অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নানা রসের ৬টি উপন্যাস

অ তী ন ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

নানা রসের ৬টি উপন্যাস

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এক স্মরণীয় নাম। বিশ শতকের পাঁচের দশকে যারা লেখালেখি করতে আসেন, তাদের মধ্যে নানা কারণেই তিনি বিশিষ্ট। তাঁর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ইতিমধ্যেই ক্লাসিক হিসাবে স্বীকৃত। এ বইটি এখনও পর্যন্ত বারোটি আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান', 'মানুষের ঘরবাড়ি'র মতো ধ্রুপদী রচনার স্রষ্টা। অতীন সাধারণত বড় ক্যানভাসে লিখতে ভালোবাসেন। তিনি প্রকৃতিমুগ্ধ লেখক। প্রকৃতির অনুপুঙ্খ বর্ণনায় মজে যান। তাঁর রচনা মানবিক রসে সিক্ত। মানুষের জীবনের, বিশেষ করে নারী—পুরুষের সম্পর্কের টানাপোড়েনের কাহিনী লিখতেও তিনি ভালোবাসেন। তাঁর রচনায় উঠে আসে আটপৌরে জনজীবনের বাস্তব চিত্র। যদিও এই বাস্তবতায় নিজেকে সীমিত রাখতে তিনি রাজি নন। তাই এই বাস্তবতাকে প্রায়ই তিনি রূপকের মোড়কে উপস্থাপিত করেন। লোকজীবনের সঙ্গে কিংবদন্তীর সীমান্তরেখাটি মুছে দেন। তাঁর চরিত্রেরা লোকজীবন থেকে উঠে এসে কিংবদন্তীর পরিসরে জায়গা করে নেয়। কখনও বা তিনি ডুব দেন মনস্তত্ত্বের নানা গূঢ় জটিলতায়।

আর তাঁর আখ্যানে নারীর ভূমিকা সবসময়ই খুব অভিঘাতময় হয়ে ওঠে। অতীন লিখেছেন, 'আসলে মানুষ এবং তার চারপাশের মধ্যে যে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে সে শুধু এক নারীর জন্য। জীবনের সবকিছুর মধ্যে যেন তাকেই বারবার আবিষ্কার...। নারী যদি তার সেই রূপবান মাছরাঙা পাখিটাকে উড়িয়ে দেয়, যে —কোনো পুরুষই অবহেলায় সব দুর্যোগ অতিক্রম করে যেতে পারে।' এরকমই কাব্যময় হয়ে ওঠে তাঁর ভাষা। যেন স্বপ্নকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। অতীন জীবন—রসিক লেখক। জীবনের অভিজ্ঞতাকে নিংড়ে তিনি তার আখ্যানের রসদ বার করে আনেন। কিন্তু সেই রসদকে স্বপ্নের কাব্যময়তায় সিক্ত করে তিনি পাঠকের কাছে পরিবেশন করেন। এইজন্য তাঁর রচনায় শ্লেষ ও অম্লতা প্রায় নেই, বরং তা এত মরমী ও মধুর। তাঁর রচনা পাঠ করলে এইজন্যই মন নিবিড় ও প্রশান্ত এক অনুভূতিতে ভরে যায়। জীবনের হিংস্রতা ও নৃশংসতাকেও তিনি বেদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। পাঠক আহত হওয়ার চেয়েও বেশি তাই বেদনা বোধ করে। তিনি তাই লেখেন, 'সব কলরবের মধ্যেও আছে জীবনের এক গোপন আকাঙ্ক্ষা।' অতীন এই গোপন আকাঙ্ক্ষার কাছেই পৌঁছতে চান। কোনও কলরব তখন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

অতীনের একটি স্মরণীয় উপন্যাস, 'শেষ দৃশ্য' (১৯৬৭)। শ্মশানে শবদাহের পেশায় নিযুক্ত সম্প্রদায়কে নিয়ে লেখা এই রচনা, রাজা হরিশচন্দ্রের নাম যারা জানে, আর জানে ওরা গঙ্গাপুত্র। শ্মশানের চারধারে অনেকগুলি কুঁড়েঘর। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের চোখে ঘৃণ্য, অবহেলিত হলেও এই মানুষগুলির জীবন আঁকা হয়েছে গভীর দরদ দিয়ে, রয়েছে তাদের 'চটানে'র নিপুণ চিত্র, তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অন্তরঙ্গ পরিচয়। গোমানি—হরিতকি—নেলি—গেরু—লখি—টুনুয়ার মতো অন্ত্যজ মানুষ এবং সেই সঙ্গে ঘাটোয়ারিবাবুকে আমরা ভালোবেসে ফেলি তাদের যন্ত্রণায়, তাদের অসহায়ত্বে। এই মানুষগুলো কেউ হাড় বিক্রি করে, কেউ চুরি করে, দারিদ্র্য আর অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। আবার গেরুর বউ শনিয়া অনাহারের মধ্যেও স্বামীকে কোনও খারাপ কাজ করতে বাধা দেয়।

অস্কার ওয়াইল্ডের প্রতীকধর্মী আখ্যানগুলির মতোই বেশ কিছু প্রতীকী আখ্যান লিখেছেন লেখক, যার মধ্যে 'টুকুনের অসুখ' (১৯৭৪) অন্যতম। খরায় গ্রাম জ্বলছে, এক ফোঁটা জলের জন্য মানুষের হাহাকার, সরকারি লঙ্গরখানায় যদিও কিছু খাবার মেলে কিন্তু জলের অভাব সেখানেও, তার ওপর আছে দুর্নীতি। সুবল নামে একটি গ্রাম্য কিশোর তার পাখি নিয়ে ট্রেনে উঠেছিল, সেখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয় চিররুগণা

বালিকা টুকুনের। টুকুন সুবলের পাখির খেলা দেখে মুগ্ধ হয় এবং টুকুনের বাবা—মা জানতে পেরে সুবলকে ব্যান্ডেল স্টেশনে নামিয়ে দেয়। টুকুন যখন নার্সিংহোমে অনেক চিকিৎসার পরও ভালো হচ্ছিল না, তখন সুবলের সঙ্গে দেখা হয়। গ্রাম্য পাখিওয়ালা সুবল হয়ে ওঠে সেই বাওবাব গাছ, যার ভালোবাসার ছায়ায় টুকুন সুস্থ হয়ে ওঠে।

'মানুষের হাহাকার' (১৯৮১) উপন্যাসে অতীন সত্তর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনকে স্থাপন করতে চেয়েছেন মানুষের সামগ্রিক উত্থান—পতন এবং অগ্রগতির অন্তহীন প্রেক্ষিতে। ফলে আন্দোলনের তাৎক্ষণিক উগ্রতা এখানে অনুপস্থিত, তার পরিবর্তে রয়েছে অস্থির সময় ও মানুষের হাহাকারের এক দরদি প্রতিবেদন। কিন্তু মানুষ পরাজয় স্বীকার করে না, সে অপরাজিত থাকতে চায়, তার মধ্যে এই বলিষ্ঠ ব্যাপ্ত জীবনবোধও নিরন্তর ভাসমান। তাই বহু তাজা প্রাণের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মধ্যে যে নতুন জীবনের সূচনা, উপন্যাসে তার কথাও বলা হয়েছে।

সমুদ্রযাত্রা, সমুদ্রের জীবন এবং সমুদ্রকর্মীদের জীবন নিয়ে লেখা আখ্যান 'নগ্ন ঈশ্বর' (১৯৮৪)। চারটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই উপন্যাসের প্রথম তিনটিকে লেখক বলেছেন, 'আলো এবং উৎসর্গের গান', শেষ পরিচ্ছদটিকেই লেখক বলেছেন মূল উপন্যাস। তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে তিন পরিচ্ছেদের তিন জাহাজকর্মীর জীবনে তিনটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা ঘটে যায়। অবনীভূষণ, বিজন এবং সুমিত্র ভিন্ন ভিন্ন জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করেছিল, বহু বন্দর ও সমুদ্র অতিক্রম করে তারা উঠে পড়েছিল এক স্থবির জাহাজে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে রয়েছে একটি অপরাধের কথা, যাকে স্মরণ করে তিনজনই অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়েছে এবং তা স্খালনের জন্য তুষারঝড়ের ভিতর ঈশ্বর—সন্ধানের মতো জীবনের মানবিক কোনও কীর্তির কথা স্মরণ করেছে, অকপটে ভালোবাসার জন্য মৃত যুবতীটিকে তারা বরফ—ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু কিছুতেই সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পারছিল না।

'দুঃস্বপ্ন' (১৯৮৫) উপন্যাসেরও কেন্দ্রে আছে এক নারী, সোমা। উদ্বাস্তু পরিবারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে সোমা। তার মা'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এক ধনী পুরুষের, সেই অপবাদ সহ্য করতে না পেরে তার বাবা আত্মঘাতী হয়। সোমা নিজেও খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বহু পুরুষের কামনার বস্তু। কিন্তু মনে মনে সে চায় এমন এক স্বপ্নের নায়ককে, যে তার জীবনে এনে দেবে সুখ, আরাম, স্বচ্ছলতা। সব পুরুষ—বন্ধুর মধ্যে সোমা তাই বেছে নেয় ধনী ব্যবসায়ী মনীষকে, যার রয়েছে অগাধ ঐশ্বর্য এবং সেই ঐশ্বর্যের মূলে রয়েছে নানা দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ। মনীষও সোমার রূপ ও শরীরের ভক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সোমা ও মনীষের বন্ধুরা এক উদ্ভট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। চারপাশে যখন বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার তীব্র হয়ে উঠেছে, দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করে তাদের হত্যা করা হচ্ছে, সেইরকম বাস্তবতায় তারা সোমার চোখে মনীষের স্বরূপকে খুলে দিয়ে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। সোমা ধীরে ধীরে বুঝতে পারে, মনীষ কোনও স্বপ্নের নায়ক নয়, সে তার স্বপ্নের নায়কের জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সোমাকে একটু একটু করে হারানোর যন্ত্রণায় মনীষ পাগলের মতো হয়ে ওঠে, এর সঙ্গে একের পর এক উড়ো চিঠি তাকে ভয়ার্ত ও তাড়িত করে চলে, আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় সে মানসিক ভারসাম্য হারায় এবং শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। মনীষকে এইভাবে তার ঈর্ষাপরায়ণ বন্ধুরা এক প্রবল ভয়ের ফাঁদে ফেলে বাধ্য করে মৃত্যুকে বেছে নিতে এবং এইভাবেই তারা সোমাকে না পাওয়ার শোধ তোলে।

'নারী এবং নদীর পাড়ে বাড়ি' (২০০২) উপন্যাসেরও কেন্দ্রে রয়েছে এক আশ্চর্য নারী, যার নাম তিথি। পড়াশুনো করবে বলে নিজের বাড়ি ছেড়ে বাবার সঙ্গে চলে এসেছিল অরণি, সেখানেই তার সঙ্গে আলাপ হয় তিথির। গরিব, অভাবী পরিবারের মেয়ে তিথি, জমিদার বাড়ির দয়ার ওপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। কিন্তু আশ্চর্য প্রাণচঞ্চল তার মন, সতেজ, সংবেদনশীল, কল্পনাপ্রবণ তার হৃদয়। অরণিকে সে যেমন অসুস্থ হলে সেবা করে, তেমনই তার মনকে নিয়ে যায় এক কিংবদন্তীকে রাজ্যে। এভাবেই তার শরীর ও মনকে অধিকার করে নেয় তিথি। অরণির কাছে তার বাস্তবতা তুচ্ছ হয়ে যায়, তিথির সঙ্গে সে হারিয়ে যায় এক

কল্পজগতে, লিপ্ত হয় নানা দুঃসাহসিক কার্যকলাপে। তারা একে অপরের কাছে অনিবার্য ও নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। তিথির সূত্রেই অরণি প্রথম যৌনতার স্বাদ পায়, নারী শরীরকে দেখে সে একেবারে অভিভূত হয়ে যায়। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলে না, তিথিকে বিয়ে দেওয়ার জন্য জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়, তাও আবার এমন এক পাত্রের সঙ্গে যার আগের পক্ষের দুটি স্ত্রী রয়েছে। তিথি কিন্তু স্টিমার থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়, আর সঙ্গে সে নিয়ে যায় অরণিকে। তিথি আর অরণি, দু'জনেই কিংবদন্তীর অংশ হয়ে যায়। লোকে বলে, তারা শুশুক হয়ে গেছে আর তাদের ঢেউয়ের মাথায় সাঁতার কাটতে দেখা গেছে।

এই বিপুলায়তন সংকলনটি প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রাপ্য দীপ প্রকাশনের কর্ণধারশ্রী শংকর মণ্ডল, তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রী দীপ্তাংশু মণ্ডল এবং তাঁদের কর্মসহযোগী শ্রী আশিস চৌধুরীর। সবশেষে বলা যায়, পাঠকদের হাতে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এক অতুলনীয় লেখকের ছ'টি উপন্যাসের এই স্মরণীয় সংকলন তুলে দিতে পারায় আমরা সকলেই গর্বিত। বাংলা উপন্যাসে এ এক গৌরবময় সংযোজন, বলা বাহুল্য, এ কথা অনস্বীকার্য।

সূচিপত্র

শেষ দৃশ্য

এক

হরিদ্বার থেকে কোনো একদিন ওরা রওনা হয়েছিল—ওরা অন্তত তাই বলে। প্রয়াগ বারাণসীর পথ ধরে গঙ্গার ধারে ধারে ওরা ডেরা বেঁধেছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম ওরা জানে—তিনি গঙ্গাপুত্র। সে নাম স্মরণ করার সময় ওরা মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে। তার চেয়ে বেশি ওদের জানা নেই। এরা বলবে তখন, না জানে বাবু কাঁহাসে আয়া, লেকিন জানে, হামরা সব আছে গঙ্গা—পুত্তুর। বলবে হরিদ্বারসে কোলকত্তা—তেমন হাজার চটান খুঁজে পাবেন। চটানে হামরা ঘাটের কাঁথা কাপড়ে ডেরা বেঁধেছি। ঘাটের দুচার পয়সায় হামলোগ নসিবকে ঢুঁড়েছি।

চটানে পাশাপাশি কুঁড়েঘর অনেকগুলো। কুঁড়েঘরগুলোর কোনোটায় চাল আছে, বেড়া আছে, দরজা আছে। চাল—ঘাটের ছেঁড়া তোষক এবং কাঁথার, বেড়া—ফালি বাঁশের। কিছু কিছু ঘরের চাল আছে, কিছু ঘরের বেড়া নেই, দরজা নেই। শুধু মেঝের ওপর ফালি বাঁশের মাচান। মাচানের নিচে রাজ্যের হাঁড়ি—কলসি। দরজার বদলে কোনো ঘরে ছেঁড়া কাঁথা ঝুলছে। ছেঁড়া কাঁথাটাই দরজার মতো কাজ করছে। ছেঁড়া কাঁথাটা তেলচিটে নোংরা। কোথাও পোড়া—চিতার আগুনের দাগ। তবু এটাই ওদের দরজার আব্রু, মনের আব্রু, চটানের ভালোবাসার আব্রু। চটানের উঠোনে শুয়োরের খোঁয়াড়, মোরগের ঘর, কুকুরের আস্তানা। ঘরে ঘরে অভাব অনটন মারধোর। আবার ভাব ভালোবাসার কথা। ঘরে ঘরে হল্লা চিৎকার—নাচন কোঁদন। তখন আসেন ঘাটোয়ারিবাবু। তিনি সালিসি সাজেন, বিচার করেন। চটানের মা—বাপ তিনি।

চটানের সঙ্গেই ঘাট—অফিস। এখানে মড়ার নামধাম লেখানো হয়। একটা কাউন্টার আছে—ঘাটোয়ারিবাবু সেখানে একটা কালো চেয়ারে বসে থাকেন সারাদিন। রাতে পাশের তক্তপোশে চুপচাপ শুয়ে থাকেন। ঘরে কতকগুলি ছবি টাঙানো আছে। এই শহরের বনেদি লোকগুলোর ছবি। তারা মরল—তিনি তাদের ছবি রাখলেন। এই ছবিগুলো দেখে কোনোদিন রাত কাটিয়ে দেন অথবা কোনোদিন ঘুমিয়ে পড়েন। ঘাট—অফিস পার হলে বারান্দা। ঘাটের কিছু কাঁথা—কাপড় ইতস্তত ছড়ানো। দুটো কুকুর শীতে কাতরাচ্ছে পাশে। ডোমেদের ছেলেপিলেরা কুকুর দুটোকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরা দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে।

তখন চটানে শীতের রোদ নেমেছে। শীতের ভোরে কাকের শব্দ, কুকুরের শব্দ, মোরগের শব্দ পাশাপাশি কোথাও। পাশাপাশি দুটো ঘরের ফাঁকে একটা শুয়োর পড়ে আছে। ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ করছে শুয়োরটা। দুটো বাচ্চা শুয়োর শীতে কাঁদছে।

হরীতকী দরজায় বসে সব দেখছিল। অন্য ঘরে গোমানি ডোম খকখক কাশছে। হরীতকীর কোমরে ব্যথা, তবু বসে বসে সব দেখছিল। কাশির জন্য গোমানি ডোমের গোঁফ কাঁপছে। চোখ দুটো জ্বলছে—জবাফুলের মতো লাগছে। কাঁপতে কাঁপতে মুখ থুবড়ে পড়ছে মাচানের ওপর। হরীতকীর কোমরে ব্যথা, তবু এসব দেখছিল।

গোমানি এদিকে ওদিকে তাকাল। বেলা দেখল। শীতের বেলা—রোদে তাপ নেই, তাপ থাকলে ঘাটের তোষক বালিশ ছেড়ে চটানের উঠোনে কিংবা ঘাট—অফিসের বারান্দায় গিয়ে বসতে পারত। হরীতকী দরজায় বসে এমন সব কিছুই অনুমান করছে। হরীতকী দরজায় বসে রয়েছে এক মালসা গরম জলের জন্যে। দুখিয়ার বৌ ঘাটের পোড়া কাঠে গরম জল করতে গেছে। একটু দেরি হবে—সে ভাবল এত সাধারণ কথা। গোমানির চোখ দুটো কাশির জন্য চোখ থেকে বার হয়ে আসতে চাইল। আবার ভিতরের দিকে পালাতে চাইল। সে দেখল বসে বসে। কোমরে ভীষণ ব্যথা। কোমরটা ধরে টিপল হরীতকী। ব্যথার উপশম খুঁজল। কোমরে চাপ ধরে আছে। সে দাঁড়াল, বাঁশে হেলান দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। দুখিয়ার বৌ মংলি আসছে, হাতে গরম জলের মালসা। হরীতকী এত খুশি যে কিছু বলতে পারল না। মালসাটা টেনে নিয়ে পর্দার মতো কাঁথার আব্রু ফেলে দিয়ে গা ধুতে লাগল।

গোমানি মুখ তুলে হরীতকীর খুশি—খুশি ভাবটুকু লক্ষ্য করে বিরক্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে চটানের নেমকহারাম উত্তাপ জমতে থাকল। রাগ হল ওর। খিস্তি করতে ইচ্ছা হল—মাগি জাত একটা জাত! ওয়ার

আবার, ধম্ম ওয়ার আবার স্বভাব! মাগির বাচ্চাটা হয়েছে শ্মশানে—হবে না! মাগির নেই জাতের ঠিক, নেই ধম্মের ভয়—চতুরাকে মদ খাইয়ে খুন করেছে—ও শ্মশানে বাচ্চা বিয়োবে না তো কী হাসপাতালে বিয়োবে! কিন্তু বলতে পারল না। শরীর দুর্বল—শীতের ব্যামোতে ওকে জব্দ করেছে। তা ছাড়া কাল না খেয়ে থাকার জন্য শরীরটা বেজান হয়ে আছে। ভুখা শরীর হল্লা করতে দিচ্ছে না। সেজন্য শরীরে আরও কাঁথা—কাপড় জড়িয়ে পাশের কিছু পোঁটলা—পুঁটলি ঠেলতে থাকল। বলল, উঠ নেলি, সকাল হো গিয়া।

কিছু কাঁথা—কাপড়ের ভিতর থেকে নেলি ধড়ফড় করে উঠে বসল। নেলির মুখটা শুকনো থাকত—যদি না রাতে এত গভীর ঘুমোত। শ্যামলা রঙের শরীর, এক মাথা চুল। চুলগুলো মুখ ঢেকে রেখেছে। চোখ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চোখে বিরক্তির চিহ্ন। আরও ঘুমোনোর ইচ্ছে। অথচ সে কিছু বলছে না, আড়মোড়া ভাঙছে শরীরের। চোখ রগড়াচ্ছে। চুলগুলো জড়ো করে তালুতে খোঁপা বাঁধছে এবং মাচান থেকে নামার সময় বলছে, ক্যান ডাকলি বাপ? খোয়াব এয়েছিল, তু ডাকলি ক্যান!

গোমানি কাশল ক'বার। ওর উত্তর দিতে সেজন্য দেরি হচ্ছে, অথচ মেয়েটা নেমে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে। সে দম নিতে পারছে না। কথা বলতে পারছে না। ওর জ্বলন্ত চোখ একবার ভিতরে, একবার বাইরে দেখছে। কোনোরকমে লেপ—তোষকের ভিতর থেকে কচ্ছপের মতো গলাটাকে বার করছে। তবু যেন কোনোরকমে —ভুখ লাগিছে।

নেলি চলে যাচ্ছে। চলে যেতে যেতে থামল। আঁচলটা টেনে কাঁধে ফেলল। চোখ টান করে, ঘাড় কাত করে তাকাল বাপের দিকে। তারপর ফের চলতে চলতে উঠোনে নেমে গেল। নিচে নেমে শুয়োরের বাচ্চা দুটোকে ছেড়ে দিল—টঙ—এ কবুতর ছিল, তাও উড়িয়ে দিল। শেষে বসুমতীকে প্রণাম করল দুহাত ঠেকিয়ে।

এমন অবস্থায় গোমানির রাগ না বেড়ে যায় না। নেলি কথা বলছে না, খেতে দেবে কী দেবে না—তাও কিছু বলছে না। বড় বাড় বাড়ছে মেয়েটা। সে ডাকল, হে শুয়োরের ছা, তুকে কী বলিছে হাম? যেছিস কুথা।

যেছি—মরতে। নেলি সাফ জবাব দিল। সাফ সাফ কথা বলল। সে ফের মাচানে উঠে গেল এবং একটা কাঁথা শরীরে জড়িয়ে নিল। রোদের তাপ বাড়ছে একটু একটু করে। উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে সে তা ধরতে পারছে। কবুতরগুলো উড়ে উড়ে চালে, মাঠে ময়দানের ঝাউগাছটায় বসল। সে দেখল কবুতরগুলো পরস্পর ঠোঁট কামড়াচ্ছে—। ঝাউগাছের ডাল ধরে রোদ নিচে নামছে—সে দেখল। একটা পোয়াতি মাদি শুয়োর কাঠগোলায় শুয়ে আছে—সে দেখল। সে এখন ওর গঙ্গা যমুনাকে খুঁজছে! এই ভোরে ওরা কোথায় গেল! সে গলা ছেড়ে ডাকল, গ....ঙ্গা....যমু.....না, কুথা গেলি এবেনে তুরা।

গোমানি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল মাচানে। বুকটা ওর ভেঙে যাচ্ছে উঠতে। নেলির ভাবসাবগুলো ওকে উন্মাদ করে দেবার মতো। সে কাশতে কাশতে বলল, দেখ নেলি, তুর এ ভাবসাব হামার ভালো লাগে না। যা বুলবি সাফ সাফ বুলবি—লয়তো ঘাটের মড়া মুখে ঠেসে ধরবে।

নেলি তখন ওর কুকুর দুটোকে আদর করছিল। ওরা ওর গায়ের ওপর লাফিয়ে উঠছে। সে শুনতে পাচ্ছে —বাপের গলায় গরল। সেও গরল তুলল গলায়—কিয়া বাত তুম বলেহ! ঘাটের মড়া ঠেসে ধরবে! ধর, ধরে যদি খানা মিলেত জরুর ধরবে।

হরীতকী শরীর পরিষ্কার করে ফেল দরজায় বসে সব দেখছে। শ্মশানে বিয়ানো বাচ্চাটা কাঁদছে ওর কোলে। সে এই সব দেখতে দেখতে ষাট সোহাগ করল, নেলি ওর ঘরের দিকেই আসছে। কুকুর দুটো তখন উঠোনের মাটি শুঁকছে। হরীতকী বাচ্চাটাকে রোদে রেখে দিল। তখন ঝাড়ো ডোমের ঘরে কী নিয়ে বচসা হচ্ছে। শিবমন্দিরের পথ ধরে শহর থেকে যাত্রী নামছে তখন। ওদের কোলাহল এই চটানে ভেসে আসছে। নেলি সেই সব কোলাহল শুনতে শুনতে হরীতকীর দরজায় এসে হাজির হল। পিসির বেটি রয়েছে—বেটির পাশে বসল। নাক নেড়ে আদর করল।

হরীতকী বলল, কিরে ভোর না হতেই বাপের সাথ ঝগড়া বাঁধালি?

হেঁ বাঁধিয়েছি ত। নেলি জবাব দিতে গিয়ে ঘাড়টা কাত করে দিল। হরীতকী ধমক দিল নেলিকে। ওকে শাসন করারও ইচ্ছা। —যা যা ঘরে যা। বাপকে দুটো রেঁধে দেগা। হাসপাতাল থেকে পুলিশ এলে ওকে ফের ভুখা যেতে হবে।

নেলি চুপচাপ ঘাড় গুঁজে পিসির বেটির পাশে কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর কী ভেবে পিসিকে জবাব দিতে গিয়ে ভেঙে পড়ল—তু বল পিসি, হামি ওয়াকে কী রেঁধে দি। ঘরে কিছু না আছে। গিল রাতে ভুখা থাকতে হল। বুললাম তু যা, এক আধ রুপেয়া ধার লিয়ে চাল দাল কিছু লিয়ে আয়। গিল ঠিক, টাকায় আট আনা সুদে ধার ভি লিল, কিন্তুক কিছু চাল দাল লিল না। পারে সব কুচ রেখে দিল। পিসি, হামি ওয়াকে কী রেঁধে দি বুল।

এই সব কথা শুনে হরীতকী নেলিকে এড়িয়ে যেতে চাইল। এই সাত সকালে গোমানি ডোমের জন্য দরদ উথলে ওঠায় নিজের উপরই সে বিরক্ত হল। সেজন্য হরীতকী কোনো জবাব দিল না। পিসির বেটির পাশে বসে মাটিতে নেলি আঁচড় কাটছে। ঘাটের কাঠ এসেছে গরুর গাড়িতে। দূরে কুকুরের আওয়াজ, মোরগ, শুয়োর, কবুতরের শব্দ নেলির দেহমনকে কেমন মাতাল করে রেখেছে যেন। সে নড়তে পারছে না পর্যন্ত। গোমানি কাশছে! বসে বসে নেলি গোমানির গালাগাল খাচ্ছে। সে তখন মাতালের মতো উঠে দাঁড়াল। কুকুর দুটোকে নিয়ে গঙ্গায় নেমে গেল। কিন্তু ভুখা শরীর নিয়ে ওর চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

শীতের গঙ্গা। জল নেই—হুহু করে বাতাস আসছে উত্তর থেকে। নেলির একমাথা চুলের খোঁপা খসে গেছে। ওর পাঁশুটে চুল বাতাসে উড়ছে। ঘাটে মড়া আসেনি। শ্মশানটা সেজন্য খাঁ খাঁ করছে। শ্মশানের চালাঘর ফাঁকা। কুকুরগুলো সেখানে জটলা পাকাচ্ছে। নেলির উপোসী শরীরটা চলছে না। ও ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। যাত্রীদের ঘাট থেকে সে একটু দূরে দাঁড়াল। কুকুর দুটো ওর দুপাশে। কুকুর দুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে আকাশ দেখল, উত্তরের হাওয়া গায়ে মাখাল এবং হিসেব রাখল যাত্রীরা কটা তামার পয়সা জলে ফেলছে।

চটান থেকে নামছে গেরু, সোনাচাঁদের ছেলে টুনুয়া, ঝাড়ো ডোমের বেটা লখি। গেরু নেলির পাশে এসে দাঁড়াল। নেলির গঙ্গা যমুনাকে আদর করল। ওরা যাত্রীদের অপেক্ষায় আছে। যাত্রীরা উঠবে ওরা নামবে। যাত্রীদের পয়সা, সোনাদানা, ডুবে ডুবে তুলবে।

গেরু বলল, নেলি তু এত সকাল সকাল!

তুভি ত এসেছিস রে। সকাল সকাল হামি একলা না আছি।

লেকিন তুর বাপ চিল্লাতে শুরু করেছে। বুলছে ও মাগি কাঁহা গ্যাল!

বুলছে ত বুলছে। লেকিন তুর নসিব ত ভাঙেনি।

লখি, টুনুয়া ততক্ষণ সবুর করতে পারল না। ওরা সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সন্তর্পণে নেমে পড়েছে। যাত্রীদের চোখেও ওরা ধরা পড়ছে না। টুনুয়া একটা ডুব দিল। টুনুয়া, লখি একসঙ্গে ডুব দিল। ওরা ডুব দিয়ে যাত্রীদের ভিতরেই ভেসে উঠছে। ওরাও যাত্রী হয়ে গেছে। নেলি গেরু এই সব দেখতে পেয়ে লাফিয়ে জলে পড়ল। শীতের জলে ডুব দিয়ে যাত্রীদের ভিতর হারিয়ে গেল।

যাত্রীরা সব উঠে যাচ্ছে। ওরা ডুব দিয়ে সাঁতার কাটছে এবং গঙ্গার বুক থেকে মাটি, কাঁকর, বালি খড়কুটো সব তুলে আনছে। গেরু অনেকক্ষণ ডুব দিয়ে থাকতে পারে। বালির ওপর মাছের মতো খুঁটে খুঁটে চলতে পারে—নেলি জলের ভিতর থেকে সব দেখতে পাচ্ছে। জলের ভিতর দিয়ে গেরুর পেশী বড় মজবুত লাগছে। কোমরটা সরু লাগছে। বুকের পেশীগুলো শক্ত মনে হচ্ছে। গেরু অনেকক্ষণ জলের নিচে ডুব দিয়ে থাকতে পারে। মাছ হয়ে ভাসতে পারে। গেরুর নসিব ভালো—সে একটা একটা দুটো পয়সা পেল। তামার পয়সা। সে এক আনা পেল। নেলিও ডুব দিয়ে দিয়ে জল কাটছে। আঁচলটা বুক থেকে নেমে মাছের পাখার মতো কাঁপছে। নেলি জলের নিচে দেখল গেরু পয়সা খুঁজছে আর ওর দিকে যেন তাকাচ্ছে। নেলি এসময়

এক আনা পেল, গেরু রে, তু আরও দেখ, যত পারিস দেখ। নেলি ডুব দিয়ে দিয়ে চোখ লাল করছে যদি নসিব খোলে। যদি সোনাদানা উঠে আসে আবর্জনার সঙ্গে। দাঁতে দাঁতে ঠেকল। সে ডুব দিল। এত করেও সে যখন পাচ্ছে না, যখন লখি, টুনুয়া সোনাদানা পেল যখন সকলে খুশি হয়ে উঠে যাচ্ছে, তখন নেলি গাল দিল—ডাক ঠাকুর তোর মুখে আগুন।

জল থেকে নেলি উঠে এল। গেরু উঠে এল। উত্তরের হাওয়া আরও বাড়ছে। নেলি শরীর সামলে নিল এবং বলতে ইচ্ছা হল, গিল কাল হামি ভুখা থাকলে গেরু। তুর চারঠো পয়সা হামারে দিয়ে দে। দু আনায় মুড়ি পিঁয়াজি কিনেলি। দুটো হামি খাই, দুটো বাপ ভি খাক। কিন্তু নেলি বলতে পারল না—জলের নিচে যে ইচ্ছার রঙে ডুবেছিল, উপরে উঠে সেই ইচ্ছাই ওকে বলতে দিল না। গেরুর দিকে তাকাল এবং নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দৌড়ে উপরে উঠতে থাকল। বলতে থাকল যেন—গেরুরে, তু বহুত জোয়ান হয়ে উঠেছিস। উপরে উঠে টুনুয়াকে ডাকাল, এ টুনুয়া শোন। টুনুয়া কাছে এলে বলল, চারঠো পয়সা ধার দিবি। কাল হামি ভুখা থাকল, বাপ ভুখা থাকল।

টুনুয়ার কাছ থেকে চারটা পয়সা নিয়ে ফের ছুটতে থাকল নেলি। কাপড়ের আঁচলে পয়সা দু আনা শক্ত করে বেঁধে শিবমন্দিরের পথে উঠতে থাকল। আকাশটা পরিষ্কার। প্রচণ্ড শীত যেন আকাশ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাপড় নিংড়াল নেলি। দুপুর হচ্ছে অথচ রোদের উত্তাপ বাড়ছে না। নেলি গায়েপিঠে উত্তাপ নিয়ে শরীরে উত্তাপ জমাতে পারল না। সে বিরক্ত হয়ে চটানের দিকে নেমে গেল। ঝাড়ো ডোম গাওয়াল করতে বের হচ্ছে—লাঠির দুপাশে ডালা—কুলো ঝুলছে। সোনাচাঁদ শহরের কুকুর বেড়াল ফেলতে মিউনিসিপাল অফিসে যাচ্ছে। দুখিয়া হল্লা করছে চটানে। নেলি চটানে না ঢুকে পুরোনো অশ্বত্থের নিচে দাঁড়িয়ে শুনল সব। দুখিয়া নালিশ দিচ্ছে গোমানিকে—তেরে বেটি চোর গোমানি। তেরে বেটি চোর। সাবধান করে দিস বেটিকে।

পুরোনো অশ্বত্থের নিচে দাঁড়িয়ে নেলি বুঝল বাপ উত্তর করছে না। এখানে দাঁড়িয়ে অন্তত কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাপের চেহারা এ সময় কেমন দেখাচ্ছে এই ভেবে নেলি মুষড়ে পড়ল। ভাবল, এখন চটানে উঠে গেলে বাপ হয়তো চেলা কাঠ নিয়ে তেড়ে আসবে। বলবে, হারাম তু চটানসে নিকাল। নেলি সুতরাং নড়ল না। আরও কিছু কথাবার্তা না শুনে সে নড়তে পারছে না। বাপের আওয়াজ কানে আসার আশায় পুরোনো অশ্বত্থের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। শীতে কাঁপল। কারণ আওয়াজ শুনলেই সে বুঝতে পারবে বাপের রাগ চেলাকাঠের না দু দণ্ড গালমন্দের। নেলি শুনল তখন বাপ বলছে—চোর! মেরে বেটি চোর!

হা জরুর চোর। তেরে বেটি চুরি করে লিছে ঘাটের কাপড়। বে হুদা হামার ডাক হল। তু কিছু করে না লিস ত পাঁচ জনকো হাম জরুর সালিসি মানে।

তু সালিসি না মানে দুখিয়া। ও আর ঘাটসে কিছু লেবে না। আমি ওয়াকে বারণ করে দেব।

নেলি বাপের এইসব কথাগুলো শুনে নিশ্চিন্ত হল। চটানে উঠে গিয়ে মাচান থেকে কাঁথা—বালিশের ভিতর থেকে একটা শাড়ি বের করল। ভিজে শাড়িটা এবং কাঁথাটা চালের ওপর ফেলে দিল। এ সময় হরীতকী দরজা থেকে মুখ বের করে দেখল দুখিয়া নেই—চলে গেছে। নেলি কাপড় ছাড়ছে, কাপড়ে বুক ঢাকতে চায় না। হাঁটু ঢাকতে চায় না। তবু নেলি কাপড়টা টেনেটুনে সব শরীরে পেঁচিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এই সব দেখে হরীতকীর কষ্ট হল এবং হাতমুখ নেড়ে ভিতরের কষ্টটাকে উগরে দিল—চামার! চামার! ছোটলোক!

গোমানি কাঁথা—কাপড়ের ভিতর থেকে সম্মতি জানাল, ছোটলোক—হা ছোটলোক বটে।

হরিতকির মনের ঝাল যেন মিটছে না।—ঘাটের কাপড় না বুলে লিয়েছে ত ওয়ার জান গেছে!

হা তাই বটে।

চুরি করে লিছে ঘাটের কাপড়! এর নাম চুরি! আর বুলি গোমানি বেটিকে কাপড় দেওয়ার মুরদও নাই তোমার। ঘাট থেকে চুরি করে তবে ওয়ার পিনতে হয়।

নেলি পুরোনো অশ্বত্থের নিচে দাঁড়িয়ে বাপের শেষ জবাবটাও শুনে গেল। —নাই আমার, হা নাই যা বুলছ।

নেলি চটান পার হয়ে শিবমন্দিরের পথ ধরল। সে শরীর ঢেকে গা বাঁচিয়ে হাঁটছে। সে জানে কেউ ওকে ছোঁবে না। সে জানে ছুঁয়ে দিলে ওরা স্নান করবে গঙ্গায় এবং নেলির চোদ্দপুরুষকে উদ্ধার করবে। নেলি রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটল। বাবুদের দেখে আলগা হয়ে দাঁড়াল। নর্দমার পাশে দাঁড়িয়ে শরীর আলগা করে দিল। জড়োসড়ো হয়ে সকলকে পথ খুলে দিল।

নেলি রামকান্তর দোকানে এসেও আলগা হয়ে দাঁড়াল।

রামকান্ত বলল—তোর বাপ চটানে আছে না হাসপাতালে গেছে?

চটানেই আছে। মাচানে পড়ে গোঙাচ্ছে।

ধারে টাকা নিল, টাকাও দিল না, সুদের নামও করল না।

করবে। হাতে টাকা হলে বাপ দিয়ে দিবে।

এবার গলা খাটো করল রামকান্ত। জোঁকের মতো গলা লম্বা করে দিল। এবং ফিসফিস করে বলল, হরীতকীর বাচ্চাটা মেয়ে না ছেলেরে?

মেয়ে বাচ্চা দি লিছে পিসি।

তুই বাচ্চা দিবিনে? তোর বাচ্চা দিতে শখ যায় না?

নেলি বাবুর মুখ দেখে অর্থ ধরতে পারল। সে চোখ ঢাকল। মুখ কুঁচকাল। কিন্তু কিছু প্রকাশ করল না। রামকান্ত সুদের মহাজন—নেলি রামকান্তকে ঘাঁটাতে সাহস করল না। অথচ চোখে—মুখে অস্বাভাবিক ভাব নেলির। বিরক্তিতে চোখ দুটো জ্বলছে। তবু সে এতটুকু রাগ দেখাল না। নরম গলায় ঢুলে ঢুলে বলল, কী যে বুলছে বাবু!

এমন কথা শুনে অনেক দিন পর রামকান্ত প্রাণ খুলে হাসল। কী যে বুলছে বাবু! নেলির মা ফুলনও এ—গলায় এমনি করে বলত। এমনি করেই চোখমুখে অস্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে তুলত। তখন ফুলনের মুখটা আরও মিষ্টি লাগত। তখন ফুলনের ভরা কোটালের যৌবন। নেলিকে প্রশ্ন করার মতো সেদিন ফুলনকেও প্রশ্ন করেছিল—ঝাড়ো ডোমের বাচ্চাটা মেয়ে না ছেলে? ডোমের বৌ বাচ্চা কেমন দিলে। তুই বাচ্চা দিবিনে, তোর মা হতে শখ হয় না?

তারপর একদিন চটানে শুনতে পেয়েছিল গোমানির পোয়াতি বৌর কান্না। মাচানের নিচে ফুলন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মেটে হাঁড়ি—কলসিগুলো নিচে থেকে সরিয়ে রেখেছে গোমানি। ঘাটের কাঁথায়—কাপড়ে মাচানের চারদিক ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মাচানের ওপর গোমানি নিশ্চিন্তে বিড়ি টানছে। সুদের মহাজন রামকান্ত চটানে এসে অপেক্ষা করছে। এ সময় গোমানির টাকার দরকার হতে পারে। টাকা দেওয়ার জন্য বসে রয়েছে সে। গোমানি তখন মাচানের ওপর ফকির দরবেশের মতো। গোমানি তখন ঈশ্বরকে ডেকে বলছে, দুনিয়া আজব জায়গা। এখানের জনম—মরণ রহস্য আমরা ছোট মানুষ হয়ে কী করে জানব। ওর আসমান ওর জমিন—ও ঠিক টেনেটুনে খালাস করবেই। মাঝে মাঝে গোমানি মাচানের নিচে উঁকি মারছিল আর দেখছিল—খালাস পাচ্ছে কী পাচ্ছে না, এবং ঝাড়ো ডোমের বৌকে বলছিল—ভাবি, টেনে নামাস না। ওকে আপনি নামতে দে।

সেই মেয়ে এখন এত বড় হয়েছে, সেই মেয়ে এখন কাপড় সামলে হাঁটে। সেই মেয়েকে সে অযথা এখানে দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়।

নেলি কিছু মুড়ি কিনল। কিছু পেঁয়াজি কিনল।

নেলি চটানে ফিরে এসে দেখল মাচানে তেমনি উপুড় হয়ে পড়ে আছে বাপ। বালিশের ভিতর মুখগুঁজে পড়ে আছে। হাত পা কুঁকড়ে রেখেছে। শরীরটা শুকনো লাউডগার মতো। গোমানি নেতিয়ে আছে মাচানে। মানুষটার পেটে রাজ্যের খিদে। নড়তে পারছে না—এ—পাশ ও—পাশ হতে কষ্ট।

নেলি সন্তর্পণে উঠোন পার হয়ে উঠল। মাচানে বসল। ধীরে ধীরে বাপের শরীর থেকে কাঁথা—কাপড় সরিয়ে ডাকল—বাপ, উঠরে বাপ। খা। দুটো দানা মুখে দেনেসে তাগদ হবে শরীরে। হাসপাতাল সে আজ জরুর সিপাই আওগে। তু খা লে।

গোমানি উঠে বসল। ওর পাতলা আমশি ঠোঁটে হাসি ফুটল। শেষে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে মুড়ির ঠোঙাটা জোর করেই যেন নেলির হাত থেকে কেড়ে নিল। তারপর মুঠো মুঠো মুড়ি কুমিরের মতো হাঁ করে মুখটায় ঠেলে দিতে থাকল এবং মুড়ি খেতে খেতেই গোমানি বলল—খুব তাল মুড়ি আছে। দুটো মুড়কি লিলে ভালো হত রে। লয় তো কিছু বেগুনি, ফুলরি।

লিয়েছি। এক আনার পিঁয়াজি ভি লিয়েছি। দ্যাখ কেমন গরম গরম আছে।

বাপের এই খুশি—খুশি ভাবটুকু নেলির ভালো লাগছে। নেলি আঁচলে গিঁট খুলে পেঁয়াজির ঠোঁঙাটা ওর হাতে দিল। —দেখ কেমন গরম গরম লিয়েছি। তুর চারঠো হামার চারঠো। মুড়ি সবটা খেয়ে লিস না আবার। হামার লাগি রাখিস। ভুখ হামর ভি লাগিছে।

নেলিকে খুশি—খুশি দেখে বিড়ি খাওয়ার জন্য গোমানি চারটা পয়সা চাইল। —চরঠো পয়সা জায়দা হবে?

নেলি ঘাড় নাড়ল। তারপর বাপের দিকে চেয়ে বলল—না।

গোমানির দাঁত না থাকায় কথা খুব অস্পষ্ট। মুখভর্তি মুড়ি থাকার জন্য কথা আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুড়িগুলো মাড়ি দিয়ে চিবুচ্ছে আর বলছে, চারঠো পয়সা জায়দা হোবে না বুলছিস। তবে চার পয়সার বিড়ি কিনে লিতাম।

নেলি দেখছে বাপ মুড়ি প্রায় শেষ করে এনেছে। একবার ওর কথা ভাবছে না। যেন সব মুড়ি, সবকটা পেঁয়াজি শেষ করে দেবে। যেন গোমানি একাই খাবে সব। বাপের এই অবিবেচনার জন্য নেলি বিরক্তিতে ভেঙে পড়ল। না হবে না। পয়সা হামার নেই। পয়সা পাব কুথা? দুচার পয়সা তু হামারে দিস?

তব তু এ—পয়সা কাঁহা পেলি? বুল শুয়োরের ছা, তু কুথা পেলি। গোমানি গলাটাকে ওঠাতে নামাতে থাকল।

পয়সা হামি কামিয়েছি। এ—মুড়ির পিণ্ডি যে তু গিললি সে হামার রোজগারের। লজ্জা না লাগে তোর মেয়েমানুষের রোজগার খেতে। পোড়া কাঠ খেতে পারিস না ঘাটের। পোড়া মানুষ চিবিয়ে খেতে পারিস না! নেলির মুখে গরল উঠল।

খুন! খুন করে দেব। গোমানি কাঁথা—কাপড় ছেড়ে উঠে পড়ল। কোমর থেকে লুঙ্গিটা খুলে যাচ্ছিল, সেটা কোনোরকমে ধরে ফেলল। এক হাতে কোমরের লুঙ্গিটা চেপে ধরে মাচান থেকে লাফ দিয়ে নামল। সে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। মাচানের নিচে গলা বাড়িয়ে সে খুঁজছে দা—টা। মুড়ির ঠোঙা এক হাতে—সেটা ছাড়ছে না। মাচানের নিচে থেকে গলাটা ফের কচ্ছপের মতো বের করে ধরল। কচ্ছপের মতো চোখ করে সে নেলিকে দেখছে—খুন করে দেব বেইমানের ছা! আমি না তোর বাপ!

নেলি ভেংচে উঠল। হাত পা নেড়ে বলল, বাপরে! হামার বাপ! বাপের মুরদ দেখলে বাঁচিনে!

গোমানি ওর ভোঁতা দা—টাকে মাচানের নিচে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাঁড়ি টেনে কলসি টেনে দা—টা খুঁজছে। দা—টা ওর এ—মুহূর্তে চাই—ই। খুন সে যেন করবেই। নেলিকে খুন না করে জলগ্রহণ করবে না—এমন ভাব চোখে—মুখে। নেলি কিন্তু নড়ছে না। মেঝেতে দাঁড়িয়ে বাপের কাণ্ড দেখছে। আর যখন দা পেয়ে গোমানি ওর সামনে দা—টাকে ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করল—খুন, খুন, আজ খুন হবে লিশ্চয়, তখন নেলি গলার স্বরটা শক্ত করল এবং পরে কোমল করে বলল, চুপ কর, চুপ কর। অমন করে ছোটলোকের মতো চিল্লাস না। যা খাচ্ছিস তাই খা, পয়সা না থাকলে দি কোত্থেকে!

গোমানি দেখল ঠোঙায় মুড়ি প্রায় নেই। সুতরাং সে নেলির মুখে ঠোঙাটা ছুঁড়ে দিল। —আর খাব না। তুর গতরের রোজগার হামার লাগে না।

গোমানি ফের মাচানে উঠে কাঁথা—কাপড় গায়ে দিয়ে বসে থাকল। যেন সে এ—মাচান থেকে আর উঠবে না, নড়বে না। অনড় হয়ে বসে থাকবে। হাসপাতালে যাবে না। কোথাও যাবে না। কোথাও না। নেলি হাঁটু গেড়ে মাটি থেকে একটা করে মুড়ি কোঁচড়ে তুলছিল তখন। একটা দুটো করে মুখে মুড়ি ফেলছিল। এই দুঃসহ দুঃখে বাপের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। ক্ষোভে চোখ থেকে জল বের হচ্ছে। ওর কান্না পাচ্ছে। এবং এ—সময়ই নেলির গেরুর মুখ মনে পড়ছে। জোয়ান শরীরটার কথা মনে পড়ছে। কৈলাস ডোমের বেটা দিন দিন চটানে মরদ হয়ে উঠছে। বাপের মতো কসরত দেখাতে শিখেছে। বল্লম ছুঁড়ে গাছ এফোঁড়—ওফোঁড় করে দিচ্ছে। আকাশ ফুটো করে দেওয়ারও ইচ্ছা যেন গেরুর।

মাচানে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল গোমানি। রাগ পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু নেলির হাবভাব দেখে মনটা ওর ফের বিগড়ে গেল। নেলি পিঁয়াজি খাচ্ছে—আহা পিঁয়াজি খাচ্ছে—যেন কিছু খায় না। যেন গোমানিকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাওয়া হচ্ছে। যেন বলছে খেতে খেতে তোর কামাই খাচ্ছি নারে, আমার মুরদের কামাই খাচ্ছি। তবে এত ডর কীসের।

থুঃ থুঃ! গোমানি থুথু ছিটাল। —না আর খাব না। তোর গতরের রোজগার হামার লাগে না। যেন পারলে এক্ষুনি উগরে দেয় সব। বাপের এইসব কাণ্ড দেখে নেলি খিলখিল করে হেসে উঠল। না হেসে পারল না। না হাসতে পারলে খালি পেটে খিল ধরে যাবে যেন। উঠোনে নেমেও সে হাসল। পাগলের মতো হাসতে থাকল। মুখে বাপের থুথু লেগে আছে, মুড়ির কুচি লেগে আছে—সব মিলে ভীষণ একটা দুর্গন্ধ। নেলি হাতমুখ ধুল মালসার জলে। ফের হাসতে গিয়ে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে সিপাহি। নেলি ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। ছুটে এসে ঘরে ঢুকল সে।

হরীতকী গোমানির এই সব কাণ্ড দেখে বলেছিল—তুমি একটা বাপই বটে গোমানি।

হে বাপই বটে! গোমানি মাচানে বসে জবাব দিয়েছিল।

এটা বহুত আচ্ছা কাজ হল না। মেয়েটা ভি না খেয়ে রয়েছে, ওয়াকে তুমি খেতে দিলা না।

গোমানি একটা কোঁত গিলল।

গোমানির সওয়াল শুনল নেলি। সিপাহি উঠোন পার হয়ে গোমানির খোলা ঘরটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর জুতোর শব্দে মুখ তুলল গোমানি। সিপাহিকে দেখে খুব ভালোমানুষ হয়ে গেল। যেন এতক্ষণ চটানে কিছুই হয়নি। সে হাসল পুলিশ দেখে।

নেলি সিপাহিকে একটা পিঁড়ি দিল বসতে।

সিপাহি বলল—হে গোমানি চলেহ।

হা জি চলতে রহেহ। গোমানি কাঁথা বালিশের নিচে এখন গামছাটা খুঁজছে। —কাঁহাসে লাশ এল?

মধুপুরসে। সিপাহি পিঁড়ি টেনে বসল উঠোনে।

গোমানি কাঁথার ভিতর থেকে গামছা টেনে বের করল। —খুনের লাশ না গলায় দড়ির লাশ। মাথায় কাপড় দিয়ে ফেট্টি বাঁধার সময় এই ধরনের একটা প্রশ্ন করল সিপাহিকে।

সিপাহি দেখে গোমানির শরীরের সব জড়তা ভেঙে যাচ্ছে।

নেহি, পানীসে ডুবল জোয়ান মেয়ে।

পেটে বাচ্চা আছে জরুর।

সে বাত ত গোমানি তুম জানবে।

গোমানি গামছা কোমরে বেঁধে উঠোনে নামল। চালাঘরে দুটো মোরগ ডাকছে। একদল কাক হল্লা করছে পুরোনো অশ্বত্থ গাছে। চটান ছাড়িয়ে একটা দেওয়াল অতিক্রম করে বড় বাড়ির দোতলায় রেডিয়ো বাজছে। উড়োজাহাজের শব্দ আকাশে। ঝাড়ো ডোমের বৌ চেলাকাঠ ভাঙছে ওর মেজোবেটার পিঠে। গোরুর গাড়িগুলো চটান থেকে নেমে যাচ্ছে! ঘাটোয়ারিবাবু চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন। ঘাটে মড়া আসেনি।

কাউন্টারের সামনে কোনো লোক দাঁড়িয়ে নেই। আকন্দ গাছের ডাল বেয়ে রোদ উঠে যাচ্ছে। গোমানি চটান ছেড়ে শিবমন্দিরের পথে পড়ল।

গোমানিকে চলে যেতে দেখে নেলি ডাকল—বাপ!

ফের পিছু ডাকলি!

ঘরে কিছু লেই বাপ! ও বেলায় খাবি কী? তু জলদি আওগে ত।

আওগে। আওগে। খাব, ঠিক খেয়ে লিব। লেকিন তু কোথাও যাস না। দিনকাল বহুত খারাপ। গোমানি শিবমন্দিরের পথ ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়ল।

নেলি চলতে থাকল। সঙ্গে গঙ্গা যমুনা চলছে। চটানে নেলিকে ধমক দেওয়ার মতো আর কেউ নেই। সে এখন একটু ঘুরবে ফিরবে। সে এখন পাশাপাশি সব চালাঘরগুলোতে উঁকি দেবে। ওদের রান্নার কথা শুনবে, ঘরে ঘরে শুধাবে ওরা বিকেলে কী খাবে। সে—সব শুনে সে বিষণ্ণ হবে। পেটের যন্ত্রণাটা তখন আরও বাড়বে।

নিজের কথা ভাববার সময় গঙ্গা যমুনার কথা মনে হল। গঙ্গা যমুনাকে এখনও পর্যন্ত কিছু খাওয়াতে পারল না। গঙ্গা যমুনা পায়ে পায়ে ঘুরছে, খেতে চাইছে। আজ এখনও ঘাটে মড়া আসেনি। রাতের বুড়ো মানুষটার নাভিটা নিশ্চয়ই কচ্ছপেরা শেষ করে দিয়েছে। গঙ্গা যমুনা বিরক্ত করছে ত করছেই। নেলি অগত্যা বলল, লে—লে—খেয়ে লে। হামার গতরটা খেয়ে লে। এই শুনে কুকুর দুটো কী বুঝে ছুটতে থাকল। নেলিও ছুটল কুকুর দুটোর পিছনে। গঙ্গার পাড় ধরে ওরা ছুটছে। নেলির ইচ্ছা, এ—সময় গেরু আসুক, ওরা একসঙ্গে ঘাটবন্দরে উঠুক। তারপর আরও দূরে আরও দূরে। সেখানে বুড়ো মানুষটার জন্যে আতপ চাউল সিদ্ধ হচ্ছে, কিছু তন্ত্র—মন্ত্র হচ্ছে তারপর ডেলা ভাতগুলোতে কিছু কালো তিল মিশিয়ে বুড়ো মানুষটার বেটারা গঙ্গার জলে ভাসাবে। নেলি সব খবর রাখে। নেলি সেই উদ্দেশ্যেই আপাতত হাঁটতে থাকল।

নেলি লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। কুকুর দুটোও লাফাচ্ছে। নেলির চুল উড়ল উত্তুরে হাওয়ায়। কাপড় উড়ল। এখানে সেখানে ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল। এখানে সেখানে উঁচুনিচু মাটি। নেলি লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে।

কতবার ঘুরে গেছে এ—অঞ্চলে নেলি। কতবার লখি এল, টুনুয়া এল। গেরু, গঙ্গা, যমুনা এল। কতবার সে একা এসেছে। কুকুর দুটো ওকে পাহারা দিয়েছে। জলকলের সেই অদ্ভুত শব্দটা সে কতবার শুনল। কতবার শুনেছে। আজও নেলি কান পেতে শুনল। মাটি এখানে কুমিরের পিঠের মতো অমসৃণ। ঝোপ—ঝাপ সবুজ কাঁটার জঙ্গল দুধারে, দু মানুষ সমান উঁচু বনফুলের ঝোপ। দু—একটা গিরগিটি লাফিয়ে পড়ল ওদের উপর। দু—একজন মানুষ শহর থেকে ফিরছে। আকাশে চিল উড়ছে—দূরে দূরে আসশ্যাওড়ার জঙ্গল। সোনা—ব্যাঙের ঢিবি মাঝে মাঝে। দুটো একটা খরগোশের গর্ত—গঙ্গা যমুনা নাক দিয়ে গর্তগুলো শুঁকছে।

নেলি পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। সে জানে বুড়ো মানুষের বেটারা ওই পথে গঙ্গায় নেমে আসবে। হাতে ওদের নতুন মালসা থাকবে। মালসায় আতপ চালের ভাতগুলো ডেলা ডেলা থাকবে। বুনো ঘাস থাকবে উপরে। নেলি এখানে দাঁড়িয়ে ঝোপ—জঙ্গল অতিক্রম করে দূরে পুরোনো বড় বাড়িটা দেখতে পাচ্ছে—বুড়ো মানুষটা গত রাতে এ—বাড়ি থেকেই ঘাটে গেছে। যমুনাকে দিয়ে বুড়োর খাটো কাপড়টা সে রাতে চুরি করিয়েছে। দুখিয়া বলছে, নেলি চোর। বলেছে, নেলি বেইমানি কিয়া। হাম জরুর সালিসি মানে,—তু বলিছে, হাম শুন লিছে। চামার! চামার!

নেলি এই পথের ওপর দাঁড়িয়ে দুখিয়াকে গাল দিতে থাকল। ....ঘাটের ডাক লিয়েছিস বুলে মাথা কিনে লিয়েছিস! একটা খাটো কাপড় লিয়েছি, ওয়ার লাগি জান গেছে। হাম সালিসি মানে! সালিসি! কে শুনে লিবে রে তুর সালিসি। কোন শুনে লিবে। হামি বলবে না কিছু তু ভেবে লিছিস। নেমকহারাম! বেইমান! নেলি এখন সেই কাপড়টাই পরে আছে বলে ওর যেন যন্ত্রণা হতে থাকল এবং গলায় গরল উঠতে থাকল।

কুকুর দুটো ওর পায়ে পায়ে ঘুরছে। সে এ—সময় কুকুর দুটোকে সালিস দিল—শুনে লে দুখিয়া কী বাত বুলছে। হামি চোর, তু চোর—এ বাত বুলছে। তুরা হামার সালিসি থাকল।

নেলি এবার কুকুর দুটোকে হাত জড়িয়ে আদর করল। জলের নিচে দেখা গেরুর শরীরটা ওর মনে পড়ল। —গেরু, তু বহুত আচ্ছা আছে। তু একদফে বড় হয়ে ঘাটের ডাক লিবি। ঘাটের কাঁথা—তোষক সব লিবি। দুখিয়ার মাথায় লাঠি ভাঙবি। হামি বহুত খুশি হবে। তু আওর হামি, হামি আওর তু। নেলি এই নিঃসঙ্গ পথে দাঁড়িয়ে অভুক্ত শরীরে স্বপ্ন দেখল। এখন চিলের ছায়াটা জলের ওপর ভাসছে। জলের ওপর নিজের ছায়া দেখল, গেরুর ছায়া এবং বুঝল নেলি এখন বড় হয়েছে। হঠাৎ এই ভরদুপুরে শরীরটার দিকে চেয়ে ওর কেমন ভয় করল। ও ছুটতে থাকল। ও ছুটছে ফের। হঠাৎ কী এক রহস্যকে ধরতে পেরে নেলি ভয়ে ভয়ে চটানে উঠে এল। চটানে উঠেই শুনল শিবমন্দিরের পথে হরিধ্বনি দিচ্ছে। ঘাটে মড়া নামানো হচ্ছে।

নেলি বুঝতে পারছে মড়াটা বড়ঘরের। বাবু মানুষদের কাঁধে খাটুলী। নেলি এই বাবু মানুষদের গঙ্গার পারে কতদিন দেখেছে। কতদিন দেখেছে। কতদিন সে দিদিমণিদের আলগা হয়ে পথ করে দিয়েছে। কতদিন এই সব বাবুভাইদের ধমক খেয়ে চটানে ফিরে এসেছে! ওরা এখন সিঁড়ি ধরে নেমে ঘাটের দিকে যাচ্ছে। দুখিয়া ছুটছে চটান থেকে। —আহারে মরদ হামার। ছুটছে ত ছুটছেই। তুর বৌটা কুথারে? বৌটাকে সাথে লিয়ে লে! একা ছুটলে আছাড় পড়বি। নেলি রসিকতা করতে চাইল দুখিয়াকে।

এখন চটানের মাগি মরদরা অফিসের বারান্দায় সব জমা হয়েছে। ওরা এখন কাঠ বইবে ঘাটে। ঘাটোয়ারিবাবু কাউন্টারে বসে পত্রিকা পড়ছেন। চোখ তুলছেন না অথচ বুঝতে পারছেন কোথায় কী হচ্ছে। তিনি জানেন দুখিয়া ঘাটে ছুটে গেছে। মড়ার কাঁথা—কাপড় আগলাচ্ছে। মড়ার নাকে কানে গহনা আছে কিনা দেখছে। তিনি জানেন হরীতকী আজ কাঠ বইতে আসবে না, সোনাচাঁদ আসবে না। কৈলাস আসবে না। গোমানি চটানে থাকলে আসত। নেলি আসবে, গেরু, লখি, টুনুয়া, ঝাড়ো ডোমের সব বেটারা, পারলে বৌটা পর্যন্ত। মণ পিছু দু আনা পাবে—চার মণে আট আনা। আনা আনা ভাগ বসাবে—না পেলে মারধোর করবে। চাটনে নাচন—কোঁদন শুরু হবে ফের।

এ—ছাড়া তিনি কাউন্টারে মুখ না তুলেই বুঝতেই পারেন কে সেখানে দাঁড়াল। কার ছায়া পড়ল। তিনি সব বুঝতে পারেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, কোত্থেকে মড়া এল? কার মড়া?

মড়া সেনবাবুদের।

কী হয়ে মরল?

দু দিনের জ্বরে।

বেশ, বেশ। কী নাম? মেয়েছেলে না বেটাছেলে?

ঘাটোয়ারিবাবু এবার মুখ তোলেন। রেজিস্ট্রিখাতা বের করে লাল কালিতে প্রথমে নখে নিব ঘষলেন। রেজিস্ট্রিখাতা থেকে কয়েকটা নাম উচ্চারণ করলেন। ওটা ওঁর স্বভাব। তিনি বললেন, কৃষ্ণপক্ষে যশোদানন্দন গেল, আহা যশোদানন্দন! তুমি তবে মরেছ। বেশ করেছ। কাজের কাজ করেছ। হীরামতি গেল নিতাই পাঠক গেল—এবারের নামটি কী যেন বললেন?

সুচিত্রা গুপ্তা।

বেশ, বেশ সুচিত্রা গুপ্তা। বয়স?

আঠারো।

কাঁচা গেল দেখছি। কী হয়ে মরল যেন?

দু দিনের জ্বরে।

তা হলে দু দিনের জ্বরে লোক এখনও মরছে। বেশ, বেশ। হরি ওঁ। ঘাটোয়ারিবাবু রসিদ লেখার আগে বললেন, হাসপাতাল থেকে এল?

না।

ডেথ—সার্টিফিকেট থাকলে দেখাতে পারতেন।

নেই।

তবে থাক। বেশ, বেশ। পরম ব্রহ্মনারায়ণ। রসিদটা কাউন্টারে ফেলে দিয়ে এই সব কথাগুলো বললেন।

তারপর ঘাটোয়ারিবাবু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শীতের নদী বালিয়াড়িতে নেমে গেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে শ্মশান দেখা যাচ্ছে না। শ্মশান বালিয়াড়িতে নেমে গেছে, সুতরাং শ্মশান দেখতে হলে ঘাটে নামতে হবে। নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ঘাটোয়ারিবাবু কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। ঘাট থেকে মানুষের কান্না ভেসে আসছে। তিনি তাড়াতাড়ি ইচ্ছা করেই যেন ডাকলেন এ গেরু, তোর বাপকে ডাক। কৈলাসকে কাঠ দিতে বল। তোরা ঘাটে কাঠ দিয়ে আয়। মড়াটা তাড়াতাড়ি জ্বলে যাক।

সেই সময় নেলি শুনতে পেল মড়াটার নাকে কানে গহনা আছে। গলায় গহনা আছে। দুখিয়া লাঠি নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। মংলি চিতা সাজানোর আট আনা পয়সা নিয়ে বচসা করছে। চিতা সাজানোর কাজ হরীতকীর। না থাকলে মংলি। মংলি বচসা করছে, আওর জায়দা লাগবে।

নেলি চটান থেকে ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। এখানে অনেক মানুষের ভিড়। চারপাশের লোকগুলো খুব কাঁদছে। নেলি ভিড়ের ভিতর গলাটা বাড়িয়ে দিল। মড়াটা দেখল। ওর হাতের কানের গহনা দেখল। গলার গহনা দেখল। গহনা সহ পুড়িয়ে দেওয়া হবে বলে দুখিয়া পাহারায় আছে; কয়লা ধুয়ে কেউ গহনা চুরি করে না নেয়, অথবা ওর নসিবে কেউ যেন ভাগ না বসায়। নেলি মনে মনে বাপের ওপর রাগ করল। বাপ এক দফে ডাক নিল না ঘাটের। নসিব খুলার চেষ্টা কভি না করল। নেলির বলতে ইচ্ছে হল, তু বুড়বক আছে বাপ। দুখিয়ার নসিব দেখে নেলির পেটের যন্ত্রণা আরও বাড়ছে।

যেমন বেঁটেখাটো দুখিয়া, তেমন জংলি মরদ। মরদ মাগি সমান—কথায়, বচসায় নাচনে কোঁদনে সব কিছুতে। নেলি হাতের কানের গহনা দেখে দুখিয়া—মংলিকে দেখল চেয়ে। নেলি মংলিকে দেখে গাল দিল। কী লুকঝুক নতুন চাদরের লাগি! মংলির কদর্য মুখটা নেলিকে যেন ঘাটে বিব্রত করে মারছে। বিরক্ত করে মারছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বদলা নেওয়ার ইচ্ছায় গঙ্গা যমুনাকে লেলিয়ে দেবার এক তীব্র হিংসায় জ্বলে পুড়ে সে খাক হতে থাকল। মংলির চোখ তুলে নেওয়ার জন্য গঙ্গা যমুনা ওর একমাত্র ভরসা—ওয়ার মরদ বুলে কিনা হামি চোর! হামি চোর আছে। চোর আছে ত ঠিক আছে। চোর যখন আছে তখন ঘাটের গহনা ভি চুরি করে লিব। হেঁ লিব। জরুর লিব। নেলি মনে মনে এই সব বলে যেন শপথ নিল। —লিব। লিব। লিব। এ—ঘাট এখন ভালো লাগছে না। চটান ভালো লাগছে না। শ্মশানটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। নিজের বাপের কথা মনে হল। বাপ হয়তো এখন হাসপাতালে লাশটার পেট চিরছে। নেলি ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে এল। উপরে কাঠ বইতে হবে। কাঠ ফেলতে হবে ঘাটে। সুতরাং নেলি চটানে উঠে গেল। চটানে যাকে দেখল বলল—দুখিয়ার নসিব খুলে গেল। মংলির ভি নসিব। বহুত সোনাদানা ঘাটে এয়েছে। কয়লা ধুয়ে দুখিয়া সব গহনা লিয়ে লিবে। ডোমের কোনো বেটা—বেটিকে দুখিয়া ঘাটে কিছু ঢুঁড়তে দেবে না।

নেলি চটানে উঠে কয়েকটা কাঠ নিল কাঁধে। হরীতকীর দরজার পাশ দিয়ে ঘাটে নামার সময় ডাকল—পিসি!

হরীতকী দরজা থেকে মুখ বার করে জবাব দিল—বুল।

তু ঘাটে যাবি না পিসি? বহুত পয়সায়ালা ঘরের জোয়ান বেটি ঘাটে এয়েছে। বেটি কী খুবসুরৎ, তু যাবিনে ঘাটে?

না, যাব না।

ক্যানে যাবি না তু পিসি?

শরীর দিচ্ছে না। দুখিয়ার জবরদস্তি হামার ভালো লাগে না। ওয়ার ঘাটে হামি থুথু ফেলি। ভোরে তু ত চোর বনে গেলি। ও নালিশ দিল গোমানিকে, তু চোর। তু ওয়ার কাঁথা—কাপড় চুরি করে লিচ্ছিস।

এইসব শুনে নেলির কোমরটা দুলে উঠতে শুরু করেছে। মংলিকে বিদ্রুপ করার জন্য সাপের মতো জিভটা লকলকিয়ে উঠল। —মংলিটা বুলে কী পিসি! বুলে যা ঘাট অফিসে যা, ঘাটোয়ারিবাবুকে বুলে ভালো ভালো কাঠ লে। বিছানার চাদরটার লাগি কী লুকঝুক! লতুন চাদর, আহা মাটার কী সর্বনাশ পিসি! মংলি বুলছে চাদর, তোশক, বালিশে আগুন ধরাতে দেবে না। হাতের কানের গহনা ভি লেবে। অত ভালো লয় পিসি। তু কী বলিস?

হরীতকী জবাব দিল না বলে ফের বলল—পিসি!

বুল।

একজোড়া গহনা হলে হামি কতদিন খেয়ে লিব দেখে লিস। বাপকে কত বুললাম তু ঘাটের ডাক লে এক দফে। দেখে লিবি তখন কত সুখ হামাদের। কত গহনা! এক দফে যদি লিত পিসি!

তুর বাপ পচাই খাবে না ও কাম করবে? দুরোজ আগে দেখলাম মাচানের নিচে বসে ওত ইসপিরিট খাচ্ছে। হাসপাতালসে চুরি করে ইসপিরিট লিচ্ছে। তুর বাপ মরবে। জলদি ও পার পাবে দেখে লিবি। খাবে না, দাবে না—পেট ওয়ার জরুর পচবে।

খড়ম পায়ে তখন ঘাটোয়ারিবাবু ঢুকছেন চটানে। খড়মের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হরীতকী তাড়াতাড়ি কাপড় সামলে বসল। বাচ্চাটাকে কোলে নিল। আদর করল। নেলি তখন চটান থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করছে। ঘাটোয়ারিবাবু ওকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে বকবে। কাজে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে এ—কথা বলবে। কিন্তু নেলি দু কদম সরে না যেতেই তিনি ডাকলেন—কাজে খুব ফাঁকি দিচ্ছিসরে।

না বাবু। বাবু, ওরা গহনা পুড়িয়ে দেবে না লিয়ে যাবে? নেলির ইচ্ছা গহনা ওরা নিয়ে যাক। গহনা না পুড়িয়ে শুধু মানুষটা পুড়িয়ে দিক। দুখিয়ার নসিবে আগুন লাগুক।

ঘাটোয়ারিবাবু ধমক দিলেন নেলিকে—তার আমি কী জানিরে ডোমের মেয়ে! আমি কী মড়ার মালিক! কী কথা বলেগো মেয়েটা! কাজে যা কাজে যা। যা করছিস তাই কর। গহনা গহনা করিস না। গহনা দিয়ে কিছু হয় না। তারপর ঘাটোয়ারিবাবু চারদিকে চাইলেন—তখন নেলি গঙ্গায় নেমে যাচ্ছে। কাঠ সাজাচ্ছে ঝাড়ো। সোনাচাঁদ অফিস থেকে ফিরে এসেছে। ঝাড়ো ডোমের বৌ বাঁশের পাতি তুলছে বঁটিতে। কৈলাসের শেষ বৌটা মানুষের কঙ্কাল সিদ্ধ করছে সোডার জলে। ঘাটোয়ারিবাবু এইসব দেখতে দেখতে হরীতকীর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরজার ওপর ঝুঁকে বললেন, বাচ্চাটাকে দেখা। একবার দেখা। বাচ্চাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, শেষ পর্যন্ত শ্মশানেই বাচ্চা বিয়োলি! বাচ্চাটা বাঁচবে অনেকদিন।

ঘাটোয়ারিবাবুর কথা শুনে হরীতকীর চোখ দুটো ভার হয়ে উঠল। ওঁর বসার জন্যে পিঁড়ি বের করল, পেতে দিল। তিনি বসলেন। হরীতকী বলল, কী আর করব বাবু। ঘাটে কাঠ দিতে গিয়ে গিল রাতে বেটি হামার হয়ে গেল। তারপর কী ভেবে হরীতকী, বাবুর সামনে ওকে শুইয়ে দিল। কুঁকড়ে আছে বাচ্চাটা। রোদের উত্তাপে আর কাঁদছে না। চোখ দুটো ঠিক মেলতে পারছে না। বুড়ো বয়সের এই বাচ্চা হরীতকীর খুব দরদের। হরীতকী খুব খুশি হয়েছে। হরীতকী অপলক চেয়ে থাকল।

ঘাটোয়ারিবাবু ভাবলেন চতুরা বেঁচে থাকলে দু হাঁড়ি পচাই গিলত আজ। খুশিতে ডগমগ করত। হরীতকীর দিকে চেয়ে বললেন, কাল কাঠ না বইলেই পারতিস। চিতা না সাজালেই হত। তারপর তিনি ফিসফিস করে বললেন, যাক সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এবার তাহলে তুই সং সাজলি হরীতকী! তিনি এই বলে উঠে পড়লেন।

হরীতকী ডাকল—বাবু—

কিছু বলবি আমাকে?

হরীতকীর চোখ দুটো লজ্জায় ভারী হয়ে উঠছে। তবু সে না বলে যেন থাকতে পারল না—বাবু বাচ্চাটা কেমন দেখলি?

ঘাটোয়ারিবাবু নিস্পৃহ জবাব দিলেন—ভালো।

কার মতো হবে বুলত?

তোর মতো।

না তোর মতো হবে দেখে লিস। হরীতকী ঘাটোয়ারিবাবুর দিকে চেয়ে হাসল। তিনি কিন্তু হাসলেন না। তিনি হরীতকীর মুখ দেখলেন। চোখ, মুখ, শরীর, দেখলেন হরীতকীর। চোখে এক ধরনের ইচ্ছার প্রকাশ— যা ঘাটোয়ারিবাবুকে কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যেন বলতে চাইছে—আ যা বাবু কাঁহা ভি চল যাই। যেন বলতে চায়—এ—চটান ছোড় দে।

তিনি মুখের ভাবটুকু উদাস করতে চাইলেন। অথবা কেমন অসহায় মনে হল ঘাটোয়ারিবাবুকে। তিনি বললেন, আমার মতো হলে তুই খুশি হবি, কিন্তু লোকে তা হবে না। চতুরার মতো হলেও ভালো হয়। লোকে চতুরার ছা বলেই জানুক। চতুরার মতোই ও দেখতে হোক। সংসারের সং সাজতে আমার আর ইচ্ছে নেই।

হরীতকীর চোখেমুখে গরল উঠতে চাইল!—সংসারের সং সাজতে তুকে বুলেছি! আর বুলব না। পেটটাকে লিয়ে এতদিন ভয় ছিল। পেটটা খালাস হয়ে হামাকে খালাস দিল। হামাকে লিয়ে তোকে আর কোথাও যেতে হোবে না। কোথাও আর পালাতে বুলব না। হামার নসিব লিয়ে হামি বেটি কে সাথ এ— চটানেই পড়ে থাকবে। লেকিন তুকে বুলবে না—আ যা বাবু—কাঁহা ভি চল যাই। কভি বুলবে না এ— চটান ছোড় দে।

যে রোদটা অশ্বত্থ গাছের ডাল ধরে নিচে নেমেছিল সেই রোদ এখন অশ্বত্থ গাছের ডাল বেয়ে উপরে উঠছে। ঝাড়ো ডোম দাওয়ায় বসে তামাক টানছে। হরীতকী বাচ্চা দিয়েছে বলে ঝাড়ো ডোমের ঘর থেকে ঘাটোয়ারিবাবুর খাবার গেছে। অফিসঘরের কোনায় টিনের থালায় কিছু ভাত, ডাল, শাকসবজি। ঘাটোয়ারিবাবু কিছুক্ষণ গীতা পাঠ করেন এই সময়, জানালায় বসে কিছু সময় মা গঙ্গা দর্শন করেন। তারপর তিনি কিছু আহার করেন। এই সময় ডোমেদের ছোট ছোট ছেলেরা অফিসঘরটার চারপাশে ঘুর ঘুর করবে—কখন তিনি ডাকবেন সেই আশায় অপেক্ষা করবে—যেদিন ডাকবেন না জানালা দিয়ে ওরা উঁকি মারবে অথবা হাত পাতবে। তিনি বলবেন—এখন হবে না। যা।

কৈলাস ওর ঘরে শুয়ে আছে। মাচানে ঠ্যাং ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। ওর শেষ পক্ষের বৌ ঠান্ডাভাত খাচ্ছে। সঙ্গে দুটো কাঁচা পেঁয়াজ নিয়েছে, দুটো কাঁচা লংকা নিয়েছে। পিঠে রোদ দিয়ে খাচ্ছে। সে পিঠ চুলকাল। চোখ কোঁচকাল। কাঁচা লংকার জন্য জল পড়ছে চোখ থেকে। নেলি ঘরের ভিতর থেকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সব দেখছে। সেও শুয়ে আছে মাচানে। শরীরে কাঁথা—কাপড় টেনে উপুড় হয়ে দুটো হাতের ওপর চিবুক রেখে গেরুর সৎমার খাওয়া দেখছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে গঙ্গা যমুনাও নেলির মতো চোখ মুখ নিয়ে বসে আছে। নেলির কষ্ট হতে থাকল। নিজে খেতে পারল না, গঙ্গা যমুনাকে খেতে দিতে পারল না। এ সময় ঘাটোয়ারিবাবু খেতে বসবেন। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল এবং ধীরে ধীরে অফিসঘরের দিকে হাঁটতে থাকল। জানলার পাশে এবং সিঁড়ির ওপর সে দেখল লখি, টুনুয়ার ছোট দুটো ভাই ঝাড়ো ডোমের ছোট দুটো বেটি বসে আছে। নেলিও ওদের পাশে বসল। গঙ্গা যমুনাও বসল। সিঁড়ির ওপর বসে ওরা সকলে খাওয়ার গল্প করল।

আজ কিন্তু ঘাটোয়ারিবাবু কাউকে ডেকে ভাতের দলা দিলেন না। তিনি নিজেই সবটুকু চেটেপুটে খেয়ে নিলেন। ঝাড়োর বৌ ভাত যতটা পেরেছে কম দিয়েছে। জল খাওয়ার সময় তিনি হাসলেন। ভাবলেন, পেটে কিল মেরে কথা বের করে শুনেছি, কিন্তু ঝাড়োর বৌ যে দেখছি পেটে কিল মেরে ভাত বের করবে। ঘরের ভিতর কুলকুচা করার সময় তিনি বললেন, তোরা যা। দাঁড়িয়ে থাকিস না। আজ আমারই পেট ভরল না। তোরা যা। অথচ তিনি জল খেয়ে ঢেকুর তোলার চেষ্টা করলেন।

নেলি ভাবছে ফের গঙ্গায় গিয়ে নামে। ফের সেই হাতের গলার গহনা দেখে! মংলির চোখটা গঙ্গা যমুনাকে দিয়ে উপড়ে আনে। কিংবা ইচ্ছা হচ্ছে হাতের গলার গহনা আগুনে কেমন গলছে সেই দেখার। সোনা গলে

গলে যেন ছাই হয়ে যায়। কিন্তু ছাই হবে না ভেবেই ওর যত দুঃখ এখন। সেজন্য গঙ্গায় নামতে পর্যন্ত ইচ্ছা হল না। রাগে দুঃখে, ভয়ে এবং পেটের যন্ত্রণায় দুটো চোখ ক্রমশ বসে যাচ্ছে। ক্রমশ নেলি দুর্বল হয়ে পড়ছে। শরীরটা নিয়ে আর চটানে ঘুরতে ফিরতে পারছে না। নেলি সেজন্য মাচানেই ফিরে এল। মাচানে শুয়ে শুয়ে বাপের জন্যে অপেক্ষা করবে। বাপ যদি ধারদেনা করে কিছু চাল ডাল নিয়ে আসে, যদি বাপ রাতের মতো কিছু ব্যবস্থা করে ফেরে এই ভেবে দুর্বল শরীর নিয়ে কোনোরকমে মাচানের কাছে এল। মালসায় কিছু জল ঢালল এবং ঢকঢক করে এক মালসা জল খেল। তারপর মাচানে উঠে বালিশ টেনে কাঁথা—কাপড়ের ভিতর শরীর গলিয়ে দিল। কাঁথার নিচে নেলি এখন কিছু যেন ভাবছে অথবা যেন ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে।

বেলা পড়ে আসছে। শীতের বেলা। ঝাউগাছের ও পাশে সূর্য ক্রমশ বাঁশবনের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। ঘাটে আগুন উঠছে না। চিতার আগুন যত নিভে আসছে দুখিয়া তত বেশি উত্তেজনা অনুভব করছে। মংলি ঘাট থেকে ফিরছে—ওর মাথায় নতুন তোশক চাদর। হরীতকীর ঘরের পাশ দিয়ে একটু ঘুরেই সে গেল। যেন সকলকে দেখিয়ে যেতে চায়। নেলি ইচ্ছা করেই কাঁথার নিচে মুখ লুকিয়ে ফেলল। কাঁথা কাপড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে তোশক চাদর দেখল না। ঝিম মেরে কাঁথা—কাপড়ের নিচে পড়ে থাকল।

আর এ—অসময় লাফাতে লাফাতে এল গেরু। গলায় কালো কারে তাবিজ। পুরুষ্টু মরদের মতো গজাতে আরম্ভ করেছে গোঁফ। কালো গেঞ্জি গায়ে—হাতে বল্লম—ওকে দুর্ধর্ষ মনে হচ্ছিল। বল্লমটা কাঁথা—কাপড়ের উপরেই যেন ছুঁড়ে দেবে। নেলির চুল মাচানের পাশে ঝুলছে। গেরু বুঝতে পারছে নেলি মাচানে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। নেলিকে সে ডাকল—এই নেলি,—নে—লি, নেলি—বা তু ত আচ্ছা আছে। অবেলায় এক ঘুম দিয়ে লিচ্ছিস।

নেলি কাঁথা—কাপড় ছেড়ে উঠল না অথবা ওঠার ইচ্ছা প্রকাশ করল না, কিংবা ইচ্ছা থাকলেও উঠতে পারল না, শুয়ে থাকার ইচ্ছা কেবল—ঘুম ঘুম ভাব শরীরে। অথচ ঘুম আসছে না। রাজ্যের চিন্তা এসে নেলিকে জড়িয়ে ধরেছে—গেরু কবে চটানে সত্যি মরদ হয়ে উঠবে, গেরু কবে বুলবে আ যা নেলি, কাঁহা ভি চল যাই, কবে অন্য চটানে উঠে গিয়ে ওরা ঘর বাঁধতে পারবে। দু হাতের ওপর চিবুক রেখে গেরুর দিকে নেলি শুধু চেয়ে থাকল। কাঁথা—কাপড় ছেড়ে কিছুতেই উঠছে না কিংবা কথার জবাব দিচ্ছে না।

গেরু নেলিকে বলল, হামি ফরাসডাঙায় যাচ্ছি! বাপ হামাকে আজ থেকে লিয়ে লিল।

তুর বাপ হামাকে লিবে? তবে হামিও সঙ্গে যাই।

গেরু প্রচণ্ডভাবে হেসে উঠল। বল্লমটা শক্ত করে ধরল। কোমর থেকে গামছা খুলে মুখ মুছে বলল, কী যে বুলছিস তু নেলি। তু যাবি ফরাসডাঙায়। তু যাবি মুর্দার কঙ্কাল তুলতে! তু যে ডরে মরে ভূত হো যাবিরে নেলি, ভূত হো যাবি!

নেলির গলার স্বরটা সহজ এবং সুরেলা হল—হামি বুঝি পারে না ভাবছিস!

গেরুর এখন কথায় ঢিলেঢালা চাল—কেইসে তু পারে? এ তো কাঠ বইয়ে দেয়ার কাজ না আছে। এ বহুত তন্তর—মন্তরের কাজ আছে, বহুত তন্তর—মন্তর লাগে।

নেলি গেরুর মুখের কাছে হাতটা ঘুরিয়ে আনল। হে রে, রাখ তোর তন্তর—মন্তর। হামি ভি বহুত তন্তর—মন্তর জানে।

লেকিন তাবিজ—ওবিজ লাগে নেলি। বাপ মেরে তিন তিনটা তাবিজ দিল। পুনঃপদের মাদুলি, মহাশক্তি কবচ বাণ, আউর মহাশক্তি কোমর বাণ। এ ঝাড়ফুক লয়, জাদুমন্তর লয়—এ আছে জড়িবুটির কারবার। দ্রব্যগুণ। ডান পুকুসে টান মেরে তোষক করে, পির পরিতে নজর দেয়, বাণ মোর এ—মাদুলি দেহে লিলে আসন পাবে দেহ। এ—তু কাঁহাসে লিবি আর কাঁহাসে দিবি।

গেরু কথাগুলো নেচে নেচে বলল—অনেকটা বাপ কৈলাসের মতো। কৈলাস যেমন করে কোর্ট—কাছারির ময়দানে একদা হেকিমি দানরির ব্যবসার সময় সকল মক্কেলদের তাবিজের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করত,

তেমনি গেরু আজ নেলিকে তাবিজের দ্রব্যগুণ ব্যাখ্যা করল।

নেলি এবার কাঁথা—কাপড় ছেড়ে উঠে বসল মাচানে। দু হাতের ওপর ভর করে বসল। চুলগুলো মুখের ওপর এসে পড়েছে। শরীরটা যেন ঝুঁকছে মাচারে বাইরে। যেন এখুনি টলে পড়বে শরীরটা। নেলি তবু বলল, হামারা কোনো জড়িবুটি লাগে না গেরু। লেকিন হামি মেয়েমানুষ লয় ত হাম ভি যেতরে মুর্দার কঙ্কাল তুলতে। চটানে ভুখা থেকে হামি নেহি মরগে। নেলি এ—সময় মুখটা ক্রমশ নিচের দিকে নুইয়ে দিচ্ছে।

তু ভুখা আছে নেলি! গেরু বল্লামটা নিচে রাখল। পাশাপাশি বসল সে। কিছুক্ষণ সে চুপ করে বসে থাকল। নেলিকে সে এ—চটানে আরও অনেকদিন ভুখা থাকতে দেখেছে, কিন্তু আজ যেন অন্যভাবে নেলির উপোসি শরীরটা দেখল। নেলি ভুখা আছে চটানে, এই ভেবে ওর খুব কষ্ট হতে থাকল। অথচ নেলিকে কিছু বলতে পারছে না এ—সময়ে। অন্য দিনের মতো নেলিকে জড়িয়ে ধরে কথা বলতে পারল না। কিংবা জড়িয়ে ধরতে ভয় হচ্ছে। সে সংশয়ের চোখে চারিদিকে একবার চেয়ে সহসা নেলির মুখটা তুলে ধরতেই দেখল, নেলি কাঁদছে! ভুখা থেকে নেলি আজ চটানে গেরুর সামনে কেঁদে দিল। —নেলি তু ভুখা আছে! পুনরাবৃত্তি করল গেরু। তারপর বল্লামটা তুলে চলে যাওয়ার সময় বলল হামার কাছে একটা পয়সা ভি নেই। থাকলে তুকে দিয়ে দিতাম। সাত সতের খেলে লখির কাছে সব পয়সা কটা হেরে গেছি।

গেরুর এসব কথা শুনে নেলি বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। মনে মনে বলল, হেরে গেরু তু হামার বুঝি বাপ। তু পয়সা দিবি, সে পয়সায় হামি খেয়ে লিব! এই সব ভেবে নেলির নিজের মনেই সরম এল। গেরু ওর কে! গেরু ওর পাশে একটু বসতে পারল না! গেরু এ—সময় পয়সা নেই বলে, অথবা নেলি আরও কষ্টের কথা শুনাবে বলে চলে গেল! ছিঃ মরণ হামার? তু হামার কে! তু হামার বাপ আছে না বেটা আছে। তু হামার কোন আছে, তুর কাছে কেন্দে ভিখ লিব!

নেলি ফের শুয়ে পড়ল। এই ঘরে শুয়ে পুরোনো অশ্বত্থ ডালে কাকের শব্দ পেল। সে বুঝতে পারছে চোখ বুজে—সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। এই সময়ে সব কাকেরা এই পুরোনো অশ্বত্থে ফিরে আসে। সে চোখ না খুলে বসুন্ধরার সব সুখ দুঃখকে বোঝবার চেষ্টা করল। তখন এল গেরু। সন্তর্পণে ফিরে এল। মরদের মতো সে ওর পাশে দাঁড়াল। বলল, দু—চারমাস তু সবুর কর। ফরাসডাঙার কায়দা—কানুন শিখেলি, তারপর তু আর হামি অন্য চটানে উঠে যাব। হয় কাটোয়ায় লয়তো নবাবগঞ্জে। তু আর তখন ভুখা থাকবিনে।

কাঁথা—কাপড়ের নিচে থেকে নেলি জবাব দিচ্ছে, দুদিন ভি হামার তর সইবে না। চটানে ভুখা থেকে হাম নেই মরেগে। কাঁথা—কাপড়ের আঁধারে নেলির বাঁচার ইচ্ছা একান্ত।

লেকিন হাম কিছু শিখলাম না, না দানরি, না হেকিমি। রাহুচণ্ডালের হাড় ভি নেই যে হেকিমি দানরি ব্যবসা করে খাব। বাপ লিয়ে যাচ্ছে আজ, এই পয়লা ফরাসডাঙায় মুর্দার কঙ্কাল তুলতে যাচ্ছি—বাপের ব্যবসা শিখে লিচ্ছি।

নেলির কপালে কতকগুলো রেখা ফুটে উঠল তখন। রেখাগুলো কপালের উপরেই নাচছে। মনে মনে সে যেন কোনো বাঁচার কৌশলকে আয়ত্ত করছে। সে কাঁথা—কাপড়ের ভিতর থেকে মুখ বার করে বলল, হাম ভি কিছু শিখে লিব, হাম ভি কিছু জরুর কামাব।

কাঁহাসে কামাবি?

ঘাটসে। ঘাটের ডাক দুখিয়ার। সেখানে বড় লোকের বেটির শরীর আগুনে খাচ্ছে। গহনা পুড়ছে। দুখিয়ার ডাক যখন, সব গহনা ও জরুর কয়লা ধুয়ে লেবে। যদি কিছু পড়ে থাকে, পহর রাতে হামি লিব।

নেলির কথা শুনে গেরু চোখ টান টান করল। বলল, তু একলা ভয় পাবিনে যেতে? তখন মড়া জ্বলবে না ঘাটে।

নেলি পাশ ফিরে শুল। বলল, কীসের ভয়! কিসকো ভয়!

লেকিন দশ লোক যদি দশ কথা বুলে?

বুলে বলবে। দশ লোক ত দশ কথা বুলছেই। বাপকে ওরা বুলছে রাতে নেলি কাঁহা ভাগে, তু নজর না রাখে গোমানি! মেয়েটা তুর দিন দিন ডাইনি বনে যাচ্ছে। তু বাপ হয়ে নজর না রাখে। খাটো কাপড়টা নেলির বুক থেকে সরে যাচ্ছিল—নেলি অন্যমনস্কভাবে কাপড়টা দিয়ে শরীরটা ঢেকে দিল। —দু রাত ধরে বাপ নজর রাখছে, হামি যেতে পেছি না কোথাও খেতে পেছি না কিছু। রোজ ভুখা থেকে মর গিলাম গেরু।

গেরু সেই কষ্ট ভাবটা মনে মনে অনুভব করতে পারছে। সে বলল, ফরাসডাঙায় যাবার সময় হয়ে গিল। কাল সবেরে আওগে। কাল সবেরে তু আর হাম জরুর খাওগে। এই বলে গেরু বল্লমটা তুলে নেলির ঘর থেকে নেমে চটানে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নেলির কিছু করার নেই এখন। শুধু মাচানে বসে থাকা, বাপের জন্য অপেক্ষা করা। মাচানে বসেই সে হরিধ্বনি শুনতে পেল। বড়লোকের বেটারা মেয়েমানুষটাকে ঘাটে রেখে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। পোড়া কয়লায় মেয়েটার শরীর পুড়ে ছাই হয়েছে। গহনাগুলো ছাই হয়নি। গহনাগুলো কয়লার সঙ্গে লেগে আছে। দুখিয়া হয়তো এখন নদী থেকে কলসি কলসি জল তুলছে। জল ঢালছে শ্মশানে। বালতিতে সব পোড়া কয়লা তুলে জলে ধুয়ে নিচ্ছে। সোনাদানা সংগ্রহ করছে। নেলির ইচ্ছা—অনেক ইচ্ছা এখন। বালতি থেকে কী করে সোনাদানা দুখিয়া তুলছে—সে দেখার ইচ্ছা। কিংবা গহনার দু—এক অণু চুরি করার ইচ্ছা। চুরি করে গহনা বেচে কিছু খাওয়ার ইচ্ছা। এতগুলো ইচ্ছার তাড়নায় সে জড়বৎ হয়ে বসে থাকল মাচানে। অথবা সে জানে ঘাটে গেলে দুখিয়া এবং ওর বৌ ওকে এ—সময় তেড়ে মারতে আসবে। ডোমের কোনো মেয়ে মরদকে সে এ—সময় ঘাটে নামতে দেবে না। সেজন্য মাচানে বসে থাকা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকল না নেলির।

রাত নামছে চটানে। অশ্বত্থ গাছটার কাকগুলো শেষবারের মতো হইচই করে ডালে ডালে বসে গেল। গঙ্গার ঢাল থেকে শুয়োরের পাল নিয়ে ফিরে এসেছে বাবুচাঁদ। খোঁয়াড়ে শুয়োরগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে সে ওর ছোট কুঠরিটায় ঢুকে গেল। ঘাটোয়ারিবাবু এ—সময় জপতপ নিয়ে বসেছেন অফিসঘরে। ঝাড়ো ডোমের ঘরে এখন সকলে পচাই খাচ্ছে। কৈলাসের ঘরে শেষ পক্ষের বৌটা পচাই গিলছে। গেরু এবং কৈলাস চলেছে—কাঁধে মদের ভাঁড়, হাতে বল্লম। ওরা চটান থেকে নেমে যাচ্ছে। ওরা ফরাসডাঙায় যাচ্ছে বেওয়ারিশ মড়ার তল্লাসে। অন্ধকার মাচানে শুয়ে নেলি সব ধরতে পারছে। নেলি জানে এ—সময়টাই একমাত্র সময় যখন চটানে পচাইর ঝাঁজ ওঠে। সে জানে চটানে এখন হৈ—হল্লা হবে। নাচনকোঁদন হবে। লখি, টুনুয়া পচাই গিলে মাতলামি করবে চটানে। ওরা এসে নেলির ঘরেও করতে পারে। কিংবা কৈলাসের শেষ পক্ষের বৌটার কাছে। লখি, টুনুয়া এখন হল্লা রসিকতা করবে। সিনেমার হালকা গান গাইবে। তখন কৈলাসের বৌটা পর্যন্ত মাতলামি করবে এইসব ভেবে নেলির ইচ্ছে হচ্ছে একটু পচাই গিলতে। বাপ এলে বাপের সঙ্গে একটু মাতলামি করতে। চটানের এমন পরিবেশে নেলির মনেও মাতলামির শখ জাগল।

প্রচণ্ড শীতের হাওয়া চটানের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। গায়ে শীত লাগতেই নেলির মনে হল কিছু পোড়াকাঠ এনে মাচানের নিচে রাখতে হবে এবং ভোররাতে যখন বাপ আর বেটিতে ঠান্ডায় কাঁথা—কাপড়ের নিচে ঘুম যেতে পারবে না, এবং বাপ খকখক করে কেবল কাশবে, তখন নেলি মাচানের পাশে পোড়াকাঠের আগুন জ্বালবে। সেজন্য নেলি ঘাট থেকে পোড়াকাঠ এনে উঠোনে রোজ তুলে রাখে, পোড়াকাঠে ভাত হয়, পোড়াকাঠের উত্তাপ নেয়। নেলি কিছু কাঠ তুলে আনার জন্যে মাচান থেকে উঠোনে নামল এবং পোড়াকাঠের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কাঠ কম কম মনে হচ্ছে। নেলির চোখ মুখ দুটোই জ্বলে উঠল, নেলির উপোসি দেহ থেকে গরল উঠতে থাকল, মর, মর—ঘাটে গিয়ে মর। হামার কাঠ চুরি করে মরছিস ক্যানে! নেলি দুটো হাত উপরে তুলে সমস্ত দুনিয়াকে শাপ—শাপান্ত করতে থাকল—ডাক ঠাকুর, তু দেখে লে সব। তোর দুনিয়ায় হামি ভুখা আছি। হামার কাঠ চুরি করে লিছে। তুর কাছে নালিশ থাকল বাপ! তারপর নেলি কয়েকটা কাঠ ঘরে তুলল এবং মাচানের নিচে রেখে দিল। বলল, ভোর রাতে আগুন জ্বালব, ও ভি মানুষের সহ্য লয়।

নেলি শুয়োরের বাচ্চা দুটোকে খেদিয়ে খেদিয়ে ঘরে তুলল। পলো দিয়ে ওদের ঢেকে রাখল। টঙের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়ার আগে উঁকি মেরে দেখল সবগুলো ঢুকেছে কিনা। কাজগুলো সব শেষ করে নেলি লম্ফ জ্বালাল ঘরে। বাপ আভি তক এল না—মনে মনে এ কথাগুলো আওড়াল। বাপ এলে দুটো চাল দাল লিশ্চয়ই লিয়ে আসবে আজ—নেলি বাপের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। বাপ এলে দুটো ভাত ফুটিয়ে দেবে বাপকে, নিজেও দুটো খাবে। গঙ্গা যমুনাকেও ভাগ দেবে। শিবমন্দিরের পথটায় এসে নেলি এমন সবই ভাবছে তখন। গঙ্গা যমুনাও দু পাশে দাঁড়িয়ে গোমানি ডোমের অপেক্ষায় থাকল।

শিবমন্দিরের পথ ধরে বাবুদের মেয়েরা শরীরে ঠান্ডা মেখে ফিরছে। ওরা লাফাল। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। নেলি দেখল—দেখছে। সুখ, সুখ—সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। নেলিও এমন সুখের ইচ্ছায় লাফাতে চাইল। শরীর দিচ্ছে না। শরীর দিলে সে সত্যি যেন লাফাত। গঙ্গা যমুনাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যেত। সুখের রাজত্বে কিংবা গেরুর জগতে। নেলি গঙ্গা যমুনাকে শুনিয়ে যেন বলল, গেরু হামার মরদ হবে। তখন তুরা ভুখা থাকবিনে। তুরা পেট ভরে খেতে পেলে নাচন—কোঁদন করতে পারবি বাবুদের বেটা—বেটির মতো। তুগো কোনো দুখ হাম রাখবে না। তুরা হামার বেটা—বেটির লাখান। সে কুকুর দুটোকে জড়িয়ে ধরল। আদর করল। সুখ জানাল।

তখন গোমানি ডোম ফিরছে। শিবমন্দিরের পথেই ফিরছে। আঁধার ঘন হয়ে উঠেছে এ পথটায়। গ্যাসপোস্টে আলো জ্বলছে। কোনো কোনো ঘরে হারমোনিয়াম বাজছে। ঘুঙুর বাজছে—নাচ গান হচ্ছে। হাসি—মস্করা, হালকা গান হচ্ছে। দু—একটা ঘাটের কুকুর নর্দমার ময়লা খাচ্ছে। তখন কিছু কিছু লোক গলি পথে হারিয়ে যাচ্ছে। ওদের পরনে, ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি। দুটো একটা মানুষ প্যান্ট পরে আলো আঁধারের দিকে হাঁটছে। তখন গোমানি ফিরছে টলতে টলতে। গালাগাল দিচ্ছে এই পথের বাসিন্দাদের। মুখে যা এল তাই বলে খিস্তি করল। শেষে একটা হালকা গানের সুর গলা বেয়ে উঠতে থাকল। নেলি বুঝল, গঙ্গা যমুনা বুঝল—বাপ চটানে ফিরছে।

গোমানি বলল, কোনরে? গঙ্গা যমুনা? নেলি?

নেলি বাপকে দেখে দাঁড়াল। গঙ্গা যমুনাও দাঁড়াল। গোমানি টলতে টলতে ফিরছে। —তুরা ইখানে বসে?

নেলি দেখল বাপের হাত খালি—কাঁধ খালি। গামছায় একটা ছোট্ট পুঁটলি ঝুলছে। নেলির জানতে বাকি নেই পুঁটলিতে কী আছে। রাগে দুঃখে নেলি কোনো কথা বলতে পারল না। বাপ খালি পেটে আজও মদ গিলে এসেছে। এই সব দেখে নেলি অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় বলল, আ যা বাপ!

হরীতকীর ঘরের সামনে আসতেই গোমানি দাঁড়িয়ে পড়ল। ভোরের সব কথাগুলো ওর মনে পড়ছে—হরীতকী ভোরে ওকে গালমন্দ দিয়েছে। বলেছে, গোমানি, তুমি একটা বাপই বটে! গোমানি হরীতকীর বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খিস্তি করার আগে সামান্য হাঁটু দুটো একটু সামনের দিকে, কোমরটা একটু পিছনের দিকে দিয়ে দু পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াল। সে দাঁড়াতে পারছে না, তবু জোর করে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে বড় বড় হাই তুলছে। সে যেন কী ভাবল—যেন কী বলতে হবে। যেন—তার মনে পড়ছে না। বিরক্তিতে সে পা দুটোকে বেতো রুগির মতো কয়েক বার কাঁপাল। কয়েক বার ভাঁটা ভাঁটা চোখ দিয়ে আশেপাশে কিছু খুঁজল যেন। তারপরই সব ঘটনাটা মনে পড়ায় বলল, মাগি জাত একটা জাত—ওয়ার আবার স্বভাব, ওয়ার আবার ধম্ম! মাগির বাচ্চা হয়েছে শ্মশানে—হবে না! মাগির নেই জাতের ভয়, নেই ধম্মের ভয়—চতুরাকে মদ খাইয়ে খুন করলে। ও শ্মশানে বাচ্চা বিয়োবে না ত হাসপাতালে বিয়োবে। যে খিস্তিটা ভোর থেকে মনে মনে গোমানি ডোম আওড়াচ্ছিল—মদ খেতে পেয়ে সে সবটা এবার উগরে দিল! —থু! এতেও শান্তি নেই, গোমানি হরীতকীর দরজার ওপর থুথু ছিটাল।

এই সব দেখে নেলি বাপের কাছে ছুটে গেল। সে বাপের হাত ধরে টানছে। এমনি হয়তো পিসি দরজা খুলে বের হয়ে অনর্থ বাধাবে। বাপের চুল ধরে টানবে। বাপের শুকনো দেহটা নিয়ে টানা—হ্যাঁচড়া করবে।

বাপ হয়তো না পেরে পিসির পা কামড়ে ধরবে। বাপকে তাই টেনে নিয়ে যেতে যেতে ধমক দিল, বাপ, ফের তু ভুখা থেকে মদ গিলেছিস! ইসপিরিট খাচ্ছিস!

হে মদ গিলেছি ত! ইসপিরিট খাচ্ছি ত! গোমানি এবার জোর করে হাতটা নেলির হাত থেকে টেনে নিল!

ভুখা থেকে ইসপিরিট খেলে যে মরবি বাপ!

হাম মরোগে তু বুলছিস? হাম বাঁচোগে নেই!

হে তু মরোগে বাপ!

হাম নেহি মরোগে, নেহি মরোগে। তু মরবে নেলি। রাগে চোখ দুটো চিংড়ি মাছের মতো বাইরে বের হয়ে পড়তে চাইল। —গোমানি মরোগে! কোন বুলবে এ কথা। গোমানি নেলির পেটে লাথি বসিয়ে দিল। তারপর বলল, কোন শালে বুলবে একথা গোমানি মরোগে!

নেলির ইচ্ছা হল এই মুহূর্তে ঘাটের পোড়া কাঠ তুলে বাপের মাথায় বাড়ি মারে। ইচ্ছে হল বাপকে চেপে ধরে মাটিতে। কিন্তু বাপ তখন এত বড় বড় হাই তুলছে এবং বাপের পেটটা এত বেশি নিচে নেমে গেছে যে সে সব দেখে ওর ইচ্ছাগুলোর রঙ অন্যরকম হয়ে যেতে বাধ্য হল। সে অন্যরকম জবাব দিল, হাসপাতালে খুনের লাশ কেটে তু ভি নরক হলি বাপ। খালি পেটে তু হামারে লাথি মারলি? এ আচ্ছা কাজ হল তুর!

গোমানি টলতে টলতে নেলির সাপের মতো বাঁকানো শরীরটা দেখল। যেন ফুলন আবার চটানে ফিরে এয়েছে। যেন নেলি ফুলনের মতোই শাসন করছে বাপকে। গোমানি এবার কাছে এগিয়ে ধরতে চাইল নেলিকে, কিন্তু পা দুটো টলছে বলে এগোতে পারছে না। সে এবার দু পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। এবং নেলিকে দেখে দেখে সে তার স্ত্রীর কথা ভাবল। স্ত্রীর কথা রোজ এইসময় তার মনে হওয়া মাত্র সে ঝিমিয়ে আসে। নেলি আজ ওর মার মতোই যেন বললে, হাসপাতালের লাশ কেটে তু ভি মরক হলি। গোমানি এইসব ভেবে দাঁড়াতে পারছে না। সে ঘরের মেঝেতে বসে পড়ল। সেই ফুলনের চোখ দুটো নেলির চোখে, নাক, সেই মুখ, সেই গড়ন। নেলির পেটে লাথি মেরে সে এখন খুব দুঃখ পাচ্ছে। গলার গামছা নিচে রাখল। পুঁটলি খুলল। গামছার পুঁটলিতে স্পিরিটের বোতল, কিছু চালভাজা, কিছু পেঁয়াজি।

গোমানি কাঁপা হাতে চাল ভাজা এবং পেঁয়াজিগুলো নাড়তে থাকল। নেলির দিকে চেয়ে বলল, নেলি তুর মায়ী কী বুলত, তু তখন ছোট, খুব ছোট। বুলত খুনের লাশ কেটে তু ভি নরক হলি। বুলত কত কথা, কত তরাস তখন তুর মায়ীর।

গোমানির মাথার ভিতর ঘোরদৌড় হচ্ছে। সে জন্য সে বেশিক্ষণ ফুলনকে মনে রাখতে পারল না। সে এসময়ে নেলিকে পেঁয়াজি এবং চালভাজার সঙ্গে বোতলটা এগিয়ে দিল। —দ্যাখ, তুর লাগি কী লিয়ে এয়েছি। খা, খা। দুটো খেয়ে লে। কিন্তু নেলি খেল না বলে গোমানি বিরক্ত হয়ে চড়া গলায় হেঁকে উঠল, লে আও, লে আও বুলছি মাটির গেলাস। মদ খানেসে দুনিয়া ঠান্ডা হোতা হ্যায়, আওর তু ত নেলি।

নেলি বাপের কথায় জবাব দিল না। এমনকি বাপের দিকে মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। একমুঠো চালভাজা, দুটো পেঁয়াজি তুলে নিল। ওগুলো খেয়ে এক মালসা জল খেয়ে বাপের কাছে এল ফের। বলল, মাচানে চল, ঘুমোবি।

নেলির মিষ্টি কথায় গোমানি খুব খুশি হল। মাথার ভিতর ঘোরদৌড়টা এখনও টগবগ করে ফুটছে। সে বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল—নেলি, তু বেড়ে কথা বুলেছিস। হামি বাঁচোগে নেই। তুর মাভি বুলত হামি বাঁচোগে নেই। লেকিন মা শীতলার কৃপায় তুর মায়ী জলদি জলদি পার পেল। তুকেও কৃপা করেছিল, লেকিন তু বেঁচে গেলি। একটু হেসে গোমানি কিছু মনে করার যেন চেষ্টা করল। তারপর বলতে থাকল—তা তু বুলতে পারিস হামি ইসপিরিট খাই ক্যানে, তুকে ভুখা রাখি ক্যানে, হামি থাকি ক্যানে, সব বুলতে পারিস। লেকিন বাত কী আছে তু জানে, খুনের লাশ, গলায় দড়ির লাশ, সকল লাশের পেট মাথা চিরে হামার মাথা ঠিক থাকে নারে, মাথাটা হামার গরম হয়ে উঠে। হামি পাগল বনে যাই। মদ খানেসে দেমাক

ঠান্ডা হয়ে যায়। মদ পিনেসে দুনিয়া ঠান্ডা হোতা হ্যায়, আওর তু ত নেলি। খা, খা লে। স্পিরিটের বোতলটা গোমানি নেলির মুখের সামনে তুলে ধরল।

বাপ, বাপ, আর পারিনে! নেলি কান্না—কান্না গলায় চিৎকার করে উঠল। —তু আর বাপ জ্বালাসনে। নেলি গোমানির হাত ধরে টানতে থাকল। চটানের সব লোক তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। একমাত্র ঝাড়োর বৌ জেগে। বাঁশের পাতি তুলছে বসে বসে। ঘরে একটা লম্ফ জ্বলছে। নেলি এসময় বাপকে কোলে তুলে নিল। বলল, আ যা বাপ, তু আর জ্বালাসনে, হামার বহুত নিদ আতা বাপ। নেলি বাপকে তুলে মাচানে শুইয়ে দিল, এবং কাঁথা—কাপড় দিয়ে ঢেকে জোরে চেপে রাখল বাপের শরীরটাকে। ঠান্ডায় গোমানির শরীরটা বরফ হয়ে ছিল, এখন উত্তাপ সঞ্চার হচ্ছে।

রাত ঘন হচ্ছে। গভীর হচ্ছে।

বাপের পাশে শুয়ে রয়েছে নেলি। ওর ঘুম আসছে না।

আসবে না। শ্মশানের সব ছবিটা সে দেখতে পাচ্ছে। কটা কুকুর কয়েকটা কচ্ছপ ঘোরাফেরা করছে সেখানে। কয়েকটা শেয়ালের আর্তনাদ অথবা ইতস্তত জোনাকির আলো। রাত যত ঘন হবে জোনাকির আলো তত বেশি ভূতুড়ে মনে হবে, তত বেশি শরীরটা ছমছম করবে। অথচ নেলি ভয় পাওয়ার মতো করে হাঁটবে না। কিংবা ওকে দেখে মনে হবে না যে সে কোনো ভয় পাচ্ছে। বরং ওকে দেখলেই ভয় পাওয়ার কথা। কুকুর দুটোর জ্বলন্ত চোখ দেখে ভয় পাওয়ার কথা!

প্রথম দিকে দু একবার গোমানি জোর করে উঠে বসবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নেলি উঠতে দেয়নি। জোর করে চেপে রেখেছে। কাঁথা চেপে গোমানির ওপর বসে রয়েছে। এখন গোমানি হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। নেলি লম্ফর আলোটা তুলে আনল। বাপের মুখ দেখল। মুখ ভয়ানক কুৎসিত—মুখে কূট গন্ধ। ভিতরের দুটো কষ্টি কালো দাঁত শ্বাসের সঙ্গে নড়ছে। আরও ভিতরের আলজিবটা সে দেখতে পেল। আলজিবটা নড়ছে না—সুতরাং বাপ প্রচণ্ড ঘুমোচ্ছে। মুখের ভিতরটা স্পিরিট খেয়ে খেয়ে কালো হয়ে গেছে। যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। বাপের জন্য নেলির অদ্ভুত রকমের কষ্ট হতে থাকল।

মাচান থেকে নেলি সন্তর্পণে নামল। মেঝেতে গঙ্গা যমুনা মুখ গুঁজে পড়েছিল। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দিয়ে ওরা ওকে দেখল। নেলি ইশারা করলে চুপি চুপি ওরা উঠে এল। চুপি চুপি ওরা উঠোনে নামল। উঠোনে দুটো মালসা—কবুতরগুলো মালসায় জল খায় বিকেলে। সে মালসা দুটো হাতে নিল। একটা পোড়া হাঁড়ি নিল। নেলির চোখে দুঃসহ সংশয়। ভয়, দুখিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়ে ওকে দেখে চিৎকার করে না ওঠে। চিৎকার করে না বলে—ডাইনি মাগি কাঁহা যাচ্ছে দ্যাখ। সে উঠোনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভালোভাবে সব দেখে নিল। কেউ জেগে নেই। কেউ না। এমনকি ঝাড়োর বৌ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। একমাত্র ঘাটোয়ারিবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাতেও ঘাটোয়ারিবাবু জানালার ধারে বসে রয়েছেন, চেয়ারে বসে কিছু যেন করছেন না—অথচ বসে আছেন। নেলি কুকুর দুটোকে ফের ইশারা করলে! শিবমন্দিরের এবং বাবলার ঘন বন পার হয়ে সে ধীরে ধীরে শ্মশানের চালা ঘরটায় হাজির হল! এখানে সারারাত লণ্ঠন জ্বলে। ঘাটোয়ারিবাবু জ্বালিয়ে দেন। বৃষ্টি—বাদলার রাতে আলো নিভে যায়। শীতের রাতে হাওয়া খুব না থাকলে নিবু—নিবু করে সারারাত জ্বলে। শ্মশানকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। নেলি সেই হারিকেনটা খুলে নিল এবং পলতেটা বাড়িয়ে গঙ্গার ঢালে নেমে গেল।

দুখিয়ার বৌ ঘরে ধড়ফড় করে উঠে বসল। ওর ঘরটা চটানের শেষ মাথায়। শিবমন্দিরের পথে নামতে সে দেখল যেন, স্পষ্ট দেখল যেন, নেলি চটান থেকে নেমে গেল। নেলির কুকুর দুটোও। মংলি তাড়াতাড়ি দুখিয়াকে ঠেলে তুলে দিল। বলল, দ্যাখ, দ্যাখ ডাইনি মাগি আঁধার রেতে পালাচ্ছে।

দুখিয়া উঠে প্রথমেই হারিকেনের আলোটা উসকে দিল। হারিকেনটা নিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়াল। হারিকেনটা উপরে তুলে নেলি কাছে কোথাও আছে কিনা দেখল। না দেখে সে হাজির হল গোমানির ঘরে।

গোমানি নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে—বেটা হাড় হাভাতে! দুখিয়া গাল দিল মনে মনে। —বেটা ইসপিরিট খোর। প্রথমে সে মাচানের কাছে গিয়ে নাড়া দিল—গোমানি গোমানি, অঃ গোমানি! হারে উঠ। উঠে তামাশা দেখে লে। জোয়ান বেটির তামাশা। বেটি ত তর ভাগলবারে। তুর বেটির ঘাড়ে ভূত সোয়ার হো গিয়ারে গোমানি! বেটি তুর ডাইনি বন গিয়া।

গোমানি কাঁথা—কাপড় ঠেলে উঠে বসল। কিন্তু ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে। এখনও শরীরটা ক্লান্ত, ভারী—ভারী। কে কী বলছে ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছে না—বুঝতে পারছে না। সুতরাং সে ফ্যালফ্যাল করে দুখিয়ার দিকে চেয়ে থাকল।

হামারে দেখে তুর হবেটা কী? নেলি আঁধার রাতে কাঁহা গ্যাল দ্যাখ। দু চারঠো আখেরের কাজ কাম কর।

কাঁহা গ্যাল।

কাঁহা ভি গ্যাল।

তু না জানিস?

হাম না জানে?

চটানের কৈ না জানে?

দুখিয়া ঠোঁট উলটে বিদ্রূপ করল, কোন জানে!

গোমানি এবার মরিয়া হয়ে ডাকতে থাকল, হরীতকী, হরীতকী!

হরীতকী শুয়েছিল। ঘুমিয়েছিল। গোমানির চিৎকারে সে জাগল। বসল এবং দুয়ার খুলে বের হয়ে দেখল দুখিয়া, ওর বৌ মংলি এবং গোমানি চটানে হইচই বাধিয়ে দিয়েছে। হরীতকীকে দেখে গোমানি ওর কাছে ছুটে গেল। বলল, তু জানে নেলি এ—আঁধার রাতে কাঁহা গ্যাল? জানে তু?

হাম না জানে গোমানি।

তু না জানে, দুখিয়া না জানে, কৈ না জানে, তব কোন জানে? কোন!

গোমানির মাথায় এখন আর তেমন ঘোড়দৌড় হচ্ছে না। এতক্ষণে শরীরটা হালকা বোধ হচ্ছে যেন। তবু সে জোরে কথা বলতে পারল না। শরীর দুর্বল। সে বুঝতে পারল—সে কত অসহায়। এজন্য দুখিয়া, হরীতকীর দিকে চেয়ে নেলির অনুসন্ধানের প্রত্যাশা করল। যদি ওরা কিছু বলতে পারে, অথবা ঢুঁড়ে এসে খবর দেয় নেলিকে পাওয়া গেছে, নেলি মালসা করে ডাল, ভাত, মাছ, মাংস আনতে যায়নি। যদি ওরা বলে নেলির ভিতর ডাইনি হওয়ার মতো লক্ষণ আপাতত প্রকাশ হচ্ছে না। যদি বলে নেলিকে পাওয়া গেছে—তু চিন্তা না করে গোমানি। কিন্তু ওরা নড়ল না, কিছু বলল না। ওরা দাঁড়িয়ে থেকে গোমানির অথর্ব শরীরটা দেখল শুধু।

এতটা অথর্ব বুঝেই দুখিয়া বলতে বুঝি সাহস করল, হামি ত তুর বেটির জন্য পাহারাদার না আছে। তুর বেটি কাঁহা গ্যাল ও হামাদের বুলতেই হবে। বেটি তুর আচ্ছা লয় গোমানি। ওকে থোড়া সমজে রাখ।

উঠোনের অন্যপাশ থেকে মংলি বলল, তু দুখি, চলে আয়। গোমানির বেটি আঁধার রেতে কাঁহা গেছে ও গোমানি বুঝবে। তু ওকে ভালাই করিস ত ও বুঝবে মন্দ। লয়ত ওয়ার বেটি রাতে কাঁহাসে ভাত দাল মাছ মাংস লিয়ে আসে। —এক দফে ও বুলবে না ওয়াকে। হাপুস হাপুস শুধু গিলবে।

ও বাত ঠিক লয় বৌ, গোমানির বেটি মন্দ কাজ করে বেড়াবে, পহর রাতে ডাইনি সেজে ঘোরাঘোরি করবে, ও কথা ঠিক লয়। চটানে ঝাড়ো ডোম আছে, সর্দার আছে, ঘাটোয়ারিবাবু আছে, পাঁচজনার পাশ জরুর নালিশ দিতে হবে। হয় গোমানি থাকবে চটানে, লয় তো হামি থাকবে। চটানে দিন দিন বেজাত অজাত হয়ে উঠছে। বহুত বেইমানি আচ্ছা লয় গোমানি।

গোমানির মন পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠছে। হাসপাতালের খুনের লাশ কাটার সময় যেমন সে ক্রমশ নিষ্ঠুর হয়ে উঠত, সে এখন সেরকম নৃশংস। চোখ দুটো ফের চিংড়ি মাছের মতো ঝুলে পড়তে চাইল মুখ থেকে। সে দুখিয়ার মুখের ওপর গিয়ে ফেটে পড়ল, বেইমানি কোন কিয়া? হাম!

না, তেরে বেটি। হারামি আছে ও। হামার বেটি হোত তু।

জবাই করতি।

জরুর।

হাম ভি করে জবাই। যেন নেলিকে জবাই করে চটানে সসম্মানে বেঁচে থাকা গোমানির একমাত্র পথ। নেলির জন্যই যেন সে এত ছোট হয়ে গেছে। এত দুর্বল হয়ে আছে চটানে। এবং নেলিকে জবাই করলে চটানের সকলে যদি খুশি হয়—তবে আজ সে তাই করবে। তাই করে সকলকে খুশি করবে। এই ধরনের কিছু ভাব গোমানির মনে বারবার চাপ দিচ্ছে। সে মাচানের নিচে থেকে দা—টা খুঁজে বের করল এবং দুখিয়ার সামনে গিয়ে জবাই—এর কসরত দেখাল। তারপর চিৎকার করে উঠল—নেলিরে, তু আজ চটানে জবাই হ যাবি।

ঘাটোয়ারিবাবুর ঘুম আসছিল না। তিনি ঘুমোতে পারছিলেন না, শরীরে কম্বল জড়িয়ে চেয়ারে বসে ছিলেন। বসে থাকতে থাকতে কখন একটু ঘুম লেগে এসেছিল টের পান নি। গোমানির উৎকট চিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ঘুমোলেন না। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। গঙ্গাপুত্তুরের দল ঘোর হামলা বাধিয়েছে। ফের চটানে খুনোখুনি আরম্ভ হয়েছে। তিনি জানেন এইসব লোকেরা সমস্ত রাত আর তাকে ঘুমোতে দেবে না। গালমন্দ, খিস্তি, হামলা, মারধোর তিনি না গেলে সারারাত ধরে চলতে থাকবে। সেজন্য কম্বল গায়ে খড়ম পায়ে তিনি চটানে নেমে গেলেন।

ঘাটোয়ারিবাবু চটানে ঢুকেই ধমকে উঠলেন গোমানিকে, এই শুয়োরের বাচ্চা হারামজাদা গঙ্গাপুত্তুরের দল, তোদের জন্যে রাতে ঘুম যেতে পারব না পর্যন্ত। তোদের দিনরাত খুনোখুনি লেগেই আছে। এ কিরে বাবা! এ যেন হনুমানের রাজত্ব। বেটারা সব হনুমানের দালাল দেখছি। কী হচ্ছে এইসব। হৈ—হল্লা চিৎকার! এই শুয়োরের বাচ্চা গোমানি, কাকে খুন করবি—তোর কোন শত্রুকে?

ঘাটোয়ারিবাবুকে দেখেই গোমানি কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। খুন হো যাবি, জবাই হো যাবি বলে আর চিৎকার করল না। এখন সে যথেষ্ট ভালো মানুষ। এখন সে চটানের কোনো ঘটনারই সাক্ষী হিসাবে থাকতে যেন নারাজ। কিছু ঘটেছে যেন এও মিথ্যা। কিন্তু ঘাটোয়ারিবাবু ঘরে উঠে এলে খুব বিষণ্ণ গলায় বলল, বাবু, নেলি চটানসে ভেগে গেল আঁধার রেতে। বাবু, হামি কী করব? মেয়েটা হামাকে ফাঁকি দিল বাবু।

গোমানির শরীরটার দিকে চেয়ে ঘাটোয়ারিবাবুর মনটা ভিজে উঠল। তিনি বললেন, ও তো প্রায় রাতেই যায় রে! আজ প্রথম গেল ভাবছিস!

গোমানি দা—টা মাচানের নিচে রেখে দিল। —লেকিন কাঁহা যায় হাম ত না জানে বাবু!

ঘাটোয়ারিবাবু এখন উপদেশ দেওয়ার মতো করে কথা বলছেন। —তবে চুপ করে থাক। চুপ করে শুয়ে থাক। খুনোখুনি করবি কাকে? খুন ত বেটা তুই নিজেই হয়ে আছিস। মদ খেয়ে দিনরাত পড়ে থাকবি, মেয়েটাকে খেতে দিবিনে। মা—মরা মেয়েটা সারা দিন রাত খেতে না পেয়ে এঘর—ওঘর করবে, না খেতে পেয়ে মেয়েটা কাঁদবে—আর আঁধার রাতে ভেগে গেল ত হুঁশ হল—মেয়েটা কাঁহা যায় হাম ত না জানে বাবু। শালা শুয়োর—হারামজাদা গঙ্গাপুত্তুর! শুয়ে থাক হনুমানের দালাল কোথাকার! শেষে তিনি দুখিয়ার দিকে চেয়ে বললেন, এই দুখিয়া, বেটা সুদখোর, তুই আবার এখানে কেন?

ভয়ে ভয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল মংলি। দুখিয়া আমতা আমতা করতে থাকল প্রথমে, পরে কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘাটোয়ারিবাবুর চোখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে সাহস করল না। হরীতকী তখন দুখিয়ার দিকে আড়ে ঠারে চাইল। ব্যঙ্গ করল। রসিকতা করতে চাইল—জানে না বাবু উইত উবকার করতে এল নেলির।

হো উবকার করতে চেয়েছে। একটা তির্যক গলা ভেসে আসছে দুখিয়ার ঘর থেকে। মংলি ঘরে বসে হরীতকীকে উপলক্ষ্য করে কথাগুলো বলছে। ঘরে বসে বসেই হাত—পা নাড়ছে এবং চোখমুখ টেনে হরীতকীর জবাব দিচ্ছে।

দুখিয়া ভালোমানুষের মতো কথা বলল এবার। —শুয়ে পড় গোমানি। কী আর করবি—সব নসিব। কাঁহাতক আর বসে থাকবি বেটির লাগি—শুয়ে পড়। বেটি তুর কামাই করে ফিরতে বহুত রাত হবে। যেন দুখিয়া এখন কত ভালোমানুষ হয়ে গেছে, যেন গোমানির দুঃখে সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। গোমানির মেয়েটা ফিরতে রাত হবে বলে যেন ওরও ঘুমোবার অসুবিধা। সে এবার ঘাটোয়ারিবাবুর দিকে চেয়ে বলল, কী বাবু, হামি ঠিক বুলছি না, ও এখন শুয়ে পড়ুক।

ঘাটোয়ারিবাবু কোনো জবাব দিতে পারলেন না দুখিয়াকে। নেলির কামাই করে ফিরতে রাত হবে কথাটা দুখিয়ার গলায় নষ্ট ঠেকল। তিনি হরীতকীর দিকে চাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষ হয়ে কী এক অন্য ভাবনার ভিতর ডুবে চটান থেকে উঠে গেলেন। দুখিয়া এ—সব দেখে হাসল। হরীতকীর দিকে চেয়ে চোখ টানল। তারপর বেশ বড় বড় পা ফেলে নিজের ঘরের দিকে যাওয়ার সময় বলল—তুর মেয়েটা চটানে দিন দিন ডাইনি বনে যাচ্ছে। ও কী হরীতকীর লাখান একটা বাচ্চা দিয়ে লিবে চটানে। গোমানিকে উদ্দেশ করে কথাগুলো বলল দুখিয়া। গোমানি শুনল। চোখ তুলে হরীতকীকে দেখে বড় বড় পা ফেলে সেও ঘরে ঢুকে গেল। যেন হরীতকীকেই ওরা সবাই শাসন করে গেল—নেলিকে নয়।

হরীতকীর তখন ইচ্ছে হল বলতে, হে দিয়েছি ত, হে দি লিছি বাচ্চা। তেরে বহুকা মাফিক হামি কী পোড়াকাঠ যে আগুন দিলে ভি জ্বলবে না। তাজা কাঠ আছি—আগুন গিলেছি, বাচ্চা দে লিছি। এ—লাজ না খোঁটার কথা আছে। হরীতকী, মংলিকে উদ্দেশ করে সারারাত ধরে গালমন্দ দেওয়ার কথা ভাবল। কিন্তু কিছু বলল না। এই নিশুতি রাতে চিল্লাতে শুরু করলে ফের ঘাটোয়ারিবাবু ছুটে আসবেন এবং তিনি দুখিয়া—মংলির এমন সব ইশারাতে সরম পাবেন। সেইজন্যই আঁধার রাতে কোনো গরল না ঢেলে হরীতকী নিজের ঘরে গিয়ে বাচ্চাকে চেপে ধরল এবং সমস্ত দুঃখ ভুলে আদর করল, শনিয়া, তু মেরে লাল।

কাঁথা—কাপড়ে শরীর ঢেকে গোমানি বেশিক্ষণ মাচানে বসে থাকতে পারল না। লম্ফটা দুবার দপদপ করে জ্বলে শেষে নিভে গেল। ঘরটা অন্ধকার হয়ে উঠল। গলা বেয়ে ফের কাশি উঠছে। খকখক করে ক'বার কেশে সে উপুড় হয়ে শুল। হেঁপো রুগির মতো কিছু কাঁথা বালিশ এনে বুকের নিচে ঠেসে দিল। কাশি দম বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করল। মাঝে মাঝে কোনো শব্দ হলেই কাঁথা—কাপড় থেকে মুখ বের করে দেখল—নেলি এসেছে কিনা! এল না! নিচে বাচ্চা শুয়োর দুটোর শব্দ। ফের মুখ বের করল—নেলি আসেনি। নিচে অথবা টং—এ কবুতরের শব্দ। এ—আঁধার রাতে নেলি কোথায় গেল! কাঁহা গেল মেয়েটা। ওর কষ্ট হতে থাকল। এ—সময় ওর ফুলনের ওপর রাগ হল। ফুলনের মৃত্যুর উপর। ফুলন মরে খুব অপরাধ করেছে এমন একটা ভাব কাজ করছে ওর মনে। ফুলন বেঁচে থাকলে এসব হাঙ্গামা ওকে পোয়াতে হত না। এইজন্য সে মাঝে মাঝে মেয়ে এবং মার ওপর খুব রেগে উঠছিল। তখন গোমানির চোখে মুখে কেমন বেপরোয়া ভাব। চোখ দুটো আঁধারেও কেমন ঘোলা ঘোলা। নেলি ফিরছে না—বড় কষ্ট হচ্ছে ওর। চটানে নিশুতি রাত নেমেছে। বরফের মতো ঠান্ডা নেমেছে। নেলি এই ঠান্ডায়, এই শীতে কিনা জানি করছে! চটানে এখন আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শ্যাওড়া গাছে ঝিঁঝিপোকা ডাকছে। ঘাটে মড়া নেই। দূরে কয়েকটা কুকুর আর্তনাদ করছে। সে অনেকগুলো শেয়ালের ডাক শুনল বাবলার ঘন বনে। শীতের ঠান্ডায় মুরগিগুলো ডিমে তা দিতে দিতে চিৎকার করছে কৈলাসের ঘরে। কৈলাসের ঘরে ওর তৃতীয় পক্ষের বৌটা একা। বৌটা মদ খেয়ে পেট ঢাক করে চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে। শুয়ে শুয়ে এটা সে আন্দাজ করল। এ—সময়ই উঠে পড়ে নেলিকে ঢুঁড়তে যাওয়ার ইচ্ছা হল গোমানির। এক ফাঁকে একটা নজর দিয়ে আসবে কৈলাসের ঘরে এই ওর বাসনা। অথচ উঠতে গিয়ে দেখছে শরীরটা ওর যেন পাথর হয়ে গেছে।

ঘাটোয়ারিবাবু যখন চটানে নেমেছিলেন, নেলি তখন গঙ্গার ঢালু বেয়ে নামছিল। গঙ্গা যমুনা আগে আগে যাচ্ছিল। ওরা ঘেউঘেউ করছে। বাবলার ঘন বনে কটা শেয়াল ডাকছে সেজন্য। গঙ্গা যমুনা মাটির গন্ধ নিতে নিতে নিচে গিয়ে নামল।

নেলি সেই তাজা চিতাটা খুঁজছে। খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে। এখানে ইতস্তত কাঠ, কয়লা, ভাঙা কলসি, ছেঁড়া তোশক, বালিশের তুলো মাটির সঙ্গে মিলেমিশে আছে। নেলি ওগুলোর ওপর দিয়েই হেঁটে গেল। হারিকেনের আলোয় সে ঠিক ধরতে পারছে না কোথায় তাজা চিতাটাকে সে রেখে এল। সে খুঁজছে। খুঁজছে। নদীর বালিয়াড়িতে সে এসে নামল। একটা কাঁচা বাঁশ দেখল। নদীর চরে বাঁশটা এখনও পোঁতা আছে। সে বুঝল কচ্ছপেরা এখনও এসে এখানে ভেড়েনি। সে তাড়াতাড়ি বাঁশটা তুলে আনল জল থেকে এবং বাঁশের ডগায় মাংসপিণ্ডটাকে দু'ভাগ করে গঙ্গা যমুনাকে খাওয়াল। তারপর ফের গঙ্গার ঢালু বেয়ে উপরে উঠে সেই তাজা চিতাটাকে খোঁজা—যেখানে দুখিয়ার নসিব খুলেছে।

এই ভর নিশুতি রাতে প্রেতের মতো দুটো কুকুরকে নিয়ে নেলি তাজা চিতাটা খুঁজছে। নেলির মনে হল তখন কে যেন দূরে শহরের দিকে ছুটছে। নেলি হাসল—ভয় পেয়ে এমন হয়। নেলি তারপরই চিতাটা খুঁজে পেল। এ—সময় নেলির মনটা আনন্দে ভরে গেল। ভয়ানক আনন্দে সে পুলকিত হল। আঁধার রাতে আকাশটায় কত নক্ষত্র, আর এই নিচের পৃথিবীতে কত সুখ—দুঃখ। কত বেদনা। নেলি এমন করে ভাবতে জানে না—কিন্তু মনের ভিতর গহনা পাওয়ার আশা এবং এই সুখানুভূতি ওর অনুভবে ঘা দিচ্ছে এবং তারই প্রকাশ যেন আকাশটায় অনেক নক্ষত্রের নিচে পৃথিবীর অনেক সুখ—দুঃখের মতো।

সে আশার ডিমে তা দিচ্ছে। আহা কাল সে খাবে, কাল সে পেট ভরে ভাত দিয়ে লিবে বাপকে। আহা গঙ্গা যমুনারে! নেলি এখন এই 'আহা'র জগৎ ধরে দুখিয়ার ধোওয়া কয়লাগুলো হাঁড়িতে ভরছে, জলে ধুয়ে নিচ্ছে—এই 'আহা'র জগৎ ধরে জল ফেলে দিয়ে কয়লার তলানি খুঁজছে। লণ্ঠনের আলোয় তলানি দেখার আগে উত্তেজনায় অধীর হচ্ছে। চোখে মুখে কত সুখের উত্তেজনা। গহনা পেলে কাল গেরুকে খেতে বলবে। গহনা বেচে চাল, ডাল, একটু মাছ নেবে। বাপ মাছ খেতে ভালোবাসে। গেরুর জন্য একটু শুয়োরের মাংস অথবা চর্বি। গেরু শুয়োরের চর্বি খেতে ভালোবাসে।

নেলি তলানি খুঁজল। একটা আঙুল দিয়ে তলানির ছোট ছোট অণুর মতো টুকরোগুলোকে ঘষল। সব জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কিছুই শক্ত ঠেকছে না। পিতল কাঁসা কিংবা লোহার মতো সোনার মতো ঠেকছে না। অণুর মতো ঠেকছে না। দুখিয়া কয়লা ধুয়ে কালি পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে। নেলি সব কয়লাগুলো জলে ধুলো এবং মালসাতে জলের তলানি খুঁজল—কিচ্ছু নেই। সে নিরাশ হচ্ছে। ওর চোখ দুটোতে ফের দুঃসহ যন্ত্রণা। ফের সে ইচ্ছে করে মাতাল হয়ে উঠেছে। সে ডাক দিল—দোহাই ডাক ঠাকুর, দোহাই তুর।

সে এবার কয়লা ফেলে শ্মশানের ভিজা মাটিগুলো তুলল হাঁড়িতে। যদি কিছু গয়না গলে মাটির সঙ্গে মিশে থাকে।

নেলি আবার আশার ডিমে তা দিতে দিতে জলে মাটি গুলল। জল ফেলে তলানি ঢালল মালসাতে। দু মালসায় তলানি জল ঢেলে জলটা আরও কমাল।

তারপর! এগুলো সে কী দেখছে—এত গহনা! এত টুকরো গহনা! চোখ ওর উজ্জল হয়ে উঠল। চোখ ওর আনন্দে জলে ভরে উঠল। এত! এত সোনার সব টুকরো! সব অণু। নেলি হারিকেনটা আরও কাছে নিয়ে গেল। টুকরোগুলো সব ঝিকমিক করছে। মালসাটি বুকের কাছে চেপে ধরল। —দোহাই ডাক ঠাকুর, দোহাই তুর। হামারে থোড়া শক্তি দে। সে একটা আঙুল দিয়ে নেড়ে নেড়ে দেখতে চাইল। আঙুলটা পর্যন্ত কাঁপছে। তবু যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে একটা অণুর স্পর্শ আঙুলে পেতে গিয়ে দেখল সেগুলো জলের সঙ্গে গুলে যেতে চাইছে।

নেলি আর পারছে না। সে আঙুল দিয়ে ফের চাপ দিল। ওরা ভেঙে যাচ্ছে। জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। নেলি আর পারছে না। আর পারছে না। ডাক ঠাকুর তু হামার সাথ বেইমানি মত কর। পেটের দুঃসহ যন্ত্রণা, শরীরটার দুঃসহ যন্ত্রণা, এইসব যুবতী মেয়ের পোড়া অণুবৎ হাড়ের টুকরো ওকে পাগল করে দিচ্ছে।

নেলি পাগলের মতো প্রেতের মতো সমস্ত রাত এইখানে পড়ে থাকল। এবং ভোর রাতের দিকে নেলি পাগলের মতোই অর্থাৎ ডাইনির মতো হয়ে—চোখ দুটো ফোলা ফোলা চুলগুলো খাড়া খাড়া করে চটানে

উঠে গেল। গোমানি রাগে দুঃখে ওর কোমরে কয়েকটা লাথি মেরেছিল—অথচ নেলি কিছু বলেনি, চুপচাপ মাচানে গিয়ে হাত—পা ছড়িয়ে চোখ দুটো স্থির করে—কাঁথা—বালিশের নিচে আশ্রয় খুঁজেছিল এবং ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দুই

তখন সূর্য পাটে বসেছিল। তখন খেয়াঘাটের মাঝিদের সঙ্গে গোমানি ডোম ঢকঢক করে স্পিরিট গিলছিল এবং তখনই নদীর পার ধরে নামছিল কৈলাস এবং ওর সঙ্গে ওর মরদ বাচ্চা গেরু ডোম। ওরা অনেক খানা—খন্দ পার হয়ে, অনেক ডহর—ডোবা পার হয়ে নদীর পাড় ধরে চলছিল।

ওরা ক্রমশ উত্তরের দিকে নেমে যাচ্ছে। গেরু মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল—শ্মশান পেছনে, শ্মশানটা হারিয়ে যাচ্ছে। চটানটা আর দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং সামনে ফরাসডাঙা, সুতরাং সামনের দিকে ওরা চলতে থাকল। ফরাসডাঙার জঙ্গলে মৃত মানুষের কবরে, অথবা সে ভাবল নতুন কবরে, যত তন্তর—মন্তর শিখল বাপের কাছে সব উগরে দেবে। তারপর তন্তর—মন্তরের গুণাগুণ দেখে সাহস সঞ্চয় করে নেবে।

গেরুর শরীর মজবুত এবং কষ্টিপাথরের মতো রঙ। একহাতে মদের ভাঁড় এবং অন্যহাতে বল্লম। সঙ্গে একটা হারিকেন আছে। গায়ে জড়ানো শ্মশানের কাঁথাকাপড়। কোমরে গামছা বেঁধেছে শক্ত করে। গেরুর শীত শীত করছে। উত্তুরে বাতাসে প্রচণ্ড ঠান্ডা। এই ঠান্ডায় ওর মুর্দা তোলার শখ অথবা খোঁজার শখ এখন আর থাকছে না। সে ভাবল, এই শীতে বরং চটানে মদ টেনে নেলির সঙ্গে মাতলামি করা ভালো। সুতরাং সে বল্লম দিয়ে একটা গাছকে ফুঁড়ে দিল।

কৈলাস তখন শীতের পোকা হয়ে বেশ গুটিগুটি চলছে। বেশ এক—পা দু'পা করে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অনেক দূর চলে যেতেই ওর হুঁশ হল—গেরুর কথা মনে হল, মরদ বাচ্চা আর কতদূরে! মরদ বাচ্চা এ—কাজ করে খেতে পারবে কী পারবে না—সব কিছু মরদের চলার ঢং দেখে বুঝে নেবার চেষ্টা করল। কৈলাস এই অন্ধকারে, এই নদীর পারে পারে যেন বলতে চাইছে—হামার শরীরটা কঙ্কাল আছে, হামার কঙ্কাল দোসরা কঙ্কাল খুঁজতে যাচ্ছে। সে এইসব ভেবে হাত—পা শক্ত করার ভঙ্গিতে শরীর টানা দিল, তারপর চোখ দুটোকে জোনাকি পোকার মতো ছোট করে সে আঁধারে গেরুর পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। গেরু আসছে এবং ওর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে ফের হাঁটতে থাকল। আঁধারে চলতে কষ্ট—তবু সে হাঁটছে। সে হারিকেনের আলো ধরালে না। তেল—খরচের কথা ভেবে সে অন্তত বাবুঘাটের ডহর পর্যন্ত এই আঁধারে চলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। সে আলো জ্বালাল না অথবা গেরুকে আলো জ্বালাতে বলল না।

সে হাঁটল। সে হাঁটছে। গেরু পিছনে—গেরু ওর ইচ্ছামতো আসুক এই ভাবনা এখন কৈলাসের অন্তরে।

কৈলাস যেতে যেতে কোঁচড়ের চালভাজাগুলো আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল এবং টিপে টিপে দেখল। কোঁচড়ের ভিতরে ইতস্তত কাঁচা লংকার টুকরো ছড়ানো—কিছু কাঁচা পেঁয়াজের কুচি। একটা মাটির ভাঁড় কোমরের অন্য পাশটায় ঝুলছে। হাঁটবার সময় ভাঁড়টা দুলছে।

কৈলাস এই আঁধারে ধুকুস—ধুকুস করে চলছিল। জোনাকির চোখ নিয়ে সে এ—আঁধারেও চলতে পারে। অন্তত চলার চেষ্টা করে। এ—সময় ওরা বাবুঘাটের পারে এসে দাঁড়িয়েছে। চটানের আলো এখান থেকে আর দেখা যাচ্ছে না। শ্মশানের হারিকেনের আলোটা ওরা দেখতে পাচ্ছে না। বাঁকের মুখে মাঝিদের পুরোনো আস্তানা হারিয়ে গেছে। নদী এখানে বাঁক নিয়েছে। নদী এখানে বাঁক নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে পদ্মার দিকে উজানে উঠে গেছে। দুপাশে সেই ঘন ঝোপ—সেই বনকুলের অন্ধকার, সেই সোনাব্যাঙের ঢিবি, খরগোশের গর্ত।

ওরা আঁধারের ভিতর সব টের করতে পারছে। ওরা এখানে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। প্রকাণ্ড ডহরটা ওরা পার হবে। আঁধারে পার হতে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ার ভয় থাকে। সেজন্য বাপের কথামতো গেরু মদের ভাঁড় মাটিতে রাখল। বল্লমটা নিচে রাখল। এবং হারিকেনটা নিচে রেখে দেশলাই জ্বেলে আলো জ্বালাল।

কাঠিটা খস করে জ্বললে গেরু বাপের মুখ দেখল। বাপ গেরুর মুখ। গেরু বাপকে এখন চিনতে পারছে না। মুখটা ওর কেমন ভয়ানক হয়ে উঠেছে। কেমন ভয়াবহ। সে বাপের দুটো বেড়ালের মতো চোখে শিকারের এক ভয়ংকর ইচ্ছাকে দেখতে পেল। সে ডাকল, বাপ! চল বাপ! সে কেমন ভয়ে ভয়ে বাপকে কথাগুলো বলল।

কৈলাস গেরুর কথা শুনল না অথবা শোনার ইচ্ছে ছিল না। গেরু হারিকেন জ্বাললে হারিকেনটা সে তুলে নিল এবং হারিকেনটা ঘুরিয়ে—ফিরিয়ে দেখল। সেই পুরানো জং—ধরা ঢাকনা, সেই ফাটা চিমনি—কোনো পরিবর্তন নেই, অথচ ওর দেখার অভ্যাস। রোজ জ্বেলে একবার ঘুরিয়ে—ফিরিয়ে দেখবে হারিকেনটা। অনেক কালের এবং অনেক পুরোনো বলে কৈলাসের মমতা হারিকেনটার ওপর খুব বেশি। এখনও সে ওর শরীরের মতো এটাকে কোনোরকমে জিইয়ে রেখেছে। জিইয়ে রেখে পুরোনো স্মৃতির ঘরে সে অনেকক্ষণ কদম দিতে পারে।

কৈলাস তখন হেকিমি করত শহরের ফৌজদারি আর দেওয়ানি কোর্টে। দাওয়াই বিক্রির সময় চেঁচাত, পুন্ন—পদের মাদুলি! এ ঝাড়ফুঁক লয়, এ জাদুমন্তর লয়—এ আছে জুড়িবুটির কারবার—দব্যগুণ। ডানপুকুসে টান মারে, তোষক করে, পির—পরিতে নজর দেয়, বাণ মারে, এ—মাদুলি দেহে লিয়ে লিলে আসান পাবেন বাবুলোক—বহুত সামান্য দাম, লিয়ে যান, বিবি—বুঢঢার লাগি লিয়ে যান। এইসব মাদুলি বিক্রি করে সে যখন চটানে ফিরত তখন রাত হত গভীর। কৈলাস সাপখোপের ভয়ের জন্য বিপদে পড়ে এই হারিকেনটা কিনেছিল। আর হারিকেনটা যত পুরোনো হল, যত দিন গেল চটানে, সে অক্ষম হয়ে পড়ছে, তত হারিকেনটার ওপর ওর মমতা বাড়ছে।

এ—সময় গেরু দুটো বিড়ি বের করে বাপকে একটা দিল, নিজে ধরাল একটা। ওরা দুজন বিড়ি খেতে খেতে ফের পথ চলতে থাকল।

অনেকগুলো পরিচিত ঝোপ পার হয়ে কৈলাস অন্য একটা ডহরের পারে এসে থামল। শহরের নালা নর্দমার জল এই ডহর ধরে গঙ্গায় গিয়ে নামে। কৈলাস ডহরের পারে অন্য দিনের মতো আজও উঁকি মারল। লাফ দিয়ে পার হতে পারবে কিনা দেখল। শেষে গেরুর হাতে হারিকেন দিয়ে ব্যাঙের মতো হাতে—পায়ে লাফ দিয়ে ওপারে পড়তে চাইল। পড়ল, হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভিজে ঘাসের জলে ওর শরীর ভিজে উঠল। শীত—শীত রাতে শীতের ভারে সে তখন কুঁকড়ে উঠেছে। সে যেন নড়তে পারছে না। শীতের কুকুরের মতো সে আর্তনাদ করতে চাইছে। বাপের এইসব ভাব দেখে গেরু হেসে বাঁচে না। রাগে দুঃখে কৈলাস গালমন্দ দিল গেরুকে। নীরস মাটিকেও সে ছেড়ে কথা বলল না। খিস্তি করল। সব আক্রোশ ওর এই মাটির উপর, এই ডহরের উপর। —শালী হামার! শালীর বুক—পিঠ গেন—গম্যি না হল। বুড়া জান—হুট করে পড়লে খুট করে মরবে। মরা কৈলাস বিচে খালাস পাবে গেরু।

গেরুর দিকে কৈলাস কড়া নজরে চাইল—যেন গেরুকে সে এখন বিশ্বাস করতে পারছে না, যেন গেরু এখুনি কৈলাসের কঙ্কাল নিয়ে জগুবাজারে হিল্টন কোম্পানির বড়বাবুর কাছে ছুটবে। সে ফের গাল দিল—শালা হামার বাচ্চা কোন বলিছে! বেতরী শালার মুখে দানা খামোকা দিলাম।

ততক্ষণে গেরু লাফ দিয়ে ডহর পার হয়েছে। বাপকে মাটি থেকে তুলেছে এবং বলেছে, তু গিরে গেলি তো হাম কিয়া করে! হামার হাসি ভি পেল, লেকিন হাম কিয়া করে! হামার কী কসুর আছে তু বুল।

নদীর পাড় ধরে চলার সময় গেরু বলল, চোট লাগল না তো রে বাপ!

কৈলাস উত্তর না করে হাঁটছে। সে যেন অন্যমনস্কভাবে হাঁটল। কিন্তু কিছু দূর এসে কী ভেবে বলল, লাগেনি। লাগবে ক্যানে! ঝাড়ফুঁক জুড়িবুটির পুন্নপদের মাদুলি হামার দেহে কতকাল ধরিয়ে বেঁইধে দিয়েছি। দশকুড়ি দশটা দব্যগুণ আছে ওয়াতে। তুরে ভি বেঁইধে দিয়েছি। পির—পরির নজর, ভূত—পেঁতের শ্বাসে তুরে ভি খাবে না। এইসব কথা বলতে গিয়ে ওর গলা শুকিয়ে উঠছে। সে ঢোঁক গিলল। সে এই শীতে পারলে জল খেত। সে এই শীতে পারলে এখুনি বসে ভাঁড়ের সবটুকু মদ টেনে নেয়।

সে কোঁচড়টা টিপে টিপে দেখল। আছাড় পড়ে সব আবার পড়ে গেছে কিনা দেখল। কোমরের ভাঁড়টা ভেঙেছে কিনা দেখল। ভাঁড়, কোঁচড়ের চালভাজা, কাঁচালংকা, পেঁয়াজকুচি সব ঠিক আছে দেখে সে খুশি হল। এই সব ভাবতে গিয়ে দেখল কৈলাসের গলাটা নিজে থেকেই ভিজে উঠছে। জিভে লাল জমছে। সে তার ডানহাতের সড়কিটা বাঁ হাতে নিয়ে বলল, এ বছরে জাড় যেয়েও যেছে না রে!

চলতে চলতে কৈলাস ভাবল—কঙ্কাল টেনে তুলতে আরও কিছুদিন বাকি। সে ভাবল—ফরাসডাঙার কোন জঙ্গলে মড়াটা পুঁতল। বেওয়ারিশ মড়ার হদিস নিতে কত সময় নেবে, কত সময় ওরা সেখানে পৌঁছবে এই চিন্তায় কৈলাসকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

সহসা আঙুলের ওপর কৈলাস কড় গুনল। সে খুশি হল। গেরুকে হাত নাচিয়ে বলল, বাঁচোয়া। দু দফে পানি ঢাললে জায়দা লাগে তো দশ রোজ।

গেরু সকল কথায় কান দিতে পারছে না। ভয়ে কিছুটা সে আড়ষ্ট। সে এখন আগে আগে চলেছে। জীবনে প্রথম কঙ্কাল খুঁজতে এসে ওর ভয় ধরেছে। ভয়ের কথা বাপকে বলতে পারছে না। বাপ এখুনি তবে গোসা করবে, গালমন্দ দেবে। এতদিন বাপ একা এসেছে। আজ ওরা দুজন। এতদিন বাপ কঙ্কাল কুড়িয়ে চটানে শুধু গেরুকে গল্প করেছে, ওর ভয়—ডর ভাঙানোর চেষ্টা করছে—আজ ওরা দুজন। এতদিন বাপ কসরত দেখিয়েছে তাবিজের, শরীরের—আজ ওরা দুজন! সুতরাং ভয়—বিস্ময়ের কিছু নেই। এখন কিছু নেই। এখন কিছু বললেই বাপ চেঁচিয়ে জঙ্গল মাথায় করবে—বলবে, বেইমান, গোলামের বাচ্চা, তু ভাগ হিঁয়াসে!

কৈলাস বলল, তুকে লিয়ে এলাম গেরু! বলা তো যায় না বাপজী ঠাকুরের কখন কী মরজি! হামি মরে গেলে তুকে কোন দেখবে। সে যেন এই বলে গেরুকে অজুহাত দেখাল।

গেরু আগে আগে হাঁটছে। বাপকে ভূতের মতো মনে হচ্ছে। এখন মদের ভাঁড়ের ভিতর সড়কি—কাঁধের ওপর ভাঁড়। ওরা আঁধার ভেঙে, ঝোপ—ঝাড় ভেঙে চলছে তো চলছেই। রাতে এ পথ গেরুর ভয়ানক দীর্ঘ মনে হচ্ছে। পথ দীর্ঘ বলে এবং ভয়াবহ বলে সে নেলিকে ভাববার চেষ্টা করছে। নেলিকে ভেবে ভয়ের কথা ভুলতে চাইছে, অথবা নেলিকে গভীরভাবে ভালোবাসতে চাইছে।

কৈলাস আর গেরুর ব্যবধান এখন বেশ ফারাক। গেরু রয়েছে সামনের পিঠুলি গাছের নিচে, আর বুড়োটা রয়েছে নিজের হারিকেনের আলোয়—শিরীষ গাছের নিচে। বাচ্চাটা এখন বড় হয়েছে, জোয়ান হয়েছে। বড় বড় পা ফেলে সে এখন হাঁটে। বুড়ো কৈলাসের জোয়ানকি গেছে, হেকিমি জীবনের জয়—জয়কার গেছে, সুতরাং সে হাঁটে আস্তে। যত সে বুড়ো হয়েছে—পা দুটো, কোমরটা, বুকটা তত সরু হয়েছে। তত সে চলতে পারছে না, তত ওর নিজের উপর, কবচ—ওবচের ওপর বিশ্বাস ভাঙছে। তত সে গেরুকে কাছে টানতে চাইছে এবং ব্যবসা শেখাবার সব রকমের ফন্দি—ফিকির আঁটছে। এইজন্যই সে বেওয়ারিশ মড়াটার জন্য এতটা পথ ছুটে এসেছে। সে যেন আর এই শরীরের ওপর ভরসা পাচ্ছে না।

শরীরের দিকে চাইলে এখন ওর নিজেরই কেমন সরম আসে। ভাঙা আরশিতে মুখ দেখার স্বভাব কৈলাসের এখনও আছে। যখন শেষ পক্ষের বৌটা বেশি উতলা হয়, বেশি ঘর—বার হয়, তখন কৈলাস আরশি নিয়ে দাওয়ায় বসে, আর গোঁফ টেনে টেনে বড় করে। তখন সে তার হাজা—মজা মুখটার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটে। বলে, বাহবাঃ, কৈলাস তুর, জোয়ানকি তবে গিল রে! তোর বহু এখন ঘর—বার হল রে। বাহবাঃ, বাহবাঃ, কৈলাস! আরশির মুখটা তখন ওকেও ভেংচি কাটে, যেন বলতে চায়—মর, মর, মরে চটান খালাস কর।

কৈলাস বড় করে মাথায় পাগড়ি বেঁধেছে। মাথার টাক ঢেকেছে। তবু চলতে চলতে ওর মনে হচ্ছিল পাগড়ির ভিতর দিয়ে টাকে ঠান্ডা হাওয়া ধাওয়া করছে। সে মাথার পাগড়িটা কষে বেঁধে নিল কতকাল আগের মতো। তখনও সে কোর্টে হেকিমি করত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের সরু লাঠিটা চটের ওপর পড়ে থাকা জুড়িবুটির ওপর ছুঁইয়ে দিয়ে বলত, রাজধনেশের ঠোঁট, কাকধনেশের পালক, আওর ময়না—ধনেশের

তেল শিরমে দু'দফে দিয়ে লিন বাবুলোক—মাথায় রোঁয়া একগাছা উঠে তো হামার ওস্তাদের কসম। তখন কৈলাস মাথায় টুপি দিয়ে টাকটা ঢেকে রাখত।

কিছু সাহস সঞ্চয় করে দূরে গেরু হাতের ওপর বল্লম উঁচিয়ে হাঁকরাল, কী রে বাপ, তু হাঁটতে লারছিস?

কৈলাস ধমকে উঠল, লারছি, লারছি। লারছি তো তুর বাপ এত পথ চলিছে কী করে! রোজল জঙ্গলে গিল কী করে?

গেরু আরও এক কদম হেঁটে পথের মোড়ে এসে দাঁড়াল! বাপ এগিয়ে আসছে। আলোটা দুলছে হাতে। বাপ জমি ভেঙে উপরে উঠল। যে পথ নদীর পাড়ে পাড়ে নবাবের রাজধানী পার হয়ে আরও উত্তরে গিয়ে পদ্মায় মিশেছে, সে পথ না ধরে ফরাসডাঙার পথে পড়ল। অন্য পথটা ডানদিকের জল—কল ঘেঁষে প্রাচীন ইংরেজ—কুঠির দিকে রওনা হয়েছে। গেরু এই পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাপকে উঠে আসতে দেখল, জল—কলের আলো দেখল, দূরের ফরাসডাঙার ছায়াছায়া অস্পষ্ট জঙ্গল দেখল।

কচ্ছপের মতো কৈলাস গুড়িগুড়ি হাঁটছে। সে হারিকেনের আলো এবং তেল বাঁচিয়ে হাঁটছে। জোরে সে হাঁটতে পারে না। ইচ্ছা করলেও না। অথচ গেরুকে বলবে, জলদি হাঁটলে হারিকেনের তেল উপরে উঠে আসবে। আলো নিভবে। অন্ধকার পথে চলতে কষ্ট হবে অথবা আর একটা দেশলাইর কাঠি জ্বালতে হবে।

বাবুঘাট থেকে এই পথের মোড় পর্যন্ত রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। পথ উঁচুনীচু, ভাঙা। গোরুর গাড়ির চাকার দাগগুলো রাতে সাপের খোলসের মতো মনে হয়। মনে হচ্ছে। যত আঁধার হয়, যত আলোর জোর কমে, তত সাপের খোলসগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তত কৈলাস হোঁচট খায় বেশি, তত ওর খিস্তি করার শখ বাড়ে। সুতরাং এই পথটুকুই কৈলাস অত্যন্ত সন্তর্পণে হাঁটে। কারণ অধিকাংশ সময় সে বেসামাল হয়ে পড়ে।

এবার ওরা পুবদিকে চলল। এই পথও গেছে নবাবের রাজধানীতে। এ—পথ যেমন উঁচু তেমনি কুমিরের পিঠের মতো অমসৃণ। জল—কল ডাইনে ফেলে পথ কেবল জাফরিকাটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটেছে। পথের দুপাশে রয়েছে রাজ্যের অনাবাদি জমি। ছোট ছোট বাচ্চা ছেলের কবর। নারকেল গাছ, হিজলির বন, কাশফুলের জঙ্গল। নীলকুঠি সাহেবদের ভাঙা বাড়ি। জায়গায় জায়গায় পথ ভেঙে গেছে। ওরা এই পথ ধরে হাঁটছে। রাত ঘন বলে কোনো জনপ্রাণীর সাড়া ওরা পাচ্ছে না। শুধু জল—কলে ইতস্তত দুটো—একটা আলো জ্বলছে। ভটভট শব্দ হচ্ছে ইঞ্জিনের। সদর দরজায় দারোয়ান কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। ভসভস করে তার নাক ডাকছে।

এ—সময় কৈলাস কাশল। জল—কলে শব্দ হচ্ছে। কাশির আওয়াজে জল—কলের দালানগুলো যেন নড়ছে। এত নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ এইসব মাঠ, ঝোপ, জঙ্গল যে কৈলাস জোরে কাশতে পারল না পর্যন্ত। সে যতটা পারল কাশিকে প্রশমিত করে ঢোঁক গিলে হাঁটতে থাকল।

ওদের এখন আর সামান্য পথ হাঁটতে হবে। এই সামান্য পথটুকুই খুব ভয়াবহ। এখানে ঝোপ—জঙ্গলগুলো পথের উপরে হুমড়ি খেয়ে আছে। সাপখোপের এক্তিয়ার এটা। দক্ষিণে প্রকাণ্ড ঝিল, জগৎশেঠের বিখ্যাত সিঁড়ি। শেঠ পরিবারের ভাঙা পুরোনো পাঁচিল। ঝিলের ভিতর সব পুরোনো কেউটে সাপ। কেউ বলে জগৎশেঠের আমলের ওরা। যক্ষের ধন আগলাচ্ছে ফরাসডাঙায়। উত্তরে প্রকাণ্ড খাল। খালে জলো ঘাস দেখে চটান বলে মনে হয়। আঁধারে সাপখোপ, শেয়াল—খটাশ জলো ঘাসের ভিতর দিয়ে শেঠদের ভাঙা পাঁচিলের অন্যপাশে উঠে রাতের কান্না কাঁদে। হঠাৎ শুনলে মনে হবে অনেকগুলো পুরোনো আমলের প্রেতাত্মা হাল আমলের নসিব দেখে কেঁদে তামাশা দেখাচ্ছে। অথবা কেঁদে—কেটে অস্থির হচ্ছে।

খালের পাড় ধরে পায়ে—চলা সংকীর্ণ পথ। ফণীমনসার কাঁটা পথের দুপাশে। রাতের শিশিরে ওরা ভিজছে। এবং এটাই ফরাসডাঙার পশ্চিম সীমানা। দক্ষিণে শহর, উত্তরপ্রান্তে ঝিল। পুবে রেল লাইন। ইতস্তত আম—কাঁঠালের গাছ সব—অন্ধকারে তারা আচ্ছন্ন, ঝিমুচ্ছে।

নিচে নামার আগে হারিকেনের পলতেটা একটু উসকে দিল। এখানে হারিকেনের আলোটা যত জোরেই জ্বলুক না কেন—কৈলাস পরিতৃপ্ত হয় না। সে যতটা পারল আলোটা বাড়িয়ে দিল। এখানে ওর কেবলই

মনে হয়—সে কালকেউটে কিংবা পদ্মনাগিনীর ওপর এই বুঝি পা—টা চাপা দিল। মনে হয় এই বুঝি ওরা কামড়ে দিল।

দূরে জল—কলের আলোটা ঝোপের আড়ালে এখনও যেন দাঁত বের করে হাসছে। ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে ভাঙা কাঁসরের শব্দ উঠছে ঝিঁঝি পোকার। ঝোপে—জঙ্গলে জোনাকি উড়ছে। ওরা ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে ছিটকে পড়ছে এবং এই ফরাসডাঙার জঙ্গলকে যেন চিতার আগুন করে রেখেছে। কৈলাস সেই সময় হেঁকে উঠল, ওস্তাদ গুরুর দোহাই, মা মনসার দোহাই, শিবরাজের দোহাই—দোহাই ধন্বন্তরি ওঝার!

পিছনে গেরু হাতের বল্লম উঁচিয়ে বলল, কী হল রে বাপ?

গেরুর মুখের কাছে হারিকেন তুলে বলল কৈলাস, মা মনসার বাহন। গন্ধ পেইছিস না? ঢেঁকুর তুলে গন্ধ দিল। ঝোপে—ঝাড়ে কোথাও লুকিয়ে রইল লিশ্চয়।

ওরা দুধারে নজর রেখে চলেছে তখন। ঝোপ—ঝাড়ের নিচে বল্লম ঢুকিয়ে খুঁজে খুঁজে দেখছে—মরা মানুষটাকে কোথায় মাটি চাপা দিয়েছে। মাঝে মাঝে কৈলাস শ্বাস টানছে জোরে। গন্ধ নিচ্ছে এবং পরীক্ষা করছে শরীরটা মাটির নিচে পচে কোনো গন্ধ তুলছে কিনা!

শালারা। কৈলাস বিড়বিড় করে খিস্তি করল। —কোথায় রেখে গেল মড়াটা! পুঁতল কোন মাটির নিচে? ক্যাবলারা!

গেরু কাঁধের ভাঁড় হাতে নামাল। তারপর সেও বাপের অনুকরণ করে হাতের বল্লমটা জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিল। দেখলে বেওয়ারিশ মড়াটাকে কোথায় কোন জঙ্গলে ফেলে গেছে।

রেললাইনের ওপাশ থেকে কতক জাফরানি রঙের আলো পাতার অন্ধকার চিরে ওদের শরীরের ওপর পড়ছে সেই সময়। চাঁদের মরা মুখটা দেখার জন্য কৈলাস ঝোপের ভিতর থেকে উঁকি মারল। গেরু তখন বলল, কী দেখছিস বাপ? কৈলাস গেরুর কথার জবাব দিল না। সে ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে আর ফোঁসফোঁস করে উঠছে। বলছে—শালারা! কোন তেপান্তরে পুঁতে গেলি রে শালারা! খটাশ—শেয়ালের খাবার করে দিলি!

রেল—সীমানার শেষে আকাশ, চাঁদ এবং গ্রহ—নক্ষত্রের ছবিটা সহসা ভালো লাগল গেরুর। বুঝি নেলির মুখ মনে পড়ল। নেলির মুখটা দেখতে দেখতে পাঁশুটে হয়ে গেল। মরা মানুষের মুখের রঙের মতো। সুতরাং গোমানির মেয়েটাও মরবে একদিন। তখন পুঁতে পচাবে কী ঘাটের আগুন জ্বালাবে, আজ যেন ঠিক করতে পারছে না। মেয়েটা হয়তো বাপের সঙ্গে এখন মাচানে ঘুমাচ্ছে। অথবা ভাঙা চালের ফাঁকে আকাশ দেখছে। নেলির এ সময় এ মুখ বড় অদ্ভুত। ভয়ানক বিস্ময়ের। গেরুর মনে এ—সময় সুখ জাগে। নেলিকে নিয়ে ঘাটের আঁধারে নামার শখ হয় তখন। বেয়াড়া রকমের একটা ইচ্ছা ওকে কেবল তাড়না করে মারে।

কৈলাস তখন হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। সে শুনল—সে শুনতে পাচ্ছে। শেয়াল—খটাশের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। ওরা কোথাও যেন মড়ার শরীরটা চুষে খাওয়ার জন্য নিজেরা ফাটাফাটি করছে। কৈলাস ছুটল। সে পাগলের মতো ছুটছে। ওর ভয়ে দুটো শেয়াল ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে চলে গেল। গেরু বাপের পিছনে ধাওয়া করছে। কিন্তু খালে নামতে গিয়ে গেরু আর নামতে পারছে না। কারা যেন ওর আশেপাশে গোঙাচ্ছে। কারা যেন ওর আশেপাশে ফিসফিস করে কথা বলছে। শেঠদের ভাঙা পাঁচিলের ওপাশে কারা যেন দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অথবা দূরে ভাঙা কুঠিবাড়িতে কেউ গলা টিপে মানুষ হত্যা করছে। গেরুর চুলগুলো ভয়ে শক্ত হয়ে গেল। সে থামল। সে দাঁড়াল। সে চলতে পারছে না। আর সেই দেখে কৈলাস খিস্তি করল, হ্যাঁ রে বেটা, তুরে তো হাম বহুত দফে বলিয়েছে, জীনপুরী, সাপখোপ, ভূত—পেঁত কেহো তুর গা ছুঁতে লারবে। তুর দেহবন্ধন করে দিছি যোগ। তারপর কাছে গিয়ে ওর শরীর ঝাঁকিয়ে বলল, ওগুলো মানুষের ডাক লয়, ভূত হয়, ওগুলো পেঁচার, শেয়াল—খটাশের জাত। তু হেঁটে আয়। জলদি আয়।

গেরু কিছু বললে না। বাপ যেন ওর ওপর তন্তর—মন্তর করল। বাপ যেন ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে সামনে এগিয়ে যেতে থাকল। হারিকেনের ফ্যাকাশে আলোতে শেঠদের ভাঙা পাঁচিল, ভাঙা কুঠি সব এখান থেকে সে দেখতে পাচ্ছে। সে ভয়ে ভয়ে কৈলাসকে বলল লক্ষ্মীপেঁচা না কালপেঁচা বাপ?

হবে একটা। তু চল। পথ চল। শেষে কী ভেবে সে নিজেই হারিকেনটা নিয়ে ছুটতে থাকল এবং বলতে থাকল, গেরু ছুটে আয় বাপ, জলদি আয়। জলদি পা চালা। সর্বনাশ করে লিল রে, সর্বনাশ করে লিল। — শালারা! ভয়ে গেরুর হাত থেকে বল্লমটা খসে পড়ল। কোনোরকমে গোঙাতে গোঙাতে সে বলল, কী হল রে বাপ! কিছু দেখে লিলি রে? জীনপরী, সাপখোপ কিছু? হায়, হায়, কিছু দেখে লিলি রে? কিন্তু কৈলাসকে দূরে চলে যেতে দেখে ওর ভয় আরও বাড়ল। বাপের কোনো জবাব না পেয়ে ওর পা দুটো যেন খালের কাদায় ডুবে যাচ্ছে। সে যেন ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে বলল, বাপ, হামার পা চলতে লারছে।

না চলুক। মর শালা। বেটা কেবল ভয়ে মরে গ। কৈলাস এই সব কথা বলতে বলতে পোড়োবাড়িটার দিকে ছুটছে। হাতে ওর হারিকেনটা তেমনি দুলচে। মদের ভাঁড়াটা টলছে। বল্লমটা ঢেউ খেলিয়ে চলছে বাতাসের ভেতর। একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, হে—রে, শুনতে লারছিল, শেয়াল—খটাশগুলো বনকাঁঠালের ঝোপে কেমন দুশমনি করছে। লিশ্চয় মানুষটাকে ওখানে পুঁতল। তু আয়, পা চালিয়ে আয়, লয়তো শেয়াল—খটাশ ভাগ বসাবে।

শেয়াল—খটাশ ভাগ বসাব এ ঠিক নয় গেরু বোঝে। আর এও বুঝতে শিখেছে কঙ্কালটা ঘরে অক্ষত নিতে পারলে দাম ওর অনেক হবে। সে তাই মাটি থেকে বল্লমটা কুড়িয়ে পোড়োবাড়িটার দিকে ছুটছে। খালের মাটি ওর আর পা টেনে ধরছে না। সে পোড়োবাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে চলছে। জাফরিকাটা সব বন—লতার জঙ্গল ডিঙিয়ে কৈলাসকে অনুসরণ করছে। কিন্তু পোড়োবাড়িটার কাছে আসতেই এবং কবরের নিচে মরা মানুষটার ছবি ভাবতেই শরীরটা শিউরে উঠল। মাথার চুলগুলো শজারু—কাঁটার মতো আকাশমুখো হয়ে দাঁড়াল। ভয়ে বিস্ময়ে হাতের বল্লমটা বাতাসে উঁচিয়ে চিৎকার করে বাপের মতো বলে উঠল, ওস্তাদ গুরুর দোহাই! এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সব ভয়টা ওর কেটে গেছে। সে এই জঙ্গলের মানুষ হয়ে গেছে। অথবা মড়া খোঁজার মানুষ হয়ে গেছে। সে নির্ভয় হতে পেরে বলে উঠল, বাপ হাম তো তুর মতো হ গেলাম। কোনো ভয়—ডর আওর না থাকল।

শেয়াল—খটাশগুলো মানুষের শব্দ পেয়ে সরে গেছে। এইবার গেরু আর কৈলাস কবরের ঝুরঝুরে মাটির বুকে উপুড় হয়ে পড়ল এবং অনেকগুলো আঁচড় দেখল। শেয়াল—খটাশের এইমাত্র দুশমনি করে সরে যাওয়ার চিহ্ন দেখল। আর কিছু সময় মাটি সরাতে পারলে মরা মানুষটার দুটো পা উপরে উঠে আসতে পারত। তার আগেই চটানের মানুষ হাজির। কৈলাস লোভে পড়ে গিয়ে বলল, মাটি তুলে দেখবি নাকি রে তু, লাশটার বত্তিশটা দাঁত থাকল কী থাকল না। খুঁড়ে একবার দেখলে হয়।

বনকাঁঠালের ঝোপে দাঁড়িয়ে সুখী কৈলাস হিহি করে হেসে ছিল। হাসবার সময় দুটো দাঁতের ফাঁক দিয়ে লালা ঝরল। সে ঢুলতে ঢুলতে বলল, শেয়াল—খটাশ লাগাল পেল না রে মড়াটার। মড়ার খবর ওরা জানতি না জানতি হামি তু দো শেয়াল হাজির হ গেলাম। সে হাসতে হাসতে কথাগুলো বলল। যখন সে কথা বন্ধ করল তখন শুনল গেরু, পোড়োবাড়িতেও কারা যেন কৈলাসের মতো হিহি করে হাসছে। হেসে তামাশা করছে ওদের সঙ্গে। কৈলাস ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গেরুকে বুকের কাছে টেনে আনল। এবং বলল, ডর কীসের রে বাপ! তু আর হামি আছে, বাপ—বেটে আছে, তবে আর ডর কীসের? ভূত—পেঁত, পির—পরির নজর, মড়ার হজমি সব আছে তোর বাপের কাছে। তারপর গেরুকে আরও বুকের কাছে চেপে বলল, তুর কোনো ডর থাকার কথা লয়।

কৈলাস গেরুকে কবরের পাশে বসিয়ে বলল, এ কাম করে খেতে পারলে চটানে তুকে ভুখা থাকতে হবে না। জগুবাজারের হিল্টন কোম্পানির বাবু থাকলেন, আর থাকল মুর্দার হদিস। এমনকি বাপ তুর মর যায় তো বাপের কঙ্কাল ভি বিচতে পারবি। বিচে পয়সা কামাতে পারবি।

কোমর থেকে পুঁটুলি খুলে কবরের পাশে রাখল কৈলাস। মদ খাওয়ার ছোট ভাঁড়টা পাশে রাখল। মুখ ঘুরিয়ে গেরুকে দেখে নিজের চোখ দুটোকে ফের টান টান করল।

গেরু মদের ভাঁড়টা বাপের কাছে এগিয়ে দিল। কৈলাস দু গেলাস মদ ঢেলে দিল। প্রথমে নিজে খেল, পরে গেরুকে এক গেলাস মদ ঢেলে দিল। পুঁটলিটা খুলে কিছু চালভাজা খেল, কিছু কাঁচা পেঁয়াজের কুচি, কিছু কাঁচা লংকার কুচি খেল। ফের মদ খেল। মদ খেয়ে শরীরে রস জমাতে চাইল। শরীরে আসক আনতে চাইল মুর্দা পাহারা দেওয়ার জন্য। দুহাতের ওপর শরীরে ভর দিয়ে কৈলাস বলল, খুদে দেখবি লাকি রে তু, লাশটার বত্তিশটা দাঁত থাকল কী থাকল না। খুদে একবার দেখলে চলত।

কৈলাস বল্লমটা হাতে নিয়ে তিনবার পাক খেল কবরটার চারপাশে। সে মড়াটাকে মন্তর—তন্তর দিয়ে বাঁধল। মড়াটার ভিতর আর শয়তান ঢুকতে পারবে না। সে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে থাকল এবং থুতু ছিটাতে থাকল কবরটার ওপর। শেষে নিজের বুকের ওপর একদলা থুতু দিয়ে বুকটা মালিশ করে দিল। গেরুর মুখেও মালিশ দিয়ে সে বল্লমটা নিয়ে মাটিতে খুঁড়তে বসল। কবর খুঁড়ে মড়ার মুখ দেখার ইচ্ছে। মড়ার বত্রিশটা দাঁত দেখার ইচ্ছে!

এই আঁধারে, ঝোপ—জঙ্গলের নিঃসঙ্গতায়, হারিকেনের অস্বচ্ছ আলোয় কৈলাসকে পৃথিবীর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। বাপের শয়তানের মস্ত মুখটা দেখে গেরুর ফের ভয় ধরেছে। শয়তানটা মড়ার ওপর ভর না করে বাপের ওপর যেন ভর করেছে। কিংবা এতক্ষণ তন্ত্র—মন্ত্র পড়ে শয়তানকে নিজের কাঁধেই ভর করিয়েছে যেন।

গেরুর এ সময় ইচ্ছে ঝোপ—জঙ্গল ভেঙে চটানের দিকে ছুটতে। ইচ্ছে হচ্ছে বাপকে একা ফেলে অন্য কোথাও চলে যায়। সে এতদিন শুনে শুনে ভেবেছিল খুব সহজ, ভেবেছিল বাপের মতো সে—ও মরদের বাচ্চা, তখন ভয় থাকার কথা নয়। কিন্তু এইসব দেখে ওর মনে হল, শয়তানের রাজত্বে চলে এসেছে! বাপ এখানে শয়তানের বান্দা সেজেছে। যেন বাপ ষড়যন্ত্র করে ওকেও খুন করতে এনেছে এ জঙ্গলে। সে উঠে ছুটতে যাবে এমন সময় দেখল কৈলাস পিছন থেকে ওকে ধরে রেখেছে। —ভয় না পাস বাপ, ভয় না মান। কৈলাস গেরুকে টেনে বসাল। গেরু বাপের হাতে কলে—পড়া ইঁদুরের মতো হয়ে বাপের পাশে বসে পড়ল।

কবরের ওপর মাটির ডেলা ডেলা চাঙড়। সুতরাং আপাতত সেগুলো না খুঁড়লেও চলে। গেরু একটা একটা করে মাটির ডেলা তুলতে থাকল। কৈলাসের ধমকে গেরুর হুঁশ হল। —হে রে বেটা, বুকের মাটি ফেলছিস ক্যানে? তু কী লাশটার বুক দেখবি?

অনেকক্ষণ পর কৈলাস হাত দুই নীচে মড়ার মাথাটা পেল। কৈলাস নীচে হাত বাড়িয়ে দিল। এবং বলল, শালার সময় অসময় লাইক! ঢুকুস—ঢুকুস কেবল মদ গিলছে।

ঘাড় কাত করে গেরু জবাব দিল, খবরদার বাপ, তু হামারে শালা শালা বুলবি না। সড়কির ঘায় তর পেট ফুঁসে দেব।

অন্য সময় হলে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যেত—কিন্তু এখন কৈলাসের সে সব হচ্ছে না। এখন কৈলাসের দক্ষযজ্ঞ করার মতো ফুরসত কম—হে রে বেটা দেখ, আলোটা লিয়ে এসে দেখ, মানুষটা মেয়েমানুষ রে! লাকে ওয়ার লাকছাঁবি আছে।

গর্তের ভিতর কৈলাসের হাতটা তখনও ঢোকানোই আছে। তখনও কৈলাস আন্দাজে ভারী ভারী ঠোঁটের ভিতর দাঁত গুণছে। দাঁত বত্রিশটা থাকল কী থাকল না দেখছে। যখন দেখল বত্রিশটা দাঁতই আছে তখন খুশি খুশি হয়ে বলল, দাঁতগুলো সবই ঠিক আছে রে বেটা।

কৈলাস হাতটা তুলে আনলে গেরু হারিকেনের আলো গর্তের ভিতর নামিয়ে দিল। অনেকক্ষণ ধরে মড়াটা দেখল। দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। মেয়েমানুষটার মুখে মাটি পড়ে ঠোঁট দুটোর রঙ ধূসর। ঠোঁটগুলো পটলের মতো ফুলে উঠেছে। ডাইনে নাকটা ঝুলে আছে। চোখ দুটো ফেটে গেছে। দাঁতগুলো অত্যন্ত উঁচু উঁচু

দেখাচ্ছে। যেন জীবন্ত কঙ্কাল হয়ে আছে মেয়েমানুষটা। গেরু ভয়ে শেষ পর্যন্ত মুখটা তুলে আনলে। সেই সঙ্গে একটা মুখের রঙও উঠে এল। সে মুখ নেলির। গেরুর ভয়ানক কষ্ট হতে থাকল।

মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে গেরুর। ওর ভালো লাগছে না, ভালো লাগছে না এসব। বাপ দু হাতের ওপর ভর দিয়ে দুলছে তো দুলছেই। একটা রাতের পোকা কৈলাসের ঠোঁট বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠছে। সে মুখের ওপর হাত লপটাচ্ছে অথচ পোকাটাকে ধরতে পারছে না। পোকাটা ছুটছে। কৈলাসের হাত কাঁপছে। সে তবু ধরতে পারল না। পোকাটা কানের পাশ দিয়ে পিঠে নেমে যাচ্ছে। সে এবার উঠে দাঁড়াল। ধেইধেই করে ঘুরপাক খাচ্ছে। পিঠের পোকা তাড়াতে চাইছে। তখন চোখের ওপর আকাশের তারাগুলো নাচছে মনে হল অথবা নাচের আগে তাল ঠুকছে মনে হল। নেশায় বুঁদ হয়ে বললে, হে রে, অমন না হলে তেমন হয়। বঙ্গালী বাবুরা কেমন কথা বুলে দেখতে লারিস? তবে হা, মেয়েমানুষটা কম বয়সের হলে কেমন হত রে গেরু বেটা শালা হামার! কৈলাস এই সব বলে উপুড় হয়ে পড়ল কবরটার ওপর। দুহাতে পাশের মাটিগুলো টেনে কবরের মুখটা ভরে দিয়ে চালভাজার পুঁটলিটা টেনে নিল। হাঁফ ছাড়ল আবার। হাঁফের টান তুলল আগের মতো। এবং কিছুক্ষণ দু ঠ্যাঙের ভিতর মুখ গুঁজে পড়ে থেকে বললে, খা, খেয়ে লে। খেয়ে খেয়ে পেট ভার কর শালা। জেরাসে ঘুমিয়ে লে। তুর বাপ কৈলাস পাহারায় থাক।

প্রায় বেশি রাতটুকু পাহারা দেবে কৈলাস। শেষরাতে গেরু। বন—কাঁঠালের শেকড়ের মাথাটা এলিয়ে দিল গেরু। ঘুমোতে চাইল। জোনাকিরা জ্বলছে। মশার কামড়ে ঘুম আসছে না। পাশে কবরটা। মেয়েমানুষটা সেখানে পচছে। মুখটা মনে পড়ছে গেরুর। যত মনে পড়ছে তত বিরক্তি বাড়ছে ওর? এককালে মেয়েমানুষটা বেঁচে ছিল। এককালে নেলির মতো হয়তো বা খুবসুরত ছিল। সব ছিল, সব ছিল মেয়েটার। নেলির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলত, কাপড় খসে পড়ত বুক থেকে—পাড়া—পড়শীরা দেখত ঢিকঢিক করে। যেমন করে রামকান্ত নেলিকে দেখে বেড়াচ্ছে।

গেরু চটানের কথা ভাবল বনকাঁঠালের শেকড়ে মাথা রেখে। ঘাটোয়ারিবাবুর কথা মনে হল। সেই যে কবে কালো বার্নিশ চেয়ারে বসেছেন, আজও বসে আছেন। মড়ার হিসাব রাখছেন কেবল—রসিদ দিচ্ছেন মরা মানুষের। দুখিয়া আর ওর বৌ চিরদিন ঘাটের ডাক নিয়ে কেবল মারধোর করেই গেল।

বে—ইজ্জতি লোক রামকান্ত। বড় বে—সরম। সুদে টাকা দেয় চটানে। বদলে সে চটান থেকে সুদ সহ অনেক কিছু নেয়। সে ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করছে চটানের। সর্দার একবার চোখ খুলে পর্যন্ত দেখে না। সর্দার পর্যন্ত বে—এক্তিয়ার হয়ে পড়ল। একমাত্র নেলিকেই বুঝি এতদিন পাহারা দিয়ে সে ঠিক রাখতে পেরেছে। এ—ব্যাপারে গোমানি খুব হুঁশিয়ার—কিন্তু লোকটা মদ গিলে যেভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে, আর—ঘরে খাবার না রেখে রেখে মেয়েটার ওপর যে অত্যাচার করে, তাতে মনে হয় নেলিকেও বুঝি চটানের বে—ইজ্জতি জীবনটা ধীরে ধীরে নিচে টানবে।

গেরু ভালো করে চোখ বুজল। ঘুমনোর জন্য চোখ বুজল। কবরের নিচে মেয়েমানুষটার মতো শক্ত হয়ে শুলো না, একটু ঘাড় কাত করে, কিছুটা ডানপাশ হয়ে শুতে চাইল। কিন্তু সেই চোখে নেলি কেবল উঁকি মারছে। নেলির মাচান, ওর ভাঙা ঘর, এ শয়তানের রাজত্বে ওকে বিব্রত করে মারছে।

কৈলাসও শুয়ে আছে। গোসাপের মতো হাত—পায়ের ওপর ভর করে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে গোসাপের মতো মাথাটাকে একবার পূর্ব, একবার পশ্চিম করছে। মাঝে মাঝে পচাই ঢেলে পচাই খাচ্ছে। কতকগুলো রাতের পোকা উড়ছে ওর মুখের চারধারে। ভাঁড় থেকে কিছু পচাই গড়িয়ে কবর ভিজছে। কৈলাস ভাবল মাটির নিচে মেয়েটার পচাই খেতে শখ জাগছে, সেজন্য এক গেলাস মদ মাটির ওপর ঢেলে দিল। এবং এক সময় যখন বুঝতে পারল শরীরটা মদের নেশায় খুবই টলছে, খুবই অসহায় হয়ে উঠেছে তখন বল্লমটা সে আরও শক্ত করে ধরল। দু আঙুলে একটা চোখ ফাঁক করে রেখে জেগে থাকার চেষ্টা করল, জেগে থেকে শেয়াল—খটাশ পাহারা দিল।

রাত যত বাড়ছে, হারিকেনের আলো তত কমে আসছে। শেষ পর্যন্ত হারিকেনটা নিভে গেল। অন্ধকারে কৈলাস চোখ পরিষ্কার করল। চোখ মুখ ঘষল। অন্ধকারকে ভালো করে দেখার ইচ্ছা। এবং শয়তানের রাজত্বে এই অন্ধকারটাকেই কৈলাসের যত অবিশ্বাস। বাধ্য হয়েই চোখ দুটো এ সময় যেন স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। অন্ধকারে সে ঠিক চিনতে পারে—কোন ঝোপে কোনো শেয়াল উঁকি মেরে আছে।

কিছু দূরে কৈলাস কোনো জন্তুর আওয়াজ শুনতে পেল। গোসাপের মতো শরীরটাকে তুলে দিল কৈলাস। কিছু দূরে পাতা খস—খস করছে। গোসাপের মতো শরীরটা টেনে চলতে চাইল সে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে কীসের আওয়াজ, কোনদিক থেকে আওয়াজটা আসছে, কতদূর পর্যন্ত যাবে।

আওয়াজটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। বনবেড়ালটা শুকনো পাতার ওপর পা ফেলে ক্রমশ কবরটার দিকে এগিয়ে আসছে। ঝোপের আড়ালে কৈলাসের চোখ দুটো জ্বলছে। বল্লমটা হাতে শক্ত হয়ে উঠছে। সে বল্লম টেনে বলল আ যাও মিঞা, আ যাও। আ যাও বেটা, খুশিসে আ যাও। তুমকো হাম তো পিয়ার করেঙ্গে দোস্ত, জরুর করেঙ্গে। তারপর একসময় বল্লমটা ছুঁড়ে দিয়ে খিস্তি করল—শালাসকল! কৈলাস জন্মেছে ডোমের চটানে, তুই বেটা বনবাদাড়ে—তফাত কত বুঝলি না! আঁধার রাতে চুপি—চুপি হাতসাফাই চালাতে এলি!

মাটির বুক হেঁচড়ে দু কদম সামনে এগিয়ে গেল কৈলাস। বলল, সামনের ঝোপটাকে উদ্দেশ করে, হে রে বেটা থামলি কেনে? কৈলাসকে ডরে ধরেছে? ও কিছু লয়, কিছু লয়। ওয়ার বুড়ো জান, লুট করে পড়লে খুট করে মরবে। ওয়ার ডর কীসের! আ যাও মিঞা!

এই সব বলতে বলতে নেশার ঘোরে কিছুক্ষণ কাঁদল কৈলাস। চটানের যত শোকের কথা মনে করে সে কাঁদতে থাকল। আবার নেশার ঘোরে সে খিলখিল করে হাসল। তখন চটানের যত সুখের কথা ওর মনে হল। জঙ্গলের জানোয়ারগুলো তখন পোড়োবাড়িটার পাঁচিল ঘেঁষে শিমুল গাছটার নিচে এসে থেমে গেছে। কৈলাস যতই শোক করুক কিংবা আনন্দ করুক, ওর চোখ সেখানে। সেজন্য অনেকগুলো চোখ শয়তানের রাজত্বে চারপাশে জ্বলছে।

হাঁটুর ওপর হামাগুড়ি দিয়ে সে সামনের ঝোপটায় ঢুকে পড়ল। সে বল্লমটা খুঁজছে। বল্লমটা খুঁজতে গিয়ে সে ঝোপের আরও ভিতরে ঢুকে গেল। সে অনেকক্ষণ খুঁজে, হাতড়িয়ে বল্লমটা বের করল। তারপর শিমুলের নীচে সেই সব চোখকে উদ্দেশ করে বলতে থাকল, রাজাবালা পাহাড়ে রাত কাটালাম, মুনমুন কাঠের লাগি ঘুরে মরেছি গারো পাহাড়ে, তুলোর পাহাড় দেখে লিয়েছি শ্বেত—শিমুলের গাছ, আর তু হামারে কী ভয় দেখাবি রে বেটা! লক্ষ্মীর মতো চুপ চুপ চলে যা। সরমকী বাত কী আছে এতে? গেরু কী দেখতে পেল—না তুদের দশটা জাতভাই দেখে ফেলেছে?

তা যাবি না, না যাস ভালো। তুকে হাম কিছু বুলবে না, তু ভি হামারে কিছু বুলবি না। বেশ দুজনে ভাব করে লিব। তুর সীমানায় তু, হামার সীমানায় হামি আছে, কোনো হামলা—মামলার কারবার নেই। লেকিন জায়দা বাত হবে তো হেকড় খাবি সড়কির। এই সব বলতে বলতে ক—কদম পিছনে সরে বসল। সে এই সব বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিছুটা। সে ঘুমে ঢুলছে। তবু কবরের ওপর জেগে বসে থাকল। কবরের ওপর জেগে পাহারা দিচ্ছে। শেয়াল—খটাশের সঙ্গে টানাটানি করতে হবে মড়া নিয়ে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে তো সব গেল। তখন মড়ার সঙ্গে ওর পা ধরেও টানবে বনবাদাড়ের জানোয়ারগুলো। সেজন্য কেবল সে বকছে। বকে বকে জেগে থাকছে।

সে তার অতীত জীবনকে এখন মনে করতে পারছে আর তাকে কেন্দ্র করেই বকে চলেছে। সে বকল—ডিহিবড়া সাপের চেয়ালগা। সুন্দরবইনা বাঘ—বাবুরা বুলেন রুয়েল বেঙ্গল টাইগার, নীলবানরের মাথা, বুনমানুষের হাড়, কুলকুহলীর গাছ, মরদরাজের মূল—এ ছ—দফের রেণু মিলে কবচ দিলে তার নাম মহাশক্তি কবচবাণ। গুণ আছে বহুত পেকারের—যে আদমি বিছানা খারাপ করে, যার গিটা বাত আছে, আস্বপ্ন—কুস্বপ্ন দেখে, যার বাদী—দুশমন—শত্রু আছে—বাণ মারে, বন্ধন করে, তার লাগি এই কবচবাণ।

বড় সামান্য দাম আছে—মাত্তর সওয়া পাঁচ আনা দাম। খুব বেশি দাম লয়, ঘাটে পথে, দোকানে দুশমনে কত পয়সা যায়—মাত্তর সওয়া পাঁচ আনা। এর শক্তি বাবু লোকদের সব আপদ—বিপদে আসান দেবে। কিন্তু তবু ঘুম পায় কৈলাসের। সড়কির ওপর ভর করে দাঁড়াল।

সে জঙ্গলের ভিতর শব্দ শুনতে পাচ্ছে আবার। জঙ্গলের ভিতর জানোয়ারগুলো ঝগড়া বাধিয়েছে। কৈলাস পোড়ো বাড়িটার দিকে পা বাড়াল। হাতের ওপর বল্লমটা উঁচু করে বলল, খবরদার! মুর্দার পানে তুগো এমন খটাশের মতো নজর ক্যান? যা ভাগ, জঙ্গলের ছা জঙ্গলে পালা।

কৈলাস এ—সময় শুনল কারা যেন ছুটে গিয়ে পোড়োবাড়িটাতে উঠেছে। কারা যেন ছুটে গিয়ে পোড়োবাড়িটার চারপাশে নৃত্য আরম্ভ করেছে। এইসব শুনে এবং ভেবে কৈলাস খুব অসহায় ভেবেছে নিজেকে। এইসব শব্দ এবং চিৎকার যেন সে প্রথম শুনছে। অথচ কৈলাসের এমন হয় না। কৈলাস তো কোনোদিন এমনভাবে ভেঙে পড়েনি। সে এই ফরাসডাঙায় একা এসেছে, এক মুর্দা পাহারা দিয়েছে, জল ঢেলেছে এবং একা লাশটার বত্রিশটা দাঁত গুনে গুনে কঙ্কালের সঙ্গে গামছায় তুলে বেঁধেছে, অথচ সে ওর কবচওবচের জন্য, দ্রব্যগুণের জন্য এইসব পির—পরিদের এতটুকু পাত্তা দেয়নি। ওরা পোড়োবাড়িটাতে একবার হাসলে সে হাসত দুবার। সে ওদের ব্যঙ্গ করত। বিদ্রুপ করত। সেই কৈলাস এখন ডাকছে—গেরু ঘুমিয়ে গেলি?

ঘুমে অবশ গেরু কোনোরকমে উত্তর করল, হামারে ডাকছিস বাপ?

শুনে লে তো কারা যেন হাসি—মস্করা করছে।

কৈ শুনতে লারছি। কেবল তো শিয়াল ডাকছে।

থাক, তু ঘুম যা। শালা কানটাই হামার কম শোনে।

খুঁজে খুঁজে এক সময় বল্লমটা তুলে আনল পাশের জঙ্গল থেকে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল কবরটার পাশে। কোনো আওয়াজ শুনেই সে আর উঠল না। সে আর উঠবে না, যতক্ষণ না ভোর হয়, যতক্ষণ না জানোয়ারগুলি ফের হামলা করতে আসে। সে বসে থাকল এবং বসে বসেই চিৎকার করল, হে—ই—উ, হে—ই—উ। কবরটায় বল্লমটা দিয়ে জোরে জোরে বাড়ি মারল। ভয়ে জানোয়ারগুলো এদিকে আর আসছে না।

শেষরাতের দিকে উঠে গেরুকে ডেকে বলল, তু এবার উঠে বস। হামি পানি লিয়ে আসি ক হাঁড়ি। পানি ঢালতে হবে কবরে।

ক হাঁড়ি জল এনে কবরে ঢালল কৈলাস। জলে মাটিটা এবং মাটির নীচে লাশটাকে পর্যন্ত ভিজিয়ে দিল। জল পেয়ে এবার লাশটা জলদি ফুলে ফেঁপে উঠবে। যত জলদি ফুলে ফেঁপে উঠবে, তত জলদি সে কঙ্কালটা ঘরে নিয়ে তুলতে পারবে। সে জল ঢেলে বলল, এবার হামি ঘুম যাই, তু জেগে পাহারায় থাক।

গেরুকে পাহারা রাখার সময় কৈলাস স্মরণ করিয়ে দিল, দুনিয়ার ভয়—বিস্ময়ের কিছু নাই। —তু তো রাজা রে, রাজার বেটা রাজা। কেউ তুর সঙ্গে বাদী দুশমনি করতে লারবে। তুর বাপ তুকে তিনটে কবচ দিল কত তন্ত্র করে। এ মন্ত্রের কারবার লয়। এ গাছ—গাছালির গুণ জুড়িবুটির কারবার। আমি মরলে তুকে একলা ফরাসডাঙায় আসতে হবে, তখন তু কেবল তিনটে কবচের স্মরণ লিবি। ভয়—বিস্ময় তুর কিছু থাকতে লারবে।

কৈলাস কয়েকটা ডাল কেটে এনে কবরটা ভালো করে ঢেকে দিল। শেয়াল—খটাশের দুশমনি থেকে দিনের আলোয় কবরটাকে রক্ষা করল।

কৈলাস এক সময় রাস্তায় বলল গেরুকে, কী রে ভয় ধরেছিল রাতে?

গেরু ভোরের দুনিয়ার রঙ মেখে বলল, না, ডরে ধরেনি। ওরা দুজন তখন চটানের দিকে যাচ্ছে।

শীতের উত্তুরে হাওয়া আজ আর নেই। তাজা চিতাটার পাশে একদল লোক একটা মড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে। ঘন কুয়াশার ভিতর ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুখিয়া। ঘাটোয়ারিবাবু গঙ্গায় স্নান সেরে জপতপ করতে করতে ফিরছেন। কতকগুলো কুকুর চালাঘরটার পাশে পড়ে থেকে রোদের উত্তাপ নিচ্ছে। অন্য পারে যুবতী মেয়েরা ঘাটে কাপড় কাচছে, কাপড়—কাচার শব্দ ওপারে ঠুকঠুক করে প্রতিশব্দ তুলছে। দূরে শীতের গঙ্গায় পুল উঠছে। ওপারে ট্রেনের শব্দ। রিকশার ভিড়। যাত্রীরা সব নেমে আসছে। সেসময় গেরু অনর্থক বল্লমটা চালাঘরটায় ছুঁড়ে দিল। কুকুরগুলো ভয়ে চিৎকার করে উঠল। ওরা ভয়ে ছুটছে বল্লমের তাড়া খেয়ে। ওরা নদীর পাড় ধরে ছুটল। অথচ বেশিদূর যেতে পারছে না। তখন গেরু দেখল কিছু দূরে কুকুরগুলো যে—পথ ধরে উঠে গেল—সেখানে নেলি চুপচাপ বসে আছে। নেলির কাছে গিয়ে বলল গেরু, দেব শালা কুকুরকে আর একটা হেঁকড়।

নেলি উত্তর করছে না। কোনো জবাব দিচ্ছে না। অথবা গেরুর দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল না।

তখন ঝাড়ো ডোম ঘাটে এসে শ্মশানের বাঁশ সংগ্রহ করছে। গেরু হাতে বল্লম দুলিয়ে এখানে হেঁকড়, সেখানে হেঁকড় দিতে দিতে নেলির চারপাশটায় ঘুরছে। লখি, টুনুয়া ঘাটে নেমে এসেছে। ওরা মড়াটাকে উঁকি মেরে দেখছে। মড়ার তোশক—চাদর দেখছে। ওরা তারপর উঠে গেল! নেলিও উঠল। ওদের সঙ্গে সে—ও কাঠ বইবে। গেরু হাতে বল্লম দুলিয়ে এখানে হেঁকড় সেখানে হেঁকড় মারতে মারতে নেলির পিছু পিছু হাঁটছে। নেলির সঙ্গে সে—ও কাঠ বইবে। যে দু—চার পয়সা হবে—নেলিকে সবটা দিয়ে দেবে এমনও ভাবল গেরু। চটানে ওঠার আগে নেলির কানে কানে বলল, ভয়ডরকে জিতে লিচ্ছি। এই মুহূর্তে নেলিকে ফরাসডাঙায় ঘটনার কথা বলে নেলির যুগ্যি মরদ হওয়ার ইচ্ছা। নেলি শুনে যেন ভাবে—মরদ আছে বটে। মরদের মতো মরদ। কিন্তু নেলির বিষণ্ণ মুখ দেখে এবং দুদিনের অভুক্ত শরীরটার দিকে চেয়ে সে কিছু বলতে পারল না। ওরা দুজন চুপচাপ একসঙ্গে চটানে উঠে এল। ঘাটোয়ারিবাবুর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। কখন বাবু ডাকবে, ওরে বাপ, আমার চোদ্দপুরুষের মনিব, গঙ্গাপুত্তুরের দল, একবার একটু ইদিকে আয়। মড়ার দায়টা আমার খালাস কর। ওরা সকলে অপেক্ষা করছে। বাবু ডাকবেন—ওরা যাবে। কাঠ মাপবে, কাঠ নিয়ে ঘাটে নামবে।

ঘাটোয়ারিবাবু এক সময় ডাকলেন, কৈ রে তোরা?

এই যে বাবু আমরা। নেলি জানালার নিচ থেকে উত্তর করল।

কে রে? নেলি!

জি বাবু।

কাল গহনা পেলি?

নেলি উত্তর করছে না।

ভেবেছিস আমি কিছু টের করতে পারি না।

নেলি তখনও কোনো উত্তর করল না।

এই মাগি, কথা বলছিস না কেন? গহনা পেলি?

নেলির ইচ্ছা হল সহসা চিৎকার করে ওঠে—না, না!

চালাঘর থেকে হারিকেন খুলে নিয়ে রাতে তাজা চিতায় পড়ে থাকলি। কিছু হল?

না বাবু, কিচ্ছু হয়নি।

ফের মিথ্যা কথা বলছিস?

না বাবু, কিচ্ছু হয়নি। গঙ্গা মায়ীকি কসম।

ঘাটের কাঠ বয়ে পেট ভরবে?

নেলি এবারেও কোনো জবাব দিল না।

ঘাটোয়ারিবাবু রেগে উঠলেন,—ভেবে রেখেছিস আজও চটানে উপোস দিবি? ও—সব হবে না। এ—চটানে ও—সব হবে না। জিয়াগঞ্জ চলে যেতে বলবি তোর বাপকে। সেখানে গিয়ে যত খুশি উপোস করগে। কেউ কিচ্ছু বলবে না। যাবি। কাল নির্ঘাত চলে যাবি।

নেলি জানালার নীচে দাঁড়িয়ে হাসল। ঘাটোয়ারিবাবু ফের কষ্ট পেতে শুরু করছেন। এবং এই উপযুক্ত সময় ভেবে সে বলল, বাবু......

বল।

বাবু, একটা টাকা ধার দিবি?

আমি তো একটা গাছ—ঝাড়া দিলেই পড়বে।

নেলি সাহস করে আর বলতে পারল না কিছু। যেখানে কাঠ মাপা হচ্ছে সেখানে চলে গেল। গেরুও নেলির সঙ্গে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই বাবু ডাকলেন—তোর বাপ ফরাসডাঙা থেকে ফিরল?

জি ফিরেছে।

ওকে ডেকে দে। কথা আছে।

গেরু ডাকল, বাপ, তু আয়। তুকে ডাকছে বাপ।

দূর থেকে কৈলাস বলল, হামাকে কিছু বুলছেন বাবু?

জি হুজুর, আপনাকে কিছু বুলছি। ঘাটোয়ারিবাবু রাগে এখন বসে বসে হাত কচলাচ্ছেন। তিনি কৈলাসকে বড় বড় চোখে দেখছেন এখন।

জানালার পাশে এসে কৈলাস দাঁড়াল। রাত জেগে ওর চোখ দুটো লাল। চোখ দুটো খুব বসে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকতে ওর কষ্ট হচ্ছে। জানালার ওপর যতটা পারল ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বলল, বুলেন বাবু।

ভিতরে আর হারামজাদা, ভিতরে আয়।

ভিতরে গিয়ে কৈলাস একই কথা বলল, বুলেন বাবু।

বুলেন বাবু! ব্যঙ্গ করলেন তিনি। কী বলব রে বেটা ডোম! তোকে বলবটা কী শুনি? তোকে বললে ব্যবস্থা করতে পারবি? সামলাতে পারবি সব?

কী সামলাব বাবু?

বৌকে সামলাবি। বৌকে সাবধান করে দিবি। সাবধান না করিস তো পুলিশে খবর দেব।

এতক্ষণে কৈলাসের যেন হুঁশ হল। এতক্ষণ কৈলাস খুব ভাবনায় পড়ল। মুখটা ভয়ে খুব শুকিয়ে গেল।

কী হয়েছে মেহেরবানি করে বুলেন বাবু। না বুললে যে কিছুই বুঝতে লারছি।

পারবি, পারবি। সব পারবি। ঠেকায় পড়লে পারবি।

কৈলাস ঘাটোয়ারিবাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। পুলিশকে ওর ভীষণ ভয়। ঘাটোয়ারিবাবু ইচ্ছে করলে যে—কোনো সময় ওকে জেলে ভরে দিতে পারেন। তাই সে কেনা গোলামের মতো বলল, আপনি কিছু করে লিবেন না বাবু! যা করে লিবেন এখানে করে লেন। পুলিশকে খবর দিবেন না বাবু! চটানের মা—বাপ তু আছে।

তোর বৌর জন্য রাতে ঘুমুতে পারিনি রে বেটা ডোম! গোটা রাত দরজায় এসে হামলা করেছে।

কৈলাস এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হল। জবাব দিল খুশি হয়ে—ওঃ, তার লাগি। তা দেব। এয়াকে সাবধান করে জরুর দেব। ও বেটি হারামি আছে বাবু। কথায় বুলে—পুরুষমানুষের ছ গুণ মেয়েমানুষের ল গুণ। বুড়া হাড়ে হামার আর রস নাই বাবু। শালী হামার কেবল রস চিবাতে চায় গ। পায় না তাই এখানে সেখানে ঢুঁড়ে বেড়ায়।

কিন্তু তিনি আর এক ধমক দিলে কৈলাস সুড়সুড় করে চটানে নেমে গেল। কৈলাসের এ—বৌ শেষ বয়সের। তৃতীয় পক্ষের। গেরুর মা নেই সে অনেক কাল। সে স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষের। কৈলাস তার হেকিমি জীবনে বৌটাকে তিন মাসের গেরুর সহ নিকা করেছিল। কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য, দু—বছরও গেল না, বৌটা

পালাল। তারপর অনেক কাল কেটেছে কৈলাসের। তখন স্ত্রী ছিল না, ঘর খালি ছিল। গেরু ছিল একা। পরের বাচ্চাটা নিজের বাচ্চার মতো হয়ে যাচ্ছে। সে বাচ্চাকে সে পুষে পুষে এতদিন বড় করেছে। এবং এ—বৌটা এসেছে কিছুদিন। ইদানীং কৈলাস জোগাড় করেছে। কোত্থেকে, কেমন করে জোগাড় করেছে চটানের মানুষগুলো তার খবর রাখে না। শুধু ওরা এক সন্ধ্যায় দেখেছে কৈলাস কাটোয়া গিয়েছে। তারপর আর এক সন্ধ্যায় দেখেছে, কৈলাস চটানে ফিরেছে। নেশায় বুঁদ হয়ে আছে মানুষটা। একটি মেয়ে ওকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে তুলল। কৈলাসের ঘরে ঢুকল মেয়েটা এবং শেষ পর্যন্ত সেই কৈলাসের বৌ হয়ে চটানে থেকে গেল।

পরদিন ভোরে সকলের দরজায় দরজায় বৌকে নিয়ে ঘুরল কৈলাস। নতুন নিকে—করা বৌকে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ঘাটোয়ারিবাবুর পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল এবং বলেছিল—চটানের মা—বাপ আছে। পেরণাম কর বাবুকে।

অফিসঘরের নিচে নেমে দেখল কৈলাস ডানদিকের চালাঘরটায় ঝাড়ো কতকগুলো বাঁশ নিয়ে ঢুকছে। দুখিয়ার ঘরে মংলি তোশক—লেপ থেকে টেনে টেনে তুলো বের করছে। কাটোয়া থেকে লোক আসার কথা। তোশক—লেপের তুলো, বালিশের তুলো, লোকটা মাথায় করে নিয়ে যাবে। নতুন লেপ হলে কাঁচা টাকায় বিক্রি। মংলি এখন যেন সেই লোকটার অপেক্ষাতেই আছে। কৈলাসকে দেখে মুখটা ফিরিয়ে নিল মংলি। তখন ঝাড়ো বলছে, কিরে কৈলাস, কিছু মিলল?

কৈলাস জবাব দিল না। জবাব দিতে ভালো লাগছে না। সারারাত জেগে শরীর দিচ্ছে না। ইচ্ছে হচ্ছে মাটির উপরই শুয়ে পড়তে। তবু সে যতটা পারল হেঁটে হেঁটে গেল। যাচ্ছে নিজের ঘরটার দিকে। পাশে শুয়োরের খাটাল। বাবুচাঁদ শুয়োর নিয়ে বের হয়ে পড়েছে। গোমানির ঘরে গোমানি উঠেছে। সে বসে বসে খিস্তি করছে। মাচানের নিচে বসে নসিবকে গাল দিচ্ছে। কিন্তু কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। কৈলাসবাবুদের বাড়ির রেডিয়োর বাজনা শুনল। পাঁচিল টপকালেই বাবুদের পাড়া। সব কাক উড়ে গেছে বাবুদের পাড়ায়, শুধু দুটো কাক এখন চটানে পড়ে খুদ—কুঁড়ে খাচ্ছে। ঘাটের কাপড় শরীরে পেঁচিয়ে মংলি তখন ভাঙা আরশিতে রূপ দেখছিল আর কাক তাড়াচ্ছিল উঠোনে। কাটোয়া থেকে লোকটার আসার কথা। আরশিতে মুখ দেখার সময় লোকটার পুষ্ট গোঁফ সে আরশিতে দেখল। দুখিয়ার গোঁফ—দাড়িবিহীন মুখটা নেলির মুখকে কুঁচকে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সেজন্য মংলি এ—চটান ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে চায়। লোকটা কী যেন ইশারা দেয়, আর মংলি তখন আরশিতে কেবল মুখ দেখে।

কৈলাস ঘরে ঢুকে দেখল বৌটা প্রায় উলঙ্গ। মেঝের ওপর বৌটা পড়ে ঘুমোচ্ছে। সে বৌটার পাশে দাঁড়াল। ঘরটার আনাচে—কানাচে চোখ বুলাল একবার। ঘরে সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। হাঁড়ির মুখে ঢাকনা নেই। হাঁড়িতে পান্তাভাত। মালসাটা নিচে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাছিরা হাঁড়ির মুখে উড়ছে বসছে। এ—শীতেও ওরা ভনভন করছে। ঘরের চারিদিকটা কদর্য কুৎসিত হয়ে আছে। নোংরা কাঁথা—কাপড়গুলো মাটিতে পড়ে আছে; কিছু বৌর বুকের কাছে উঠে এসেছে। এমনকি পরনের কাপড়টা পর্যন্ত। এইসব দেখে পিঠে লাথি মারার শখ হল। দাঁত ভেঙে দেওয়ার ইচ্ছা কৈলাসের। সে গেরুর মা—র দাঁত ভেঙেছিল লাথি মেরে। এ বৌর দাঁত কোমর দুই—ই। তবে ঘাটোয়ারিবাবুর দরজায় হামলা করতে পারবে না। রসের জন্য দরজায় দরজায় ভিখ মাংতে হবে না। ঘরে পড়ে থেকে কেবল গোঙাবে। এবং পানি খেতে চাইবে সকলের কাছে।

এই পিঠে লাথি মারতে যতটুকু শক্তির দরকার, কৈলাসের এখন যেন তাও নেই। সে ডাকল, উঠ হারামি, উঠ। পা দিয়ে কৈলাস শরীরটাকে ঠেলতে থাকল। উঠলি না, উঠলি না তু! গোটারাত ঘাটোরিবাবুকে জ্বালিয়ে এখন ঘুম দিয়ে লিচ্ছিস! আচ্ছা মানুষের সাথ তু কারবার করতে গেলি! সরম আসে না তুর! মুখে তু হামার চুন দিলি!

কৈলাস ঘরের কোণায় ঠেস দিয়ে রাখল হাতের সড়কিটা! মদের ভাঁড়টা মাচানের নিচে রেখে দিল। হারিকেনটাও। মাচানে বসে সে বিড়ি ধরাল। বৌটা আড়মোড়া ভেঙে উঠছে। অপমানে ফেটে পড়ছে চোখ দুটো। গরল ওঠার আশঙ্কা! গরলে যেন এখুনি ফেটে পড়বে। কিন্তু কৈলাস শক্ত নজরে চাইতেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে। সেজন্য গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, অথচ কিছু বললে না। এক কোণায় সে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

কৈলাস মাচানে দু ঠ্যাং ছড়িয়ে দিয়ে বলল, দু—ঘটি জল লিয়ে আয় লদী থেকে। হামি চান করে লিব।

মেটে কলসিটা কাঁকে নিয়ে বৌ ফের তাকাল কৈলাসের দিকে। চোখ দুটো দেখে এখন খুব নিরীহ মনে হচ্ছে। মায়া মাখানো মনে হচ্ছে। কে বলবে এ—চোখ দুটোই মাঝে মাঝে আগুন হয়ে ওঠে, সাপের মতো হয়ে ওঠে, কখন ছোবল মারবে কৈলাসকে! তখন কৈলাসকে পর্যন্ত চটান ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। অথচ সেই বৌ কথার জবাব না দিয়ে ঘাটে জল আনতে চলে গেল। এই সব দেখে কৈলাসের খুব মায়া হল বৌটার জন্য। সে ভাবল, ও ঠিকই করেছে। ওয়ার তো ল গুণ। ওয়ার কোন দোষ আছে? মহাশক্তি কোমরবাণ হিম্মত ওয়ার নেই। সে তার কবচের কথা ভাবল। সবই ধাপ্পাবাজী। কৈলাস কিছুকাল থেকে ওর কবচের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে এই ধরনের কথা বলতে শিখেছে। সে একটু কাত হয়ে শুলো। যতক্ষণ বৌটা ঘাট থেকে না ফিরছে, ততক্ষণ শুয়ে থাকা, ততক্ষণ এইসব ভেবে সুখী হওয়া যাক। অথবা জ্বালা থেকে আসান পাওয়ার জন্য যেন সে চোখ বুজল।

কৈলাসের ইচ্ছা নয় গেরু জানুক মহাশক্তি কবচবাণ, মহাশক্তি কোমরবাণ, পুন্নপদের মাদুলিতে কোনো দ্রব্যগুণ নেই। ইচ্ছা নয় এইসব মাদুলির ওপর গেরুর বিশ্বাস ভেঙে যাক। কারণ এ—চটান বড় বেইমান। সহজে সে দু মুঠো কাউকে খেতে দেয় না। কৈলাস মরে গেলে গেরুকেও দেবে না। গেরু না খেতে পেলে ফের চটানে ভুখা থাকতে শুরু করবে। গোমানির বিটির মতো এ—ঘর সে—ঘর করবে। তাই সে মড়ার হাড় খুঁজতে যাওয়ার সময় ওকে সঙ্গে নিয়েছে; দ্রব্যগুণের কথা বলেছে। বলেছে, এ—মাদুলি দেহে ধারণ করলে, পির—পরি, সাপখোপ, জীন—দৈত্য কিছুতে নাকাল করতে পারবে না। বলেছে, ডানপুকুসে টান মারতে পারবে না। কবচের প্রতি গেরুর বিশ্বাসকে অক্ষয় অমর করার জন্য, চটানে দ্বিতীয় পক্ষের বৌটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এমন অনেক মিথ্যা বলেছে, যা সে একদা ওস্তাদ গুরু হারুন রসিদের কাছ থেকে শিখে ভেবেছিল, দুনিয়ার ঈশ্বর যদি সত্যি হয় তবে আল্লার কসম খেয়ে সে বলতে পারে এ জুড়িবুটির মাদুলিও অক্ষয় সত্য। সেই অক্ষয় সত্যের ওপর নির্ভর করেই সে ফরাসডাঙার ঝুমঝুমখালিতে বসন্ত—কলেরার এবং যত বেওয়ারিশ মড়ার কঙ্কাল সংগ্রহ করে বেড়িয়েছে। কোনোদিন যদি আঁধার রাতে সে হেলে পড়ত ভয়ে, দুহাত উপরে তুলে, আকাশে বল্লম ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠত, ওস্তাদ হারুন রসিদের দোহাই! গেরুকেও বারবার সেই দোহাই দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে বলেছে। কারণ, কৈলাস জানে গেরুকে কঙ্কালের পয়সাতেই চটানে টিকে থাকতে হবে, চটানে বেঁচে থাকতে হবে।

হারুণ রসিদ ওর ওস্তাদ গুরু—মাচানে শুয়ে শুয়ে সে তার হেকিমি জীবনের কথা ভাবল। মানুষটা কালীর সাধনা করত—অদ্ভুত মানুষ। ভোরে ঠিক সূর্য ওঠার আগে তিনি গুহায় ঢুকতেন। গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে রাখতেন এবং ভিতরে পড়ে ঘুমুতেন। সূর্য—অস্ত যাওয়ার পর পাথর ঠেলে বাইরে আসতেন এবং পাঁচ ওক্তের নামাজ পড়তেন। তখন সব সাগরেদরা আসতে শুরু করত পাহাড়ের ঢালু ধরে। ওরা এসে একে একে জমা হত। সেই জনহীন পাহাড়ঘেরা দরগার ময়দানে এ—চটানের মতো নাচন—কোঁদন হত তখন। ঝাড়ফুঁক, তন্ত্র—মন্ত্র জুড়িবুটির কারবার হত সেখানে। কোথায় শ্বেতশিমুলের ছাল মিলবে, দুই সতীনা গাছ পাওয়া যাবে, কোন গুহায় নীলবানরের মাথা মিলবে—সবকিছুর হদিস দিতেন ওস্তাদ গুরু হারুন রসিদ। আর কৈলাসকে বলতেন, রাহুচণ্ডালের হাড় না হলে কোনো কবচওবচে কাজ দেবে না। তুই তো ডোমের বাচ্চা রে মরদ, রাহুচণ্ডালের হাড় জোগাড় করতে কত আর সময়! জোগাড় কর—মা চণ্ডীর থানে স্পর্শ পাইয়ে দি হাড়টায়, গাছগাছালির নাম করে দিচ্ছি, সব মিলিয়ে পুন্নপদের মাদুলি দে, মহাশক্তি কবচ দে—পারিস তো মহাশক্তির কোমরবাণও দিবি।

কাছাড়ের সেই রসিদের দরগা, সেই পাহাড়ের দরগার ময়দান, সেই গুহার ভেতর মা চণ্ডীর থান, সেবাইত রসিদ, শাগরেদ মিঞাচাঁদ, বুনো ঠাকুর, হরিশ চণ্ডালে—সব এক এক করে ওর চোখের ওপর এসে ভাসতে থাকল। সে এক জীবন গেছে কৈলাসের। মাইলের পর মাইল হেঁটে গিয়ে গঞ্জের হাট করেছে, ব্যাখ্যা করেছে গুরুর দ্রব্যগুণের কথা, জুড়িবুটির কথা। তখন কত মন্ত্র—তন্ত্র করে ভূত—প্রেত ছাড়িয়েছে মানুষের শরীর থেকে। আঁধার রাতে হেঁটে কৈলাস তখন সওদা এনেছে কত। গুরুর পায়ের নীচে বসে মহাশক্তি কোমরবাণের ব্যাখ্যা শুনেছে মন দিয়ে। সে ব্যাখ্যা বসে বসে মুখস্থ করেছে। এবং সে তার হেকিমি জীবনে ওস্তাদের সেই কথাগুলো টেনে টেনে ভেঙে বলেছে—এ বারো প্রকারের তন্ত্র আছে। হাতে সরু একটা ছিপের মতো লাঠি থাকত তখন। গঞ্জের হাটে চাদরের ওপর বিছিয়ে রাখত বনরুইমাছের ছাল, হরিণের সিং হেমতাল কাঠ, গোঁড়ের বাঁশ, কালী ঝাপ, নরসিং ঝাপ, দুর্গা ঝাপ। তলায় রাখত কালনাগিনীর গাছ, শ্বেত—শিমুলের ফল, ময়রুন বিবির ফুল! ময়রুন বিবির ফুলের কাছে এসে ছিপের ডগাটা থামত। চোখ দুটো ওর টাটাত। চোখ দুটো রগড়ে বলত, এ ফুল আরব থেকে লিয়ে আসতে হয়। হজের মানুষ হজে যান, লিয়ে আসেন এ ফুল। প্রসূতির বাচ্চা হয় না, ব্যথাবেদনায় হুম হুম করছে, কথাবার্তা বেমালুম গণ্ডগোল, জল লেন, ময়রুন বিবিয়ে ডুবিয়ে দ্যান—সাদা জলটারে মিঠাই দিয়ে খাওয়ান, বিবি আপনার আসান পাবে জরুর। পোয়াতির বাচ্চা হতে জেরা সময় লেবে।

গঞ্জের হাটে এই সব হেকিমি ব্যাবসা করত কৈলাস। ওস্তাদ গুরুর জীয়নহাড়টা সঙ্গে নিত। সোয়া পাঁচ আনা দাম চাইত তাবিজের জন্য। তাবিজটা দেওয়ার আগে রাহুচণ্ডালের হাড়ে ঠেকিয়ে দিত। বলত লেন—পোয়াতির কোমরে বেঁইধে দ্যান।

কাছাড় দরগা থেকে পালিয়ে এসে একদা কোর্ট—কাছারিতে এই ব্যাবসাই করত কৈলাস। কোর্ট—কাছারির কোনো পুরানো অশ্বত্থের ছায়ায় সে দাঁড়াত। একটা চাদর বিছিয়ে রাখত নীচে। গাছগাছালিগুলো সারি সারি সাজানো থাকত। একটা হারিকেন থাকত। আর থাকত ডোমন সা। শাগরেদ ডোমন সা। সারাদিন চেঁচাত কৈলাস। মুখে থুথু উঠত থুথু ছিটাত চারপাশে এবং দরগার মতোই ব্যাখ্যা করত বিশল্যকরণী গাছের, দুই সতীনা গাছের। তখন কত লোক জমত চারপাশে। কোর্টের লোক, মামলা—মোকদ্দমায় হার—জিতের লোক। ওরা কৈলাসকে দেখত, কৈলাসের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা দেখত।

কোনো কোনো সময় ছিপের ডগা ছুঁইয়ে হাঁটু দুটো সামনে এনে কাঁপাত। সরু কোমরটা ভেঙে দিয়ে চোখে—মুখে অমানুষিক ভাব ফুটিয়ে তুলত। বলত, এ হল গিয়া কুম্ভীরের লিঙ্গ। তারপর খুদে খুদে দুটো চোখ নিয়ে সকলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকত। মানুষগুলোর মনে তন্ত্রের নেশা ধরানোর চেষ্টা করত, এবং যখন দেখত নেশা বেশ ধরে এসেছে তখন সে একঝলক হেসে বলত, এবার বেমাফিক দু—চারঠো কথা বলে লিব, নিজ দয়াগুণে বাবুলোকে মাপ করে লিবেন। এই যে ছোট সাদা তন্ত্র দেখলেন, মালোম লিশচয়ই আসছে—এ হল গিয়া কুম্ভীরের লিঙ্গ। এ চীজ বহুত লাখোটিয়া চীজ, বহুত দাম। যখন তখন পাবেন না, যেখানে সেখানে মিলবে না। বেনাতি মণিহারি দোকানে যান, কাম কারবার করেন, লেকিন চীজ আপকো নাহি মিলছে। হে আছে, লাখোটিয়া চীজ ভি আছে। লেকিন কাঁহা পাবেন, কাঁহা আছে? বড় বড় পুরানা কবরাজবাবু আছে, উসকা পাশ যান—পাবেন। দাম ভি বহুত আছে, দশ কুড়িতে ভরি হবে।

এ সময় একটু থামত কৈলাস। জোরে জোরে শ্বাস নিত, হাঁপের টানের মতো শব্দ উঠত গলায়। কৈলাস চাদরটার চারপাশে এক পাক হাঁটত। সরু ছিপটা হাতে থাকত—তখন চেঁচাত না, ছিপটার দুটো ডগা দু—হাতের মুঠোতে রেখে একটু বাঁকিয়ে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরে বলত, দেখে লেন। বাবুলোগ! খুব ধীরে ধীরে বলত। পারলে ইশারায়। তারপর কৈলাশ পা তুলে নাচতে আরম্ভ করত। চাদরটার চারপাশে সে ঘুরপাক খেত হেঁটে হেঁটে—যেন নেচে নেচে সে হাঁটছে। ওর মুখের কথার সঙ্গে পা দুটোর মাত্রা ঠিক থাকত। সে বলত, আমার দেহ আপনার দেহ এ ছিপের লাখান। খাওয়ান—দাওয়ান বেশ আছে, কিন্তুক ঘুণে ধরলে বোঝবার জোটি লাই। কবে ঘুণে ধরল সেটি টের পাবেন না। তবে বাত আছে এক, ভাঙেন

মচকান টের করতে পারবেন অন্দরে ঘুণ ঘুইসে গেছিল। বাবুভাই, আপনারা ফিটফাট থাকেন বাইরে, মাস্তানের মতো চলেন ফেরেন, টের পাওয়া যায় না অন্দরে ঘুণ আছে কি না আছে। তবে বিবির কাছে গেলে সব নজর আসে। তার লাগি বলি বাবু মহাশক্তি কোমরবাণ। সকলের চোখের সামনে কৈলাস তাবিজটা তুলে বলত, দাম মাত্র স পাঁচ আনা।

কোর্ট—কাছারির ময়দানে অশ্বত্থের ছায়ায় অনেকক্ষণ ধরে মহাশক্তি কোমরবাণের ওপর অশ্লীল আলোচনা করত কৈলাস। পাঁচ—সাত টাকার বিক্রি তুলতে সাঁজ নেমে আসতে ময়দানে। শাগরেদ ডোমন সা পাশের একটা কাঠের বাক্সে সব গাছ—গাছালি তুলে সাজিয়ে রাখত। সন্ধ্যার ঘন আঁধারে হারিকেন জ্বালিয়ে চটানের পথ ধরত তারা। শহরের পথ ধরে এলে ঘুরতে হবে ভেবে সে গঙ্গায় নেমে সোজা এসে চটানে উঠত, এবং ঝোপ—জঙ্গল ভেঙে চটানে ফিরতে বেশ রাত হত তার।

গেরুর মা তখন চটানে এসেছে। তিন মাসের বাচ্চাটাকে নিয়ে জিয়াগঞ্জের চটান থেকে কৈলাসের সঙ্গে এ চটানে উঠে এল। হেকিমি—দানরির পয়সায় কৈলাস বৌয়ের মন ভুলাল। বৌটা নতুন শাড়ি পেল, নাকের নথ পেল, সোনার পাতের চুড়ি পরল হাতে। খুব খুশি খুশি মন। জিয়াগঞ্জের চটানে যে না খেতে পেয়ে শুকনা কাঠের মতো রঙ ধরেছিল, এ চটানে এসে সেই বৌ লাউডগার মতো রূপ খুলে ধরল। আহা কী রূপ! কী রূপ! চটানে ফেরার সময় কৈলাস সারাক্ষণ গেরুর মা—র রূপ নিয়ে মনে মনে কোন্দল করত। মনে মনে নিজের বয়েসটার কথা ভেবে মুখ মুষড়ে পড়ত। উত্তর—চল্লিশের কৈলাসকে গেরুর মা—র কাঁচা বয়স সহ্য করবে কিনা ভেবে সারা পথ অন্যমনস্ক হত। তাই প্রথম যৌবনটাকে ফিরে পাবার জন্য অনেক বাছ—বিচার করে, অনেক তন্ত্র—মন্ত্র পড়ে, দেহে ধারণ করেছিল মহাশক্তি কোমরবাণ। বিটি—মানুষের ল গুণ পুরুষমানুষের ছ গুণ। তার ওপর ভাঙা বয়সটা ওকে কেবল বিরক্ত করে মেরেছে। সারাক্ষণ এই সব ভেবে নিজের দেওয়া তাবিজ নিজেই ধারণ করল এবং ভাবল তাবিজের দৌলতে ওর জীবনীশক্তি অনন্ত। ভেবেছিল দেহের আর অপচয় নেই। দেহে ঘুণ ধরবে না, ভাঙবে না, মচকাবে না। মেয়েমানুষের ল গুণকে সে পুষিয়ে নিতে পারবে।

চটানে ফিরতে রাত হয় কোনোদিন। গভীর রাত। গেরুর মা তখনও ঘুমিয়ে পড়ত না। ঘাটের কাঁথাকাপড় গায়ে জড়িয়ে শীতের রাতে কৈলাসের অপেক্ষায় মাচানে বসে থাকত। বসে ওর জন্য অপেক্ষা করত—কখন খাবে, কখন শোবে, কখন ঘুমোবে সেই আশায়। খেতে বসে কৈলাস গেরুর মা—র ভারী ভারী চোখ দুটো দেখে কঠোর উত্তেজনা বোধ করত। তারপর বৌটাকে নিয়ে যেত মাচানে। গেরু যদি কেঁদে উঠত এ—সময়, কৈলাসের মেজাজ বিগড়ে যেত। বলত, সময়—অসময় নাই বেটার! নেমকহারাম শালা হামার! ভোর—রাতে যদি কৈলাস কোনোদিন জাগত, যদি দেখত বৌটা একটু উচ্ছৃঙ্খল ভাব নিয়ে শুয়ে আছে, তখন ফের গেরুর মাকে কাছে টানার চেষ্টা করত। ফের উত্তাপ জমা হত মাচানে। ফের মাচানে গোঙানির শব্দ উঠত। এবং এ—ভাবে গেরুর মাকে কেন্দ্র করে কৈলাস তার অনন্ত জীবনীশক্তির পরীক্ষা দু—দুটো বছর ধরে চালিয়েছিল। দু বছর একসঙ্গে থেকেছে, বসেছে, উঠেছে, একসঙ্গে সাঁঝের আঁধারে মদ খেয়ে হৈ—হল্লা করেছে চটানে, আর রাতের পর রাত তাবিজের দৌলত পরীক্ষা করেছে গেরুর মা—র উপর।

শাগরেদ ডোমন সা বারান্দার এক কোণায় পড়ে থাকত। ওস্তাদের নিকা—করা বৌর কান্না শুনতে পেত মাঝরাতে। ভোরবেলায় ওস্তাদের বৌকে বলত, লিব নাকি কিছু? সে কাঠের বাক্সটা কাঁধে নেওয়ার সময় ডাগর দুটো চোখের দিকে চেয়ে বলত, ওস্তাদের সব ভুলভাল হয়ে যাবে। হামি লিব নাকি কিছু? আপ বুলিয়ে দিন। হামি ঠিক ওস্তাদকে স্মরণ করিয়ে দেবে। হামি লোক ঠিক আছে, আপনি বুলেন।

শাগরেদ ডোমন সা—ই তখন মোটঘাট বইত। চাদর বিছাত। জুড়িবুটিগুলো সাজিয়ে রাখত চাদরে। কোনোদিন সে তন্তর—মন্তর শিখত কৈলাসের কাছে।

কৈলাস বলত, শিখে লে শালা! তোর ওস্তাদ হামি, হামার ওস্তাদ রসিদ। সব ওস্তাদের জয়—জয়কার দিয়ে বুলে ফ্যাল হেকিমি—দানবি দশ—পঁচিশ দফে বেইমান মানুষের কাজে লাগে। আওর এ দফে শুনে

রাখ শালা, বেম্ম চণ্ডালের হাড় লাগবে। জীয়ন হাড় যাকে বলিস। সেই রাহুচণ্ডালের হাড় না হলে আর তুর চলছে না। গাছ—গাছালির গুণ, জুড়িবুটির জেরাসে কারবার। দুরোজের বাত আছে ও।

কৈলাসের তৃতীয় পক্ষের বৌ শুয়োরের খাটাল পার হয়ে তখন এক—কলসি জল রাখল উঠোনে। কিন্তু কৈলাস তখনও ঝিম মেরে সামনে শুয়েছিল। সে তার চটানের অতীত কথাগুলো ভাবতে ভাবতে শেষ বয়সের বৌটার দিকে ভালো করে নজর দিয়ে দেখল। এ বৌটাও হয়তো এক রাতে চটানের কোনো মরদের সঙ্গে উধাও হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং ভালো এখন যদি ওর সব ক'টি দাঁত ভেঙে দেওয়া যায়। আর কিছু না হোক, চটানের উঠোনে সারাজীবন তবে পড়ে থেকে গরল তুলতে পারবে। চটান থেকে উধাও হবার ভয় থাকবে না।

কৈলাস উঠে দাঁড়াল। চালার বাইরে এসে খেঁকিয়ে উঠল। খুব জোরে চেঁচালে চোয়ালের লম্বা দাঁত দুটো বাইরে ঝুলতে থাকে। এখন দাঁত দুটো ঝুলছে। সে বলছে, পানি দিয়েই তুর কাম খালাস হল রে ডোমনী! আওর কুচ দিবিনে?

বৌ নাকের নথ দুলিয়ে ঘরে ঢুকল। বিড়বিড় করে কী সব বকল। কিছুক্ষণ পর একটা পিঁড়ি বের করে দিল বাইরে। পিঁড়িটার ওপর বসে কৈলাস স্নান করবে। পিঁড়ি বের করে নিচু গলায় গাল দিল, খেঁকিয়ে উঠছিস ক্যানে? দুদিন বাদ তো চটান খালাস করবি, খেঁকিয়ে উঠছিস ক্যানে?

সে মাথায় জল ঢালল শুধু। কোনো জবাব দিল না। কারণ, এখন যদি সে ফের জবাব দেয়, তবে বৌটার জেদ বাড়বে। নাচন—কোঁদন শুরু হবে। দয়া করে যদি নাচন—কোঁদন একবার এই তৃতীয় পক্ষের বৌর শুরু হয়, তবে সাধ্য কী সমস্ত দিনমানে সে এ নাচন—কোঁদন থামাতে পারে।

স্নান—শেষে কৈলাস ঘরে ঢুকলে একথালা পান্তাভাত বেড়ে দিল বৌটা। তেল—চিটচিটে গামছা দিয়ে কৈলাস শরীর মুছল। তারপর দু ঠ্যাং বিছিয়ে এক কোণায় খেতে বসে গেল। দুটো শুকনো লংকা পাশের পোড়া কাঠে পোড়াবার সময় ডাকল, গেরু, তু কাঁহা রে? খানা—পিনা তু করবি না? এ—সময় কৈলাস একটা পেঁয়াজ চাইল বৌটার কাছে। বৌ কাঁচা পেঁয়াজ দিল। তারপর বলল, খানিক পচাই লিবি? গত রাতে গেরুর সৎমা সবটুকু পচাই শেষ করতে পারেনি বলে এই ধরনের সুখের কথা বলতে পারল। কৈলাস এতক্ষণ পর খুব খুশি—খুশি হয়ে উঠল। বলল, তা আছে লাকি? থাকলে দে দুটো ঢেলে। ভাতের সঙ্গে পচাই খেতে পেয়ে কৈলাস এত খুশি যে বৌটার কানের কাছে মুখ না নিয়ে আর পারল না। ফিসফিস করে বলল, মড়াটা যে মেয়েমানুষ লা। ভারী ঠোঁট দুটো বলতে গিয়ে নিচে ঝুলে পড়ল। মাগিটা মায়ের দয়াতে পার পেল।

এ চটানে খবর দেওয়ার মতো আর একটা খবর আছে কৈলাসের। খবর—মেয়েমানুষটার দাঁত একটাও পড়েনি। খুলিটার দাম জগুবাজারের হিল্টন কোম্পানির বড়বাবু পুরো এক কুড়ি আঠারো টাকা দেবেনই, সব দাঁতগুলো ঠিক থাকলে তিনি খুলির জন্য পুরো আটত্রিশ টাকাই দেন। দাঁত যদি দুটো একটা না থাকে তবে দাম কমবে ফাটকা বাজারের মতো। চড় চড় করে দাম কমে দশ—পাঁচ হতে পারে। সেজন্য কৈলাস ফরাসডাঙার জঙ্গলে মড়া পেলে কবর খুঁড়ে প্রথম দাঁতগুলো দেখে। দাঁত ক'টা থাকল, কটা উঠল দেখে।

দাঁত কম থাকলে নিজের দাঁতে হাত বুলোয় কৈলাস। বলে, এ—মুর্দা হামার মতো পাপী—তাপী কিছু একটা হয়ে লিবে।

থালায় যখন পচাই ঢালছিল বৌ, তখন সে খবরটা না দিয়ে থাকতে পারল না। এতক্ষণ ধরে এই খবরটা দেওয়ার জন্য ছটফট করছিল সে। মুখের ভেতর এক ঢোঁক পচাই নিয়ে বলল, মড়ার বত্তিসটা দাঁত আছে রে বৌ! ঘরে পয়সা এ টাইমসে জায়দা উঠবে। গেরুটাকে একটু সামলে চলতে বুলবি। ডাইনি মাগিটার সঙ্গে মিশতে বারণ করবি। তাহলে আগামী সালে একটা সাদি—সমন্ধ করে লিব। তু কী বলিছে?

তা লিবি। কিন্তুক ওয়ার গতিক—বিতিক ভালো লয়। বলে উঠে দাঁড়াল সে। সরু কোমরটা নেচে উঠছে। বেশি পয়সার কথা শুনে চোখ দুটো ওর চকচক করে উঠছে। দু—কদম সে পা বাড়াল সামনে, কোণ থেকে

মাদুরটা এনে সে মাচানে বিছিয়ে দিল।

কৈলাস নতুন মাদুর দেখে ফিসফিস করে বলল, কাহার মন ভুলালি রে বৌ? দুখিয়ার লয় তো? মরঘাটির ডাক তো এ—সালে ওয়ার।

বৌটার গলায় এবার সোহাগ উথলে উঠছে, তু যে কী বলিছে!

কৈলাস মাচানে গড়াগড়ি দেওয়ার সময় বলল, দেখে লিবি, এবার মড়ক লিশ্চয়ই একটা লাগবে। ঠান্ডা আভিতক পুরোদমে থাকল, লেকিন মায়ের দয়া আরম্ভ হয়ে গেল। লিশ্চয় মড়ক লাগবে। লিশ্চয় লাগবে। বাপজী ঠাকুরের মানত করে লিলুম। সে দুহাত তুলে বাপজী ঠাকুরকে মানসা দিল। কৈলাসের খাপছাড়া বেঢঙের শরীরটার দিকে নজর দিতে দিতে বৌটা যেন আঁতকে উঠল। বলল, তবে!

সে হাসল চোয়ালের সেই নোংরা দাঁত দুটো বের করে। হাসতে হাসতে বলল, ও কিছু লয়, ও কিছু লয়। লেকিন এ সালে তুর গায়ে গহনা উঠবে। হামি কৈলাস ডোম এ—কথা বলিছে। ঝুমঝুমখালি আর ফরাসডাঙার জঙ্গলে মড়া পোঁতার হিড়িক লাগবে, ঠিক গেল চার সালের আগের মতো।

সে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আজ অনেক টাকার স্বপ্ন দেখল। বৌ পাশে বসে রয়েছে। সে বসে বসে কৈলাসের আশা—আকাঙ্ক্ষার কথা শুনছে। শুনতে শুনতে এক সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর দুটো হাত চোখের সামনে তুলে কেমন যেন কুঁকড়ে গেল মেয়েটা।

আকাশ এবং মাটি লাল এবং এই মাটির কস খেয়ে পাশের নদীটা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে। শ্মশানে একসঙ্গে তিনটা চিতা জ্বলছিল। চটানের মেয়ে—মরদেরা শ্মশানের কাঠ বয়ে কিছু পয়সা পেয়েছে। ঘাটোয়ারিবাবু সবাইকে পয়সা দিয়েছেন। নেলিও হাত পেতেছে এবং পয়সা পেয়েছে! তারপর নেলি সন্তর্পণে বের হয়ে যাবার উপক্রম করতেই ঘাটোয়ারিবাবু ডেকেছেন, বলেছেন, এই ধর, টাকা দিলাম। যত জলদি পারিস টাকা শোধ করবি। না করিস ত খাতায় নাম লিখব। হিসাব রাখব।

নেলি জবাব দিল, তা দেব বাবু। জলদি দিয়ে দিব।

এবং এখন দেখলে মনে হবে না যে নেলি দীর্ঘ সময় ধরে না খেয়ে আছে চটানে। মনে হবে না—সে কিছুক্ষণ আগেও ভুখা থাকার দরুন পাগল বনে যাচ্ছিল। মনে হবে না—ভুখা থাকার জন্য সে কিছুক্ষণ আগেও গেরুকে গালমন্দ দিচ্ছিল। গেরু বলেছিল ওকে, তু নিশুতি রেতে একলা ঘাটে গেলি, গহনা খুঁজলি, তু ডাইনি বনে যাবি। তুর ভয় না করল। তখন নেলি গেরুকে গালমন্দ দিচ্ছিল, গেরু তু হামার খবরদারি মত কর। রেতে ঘাটে একা নেমে গিয়েছিল ত হয়েছেটা কি! ঘাটে মড়া ছিল না, লেকিন হামার গঙ্গা যমুনা ত ছিল। তু রামকান্তর ভয় দেখাচ্ছিস, থোড়াই ভয় আছে ওয়ার। বে—সরমের কথা বলে তু গঙ্গা—যমুনাকে দিয়ে ওয়ার চোখ তুলে লেব না! লেকিন তু মরদ না আছে গেরু। কিছুক্ষণ আগে ঘাটে কাঠ নিয়ে যাবার সময় নেলি গেরুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিল, তু মরদ না আছে গেরু। তু ভেড়ি আছে, তু পাঁঠা আছে। তুর বিবিকে লিয়ে ভিন আদমি রঙ্গরস করতে চাইবে, আর তু তখন চোখ মেলে ভেড়ির মতো তাকিয়ে থাকবি। মুরদ থাকে'ত নিয়ে চল অন্য চটানে। দুজনে ঘর বাঁধবি। তখন খবরদারি কর। বেমাফিক চলেছি ত মার—ধোর কর। লেকিন আভি তেরে এক বাত ভি হাম না শোনে। হাম ভুখা আছে। রঙ্গরসের বদলে পয়সা মিলে ত ও ভি হাম লেবে। ভালোমানুষ হয়ে চটানে ভুখা না থাকবে। ডাইনি বনে যাবে ত সে ভি আচ্ছা।

নেলি সিঁড়ি ধরে নিচে নামল। মনে মনে সে এখন গেরুকেই খুঁজছে। হাতে ওর একটা টাকা—অনেক সম্পদ! অনেক আকাঙ্ক্ষা এখন নেলির মনে। এক টাকায় কী কিনবে! কত কিনবে! এক সের চাল, এক পো ডাল, এক পয়সার পেঁয়াজ। দু পয়সার তেল। একটু নুন। সে খাবে, বাপ খাবে। গেরু খাবে কিনা তাও ভাবল। কাঠ বইবার সময় গেরুকে সে অনেক গালমন্দ দিয়েছে। গেরুকে বকে নিজেই কষ্ট পাচ্ছে এখন।

চোখ তুলে এ—ঘর সে—ঘর দেখল। কোথাও নেই, কোনো ঘরে কেউ নেই। গেরু কোথাও নেমে গেছে, রেগে গেছে।

নেলি এবার শিবমন্দিরের পথে পড়ল। রামকান্তর দোকানে গিয়ে দাঁড়াল। এ—দোকানে সে দুটো পেঁয়াজ, একমুঠো চাল, একটু নুন বেশি পাবে। সেজন্য সে অন্য দোকানে গেল না, অন্য পথ ধরল না। রামকান্তর দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁকল, আট আনার চাল দে বাবু। দু আনার ডাল দে বাবু। দু পয়সার তেল, এক পয়সার নুন। এক এক করে নেলি সওদার নাম করে গেল, এক এক করে রামকান্ত সব বেঁধে দিল। তারপর নেলির দিকে চেয়ে বলল, ভোররাতে তোর বাপ চিল্লাচ্ছিল কেনরে?

জবাব দেবার আগে নেলি চটানের অন্য পাশে হল্লার শব্দ শুনল। ক্রমশ এদিকেই যেন আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। সে দেখল দুখিয়া ছুটে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। পিছনে গেরু ছুটছে। গেরুর হাতে বল্লম। দুখিয়া নেলির সামনে এসে থেমে গেল। তু হামারে বাঁচা। গেরু হামারে বল্লমের হেকড় দিতে চাইছে।

নেলি দেখল, দুখিয়া ভয়ে কাতরাচ্ছে। দুখিয়ার মুখ দেখে নেলির কষ্ট হল। নেলি তাড়াতাড়ি দুখিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর গেরুর দিকে চেয়ে বলল, আঃ যা তু। গেরুকে ডাকতে থাকল।

আঃ যা, দেখি তুর কত মুরদ।

মুরদ আছে, জরুর মুরদ আছে। বলে গেরু নেলির পিছনে ছুটে গেল এবং দুখিয়ার গলাটা টিপে ধরতে চাইল। বলল, শালে কুত্তা! শালে বেইমান। নেলিকে তু বেশ্যা পেলিরে।

গেরু তু চুপ কর। চুপ কর। কী করেছে বুল! নেলি গেরুর হাত ধরল এবার। চটানের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল। —কী হয়েছে বুল?

গেরু কোনো উত্তর দিতে পারল না। শুধু হাঁপাতে থাকল। শুধু এদিক ওদিক তাকিয়ে গজরাতে থাকল। সে নেলির চোখ দেখল, মুখ দেখল। ওর দুঃখ বাড়ছে। অথচ কিছু বলতে পারছে না। বলতে পারল না—ও শালে বুলে কী নেলি, তু বেশ্যা। রামকান্তকে এ—সব কথা বুলেছে, আর মাগনা চপ ভাজা খাচ্ছে। বলতে পারল না, ও শালাকে হাম জরুর খুন করবে। জরুর হেকড় দেবে বল্লমের। শুধু ফ্যালফ্যাল করে নেলির দিকে চেয়ে থাকল। গেরুর আপসোস বাড়ছে—সে বলতে পারছে না, দুখিয়া দিন দিন বাবু হয়ে উঠছে। দিন দিন জায়দা পয়সা কামিয়ে টেরি কাটতে শিখেছে। কোঁচা মারতে শিখেছে। রামকান্তর দলে ভিড়ে নেলিকে অসৎ বানাতে চাইছে। কিছু বলতে না পেরে গেরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কঠোর উত্তেজনায় ভুগল। চটানের মেয়ে—মরদেরা এইসব দেখে হাসল আর হাসল। কারণ নেলি তখন গেরুকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। গঙ্গা—যমুনার মতো গেরু নেলির বশ মেনেছে।

চটানে মেয়ে—মরদেরা সব ফিরে এল। উঠোনে মাদুর বিছিয়ে বিকেলের রোদ শরীরে মাখাল। লাশ—কাটা ঘরে গোমানি আজ যায়নি। হাসপাতাল থেকে পুলিশ আসেনি। সে মাচানে পড়ে পড়ে সারাদিন গালমন্দ দিয়েছে। এখন নেলি দুটো রেঁধে খাওয়াবে জেনে নিশ্চিন্ত মনে চটানে ল্যাং খাচ্ছে। শীতের আমেজ আকাশ দেখে চিনতে পারছে। না খেতে পেয়ে মনটা এতক্ষণ কাঠের মতো হয়ে ছিল। ওর দুঃখ হচ্ছিল হাসপাতালে আজ যেতে পারল না, লাশ—কাটা ঘরে পেট চিরতে পারল না মানুষের এবং চুরি করে ইসপিরিট খেতে পারল না। বিকেলের মেজাজটা সে পাচ্ছিল না। ওর দুঃখ সেজন্যও। কিন্তু ঝাড়ো ডোমের ঘরে চর্বির গন্ধ। কিছুদিন থেকেই চর্বি খাওয়ার শখ হয়েছে গোমানির। কিছুদিন থেকেই বলবে ভাবছিল নেলিকে, শুয়োরের চর্বি দিয়ে ভাত দে নেলি। চর্বির গন্ধটা বার বার পেটের যন্ত্রণাকে প্রকট করে তুলছে। নেলি ফিরছে না এখনও, নেলি ঝগড়া করছে গেরুর সঙ্গে। কখন ফিরবে, কখন রান্না চড়াবে? কখন দুটো ভাত, একটু নুন, একটুকরো পেঁয়াজ ওর পাশে রাখবে! সে এইসব ভাবতে ভাবতে একটু এগিয়ে গেল।

তখন ঘাটোয়ারিবাবু তাঁর নিজের চেয়ারে—সেই চোখ, সেই মুখ নিয়ে বসে আছেন। জানলার গরাদে চোখ রেখেছেন। গরাদের ফাঁক দিয়ে কত আগুন দেখলেন, কত শকুন উড়ল আকাশে, কত জল এই নদী ধরে সমুদ্রে নেমে গেল—অথচ তিনি তাঁর নিজের চেয়ারে। কত ধনী এল, কত গরিব এল ঘাটে, অথচ তিনি তাঁর

নিজের চেয়ারে। এইসব দেখে এবং ভেবে তিনি স্থির করেছিলেন—মৃত্যু, মৃত্যুই সব, মৃত্যুই শেষ। মৃত্যুর জন্যে দুঃখ অথবা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দুঃখ—উভয়ই পরিহাসজনক। উভয়কেই তিনি ঘৃণা করে এসেছেন এতদিন। উভয়ের জন্যই তিনি গরাদের ফাঁকে কঠোর দৃষ্টি হেনেছেন। শিবের মতো ত্রিনয়ন খুলে বলেছেন —পরম ব্রহ্ম নারায়ণ। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। বলেছেন, কেঁদে কেটে কী হবে, জীবনে এটাই ত নির্দিষ্ট ছিল। তবে কান্না কেন? আনন্দ করো, আনন্দ করো। অথচ তিনি যত মৃত্যুর মুখোমুখি হাজির হচ্ছেন, যত বয়স বাড়ছে, ততই বিষণ্ণ হয়ে পড়ছেন। ততই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠছেন না। ততই তিনি কম কথা বলছেন। ততই তিনি যেন জগতের এই মিথ্যা মায়ায় জড়িয়ে পড়ছেন। তিনি চোখ ফিরিয়ে দেখলেন চটানে কৈলাস মাচানে ঘুম যাচ্ছে, আর ওর বৌটা মনু ডোমের সঙ্গে একখিলি পান খাওয়ার জন্য বায়না ধরেছে। মনু ডোমের সঙ্গে বৌটা পান খেতে চলে গেল। অশ্বত্থের ডালে সব কাকেরা ফিরে আসছে। ভোরে যে মরা কাকের বাচ্চাটার জন্য ওরা কেঁদেছিল এখন আর কাঁদছে না। ডালে বসে ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে। ঘাটোয়ারিবাবুর মনে হল তিনি যেন সারা জীবন বিশ্রামই করে এসেছেন। তিনি যেন মরে বেঁচে ছিলেন। তিনি দেখলেন এখন চটানে ঘরে ঘরে পোড়াকাঠের আগুন জ্বলে উঠছে। হাঁড়ি হাঁড়ি পচাই জড়ো হয়েছে চটানে। দুখিয়ার বউ মংলি পাঁঠার নাড়িভুঁড়ি দিয়ে চাট বানাচ্ছে। ঝাঁঝালো গন্ধ চটানে। চাটের ঝাঁজ, মনের ঝাঁঝ। বাবুদের বাড়িতে রেডিয়ো বাজছে। তখন নেলি চটানে ফিরছে। গঙ্গা—যমুনা এধার ওধার খেয়ে ঢেকুর তুলছে। গেরু ঘরে ঢুকে বাপের পাশে শুয়ে পড়ল। বুঝি ঘুমোল। বুঝি রাতে ফের পাহারা দেবে। ঘাটোয়ারিবাবু অফিসঘরে বসে সব দেখে এ—সব ভাবলেন।

নেলির ঘরেও পোড়া কাঠ জ্বলে উঠছে। নেলি রান্না চড়াল, অন্য দশটা ডোমের মতোই ওর রান্না। ঘাটের পোড়া কাঠে পুরোনো হাঁড়িতে ভাত হবে। ফ্যানটুকু গেলে প্রথমেই নেলি চুমুক দিয়ে খেয়ে নেবে। একটু নুন দেবে মুখে।

নেলির ফ্যান খাওয়া গোমানি মাচানে বসে দেখল। ওর ইচ্ছা এ—সময় নুন মিশিয়ে সেও একটু ফ্যান খায়। তা নেলি যখন দিল না, গোমানি তখন বায়না ধরতে থাকল—হামারে এটা দে, ওটা দে। হামি ফ্যান খাব। হামারে আর ভুখা রাখিস না। পেট হামার হারমাদ হয়ে উঠল।

নেলি একটু ডাল সিদ্ধ করে নিল মালসায়। অন্য একটা মালসাতে বাপের জন্য ভাত বাড়ল, তারপর বাপকে খেতে দিল। নিজেও খেল এক সময়। ওরা জল খেয়ে দুজনেই বড় রকমের ঢেকুর তুলল।

এখন ইচ্ছা করছে গোমানির নেলির সঙ্গে দু চারটা ভালোমন্দ কথা বলে। ইচ্ছা হচ্ছে নেলিকে পাশে বসিয়ে আদর করতে। কিন্তু এ—সময়ে কেন জানি ফুলনের স্মৃতি ওকে বড় কাতর করছে। বাপ বাঙালি ডোমকে স্মরণ করে সে হাতজোড় করল। বাপের জন্যই হাসপাতালের চাকরি। বাপের জন্যই সে মাস গেলে আশিটা টাকা পায়। কিন্তু মাসের পনেরো দিন যেতে না যেতেই টাকাগুলো নিঃশেষ হয়—এজন্য ওর এখন খুব দুঃখ। নেলির কথা ভেবে দুঃখ আরও গভীর। মাসের শেষে ধার—দেনা, তারপর সুদ গোনা। মাসের প্রথম তারিখে কিছু দেনা শোধ করা। মাসের শেষ দিকে নেলিকে খুন জখম করা। আর এও নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে মাসের শেষ দিকে দু তিনটে রোজ উপোস দেওয়া। চুপচাপ পড়ে থাকা মাচানে এবং নসিবকে গালমন্দ দিয়ে চোখ বুজে থাকা। এ—সময়ে চটানটা ওর কাছে হারাম। মানুষগুলো সব অজাত—কুজাত। দুনিয়াটা রসাতলে যাচ্ছে।

বাপ বঙ্গালী ডোমও এ—কথা বলত ঘরে ফিরে—দুনিয়াটা রসাতলে যাচ্ছে। তখন গোমানি চটানে পড়ে থাকত না। সদর জেলের পাশে একটা কুঠরি ছিল বাপ বঙ্গালী ডোমের, মা সিঁদুরী সেখানে থাকত। গোমানি থাকত মা—বাপের সেই কুঠরিটায়। বাপ সদর জেলে গলায় দড়ি পরাত। ফাঁসি দিত হারমাদ লোকদের। এবং ঘরে ফিরে মা সিঁদুরীকে বলত, দুনিয়াটা ডুবে গেল রে বুড়ি। বাপ বঙ্গালী ডোমের মতো গোমানিও আজকাল এসব কথা বলতে শিখেছে। মেয়েটা দিন দিন ডাইনি বনে যাচ্ছে—এ—কথা ভাবতেও ওর কষ্ট হয়। রাতের আঁধারে মেয়েটা কখন যে বের হয়, আর কখন যে ফিরে আসে! রাতের আঁধার থেকে কী করে

যে মালসা মালসা ভাত নিয়ে আসে! কী করে যে কখন সখন এত সব খাবার জোগাড় করে নেলি! আশ্চর্য! আশ্চর্য! সব নসিব, নসিবের খেলা, নসিবের ভাঁওতা। নেলি ডাইনি বনে যাচ্ছে। যাক! যাবে। গোমানির নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা হল। শরীর কামড়াতে ইচ্ছা হল গোমানির, ভালো লাগে না এ—সব! ভালো লাগে না। রাতে এমন সজাগ পাহারা রেখেও মেয়েটাকে ধরে রাখতে পারছে না। মেয়েটা ভোর রাতে ভাত আনে, ডাল, তরকারি ভাজা আনে—কিছু বলতে গেলে খেঁকিয়ে ওঠে। কিছু বলতে গেলে খটাশের মতো মুখ করে কামড়াতে আসে। ঘাটে মড়া এলে নেলি অফিসে ঘুরঘুর করবে। মড়ার নাম ধাম, মড়ার হদিস নেবে। শেষে নেলি রাতের আঁধারে গঙ্গা যমুনাকে নিয়ে বের হয়ে পড়বে। বাড়িটা খুঁজবে। খুঁজে বের করার পর রাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। কোনোদিন পাবে কিছু, কোনোদিন পাবে না। বাপকে ভালোমন্দ খাওয়াবার এবং নিজে ভালোমন্দ খাবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারবে না। তখন চটানের কোণে মরদদের চোখ টাটায়। তখন ওরা হাজার রকমের ঠাট্টা—তামাশা করে। তখন গোমানি মাচানে বসে গজরাতে থাকে, মেয়েটার গলাটিপে ধরতে ইচ্ছা হয়, অথচ যখন মালসা থেকে নেলি খাবারগুলো আলগা করে বাপকে দেয়, তখন বাপ খুশি হয়ে বলবে, দুটো রেখে দিস। অথচ গোমানি খেতে আরম্ভ করলে সে—সব কথা মনে থাকে না। এতটুকু পেটে মালসা—মালসা খাবার গিলে বলবে হামি ব্যারামী নাচারী লোক আছি। দুটো জায়দা খেয়েই লিবে।

শীতের রোদ যত চটান থেকে নেমে যেতে থাকবে, তত চটানটা নিজের স্বভাব খুলে ধরবে। তত চটানটা মাতাল হতে শুরু করবে। পচাই খাবার জন্য প্রায় ঘরেই এখন চাট হচ্ছে। গোমানির ঘরে চাট হচ্ছে না। কিন্তু গোমানি ঝাড়ো ডোমের সঙ্গে এখন কথাবার্তা বলছে। একটু পচাই গিলবার জন্য ভাব জমাচ্ছে। এমন শীতের সন্ধ্যাটা মাটি হোক, সে তা মনে মনে চায় না। ঝাড়োর সঙ্গে ভাব জমুক, দু ঢোক পচাই গিলতে পারুক, তেমনি ইচ্ছা ওর। ল্যাং খেতে খেতে এবার সে ঝাড়োর দাওয়ায় গিয়ে বসল। ঝাড়ো ডোমের বিবিকে ডাকল। দুটো মিঠা বাত বলে বিবির মন ভিজাতে চাইল। তারপর লাশ—কাটা ঘরের গল্প জমিয়ে সেই দাওয়ায় জাঁকিয়ে বসল। আর কে আছে তাকে দাওয়া থেকে তোলে। এখন কে আর আছে এ ঘরে, ওকে এক চুমুক না দিয়ে খায়। এখন এমন কার হিম্মত আছে, শীতের সন্ধ্যাটা মাটি করতে পারে। সেজন্য গোমানির দুনিয়া এখন মজাদার দুনিয়া। খুব খুবসুরত দুনিয়া। এ দুনিয়াতেই বেঁচে সুখ। ঘাটে তিন তিনটে চিতা জ্বলছে—আহা এ দুনিয়াতেই বেঁচে সুখ। তিন তিনটে চিতা জ্বলছে, আকাশ লাল হচ্ছে মাটি লাল হচ্ছে। নদীর জল লাল—চটানের ঘরে ঘরে বিবিরা লাল নীল হচ্ছে। রঙিন কথা বলছে। জোয়ান মরদেরা শরীর রাখবার জায়গা পাচ্ছে না। জোয়ান বৌ—ঝিরা বেসামাল হয়ে পড়ছে। দুখিয়ার বৌ মংলি দুলতে দুলতে অন্য ঘরে যাচ্ছে। দুখিয়া ওর হাত টেনে রাখতে পারছে না। —ছোড় দে তু, মুঝে ছোড় দে। হাম চল যাও কাহাভি। তুর সাথ আর ঘর না করে। ভোরের আরশি দেখা, ঘাটের দামি কাপড়টায় রং, এক খিলি পানের রস ঠোঁটে, পচাই খাওয়ার পর উগ্র হয়ে উঠেছে। হে হে করে ঢোল বাজাচ্ছে মনু ডোম। মংলি দরজায় কার গানের শব্দ পেল। লোকটা এসেছে। মংলি উধাও হতে চাইল।

ঘাটোয়ারিবাবুও দরজায় কার পায়ের শব্দ পেলেন। —কে দরজায়? ঘাটোয়ারিবাবু প্রশ্ন করলেন।

হামি কৈলাস আছে বাবু!

এ—অবেলায় কেন আবার?

ফরাসডাঙায় যাচ্ছি।

ফরাসডাঙার যাচ্ছিস ত এখানে কী?

একটা কথা বুলতে এলাম বাবু। যদি মেহেরবানি করে শোনেন। যদি থোরা দয়া হয়।

দয়া বুঝিনে। যা বলবার বলে ফেল।

হামি ত বাবু বেশি দিন বাঁচবে না। গেরুর লাগি বহুত চিন্তায় আছি। হামি মর যানেসে গেরু কী করবে কেনা জানে বাবু। দু চারঠো বাত আপনার পাশ বুলে লিব। দু চারঠো আর্জি আপনার কাছে পেশ করব। এই

সব বলে কৈলাস দরজার ওপর বসে পড়ল। ফের বলতে থাকল, ওকে একটু দেখে লিবেন বাবু। আমি মর যায় তো ওয়ার কৈ না থাকল। দু চারঠো ঘাটের মরা দিয়ে গেরুকে বাঁচিয়ে দিবেন। আপ ওয়ার মা—বাপ!

ঘাটোয়ারিবাবু কোনো জবাব দিলেন না। কৈলাস কোনো জবাবের প্রতীক্ষা না করে চলে গেল। অনেকদিন থেকেই সে ভেবেছিল ঘাটোয়ারিবাবুকে গেরুর ভার দিয়ে নিজে খালাস পাবে। নিজের দায় থেকে মুক্তি পাবে, অথবা নিজের মৃত্যুর পর গেরুর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

ঘাটোয়ারিবাবু কৈলাসের কথা ভেবে একটু অন্যমনস্ক হলেন। একটু বিচলিত হলেন। লোকটা সারা জীবন মড়ার পিছনে ছুটে শেষ বয়সে অন্যের বাচ্চার জন্য হাউহাউ করে কাঁদতে চাইল। তিনি কৈলাসের চোখ দেখে যেন সব ধরতে পেরেছেন।

কৈলাস অফিসের বারান্দা থেকে নেমে এল। তাবিজের উপর দিন দিন যত বিশ্বাসটা ভেঙে যাচ্ছে, তত সে নিজেকে খুব অসহায় মনে করছে। তত গেরুর জন্য চিন্তা বাড়ছে। ঘুম থেকে উঠে সে দেখল গেরুটা ওর পাশে শুয়ে আছে। বেড়ালের বাচ্চার মতো ঘুম যাচ্ছে। ওর কেমন মায়া হল। কেমন করে গেরুর মার কথা মনে পড়ে গেল। সেই সুখের দিনগুলোর কথা এক এক করে মনে করতে পারল। যত মনে হল তত দুঃখ পেল। তত গেরুর জন্য মমতাবোধ বাড়তে থাকল। তত বাচ্চাটার জন্য ওর বেশি চিন্তা হল। ঘাটোয়ারিবাবুকে বলতে পেরে সে এখন যেন খুব হালকা বোধ করছে।

কৈলাস ঘরে ঢুকে এক ছিলিম তামাক খেল। গেরু ঘুমোচ্ছে—ঘুমোক! আজ আর গেরুকে ফরাসডাঙায় নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। পর পর দু রাত জেগে থাকলে শরীরটা ওর খারাপ হয়ে যাবে। সেজন্য কৈলাস হারিকেন জ্বালিয়ে এক ভাঁড় পচাই হাতে, বল্লম নিয়ে নদীর পথে নেমে পড়ার আগে বৌকে বলল, আজ ফের হামলা বাধাবি না ঘাটোয়ারিবাবুর দরজায়। তবে খুন করব বুলে দিলাম।

ঘাটের তিনটে চিতা তখন নিভে আসছে। কৈলাস নদীর পাড় ধরে ফরাসডাঙায় চলে গেল। খেয়াঘাটে আলো জ্বলছে। ওপারে গোরুর গাড়ির নিচে হারিকেন দুলছে। দুটো একটা শীতের ব্যাঙ গর্তে মুখ লুকিয়ে ক্লপ ক্লপ করল। নদীর ধারে লোক চলাচল কমে আসছে, শীতের রাত বলে পথ ঘন আঁধার না হতেই নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছে। শুধু নদীর ঢালুতে দু—চারজন লোক কাঁচা কয়লার আগুন ধরিয়ে ছইয়ের নিচে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছে। ছইয়ের নিচে হারিকেন ঝুলছে। লণ্ঠনের আলোয় ওদের মুখ শীতের রাতে গর্তের ভিতর ক্লপ ক্লপ শব্দ করা ব্যাঙের মতো। গঙ্গা—যমুনা মাটি শুঁকতে শুঁকতে সেদিক দিয়ে গেল। ওরা ব্যাঙের মতো মুখগুলো দেখে আর দাঁড়াল না। এখানে খাবার নেই এ—সব মুখ দেখে ওরা বুঝতে পারল।

গেরু ঘুম থেকে উঠে দেখল চালাঘরটায় সে একা। ঘরটায় কোনো লম্ফ জ্বলছে না। সে উঠে চারপাশের মাচানটা হাতড়াল। বাইরে একটা লম্ফ জ্বলছে। সৎমা ঘরে নেই গেরুর। সে তার শরীরের জড়তা নিয়ে মাচান থেকে নামল। সে বাপকে খুঁজল। বাপ চটানে নেই। ঘরে হারিকেন নেই, বল্লম নেই—বাপ আজ একাই ফরাসডাঙায় গেছে। বাপ ওকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেনি। বিরক্ত করেনি তাকে। বরং এক ভাঁড় পচাই মাচানের নিচে পড়ে আছে। সে বুঝল ওটা ওর জন্য রেখে গেছে বাপ। বাপের বৌটা এখন অন্য কোনো ঘরে হয়তো চাট দিয়ে পচাই গিলছে। চালাঘরে সে তার নিজের ভাঁড়টা দিয়ে মাংসের চাট খুঁজতে থাকল। এবং ভাবল নেলিকে ডেকে একটু পচাই খাওয়াবে। বাপ যখন ঘরে নেই, বাপের বৌটাও যখন নেই তখন তারা দুজনে নিশ্চিন্তে বসে এ—ঘরে পচাই গিলতে পারবে।

আগুনের পাশে চুপচাপ বসে আছে নেলি। উনুন থেকে আগুনের উত্তাপ নিচ্ছে। দুদিন পর বাপ দুটো অবেলায় খেয়ে, ঝাড়োর ঘরে একটু পচাই টেনে সকাল সকাল মাচানে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইচ্ছা করেই নেলি লম্ফ জ্বালল না। আঁধারটা ওর ভালো লাগছে। ওর ইচ্ছে এ—সময় গেরু এসে ওর পাশে বসুক একটু পোড়া কাঠের উত্তাপ নিক। মনু ডোমের ঢোল বাজানোর শব্দ আসছে না আর। ঝাড়ো ডোমের ঘরে সবাই ঝিমিয়ে পড়েছে। হরীতকীর ঘরে আলো জ্বলছে এখনও। বাচ্চাটা দুবার ট্যাঁট্যাঁ করে কাঁদল। কান্না শুনে নেলির ভারী আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছে বাচ্চাটাকে। পোড়া কাঠের আগুনে নেলির মুখ লাল। মনের ভিতর

এখন আগুনের রঙ। বুকের ভিতর ইতর শখগুলো গেরুর মতো একটা ছোট কাঠের পুতুল বানাতে চাইছে। সেজন্য সমস্ত শরীরে আগুনের রঙটা গলে পড়ছে যেন। নেলি বসে থাকতে পারছে না। গেরু হয়তো ফরাসডাঙায় গেছে। নতুবা সে এখন গেরুর ঘরে গিয়ে আর কিছু না হোক কাঠের পুতুলটার জন্য রঙ গুলতে পারত। নেলি দুদিন পর পেট ভরে খেতে পেয়ে চটানটাকে ফের ভালোবেসে ফেলল। সেজন্য মুখোমুখী বসে রঙ গুলতে চাইল সারারাত।

গেরু সন্তর্পণে এসে উনুনের ওপর মুখ বাড়াল তখন। —হামার ঘরে চল নেলি। গেরু ফিসফিস করে বলল যেন গোমানি না শুনতে পায়। —এক ভাঁড় পচাই আছে। তু আর হাম খাবে। ঘরে বাপ নেই, মায়ি ভি নেই। তু চল।

নেলি বলল, না যাবে না। তুর পচাই তু খা।

যাবি না ক্যানে? গেরু নেলির হাতটা চেপে ধরল।

হাত ছাড় গেরু। হাত না ছাড়বি ত বাপকে ডাকব।

তু চল নেলি।

নেলি উঠে পড়ল উনুনের পাশ থেকে। ওখানে বেশি কথাবার্তা বললে বাপ জেগে যাবে। বাপ তবে অনর্থ ঘটাবে। ওরা এসে শুয়োরের খাটালটার পাশে দাঁড়াল। কাঠগোলা বাঁদিকে রয়েছে। ওখানে ঘন আঁধার। ওখানে কোনো লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ওখানে বড় নির্জন, বড় নিঃসঙ্গ। সুতরাং নেলি জোরে কথা বলতে পারল। —তু যে বল্লমের হেকড় দিতে চাইলি দুখিয়াকে, যদি তোর জেল হয়, যদি তোর গলাটা যায় তখন কেমন হবে!

ও তুকে বেশ্যা বানাতে চাইছে।

বেশ্যা বানাতে চেয়েছে ত হয়েছেটা কী।

রামকান্ত খুব খুশি হচ্ছিল এ—সব বাতচিত শুনে।

তোর সাথ গেলে তুভি ত খুশি হবি। তু পচাই খেতে বুলে হামারে লোভ দেখাতে চাস।

গেরু জবাব দিতে পারল না। ওর এমনই যেন একটা ইচ্ছা শরীরে এতক্ষণ ধরে কাজ করছে। আঁধারে সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। নিজেকে অপরাধী ভাবল। আঁধারে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে শরীরের যন্ত্রণায় গেরু কথা বলতে পারছে না, থরথর করে কাঁপছে। অনেক আশা নিয়ে গেরু উনুনের ওপর মুখ বাড়িয়েছিল। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল সে দুদণ্ড নেলিকে কাছে পাবে বলে। নেলি হাসল। গেরুর হাত ধরে বলল, চল গেরু, পচাই লিয়ে নদীর ঢালুতে চল। লেকিন তু হামার গায়ে হাত না দিবি কথা থাকল। তু হামারে ঢালুতে বেশ্যা না বানাবি কথা থাকল।

সেই নির্জন আঁধারে গেরু প্রতিজ্ঞা করল যেন মাথা নেড়ে—সে কখনও হবে না। জান যাবে লেকিন বাত ঠিক থাকবে, গেরুর চোখেমুখে নেলির জন্য এমনই একটি আশ্বাস। গঙ্গা—যমুনা সঙ্গে থাকল। দরকার হলে গঙ্গা—যমুনা পাহারা দেবে।

সরীসৃপের মতো ঘন আঁধারের শরীর ভেঙে গেরু, নেলি মদের ভাঁড় নিয়ে নদীর ঢালুতে নেমে গেল। আঁধারে সাদা বালিয়াড়িটা বাসি দুধের মতো পড়ে আছে। ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে। বাবলার ঘন বনে জোনাকি জ্বলছে। দূরে শহরের বাড়ি ঘরে আলো, আঁধারে ওরা নদীর পাড়ে বসে। মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বড় ঘন এ—আঁধার! বড় গভীর এ—আঁধার—অথচ গঙ্গা—যমুনার চোখের মতো স্বচ্ছ। নেলি গেরুর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সারা আকাশ জুড়ে কত নক্ষত্র। নেলি ভালোবাসার জন্য বড় আকুল বোধ করছিল।

গাং শালিকের সেই শব্দটা কুনুয়া, কুনুয়া, কাকের সেই কাঠ কাঠ শব্দ—ক্ক ক্ক আর শালিকের শব্দ ঘেররো ঘেররো—মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে ভোরের কথা বলছে। ঘাসে ঘাসে শিশিরের জল। নালা ডোবায় মরা

ইঁদুরের পচা গন্ধ। ঝোপে জঙ্গলে পাতারা সব শুকোচ্ছে, পাতারা সব পচে, ফসিল হতে চাইছে। বেশ্যা পট্টিতে মেয়েরা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। হাতে পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা। সমস্ত রাত ওদের শরীরে বড় ধকল গেছে। ওরা আশা করছে বিছানাতেই যদি এক কাপ চা হত।

গঙ্গা থেকে স্নান সেরে ওঠার সময় ঘাটোয়ারিবাবু স্তোত্র পাঠ করেন। তারপর গীতার প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্ব। শিবমন্দিরের পথ ধরে উঠে আসার সময় কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠেন মাঝে মাঝে। কারণ এক সময় ডানদিকের পথটা ধরে তিনিও সে অঞ্চলে ধাওয়া করতেন। আজ তারা আর নেই। সময় বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে। তিনি যখন চেয়ারে বসে থাকেন, অথবা শূন্য দৃষ্টিতে যখন ঘাটটা পর্যন্ত শূন্য ঠেকে, তখন এইসব স্মৃতি মনে করতে পারেন, তখন তাদের ভালোবাসার কথা মনে হয়। তাদের অনেক সুখ দুঃখের কথা মনে হয়। তিনি পথের পাশে সেজন্য রোজ একটু থামেন। যারা একে একে এই পথ ধরে বের হয়ে আসে তাদের তিনি দেখেন। কোনো পরিচিত ভদ্রলোককে দেখলে মুখ টিপে হাসেন। তখন আকন্দ গাছটার নিচে তোলা ছবিগুলোর কথা মনে হয়। আকন্দ গাছটার নিচে আবার যখন ছবি উঠবে তখন ছবিতে তারাও জায়গা পেয়ে যাবে।

তিনি অফিসঘরে ঢোকার সময় শুনলেন গোমানি ডোম মাচানে পড়ে পড়ে কাশছে। তিনি বিরক্ত হয়ে দেওয়ালের ছবিগুলোয় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। —বেটা শালা মরবে। কেশে কেশে মরবে। সেজন্য বেটা তুই ভাবিসনে, আকন্দ গাছটার নিচে তোর ছবি উঠবে। ভাবিস না বাবুদের মতো তোর ছবিও আমি ঘরে রাখব। গোমানিকে তিনি মনে মনে যতটা পারলেন গালমন্দ দিলেন। তা ভাবিস না বাপু তা ভাবিস না। যারা ইতর, বদমাইস তাদের ছবি আমি রাখি না। তাদের ধূপধুনো আমি দিই না।

ঘাটোয়ারিবাবু ঘরে ঢুকে প্রতিদিন যা করেন, আজও সেইসব কাজগুলো করলেন। ভিজা গামছা দিয়ে দেওয়ালের ছবিগুলোকে মুছে দিলেন। সামনের আকন্দ গাছটার নিচে এক ঘটি জল ঢেলে দিলেন। যতবার এই গাছটার নিচে ছবি উঠেছে, ততবার তিনি একখানা ছবি পাবার আশা রেখেছেন। কেউ দিয়েছে, কেউ কেউ দেয়নি। যারা দিল তাদেরগুলো তিনি সযত্নে দেয়ালে টাঙালেন। ধূপধুনো দিলেন। বললেন, হরিবোল। বললেন, পরমব্রহ্ম নারায়ণ। প্রত্যেক কাজগুলো এখনও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে করেন। তারপর ভিজা কাপড় ছেড়ে শরীরে চাদর জড়িয়ে জানালায় উঁকি দিলেন—কেউ উঠেছে কিনা চটানে, কেউ এদিকে আসছে কিনা দেখলেন। এ সময় একটু মহাদেবকে, বাবা ব্যোম ভোলানাথকে স্মরণ করার দরকার হয়। তার পায়ের তলায় বসে প্রসাদ পেতে ইচ্ছে হয়। এখন কৈলাসের আসার কথা, গোমানির আসার কথা, শীতের ভেতর ওরা ল্যাং খেতে খেতে আসবে।

সামনের বারান্দায় ঝাড়ো ডোমের বেটারা কাঁথা—কাপড়ের নিচে থেকে উঁকি মারছে। এ ভোরে মনুডোম পায়রা ওড়াচ্ছে আকাশে। নেলির বাঘের মতো কুকুর দুটো চোখ মেলে আকাশ দেখছে। আর এ—সময়ই ছোট চাকুটার দরকার হয় ঘাটোয়ারিবাবুর। এক ছিলিম গাঁজা, হলদে একটা নেকড়ার দরকার হয়। যত ভোরের সূর্য উপরে উঠবে ততই নেশার জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করবে। ততই তিনি গোমানি ডোমের প্রতীক্ষায় ঘরময় পায়চারি করবেন। ততই তিনি এই চটানের ওপর অধীর হবেন।

তিনি ফের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে যখন দেখবেন, কেউ উঠছে না, কেউ এদিকে আসছে না, তখন অগত্যা ডাকতেই হল, ওরে শালা গঙ্গাপুত্তুরের দল, ওরে শালা গোমানি, তোরা ঘুম থেকে উঠবিনে।

বাবুর ডাক শুনে গোমানি ডোম চালা ঘরটার মাচানে ধড়ফড় করে উঠে বসল। বাবু ডাক দিয়েছেন।

পড়ি কী মরি করে এখন ছোটার ইচ্ছা ওর। সে এই ডাকের জন্যই মাচানে এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছিল। ঘাটোয়ারিবাবু ডাকবেন—তবে সে উঠবে, তবে সে যাবে। ভোরে দরজায় বসে থাকলে বাবু খেঁকিয়ে উঠেন। —মাগনা গ্যাঁজা টানতে এয়েছেন। ভাগ বেটা ভাগ। গোমানি সেজন্য মাচানে শুয়ে প্রতীক্ষা করছিল এতক্ষণ।

গোমানি ধীরে মাচান থেকে নামল। নেলি টের পাচ্ছে না। সে যাচ্ছে। যাবে। শীতে পা ফেটে গেছে। জায়গায় জায়গায় গোড়ালিটা হাঁ করে আছে। মাটিতে পা ফেলতে বড্ড কষ্ট। মাটিতে পায়ের চাপ যত বাড়ছে

মুখটা ততই কাতর হয়ে উঠছে।

ধীরে ধীরে পা মাটিতে চেপে চেপে গোমানি চলার মতো করে নিজেকে রপ্ত করে নিল। সামান্য আমের আঠাটুকু উনানে তাড়াতাড়ি গরম করে গোড়ালির ফাঁকে ফাঁকে লাগিয়ে নিল। তারপর খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকল এবং কোনোরকমে ঘাটোয়ারিবাবুর ঘুরে ঢুকে গেল। বলল, আমি যে বাবু উঠেই আছিগ! কাশিতে আর ঘুম আসে কৈ। গোমানি গায়ের কাঁথাটা শরীরে ভালোভাবে জড়িয়ে ফের খকখক করে কাশল। কাশতে কাশতে নুয়ে পড়ল। কাশির গমক কমে এলে বাবুর দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, মন চিন্তা করল বাবুর কাশি না শুনলে আর উঠছিনে। লেকিন বাবু আজ আপুনি ত কাশলেন না।

ঘাটোয়ারিবাবু জবাব দিলেন—চোখ দুটো লাল। তিনি জবাব দিলেন—চোখ দুটো গোলকের মতো হয়ে উঠছে। —আমার ন্যাজোরের ছাও! আমার কাশি না শুনলে বাবু উঠবেন নি! শালা ডোম আমি কী তোর মতো। কাশি আমার লেগেই থাকবে। আমি কী শালা ইসপিরিট খোর! তোর মতো কাশি না থাকলে ভোরে আমার ঘুম ভাঙবে না!

গোমানি জানে এ—সময় কোনো উত্তর দিতে নেই। ভালো কী মন্দ—যে—কোনো জবাবে বাবু চটবেন। বাবু গালমন্দ করবেন। এক ছিলিম গাঁজার জগৎ থেকে ওকে তাড়িয়ে দেবেন। সেজন্য গোমানি কোনো জবাব দিল না। ছোট চাকুটা কাঠের ওপর শুধু ঘষতে থাকল।

শীতে বাবুর হাত দুটো বরফ হয়ে গেছে। তিনি দুটো হাত চকমকি কাঠের মতো ঘষলেন। গোমানি এখন নিচে বসে প্রসাদ তৈরি করছে। গোমানিকে দেখলে গহনির কথা মনে হয়, ঘাটোয়ারিবাবুর। কোনো এক বর্ষার কথা মনে হয়, কোনো এক বীভৎস মৃত্যুর কথা মনে হয়। মৃত্যুর পর গহনির মুখটা যেমন বীভৎস ছিল, এখন এই ঘরে গোমানির মুখ যেন তেমন। যেন সেই গহনির মৃত্যুর পর ওর মাথার লক্ষ লক্ষ উকুনের গৃহত্যাগের পরিণামের মতো। বড় কষ্টে মৃত্যু, বড় শোকে মৃত্যু।

কলকেতে আগুন দিয়ে গোমানি বাবুকে বাড়িয়ে ধরল,—নেন বাবু।

বাবু এ—সময় একটু অন্যরকম হয়ে পড়েন। গাঁজা ফোঁকার আগে তিনি পৃথিবীর পরিণাম ভেবে বড় বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তিনি কলকেতে হলদে নেকড়াটা জড়িয়ে নেবার সময় বললেন, গোমানিরে! —একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ফুসফুসের সমস্ত শ্বাসটা খালি করে কলকেটা এবার মুখে চেপে ধরলেন।

গোমানি আসনপিঁড়ি বসে নন্দীভৃঙ্গি সেজে আছে। বাবু এখন কী কী কথা বলবেন এবং কী জবাব দিতে হবে সব গোমানির ঠিক করা আছে।

বাবু ধোঁয়া টেনে ফের ডাকলেন—গোমানিরে!

বুলেন বাবু!

লাশ—কাটা ঘরে তুই হাজার কিসিমের মড়া চিরেছিস নারে?

তা অনেক বাবু। বহুত। হাজার হয়ে যাবে বাবু। জোয়ান মেয়ের পেট চিরেছি। পেট চিরে বাচ্চা বের করেছি কত।

নেশার জগতে ঘাটোয়ারিবাবু লাশ—কাটা ঘরে চলে যান! টেবিলের সেই সব যুবতী মেয়ের পাশে তিনি বিচরণ করতে থাকেন। লাশ—কাটা ঘরের গল্প শুনে তিনি মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠেন। সেইসব টেবিলের পাশে বিচরণ করতে করতে মনে হয় তিনি পাগল হয়ে গেছেন অথবা মাতাল। লাশ—কাটা ঘরে তিনি প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ান। লাশ—কাটা ঘরের গল্প, নেশার ঘোরে বড় জমজমাট। তিনি বললেন—তারপর গোমানি?

তারপর ওরা কলকেটা আরও দুচারবার হাত বদলাল। কলকেতে যখন কোনো আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন চুপ হয়ে বসবে। কেউ কোনো কথা বলবে না। গোমানি না, বাবু না, কৈলাস থাকলে সেও না। চুপচাপ বসে নেশা হজম করবে। দেখলে মনে হবে, ওরা দু'জন চটানের বাইরেকার মানুষ। ওরা দুজন চটানের বুকে সন্ন্যাসী। বাইরের জানালায় তখন রোদ নামব—নামব করছে। পাশের কলতলায় দুটো একটা মড়া আসতে

শুরু করেছে। চটানের মানুষগুলো এক দুই করে যে যার কাজে নেমে যাচ্ছে। খাটালে শুয়োর নেই। ঝাড়ো ডোম লাঠির দুপাশে ডালা কুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মনু ডোমের কবুতরগুলো নেমে এসে ঝাউগাছটায় বসল। মংলি তোশক—লেপ থেকে তুলা বের করছে। হরীতকী জল রোদে দিয়ে বাচ্চা পাহারা দিচ্ছে। কার বাচ্চা, কে জন্ম দিল, সে সব এখন আর হরীতকীর মনে নেই। সে মা হতে পেরেছে ওর কাছে এটাই বিলকুল সত্য।

গত রাতে নেলিও মা হতে চেয়েছিল নদীর ঢালুতে। খুব শখ জন্মেছিল বালিয়াড়িতে গেরুকে নিয়ে পড়ে থাকতে। কিন্তু গেরু তখন বলেছে—তুকে হাম বেশ্যা বানাবে! তু হামারে ও বাত না বলিস। দোহাই তুর ডাক—ঠাকুরের। কিন্তু নেলি যথেষ্ট পরিমাণে পচাই গিলে মাতাল হয়েছিল। শপথের কথা ভুলে গেছিল। রাতের আঁধার, বালিয়াড়ির বাসি দুধের মতো রঙ ওর মা হওয়ার ইচ্ছাকে প্রকট করে তুলেছিল। সেজন্য প্রথমে গেরুর হাত ধরে টেনেছে নেলি, তারপর গেরুকে জড়িয়ে ধরে পিষে ফেলার উপক্রম। নেলি যেন ডাইনি বনে গেল। গেরু ভয় পেল। নেলির চোখ দুটো কেমন সাপের চোখের মতো হয়ে উঠেছে। আর বলেছে, তু হামারে ছেড়ে দিস না গেরু। শক্ত করে ধর। তু ছেড়ে দিলে হামি বাঁচবে না। শরীরে আগুন জ্বলছে। হামারে তু থোড়া শান্তি দে, শান্তি দে তু।

তবু যখন গেরু হাত দিয়ে ঠেলে দিচ্ছিল নেলিকে, যখন নিজের কাপড়টা সামলাচ্ছিল, শরীর আড়াল দিচ্ছিল এবং ওর নেশা ভাঙাবার জন্য বার বার বলছিল, ও ঠিক না আছে, তখন নেলি বলছিল, তু গেরু মা হতে দিবিনে। হামারে বাঁচতে দিবিনে চটানে! তারপর বালিয়াড়িতে সামান্য ধস্তাধস্তি হয়েছিল। গেরু যত জোর করে শরীরটা সরাতে চেয়েছে, তত নেলি গেরুকে দু হাতে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত গেরু বাধ্য হয়েছিল নেলিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে এবং চটানে ছুটে আসতে। নেলি সত্যি যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে—ডাইনি বনে যাচ্ছে। দুখিয়া যেন ঠিক বলেছে। অথবা পাগল হয়ে গেল। নেলি মা হওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেল। চটানে উঠে এসে সে হালকা বোধ করেছিল।

সে নিজেকে বাঁচাবার জন্যই হাঁপাতে হাঁপাতে চটানে এসে উঠেছিল। সেজন্য ভোরে নেলির মাচানে নেলি পড়ে থাকল, গেরুর মাচানে গেরু। গত রাতের ঘটনার কথা ভেবে ওরা আবার দেখা করতে লজ্জা পাচ্ছিল। ওরা উঠছিল না সেজন্য মাচান থেকে। ঘুমের ভান করে মাচানে পড়ে আছে। যেন কত ঘুম চোখে। যেন কতকাল ওরা ঘুমায়নি। অথবা ভোরের এই ঘুমটা ওদের ছাড়তে চাইছে না। ওরা যতটা পারছে ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

জানালায় রোদের রঙটা আরও ঘন হয়েছে। মেঝেতে রোদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। এখন ঘাটোয়ারিবাবুর শরীরে রোদ, মুখে রোদ। জানালা পার হয়ে একটা লোক নেমে গেল। গিরিশ বুঝি। বাবুচাঁদের বাপ। রেলের ঘুন্টিম্যান। সে সময়ে ওপারে যায়। বাবুচাঁদ শুয়োরের ব্যবসা করে। পাকা ঘর তুলেছে ব্যবসা করে। চটান থেকে দূরে ঘর করেছে। খাটালের জায়গাটুকু এখনও ছাড়ছে না। বাপ পিতামহের জায়গা ছাড়তে নেই।

ঘাটোয়ারিবাবু এখানে বসে খাটাল দেখতে পাচ্ছেন। কাঠগোলা পার হলে বাবুদের পুরোনো দেয়াল। তারপর ভদ্র পল্লী। তিনি জানেন সেখানে যারা বাঁচে, তারা চটানের মতো বাঁচে না। সেখানে ঘর আছে, গৃহিণী আছে। পুত্রকন্যা আছে। দৈনন্দিন বাজার হিসাব আছে। সুখ আছে, দুঃখ আছে, কিন্তু চটানের মতো আগুন নেই। নাচন—কোঁদন নেই।

ঘাটোয়ারিবাবুর চোখ দুটো জ্বলছে তখন। গোমানি ডোম তখন ঝিমোচ্ছিল। তিনি ডাকলেন, এই শালা ঝিমোচ্ছিস যে। মাগনা প্রসাদ পাও বলে তার দাম দিতে জান না!

আজ্ঞে হামি ত ঢুলছি। ঝিমোচ্ছি না।

রক্তের তেজ এখন নেই নারে?

বাবু ও বাত কেনে বুলছেন?

বলব না! তুই ত পেট চিরেছিস, কিন্তু পেট চিরে বাচ্চা বের করেছিস?

কত! কত!

কত! কত! ঠোঁট উলটে বাবু বিদ্রূপ করলেন, কটা করেছিস?

কত হবে? সে যে অনেক বাবু লেখাজোখা নাই। তা হাজার হবে বাবু ধরে লেন।

তুই বললি আর অমনি আমায় ধরে নিতে হবে।

তবে হামি ত নাচার বাবু। হামার ত লেখাজোখা নাই।

তা থাকবে কেন, শালা মদখোর। নেশা করে ভাঙ খেয়ে জীবনটাকে জাহান্নমে দিচ্ছিস। তুই ত নিজের মেয়েটাকে দেখিস নারে? ভালবাসিস নারে! রাতে কোথায় ভাগে সে খবর তুই নিস!

পাশের দরজায় কে ঠকঠক আওয়াজ করছে। দরজার কড়াটা কে যেন ঠকঠক করে নাড়ল। তিনি বিরক্ত হলেন। তবু পা দুটো নামালেন চেয়ার থেকে। অভ্যাসবশত বললেন—কোত্থেকে মড়া এল। কী নাম মড়ার?

কাউন্টারে একটা মুখ দেখা গেল। কাউন্টারের মুখটি খুব বিনীত। উত্তর আরও বিনীত। লোকটি বিনীত। লোকটি জবাব দিল,—আমি মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এসেছি।

ঘাটোয়ারিবাবুর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। দুনিয়ায় ঐ একটি জায়গাকেই ওঁর যত ভয়। কোনো সমন নেই ত! কোনো নালিশ! কোনো আর্জি অথবা মেয়েদের কথা। তিনি তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। —আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য! বসুন। চেয়ার টেনে দিয়ে কথাগুলো বললেন। ওরে বেটা মুখ্যু কী দেখছিস? যাঃ দরজা খুলে দে। দ্যাখ কে এসেছেন।

গোমানি ল্যাং খেতে খেতে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিল। শেষে এক কোণায় চুপচাপ বসে বাবুকে দেখতে থাকল।

আপনাকে ত এর আগে দেখিনি! যদি দয়া করে....।

আমি নতুন ঘাটোয়ারিবাবু হয়ে এলাম।

ঘাটোয়ারিবাবু ঠিক যেন ধরতে পারছেন না কথাটা। দেয়ালে ছবি টাঙানো। কোণায় গোমানি বসে, দু—একটা মোরগ খুঁটে খুঁটে পোকামাকড় খাচ্ছে। আকন্দ গাছটার পাতায় প্রজাপতি একটা। নানা রকমের সব রঙ ঝুলছে আশেপাশে। ঘাটোয়ারিবাবু এসব ধরতে পারছেন এবং বুঝতে পারছেন, অথচ এই সাধারণ কথাটা তিনি যেন ধরতে পারছেন না। দুঃখ। দুঃখ। ঘাটোয়ারিবাবু খুব ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন এখন। —আপনি কী বললেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আপনার মতো আমিও এ—ঘাটে থাকব। আমি নতুন ঘাটোয়ারিবাবু। সুপারিশের জোরে কাজটা হল। বাবাকে হয়তো চিনবেন, তিনি ট্যাক্স কালেক্টর। অনেক ধরে কাঠ—খড় পুড়িয়ে তবে চাকরি।

দয়া করে নামটা।

বাবার নাম?

কী তোমার নাম বাপু! কাজ ত আমার শেষ হয়ে এল বুঝতেই পারছি। ট্যাক্স কালেক্টর ত চার পাঁচ জন আছেন। কোন জনের তুমি বাপু।

আপনি তেমন ভাববেন না। বুড়ো হয়েছেন বলে আমাকে ওরা কাজটা দিল।

ওহে ছোকরা, তেমন কথা আমি তোমাকে কী বলছি! চাকরি আমার নেয় কে। কার বাবার সাধ্য আছে নেয়। নামটা শুনি এবার।

নতুন বাবু খুব বিব্রত বোধ করছিলেন। তিনি নামটা বললেন, দুঃখভঞ্জন ভট্টাচার্য।

আপনি বামুনের ছেলে ছিঃ ছিঃ কী ব্যবহারটাই না করে ফেললাম। দয়া করে দোষ ধরবেন না। ব্রাহ্মণ! কুলশ্রেষ্ঠ! উপনিষদ পড়েছেন? কঠোপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ, কেনোপনিষদ? পড়েননি? তবে পড়বেন। এখানে যখন ভিড়ে গেছেন তখন একবার পড়তে হবেই। উপনিষদ বলে—পুরুষ আপাদমস্তক পবিত্র। দৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহাদের প্রাণ আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আবার মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। এবং মনুষ্যগণের মধ্যে

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। এসব কথা আমার নয় দুঃখভঞ্জনবাবু। এ—সব কথা মনুর। বলে, ঘাটোয়ারিবাবু গড় হয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হলেন নতুন বাবুকে।

দুঃখবাবু ফের বিব্রতবোধ করতে থাকলেন। বড় অদ্ভুত এ—জায়গা তিনি ভাবলেন। তিনি বললেন, এ কী করছেন। ছিঃ ছিঃ বয়সে কত বড় আপনি। না না এ ঠিক হল না আপনার।

ঠিক হয়নি বলতে চান? যেন ঘাটোয়ারিবাবু নতুন বাবুর অপরিপক্কতা ধরে ফেলেছেন। তিনি হেসে আর বাঁচলেন না।

তিনি সামনের টুলটায় বসে খুব উদাসীনের মতো বললেন, ঠিকেরই বা কী আছে আর বেঠিকেরই বা কী আছে। সবই ঠিক সবই বেঠিক। দেখুন না আমাকে? অর্থাৎ আমার এই শিবরাম ঘোষকে। কতকাল এখানে আছি, কত ঠিকও দেখলাম, কত বেঠিকও দেখলাম, কত ঠিকবেঠিক হল—অথচ রেহাই কারও থাকল না। না আমার, না আপনার। মা শ্মশানী সকলকে গিলে খাচ্ছে। খাবে। আমাকে খাবে, আপনাকে খাবে, সকলকে খাবে। সকলকে গিলে খাচ্ছে আর শান্তি দিচ্ছে। কী পাপী কী তাপী! তবু প্রণাম করলাম আপনাকে, আপনি কুলশ্রেষ্ঠ বলে, আপনি জাতসাপের বাচ্চা বলে। ঠিক বেঠিক বুঝিনি, মন চাইল কাজটা হয়ে গেল। এবারে বসুন। চা খান। প্রসাদ পেয়ে সুখী হই।

মাচানে শুয়ে শুয়ে সব শুনতে পাচ্ছে নেলি। কে এমন এসেছেন এই চটানে, যাকে ঘাটোয়ারিবাবু পর্যন্ত সমীহ করে কথা বলছেন। দুনিয়ায় তবে তেমন লোকও আছে, ঘাটোয়ারিবাবু সমীহ করেন! প্রথম ভালো লাগল, পরে খারাপ লাগল ভাবতে। ঘাটোয়ারিবাবুর উপরওয়ালা কেউ থাকুক সেটা ওর ভালো লাগল না। মন চাইল না। সুতরাং খুব ইচ্ছা হচ্ছে উঠে দেখতে—তিনি কে, তিনি কেমন। ইচ্ছা হচ্ছে দেখতে ঘাটোয়ারিবাবুর চোখ—মুখ এখন কেমন দেখতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাটোয়ারিবাবুর কথা শোনারও ইচ্ছা। নেলি সেজন্য মাচান থেকে নেমে শরীরে কাঁথা—কাপড় জড়িয়ে ঘাট—অফিসের বারান্দায় উঠে এল। জানালা দিয়ে সে উঁকি দিল। বাবু বসে আছেন, নতুন মানুষটি চা খাচ্ছেন। বাপ খাচ্ছে। ওদের খেতে দেখে তিনি যেন কৃতার্থ হচ্ছেন। রামকান্তের দোকান থেকে চা এসেছে, নেলি বুঝতে পারল। ছোকরা চাকরটা এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। নেলির এ—সময় ইচ্ছা হল জানতে, মড়া এল না ত! ঘাটোয়ারিবাবুর কোনো পরিচিত জন যদি দূর থেকে মড়া নিয়ে আসে।

নতুন বাবু দেখলেন জানালায় একটি বেশ মিষ্টি মুখ পরম কৌতূহল নিয়ে ওকে দেখছে। নতুন বাবু চোখ তুলতেই মেয়েটা চোখ নামাল। নতুন বাবু বললেন,—মেয়েটা কে?

গোমানি ডোমের বাচ্চা। এই যে গোমানি—বড় মজাদার লোক। এসেছেন যখন নিশ্চয়ই টের পাবেন। বেটা হাসপাতালে লাশ—কাটা ঘরে কাজ করে। বেটা ইসপিরিট খোর। মদ, ভাং, গাঁজ খেয়ে সারাদিন চটানে পড়ে থাকে।

গোমানি নতুন বরের মতো মাথা গুঁজে বসে আছে। এবং মাঝে মাঝে বলছে—কী যে বুলছে বাবু।

নেলি জানালা থেকে প্রশ্ন করল—মানুষটা কে বাবু?

আয়, আয়। ভিতরে আয়। আমাদের নতুন ঘাটোয়ারিবাবু। জাত সাপের বাচ্চা।

নেলি ভিতরে ঢুকল। দূর থেকে গড় হয়ে প্রণাম করল। তারপর জড়োসড়ো হয়ে নতুন বাবুকে এক কোণায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল। তখন এক এক করে সবাই উঠে এল। সবাই গড় হল। গড় হয়ে সবাই দুঃখবাবুকে চটানের নতুন ঘাটোয়ারিবাবু বলে মেনে নিল।

নতুন বাবু আবার জানতে চাইলেন, এখানে ক'ঘর ডোমের বাস?

হবে ছ'সাত ঘর।

বেশ। বেশ। নেলির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম কিগো মেয়ে?

হামার নাম? হামার নাম নেলি। গোমানি ডোম হামার বাপ।

তখন গেরু উঠে এসেছে মাচান থেকে। কৈলাস ফিরেছে ফরাসডাঙা থেকে। দুখিয়া, মনু, বাবুচাঁদ সকলে এসে জড়ো হয়েছে অফিস বারান্দায়। নতুন ঘাটোয়ারিবাবুকে ওরা দেখতে এসেছে। ওদের ভক্তি জানাতে এসেছে। গেরু দেখল বাবুকে—বাবু ওরই মতো সুঠাম, সুপুরুষ। চোখ দুটো বড় বড়। মুখটা ডিমের মতো মসৃণ। সেজন্যই মনে হল সকলের—চটানে মানুষটা বড় বেমানান। অমসৃণ চটানে মসৃণ মানুষটাকে শেষ পর্যন্ত কারও যেন ভালো লাগল না।

নতুন বাবু চলে যাবার পরই এক এক করে সব মনে হতে থাকল ঘাটোয়ারিবাবুর। মনে হতে থাকল আর দুঃখ পেতে থাকলেন। তিনিও একদিন মৃত্যুর ইজারা নিতে এসে দেখেছিলেন পুরানো ঘাটেয়ারিবাবুকে। দেখেছিলেন গহনির স্বামী সোনাচাঁদকে। সোনাচাঁদ তখন ঘাটের ইজারাদার হয়ে বসে আছে, ঘাটোয়ারি হয়ে বসে আছে। মাথায় বড় বড় পাকা চুল। গোঁফ ঝুলে পড়েছে—সাদা। মুখ পাঁচের মতো লম্বা—বনমানুষের মতো চেহারা। শিবরামকে দেখে প্রথম দিন সোনাচাঁদ চটানের এক কোণায় গুম হয়ে বসেছিল। তখন এখানে জলকল ছিল না, গ্যাসপোস্টে আলো ছিল না, বাবু মানুষদের বাড়িগুলো দূর দূর ছিল। ডহর—ডোবায় চারিদিক ভর্তি। চারিদিকে তখন ঘন জঙ্গল। নদী ভেঙে এত এদিকে আসেনি। এ—পারে নদীর কোনো চর ছিল না। এত লোকজন ছিল না, এত মৃত্যু ছিল না। এত মানুষ ছিল না। ক'বছরে শহরটা ভরে গেল যেন। কোত্থেকে সব হুড়হুড় করে লোক এসে এই বেওয়ারিশ জায়গাটাকে পর্যন্ত দখল করে বসল। তখন মিউনিসিপ্যাল অফিসের নজর এল এদিকটায়, জলের কল এল। আলো এল। ট্যাক্স বসল। শিবরাম ঘোষ বুড়ো হলেন।

অশ্বত্থ গাছটা তখন নতুন। সবে সজাগ হয়ে আকাশে ডালপালা মেলে ধরেছে। শিবমন্দিরের পথ ধরে গঙ্গায় নামতে সিঁড়িটা নতুন হচ্ছে। সিঁড়িটা রসকলির মা নিজের নামে গড়িয়ে দিচ্ছে। তোমাদের পদরজ দাও মোরে—নামাঙ্কিত মারবেল পাথরটা গাঁথা হচ্ছে। রসকলির মা নিজের নামে সিঁড়ি বাঁধাতে চাইল। জীবনের সব পাপ ধুয়ে মুছে দেওয়ার জন্য শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করল সে। ঘাটোয়ারিবাবু সব চোখের সামনে দেখেছেন। অন্ধকার গলির মোড়ে সেদিন কত লোক! কত আলো! কত দীন—দরিদ্র! কত ব্রাহ্মণ! কত অলীক ভোজন! কত দান—ধ্যান! রসকলি তখন মাত্র নতুন ব্যবসা ফেঁদেছে। পুরানো বাবুরা চলে যাচ্ছেন ভোজ খেয়ে। তারা আর রসকলির মা সুরবালাকে পাবে না। সুরবালা তীর্থ করতে যাচ্ছে। যাবার আগে এই সব কাজগুলো করে যাচ্ছে।

এই সব ভাবনার ভিতর আরও দূরে চলে যেতে থাকলেন তিনি। অনেক সব কথা মনে হতে থাকল তাঁর। দুঃখবাবু এসে পুরনো দিনের সব স্মৃতিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন; যত মনের গভীরে ভেসে উঠছে তত বিষণ্ণ হয়ে পড়ছেন। দুঃখবাবু চটানে যেন আজ ওঁর স্মৃতির ঘরে লুকোচুরি খেলতে এসেছিলেন। গহনির শাপশাপান্ত এতদিন ওঁর জীবনে যথার্থভাবে দেখা দিয়েছে। দুঃখবাবু না এলে এই কথা মনে হওয়ার নয়। তিনিই যে ঘাটের একমাত্র ইজারাদার নন, মৃত্যুর হিসেব—নিকেশের একমাত্র বাবু নন, দুঃখবাবু আজ বড় বেশি হঠাৎ যেন সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল। বড় বেশি—সহসা তিনি বুঝতে পারলেন সোনাচাঁদের হিসেবের মতো দুঃখবাবুও শিবরামের হিসাব রাখবে। সাং—আজিমগঞ্জ, পিতার নাম—হরেরাম ঘোষ। পেশার কথা লিখবে কি? তিনি লিখেছেন কি? তিনি দেয়ালে টাঙানো সব ছবিগুলো দেখলেন। ওরা যেন আজ প্রথম সকলে মিলে হাসল। ঘাটোয়ারিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা দেখছি। দেওয়ালের ছবিগুলো যত হাসল, তত তিনি ভয় পেতে থাকলেন। তত মৃত্যুর জন্য বেশি চিন্তা করছেন। মৃত্যুর শক্ত মুঠোতে তিনি হাঁসফাঁস করছেন। ভয়ানক! বীভৎস! তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন। নিঃসঙ্গ—নিঃসঙ্গ। সব নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। বড় একা, বড় বেশি একা তিনি আজ।

স্মৃতির ঘরে অনেক চেষ্টা করেও মাকে মনে করতে পারলেন না, অথবা মাকে দেখতে পেলেন না। তিনি সেই স্মৃতির ঘরে যখন খুব ছুটোছুটি করে মায়ের দেখা পেলেন না, তখন তিনি যেন বাধ্য হয়ে চিৎকার করে উঠলেন—মা! মা! এখন তিনি বুঝতে পারছেন মাকে না মনে হওয়ারই কথা। অথচ তিনি গল্প শুনছেন মার।

জানালার গরাদে মুখ রাখার সময় সেই সব শোনা কথা সত্য ঘটনা বলে মনে হয়েছে। তিনি তখন মাকে দেখতে পান। সেই ঘরটা দেখতে পান। পাটকাঠির সেই ঘরটায় ভাঙা জানালা, খড়ের ঢাল—মা মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, সে মার আশেপাশে দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছে এবং মাকে ঘুম থেকে জাগাবার জন্য নানারকমের ফন্দিফিকির আঁটছে। মা কিন্তু ঘুম থেকে জাগলেন না। মায়ের মৃত্যুটা এমনই নাকি কিছু একটা ঘটনা।

বাবার মুখটা মনে পড়লে ওঁর মুখটা আরও কুৎসিত হয়ে ওঠে। তিনি বড় হয়ে এসব কথা শুনেছেন। তিনি সব মনে করতে পারেন। সেই নিঃসঙ্গ দুঃখদায়ক দিনগুলোর কথা মনে করতে পারেন। তখন বাবা দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছেন। বাবা যাকে নিয়ে ঘর করতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাকে ঘরনি পেলেন। ঘাটোয়ারিবাবুর জীবনে দুঃখ বাড়ল। দুঃখ ঘনীভূত হল। তিনি ঘর ছেড়ে পালাতে চাইলেন।

স্মৃতির ঘরে এখন রসকলি হাঁটছে। গলিটার স্মৃতি জাগছে। ছোট ছোট দরজা, ঘিঞ্জি গলি। মুখে সাদা রঙ মেখে, চোখে কাজল টেনে, গ্যাসপোস্টের আলোর নিচে ওরা দাঁড়াত। কেবল রসকলির বাঁধা খদ্দের। ওর ঘরে তখন হারমোনিয়াম বাজাত, ঘুঙুর বাজত। রসকলি ওদের মতো আলোর নিচে দাঁড়াত না, চোখ—মুখ প্রকট করে তুলত না। অথচ ঘাটোয়ারিবাবু মনে করতে পারছেন না সেদিন কী করে এই সব মুখ ঠেলে রসকলির ঘরে গিয়ে উঠেছিলেন। কী করে বাঁধা খদ্দেরের মতো বলেছিলেন—বাহবা অঃ হঃ! বড় সুখের মুখ, সোহাগের মুখ! বড় কমনীয়! কমনীয়? অঃ হঃ!

অভদ্র! শুয়োরকা বাচ্চেচ! দু—চারজন ভদ্রলোক—যারা আসর গরম করছিল তারা এমন সব কথা বলে শিবরামকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিল।

শিবরামের চোখ—মুখ জ্বলছিল—প্রথম মাত্রারিক্ত মদ খেলে যা হয়।

শরীরে জড়তা আসছিল, জিভ টানছিল। কথা জড়িয়ে আসছিল। সে কথা বলতে পারছিল না। তবু বলার চেষ্টা করল—অঃ হঃ! সখী আমার! শ্মশানের বীভৎস গ্রাস দেখে সে ভেঙে পড়েছিল সেদিন। সে মদ খেয়েছিল সেদিন। প্রথম মদ খেয়েছিল। প্রচুর মদ।

বদমাস লোকটাকে বাহার নিকালো। আসর গরম—করা লোকগুলো ওকে চ্যাঙদোলা করে বাইরে বের করবার ব্যবস্থা করছিল।

সে চ্যাঙদোলায় দুলতে দুলতে বলল, তোমরা কী করছ! যাচ্ছি। বেশ যাচ্ছি। তারপর ঘাড় কাত করে বলল, সুন্দরী, আমি থাকব না, আমি থাকব না। আমি জল খাব। বুকে হাত রাখার চেষ্টা করল শিবরাম ঘোষ।

রসকলি দেখল। সব দেখল। শিবরাম ঘোষের শরীরের শক্ত বাঁধুনি দেখল। চওড়া কাঁধ দেখল। ডাগর চোখ দেখল। শিবরামের বুকে পিপাসার কথা শুনল। সে একটু দুলে বলল, ওকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ও গান শুনুক। ওকে বসতে দাও।

সকলে এতটুকু হয়ে গেল। ওরা ওকে ছেড়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো যে—যার জায়গায় বসে পড়ল। শিবরাম উপুড় হয়ে পড়ে আছে। হুঁশ নেই, উঠতে পারছে না। যতবার উঠতে যাচ্ছে ততবার পড়ে যাচ্ছে।

রসকলি নিজে সাহায্য করল। ওকে তাকিয়া দিল। পাশে এনে বসাল। তারপর গান ধরল। কিন্তু শিবরামের হুঁশ ছিল না কোনো। সে গান শুনতে পেল না সে শুধু পড়ে থাকল। কতক্ষণ ধরে এইসব গান, মাইফেল হল্লা হয়েছিল তাও সে জানতে পারত না, যদি না রসকলি সবাইকে বিদেয় করে দিয়ে শেষ রাতের দিকে ডাকত, এবার ওঠ নাগর!

শিবরাম যেন ঘুম থেকে জাগল। তাকিয়া থেকে মাথা তুলে বড় বড় চোখে তাকাল—যেন রসকলি কী বলছে সে বুঝতে পারছে না। চোখ দুটো জবাফুলের মতো, চোখ দুটো তবু ঝিমুচ্ছে। নেশা ভালো করে কাটেনি। শরীরে তখনও জড়তা আছে। মাথাটা খুব ভারী ঠেকছে। রসকলিকে এখনও যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তাছাড়া সে বিশ্বাস করতে পারল না—এ—মেয়েটা ওকে উঠতে বলতে পারে। সে বলল, আমি উঠব না

সখি! আমি শোব। ঘুমুব। আর কিচ্ছু করব না। চরিত্র নষ্ট করব না। সখি, আমি ঘুমোব। বলে তাকিয়ার ওপর ফের শরীরটা ঢেলে দিল।

রসকলি চাকরকে ডেকে বলল, ধনুয়া, উসকো বাহার নিকালো। শিবরাম চোখ পর্যন্ত খুলল না। অথবা খুলতে ইচ্ছা হল না। এত জড়তা শরীরে, এত বেশি সে অবসন্ন। চাকরটা তবু যদি ঠেলে বের করে দেয়! ওর কিন্তু উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না, শিবরাম মনে মনে খুশিই হল।

চাকরটা এসে শিবরামের ঘাড় ধরে বের করতে গেলে রসকলি বলল, থাম। ওকে বিছানাটা ভালো করে পেতে দে। শুইয়ে দে। আর সারারাত এখানে বসে থাকবি। বাতাস করবি।

রসকলি মুখটা শিবরামের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁগো নাগর, তোমার কেউ নেই ত?

কেউ নেই।

কেউ নেই! সত্যি বলচ?

সত্যি বলচি। কেউ নেই। এতটুকু বয়সে সব গেছে। এতটুকু বয়সে বাবা ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। আর এতটুকু বয়সে লোকের হয়ে মড়া পোড়াতাম। ক'দিন যাবৎ ঘাটোয়ারিবাবু হয়ে আছি। এতটুকু বলার সময় শিবরাম হাতদুটো বিনীতভাবে ফাঁক করল। রসকলি ঘাটোয়ারিবাবুর এমন সব কথায় না হেসে পারল না।

সেই থেকে শিবরাম রোজ সন্ধ্যায় যেতেন। গহনির স্বামীকে যাবার সময় বলতেন, তুমি দেখবে ঘাট। দিনে আমি। রাতে গিয়ে রসকলির ঘরে পড়ে থাকতেন এবং অন্য সব খদ্দেরদের সঙ্গে মাইফেল করতেন। কিন্তু বেশিদিন শিবরামের ওসব ভালো লাগেনি। রসকলি অন্য খদ্দেরদের সঙ্গে ন্যক্কারজনক কথা বললে তিনি মনে মনে রেগে যেতেন। এবং রসকলি যখন খদ্দের নিয়ে ভিতরে চলে যেত, তখন তিনি রাগে অভিমানে উঠে আসতেন। চটানে হরীতকী তখন বড় হয়ে উঠেছে, ঘাটোয়ারিবাবুর ভাত জল দিতে পারছে। ঘর—দোর দেখাশোনো করছে।

একদিন শিবরাম জানালায় মুখ রেখে বসল। রসকলির ওপর রাগে—দুঃখে কিছু ভালো লাগছে না। গরাদে মুখ রেখে শপথ করল—কোনোদিন সে গলির আঁধারে হারিয়ে যাবে না। রসকলি তার মক্কেলদের নিয়ে থাক, রসকলি দিন দিন চরিত্র নষ্ট করে শরীর নষ্ট করুক, যততত্র ঘুরে বেড়াক—ঘাটোয়ারিবাবুর কোনো আসবে যাবে না। রসকলি নষ্ট মেয়ে, নষ্ট মেয়ের আবার চরিত্র, তার আবার শরীর, তার আবার ভালোমন্দ। নষ্ট মেয়ের আবার ভালোবাসা। তিনি যাবেন না। আর যাবেন না—এমনিই একটা যখন শপথ করছিলেন তখন দরজার কড়া নড়ল। কে যেন দরজার কড়া নাড়ল।

কে দরজায়।

আমি গো আমি।

ঘাটোয়ারিবাবু বুঝতে পেরেছিলেন রসকলি দরজায় দাঁড়িয়ে। তিনি ভেবেছিলেন তিনি উঠবেন না, তিনি দরজা খুলবেন না, জানালা থেকেই বলবেন, শরীর ভালো নেই। কিন্তু তিনি পারলেন না। উঠলেন, দরজা খুললেন। সহসা সবকিছু আবার ভালো লাগল। চটান ভালো লাগল। দরজা খোলার সময় তিনি অদ্ভুত আরাম পেলেন। তবু কিছু একটা অজুহাত দেখাতে হয়! তিনি বললেন, শরীর ভালো যাচ্ছে না।

রসকলি শিবরামের শরীরে হাত দিল। কপালে হাত রাখল এবং উত্তাপ দেখল। তারপর কাছে টেনে নিয়ে বসাল। বলল, আজ তোমার এখানে থাকব। গলিতে ভালো লাগছে না।

শিবরাম শঙ্কিত হল।—না, না, এ চটানে নয়। বড় খারাপ জায়গা। বরং তোমার ঘরে চলো।

আমার ঘরে কত মক্কেল। ওদের থেকে পালিয়ে এলাম।

ওদের আসতে বারণ করে দাও।

তবে আমার সংসার চলবে কী করে? বুড়ো বয়সে আমাকে কে তীর্থ করাবে?—পয়সা পাব কোথায়?

আমি দেব।

তুমি পারবে এত দিতে!

শিবরামের মনে হল তখন—সে বড় নিঃস্ব। মনে হল রসকলির জন্য তার কিছু করার নেই। ভাবল রসকলিকে নিয়ে বরং কোথাও চলে যাওয়া যাক। কিন্তু মায়ের মৃত্যু, বাপের তিরস্কার এবং সৎ—মায়ের অত্যাচার, তারপর মড়া পুড়িয়ে অন্ন সংগ্রহ, সব ওকে বিষণ্ণ করে তুলল। দুঃখ! দুঃখ! শুধু দুঃখই সেখানে। সেই করুণ অতীত ওকে চটান ছাড়তে দিল না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে দিল না। অফিসের মাসোহারা ওকে চটানে আবদ্ধ করে রাখল। একটা জীবনের জন্য চটানে কোনো অভাব নেই, কোনো দুঃখ নেই। চটানটা শিবরামের সুখের জগৎ। ইচ্ছা করলে সে এখানে বসেই দুটো মানুষের মতো অন্ন সংস্থান করতে পারে। ইচ্ছা করলে সে এখানে বসেই রসকলিকে তীর্থ করাতে পারে। এই চটানে বসে ইচ্ছা করলে সে ওর সব, সব কিছু করতে পারে। শুধু পারে না চটান ছাড়তে—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে।

রসকলি আবার বলল, আছে তোমার এত টাকা?

আছে।

রোজ তুমি আমায় খুশি করতে পারবে!

টাকা দিয়ে?

না সব দিয়ে। পারবে! যদি পার কালই মক্কেলদের ভাগিয়ে দেব। কালকেই ঘরটা একমাত্র তোমার হবে। রসকলি আর কারও না, তোমার। যদি পার, তুমি আমায় কথা দাও।

পারব। ঘাটোয়ারিবাবু কথা দিলেন। আর অক্ষরে অক্ষরে সে কথা তিনি পালন করলেন। সে একদিন গেছে।—টাকা চাই সোনাচাঁদ?—কত টাকা। —লেকিন বাবু থোরা সবুর করতে হবে।

দূর দূর থেকে তখন মড়া আসত। দশ ক্রোশ, বিশ ক্রোশ হবে। গঙ্গা পাইয়ে দিতে আসত তারা। দশ, বিশ ক্রোশ আসতে মড়াগুলো ফুলেফেঁপে উঠত। তারা তিন চার দিনের পথ হেঁটে এসেছে। মড়াটা ওরা চটানে নামাত। দুর্গন্ধ উঠত। চটানের আশেপাশে কেউ দাঁড়াতে পারত না দুর্গন্ধে। সোনাচাঁদ তখন বলত, ওদের ছেড়ে দ্যান বাবু। ওরা চলে যাক। ঘাটোয়ারিবাবু মড়ার নামধাম লিখে নিয়ে বলতেন, তোমরা যাও বাপুরা! মড়া পোড়াতে হবে না। আমি পুড়িয়ে দেব। তারপর ওদের আরও কাছে ডেকে বলতেন, কাঠের দামটা ত তোদের শালা লাগতরে। ওটাও লাগল না। ও দিয়ে তোরা রামকান্তর দোকানে বেশি পচাই খেতে পারবি। যা। যা। তোদের বেশি টাকা হল, সোনাচাঁদেরও বেশি টাকা হল। ঘাটোয়ারিবাবুরও বেশি টাকা। কাঠের টাকা বাঁচল। তিনি কিছু কাঠ চুরি করে বেচে দিতে পারবেন। এবং মড়াটা নিয়ে সোনাচাঁদ আশেপাশের কোনো খানাখন্দের ভিতর পচিয়ে রাখত। গহনির বড় ছেলে কৈলাস তখন নিখোঁজ। কৈলাস তখন কাছাড়ের জঙ্গলে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। ওস্তাদ হারুন রসিদের দরগায় মন্ত্র নিচ্ছে হেকিমি—দানরির।

কৈলাস কিন্তু একদিন কঙ্কাল সংগ্রহ করে জীবনধারণ করতে হবে ভেবেই ভয়ে চটান ছেড়ে পালিয়েছিল এবং সেই থেকে অনেক দেশ দেখেছে। আসামের জঙ্গলে ঘুরেছে—হারুন রসিদের দরগা আবিষ্কার করেছে কাছাড় জঙ্গলে। সেখানেই সে বিদ্যা আয়ত্ত করল হেকিমি জীবনের। বেঁচে থাকার কিছু একটা সুরাহা করল। বাপের মতো পচা গন্ধ শুঁকতে পারল না। শেয়াল কটাশের মতো বন—বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে শরীর নষ্ট করতে পারল না। অথচ কৈলাস এখন বিশ্বাস করেছে যা নসিবে লেখা আছে, তার খণ্ডন নেই। নতুবা দ্বিতীয় পক্ষের বৌটাই বা পালাবে কেন, ডোমন সা—ই বা সেই ফাঁকে জীয়ন হাড়টা চুরি করবে কেন। নসিব সকলের উপরে। নসিবের হাত থেকে কারও রেহাই নেই। না দরগার রসিদের, না কৈলাসের! না বাবুচাঁদ, না সোনাচাঁদের। পা ফকির দরবেশের, না বেইমান পুরুষের। কারও রেহাই নেই, কারও রেহাই নেই। সব নসিব। নসিবের জন্য রসিদকে খুন করে কৈলাস জীবন হাড়টা চুরি করল। হেকিম ব্যবসা ফাঁদল দেশে ফিরে। শাদি করল। তখন গহনি বেঁচে নেই কৈলাস তখন জোয়ান মরদ। রাহু চণ্ডালের হাড়ের দৌলতে

পয়সার শেষ নেই। কিন্তু নসিবের জন্য প্রথম বৌটা গেল। সে ঘরে ফিরে একদিন দেখল ভালো বৌটা বমি করছে। দু—বার পায়খানা। তারপর শেষ। নসিবের ঘরে ফাঁকি নেই। খুনের বদলা নিল।

কিন্তু এখন দেখলে মনে হবে কৈলাস নসিবের ঘরেই বদলা নিচ্ছে। অথবা নসিবের ঘরে চুরি করছে। নসিবের ঘরে গেরুকে কৈলাস জিম্মায় রাখতে পারছে না। ওর যে করে হোক কোনো হিল্লে করতে হয়। চটানে বেঁচে থাকার এলাদ খুঁজতে হয়। একটা পাকা ব্যবস্থা করতে হয়। তিনটে কবচের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে, শাদি—সমন্দ করে, গেরুকে নসিবের হাত থেকে দূরে রাখার ইচ্ছা। কিন্তু বেইমান বাচ্চাটা তার কী বুঝবে! ডাইনি মাগির সাথে ঘুরে বেড়াবে শুধু। কৈলাস ফরাসডাঙা থেকে ফিরে আসার পর এমন কিছুই মাচানে বসে ভাবছিল। তৃতীয় পক্ষের বৌটার নালিশ, গেরুটা কাল রাতেভি গেল। নেলির সাথ হল্লা করল। তু কিছু না বুলছিস ত ওটা আরও বাড় বাড়বে।

কৈলাসের চোখ দুটো লাল হচ্ছে। চটানে চোখ দুটো ঘুরছে। মাচান থেকে উঁকি মেরে মেরে গেরুকে খুঁজছে। গেরুকে চটানে না দেখে ওর তেষ্টা পেল। ও জল খেল।

বৌটা কৈলাসকে যখন জল দিল তখন হরীতকী রুটি সেঁকছে। দু'জনের রুটি। হরীতকী এবং ঘাটোয়ারিবাবুর। হরীতকী বাচ্চাটাকে উঠোনে শুইয়ে রেখেছে। সমস্ত শরীর তেল মাখিয়ে রোদে শক্ত করছে। মেয়েটা কাঁদছে না—হাত—পা নেড়ে খেলছে। এই সব দেখে কৈলাস গেরুর কথা ভাবল। ওর ছেলেবেলাকার কথা ভাবল। চটানে শুয়ে শুয়ে ওর হাত—পা নেড়ে খেলার কথা ভাবল। এই সময় কৈলাস পকেট থেকে একটা নাকছাবি তুলে মাটির গেলাসের বাকি জলটুকুতে ফেলে দিল। উঁকি দিল গেলাসটায়। নাকছাবিটা সোনার কী তামার দেখার ইচ্ছা হল। বেওয়ারিশ মড়ার নাকছাবিটা ঘষতেই টের পেল ওটা রুপোর! গেরুর মা—র কথা মনে হল। একটা নাকছাবির কথা মনে হল। নাকছাবিটা রুপোর। ঠিক এইরকম দেখতেই যেন। ঠিক যেন এইরকম। একরকম। একরকমের গহনা, বুঝি হতে নেই! ওর ইচ্ছে এখন এই সব মন্দ ভাবনা থেকে সরে দাঁড়ায়। এই সব ভাবনা ওকে বিষণ্ন করে তোলে। বারবার রাহু চণ্ডালের হাড়টার কথা মনে হয়। রাগে দুঃখে গেরুর মাকে গাল দিতে ইচ্ছে হয়। লাথি মেরে দাঁত ভাঙতে ইচ্ছে হয়। ফের কষ্ট হয় গেরুর মার জন্য। গেরুর মা ঘরে থাকলে হাড়টা বুঝি চুরি যেত না, রাতের আঁধারে ডোমন সা পালাতে পারত না।

বেশ চলছিল তার সেই হেকিমি জীবনটা। ভোরে উঠে দুটো জল—ভাত মুখে দিয়ে ডাকত গেরুকে। পাশে বসতে বলত। সে বসত। গেরু বসত। জড়িবুটিগুলো সামনে বিছিয়ে রেখে সহসা একটা জড়ি তুলে বলত, বুল তরে বাপ এটা কি?

এটা জীয়ন হাড়।

বুলতে পারিস বেম্ম চণ্ডালের হাড়, লয়তো রাহু চণ্ডালের হাড়।

এ দিয়ে কী হয়?

জড়িবুটির কাজ—কারবারে লাগে।

বেশ। বেশ। তু আচ্ছা বুলে দিচ্ছিস। কৈলাস এ সময় একটা নরসিং ঝাপ তুলে ধরে বলত, এটা কোন ব্যারামে লাগে। কোন ব্যারামের জড়িবুটি। বুলতে লারলি?

গেরু বলত, এটা নরসিং ঝাপ।

এটা কী?

এটা দুর্গা ঝাপ।

কৈলাস বলত, এটা ঈশ্বর ঝাপ, কালী ঝাপ।

গেরু বলত, এটা বন রুই মাছের ছাল, হেমতাল কাঠ।

কৈলাস বলত, কুলকুহলীর গাছ।

গেরু বলত, মরদ রাজের মূল।

কৈলাস গেরুকে তন্ত্র—মন্ত্র শেখাত এবং ভাবত—গেরুটার মনে তন্তর—মন্তরের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে। সেজন্য জড়িবুটির নাম, কী কায়দা আছে জড়িবুটিতে, কোন ব্যারামে কোন জড়িবুটি লাগে—সব সে গেরুকে যত্ন নিয়ে শেখাত। ওর ইচ্ছা গেরু যেন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে—দানবি বিদ্যার একটি অপার্থিব শক্তি আছে। গেরুও অকৃত্রিম বিশ্বাস নিয়ে সে বিদ্যা আয়ত্ত করছে। কিন্তু কীসে কী হল, কী হয়ে গেল—ভোরে উঠেই কৈলাস দেখল কাঠের বাক্সটা থেকে রাহু চণ্ডালের হাড়টা এবং দামি গাছগাছড়াগুলো চুরি গেছে। বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন কৈলাস হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিল!

সে কেঁদেছিল ওর অকৃত্রিম দ্রব্যগুণের জন্য নয়। কেঁদেছিল ওর ব্যবসা মাটি হল বলে। গেরুর দিকে চেয়ে ওর দুঃখ বাড়ছিল,—চটানে বাচ্চাটা দু—মুঠো খাবে কী করে! চটানে যারা কাঠ বয়ে খায়, তাদের প্রায় উপোস দিতে হয়। অন্যদল শহরের বেড়াল—কুকুর তাড়িয়ে অথবা ফেলে পয়সা রোজগার করে। তাদেরও সে উপোস করতে দেখেছে। একমাত্র রয়েছে হাসপাতাল। কিন্তু ইসপিরিট—খোর গোমানি বেঁচে থাকতে গেরু সে কাজ পাবে না। মরলেও না। চটানের সে দিকটা হাঁ করে আছে!

সেদিন কৈলাস প্রথম গালমন্দ দিল গেরুর মাকে। গেরুর মা ঘরে থাকলে ডোমন সা রাহু চণ্ডালের হাড় এবং দামি গাছগাছালি চুরি করে উধাও হতে পারত না। গেরুর মার ঘুম ছিল পাতলা। মাচান নড়েছে ত বৌটা জেগে উঠেছে। মাচানের নিচে শব্দ হয়েছে ত বৌটা জেগে উঠেছে। মাচানের নিচে শব্দ হয়েছে ত বৌটা কুপি জ্বেলেছে। কৈলাস ঘুমের ভিতর হেসে উঠেছে ত বৌটা মাচানে উঠে বসেছে। লম্ফ জ্বালিয়ে বলেছে, কিরে মরদ, খুব যে হেসে লিচ্ছিস বড়।

কৈলাস সেই শব্দে মাচানে উঠে বসল। চোখ দুটো রগড়াল। কুপির আলোতে বৌটাকে ঝাপসা মনে হল। নজর আসছে না ঠিকমতো। সে বুক হেঁচড়ে বৌটার কাছে গেল। বৌটা তখন হাসছে। হাসিতে বত্রিশটা সরু দাঁত উপচে পড়ছে যেন। বৌকে হাসতে দেখে সেও হাসল। হাসির জোয়ারে ওরা ভাসল। বর্ষার চিতা ঘাট—অফিসের কাছে এসে গেছে। চিতার আগুনে সে বৌটার মুখ পরিষ্কার দেখল। বৌটার কাছে ঘন হয়ে বসল। এবং চিতার আলোতে ওরা ভালোবাসার গল্প করল। কিন্তু সেই কৈলাস ভোরে গেরুর মার উঠতে দেরি দেখে, সকাল সকাল এক সানকি ভাত দিতে দেরি হল বলে কপালে লাথি মারল। কপাল ভালো বলে, কপালের লাথি মুখে লেগেছে। কৈলাস বলেছিল, শালীর হামার ঘুমে পোষায় লাগ।

লাথির জন্য গেরুর মার দাঁত ভাঙল। ঠোঁট কেটে গেল। চারিদিক অন্ধকার দেখল মেয়েটা! তিন চারদিন ধরে সে চিৎকার করল চটানে। তিন চারদিন ধরে নাচন—কোঁদন হল। তিন চারদিন ধরে ওরা দুজন এক মাচানে শুল না। ভাত রাঁধল না। গেরুটা নিচে পড়ে কাঁদল, একবার কৈলাস ধরে কোলে নিল না। অথচ পাঁচ দিনের দিন রাতের কী শলাপরামর্শতে ভোরবেলা কৈলাস ডাকল, চলেহ গেরুর মা।

ডাক্তারখানায় গিয়ে কৈলাস বলল, ডাগদারবাবু আছাড় পড়ে দাঁত টুটে গেল। বহুত কষ্ট পেয়ে লিচ্ছে বহুটা। দুটা দাঁত ওয়ার টুটে গেল।

কৈলাস পয়সা খরচ করে টাকা দিয়ে দাঁত বাঁধিয়ে দিয়েছে। এবং সেই তামার বাঁধানো দাঁত নিয়ে যখন গেরুর মা হাসত কুপির আলোতে, কৈলাস তখন ভাবত—ওর বৌর মতো রূপের বৌ চটান জুড়ে কেন, শহর জুড়েও বুঝি নেই। সে হেসে বলত খুশি হয়ে—দাঁত টুটে তুর রূপ যে বাড়লরে বৌ। হাসলে তুর রূপের জৌলস আরও খুলে পড়ছে।

তখন মাচান থেকে নেমে আসত গেরুর মা। তখন চুপ করে দাঁড়াত কৈলাসের সামনে। চোখ দুটো ডাগর করে তুলত। উনুনের পাশ থেকে নোড়াটা নিয়ে বলল, রূপের বাহার যখন খুললই হামার দু দাঁত বাঁধিয়ে তখন বত্তিশটা দাঁত টুটে ফের না হয় বাঁধিয়ে দে। বলে খিলখিল করে হাসত গেরুর মা। চটানের মেয়ে মরদেরা বলত, মাগির ঢং দেখ।

সেই গেরুর মা শেষ পর্যন্ত চটান ছেড়ে পালাল। এখন কৈলাসের আপশোশ হয়। আপশোশ, কেন সে গেরুর মার বত্তিশটা দাঁতই ভেঙে দিল না। কেন সে দুটো দাঁত বাঁধিয়ে দিতে গেল। বত্তিশটা দাঁত ভাঙলে

ওর রূপ ডুবত, জৌলুস কমত! চটানে পড়ে থেকে চিল্লাত শুধু। অন্তত শেষ বয়সে তবে কাটোয়া থেকে আর একটাকে ধরে নিয়ে আসতে হত না। বাপ—নানার ব্যবসা কাঁধে চাপিয়ে ঘোড়দৌড় করতে হত না।

গেরু ঘরে ঢুকতেই মাচানে উঠে বসল কৈলাস। বলল, তু কাঁহা যাস, কাঁহা ঢুঁড়ে বেড়াস? এ ঠিক না আছে গেরু। আভি ত তু বড় হো গেলি। থোড়া সমজে না চললে তুর শাদি—সমন্দ হাম কেইসে করে।

হাম ত আভি শাদি না করে বাপ।

কাহে তু শাদি করবি না।

গেরু চুপ করে থাকল। মাচানের পাশে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে রাখল। গেরুকে দেখে কৈলাসের জেদ বাড়ছে। পুষে বড় করা বাচ্চাটা বলছে কী!—তুকে জরুর শাদি করতে হোবে। কৈলাস এ—সময় নিজের ওজনটা মেপে দেখতে চাইল।

না করি ত...।

তু শাদি করবি না!

না করি ত!

না করিস ত চটানে ভুখা থেকে মরবি। পেটে ভুখা থাকবি, মনে ভুখা থাকবি। এ—আচ্ছা বাত লয় গেরু। হাম মর জানসে তুকে কোন দেখবে? কোন তুকে পিয়ার করবে? বুল? বুল! চুপ করে থাকলি ক্যানে? চুপ করে থাকলি চলবে? হামি মর যানেসে তুকে কোন দিক ভালো করবে? তুকে জরুর শাদি করতে হবে। ডাইনি মাগির সাথ তু ঘুরবি ত হাম জরুর চটানে সালিসি মানাবে। তু কি ভাবিস হামি কৈলাস মরে গেছি?

গেরু এবারেও কোনো জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কৈলাস মাচানে বসে দু—তিনবার ফোঁসফোঁস করল। তারপর নিচে নেমে ডাকল বৌকে, তু খেতে দে। হামি আজ জিয়াগঞ্জ যাবে। ঢাউস ডোমের বিটির খোঁজ করবে। গেরুর শাদি—সমন্দ হামি জরুর করে লিবে। কৈলাস খেতে বসে বিড়বিড় করে বকল, তুর মাই হামারে জাদা সুখ দিয়াছে আর তুত গেরু। পুষে বড় করা বাচ্চা। মা মনসার বাহনের লাখান লিকলিক করছিস। ফাঁক পেলেই ছোবালা বসাবি। ও বাত হামার না জানা আছে ভাবিস তু।

খেতে বসে কৈলাসের চোখ দিয়ে জল পড়ল। পুষে বড় করা বাচ্চাটাও বেইমানি করতে শিখেছে। বাচ্চাটা বুলে কিনা—না করি ত! হামার মরদরে তু!

গেরুই প্রথম খবরটা দিয়েছিল নেলিকে। —জানিস বাপ জিয়াগঞ্জ গেল।

নেলি গঙ্গা—যমুনাকে আদর করছিল। গঙ্গা—যমুনাকে ধরে গালে লেপ্টে দিচ্ছিল। গেরু পাশে দাঁড়িয়ে ফের বলল, জানিস বাপ জিয়াগঞ্জ গেছে।

ঝাউগাছটা থেকে একটা ডাল ভেঙে পড়ল। কাকের পুরনো বাসা থেকে খড়কুটো উড়ল। দুটো প্রজাপতি উড়ছে আকন্দ গাছে। মুরগিরা সব ডিম পাড়ছে। নতুন ঘাটোয়ারিবাবু এসে অফিসঘরে বসেছেন। পুরনো বাবু গল্প করছেন নতুন বাবুর সঙ্গে। দুঃখবাবু মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে নেলিকে দেখছেন। ওর কুকুর দুটোকে আদর করা দেখছেন। বাঘের মতো কুকুর দুটোকে দেখে বাবুর ভয় বাড়ল। তিনি চোখ তুলে ফের পুরনো বাবুকে দেখলেন এবং ফের গল্প আরম্ভ করলেন।

নেলি কুকুর দুটোকে আদর করতে করতে চোখ তুলে একবার বাবুকে দেখল। একবার গেরুকে দেখল।

গেরু ফের বলল, বাপ জিয়াগঞ্জ গেছে। বাপ জিয়াগঞ্জ শাদি সমন্দ দেখতে গেল।

কার শাদি সমন্দ?

তু বুঝি জানিস না! হামার শাদি সমন্দ।

তুর বাপ গেল আর যেতে দিলি?

হামি বারণ করলাম। লেকিন শুনল না।

তু বুলতে লারলি নেলি হামার বিবি হবে। বুলতে লারলি নেলির সাথ হামার বাতচিত হয়ে গেছে। বুলতে লারলি অন্য চটানে উঠে যাব এক রোজ। তুর বাপ বুলল আর ভেড়ির মতো সব বাতচিত শুনলি।

তু বুলতে পারতিস তুর বাপকে গেরুকা সাথ হামার শাদি হবে। বুলতে পারতিস গেরু হামার মরদ হবে।

ওরা দুজনই দুজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। দুজনেই গোপনীয় কথা বলছিল। কেউ দেখতে পাচ্ছে না; একমাত্র দুঃখবাবু ওদের দেখতে পাচ্ছেন। মুখ ফেরালে ঘাটোয়ারিবাবুও ওদের দেখতে পাবেন। ওরা কাঠগোলার পাশে, শুয়োরের খাটালের গলিতে দাঁড়িয়ে বচসা করছে না, ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে। দুঃখবাবু ওদের দুজনকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। কিছু তিনি শুনতে পাচ্ছেন না অথবা ওরা আরও ঘন হল না। ওরা আরও ঘন হলে তিনি হয়তো চোখ নামাবেন।

নেলি বলল, জরুর পারি বুলতে। আভি বুলতে পারি বাপকে। বাপ গেরু হামার মরদ হবে। দেখবি? দেখবি তু? নেলি গঙ্গা—যমুনাকে নিয়ে এই মুহূর্তে বাপের কাছে ছুটতে চাইল। যেন এই মুহূর্তে বলা চাই বাপকে।

—বাপ গেরু হামার মরদ হবে। বাপ হামার আর গেরুর বাতচিত ঠিক হয়ে আছে। তু মানা না করে।

গেরু বলল, থাক, আভি তুকে বুলতে হবে না। বাপকে জিয়াগঞ্জ থেকে ফিরতে দে। হাম বাপকে জরুর বুলবে।

নেলি বলল, অঃ। হামার মরদরে! তুর মতো মরদ হামার লাগে না। বলে একটা বিদঘুটে শিস দিল নেলি, কুকুর দুটোকে নিয়ে গঙ্গার ঢালুতে ছুটল। এখন যেন কোনো দুঃখ নেই নেলির। যেন কোনো আপশোশ নেই গেরুর শাদি—সমন্দের জন্য। মরদের জন্য কষ্ট হয়। মেয়ে মানুষের জন্য কীসের আবার কষ্ট! জিয়াগঞ্জের মেয়ে গেরু ধরে আনুক, শাদি করুক, সুখে থাক—ওর কোনো আপশোশ নেই।

নেলি কুকুর দুটোকে নিয়ে বালির চরে নামল। তারপর কুকুর দুটোকে ছেড়ে দিল। কুকুর দুটো ছাড়া পেয়ে মাটির গন্ধ নিতে নিতে উপরে উঠে গেল। এই বালির চরে নেলি এখন একা। নিঃসঙ্গ। শীতের নদীতে কোনো শব্দ নেই। জলে ঘূর্ণি নেই। জল কাচের মতো অথবা আয়নার মতো। দুটো একটা করে পাখি উড়ে যাচ্ছে। নদীর জলে তাদের ছায়া পড়ল। নেলি জলের আয়নায় মুখ দেখল। চোখ দেখল। জিয়াগঞ্জের মেয়ে ওর চেয়ে খুবসুরত কিনা জলের আয়নায় যাচাই করল। একটু জল তুলে নেলি মুখে দিল। মুখ ধুল। দুটো—একটা মাছ নড়ল জলে। জলের আয়নায় নেলির মুখটা হারিয়ে যাচ্ছে অথবা কাঁপছে। অথবা মুখটা ঝাডোü ডোমের বৌয়ের মতো হয়ে গেল। মুখটা জলে কাঁপছে, কুৎসিত হয়ে উঠছে। যখন শ্যাওলার আঁধারে মাছদুটো হারিয়ে গেল নেলি তখন বালিয়াড়িতে উঠে এল এবং বালির ওপর বসে পড়ল। দু—হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজে দিল। বুকের ভিতর কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে। নেলি বুকে হাত রাখল। গেরুর শাদি হবে, সমন্দ হবে। ঠোঁটে অনেকবার শব্দগুলো ভেঙে পড়ল। ওর কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট। এই কষ্টটুকু গেরুর কাছ থেকে আড়াল দেওয়ার জন্যে সে যেন এখানে এসে বসেছে। মুখ ধুয়েছে জলে। গেরুর সামনে শিস দিয়ে নিজের কষ্টকে আত্মগোপন করেছে। যেন কিছুই হয়নি। যেন এমন হামেশাই ঘটে থাকে। মরদের কথা ঠিক থাকে না, থাকবার নয়। গেরু অন্যত্র শাদি করবে এটা যেন জানাই ছিল নেলির।

বালির চরে নেলি অনেকক্ষণ বসে থাকল। বাপ হয়তো এখন লাশ—কাটা ঘর থেক বের হয়েছে। গাছের নিচে বসে ইসপিরিট খাচ্ছে। মাসের পয়লা। বাপ মাইনে পাবে। আজ দুটো ভালোমন্দ খাবে নেলি। বাপ ভালো ভালো সওদা করবে। এ—দিনটাতেই নেলির সুখ। এ—দিনে বাপ নিজে বেশি খেতে চাইবে না। নেলিকে সব খাওয়াতে চাইবে। এখন কিন্তু নেলির উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। গতরাতে গেরু এবং সে এখানেই বসেই হল্লা করেছে। নেলির সব মনে পড়ছে এখন। নেলির যত মনে পড়ছে তত কষ্ট বাড়ছে তত এই চরে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। বসে গত রাতে গেরুকে ধরে মরদ বানাতে চেয়েছে। মা হতে চেয়েছে। সেই গেরুর শাদি হবে। সমন্দ হবে। কৈলাস যখন বের হয়েছে তখন সে ঠিক না করে ফিরছে না। জিয়াগঞ্জের সব কটি মেয়ের মুখ সে মনে করার চেষ্টা করল। ওরা ওর চেয়ে কত খুবসুরত তা নিয়ে মনে মনে ফয়সালা

করল। সে বসে বসে ভূতি, শনিয়া এবং আঁধারীর কথা ভাবল। জিয়াগঞ্জের সবকটি মেয়ে ওর দুশমন হয়ে গেছে। আঁধারীকে ধরে গেনু একবার একটা কেচ্ছা করেছিল। গঙ্গা পুজোর রাতে সেই কেচ্ছার কথা ভেবে সে হাসল। সেদিন ডোমেদের সব মেয়ে—মরদেরা পয়সা নিচ্ছে যাত্রীদের কাছ থেকে। জিয়াগঞ্জ থেকে সে তিনটে মেয়েও এসেছিল। আঁধারী এসেছে, ভূতি এসেছে। আঁধারী এবং গেরু রাতে কোথায় হারিয়ে গেল। লখি, ধুনুয়া তদারক করল। খুঁজল। নেলি ওদের খুঁজে বার করল। সেই নিয়ে কত কথা। কত কেচ্ছা। হয়তো সেই আঁধারীই গেরুর বিবি হয়ে আসছে।

এই বালিয়াড়িতে বসে নেলি ভেঙে পড়েছে। যন্ত্রণাটা বুকের ভিতর অসহ্য ঠেকছে। যে—গেরুকে মরদ বানাবার এত শখ সেই গেরু হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। গেরুকে নিয়ে আঁধারীর কত শখ, কত সুখ পাবে। যে পুতুলের জন্য নেলি রং গুলতে চেয়েছিল, সে পুতুলটা শেষ পর্যন্ত আঁধারীই পাবে! সব কিছু অসহ্য লাগছে নেলির সেজন্য। চারিদিকে সে চাইতে থাকল। যেন সে গেরুকেই খুঁজছে। কুকুর দুটো তখন অনেক উপরে। অনেক দূরে। মাটির গন্ধ নিতে নিতে বাবলার ঘন বনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ওদেরও সুখ আছে, ওদেরও শখ আছে। বাবলার ঘন বনে হয়তো ওরা সে সুখ এবং শখকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু নেলির কিছু নেই। না সুখ, না শখ। না গেরু, না দুঃখবাবু। আজ দুঃখবাবুকে নেলির খুব আপন জন বলে মনে হল।

মনে হল এ—বাবু তার দুঃখ বুঝবে। এ—বাবু তাকে একটু আশ্রয় দেবে। আঁধারী এবং গেরুর মতো কোনো সুখের রঙ গুলতে গিয়ে হয়তো আর একটা কেচ্ছা হবে চটানে, লেকিন রসের ঘরে এ—কেচ্ছার দাম থোড়াই আছে। গেরুর মতো পুতুলের রঙ না হয়ে অথবা গেরুর মতো পুতুলের মুখ না হয়ে দুঃখবাবুর মতো হবে। সেই চোখ, সেই রঙ, সেই গড়ন।—গেরুরে, তুর মতো মরদ হামার হামেশাই আসবে। রাগে দুঃখে নেলি এখন গেরুকে গালমন্দ দিচ্ছে। বদলা নিয়ে মনে মনে সুখ পাচ্ছে।—তুর আঁধারী, হামার দুঃখবাবু। কম কীসে! তু এক কাঠি বাজাবি, হামি দু কাঠি। তু আঁধারীর পেটে বাচ্চা বানাবি, হামি দুঃখবাবুকে লিয়ে কেচ্ছা বানাব।

নেলি বালিয়াড়িতে হয়তো আরও কিছুক্ষণ বসে থাকত, আরও কিছুক্ষণ গালাগাল করত গেরুকে কিন্তু মনে হল বাপ ফিরছে নদীর পাড় ধরে। ঢুলতে ঢুলতে আসছে। দু একজন বাবুমানুষের ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ছে যেন বাপকে। বাপ কিছু বলছে না। ওদের হাত দিয়ে ইশারা করছে। ওদের ঢিল ছুঁড়তে বারণ করছে ইশারা করে। ওরা শুনছে না। ওরা তবু ঢিল ছুঁড়ল। বাপ যখন ওদের দিকে দৌড়োবার জন্য ঝুঁকি সামলাল, তখন ছেলেগুলো দৌড়ে পালাল। তাই দেখে বাপ হাসছে। মদের নেশায় বাপ হাসছে।

—বাপ...। বালিয়াড়ি থেকেই নেলি ডাকতে থাকল।

—আয় আয়। তু ওখানটায় কী করছিস? তু আয়। গোমানি নেলিকে পাড় থেকে ডাকতে থাকল।

নেলি ছুটল। চর ভেঙে উপরে ছুটল। নেলির খোলা চুল উড়ছে। কাপড় খসে পড়ছে শরীর থেকে। চর ভেঙে তবু নেলি উপরে ছুটল। নয়তো বাবুমানুষদের ছেলেগুলো বাপকে আরও বেশি ঢিল ছুঁড়বে। নেশার শরীর বাপের। ওদের ধমক দিতে পারছে না।

উপরে উঠে সে প্রথম বাবুমানুষদের ছেলেগুলোকে তাড়াল। শেষে বাপের হাত ধরল। বাপের কোমরে হাত দিয়ে দেখল মাসের মাইনেটা ঠিক রেখেছে কিনা।

গোমানি বলল, গঙ্গা—যমুনা কোথারে নেলি?

—ওরা জঙ্গলে ঢুকল বাপ।

—ওদের থোড়া গোস্তর ঝোলে ভাত খাওয়াবি। হলুদ মেখে ভাত খাওয়াবি। হাসপাতালের সাব ওয়ার কুকুরটাকে গোস্ত দেয়। তু গঙ্গা—যমুনাকে গোস্ত দিবি। ভুলবি না।

—ভালো সওদা করলি বাপ?

—তু করে লিয়ে আয়। পয়সা দিচ্ছি। বলে কোমর থেকে টাকা খুলতে চাইল গোমানি। গঙ্গা—যমুনার লাগি বোয়াল মাছ লিবি। ওভি ডাগদারবাবু ওয়ার কুকুরকে খাওয়ায়। এক পোয়া গোস্ত লিবি তুর লাগি।

খাসির গোস্ত। হাম রাতে কুছ খাবে না। গোমানি পর পর দুটো ঢেঁকুর তুলল। সে হাঁটছে। কোমরের কাছে হাতটা ঝুলছে। অথচ সে ট্যাঁক থেকে টাকা বের করল না। সব বেমালুম ভুলে গেছে। বেমালুম ভুল বকছে। কী কথা বলতে অন্য কথা বলছে। সে বলল, তুর মায়ীর লাগি ভি গোস্ত লিবি। আজ ফুলন ভি গোস্ত খাবে।

নেলি বলল, তু রূপেয়া দিলি না, হাম গোস্ত লিব কোত্থেকে।

—রূপেয়া! লে দিচ্ছি। কত লাগবে বল? দশ, বিশ, পঁচিশ, শ রূপেয়া? কেতনা রূপেয়া আওর তু মাঙে? গোমানি এবার কোমর থেকে কাপড়ের ভাঁজটা খুলল। ছোট লাল শালুর খুঁট থেকে গুণে একটা টাকা বের করল। লে রূপেয়া। আচ্ছা সওদা কবে লিবি। গঙ্গা—যমুনার লাগি দুটো শাড়ি লিবি। জায়দা হোত ফুলনের।

নেলি বলল, তাই লিব। লেকিন তু যেতে পারবি একা একা! না হামি যাব তুর সাথ।

গোমানি চোখ দুটো ছোট করল। মুখ কুঁচকাল। কপাল কুঁচকাল। যেন নেলির জায়দা সাহস হয়ে গেছে। সে বলল, তু যা! তু যা!

নেলি দাঁড়াল না। বাপকে একটু এগিয়ে দিয়ে সে বাবলার ঘন বনে ঢুকে গেল। ডাকল—গ...ঙ্গা, য...মু...না! তুরা আয়। হামার সাথ বাজারে যাবি।

ঘন বনের ভিতর থেকে নেলি দেখল কুকুর দুটো বাঘের মতো ছুটে আসছে। নেলির এখন খুব আনন্দ হচ্ছে। কুকুর দুটো ওর বেটার মতো। ঘন জঙ্গলের ভিতর কুকুর দুটোর চেহারা ভয়াবহ লাগছে। যত ছুটছে তত বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কাছে এলে নেলির কুকুর দুটোকে কিছুক্ষণ চাপড়াল। শেষে ওরা একসঙ্গে হাঁটতে থাকল।

গোমানি হাঁটছে অন্য দিকে। নেলি অদৃশ্য হয়ে গেল। গোমানি চটান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারল না। তার আগেই, চটানে ওঠার মুখে সে মাটিতে পড়ে গেল। সে দুবার ওঠার চেষ্টা করেও উঠতে পারল না। গোমানি মাটিতে পড়ে ভাবল যেন নেশাটা বেশিই হয়েছে। এমতাবস্থায় সে মাটিতে পড়ে থাকল। যখন উঠতে পারছে না, হাতে—পায়ে শক্তি পাচ্ছে না, তখন নেশাটা জমেছে বটে। তা জমবে না। লাশ—কাটা ঘরে এত লাশ! এত লাশের দুর্গন্ধ একসঙ্গে! অসংখ্য, অসংখ্য! গলায় দড়ির দাগ, ঠোঁটে বিষের দাগ! দুটো খুনের লাশ। লাশগুলোর মাথায় নম্বর দেওয়া। জোয়ান মেয়েটা কাপড় সামলাতে পারেনি—ওয়াক! নষ্ট! নষ্ট! মেয়েটা শরীরে আগুন দিল। শরীরটা আগুনে সিদ্ধ হল। ওয়াক তুলল। এই নচ্ছার দুনিয়ায় বেঁচে সুখ নেই—শুধু দুঃখ। দুঃখ। দুনিয়াটা শুয়োরের চোখ নিয়ে বেঁচে আছে। সব নেমকহারাম। সব বেইমান। ওর চোখ দুটো বুজে আসছে। তবু এই নচ্ছার পৃথিবীকে দেখবার জন্যে সে দুবার চোখ মেলে তাকাল। যদি নেলি আসে এখন, যদি হাত ধরে বলে, বাপ উঠ। তুর সাথ মা বসুন্ধরা ঠাট্টা করছে! তু উঠ। তামাশা করছে।

কোথাও কোনো মানুষের সাড়া না পেয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ মাটিতে পড়ে থাকল। শরীরে যত শীত লাগছে, নেশাটা যেন ওর তত জমে আসছে। সে মাটিতে পড়ে থেকেই বলল—অহ!

কিছুক্ষণ পর গোমানি উঠে বসল, কিন্তু দাঁড়াতে পারল না। দাঁড়াতে গিয়ে ফের পড়ে গেল। মা বসুন্ধরা বড় বেশি দুলতে শুরু করেছে। সে ক্ষেপে গেল। শুয়ে শুয়েই সে বসুন্ধরার কপালে লাথি মারতে লাগল।—আপদ!

সে শুয়ে শুয়ে আবার বলে, মা বসুন্ধরা, তু একটু থামবিনে? মেয়েটা হামার বাজারে গেছে মা। তু যা দুলছিস, নেলি হামার নিগঘাত আছাড় পড়বে। তু দুলবি না মা। দোহাই তুর গোমানি বাপের। গোমানি এবারেও একটা ওয়াক তুলল।

ঘরে চাল ছিল বলে নেলি ভালো সওদা করতে পারল। খাসির গোস্ত, তেল মসলা সব নিল হিসাব করে। রাত করে ঘরে ফিরল। চটানে আঁধার নেমেছে বলে ঘরে ঘরে লম্ফ জ্বলছে। কৈলাস ডোম এখনও চটানে ফেরেনি। ফেরার পথে ফরাসডাঙায় হয়তো রাত কাটিয়ে আসবে। কাল ভোরে সঠিক খবরটা পাবে নেলি। ঝাড়ো ডোমের বৌ, বারান্দায় পাঁতি তুলছে। ঝাড়ো পাঁতি দিয়ে ডালা কুলো তৈয়ার করছে। অন্য ঘরে কিছু

নেশা জমেছে। হরীতকী ক—রোজ নেশা করতে পারল না। বিকেল থেকে বাচ্চাটা অনবরত ট্যাঁ—ট্যাঁ করে কাঁদছে। ওর বিশ্বাস কৈলাস ঝাড়ফুঁক দিলে বাচ্চাটা ভালো হয়ে যাবে।

নেলি ঘরে ঢুকে দেখল বাপ চটানে ফেরেনি এখনও। নেলি বিরক্ত হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। বাপ নিশ্চয়ই এখনও কোথাও পড়ে আছে। গঙ্গা—যমুনাকে নিয়ে সে আঁধারে বাপকে খুঁজতে বের হয়ে গেল। এবং চটান থেকে নেমেই দেখল, চটানে উঠবার মুখে গোমানি শুয়ে শুয়ে কেবল ওগলাচ্ছে। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। নেলি নাকে কাপড় দিয়ে বাপকে টেনে তুলল এবং বাপকে ধরে শীতের গঙ্গায় চুবিয়ে আনল। শেষে ধরে এনে মাচানে শুইয়ে দিয়ে বলল, বকবক করবি ত এখন মাথায় পোড়াকাঠের বাড়ি মারব বলে দিলাম। চটানে পড়ে হয় ঘুমোবি, লয় মাচানে আগুন ধরিয়ে দেব।

নেলি উনুনে কাঠ গুঁজে দিল। লম্ফ থেকে আগুন দিল কাঠে। আগুনটা বাড়িয়ে দিল। মাচানে বাপ শীতে হিহি করে কাঁপছে। আগুন পেয়ে বাপ কিছুটা যেন তাজা হল। নেলি আগুনটা বারবার উসকে দিচ্ছে যাতে বাপ তাড়াতাড়ি গরম হয়, যেন বাপ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে পারে। বাপের বকবক আর ভালো লাগছে না। মনটা ভালো নেই। দুঃখবাবু হয়তো এতক্ষণে চলে গেছেন। অফিসঘরে এখন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গেরু নিশ্চয়ই মাচানে শুয়ে আছে, নিশ্চয়ই ঘুমোতে পারছে না। শরীরে যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

অফিসঘরে দুঃখবাবু নেই। তিনি চলে গেছেন। কাল থেকেই পাশের ঘরটাতে থাকবেন এ ঠিক হল। তবে রোজ রাতে থাকবেন না, মাঝে মাঝে থাকবেন। ঘটোয়ারিবাবুর সুবিধে—অসুবিধে দেখে তিনি এখানে রাত কাটাবেন। ঘরে বৌ আছে, বাচ্চা আছে, রাতে এখানে থাকার অসুবিধা আছে। দুঃখবাবুর দুঃখ বুঝেই যেন তিনি বলেছিলেন, রাতে এখানে না থাকলেও চলবে আপনার। যতদিন আমি আছি মাঝে মাঝে হাজিরা দিলেই চলবে।

দুঃখবাবু বলেছেন তখন, না আপনি বুড়ো মানুষ। মাঝে মাঝে রাতে আমি থাকব বৈকি! তবে বুঝতেই পারছেন বৌ বাচ্চা নিয়ে ঘর। পুরো সংসার।

ঘাটোয়ারিবাবুর ইচ্ছা হল জানতে দুঃখবাবুর ছেলে কটি। ওরা কত বড়। ওরা কী করে, দুঃখবাবু চটানে আসবার সময় ওরা কাঁদে কিনা। ওরা কদমা খেতে চায়, কমলা খেতে চায় হয়তো। না দিলে তারা কেমন করে—সে জানারও ইচ্ছে ঘাটোয়ারিবাবুর। না দিলে ওরা হয়তো কাঁদে, তখন দুঃখবাবুর কষ্ট হয়। দুঃখ হয়, মনে হয় ওরা মরবে একদিন। এই চটানে বয়ে আনতে হবে। আপনি, নয় আমি, নয় অন্য কোনো ঘাটবাবু ওদের হিসাব রাখবে। আপনার মনে হয় না—আপনিও মরবেন একদিন। তবে সংসার সংসার করে লাভ কী! অত সুখ—দুঃখ ভেবে কী হবে! বরং চলে আসুন চটানে। সারাদিন সারা রাত এখানে পড়ে থাকুন। ডোমেদের নিয়ে ঘরকন্না করুন। যথার্থ ঘাটোয়ারিবাবু এ—সব বলতে পারেননি। প্রথম কিংবা নতুন বলেই হয়তো। কিংবা সংসারী মানুষকে ঘেঁটে লাভ কী!

তা ছাড়া তিনি নিজেও রসকলিকে নিয়ে কম ডুবে ছিলেন না। রসকলির ঘর বাঁধার শখকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

রসকলি বলত, আমি এ—চটানেই ঘর বাঁধব!

ঘাটবাবু বলতেন, তা হয় না।

অর্থের অভাবের জন্যেই তিনি অন্যত্র যেতে পারেননি।

রসকলি বলেছে অন্যত্র যাব!

না, তা হয় না। অর্থের অভাবকে আমার বড় ভয়।

তবে এ—চটানেই। ঝাড়ো, গিরিশ ঘর করতে পেরেছে যখন।

ওরা পারে। ওরা গঙ্গাপুত্তুর। ওরা সব পারে। ওরা শিবের মতো। ওদের ঘর করা এখানেই সাজে অন্যত্র সাজে না।

রসকলির বাসনা তিনি পূরণ করতে পারলেন না। শেষ দিকে রসকলিকে তেমন মধুর মনে হত না। রসকলির মৃত্যুর কিছু পূর্বে তার প্রতি ওঁর কেমন বিরক্তবোধ জন্মেছিল। রসকলিকে শেষ দিকে বলেছেন, সংসারের সং সাজতে ইচ্ছে নেই। তিনি মনুষ্য চরিত্রকে ব্যাঙের মতো লাফ দিতে দেখে নিজের মনেই হেসেছেন। রসকলির প্রতি ভালোবাসা এবং বিরক্তবোধ উভয়েই ব্যাঙের মতো উল্লম্ফন মনে হয়েছিল।

হরীতকীকেও তিনি সেদিন বলেছেন, সংসারের সং সাজতে ইচ্ছা নেই।

হরীতকী বলেছে সংসারের সং সাজতে তুকে বুলেছি। আর বুলবে না। পেটটাকে লিয়ে এতদিন ভয় ছিল। পেটটা খালাস হয়ে হামাকে খালাস করে দিল। হামাকে লিয়ে তুকে আর কোথাও যেতে হবে না। কোথাও আর পালাতে বুলব না। হামার নসিব লিয়ে হামি বাচ্চাকে সাথ চটানেই পড়ে থাকব। লেকিন তুকে বুলবে না, আঃ যাঃ বাবু কাহাভি চল যাই। কভি বুলবে না চটান ছোড় দে।

ঘাটোয়ারিবাবু সব কথাগুলো স্মরণ করে না হেসে পারলেন না। তিনি নিজেও জানেন না, হরীতকীর বাচ্চাটা ওঁর না চতুরার। এ—কথা হরীতকী, নিজেও জানে না। চতুরাকে নিয়ে ঘর করতে করতে মাঝে মাঝে যে উদবৃত্ত সময়টুকু ঘাটবাবুকে সে দিত, সে বড় অল্প। বড় কম সময়। অথচ হরীতকীও চতুরার মৃত্যুর পর বুঝল ঘাটবাবুরও এ—চটান ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এ—চটান ভিন্ন তিনি অন্যত্র বাঁচতে পারবেন না। সে শুধু যেন অর্থের জন্য অথবা অভাবের জন্য নয়। কারণ এও যেন জীবনের অন্য সত্য। আপনার মনে হয় না আপনিও মরবেন একদিন? তবে আর সংসার—সংসার করে লাভ কী? অত সুখ দুঃখ ভেবে কী হবে! বরং চলে আসুন না এই চটানে, সারারাত সারাদিন এখানে পড়ে থাকুন। ডোমেদের নিয়ে ঘরকন্না করুন। যথার্থ ঘাটোয়ারিবাবু হয়ে দুনিয়ার সব সুখ, সব শখকে তফাত রাখুন।

আবার যখন রাত হয়, চটানে কেউ জেগে থাকে না, যখন ঘাটে কোনো মড়া জ্বলে না, তিনি সন্তর্পণে উঠে কাঠের বাক্সটা খুলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন। বাক্সর ভিতর অনেক গহনা। রসকলির গহনা। এই দুই করে গহনাগুলো গুণবেন, এক দুই করে গহনাগুলো সাজিয়ে রাখবেন। রসকলি মৃত্যুর আগে ঘাটবাবুকে ডেকে সব গহনা দিয়ে বলেছিল, আমি চলেছি, তুমি এবার ঘর কর। রসকলির তীর্থে যাওয়া হল না। গলির আঁধারেই রসকলির ভয়ানক রোগে মৃত্যু হল। অথচ এখন মনে হবে—এই চটানে এই কাঠের বাক্সর জন্য তিনি বেঁচে আছেন। সেজন্য চটান ছেড়ে তিনি অন্যত্র গেলেন না। নিঃসঙ্গ জীবনে রাতের কোনো নির্জন সময় ওঁর জীবনে বৈচিত্র্য বয়ে আনে। তিনি বাক্স খুলে গহনা দেখেন, গহনার সঙ্গে রসকলির মুখ দেখেন। রসকলির হাসি—মস্করা শুনতে পান। ভালোবাসার কথা শুনতে পান। এই সব কথা ভেবে তিনি একটু দুঃখ পেতে চান। আপনজনের দুঃখ। আপনজনের বিয়োগ—বেদনা। জীবনে তিনি এই দুঃখটুকুর স্পর্শের জন্যই রাতের আঁধারে কাঠের বাক্সটা খুলে বসেন এবং পৃথিবীকে ভালোবাসতে চান। আবার এমনও হয়—কাঠের বাক্সটা খুলে বসে আছেন, অথচ রসকলির মুখ স্মরণে আসছে না। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে মুখটা, কোথায় যেন পালিয়ে আছে রসকলি। যতবার তিনি মুখটা স্মরণ করতে চান, ততবার মুখটা কাছে এসে মাকড়সার জালের মতো কাঁপতে থাকে। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন একটা ঘটনা বেশি ঘটছে। ততই তিনি রসকলিকে ভুলতে বসেছেন। একটু ব্যথা এবং বেদনার স্মৃতিতে তিনি এখন বাঁচতে চান। কিন্তু মনের এই নিষ্ঠুর গণ্ডি অতিক্রম করে কিছুতেই তিনি সেখানে পৌঁছাতে পারেন না। শুধু মৃত্যু, মৃত্যু। এই মৃত্যুর নিষ্ঠুর পরিণতিই ঘাটবাবুকে দিন দিন অচল করে তুলছে, অনড় করে তুলছে। ঘাটের মতো নির্দয়—নিষ্ঠুর করে তুলছে। কোনো কোনো দিন ঘাটোয়ারিবাবু এই সব ভাবতে ভাবতে চোখ ঢেকে চেয়ারে বসে থাকতেন। কাঠের বাক্সটা খোলাই থাকত।

কোনো দিন দরজায় শব্দ হত। দরজাটা ঠকঠক করে কাঁপত। তিনি ভাবতেন রসকলি এল। ভাবতেন, রসকলির প্রেতাত্মা এসে ওঁকে ডাকছে। অথবা মনে হত রসকলির প্রেতাত্মা সব গহনা ফেরত নিতে এসেছে। তিনি তখন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারটাতে বসে থাকতেন। এবং চেয়ার থেকেই জবাব দিতেন—কে, কে দরজায়?

আমরা মড়ার লোক বাবু। বহুদূর থেকে এসেছি বাবু। আমরা সাতকান্দির মড়া পোড়ার দল বাবু।

ঘাটোয়ারিবাবুর দরজা খুলতেন না। ওদের বলতেন, কাউন্টারে এসো। তিনি ভয় পেতেন। হয়তো রসকলির প্রেতাত্মা সকল মানুষকে বলে বেড়িয়েছে—ঘাটবাবুর কাঠের বাক্সে কী আছে জান না? অথবা ঘাটবাবুর ধারণা—হয়তো চটানের সবলোক জেনে ফেলেছে—বাক্সটাতে জড়োয়া গহনা আছে। তিনি কখনোই রাতে দরজা খুলে বসে থাকতেন না। তিনি বলতেন, কাউন্টারে এসো। তিনি বলতেন, যা হয় কাউন্টার থেকে বল।

লোকটা কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল।

যে চটানটা এতক্ষণ ঝিমিয়ে ছিল যে চটানটা নেশা ভাঙ করে এতক্ষণ ঝিমুচ্ছিল, মড়া আসছে শব্দে সেই চটানটাই আবার জেগে উঠল। আবার সোজা হয়ে বসল।—ওরে ওঠ ওঠ। ও নেলি, দেখ মড়া এসেছে। ঘরে ঘরে তখন লম্ফ জ্বলল। ঘরে ঘরে তখন ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি। ঘরে ঘরে কথাবার্তার শব্দ। দুখিয়া উঠল। মংলি উঠল, দুখিয়া পাগড়ি বাঁধল মাথায়। হাতে লাঠি নিল। মংলি এত ঘুম যে উঠতে পারছিল না, তবু উঠল। কাঠের দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে। কাঠ মাপছে ঝাড়ো। ডোমেদের মেয়েমরদেরা কাঠ বয়ে নিচ্ছে। একমাত্র হরীতকী ওঠেনি। বাচ্চাটার শরীর ভালো যাচ্ছে না। টোকায় ধরেছে। বাচ্চাটা কাঁদতে কাঁদতে নীল হচ্ছে, লাল হচ্ছে। কৈলাসের জন্য রাত জেগে বসে আছে হরীতকী। বাচ্চাটাকে হাঁটুর ওপর রেখে পেটে গরম তেল মাখিয়ে দিচ্ছে। মুখটা দেখে কষ্ট হচ্ছে—হরীতকী কাঁদছে। নিঃশব্দে। কৈলাস যদি থাকত এ—সময়! ওর ঝাড়ফুঁক, জাদু মন্তরে বড় বিশ্বাস হরীতকীর।

ঘাটে চিতা সাজানোর ভার হরীতকীর। শরীর ভালো নয় বলে সে যাচ্ছে না। সে নেলিকে ডেকে বলল, তু আজ চিতার কাঠটা সাজিয়ে দে নেলি। পয়সা যা হবে তু লিবি।

নেলি যখন গেরুর পাশ কেটে নদীতে নামল, তখন একটা ছোট—রকমের খেউড় দিল গেরুকে। নেলির মাথায় কাঠ। গেরুর মাথায় কাঠ। নেলি ঠেস দিয়ে বলল, তুর বহু আসছেরে গেরু, তুর বহু হামার মরদ হবেরে, মরদ হবে। ঠেস দিয়ে গেরুকে এই ধরনের কথা বলে খুশি হল নেলি।

ঘন আঁধারে চটানের আলোগুলো যেন ভূতুড়ে চোখ। ভূতুড়ে গন্ধ যেন চারিদিকে। আসশ্যাওড়ার জঙ্গল পুরোনো অশত্থগাছটার পাশে। সেখানে ঝিঁঝিপোকা ডাকছে। সেখানে আকন্দ গাছে ফুল ফুটেছে। শিশির পড়েছে। শীতের কীট, শীতের পতঙ্গ—শিশিরে ভিজে ঘুমোচ্ছে। দূরে আলো, শহরের আলো। ওপারে ট্রেনের শব্দ। নদীর ঢালুতে মড়াটা পড়ে আছে। শিয়রে লণ্ঠন জ্বলছে। মড়াটার পাশে দুটো লোক বসে। ওরা শীতে কষ্ট পাচ্ছে। ওরা হরিধ্বনি দিয়ে মড়াটা চিতায় তুলে দিল। আগুনটা ধীরে ধীরে সব কাঠগুলোকে, মড়াটাকে গ্রাস করার জন্য উপরের দিকে ধেয়ে উঠছে। যেন স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করছে। মানুষগুলোর মুখ লাল হচ্ছে ওরাও সিঁড়িতে পা রাখার জন্য যেন প্রস্তুত হল। ওরা ফের হরিধ্বনি দিল। চটানে তখন যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার রাতটা বোবা হয়ে গেল, ঘন হয়ে গেল। মনেই হবে না এই সব দেখে—মড়া জ্বলছে। মনেই হবে না পৃথিবী থেকে একটা মানুষ চলে গেল। তার সুখ—দুঃখ চলে গেল। তার অনুভূতি—আবেগ চলে গেল। যেন কিছুই হয়নি—অথবা এমন হওয়াই স্বাভাবিক। হামেশা এটাই হচ্ছে। আগুন জ্বলছে আর স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি হচ্ছে অথচ এ—মানুষটারও জন্ম হয়েছে। ছ'দিনে ষষ্ঠী, শেষে বিয়ে। ঘর—সংসার। ঘর, সুখ, শখ—সব! শুধু ঘাটের সুখটা জানা ছিল না। আজ সে তাও পেল। স্বর্গের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দুনিয়াকে শেষবারের মতো আদাব দিল আজ।

ভোরবেলায় খবর শুনে চটানের সকলে আশ্চর্য হল। নেলি রোদে পিঠ দিয়ে বসে সব শুনছে। কৈলাস ডোম সকলকে ডেকে ডেকে বলছে, গেরুর শাদি ঠিক হো গিলরে গোমানি। ও ঝাড়ো, বাত শুনলি ত? গেল রাতে ঠিক করে লিলাম গেরুর শাদি। তু ত চিনিস নন্দুয়াকে। নন্দুয়ার বিটি।

গেরু চটানের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। ঘরে ঢুকে নেলিকে দুবার দেখবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু দেখতে পায়নি। রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে নেলি। একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে একটা একটা করে আঁক দিচ্ছে এবং এক দুই করে গুনছে। কৈলাসের খবরকে যেন পাত্তাই দিল না। খবরটা শুনে চটান থেকে মুখ তুলল না পর্যন্ত। গেরুর ইচ্ছা এখন ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওর মুখটা দেখে। মুখে কোন কোন ইচ্ছার রং ধরছে—সে দেখারও ইচ্ছা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারল না। যেতে সাহস হল না। কিছুদূর হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে এল। বাপ তখন চটানের ঘরে ঘরে খবর দিয়ে বেড়াচ্ছে, পুষে বড় করা বাচ্চাকে চটানে বেঁধে দিয়ে গেলাম। বাঁচি মরি গেরুকে দেখার একটা লোক থাকল। কৈলাস, এমন সব কথা বলছিল, আর ঘরে ঘরে খবর দিয়ে বেড়াচ্ছিল।

ঝাড়োর বিবি বলল, কী দেবে বেটাকে?

একটা শুয়োর দেবে বুলছে।

দুখিয়া বলল, খুব খরচপত্তর করবি ত?

জরুর। করব না ত টাকা হামার খাবে কে? এক বেটার শাদি হামার—কম শখের কথা! কী বুলিসরে গোমানি?

তা বটেক। হাম ভি এক দফে কাহা ভি চলে যাবে। বিটির শাদি ঠিক করে লিব। হাম ভি খরচ—পত্তর করবে ভাবছে। হামার ভি এক ভি বিটির শাদি। খরচ—পত্তর না করবে ক্যানে।

মংলি তখন মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খুকখুক করে হেসে দিল। কৈলাস বলল, তা দিবি। দেবার ত সময় হয়েছে বটেক। গোমানি মাচানে বসে সকলকে জোরে বলল, দিব, দিব। ঠিক শাদি দিয়ে লিব। হামি কী কৈ আদমিসে কম রোজগার করি! তবে—তবে—তামাশা ক্যানে? মস্করা ক্যানে? তবু চটানের সকলে নেলির শাদি—সমন্দকে তামাশা বলে ভেবে নিল।

কৈলাস ঘাটোয়ারিবাবুর ঘরে ঢুকল। বাবুর পায়ে গড় হল। বলল, আপনার—আওর—ডাক ঠাকুরের কিরপায় গেরুর শাদি—সমন্দটা হয়ে গেল। চার রোজ বাদ নন্দুয়ার বিটিকে লিয়ে আসছি। বেটার লাগি ইবার ভিন্ন ঘর করে লিব। আপ বুলেন ত আজই করে লিচ্ছি।

ঘাটবাবু বললেন, বলিস কিরে! শাদি—সমন্দ তবে লাগালি!

হে বাবু করে লিলাম। জান আওর দিচ্ছে না, এক রোজ ত মর যাওগে বাবু। টাইম ভি ত হয়ে গেল। লেকিন বেটার হিল্লে করে না দিলে ওকে কোন দেখবে?

বেটাকে ওরা দেবে কী?

একটা শুয়োর দেবে। শুয়োর না দিলে শুয়োরটার দাম দেবে বাবু। লেকিন হামি বুলে দিয়েছি হামি শুয়োর লিব। বুলছে খাসি শুয়োর দেবে। বিয়ের দিন ভোরে শুয়োরটাকে লিয়ে আসবে। শুয়োরটা চটানে জবাই হবে। শুয়োরের গোস্ত হবে। পচাই আসবে। বিকালে হামরা সব গোস্ত, পচাই লিয়ে জিয়াগঞ্জ যাবে। বাবু আপ ভি চলিয়ে না। খুব খুশিকী বাত হবে।

নেলি তখনও রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে। ওর শীত আজ শরীর থেকে যাচ্ছে না। যেন সে নড়বে না এমনই একটা শপথ করেছে। গেরু দূরে দাঁড়িয়ে সকলের আড়ালে অনেকক্ষণ নেলিকে দেখল। তারপর চটান থেকে নেমে গেল। বাপের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারল না, হাম শাদি না করবে বাপ। তু এ শাদি তুলে দে।

নেলি কিন্তু রোদ থেকে উঠল না। নেলি এই রোদে বসেই বুঝতে পারছে গেরু চটান থেকে নেমে গেল। গেরুর মনের ইচ্ছা যেন নেলি ওর সঙ্গে চটান ছেড়ে নামুক। এই বোধের জন্য নেলির বিরক্তবোধ গেরুর ওপর আরও বাড়ল। সে ভাবল, কী দরকার? বরং এই রোদ ভালো, রোদের এই উত্তাপ ভালো, গেরুর কাছে গিয়ে সে কী শুনবে! যে মরদ সকলের সামনে কিছু বলতে পারল না, চটান থেকে নেমে সে আর কী বলবে? কী আর অন্তরের কথা শোনাবে?

নেলি সেজন্যে উঠল না। যে—ভাবে বসেছিল ঠিক সেইভাবেই বসে থাকল। রোদে বসে গেরুর ওপর অভিমানে ফেটে পড়ছে। —ছিঃ ছিঃ তা কিছু বলতে লারলি! সকলের সামনে তুর বাপ হল্লা করে বলল, গেরুর শাদি ঠিক হো গিল। তু তখন বোবা বনে গেলি! কোনো জবাব দিতে লারলি। লেকিন তু হামারে লিয়ে চটানের নিচে নেমে যেতে চাস। সেখানে তু কী বুলবিরে মরদ, কী বুলবি! হামি জানি তু কিছু বুলতে লারবি। রাগে, দুঃখে, নেলির ভেতরটা ফুলে ফেঁপে উঠছে। চটানের চারিদিকে হল্লা। গেরুর শাদি হবে বলে, সকলে হল্লা করছে। গেরুর শাদি হবে বলে, সকলে ভোজ পাবে বলে, ঘরে ঘরে খুশির কথা। গোমানি পর্যন্ত কৈলাসকে ডেকে বলেছে, হামার লাগি তু থোড়া বিলিতি মাল লিবি। লয়তো হামার জমবে না। হাঁড়ি হাঁড়ি পচাই গিলে শাদি—সমন্দে সুখ নেই। তুর ত এক বেটার শাদি।

নেলির কাছে এখন চটানের সব মানুষগুলো বেইমান। সব মানুষগুলো শুধু ভোজের কথা ভাবল। নেলির দুঃখ কষ্ট কেউ দেখল না। বাপ পর্যন্ত মাচানে শুয়ে বিড়ি টানছে। ভোজের খোয়াব দেখছে, অথবা অন্য কিছু। নেলির কিছুই ভালো লাগছে না। না এই রোদ, না রোদের উত্তাপ। না এই চটান, না চটানের মানুষগুলোকে। ঘাটোয়ারিবাবু পর্যন্ত বলছেন না, এ শাদি—সমন্দ করে তুই ঠিক করলি না কৈলাস। নেলির কথা তোদের জানা উচিত ছিল। অথচ কেউ কিছু বলছে না। নেলির অভিমানে কান্না পেতে থাকল।

দুঃখবাবু চটানে ঢুকে দেখলেন নেলি রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে। তিনি ডাকলেন, কিরে নেলি, রোদ মাখাচ্ছিস গায়ে?

নেলি তখন মাথা গুঁজে বসে কাঁদছিল বলে উত্তর করতে পারল না। দুঃখবাবু ফের বললেন, খুব বুঝি শীত লাগছে গায়ে!

নেলি কোনোরকমে জবাব দিল, হে বাবু।

আমার ঘরটা একটু পরিষ্কার করে দিবি। আজ বিছানাপত্র নিয়ে আসব। কোনো কাজ নেই ত তোর এখন।

না বাবু কোনো কাজ নেই। আপনি যান বাবু হামি যাচ্ছি।

সে রোদ থেকে উঠে পড়ল। মাচানের নিচে থেকে একটা ঝাঁটা নিয়ে দুঃখবাবুর ঘরে ঢুকে গেল। ঘরটা কত কাল থেকে নোংরা হয়ে আছে! কবে ঝড়ের রাতে একটা মড়া এ ঘরে রাখা হয়েছিল—তার কাঁথা বালিশগুলো পর্যন্ত এখনও পড়ে আছে। ঘরটার চুনবালি খসে দিন দিন খুব নোংরা হয়ে উঠছে। দেওয়ালের ইট সব খসে পড়ছে। ঝুল ঝালড়ে ঘরটা ভর্তি। নেলি ভালো করে কাজগুলো করতে থাকল এবং ভেতরের কষ্টটাকে ভুলতে চাইল।

ঘাটোয়ারিবাবুর ঘরে দুঃখবাবু বসে আছেন। দুজনে গল্প করছেন। ঘরের গল্প। স্ত্রীর গল্প। পরিবার—পরিজনের অভাব—অনটনের গল্প। এতসব গল্প বলে দুঃখবাবু কত সুখী—এমন ধারণা করলেন ঘাটবাবু। গল্প শুনিয়ে দুঃখবাবু যেন বলতে চাইলেন, বেশ আছি মশাই। বাচ্চাদুটো ভালোমন্দ খাবার জন্য কাঁদে, বৌ—এর হরেক রকমের বায়না—যতটা পারি দেওয়ার চেষ্টা করি। না দিতে পারলে গিন্নি অভিমান করে, রাগ করে। বেশ লাগে মশাই—আছি বেশ। ছেলেটাকে ভালোমন্দ দিতে না পারলে কষ্ট হয়, কিন্তু যখন দিতে পারি, ছেলেটা ভালোমন্দ হাতে নিয়ে যখন কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বড় ভালো লাগে, বড় আনন্দ। দুঃখবাবু চোখ বড় করে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। —এবার মাইনে পেলে প্রথমেই বৌকে কিছু কিনে দেব। দুঃখবাবু এবার উঠলেন।—দেখি কতটা হল! দেখি গোমানির বেটি কতটা সাফ করল।

কিরে কতটা সাফ করলি? দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুঃখবাবু প্রশ্ন করলেন।

হয়ে এল বাবু। ঘর ত লয় বাবু, ভাটিখানার মজলিস। এখানে কাঁথা, ওধারে বালিশ, দেওয়ালে নোনা, চিতার কাঠের মতো সব দাঁত—বের—করা ইঁট—ঘরে ঢুকলেই ত ভয় ধরে।

দুঃখবাবু ঘরে ঢুকে ভীষণ দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিলেন। বললেন, কীসের গন্ধরে নেলি! ঘরে থাকা যাচ্ছে না।

আর কীসের গন্ধ! পচা ইঁদুরের গন্ধ বাবু, ঐ দেখুন না বাবু, কেমন ফুলে—ফেঁপে আছে! আপনি আভি যান! হলে ডাকব। তখন আর কোনো গন্ধ পাবেন না। যখন নেলির হাত লেগেছে, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। নেলি আশ্বাস দিল দুঃখবাবুকে।

বস্তুত এ কাজগুলো করতে করতে নেলি নিজের দুঃখটা বেমালুম ভুলে গেল। গেরুর শাদি হবে, শনিয়া চটানে বৌ হয়ে আসবে, শুয়োরের গোস্ত হবে, মজলিস বসবে—রোজকার ঘটনার মতো এগুলো ওকে আর দুঃখ দিচ্ছে না। সে ঝুল ঝাড়ল, ঘরের মেঝেটা ভালো করে পরিষ্কার করে দিল, পচা ইঁদুরগুলোকে সামনের একটা ডোবায় ফেলে এল, মড়ার কাঁথা—কাপড়গুলোকে বাইরে বের করে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর একটু বিশ্রাম নেবার সময় নেলি দুঃখবাবুকে বলল, বাবু চটানে ত ভোজ লেগে গেল। গেরুর শাদি হবে জিয়াগঞ্জে। আপনি যাবেন না ভোজ খেতে জিয়াগঞ্জে।

গেরুর শাদি হবে তুই যাবি না?

হামাকে কে লেবে বাবু?

কেন নেবে না? ঘাটোয়ারিবাবু বললেন, সবাই যাচ্ছে। তিনি পর্যন্ত যাবেন।

লেকিন হামি যাবে না বাবু। হামাকে ওরা লেবে না। নেলি এইটুকু বলে আর দাঁড়াল না। হয়তো দাঁড়াতে পারল না। ফের সেই দুঃখটা বুক বেয়ে গলা ধরে উপরে উঠছে।

যে দুঃখটা নেলির গলা বেয়ে উপরে উঠে আসছে সে দুঃখটাই ওর চোখ দুটোকে সর্পিল করে তুলল। সে মনে মনে সাপের মতো হিসহিস করছে। সে চোখ তুলে চারিদিকে চাইল এবং হাঁটতে থাকল। দুটো ষাঁড় শিং নিচে নামিয়ে তেড়ে আসছে। দুটো গোরু চরছে অন্যত্র। ওরই বয়সি দুজন মেয়ে গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছে। ওরা হাসছে। ওদের পিঠে রোদ। শাড়ির আঁচলে ওদের হাসির কৌটা যেন বাঁধা। সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে এ সময় বিশ কাটালির ঝোপে একটা মানুষ বসে পড়ল। নেলি নিজের শরীরের ওপর এ সময় বিরক্ত হয়ে পড়ছে। মানুষটা বিশ কাটালির ঝোপে, দুটো ষাঁড় লড়ছে, আঁচলে হাসির কৌটো বাঁধা, আর পেটে ওর যে দুঃসহ ব্যথা—সব মিলে দুঃসহ ভাব সর্বত্র। তলপেটে পরিচিত ফিক ব্যথাটা ক্রমশ নিচে নামছে। যত নামছে তত অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে পৃথিবীটাকে। শরীরটা এই শরীরটা এই মুহূর্তে নোংরা হবে জেনে সে আর নিচে নামল না। বড় অস্বস্তি এ—সময় ওর। শরীরটাকে নিজের বলে ভাবতে কষ্ট হয়। কিছু ভালো লাগে না। ইচ্ছা করে মাচানে সারাদিন পড়ে থাকতে, মাচানে পড়ে ঘুমোতে, শরীর কাঁথা—কাপড়ে আড়াল রেখে একটা গোপন গভীর কষ্টকে ঢেকে রাখতে। একটা দুঃসহ লজ্জাকে ঢেকে রাখতে। সেজন্য সে ঘাটের দিকে নেমে গেল না, গেরুকে খুঁজে দুটো কথা বলবার সময় হল না। যতটা সত্বর সম্ভব সে চটানে উঠে গেল।

ঘরে ঢুকেই সে মাচানের নিচে থেকে কিছু ছেঁড়া কাঁথা—কাপড় ছুঁড়ে দিল। বাপ মাচানে নেই—কোথাও বের হয়েছে। অন্য কাঁথা—কাপড় দিয়ে সে দেয়ালের ফাঁক—ফোকর বন্ধ করে দিল। তারপর শরীরের সব দুঃখ অপমান লজ্জা আক্রোশ ঝেড়ে ফেলে সব কাঁথা—কাপড় বেড়া থেকে টেনে মাচানে এনে ফেলল। কৈলাস তখন ঝাড়ফুঁক দিচ্ছে হরীতকীর বাচ্চাটাকে। কৈলাস অদ্ভুত সব মন্ত্র উচ্চারণ করছে। নেলি মাচানে শুয়ে না হেসে পারল না। কৈলাসের মন্ত্রগুলো সে নিজে নিজে আওড়াল—ইটমের বিবি চিটম খায়, পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটে বেড়ায়! মা মনসার বাহন হবি, পীরের ভূত পয়গম্বরে খাবি—ফুঁঃ। মাচানে শুয়ে কৈলাসের মতো একটা জোরে ফুঁ দিল। কৈলাসের মতো চারিদিকে থুথু ছিটাল নেলি।

কিন্তু নেলি মাচানে শুয়ে থাকতে পারল না। পিসির মেয়েটা কাঁদছে। পিসি গেল রাতে উজাগর থাকল। নেলি উঠে হরীতকীর ঘরে ঢুকে গেল। কৈলাস ঝাড়ফুঁক দিয়ে বের হয়ে গেলে, সে বলল, দে পিসি হামার কোলে দে। তু এক দফে ঘুম দিয়ে লে। সারারাত না ঘুমিয়ে তুর শরীর আর শরীর নাই।

তু কোলে লিবি?

হে পিসি লিব। হামার হাতে কোনো কাজ না আছে। লতুন ঘাটবাবুর ঘর ঝেড়ে দিলাম। বাপ কাহা ভি চল গেল। বাসি ভাত আছে। বাপ বাসি ভাত খেয়ে লিবে।

তু খাবি না?

বাপ খেলে যদি দুটো থাকে খেয়ে লিব।

নেলি হরীতকীর কোল থেকে বাচ্চাটাকে নিল। কাঁথা—কাপড়ে পেঁচিয়ে কোলে রাখল। —পিসি ওয়ার নাম হবে চঞ্চলা। হামি চঞ্চলা বলে ডেকে লিব।

নেলি চঞ্চলাকে দু—হাঁটুর ওপর শুইয়ে আদর করল। মুখ দেখল, ছোট ছোট চোখ, ছোট ছোট হাত—পা। এখন আর কাঁদছে না যেন। চোখমুখ নীল হচ্ছে না। কৈলাসের ঝাড়ফুঁয়ে যেন ভালো হয়ে যাচ্ছে। পিসি পাশে শুয়ে পড়ল। নেলির এ—সময় কুকুর দুটোর কথা মনে হল। ওরাও পিসির বাচ্চাটার মতো ছোট ছিল একদিন। শীতে কষ্ট পেত খুব। ওদের মা—টা মরে গেল। তখন কে দেখবে ওদের! কে আগলাবে! অফিসঘরের বারান্দায় শীতে কাঁদত রাতে। কুকুর দুটোর জন্য নেলির ভারী কষ্ট হত। একরাতে সে মাচান থেকে উঠে পড়ল এবং সন্তর্পণে বারান্দা থেকে বাচ্চা দুটোকে এনে বুকের কাছে কাঁথার নিচে রেখে ঘুম পাড়াল। বাচ্চা দুটো এতটুকু নড়ল না। এতটুকু কাঁদল না। ভোরে শুয়োরের দুধ বাচ্চা দুটোকে খাওয়াল। পুষে পুষে বড় করল। এখন ওরা গঙ্গা—যমুনা। এখন ওরা নেলির বেটার মতো। গেরু শনিয়ার মরদ হচ্ছে, বাপ দিন দিন অমানুষ হয়ে উঠছে, কৈলাস, দুখিয়া ডাইনি বলে ওকে গাল—মন্দ দিচ্ছে—সব কিছুই সে দু—বেটার মুখের দিকে চেয়ে সহ্য করে আছে। অথবা দু—বেটার জন্য এ—সবকে সে এতটুকু গ্রাহ্য করে না। কৈলাস কিংবা দুখিয়া যদি বেশি হারামি হয়ে ওঠে, রামকান্ত যদি বেশি বেইমানি করতে চায়, গেরু যদি ফের ফিরে আসে কোনো দিন, তবে সে কাউকে সালিসি মানবে না। একমাত্র গঙ্গা—যমুনাকে বলবে তুরা দেখে লে ব্যাপারটা। যা করতে হয় তুরা করে লে। হামার মা বাপ আছে তুরা।

হরীতকী এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারছে। কাপড়ে মুখ ঢেকে মেঝেকে শুয়ে আছে। মাছিগুলো তবু যন্ত্রণা করছে পিসিকে। নেলি হাত বাড়িয়ে মাছি তাড়াল। পিসি শুয়েছে ত ঘুমিয়েছে। পিসির বিশ্বাস কৈলাসের ঝাড়ফুঁকে বাচ্চাটা ভালো হয়ে উঠবেই। নেলিরও বিশ্বাস। ওর দ্রব্যগুণের কথা, তন্ত্র—মন্ত্রের কথা নেলি এতদিন এই চটানে অনেকবার শুনেছে। অনেকবার দেখেছে। ওর দ্রব্যগুণের জন্যে শহরের বাবুরা পর্যন্ত আসেন। কতদিন দেখেছে নেলি—পুরানো অশ্বত্থের নিচে কৈলাস দাঁড়িয়ে আছে, বাবুরা এসেছেন শহর থেকে—কৈলাস মেয়েমানুষের শরীর থেকে ভূত ছাড়াচ্ছে। কতদিন যে কত পোয়াতির বাচ্চা হতে সাহায্য করেছে। সেজন্য নেলিও যেন জেনে গেছে বাচ্চাটা ভালো হয়ে উঠবেই। পিসির মতো সেও নিশ্চিন্ত হয়ে খুব হালকা বোধ করল।

কৈলাস নিজের চালাঘরটায় ঢুকে শুয়ে পড়ল মাচানে। সেই দ্রব্যগুণ, সেই জড়িবুটি, সেই ওস্তাদের দেওয়া মন্ত্র ওকে ছেড়েও যেন ছাড়ছে না। সেই ঝাড়ফুঁক, সেই জাদুমন্ত্র, সেই মিথ্যা ফেরববাজি—যার কোনো দাম নেই, কোনো গুরুত্ব নেই ভালো হয়ে ওঠার জন্য। তবু সে কেউ এলে দ্রব্যগুণের কথা আওড়ায়, জাদুমন্ত্র করে মানুষের বিশ্বাসকে মজবুত করে তোলে, হারুন রসিদের দোহাই দেয়, গেরুকে ডেকে বলে—বুঝলি, এ—বারো পেকারের তন্ত্র আছে। শুধু পুষে বড় করা বাচ্চাটার জন্যই—কেউ জড়িবুটির জন্য হাজির হলে চিৎকার করে বলতে পারে না, সব মিথ্যা, সব ফেরববাজি। গেরুটা যে তবে সব জেনে ফেলবে—একা ফরাসডাঙার কঙ্কাল তুলতে সাহস পাবে না।

যখন বাবুদের গলি থেকে সূর্য ওঠার চেষ্টা করছে, যখন রামকান্ত দোকান সাজিয়ে বসেছে—অন্ধকারের খেয়া পার হয়ে সূর্য যখন নদীর পাড়ে এসে হাজির, তখন চটানের একদিকে ভিড় জমতে শুরু করেছে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মরদ, মংলি, দুখিয়া সকলে একে একে ভিড় বাড়াচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মরদ গোল হয়ে দাঁড়াল। জন আষ্টেক জিয়াগঞ্জের মরদ বাঁশে বেঁধে শুয়োর এনে ফেলেছে। ওরা মাঝরাতে লণ্ঠন হাতে

রওনা হয়েছিল। ওরা চটানে পৌঁছল আর ভোর হল। ওরা এই শীতের ভোরেও ঘেমে গেছে। ওরা এখন কৈলাসের ঘরে বসে বিড়ি টানছে আর বকবক করছে।

খাসি শুয়োরটা ঘোঁতঘোঁত করছে মাটিতে। চারটে পা বাঁধা বাঁশটার সঙ্গে। তবু পড়ে পড়ে দাঁত দিয়ে মাটি তুলছে। এইসব দেখে পাশের খাটালে বাবুচাঁদের শুয়োরগুলো লাফাল, ছুটতে চাইল।

বাবুচাঁদ শুয়োর নিয়ে আজ বের হবে না। বিকেলে জিয়াগঞ্জ যাবে গেরুর সঙ্গে। সে ঘরে বসে লাঠিতে তেল খাওয়াচ্ছে। সেজন্য শুয়োরগুলো খাটালেই পড়ে থাকল কাদার মধ্যে—নাক—মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকল। মাঝে মাঝে খাসি শুয়োরটার চিৎকারে ওরা যেন অন্যমনস্ক হচ্ছিল। যেন দেখছিল—আহারে!

নেলি ওর ঘরে বসে বলছিল—আহারে!

মংলি হাই তুলতে তুলতে বলছিল, আহা শুয়োর বটে একখানা। যেমন চর্বি তেমন গোস্ত।

ঝাড়োর বৌ বলছিল, খেয়ে সুখ হবে।

চটানের উপরেই শুয়োরটা খুন হবে। বাপ গোমানি খুন করবে। বাপ ক্রমে লাশ কাটা ঘরের মতো চেহারা ধরবে। বাপ দা দিয়ে বসে বসে এখন বাঁশ সরু করছে—চাঁচছে। আঙুল টিপে টিপে খুঁটির ধার দেখছে। এ—সময় ওর জিভটা মুখ থেকে বের হয়ে আসবে। কাজ করবে আর, জিভ কামড়াবে গোমানি। বেশ মিহি; বেশ সরু করে খুঁটির মুখে ধার দিচ্ছে। গোটা চারেক হলে চলবে আপাতত। কোমরের দু পাশে দুটো, গলার দু পাশে দুটো বসিয়ে দেবে। এবং লোহার শিকটা গরম করে লেজের নিচে দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেই হবে। একটা খাসি শুয়োর খুন হবার পক্ষে এই যথেষ্ট। গোমানি বাঁশ চাঁচবার সময় এমন সব ভাবছিল এবং জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছিল।

গিরিশও বসে নেই। সে বড় বড় সব কলাপাতা কাটছে। কলাপাতা এনে চটানে জড় করছে। শুয়োরটার চারপাশের বাচ্চাগুলো এখন ঢিল ছুঁড়ছে—শুয়োরটার মুখে ঢিল ছুঁড়ে ওরা পরিতৃপ্ত হচ্ছে। ঘাটোয়ারিবাবু জানলা দিয়ে দেখছেন। হ্যাঁ মৃত্যু বটে শুয়োরের মৃত্যু। তিনি জানলার গরাদে হাত রেখে এ সব ভাবলেন। নেলি ঘরে বসে দেখল। সে বের হল না, বের হয়ে শুয়োরের মৃত্যু দেখল না। নতুন বাবু চটানে নেই, তিনি বিকেলে আসবেন। মাচানে শুয়ে শুয়ে নেলি নতুন বাবুর কথা ভাবল। গেরুর বিয়েতে সে যাবে না, পিসিও যাবে না, তিনি যাবেন না। যখন সকলে দল বেঁধে জিয়াগঞ্জে যাবে তখন তিনি ঘাটের পাহারায় থাকবেন।

অথচ আজ নিয়ে চার রাত নেলি মাচানে ঘুমাতে পারল না। সে নিজেও বুঝতে পারেনি যে গেরুর শাদিতে সে এতটা ভেঙে পড়বে। অথচ যত দিন গেল আপশোশটা তত বাড়ল। গেরুর সঙ্গে যতবার দেখা হল, ততবার সে নিজেকে আড়াল দিল। আগের মতো উচ্ছল হল না। হাসি—মস্করা করল না। গেল কাল থেকে নেলি নিজের ঘর থেকেই বের হল না। বের হতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কতবার সে গেরুর গলার আওয়াজ পেল, কতবার গেরু এ—ঘরে ঢুকে ডেকেছে। নেলিকে, কতবার বলেছে, নেলি তুর বাপ কুথিরে? নেলি সবই আন্দাজ করতে পারল। আন্দাজ করল—গেরু বাপের নাম করে এ—ঘরে সে তার দুঃখ জানাতে এল। আপশোশ জানাতে এল। তখন নেলি কোনো জবাব দেয়নি, চুপ করে থেকে গেরুকে ফিরিয়ে দিয়েছে। অথবা বড় বড় চোখে দেখেছে গেরুকে এবং ভেবেছে গেরু তু সব ভুলে গেলি!

ভেবেছে মরদ এত বেইমান হয়, মরদ এত আহম্মক হয়। মরদ এমন পাগল বনে যায় মেয়েমানুষের জন্য। মেয়েমানুষের শরীরের জন্য এত লুকলুক! এত হয়রানি! এত খানাপিনা! এত গোস্তের ঝালঝুল শনিয়ার শরীরটাকে চটানে তোলার জন্য। নেলি গেরুকে ফিরিয়ে দিয়ে এমন সবই ভাবল কেবল।

শুয়োরটা যত চিৎকার করছে, যত দাঁত দিয়ে মাটি তুলছে, যত মুখে গাঁজলা তুলছে, তত যেন নেলি ভেঙে পড়ছে। তত নেলি মাচানে শুয়ে শুয়োরের কষ্টটুকু নিঃশেষে ধরতে পারছে। বাপ শুয়োরটার কোমরের দু পাশে গলার দু পাশে বাঁশের শলা পুঁতে দিচ্ছে। লেজের নিচে লোহার শিক—ভয়ানক বীভৎস! গোমানি শুয়োরটাকে যেন লাশ—কাটা ঘরে এনে ফেলেছে—শুয়োরটা শুয়ে আছে, গোমানি শুয়োরটার কপালে হাতুড়ি ঠুকছে। গোমানি লোহার শিকটা কাঠের আগুনে লাল করেছিল। এই বাড়তি দয়াটুকু বাপের কেন যে

হল, নেলি বুঝতে পারছে না! আহা! শুয়োরটা মরবে এখন। বড় কষ্ট পেয়ে মরছে। বাপ গুণে গুণে যত শলা পুঁতল তত লোক জমল চটানে। রামকান্ত পর্যন্ত ছুটে এল। বলল, দেখি, দেখি, কী করে পুঁতলি। দেখি, দেখি, কতটা পুঁতলি। আঃ হাঃ ওতেই হবে, বড় দাঁতাল দেখছি।

গোমানি বলল, না বাবু, ও মরবে না। ওয়ার ত কচ্ছপের জান। দাঁড়িয়ে দেখে লেন, আউর ভেবে লেন, কেতনা হারামি আছে ও। সহজে শালা মরছে না বাবু।

গোমানি আর একটা শলা চেঁচে শুয়োরটার পেটে পুঁতে দিল। মোটা এবং গোরুর খোঁটার মতো শলাটা চড়চড় করে ভিতরে ঢুকে গেল। তার ওপর গোমানি মুগুর দিয়ে ওটায় তিন চারটে বাড়ি মারল। শুয়োরটা মুখ দিয়ে কতক রক্ত উগলে দিল। শুয়োরটা কুঁকড়ে যাচ্ছে মুখটা হাঁ করে বীভৎস করে তুলছে। ডোমেদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলো তবু ঢিল ছুঁড়ল। দুটো কাক ডাকল ঝাউ গাছটায়। ওরা ঘুরে ঘুরে উড়ল শুয়োরটার উপর। মংলি ঝাঁটা নিয়ে কাক তাড়াল।

গিরিশ পাতাগুলো জড়ো করে বিছিয়ে রাখবে—পাশাপাশি সাজিয়ে রাখছে। গোমানি আগুন জ্বালাল। সকলকে ডেকে শুয়োরটাকে আগুনে তুলে সেঁকে নিল। আগুনের উপরও শুয়োরটা রক্ত উগলে দিল। শেষবারের মতো শরীর থেকে রক্ত বের করে শুয়োরটা এবার সোজা হয়ে শক্ত হয়ে গেল। গোমানি খুশি হল —শালে এতক্ষণে গেল।

নেলি শুয়ে শুয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সব দেখল। সব চেঁচামেচি শুনল। বাপের কাণ্ডকারখানায় বিরক্তবোধ করল। যেন সাত জন্মে শুয়োর খায়নি বাপ। যেন সাতজন্মে এমন ভোজের আয়োজন বাপ চটানে দেখেনি। নেলি বিরক্ত হয়ে কাঁথা—কাপড় ফেলে উনুনের একপাশে বসে পড়ল। শুয়োরটার কষ্ট শেষ হওয়াতে সে হালকাবোধ করল।

হাঁড়িটা বেশ বড়। গঙ্গা থেকে কৈলাসের বৌ হাঁড়িটা ধুয়ে এনেছে। ওরা কয়েকজন মিলে শুয়োরটাকে এখন পাতার ওপর রেখেছে। শুয়োরটার শরীরে পোড়া ঘায়ের মতো রঙ। কৈলাসের বৌ হাঁড়িটা শুয়োরের পাশে রাখল। গোমানি শুয়োরের পেট চিরল। লাশকাটা ঘরে ছুরি চালিয়ে হাত ওর পাকা। ছুরির প্যাঁচে পেটটাকে দু ভাগ করল। অদ্ভুত কায়দায় ভিতর থেকে সব ময়লাগুলো তুলে নিল গোমানি। তারপর হাত ঢুকিয়ে পেটের ভিতর থেকে কাদার মতো জমাটবাঁধা রক্ত মালসা মালসা তুলে আনল এবং হাঁড়িতে রাখল। কৈলাসের বৌর দুটো লোভী চোখ, হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখছে। দুখিয়া মংলি পরস্পর তাকিয়ে চোখ টান করল। হরীতকী দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। বাচ্চাটা এখন কাঁদছে না, নীল হচ্ছে না। সে এ—শরীর নিয়ে জিয়াগঞ্জ যেতে পারবে না ভেবে দুঃখ পাচ্ছে। এমন একটা খানাপিনা থেকে বাদ গেল সে। এমন একটা মাইফেলে সে থাকতে পারল না। ওর চোখে সে আপশোশ ধরা পড়েছে।

চর্বিগুলো গোমানি ভাগ করে রাখল। মাংসগুলো কেটে কেটে কলাপাতার স্তূপ করল। শুয়োরটার গায়ে মাংসের চর্বি বেশি। শুয়োরটা বড় জবরদস্ত, শুয়োরের মতো শুয়োর বটে। কৈলাস দাওয়ায় বসে এমন সব কথা বলছে। এখন কৈলাসের মুখে ও মনে বেশ একটা আমিরী চাল। রাজা—বাদশার মতো বসে ওজর বানাচ্ছে। আদেশ দিচ্ছে চটানের সকলের কাছে। সে হুজুর বনে গেছে। সকলে এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে—কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে হুকুম নিচ্ছে। সে গেরুকে বাজারে পাঠাল। লখি, টুনুয়াকে নদীর ওপারে। ঝাড়োকে জিয়াগঞ্জ থেকে কাটোয়া পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ধারে যত চটান আছে—সেখানে। ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। বলছে সকলকে, তুমরা যাবেক কিন্তুক বাপুরা। কৈলাসের পুষে বড় করা বাচ্চাটার শাদি। মেয়েরবানি করে তুমরা সব চলোগে। লয়তো কৈলাসের খুব দুঃখ হবে। তুমরা যাবেক সকলে। ঝাড়ো সকলকে দাওয়াত দেবার জন্য চটান ছেড়ে দুদিন আগে চলে গেছে।

আজ এই ভোরে, এই আমিরী ভাবটুকু কৈলাসকে খুব সুখ দিচ্ছে। সকলের সঙ্গে সে কথা বলল। আজ বৌটারও খুব সুখ। এত বড় একটা শুয়োর এ চটানে কোতল হল, সে ত ওরই বেটার জন্য। চটানের মানুষেরা এত বড় শুয়োর কোতল হতে দেখেছে চটানে—না আর দেখবে! সে ঘরে গেল তখন। কৈলাসের

কানে কানে বলল, একটা মাইক লাগা না! বাবুদের বাড়ি গমগম করে উঠুক। বলুক, কৈলাস ডোমের বেটার শাদি। শহরের লোক যদি না জানল তবে শাদিতে কী সুখ!

কৈলাস ভাবল, তা বটে তা বটে। এক বেটার শাদি।

সে ডাকল দুখিয়াকে—দুখিয়ারে, অঃ দুখিয়া!

হা জী বলেহ।

তু একবার লখনবাবুর কাছে যা। ওয়াকে বলবি একটা মাইক লিতে হবে। একটা কলের গান ভি লিতে হবে। দশ রুপায়া কাল দে লিব। তু যা।

দুপুরে একটা চাঁদোয়া টাঙানো হল উঠোনে। একটা ঘট বসানো হল। চটানের সকল মেয়ে—মরদ মিলে নদী থেকে জল তুলে ঘটে একটু একটু জল ঢালল। মাইক বাজল উঠোনে। বাবুদের বাড়িমুখো মাইকটা বসানো হয়েছে। খাটালের গলিতে দুটো বড় কড়াইয়ে শুয়োরের গোস্ত জ্বাল হচ্ছে। বড় মাছের ঝোল হচ্ছে। বড় কড়াইয়ে দু কড়াই মিষ্টি আনিয়েছে কৈলাস। দুখিয়া রান্নার তদারক করছে। মাঝে মাঝে ঘাটোয়ারিবাবু অফিস থেকে নেমে আসছেন। হেঁটে হেঁটে সব দেখাশোনা করছেন এবং সকলকে তাড়া দিচ্ছেন—এবার রওনা হতে হয়।

নেলি উনুনটার পাশে বসে সব দেখল। বাপ ছুটোছুটি করে মরছে একবার রামকান্তের কাছে, একবার কলের গানের কাছে। লাশ—কাটা ঘরের দুজন লোক এসেছিল, বাপ এক ঘণ্টার ভিতর সে—কাজগুলো সেরে চলে এল। বাপের মুখের ঘাম জমেছে। এতদিন পর বাপ যেন একটা কাজের মতো কাজ পেল। কৈলাস ওকে দিয়ে পয়লা নম্বর কাজগুলো করাচ্ছে বলে—সে কৃতার্থ হচ্ছে। বড় অনুগত আজ গোমানি ডোম। বড় ভালোমানুষ আজ সে।

লখি—টুনুয়া নদীর পার থেকে ফিরছে। ওদের সঙ্গে আরও চারজন মরদ। ওদের কাঁধে বড় বড় ভাঁড়। ওরা পচাই নিয়ে ফিরছে।

ঘাটোয়ারিবাবু ফের অফিস থেকে নেমে এলেন। বললেন, কিরে তোদের এখনও হল না। জিয়াগঞ্জ পৌঁছতে দেখছি তোরা খুব রাত করবি।

ঘাটোয়ারিবাবুকে চটানে দেখে সকলে এসে জড়ো হল। ওরা খুব ভালো মানুষের মতো বাবুর কথা শুনল। তারপর সকলে সকলকে তাড়া দিল। বলল, জলদি, জলদি করো। আর দেরি চলবে না।

ঘরে ঘরে সকলে সাজল। মংলি দাওয়ার নিচে পানের পিক ফেলে আকাশি রঙের শাড়ি পরল এবং ভাবল যদি কাটোয়া থেকে লোকটা আসে, যদি মংলির সঙ্গে জিয়াগঞ্জে যায়! কাঠের বাক্স থেকে সে ভাঙা আরশি নিল। নিজের মুখ দেখল এবং পাশাপাশি অন্য মুখটা দেখারও ইচ্ছা। কপালে টিপ দিল কাগজের। চোখে কাজল, পায়ে রুপোর খাড়ু, হাতে রুপোর চুড়ি, নাকে পিতলের নথ পরল, চোখ টানটান করে সকলের সঙ্গে কথা বলছে। দুখিয়াকে ধমক দিচ্ছে। মংলির ধমক খেয়ে দুখিয়া ফেটি বাঁধল মাথায়, কাঁধে গামছা, গায়ে হাফশার্ট, হাতে লাঠি নিল। হাতে লাঠি নিয়ে দুখিয়া এ—ঘর সে—ঘর করতে থাকল। দুটো গোরুর গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। দুখিয়া গোস্ত, পচাই, মিষ্টি, মাছ—গোরুর গাড়িতে বোঝাই করছে। অন্য গোরুর গাড়িতে গেরু বসেছে টোপর মাথায় দিয়ে। চারপাশে বসেছে চটানের সব বাচ্চাকাচ্চার দল।

বেড়ার ফাঁকে নেলি দেখছে। হরীতকী তবু বাচ্চাটা কোলে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে পারল। নেলি সেটুকু পর্যন্ত পারল না। লজ্জায়, দুঃখে সে চালাঘরটার একপাশে চুপচাপ বসে থাকল এবং বেড়ার ফাঁক দিয়ে গোরুর গাড়ির ওপর গেরুকে দেখে তার চোখ ফেটে জল বেরোতে লাগল। গেরু শাদি করতে যাচ্ছে। সে আজ থেকে শনিয়ার মরদ হবে। অন্য চটানে উঠে যাওয়ার জন্য অন্য কোনো মরদ থাকল না নেলির। সে এ চটানে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ। বাপ গোমানি পর্যন্ত চুল পাট করেছে, তেল মেখে গোঁফ মোটা করেছে। শক্ত করেছে। বাপ গোমানিকে বড় খুবসুরত লাগছে। গেরুকে আজ বাবুমানুষের মতো লাগছে। লতুন কাপড় পরনে, লতুন জামা গায়ে। মাথায় টোপর পরছে গেরু। সেও কেমন চুপচাপ, কেমন ভেঙে পড়েছে যেন।

গেরুকে দেখে নেলির কষ্ট হতে থাকল। যেন ওর কিছু বলবার নেই। সে বাপ কৈলাসের হাতে বাঁধা। যেন তার নালিশ—নেলি তু না কাঁদিস। হামাকে তু ভুলে যা। আজ থেকে তুর গেরু মর গিল।

গোরুর গাড়ি দুটো চটান থেকে নেমে গেলে নেলি হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল উনুনের পাশে। চটানে কেউ নেই, হরীতকী গোরুর গাড়ির সঙ্গে কিছুদূর নেমে গেছে। একমাত্র মংলি তাদের কাঠের দরজায় তালা দিয়েছে। অন্য সকলের দরজা নেই, তালাও পড়েনি। নেলি ঘর থেকে বের হয়ে চটানের চারপাশটায় হাঁটতে থাকল। সহসা একটা দুরন্ত ইচ্ছা নেলিকে পাগল করে তুলেছে। নেলিকে উত্তেজিত করে তুলেছে। এ—চটানে ওর জন্য কেউ ভাববার নেই, কী হবে এ—চটান দিয়ে কী হবে বাপ গোমানি, অন্য মেয়ের মরদ গেরুকে দিয়ে, কী হবে এ চটানে বেঁচে থেকে। তার চেয়ে সে অন্য কোথাও উঠে যাবে, অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধবে। সেইজন্যই দুরন্ত ইচ্ছাটা ওকে ঘোড়দৌড়ের মতো ছুটাল। ঘরে ঘরে আগুন ধরানোর জন্য নানারকম ফন্দি—ফিকির খুঁজতে থাকল। দরকার হলে সে—আগুনে পুড়ে মরবে। চটানে আগুন দেবার আগে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, কিছুক্ষণ আকাশ দেখল। দু—একবার প্রকট হাসিতে ফেটে পড়তে চাইল। অথচ আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছা নেলিকে হাসতে দিচ্ছে না। ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে, ক্রমশ হাতে পায়ে শক্তি পাচ্ছে না, এমনকি দেশলাইটা হাতে নিয়ে একটা কাঠি ধরাবার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। এত ভারী হয়ে গেছে শরীরটা, এত সে ভেঙে পড়েছে।

তখন দুঃখবাবু চটানে উঠে এলেন। চটানটা একেবারে ফাঁকা। কেউ নেই। এমনকি হরীতকীকে দেখতে পাচ্ছেন না। নেলিকে দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি চটান অতিক্রম করার সময় ডাকলেন, নেলি আছিস নাকি রে ঘরে? নেলি, ও নেলি! চটান যে একেবারে ফাঁকা। হরীতকীও বুঝি গেছে! নেলি, ও নেলি, সাড়া দিচ্ছিস না কেন?

নেলি তাড়াতাড়ি দেশলাইটা লুকিয়ে ফেলল। ভেতর থেকে উত্তর করল এই যে বাবু আমি ঘরে। শরীর ভালো নেই বলে শুয়ে আছি বাবু।

কিছু করছিস না ত?

না বাবু, কিছু করছি না।

শরীর কী খুব খারাপ যাচ্ছে?

না বাবু।

ওরা তবে সব চলে গেল?

জী বাবু। নেলি আর শুয়ে থাকতে পারল না? খারাপ দেখাচ্ছে ভেবে নেলি তাড়াতাড়ি উঠে বসল। বাইরে বের হয়ে এল। হাতে পায়ের জড়তা ভাঙবার মতো শরীর টান টান করল। গেরুর বিয়েতে সে এতটুকু ভেঙে পড়েনি, শরীর টানা দিয়ে এ—মত ভাব প্রকাশ করার ইচ্ছা—যেন ভাবটা—গেরু শাদি করতে গেছে, নেলি, পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

তা হলে তুই গেলি না?

না বাবু! যেতে ইচ্ছে হল না।

বসে থাকলি একা একা?

জী বাবু।

তবে আমার ঘরে আয়, কাজও করবি, গল্পও করবি।

দুঃখবাবু এবার অফিসঘরের দিকে হাঁটতে থাকলেন। বেলা পড়ে আসছে। দুঃখবাবু ঘরে ঢুকে জানলা খুলে দিলেন। শীতের পাখিরা জানালার আকাশে উড়ছে। পলাশগাছে ফুল ফুটছে। গাঙ শালিকেরা মধু খাচ্ছে পলাশ ফুলের। ওরা উড়ল। ওরা বসল। দুঃখবাবু জানালা খুলে সব দেখতে পেলেন। বাবলার ঘন বনে দুটো মেয়ে কাঠ সংগ্রহ করছে, দুটো কাঠঠোকরা পাখি, দুটো ইষ্টিকুটুম ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। আকাশ ঘন নীল। চালা ঘরটায় ইতস্তত কুকুরের আর্তনাদ। বালিয়াড়িতে পায়ের ছাপ। হরীতকীর ঘরে বাচ্চাটা হাত

—পা নেড়ে খেলছে। হরীতকী ফিরে এসেছে নদীর ঢালু থেকে। হরীতকী কত রকমের কথা বলল বাচ্চাটার সঙ্গে। দুঃখবাবু নিজের ঘরের কথা ভাবলেন। বৌ বাচ্চার কথা ভাবলেন। ভাবলেন অভাবের সংসার। সুখ—দুঃখের ঘর। ওদের মুখে দুটো অন্ন দেওয়ার জন্যই তিনি এখানে মরা মানুষের হিসাব আগলাচ্ছেন। কিন্তু এখানে এলেই মনটা ভারী হয়ে ওঠে। বুকে নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা—মৃত্যু, মৃত্যু। এই ভাব শুধু মনে। তবু আসতে হবে, বসতে হবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানে পড়ে থেকে মড়ার হিসাব আগলাতে হবে। এইসব ভেবে দুঃখবাবু কেমন মুষড়ে পড়লেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তখন পাশে কেউ নেই যে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে সাহস দেবে অথবা দুটো ভিন্ন রকমের কথা বলে মনের অস্বস্তি দূর করবে। তিনি ফের ডাকলেন, নেলি, ও নেলি। একবার আয়না বাপু। ঘরে একা বসে করছিসটা কী শুনি। এইসব বলে, ডেকে—হেঁকে নিজেই মনটাকে অন্যমনস্ক করতে চাইলেন।

নেলি ঘরে গিয়ে মাচানে বসে পড়েছিল। উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। গল্প করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তবু বাবু ফের ডাকলেন। বাবুর কথা অগেরাহ্যিতে আনতে নেই। বাবু যখন ডেকেছেন, যখন এ—দুঃখ যাবার নয়, তখন দুটো ভিন্ন রকমের কথাই বলা যাক লতুন বাবুর সঙ্গে। সে মাচান থেকে উঠল—যেন আর কোনো দুঃখ নেই। কিছুক্ষণ আগেও আত্মহত্যার যে প্রবল ইচ্ছা ওকে তাড়না করছিল, নতুন বাবুর ডাকে সে ইচ্ছা আর সাড়া দিচ্ছে না। সেই দুরন্ত ইচ্ছাটাও নেই। বাবু ডাকছে। বাবুর ইচ্ছা ওর পাশে বসে সে গল্প করুক। নেলি নিজের শরীরটার দিকে চাইল। কদিনে শরীরটা আরও যেন বেশি ভারী হয়ে উঠেছে। কোমরের নিচটা ক্রমশ মোটা হচ্ছে। শরীরে মাংস লাগছে। ছোট কাপড়ে শরীর ঢাকছে না। সে নিজেই লজ্জা পেল শরীর ঢাকতে গিয়ে। তবু শরীর কোনোরকমে ঢেকে সে বাবুর ঘরে গিয়ে উঠল। দরজার ভিতরে উঁকি মেরে বলল—আমায় ডেকেছেন বাবু! কী কাজ করে দিব বুলে দ্যান।

দেখ না ঘরটা কেমন নোংরা হয়ে আছে। সেদিন ত ঘরটা পরিষ্কার করে দিলি। দ্যাখ আজই কী নোংরা হয়ে গেছে। দ্যাখ তক্তপোশে দেওয়ালের কেমন চুনবালি। মেঝেতে পা রাখা যাচ্ছে না। দে দে পরিষ্কার করে দে। ঘরটাতে বসতে পারছিনে।

আপনি টুলটার ওপর উঠে বসেন, হামি ঝাড় দিয়ে লিচ্ছি।

ইতিমধ্যে ঘাটোয়ারিবাবু দুঃখবাবুর জন্য একটা ছোট পুরনো তক্তপোশ জোগাড় করে দিয়েছেন। ঘরের একপাশে সেটা পাতা আছে। নেলি নুয়ে প্রথম তক্তপোশের নিচটা পরিষ্কারের জন্য গলা বাড়ালো। নেলি তক্তপোশের নিচেটা ঝাঁট দিচ্ছে—দুঃখবাবু দেখতে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। নিজের স্ত্রীর কথা মনে হল। ঘরে ওর স্ত্রী আছে। সতীসাধ্বী স্ত্রী। সুতরাং মনের দুর্বিনীত ইচ্ছাটাকে দমন করতে চাইলেন। বিবাহিত পুরুষের এমন ইচ্ছা ভালো নয়। তিনি টুলে বসে আহ্নিকের মতো জপ—তপ করতে থাকলেন—বিবাহিত পুরুষের এমন ইচ্ছা ভালো নয়। ভালো নয়। শেষে কেন জানি তিনি নেলির ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, নেলি, তুই একটা ব্লাউজ পরতে পারিস না? তোর বাপকে বলবি তুই বড় হয়েছিস। একটা জামা যেন তোকে কিনে দেয়। কথাগুলো দুঃখবাবু ধমকের সুরেই বললেন।

নেলি লজ্জায় মাথা তুলতে পারল না।

তখন সূর্য পুরনো অশ্বত্থের ডাল বেয়ে নদীর ওপারে নামছে। যে রোদ জানলা বেয়ে মেঝেতে নেমেছিল সে আবার দেয়াল বেয়ে উপরে উঠছে। লাল রঙ ধরেছে। পৃথিবীর সর্বত্র আলো। আলোর রঙ। লাল নীল হলুদ আলো। আকাশ নীল। সাদা মেঘ। টুকরো টুকরো সাদা মেঘের রঙ আকাশে কুর্চি ফুল ফুটিয়েছে। বিকেলের সাদা মেঘ সোনালি রঙে জ্বলছে। নেলি জানালায় মুখ রাখতে পারল না। একটা ব্লাউজের অভাব এই ধরণির সব সুখকে বিষময় করে তুলল। ঘরটা পরিষ্কার করে সে কোনোরকমে বাইরে এসে দাঁড়াল। সূর্যের সোনালি আলো ওর শরীরে এসে নেমেছে। দুঃখবাবু দেখলেন—নেলি সে আলোয় জ্বলছে। নেলির মুখ, চোখ, শরীর এই আলোর অসামান্য লাবণ্যে বড় মনোরম হয়ে উঠছে।

দুঃখবাবু ডাকলেন, কিরে রাগ করলি?

নেলি জবাব দিল না।

সহজ হবার জন্য দুঃখবাবু বললেন, তোর বিয়েতে আমাকে নিমন্ত্রণ করবি না? তোর বিয়েতে কিন্তু দেখিস যেন বাদ পড়ি না। কিরে, কথা বলছিস না কেন? মনে থাকবে তো আমার কথা?

মনে থাকবে। লেকিন শাদি আমার হবে না বাবু।

কে বললে হবে না? জরুর হবে। আমি দেখে শুনে তোর শাদি দেব!

কাঁহা দিবি বাবু? কোন হামারে শাদি করবে?

সবাই করবে। কাটোয়ার চটান থেকে তোর জন্যে মরদ ধরে আনব।

লেকিন হবে না।

কেন হবে না।

চটানের লোকেরা বুলবে হামি ডাইনি আছি। দিন দিন ডাইনি বনে যাচ্ছি। আপনি তু লতুনবাবু আছেন। দুরোজ থাকেন, সব টের পাবেন।

নেলি নেমে যেতে থাকল অফিসঘরের বারান্দা থেকে। দুঃখবাবু ফের ডাকলেন। নেলি দাঁড়াল না। বাবুর কথাগুলো ওর শরীরের আগুনটাকে আরও খুঁচিয়ে দিয়েছে। সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকল। নিচে নেমে সে কাউকে না দেখে গঙ্গা—যমুনাকে ডাকল। শেষে চটানে উঠে হরীতকীকে বলল, রাতে তু কিছু না রাঁধবি পিসি। হামি আজ রাতে বুড়াবাবার ঘরে যাবে। আজ তু, হামি—দুটো ভালো মন্দ খেয়ে লিবে।

সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে নেলি গঙ্গা—যমুনাকে নিয়ে নদীর পাড় ধরে ছুটতে থাকল। নদীর পাড়ে রাত ঘন হয়ে নামছে। ঘন অন্ধকারে জোনাকি জ্বলচে। নিচে বালিয়াড়িতে কাঁচা কয়লা পুড়ছে। নেলি ছুটতে থাকল কেবল। কুকুর দুটো ছুটছে। শিমুল পলাশের অন্ধকার অতিক্রম করে নেলি সেই বুড়োর বাড়িটার পাশে একটা ঝোপের ভিতর কুকুর দুটোকে নিয়ে লুকিয়ে থাকল। বুড়োর ছেলে দুটো আসছে। কিছু মেয়ে—পুরুষ সঙ্গে। পুকুর পাড়ে পেয়ারা গাছের নিচে ওরা প্রদীপ রাখল। ওরা পেয়ারা গাছটার নিচে বুড়োর আত্মাকে খেতে দিল। নেলি ঝোপের ভিতরে বসে সব দেখছে। গঙ্গা—যমুনাও দেখছে। পেয়ারা গাছটার নিচে মালসাতে খেতে দিয়ে বুড়োর ছেলেরা কাঁদল। মেয়েরা কাঁদল। তারপর ওরা চলে গেল। বুড়োর আত্মাকে শেষবারের মতো খেতে দিয়ে ওরা বাড়ির ভিতর ঢুকে সদর বন্ধ করে দিল। শুধু যারা বাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছিল তারা দেখেছিল প্রথম একটি মেয়ের রূপ ধরে আত্মাটা খাবারগুলো খেল পরে দুটো কুকুরের শরীর নিয়ে আত্মাটা খাবারগুলোর আশেপাশে ঘুরে বেড়াল। এক সময় পেয়ারা গাছের নিচে প্রদীপটা নিভে গেল।

নেলি সে রাতে ঘরে ফিরে বলেছিল, পিসি তু আর হামি খাবে। খাওয়ার পর ঢেকুর তুলে বলেছিল, বেশ খেলাম নারে পিসি। তু ভি খেলি হাম ভি খেলাম। গঙ্গা—যমুনা ভি খেল। বুড়োটার খুব চিংড়ি মাছের মুড়ো ভাজা খাওয়ার শখ। সব দে লিছে পিসি। ওর বিটিরা কাঁদছে কী পিসি! বুলছে—বাবাগো তুমি চিংড়ি মাছ খেতে ভালোবাসতে গো। বাবাগো তোমাকে দেখতে নারলেম গো। কী কাঁদছে পিসি। ওয়ার বেটারা পিসি আচ্ছা নকরি করে।

নেলি খেয়ে উঠে বলল, হামরাও একটা ভোজ খেয়ে লিলাম পিসি। আচ্ছা ভোজ।

হরীতকী বলল, ভাত, দাল, মিষ্টি, রসগোল্লা। মাছের কালিয়া। কত হরেকরকম খাবার খেয়ে লিলুমরে। গেরুর ভোজের চেয়ে এটা কম হল না। কী বলিস তু?

অথচ ঘুরে ফিরে সেই এই আপশোশ নেলির। যত জিয়াগঞ্জের চটানের কথা মনে পড়ছে তত কষ্ট বাড়ছে। এখন হয়তো শনিয়ার শরীরটা গেরুর শরীরের সঙ্গে মিলে আছে। বাপ গোমানি মদ খেয়ে হয়তো হল্লা করছে। কৈলাসের হাঁক—ডাকে হয়তো গোটা চটানটা কাঁপছে। মংলি মরদের সঙ্গে হয়তো বালিয়ারিতে নেমে গেছে। যতরকমভাবে হতে পারে—সব রকমের ফুর্তি করছে। নেলি নিজের ঘরে ঢোকার সময় এমন

সব ভাবল। এমন সব ভাবায় চোখে—মুখে জ্বালা ধরছে। সে বিছানায় শুয়ে শরীরটাকে শক্ত করে দিল। গায়ে কাঁথা—কাপড় টেনে পায়ে পা ঘষতে থাকল। উপুড় হয়ে পড়ে চাপ দিতে চাইল শরীরে। শরীরে তার গরম ধরে গেছে। ইচ্ছার আধারগুলোতে দুঃখবাবু অথবা গেরুর প্রতিবিম্বকে দেখতে চাইল। গেরুর চেয়ে দুঃখবাবুর প্রতিবিম্ব ওকে বেশি তাড়না করছে। অথবা নেলি সেই প্রতিবিম্বকে ভালোবাসতে চাইছে। গেরুর ওপর বদলা নিতে চাইছে। সুতরাং নেলিও সেই প্রতিবিম্ব নিয়ে যতরকমভাবে হতে পারে শরীরের ওপর লুফতে থাকল কিন্তু এই করে গতরে উত্তেজনা শুধু জমছে। গরম বাড়ছে। গভীর রাতে দুঃখবাবুর ঘরের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। নেলি শক্ত হয়ে শুয়ে থাকল মাচানে। মাচান ধরে পড়ে থাকল। শরীরের চাপ মাচানে সেজন্য বাড়ছে। কাঁথা—কাপড়ের ভিতর মাচানের শব্দ উঠছে। সে কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারছে না। কিছুতেই নিজেকে আর যেন ধরে রাখতে পারছে না। আর পারছে না। পারছে না। সে উঠে বসল। উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে। মনে হচ্ছে শরীরে ভীষণ জ্বর এসেছে। অথবা বেতো রুগির মতো কেমন এক অলস যন্ত্রণায় ভুগছে। মাচানের ওপর বসে সে যেন বুঝল শুধু প্রতিবিম্বকে নিয়ে শরীরের গরম মেটে না। এতে শরীরের যন্ত্রণা আরও বাড়ে। নেলি নিজের কাছেই খুব অসহায় হয়ে পড়ল। যত ভাবছে উঠবে না, দুঃখবাবুর ঘরের দিকে যাবে না, ততই উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ছে। অসহ্য মনে হচ্ছে এই মাচান। কপালে ঘাম জমেছে। শরীরের সব রক্তমাংস যেন জল হয়ে এক্ষুনি গলে পড়বে। নেলি মাচানে বসে অন্ধকারে দু—হাত উপরে তুলে ডাকল, ডাকঠাকুর, তু হামারে ভরসা দে।

এমন সময় হরীতকীর ঘরের বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। দূরে রাত পেঁচা ডাকল। ঝাউগাছটার মরা ডালে শকুনেরা পাখা ঝাপটাল। শ্মশানে মড়া নেই। সুতরাং আগুন জ্বলছে না। পিসি ঘুমের ভিতরই বাচ্চাটাকে ষাট সোহাগ করছে।

নেলি ফের ডাকল তার ঈশ্বরকে, ডাকঠাকুর, তু হামারে ভরসা দে লয়তো হামি মরে যাবে, হামি বাঁচবে না।

তারপর নেলি বুঝল তার নিজস্ব কোনো ইচ্ছা—অনিচ্ছার কথা নেই এখন। এটা তার শরীরের ইচ্ছা, সে ইচ্ছার দুঃসহ যন্ত্রণায় মাচান থেকে নেমে দুঃখবাবুর ঘরের দিকে হাঁটছে। তখন হরীতকীর ঘরে আঁধার। নেলির ঘরে কোনো লম্ফ জ্বলছে না। চটানে আঁধার। চটানে কোনো মরদের সাড়া নেই। মেয়ে মরদ বিহীন এই চটানে নেলি যেন ভূতের মতো হাঁটছে। কুকুর দুটো পিছনে আসছে। নেলি ওদের ইশারা করল চলে যাওয়ার জন্য। কুকুর দুটো আঁধারে নেমে গেল। শ্মশানের চালাঘরটায় হারিকেন জ্বলছে। কুকুর দুটো নিচে নেমে চিৎকার করল। বাবলার ঘন বনের দিকে ওরা যেন ছুটে গেল তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু রাতের শব্দ, রাত—পোকার শব্দ। কিছু ঝিঁঝিপোকার শব্দ অথবা যন্ত্রণার শব্দ। কাঠগোলায় কারা যেন হুড়মুড় করে সব কাঠ ফেলে দিল। নেলি দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্তর্পণে কাঠগোলার দিকে তাকাল—কেউ সে—ঘর থেকে নেমে আসছে কিনা দেখল। কেউ আসছে না। শুধু একটা কুকুর কাঠগোলা থেকে ছুটে পালাচ্ছে। কুকুরটা কাঠগোলায় যেন ভূত দেখেছে। তখন নেলির পায়ের ওপর আলো। দুঃখবাবুর ঘরের জানালা দিয়ে আলো এসে নিচে নেমেছে। সে দুঃখবাবুর ঘরের খুব কাছাকাছি এসে গেল। আলোটা ওর পা থেকে বেয়ে কোমরে উঠল। নেলি ওপরে উঠে জানালাটা একটু ঠেলে ঘরের ভিতরটা দেখল। লতুনবাবু লেপ দিয়ে শরীর মুখ ঢেকে রেখেছেন। আলোটা পাশের একটা তাকে জ্বলছে। নেলি এবার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। এবং ধীরে ধীরে ঠেলে দিতেই দেখল দরজাটা খুলে যাচ্ছে। অথচ নেলি দরজাটা বেশি দূরে ঠেলে দিতে পারল না। সে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে দরজার পাশে বসে পড়ল। মনে হল দুঃখবাবু এক্ষুনি হাজার লোককে ডেকে বলবেন ডাইনি মাগি আমাকেও খেতে চাইছে।

দুঃখবাবু ঘরে ঘুমোতে পারছিলেন না। চটানের প্রথম রাতযাপন তাঁকে মনের দিক থেকে বিব্রত করে মারছে। তিনি শুয়ে শুয়ে নেলির কথাই ভাবছিলেন। নেলির অসহ্য চোখ দুটো শরীরে দুরন্ত যন্ত্রণার জন্ম দিচ্ছে। বাসি কাপড়ের মতো স্ত্রীর শরীরটা মনের দড়িতে ঝুলছে। তিনি চোখ বুজে পড়েছিলেন শুধু। নেলি

এই চটানে আছে। মাচানে নেলি, নেলি, এই ভাবনা শুধু মনে। বিকেলে এ—ঘরে নেলি না এলেই যেন ভালো করত। কিন্তু মনে হচ্ছে দরজাটা কে যেন ঠেলে দিল। মনে হচ্ছে দরজার ও পিঠে কে বসে হাঁপাচ্ছে। চোখ বুজেই তিনি যেন সব টের করতে পারছেন। তিনি ডাকলেন, কে বাইরে? কে দরজাটা ঠেলছিস?

তিনি দরজার ও—পিঠ থেকে কোনো জবাব পেলেন না বলে উঠে বসলেন। চোখ মুখ ঘষলেন। ভাবলেন মনের বিভ্রম হয়তো। তিনি শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন ফের। কিন্তু শুয়ে পড়ার সময় দেখলেন দরজাটা সত্যি একটু খোলা। ভাবলেন হয়তো বাতাসে। তিনি উঠে দরজা বন্ধ করতে গিয়েই দেখলেন বাইরে নেলি চুপচাপ বসে আছে। বসে বসে যেন শীতে কাঁপছে।

তিনি বললেন, কিরে ভয়ে চটানে ঘুমোতে পারলি না বুঝি? আয়, আয়, ভিতরে আয়। ভিতরে বসবি। বাইরে খুব ঠান্ডা।

নেলি উঠে দাঁড়াল। বাবুর কথা শুনতে হয়, সুতরাং সে ঘরে ঢুকে গেল। এখন আর যেন নেলির কিছু করণীয় নেই। আবার বাবু যদি কিছু বলে, যদি বলে বোস, তবে বসবে। যদি বলে দাঁড়া তবে দাঁড়াবে। যদি বলে অন্য কিছু—তবে, তাই হবে। দুঃখবাবুর কাছে এখন নেলি কাঠের পুতুলের মতো হয়ে বাঁচতে চাইল।

সে সময় সহসা বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে। জানালায় বিদ্যুতের ছটা এসে নামল। ওদের মুখ উজ্জ্বল হল। শীতের শেষে ঝড়বৃষ্টি হবে। দুঃখবাবু জানালা বন্ধ করে দিলেন। সহসা মনে হল আকাশ কেঁপে উঠছে। অন্ধকারে বাইরের আকাশটা যেন ছাদের মাথায় ভেঙে পড়ল। দুঃখবাবু ভয় পাওয়ার মতো করে বললেন, কোথাও বাজ পড়ল নেলি। নেলি কাঠের পুতুল বলে জবাব দিতে পারছে না। আবার তেমনি আকাশ ভেঙে পড়ার শব্দ। জোর হাওয়া দিচ্ছে। দরজা জানলা কাঁপছে। বৃষ্টির ভয়ানক ছাট আসছে। জানালার ফাঁক দিয়ে দেয়াল বেয়ে জল মেঝেতে নামল। মেঝেতে জমল। তারপর মনে হল জানালায় কারা যেন ধাক্কা মারছে। যেন লাঠি পিটছে। অথবা কারা যেন জানালায় হাত দিয়ে শব্দ করছে এবং ভয়ানক কিছু ঘটে গেছে এমন ভাব দেখাচ্ছে। দুঃখবাবু জানালা খুলে বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে দেখার জন্য ফাঁক করতেই এক পশলা শিলাবৃষ্টি হল ভিতরে। তিনি বুঝলেন বাইরে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। নেলিকে বললেন, তুই তক্তপোশে উঠে আয়। জলে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছিস কেন? তক্তপোশে বসে থাক, জল ছাড়লে ঘরে যাবি।

নেলি শীতে কাঁপছিল অথচ কিছু বলছিল না। দুঃখবাবু চাদরটা দিলেন ওকে। নেলি চাদরটা গায়ে দিল না, জবুথবু হয়ে তক্তপোশের এক কোণায় খুব আলগা হয়ে বসে থাকল। মেঝেতে জল ক্রমশ উপচে পড়ছে। শীতে কনকন করছে পাটা। নেলি তবু পা তুলে বসল না।

দুঃখবাবু ভাবলেন ধমক দেবেন। শাসন করবেন। নেলি এটা ভালো হচ্ছে না। আমার কথা অমান্য করতে নেই। তক্তপোশে পা তুলে বোস। চাদরটা গায়ে দে। শীতের ঠান্ডা কাউকে রেহাই দেয় না। তোকেও দেবে না, তুই শীতের ঠান্ডায় মরবি। অথচ তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। গলাটা কেমন কাঠ—কাঠ। গলাটা শুকনো। নেলি সেই যে পুতুলের মতো বসে রয়েছে, সেই যে ঘরে ঢুকে চুপ করে গেল—সেই যে ভাব, যদি বলে দাঁড়া, —তবে দাঁড়াবে, সে ভাব কিছুতেই যেন কাটিয়ে উঠতে পারছে না। দুঃখবাবুর শীত করতে থাকল। তিনি একটা কাঁথা জড়িয়ে বসলেন। এমন সময় প্রচণ্ড হাওয়ায় জানালায় একটা পাট খুলে গেল। আলোটা নিভে গেল। দুঃখবাবু জানালার পাশে ছুটে গেলেন। জানালাটা বন্ধ করার সময় শিলাবৃষ্টিতে ওর চোখ—মুখ ভিজে গেল। শরীরটা ভিজে গেল। অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তক্তপোশ ধরে ধরে চলছেন। তবু আন্দাজে নেলির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।—চাদরটা দিবি? মুখ মুছব। চাদরটা নেওয়ার সময় তিনি নেলিকেও টেনে তুললেন।

নেলি চিৎকার করে উঠল, তু হামারে ব্যাশ্যা না বানাবি বাবু।

আবার সহসা আকাশ ভেঙে পড়ল ছাদে। দুঃখবাবু নেলির কথা শুনতে পেলেন না। নেলি এখন নিজেই পাগলের মতো দুঃখবাবুকে পেঁচিয়ে ধরেছে। দুঃখবাবুর শরীরের সঙ্গে নেলি এখন মিশে যেতে চাইছে। আর দুঃখবাবু যেন বুঝলেন, ওটা সত্যি নেলির শরীর মাত্র।

ভোরবেলায় সকলে মিলে একটা বাজপড়া মরা মানুষকে চটানে এনে তুলেছিল। সকলে দেখল সেটা গোমানির। জিয়াগঞ্জে ভোজ খেতে খেতে মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল। রাতেই সে মেয়েটার জন্য ছুটল। রাতের জল—ঝড় ওকে আটকাতে পারেনি। হঠাৎ বাজ পড়ে চটানে উঠে আসতে সে মরল।

গোমানিকে ঘাটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘাটোয়ারিবাবু সামনে দাঁড়িয়ে সব কাজগুলো করলেন। কৈলাস কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। ওকে রাত করে ছেড়ে না দিলেই হত। অনেক দিন পর চটানের সকলে বড় রকমের একটা শোক পেল। ওরা সকলেই প্রায় কেঁদেছে। জোরে জোরে। শুধু নেলি অপলক চেয়ে ছিল। ব্যাপারটাকে সে যেন বুঝতে উঠতে পারেনি অথবা বাপ মরেছে এ—কথা সে এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। কেমন হতভম্ব, কেমন পাথর বনে গেছে নেলি। তবু সন্ধ্যার সময় শুয়োরের বাচ্চা দুটোকে ঘরে তুলতে ভুলল না, কবুতরের টঙ বন্ধ করতে ভুলল না। যন্ত্রের মতো কাজগুলো করল। ঘরের লম্ফটা জ্বেলে বসতেই কৈলাসের বৌ এল, হরীতকী এল, মংলি এল। ওরা সকলে ওকে ঘিরে বসল। নানারকমের কথা বলে ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। নেলি কথা বলল না, শুধু চুপচাপ শুনল। দরজার দিকে চেয়ে ভাবল—বাপ আর এখানটায় বসবে না। বাপ আর গালমন্দ দেবে না। বাপের আশায় সে আর শিবমন্দিরের পথে বসে থাকবে না। এইসব ভেবে নেলির কান্না আসছে। নেলি কাঁদতে থাকল।

যত বাপের কথা মনে হচ্ছে তত নিজেকে শাপ—শাপান্ত করতে ইচ্ছে হচ্ছে নেলির। মনে হল রাতের আঁধারে দুঃখবাবুর ঘরে না গেলেই হত। এমন করে শরীরের গরমে না ভুগলেই হত। নিজের শরীরটাকে বসে বসে এখন কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। বারবারই মনে হচ্ছে ডাকঠাকুর নেলির পাপের বোঝা বাপের মাথায় ফেলেছে। বাজ হয়ে ডাকঠাকুর বাপের মাথায় পড়ল। মেলিকে সমঝে দিল—ওটা ভালো কাজ লয়। অমন কাজ করতে নেই। করলে ফের ভুগতে হবে।

হরীতকী বলল, হামার ঘরে আয় তু। দুটো খাবি। সারাদিন কিছু খাসনি। এখন তুকে দুটো খানা মুখে দিতে হবে।

পিসি হামার ভালো লাগছে না।

এটা কী ভালো লাগার কথা! বকা—ঝকা করত, লেকিন এ চটানের আদমি ত ও। তার লাগি তু না খাবি, শরীর মন্দ করবি ও আচ্ছা বাত লয়। একা একা থাকবি ত মন আওর জায়দা খারাপ হোবে। হরীতকী নেলির হাত ধরে টানতে থাকল।

নেলি হরীতকীর ঘরে চলে গেল।

কৈলাস দাওয়ায় বসে তামাক টানতে টানতে গোমানির কথা ভাবল। কৈলাসের কাছে দুনিয়াটা খুব ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। গোমানি এ—চটানে আর চিল্লাবে না ভাবতে বড় কষ্ট হয়। তবু উঠতে হবে ভাবল কৈলাস। ফরাসডাঙায় যেতে হবে। কঙ্কালটার নসিবে শেয়াল—খটাশের অত্যাচার কতটা বেড়েছে তা দেখতে হবে। সে উঠে পড়ল।

শনিয়া চুপচাপ মাচানে বসে আছে। গেরু বাঁশে হেলান দিয়ে অন্যমনস্ক হয়েছে। এ—শাদির সঙ্গে গোমানির মাথায় বাজ পড়ার কোনো অদৃশ্য হাত আছে যেন। গেরু, শনিয়া মনে মনে এমনই কিছু আন্দাজ করছে।

কৈলাস ডাকল, হে রে গেরু একবার যে ফরাসডাঙায় যানে লাগে!

গেরু বুঝল বাপ তাকেও ফরাসডাঙায় যেতে বলছে। সে উঠল। শনিয়ার দিকে চেয়ে বলল, তু অমন না ভাবিস। সে বলল, হাম ফরাসডাঙায় যাচ্ছে।

কৈলাস এবং গেরু সেইমতো হাতে বল্লম নিয়ে কাঁধে মদের ভাঁড় নিয়ে বের হয়ে পড়ল। কৈলাস সঙ্গে একটা কোদাল নিল এবং একটা গামছা নিল। কঙ্কালটা তুলে আজই লিয়ে আসতে হবে। সাবান—সোডাতে সেদ্ধ করতে হবে। দুধের মতো রঙ ধরাতে হবে কঙ্কালের গায়ে। দেরি হলে কঙ্কালের গায়ে দাগ পড়বে।

নদীর পারে নেমে শ্মশানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফের কৈলাস, গোমানিকে মনে করতে পারল। ওর উপকারের কথা মনে হল। বহু দেশ—বিদেশ ঘুরে প্রথম যেদিন সে এ—চটানে এসেছিল থাকবার জন্য বাঁচবার জন্য তখন গোমানিই তাকে থাকবার এবং বাঁচবার সব রকমের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। গোমানি তখন বড় রকমের জোয়ান দু—দশ চটানের। গলায় মোটা কালো কারে সাদা তাবিজ। পালোয়ানের মতো দেখতে। অথচ সে চেহারা বড় বেশি জলদি নেতিয়ে পড়ল চটানে। গোমানির সেই পয়মাল চেহারা বড় জলদি ভেঙে গেল।

কৈলাস হাঁটতে থাকল।

গেরু হারিকেন হাতে আগে আগে ছুটছে, ওকে ছুটতে দেখে কৈলাস ভাবল—গেরু গোমানির মতো পয়মাল হয়ে উঠছে দিন দিন। সে ভেবে খুশি হল যে পুষে বড় করা বাচ্চাটাকে পয়মাল করে তুলতে পেরেছে। শাদি—সমন্দ হয়ে গেল; শনিয়া বিবি চটানে এল। বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করার একটা মানুষ থাকল। অথচ গেরুকে বড় করার জন্য কৈলাসের একদিন কিনা মেহনত। একদা এই গেরুর জন্য ওকে সব কিছু করতে হয়েছে। গেরুর মা নিজে চলে গিয়ে গেরুর হিসাব ওকে দিয়ে গেল। গেরুর মা বেইমানি করেছে, কিন্তু সে করেনি।

চলতে চলতে মনে হল গেরুর মাকে সে বড় বেশি পিয়ার করত। বড় বেশি সুখ দেওয়ার চেষ্টা করত। অথচ বৌটা বুঝল না, ভালোবাসার দাম দিল না। জোয়ান মরদের লোভে পড়ে চটান ছেড়ে পালাল। গাছগাছালিও চুরি গেল। ওর অভাব বাড়ল। হেকিমি—দানরির ব্যবসা গেল, সঙ্গে সঙ্গে উপোস আরম্ভ হল চটানে। গেরুটাও টাঁও টাঁও করে কাঁদে। ঘরে ঘরে উঁকি মারে—ওর মুখে দুবেলা দুমুঠো খাবার দিতে পারছে না কৈলাস।

যখন কৈলাস গেরুর মায়ের মুখ গেরুর মুখে দেখতে পেত, তখন কষ্টটা আরও বাড়ত। সারাদিন—সারা মাস চেষ্টা করে বেঁচে থাকার কোনো এলাদ ঠিক করতে পারছে না কৈলাস। সে ভেঙে পড়েছে। একবার ইচ্ছা হয়েছিল ফের এখান থেকে বের হয়ে পড়ে। কোনো দরগায় অথবা কোনো আখড়ায় হেকিমি দানরির বিদ্যা আরম্ভ করে, অথবা পকেটমারের বিদ্যা। ইচ্ছা হয়েছিল চটানে অনেক ডোমের মতো চুরি, ডাকাতি রাহাজানি করে বাঁচতে। ইচ্ছা হয়েছিল একদিন গেরুর গলা টিপে সব চুকিয়ে দিতে। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। সে তখন সারাদিন সারা মাস নদীর পাড় ধরে হাঁটত এবং কোন আকাশে শকুন উড়ল দেখত। হাতে কৈলাসের লাঠি থাকত, কোমরে একটা চাকু। মরা গোরু—পাঁঠার ছাল তুলে ঘরে ফিরে গেরুর মুখে দুটো দানা দেবার ব্যবস্থা করত।

তখন গেরুটা কত ছোট, কত সরু! সে চুপচাপ বারান্দায় পড়ে থাকত। ঘাটে মরা মানুষ কখন আসবে, কখন বড়মানুষের মড়ার পিছনে খৈ—পয়সা ছিটানো হবে তার অপেক্ষায় সে বারান্দায় পড়ে থাকত। যখন ওরা আসত, গেরু বারান্দা থেকে নেমে শিবমন্দিরের পথে গিয়ে দাঁড়াত। অন্য ডোমের বাচ্চাদের সঙ্গে সে খৈগুলো মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে তুলত। তারপর একটা একটা করে বারান্দায় বসে খেত।

গেরুর একমুঠো ভাত চাই। কৈলাস এবং গেরুর জীবনে একমুঠো ভাতের দাম চড়ে গেছে। সারাদিন—সারামাস ঘুরেও চটানের অভাবকে দূর করতে পারছে না। কৈলাস মাঝে মাঝে ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ হয়ে যেত। সে চটানে ফিরে গেরুকে কাঁদতে দেখলে রাগে দুঃখে ওকে লাথি মারত। যেন লাথি মেরেই খুন করবে এমন একটা ভাব থাকত চোখেমুখে।

সেই সব দিনে এইসব পথ ধরে কৈলাস হাঁটত। এইসব পথে ঝোপে—জঙ্গলে ছাগল, ভেড়া, গোরু, বাছুর খুঁজে বেড়াত। অথবা আকাশ দেখত। আকাশে শকুন উড়ছে, শকুনেরা জটলা করছে—সে ছুটল। শকুনগুলো যতদূর উড়ল সে ততদূর ছুটল। সে ছুটছে আকাশ দেখছে। শকুন উড়ছে। শকুনগুলো কোনো কোনো সময় হাজার হারুন রসিদের মুখ হয়ে আকাশের নিচে ভাসত। ওকে এভাবে ছুটতে দেখে হাসত। যেন বলতে চাইত নসিবের ঘরে কারও রেহাই নেই। যেন বলতে চাইত, নসিব খুনের বদলা নিল। তারপর

সে দেখত আকাশ ফুসমন্তরে যেন খালি হয়ে গেল। সেখানে হারুন রসিদের মুখ নেই, শকুন নেই, কিচ্ছু নেই। হারুন রসিদ যেন জাদুমন্তর করে এতদূর কৈলাসকে ছুটিয়ে মেরেছে। তারপর আকাশের সেইসব মুখ একসঙ্গে মেঘ হয়ে আকাশকে ঢেকে দিত। সে তখন চিৎকার করে বলত, শালা রসিদ, তুর সব সহ্য হয়, লেকিন ভণ্ডামি সহ্য হয় না। সে পথের ওপর বসে হাঁপাতে থাকত। ভাবত নসিবের ঘরে বদলা নেই।

সারাদিন ঘুরে একদিন নদীর পার থেকে চটানে ফিরছে কৈলাস। তখন বর্ষাকাল। তখন রাস্তাটা পাকা ছিল না। বাজারের মুখে একহাঁটু কাদা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। গোরুর গাড়িগুলো গাছের নিচে পড়ে আছে। গোরুগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা গোরুকে ওর বিষ দিতে ইচ্ছা হল। সে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করল। গাড়োয়ানরা সব বচসা করছে। সে গাছের নিচে থেকে বিষের পুঁটলিটা কলাপাতায় পেঁচিয়ে বড় গোরুটার সামনে ছুঁড়ে আঁধার থেকে সরে দাঁড়াল।

এমন দিন আরও সব গেছে কৈলাসের। সেদিনও সাঁজ নেমেছিল পারের বাজারে। সেও বর্ষাকাল। রাস্তাটা তখনও পাকা হয়নি। বাজারের মুখে একহাঁটু কাদা। সে মাথায় একটি মোষের চামড়া নিয়ে খেয়াঘাটের পাশে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। গোরুর গাড়িগুলো বাড়িমুখো হয়েছে। গাড়ির নিচে লণ্ঠন দুলছে। প্রচণ্ডবেগে গঙ্গার খোলা জল নিচে নামছে। কৈলাস মাথায় ছাল নিয়ে পৃথক হয়ে দাঁড়াল। ছালটার টাকা মিললে তাঁর পাঁচটা ভাগ হবে। বড় সামান্য বড় সামান্য, ওর অংশ। খেয়াতে উঠে খুব আপশোশ হচ্ছে কৈলাসের।

সেদিনই ঘটনাটা ঘটল।

সে রাতেই সে বেঁচে থাকার এলাদ খুঁজে পেল।

খেয়া থেকে নেমে সে হাঁটছিল। নদীর পাড় ধরে, বাবলার ঘন বনের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। সে তখন গন্ধ পাচ্ছে, কীসের যেন গন্ধ পাচ্ছে। দুর্গন্ধ। পচা গন্ধ। সে খুব খুশি হল। সে দেখল বর্ষার নদী ধরে আর একটা ছাগল অথবা গোরু স্রোতের সঙ্গে নিচে নামছে। স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। সে লোভ সামলাতে পারল না। আকাশের মরা আলো, নদীর ঘোলা জলের উত্তাপ ওকে টেনে নিল। সে জয় ওস্তাদ গুরু বলে লাফ দিয়ে জলে পড়ল। স্রোতের সঙ্গে সেও ভেসে চলেছে। বাবলার ঘন বনের আড়ালে মোষের চামড়াটা রেখে এসেছে কৈলাস। তারপর দুধারে গ্রাম, মাঠ কাশবন। দু—তীরে ঘন সবুজের জঙ্গল, নৌকায় ইতস্তত লণ্ঠন জ্বলছে। কৈলাস সব কাটিয়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল। স্রোতে মরা জন্তুটা ওর সঙ্গে যেন পাল্লা দিচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত কৈলাস অস্পষ্ট অন্ধকারে ডুব দিয়ে মরা জন্তুটার একটা পা ধরে ফেলল। সে এত ক্লান্ত, এত উন্মত্ত এবং উত্তেজিত যে ধরেই বলে উঠল—শালা কাঁহা যাওগে তুম! লোভ ওকে এমন মাতাল করে তুলেছে যে সে ওটাকে টানতে টানতে পাড়ে এনে তুলল অথচ দেখল না এত মেহনতে ওর হাতে কী ধরা পড়েছে!

জল থেকে টেনে তুলতেই কৈলাসের মাতাল ভাবটুকু থাকল না। সে ভয়ে শিউরে উঠল। ঘৃণায় মুখ কুঁচকে উঠল। ওর ওয়াক উঠতে চাইল। সে দেখল, টেনে তোলা জন্তুটা গোরু ছাগল অথবা ভেড়া নয়। একটা মানুষের শরীর ফুলে ফেঁপে ঢাক হয়েছে। সে আর স্থির থাকতে পারল না, সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল, ওস্তাদ গুরুর দোহাই। দোহাই হারুন রসিদের। দোহাই কাছাড় দরগার। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাস তাজা হল। সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মনে পড়ল ওর বাচ্চা বয়সের কথা। বাপ—পিতামহের কথা। বাপকে দেখেছে, পিতামহকে দেখেছে। এমন কত কঙ্কাল কুড়িয়ে এনেছে মানুষের। চুপি চুপি কলকাতায় যে—সব কঙ্কাল বিক্রি করেছে। বড় হয়ে সে শুনেছিল হিল্টন কোম্পানির কথা। জগুবাজারে সে কোম্পানির অফিস আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এতদিনে বেঁচে থাকার এলাদ সে পেয়েছে। গেরু আর উপোস করবে না। ওকে আর শকুন দেখে বেড়াতে হবে না। এবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে। ফের একটা শাদি ধরতে পারবে। ফের চটানে বুক ফুলিয়ে চলতে পারবে।

তারপর যখন সে মড়াটাকে বাবলার ঘন জঙ্গলে কাদার ভিতর পুঁতে দিচ্ছিল তখন ভাবল, নসিবের ঘরে বদলা নেই। ওকে ফের বাপ—পিতামহের ব্যবসাতেই নেমে যেতে হল।

সে প্রায় দেড় যুগ। হিসাব করলে যেন আরও বেশি হবে। সেই গেরু এখন সময়ের পথ হেঁটে এসে জোয়ান হয়েছে। সেই গেরু এখন ইংরেজ কুঠির পথ ধরেছে। হাতে লণ্ঠন। কাঁধে বল্লম। জোয়ান গেরু ছুটে ছুটে চলেছে। কৈলাস গেরুর নাগাল পাচ্ছে না। পথ থেকে নিচে নেমে ডহর পার হবার সময় কৈলাস ডাকল, গেরু হামার বাপরে পথ দেখে হাঁট। হারিকেনের আলো ঠিকসে পথে ফ্যাল।

গেরু থামল। হাতে হ্যারিকেন এবং মদের ভাঁড় নিয়ে সে বাপের জন্য অপেক্ষা করল।

শীতের ভিতরও কৈলাসের শরীরটা ভিজে উঠেছে যেন। সে থেমে গেছে যেন। গেরু কাছে এসে একটু দম নিয়ে দাঁড়াল।

গেরু বলল, তু আজ না এলে পারতি বাপ। তু চলতে লারছিস।

চলতে লারছি! কৈলাস ধমকে উঠল—কোন বলিছে চলতে লারছি!

হামি গেরু এ—কথা বলিছে বাপ। তু চলতে লারছিস। ফরাসডাঙায় পথে আসতে তু তিন দফে হাঁফ ছাড়লি।

তিন দফে হাঁফ ছেড়েছি ত বেশ করেছি। বলে, গেরুর হাতের হারিকেনটা জোর করেই টেনে নিল। তারপর এক ধমক, দ্রুত হেঁটে গেরুর মুখে হারিকেন উঁচিয়ে বলল, কোন বলিছে হাম হাঁটতে লারছি? তু দেখেলে! তু নিজের আঁখোসে দেখে লিলি ত! গেরু হামার বাপরে, শালা হামার পুতরে, হামি সব পারি। হামি লড়তে পারি, হামি বসতে পারি। হামি সব পারি।

ওরা পোড়ো বাড়িটা পার হয়ে কাঁঠাল গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। রাতের আঁধারে ঝিঁঝিরা তেমনি ডাকছে। তেমনি জোনাকি উড়ছে। জোনাকি জ্বলছে। রাতের আঁধারে তেমনি চাপা কান্নার আওয়াজ। ঘাসের ভিতর ছোট ছোট পোকা—মাকড়েরা তেমনি হামাগুড়ি খাচ্ছে।

মদের হাঁড়িটা কবরের পাশে রাখল গেরু। আজ সে ঝোপ—জঙ্গলের বীভৎসতাকে দেখল না, অথবা লক্ষ্য করল না। প্রতিদিনের মতো ওরা মদ খেল। এবং উঠে দাঁড়াল। কোদাল মেরে চাপ চাপ মাটি সরাচ্ছে গেরু। দু—হাতে কৈলাস মাটি সাফ করছে।

অনেকক্ষণ কোদাল মেরে যখন গেরু ক্লান্ত, যখন কপালের ঘাম মুছে বলল, তু দু—চারঠো কোপ দে ত বাপ, তখন কৈলাস কোদাল টেনে বলল, হয়রান হয়ে পড়লি জোয়ান! তু মরদ হামারে বলিছে হাম হাঁটতে লারি!

বাপ বেশ কায়দার সঙ্গে ছোট ছোট কোপ মারছে কবরে। অবসর বুঝে গেরু সরে গেছে কাঁঠাল গাছটার নিচে। অবসর বুঝে কিছুটা মদ টেনে নিল। সে ঝিমোচ্ছে। সে দেখছে—বাপ বেশ কায়দার সঙ্গে মাটি সরাচ্ছে। ওর নেশা পাচ্ছে দেখে সে যেন না বলে পারল না তুর ভালোর জন্যই হামি এ কথা বলিছে। বুড়া হলি। চটানে থাকলে তুর দেহের ভি ভালো, মনের ভি ভালো। হামার ত আঁধার রাতে ভর থাকার কথা লয়! তু তিন তিনটে কবচ পড়ে দেহে হামার বেঁধে দিলি—ভূত পেত, পির, পরি সাপখোপ, বাদী দুশমন কেউ হামার অনিষ্ট করতে লারছে। আঁধার রেতে হামার ডর থাকার কথা লয়। ভূত বলিছে হামি রাজারে!

কৈলাসের মনে তখন ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছে। কবরের নিচে থেকে কঙ্কাল টেনে তোলার সময় সে যেন বুঝতে পারছে তিনটি কবচই বেইমান, ইবলিশ। তবু সে সব ভুলে গিয়ে বলল, হে তু রাজার বেটা রাজা। একহাতে হারিকেন লিয়ে গর্তের নিচে বসল গেরু। মাটির ভিতর থেকে খুঁজে খুঁজে হাতের হাড় আঙুলের হাড়—হিসাব করে গোটা কঙ্কালটাই তুলল। তারপর সে উপরে উঠে ফের বসে গেল। গামছাটা সে বিছিয়ে দিল। হাড়গুলো বিছিয়ে দিল। ওস্তাদ কৈলাস এখন হাড়গুলো গামছার ওপর একটা গোটা মানুষের মতো করে সাজাচ্ছে। দুহাতের পাঁচটা পাঁচটা দশটা আঙুল সাজাল। গোড়ালি থেকে মাথা পর্যন্ত সাজিয়ে দেখল ঠিক আছে। গুণে গুণে সব হাড় গেরু তুলতে পেরেছে।

কৈলাস বলল, দাঁতগুলো কাঁহারে?

হামার হাতে আছে বাপ।

দে—ত, গুণে দেখি ঠিক আছে কিনা।

কৈলাস দাঁতগুলো গুণল। এক দুই করে বত্রিশটা দাঁত। দুর্গন্ধে কৈলাসের মুখটা কুঁচকে উঠেছে। মাঝে মাঝে থুথু ছিটাল। পোড়ো বাড়িটাকে ব্যঙ্গ করল। এবং গোটা কঙ্কালটা মাটির ওপর বিছিয়ে দিয়ে যখন দেখল কবরের নিচে কিছু পড়ে নেই, তখন কৈলাস ব্যস্ত হয়ে খুলিটাকে পরখ করল। চোয়ালের হাড়টা দেখল এবং আলগা দাঁতগুলো গুণে হিসাব করে বুঝল—সাবাস বেটা গেরু, খুঁজে খুঁজে মেয়েমানুষটার সব কটি দাঁত সংগ্রহ করেছে।

সামনে দুটো দাঁত কষ্টিপাথরের মতো কালো। পান—দোক্তার জন্য দাঁতগুলোতে কালো রঙ ধরেছে। গেরুর মা—র কথা মনে আসছে। পান—দোক্তা খেত বৌটা। মুকের একটা দিক সব সময়ের জন্য ফুলে থাকত। ঘাসের নিচে থেকে কিছু বালি নিয়ে কৈলাস সামনের একটা দাঁত ঘষল। বালিতে ঘষে পরিষ্কার করল। পান—দোক্তার পাথর পড়া দাঁতগুলো সাফ হল না, অথচ একটি দাঁত বালির ঘষা খেতে খেতে তামার রঙ ধরল। কৈলাস দাঁতটাকে হাতের সমস্ত জোর দিয়ে পরিষ্কার করল। দেখল তামার বাঁধানো একটা দাঁত। দাঁতটা দেখে ওর শরীর হাত পা সব কাঁপছে। খুঁজলে যেন সে আরও একটা তামার বাঁধানো দাঁত পাবে। সে ভয়ে দাঁতটা খুঁজল না। শুধু গেরুর মার বাঁধানো দাঁত দুটোর কথা ভাবতে গিয়ে কঙ্কালটাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হল। কঙ্কালটার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হল। সহসা সে প্রায় ডুকরে উঠেছিল—গেরুর মা তু ভাগ গিলিরে!

কৈলাস তবু গোপনে কাঁদছে। পাশের গেরু পর্যন্ত টের পায়নি—কৈলাস কাঁদছে। কৈলাস হাড়গুলোকে খুব ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করল। খুব ধীরে ধীরে বুকের পাঁজরগুলো চোখের সামনে এনে দেখল। তারপর কোনোরকমে কঙ্কালটা গামছায় বেঁধে পথ চলতে থাকল। গেরু খুব অবাক হয়ে বাপকে অনুসরণ করছে। বাপ যেন ঝোপ—জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অন্ধের মতো ছুটে চলছে। বাপের সঙ্গে সে ছুটে নিজেকে সামলাতে পারছে না।

কিছুদূর এসে কৈলাস মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পিছনে ঢিবি, নিচে জ্বলো, ঘাস ওবোৎল্যাংড়ায় জঙ্গল ধারে ধারে। ঘন জঙ্গল দুপাশে। জঙ্গলের ভিতর কৈলাসের শরীরটা পড়ে রয়েছে। পড়ে থেকে বিলাপ করছে—হামি গেলামরে, হামারে খেয়ে লিলরে।

গেরু আলো উপরে তুলেও বাপকে দেখতে পাচ্ছে না। দূরে শুধু চিৎকার শুনছে—গিলামরে, খেয়ে লিলরে। আলোতে ওর নিজের ছায়াটা নড়ছে। পোড়ো বাড়িটাতে কারা যেন কথা বলতে শুরু করেছে, কারা যেন সব দরজা জানালাগুলো খুলছে, বন্ধ করছে। ঘাসের ভিতর থেকে গন্ধ উঠছে। গেরু আলোটা নিয়ে আশেপাশের জঙ্গলে খুঁজতে থাকল বাপকে। ঢিবির নিচে নামল গেরু। বাপকে দেখতে পেয়ে বলল, উবুড় হয়ে পড়ে আছিস ক্যানে। কী হয়েছে তুর।

গেরুর উপস্থিতিটা কৈলাসের এ—সময় ভালো লাগল না। মনে হল বেইমানটা সব গোলমাল করে দেবে! এতদিনের গড়ে তোলা সমস্ত বিশ্বাসকে এক মুহূর্তে ভেঙে দেবে। সেজন্য কৈলাস উঠে দাঁড়াল। জামা—কাপড় ঝাড়ল এবং নিজেকে সামলে পায়ের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করতে চাইল। গেরুর হাত ধরে বললে, জলদি চটানে নিয়ে চল। হামি হাঁটতে লারছি। বুক হামার শুকিয়ে উঠছে!

বাপকে ধরে তোলার সময় গেরু দেখল, বাপের পা থেকে কালো রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ঝোপের ভিতর থেকে কিসে যেন বাপকে কামড়েছে।

সে চিৎকার করে উঠল—বাপ।

তু জলদি চল! বাপ বাপ বলে চিৎকার হাকরালস না।

তুকে বাপ মা মনসার বাহন ছোবল দিছে। তু বস পাটা জলদি বেঁইধে দি।

কৈলাস খেঁকিয়ে উঠল, চুপ কর তু শালা শুয়োরের ছা, লটকনের বাচ্চা। মা মনসার বাহন কামড় দিছে! বুললি আর অমনি হয়ে গেল! সাহস কিরে লটকনের ছা, কাণি হামারে ছোবল মারবে! হাতে লাগেশ্বর কবচ তুর মুখ দেখার লাগি। শেষে কৈলাস পাগলের মতো হাসল। এবং এ—সময় ওর মুখ দেখলে দুনিয়ার সব মানুষের দয়া হত। নসিবের ঘরে বদলা নেই, বদলা নেই—এ—ভাবটুকু শুধু মুখে। সে চলতে চলতে বলল, ও কিছু লয় ও কিছু লয়। হুঁ চট খেয়ে পাটা ছিঁড়ে গেল। তু আর বাপ, হামারে একটু ধরে চল।

চাটনে ফিরে কোনোরকমে দুটো চোখ টেনে বলল কৈলাস, বারান্দায় শুইয়ে দে বাপ! দোহাই তুর ওস্তাদের কাউকে ডেকে লিস না। বেশ আছি। আচ্ছাই তবিয়ত আছে। তু থোড়া পানি হামার শিয়রে রেখে যা বাপ। দোহাই তোর ওস্তাদের কাউকে ডেকে লিস না।

চালাঘরের বারান্দায় বাপকে শুইয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকল গেরু। ঘরটা অন্ধকার। সে পকেট থেকে দেশলাই তুলে লম্ফ জ্বালল। হাতের পুঁটলিটা নিচে ঠেলে দিল। মাচানের ওপর শনিয়া শুয়ে আছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু এ—শরীর নিয়ে বৌর কাছে যেতে সংকোচ হল। অথবা মনে সংশয়ের জন্ম হচ্ছে। সে বাইরে বের হয়ে হাত—পা ধুলো ভালো করে। চারপাশে আঁধার। অফিসঘরের বারান্দায় ও—পাশে কারা যেন নেমে যাচ্ছে। শুধু দুখিয়ার ঘরে লম্ফ জ্বলছে। অন্য চালাঘরগুলোতে কোনো লম্ফ জ্বলছে না। নেলির ঘর থেকে গঙ্গা—যমুনা চটানে বের হয়ে এল। ওরা শুয়োরের খাটাল পার হয়ে আঁধারে নেমে গেল।

ঘাটে দুটো চিতা জ্বলছে। কিছু মানুষ দুটো মানুষকে পোড়াচ্ছে। বাতাসের সঙ্গে পোড়া গন্ধ উঠে আসছে। বুক ভরে গন্ধটা নিতে খুব ভালো লাগল। কঙ্কালের গন্ধের চেয়ে ওর এ গন্ধটা ভালো লাগছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ভাবল গেরু, দুখিয়াকে ডেকে বাপের কালো রক্তের কথা বললে হয়। সে দু—কদম দুখিয়ার ঘরের দিকে পা বাড়াল। ডানদিকের বেড়াটা ঘেঁষে সে দুখিয়ার ঘরে ঢুকল। মদ খেয়ে ওরা দুজনে সন্ধ্যায় উন্মত্ত হয়েছিল, রাতে ঘরে আলো জ্বেলে সুখ সুখ খেলা খেলেছিল। তারপর কখন আলো না নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে ঘরে ঢুকে দেখল ওরা উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে। খাটের কাঁথাকাপড়ের ওপর ওরা দুজন মা—বসুন্ধরার মতোই শান্ত। হাঁড়ির মতো দুটো পেট মদে ঢাক। এইসব দেখে গেরুর যন্ত্রণা বাড়ছে। সে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। সে মুখ বাড়াল। সে উঁকি দিল। মংলির শরীরে মা—বসুন্ধরাকে দেখতে পাচ্ছে। সে যেন চিনতে পারছে এরা ভূমি। বীজ দুখিয়া। ভূমি মংলি। মংলির আবাদের ক্ষেত্রটি দুখিয়ার বীজে ভেসে আছে।

দুখিয়াকে ডাকতে পারল না গেরু। শরীরে ওর ভয়ানক উত্তেজনা। চোখ দুটোতে ভয়ানক জ্বালা। শরীরের যন্ত্রণা কমছে না। উঠোনের ওপর নেমে এসেও ওর শরীর ঠান্ডা হচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তাড়াতাড়ি মাচানে শুয়ে শনিয়াকে জাগাল।

তারপর আবার রাত কাটানোর পালা। চটানে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। চিতার আগুনে আকাশ আর লাল হচ্ছে না। বোধ হয় এতক্ষণে মানুষ দুটোর পোড়া শেষ হয়ে গেছে। শনিয়া, গেরু অনেকক্ষণ ধরে ফিসফিস করে কথা বলল। এবং এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অথচ ঘুম ভাঙতে দেরি হল না। মাচানের নিচে কীসের যেন শব্দ। কারা যেন মাচানের নিচে নাচছে। অথবা গোটা কঙ্কালটা প্রাণ পেয়েছে যেন। মাচানের নিচে কঙ্কালটা নাচছে। অথবা কঙ্কালটা হেঁটে বেড়াচ্ছে মাচানের নিচে। সে মাথা তুলে সব শুনল। সে ডাকল—বাপ! বাপ! কিন্তু বারান্দা থেকে কোনো জবাব এল না। সে ভয়ে ভয়ে ফের ডাকল বাপ! বাপ দ্যাখ কঙ্কালটা মাচানের নিচে নেচেকুঁদে লিচ্ছে। তবু বারান্দায় কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাপের কথা মনে হল। তাবিজের কথা মনে হল সঙ্গে সঙ্গে ভয়টা কেটে গেল। তখন লম্ফটা জ্বালল এবং সে আলোতে দেখতে পেল ঘাটের একটি অভুক্ত কুকুর কঙ্কালের রস চুষে খাচ্ছে।

শালে তু। গেরু লাফ দিয়ে কোণ থেকে সড়কিটা টেনে নিতেই কুকুটা ভয়ে ছুটে পালাল। গেরু কুকুরটাকে তাড়াবার জন্য উঠোন পর্যন্ত নামল এবং বারান্দায় বাপকে কিছু বলতে গিয়ে দেখল বাপের শরীরটা শক্ত হয়ে আছে।

কৈলাস ডোম মারা গেছে।

একদিন গেল, দুদিন গেল। একমাস, দু—মাস গেল। চটানে গোমানি নেই, কৈলাস নেই। তেমন নাচন—কোঁদন নেই, হৈ—হল্লা নেই। শীত কমে গেছে। শিমুল গাছে ফুল থেকে ফল ধরেছে। ফল কেটে এখন তুলা উড়ছে শ্মশানে, চটানে। হাওয়া উঠছে দুপুরের দিকে। ঝাড়ো ডোম ওর ঘরটার ওপর বেশি কাঁথা—কাপড় চাপাচ্ছে। দুখিয়া একটা মাটির ঘর তুলছে।

গেরু এখন ফরাসডাঙায় মাঝে মাঝে যায়। শনিয়া সেজেগুজে রাতে শুয়ে থাকে। সে—দিন ওরা সিনেমায় গিয়েছিল, শনিয়া প্রায়ই গুনগুন করে হিন্দি গান গায়। শনিয়া নেলিকে গানটা একদিন শুনিয়েছে। এতদিন শনিয়ার ওপর যে রাগ ছিল গান শোনানোর পর থেকে সে রাগ আর থাকল না। রাগটা কেমন করে যেন জল হয়ে গেল। এবং সেদিন থেকেই শনিয়ার সঙ্গে দু—চারটা সুখ—দুঃখের কথা বলে নেলি সুখ পাচ্ছে।

আর সেইদিনই নেলির একবার বমি করার প্রবৃত্তি হল। সেদিনই শরীরটা ভারী মনে হল। মনে হল মা—বসুন্ধরা কেমন মাতাল হয়েছেন। মনে হল রাতে কিছু খেলে আবার বমি হবে। কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। শুধু শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে। সমস্ত মুখে কেমন বিশ্রী থুতু উঠছে কেবল। সে একবার উঠে থুতু ফেলল, দু—বার ফেলল, তিনবার ফেলল—শেষে পারল না। মাচানে শুয়ে শুয়েই থুতু ছিটাতে থাকল। ঘরে আলো জ্বালল না নেলি। আঁধারের ভিতর চুপচাপ শুয়ে রইল। এবং এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার সময় যে চোখে—মুখে অন্ধকার দেখল। মনে হল পিসির কথা। ঝাড়োর বৌর কথা মনে হল। ওরা চটানে বাচ্চা দেবার আগে যে সব উপসর্গে কাতর হত নেলিও সেই রকম উপসর্গে কাতর হয়ে পড়ছে। নেলি তাড়াতাড়ি মাচানে শুয়ে পড়ল। মনে হল তেষ্টা পেয়েছে খুব। সে ডাকল—শনিয়া শনিয়ারে থোড়া পানি দে। থোড়া পানি দে শনিয়া।

তখন দুঃখবাবু উঠে গেল অফিসারের বারান্দায়। নেলি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দুঃখবাবুকে দেখল। সে হাসল। দুঃখবাবুর চোখে—মুখে এখনও লজ্জা। এখনও সংশয়, সংকোচ। দুঃখবাবুর চোখেমুখে সংশয় দেখলে নেলির খুব ভালো লাগে। ওর ইচ্ছা হল ফের সে দুঃখবাবুর পায়ের কাছে গিয়ে বসে। দুঃখবাবুকে ভালোবাসে। বাবুর সব কাজগুলো করে দেয়। দুঃখবাবুর শরীরটা ওর নিজের শরীরে এসে বাসা বেঁধেছে। এই সুখানুভূতিতে নেলি লজ্জায় এবং আনন্দে মুখ গুঁজে দিল। বাপ আবার ফিরে আসছে চটানে, বাপ আবার ওকে আশ্রয় দেবে। বাপ নাচবে—কুঁদবে। নেলি এই সব ভেবে ফের ডাকল, শনিয়া, শনিয়ারে থোড়া পানি দে। থোড়া পানি দে শনিয়া।

শনিয়া ঘরে এসে জল দিল নেলিকে। বলল, আভি তক শুয়ে থাকলি মাচানে। উঠবিনে? তবিয়ত বুঝি আচ্ছা না আছে?

নেলি শুয়ে থেকেই জবাব দিল, আচ্ছা না আছে।

কিছু খাবি—দাবি? রুটি করে লিচ্ছি।

নেলি বলল, দুটো আম দিয়ে অম্বল করে লিবি?

লিব। লেকিন তুর তবিয়ত আচ্ছা না আছে। খাটা খানেসে ভোগান্তি হোবে।

কিছু হোবে না। তু দে লিবি, হামি খেয়ে লিব। হামার কিচ্ছু হোবে না।

শনিয়া চলে যেতে চাইলে নেলির বলতে ইচ্ছা হল, তুকে একটা বাত বুলবে, লেকিন কাউকে বুলবি না। শনিয়া ততক্ষণে চলে গেছে। সুতরাং নেলির বলা হল না। নেলি পাশ ফিরে শুল।

নেলির সুঠাম শক্ত শরীরটা দু—একদিনের মধ্যেই কেমন ভেঙে যেতে লাগল। চটানে সকলেই ধরে ফেলেছে। শনিয়া চুপি চুপি বলেছে গেরুকে। হরীতকী এসে নেলির ঘরে বসে বলেছে—এ আচ্ছা কাজ হল না নেলি। তু ভি হামার মতো হলি। জ্বলে পুড়ে থাক হবি। যেন বলতে চাইল হরীতকী, তুকে নতুন বাবু থোড়াই কেয়ার করবে।

নেলি কোনো কথারই জবাব দিচ্ছিল না। সে চুপচাপ মাচানে পড়ে পাশের একটা মালসাতে থুতু ফেলছে। চোখ দুটো জ্বলছে। যেন বলতে চায়, ডাইনি মাগির আবার ভালো মন্দ। একটা বাচ্চা হবে তার আবার নতুন বাবু, পুরানা বাবু! তার আবার গেরু, টুনুয়া। গেরুর বিবি শনিয়া না হয়ে নেলি হতে পারত, চটানের যে—কোনো মেয়ে হতে পারত। এসব ভেবেও নেলি জবাব দিল না। এইসব ভেবে ভেবেই যেন চোখ দুটো ওর নিচে বসে যাচ্ছে। কেমন করুণ দেখাচ্ছে। গিরিশ কিছু বলছে না গেরু বলছে না কিছু। মংলি ঘরে ঘরে ঢিঢি দিয়ে বেড়াচ্ছে। গোমানি মরল—তার মেয়েটাও মরদ ধরল। এমন সব কথা বলে মংলি সুখ বাড়াচ্ছে, মনের ঝাল ঝাড়ছে নেলি মাচানে শুয়ে সব শুনেও কোনো জবাব দিত না। অথবা জবাব দেওয়ার ইচ্ছা থাকত না।

নেলির এ বমি—বমি ভাবটা কিন্তু বেশিদিন থাকল না। থুতু ফেলাটাও কখন কমে গেল। তখন বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ মাস। গরমে ঘর—বার হওয়া দায়। নেলি এমন দিনেই আবার ঘর—বার হতে থাকল। ফলন্ত শরীর নিয়ে নেলি ঝাড়ো ডোমের সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করল। ঝাড়োর কাছ থেকে ডালাকুলো নিয়ে সে চটান থেকে বের হয়ে যেত। দুপুর রোদে গাওয়াল করে বেড়াত। গেরস্ত বাড়ি ঢুকে বলত, মা মাসিরা আছেন লাকি! ডালাকুলো লেন।

গেরস্ত বৌরা বলত, তোর ডালা—কুলোর দাম বড় বেশি নেলি।

তা যে হবেই মা মাসি। হামার যে আর কেউ লেইগ মা মাসি। থাকলে কমে দিতে পারতাম। এ পয়সায় হামি খাব, কিছু সঞ্চয় করে লিব। হামার ফলন্ত শরীরটা আর কদিন একা থাকবে মা মাসি।

এ সব শুনে গেরস্ত বৌদের দয়া হত যেন। করুণা হত। এমন নাক চোখ মেয়েটার। এমন শরীর মেয়েটার। কেউ বলে নেই ওর! ওরা সেজন্য চাল দিত, ধান দিত বেশি। পয়সা দিত। নেলি সব মাথায় করে চটানে ফিরত, ঝাড়োর সঙ্গে হিসাব করতে বসত। ঝাড়োর পাওনা মিটিয়ে সে ঘরে ফিরত। ঘরে ফিরতে রাত হত কোনোদিন। দূর গাঁয়ে গাওয়াল করতে গেলেই এমন হত। পেটের বাচ্চাটার জন্য নেলি গঙ্গা—যমুনাকে নিয়ে গাওয়াল করতে করতে কতদিন কোথায় চলে গেছে! কতদিন সূর্য মাথার উপরে উঠে কখন হেলতে আরম্ভ করেছে, কখন বিকেল হয়েছে খেয়াল থাকত না নেলির, সে হাঁটত। হাঁটত। সে ঘরে ঘরে গাওয়াল করত ফলন্ত শরীরের জন্য মায়া হত। বাচ্চাটার জন্য মায়া হত। গঙ্গা—যমুনা পাশে পাশে থাকত। পাশে পাশে হাঁটত। চাল, ধান, পয়সা কত হল, দু—চার বাড়ি গাওয়াল করে নিতে পারলে, দু—চারটা গ্রাম ঘুরতে পারলে আর কত হতে পারে—সেই হিসাব শুধু মনে। বাপ ফের ওর ঘরে ফিরে আসছে, বাপ আবার ওকে শাসন করতে আসছে—এই ভাবনায় সে শুধু পথ চলত। মাঝে মাঝে গঙ্গা—যমুনাকে বলত, তুগো একটা ভাই হবে। হামার মতোই কিন্তুক ওয়াকে ভালোবেসে লিবি, হামি তো একা একা তুদের জন্য কুথা চলে যাব, তখন তুরা উয়াকে পাহারা দিবি।

প্রতিদিনের মতো আজও চটানে সূর্য উঠছে। প্রতিদিনের মতো আজও চটান থেকে নামছে নেলি। সঙ্গে গঙ্গা—যমুনা। নেলির মাথায় ডালা, কুলো, ঝুড়ি। দিন রাত বসে ঝাড়ো আর ওর বৌ—ছেলেরা এসব তৈরি করেছে। নেলি ওদের থেকে কিনে নিচ্ছে। দূর গাঁয়ে ডালা—কুলো সব বিক্রি করছে। সে এখন নদী পার হবে। গ্রীষ্মের নদী শুকনো। মরা নদী। কোথাও কোথাও জল জমে আছে। কোথাও কোথাও বালি চিকচিক করছে। জল আয়নার মতো। নেলি নদীর জল ভেঙে পার হওয়ার আগে দু—আঁজলা জল খেল। বলল, মায়ী গঙ্গা তুর দুধ খেয়ে লিলাম।

নেলি নদী পার হয়ে তিলতলা, গোয়ালজান, রসরাজপুর, হলদিচক, পদ্মনাভপুর হয়ে কান্দি, বাসন্তী বলরামপুরে ঘুরে যখন কোনো বাড়ির ভিতর ঢুকে দুটো কথা বলে বিশ্রাম করত, তখন কেউ প্রশ্ন করত—মুখটা ত শুকিয়ে গেছে রে। কিছু খেয়ে বুঝি বের হসনি।

কি যে বুলেন মা! না খেয়ে ফলন্ত শরীর নিয়ে বের হতে আছে। মায়ীর দুধ খেয়ে লিছি, সারা দিনমানে ভুখ আর না লাগবে মা মাসি। তবু যদি ওরা পীড়াপীড়ি করত নেলি তখন দুটো খেয়ে বলত মা ঠাকরুণ, বড় দয়া আপনাগ। হামার গঙ্গা—যমুনাকে দুটো দিলাম—কিছু মনে করে লিবেন না।

সকলে কুকুর দুটোকে তখন দেখত। কুকুর দুটোকে দেখে ওরা ভয় পেত। কুকুর দুটোর দিকে চেয়ে ওরা বলত, এ দুটোকে সামলে চলিস বাপু। কুকুর পুষিসনি তো যম পুষেছিস। কখন কার সর্বনাশ করবে—তখন বুঝবি ঠেলা।

মা—মাসিরা অমন কথা বুলবেন না। ওরা হামার বেটা আছে। ওরা হামার সাত জনমের মেহমান। নেলি কুকুর দুটোকে ধরে চুকচুক করত। ওর আদর করার ঢং দেখে গেরস্ত বৌরা হাসত।

সেদিনও নদী পার হয়ে চটানে ফিরতে রাত হয়ে গেল। অন্ধকার পথ—কিছু দেখা যায় না। কুকুর দুটো ওকে পথ দেখিয়ে চলেছে। নেলি হাঁটছে পা চালিয়ে। মাথায় চালধানের বোঝা। শরীর ভারী বলে পা চালাতে পারছে না। বালিয়াড়ি অতিক্রম করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। নদীর পারে ওঠার সময় সে খুব হাঁপিয়ে পড়ল। এখানে একটু বসল নেলি। সারাটা দিন স্যাঁকা রুটির মতো গরমে সে পুড়েছে। নদীর ঠান্ডা হাওয়ায় বসে থাকতে ওর খুব ভালো লাগল। এখানে বসে চটানের আলো দেখতে পেল সে। দুঃখবাবু হয়তো এতক্ষণে ঘরে ফিরে গেছেন। শনিয়া, গেরু হয়তো মাচানে ঘুমিয়ে পড়েছে। শ্মশানে আগুন জ্বলছে না। এখানে বসে বাবলার ঘন বনে কুকুর দুটোর আওয়াজ পেল। ওরা বুঝি শেয়াল তাড়াচ্ছে ভেতরে। নেলি কী ভেবে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। যেন শরীরটাকে ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিয়ে একটু ঠান্ডা হতে দিল। শুয়ে শুয়ে নেলি এক, দুই করে তারা গুণল। এক, দুই করে ঘণ্টা পেটার আওয়াজ শুনল। এক, দুই করে এতদিনের সঞ্চয়ের কড়ি হিসাব করল।—বাপ, বাপরে। পেটের নিচে হাত বুলিয়ে যেন বলতে চাইল, তু আচ্ছা আছে ত বাপ! নেলি আরও নিচে হাত নামিয়ে বাচ্চাটাকে আদর করবার সময় লক্ষ্য করল, কে যেন সন্তর্পণে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

নেলি ভয় পাওয়ার মতন করে বলল, কৌন? কৌন ওখানটায়? সে ডেকে উঠল, গঙ্গা! যমুনা!

দুঃখবাবু বললেন, আমি নেলি, তোর দুঃখবাবু!

বাবু! হামার খুব ভয়ে ধরেছিল বাবু।

খুব গরম পড়েছে। শরীরে ঠান্ডা হাওয়া লাগাচ্ছিস।

আজ রাতে তু বাবু ঘাটে থাকবি বুঝি?

ঘাটোয়ারিবাবুর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বলে আজ রাতে থেকে গেলাম।

তবে বস না এখানে। বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। তবুও শরীরটা ঠান্ডা হবে। হামার ভি শরীর ঠান্ডা হবে।

আকাশে তেমনি নক্ষত্র জ্বলছে। দুটো পাশাপাশি নক্ষত্রের মতো ওরা দুজনে পাশাপাশি বসে থাকল। দুঃখবাবু বললেন, তোর শরীর ভালো যাচ্ছে ত?

নেলি ভাবল, এতদিনে বাবু সময় পেল জানার শরীর ভালো যাচ্ছে কী মন্দ যাচ্ছে। নেলি হাসল। সে এতদিন দেখে এসেছে—বাবু রোজ ঘাটে এসেছেন, রোজ ঘাটোয়ারিবাবুর সাথে বসে গল্প করছেন। অথচ চটানে নেমে একবারও বলেননি নেলি ঘরে আছিস নাকি? তোর শরীর শুনছি ভালো যাচ্ছে না। বাবু রোজ আসতেন ভয়ে ভয়ে, রোজ বের হয়ে যেতেন ভয়ে ভয়ে, অথচ একদিনও ডেকে বললেন না, আমি এসেছি। অথবা বললেন না, সব জানি। এই সব দেখে অনেকদিন নেলির বলতে ইচ্ছে হয়েছে, বাবু হামি কাউকে বুলবে না তু হামার বাচ্চার বাপ আছিস। বুলবে না তু একরাতের মরদ হয়েছিলি হামার।

দুঃখবাবু নেলির খুব ঘনিষ্ঠ হলেন। প্রকৃতই দুঃখবাবু এঘটনায় খুব অনুতপ্ত হয়েছেন। চটানে যত দেখেছেন নেলিকে, তত বেশি তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন। তত তিনি ভেবেছেন বাপ—মা মরা মেয়েটার প্রতি তিনি এমন লোভী না হলেই পারতেন। যত তিনি এই সব ঘটনা নিয়ে ভেবেছেন, তত তিনি মেয়েটার ভালো—মন্দের জন্য নিজেকে দায়ী করেছেন। দায়ী করতে গিয়ে এক সময় দেখলেন ভালোও বেসে ফেলেছেন। দুঃখবাবু বললেন, আমার খুব ইচ্ছা তোকে কিছু একটা করেদি। কিন্তু কিছুই পেরে উঠছি না রে। কথাটা চটানে কতদিন বলব ভাবলাম, কিন্তু হয়ে উঠল না। তোদের অন্য মরদেরা যদি কিছু ভাবে। এই যখন

মাচানে পড়ে থাকতিস, তখনও বারবার ইচ্ছে হয়েছে তোর কাছে যেতে, একটু বসতে, একটু ভালোবাসতে—কিন্তু পারিনি।

এই সব কথা শুনে নেলি খুব খুশি হল। মা—বসুন্ধরা এখনও তবে ওর জন্যে একটি মরদ রেখেছে যে নেলিকে ভালোবাসে, যে নেলিকে পিয়ার করে। এই সব কথা শুনে নেলির পুরনো ভালোবাসাটা ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ইচ্ছাটাও। নেলি দুঃখবাবুর মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলল, বাবু তু হামারে পিয়ার করিস? এ বাত সাচ বাত বাবু?

সাচ বাত নেলি। তোকে আমি পিয়ার করি। তোকে আমি ভালোবাসি। আঁধার রাতে নতুনবাবু ভালোবাসার জন্য মাতাল হয়ে উঠলেন।

আমি তুকে ভালোবাসি বাবু।

নেলি!

হা বাবু।

তোকে আমি কিছু দিতে পারছি না। ঘরে বৌ আছে, ছেলেপুলে আছে। ওদের পুষিয়ে আর কিছু বাঁচে না। তোকে কিছু দিতে পারি না।

সেজন্য কিছু ভাবিস না বাবু, হামি হামার বাচ্চার জন্য ঠিক সঞ্চয় করে লিচ্ছি।

তারপর ওরা দু—জন বসে আরও অনেক কথা বলল। পুরানো ইচ্ছাটা দুজনকেই মাঝে মাঝে বিব্রত করে মেরেছে। দুজনই পরস্পর ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে। দুজনে দুজনকে সুখী করতে চেয়েছিল—কিন্তু দুজনেই পারেনি! ওরা যেন শপথ করেছে মনে মনে সুখ—দুঃখের দুনিয়ায় ছল—চাতুরী থাকতে নেই।

ওরা দুজনেই শেষে উঠে দাঁড়াল। নেলি আগে আগে চটানে উঠে গেল। দুঃখবাবু একটু ঘুরে চটানে উঠলেন। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। জানালাটা খুলে দিলেন। জানালায় দাঁড়িয়ে আঁধারেও নেলির মুখটা দেখতে পেলেন। যেন আঁধারের গর্ভে নেলি ছুটছে। উদ্দাম, উন্মত্ত হয়ে ছুটেছে। অথবা ঋতুমতী ঘোড়ার মতো ছুটেছে। নেলি দুঃখবাবুকে দেখে যেন থামল। যেন বলল, পথ ছেড়ে দে। হামি ছুটবে।

দুঃখবাবু খুব শক্ত হাতে যেন ওকে ধরে রেখেছেন। যেন বলছেন এভাবে ছুটে তুই মরে যাবি। তোকে আমি মরতে দেব না। তোকে বাঁচতে হবে।

সে যেন বললে—কার জন্য বাঁচব বাবু?

আমার জন্য। দুঃখবাবু জানালায় দাঁড়িয়ে আঁধারের গর্ভে এ সব দেখে চলেছেন।

তখন যেন দুঃখবাবু দেখল নেলি ওর পায়ের নিচে পড়ে কাঁদছে। যেন বলছে, বাবু এ শরীরের বড় যন্ত্রণা। এ শরীরের দুঃখ কাউকে দিতে পারছি না বাবু। তু—যদি এ যন্ত্রণা দুহাত পেতে নিস!

জানালায় দাঁড়িয়ে দুঃখবাবুর মনে হল তিনি প্রকৃতই নেলিকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছেন। মনে হল তাঁর স্ত্রীর প্রতি যে গভীর ভালোবাসা, নেলির প্রতিও সেই গভীর ভালোবাসা। তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে আবেগে গলে গলে পড়ছেন। তিনি ভাবছেন—বাপ—মা—মরা এই মেয়েটার সুখ—দুঃখকে অস্বীকার করলে ভগবানের পৃথিবীতে বেইমানি করা হবে। রাতের আঁধারে তিনি ভাবলেন, কালই বলবে নেলিকে—বাচ্চাটার বাপ হতে সে রাজি আছে। বলবে, এজন্যে আমার নসিবে যা আছে তাই থাকল নেলি, তবু তোর নসিবকে নষ্ট হতে দেব না। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দুঃখবাবু মনের অনুশোচনায় বড় কাতর হয়ে পড়লেন।

পরদিন ভোরে নেলি যথারীতি এল। দুঃখবাবুর ঘরদোর অনেকদিন পর পরিষ্কার করল। দুঃখবাবু কাঠগোলায় কাঠ মেপে তখন ঘরে ফিরছিলেন। নেলিকে দেখে বললেন, তুই আমার ঘরে বোস। একটা কথা আছে।

দুঃখবাবু ঘাটোয়ারিবাবুর ঘরে ঢুকে বললেন, ইমতাজ আলী ষাট মণ কাঠ দিয়ে গেল। টাকাটা কী আজই মিটিয়ে দেবেন, না ওদের কাল আসতে বলব?

ঘাটোয়ারিবাবু চাদর ঠেলে উঠে বসলে ফের দুঃখবাবু প্রশ্ন করলেন, শরীরটা আজ কেমন আছে আপনার?

ভালো আছি, বেশ আছি, কাল আদার কুঁচি, গরম জল খাওয়ায় বেশ কাজ দিয়েছে। একটু হেসে বললেন, ওদের বলে দিন টাকাটা কালই দেব। আপনি আজ এক ফাঁকে অফিস থেকে টাকাটা নিয়ে আসবেন। আপনার একটু অসুবিধে হবে বুঝতে পারছি।

কী আর অসুবিধে হবে! আসবার সময় বাড়ি হয়ে আসতে পারব। ওদের একটু বাজার করে দিয়ে আসতে পারব। এই বলে দুঃখবাবু ঘরে গিয়ে দেখলেন নেলি তখনও কোনায় চুপচাপ বসে আছে। বাবুকে ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, কী বুলবি বাবু?

বোস বলছি। দুঃখবাবু বলতে ইতস্তত করছেন। আঁধার রাতের পৃথিবীটা যেন এ পৃথিবী নয়। যেন এটা অন্য পৃথিবী। এই নিদারুণ পৃথিবীতে যেন আবেগধর্মিতার কোনো স্থান নেই। এই নিদারুণ পৃথিবীতে সমাজ আছে, সংসার আছে। বাপ হব বললেই হওয়া যায় না। ভালোবাসব বললেই ভালোবাসা যায় না। বরং তিনি যেন এখন সংসারের চোখে দেখছেন নেলিকে। নেলি হয়তো সকলকে একদিন বলে বেড়াবে এটা দুঃখবাবুর বেটা আছে। অথবা এতদিনে বলে দিয়েছে। তিনি নেলিকে আরও কাছে এসে বসতে বললেন। তারপর নেলির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, লোককে কিছু বলেছিস?

কি বুলব বাবু?

লোকে তোকে বলে না বাচ্চাটা পেটে কী করে এল?

বুলে!

তুই কী বলিস?

বুলি বাচ্চাটা ভগমান দিল। ও হামার ভগমান আছে।

দুঃখবাবু এবার কাঁদো—কাঁদো হয়ে বললেন, আমার কথা বলিস—নি তো?

পাগল। তা হামি বুলি! কভি বুলবে না। বাবু হাম তেরে সাথ বেইমানি না করবে। লেকিন বাবু ওরা ত মরদ আছে। ওরা কী জানে না। ওরা কী টের পায় না বলছিস? লেকিন হামি কিছু বুলবে না বাবু। হামি বেইমানি করবে না। তু হামার ভগমান আছে।

দুঃখবাবু এবার বললেন, তাহলে তুই যা। এই কথা থাকল।

তখন গেরু নিজের ঘরে বসে হল্লা করচে। কৈলাস মরে যাওয়ার পর থেকেই ওর ঘরে ফের অভাব ঢুকল। অভাবের জন্য সে কৈলাসকে ফরাসডাঙায় টেনে নিয়ে গেছিল। সেখান পুঁতে কঙ্কালটা সংগ্রহ করেছিল এবং অল্প দামে বিক্রি করেছিল হিল্টন কোম্পানির বড়বাবুর কাছে।

বড়বাবু ওকে শুধিয়েছিলেন, তোর নাম কী রে?

গেরু ডোম।

বাপের নাম কী?

কৈলাস ডোম।

হ্যাঁরে তুই কৈলাসের ছা। কৈলাস মরদ ছিল বটে।

জী বাবু।

কটা কঙ্কাল এনেছিস?

দুটো।

একটা পুরুষমানুষের বাবু। একটা মেয়েমানুষের। একটা বাপের, অন্যটা ফরাসডাঙায় পোঁতা।

বড়বাবু বিদ্রূপ করে বললেন, বল মায়ের। বাপেরটা দিয়েছিস, মায়েরটা দিতে ক্ষতি কি!

গেরু দাওয়ায় বসে হল্লা করছে। বলছিল, আসুক টিকায়ালা মাগিরা। ওয়াদের গঙ্গার পানিতে চুবিয়ে না লিচ্ছিতো হামার নাম গেরু লয়। দ্যাশে আর মড়ক লাইক। নেলি দেখল কৈলাস মরতে না মরতে গেরু

বাপের মতো হয়ে উঠল। বাপের মতো টেনে টেনে কথা বলছে। বাপের মতো আপশোশ করতে শিখছে। শনিয়া পাশে বসে গেরুর গালমন্দ শুনছে। ঝাড়োর ঘরে বচসা হচ্ছে তখন। লখি, টুনুয়া, চাকু নিয়ে মারামারি করছে। লখির হাত থেকে এখন ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। ঝাড়োর বৌ এবং ঝাড়ো মিলে দুজনকে দুঘরে আটকে রাখল। নতুবা যেন তক্ষুনি চটানে একটা খুনোখুনি হত।

নেলি ভাত রাঁধছিল। ওদের হৈ—হল্লায়, নাচন—কোঁদনে সে সেখান থেকে নড়ল না। লখি, টুনুয়া তো চোর। ছিঃ চুরি করে পয়সা কামাচ্ছিস! মুখে তুদের পোকা পড়ুক। উনুনে পোড়া কাঠ গুঁজে দেবার সময় সে শুনল, গেরু বলছে, শালারা ঘড়ি চুরি করে লিছে। ঘড়ি চুরি করে আভি খুনোখুনি করছে, ভাগের পয়সা টুনুয়ার কম হল। মর শালারা খুনোখুনি করে।

শনিয়া বলল, ঘরে বসে ওদের গাল দিলি তুর চলবেক?

ক্যানে চলবেক না!

দু'টো দানা মুখে দিবি না!

কি করি বুল। নেলিকে যেন শুনিয়ে শুনিয়ে কথাগুলো বলল গেরু। গোমানি চাচার নোকরিটা ভি হামার জুটল না। ডাকদারবাবুকে ঘুষ দিয়ে নোকরিটা দুখিয়া নিল। সেই কবে ফরাসডাঙায়—তখন ফাল্গুন মাস,—একটা যাও ভি মিলল, তার দাম বড়বাবু ঠিক দিল না। বুলছে—এখন কী আর দাম আছে কঙ্কালের। কত আসছে, আমরা কিনতেই পারছি না ঠিক দাম দিয়ে। কঙ্কালের দাম কমছে তো কমছেই।

গেরুর রাগ এখন যেন সব শনিয়ার উপর—শনিয়া তু দানা দানা করবি না। তু মরবি, হাম ভি মরে। গেরু দুটো হাত নাচিয়ে শনিয়াকে যেন এক্ষুনি গলা টিপে ধরবে এমন ভাব করল।

অভাব—অনটনে গেরু মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। নেলি ঘরে বসে সব ধরতে পারল। নেলি ঘর থেকেই বলল, গেরু তু আয়। তুর বহু হামার ঘরে চারটো খাবে। তোরা আজ আমার মেহমান থাকলি।

কাটোয়া থেকে সেই লোকটা এসেছে। মংলির ঘরে বসে দর—দস্তুর করছে ছেঁড়া তোশক—বালিশের। ঘরে বসে ওরা যেন কী সব শলা—পরামর্শ করল। দুখিয়া নেই। পুলিশ এসে ডেকে নিয়ে গেছে। হরীতকীর ঘরে ওর মেয়েটা হাত—পা নেড়ে খেলছে। নেলি ভাত রান্না করতে করতে একবার পিসির ঘরে উঠে গেল। চঞ্চলাকে আদর করল। পিসি ঘরে নেই—নদীতে নাইতে গেছে। নেলি ভাবল, পিসিকেও আজ ওর ঘরে দুটো খেতে বলবে।

বিকেলের দিকে গুমট ভাব। আকাশের নীল রঙটা ক্রমশ কালো হচ্ছে। গরমে চটানের মেয়ে—মরদেরা হাঁসফাঁস করছে। নেলির শরীরটা ক্রমশ মোটা হয়ে উঠেছিল বলে সে দুটো পা বিছিয়ে চালা ঘরটার মেঝেতে বসেছিল। আকাশ দেখছিল মাঝে মাঝে। হয় বৃষ্টি হবে, নয় ঝড়। চালা ঘরটার ওপরে তোশক—কাঁথা নেই বললেই হয়। ঝড় হলে যা আছে সব উড়ে যাবে, আর জল হলে ঘরে থাকা দায় হবে। বাইরে জল হওয়ার আগে ঘরে জল পড়বে। নেলি এই সব ভেবে ভেবে খুব মুষড়ে পড়ছিল। একবার গেরুকে ডাকলে হয়। বললে হয়, হামার চালে দুচারটা ছেঁড়া তোশক—কাঁথা ফেলে দে। দড়ি দিয়ে বেঁধে দে। লয়তো এ ঘরে থাকা হামার বড় দায় হবে।

কাটোয়া থেকে যে লোকটা এসেছিল, ঝড়—জলের আভাস পেয়ে চটানে থাকতে চাইল সে। লোকটা এখন চটানটা ঘুরে ফিরে দেখছে। দুখিয়া এলে বারান্দায় বসবে সে। দুজনে মিলে এক ছিলিম গাঁজা খাবে। চটান দেখার সময় সে আকাশও দেখল। খুব জল ঝড় হবে। আকাশ দেখার সময় সে এ কথা বলল।

গেরু নেলির চালে বসে বলল, খুব জল ঝড়ে হোয়ে লিবে। দে দেখি আর কী আছে। ঘরের সব কাঁথা—বালিশ দিয়ে লে। সব বিছিয়ে দি। রশি দে, পুরানা যা আছে সব দে, বেঁইধে দি।

নেলি শীতের সব কাঁথা—কাপড় টেনে বের করল ঘর থেকে। বাপের কাঁথা—কাপড়, ওর নিজের কাঁথা —কাপড়—সব কাঁথা—কাপড় বের করল। শীত আসতে আসতে আবার সব ঘাট থেকে জোগাড় করে

নিতে পারবে। শনিয়া এবং নেলি দুজনে মিলে তোশক—কাঁথা সব উপরে তুলে দিল। গেরু চালার ওপর বসে রশি দিয়ে বাতার সঙ্গে সব কাঁথা—কাপড় বেঁধে দিল।

গেরু চাল থেকে নামার আগেই ঝড় উঠেছে। উত্তর—পশ্চিম কোণের মেঘটা সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। গঙ্গার বালিয়াড়ি থেকে অজস্র বালির ঝড় উপরে উঠে আসছে। নেলি এই ঝড়ের ভেতরেই কয়েকটা পোড়া কাঠ ঘরে নিয়ে তুলল। শুয়োরের বাচ্চা দুটো এখন বড় হয়েছে। ওদের ডেকে সাড়া পেল না সে। কবুতরগুলো ঝড়ের ভিতর কোথায় হারিয়ে গেছে যেন। সে গঙ্গা—যমুনাকে ডাকল—কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামছে। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটায় চটানের কঠিন মাটি ভিজতে থাকে। তারপর এক দুই করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টির ধারা নেমেছে। বৃষ্টির জলে মা—বসুন্ধরা ঠান্ডা হচ্ছে।

শরীরের গুমোট ভাবটা কাটাবার জন্য নেলি উঠোনের বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজল। মা—বসুন্ধরার মতো বৃষ্টির জলে সেও ঠান্ডা হচ্ছে। নেলি দেখল, বৃষ্টির ভিতর দু—একটা কাক উড়ে যাচ্ছে। দুটো শালিক বৃষ্টির জলে স্নান করছে। বিচিত্র শব্দ উঠছে আশেপাশে। ব্যাঙ ডাকছে। কচুর ঝোপে বৃষ্টি পড়ার টুপটাপ শব্দ। এই সব দেখে নেলিও ব্যাঙের মতো বৃষ্টির জলে লাফাল, নাচল। আনন্দে ছুটে ছুটে বেড়াল। পোড়া মাটিতে প্রথম বৃষ্টি পড়ার গন্ধ নেলিকে সব রাগ অভিমান ভুলিয়ে দিল। সে চিৎকার করে উঠোন থেকে বলছে, শনিয়া গতরে পানি ঢেলে লে। পানিতে ভিজে পোড়া শরীর ঠান্ডা করে লে!

মংলি নিজের দাওয়ায় বসে বলল, মাগির ঢং দেখ।

দুখিয়া এখনও ফেরেনি। কাটোয়ার লোকটা ঘরে বসে তখন মংলিকে ডাকছে। ভিতরে যেতে বলছে। মংলি যেন নেলির জন্যেই ঘরের ভিতর গিয়ে বসতে পারছে না। উঠোনে দাঁড়িয়ে জলে ভিজছে আর মংলির ইতর ইচ্ছার সাক্ষী থাকার চেষ্টা করছে।—ওলো মাগি তু মরবি—তু মরবি। তু ফুলে ফেঁপে মরবি। মংলি দাওয়ায় বসে যেন শাপ—শাপান্তর করল নেলিকে।

হরীতকী ঘর থেকে ডাকছে, নেলি তু আচ্ছা কাজ করে লিচ্ছিস না। দিনকাল বহুত খারাপ যাচ্ছে। জলে ভিজে তবিয়ত খারাপ হবে। ঘরে যা, ঘরে যা।

নেলির তখন মনে পড়ল বাপের কথা। ওর ভগবানের কথা—ভগবান যে ওর পেটে। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল। কাপড় ছাড়ল। শুয়োরের বাচ্চা দুটো জলে ভিজে ঘরে ঢুকছে। কবুতরের বাচ্চাগুলো টঙ—এর ভিতর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বৃষ্টি তেমনি জোর হচ্ছে। বেলা থাকতে চটানে রাত নেমে গেল। উঠোনের জল নালা—নর্দমায় নামছে। ঘাটোয়ারিবাবুর জানালা বন্ধ। দুঃখবাবু চটানে নেই। নেলি কুপিটা ধরাল। কুপির আলো দেখে শুয়োরের বাচ্চা দুটো ওর পাশে এসে বসল। নেলি আদর করল ওদের। গঙ্গা—যমুনা পাশে না থাকায় যে নিঃসঙ্গতা বোধ ছিল, ওরা পাশে এসে বসায় সে অভাব বোধটুকু কেটে গেল নেলির। বাইরে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে—টিপটাপ—টুপটাপ।

ভোর রাতের দিকেই আজকাল যা একটু ঘুম হয় ঘাটোয়ারিবাবুর। সারা রাত তিনি গরমে ছটফট করেন। শেষরাতের দিকে ঠান্ডা পড়লে শতরঞ্চটা পেতে শুয়ে পড়েন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা চলে আসে তখন। তারপর ভোরে ঘুমটা ভেঙে গেলে তুড়ি দেন এবং হাই তোলেন। বলেন পরম ব্রহ্ম নারায়ণ। তোমারই ইচ্ছা ঠাকুর। এই সব বলে শরীরের সব জড়তা ভেঙে উঠে পড়েন।

কাউন্টারে একটা মুখ ভেসে উঠল। মুখটা উঁকি দিয়ে বলছে, একটু এদিকে আসবেন?

ঘাটোয়ারিবাবু শতরঞ্চতে বসে দুটো স্তোত্র পাঠ করলেন। কাউন্টারের কথা তিনি ইচ্ছা করেই শুনলেন না। এখন তিনি স্তোত্র পাঠ করবেন। হাতমুখ ধোবেন। গঙ্গায় স্নান করবেন। এখন অনেক কাজ। তিনি জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকলেন।

কাউন্টার থেকে আবার গলাটা ভেসে এল।

তিনি যথারীতি দাঁড়ালেন—যথারীতি দড়ি থেকে গামছা টেনে দরজা খোলার সময় বললেন—একটু বসতে হবে। স্নানটা সেরে আসি। মড়া নিয়ে যখন তখন এলেই ত চলবে না! ঘাটে গিয়ে বসুন। হনহন করে তিনি শিবমন্দিরের পথ ধরে গঙ্গায় নেমে গেলেন।

কাউন্টারে লোকটা পায়চারি করতে থাকল। রাগে—দুঃখে তার ইচ্ছা হল ঘাটোয়ারিবাবুর গলা টিপে ধরতে। মৃত্যুর জন্য মানুষটার এতটুকু দুঃখ নেই। এতটুকু সহানুভূতি নেই। চামার যেন। লোকটা মৃত্যুর খবর শুনে একবার চমকাল না। একবার আহা পর্যন্ত করল না। মৃত্যুর জন্য কোনো কষ্ট নেই, মৃত্যুর জন্য যেন লোকটা হাঁ করে বসে থাকে। যেন এই মৃত্যুই স্বাভাবিক, বেঁচে থাকা অস্বাভাবিক। বেঁচে থাকার কোনো দাম নেই, শুধু দাম আছে জন্ম এবং মৃত্যুর। ভিতরের এই এত কাণ্ড সব যেন ওর কাছে জন্ম—মৃত্যুর বিকার। ওর মুখটা দেখে লোকটা পায়চারি করতে করতে এই সব ভাবল।

ঘাটোয়ারিবাবু নদীতে নামার সময় দেখলেন দশ—বারো বছরের একটি হৃষ্টপুষ্ট ছেলেকে দুজন লোক কাঁধে করে ঘাটে নামাচ্ছে। বাপ পিছনে। তিনি বুক চাপড়ে কাঁদছেন। কাউন্টারে তবে এই মড়ার লোকটাই ওকে এতক্ষণ জ্বালাচ্ছিল। ঘাটোয়ারিবাবু একবার দেখে আর দেখলেন না। ঘাটের অন্য লোকগুলো স্নান সেরে দূরে দাঁড়াল। তারা বলল—আহা কী সর্বনাশ! এই ধরনের সব শোক প্রকাশ করল। ঘাটবাবু দাঁড়ালেন না। তিনি নেমে যাচ্ছেন। তিনি এই ধরনের কোনো শোকই প্রকাশ করলেন না। তিনি শুধু বললেন, হরিবোল। হরিবোল। যারা শোক প্রকাশ করছিল তারা উপরে উঠেই বচসা আরম্ভ করে দিল। কে ছুঁয়ে কাকে অস্পৃশ্য করল সেই নিয়ে বচসা।

ঘাটোয়ারিবাবু ডুব দেবার আগে কানে আঙুল দিলেন। গঙ্গার জলে শান্তি আছে কোথাও। সহস্র ডুব দিয়ে তিনি যেন তাই প্রত্যক্ষ করতে চাইছেন।

স্নান সেরে উঠে আসার সময় ঘাটবাবু দেখলেন লাঠি নিয়ে হাঁটছে দুখিয়া। মংলি মনে মনে হিসাব কষছে—কত দাম হবে, কত বিক্রি হবে। মংলির চোখ দুটো, দুখিয়ার লাঠি এবং চটানের মেয়ে—মরদের লোভী ইচ্ছাগুলো ঘাটোয়ারিবাবুর মনে বিরক্তির জন্ম দিচ্ছে।...দু দণ্ড সবুর কর। একটা ছোট মানুষ তোদের এই পৃথিবী থেকে চলে গেছে, পৃথিবীর হের—ফেরটাই জানতে পারেনি। সুখ—দুঃখের অর্থটাই ধরতে পারেনি—তার জন্য তোদের একটু কষ্ট হওয়া উচিত। একটু দূরে সরে দাঁড়া। ওভাবে ঝুঁকে দাঁড়াস না মড়ার ওপর। তোদের নজর বড় খারাপ নজর।

নিজের এই চিন্তার জন্য তিনি আশ্চর্য হলেন। যত বয়স বাড়ছে তত পৃথিবীর জন্য দরদ বাড়ছে। তিনি নিজেকেই বললেন, ঘাটবাবু, তোমার অমন চিন্তা ভালো নয়। মৃত্যুই তোমার জীবনের বড় সত্য—তাকে অস্বীকার কোর না।

অফিসঘরে ঢুকে তিনি কাপড় ছাড়লেন। ধূপ—ধুনো জ্বেলে টাঙানো ছবিগুলোর সামনে ধরলেন। তারপর রেজিস্ট্রি খাতায় কাঠের বাক্সে। তিনি ছবিগুলোর কাছে গিয়ে সকলকে এক, দুই করে প্রণাম করলেন। উপনিষদের দুটো পরিচিত শ্লোক উচ্চারণ করে সকলকে শুনালেন। লোকটা তখনও কাউন্টারের ওপিঠে পায়চারি করছে। বিরক্ত হচ্ছে, ঘাটোয়ারিবাবুর বেয়াড়া কাজগুলো দেখছে। শুধু একবার কাউন্টারে উঁকি দিয়ে বলেছে, কী হল আপনার?

হবে, হবে। সময় হলে হয়ে যাবে। তখন আপনাকে বলতে হবে না। আর আমি ইচ্ছা করলেও দু দণ্ড দেরি করতে পারব না।

তিনি এ সময়ে দরজা, জানালা বন্ধ করে দিলেন। কাউন্টারে ঝাঁপ ফেলে দিলেন এবং মহাভারতের আদি পর্ব থেকে পাঠ করতে থাকলেন: নারদ কহিলা তবে দেব নারায়ণে। অদিতি কহিল যত কুণ্ডল করনে।। নরক আনিল বলে অদিতি কুণ্ডল। লুটিয়া অমরাবতী অমরী সকল।। পৃথিবীর পুত্র হয় নরক দুর্মতি। তারে না মারিলে যায় স্বর্গের বসতি।।

লোকটা কাউন্টারের ওপাশ থেকে চিৎকার করে উঠল, অ মশাই। মহাভারতটা দয়া করে পরে পড়বেন। দয়া করে নাম ধাম লিখে অধমকে বিদায় করুন।

ভিতর থেকে কোনো জবাব এল না। অথবা কোনো সাড়া। রোদ বাড়ছে। রোদ ঘন হচ্ছে। ওরা মড়া আগলে ওর অপেক্ষায় বসে আছে। এখন শুধু ঘাটবাবু ছেড়ে দিলেই হয়। তারপর কাঠ নিয়ে যাওয়া আছে। চিতা সাজানো আছে। গঙ্গার জলে দেহটাকে শুদ্ধ করার কাজ আছে। অনেক বেলা হবে আগুন দিতে। সে এই সব ভেবে ফের ডাকল, অ মশাই!

কোনো জবাব নেই। কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না ভিতরে। ভিতর থেকে ধোঁয়াটে ভাব এবং গন্ধ। তিনি গঞ্জিকা সেবন করছেন তবে! ভারী বদ লোক ত দেখছি। লোকটা পায়চারি করতে করতে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

তিনি ধোঁয়ার জগতে অনেকক্ষণ বসে জগতের অনিত্যতাকে উপলব্ধি করে কাউন্টারের পাল্লা খুলে দিলেন। কী নাম, কোথায় থাকে, বয়স কত, হাসপাতালে মরল—ডেথ সার্টিফিকেট আছে কিনা, এসব কথাগুলোও জিজ্ঞাসা করলেন।

এই সময় দুঃখবাবু এল। হরীতকী এল। লোকটা অফিস থেকে ঘাটে নেমে যাচ্ছে। কাঠ মাপছে ঝাড়ো। ডোমের মেয়ে—মরদেরা কাঠ নামাচ্ছে গঙ্গায়। কিছুদিন থেকে নেলি চিতা সাজানোর কাজটা পেয়েছে। নেলি চিতার কাঠ সাজাবে। সেজন্য সে গঙ্গায় নেমে যাচ্ছে।

দুঃখবাবু হঠাৎ বললেন, বড় করুণ, বড় করুণ!

ঘাটবাবু জবাব দিলেন না। তিনি যেন কথাটার যথার্থ অর্থই ধরতে পারেননি এমন ভাব দেখালেন।

দুঃখবাবু হরীতকীকে উদ্দেশ করে বললেন, দেখলি হরীতকী, লোকটার কী সর্বনাশ! জলজ্যান্ত কাঁচা ছেলেটা গেল। আমাদের পাড়ার অরুণবাবুর ছেলে।

আপনার ছেলেটা কত বড় হয়েছে দুঃখবাবু? ঘাটবাবু এতক্ষণে সব ধরতে পেরে প্রশ্ন করলেন নতুন বাবুকে।

আর ছেলেপুলে! যমের ঘর নিয়ে সংসার মশাই। কখন যে কোনটা খসবে...! নতুন বাবুকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে এখন।—ওরা আমার ছেলেপুলে নয়, সব ওঁর, সব ঈশ্বরের। বড়টার বয়স আশ্বিন এলে পাঁচ বছর পূর্ণ হবে।

একদিন ছেলেটাকে নিয়ে আসুন না দেখি। বড় ইচ্ছা হয় দেখতে। কী বলব, আপনার সংসারের কথা শুনে আমার বড় আপশোশ হয়। ইচ্ছা হয় নিজেও একটা সংসার করি। ঘর বাঁধি। ঘাটোয়ারিবাবু এইসব বলে কেমন লজ্জা পেলেন। তিনি আবার আগের কথায় এলেন। আমাদের কথা ওদের আপনি বলেছেন।

বলিনি! কী যে বলেন, সব! বলেছি। আপনার কথা বলেছি, হরীতকীর কথা বলেছি। নেলি, গোমানি, কৈলাস, গেরু—সবার কথা বলেছি। ওরা তো লেগেই আছে এখানে আসবে বলে। আমি নিয়ে আসি না। মনটা আমার খুঁতখুঁত করে।

হরীতকী বিরক্ত করছিল তখন ঘাটবাবুকে—তুর জন্য কী রাঁধি বুলে দে। বেলা তো বাড়ছে। তুর সে খেয়াল আছে বাবু!

যা হয় কিছু রেঁধে দে বাপু। এখন জ্বালাস নে। দেখছিস তো দুঃখবাবুর সঙ্গে গল্প করছি।

হরীতকী উঠে দাঁড়াল। একটা ঝাঁটা এনে ঘরটা ভালো করে পরিষ্কার করে দিল। তারপর আকাশের বেলা দেখতে বের হয়ে গেল।

দুঃখবাবুর সঙ্গে গল্প করে ঘাটোয়ারিবাবুর মনটা কোমল হয়ে উঠেছে। একটি ঘর, একটি সংসার ছোট সব সুখ—দুঃখ, ছোট ছোট কথার জন্য মনটা মাঝে মাঝে অবুঝ হয়ে ওঠে। তখন মনে হয় ঘাটের নিষ্ঠুরতা—ওঁর মন এবং হৃদয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে। তখন মনে হয় এ চটান ছেড়ে পৃথিবীর অন্য কোথাও গিয়ে বাঁচতে। ঘর বাঁধতে। ভাবতে ভাবতে আবার বলেন, একদিন নিয়ে আসুন না আপনার

ছেলেকে আপনার মেয়েকে। একটু আদর করি। আমি ওদের কোনো অনিষ্ট করব না। দুঃখবাবু আমার আদর করার মতো কেউ নেই। কথাগুলো বলে তিনি চোখ বুজলেন। একটু সামান্য সুখের ইচ্ছায় তিনি চোখ বুজে আছেন। চোখ খুললেই যেন সামান্য সুখের ইচ্ছাটাকে চটানের নিষ্ঠুরতা গ্রাস করবে। চোখ বুজেই বললেন, কী আনবেন তো, কথা দিচ্ছেন তো? কথা বলছেন না কেন?

নিশ্চয় আনব। নিশ্চয়।

আপনার স্ত্রী আছে, বাবা মা আছেন, ভাবতে বড় ভালো লাগে। স্ত্রী স্বামীকে কত ভালোবাসে তা জানার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবু বুড়ো বয়সে—বলতে লজ্জা কি—রসকলিকে দিয়ে সে স্বাদ এককালে মেটাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কথা কী জানেন, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না মশাই, মেটে না। কোনো স্বাদ নেই। কোনো স্বাদ নেই। তিনি চোখ খুলেও খুলতে পারছেন না। সামান্য সুখটা আর একটু থাক—এই তাঁর ইচ্ছা।

এক নতুন ইচ্ছায় ঘাটোয়ারিবাবু ডুবে যাচ্ছেন। জীবনের অনেকগুলো ক্ষুদ্র অনুভূতি অন্য এক মনোরম ধরিত্রীর অনুসন্ধানে ওঁকে উদগ্র করে তুলল। চোখ বুজেই তিনি সেই সুখকে ধরতে পারলেন। দুঃখবাবু যেন ছোট ফুল দিয়ে সংসার সাজাচ্ছেন। হরীতকীর বাচ্চা হয়েছে। নেলিরও বাচ্চা হবে। ওরা ওদের ঘর নিয়ে বাঁচল। ওরা ওদের সুখ নিয়ে বাঁচল। শুধু এই ঘাটবাবু কড়ির হিসাবের মতো মৃত্যুর হিসাব রাখছেন। এই সব ভেবে ভেবে গভীর জলধিতে ডুবে গেলেন তিনি। শুধু আঁধার—আঁধার। জীবনের কোনো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি চোখ বুজেই চেয়ারের হাতল দুটো জোরে চেপে ধরলেন। তিনি মৃত্যুর বীভৎসতায় শিউরে উঠলেন।

সহসা চোখ খুলে চেয়ারের হাতল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইতস্তত কিছুক্ষণ পায়চারি করে দুঃখবাবুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, ভোরে যখন আসেন গিন্নি কিছু বলে না? বলে না, ঘাটের চাকরি ছেড়ে দাও? বলে না, অন্য চাকরি দেখ?

ওসব বলে না, তবে বলে, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আমি ফিরে গেলে তবে ওর সব কাজ শেষ হবে। ফিরে গেলে নাইবার জল দেবে। সে জলে আমি স্নান করব। আমি খেতে বসব। ছেলেমেয়ে দুটো কোত্থেকে এসে জুটবে। যতই খাক, আমার সঙ্গে না খেলে ওদের পেট ভরবে না। ও আমাকে খাইয়ে দিয়ে দিবা নিদ্রার ব্যবস্থা করে তবে নিজে স্নান করবে। খাবে।

খুব ভালো মেয়ে।

হ্যাঁ, তুলনা হয় না।

স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে তবে সুখেই আছেন।

তা মোটামুটি আছি। সুখে—দুঃখে চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে টাকা—পয়সার জন্য খুব বিব্রত বোধ করি। অভাব অনটনের সংসার। বুঝতেই ত পাচ্ছেন।

তা হলে বলছেন দুঃখও আছে।

তা আছে।

তিনি বুঝলেন নিরবচ্ছিন্ন সুখ অথবা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ মানুষের থাকতে নেই। তিনি বুঝলেন এই সুখ দুঃখের জন্যই দুঃখবাবুর সংসার—সংসার হয়েছে। একটু সুখ দুঃখের জন্যই দুঃখবাবু এমন সুখের কথা বলতে পারছেন। এই সুখ—দুঃখ না থাকলে তিনিও যেন বলতেন, আর ভালো লাগে না মশাই, সংসারের ওপর বীতরাগ হয়ে পড়েছি।

রোদের তাপ বাড়ছে। বেলা বাড়ছে। শ্মশানের আগুনটা দাউ—দাউ করে জ্বলছে। ওরা দুজনেই আগুনটা দেখে চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। রোদের উত্তাপে আগুনটা খুব নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। ঘাট থেকে উঠে আসছে নেলি। ওর কাজ হয়ে গেল বলে উঠে এল। কিন্তু ওরা দেখল একটি ডোমের মেয়ে ওকে উঠে আসতে সাহায্য করছে। হরীতকী ছুটে চটান থেকে নামল। শনিয়া সকলকে বলছে চটানের—নেলির বাচ্চা হবে।

দুঃখবাবু জানালায় দাঁড়ালেন। তিনি জানালা থেকে শনিয়ার কথা শুনতে পাচ্ছেন। তিনি আড়াল থেকে নেলিকে উঠে আসতে দেখছেন। নেলির দীর্ঘ শরীরটা ব্যথায়, বেদনায় নুয়ে পড়েছে। চুলগুলো কপালে, মুখে ছড়িয়ে আছে। হরীতকী নেলিকে দাঁড় করিয়ে খোঁপা বেঁধে দিল। হরীতকী কপাল থেকে চুলগুলোকে সরিয়ে দিল, নেলির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। চোখ দুটো কোমল, সাদা—সাদা, ধীর। ওর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা ওকে সুখ এবং দুঃখ দুই—ই দিচ্ছে যেন। জানালার কাছে এসে নেলি চোখ তুলে দুঃখবাবুকে দেখল। চোখ নামাল। নেলি যেন বলছে, হামার ভগমান আসছে বাবু। হামি হামার মাচানে ভগমানকে নামাতে যাচ্ছি।

বড় করুণ! বড় করুণ! দুঃখবাবু জানালায় মুখ রেখে ফের উচ্চারণ করলেন। জানালা থেকেই দেখতে পাচ্ছেন—অরুণবাবু এই রোদের উত্তাপে বসে নিজের বাচ্চাটাকে ভস্ম হতে দেখছেন। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে আগুনের জঠরে ঠেলে দিলেন। শ্মশানের শেষ ধোঁয়ার সিঁড়ি উপরে উঠে যাচ্ছে। ওর একমাত্র আত্মা স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করছে। নেলি এই পথ ধরে উঠে গেল। সে তার ভগবানকে মাচানে নামাতে যাচ্ছে। দুটো মোষ নেমে গেল গঙ্গায়। ওরা লড়াই করতে নেমে গেল। একটা লোক নানারকমের খেলনা শরীরে ঝুলিয়ে বিক্রির আশায় উঠে যাচ্ছে। সে শিবমন্দিরের পথ থেকেই নাচতে আরম্ভ করল, বলতে আরম্ভ করল, লে যানা বাবু। সাড়ে ছ আনা। দেখে শুনে মন দেওয়ানা। আহা মন দেওয়ানা। দেওয়ানা।

চটানে নেলির গোঙানি। গোঙানি থামছে, না। অহরহ সেই আওয়াজ দুঃখবাবুকে বিব্রত করছে। নেলির বুঝি খুব কষ্ট। জানালায় দাঁড়িয়ে নেলির কষ্ট তিনি বুঝি ধরতে পারছেন। এখন এই জানালায় দাঁড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে না। চটানে নামার ইচ্ছা। নেলির মাচানে বসার ইচ্ছা। একটু আদর করার ইচ্ছা। কিংবা তিনি যেন ওকে সাহস দিতে চাইছেন। কিন্তু দুঃখবাবু নড়তে পারছেন না। নেলি মাচানে পড়ে পড়ে কাঁদছে—আর তিনি নড়তে পারছেন না।

হরীতকী জল গরম করছে ঘরে।

মংলি নিজের ঘরে বসে শাপ—শাপান্ত করছে। চটানে এত বিটির পেটে বাচ্চা আসছে, ওর পেট কেবল খালিই যাচ্ছে। দুখিয়ার সঙ্গে ঘর করতে এসে কত বছর ঘুরে গেল। চটানে কত লোক এল গেল। অথচ ওর পেটে একটা বাচ্চা এল না। চোখখাগী ডাকঠাকুর। নিজের গতরটা দেখল—নিজেকে, দুখিয়াকে শেষে চটানের সকল মেয়ে—মরদকে শাপ—শাপান্ত করল।

দুঃখবাবু জানালায় দাঁড়িয়ে এ সবও শুনলেন।

জল গরম করে হরীতকী নেলির ঘরে ঢুকল।

একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি গেরু এবং শনিয়া দুজনে মিলে ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে গেল।

নেলি মাচানে এ—পাশ ও—পাশ করছে। উঠছে—বসছে, গাভীন গোরুর মতো হামলাচ্ছে। মুখ, শরীর শক্ত করে দিচ্ছে।

হরীতকী বুঝল খুব কষ্ট হচ্ছে নেলির। বাচ্চাটা হতে কষ্ট দিচ্ছে নেলিকে। হরীতকী সহ্য করতে না পেরে বাইরে এসে দাঁড়াল। গেরুকে ডেকে বলল, তুর বাপ তো দানরি—ফানরি করত। খুঁজে দেখ না দুচারঠো চিজ মিলে কিনা! তুর বাপ তো পোয়াতির বাচ্চা আনতে জেরা সময় লিত। খুঁজে দেখ না ময়রুন বিবির ফল তুর ঘরে আছে কিনা। নেলি বহুত কষ্ট পেয়ে লিচ্ছে। পেলে ওয়াকে ডুবায়ে দিতাম পানিতে। পানি খাইয়ে দিলে ও—মেয়েটা আসান পেত।

চটানে দাঁড়িয়ে গেরু হঠাৎ বাপের হেকিমি জীবনটার কথা মনে করতে পারল। মনে হল ওর—এইত সময়। কঙ্কালের দাম কমে যাচ্ছে। মড়ক আর লাগছে না। হিল্টন কোম্পানির বড়বাবু কঙ্কাল কিনছেন না। এই ঠিক সময় বাপের ব্যবসাটা জোড়াতালি দিয়ে ফের আরম্ভ করে দেওয়া যায়। সে তাড়াতাড়ি বাপের মাচানের নিচে ঢুকে গেল। হাতড়ে হাতড়ে ছোট বড় অনেক মেটে কলসি, হাঁড়ি বের করল। বেড়ার পাশ

থেকে বেতের ঝুড়িটা টেনে বের করল। ঝুড়িটা ইঁদুরে খেয়েছে। উইপোকরা কেটেছে। মাকড়সার জাল ঝুল কালিতে ভরে আছে। সে ঝুড়িটা তুলে বাইরে নিয়ে এল।

এখনও দুটো একটা প্রায় সব রকমের গাছগাছড়াই আছে যেন। হেমতাল কাঠ আছে, নরসিং ঝাঁপ আছে। বন রুই মাছের ছাল আছে। শ্বেতশিমুলের ছাল, গোঁড়ের ছাল আছে দুটো। নীল বানরের মাথা আছে। গেরু তন্ন তন্ন করে করে খুঁজছে। আছে, আছে, যেন সব আছে। সে নিচে ময়রুন বিবির ফুল পেয়ে চিৎকার করে ডাকল, পিসি আছে রে আছে। পেয়ে লিছিরে ময়রুন বিবিরে। দে দে জল খাইয়ে দে। ওরে শনিয়া, জলদি পানি লিয়ে যায়। ময়রুন বিবিরে ডুবায়ে দে। পানিটা খাইয়ে দে পোয়াতিরে, বাচ্চা হতে জেরা সময় লেবে। ঠিক বাপের মতো গেরু সুর করে কথাগুলো বলতে থাকল।

পরদিন ভোরবেলায় গেরু দাওয়ায় একটা চাদর বিছিয়ে সব গাছগাছালিগুলো রাখল। ফুঁ দিয়ে ধুলো সাফ করল। সরু একটা কঞ্চি কেটে, বাপের মতো কঞ্চিটা হাতে নিয়ে চাদরের চারপাশে ঘুরতে থাকল। গেরু চাদরটার চারপাশে নাচল কুঁদল। লাফাল। বাপের মতো ঘুরে ফিরে নেচে—কুঁদে রসল্লা দিচ্ছে। যেন কোনো ভুল না হয়। যেন আনাড়ি বলে লোকে ধরতে না পারে। সে ঘুরে ঘুরে বাপের কথাগুলো মুখস্থ করল। কোর্ট—কাছারিতে হেকেমি করার সময় বাপ যেমন চেঁচাত, সেও তেমনি চেঁচাতে থাকল। এ পুন্ন—পদের মাদুলি। এ ঝাড়ফুঁক লয়, এ জাদু মন্তর লয়, এ আছে জড়িবুটির কারবার—দ্রব্যগুণ। ডান পুকুস টান মারে, তোষক করে, পির পরিতে নজর দেয় বাণ মারে, এ মাদুলি দেহে লিলে আসান পাবে দেহ। বহুত সামান্য দাম আছে লিয়ে যান। বিবি বুঢঢার লাগি লিয়ে যান। গেরু বাপের মতোই সুর করে কথা বলল।

শনিয়া বলল, এবেনে এটা কী হচ্ছে?

গেরু বিরক্ত হয়ে বলল, এবেনে এটা কাম হচ্ছে। এবেনে তু কাজিয়া না করবি। খাওয়ান থাওয়ান মাত করবি। হামি হাড়—গোড়ের ব্যবসা করবে না। হাকিমি ব্যবসা করবে। দু চারঠো গাছগাছালি জোগাড় করে লিলেই হবে। তু থাম।

শনিয়া গেরুর চোখ দুটো দেখে ভয় পেল। সে কিছু বলল না। চুপচাপ দরজার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। গেরুর লাফ ঝাঁপ দেখল, এবং ফিক করে হেসে দিল এক সময়। গেরু এখন অজগর সাপের মতো হয়ে যাচ্ছে। সে বলছে—ডিহিবড়া সাপের চোয়াল গা। গেরু ডিহিবড়া সাপের মতো মুখ করে হাই তুলছে। শনিয়া ওর হাই তোলা মুখের ঢঙ দেখেই হাসল।

গেরু রুখে উঠল, তু হাসলি কেনে?

হামি হাসলাম কুথি আবার?

তু হাসলি না, ফিক করে হাসলি না তু?

তু অমন করছিস ক্যানে? মুখটাকে সাপের মতো করে হাই তুলছিস।

হাই তুলবো না। সাপের কথা তুললে সাপের মতো হতে হয়। বানরের কথা তুললে বানরের মতো হতে হয়। তবে দানরি—ফানরি হবে। কাজ কারবার হবে। এটা তামাশা ভেবে লিস না শনিয়া। এ বহুত তন্তর মন্তরের কারবার আছে। তু মত হাসবি। ঠিক এখানটাতে বসেই বাপ হামাকে গাছগাছালির নাম শেখাত। বাপ বুলত। শিখে লে বেটা। এ কাম করে খেতে পারলে চটানে ভুখা থাকতে হবে না। শনিয়ার দিকে মুখ তুলে ফের বলল, তু—হাসবি না।

হাসব না।

গেরু বাপের মতো রসল্লা দিতে লাগল আবার। সে ঘুরে ঘুরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। যেখানে যেমন যে বলছে, সেখানে সে তেমনটি হওয়ার চেষ্টা করছে। বাঘের কথা বলছে বলে বাঘের মতো হাঁটছে। সে বলছে—সুন্দরবইনা বাঘ। বাবুরা বলেন রুয়েল বেঙ্গল টাইগর। নীল বানরের মাথা, বনমানুষের হাড়, কুল কুহলীর গাছ। মরদ রাজের মূলে ছ দফের রেণু মিলে কবচ দিলে নাম তার মহাশক্তি কবচ বাণ। গুণ বহুত

পেকারের। যে আদমী বিছানা খারাপ করে, আস্বপ্ন—কুস্বপ্ন দেখে, যার বাদী দুশমন শত্রু আছে—বাণ মারে, বন্ধন করে—তার লাগি এই কবচ বাণ। বড় সামান্য দাম আছে। —মাত্তর স পাঁচ আনা। খুব বেশি দাম লয়। ঘাটে পথে দোকানে দুশমনে কত পয়সা যায়—মাত্তর স পাঁচ আনা। একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে এবং লাফালাফি করে গেরু অবসন্ন হয়ে পড়ল যেন। সে বসল কালো চাদরটার পাশে। তারপর শনিয়ার দিকে চেয়ে বলল, কেমন শুনলি বল।

বহুত আচ্ছা।

তুর একটা মাদলি কিনতে শখ গেল না?

জরুর শখ গেল।

ও হামি আচ্ছা বলিয়ে লিচ্ছি। পয়সা, পয়সা, কত পয়সা হবেক দেখবি।

একদিন, দুদিন, তিনদিন রসল্লা দিল গেরু। তিনদিনই দরজায় দাঁড়িয়ে শনিয়া দেখল সব। তিন দিন শাগরেদের মতো গেরুকে সাহায্য করেছে। গাছগাছালি বিছিয়েছে। গাছগাছালি চাদর থেকে তুলে ধরে রেখেছে। তিনদিনই মনে হয়েছে—গেরু অন্য মানুষ। গেরু দানরি হয়ে গেছে কিংবা হাকিমদার।

পরদিন ভোরে মাথায় কাঠের বাক্স নিয়ে হাতে হারিকেন নিয়ে চটান থেকে নেমে গেল গেরু। শিবমন্দিরের পথ ধরে সে শহরের রাস্তায় পড়ল। রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। সে লোক ঠেলে যেতে লাগল। কোর্ট—কাছারি করতে যাচ্ছে। সুতরাং বাপের কথাগুলো আওড়াচ্ছে মনে মনে। সে রাস্তার একপাশ ধরে হাঁটে। মোটর রিকশা বাঁচিয়ে হাঁটে। একদিন, দুদিন এবং অনেকদিন হাঁটল। কোর্ট—কাছারিতে বসল। অনেকদিন। বাপের মতো জোর গলায় কথা বলেছে অনেকদিন। বাপের মতো অশ্বত্থ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে চাদরের ওপর জড়িবুটি বিছিয়ে নেচেছে, কুঁদেছে। অথচ বিক্রি ভালো হয়নি। এত করেও বাপের মতো বিক্রি তুলতে পারছে না, মাদুলি বিক্রি হয়েছে, কিন্তু কোনো কাজ আসেনি। মামলা—মোকদ্দমায় হেরে গিয়ে ওকে এসে ধরেছে। বলেছে, জুয়াচোর। কেউ কেউ গালমন্দ করেছে। মারধোর করেছে। ওর তখন ভয়ানক আপশোশ। জিয়ন হাড় বাদে সব তাবিজ—ওবিজ বে ফয়দা। সে নিজেই যেন নিজের নসিবকে ঠকাচ্ছে। রাহু চণ্ডালের হাড় না হলে গাছগাছালির দ্রব্যগুণ ফাঁকা মাঠে ঘোড়দৌড়ের মতো। সবই হবে—শুধু কাজ দেবে না। শুধু গালমন্দ জুটবে। সে এখন যেন মনে মনে বাপকে খুঁজছে। ডোমন সাকে খুঁজছে। মনে মনে বাপের কথা আওড়াচ্ছে। হাকিমি বলিস, দানরি বলিস, এ চীজ বেইমান মানুষের দু—দশ দফে কাজে লাগে। আউর শালা শুনে লে, রাহু চণ্ডালের হাড় লাগে, তুরা যাকে বলিস জীয়ন হাড় কিংবা ব্রেহ্ম চণ্ডালের হাড়। দানরি—ফানরিতে হাড়টাই সব।

নেলির বাচ্চা এতদিনে হামাগুড়ি দিচ্ছে চটানে। হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাচ্ছে। অঃ...অঃ...করে কথা বলছে। কাক তাড়াচ্ছে। মাছি, ব্যাঙ তাড়াচ্ছে। হেঁটে হেঁটে ঘাটোয়ারিবাবুর ঘরে চলে যাচ্ছে। ঘাটোয়ারিবাবুর পায়ের কাছে বসে সারাদিন খেলছে। ঘাটোয়ারিবাবুও কথা বলছেন ওর সঙ্গে। ঘাটোয়ারিবাবুও অঃ অঃ করছেন। হাত নেড়ে, চোখ বড় করে, পু পু করে কথা বলছেন, খেলছেন সারাদিন। তিনি এখন বাচ্চাটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বাচ্চাটাকে নিয়ে মন্দ কাটছে না।

গঙ্গা—যমুনা সঙ্গে এখন যাচ্ছে না। ওরা চটানে বাচ্চাটার পাহারায় থাকছে।

অশ্বত্থ গাছের শেষ পাতাটা থেকে যখন সূর্যের রঙ সরে যায়, গেরু ওর পুঁটুলি বেঁধে কাঠের বাক্স মাথায় নিয়ে পাশের দোকানিকে বলে, দাও ত দেখি, এবার তবে উঠতে পারি।

দোকানি এক পয়সার একটা বিস্কুট দিল। গেরু বিস্কুটটা একটুকরো কাগজে মুড়ে সযত্নে পকেটে রাখে, তারপর হারিকেন জ্বালিয়ে শহর ধরে গঙ্গায় নেমে যায়। চটানটা দেখলেই নেলির বাচ্চার কথা মনে হয়। বাচ্চাটাকে একটা বিস্কুট খাওয়াতে পারলে খুশি হয় সে। চটানে উঠে গেরু ডাকল, চাচা হামার কাঁহারে? চাচা।

নেলি যেদিন সকাল সকাল গাওয়াল করে ফেরে, সেদিন বাচ্চাটা ওর কোল থেকেই অঃ...অঃ....করে উঠবে। দুহাত নাড়বে। কল—কল করে উঠবে। যেদিন ফিরবে না, সেদিন হয় দুঃখবাবুর ঘরে, নয় ঘাটোয়ারিবাবুর ঘরে থাকবে। গেরুর গলার আওয়াজ পেলেই জানালা দিয়ে উঁকি দেবে। শব্দ পেয়ে গেরু জানালায় দাঁড়াবে। আলোটা তুলে ধরে বলবে, চাচা খা লে।

তখন ঘাটোয়ারিবাবু চেয়ারে বসে চোখ বুজে থাকেন। চোখ বুজেই বলেন, গেরু এলি?

হে বাবু, এলাম।

ব্যবসা তোর চলছে কেমন?

আচ্ছা না বাবু। আচ্ছা না চলছে। তারপর ধীরে ধীরে গেরু জানালা থেকে মুখটা নামিয়ে নেয়। ব্যবসা জমে উঠছে না। মন ভারী হয়ে উঠেছে দিন দিন। দিন দিন কেবল বাপকে মনে পড়ছে আর রাহু চণ্ডালের হাড়ের কথা ভাবছে সে। এ সব ভেবে চটানে উঠে যেতে থাকে। এ সময় শনিয়া আসে। গেরুর মাথা থেকে কাঠের বাক্স নামাতে সাহায্য করে। হাত—মুখ ধোয়ার জল রাখে দাওয়ায়। ঘরে ঢুকে মাচানে বসে গেরু বলে, রাহু চণ্ডালের হাড় না হলে আর চলছে না বৌ। বাদী—বিবাদীরা রোজ বচসা করছে। মাদুলি কেউ লিচ্ছে না। সবাই বলছে আমি ধোঁকা দিয়ে পয়সা লিচ্ছে।

তু খেয়ে লে ত। তা হবেক পরে হবে।

খেতে খেতে গেরু বলল, নেলি ফেরেনি?

না।

নেলির ব্যবসাও আচ্ছা যাচ্ছে না বুল।

হামি কী করে বলব?

শনিয়া একটু পচাই ঢেলে বলল, লে, খা লে। শনিয়া জানে এই পচাইটুকুর বিনিময়ে গেরু চটানের সব দুঃখের কথা ভুলে যাবে। তখন ওর মনে হবে দুনিয়ায় বেঁচে সুখ আছে! দুনিয়াকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট।

সব পচাইটুকু শেষ করে গেরু ঝিম মেরে বসে রইল। শনিয়া ওর হাত মুখ ধুয়ে দিয়ে মাচানে তুলে দিল। গেরু মাচানে বসে ঝিমায়। চার্চের ঘড়িতে তখন কে ঘণ্টা পেটাচ্ছে। তখন নেলি নিজের ঘরে বসে আদর করছে বাচ্চাটাকে। ঘাটোয়ারিবাবু সুর করে মহাভারত পড়ছেন। কেউ বচসা করছে ঝাড়োর সঙ্গে। ওদের উনুনে আজ হাঁড়ি চড়েনি। বচসাতে সে সব ধরতে পারছে। দু'চারদিন পরে এ ঘরেও হাঁড়ি চড়বে না। বিক্রি খুবই কমেছে। নেই বললেই চলে। দুটো পেটের দায় ওকে পীড়িত করতে থাকল। হাড় সংগ্রহের জন্য নানাভাবে চিন্তায় ডুবে যেতে থাকে। গেরু নিষ্ঠুর হতে চাইছে, বীভৎস হতে চাইছে। সে বাপকে মনে করতে পারছে। রসিদের দরগা, কালীর থান এবং অনেক বীভৎস গল্প যা বাপের কাছে শুনেছে—সব মনে করতে পারছে। গেরু একটা মদের ঢেকুর তুলল। পাশের ঘরে এখনও পু পু করছে....বাচ্চাটা। ওর লোভ বাড়ছে। গেরু নিষ্ঠুর হতে চাইল। বীভৎস হতে চাইল। বাচ্চাটা কখন ঘুমোবে! নেলি কখন ঘুমোবে। গঙ্গা—যমুনা কখন নদীর ঢালুতে নামবে। কখন নেমে যায়? কখন ঘাটোয়ারিবাবু জেগে থাকবেন না—কখন, কখন এমন সব ঘটবে। সে মাচানে বসে অধীর হয়ে উঠল। মনে মনে সে ভারী নিষ্ঠুর। মায়া দয়া নেই এবং মমতাহীন। নেলির বাচ্চাটাকে সে রাতের আঁধারে চুরি করে খুন করতে চায়। খুন করে হাড় সংগ্রহ করতে চায়।

অথচ ভোর হলে রাতের ভাবনাটা আর থাকে না। শরীরটা হালকা লাগে। মন মেজাজ দুই—ই তখন প্রসন্ন। তখন মনে হয় কী দরকার এভাবে বেঁচে। এবং ফের ফরাসডাঙায় যাবে অথবা ঝুমঝুমখালিতে—কঙ্কাল খুঁজে খুঁজে বেড়াবে। দুটো পেটের দায়ে একটা খুনখারাপির দিকে টেনে নিয়ে যাবে? মনে মনে সে সত্যি তা চাইল না।

সে ভোরে উঠল। গামছাটা কাঁধে ফেললে। বাবুচাঁদ শুয়োর নিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। এখন ভরা গাঙ। চটান থেকে বর্ষার জলে নৌকা দেখা যাচ্ছে। পাল দেখা যাচ্ছে। মাস্তুলের ডগায় দু—একটা পাখি বসে আছে। সূর্যের গাঢ় রঙ নদীতে—শ্মশান চটানের খুব কাছাকাছি এখন। এ ভোরে এই সব দেখে বাচ্চাটাকে

দেখার ইচ্ছা গেরুর প্রকট হয়ে উঠল। সে বাইরে থেকে ডাকে, চাচা ঘুম থেকে উঠলি? ভিতরে ঢুকে গেল সে। বাচ্চাটা নেলির পাশে বসে খেলছে। নেলি ঘুমোচ্ছে। গেরুকে দেখেই ওঠার জন্য দু হাত বাড়িয়ে দিল। গেরু তখন কথা বলছে, ভয় দেখাচ্ছে কোলে নেবে না। রাগে দুঃখে অভিমানে নেলির চুল ধরে টানে বাচ্চাটা। নেলি ঘুমের ভিতরই বলল, বাপ, তু হামারে জ্বালাসনে। থোড়া ঘুম যেতে দে। এই ঘুমের ভিতর নেলি যেন কত বছর আগে চলে গেছে। গেরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ভারী মজা পায়।....শনিয়া যদি এমন একটা বাচ্চা দে লিত চটানে।

গেরু বলল, চল হারুয়া, গঙ্গার ধারে চল। নেলির দিকে চেয়ে বলল, হামি হারুয়াকে লিলামরে নেলি।

আজ গেরু কোর্ট—কাছারি করতে গেল না। যা আছে তাতে ওরা দু—পাঁচ দিন খেতে পারবে। কাছারিতে গেলেই এখন শমনের মতো লোকগুলো ওর চারপাশে জড়ো হতে থাকে। অপমান করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। গেরু দুটো কথা বলতে উঠলে ওরা বলে ধোঁকাবাজ। গেরু বাপের মতো কসরত দেখিয়ে যখন সমস্ত জনতাকে বশ করে আনে তখন হয়তো একটিমাত্র লোক বলে ওঠে, এ সব মাদুলি—ফাদুলিতে কোনো কাজ হয় না। সোয়া পাঁচ আনা পয়সাই জলে। গেরু তবু থামে না। লোকটার কথা পরোয়া করছে না। এমনি ভাব ওর চোখে—মুখে। সে নাচে, লাফায়। সে বলে বিশ্বাসে আশ্বাস বাবু। দশজনের কথায় কান দেবেন না। নিজের শরীরে ধারণ করে লেন। পরখ করেন। বিশ্বাসে আশ্বাস বাবু। বিশ্বাসে আশ্বাস।

কিন্তু ঐ একটিমাত্র লোকই ওর ব্যবসায় ক্ষতির পক্ষে যথেষ্ট। লোকগুলো ওর নাচন—কোঁদন দেখে মাত্র। তামাশা দেখে মাত্র। নাচন—কোঁদন থেমে গেলেই ওরা ধীরে ধীরে সরে পড়ে। মনে হয় এতক্ষণ ওরা ওর কেরামতি দেখার জন্যই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বিরক্ত হয়ে বলে, শালারা! একটা জীয়ন হাড় লাইরে! তবে তুগো সমঝে দিতে পারতাম হাকিমি দানরি বুলে কাকে!

গেরু গঙ্গার ধারে হারুকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এমনি সব কথা ভাবে।

বর্ষার গঙ্গা বলে সে নিচে নামতে পারল না। এক মাল্লা, দু মাল্লা—সব নৌকাগুলো ঘাটে ঘাটে ভিড়ছে। ফজলি আমের নৌকা। কাঁঠালের নৌকা। গেরু হারুকে নিয়ে নৌকার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। আম কাঁঠালের গন্ধ নাকে আসে। দুটো একটা পাখি ওড়ে নদীর জলে। ওদের ছায়া পড়ে না। জল ঘোলা। জলে ঘূর্ণি। ঘূর্ণিতে একটা গোবরে পোকা ডুবছে। পোকাটাকে ডুবতে দেখে গেরুর কেমন কষ্ট হতে থাকে।

হারুর দিকে চেয়ে বললে গেরু, কিরে সাঁতার দিয়ে লিবি? তুর মায়ী ত সাঁতারে গঙ্গা পার হত।

হারু দুটো হাত একসঙ্গে করে নাড়তে লাগল। পু...পু করতে থাকল। যেন গেরুর কথা সে কত বুঝতে পেরেছে।

গেরু খুশি হয়ে হারুকে দু হাতের ওপর নাচাল। মাথার ওপর ঘোরাল। তারপর গালটা গালে ঘষে দিয়ে খুব জোরে দু'টো চুমু খেল। —আঃ। অদ্ভুত সে একটি শব্দ তুলল গলায়।

জল নামছে নিচে। ঘূর্ণি উঠছে। ঘোলা জল। অন্যপারে একটা ধস পড়ার শব্দ হয়। গেরু দেখে ধসটা একটা অতিকার কচ্ছপের মতো যেন নদীর গর্তে নেমে গেল। হারু ওর কোলে। হারু নিচে নামতে চাইছে। নিচে নেমে দুষ্টুমি করতে চাইছে। গেরু ওকে দুষ্টুমি করার সুযোগ দেওয়ার জন্যই যেন নিচে নামিয়ে দিল। হারু তখন হামাগুড়ি দিচ্ছে, হারু তখন ছুটছে। গেরু যত ওকে ধরার জন্য ছুটছে, সেও তত চুটছে এবং হামাগুড়ি দিচ্ছে। হেসে গড়িয়ে পড়ছে। গেরু অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে ছুটাছুটি করল। অনেকক্ষণ হাসল। অনেকক্ষণ ওরা দুজনে নদীর পাড়ে, নদীর হাওয়ায় নদীর জলে পুলকিত হল। তারপর একসময় ওরা নদীর পাড়ে চুপচাপ বসে থাকে। নদীর জল দেখে, ঘূর্ণি দেখে। ধস নামা দেখে। গুণ টানা নৌকায় ছইয়ের ওপর মাঝিদের গান শোনে। গেরু এবং সে এই সব দেখে আপাতত মশগুল হয়ে থাকে।

গেরু হারুকে নিয়ে বেশ মশগুল হয়েছিল। অনেকদিন হারুকে কাঁধে করে নদীর পাড়ে পাড়ে অনেক দূরে চলে গেছে। বর্ষার ভরা গাঙে দু—পা ডুবিয়ে বসেছে। এখন দুটো একটা কথা বলতে পারছে হারু। গেরুর হাতে পায়ে ভর করে ধরে কাঁধে উঠবার চেষ্টা করত হারু। কত রকমের কথা বলত। সে পাখি দেখলে

বলত, গেউ....চাচা....পাখ....ই....। গেউ চাচা ফস—দাঙ্গা যাবে। গে...উ চা...চা...ল...দি...য় পা...নি...খাব...অ...।

গেরু চুপচাপ বসে থাকে। জলের ধারে ওর ছায়া পড়ে তখন। হারু কথা বলে—রাজ্যের কথা। গেরুর খুব ভালো লাগে। অভাবের যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারছে। নদীর অন্য পারে সানাই বাজে। বাবুদের বাড়ি বিয়ে। বাপ ওর বিয়ে দিয়েছিল! বিবি ওর এখনও চটানে আছে। কোনদিন চটানে ছেড়ে ভাগবে। কোনদিন বলবে, তুর লাখান মরদ হামার লাগে না। আমি অন্য চটানে উঠে যাবে। গেরু যেন সেই ভয়ে চটানে বেশিক্ষণ থাকে না। যতক্ষণ পারে চটানের বাইরে কাটিয়ে সাঁঝ লাগলে চটানে উঠে যায়। কখন জানি বলবে মেয়েটা, চললাম রে মরদ। কখন জানি বলবে মেয়েটা—হামার মরদ বটে তু। দুটো পেটের দানা চটানে তুলতে লারিস। সাঁঝ লাগলে চটানে উঠত গেরু, কিন্তু শনিয়ার সঙ্গে কথা না বলে মাচানে উঠে শুয়ে পড়ত।

কোথায় যেন চলে যায় নেলি—ফিরতে গভীর রাত করে। মালসা মালসা খাবার আনে। হারুকে পেট ভরে খেতে দিয়ে সকলকে মুঠো মুঠো দেয়। নিজে খায় পেট ভরে।

ঠিকমতো খেতে না পেয়ে শনিয়া দিন দিন শুকনো কাঠ হয়ে যাচ্ছে। চুরি—চামারি করে গেরু আজকাল যা হচ্ছে—শনিয়াকে সে কথা জানতে দিচ্ছে না। পয়সায় সে কেবল মদ গিলছে। মদ গিলে আজকাল কেমন চেহারা হয়ে উঠেছে, কেমন বেলেল্লাপনা করতে শিখেছে। দুনিয়াতে কিছুই তার আর ভালো লাগছে না। শুধু হারুকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে ভালো লাগছে। কোথাও বসতে অথবা ওকে ভালোবাসতে ভালো লাগছে। যত এমন হয় তত ওর একটা বাচ্চার শখ জাগে। ওর বাপ হতে ইচ্ছা হয়। হারুর মতো রাজ্যের পাখি টিকটিকিদের সঙ্গে কথা বলুক ওর বাচ্চাটা এই শখ মনে মনে। যত এই সব মনে হয়, তত হারুকে কোলে নিয়ে ঘুরতে ইচ্ছা করে। তত সে হারুকে কাঁধে করে মাঠ, নদী, বন পার হয়ে যায়।

গেরু কোনো কোনোদিন হারুকে কাঁধে নিয়ে নদীর পারে সূর্য ওঠা দেখে। সূর্যাস্ত দেখে, নক্ষত্র দেখে! পৃথিবী, আকাশ, গাছপালা পাখি দেখে। ওরা এই ধরণিকে ভালোবাসতে চায়। এই ধরণিকে ভালোবেসে বাঁচতে চায়।

বর্ষার রাতে চটানে ফিরে গেরু দেখল, শনিয়া মাচানে পড়ে আছে। শনিয়ার চোখ দুটো ছলছল করছে। গেরুকে অপলক দেখছে শনিয়া। ভুখা থেকে শনিয়া বুঝি কথা বলতে পারছে না।

শনিয়ার চোখ দুটো দেখে গেরুর খুব কষ্ট হতে থাকে। ভুখা থেকে মেয়েটা বুঝি মরে যাবে—তবু চটান ছেড়ে যাবে না। চোখ দুটো শনিয়ার এমন ভাবই প্রকাশ করে। গেরু শনিয়ার পাশে বসে। অথচ কিছু বলতে পারে না। আদর অথবা কোনো সোহাগের কথা বলতে পারল না। এ সময় শনিয়াকে কী বলা যায়। কী বললে শনিয়া সুখ পাবে—সে ভেবে পেল না। অথচ শনিয়া গেরুর হাত টেনে বুকের কাছে রাখল এবং ইশারা করে একটু ঘন হয়ে বসতে বলল। গেরু ঘন হয়ে বসল এবং শনিয়ার ঠোঁট নড়তে দেখে বলল, তু কিছু বুলবি?

শনিয়া হাসল। ঠোঁট দুটো বেত পাতার মতো কাঁপছে। পাতলা ঠোঁটে অল্প হাসিটুকু গেরুর খুব ভালো লাগছে।

শনিয়া বলল, তু কেবল বাইরে বাইরে থাকিস। তু হামারে দেখবি না?

গেরু বলল, জরুর দেখব। লেকিন তুকে কিছু খেতে দিতে পারছি না, বহুত কষ্ট হামার।

কোনো কষ্ট না আছে। তু আয়, কথা শোন।

গেরু নিজের মুখটা শনিয়ার ওপর নামিয়ে দিল।

শনিয়া ফিসফিস করে বলল, হামার পেটে তুর একটা বাচ্চা এয়েছে গেরু। বহুত সুখের কথা বাচ্চাটা তুকে বাপ ডাকবে, হামারে মায়ী ডাকবে। বলতে বলতে শনিয়ার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গেরুরে গেরু, তু আচ্ছা হো যা। হামি ভালো হয়ে উঠব। হামি কাজ করবে তু কাজ করবে। একটা বাচ্চার কৈ দুখ না থাকবে।

গেরু আনন্দে অধীর। ইচ্ছা হয় সকলকে ডেকে বলে, হামভি চটানে মরদ বনে গিলাম। কিন্তু রাত বলে, সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে বলে, সে শনিয়াকে কাঁধে ফেলে ঘুরতে থাকল। কয়েকটা পাক খেল ঘরে, শনিয়া চিৎকার করছে গেরু হেরে তু করছিস কি! খুশির চোটে তু কী হামারে মেরে ফেলবি!

গেরু শনিয়াকে মাচানে শুইয়ে দিল। দু দণ্ড পাশে শুয়ে থাকল। তারপর সে শনিয়াকে মাচানে রেখে শহরের দিকে চলে যাওয়ার আগে বলল, তু ঘুম যাস না। হামি আ—ভি ফিরে আসবে।

সারা রাত ঘুরে শহরের কোনো ঘরে, কোথাও সে চুরি করতে পারল না। ভোর রাতের দিকে সে ফিরে এল। সে দেখল মাচানে তখন শনিয়া জেগে আছে। সে বললে, না—রে কিছু হল না।

শনিয়া মাচানের নিচে থেকে একটা থালা বের করে দেয়। তু খা লে। নেলি হামারে একথাল, তুরে একথাল দিয়ে গেল।

গেরু খেতে খেতে বলল হামার ভি একটা বাচ্চা হবে। হামার ভি ঘর হবে। লেকিন অভাব হামার যাবে না শনিয়া। একটা জীয়ন হাড় না হলে তু মরবি, হামি মরবে, বাচ্চাটা ভি মরবে। একটা বেহ্ম চণ্ডালের হাড় হামার জরুর লাগে। গেরু এ সময় হারুর বিবর্ণ মুখটা দেখতে গেল।

তখন ঘাটোয়ারিবাবু কালো রঙের চেয়ারে বসে জানালার গরাদে নিরবধিকালের মুহূর্তকে প্রত্যক্ষ করলেন। দূরে কে যেন কালের ঘণ্টা বাজায়! সবই প্রত্যক্ষ করলেন এবং ভাবলেন—বিস্বাদ, বিস্বাদ শুধু। শুধু যন্ত্রণা, শুধু মৃত্যু, শুধু বিষণ্ণতা। ভিন্ন ভিন্ন সব যন্ত্রণার প্রহসন। বরং কোথাও চলে যাওয়া ভালো। মৃত্যুর প্রহসনে, যন্ত্রণার রাজ্যে বেঁচে সুখ নেই। যত নেলির ছেলে বড় হচ্ছে, যত দুঃখবাবু চটানে এসে ছেলের দুষ্টুমির গল্প করছেন তত ঘাটোয়ারিবাবু এই সব ভেবে অধীর হচ্ছেন। আর ভাবছেন দূরে কালের ঘণ্টা কে যেন বাজায়!

পাখিরা আকাশে নেই। পুরোনো অশ্বত্থের নিচে দুটো কাক মরে পড়ে আছে। দুটো দোয়েল আকন্দ গাছটার ছায়ায় বসে জানালার গরাদে ঘাটোয়ারিবাবুকে দেখছে। ওর চোখ, মুখ দেখছে। ঘাটোয়ারিবাবু জানালায় কেমন পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। বর্ষার নদী দেখছেন। নদীটা চটানের পোয়াতী বৌদের মতো কলকল করছে। দোয়েল দুটো এখন শিস দিচ্ছে। নেলির ছেলেটার বয়স বাড়ছে। অফিস বারান্দায় হাতে লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে জানালায় উঁকি দিচ্ছে। হাত—পা নেড়ে কত রকমের কথা বলছে। বড় বড় চোখ হয়েছে বাচ্চাটার। নাক, চোখ, মুখ নেলির মতো। মুখের গড়নটা, শরীরটা, দুঃখবাবুর মতো। ঘাটোয়ারিবাবু এ সময় কিঞ্চিৎ হাসলেন। ব্রাহ্মণের ঔরসে চণ্ডালিনীর গর্ভে সন্তান—কৈলাস হলে বলত, বেম্ম চণ্ডালের ছা। তিনি কিঞ্চিৎ হাসলেন। তেমন ছা থেকেই রাহু চণ্ডালের হাড় হয়। শুধু হাড়টার ওপর এক রোজের পুজো আর্চা কালীর থানে মানত। বাচ্চাটাকে জলের নিচে চুবিয়ে মারা এবং রাতে শ্মশানকালীর পুজো। যখন কৈলাস প্রথম এল চটানে, যখন সে হেকিমি করত কোর্টে, তখন সে বলত, বাবু ও বড় লাখোটিয়া চীজ আছে। এ সহজে মিলবে না বাবু। ওস্তাদ রসিদ বহুত কসরত করে পেরাগের থেকে একটা বেম্ম চণ্ডালের ছা চুরি করেছিল। তারপর বহুত তন্তর—মন্তর তারপর বাচ্চাটাকে জলে শ্বাস বন্ধ করে মারা। বলতে বলতে কৈলাস কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। ঘাটোয়ারিবাবু এখনও যেন তার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। যেন কৈলাস ওর পিছনে দাঁড়িয়ে এইমাত্র কথাগুলো বলে গেল। হাড়টা চুরি যাবার পরও কৈলাস কতবার এসেছে বাবুর কাছে। বসেছে, বলেছে, একটা হাড় লাগে বাবু। লেকিন কাঁহা মিলে! কাঁহা মিলে! নেলির বাচ্চাটাকে দেখে বাবুর মনে হল কৈলাসের প্রেতাত্মা যেন ওর চারপাশে ঘুরছে। ওর শরীর থেকে হাড় বের করে নেওয়ার জন্য দিনরাত সেই প্রেতাত্মার চোখে ঘুম আসছে না। প্রেতাত্মা চটানের চার পাশটায় ঘুরছে ফিরছে। ফাঁক খুঁজছে চুরি করবার জন্য।

ঘাটোয়ারিবাবু ধমক দিলেন, এই তুই এখানে কেন? তোর মা কোথায়?

হারু বড় বড় চোখে তাকাল। বাবু যে ওকে ধমক দিচ্ছে ও বুঝতে পারল। বুঝতে পেরে সে কাঁদল।

ওঃ কাঁদা হচ্ছে। আমি তোর ভালোর জন্যই বলছি। একা একা কোথাও যাবি না। তোর মা কোথায়? মাকে ডাক, কথাটা বলে দি। দিনকাল খুব খারাপ।

হারু কিছু বুঝতে পারল না। সে একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। লাঠি দিয়ে মেঝেতে বারবার আঘাত করল। সে বাবুর মতো আকাশ কিংবা পাখি দেখলে না। দেয়াল ধরে টিকটিকি নামছে। সে লাঠি দিয়ে টিকটিকিটা মারতে গেল। হাত দিয়ে ধরতে গেল। ভয়ে উপরে উঠে গেল টিকটিকিটা। নাগালের বাইরে গিয়ে লেজ নাড়তে লাগল। হারু টিকটিকিটা ধরতে না পেরে রাগে বাইরে ফেলে দিল। তারপর ভিতরে ঢুকে বাবুর পায়ের কাছে বসল। বাবুর পায়ের চুল ধরে টানতে থাকল।

এই শালা ব্যথা পাচ্ছি। ব্যাটা তো দিন দিন খুব পাজি হয়ে উঠছে। তুই যে লোম ধরে টানছিস আমি ব্যথা পাই না রে?

হারু বলল, বাউ...ত...ত।

ঘাটোয়ারিবাবু সোহাগ করলেন, বাউ—ত—ত—। আমি বুঝি তত বাবু?

টিকটিকিটা দেয়ালে ক্লপ ক্লপ করল। ক্লপ ক্লপ করে টিকটিকিটা একটা মাছিকে আক্রমণ করছে। ঘাটোয়ারিবাবু ক্লপ ক্লপ শব্দ শুনলেন। তিনি বাইরে এসে টিকটিকি দেখলেন। দেখছেন। মাছিটা দূরে গিয়ে বসেছে। টিকটিকিটা উপরে উঠে গেল। কোনো আক্রমণের ইচ্ছা এখন আর নেই। বড় শান্তশিষ্ট জীব। তিনি দেখলেন টিকটিকির চোখ, মুখ গেরুর মতো এবং হারু মাছি হয়ে দেয়ালে উড়ছে। টিকটিকিটা আনন্দে দেয়ালে লেজ নাড়ে। এইসব দেখে, কৈলাসের প্রেতাত্মা গেরুর চোখে ঘুম নেই—ঘাটোয়ারিবাবু যেন টের করতে পারছেন। গেরুর হাকিমি ব্যবসাটা তিনি ভালো চোখে দেখছেন না। গেরু ফের কোর্ট—কাছারি যেতে আরম্ভ করেছে। ফের রসল্লা দিচ্ছে ঘরে।

যতদিন যাচ্ছে গেরুর অভাব তত বাড়ছে। নেলি রোজ রাতে কিংবা দিনে বের হতে পারছে না। চটানের ওপর দিয়ে আশ্বিন মাস গেছে কার্তিক মাস যাচ্ছে। গেরু শুধু রসল্লা দিয়েই যাচ্ছে। দুঃখবাবু এসে শুধু গল্প করছেন, কোনো কাজের নাম নেই। এবার একটু চাপ দিতে হবে। খড়ি কাঠ নেই। কাঠ সংগ্রহের জন্য ওকে যেতে বলতে হবে। অনেক কাঠের দরকার হয়ে পড়েছে। কিছুদিন থেকে খুব মড়া আসতে শুরু করেছে ঘাটে। কার্তিক মাসের টানে বুড়োরা মরছে খুব। রোজ তিনটে চারটে করে আসছে। জ্বলছে। খুব দূর থেকে আসছে সব—দশ ক্রোশ, বিশ ক্রোশ হবে। তখনই মনে হল তার, কালের ঘণ্টা কে বাজায়!

হারু হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে বারান্দায়। কোনো ভয়ডর নেই। নেলি চটানে পড়ে আছে ক'দিন থেকে। ঝাড়োর ঘরে পাতি তুলছে। হারুকে দেখে বুড়ো মানুষেরা মরছে খুব এ—কথাটা কেন যে মনে হল তাঁর। তিনি তাঁর শরীরের সব গ্রন্থিগুলো দেখে বিষণ্ণ হলেন। মৃত্যুর ইচ্ছা এ শরীরে যেন প্রকট হচ্ছে। মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু। তিনি বারান্দায় পায়চারি করার সময় উচ্চারণ করলেন। তিনবার তিনি ঈশ্বরের স্মরণ নিলেন। তিনবার তিনি সকলের অলক্ষ্যে হারুকে প্রদক্ষিণ করলেন। যেন হারু ওঁর সন্তান। অথবা হারু তাঁর এক অন্য জীবনের প্রতীক। হারুকে দেখলে ওঁর মন অযথা খুশির ইচ্ছায় উদার হতে থাকে। তখন বাঁচার ইচ্ছা তীব্র হয়। তখন পৃথিবীর কুটোগাছটা পর্যন্ত অর্থবহ মনে হয়। তখন চটান ছেড়ে চলে গিয়ে অন্য পৃথিবীর মানুষ হয়ে বাঁচতে ইচ্ছা হয়। মৃত্যু—নরক এবং যন্ত্রণার প্রতীক।

যে ভোরে তিনি এমনসব ভাবছিলেন, সে রাতেই ঘটনাটা ঘটল। দুঃখবাবু ঘরে ফিরে গেছেন। কাকপক্ষীর কোনো সাড়া নেই চটানে। মদ খেয়ে হল্লা করছে কেউ। রাত না নামতেই চটানটা নিঝুম হয়ে গেছে, কেমন ফাঁকা ফাঁকা কেমন নিঃসঙ্গ। নেলি সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে মাচানে। গঙ্গা—যমুনা, নিচে ঘুমিয়ে আছে। হারু অন্য পাশটায় উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘাটোয়ারিবাবুর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না বলে তিনি সকাল সকাল শুয়ে পড়েছেন। ঘাটে কোনো মড়া জ্বলছে না। ওপারে রেলের শব্দ পর্যন্ত সে রাতে ওঠেনি। ট্রেনটা যেন কোথাও আটকে আছে। অথবা কোথাও আটকে গর্জাচ্ছে, ফুঁসছে। রাতের ঘন আঁধারে লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর দূত যেন পায়চারি করে বেড়াচ্ছে চটানে। লক্ষ লক্ষ প্রেতাত্মা যেন উড়ছে চটানের উপর।

গেরু দরজা দিয়ে বের হবার সময় শনিয়া হাত টেনে ধরল—তু না যাস গেরু। হামার কীরা। তু না যাস। ও কাম করতে হবে না। হামি উপুস করবে, মরবে লেকিন তু এ কাম না করবি।

গেরুর চোখ দুটো জ্বলছে! হিংস্র এবং অমানুষের মতো লাগছে গেরুকে দেখতে। সে বলল, তু হাত ছেড়ে কথা বুল মাগি। তু জায়দা ঢঙ মাত দেখা আভি। হামি এক রাতে জরুর ফিরে আওগে। তু হাম কাঁহা ভি চল যাউগে। বলে গেরু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিল! কৈ আদমি তুকে কিছু বুলে তো তু বুলবি হামি না জানে ও কাঁহা গেছে! এ বাত তু মনে রাখিব। লয়তো তু ভি খুন হো যাবি চটানে—বুলে দিলাম।

তারপরই গেরু চটানে নেমে কেমন হিহি করে কাঁপতে থাকল। বড় শীত করছে। হাত পা শিথিল। চটানে নেমে ওর মনে হচ্ছে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। প্রথম রাতে মড়া তুলতে গিয়ে ফরাসডাঙায় যেমন তার হয়েছিল চোখে—মুখে, মনে সে ভাবটা হুবহু কাজ করছে এখন। মনে হচ্ছে দূরে কেউ যেন শোকের কান্না কাঁদছে। গলা টিপে ধরলে যে শব্দটা গলা থেকে বের হয়—সে শব্দটা কাছাকাছি কোথাও উঠেছে। অথবা কোনো মানুষকে জলের নিচে শ্বাস বন্ধ করে মারলে ফুসফুসের রংটা যা হয়, ওর চোখে সেই রং। সে নিশ্বাস নিতে পারছে না। সে যেন মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তবু তবু সে যাচ্ছে। তবু তবু সে হাঁটছে। কোমরে চাদর বাঁধল গেরু, গামছা দিয়ে মাথাটা পেঁচিয়ে নিল। তারপর কিম্ভূতকিমাকার মানুষ হয়ে একটা ভয়ংকর শ্বাপদের মতো চটানে হামাগুড়ি দিতে থাকল। আঁধারে গেরুকে আর দেখা যাচ্ছে না। গেরু হাঁটছে—হাঁটছে।

দরজায় জবুথবু হয়ে শনিয়া দাঁড়িয়ে আছে। ওর ইচ্ছা হল চিৎকার করতে। ইচ্ছা হল বলতে, গেরু তু না যাস। গেরু তু খুন মতো কর। হামি তুর সাথে যাবে, তুর সুবিধা অসুবিধা দেখবে। কিন্তু গেরুকে তখন দেখা যাচ্ছে না। নেলির ঘরেও কোনো চিৎকার উঠছে না। সে দরজায় দাঁড়িয়ে হারু কিংবা নেলির চিৎকার শোনার অপেক্ষায় রইল।

নেলি যদি মাচানে জেগে থাকত, সে দেখতে পেত, দুটো ভয়ংকর হিংস্র হাত ওর মাচানের ওপর এগিয়ে আসছে। সে দেখতে পেত, গঙ্গা—যমুনা চোখ তুলে তাকিয়ে পরিচিত জন বলে কিছু বলছে না। গেরু প্রথমে গঙ্গা—যমুনাকে আদর করল। দুটো মুড়ি দিল খেতে। শেষ মাচানের ওপর ঝুঁকে ঘুমন্ত হারুকে কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে চটান থেকে ভালোমানুষের মতো নেমে গেল। হারুকে নিয়ে যেন বেড়াতে যাচ্ছে এমন ভাব গেরুর।

সকলে তখন ঘুমোচ্ছে চটানে। কেবল শনিয়া ঘটনার সাক্ষী হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। অথচ বাচ্চাটা একবারও কেঁদে উঠল না। সে বিস্মিত হয়ে কেবল দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল। গেরু কোনো পথ ধরে চটান থেকে নেমে যাচ্ছে দরজায় দাঁড়িয়ে সে তা ধরতে পারছে।

গেরু চটান থেকে ছুটতে থাকল। কার্তিক মাস শেষ হয়ে আসছে। কার্তিক মাসের রাত্রি। নদী এখন অনেক নিচে নেমে গেছে। সে নদীর পাড় ধরে ছুটল। হারু ভয়ে এখন চিৎকার করলেও চটানের কেউ শুনতে পাবে না। ঘাসের ওপর শিশির পড়েছে। সে শিশির মাড়িয়ে চলল। রাতের কোনো পাখি ঝোপে জঙ্গলে ডাকছে না। ওপারে ট্রেনের শব্দ নেই অথবা আলো এসে পড়ছে না। সুতরাং সে ছুটতে থাকল। চোরের মতো নদীর পাড়ের দিকে ছুটছে।

সহসা কোনো প্রবল ঝাঁকুনিতে হারুর ঘুম ভেঙে গেল! সে ভয় পেল। সে দেখল আঁধারে কে যেন ওকে মাটি থেকে তুলে নিচ্ছে। কে যেন ফের ওকে নিয়ে ছুটছে। সে এবার কেঁদে উঠল। সে জোরে কাঁদতে থাকল।

গেরু ওর কান্না শুনে থামল। মুখের কাছে মুখ এনে বলল, তু চিনতে লারছিস। হামি তুর গেউ চাচা। তুকে নিয়ে হাম মেমান বাড়ি যাচ্ছে। তু রোনেসে আদমি লোক আচ্ছা না বুলবে হারুয়া।

গেরুকে চিনতে পেয়ে হারু নির্ভয় হতে পারছে। কার্তিক মাসের রাত। শীত শীত করছে হারুর। সে গেরুর শরীর জড়িয়ে থাকল। শরীরের উত্তাপ নিতে চাইল। বলল, গেউ চাচা মায়ী যাব। তু—উ মায়ী যাবি না? টু...প...লে...না।

হে, যাবে। জরুর যাবে। তুর মাইকা পাশ জরুর যাবে। লেকিন আভি কথা বুলে না। বাপ ত আচ্ছা আছে।
গেরু যত হারুর সাথে কথা বলছে তত যেন ওর ভয় বাড়ছে। সে চলতে চলতে ভাবল ফরাসডাঙায় জঙ্গলে পোড়া বাড়িটাতে রাত কাটাবে। হারুর শরীরটা চাদরে পেঁচিয়ে ভাঙা পাঁচিলের আঁধারে ফেলে রাখবে। ভোররাতের দিকে কাঁঠাল গাছটার নিচে পুঁতে দেবে। তারপর সে কিছুদিন এধার ওধার করে বেড়াবে। কিছুদিন জল ঢালবে হারুর শরীরটার উপর। হারুর শরীর পচিয়ে বাঁ হাতের হাড় সংগ্রহ করবে। হাড়টা গঙ্গা জলে শুদ্ধ করে শ্মশানে কালীর পুজো দেবে একটা। শেষে সে বের হয়ে পড়বে। গাছগাছালি নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। সঙ্গে শনিয়া থাকবে, বাচ্চাটা থাকবে। বাচ্চাটা বাপ বলে ডাকবে। গেরু বলবে, শিখে লে শালা, এর নাম জীবন হাড়। এ হাড় দু—শ পচিশ দফে বেইমান মানুষের কাজে লাগে। জড়িবুটি, দ্রব্যগুণ, মন্তর—তন্তর এ সবের জেরাছে কারবার।

হারু গেরুর কাঁধে হাত—পা নেড়ে এখন খেলছে। অজস্র কথা বলছে। গেরু চাচার সঙ্গে ঘুরতে পেরে হারুর এ আঁধার খুব ভালো লাগছে। অন্য দিনের মতো বুকের ওপর হারু পা দুটো নাচাল। দোলাল। হাত তুলে আকাশের ছোট চাঁদকে ডাকল। গেরুর কপালে টিপ দিল। হাসল। সে অজস্র রকমের কথা বলে গেরুকে অন্যমনস্ক করতে চাইছে। সে ডাকল, গেউ চাচা...উ....উ....আ....আ। দূরে শেয়াল ডাকে। সে বলে বা...যা...জি...ভি। ..জু...জু। গে...উ চা...চা। পু....পু। হারু যেন এই কাক জ্যোৎস্নায় মেমান বাড়িই যাচ্ছে। কোনো ভয়ডর অথবা শঙ্কা জাগছে না। কোনো সংশয় জন্মাচ্ছে না। গেরু চলতে চলতে দেখল রাজ্যের সব ভয় ওকে এসে জড়িয়ে ধরেছে। হারুই যেন গেরুকে নিয়ে যাচ্ছে জলে ডুবিয়ে মারার জন্যে। গেরুর হাত কাঁপছে। পা কাঁপছে। হারু যত ঘাড়ে বসে রাজ্যের কথা বলে যাচ্ছে, তত গেরু বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে। বিরক্ত হয়ে পড়ছে। হারুর সরল কথাবার্তায় গলা শুকিয়ে উঠছে গেরুর। সে এগোতে পারছে না। এগোতে কষ্ট হচ্ছে। ইচ্ছা হচ্ছে এক্ষুনি হারুকে মাটিতে আছড়ে অথবা গলা টিপে মেরে ফেলতে, কিন্তু সেই শরীর থেকে জীয়ন হাড় পাবে না ভেবে সে বিরক্তিতে চিৎকার করে ওঠে, হারু তু থাম, তু থাম। সে চোখ মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ে। হারু পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গেরুকে এভাবে বসে থাকতে দেখে সে চুল ধরে টানতে থাকে। গেরুর মুখ দেখতে চায়। মুখ দেখে বলতে চায় গে...উ...চা...চা...তু...ভা...ল। হামি...ভা...ল। না...গে...উ....চা...চা।

হারুর মুখের দিকে চেয়ে গেরু ফের চিৎকার করে উঠল, তু থাম! তু থাম? গেরু কী ভেবে হারুকে কোলে তুলে নদীর দিকে নেমে যেতে থাকে। বেশি দেরি করলে সে যেন ধরা পড়বে। বেশি দেরি করলে সে নিজেই খুন হয়ে যাবে। সে ছুটে ছুটে নদীর দিকে নেমে যেতে থাকে, আর বলতে থাকে, তু থাম।

গেরু জোরে ধমক দেওয়ায় হারুর কেমন অভিমান হল। গেউ চাচা ওকে বকছে। হারুর অভিমান বাড়ছে। সে মুখ ফিরিয়ে রাখে। সে কথা বলে না। ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে চায়। গেরু অন্যদিনের মতো বলতে পারছে না, আয় বাপ তুকে কিছু না বুলবে। সে বলতে পারল না, অথচ ওর কষ্ট হতে থাকল। জলের দিকে সে যত নেমে যাচ্ছে কষ্টটা যেন তত বাড়ছে। তত আগেকার কথা নদীর ভরা বর্ষার কথা, একটি বিস্কুটের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যত এই সব মনে হয় ততই সে জোরে ছুটতে থাকে। সত্বর সে ওকে জলে চুবিয়ে নিশ্বাসটা বন্ধ করে দিতে চায়।

গেরু কোমর জলে গিয়ে নামল। সে বুঝতে পারছে হারু তেমনি ওর কোলে অভিমান ভরে মুখ ফিরিয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে সোহাগ না করলে, ভালোবেসে কথা না বললে সে মুখ ফেরাবে না। সে যে কী করে! সে বুকের ওপর থেকে হারুকে জলের কাছে কাছে নামিয়ে আনল। ধীরে ধীরে জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। হারুর পা দুটো জলে নেমে যাচ্ছে। হারু কিছু বলছে না। প্রচণ্ড অভিমানে সে এখনও মুখ ঘুরিয়ে আছে। অভিমানে হারুর মুখ থমথম করছে। দু চোখে জলের ধারা নামছে। জ্যোৎস্নায় চকচক করছে কিন্তু কোনো ভয় নেই শঙ্কা নেই। অভিমানে চোখ ফেটে হারুর জল বের হয়ে আসছে। ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে অথচ কাঁদছে না। দুজনের ছায়া গেরু জলে দেখতে পায়। আর তখনই গেরুর মধ্যে কী যে হয়ে যায়। জগৎ সংসার এবং

পৃথিবী বড়ই ভালোবাসার। ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আকাশের আলো, বালিয়াড়ির সাদা রঙ, একটি বিস্কুটের স্মৃতি এবং হারুর এই অবোধ অভিমান গেরুর মনে প্রচণ্ড ঝড় তুলেছে। সে যত ওকে জলে ডুবিয়ে দিতে চাইছে, তত যেন সে ওকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবেসে ফেলছে। সে যেন দেখছে—নেলির দুটো ভিজে চোখ বলছে, হামার সাত রাজার ধনকে তু খুন না করিস। এবং তখনই দেখল হারু ওর দিকে চেয়ে হাসছে। ফের হাজার রকমের কথা বলছে, গেরু—চা—চা—তু—হামারে চু—উ—না—দিবি।

গেরু নিজেকে আর কঠিন কঠোর করে রাখতে পারে না। সে আর নৃশংস হতে চায় না। সে বরফের মতো গলে গলে পড়ে। কোমর জলে হারুকে বুকে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর পায়ের কাছে দুটো মাছ নড়ছে। জল কাঁপছে, ওদের ছায়া দুটো কাঁপছে। আকাশের একটুকরো চাঁদ তখন নদীর পাড়ে গাছের ছায়ায় নেমে যাচ্ছে। ধরণি শান্ত। কোথাও কোনো ভয়—ভীতির চিহ্ন নেই। কোথাও কোনো সংশয় নেই। সন্দেহ নেই। গেরুর হাত—পা এখন কাঁপছে না। সে ধীরে ধীরে বালিয়াড়ি ভেঙে ওপর উঠল।

হারু ফের বলে, তু—চু—উ—দে চাচা।

জরুর দেবে। হামি তুরে চুমু না দেবে ত কোনো দেবে? হারুর কপালে গেরু চুমু খেল। যেমন করে রোজ গালটা মুখটা ওর নরম গালে ঘষে দিত আজও তেমনি ঘষে দিল। গেরু সুখ পেল, আনন্দ পেল। হাকিমি দানরির কথা ভুলে গেল। ভুলে গেল সে আজ দুদিন ধরে ভুখা আছে। সে ভুলে গেল হারুকে কিছুক্ষণ আগেও সে খুন করার কথা ভেবেছে। ওর শরীরে মনে যে অস্বস্তি এতক্ষণ হচ্ছিল, পাড়ে উঠে সব কেমন উবে গেল, নিঃশেষ হয়ে গেল।

একদল বাদুড় উড়ে গেল নদীর অন্য পারে। কিছু শেয়াল ডাকে ডহরের পারে। খানা—খন্দে, ঝোপ—জঙ্গলে পাখিরা সব প্রহরে প্রহরে ডাকছে। ধীরে ধীরে গেরু বালিয়াড়ি ভাঙে। পায়ের ছাপ পড়ছে বালিয়াড়িতে। সে হেঁটে যাচ্ছে। কাঁধে হারু হাজার রকমের কথা বলে খুশি হচ্ছে।

ধীরে ধীরে গেরু চটানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে শ্মশানটার কাছে এসে দেখল চালাঘরে চার—পাঁচটা লোক বসে বিড়ি টানছে। চালাঘরটার পাশেই মড়াটা রাখা রয়েছে। শিয়রে হারিকেন জ্বলছে। মড়াটা চাদরের নিচে থেকেই ফুলে ফেঁপে উঠেছে। গেরু মড়াটা দেখে ধরতে পারল গন্ধ নিয়ে ধরতে পারল—মড়াটা পচে গেছে। সে দাঁড়াল মড়াটার কাছে। লোকগুলো কিছু বলছে না। ওরা জানে গেরু চটানের লোক। ওরা এখানে আরও কতবার মড়া বেচে অথবা পুড়িয়ে চলে গেছে। গেরু ওদের চিনতে পারল। গেরু ওদের মতো করে কথা বলল।—গেল সালে তোমরা এয়েছিলে নাকো মোড়লের বেটা?

ভিতর থেকে বুড়ো লোকটা উত্তর করল, হ্যাঁ এয়েছিলাম বটে। তুর বাপ বেঁচে নেই। এখন আর আমাদের কে চিনবে!

গেরু বলল, না চিনলে চলবে কেন? না চিনলে বললাম কী করে তুমরা গেল সালে এসেছিলে!

বুড়ো লোকটা জবাব দিচ্ছে।—গেল সালের মড়াটা তো পুড়িয়েই যেতে হলরে বাপু। তুই চিনতে পেরেই আর কতটা উপকার করলি।

গেরু বুঝল ওরা মড়াটা বিক্রি করতে চায়। বুঝল, ওরা বিশ ক্রোশ, পঁচিশ ক্রোশ পথ ভেঙে মড়াটাকে গঙ্গা পাইয়ে দিতে এসেছে। গঙ্গার জলে চুবিয়ে মড়াটা ইচ্ছে করলে ওরা বিক্রি করতে পারে। ইচ্ছে করলে এমনি দিয়ে যেতে পারে। ইচ্ছে করলে কাঠের পয়সায়, ঘাটের পয়সায় ওরা ফুর্তি করতে পারে। গেরু জানে, কৈলাস বেঁচে থাকলে মড়াটা নিয়ে নিত বাবুকে বলে। বাবু রসিদ লিখতেন অথচ কাঠ পুড়ত না। অথচ টাকা পেতেন কিছু, ওদের কাঠের দাম লাগত না। ঘাটের দাম লাগত না। সে পয়সায় নিমা বাগদীর লোকেরা মদ খেত, ফুর্তি করত। গাঁজাভাঙ খেয়ে পাশের একটা বস্তিতে উলঙ্গ হয়ে নাচত।

গেরু বলল, মড়াটা আমি নিলে দেবে আমাকে?

নিবি তুই! নিলে দুর্ভোগ পোহাতে হয় না।

গেরু বলল, তবে জলদি হারিকেনের আলোটা নিভিয়ে দাও। বালিয়াড়িতে নেমে চুপচাপ বসে থাকো।

দুদিন খেতে না পেয়ে গেরুর মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল। মড়াটা পাবে ভেবে শুকনো মুখটা ফের খুশিতে ভরে উঠল। সে হারুকে কাঁধে নিয়ে তাড়াতাড়ি চটানে উঠে যাচ্ছিল। এমন সময়ে ঘাটোয়ারিবাবু ডাকলেন কে যায়?

হামি গেরু আছে বাবু।

কোথায় গেছিলি নেলির বাচ্চাকে নিয়ে?

নদীর ধারে বাবু।

নদীর ধারে গেছিলি। কেমন সন্দেহের গলায় বললেন ঘাটোয়ারিবাবু।

হে বাবু নদীর ধারে। দুরোজ ভুখা থেকে নিদ নেই আতে বাবু! গেরু মনে মনে খুব খুশি হচ্ছে। খুব বুদ্ধি করে কথাটা বলতে পেরেছে ভেবে সে খুব খুশি। ও পা বাড়ায় চটানের দিকে।

ঘাটোয়ারিবাবু আবার ডাকলেন, যাস না কথা আছে।

গেরু বলল, থোড়া বাদ আসছে বাবু। সে হারুকে নেলির পাশে রাখতে যাচ্ছে।

ঘাটবাবু শিবরাম ঘোষ জানালায় বসে অপেক্ষা করলেন। দেয়ালে হারিকেনটা নিবু নিবু হয়ে জ্বলছে। দুঃখবাবু বিকেলে ছেলেপিলের গল্প করে গেছেন। গল্পগুলো এত ভালো লেগেছিল যে তিনি চটানে বসে থাকতে পারেননি—তিনি দুঃখবাবুর সঙ্গে শহর পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলেন। দুটো কমলালেবু কিনে দিয়ে বলেছিলেন, ওদের দেবেন। বলবেন, তোদের জ্যাঠামশাই দিয়েছে।

তিনি বসে বসে এমন সবই ভাবছিলেন। ভাবছিলেন হয়তো দুঃখবাবু ওর দেওয়া কমলালেবু দুটো ওদের হাতে দিয়েছেন। ওরা খুশি হয়েছে। হয়তো দুঃখবাবুর স্ত্রী বলেছেন একবার নিয়ে এসো না ওনাকে। একদিন এখানে দুটো খাবেন। অথচ তিনি ধরতে পারলেন না কখন হারুকে চুরি করার মতলবে গেরু নেলির ঘরে ঢুকছে, কখন সে নেমে গেছে নদীতে। তিনি ভাবলেন, এই গেরুকে একটু বকতে হবে। গেরুকে সাবধান করে দিতে হবে। তিনি গেরুর অপেক্ষাতে জানালার ধারে বসে থাকেন।

বাবু।

গেরু বুঝি এল। তিনি চোখ তুললেন।

কে? অঃ গেরু—আয়।

গেরুকে পাশে বসতে বলে বললেন, তুই নেলির বাচ্চাকে নিয়ে যখন তখন চটান থেকে নেমে যাবি না।

যাবে না বাবু।

তুই মনে করবি না আমি কিছুই টের করতে পারি না।

গেরু চুপ করে থাকে। ঘাটোয়ারিবাবুর পায়ের কাছে বসে মুখ নিচু করে থাকে।

তুই মনে করবি না তোর চালাকি কেউ টের পায়নি।

গেরু এবার মুখ তুলে বাবুর দিকে তাকায়।

তুই মনে করবি না বাচ্চাটা শুধু নেলির, বাচ্চাটা আমার। ওটা আমার পায়ের কাছে মানুষ। ওর শরীরে আমার রক্ত না থাকতে পারে। কিন্তু আমার ভালোবাসা আছে। বলতে বলতে সহসা চুপ করে যান। জানালা দিয়ে অন্ধকার দেখতে দেখতে উদাসীন হয়ে যান।

বাবু!

বল।

বাবু একটা কথা বললে রাগ করে লিবেন না?

কী কথা বুলবি?

বাবু একটা মড়া এয়েছে ঘাটে। নিমা বাগদীর মড়া। ঠিক করে বুললে আপনি হয়তো চিনে লিবেন। সাঁইথিয়ার নিমা বাগদী। মড়া বেচে আদমীটা মদ খায়। আপনি জরুর চিনে লিবেন। ও হামারে মড়াটা দিয়ে

দিতে চায়। বুলে দিন না বাবু। গেরু বাবুর পায়ের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। পা দুটো ছুঁতে চাইল। চোখ দুটো ফের নরম করে ডাকল, বাবু।

ঘাটোয়ারিবাবু একটু সরে বসলেন—এ কী হচ্ছে। তুই অসময়ে আমার পা ছুঁবি না।

গেরু যথার্থই আর ছোঁয়ার চেষ্টা করল না। চোখ দুটো ভারী করে বলল, দুরোজ ভুখা আছে বাবু। দু রোজ দানা—পানি কিছু পড়ছে না পেটে। ঠাকুর ভি ধারে দিচ্ছে না। বৌটা না খেয়ে মরে যাবেক বাবু।

ঘাটোয়ারিবাবু চোখদুটো উদাসীনের মতো করে রাখলেন। গেরুর কথা তিনি যেন শুনতে পাচ্ছেন না।

গেরু দুটো হাত মেঝের ওপর রাখে। হাত দেখানোর মতো করে রাখে। বলে, বাবু আপনি চটানের মা—বাপ।

ঘাটোয়ারিবাবুর চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। চোখের মণি দুটো ঘুরতে থাকল যেন। ভাগ, ভাগ। শালা ভাগ। তিনি খিস্তি করতে আরম্ভ করলেন। আমি মা—বাপ! ছেলেপুলে নেই, ঘরসংসার বলতে কিছু নেই—আমি চটানের মা—বাপ? আমি মরলে তোরা কখনও কাঁদবি? তোরা চোখের জল ফেলবি? তোদের পাষাণ আত্মা আমার জন্য চোখের জল ফেলবে? শোক করবে? ঘাটোয়ারিবাবু কথাগুলো বলতে বলতে গভীর বেদনায় ভেঙে পড়লেন। গেরু মাথা নিচু করে যেমন বসেছিল, তেমনি বসে থাকে।

ঘাটোয়ারিবাবু রামায়ণ মহাভারত দুটো ঠেলে দিয়ে কাউন্টারটা খুলে দিলেন। লোকগুলো এখনও আসছে না—তিনি বিরক্ত হচ্ছেন। তিনি মড়ার নামধাম রেজেস্ট্রি খাতায় তুলে শুয়ে পড়বেন। আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না। জেগে থাকতে ভালো লাগছে না। গেরুকে উঠতে না দেখে বললেন, টাকা চাই? টাকা—নেবার সময় ত মনে থাকে না!

গেরু ডোম চোখ তুলল না। বাবুর পায়ের ওপর চোখ রেখেই বলল টাকা হামার লাগে না বাবু! আপনি কত দিয়ে লিবেন?

তবে কী চাই! কী চাইরে কৈলাসের ছা! নেমকহারাম পাষণ্ড! আমি কী দিতে পারি তোকে!

বাবু আপনি ইচ্ছা করলে সব দিতে পারেন। মড়াটা ফুলে—ফেঁপে গেছে বাবু। মড়াটা হামারে দিয়ে দিতে চায় বাবু। আপ বুলেন ত হামি লিয়ে লি। লয়ত হাম মরবে, বিবিটা ভি মরবে বাচ্চাটা ভি মরবে।

ঘাটোয়ারিবাবুর মনে হল তিনি ভুল শুনেছেন। মনে হল গেরু ওর সঙ্গে মস্করা করছে। অথবা তঞ্চকতা করছে।

গেরু ফের বলে, হামার বাচ্চাটা ভি মরবে বাবু!

তোরও বাচ্চা হল রে গেরু। গেরুর বাচ্চা হবে জেনে তিনি চেয়ারে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি ঘরের ভিতরেই দ্রুত পায়চারি করতে থাকলেন। একবার ঘাটের দিকে, একবার চটানের দিকে মুখ ফেরাতে থাকলেন। রাত বাড়ছে তখন। রাত ঘন হচ্ছে। দূরে কোনো পুরনো অশ্বত্থের ছায়ায় ঘাসের নিচে প্রজাপতিরা ডিম পারছে যেন! ডিমের উত্তাপ এ শরীরে এসে তা দিচ্ছে। তিনি এখানে দাঁড়িয়ে হরিণ—হরিণীর জলপান করার শব্দ পেলেন। তারপর দেখতে পেলেন ওরা সব গভীর অরণ্য হয়ে গেছে। গভীর অরণ্যে ঐসব হরিণেরা ভালোবাসার চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। যেন কোনো নীহারিকার অতীত থেকে এ বর্তমান শুধু চিহ্ন রেখে যাওয়া। ডিম পেড়ে যাওয়া—হরিণেরাও ডিম পাড়ে—এমন ভাবতেই ঘাটোয়ারিবাবুর ভালো লাগছে। কালের অবক্ষয়ে ইচ্ছার জন্মকে তিনি কোনো সুখী পরিবারে আটকে রাখতে পারলেন না। তিনি শুধু জেনেছিলেন মৃত্যু—মৃত্যুই সব। মৃত্যুর কড়া—ক্রান্তির হিসাবে তিনি কেমন অবিশ্বাস্যভাবে এতদিন এই চটানে...একটা চটানে—বাঁজা হরিণ হয়ে ছুটেছিলেন। গেরুর বাচ্চা হবে জেনে এ সময় হরীতকীকে কাছে পেতে খুব ইচ্ছা হল। একটা বাঁজা হরিণের মতো না বেঁচে একটা ফলন্ত হরিণের মতো বাঁচতে ইচ্ছা হল ওঁর।

ঘাটোয়ারিবাবু জানালার পাশে দাঁড়ালেন। জানালা ধরে অন্ধকার গলে গলে পড়ছে। গেরু পাশে চুপচাপ অপরাধীর মতো বসে আছে। বাবুর ইচ্ছা হচ্ছে না গেরুর চোখে—মুখে ডিম পাড়ার আনন্দ চিহ্ন থাকুক।

ইচ্ছা হচ্ছে না চটানে গেরু বাপ হোক। তিনি বিদ্রূপ করে বললেন, তাহলে তুইও বাপ হলিরে গেরু!

বাবুর কথা শুনে গেরু লজ্জা পেল। সে কোনোরকমে বলে, জী বাবু হামি বাপ হবে।—বাবু তিন দিন হোবে মানুষটা মরল।

ঘাটোয়ারিবাবু নিমা বাগদীকে চেনেন। নিমা বাগদীর দল আছে একটা। ওরা দেশ—দেশান্তরের মড়া পুড়িয়ে বেড়ায়। মড়াকে গঙ্গা পাইয়ে দেয়। দূর দূর গাঁয়ের মড়া নিয়ে সে ঘাটে আসে! দূর থেকে এলে মড়াগুলো ফুলে—ফেঁপে ওঠে। কৈলাস থাকলে সে ব্যবস্থা করত ওদের। পোড়ানোর কাঠ লাগত না। ওদের কাঠের পয়সা বাঁচত, ঘাটবাবুর কাঠ বাঁচত। কৈলাসের থাকত কঙ্কালটা। কৈলাস কঙ্কালের পয়সার ভাগ দিত বাবুকে। নিমা বাগদীর অনেকদিন দেখা নেই। তিনি ভেবেছিলেন নিমা বুঝি মরেছে।

গেরু বাপের মতো শরীর টেনে বলল, বাবু আপনার ভি কুছু হোবে। হামার ভি কুছু হোবে।

ঘাটোয়ারিবাবু কী ভেবে একবার গেরুর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, তা হয় না। দশমাসের আগের মানুষটা আমার বেঁচে নেই। মানুষটাকে পোড়ানো হবে না, সে টাকায় ওরা মদ খাবে। আমার কাঠ বাঁচাবে, দু পয়সা হবে? এসব আমার ভালো লাগে না। ঘাটোয়ারিবাবু ফের চেয়ার টেনে নেন। জানালায় ঝুঁকে পড়েন। কী ভেবে গেরুকে কাছে ডেকে বলেন, তুই যা। মড়াটা পাবি না। মরা মানুষকে ঠকাতে আমার ভয় করছে গেরু।

গেরুকে উঠতে না দেখে তিনি ফের প্রশ্ন করেন, বাচ্চাটার কী নাম রাখবি?

বাচ্চাটা না হতে বিবিটা যে মরে যাবে গ।

ঘাটোয়ারিবাবু যেন সব ভুলে গেছেন এমন ভাব দেখিয়ে বলেন, কেন, কেন? কেন মরবে বিবিটা?

ভুখা থেকে। সে বাত ত বুলছি বাবু।

এ সময় ঘাটোয়ারিবাবুর ইচ্ছা হল বিবিটা ওর মরুক। চটানের সব মরুক। মরে মরে সব সাফ হয়ে যাক। এত মড়া দেখেছেন, আর একটা মড়া দেখতে ক্ষতি কি। তিনি এবারেও বলেন, তুই যেতে পারিস গেরু। মড়া আমি তোকে দিতে পারব না। সারাজীবন তাজা মানুষকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে এখন মরা মানুষকে ঠকাতে ভয় করছে।

গেরু শেষবারের মতো চেষ্টা করল, বাবু একটা মরা মানুষ পেলে দুটো জেতা মানুষ বাঁচে।

তুই আর তোর বিবির কথা বলছিস?

জী না। বিবি—বাচ্চাটার কথা বুলছি। বাবু হামার বাচ্চা হবে, ওয়ারে মেরে লিবেন না! হামার বাচ্চা—বড় সাধের, বড় শখের। থোড়া মেহেরবানি করেন। আপ মা—বাপ আছে। গেরু ঘাটোয়ারিবাবুর পা জড়িয়ে কাঁদতে থাকে।

আমি তোর বাচ্চাকে মেরে ফেলব! খুন করব বলছিস?

জী বাবু!

ঠিক বলছিস তুই?

জী ঠিক। আপ দয়া করেন বাবু।

নিমা বাগদী আকন্দ গাছটার নিচে সব শুনছে।

হরীতকী অফিসঘরে গেরুর কথা শুনতে পেল। এত রাতে গেরু বাবুর ঘরে কেন? সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকে।

গেরু বলে উঠল, বাবু?

ঘাটোয়ারিবাবু অন্যমনস্কভাবে জবাব দেন, ওঠ! যা! মড়াটা নিয়ে পুঁতে দে গিয়ে। তোর বাচ্চাটা তো বাঁচুক আগে। পাপ পুণ্যের কথা পরে ভেবে দেখব।

গেরু ডোম বের হয়ে গেল। নিমা বাগদী ঢুকল। গড় হলে ঘাটোয়ারিবাবু বললেন, এখনও তবে বেঁচে আছিস?

আছি বাবু। নিমা বাগদীও ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘাটোয়ারিবাবু জানালা থেকে এখন আকাশ দেখছেন।

দূরে পুরনো অশ্বত্থের ছায়ায় ঘাসের নিচে তেমনি প্রজাপতিরা ডিম পারছে। তিনি তার উত্তাপ পাচ্ছেন। গভীর অরণ্যে হরিণ—হরিণীরা তেমনি ছুটছে, ছুটবে। তিনি আকাশ দেখেন আর ভাবেন। তিনি যেন আজ প্রথম আকাশ দেখছেন। আকাশে কত নক্ষত্র, আকাশে কত আলো! কত আনন্দ! কত আনন্দ এই জীবনধারণে। তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে গভীর অনুতাপে পুড়তে থাকেন।

হরীতকী ঘরে ঢুকে দেখে বাবু জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছেন। সে ডাকে, বাবু।

ঘাটোয়ারিবাবু উত্তর দিতে পারেন না। তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে গভীর এক নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায় দুঃখ পান।

বাবু উত্তর দিচ্ছেন না দেখে হরীতকী বিস্মিত হয়। ডাকে, বাবু।

হরীতকী ফের ডাকে, বাবু! বাবু বাবু!—হরীতকী ডেকে সারা হতে থাকে। বাবু জানালা থেকে মুখ তোলেন না। একবার বললেন না—কেন ডাকছিস? হরীতকী জোর করে বাবুকে টেনে নেয় জানালা থেকে। দেখে বাবু কাঁদছে।

বাবু তুই কাঁদছিস?

ঘাটোয়ারিবাবু পাগলের মতো হরীতকীকে বুকে টেনে আনেন, যাবি, যাবি তুই? যেদিকে দু চোখ যায়—এ চটান ছেড়ে অন্য কোথাও?

হরীতকী হেসে গড়িয়ে পড়ল।—বাবু বুলছিস কী তুই? শেষ বয়সে সোয়ামী—বৌ হয়ে সং সাজতে ইচ্ছা তুর। হরীতকীর হাসি আর থামছে না। এর লাগি কাঁদছিস তু বাবু?

জীবনের এই সং সাজার রাজত্বে আজ মনে হল ঘাটোয়ারিবাবুর—নিজেও এখানে সং সেজে বসে আছেন। সং সাজার রাজত্বে দুঃখবাবু, গেরু ডোমের সং সাজার সার্থকতা আছে। কারণ তাদের পাত্রপাত্রীরা চোখের জল ফেলবে কিন্তু ঘাটোয়ারিবাবু সারা জীবন ধরে সং সেজে সেটুকু উপার্জন করতে পারেননি।

হরীতকীর হাত ধরে তিনি বললেন, আমি মরলে তুই কাঁদিস। তিনি ধীরে ধীরে তারপর চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন। হরীতকী চলে গেল। রামায়ণ মহাভারতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন তিনি। রাত বাড়ছে রাত হালকা হচ্ছে। এই ধরণির কোলে প্রজাপতিরা সব ডিম পারছে। তিনি চোখ বুজে থেকে কোনো এক গভীর অরণ্যে চলে যাচ্ছেন, ধরণির বিচিত্র রকমের জীবনধারণের সঙ্গে ঘাটোয়ারিবাবুর আবার সেই ইচ্ছাটা জন্মাল—

চটানে আবার ভোর হল। আবার রাত্রি হল। দিন রাত্রি যেতে মাস গেল। শীত এল, শীত গেল। গ্রীষ্ম এল। ঘাটোয়ারিবাবু চেয়ারটায় বসে রামায়ণ পড়তে পড়তে গরমে ছটফট করেন।

ঘন বৃষ্টি হয়েছিল যেমন দুদিন, আবার ঘন রোদ তেমনি দু—সপ্তাহ। দুপুরের দিকে আবার সেই গরম হাওয়াটাই উঠেছে। শিমুল গাছের নতুন পাতাগুলো পুরনো হচ্ছে। এখন একটা পাখি পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। এই ঘন রোদে কিছু লোক বাবলার বনে কাঠ কাটছে। নদী থেকে শেষ লোকটা স্নান করে উঠে গেল। দুজন লোক একটা লোককে আমকাঠে পুড়িয়ে শেষ বারের মতো 'হরিবোল' দিল। ঘাটোয়ারিবাবু জানালায় বসে সব দেখেন। জানালার একটা কপাট খোলা। ভিতর দিকের দরজা বন্ধ। অন্য জানালাটাও বন্ধ। গরম হাওয়াটা ঘরের ভিতর বেশি ঢুকতে পারছে না। গরম হাওয়াটা দরজায় কিংবা জানালায় আছড়ে পড়ে থমকে থাকছে। বাতাসের শব্দটা বিরক্ত করে মারে বাবুকে। তখন চটানের মেয়ে—মরদদের বলতে শোনেন, গেরুর ছেলে হল।

গেরুর ছেলে হওয়ার কথা শুনেই কেন জানি ঘাটোয়ারিবাবুর একটা পাখি দেখার শখ হল। এই ঘন রোদে পাখিরা উড়ছে না। ওরা কোথায় গেল জানার শখ হল। তিনি দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। দরজা বন্ধ করে শেকল তুলে দেন। তারপর ধীরে ধীরে পাখি দেখার জন্য চটান পার হয়ে অশ্বত্থ গাছটার নিচে

এসে দাঁড়ান। এখানে শুধু কাক। ওরা অধিকাংশ ডালে ডালে বসে আছে। মাত্র একটি কাক উড়ে উড়ে চিৎকার করছে।

তিনি অন্য পাখি দেখার ইচ্ছায় ক্রমশ অশ্বত্থ গাছ পেরিয়ে সরু একটা পথে নামলেন। রোদটা ঠিক কপালে এসে নামছে। সেই পথ ধরে যাওয়ায় কয়েকটা বুলবুল পাখি একটা ইষ্টিকুটুম পাখি ও গোটাদুই শালিক দেখতে পেলেন। তিনি এখানেও থামলেন না। পথটা ধরে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে আন্দাজ এক ক্রোশ পথ হবে, হেঁটে একটা আমকাঁঠালের বাগানে এসে বসেন। এখানে সব রকমের পাখিরা যেন বাস করে, এমন একটা ধারণা হল ঘাটোয়ারিবাবুর।

তিনি স্মৃতির ঘরে অনেকক্ষণ হেঁটে মনে করতে পারছেন না—একটা চালাঘর, কিছু কাঠ, কিছু মেয়ে—মরদ ভিন্ন তাঁর অন্য অস্তিত্ব আছে। তিনি ঘাসের ওপর বসে সেই স্মৃতিকে বারবার ঠেলে দিয়ে এই পৃথিবীকে দেখার জন্য চোখ খুললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এটা যেন দুঃখবাবুর সংসার। কিছু ছেলে, কিছু মেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে। কিছু পাখি দোল খাচ্ছে। খঞ্জনা পাখিরা ঘাসের ওপর শুয়ে শরীরের উত্তাপ কচি ঘাসে মিশিয়ে দিচ্ছে। ছেলেমেয়েরা কোঁচড়ে ভরে বাতাসে—ঝরা আম তুলে নিচ্ছে। হাওয়া, পাখি, ফুল, ফল ফুটফুটে ছেলের দল ঘাটোয়ারিবাবুকে বসতে দিল না। তিনি নিজেও কেমন যেন ওদের মতো ছোট হয়ে গেছেন। ধরণির এইসব বিচিত্র কচি কচি উপাদানগুলো যেন বলছে, তুমি আনন্দ কর, আনন্দ কর। তুমি ফুল ফোটাও। তুমি কঠিন হয়ে থেক না। তুমি পাষাণ হয়ে বেঁচ না। তিনি সেজন্য আজ ছুটতে চাইলেন। ছেলেমেয়েদের কোঁচড়ে কোঁচড়ে আম তুলে দিলেন। আর সকল পাখিদের ডেকে বলেন আমি আসব, আবার চলে আসব।

শেষে ঘাটোয়ারিবাবু দেখেন সন্ধ্যা হচ্ছে। সূর্য পাটে বসেছে। গাছে গাছে তার শেষ আলো। নিজেকে বিলিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। ছেলের দল, মেয়ের দল, এক দুই করে চলে যেতে থাকে। এক দুই করে পাখিরা কোনো আঁধারের আশ্রয়ে যেন হারিয়ে যেতে থাকে। নদীর পার ধরে ঘরে ফেরে এই ধরণির সব সুখী লোকেরা। দুঃখবাবুও হয়তো চটান ছেড়ে ঘরে চলেছেন। দুঃখবাবুর সাজানো সংসারের কথা জেনে আজ কেন জানি মনে হচ্ছে যদি তিনি গাছ, অথবা ফুল কী পাখি হয়ে বাঁচতে পারতেন। আর মনে হল ফুলের ভিতর সৌরভ আছে। সেই সৌরভ তার কানে কানে বলে গেল, ঘাটোয়ারিবাবু ফুল ফোটাও—ফুল ফোটাও। ঘাটোয়ারিবাবু, সুখ মেয়েতে—মদে নয়, রামায়ণ—মহাভারতেও নয়, সুখ সৌরভ ফুলের ভিতরে। ফুল ফোটার ভিতরে। তিনি এই প্রথম উপলব্ধি করলেন জীবন মৃত্যুর চেয়ে বড়। মৃত্যুকে উপেক্ষা করার জন্য তিনি শেষবারের মতো জীবনে ফুল ফোটাতে চাইলেন। তিনি গাছ—ফুল—পাখি হতে চাইলেন। কিন্তু হায় তখন তাঁর পারের কড়ি জমা পড়ে গেছে। তিনি গাছ, ফুল অথবা পাখি হতে পারলেন না। তিনি শুধু বসে বসে নিঃশেষে কাঁদলেন।

টুকুনের অসুখ

এক

খরা, প্রচণ্ড খরা। কবে কোন বছরে একবার বৃষ্টি হয়েছিল এ অঞ্চলে, কবে কোন বছরে সবুজ শ্যামল মাঠ ছিল এ অঞ্চলে—মানুষেরা তা যেন ভুলে গেছে। গ্রাম মাঠ খা খা করছে। নদী—নালা সব হেজে মজে গেছে। শুকনো বাতাস আর মাঠে মাঠে শুধু ধুলো উড়ছে।

ফাল্গুন মাস, বৃষ্টি হচ্ছে না। মনে হয় কোনোদিন আর বৃষ্টি হবে না। মাঠে শুধু ধুলো উড়ছিল। গোরু—বাছুর নিয়ে দেশ ছেড়ে মানুষেরা সব চলে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষের মতো। ধান—চাল নেই, মাঠে শস্য নেই। দু'সাল হল দুর্ভিক্ষের মতো চলছে।

গ্রামের পর গ্রাম মাঠের পর মাঠ সব জলবিহীন। নদী যেখানে গভীর ছিল সেখানে সামান্য মাটি খুঁড়ে গত সালেও জল পাওয়া যেত—এবার তাও নেই।

যা কিছু অবশিষ্ট মানুষ গ্রামে রয়েছে, নারী যুবক—যুবতী, ছেলে বুড়ো সকলে মাটি খুঁড়ছিল নদীর ভিতর। ভিতর থেকে যদি সামান্য পরিমাণ জল পাওয়া যায়। সামান্য জল পেলে ওরা সংরক্ষণ করে রাখবে। অন্তত আগামী বর্ষা পর্যন্ত ওরা সেই জল নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষটি সকলের আগে আগে কাজ করছিল। তার হাতে যেন গুপ্তধন আবিষ্কারের চাবিকাঠি। সে দাগ দিয়ে যাচ্ছিল লাঠি দিয়ে। বালির ওপর একটা করে গুপ্তচিহ্ন রেখে যাচ্ছে। আর প্রতিটি গুপ্তচিহ্ন প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাত দূরে, এঁকেবেঁকে গেছে অনেকটা সাপের মতো—কারণ কেউ জানে না নদী কোথায় অন্তঃসলিলা। এ নদী যদি মরে যায়, মানুষরা তবে সব মরে যাবে। ওদের হাতে সামান্য শস্য—দু'সাল আগের সামান্য শস্য—সঞ্চিত শস্য এখন প্রায় নিঃশেষ, তবু এই জল পেলে তৃষ্ণার হাত থেকে বাঁচবে, জল পেলে পাতা ঘাস এবং অন্য যা কিছু আছে এ অঞ্চলে, পাহাড়ে, ছোট পাহাড় অঞ্চলে এখনও যেসব লতাগুল্ম রয়েছে, তার শিকড়—বাকড় আছে, বনআলু রয়েছে, জল পেলে যে—কোনোভাবে সিদ্ধ করা যাবে, খাওয়া যাবে, খেলে পরে এ বর্ষাকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে।

এই মাটি, বাপ—পিতামহের মাটি। সোনার ফসল হত মাটিতে। সব ফসল হায় কোথায় এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। বৃদ্ধ লোকটির হাতে লাঠি। সে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। নদীর দু'ধারে ছোট ছোট পাহাড়। ঝরনার জল আর নামছে না। গাছে গাছে কোনো পাখির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেই যেন মন্বন্তরের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে।

বৃদ্ধ হেঁটে যাচ্ছেন, মাটিতে ক্রস চিহ্ন এঁকে দিচ্ছেন। একজন করে মানুষ কেউ চিহ্নের ওপর বসে পড়ছে মাটি খোঁড়ার জন্য। যেখানে জলের সন্ধান পাওয়া যাবে সেখানেই পরদিন জড়ো হবে সব অন্য মানুষেরা—সারাদিন খেটে জল বের করবে। নিজেরা জল ভরে রাখবে ঘড়াতে। জলের জন্য ওরা প্রায় মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

বৃদ্ধ মানুষটিকে মোজেসের মতো মনে হচ্ছিল। লম্বা আলখাল্লার মতো জামা গায়, পায়ে নাগরি জুতা, মাথায় ফেটি বাঁধা। উঁচু লম্বা মানুষ, চুল ছোট করে ছাঁটা, শক্ত চোয়াল মানুষটার। রোদে, জলে অথবা খরার সময়ে মুখে শক্ত সব রেখা—যেন দেখলেই মনে হয় মানুষটা আজ হোক কাল হোক এ অঞ্চলে জল নিয়ে আসবে।

গেরস্থের বউরা, বিবিরা, যুবক—যুবতীরা ছোট—বড় সকলে লম্বা লাইন দিয়ে এঁকেবেঁকে জলের জন্য মাটি খুঁড়তে বসে গেছে। বৃদ্ধ যেখানে পাহাড়ের ঢালু জায়গাটা ছিল, সেখানে উঠে দাঁড়ালে, পেছনে প্রায় দু—তিন মাইল পর্যন্ত শুধু নদীর বালি চোখে পড়ে—খরার জন্য, গ্রীষ্মের জন্য বালি চিকচিক করছিল। নদীটাকে এখন মরা একটা সাপ মনে হয়। আবার মনে হয়—চিত হয়ে আছে অজগরটা। এক লম্বা অজগর—দু—তিন মাইল লম্বা, চার মাইল লম্বা, আরও কত লম্বা হবে কে জানে। বালিয়াড়ি, দিগন্তের দিকে ছুটে গেছে—যেন নদীটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কারু জানা নেই।

পাহাড়ের পর পাহাড়, কোথাও সমতল মাঠ আবার পাহাড়, ছোট পাহাড়, কত রকমের লাল—নীল পাথর, পাহাড়ে কত রকমের গাছ—গাছালি, গুল্মলতা আর কত রকমের পাখি ছিল। সব পাখিরা উড়ে চলে গেছে। গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে। গাছগুলো মৃতের মতো পাহাড়ময় দাঁড়িয়ে—সমতলভূমিতে সব কুঁড়েঘর, খড়ের চাল। ঝোপে—জঙ্গলে শুধু শুকনো পাতার খস খস শব্দ। ঘাস আর নেই। মাটির নীচে ঘাসের শেকড় মরে যাচ্ছে। বৃদ্ধের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা।

ঠিক সামনেই বালুবেলাতে এই অঞ্চলের ছোট ছেলেটি বসে মাটি খুঁড়ছিল। বৃদ্ধ দেখল ছোট ছেলেটি সকলের শেষে মাটি খুঁড়তে বসেছে। ওর গায়ে লম্বা ঝুলের জামা। জামাটি ওর নয়, সুদিনে কী দুর্দিনে ওর বাবা হয়তো তৈরি করেছিল। পার্বণের দিনে ওর মা—বাপ একবার মেলায় গিয়েছিল এবং পরে, এই মাস দুই পরে হবে, ওলাওঠায় বাপ—মা দু'জনই গেছে। তখনও সামান্য জল ছিল পাতকুয়াতে, সামান্য জল তুলে রাখা যেত। এখন এই সামান্য বালকের হাতে একটা খুরপি। পিঠের নীচে বাঁশের এক হাত লম্বা একটা চোঙ। ভিতরে কিছু যত্ন করে রেখে দিয়েছে মনে হয়। বালিমাটি খোঁড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই লম্বা একটা চোঙ থেকে ম্যাজিকের মতো ছোট একটা পাখি বের করে আনছিল এবং বোধ হয় শুকনো বটফল খাওয়াচ্ছিল। সে, এই বালক কাজে ফাঁকি দিচ্ছে দেখে পাহাড়ের ঢালু থেকে হেঁকে উঠল—হেই সুবল।

দূরে দূরে এই হাঁক ভেসে যাচ্ছিল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হচ্ছিল।

সুবল তাড়াতাড়ি পাখিটাকে বাঁশের চোঙের ভেতর ভরে মুখটা সামান্য একটা ছোট্ট কাঠ দিয়ে ঢেকে দিল, তারপর আপন মনে এবং একনাগাড়ে সে মাটি খুঁড়তে থাকল। দলের লোকেরা মাটি খুঁড়ছে। ওদের কোচড়ে শুকনো চানা ছিল। ক্ষুধার জন্য ওরা শুকনো চানা চিবিয়ে খাচ্ছিল। শুকনো চানা গালে এবং দাঁতের ফাঁকে সাদা অথবা হলুদ রঙের ফেনা তুলছে। দেখলেই বোঝা যায় ওরা জলের বিনিময়ে নিজের রক্ত চুষে তৃষ্ণা নিবারণ করছে। মানুষগুলোর মুখ, যুবতীর মুখ, বউ—বিবিদের মুখ, মিঞা—মাতব্বরদের মুখ যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, বৃদ্ধের জন্য ওরা এখনও গ্রাম ছেড়ে পালায়নি, যেন এক বৃদ্ধ সকলকে আটকে রেখেছে। সকলকে বলছে—কোথাও না কোথাও নদীর অন্তঃস্তলে জল আছে, আমাদের এই জল অনুসন্ধান করে বের করতে হবে।

নদী অন্তঃসলিলা। বৃদ্ধ বড় একটা অর্জুন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ভাবল, নদী অন্তঃসলিলা। নদী কোথাও না কোথাও এইসব লোকালয়ের জন্য জল সঞ্চয় করে রেখে দিয়েছে। কী এমন পাপ ছিল, কী এমন জঘন্য অপরাধ ছিল মানুষের, যার জন্য হায়, ঈশ্বর বাধ সাধলেন। বৃদ্ধ ঈশ্বর বিশ্বাসী। ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি মানুষের দুঃখ অনন্তকাল ধরে সহ্য করেন না। তিনি নিশ্চয় সরল এবং গরিব এই মানুষগুলোর জন্য নদীর বালুগর্ভে জল সঞ্চয় করে রেখেছেন।

শুধু এখন প্রচেষ্টা। সমবেত প্রচেষ্টা। আজ প্রায় পনেরো দিন ধরে এই সমবেত প্রচেষ্টা—জলের জন্য সপ্তাহে যে মোষের গাড়ি তিনটি আসে, যারা জল আনতে বিশ ক্রোশ দূরে যায়—তাদেরও ক'দিন ধরে আর দেখা নেই। লোকগুলো জলের অভাবে মরে যাবে এবার।

শহর অনেক দূরে—শহরের দিকে যে গেছে সে আর ফেরেনি। ক্রমশ এক—দুই করে গ্রামের মানুষেরা সরে পড়ছে। বৃদ্ধের দু'চোখে জ্বালা এবং যন্ত্রণায় জ্বলছিল। মানুষগুলো বলে দিয়েছে আজই ওরা শেষ চেষ্টা করবে, জল না পেলে শহরের দিকে চলে যাবে। গ্রামে আর একজন মানুষও থাকবে না। মাঠ এবং নদী ভেঙে ওরা সকলে শহরের দিকে চলে যাবে।

দুপুর পর্যন্ত জল পাওয়া গেল না। বালিয়াড়ি তেতে উঠেছে। উত্তপ্ত এই বালিয়াড়িতে মানুষগুলো বসে থাকতে পারছিল না। ওরা বালি খুঁড়ে খুঁড়ে আট—দশ—বারো হাত পর্যন্ত গর্ত করে ফেলেছে, ভিতরে ঠান্ডা ভাব, অথচ জলের কোনো চিহ্ন নেই।

পাহাড়ের ওপারে রেললাইন। দুপুরের গাড়ি চলে যাচ্ছে। পাহাড় এবং মাঠ অথবা দিগন্তের ওপারে ওই রেলের হুইসল ওদের বুকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যেন। ওরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল—এই ট্রেনে উঠলে

অনেক দূরে এক শহর আছে, বড় শহর, বড় ইটের সব বাড়ি, আকাশ ছুঁয়ে আছে সেই সব উঁচু বাড়ি, কলকারখানা এবং নদীর ওপরে বড় জাহাজ, নদীতে কত জল, জলের জন্য বালি খুঁড়ে মরতে হয় না, সুতরাং সেই শহরে চলে যাবার হাতছানি ওদের মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল।

বৃদ্ধ মানুষটি অর্জুনগাছের নীচে বসে দূরে, বহু দূরে যাদের এখান থেকে পিঁপড়ের মতো মনে হচ্ছিল—লম্বা বালিয়াড়ি, দিগন্তে ভেসে গেছে এই নদী, সোজা, কোথাও বেঁকে নদীর বালুবেলা সূর্যের উত্তাপে আগুনের মতো ঝলসে যাচ্ছিল। মানুষগুলোকে কালো কালো কীটপতঙ্গের মতো মনে হচ্ছে। যেন একটা বড় পিঁপড়ের সারি নদীর মোহনা খোঁজার জন্য নদীর ঢালুতে নেমে যাচ্ছে। পাহাড় উঁচু বলে এবং এখানে সামান্য ছায়া রয়েছে বলে, ঝোপজঙ্গলের শেষ সুষমাটুকু নষ্ট হয়নি। বৃদ্ধ কোথায় এবং কোনদিকে গেলে বনআলু প্রচুর সংগ্রহ করা যেতে পারে—অর্থাৎ এই মানুষ যিনি আপ্রাণ তার মানুষের বেঁচে থাকার এলাদ সংগ্রহের জন্য ভেবে চলেছেন।

কবে একবার এ—অঞ্চলে মহারানির মতো এক সম্রাজ্ঞী এসেছিল—খরা অঞ্চল তিনি দেখে গেছেন। বড় বড় পরিকল্পনা হচ্ছে। মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই—জল এ অঞ্চলে আজ হোক কাল হোক আসবে। মানুষগুলো সম্রাজ্ঞীর কথায় প্রাণের ভিতর জীবনধারণের আকুল ইচ্ছায় গ্রাম ছেড়ে পালায়নি। ওরা দিনের পর দিন জলের জন্য অপেক্ষা করছে। জল আসবে। এই গ্রীষ্মের খরা রোদ আজ হোক কাল হোক মরে যাবে। ওরা সকলে একবার আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকাল, কোনও দিগন্তে যদি সামান্য মেঘের আভাস চোখে পড়ে। কোথাও কোনও মেঘের আভাস নেই। খালি আকাশ। নীল হরিদ্রাভ বর্ণ, যা শুধু মাঠের ওপর এবং ঘাসের ওপর আগুন ছড়াচ্ছে।

ঘাস নেই, শুকিয়ে কবে ধুলোবালির সঙ্গে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে অন্য কোনও নদী অথবা মাঠের ছায়ার সঙ্গে যেন বাতাসে ভেসে চলে গেছে। মানুষগুলো এখন কোনও মেষপালকের মতো আজগুবি স্বপ্ন দেখছিল। কারণ দুপুরের রোদে, কবে একবার ওরা পেটপুরে তৃষ্ণার জলপান করেছিল মনে নেই—মানুষগুলো সব ঝিমিয়ে পড়ছে। ওদের হাত অসাড় হয়ে পড়ছে। চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মাথা ঘুরছে। ওরা উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিল না। কারণ সারাদিন মাটি খুঁড়ে ওরা জলের সন্ধান পেল না। ওরা ক্লান্ত। এবং প্রায় হতচেতন। ওরা প্রায় কিছুই ভাবতে পারছিল না। ওরা বালিয়াড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এবং এক আজগুবি স্বপ্ন সেই মেষপালকের মতো। হাতে বড় এক শক্ত লাঠি মেষপালকের—আগুন, লাঠি তুললে আগুন। জল, লাঠি তুলতে জল। অন্নবস্ত্র, লাঠি তুললে অন্নবস্ত্র। এমন এক মানুষ কী তাদের জন্য কোথাও অপেক্ষা করছে না! যে তাদের জন্য এই মাটিতে জল নিয়ে আসবে। অন্নবস্ত্র নিয়ে আসবে।

ঠিক তখনই অর্জুনগাছের নীচ থেকে বৃদ্ধ চিৎকার করে বলল, তোমরা সকলে উঠে এসো।

সেই শব্দে আবার পাহাড়ের সঙ্গে সমতল ভূমিতে এবং ঢালু বালিয়াড়িতে প্রতিধ্বনি তুলে নেমে গেল। মানুষগুলো কোনও স্বপ্নলব্ধ আদেশের মতো সেই উঁচু পাহাড়ের দিকে যেতে থাকল।

সেই বালকটি তার পাখিটাকে চোঙের ভিতর রেখে পিঠে ছোট্ট একটা হুক দিয়ে ঝুলিয়ে দিল। তার সঙ্গে টিনের থালা—মগ ছিল একটা এবং সামান্য কাপড়জামা। কালো নোংরা পুঁটলিটা সে পিঠের বাঁ দিকে ঝুলিয়ে সকলের সঙ্গে উঠে যেতে লাগল পাহাড়ের দিকে।

বৃদ্ধ পাহাড়ের নীচে সামান্য এক সমতলভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে অনুসন্ধান করে এই স্থানটুকু আবিষ্কার করেছে। কিছু গুল্মলতা দেখে সে বুঝে নিয়েছিল এই মাটির নীচে রসাল একরকমের শিকড় রয়েছে। সুতরাং খুঁড়ে খুঁড়ে এক পাহাড় রসাল শেকড় তুলে রেখেছে। তার শক্ত বাহু কাজ করার জন্য বড় বেশি পাথরের মতো কঠিন মনে হচ্ছিল।

বৃদ্ধ সকলকে প্রায় সমানভাবে ভাগ করে দিল। এবং বলল, চুষে খাও। তোমাদের তেষ্টা নিবারণ হবে।

মানুষগুলোর কাছে এই বৃদ্ধ মোজেসের মতো। এই দুর্দিনে এই একমাত্র মানুষ যে তাদের আশা দিয়ে বাঁচবার জন্য অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। তিনি কেবল বলছেন, জল হবে। এবার বর্ষায় জল হবে। জল হলে নদীর

সব জল আমরা নেমে যেতে দেব না। বাঁধ দিয়ে আমরা জল আটকে রেখে দেব। সুদিনে দুর্দিনে জল আমাদের কাজে আসবে।

বৃদ্ধ আরও বলছিল, এই মাটি সোনার ফসল দেবে। এই মাটি ছেড়ে কোনো শহরে চলে গেলে—ভিখারি বনে যাবি, এই মাটিতে জল হলে আমরা সকলে মিলে সোনার ফসল ফলাতে পারি। বৃদ্ধ এইটুকু বলে পিতামহের আমলের এক মন্বন্তরের গল্প শোনাল।

সুবল কান খাড়া করে রাখল। নানারকমের বীভৎস দৃশ্য চোখের ওপর ভাসছিল সুবলের। বৃদ্ধ পুরাতন এক মন্বন্তরের গল্প শুনিয়ে বলল, সংসারে এমন হয় মাঝে মাঝে। তাতে ভেঙে পড়লে চলে না। মানুষ, গোরু—বাছুর পথে—ঘাটে মরে পড়ে থাকে। ঘরের ভিতর মৃতের দুর্গন্ধ। মহামারী আসে। গ্রামের পর গ্রাম ক্রমশ খালি হয়ে যায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে ধুলোর ঝড় উঠছে। ওরা দলবেঁধে হাঁটতে থাকল। ওরা জানত, এই সামনের ঢালু বেয়ে নেমে গেলে বড় এক পাকা রাস্তা পাওয়া যাবে। তারপর দু'ক্রোশের মতো হেঁটে গেলে রেললাইন, লাইনের ধারে লঙ্গরখানা খুলেছে সরকার, সেখানে পৌঁছুতে পারলে এক হাতা খিচুড়ি পাওয়া যাবে। এই সামান্য আহার সারা রাত্রির জন্য ওদের সামান্য শান্তি দেবে। তারপর ফের আগামীকাল নদীর ঢালুতে জলের সন্ধান চলবে। ক্রমশ এভাবে চলবে। কতদিন চলবে এভাবে ওদের জানা ছিল না। শুধু বৃদ্ধ আগে আগে হাঁটছে। হাতে লাঠি। সে মাঝে মাঝে হাতের লাঠি আকাশের দিকে তুলে দিচ্ছে, পথে—ঘাটে গোরু—বাছুর মরে পড়ে ছিল, পচা দুর্গন্ধ। কোনও গ্রামে ওরা মানুষের চিহ্ন দেখতে পেল না। কেবল দূরে ট্রেনের হুইসল শোনা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে।

ওরা সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় রেললাইনের ধারে পৌঁছাল। গ্রামটাকে উৎসবের মতো মনে হচ্ছিল। বড় বড় কড়াইয়ে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। দূর দূর গ্রাম থেকে মানুষেরা এসে বসে রয়েছে। বড় বড় অর্জুন গাছের নীচে খড়বিচালি বিছিয়ে বউ—বিবিরা শুয়ে আছে, খাবার হয়ে গেলে টিনের থালা এবং মগ নিয়ে সকলে লাইন দেবে। অবশ্য শিশুদের এবং বালক—বালিকাদের খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। ওরা খেলে খাবে বুড়ো—বুড়িরা এবং বউ—বিবিরা। তারপর যুবক এবং মরদ মানুষেরা।

উৎসবের মতো এই গ্রাম। ব্যাজ পরা একদল মানুষ। বড় বড় তাঁবু খাটানো হচ্ছে। ডে—লাইট জ্বলছে, কোনও পরিত্যক্ত ধনী গৃহস্থের বাগানবাড়ি হবে এটা। প্রায় দশ—বারোটা উনুনে লোহার বড় বড় কড়াইয়ে খিচুড়ি ফুটছে। ত্রিপাল গোল করে মাটির গর্তে খিচুড়ি রাখা হচ্ছে। বড় বড় কাঠের হাতা নিয়ে বড় বড় বালতি নিয়ে ব্যাজ পরা মানুষগুলো ছুটোছুটি করছে। কিছু লোক কোথায় গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, একদল স্বেচ্ছাসেবক সেদিকে ছুটল। ওরা লুকিয়ে খাবার চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

বড় বড় মোষের গাড়িতে শহর থেকে জল এসেছে। বড় বড় মাটির জালা জল ভর্তি ছিল, এখন সেই জল নিঃশেষ। কেউ খিচুড়ি খাবার পর এক ফোঁটা জল খেতে পারছে না। মানুষগুলোর মুখে বিরক্তির ছাপ এবং উত্তেজনা দেখা দিচ্ছে।

জল নেই, খাবার জল নেই। এই অঞ্চলে পাঁচ—সাত ক্রোশ এমনকি দশ ক্রোশ হবে জল নেই—খাবার জল নেই, পাতকুয়াতে কোথায় সামান্য জল একজন গেরস্থ মানুষ লুকিয়ে রেখেছিল—সেখানে খণ্ডযুদ্ধ মানুষের সঙ্গে মানুষের। কারণ কে যেন বলছিল এই দুর্দিনে জল লুকিয়ে রাখতে নেই।

তখন তাঁবুতে তাঁবুতে সরকারের লোক সব ফিরে যাচ্ছিল। জলের কথা বললে ওরা না শুনি না শুনি করে পেতল—কাঁসা যা ছিল কিছু সামনে তা দিয়ে কান ঢেকে দিল। অর্থাৎ ওরা কিছু শুনতে চাইল না। উপরন্তু তাঁবু থেকে হ্যাট পরা মানুষটা বের হয়ে বলল, কাল থেকে লঙ্গরখানা বন্ধ। কতদিন বন্ধ থাকবে জানা নেই, গুদামখানায় চাল—ডালের মজুত শেষ। আবার কোথা থেকে গম আসছে, আসার যদি কথা থাকে তবে এখানে দু'—চারদিন রুটি মিলতে পারে আবার নাও মিলতে পারে। সরকারের লোকটি নিজের দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে তাঁবুর ভিতর ঢুকে গেল।

মানুষগুলো, কত মানুষ হবে—প্রায় হাজার মানুষ, ছেলে বউ—বিবি নিয়ে হাজারের ওপর হতে পারে, বিশেষ করে সুবল, যার বাঁশের ভেতর ময়না পাখির বাচ্চা, বাচ্চাটাকে সুবল একটা মরা গাছের নীচে কুড়িয়ে পেয়েছিল। কারণ পাখিরা পর্যন্ত ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে, জলের অভাবে, শস্যের অভাবে এখন আর কোনও পাখি পর্যন্ত ডাকে না—সুবল সেই মরা গাছের ডালে একটা ভাঙা বাসা দেখেছিল। বোধ হয় পাখিটা বাসা থেকে পড়ে গেছে। পাখিটা জলের জন্য অথবা ক্ষুধায় দু'ঠোঁট ফাঁক করে দিচ্ছিল—সুবল পাখি নিয়ে ছুটে ছুটে ওর যে শেষ সামান্য সঞ্চিত জল ছোট কাচের শিশিতে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই জল থেকে প্রায় মধুর মতো একটু একটু করে জল দিতেই পাখির বাচ্চাটা যেন প্রাণ ফিরে পেল। সুবল হাতে তালি বাজাল এবং এতবড় খরা চলেছে, মন্বন্তর এসে গেল দেশে—এই পাখি মিলে যাওয়ায় ওর ভয় যেন কেটে গেল। সেই সুবল যাকে দেখলে এখন ভিড়ের মধ্যে মনে হল বড় কাঙাল, সরল সহজ—গোবেচারা সুবল পিঠে বাঁশের ভেতরে পাখি নিয়ে এগিয়ে গেল। বলল, আমরা খেতে না পেলে মরে যাব।

তাঁবুর ভিতরে বোধ হয় কী নিয়ে হাসি—মশকরা হচ্ছিল। ওরা খুব জোরে হাসছে। ওরা সুবলের কথা শুনতে পায়নি। সুতরাং সুবল পেছনের দিকে তাকাতেই দেখল সেই বৃদ্ধ লাঠি উঁচু করে রেখেছে। যেন এই লাঠিতে মোজেসের প্রাণ আছে। লাঠি এখন ওদের সব আশা পূরণ করবে। সে লাঠি তুলে ওপরে কী নির্দেশ করতেই সকলে বুঝে নিল, ওদের এবার এ স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। ওরা বৃদ্ধের কথামতো পিছনে পিছনে চলতে থাকল। তাঁবুর চারপাশে পুলিশ ছিল কিছু... ওদের হাতে বন্দুক ছিল, গ্রামের মানুষেরা হিংস্র, ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠছে অথচ এই বন্দুক দেখলে তাদের প্রাণ শুকিয়ে যায়—ওরা অর্থাৎ এই—এই মানুষেরা, যারা হা—অন্নের জন্য মাটি কামড়ে পড়ে থাকছে, তাদের নীরবে অন্ধকারে নেমে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকল না।

অন্ধকারে বৃদ্ধ বলল, আমরা কোথায় যাচ্ছি সুবল?

—জানি না কর্তা।

—আমরা কোথাও যাচ্ছি না। আমরা এই পাহাড়ের ওপর আগুন জ্বেলে দেব। সব পুড়িয়ে দেব। যখন মাটি এত নেমকহারাম, ঈশ্বর এত বেইমান—যখন বৃষ্টি হচ্ছে না, যখন ঘাসমাটি পুড়ে গেল, সব তখন আমরা আগুন জ্বেলে বাকি যা আছে সব পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাব শহরে।

কিন্তু ভিতর থেকে কে যেন রুখে উঠল। বলল, আমরা জল খেতে চাই কর্তা। তুমি সারাদিন বালুর ভিতরে পুরে রেখেছিলে জল দেবে বলে, কিন্তু জল কই?

দলের ভিতর শিশুদের কান্না, জল খাব। ওদের সকলের ভয়ঙ্কর তেষ্টা। বৃদ্ধ নিজেও তেষ্টায় মরে যাচ্ছে। ভিতরে এক ভয়ঙ্কর হিংস্রতা কাজ করছে। ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধি পালটায়। মনে হয় এই মাটি সোনার ফসল দেবে, আবার মনে হয় জল বুঝি এখানে আর কোনওদিন হবে না, মাটি আর সোনার ফসল দেবে না। সব শুকিয়ে যাবে তারপর একদিন এই অঞ্চল মরুভূমি গ্রাস করে নেবে।

তখন দূরের ট্রেনের হুইসল। বড় একটা ট্রেন বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে। কোথায় এক দিল্লি বলে শহর আছে, কোথায় এক কলকাতা বলে নগর আছে, সেখানে ট্রেনটা যাবে। দিল্লি থেকে কলকাতা। বৃদ্ধ এবার লাঠিটা শক্ত করে ধরে ফেলল। তারপর সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা এই লাইনের ওপর বসে যাও। শহর থেকে নগরে যাবার জন্য বড় ট্রেন আসছে। আজ আমরা ট্রেনটা থামিয়ে দেখব কী আছে, যদি ভিতরে জল থাকে, তবে আমরা জল নিয়ে চলে যাব। জলের জন্য অন্নের জন্য আমাদের এই দস্যুবৃত্তি। আমাদের কোনো পাপ হবে না।

সুবলের ভয় ছিল, ট্রেনটা হুড়মুড় করে এসে ওপরে উঠে যেতে পারে। সে ভয়ে ভয়ে বলল, কর্তা, আমরা যে তবে সব মরে যাব।

—মরে যাবে কেন?

—ট্রেনটা আমাদের ওপর দিয়ে চলে যাবে।

—আরে না, ট্রেন মানুষের ওপর দিয়ে যায় না। এতগুলো লোক দেখলে ড্রাইভার ট্রেন থামিয়ে দেবে।

কর্তামানুষ এ বৃদ্ধ, এই অঞ্চলের পুরোহিত মানুষ, বিদ্যায় বুদ্ধিতে সকলের চেয়ে প্রবল সুতরাং সুবলের আর কোনও ভয় থাকল না। সে তার পাখি পিঠে রেখে দিল, সে তার ঝোলাঝুলি, বগলের নীচে ঝুলিয়ে রাখল। সুবল অন্ধকারে টিপে টিপে দেখল ঝোলাঝুলিতে ওর সংগ্রহ করা পোকামাকড়গুলো রয়েছে কিনা! কারণ সে খুব ভোরে উঠে পোকামাকড় সংগ্রহ করে রেখেছে পাখিটার জন্য। খুব ভোরে উঠে সে পাখিটাকে আকাশে ওড়াবার চেষ্টা করেছে। কারণ তখন প্রবল খরা থাকে না, ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকে, এবং খুব ভোরেই পাখিটা যেন সামান্য সতেজ থাকে। তারপর সূর্য ওঠার সঙ্গে পাখিটা গরমে ছটফট করতে থাকে। সুবলের মনে হয় সে পাখিটাকে আর বুঝি বাঁচাতে পারবে না। সে যখনই সামান্য অবসর পায় পাখিটাকে বাঁশের চোঙ থেকে তুলে এনে হাতের ওপর বসিয়ে রাখে। এবং নিজে সূর্যের দিকে পিঠ রেখে পাখিটাকে ছায়া দেয়। যদি ফুরফুরে হাওয়া থাকে তবে পাখিটাকে হাওয়া লাগাবার জন্য হাতের কবজিতে বসিয়ে সে আপন মনে শিস দিতে থাকে এবং গ্রাম্য কোনো সংগীত অথবা লোকগাথা সে কবিতার মতো উচ্চারণ করতে করতে, এই প্রবল খরা, মন্বন্তর আসছে, দুর্ভিক্ষ সারা দেশে, আবার ওলাওঠা মহামারীর আকারে দেখা দিচ্ছে, সুবল পাখিটাকে রক্ষা করার জন্য সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখন সে অন্য কোথাও পালাতে পারলে বাঁচে।

ভয়ঙ্কর অন্ধকার। এতগুলো মানুষ নিঃশব্দে হাঁটছে। পাতার শুধু খস খস শব্দ উঠছিল। ওরা প্রায় সকলেই বনবেড়ালের মতো চুপি চুপি রেললাইনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শিশুদের কান্না মাঝে মাঝে বড় ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছিল।

শালগাছের জঙ্গল সামনে। জঙ্গল পার হলে রেললাইন। শালগাছগুলো প্রায় মৃতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে গাছের ডালপালাগুলোকে খুব ভূতুড়ে মনে হচ্ছিল। কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। কোনও গ্রাম থেকে একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না। মাঝে মাঝে শেয়ালের চিৎকার—আর এক ঝিল্লির ডাক, মনে হয় এই সংসারে জীবনধারণের আর কিছু থাকল না, কোনও আলো অথবা হাওয়া, সর্বত্র ভয়াবহ মৃতের গন্ধ শুধু।

বৃদ্ধ পুরোহিত রেললাইনে ওঠার আগে বললেন, বিবি—বউদের এবং শিশুদের আলাদা রেখে দাও। ওরা বড় কড়ুই গাছের নীচে বসে থাকুক।

বৃদ্ধ এবার যুবকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা হাতে সামান্য কাপড় নাও। ট্রেনের আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাত ওপরে তুলে গাড়ি থামাবার নির্দেশ দেবে। বৃদ্ধ পুরোহিত এই সব বলে রেলের লাইনে কী নুয়ে যেন দেখল। তারপর সে সকলের আগে হাতে সেই লাঠি নিয়ে সামান্য সময় স্থির হয়ে দাঁড়াল। অপলক সে যেন কিছু দেখছে,—অন্ধকার, না এই জগৎসংসার, না পূর্বস্মৃতি তার কাজ করছিল। কী ছিল এই অঞ্চলে। বড় মাঠে সোনার ফসল ছিল, বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল, গোয়ালে বড় বড় গোরু, মোষ ছিল, শীতের সময়ে রামায়ণ—গান ছিল আর গ্রীষ্মকালে ঢোলের বাজনা ছিল, রামাহই রামাহই গান ছিল। এখন সব নিঃশেষ। কেবল ভয়, যা কিছু সামান্য মানুষ আছে তারাও চলে যাবে সব বাড়ি ছেড়ে। ভয়, মহামারী, মন্বন্তর এসে গেল। সামান্য খয়রাতি সাহায্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে আর কী থাকল মানুষগুলোর, কীজন্য আর অপেক্ষা করা। এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে মানুষগুলো বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বৃদ্ধ পুরোহিত অন্ধকারের ভিতর কোনও আলোর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না।

ট্রেনটা বোধ হয় তখন নদী পার হচ্ছিল, কোনও বড় সেতু পার হচ্ছিল, অথবা বাঁকের মুখে কোনও পাহাড়ের ভিতর ট্রেনটা ঢুকে যাচ্ছে—সুতরাং গম গম, খুব দূর থেকে গম গম শব্দ, মনে হয় খুব দূর থেকে ভেসে আসছে শব্দ, যেন হাওয়ায় ভর করে শব্দটা কানের পাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

তারপর সেই আলো, ট্রেনের আলো, দূর থেকে ওরা ট্রেনের আলো দেখতে পেল। ট্রেনটা যত দ্রুত এগিয়ে আসছে তত ওদের বুক দুরু দুরু করছিল। তত ওরা মরিয়া হয়ে উঠছে। যেন ওরা কোনও দীর্ঘ

মরুভূমি পার হবে এখন—সুতরাং সকলের মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই, সকলের রক্তে এক অমানুষিক উত্তাপ সঞ্চিত হচ্ছে।

হাড়গোড় বের করা মানুষগুলোর দিকে এখন আর তাকাচ্ছে না। লাইনের ওপর যেন শত শত কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষদের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, স্নান না করার জন্য চুল শনের মতো হয়ে গেছে, গায়ে খড়ি ওঠা, পেটের ভিতর যন্ত্রণা, ক্ষুধার যন্ত্রণা। সামান্য লঙ্গরখানার দান এই সামান্য পথটুকু অতিক্রম করতেই হজম হয়ে গেছে।

ওরা সকলে আলোটা দেখে ভয় পাচ্ছে। ওরা এই ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ওরা অন্ধকারে পরস্পর মুখের দিকে তাকাল। বৃদ্ধ পুরোহিত পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে। দৈত্যের মতো ঝড়ের বেগে ট্রেনটা ছুটে আসছে, পাহাড়ের ওপর পড়লে রক্ষা থাকছে না। সব মানুষগুলোর রক্তে এই লাইন ভেসে যাবে, শকুনের আর্তনাদ শোনা যাবে দূরে—বৃদ্ধ ভয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেন ডেকে উঠল, জল চাই, আমরা জল চাই।

সঙ্গে সঙ্গে সুবল ওর পাখিটাকে বুকের কাছে এনে বলল, হ্যাঁ, আমরা জল চাই। যুবক—যুবতীরা বলল, জল চাই, জল চাই।

কড়ুই গাছের নীচে থেকে বউ—বিবিরা চিৎকার করে উঠল, জল চাই, জল চাই।

ভূতের ভয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেন ওই মানুষগুলো জল চাই, জল চাই বলে হরি নামের মতো মন্ত্র উচ্চারণ করছে। এই উচ্চারণ কেবল দীর্ঘ মাঠে শব বহনকারী মানুষের কান্নার মতো শোনাচ্ছে। বড় মাঠ সামনে, লাইনের পাশে বড় পাহাড়, শালগাছের মাথায় ভাঙা চাঁদের আবছা অন্ধকার, এতগুলো মানুষের ভয়াবহ কণ্ঠ চারপাশের পরিবেশকে খুব বিষণ্ণ করে তুলছে।

ট্রেনটা হুইসল দিচ্ছে, ড্রাইভার টের পেয়ে গেছে বুঝি। আবছা কী যেন দেখা যাচ্ছে লাইনের ওপর। প্রথম কুয়াশার মতো মনে হচ্ছে, তারপর মনে হচ্ছে মরীচিকার মতো হাজার সরলরেখা পুতুলনাচের দড়িতে ঝুলছে।

ড্রাইভার চোখ মুছে নিল। এই অঞ্চলে ভয়ঙ্কর খরা চলছে, এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন বৃষ্টিপাত নেই এবং এই অঞ্চলে মহামারী আরম্ভ হয়ে গেছে—ড্রাইভার ভালো করে দেখে নিল। কিছুদিন আগে ড্রাইভার দেখেছে দূরে মাঠে সব মৃত গোরু—বাছুর—মোষ, হাজার হবে প্রায়, লাইনের ধারে ধারে মরে আছে। মাঝে মাঝে সে মৃত মানুষের মুখও দেখেছে। লোকালয়ে আর কোনও লোক নেই, সকলে শহর গঞ্জে চা—বাগানে এবং দূরদেশে চলে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর দুর্দিন মানুষের।

আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা বাঁক নিলে ড্রাইভার টের পেল, শত শত কঙ্কাল যেন রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ভূতের মতো নৃত্য করছে। সে এবার প্রাণপণে রড চেপে ধরল, প্রাণপণে সে হুইসল বাজাতে থাকল। এরা সব মানুষের কঙ্কাল, চোখ—মুখ কোটরাগত, লাইন থেকে একটা প্রাণী সরছে না এবং ড্রাইভার ভূতের ভয়ে প্রথম ভাবল যদি ওরা যথার্থই মানুষের অভুক্ত আত্মা হয় তবে আর ট্রেন থামিয়ে কী হবে, বরং সে জোরে বের হয়ে যাবে, ট্রেন থামালে মৃত আত্মারা ওর ট্রেনটাকে এই নির্জন মাঠে আটকে দিতে পারে। সুতরাং ফের চাকা ঘুরিয়ে দিতে গেল—ফায়ারম্যান শক্ত হাতে বাধা দিল, বলল, না। ওগুলা ভূত নয় দাদা। ওগুলো মানুষ। সে ড্রাইভারকে সরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ট্রেনটা থামিয়ে দিল।

মানুষগুলো কোলাহল করতে থাকল, জল চাই, জল চাই। মানুষগুলো কামরায় উঠে গেল। বলল, জল চাই, জল চাই।

ভিতরের যাত্রীরা ভয় পেয়ে গেছে। সব কঙ্কালের মতো মানুষের চেহারা, ক্ষুধার্ত, চোখ কোটরাগত, হাত —পা শীর্ণ, ক্লান্ত এবং অবসন্ন। এই সব মানুষের শরীরে জীর্ণ—বাস, ময়লার জন্য দুর্গন্ধ, ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ, যাত্রীরা সকলে নাকে কাপড় দিচ্ছে। ভয়ে ওরা কথা বলতে পারছে না। যেন শয়তানের প্রতীক এইসব

মানুষেরা। যাত্রীদের সুন্দর সুদৃশ্য কামরার প্রাচুর্য ওদের পৈশাচিক করে তুলেছে। ওরা প্রেতের মতো ভিতরে ঢুকে দু'হাত ওপরে তুলে জলের জন্য, জল চাই, বলে নামকীর্তনের মতো নাচতে থাকল।

যাত্রীদের মনে হল, ক্ষুধার্ত সব রাক্ষস অথবা ডাইনির মতো মানুষগুলো আকাশে বাতাসে দুঃখের খবর পাঠাচ্ছে, ওরা ভিতরে ঢুকে সব তছনছ করে দিচ্ছিল। জল কোথায়, জলের জন্য ওরা ওদের মগ, থালা এবং চামড়ার ব্যাগ খুলে রেখেছে, অথচ জল কোথায়, বৃদ্ধ পুরোহিত শুধু জানতেন জল কোথায়, তিনি সকলকে দু'হাত তুলে শান্ত থাকতে বলেছেন, সামান্য জলটুকু সকলকে সমান ভাগ করে দিতে হবে। তিনি প্রতি কামরায় একজন করে যুবককে জলের কল দেখিয়ে দিলেন, কী করে খুলতে হবে বন্ধ করতে হবে দেখিয়ে দিলেন, প্রত্যেককে লাইন দিয়ে যেমন মানুষগুলো সরকারের লঙ্গরখানাতে লাইন দিয়ে খাদ্যবস্তু থালায় নিত, তেমন লাইন দিয়ে সামান্য জলটুকু সকলকে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে বললেন।

সুবলের কামরায় খুব অল্প মানুষ। সুখী মানুষ, তাঁর স্ত্রী এবং রুগণ এক বালিকা নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে। এতবড় কামরা—রিজার্ভ প্রথম শ্রেণীর কামরা, মাত্র তিনজন মানুষ। রুগণ বালিকা মোমের মতো সাদা। সাদা চাদরে শরীর ঢেকে রেখেছে। মাথায় আলো জ্বলছিল। খুব অনুজ্জ্বল আলো। ওরা সকলে ভয়ে কেমন চোখ—মুখ সাদা করে রেখেছে। বালিকাটি পর্যন্ত মুখ—নাক দেখে আঁৎকে উঠেছে। সুবলের পিছনে বড় বড় সব মানুষ। মানুষ বলে চেনা যায় না। যেন বড় এক রাজপুরী। সুন্দর সব বাদামি রঙের গাছ। গাছে হিরে—পান্নার ফুল। নীচে রাজকন্যা আঙুর খেতে খেতে কোনও রাজপুরের জন্য অন্যমনস্ক। অথবা এও হতে পারে রাজকন্যার জানা ছিল না, রাজ্যের কোথাও দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। জানা ছিল না, রাজ্যের রাজা বনের হরিণ অনুসন্ধানে মত্ত। রাজা, রাজ্যের খবর রাখছে না। হাজার হাজার গ্রামে মড়ক লেগেছে। অনাবৃষ্টির জন্য ফসল ফলছে না। অল্প বৃষ্টির জন্য মাটি ক্রমশ মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। হায়, তখনও রাজা মনোরম রাজপ্রাসাদে নূতন অরণ্যের সৃষ্টি করছে। কারণ ওর প্রিয় হরিণটি এই বনের ভিতর হারিয়ে যাবে। সে সেই হরিণের জন্য শুধু ব্যস্ত থাকবে। রাজকার্যের জন্য বনের হরিণটি ওর বড় প্রিয়। মরীচিকার পেছনে ছোটার মতো রাজা শুধু ছুটছেন। তখন রাজকন্যা দেখতে পেল হাজার হাজার কঙ্কালপ্রায় মানুষ তাকে ঘিরে ফেলেছে, হাউ মাউ কাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ—এই সব কথা বলছে।

সুবল হাতের ইশারা করলে সকলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুখী মানুষটি প্রথম খুব চেঁচামেচি করছিল, পুলিশের ভয় দেখাচ্ছিল। কিন্তু এতবড় নির্জন মাঠ, একদিকে দীর্ঘ পাহাড়, অন্যদিকে এক মরা নদী, নদীতে মানুষগুলো জলের জন্য দিন নেই, রাত নেই মাটি খুঁড়ে চলেছিল, অথচ জল নেই, জল নেই, হাহাকার জলের জন্য। সুতরাং সামান্য পুলিশের ভয় সুবল অথবা এইসব কঙ্কালপ্রায় মানুষদের এতটুকু বিচলিত করতে পারল না।

বরং মানুষগুলো, সুদৃশ্য এই কামরা, আসবাবপত্র দেখে কৌতুকবোধ করতে থাকল। ওরা সুবলকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছে। অথবা সুবলকে অনুনয়ে বলছে, ওরা এই কামরার ক্ষতি করবে না। শুধু ঢুকে দেখবে, মোটা গদি, এবং আলোর কাছে হাত রেখে দেখবে—কেমন ভিতরে অনুভূতি জন্মায়। সুবল ওদের এক এক করে জল খেতে দিচ্ছে, আর এক এক জন কামরার ভিতর ঢুকে দেওয়ালে হাত রাখল, অথবা একটু আরাম করে গদিতে বসে শুয়ে কেমন লাগে দেখতে থাকল। বা বেশ তো, ওদের কেউ কেউ যেন চোখ বুজে আরামটুকু অনুভব করছে। বাংকের ওপর বসে, হাঁটু মুড়ে বসে শুধু চারিদিকের দৃশ্য,—জানালা দিয়ে শুধু অন্ধকার মাঠ, পেছনের করিডোরে মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে, কোলাহল করছে। গার্ডের লালবাতি, যেন মাঠ, মরা নদী অথবা শুকনো পাহাড়ের উদ্দেশ্যে লালবাতি জ্বেলে বসে আছে।

কামরার ভিতর সুখী মানুষ, তাঁর স্ত্রী এবং রুগণ বালিকা ভয়ে থর থর করে কাঁপছে, ওরা ভয়ে কামরার এক পাশে, যেন ভয়ঙ্কর কোনও দুর্ঘটনার অপেক্ষায় আছে ওরা।

ড্রাইভার নীচে নেমে দেখল, পিপীলিকার মতো মানুষগুলো কামরায় কামরায়, ছাদের ওপরে উঠে হৈহুল্লোড় করছে। শিশুদের মতো চিৎকার, যেন এই ট্রেন ওদের কাছে খেলনার মতো অথবা যুদ্ধে

প্রতিপক্ষের পরিত্যক্ত কামান, কামানের গোলাগুলি শেষ, গ্রামের দুষ্ট বালকবালিকারা কামানটা টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভার যাত্রীদের পার হয়ে গার্ডের ঘরে গিয়ে দেখছে, ভয়ে গার্ডসাহেব লালবাতি জ্বেলে বসে রয়েছে।

এবার ড্রাইভার মরিয়া হয়ে বলল, এবার নীলবাতি জ্বালুন, ট্রেন ছেড়ে দিই, একটা মানুষও লাইনের ওপর আর নেই। শালা সকলকে নিয়ে এবার স্টেশনে নিয়ে ফেলি।

ড্রাইভারের চিৎকারে গার্ডসাহেব ভয়ে তিড়িংবিড়িং করতে থাকল। ঘুরেফিরে কেমন মাতালের মতো কিছুক্ষণ নেচে বেড়াল। ড্রাইভার বুঝল গার্ডসাহেব ভয়ে ভিরমি খেয়েছে। সে বলল, গার্ডসাহেব, বেশি দেরি করলে বয়লার থেকে জল ঢেলে নেবে। ট্রেন তবে আর চলবে না!

গার্ডসাহেব কী যেন ভাবলেন। এদের এত তেষ্টা?

—তেষ্টা, কী যে জল খাচ্ছে! কেবল জল খাচ্ছে।

—কেবল জল খাচ্ছে?

—কেবল জল খাচ্ছে। জল খাচ্ছে। জল খাচ্ছে। কেবল জল খাচ্ছে।

—অন্য কিছু না?

—না, কিছু না। কোনোদিকে আর ভ্রূক্ষেপ নেই। বড় সজ্জন।

—তবে এবার শালা সজ্জনদের চল শহরে নিয়ে তুলি। বলে তিনি বসে টুক করে লাল বাতিটাকে নীল করে দিলেন।

ড্রাইভার নামার সময় বলে এল, আপনি সাব হুইসল বাজাবেন না। আমি সেকেন্ডে এমন গতি বাড়িয়ে দেব না, শালা একটাকেও নামতে দেব না। বলে ড্রাইভার অন্ধকারের ভিতর নিচু হয়ে হাঁটতে থাকল। এবং দেখল ট্রেনের নীচে আবার কেউ বসে রয়েছে কিনা। সে কোনো মানুষ দেখতে পেল না। কেবল মনে হল নীচে ঠিক বড় একটা গাছের অন্ধকারে একজন আলখাল্লা পরা মানুষ দাঁড়িয়ে দুঃখী লোকদের যেন জলপান দেখছে।

ড্রাইভার বলল, শালা, তুমি লিডার আছে। তোমাকে ফেলে দেখ শালা, কেমন সব ফাঁক করে দিই। তুমি শালা এখানে পড়ে পড়ে এবার ঘাস খাও। মুরগি খাও। মুরগির নাম মনে হতেই ড্রাইভারের জিভে জল এসে গেল।

ওদের এত জলতেষ্টা যে, কোথায় ড্রাইভার, কোথায় ফায়ারম্যান দেখবার ফুরসত নেই। আর এতগুলো মানুষ একসঙ্গে ট্রেনে উঠে পড়বে সেও, কেউ ভাবেনি।

বৃদ্ধ পুরোহিত ওদের জল খেতে দেখে, ওদের হইচই দেখে খুব খুশি। দীর্ঘদিন পর জল পান, তৃষ্ণার জল কতদিন পর পান করা গেল। তিনি নিজেও জল এনে গাছের নীচে পান করছেন। মনে হচ্ছিল পেটে আর জায়গা নেই, তবু মনে হচ্ছিল জলের আর এক নাম জীবন, এই জল এবং জীবনকে চেটে চেটে খাবার জন্য তিনি কিছুক্ষণ পর পরই গলায় জল ঢেলে দিচ্ছেন, এবং জল খাবার সময় যেন অন্ধকারে টের পেলেন, ট্রেনটা নড়ছে, ট্রেনটা সহসা এমন গতি বাড়িয়ে দিল যে, তিনি অনুমানই করতে পারলেন না কী করে চোখের পলকে এতগুলো লোক নিয়ে ট্রেনটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিনি চিৎকার করতে করতে ট্রেনটার পিছনে ছুট দিলেন। তিনি অন্ধকারেও দেখতে পেলেন সেইসব দুঃখী মানুষদের হাত—ওরা যেন বলছিল, দেখ দেখ, কেমন বেইমান এই ট্রেন, আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। তিনি শুধু চিৎকার করছিলেন, তোরা সব নেমে পড়। তোদের নিয়ে ট্রেনটা চলে যাচ্ছে, তোরা লাফিয়ে পড়।

কিন্তু সুবল ট্রেনের ভেতর জানালাতে সামান্য সময়ের জন্য উঁকি দিয়েছিল। অন্ধকারে গাছপালা আবছা আবছা, সে কোনও মানুষকে কোনও বড় গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দ্যাখেনি। সে ভেবেছিল হয়তো দু—একজন পড়ে থাকল—আর সকলকে নিয়ে ট্রেনটা মোটামুটি শহরে পৌঁছে যাবে। কারণ এই মন্বন্তর মানুষের

আত্মবিশ্বাস হরণ করে নিয়েছে। ট্রেন ছেড়ে দিলে কেউ লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করেনি। সকলে যেন মোটামুটি ভিতরে ভিতরে খুশি।

ট্রেনটা ওদেরকে কোনও না কোনও শহরে পৌঁছে দেবে। অন্ন—জল এবং বস্ত্রের অভাব হবে না। একবার শুধু পৌঁছে যাওয়া। সেখানে পুলিশের ভয় সামান্য থাকবে। সুতরাং ওরা সকলেই প্রায় ভদ্রলোকের মতো কামরায় টিকিটবিহীন যাত্রীর মতো বসে থাকল। ওরা আর কিছু তছনছ করছে না। যাত্রীদের মনে সাহস ফিরে এসেছে। ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে বড় নিস্তেজ মনে হচ্ছিল। শরীর শক্তিবিহীন। অনেকের ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঘুম পাচ্ছিল।

সুবল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর ঘরে এক কোণায় চুপচাপ বসে থাকল। সাদা মোমের মতো বালিকার মুখ। চোখ বড় বড়। সুবলকে বালিকাটি দেখছে। ঘরে অন্য যারা ছিল তারা জল খেয়ে চলে গেছে।

এই কামরায় অবশিষ্ট জলটুকু নিঃশেষ। প্রৌঢ় মানুষটি কী যেন বই পড়ছিলেন। তাকে এখন আর উদ্বিগ্ন দেখা যাচ্ছে না। এমনকি তিনি যেন ভেবে নিয়েছেন, এইসব দেহাতি মানুষেরা কোনও কিছু আর অনিষ্ট করবে না। ফাঁক বুঝে জলের জন্য ট্রেন আক্রমণ করতে এসে ট্রেনে চড়ে যাচ্ছে। এক ঢিলে দুই পাখি। রথও দেখা হল, কলাও বেচা হল। সুবলের মুখ দেখে তাই মনে হয়।

সুবল এখন ট্রেনে চড়ে কোথাও চলে যেতে পারছে ভেবে খুশি। অন্তত জলের জন্য আর মাঠ—ঘাট ঘুরে মরতে হবে না। সুবলের মুখ দেখলে তাই হয়। বালিকাটি অসুস্থ। সাদা মোমের মতো মুখে শুধু চোখ দুটোই অবশিষ্ট। চোয়ালে সামান্য মাংস। হাত—পা বড় শীর্ণ। শুধু মুখে সামান্য সতেজ ভাব। চোখ দুটো বড় টল টল করছিল। সুবলের আশ্চর্য লাগছে—এই মুখ, সুন্দর সতেজ মুখ রুগণ এবং পীড়িত। ভিতরে ভিতরে অসামান্য কষ্ট। শিয়রে বসে আছেন যিনি—বালিকাটির মা হবে নিশ্চয়ই। তিনি বুক পর্যন্ত সিল্কের চাদরটা মাঝে মাঝে টেনে দিচ্ছেন। যারা পরে তৃষ্ণার জল খেতে এসেছিল—অবশিষ্ট জল, এমনকি এই রুগণ বালিকার জন্য যে মাটির জারে অল্প জল ছিল, জলের স্বাদ পেয়ে সবটুকু জল খেয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছিল, বালিকার এখন তৃষ্ণা পেয়েছে। বালিকা তৃষ্ণায় জলের জন্য ঠোঁট চাটছে। শিয়রে মা বসে। তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে বললেন, টুকুন জল খেতে চাইছে।

প্রৌঢ় মানুষটি উঠে বসলেন, তিনি দেখলেন জল কোথাও নেই। দরজার গোড়ায় সুবল বসে বসে ঝিমুচ্ছে। এখন আর স্টেশন না এলে জল পাওয়া যাবে না। কোনও বয়কে ডেকে অথবা খাবার ঘরে অনুসন্ধান করলে হয়। তিনি সুবলকে অতিক্রম করে বাইরে বের হতেই দেখলেন বারান্দায় সেইসব দেহাতি মানুষেরা ক্লান্তিতে শুয়ে পড়েছে। কোথাও এতটুকু স্থান নেই যে, তিনি পা ফেলে তাদের অতিক্রম করে যাবেন। এবং এইসব দেহাতি মানুষদের দেখেই মনে হয়, জল কোথাও আর অবশিষ্ট নেই। শুধু এনজিনে জল আছে এবং তিনি ঈশ্বরের নিকট কেমন অন্যমনস্কভাবে হাতজোড় করে ফেললেন। বললেন, ঈশ্বর, এই নির্জন মাঠে ট্রেন ফের থেমে পড়লে মেয়েটাকে আর জল দিতে পারব না। জল না পেলে বড় ছটফট করবে।

সুবল ঝিমুচ্ছিল। সহসা আর্তনাদে সুবলের ঘুম ভাবটা কেটে গেল। সুবল দেখল সেই সুন্দর সতেজ মুখ বালিকার, অথচ চিৎকার করছে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কোথাও চলে যাব, কষ্ট আর সহ্য হয় না মা! কী যে এক ভীষণ রোগ মেয়ের, মা পর্যন্ত তার দুঃখে আর্তনাদ করছিলেন।

বড় শহরে যাচ্ছে মা—বাবা, মেয়েকে নিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছে। অথবা মনে হচ্ছিল এই মেয়ের জন্যই মা—বাবা প্রবাস ছেড়ে নিজের দেশে চলেছেন। অনেক ডাক্তার দেখানো হল। জলবায়ু পরিবর্তন করা হল। কত টোটকা, কবিরাজি কি—না করেছেন প্রৌঢ় মানুষটি হায়, মনের অসুখ মেয়ের, কেউ কিছু করতে পারছে না। ক্ষণে ক্ষণে বালিকার শুধু জলতেষ্টা পায়।

ছেঁড়া জামা সুবলের গায়ে। সুবলের পরনে প্রায় নেংটির মতো একটু কাপড়। জামাটা হাঁটু পর্যন্ত সুবলের ফুলে—ফেঁপে ছিল। দেখলে মনে হবে, দুটো সুবলকে ভিতরে পুরে রাখা যায়।

সুবল উঠে দাঁড়াল এবং ওর মাথায় লম্বা টিকি দেখে মেয়েটি প্রথমে চিৎকার থামিয়ে দিল। সুবলের বড় বড় চুল, প্রায় চুলে মুখ ঢেকে যাচ্ছে, সুবলের শরীরে ঘাম এবং ময়লায় অথবা বলা যেতে পারে অপরিচ্ছন্নতার গন্ধ। সুবলকে দেখে মেয়েটি এবার ভয়ে যেন গুটিয়ে যাচ্ছে ফের। সে সন্তর্পণে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলল।

সুবল বলল, মা, আমার একটু জল আছে। জলটা ওকে দিতে পারি মা। ওর খুব তেষ্টা পেয়েছে।

মা বললেন, তুমি জল দেবে কী বাছা! জল তোমার কোথায়?

সুবল বলল, এই যে! সে একটা বাঁশের চোঙ বের করে দেখাল।

—এই চোঙায় জল আছে মা। আমার একটি পাখি আছে মা! পাখির জন্য একটু জল নিয়েছি মা।

মা বললেন, না বাছা। জল তোমার বড় নোংরা।

সুবল কোনও কথা বলল না। সে তার পাখিটাকে পাশের পকেট থেকে তুলে এনে হাতের কবজিতে বসাল। নীচে ছোট ছোট পুঁটলি সুবলের। সংসার বলতে যা—কিছু সবই শেষদিকে সুবলের সঙ্গে সঙ্গে থাকত। কারণ ওদের কোনও ঠিক ছিল না কখন কোথায় ওরা থাকবে। বৃদ্ধ পুরোহিত মানুষটি তাদের সকলকে নিয়ে স্থানে স্থানে জলের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন। বৃদ্ধের কথা মনে হতেই অন্য একটা চোঙে পাখিটাকে পুরে রাখল। পোকামাকড় যা—কিছু পাখিটার জন্য, পোঁটলা খুলে দেখল। পোঁটলা খুলতেই ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সেটা হাত থেকে খসে পড়ল, আর পোকামাকড়গুলো পর পর ছড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধের কথা মনে পড়েছে, কামরায় কামরায় খুঁজে দেখলে হয়, কোনও কামরায় তিনি হয়তো আছেন। কারণ সুবল ভেবেছে ভিড়ের সঙ্গে তিনি নিশ্চয় উঠে এসেছেন। কিন্তু পোকামাকড়গুলো ছড়াতেই যাত্রী তিনজন, বিশেষ করে রুগণ মেয়েটি হইচই বাধিয়ে দিল ভয়ে।

পোকামাকড়গুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে। আলোর ভিতর ওরা চোখে দেখতে পাচ্ছে না—বালিকার অথবা প্রৌঢ় ব্যক্তিটির পিঠে শরীরে মুখে বেয়ে বেয়ে উঠে যাচ্ছে। সুবল ভয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এমনটা হবে জানা ছিল না। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে হাত থেকে পোঁটলা খসে পড়বে এবং ঘরময় কীটপতঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে ভাবতে পারেনি সুবল।

ট্রেন বেগে চলছে, মাঝে মাঝে ট্রেনের হুইসল কানে বড় বেশি বাজছে! পাখিটা সুবলের মাথায় হাতে এবং ঘাড়ে উড়ে উড়ে বসছে। পাখিটাকে দেখে মেয়েটি ওর সব দুঃখ যেন ভুলে যাচ্ছে। এমনকি এই যে কীটপতঙ্গ মেঝের ওপর, দেয়ালে দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। কী সুন্দর পাখি, সোনার রঙের ঠোঁট, পায়ে সবুজ ঘাসের রঙ, পাখা কালো, গলার নীচে লাল রিবন যেন বাঁধা, নরম এবং কোমল পাখি। সুবলকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখে পাখিটা, পাখিটার বয়স আর কত, পাখিটা উড়ে উড়ে দেয়ালের দিকে চলে যেতে থাকল এবং একটা একটা করে কীটপতঙ্গ ধরে এনে সুবলের জেবে ভরে দিতে থাকল।

সুবল দেখল, তার পোষা পাখিটা বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেছে। সে যেন ইচ্ছা করলে এই পাখি নিয়ে সকলকে এখন খেলা দেখাতে পারে।

সুতরাং এখন কামরায় চারজন। বিশেষ করে মা—বাবা এই পাখিয়ালা সুবলকে আর ঘৃণার চোখে দেখতে পারছে না। মেয়েটা এই যে এতক্ষণ কেবল ছটফট করছিল—আমার কিছু ভালো লাগছে না মা, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কোথাও চলে যাব মা, মা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? এইসব দুঃখকর কথা আর বলছে না। একটা পাখি, সাধারণ পাখি আর এক পাখিয়ালা, কোথাকার এক পাখিয়ালা, ময়লা, বিশীর্ণ চেহারা, দেহাতি—কোনো আশা—আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু যেন এই পাখি বেঁচে থাক, পাখি থাকলেই সব থাকল, পাখির খেলা দেখিয়ে সে সকলকে বুঝি মুগ্ধ করতে চায়।

টুকুন বলল, এই পাখিয়ালা।

সুবল চোখ তুলে তাকাল।

—পাখিয়ালা, দ্যাখো এখানে একটা লম্বা গঙ্গাফড়িং।

পাখি কী দেখল, সুবল পাখিকে কী বলল বোঝা গেল না। পাখি উড়ে গিয়ে ফড়িংটাকে ঠোঁটে ঠেসে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে টুকুন অতীব আনন্দে হাততালি দিতে থাকল। আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল এসে গেল। যেন বলতে চাইল—পাখিয়ালা, তুমি জাদুকর, জাদু তোমার হাতের খেলনা। এই মেয়ে কতকাল তার হাসি ভুলে ছিল, কতকাল এই মেয়ে আমার হাততালি দেয় না, আনন্দ করে না। পাখিয়ালা, তুমি আমার এই মেয়ের মুখে হাসি ফুটিয়েছ, তুমি বুঝি জাদুকর!

এই করে এখন আর কোনও বেদনার চিহ্ন আঁকা নেই। কোনও জলতেষ্টা নেই।

টুকুন বলল, পাখিয়ালা, তুমি এই পাখি কোথায় পেলে?

—গাছের নীচে দিদিমণি।

—কী গাছ ছিল ওটা?

—একটা শিরিষ গাছ ছিল।

—পাখিটার বুঝি কেউ ছিল না?

—কেউ ছিল না। ওর মা—বাবা ওকে ফেলে রেখে চলে গেছে। কী খরা আমাদের দেশে! কী রোদ ছিল, কী দুঃখ। আমাদের লোকগুলো টুকুনদিদিমণি, তোমাকে কী বলব, আমাদের লোকগুলো সতেরো আঠারো দিন জল খেতে পায়নি।

বাবা বললেন, সুবল, তোমাদের কোনও সরকারি সাহায্য মেলেনি?

সুবল কী বলবে ভেবে পেল না, কিছুদিন কিছু লোক বড় বড় গাড়ি করে পাহাড়ি অঞ্চলে ঘুরে ফিরে গেছে, বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলে গেছেন। ঐসব পরিকল্পনার কথা সুবল বোঝে না। বড় বড় নেতাগোছের মানুষ এসেছিল। দেশের জননী এসেছিলেন। তিনি খিচুড়ি মুখে দিয়ে কেমন খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছে সকলকে, তার স্বাদ চেখে গেছে। কিন্তু মানুষের তেষ্টা দেখে যাননি।

হায়, সুবল যেন বলতে পারত, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো আর। গোরু—ভেড়া নিয়ে মানুষেরা চলে যাচ্ছে, মাটি ফেটে গেছে, শুকনো উত্তাপ, লু বইছে এবং গাছে মৃত ডাল শুধু, মাঝে মাঝে কোনও পাহাড়ের গায়ে দাবানল জ্বলতে দেখা গেছে। এক বুড়ো ঠাকুর সেই দাবানল দেখে বলেছে, দেশের পাপ, এত পাপ আর ধরণী সহ্য করবে না। পাপে দেশ ছেয়ে গেছে, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, মরুভূমির মতো হাহাকার করছে গোটা দেশ। বুড়ো ঠাকুর এই বলতে বলতে একটা গাছের ডালে নিজের বস্ত্র বেঁধে আত্মহত্যা করেছিল।

আর কী দেখেছিল! দেখেছিল সেই চৌবেজীর বউকে। বউটা এমন খরা দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। অভাব দেখে চৌবেজীর বউ অন্ন—বস্ত্রের সব আশা ত্যাগ করা যায় কিনা তার পরীক্ষা করত। সে অন্ন পেলে বলত, বিষ্ঠা খেতে নেই, জল পেলে বলত, বিষ, বিষ খেতে নেই। কাপড় পরতে দিলে বলত, আগুন, আগুন পরতে নেই। চৌবেজীর বউটা রাতে মাঠে নেমে উলঙ্গ হয়ে নাচত। ভয়ে বিস্ময়ে সকলে একদিন দেখেছে, চৌবেজীর বউ শরীরে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সবই অভাবের জন্য এবং অন্নের জন্য। সারা গ্রামময় যখন ওলাওঠা, তখন মহাবীর মা শীতলার একটা মূর্তি বানিয়ে দিনরাত অশত্থ গাছটার নীচে বসে থাকত। মূর্তিটাকে সে সবসময় বগলের নীচে চেপে রাখত। যেন বগল থেকে ছেড়ে দিলে তার শরীরে মায়ের দয়া হবে। বগল থেকে ছেড়ে দিলেই মা শীতলা ওর ভিতরে ঢুকে ওলাওঠা বানিয়ে দেবে।

বস্তুত মহাবীর অভাবের জন্য, অন্নের জন্য, এবং এমন অনাবৃষ্টি আর আকাল দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। সে সেই খড়ের তৈরি মা শীতলাকে বগলে চেপে সারাদিন চুপচাপ বসে থাকত। বিড় বিড় করে বকত। তারপর একদিন সকলে দেখল মহাবীর মাথায় পাগড়ি বেঁধে মা শীতলাকে বগল তলায় রেখে উত্তরের দিকে যাচ্ছে। লোকটা আর এ—অঞ্চলে ফিরে এল না। লোকটা অভাবের জন্য, খরার জন্য পাগল হয়ে গেল, নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

সুবল খুব নিবিষ্টমনে পোঁটলাটা বাঁধছে। এখন আর একটাও পোকামাকড় কামরার ভিতর উড়ে বেড়াচ্ছে না। পাখিটা উড়ে উড়ে সব ক'টি পোকামাকড় ধরে দিয়েছে সুবলকে। তারপর বড় জেবের ভিতর ফুর ফুর করে উড়তে উড়তে ঢুকে গেছে।

ট্রেন চলছিল। বেগে চলছিল। জানালা খুলে সুবল দেখল সারা মাঠে শুধু অন্ধকার। মাঝে মাঝে কোথাও আলো দেখা যাচ্ছে। বোধহয় দূরে কোথাও অন্য ট্রেন লাইন আছে। দূরে একটা ট্রেন বাঁক নিচ্ছে। ঠিক একটা আলোর মালা, সুবলের এই আলোর মালা দেখতে বড় ভালো লাগছিল।

ওর ঘুম পাচ্ছে, মিষ্টি ঠান্ডা বাতাস মনে হচ্ছিল ভিতরে ঢুকছে—বোধহয় রাত শেষ হয়ে আসছে। এই শেষ রাতটুকুতে মনেই হয় না কোথাও কোনও অঞ্চল এখন জলাভাবে পুড়ে যেতে পারে। সুবলের চোখে ঘুম এসে গেল। জেবের ভিতর পাখিটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল।

দুই

অতর্কিতে এই ট্রেনটার চলে যাওয়া—যেন নিমেষে এক বড় সংসার নিয়ে ট্রেনটা উধাও হয়ে গেল। পুরোহিত মানুষটি কী করবেন ভেবে পেলেন না। তিনি ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে উঠে যেতে থাকলেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও কোনও মানুষ অথবা পরিবারকে ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি ভিন্ন ভিন্ন আশার কথা শোনাতেন, হা অন্নের জন্য, জলের জন্য এবং অনাবৃষ্টির জন্য যখন মন্বন্তর আসে তখন হাজার হাজার লোক মরে যায়, মহামারী দেখা দেয়, গোরু—বাছুর সব বিক্রি করে দিতে হয়, শুধু সামান্য কুঁড়েঘর পড়ে থাকে অবশিষ্ট—কিন্তু তারপর ঈশ্বর মঙ্গলময়, তারপর সব পাপের সংসার আগুনে পুড়ে গেলে ঘনবৃষ্টি। বৃষ্টি হলেই নতুন গাছগাছালি, মাঠে সবুজ ঘাস দেখা দেয়, কোথা থেকে সব পাখি উড়ে আসে তখন। কোথা থেকে সব বন্যপ্রাণী নেমে আসে। এবং ধীরে ধীরে অঞ্চলটা তপোবনের মতো হয়ে যায়। তখন আর পাপ থাকে না, শুধু পুণ্য পড়ে থাকে, এই পুণ্যের জন্য আবার শতবর্ষ ধরে ফসল ফলাও, ঘরে উৎসব, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ। তারপর ফের পাপ, ফের হা অন্নের সম্মুখীন হওয়া।

বস্তুত এই বৃদ্ধ পুরোহিত ভোর হলেই আকাশ দেখতেন, তিনি প্রায় সব সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। একটু মেঘ দেখলে চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠত। বুঝি আজই বৃষ্টি হবে। কিন্তু তারপর কোথায় বৃষ্টি, সামান্য মেঘটুকু ফুসমন্তরে আকাশের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেত। তিনি তখন ফের অন্য একটুকরো মেঘের সন্ধানে পাহাড়ের টিলাতে উঠে যেতেন। যেন মৃত সব গাছাগাছালি, কুঁড়েঘর অথবা উত্তর—পশ্চিমের পাহাড় যাবতীয় মেঘকে তার দৃষ্টির আড়ালে রেখে দিয়েছে।

তিনি ভেবেছিলেন মানুষের অসীম দুঃখ—কষ্টের দিন শেষ হয়ে আসছে। এবার এ অঞ্চলে ঈশ্বরের করুণাধারা দ্রুত নেমে এসে মাঠ—ঘাট ভাসিয়ে দেবে। তিনি সেই আশায় পাহাড়ের টিলাতে দাঁড়িয়ে দিগন্তে সামান্য মেঘের অনুসন্ধান করতেন।

অথচ এক ট্রেন এসে এ অঞ্চলের সব লোকজন নিয়ে চলে গেল। শহরের দিকে ট্রেন চলে গেছে। জলের জন্য ট্রেন ধরতে আসা, আর সেই ট্রেনে চড়ে মানুষজনেরা সব চলে গেল।

পাহাড়ের উৎরাই ভেঙে উঠতে ভীষণ কষ্ট। পথ, অন্ধকারে স্পষ্ট নয়। চাঁদের ম্লান আলোটুকু নিভে গেছে। ইতস্তত কিছু কুঁড়েঘর ছোট ছোট পাহাড়ি—উপত্যকা—তিনি পাহাড়ি—উপত্যকায় নেমে গেলেন। পথের দুধারে শূন্য সব কুঁড়েঘর। একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না। অন্ধকার এবং মৃত অরণ্য কেবল ভয়ের সঞ্চার করছে। তিনি চলতে চলতে কিছু কীটপতঙ্গের আওয়াজ পাচ্ছিলেন। ওরা সামান্য জীব মাত্র, এতবড় লোকালয় এখন একেবারে জনহীন।

তিনি হাঁটতে হাঁটতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। কে বা কারা সারাক্ষণ পাহাড়ের নীচে দৌড়াচ্ছে মনে হল। যেন কোনও বন্য জন্তুর দল। ক্লপ ক্লপ শব্দ তুলে খুরে, অনবরত সমতল মাঠে ছুটছে। তিনি দ্রুত পাহাড়ের ঢালুতে নেমে এলেন, মনে হল ভোরের হাওয়া বইছে। মনে হল এবার পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে

গেছে। আর মনে হল শান্ত এক ভাব ধরণীর কোলে। এইসব মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা গাছের গুঁড়িতে পিঠ রেখে বসে পড়লেন। তাঁর ঘুম এসে গেল।

সুবল কীসের শব্দে জেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত জেবের ভিতর, পাখিটা পোষা এবং ভালোবাসার পাখিটা কী করছে দেখতে থাকল। চারিদিকে কোলাহল। ট্রেন বড় একটা স্টেশনে থেমে আছে। কেবল ফুঁসছে ট্রেনটা, সে জানালাতে মুখ রাখতেই দেখল, দেহাতি মানুষগুলো সারা রাস্তায় ট্রেন আটকে জল শুষে নিয়েছে, সেই মানুষগুলো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে। গোটা স্টেশনে একদল পুলিশ। দেখলে মনে হবে না ওদের এই মানুষগুলো সম্পর্কে কোনও কৌতূহল আছে। নির্বিকারভাবে যেন একদল বন্য মানুষকে ঘেরাও করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সবাই পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু হাতে বন্দুক, কিছু ফাঁকা আওয়াজ ওদের সন্ত্রস্ত করছিল।

সুবল এবার দ্রুত নেমে যাবার জন্য দরজা টানতেই দেখল দরজা খুলছে না। সে এবার কামরার ভিতরটা দেখল। এত কোলাহলের ভিতরও টুকুন এবং টুকুনের মা—বাবা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সে ভেবে পেল না এখন কী করবে! সে পুলিশের ভয়ে, নিশ্চয়ই ওরা এসে দরজা খুলে ওকে ধরে নিয়ে যাবে, সে কী করবে ভেবে পেল না! নিশ্চয়ই ওরা এসে ওর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নামাবে। ওর ভয়ে কান্না পাচ্ছিল প্রায়।

ঠিক তখন টুকুন জেগে গেছে। এই সব শব্দে, টুকুন জেগে দেখল, সুবল দরজা খুলতে পারছে না। টুকুন বাবাকে দেখেছিল দরজা লক করে দিতে। সুতরাং সুবল দরজা খুলতে পারছে না। সে সুবলকে কিছু বলার জন্য উঠে বসতেই জানালায় দেখতে পেল একজন পুলিশ ওদের কামরার দিকে ছুটে আসছে। প্ল্যাটফরমে হইচই। মানুষের ছোটাছুটি, এবং কান্না। যারা জল চুরি করেছিল অথবা লুট করেছিল তাদের এখন ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টুকুন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ডাকল সুবল, সুবল। দরজা খুলবে না। দরজা খুললে ওরা ঢুকে পড়বে ঘরে।

সুবল বলল, আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে!

টুকুন বলল, তাড়াতাড়ি এদিকে এসো সুবল। বলে, সে বাংকের নীচে সুবলকে ঢুকিয়ে দিল। তারপর লম্বা চাদর দিয়ে পর্দার মতো একটা আড়াল সৃষ্টি করে সুবলকে অদৃশ্য করে দিল।

সুবল সব পোঁটলাগুলো শিয়রের দিকে রেখে দিল। জেবের ভিতর পাখিটা আছে, সুতরাং সুবল পাখিটাকে একটু আলগা করে রেখে দিল পাশে। পাখিটা এখন প্রায় জড় পদার্থের মতো যেন শীতে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে অথবা পাখিটার ঘুম পাচ্ছিল বোধহয়—খুব জড়সড়ো হয়ে সুবলের শিয়রে বসে রয়েছে। টুকুন তার বিছানার চাদরটা নীচে ঝুলিয়ে দিয়েছে। টুকুন রুগণ এবং দুর্বল। টুকুন কোনওরকমে উঠে বসল এবং চাদর ঠিক মেঝের সঙ্গে মিলে আছে কিনা, সুবলের হাত পা এবং অন্য কোনও অংশ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা দেখবার জন্য উঠে দাঁড়াল। টুকুন বড় দুর্বল, ক্ষীণকায়। সিল্কের দামি ফ্রক গায়ে ঢল ঢল করছে। শুধু সামান্য মুখে সতেজ সুন্দর চোখ কালো জলের মতো গভীর মনে হয়, বেদনার চিহ্ন এই চোখে। দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। টুকুন কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মা এবং বাবা শেষ রাতের ঠান্ডা বাতাসটুকু পেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। সুতরাং টুকুন নিজে ধীরে ধীরে উঠে গেল এবং দরজা খুলে দিল—লম্বা এক পুলিশের মুখ, গোটা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টুকুন খুব আস্তে আস্তে বলল, কেউ নেই।

—কেউ তোমাদের কামরায় ঢুকে লুকিয়ে নেই তো?

—না।

—বড় জালাতন করছে এইসব দেহাতি মানুষগুলো।

টুকুন কোনও জবাব দিল না। কারণ বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তার শরীর এত দুর্বল যে, মনে হচ্ছিল মাথা ঘুরে নীচে পড়ে যাবে। সে পুলিশের কথা প্রায় শুনতে পাচ্ছিল না। এটা প্রথম শ্রেণী, ওরা প্রথম

শ্রেণীর যাত্রী। পুলিশের গার্ড এসেছিল, স্টেশনমাস্টার এসেছিল, ওদের কামরাতে এইসব দেহাতি মানুষগুলো উপদ্রব করে গেছে কিনা, অথবা কোনও দুর্ঘটনার জন্য এই দেহাতি মানুষগুলো দায়ী কিনা অনুসন্ধানের চেষ্টায় আছে।

টুকুন এবার শক্ত গলায় বলল, এ ঘরে কেউ আসেনি গার্ডসাহেব। বলে, সে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বাংকে কোনোক্রমে ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর অবাক টুকুন, কী বিস্ময় টুকুনের, আজ প্রথম কতদিন পর সে নিজে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে পেরেছে। সে কতদিন পর নিজের পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে পেরেছে। সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মা—বাবা ঘুমুচ্ছেন। মা—বাবা দেখতে পেলেন না টুকুন নিজে উঠে বসেছে এবং নিজে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। দরজা বন্ধ করেছে।

সে মা—বাবাকে ডাকেনি, কারণ মা—বাবা হয়তো ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দিয়ে সব বলে দিতেন। হ্যাঁ, এসেছিল, সুবল এক পাখিয়ালা, সে পাখিয়ালা এসেছিল দলবল নিয়ে, সে তার দলবল নিয়ে এই ঘরের শেষ জলটুকু নিঃশেষ করে গেছে। মাকে হয়তো বোঝাতেই পারত না, সুবল এক পাখিয়ালা এসে টুকুন নামে এক রুগণ স্থবির বালিকার পায়ে শক্তি সঞ্চার করতে সাহায্য করেছে। টুকুন মাকে বাবাকে তার এই বিস্ময় দেখানোর জন্য ডাকল, মা, মা!

সে ডাকল, বাবা, বাবা!

ট্রেন চলছে। ভোর হয়ে আসছে। জানালা দিয়ে আবার বড় মাঠ দেখা যাচ্ছে। ট্রেনের তার দেখা যাচ্ছে। পাখিরা ভোরের আলোতে উড়ে যাচ্ছিল। এই মাঠ দেখলে এখন আর কোনও জলকষ্টের কথা মনে পড়ছে না। কিছুটা সবুজ আভা এখন দেখা যাচ্ছে। গ্রামে মানুষের চালাঘর, গোরুবাছুর এবং মাঠে সামান্য শস্য দেখা যাচ্ছিল। টুকুন খুব ধীরে ধীরে তখনও ডাকছে, মা, বাবা, দেখো দেখো। মা, বাবা, ওঠো ওঠো। দেখো তোমরা, তোমরা দেখো, টুকুন শুয়ে নিজের মায়ের ওপর কোমল হাত রাখল।

সুবল বাংকের নীচে চুপ মেরে শুয়ে আছে। এখন বের হলে যে কোনও আর ভয় নেই সে তা বুঝতে পারছে না। ওর ধারণা পুলিশ এখনও এই ট্রেনে দলবল নিয়ে ঘুরছে। সে এতটুকু নড়ছিল না। সে পাখিটাকে পর্যন্ত হাতের ইশারাতে দুষ্টুমি করতে বারণ করে দিল। কারণ ভোর হয়ে গেছে বোধহয় আর খরা অঞ্চলের ওপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে না। সে ট্রেনে শুয়ে শস্যের গন্ধ পেল। এই শস্যের গন্ধ পেয়ে পাখিটা কেমন শক্তি পাচ্ছে ভিতরে। ওর ফুর ফুর করে উড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল। সে এত উত্তেজিত যে বাংকের নীচেই দু'বার ফুর ফুর করে উড়ে মাথায়—মুখে এসে সুবলের পাশে বসে পড়ল।

সুবল এতটুকু নড়ছিল না। সে পাখিটার দুষ্টুমি ধরতে পেরে বাঁশের অন্য একটা চোঙ টেনে আনল সন্তর্পণে। তারপর পাখিটাকে চোঙের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। এবং মুখ বন্ধ করে বলল, বড় বজ্জাত পাজি তুই। বড় শহরে না গেলে তোমাকে আর ছেড়ে দিচ্ছি না।

টুকুন নিজের পায়ের ওপর চোখ রেখেছিল বিস্ময়ে! মা—বাবা উঠে গেছেন। টুকুন ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, মা, আমি উঠে দরজা পর্যন্ত গেছি, দরজা খুলে দিয়েছি।

মা এত বিস্মিত যে কথা বলতে পারছিলেন না। বোধহয় টুকুন স্বপ্নের কথা বলছে।

—বাবা, পুলিশ এসেছিল।

বাবা টুকুনকে দেখতে থাকলেন। কথা বলতে পারছিলেন না।

—বাবা, সত্যি আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। ওরা সুবলকে ধরতে এসেছিল। আমি বলেছি এখানে কেউ নেই।

বাবা এবার দরজার দিকে চোখ তুলে দেখলেন, দরজা তেমনি লক করা আছে। তিনি ভাবলেন টুকুন হয়তো কোনও স্বপ্ন দেখেছে। টুকুন স্বপ্ন দেখেছে কোনও মাঠ অথবা ওর প্রিয় লেবুতলায় সে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। ওর শরীরের সমস্ত শিরা—উপশিরা শুকিয়ে আসছে। পায়ের কোথাও আর শক্তি অবশিষ্ট নেই। কেমন ক্রমশ টুকুন স্থবির হয়ে যাচ্ছিল। কোথাও কোনও জায়গা নেই, বড় ডাক্তার নেই যেখানে তিনি

টুকুনকে নিয়ে না গেছেন। হতাশা এখন সম্বল। মেয়েটা ক্রমশ পঙ্গু হয়ে যাবে তারপর সতেজ মুখে আর কোনও বিষণ্ণ ছবি ঝুলে থাকবে না। টুকুন মরে যাবে। বাবা তার এই স্বপ্নটুকু ভেঙে দিতে চাইলেন না।—বাঃ, বেশতো টুকুন, তুমি হেঁটে গিয়েছ, বাঃ, বেশতো। আমি তো বলেছি তুমি আজ হোক কাল হোক হাঁটতে পারবে। তুমি হেঁটে হেঁটে কোথাও না কোথাও চলে যেতে পারবে।

—বাবা, আমি হেঁটে হেঁটে এই বাংকে এসে শুয়ে পড়েছি। আমি সুবলকে পর্দার আড়ালে রেখে দিয়েছি, সব আমি বাবা নিজের হাতে করেছি। আমি পায়ে হেঁটে করেছি। বলে টুকুন ফের উঠে বাবাকে দেখাতে চাইল, আমি হাঁটতে পারি, মাকে দেখাতে চাইল, এই দেখ আমার পায়ে কেমন শক্তি, কিন্তু হায়, টুকুন শত চেষ্টা করেও পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারল না, অতীব আশার উত্তেজনা ওকে বড় অসহায় করে তুলছে। তবে কী সব ভোজবাজির মতো হয়ে গেল! টুকুন কত চেষ্টা করল। কতভাবে চেষ্টা করল। প্রাণে সকল আবেগ ঢেলে চেষ্টা করল, কিন্তু হায়, টুকুন কিছুতেই আর নিজের চেষ্টায় উঠে বসতে পারল না। টুকুন ভয়ঙ্কর হতাশায় ফের কেঁদে ফেলল, মা, আমার কিছু ভালো লাগে না, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, কোথাও আমি চলে যাব।

হায়, মেয়েটার দিকে এখন আর তাকানো যাচ্ছে না। সতেজ মুখে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। সাদা জামা, চোখের জলে ভিজে গেল। সারাজীবন ধরে কান্না। কী এক দুরারোগ্য ব্যাধি, কী এক অসীম হতাশা এই পরিবারকে ক্রমশ গ্রাস করছে। টুকুন ক্রমশ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। হাত—পা অচল হয়ে যাচ্ছে। ভিতরের শিরা—উপশিরা শুকিয়ে যাচ্ছে, রোগের কোনও কারণ নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

ট্রেন চলছিল। পাখি উড়ছিল আকাশে। লাইনের তারে কিছু শালিখ পাখি দেখতে পেল ওরা। কত গ্রাম—মাঠ ফেলে ট্রেন ছুটছে। জানালায় ছোট ছোট কুঁড়েঘর, বড় দিঘি, কালো জল, সবুজ মাঠ ভেসে উঠছিল। যত ট্রেন বড় শহরের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে তত লোকালয়, ইট—কাঠের বাড়ি, কারখানার চিমনি এবং লোহার পুল। সুবল বাংকের নীচে থেকে উঠে এলে দেখতে পেত সব। বোধহয় সুবল ফের ঘুমিয়ে পড়েছে বাংকের নীচে। সুবলকে ঘুমুতে দেখে পাখিটা চোখের ভিতর কিচমিচ করছিল। ছটফট করছিল ভিতরে। ফুর ফুর করে ওড়বার ইচ্ছা পাখির, পাখি কেন আর এখন চোঙের ভিতর থাকবে। দুষ্টু পাখি সুবলের কানের কাছে চোঙের ভেতর থেকে বের হবার জন্য কিচমিচ করে প্রায় কোলাহল জুড়ে দিল।

বোধহয় সুবল পুলিশের ভয়ে ঘাপটি মেরে আছে। নড়ছে না। পাখিটা চোঙের ভেতর থেকে ভাবছে সুবল ঘুমোচ্ছে। টুকুন ভাবছে সুবল ঘুমুচ্ছে। মা—বাবা এ—ঘরে সুবল আছে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। কারণ এঁরা সুবলকে দেখতে পাচ্ছেন না। চাদরটা মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সুবলের হাত—পা—মুখ কিছু দেখা যাচ্ছে না। সবটাই স্বপ্ন টুকুনের। সুবল, পাখিয়ালা সুবল চলে গেছে।

আর ঠিক তক্ষুনি সুবল চাদর ফাঁক করে কচ্ছপের মতো মুখ বার করে বলল, মা পুলিশ দরজায় দাঁড়িয়ে নেই তো। মা, আমরা আর কতক্ষণ ট্রেনে? পুলিশ আমাকে ধরবে না তো! টুকুন শুয়ে শুয়ে বলল, তুমি কতদূর যাবে সুবল?

—আমি কলকাতা যাব দিদিমণি।

—সেখানে কে আছে সুবল?

—আপন বলতে কেউ নেই। বলে সুবল হামাগুড়ি দিয়ে চাদরটা সরিয়ে বের হয়ে এল। নোংরা জামাকাপড় বলে সে এক কোণায় মেঝের ওপর জবুথবু হয়ে বসল। সে দু'হাত জোড় করে বলল, মা, পাখিটা আমার বের হতে চাইছে। বের করব? পাখিটা একটু উড়তে চাইছে।

পাখিটা হেগে—মুতে দিতে পারে এই ভয়ে প্রৌঢ় মানুষটি কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করছিলেন। নোংরা সুবলকে সহ্য করতে পারছিলেন না। যেখানে সুবল বসছে ঠিক সেখানেই নোংরা লাগাচ্ছে। কিন্তু টুকুন পাখির নাম শুনেই বলল, সুবল, তুমি এখন পাখি ছেড়ে দিলে মাঠে উড়ে যাবে?

—না দিদিমণি। পাখি আমার পোষা। পাখির মা নেই বাবা নেই, আমার মতো পাখির কেউ নেই। আমাকে ফেলে পাখি আর কোথাও যাবে না দিদিমণি।

—দেখি, কেমন যায় না!

—কেন দিদিমণি, তুমি দ্যাখোনি পাখিটা আমাকে কেমন সব পোকামাকড় ধরে দিয়েছে?

—তা দিয়েছে তোমার পাখি।

—তবে এই দ্যাখো। বলে চোঙের মুখ খুলে দিল সুবল। সেই পাখি সোনার ঠোঁটে কিচমিচ করে উঠল। পেটের দিকে সাদা রঙ, পাখা কালো আর ঘন সবুজ রঙ পাখির পায়ে। পাখিটা প্রায় নেচে নেচে বেড়াল সারা কামরায়। পাখিটা দেয়ালে উড়ে গিয়ে বসল, ওপরের বাংকে বসে উঁকি দিয়ে যেন গাছের ডালে বসে উঁকি দিচ্ছে তেমনি পাখিটা নীচে টুকুনকে দেখল। টুকুন পাখিটাকে দেখল, মাঠের ভিতর খোলা আকাশের নীচে এই পাখি কত সুন্দর দেখাত—সুবল এক পাখিয়ালা কলকাতা যাচ্ছে। যেন বলছে, দেখো দেখো খেলা দেখো, পাখি আমার খেলা দেখাবে, নাচবে, গাইবে, হাওয়ায় উড়বে, ষাঁড় গোরুর মতো, ভালুক অথবা বাঁদর নাচের মতো, সুবল এক পাখিয়ালা কলকাতা নগরীতে অন্নসংস্থানের জন্য যাচ্ছে।

পাখিটা জানালায় বসল, পাখিটা টুকুনের শিয়রে বসে লেজ নাড়ল। আর পাখিটাকে টুকুন সামান্য আপেলের টুকরো দিল খেতে। শিয়রে বসে টুকুনের হাত থেকে পাখিটা ফলের নরম অংশ ঠুকরে ঠুকরে খেল।

তখন সুবল বসেছিল নীচে। ওর পোঁটলার ভিতর লুকনো বটফল, একমুঠো ফল মুখে ফেলে দিয়ে চিবুতে থাকল। প্রায় যখন ফেনা উঠে গেছে মুখে তখন দলাটা কোঁৎ করে গিলে ফেলল সুবল। ফের একমুঠো, ফের ফেনা ওঠা পিষ্টক সে খেয়ে সামান্য পাখিটার জন্য রেখে দিল হাতে।

সুবলের এই নোংরা স্বভাব দেখে টুকুনের মা ঘৃণায় মুখ কোঁচকাল, ঘৃণায় একবার চেকারবাবুকে ডেকে বলবে কিনা ভাবল, এখন তো খরা অঞ্চল নেই, এখন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের ভয় কি! সুতরাং এবার প্রায় টুকুনের মা ধমক দিয়ে বলল, সামনের স্টেশনে তুমি বাপু নেমে যাবে।

সুবল বলল, তাই যাব মা। স্টেশনের কী নাম?

—স্টেশনের নাম ব্যান্ডেল।

—যাব মা। সেখান থেকে কলকাতা কতদূর মা?

অত কথা শুনতে ভালো লাগল না। কোথাকার কোনও এক মানুষ, উটকো মানুষ মা মা বলে একেবারে কামরাটাকে কদাকার করে তুলছে। সে বলল, মা, আমি তো আপনাদের কোনও অনিষ্ট করছি না।

টুকুন শুনছিল সব। সে দেখল সুবল ভয়ে কেমন চুপ মেরে গেছে। সুবল ওর সব সম্বল নিয়ে এসেছে বলে পোঁটলা খুলে দেখল, ছোট ছোট পোঁটলার কোনোটায় চন্দনের বীচি, কোনোটাতে পুঁতির মালা।

তার মা একবার মেলা থেকে একটা পুঁতির মালা কিনে দিয়েছিল আর রঙবেরঙের সব পাথর, সে সেইসব পাথর পাহাড়ের নুড়িপাথর থেকে সংগ্রহ করেছে। সে কিছুই ফেলে না। যা ভালো লাগে, যা কিছু ভালো লাগে—সবই সঞ্চয়ের সামিল এই ভেবে সব সে সঞ্চয়ের ঝুড়িতে জমা রেখে দিত। চন্দনের বীচি, কুঁচফল এবং ভিন্ন ভিন্ন পাথরের উজ্জ্বল রঙ টুকুনকে পুলকিত করছিল। টুকুন মাকে ভয় পায়, মা সুবলকে নেমে যেতে বলেছেন, টুকুনের কষ্ট হচ্ছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল টুকুনের, কারণ সুবলের কেউ নেই—কত আর বয়েস সুবলের, সে সময় পেলে পাখির খেলা দেখায়। অথবা কোনও কোনও সময় ঋষিপুত্রের মতো মনে হয় যেন সুবলকে, সবচেয়ে বড় আশ্চর্য, সুবলের জন্য টুকুন দরজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পেরেছিল। যেন এক দৈবশক্তি ভর করেছিল টুকুনের পায়ে। অথবা সুবল মন্ত্র—তন্ত্র পড়ে টুকুনকে হাঁটতে সাহায্য করেছে। এই সুবল চলে গেলে সে সত্যই পঙ্গু হয়ে যাবে। আর কোনওদিন সে হেঁটে গিয়ে জানালায় দাঁড়াতে পারবে না, কোনওদিন সে খোলা আকাশের নীচে আর দৌড়তে পারবে না।

তিন

তখন খোলা আকাশের নীচে একটা গাছ, কী গাছ হবে, চড়ুইগাছ অথবা অর্জুন গাছ হতে পারে। গাছে পাতা নেই, রোদ এসে মুখের ওপর পড়ছে, প্রথমে মনে হচ্ছিল কেউ অন্ধকার রাতে ওর সামনে আলো বহন করে এনেছে, সে সচকিত হয়ে চোখ খুলল, মাথার ওপর প্রখর রোদ, সামনে খোলা মাঠ, শুধু ধুধু করছে মাঠের রোদ। ঝিল্লির আঁকাবাঁকা রেখা দিগন্তে পাখির মতো উড়ে উড়ে যাচ্ছে। মরীচিকার মতো মনে হচ্ছিল। বৃদ্ধ পুরোহিত প্রথমে শরীরের আলখাল্লা খুলে ফেললেন। মরীচিকার মতো এই জলের চিহ্ন তিনি দেখতে পাচ্ছেন, মাঠ পার হয়ে হয়তো আকাশের নীচে কোথাও কোনও মেঘের টুকরো উঠে আসছে, তিনি জলের সন্ধানে এই মরুভূমির মতো প্রান্তরে ছুটতে থাকলেন। তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না। তিনি প্রায় পাগলের মতো ছুটে চলেছেন, যদি কোথাও কোনও জলের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

আর তিনি ঠিক নীচে এসে যেখানে গতকাল মানুষেরা নদীর ঢালুতে জল অনুসন্ধান করে গেছে, সেখানে থমকে দাঁড়ালেন। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে একটি ছোট্ট পাহাড়ের শিরা বের হয়ে এসেছে। দু'দিকে পাহাড়ের উপত্যকা গিরিখাতের মতো সৃষ্টি করেছে। তারই নীচে ছোট পাতকোর মতো গর্ত। বালুর পাহাড় চারধারে। একের পর এক এই সব গর্ত গতকাল তাঁর দলের মানুষেরা করে গেছে। কোনও গর্তেই জল নেই তিনি তা জানতেন। শুধু দূরে দেখলেন তিনটি ছোট ছোট প্রাণী একটা গর্তের চারধারে কেবল ঘুরছে। এই খরা অঞ্চলে, জলের অভাবের জন্য যেখানে কোনও পাখপাখালি পর্যন্ত নেই, যেখানে কোনও কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না, সেখানে এমন তিনটি প্রাণী দেখে বিস্মিত হলেন।

তিনি যত এগুচ্ছিলেন তত এইসব ছোট ছোট প্রাণীগুলোকে কেমন চঞ্চল দেখাচ্ছিল। কাছে গেলে বুঝতে পারলেন দুটো হরিণ শিশু জলের জন্য পাশের সংরক্ষিত বন থেকে এখানে ছুটে এসেছে। ওঁকে দেখে তারা ছুটে পালাল না! শুধু সামান্য লাফ দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল। তিনি গর্তের পাশে দাঁড়ালে আরও বিস্মিত হলেন—একটা বড় হরিণ গর্তের ভিতর পড়ে গেছে, হরিণটার হাঁটু পর্যন্ত জল, সে তার শিশুদের জল দেবার জন্য নীচে লাফিয়ে পড়েছে। আর উঠতে পারছে না। কেবল ভিতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। বৃদ্ধকে দেখে কেমন কঁকিয়ে কঁকিয়ে একটু শব্দ করল তারপর বৃদ্ধকে অপলক দেখতে থাকল।

তিনি এবার হরিণ শিশুদের অতিক্রম করে সেই গর্তে নেমে গেলেন। নীচে নেমে হরিণটাকে পাড়ে উঠতে সাহায্য করলেন। তারপর আলখাল্লাটা জলে ভেজালেন। হরিণী একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাচ্চাগুলোর জন্য অপেক্ষা করছে। জলের পিপাসা ওদের এত বেশি যে, ওরা জল খাবার জন্য ঝুঁকে পড়ছিল গর্তে। প্রাণের মায়া ছিল না। বৃদ্ধ আলখাল্লা ভিজিয়ে জল তুলে আনলেন। একটু একটু করে তিনি সেই তিনটি শিশুকে আলখাল্লা চিপে জল খেতে দিলেন। ওরা জল খেল, লাফাল, তারপর হরিণীর সঙ্গে সেই বনের দিকে ছুটে যাবার জন্য পাহাড়ের কোলে উঠে গেল।

যতক্ষণ না ওরা তিনজন হারিয়ে গেল ততক্ষণ বৃদ্ধ সেই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এখন আর যেন কিছু করণীয় নেই। বালির নীচে চোরা স্রোত, এই স্রোতের সন্ধান যদি তিনি গতকাল পেতেন তবে বুঝি এইসব অঞ্চলের অন্তত কিছু কিছু মানুষকে শস্য এবং সুদিনের আশ্বাস দিয়ে ধরে রাখতে পারতেন। কিন্তু হায়, ওরা এখন সব বিবাগী। ওদের ছোট ছোট কুঁড়েঘর পড়ে আছে। পাহাড়ি উপত্যকাতে এই সময় অন্যান্য বছর যখন বর্ষার জলে মাটি ভিজতে থাকে তখন এক মেলা হয়, উৎসব হয়, উৎসবে তিনি প্রধান মানুষ। এই উৎসব শস্যের জন্য, সম্পদের জন্য, কতকাল থেকে পৈতৃক এই ব্যবসা তাঁর। সকলের বিশ্বাস এখন তিনিই একমাত্র মানুষ যার মন্ত্রের উচ্চারণে আর তেমন শক্তি নেই। হোমে তিনি যে বিল্বপত্র দান করেন এখন তা আর তেমন পবিত্র নয়—নিশ্চয় কোথাও না কোথাও তিনি তাঁর পবিত্র জীবন থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। মানুষের বিশ্বাসভঙ্গের দায়ভাগ তাঁর ওপর।

বৃদ্ধ পুরোহিতের নাম জনার্দন চক্রবর্তী। তিনি জলের ভিতর তাঁর মুখ দেখে আঁতকে উঠলেন। চোখে—মুখে অবসাদ, বড় বড় দাড়িতে মুখ ঢেকে গেছে, তিনি ক্রমশ কেমন বন্য জীবের মতো হয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে

বনমানুষের মতো মনে হচ্ছে। তিনি রোদের জন্য ওপরে দাঁড়াতে পারছিলেন না। তিনি উলঙ্গ হলেন এবং হাঁটুজলে নেমে শরীরে মুখে জল ঢেলে দিলেন। সমস্ত ক্লান্তি এবং অবসাদ শরীরের ক্রমশ কেমন উবে যাচ্ছিল। দীর্ঘদিন পর ঠান্ডা জলের এই স্নান তাঁকে সুখী এবং তাজা যুবকের মতো ফের সেই পুরানো মন্দিরে উঠে যেতে প্রেরণা দিচ্ছে। তাঁর সেই স্বপ্নের কথা মনে হল, জলের জন্য অনুসন্ধান, স্বপ্নে কে যেন বলল—অনুসন্ধান কর, কোথাও না কোথাও নদীর ঢালুতে চোরা স্রোত রয়েছে, তুমি তাই খুঁজে বের কর।

সে আবার চিৎকার করে উঠল, মা সুবচনী, তোর জয় হোক! কিন্তু মা তোর মনে কী এই ছিল? তোর মাটিতে মা ফসল ফলে না, তোর মাটিতে মা আর পালা—পার্বণ নেই, সব খা খা করছে, সব জনহীন প্রাণীহীন মা, আমি এখন এই জলে কী করব মা। তোর জলে তুই ডুবে মর। তুই ডাইনি। সকলের হাড়—মাংস খেয়ে তুই সুবচনি এখন ধেই ধেই করে নাচছিস।

জনার্দন পাড়ে উঠে আলখাল্লা এবং পরনের কাপড়টা কাঁধে ফেলে একবার চারিদিকে তাকালেন। কবে সব মানুষজনদের নিয়ে তিনি জলের সন্ধানে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে চলে এসেছিলেন, এখন যেন আর তা মনে পড়ছে না। ভালোবাসার মাটি সকলে ছেড়ে চলে গেলে কী আর থাকল। জনার্দন, এই মাটি ছেড়ে সকলে কোথাও চলে যাবে ভাবতেই জলের জন্যে হতাশ হয়ে মরছিল। পাড়ে উঠে দেখল—তাঁর আবাস অনেক দূর। এত দূর তিনি হেঁটে যেতে পারবেন না, বিশেষ করে এই খরার রোদে। তিনি বালুর ওপর আর পা রাখতে পারছিলেন না, সূর্য যত ওপরে উঠে আসছে তত পায়ের নীচের উত্তাপ প্রখর মনে হচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি কোনও নিকটবর্তী গ্রামে উঠে যাবার জন্য প্রায় ছুটে চললেন। পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরে এখন অন্তত সময়টা কাটিয়ে বেলা পড়ে এলে পর ছোট পাহাড়ে চলে যাবেন।

গ্রামের ভিতর ঢুকতেই জনার্দনের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। এখন আর এখানে মানুষের কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। প্রিয় কদমফুল গাছটা মরে গেছে। পুকুরের মাটি ফেটে গেছে। সব কেমন জ্বলেপুড়ে খা খা করছিল। কোথা থেকে পচা দুর্গন্ধ আসছিল। জনার্দন ছোট একটা কুঁড়েঘর দেখে ভিতরে ঢুকে গেলেন। বস্তুত জনার্দন ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন দরজার পাশে একটা ছেঁড়া গামছা ঝুলছে এবং বাতাসে গামছাটা নড়ছিল। জনার্দন ভয়ে দরজা বন্ধ করে বসে পড়লেন। মনে মনে বললেন, মা সুবচনি, এত ভয় কেন প্রাণের জন্য। কীসের ভয় মা। আর তো কেউ নেই মা। আমি পুত্র—কন্যাবিহীন। শুধু এক অহঙ্কার ছিল মা। অহঙ্কার আমার এই উপবীতের। তিনি তাঁর উপবীতে হাত রাখলেন। পুরুষানুক্রমিক এই উপবীত, উপবীতের অহঙ্কার, কে যেন হেঁকে গেল মাঠে, ঠাকুরমশাই, মেয়ের বিয়ে কোন মাসে দেব, ঠাকুরমশাই মাথা চুলকে কী দেখলেন, তারপর বইয়ের পাতায় কী পড়লেন, শেষে বলে দিলেন, সাতাশে শ্রাবণ। সন্তানের কী নাম হবে, তিনি নাম বলে দিতেন, পুত্র হবে না কন্যা হবে, তিনি বলে দিতেন, কবে জমিতে ধান চাষ হবে—তিনি বলে দিতেন, কালবৈশাখীর ঝড় থেকে রক্ষার জন্য ভৈরব পূজা দিতেন। বৃষ্টি না হলে হোম করতেন। সময়ে অসময়ে বৃষ্টি ঝড়ে পড়ত। জলে ভেসে যেত মাটি। লাঙল কাঁধে তুলে সুবচনির মন্দিরে চাষি মানুষেরা যেত, তিনি লাঙলের ফলাতে সুবচনির তেল সিঁদুর মেখে দিতেন, গৃহস্থগণ চাষ করে আপন ঘরে সম্বৎসর সোনার ফসল তুলত।

জনার্দন ঘর অন্ধকার করে বসে থাকলেন। ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ, ঘরের ভিতর একটা ছেঁড়া বালিশ—তিনি তার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। দিনের বেলাতে আর বের হওয়া যাবে না বোধ হয়, চারিদিকে লু বইছে। মাথায় মুখে কাপড় জড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। তিনি স্থির করলেন, দিনের বেলাতে সুবচনির মন্দিরে নিদ্রা যাবেন, রাতের বেলাতে উঠে খাদ্য অন্বেষণ এবং অন্যান্য কাজ, কী করে এই মাটিকে উর্বর করা যায়, কী করে ফের মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে বৃষ্টিপাত ঘটানো যায়, সে সবের চেষ্টা।

কারণ জনার্দন ঠাকুরের মন্ত্রের ওপর জনগণের বড় বিশ্বাস ছিল। এই অঞ্চলের দেবী সুবচনি, এই অঞ্চলের রক্ষার দায়িত্ব তাঁর। আর জনার্দন ঠাকুর পুরুষানুক্রমিক দেবীর সেবাইত। পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস, অঞ্চলের মানুষদের বিষয় সম্পর্কে জনার্দন ঠাকুর—প্রায় যেন ঈশ্বরের কাছের মানুষ। অশিক্ষিত গ্রাম্য এবং পূর্ণিয়া

অথবা বিহার—বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ এরা। কিছু পাহাড়ি আদিবাসী। কিছু বাঙালি। ভাষা, বিহার—বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের। বড় গরিব মানুষগুলো। যা ফসল ফলত মাঠে, ওরা সোনার ফসল ভেবে নিত। এভাবে ওদের বছরের পর বছর কেটে গেছে। জলের কষ্ট ছিল, কিন্তু জলের অভাবে গোরু—বাছুর মরে যায়নি, অন্নের কষ্ট ছিল মানুষের—কিন্তু কেউ অনাহারে থাকে না। মা সুবচনি, বড় জাগ্রত, বড় লক্ষ্য তাঁর সন্তানের ওপর।

বিস্তীর্ণ পাহাড় আছে, শাল—শিমুলের গাছ আছে, বনে পাখি আছে, হরিণ আছে, আর কত রকমের মূল আছে গাছের যা তুলে ক্ষুধায় খেলে অন্নকষ্ট দূর হয়, শরীরে শক্তি সঞ্চার হয়। গৃহস্থের সোনার ফসল, গরিবের মুনিষ খেটে খাওয়া, কাজ না থাকলে, বনে—পাহাড়ে ঘুরে বেড়াও সকল অন্নকষ্ট দূর হয়ে যাবে। তেমন অঞ্চলে পর পর তিন বছর খরা গেল—সকলে দুঃস্বপ্ন দেখল—বুঝি এই অঞ্চল মরুভূমি গ্রাস করে নিচ্ছে।

সুতরাং মানুষেরা যাদের সহায়—সম্বল আছে তারা শহরে চলে গেল, মড়কে কিছু লোক সাফ হয়ে গেল আর বাকি যারা ছিল এতদিন তাদের জনার্দন ঠাকুর নানারকম আশ্বাস দিয়ে ধরে রেখেছিলেন, কিন্তু হায়, কোথাকার এক ট্রেন এসে তাদেরও নিয়ে চলে গেল। জনার্দন দুঃখে হতাশায় ভেঙে পড়লেন। তবু হায়, জনার্দন ঠাকুরের এই মাটির জন্য আশ্চর্য এক ভালোবাসা। এমন মাটি, ভালোবাসার মাটি, কোথাও যেন তাঁর নেই। তিনি এখানে রাজার মতো ছিলেন, মানুষের কাছে তিনি এখানে পিরের মতো। সেই মানুষেরা চলে গেছে। সেই সব ভালোবাসার মানুষেরা চলে গেছে। তিনি তাদের আর কিছুতেই বুঝি ফেরাতে পারবেন না। তাঁর বাপ—পিতামহের গল্প, দেবীর সব পৌরাণিক ইতিহাস, এবং যা চমকপ্রদ, ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রবাদ এই মাটির সঙ্গে মিশে আছে। কেউ আর স্মরণ করবে না, জনার্দন ঠাকুরের পরিবার দশ পুরুষ আগে পূর্ববাংলার কোনও এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে এখানে সুবচনি দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখন এত লোকালয় ছিল না, দেবীর আশীর্বাদ পাবার লোভে মানুষেরা এই পাহাড়ের নীচে বসতি স্থাপন করেছিল। তারপর থেকে এই জনার্দন এবং তাঁর পরিবার পৌরাণিক ধর্ম বিশ্বাসের মত।

জনার্দন ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে ফের উপবীতে হাত রেখে বিড় বিড় করে কী যেন আওড়ালেন, যেন তিনি শপথ করছেন। কীসের শপথ স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবু তাঁকে দেখলে মনে হল আমৃত্যু এই মাটির সঙ্গে তাঁর লড়াই। দেবীর সঙ্গে তাঁর লড়াই। ঊষর এই দেশকে উর্বর করে তোলার জন্য তাঁর সংগ্রামকে বড় স্বাস্থ্যকর মনে হবে। কিন্তু তাঁর মুখের ছবি, চোখের দৃঢ়তা এবং উপবীতের অহঙ্কার তাঁকে যেন বড় এক লম্বা দৈত্যের মতো বড় করে ফেলেছে! ভয়ঙ্কর খরা, বাইরের লু আর ঊষর প্রকৃতি তাঁকে নিরস্ত করতে পারল না।

শরীর—মন—প্রাণ শক্ত করার জন্য তিনি বিড়বিড় করে দেবী সুবচনির পাঁচালি পড়তে থাকলেন, সুবচনি মায় বাড়ি বাড়ি যায়, বাড়ি বাড়ি গেলে মায় আমার ধান্য—দূর্বা পায়। আরও কী বলার ইচ্ছা যেন। যেন বলার ইচ্ছা মা, তোর এত ছেলে আছে, আর তুই তোর মাটির ছেলেদের সব একসঙ্গে গ্রাস করে ফেললি! জনার্দন চিৎকার করে উঠলেন, সুবচনি মায়গ আমার বড় দয়াময়, ছেলে কোলে লইয়া ঘোরে পাড়াময়। জনার্দন আবছা অন্ধকারের ভিতর উঠে বসলেন, বললেন, তুই যদি দয়াময়ী হস মা, তবে তোর এই রাক্ষুসী মুখ দেখতে পাচ্ছি কেন?

তখন সারা মাঠ খা খা করছিল। চিতার মতো জ্বলছে গ্রাম—মাঠ গাছগাছালি। জনার্দন পরিত্যক্ত এক কুঁড়েঘরে বসে আছেন। তিনি ভিজা আলখাল্লাটা গায়ের ওপর রেখে দিয়েছিলেন, এখন সেই আলখাল্লা এবং কাপড় দুই—ই শুকিয়ে প্রায় শক্ত কাঠ।

তিনি কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। বিশ—ত্রিশ ক্রোশ হেঁটে শহরের দিকে চলে যাবেন—কিন্তু যা খবর সেখানেও লোক নেই। লোক সব শহর—গঞ্জ ছেড়ে দিচ্ছে। সরকার থেকে যা সামান্য সাহায্য আসছে তাও বন্ধ। সরকার থেকে যে পাতকুয়া গ্রামের মাঠে কাটা হয়েছিল, তাতে জল নেই। সুতরাং জনার্দন ক্রমশ

ভেঙে পড়ছেন। ওঁর প্রবল আবেগ, ঊষর জমি উর্বর করে তোলার আবেগ ক্রমশ মরে যাচ্ছিল। কারণ সর্বত্র এই হাহাকারের দৃশ্য—জনার্দন এবার পাগলের মতো দরজা খুলে দিলেন এবং তপ্ত মাঠের ওপর দিয়ে লু—এর ভিতর দিয়ে শ্মশানের মতো এক সাম্রাজ্য শুধু চারিদিকে—জনার্দন চোখ—মুখ বন্ধ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই পাহাড়ের উদ্দেশ্যে ছুটছেন।

চার

তখন ট্রেনটা ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ছাড়ব ছাড়ব করছে। সুবল কামরা থেকে নেমে গিয়েছিল, নেমে গিয়ে দেখল বড় একটা চোঙ দিয়ে আকাশ ফুঁড়ে যেন জল পড়ছে। এত জল! সে অবাক হয়ে তাকাল পশ্চিমের দিকে, সেখানেও বড় একটা চোঙ থেকে জল পড়ছে আকাশ থেকে। এত জল। সুবল দেখল নীচে ছোট ছোট টিপকল, কেবল জল আর জল। সে তাড়াতাড়ি পোঁটলাপুঁটলি রেখে জলে স্নান করে নিল। জল আর জল। চোখ—মুখে জল পড়তেই শরীরের সব অবসাদ কেটে গেল। যেন সমস্ত শরীরে ঈশ্বর তাঁর ঠান্ডা হাতের স্পর্শ দিচ্ছেন। সে কলের নীচে শুয়ে বসে লাফিয়ে স্নান করল। ওঃ, কী ঠান্ডা জল! ওঃ কী আরাম!

কিন্তু একজন নীল উর্দিপরা লোক এসে হেঁকে উঠতেই সে ভয়ে ভয়ে কলের নীচ থেকে বের হয়ে গা—শরীর মুছে যখন প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটছিল তখনও ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। জেবের ভিতর পাখিটা আছে কিনা দেখে নিল সুবল, তারপর ছুটে গিয়ে সেই কামরার জানালায় দাঁড়িয়ে হাঁকল, টুকুন দিদিমণি, আমি স্নানটা সেরে নিলাম।

সুবলের মুখ কী সতেজ, আর কী এক গ্রাম্য সরলতা—আশ্চর্য সরল চোখ সুবলের। স্নান করার জন্য চুল থেকে এখনও টুপটাপ জলের ফোঁটা মুখে শরীরে পড়ছে। সেই লম্বা জামা গায়ে, পোঁটলাপুঁটলি কাঁধের দু'ধারে ঝোলানো—প্রায় তীর্থযাত্রীর মতো দেখতে। একটা শুকনো ডাল হাতে এবং বাঁশের চোঙটা পিঠের ডানদিকে ঝুলছিল।

টুকুন ওর সরল গ্রাম্য চোখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, সুবল, তুমি কলকাতায় গেলে আমাদের বাড়ি এসো।

—যাব দিদিমণি।

—তোমার পাখিটা কোথায় সুবল?

—পাখিটা জেবের ভিতর বটফল খাচ্ছে দিদিমণি।

—তোমার পাখিটা আর একবার উড়বে না?

—উড়বে না কেন? বলে সে হাত দিল পকেটে। তারপর পাখিটাকে কাঁধে বসিয়ে দিল। তারপর এই প্ল্যাটফর্মে পাখিটা সুবলের মাথার চারপাশে ঘুরে ঘুরে জেবের ভিতর ঢুকে গেল।

টুকুন বলল, তুমি আমাদের বাড়িতে গেলে আমি আবার পাখির খেলা দেখব। বলতেই ট্রেন—টা ছেড়ে দিল। সুবল গাড়িটার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে গেল। সুবল, টুকুন দিদিমণিকে একটা চন্দনের বীচি, একটি পাথর এবং সেই দুর্মূল্য কুঁচফল দেবে ভেবেছিল, এত তাড়াতাড়ি ট্রেন ছেড়ে দেবে তার মনে হয়নি। সে পোঁটলা খুলে দিতে গিয়ে দেখল ট্রেনটা সামান্য চলছে। সে পোঁটলা থেকে চন্দনের বীচি একটি পাথর ও সেই দুর্মূল্য কুঁচফল বের করে গাড়ির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে টুকুনের হাতে দিল। সে দাঁড়িয়ে থাকল। চারদিকে অপরিচিতি জন, পাখিটা জেবের ভিতর খুঁটে খুঁটে কেবল ছোলা খাচ্ছে, আর একটা ট্রেন এসে এই মাত্র থামল প্ল্যাটফর্মে। সব মানুষেরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামছে কিন্তু বড় নির্জন মনে হল জায়গাটা। যেন সেই পরিত্যক্ত মাঠ এবং পাহাড়ের মতো এই প্ল্যাটফর্মে শুধু হাহাকারের দৃশ্য। কোথাকার একটা ট্রেন তার প্রিয় দিদিমণিকে নিয়ে চলে গেল।

সুবলের দীর্ঘদিন পর আজ মা'র কথা মনে হল। মেলার কথা মনে হল। সুবচনি দেবীর মন্দিরে ফসল ঘরে এনে যে উৎসব হত তার কথা মনে হল—সে মেলায় বিদেশ থেকে কত লোক আসত, বাজিকর আসত,

সাপের পেটে মানুষের মুখ, একটা মানুষের তিনটে মুখ, তিনটে মানুষের একটা মুখ, বড় বড় কাচের বৈয়াম, আর তার ভিতর কিম্ভূতকিমাকার সব মানুষ, অথবা মাঠের শেষ দিকে বড় তাঁবু, সার্কাসের খেলা, হাতি, বাঘ, সিংহ, একটা মেয়ে তারে ঝুলে খেলা দেখাত। একটা ট্রেন গাড়ি তার টুকুন দিদিমণিকে নিয়ে চলে গেল—এসব দৃশ্য চোখের ওপর ভাসতে থাকল সুবলের। আর একটা ট্রেন এসে থেমেছে। ট্রেন চলে যাবে এবার। সুবল ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে বসে ওর পোঁটলাগুলো ফের বেঁধে নিল। তারপর যাকে সামনে পেল তাকেই শুধাল, এই ট্রেন কর্তা, কলকাতা যাবে না?

কে যেন বলল, যাবে।

সে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে উঠে গেল। ট্রেনটা নীল রঙের। বড় হাতল ঝুলছে। সুবল বয়েস অনুযায়ী লম্বা এবং পায়ের পেশী পাহাড়ে ওঠানামার জন্য বড় শক্ত। সে এক পাশে ভিড়ের ভিতর একটা হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। এখন আর মনে কোনও গ্লানি নেই। ট্রেনটা ওকে কলকাতা নিয়ে গেলে সে টুকুন দিদিমণির কাছে চলে যেতে পারবে।

আর এ—সময়ই সুবলের মনে হল ভীষণ ক্ষুধা পেটে। সে তার সঙ্গের শুকনো বটফল থেকে একটা দুটো করে মুখে পুরে দিতে থাকল। সে বটফল চিবুচ্ছে আর দু'পাশের বড় বড় কলকারখানা দেখে কেবল বিস্মিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে সে যেন কোনও এক রাজার দেশে চলে এসেছে। যেন এখানে অন্নের অভাব নেই। অন্ন চাইলেই অন্ন। জলের অভাব নেই, জল চাইলেই জল। আর ভালোবাসার অভাব নেই, টুকুন দিদিমণি রাজ্যের সব ভালোবাসা তার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে। তার মনে হল, কলকাতায় পা দিলেই সে রাজা বনে যাবে।

সুবল দেখল তার গাড়ি আশ্চর্য এক নগরীর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। সে চোখ মেলে যত দেখছে তত বিস্মিত হচ্ছে। বড় আশ্চর্য এক নগরী, চারিদিকে বড় বড় প্রাসাদের মতো বাড়ি, সেই সুসনের রাজবাড়ির মতো, কবে একবার বাবা তাকে রাজবাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, কবে একবার সে ছোট বেলায় গল্পের বইয়ে রাজবাড়ির গল্প পড়েছিল, চারিদিকে বড় বড় অট্টালিকা, চারিদিকে বাঁধানো রাস্তা। বড় বড় দেবদারু গাছ, গাছে গাছে রুপোর পাতা, সোনার ফল, নীচে বনের ভিতর সোনার হরিণ—এ যেন সেই রাজার দেশ, লাইনের ওপর তার, আর আশ্চর্য এক লম্বা ঘরের ভিতর তার গাড়ি ঢুকে গেছে, নানারকমের নীল লাল রঙের বাতি, বেগুনি রঙের বাতি, কত হাজার হাজার লোক, সব রাজবাড়ির রাজপুত্রদের মতো ফিটফাট, কোথাও কোনও অপরিচ্ছন্নতা নেই, ঝক ঝক করছে সবকিছু।

অথচ কেউ দাঁড়িয়ে একমুহূর্ত গল্প করছে না, সকলে নিজের মতো হেঁটে যাচ্ছে। সকলে ব্যস্ত। সকলে যেন কোথাও কোনও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছে। অথবা কোথাও বড় এক রাজবাড়ি আছে, সকলে সেই রাজবাড়ির উদ্দেশে ছুটছে।

সুবল ভিড়ের ভিতর দেখল ডান পাশের লোহার গেটে চেকারবাবু কার সঙ্গে পয়সার হিসাব করছেন গোপনে, মনে হল, চেকারবাবুর হাতে কে পয়সা গুঁজে দিল। সুবল দাঁড়িয়ে থাকল। ওর কাছে পয়সা নেই, টিকিট নেই। এখন টুকুন দিদিমণি নেই যে ওকে গেট পার করে দেবে। এই লোহার দরজাটার কাছে এসেই সুবলের ভয়ে পা সরছিল না। সে একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, ভিড় কমলে চেকারবাবুকে বলবে, বাবু আমার পয়সা নেই, আমার কিছু বটফল আছে, কিছু পাথর আছে আর আছে এক পাখি। আমি বাবু আমার পাখির খেলা দেখাতে পারি। বাবু পাখির খেলা দেখলে আপনি খুশি হবেন। খুশি হলে বাবু ওকে ছেড়ে দেবে এই ভেবে সুবল একটু পিছনের দিকে সরে তাকাতেই দেখল—ট্রেন, মেলা ট্রেন, কেবল ভোঁস ভোঁস করছে ট্রেন। মানুষ আর লটবহর চারিদিকে। লোহার রেলিং পার হলে ফলের দোকান। চারিদিকে এত প্রাচুর্য, এত সম্পদ, এত মানুষ, এত জল—সুবল ক্রমশ কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ছে।

তখন চেকারবাবু ডাকলেন, এই ছোকরা, ওখানে কী হচ্ছে। টিকিট কোথায়?

—বাবু টিকিট নেই।

চেকারবাবু দেখলেন সুবলকে এবং চেহারা দেখে না হেসে পারলেন না। ভিখারির মতো জামাকাপড় গায়ে কতরকমের পোঁটলা ঝুলছে কাঁধে, হাতে লাঠি এবং পিঠে বাঁশের চোঙ। একেবারে বহুরূপী।

অন্য চেকারবাবু বললেন, ঠিক শালা খরা অঞ্চলের লোক। উপদ্রব বাড়ছে।

—কী করে হবে! ওরা তো দল বেঁধে আসছে। এ তো একা।

—দল ছুট। দেখে বুঝতে পারছ না?

সুবল দেখল বাবু দু'জন ওকে দেখে খুব হাসাহাসি করছে। সুবল যেন সাহস পেল এবার। কাছে গিয়ে বলল, বাবু আমাকে ছেড়ে দিন। আমার পয়সা নেই। এই দেখুন বলে সে তার জেব উলটে দেখাতে গেলে পাখিটা উড়ে এসে ওর মাথার ওপর বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে চেকারবাবু দু'জন বলল, শালা ভোজবাজি জানে। জেব উলটে পয়সা নেই দেখাতে গেল আর শালার জেব থেকে পাখি উড়ে এসে মাথায় বসল। পয়সার বদলে পাখি!

চেকারবাবু বললেন, খুব তো ভোজবাজি শিখেছ।

—না কর্তা। কোনও ভোজবাজি নেই। পাখি আমার পোষা। ও জেবের ভিতর থাকে। খুব নাছোড়বান্দা না হলে চোঙের ভিতর ভরে রাখি না। বলে সে পিঠ থেকে বাঁশের চোঙা এনে উলটে দেখাল। তারপর একটু হেসে খুব বিনীতভাবে বলল, যাব কর্তা? শুকনো বটফল ছিল পোঁটলাতে, কথা বলতে বলতে দুটো একটা বটফল মুখে পুরে দিচ্ছিল।

এখন যথার্থই যেন সুবলের কোনও ভয় ছিল না। কোনও ডর ছিল না। চেকারবাবুরা ওকে কোনও আর ভয়ও দেখাচ্ছে না, কেমন আলগা করে পথ ছেড়ে দিলেন। সুবল পাখির খেলা দেখানোর জন্য চেকারবাবু দু'জন বোধহয় খুশি। সে প্রায় চুপি চুপি বের হয়ে সোজা স্টেশনের কাউন্টার পর্যন্ত হেঁটে এল। প্রায় মুক্ত এখন সুবল। সে ঘুরে ফিরে এতবড় স্টেশন দেখতে থাকল। চারদিকের এই প্রাচুর্য ওকে জীবনযাপন সম্পর্কে আর কোনও ভয়ের উদ্রেক করতে পারল না। যখন এত প্রাচুর্য, এত জল আর এত সুখী মানুষের ভিড় তখন সামান্য এক সুবলের আহারের জন্য ভাবনা কী। সে প্রায় লাফিয়ে হাঁটতে থাকল, ঘুরতে থাকল এবং ছবির মতো, রাজারানির মতো আর নদীর জলের মতো পরিচ্ছন্ন এই স্টেশনের চারদিকটা দেখতে পেয়ে সে আনন্দে প্রায় শিস দিয়ে উঠল।

কোনও গ্রাম্য সংগীত ও শিসে বাজাচ্ছিল। আর ওর মুখের শিস শুনে পাখি পর্যন্ত আত্মহারা। পাখি এবং সুবল এমন একটা দেশে চলে এসেছে—এমন প্রাচুর্যের দেশ, ভাবল সে। বাইরে বের হতেই দেখল বড় বড় দোতলা সব বাসগাড়ি, ট্রামগাড়ি দৈত্যের মতো—সেই যেন আলাদীনের প্রদীপ, যা চাওয়া তাই পাওয়া যায়। আলাদীনের পোষা দৈত্যের মতো সব ট্রামগাড়ি, বাসগাড়ি সুবলের জন্য এবং ওর পাখির জন্য প্রতীক্ষা করছে। সুবল বলল, রোস। আমরা আসছি। কারণ ডানদিকে কিছুদূর হেঁটে গেলে জল, টিপকল থেকে কেবল জল পড়ছে।

সে জলের নীচে ফের ছুটে গিয়ে দাঁড়াল। পাখিকে জল খাওয়াল, স্নান করাল। এবং শান্তশিষ্ট বালকের মতো সে তার ভিজা নেংটি কাপড়, জামা সব রেলিঙ—এ শুকোতে দিলে।

এখন নদীর জলের ওপর সব বড় জাহাজ ভাসছে, কোথাও আকাশের নীচে লম্বা ম্যাচ বাক্সের মতো বাড়ি, ডানদিকে বড় একটা পুল, মাথায় সারি সারি সব পাখি বসে রয়েছে আর সব ঠেলাগাড়িতে আলু, ফুলকপি, শাকসবজি হরেক রকমের কত তরমুজ এবং ফল যাচ্ছে। সে অপলক দেখতে দেখতে সেই বৃদ্ধ পুরোহিতের কথা ভাবল। তিনি সামান্য জলের জন্য কী না করেছেন। পাগলের মতো পাহাড়ের নীচে, সমতলভূমিতে, নদীর ঢালু অঞ্চলে এবং পাহাড়ের গিরিপথে জলের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। হায়, যদি মানুষরা কলকাতার এত প্রাচুর্যের কথা জানতে পারত। তা হলে বুঝি তিনি সব ফেলে, তাঁর সুবচনি মন্দিরে তেলসিঁদুর ধান—দূর্বা ফেলে এখানে চলে আসতেন।

ঠিক তক্ষুনি এক বৃদ্ধ যেন সেই জনার্দন চক্রবর্তী, সে কাছে গিয়ে ভালো করে দেখার চেষ্টা করল—না, জনার্দন ঠাকুর নয়, অন্য মানুষ, তেমনি লম্বা জোয়ান মানুষ, মাথায় সাদা চুল, চোখ বড় বড়, পায়ে হরেক রকমের রঙবেরঙের কানি বাঁধা, হাতে পায়ে গলায়! ঠিক ফকির দরবেশের মতো মুখ—কেবল হেঁকে যাচ্ছে। কী হাঁকছিল বোঝা যাচ্ছে না—খুব সন্তর্পণে কান পাতলে ওর অস্পষ্ট কথা ধরা যাচ্ছে। সে দু'হাত ওপরে তুলে নাচছিল, গাইছিল এবং মাঝে মাঝে কলকাতা শহরকে যেন সে জরিপ করছে—একটা ফিতা ছিল হাতে, সে ফিতা দিয়ে কী যেন কেবল মাপছে মাঝে মাঝে। সুবল বুঝল মানুষটা তবে জনার্দন চক্রবর্তী নয়। সুবল রেলিং থেকে ওর জামাকাপড় তুলে নিল। তারপর এক অনির্দিষ্ট যাত্রা। এই শহর এতবড় শহর ঘুরে ঘুরে দেখা। কিছু আহারের ব্যবস্থা করতে হয়। সুবল আহার সংস্থানের নিমিত্ত চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে হাঁটতে থাকল।

তখন টুকুন হাসপাতালের এক ঘরে শুয়ে ছিল। জানালার পাশে টুকুনের বিছানা। স্প্রিং—এর খাট। মাথার দিকটা একটু ওপরের দিকে তোলা। টুকুন সামনের জানালা দিয়ে মাঠ দেখতে পাচ্ছিল। জানালার নীচে পথ, পথের ওপর এক ফুচকাওয়ালা ফুচকা বিক্রি করছে। বড় গরম চারিদিকে। বৃষ্টি নেই, টুকুন গরমে হাঁসফাঁস করছিল দুপুর থেকে।

এখন বিকেল সুতরাং এখন ফুচকাওয়ালা ফুচকা নিয়ে বের হয়েছে। এখন বিকেল সুতরাং মাঠে মাঠে খেলার দৃশ্য আর পার্কের ভিতরে ছোট বড় ছেলেমেয়ে সব খেলতে এসেছে। ওরা ঘাসের ওপর ছুটাছুটি করছিল।

টুকুন জানালা থেকে সব দেখতে পাচ্ছে। একটা গাছে কিছু ফুল ফুটে আছে—কী ফুল হবে, বোধহয় নাগেশ্বর ফুল, ফুলের সৌরভ সব পার্কটা কেমন আমোদিত এবং বোধ হয় এই সব ফুলের সৌরভের জন্য নানারকমের পাখি উড়ে এসেছে, পাখিগুলো উড়ছিল, পাতা উড়ছিল, পাখিগুলো উড়ে উড়ে ডালে বসছে, ঠিক যেন সুবলের পাখি! সুবল, এক পাখিওয়ালা সুবল এই শহরে এসে নানা জাতের সব পাখি ছেড়ে দিয়েছে আকাশে।

কিন্তু রাস্তার অন্য দৃশ্য। রাস্তার ওপর বড় মিছিল। মিছিলের আগে একটা মানুষ লাঠি হাতে হেঁটে যাচ্ছে। পেছনে একদল মানুষ, ওদের হাতে নানা রঙের ফেস্টুন, ভিন্ন ভিন্ন লেখা, বাঁচার মতো খাদ্য দিতে হবে, চোরাকারবারি বন্ধ করতে হবে, অথবা যেন বলার ইচ্ছা সকলের, আমাদের দাবি মানতে হবে, না মানলে সংসারে সব আগুন লাগিয়ে দেব।

অথবা টুকুন মাঝে মাঝে এমন সব দৃশ্য দেখতে পায় যা মনকে ব্যথিত করে। সামনে একটা—বোধ হয় ওটা শাল—শিমুল জাতীয় গাছ, গাছের নীচে প্রায় উলঙ্গ সব কাচ্চাবাচ্চা, প্রায় নগ্ন সব যুবক— যুবতী রাতে শুয়ে থাকে। ভোর হলেই ওরা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। আর টুকুনের চোখে ঘুম নেই বলে, শেষ রাতের দিকে কেবল মনে হয় ঘোড়ার গাড়িতে অথবা গোরুর গাড়িতে কারা যেন শহরে কেবল কীসব ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে আসছে চুরি করে। অথবা মাঝে মাঝে রাত গভীরে শহরের সব অলিগলিতে কীসের যেন ফিসফিস শব্দ, ওরা যেন এক ষড়যন্ত্র করছে।

ভোর হলেই টুকুন দেখতে পায় এক ছোট্ট বালক কাঁধে মই নিয়ে দেয়ালে দেয়ালে কেবল পোস্টার মেরে যাচ্ছে। ওর একদিন বলতে ইচ্ছা—এই পোস্টারয়ালা, তোমার পোস্টারে কী লেখা আছে?

হয়তো সেই পোস্টারয়ালা জবাব দেবে—কী করে বাঁচতে হয় তার কথা লেখা আছে।

আমার পায়ে শক্তি নেই, আমার শরীর ক্ষীণ হয়ে আসছে, আমি আর বাঁচব না বুঝি। পোস্টারয়ালা, তোমার পোস্টারে আমার বাঁচার কথা লেখা নেই? টুকুনের আরও যেন কীসব প্রশ্ন করার ইচ্ছা। শাল—শিমুলের নীচে যুবক—যুবতীরা কেন রাতে শুয়ে থাকে, অন্ধগলিতে রাতে কারা ফিসফিস করে কথা বলে, কত রকমের ভোজ্যদ্রব্য চুরি যাচ্ছে শহরে, গ্রামে, কেবল মানুষেরা আপন স্বার্থের জন্য সঞ্চয় করে যাচ্ছে, অন্যের জন্য ভাবনা নেই, এমন কেন হয়, টুকুনের ঘুম আসে না রাতে, কেবল দুঃস্বপ্ন।

মা—বাবা বিকালে আসেন, ওঁদের মুখ বড় করুণ, বাবা সারাদিন অফিস করেন, কত হাজার টাকা বাবা রোজগার করেন, বাবা টুকুনের কাছে বীরপুরুষের মতো, মা বাবাকে আদৌ সমীহ করেন না, মা কেমন গোমড়ামুখো অথবা টুকুনকে এই যে নানারকমের খেলনা কিনে দিয়ে যাচ্ছে—গোটা ঘর ভর্তি খেলনা, রাতে ওরা টুকুনের সঙ্গে কেবল কথা বলতে চায়, কিন্তু টুকুন সামান্য তাজা মুখ নিয়ে যখন কথা বলতে থাকে তখন বড় বেড়ালটা মিউ মিউ করে কাঁদে। টুকুনের রাগ হয়। তুমি কাঁদবে না, কাঁদলে তোমাকে বাছা জলে ফেলে দেব।

গোটা ঘর ভর্তি খেলনা। টুকুনের মাঝে মাঝে মনে হয় খেলনাগুলো সব নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। হাসি—মশকরা করছে। যেন টুকুনই এখন ওদের খেলনা হয়ে গেছে। কারণ টুকুন বিছানা ছেড়ে ওদের কাছে যেতে পারে না, হাঁটতে পারে না। দিনের বেলায় শুধু জানালা দিয়ে সামনের মাঠ দেখে, এবং মাঠ, গাছ, পাখি আর পথের বিচিত্র সব মানুষদের দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায়। ওর তখন সব ছেড়েছুড়ে ছুটতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু হায়, পায়ে একেবারে শক্তি পাচ্ছে না। হায়, সেই পাখিয়ালা যে টুকুনকে হাসিয়েছিল, যার জন্য টুকুন তালি বাজিয়েছিল এবং যে মানুষের জন্য টুকুন দরজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পেরেছিল, সেই মানুষের আর দেখা নেই।

টুকুনের বাঁ—দিকে বড় একটা পুতুল ছিল, টুকুন দেখল পুতুলটা যেন ওর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। সামান্য গোঁফের রেখা আছে পুতুলটার মুখে, পুতুলটার নামও আছে একটা, টুকুন চিৎকার করে উঠল, রাজা, এক থাপপর মারব। খুব হাসা হচ্ছে! সব খেলনাগুলো ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেল।

টুকুন সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বালিশের নীচ থেকে চন্দনের বিচি, পাথর এবং কুঁচ ফল বের করে দেখাল রাজাকে এবং অন্যান্য পুতুলগুলিও ওর দিকে যেন চন্দনের বিচি, লাল—নীল পাথর, কুঁচ ফল দেখার জন্য এগিয়ে এল। টুকুন এবার বলল, বুঝলি রাজা আমি মিথ্যা বলি না। এই দেখ, সুবল আমাকে কত কিছু দিয়েছে। সুবলকে পুলিশ ধরতে এসেছিল, আমি নিজে পায়ে হেঁটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে রাজা এবং কুদুমাসি বিড়াল সকলের হয়ে আদাব দিল টুকুনকে। তারপর টুকুন তাচ্ছিল্যভরে ওদের শোনাল, দেখিস সুবল এলে আমি তোদের হেঁটে দেখাব। সুবল জাদুকর, সে জাদুর পাখি রেখেছে কাঁধে। সে পাখি উড়িয়ে দিলেই আমি তোদের কাছে হেঁটে চলে যেতে পারব।

পাঁচ

সেই এক জাদুকরের জন্য জনার্দন চক্রবর্তীও ঘুরছে। একা নিঃসঙ্গ মাঠে জনার্দন চক্রবর্তী রাতের অন্ধকারে অথবা ভোররাতের দিকে ঘুরছে। খরা থেকে এই মাটিকে রক্ষা করার জন্য ঘুরছে। এক প্রচণ্ড অহমিকা জনার্দনের। সুবচনি দেবীর মন্দিরে মাথা কুটছে, মা জল দাও। জল দাও। মা, জলে তুমি মাটি ভাসিয়ে দাও। মা, তোমার সন্তানেরা সব দেশ ছেড়ে চলে গেল। কেউ আর ফিরে এল না, আমি মরে গেলে তোকে কে আর ফুল জল দেবে। কিন্তু নিষ্ঠুর সুবচনি দেবী, করালবদনি ডাইনি মুখ ব্যাদান করে আছে। লম্বা জিভে যেন জনার্দনকে ভেংচি কাটছে। শ্মশানের মতো মন্দিরের চারপাশে শুধু আগুনের মতো রোদ।

জনার্দন মাঝে মাঝে দেবীর কপালে হাত রাখত, কপাল ঘামছে কিনা দেখত, কপাল ঘামলে দেবী প্রসন্না হবেন।

সে দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য এক রাতে হাজার বিল্বপত্র সংগ্রহের জন্য বের হয়ে দেখল, গাছে কোনও বিল্বপত্র নেই। সে দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য জল তুলে আনল নদীর গর্ত থেকে কিন্তু এমন মরুভূমির মতো স্থান যা জলের রঙ ক্রমশ গাঢ় হয়ে রক্তবর্ণ ধারণ করল। দেবী হা হা করে হেসে উঠে যেন ভয় দেখালেন জনার্দনকে। জনার্দন খেপে গিয়ে বলল, বল—মাগি, কবে বৃষ্টি হবে, তোর কোনও মরদকে ধরে আনতে হবে বল, বলে সেই নগ্ন সন্ন্যাসী অথবা কাপালিকের মতো চেহারা যে জনার্দন মুখে বড় দাড়ি, নাসিকা লম্বা, আর কোটরাগত চোখ থেকে আগুন ঝরছে, সেই জনার্দন হা হা করে লাঠি তুলে তেড়ে গেল দেবীর কাছে

এবং চিৎকার করে উঠল, জল, জল চাই, জল না হলে শালি তোর একদিন কী আমার একদিন। এই দ্যাখ, বলে সে বড় শক্ত বাঁশের লাঠি ঘরের কোণে তুলে রাখল, জল না হলে তোর মাথা দু'ভাগ করে দেব। তোর ছেইলা কোলে নিয়া বেড়ানোর শখ ভেঙে দেব।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। সুতরাং ভিতরে উত্তাপ কম। প্রায় সারাটা দিন এই মন্দিরে জনার্দন পড়ে থাকে। প্রায় সারাটা দিন জনার্দন দেবীর সঙ্গে বচসা করে, কথা বলে, মার্জনা ভিক্ষা করে, অথবা উপবীতের অহঙ্কার দেখায়। পাথরের দেয়াল বলে এবং জায়গাটা পাহাড়ের গুহার ভিতর বলে ওর চিৎকার অথবা মার্জনা ভিক্ষা কোনও কাকপক্ষী পর্যন্ত টের পায় না। কোনও লোক চলাচল আর নেই এ অঞ্চলে।

সে মাঝে মাঝে পাহাড়ের ওপরে উঠে দূরে ট্রেনের শব্দ শোনার চেষ্টা করে অথবা কখনও দেবীর গায়ের কাছে পড়ে থেকে মা মা বলে কাঁদতে থাকে—মা, সোনার দেশে ফসল ফলাবি না মা? কোন পাপে মাগো তোর মাটিতে আর ফসল ফলাবি না মা? কোন পাপে মাগো তোর মাটিতে আর ফসল ফলে না, বৃষ্টি হয় না।

দেবীর মুখ তেমনি নির্বিকার। ছেলের মুখ দেবীর স্তনের কাছে। কালো পাথরের মূর্তি। এক ফুটের মতো লম্বা। পায়ে কপালে এত সিঁদুর যে এখন আর মুখ এবং স্তনের প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। নীচে বেদি। বেদিমূলে কিছু ধান—দূর্বা, শুকনো ধান—দূর্বা, শঙ্ক কোষাকুষি, ঢোল ঢাক, বড় কাসি আর বাঘের কী হরিণের চামড়া, ব্যবহারে সব লোম উঠে গেছে, সুতরাং বাঘ অথবা হরিণ না অন্য জীবজন্তুর চামড়ায় তৈরি এই আসন বোঝা যায় না। তেল—সিঁদুরের জন্য দেবীর মুখ সব সময়ই চক চক করছে।

জনার্দন তিক্ত হয়ে দেবীর মুখে দুটো বুড়ো আঙুল ঠেসে ধরল। বলল, খা, কাঁচকলা খা। বস্তুত জনার্দন পেটে খিধে থাকলে এমন করতে থাকে। কোনও খাদ্যদ্রব্য নেই। সে গত রাত্রে বনের ভিতর বন—আলুর মতো লতার সন্ধানে ছিল। সে কিছু খুঁজে পায়নি। লতার সন্ধান পেলে সে মাটি খুঁড়ে অনেক নীচ থেকে বড় থামের মতো আলু তুলে আনতে পারত।

সে সুতরাং সারাদিন উপোসী থেকে দেবীর ওপর তিক্ত হয়ে পড়েছে। নিজের উপবাসই দেবীর উপবাস। নিজের দুঃখই দেবীর দুঃখ।—কি আর খাবি মা। হয়তো কিছু বটফল সংগ্রহ করেছে জনার্দন, তাই মুখে ফেলে বলল খা মাগো, খা, এই খেয়ে পেট ভরে ফেল। কেমন লাগে মা খেতে! সে নিজে বটফল চিবিয়ে বলত, কেমন লাগে! ভালো লাগে! খা, ভালো লাগলে অমৃত বলে খেয়ে নে। সে কোৎ করে একটা ঢোঁক গিলত তারপর। তারপরে দেবীর মুখের দিকে ফ্যাকাসে চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকত কতক্ষণ, একসময়ে হা হা করে হেসে উঠত ফের।—কেমন লাগে, অন্ন নেই, জল নেই, মানুষ নেই, ফুল বেলপাতা, দূর্বা—ধান কিছু নেই, কেমন লাগে! ছেইলা কোলে লৈয়া বৈসা থাকতে কেমন লাগে। চেষ্টা নেই, সাধনার ধন মা না দিলে ফসল ফলে না। বলে জনার্দন দরজাটা ফাঁক করে দেখল, বেলা পড়ে গেছে। সূর্য পাহাড়ের অন্যমাথায় নেমে গেছে।

এবার তার ফের বের হবার পালা। এখন বের হলে সব ঘুরে, পাহাড়ময় ঘুরে মাঠময় ছুটে নদীর গর্ত থেকে ভোরের দিকে সামান্য জল নিয়ে ফের সুবচনির মন্দিরে উঠে আসা যাবে। জল তোলার আগে তেমনি সেই হরিণী তার দুই শিশু নিয়ে এসে বসে থাকতে পারে। জলের জন্য পারে সে বসে থাকত। জনার্দন উঠে আসার মুখে ওদের জল দেবে খেতে। জীবের জন্য মায়া। যেন জীব বলতে সামান্য এই হরিণ, তার দুই শিশু, ক্বচিৎ দুটো একটা পাখি উড়ে যেতে দেখা যায়।

জনার্দন আকাশের দিকে চোখ তুলে অনেকক্ষণ পাখির আকাশে ওড়া দেখে, কোথায় কোনও টুকরো মেঘ আকাশের কোলে ভেসে আসছে কিনা দেখে, আর হা—অন্নের জন্য দু'হাত তুলে যেন হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়, একটি ম'ল জলে ডুবে রইল বাকি নয়, জনার্দন ডুবে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া ছেলের মতো মাঠময় পাহাড়ময় শুধু নদীর কোথায় জলসঞ্চয় করে রাখলে সম্বৎসর এই অঞ্চলে জলে ভরে থাকবে, তাই অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

সুতরাং রাতের বেলায় জনার্দনকে চেনা যায় না। মানুষ বলে চেনা যায় না। এক দৈত্য আলখাল্লা পরে অথবা এক কাপালিক মাথায় পাগড়ি বেঁধে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জল, মাগো জল চাই। এমন এক অঞ্চল মা, জলের ব্যবস্থা থাকলে আর কোনোকালে এখানে দুর্ভিক্ষ হবে না, সময়ে জল চাই ফসলের গোড়ায়।

নদীর নীচে জমি, বাঁধ দিলে জল থাকে, এমন এক জায়গার সন্ধানে ছিল জনার্দন যেখানে অল্প আয়াসে বাঁধ দিলে সব জল বর্ষায় নেমে যাবে না, কিঞ্চিৎ জল থেকে গেলেই অঞ্চলের খরা নিভে যাবে। সেজন্য জনার্দন প্রায় পাগলের মতো পাহাড়ের ঢালুতে, এবং নদী উৎরাইয়ে রাতের অন্ধকারে অথবা যখন জ্যোৎস্না থাকত, চাঁদের মরা আলোতে জনহীন প্রান্তর ভীষণ মনে হত তখন জনার্দন দাগ কেটে আপন উদ্যম, সফল উদ্যম মিলিয়ে নদীর তটে বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিত। বটফল, বন—আলু এবং ক্বচিৎ কোথাও মৃত পাখি অথবা জীব মিলে গেলে তার মাংস জনার্দনের খাদ্যবস্তু ছিল।

জনার্দন মাঠময় ঘুরে পাহাড়ময় ঘুরে সেই স্থান সেই সংযোগস্থলের সন্ধান খুঁজে পেয়েছিল। সে রাত হলে বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিত, নদী এখানে বড় সরু পথ কেটে নেমে গেছে। দু'ধারে পাহাড়, উঁচু মতো পাহাড়, জল নেমে গেলে পাহাড়ের ভিতর হ্রদের মতো জল ধরে রাখবে, শুধু খাদে বড় কিছু পাথর ফেলে দিতে হবে, হাজার পাথর, লক্ষ পাথর। জনার্দন শিশু বয়সের কবিতা আওড়াত—উদ্যমবিহনে কিবা পুরে মনোরথ। শুধু উদ্যম চাই, সফল উদ্যম।

সে একটা পাথর টেনে আনত আর বলত উদ্যম চাই, উদ্যম। মা, মাগো, শক্তি দে। সে আবার পাহাড়ের মাথায় পাথর দোলাত, তারপর পাথরটা নীচে ফেলে দিত, মাগো উদ্যম চাই, উদ্যম। সে সারারাত এক করে ভোরের দিকে হরিণ শিশুদের জলের ব্যবস্থা করে, নিজের জন্য সামান্য জল তুলে সুবচনির মন্দিরে উঠে যেত। ওঠার সময় শুনত, মা—ও যেন বলছেন, উদ্যম চাই জনার্দন, আমরা বড় উদ্যমবিহীন হয়ে পড়েছি।

টুকুনের ঘরেও সেই এক কথা। ডাক্তারবাবু, নার্স, টুকুনের বাবা এবং মা বসেছিলেন। টুকুন এই সময়টাতে একটু হাত—পা মেলে বসার চেষ্টা করে। মা—বাবাকে দেখলে কেমন যেন মনটা নরম হয়। ডাক্তারবাবু ভালোবাসার হাত রাখেন টুকুনের মাথায়।

নার্স টুকুনের বেণী বেঁধে দেবার সময়ে নানারকমের পাখির গল্প করে থাকে। ফুলপরি, জলপরি, স্থলপরি, দেবস্থানে এক রকমের পরি থাকে, ভগবানের কছে অন্যরকমের পরি, আর ডাক্তারবাবু বলছিলেন, সব পাখির এক কথা টুকুন, উদ্যম চাই, বাঁচার উদ্যম। ডাক্তারবাবু টুকুনের বাবাকে বলেছিলেন, মেয়েটার সব উদ্যম শেষ হয়ে গেছে যেন। বেঁচে থাকার স্পৃহা জন্মানো দরকার ওর ভেতরে। নতুবা একদিন শুকিয়ে মেয়েটা কাঠ হয়ে যাবে। কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।

সুতরাং এক বাঁচার উদ্যম এই সংসারকে নিয়ত গতিশীল করে রেখেছে। টুকুনের বাবা বললেন, মা, তোমার জন্য আমরা আর কী কী করতে পারি!

টুকুন বলল, বাবা, আমার জন্যে একটা ফুলপরি কিনে আনবে।

বাবা টুকুনকে ফুলপরি এনে দিয়েছিলেন।

টুকুন বলল, বাবা, আমাকে একটা খরগোস কিনে দেবে।

বাবা তাই কিনে দিলেন। আর এভাবেই টুকুনের ঘরটা খেলনায় ভরে গেল। কী নেই এখন টুকুনের ঘরে, জলপরি আছে, ফুলপরি আছে, রাজা আর কুদুমাসি বিড়াল এবং সেই এক বন্দুকধারী সিপাই। টুকুনের বাবা টুকুনের জন্য কোনও অভাব রাখেনি। যা চেয়েছে টুকুন, বাবা সব এনে দিয়েছেন। যেন এখন শুধু টুকুনের জন্য এক রাজপুত্র ধরে আনা বাকি। এনে দিলেই টুকুন এই ঘরের ভিতর স্বর্গরাজ্য তৈরি করে ফেলবে। কারণ টুকুন যেন কী করে জেনে ফেলেছিল—সে মরে যাবে। মরে গেলে মানুষ কী হয়। টুকুনের কী হবে অথবা মৃত্যুর পর টুকুন নিশ্চয় এমন এক স্বর্গীয়রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করবে যেখানে তার এই জগৎ থাকবে আর কে থাকবে! সেই সুবল নিশ্চয়ই থাকবে, পাখিয়ালা সুবল, কাঁধে পাখি নিয়ে। বড় পাঁচিল থাকবে

একটা, কারণ যারা নরকে যায় তাদের জন্য পাঁচিলের ওপাশে যমপুরী। যমপুরীতে ভূতপ্রেত থাকে। সুবল পাঁচিলের ধারে এসে উঁকি মারলে সে হাত ধরে তাকে তুলে নেবে। তখন বাবা—মা কিছু বলতে পারবে না। সুবল এলেই প্রায় যেন সবকিছু ওর হয়ে যায়। সে হেঁটে চলতে ফিরতে পারবে। সুবলের জন্য তার ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল।

টুকুন বলল, বাবা, সুবল বলেছিল কলকাতায় আসবে?

বাবা বললেন, কে সুবল?

—বা, তুমি দ্যাখোনি, ট্রেনে যখন ফিরছিলাম, সেই সুবল, পাখিয়ালা সুবল, আমাদের সঙ্গে আসছিল। মা ওকে স্টেশনে নামিয়ে দিলেন!

টুকুনের বাবা এতক্ষণে মনে করতে পারল!

ডাক্তারবাবু বললেন, কী ব্যাপার সুরেশবাবু?

—আর বলবেন না। আমরা ফিরছিলাম সিমলা থেকে। ট্রেনটা যখন বাংলায় ঢুকছে, রাতের বেলা, কোথাকার সব কতগুলি লোক, কংকালসার চেহারা, আমাদের ট্রেনটাকে আটকে দিল। বলল, জল চাই, জল চাই। বোধহয় খবরটা পত্রিকায়ও পড়ে থাকবেন।

—হ্যাঁ, সেই খরার খবর! জল নেই নাকি দেশটাতে।

—ওরা ট্রেনে উঠে কল খুলে সব জল খেয়ে নিচ্ছিল।

—তারপর!

—তারপর আর কী! ড্রাইভার ভীষণ চালাক। লোকগুলো সব জল যখন চেটে চেটে খাচ্ছিল, সে মশাই জল খাওয়া দেখলে আপনি ভয় পেয়ে যেতেন, জল এভাবে খায় আমার জানা ছিল না, যেন অমৃত পান করছে অসুরেরা। জলের অপর নাম জীবন, সেদিন ট্রেনে প্রথম বুঝেছিলাম। ড্রাইভার দেখল জলের নেশায় পাগল, ড্রাইভার বুদ্ধি করে ট্রেন সহসা ছেড়ে দিল। ব্যস।

—সব নিয়ে রওনা হলেন?

—হ্যাঁ, প্রায় তাই। দলের মধ্যে সুবল ছিল। সুবল আমাদের কামরায় ছিল! ওর একটা পাখি ছিল সঙ্গে, কিছু কীটপতঙ্গ ছিল, শুকনো বটফল ছিল পুঁটলিতে, সে তার পোষমানা পাখি উড়িয়ে দিয়েছিল, পাখিটা উড়লে টুকুনকে আমরা হাততালি দিতে দেখেছিলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, সে এখন কোথায়?

—জানি না। ব্যান্ডেল স্টেশনে দেখি সে নেই।

টুকুন বলল, মা ওকে নামিয়ে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, আপনারা দেখেছেন টুকুন হাততালি দিয়েছে।

—হ্যাঁ, আমাদের চোখের সামনে।

—তুমি সে কথাটা বলো। টুকুনের মা টুকুন যে স্বপ্ন দেখেছিল তার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা ডাক্তারবাবু, ট্রেনে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সুবল দরজার এককোণায় পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বসেছিল। অন্য স্টেশনে ট্রেন এলে পুলিশ তাড়া করেছিল লোকগুলিকে। সুবল আমাদের কামরায় আছে, টুকুন বলছিল সে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। এটা স্বপ্নের মতো ঘটনা, হয়তো টুকুন স্বপ্ন দেখছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, ওর সে সময় বাসনা, তীব্র বাসনা, বাঁচার তীব্র বাসনা, জীবনের সুখ—সম্পদে কী কোথায় জীবনের তৃষ্ণা রয়েছে সামান্য সময়ের জন্য বোধহয় ভিতরে ওর সেই তৃষ্ণা জেগেছিল। এই তৃষ্ণা কী করে ফের জাগানো যায়। বেঁচে থাকার তৃষ্ণা, রক্তের ভিতরে তুফান, বুঝলেন সুরেশবাবু, সেই তুফানের কথাই বলছি, রক্তের ভিতরে তুফান তুলে দিতে হবে, ঢেউ, যাকে আমরা তরঙ্গ বলি, বেঁচে থাকার জন্য এই তরঙ্গ তুলে দিতে পারলে আবার টুকুনকে বাঁচাতে পারব। সুবল সেই পাখিয়ালা হয়তো সেই রক্তে

সামান্য দোলা দিতে পেরেছিল। ডাক্তারবাবু প্রায় সব কথাই বিশেষ করে রুগি সম্পর্কে কথা বলে ইংরেজিতে বলেছিলেন। সুতরাং টুকুন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল, সে স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারছে না। সে শুধু বলল, মা, আমি জল খাব।

—সেই এক উদ্যমের কথাই বলছি ডাক্তারবাবু। কথাটা বলে ফের কেমন অন্যমনস্ক হলেন। এবং নিজেকেই নিজে বললেন, আমরা বড় উদ্যমবিহীন হয়ে পড়েছি, সুরেশবাবু।

বিকাল মরে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবু ওপরে উঠে গেলেন। সুরেশবাবু এবং টুকুনের মা চলে গেল। নার্স সামান্য দুধ গরম করার জন্য কিচেনের দিকে গেছে। বাইরে আলো জ্বলে উঠল। ঘরে হলুদ রঙের আলো, এখন। এই ঘরের চারপাশে সব পুতুল, জলপরি, স্থলপরি। আর কেউ থাকবে না এখন। সুতরাং পুতুল এবং এইসব পরিরা সন্ধ্যার পর টুকুনের সঙ্গে ঘর—সংসার আরম্ভ করে দেয়। টুকুন আপন মনে কথা বলে চলে, এই রাজ্যে তখন টুকুন রানি অথবা রাজকন্যার মতো। সব পরিদেব, সে জলপরি অথবা স্থলপরি হোক, সে রাজা অথবা কুদুমাসি বিড়ালই হোক টুকুনের কথায় উঠতে বসতে হবে। এদিক ওদিক হলে রক্ষা থাকবে না। পরদিন ভোরে নার্সকে বলবে, মাসি বেড়ালটাকে ঘরের বার করে দাও। সারারাত ওটা আমাকে ঘুমুতে দেয়নি, কেবল জ্বালাতন করেছে।

সুবল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বলল, পাখি তুমি বড় জ্বালাতন করছ। উড়ে গেলে আসতে চাও না।

পাখিটা সুবলের মাথায় মুখে ঘুরতে থাকল। যেন পাখিটা সুবলের অভিমান ধরতে পেরেছে। অভিমান ভাঙানোর জন্য নানাভাবে সুবলকে খুশি করার চেষ্টা করছিল উড়ে উড়ে।

সুবলকে এখন দেখলে প্রায় চেনা যায় না। সে কী করে ইতিমধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ফেলেছে। ওর বাঁ হাতে ছোট কাঠের বাক্স, বাক্সের ভিতর জুতোর ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের কালি, ব্রাস, ক্রিম এবং ছোট একটা তোয়ালে। ওর চুল আর বড় নেই, টিকি এখন আরও ছোট করে ছাঁটা। বড় লম্বা জামা আর শরীরে ঢল ঢল করছে না, সুবল প্যান্ট পরেছে একটা, গেঞ্জি গায়ে দিয়ে সমস্ত সকাল জুতা পালিশ করে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। সে গাছের নীচে শুয়েছিল। পাখিটা ঘাসের ওপর লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। সে কিছু চানা কিনে নিজে খেয়েছে, পাখিটাকে খাইয়েছে।

পথের ওপাশে বড় বড় প্রাসাদের মতো বাড়ি। সে ঘাসের উপর শুয়ে বড় সব বাড়ি দেখছিল। জানালায় কত সুন্দর মুখ, সুন্দর মুখ দেখলেই টুকুন দিদিমণির কথা মনে হয়। সে প্রথম ভেবেছিল। কলকাতা গেলেই টুকুনদিদিকে পাওয়া যাবে, সে সেই ডাবয়ালাকে অর্থাৎ সুবল কতদিন সেই ডাবয়ালার ডাব নৌকা থেকে তুলে এনেছে পারে, ডাবয়ালা খুশি হয়ে পয়সা দিয়েছে, তাকে একবার বলেছিল, তুমি জান ডাবয়ালা টুকুনদিদিমণি কোথায় থাকে? লোকটা রাস্তার নাম এবং নম্বর চাইতেই বুঝেছিল সুবল, টুকুনদিদিমণিকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, এতবড় শহরে টুকুনদিদিমণি হারিয়ে গেল।

এতবড় শহর দেখে সুবলের বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন জনার্দন চক্রবর্তী ওদের প্রিয় পুরোহিত, গ্রামের এবং অঞ্চলের বাঞ্ছিত পুরুষ যিনি প্রায় সব ধর্মের নিয়ামক তেমন কোনও অসীম এবং অপরিমেয় শক্তিশালী মানুষ, অথবা সে জাদুকর হতে পারে, পির পয়গম্বর হতে পারে যিনি এই শহরকে চালাচ্ছেন। মোড়ে মোড়ে পুলিশ, প্রাসাদে—প্রাসাদে উর্দিপরা দারোয়ান, হাওয়াই গাড়ি, ট্রাম এবং স্রোতের মতো মানুষের মিছিল। সন্ধ্যা হলে রাস্তার সব আলো জ্বলে উঠছে। গাড়িগুলো মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আবার চলতে শুরু করেছে। এতটুকু ফাঁকা জায়গা পড়ে নেই। কেবল বড় বড় অট্টালিকা আর গম্বুজের মতো রহস্যজনক মিনার সুবলকে বড় বেশি আবেগধর্মী করে তুলেছে।

আর মনে হত এই শহরে টুকুনদিদিমণি আছে। এই শহরের কোথাও না কোথাও টুকুনদিদিমণি আছে। সুতরাং সুবল যখনই সময় পেত, পথ ধরে হেঁটে যেত, গাড়ি দেখলে এবং ফ্রক পরা মেয়ে দেখলে চোখ তুলে তাকাত যদি টুকুনদিদিমণি হয়, যদি টুকুন তার জন্য কোনও জানালায় মুখ বার করে রাখে। সে

ভোরের দিকে কাজ করত, সুবল একা মানুষ। কোনও আত্মীয় নেই, বন্ধু—বান্ধবহীন সুবলের আয় থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় হলে সে বাসে উঠতে পারছে, সে ঘুরে ঘুরে কাজ করছে।

সে কখনও এক জায়গায় বসছে না, প্রায় শহরটাই যখন মেলার মতো, প্রায় শহরটাই যখন উৎসবের মতো সেজে আছে এবং যেখানে বসা যায় সেখানেই দু'পয়সা সংগ্রহ হচ্ছে তখন এক জায়গায় বসে কী লাভ। এই ঘোরা, কাজের জন্য ঘোরা এবং টুকুনদিদিমণির জন্য ঘোরা সুবলের একটা বাই হয়ে গেল। শুধু দুপুর হলে সে গড়ের মাঠে চলে আসত। এসময় সুবলের প্রিয় পাখি আকাশে উড়তে চায়। পাখিটা না উড়লে ওর পা স্থবির হয়ে যাবে, পাখি স্থবির হয়ে যাবে ভেবেই সুবল ঠিক দুপুরে, যখন রোদে খা খা করছে সারা মাঠ, যখন দুর্গের উপর কবুতর ওড়ে এবং যখন প্রায় পাখিরা দুপুরের অবসাদে গাছের ডালে অথবা অন্য কোনও ছায়ায় চুপটি মেরে ঠোঁট পালকে গুঁজে পড়ে থাকে তখন সুবল আকাশে পাখিটাকে উড়িয়ে দেয়। পাখিটা উড়তে উড়তে কোথায় যেন চলে যায়। আর দেখা যায় না।

রোদের জন্য আকাশের দিকে বেশিক্ষণ চোখ তুলে তাকাতে পারে না সুবল। সে পাখিটার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। ওর এক হাতে বাক্সটা তখন খোলা, অন্য হাতের মুঠোয় সে রোদের ভিতর অনেকটা ঠিক আকবর বাদশার মতো হাতের মুঠোয় পাখি রাখার জন্য গর্বে আত্মহারা। অথবা পাখি উড়ে উড়ে যখন ক্লান্ত হয়, পাখি যখন সুবলের কাছে ফের ফিরে আসে এবং মুঠোয় বসে চারদিক তাকায় তখন সুবলের এক প্রশ্ন, টুকুনদিদিমণিকে পেলি?

পাখি পাখা ঝাপটাল, ফের উড়তে চাইল। সুবল বুঝল, না টুকুন দিদিমণিকে পাখিটা খুঁজে পায়নি। সুতরাং সে বলত, বেশ হয়েছে বাপু, এবার চলো চুপটি করে আমার কাঁধে বসে থাকবে। এখন আর রোদে রোদে তোমায় ঘুরতে হবে না।

এই পাখি যেন সব বোঝে। সুবলের দুঃখের দিনে এ পাখি ছিল, সুখের দিনেও এই পাখি। সে বলল, টুকুনদিদিমণি কোথায় যে গেল।

পাখি বলল, কিচ কিচ। পাখি সুবলের সঙ্গে কথা বলতে চাইল।

সুতরাং সুবলের এখন এক কাজ। টুকুনকে খুঁজে বের করতে হবে। কোনও ঠিকানা নেই টুকুনের। এতবড় শহর তবু সুবল হার মানল না। সকালের দিকে দুজনের মতো রোজগার হয়ে গেলেই সুবল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। জানালায় জানালায় উঁকি দিয়ে দেখে, পার্কের ভিতর ফ্রক পরা মেয়ে দেখলে টুকুনদিদিমণি যদি হয়, সে প্রায় পাগলের মতো এই শহরে টুকুনকে অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে, পার্কে, বড় রাজপথ, গঙ্গার ধারে, এবং বড় বড় বাড়িতে উঠে যেত কাজ নিয়ে। সে কাজের ফাঁকে শুধু কীসের প্রত্যাশা করত যেন।

সুবল ওর পাখিকে পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল অনুসন্ধানের জন্য। যখন ওর শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ত, যখন অবসাদে শরীর চলতে চাইত না, সুবল ওর পাখি ছেড়ে দিত, দেখ যদি তুই কোথাও টুকুনকে খুঁজে পাস। সুবল এক সরল বালক, পাখি এক অবলা জীব, শহরের মানুষেরা সুবলকে দেখলে এবং ওর পাখি দেখলে কৌতুক বোধ করত। সুতরাং সুবল পাখিটার জন্য একটা দাঁড় কিনে নিয়েছে। পাখিটা দাঁড়ে বসে থাকত। সুবল মাঝে মাঝে যখন হাতে কাজ থাকত না আর ঘুরে ঘুরে আর শরীরও যখন দিচ্ছে না, তখন বলত, পাখি তুই আগে ছিলি কার?

পাখি বলত, কী বলত—সরল না হলে বোঝা যায় না, পাখি বলত বুঝি রাজার!

সুবল, মনে মনে এবার বলত, এখন কার?

—এখন তোমার।

—হ্যাঁ তবে দেখ উড়ে, সেই দিদিমণি আমাদের কোথায়! তারপর পাখি উড়তে থাকত। দেওয়ালের পাশে, জানালায়, অথবা সদর পথে এক সোনার পাখি উড়ে যেত। পাখির সরল চোখ জানালায়, ঘরের ভেতর এবং রুগণ যুবক—যুবতী অথবা ছোট মেয়ে দেখলে শিয়রে বসে দেখত সেই টুকুন কিনা। সুবলের পাখি, ভালোবাসার পাখি হয়ে শহরময় উড়ে বেড়াচ্ছে। পাখি উড়ে উড়ে কত দৃশ্য দেখতে পেল, শহরে বড়

লাল বাড়িতে কারা যেন জড়ো হয়েছে, রাস্তায় মানুষের কী ভিড়, আর পুলের উপরে সম্রাট সিজার যেন মিশর দেশ জয় করে ফিরছেন, এক অলৌকিক ঘটনার মতো, পাখি এসে দাঁড়ে বসে গেল এবং কিচ কিচ করে উঠল।

সুবল বলল, পেলি না।

পাখি কিচ কিচ করে উঠল।

—না পেলে আর কী করবি।

সুবল বলল, টেরিটিবাজার থেকে তোর জন্য কীটপতঙ্গ কিনে এনেছি। খা। বলে সুবল দাঁড়ের উপর ছোট পেতলের বাটিতে কীটপতঙ্গগুলো রেখে দিল।

আর তখনই মনে হল শহরের উপর দিয়ে দলে দলে লোক ছুটছে, ওদের কণ্ঠে চিৎকার, অন্ন চাই, বস্ত্র চাই। সুবলের মনে হচ্ছিল ওরা সব বলছে সকলে, শুধু বলছে না, উদ্যম চাই। আমরা কেমন যেন উদ্যমবিহীন হয়ে পড়েছি, একথা কেউ বলছে না।

সুবলের ইচ্ছা হল চিৎকার করতে, বলুন আপনারা উদ্যম চাই। উদ্যম। উদ্যম বিহনে কিবা পূরে মনোরথ। পাঠশালায় জনার্দন ঠাকুর ওদের পড়াত, উদ্যম বিহনে কিবা পূরে মনোরথ।

সুবলের এই করে শহরটা প্রায় ঘোরা হয়ে গেল ক্রমশ। শহরের সর্বত্র সে এক উদ্যমবিহীন জীবন দেখতে পেল যেন। অফিসে, কাছারিতে, মাঠে ময়দানে এবং সব নেতা গোছের মানুষদের মুখেও সব কথার উল্লেখ আছে, শুধু উদ্যমবিহীন হয়ে পড়েছি, এ—কথা কেউ বলছে না। অফিসে কাছারিতে এবং বড় পার্কের ভিতর মানুষের কথাবার্তা থেকে এসব ধরতে পারত।

সকলের কথায় কী এক আক্রোশ যেন, কেউ সুখী নয়, এত বড় কলকাতা শহর দেখে সে যা ভেবেছিল, সুখের নগরী, দুঃখ নেই, অভাব নেই, জল, অন্ন—বস্ত্র সব কিছু আছে যখন, যখন আলোময় এই শহর, যখন বড় বড় হলঘরের মতো হোটেল ঘর, দেব—দেবীর মন্দির রয়েছে, মানুষের দুঃখ তখন থাকার কথা নয়।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এখানে শুধু দুঃখই আছে, ফুটপাতে মানুষের দৈন্য, পাগলের প্রাদুর্ভাব বড় বেশি শহরে। এই দুঃখের নগরীতে সুবলের যেন আজকাল আর ভালো লাগছে না। ওর মনে হল সেই সব বরিষের দিন, মাঠে মাঠে ধান, গোয়ালে গোরু, সে গোরু নিয়ে মোষ নিয়ে বের হয়ে গেছে মাঠে, মাঠে মাঠে ফসলের দিনগুলি অথবা আদিগন্ত সবুজ মাঠ শুধু, সে দৌড়ে বেড়াত, মাঠের ভিতর কেবল কী যেন এক রহস্য। গ্রামের অন্য রাখাল বালকের সঙ্গে গুলি খেলা, কোনও বড় অর্জুন গাছের নীচে বসে থাকা, অথবা বুনো মানুষ হরিপদর মুখে—অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যাওয়া—হায় সেই দেশে কী করে এমন খরা এসে মরুভূমির মতো হয়ে গেল, সুবল চোখ বুজে বলল, মা সুবচনি জল দে। যদি জল হয়, যদি খাদ্য হয়, যদি মাঠে মাঠে ফের গোরু মোষ নিয়ে বের হওয়া যায়, কিন্তু কে খবর দেবে, কে বলবে দেশটাতে ফের বর্ষা নেমেছে, দেশটাতে আবার সোনার ফসল ফলবে—কার এমন উদ্যম আছে—ফের মাঠে সোনার ফসল ফলার, বরিষের দিনে জল কোথাও ধরে রাখে, অজন্মা অথবা খরা এলে সেই জলে মানুষ স্নানাহার করবে।

ছয়

পাখি উড়ছিল আকাশে, সুবল ঘুরছিল পথে পথে। টুকুন বসে রয়েছে নিজের জানালায়, আর জনার্দন মাঠ ভেঙে নেমে আসছে। নদীর চোরা স্রোতের ওপর বন থেকে হরিণী ওর দুই বাচ্চা নিয়ে নিশ্চয়ই এখন অপেক্ষা করছে।

জনার্দন খুব পা চালিয়ে হাঁটছিল। সারারাত পাহাড়ের উপর কাজ গেছে। পাহাড়ের মাথা থেকে বড় বড় পাথর ফেলে যোজকের মতো ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিচ্ছে। পাগলের প্রায় কাজকর্ম। কী হবে, যদি এই অঞ্চলে

বৃষ্টি হয়, যদি নদী জলে ভেসে যায়, এবং পাহাড়ের ভিতর হ্রদের মতো স্থানটুকু জলে ভেসে যায়, তবে কার সাধ্য এই সামান্য আলগা পাথরে আটকে রাখে।

তবু এক বিশ্বাস, এই উপবীতের অহঙ্কার—এর এই কাজ উদ্যম এবং আত্মত্যাগ মন্ত্রের মতো শুভ দিনের জন্য প্রতীক্ষা করবে। জল হবে দেশে, ঘরে ঘরে মানুষজন ফিরে আসবে, সে এই জল নিয়ে চরণামৃত করবে মা সুবচনির, এবং মাঠে মাঠে তাই ছড়িয়ে দিয়ে হাঁকবে, শস্যশ্যামলা দেশে আমার সুবচনি মায়, ছেইলা কোলে লৈয়া বাড়ি বাড়ি যায়। দুর্ভিক্ষ এবং খরার দিনেও জনার্দন প্রায় একটা সুখের স্বপ্ন দেখে ফেলল।

সে দেখল যেন সেই পাহাড়ের ওপর বিরাট এক জলাশয় গড়ে উঠেছে। এক হ্রদ, চারপাশে কত গাছপালা, নীচে কত জীবজন্তু বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। আরও নীচে সমতল মাঠ, কোঠা বাড়ি, ছোট ছোট নালার মতো খাল সমস্ত অঞ্চলটাকে জালের মতো ঘিরে রেখেছে। মানুষ তার প্রয়োজনমতো জল নিচ্ছে নালা থেকে এবং সময়ে শস্য হবে, জলের জন্য শস্য হবে, আর সারা গ্রামময়, অঞ্চলময় কোনও বিষাদ থাকছে না, শুধু গাছপালা পাখি, নদীতে জল, হ্রদে জল, মাঠের মাঝে যেসব খাল হ্রদ থেকে নেমে এসেছে সেখানে জল, আর জলে কত গাছ, মাঠে কত সোনার ফসল, সুবচনি দেবীর মন্দিরে মেলা বসেছে। দূর দেশ থেকে মানুষ এসেছে সওদা করতে, নটুয়া এসেছে গান গাইতে, কবি এসেছে কবিগান শোনাবে বলে। বাজিকর এসেছে জাদু দেখাবে বলে, ছোট—বড় শিশুরা যুবকেরা যুবতীরা মাথায় ফেটি [illegible] ছুটছে মেলায়, যুবতীরা হেসে গড়িয়ে পড়ছে, কাচের চুড়ি কিনছে দু পয়সায় আর মেলার প্রাঙ্গণে বড় নিশান উড়ছে—উদ্যমবিহনে কার পূরে মনোরথ।

জনার্দন বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে নীচে সেই সামান্য জলাশয়ের উদ্দেশ্যে হাঁটছে এবং স্বপ্ন দেখছে। হরিণী আর তার দুই শিশুসন্তান প্রতীক্ষারত। জলের জন্য ওরা দূরের কোনও সংরক্ষিত বন থেকে নেমে আসে। ওরা জলপানের জন্য ভোর রাতের দিকে নেমে আসে এবং ভোরেই জল পান করে চলে যায়। সুতরাং জনার্দন পা চালিয়ে হাঁটছিল। ওর হাতে একটা ছোট পেতলের বালতি, ফেরার পথে সামান্য জল নিয়ে সুবচনির মন্দিরে উঠে যাবে।

ভোরে জলপান করানো তার কাজ, সে নেমে এসে কিছুক্ষণ ওদের তিনজনকে দেখল। হরিণী নির্ভয়ে জিভ বের করে নাক দিয়ে কিছু ঘাম চেটে নিল। হরিণী এতক্ষণ শুয়ে ছিল। জনার্দনকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। পাশে তার দুই শিশু হরিণ ঘোরাফেরা করছে। লাফাচ্ছে। ছুটে দূরে চলে যাচ্ছে। মুখ উঁচু করে কী দেখছে। ফের নেমে আসছে নীচে ঠিক মায়ের কাছে, আর পেটের নীচে এসে গুঁতো মারছে। সামান্য স্তন থেকে দুধ খাবার জন্য মুখ বাড়ালে, এখন নয় এখন নয় এমন ভাব হরিণীর চোখে। সে তার পিছনের দুপা দিয়ে ওদের সরিয়ে দিচ্ছে। তারপর সেই শিশু হরিণেরা মায়ের কাছে বিমুখ হয়ে জনার্দনের পায়ের কাছে দাঁড়াল। জনার্দন ওদের একজনকে তুলে নিল বুকে, অন্যজন মুখ উঁচু করে জনার্দনকে দেখতে থাকল।

—অভিমান। জনার্দন অন্য শিশু হরিণকে বাঁ হাতে তুলে এনে দুগালে দুজনের মুখ লেপ্টে দিল।—কিরে তোদের কি ভয় হয় না। জনার্দন বলল। তোদের মানুষকে এখন ভয় নেই। তোরা এতদূর থেকে চলে আসিস কষ্ট হয় না!

হরিণী তার দুই শিশুর সঙ্গে এই মানুষের ভালোবাসাটুকুতে খুব খুশি, সে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। এবার একেবারে শরীর ঘেঁসে দাঁড়াল। জনার্দন বলল, কতক্ষণ লাগে যেতে? বলে তার কোল থেকে তাদের নামিয়ে দিয়ে বলল, এখন আর লাফানো ঝাপানো নয়। এবার জল খেয়ে সূর্য ভালো করে না উঠতে মানুষের এই অঞ্চল ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে যাও। আমার অনেক কাজ আছে, ওদিকে মা আমার প্রত্যাশায় বসে থাকে, কেবল কী খাবে কী খাবে করে সারাদিন! জনার্দন তার কথা নালিশের মতো করে যেন ওদের শোনালো, তুই মেয়ে ছেলে খরা এনে দেশটাকে শ্মশান করে দিলি, এখন কেবল খাব খাব করলে চলবে কেন!

ভিতরে ভয়ঙ্কর ক্ষুধা জনার্দনের। যখন খিদে পায়, যখন পেটের ভিতরটা সামান্য আহারের জন্য ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠে তখন পাগলের মতো সুবচনি দেবীর উদ্দেশ্যে গাল পাড়তে থাকে।—খাবি খাবি। সব খেয়ে

তোর শান্তি। আমাকেও খাবি। জনার্দন জল খেল। জল খেলে পেটের যন্ত্রণাটা সামান্য সময়ের জন্য কমে যায়।

মন্দিরে আর আহার বলতে কিছু নেই। আলুর লতা এখন পাহাড়ে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জল নিয়ে নদীর পারে সে উঠে এল। হরিণী তার তুই শিশু নিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ের ওপারে যে সংরক্ষিত বন রয়েছে তার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

সে কিছুক্ষণ অপলক ওদের উঠে যাওয়া দেখল। ভিতরে ক্ষুধার কষ্ট, কোনও মৃত পাখি পর্যন্ত সে খুঁজে পেল না, না শুকনো বট ফল। সে ভাবল—দূরে যেসব কুঁড়েঘর রয়েছে, যা এখন শ্মশানপুরীর মতো খা খা করছে—সেখানে উঠে গেলে হয়। ঘরের ভিতরে যদি খুঁজে কিছু সংগ্রহ করতে পারে। যদি কেউ দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় রেখে মারা যায়। জনার্দন এবার মা মা বলে দ্রুত হাঁটতে থাকল। এই অঞ্চল লোকালয়বিহীন। সুতরাং এখন সে প্রায় নগ্ন। সে প্রায় বেঁহুশ। সে ওপরে উঠে যাচ্ছিল, আর বম বম করছিল। মা, তারা শ্মশানীকে বলছিল, তুই মা আর কত কষ্ট দিবি জীবকুলকে এসব বলছিল! মা তারা ব্রহ্মময়ী। ওর চলতে চলতে মনে হল, মা তারা ব্রহ্মময়ী তার সামনে ডাইনির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জীর্ণ কুটিরের দিকে উঠে যেতে বলেছিল। সে বলল, পথ ছাড়। তুই ভেবেছিস ভয় দেখিয়ে আমাকেও দেশছাড়া করবি। তুই জানিস না জনার্দন কত অহঙ্কারী মা। মা তোর একদিন কী আমার একদিন। আমি মা দেখব তোর সন্তানকে তুই আর কত কাল নিরন্ন রাখবি। দেখব, দেখব, দেখব। জনার্দন দ্রুত হাঁটছিল আর তিনসত্য এই বলে গাল দিচ্ছিল, তুই মা করালবদনী, মুখ ব্যাদন করে আছিস, মুখের রক্ত মাটিতে উগলে পড়ছে তবু একবিন্দু জল দিবি না।

জনার্দন হাঁটতে হাঁটতে ফের বলল, বেশিদিন আর নেই। আমি মরে গেলে মনে করবি না, তোকে ওখানে বসিয়ে রাখব। তোকে বুঝলি সুবচনি, তোকে তোর ছেলেকে নিয়ে ঐ যে পাহাড় দেখছিস সেখানে নিয়ে যাব। পাথরের নীচে রেখে পাষাণের ভার চাপিয়ে দেব। তবু যদি তোর চোখে জল না আসে দুঃখে, তবে তোর মুখে মুতে দেব।

তখন সুবল দেবদারু গাছের নীচে বসে জুতো পালিশ করছিল। পাখিটা দাঁড়ে বড় বেশি ছটফট করছে। বড় বেশি কিচমিচ করছে। পাখিটার তবে বুঝি জল তেষ্টা পেল। সে বাটিতে করে সামান্য জল দিল পাখিটাকে। কিন্তু পাখি জল খেল না। পাখা ঝাপটাতে থাকল। এবং পা দিয়ে বাটির জল উলটে চিঁ চিঁ করে কাঁদতে থাকল!

পাখিটাত এমন করে না কোনওদিন! সুবল ভাবল। সুবল অস্বস্তি বোধ করছে। পাখিটা ছটফট করলে ওর বড় কষ্ট হয়। সে ভালোভাবে জুতো পালিশে মন দিতে পারছিল না। সুতরাং লোকটা রেগে মেগে পয়সা না দিয়ে চলে গেল।

সুবল ভাবল, বাঁচা গেল। লোকটি পয়সা দেয়নি বাঁচা গেল। লোকটি চলে গেছে, সুতরাং সুবল এখন পাখিটার দিকে ভালোভাবে মন দিতে পারবে। সে ওর ক্রিমের কৌটার মুখ বন্ধ করে ব্রাস দিয়ে কাঠের বাক্সটাতে একটা বাড়ি মারল, তারপর ব্রাসটা নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, এই সাতসকালে তোর কী হল বাপু।

পাখিটা দাঁড় থেকে উঠে সুবলের হাতে ঠোকরাতে থাকল। সুবল কী ভেবে বলল, আমাকে ভালো লাগছে না। তবে যা, উড়ে যা। বলে সে পা থেকে শেকল খুলে দিল। আর শেকল খুলে দিতেই পাখিটা সামনের দেবদারু গাছ অতিক্রম করে সামনের ছোট মাঠ পার হয়ে একটা জানালায় গিয়ে বসল। আর সেখানে বসে সেই আগের মতো প্রাণপণে চিঁ চিঁ করতে থাকল।

সুবল কিছু একটা ঘটবে, ঘটেছে ভেবে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখল ঘরের ভিতর টুকুনদিদিমণি, সংজ্ঞাহীন, বড় বড় ডাক্তার, অনেক খেলনা চার ধারে। পাখিটা কিচ কিচ করছে বলে নার্স ছুটে এসে পাখিটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলে, সুবল বলল, আমাদের টুকুনদিদিমণি না? টুকুন টুকুনদিদিমণি, সে খেপা বালকের মতো

ডাকতে থাকল, সে এত উত্তেজিত যে এইসব বড় বড় ডাক্তারদের আদৌ ভ্রুক্ষেপ করল না। সে জানালার ওপরে উঠে গেল। পাখিটা সুবলের উত্তেজনা যেন ধরতে পারছে, পাখিটা সুবলের চারপাশে এখন উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সুবল ডাকছে, টুকুনদিদিমণি আমি এসে গেছি। আমি তোমাকে কত খুঁজে খুঁজে ফিরে গেছি। এই দেখ টুকুনদিদিমণি সেই দুষ্টু পাখি, দেখ নীল লাল কুঁচ ফল।

একজন নার্স এগিয়ে এসে বলল তুমি কে বাপু।

—আমি সুবল। সুবল আমি। আমরা ট্রেনে করে আসছিলাম...।

—অঃ তুমি সুবল। নার্সের মনে হল যেন সেই এক গল্প টুকুনের মা বাবা করে গেছে, এক সুবল, পাখিয়ালা সুবলকে দেখে টুকুনদিদিমণি হাতে তালি বাজিয়েছিল। সেই সুবল এসে গেছে। নার্স এবার ধীরে ধীরে বলল, টুকুনদিদিমণির খুব অসুখ। টুকুনদিদিমণি বাঁচবে না।

সুবল বলল, বাঁচবে না কেন?

—ওর ভয়ঙ্কর অসুখ।

—কী অসুখ।

—নার্স অসুখটার নাম করতে পারত। কিন্তু সাধারণ এক পাখিয়ালা সুবলকে এত ফিরিস্তি দিয়ে কী লাভ। সে বলল, তুমি অতসব বুঝবে না। তুমি যদি টুকুনদিদিমণিকে দেখতে চাও, ঘুরে সামনের দরজায় এসো।

—আমি ত এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি টুকুন দিদিমণিকে। দিদিমণি ঘুমুচ্ছে।

নার্স এবার বিরক্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছে।

—জাগলে একবার ডেকে দেবেন। আমি দেবদারু গাছটার নীচে রয়েছি। আমার কথা আছে অনেক। টুকুনদিদিমণি বলেছিল কলকাতায় এলে আমি যেন ওর সঙ্গে দেখা করি।

নার্স বলল, এখন যাও বাপু। ডাক্তারবাবুরা খুব বিরক্ত হচ্ছেন। তুমি গিয়ে চুপচাপ দেবদারু গাছের নীচে বসে থাক।

—দিদিমণির বাবা মাকে দেখছি না?

—ওরা বিকেলে আসবে। তুমি যাও বাপু। কথা বল না। ডাক্তারবাবুরা বিরক্ত হচ্ছেন।

—তবে আমার পাখিটা এখানে থাকল।

—পাখি আবার কেন।

—দিদিমণি জাগলে সে আমাকে ডেকে দেবে।

—না বাপু পাখি টাখি রেখ না। তুমি তোমার পাখি নিয়ে চলে যাও। টুকুন জাগলে তোমায় ডেকে দেব।

—সত্যি ডেকে দেবে ত?

নার্স বিরক্তি প্রকাশ না করে আর থাকতে পারল না, যাও বলছি।

—যাচ্ছি। সে পাখিটাকে ডাকল, আয়।

পাখিটা নড়ল না। পাখিটা গরাদে বসে ঠোঁট মুছতে লাগল।

সুবল বলল, এ এখন যাবে না। আমি যাচ্ছি। পাখিটা আপনাদের কোনও বিরক্ত করবে না!

—না নিয়ে যাও বলছি।

পাখিটা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, টুকুন চোখ খুলছে। পাখিটা এবারে ভিতরে ঢুকে ফুর ফুর করে উড়তে থাকল। টুকুন ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখল সেই পাখি—সোনার রঙের ঠোঁট, পায়ে সবুজ ঘাসের রঙ, পাখা কালো—গলার নীচে লাল রিবন যেন বাঁধা! টুকুন মনে করতে পারছিল না এই পাখি সে প্রথম কোথায় দেখেছিল। সে পাখিটাকে কোথায় দেখেছে। কবে কখন! এই প্রিয় পাখি কার, কে এই পাখি নিয়ে এসেছিল তার কাছে। যেন স্বপ্নের মতো তার কাছে এক পাখি এসে গেছে, লাল রিবন বাঁধা পাখি! সে এই পাখি দেখে কত দীর্ঘদিন পর যেন মনে করতে পারল—এ পাখি সুবলের পাখি। সুবলকে ফেলে তার কাছে চলে এসেছে। পাখি দেখে টুকুন প্রথম জল খেতে চাইল, জল দিলে সে পাখিটাকে ধরার

জন্য হাত তুলতে গিয়ে মনে হল শরীরের ভিতর কী যেন কেবল শির শির করছে। সে সামান্য হাসতে পারল, আরামদায়ক এক অনুভূতি! পাখি, সুবলের পাখি, পাখি যখন এসে গেছে তখন সুবলও এসে যাবে। সুবল, পাখিয়ালা সুবল এই সংসারে এলে আর কোনও দুঃখ থাকবে না। টুকুন সামান্য না হেসে যেন থাকতে পারল না।

বিকালের দিকে টুকুনের বাবা সুরেশবাবু এলেন। ওদের পারিবারিক ডাক্তার এলেন। এবং টুকুনের মা শিয়রে বসেছিল। নার্স, সকালের দিকে টুকুন সংজ্ঞাহীন হয়েছে আজও—খবরটা সুরেশবাবুকে দিতে গিয়ে সেই পাখিয়ালার গল্পও করে ফেলল।

সুরেশবাবু বললেন, সে এখন কোথায়?

নার্স দেবদারু গাছটার দিকে হাত তুলে বলল, ওর নীচে বসে জুতো পালিশ করছে। সকালের দিকে এসেছিল। খুব বিরক্ত করছিল টুকুনকে। তাই তাড়িয়ে দিয়েছি।

—ওর পাখিটা এখনও আছে?

—পাখিটাকে নিয়েই ত সব ঝামেলা। ঘরের ভিতর ঢুকে কেবল ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ছে। আমার কথা শুনছে না, পাখিয়ালার কথা শুনছে না। ডাক্তারবাবুরা খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন। ভয়ে ভয়ে আমি তখন ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। সে পাখি নিয়ে দেবদারু গাছের নীচে বসে আছে।

নার্স ভুলে গেল পাখিটা যখন উড়ছিল তখন টুকুনের মুখে সামান্য সজীবতা লক্ষ্য করা গেছে। নার্স ভুলে গেল বলতে সংজ্ঞাহীন অবস্থা থেকে টুকুন পাখির ডাক শুনে জেগে উঠেছে। আর ভুলে গেল বলতে পাখিয়ালা বিশ্বাস করছিল না, টুকুন বাঁচবে না।

মা টুকুনের কপালে হাত রাখল। টুকুনকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। খেলনাগুলো সব একদিকে জড়ো করা। নার্স বিকেলের দিকে চুল বেঁধে দিয়েছে। মুখে সামান্য পাউডার। মুখের এনিমিয়া ভাবটা এখন আর তত স্পষ্ট নয়। সকলের মুখই বিষণ্ণ। বিশেষ করে টুকুনের মা সারাক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ডাক্তারবাবু বললেন, এখন আর আমাদের কিছু করণীয় নেই।

—না কিছু করণীয় নেই।

—সংক্ষেপে বুঝলেন সুরেশবাবু, ডাক্তারবাবু কেমন বিচলিতভাবে কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

—আপনি উদ্যমহীনতার কথা বলতে চাইছেন।

—হুঁ আমরা কেমন যে ক্রমশ উদ্যমবিহীন হয়ে পড়ছি সকলে।

—তিনি একটু থামলেন, তারপর টুকুনের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন। ওর ভিতরের কলকবজাগুলো ঠিকমতো প্রথম থেকেই কাজে লাগেনি।

সুরেশবাবু বললেন, কিন্তু আমার দিক থেকে ত' কোনও ত্রুটি ছিল না ডাক্তারবাবু।

আর তখন কে যেন পথে পথে বনে বনে বলে গেল, কে যেন হেঁকে হেঁকে গেল, পথ দিয়ে মানুষ যায় দেখ, ঘোড়া যায় গাড়ি যায় দেখ, দুঃখ যায় সুখ যায় দেখ। দেখ দেখ মানুষ কত মানুষ, কত হিসাবের মানুষ পোস্টার মারছে দেয়ালে—খেতে পায় না, অনাহারে দুর্ভিক্ষে মানুষ সব গ্রামে মাঠে মরে থাকছে।

অথবা যেন পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল শহরটা—জল চাই, অন্ন চাই। শুধু লেখা ছিল না উদ্যমবিহনে কিবা পূরে মনোরথ! সুরেশবাবু নিজের চোখে মেয়ের চোখ দেখছিলেন, এক দুরারোগ্য ব্যাধি এই মেয়ের! ঠিক যেন তার কলকারখানার মতো। আয় নেই, ব্যয় বাড়ছে, শ্রমিকেরা উৎপাদন বাড়াচ্ছে না। টাকার দাম কমছে, জিনিসপত্র আকরা। এক রোগ তার কলকারখানাকে উৎখাতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই তিনি সে ক্ষয় থেকে তাকে রক্ষা করতে পারছেন না...ঠিক যেন এই মেয়ে, যে ইচ্ছা করলেই বেঁচে উঠতে পারে ভিতরের উদ্যমহীন এক ক্ষতজাত রক্ত কিছুতেই তাকে সুস্থ হতে দিচ্ছে না।

সুরেশবাবু যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন, তোরা বল, বুকে হাত দিয়ে বল, যা এখন উৎপাদন করছিস, তোরা মনপ্রাণ দিলে তার দ্বিগুণ দিতে পারিস।

এক দৈত্য বোধহয় নিয়মের দৈত্য অথবা আদাইয়ের দৈত্য হু হু করে হেসে উঠল—স্যার আপনি কী জলে ডুবে স্বপ্ন দেখছেন। আমরা কী আর উৎপাদন বাড়াতে পারি!

সুরেশবাবু মেয়ের মুখ দেখে আঁতকে উঠলেন। ভিতরে মেয়ের সেই ক্ষতজাত রক্ত কেবল ভিতরে ঘুরে ঘুরে আমরণ পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য লড়াই। যেন এই মেয়ে তার নিজের ভিতরেই ক্ষয়কে ভালোবেসে পুষে রেখেছে। সে বলল, টুকুন তুমি ঐ দেখ পাখিয়ালা সুবল এসে গেছে। তুমি তখন হাতে তালি বাজিয়েছিলেন, এখন পারো না। ঐ দেখ সুবল দেবদারু গাছের নীচে বসে জুতো পালিশ করছে। তাকে ডাকব?

টুকুন হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। যেন কোনও অমল আনন্দের খবর বয়ে আনার মতো মানুষ তার আর নেই।

সে শুধু বলল, বাবা জল খাব। জল।

সুরেশবাবু নার্সকে জল দিতে বলে বের হয়ে গেলেন। যে বাঁচতে চায় না, তাকে বাঁচিয়ে লাভ নেই। সুরেশবাবুর মুখে অবসাদের চিহ্ন। তিনি বড় বড় হাই তুলতে থাকলেন।

সুবল দেবদারু গাছের নীচে বসে ছিল। রাস্তায় আলো জ্বলছে। ফুটপাতে মানুষের ভিড়। কোথায় কী গণ্ডগোল হয়েছে, সহসা শহরের ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেল। মানুষেরা পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরছে। কিছু টেম্পো, লরি এবং রিকশা মানুষ বইছিল, রাস্তা ফাঁকা বলে সব ছোট ছোট ছেলের দল রাস্তার উপর বল খেলেছিল, ক্রিকেট খেলছিল এবং হাডুডু খেলছিল।

অথচ দেবদারু গাছটার নীচে বসেছিল সুবল, রাতে সে এই গাছের নীচে শুয়ে থাকবে। সঙ্গে ওর ছোট এক সতরঞ্চ আছে, অপরিচ্ছন্ন হলে সে সব গঙ্গার জলে ধুয়ে নেয়। আর ঐ গাছের নীচ থেকে টুকুন দিদিমণির জানালা স্পষ্ট। এখন মনে হচ্ছে দিদিমণির ঘরে কেউ নেই। ঘর ফাঁকা। শুধু সেই রাজা, কিছু পরি এবং বিড়াল, কুদুমাসির মুখ দেখা যাচ্ছিল। সে তার পাখির দিকে মুখ তুলে তাকাল। পাখিটা দাঁড়ে বসে ঝিমোচ্ছে। সে এবার সব গোছগাছ করে কাঁধে ফেলে জানলার দিকে এগুতে থাকল, যখন কেউ নেই, জানলা দিয়ে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু ঘরে একটা নীল আলো জ্বলছে, তখন সুবল কিছুতেই দেবদারুর নীচে বসে থাকতে পারল না। কী এক অপরিসীম ভালোবাসা আছে টুকুনদিদিমণির, টুকুনদিদিমণি ছুটে গিয়েছিল দরজায়, দরজা খুলে বলেছিল, এখানে কেউ নেই, এ কামরায় কেউ ঢোকেনি। বলে পুলিশের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল—সেই থেকে মনে হয়েছে সুবলের এমন ভালোবাসার জন আর তার কেউ নেই। এমন আপনার জন তার আর পৃথিবীতে কেউ নেই। টুকুনদিদিমণিকে সে যেন ইচ্ছা করলে সব দিয়ে দিতে পারে। আর এই যে পাখি, যার মূল্য সুবলের কাছে প্রাণের চেয়েও অধিক, ইচ্ছা করলে সুবল টুকুনদিদিমণিকে খুশি করার জন্য সেই অমূল্য ধনও উড়িয়ে দিতে পারে। তার যা কিছু সম্বল, যা কিছু সঞ্চয় সব এই টুকুনদিদিমণিকে দিয়ে দিতে পারে। ঘর ফাঁকা দেখে সে কিছুতেই আর গাছের নীচে বসে থাকতে পারল না—জানালায় এসে কাঁধ থেকে ঝোলাঝুলি নামিয়ে ফিস ফিস করে ডাকল, টুকুনদিদিমণি আমি এসেছি।

জানলার দিকে মুখ ছিল টুকুনের। স্প্রিং—এর খাট, শিয়রের দিকটা একটু উঁচু করা। টুকুনদিদিমণির চোখ ঘোলাটে, যেন স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছে না। প্রায় অন্ধের মতো—অথবা সংজ্ঞাহীনের মতো ঠিক যেন তার সেই খরা অঞ্চল, কোনওকালে বৃষ্টি পায় না আর ফসল ফলবে না, সোনার ফসল ঘরে তুলে কেউ আর উৎসবে পার্বণে আলো জ্বালবে না। সে ফিস ফিস করে ডাকল, দিদিমণি, দিদিমণি আমি সুবল চিনতে পারছ না? আমাকে তুমি চাদর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলে, আমাকে তুমি পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেছিলে। আমি পাখিয়ালা সুবল।

—কে? সুবল!

—হ্যাঁ আমি সুবল। আমি তোমাকে কুঁচফল দিয়েছি।

—তুমি আমাকে রঙবেরঙের পাথর দিয়েছ সুবল।

—আমি তোমাকে চন্দনের বীচি দিয়েছি।

—আমার শিয়রে সব আছে।

—কৈ দেখি। সুবল দু পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। কিন্তু অবাক টুকুন তার হাত—পা নড়াতে পারল না।

সুবল বলল, কৈ দেখি। তোমার শিয়রের নীচে কোথায় রেখেছ দেখি।

টুকুন বলল, নার্স এলে বলব। নার্স শিয়রের নীচ থেকে চন্দনের বীচি বের করে দেখাবে।

—কেন তুমি পারো না!

—না সুবল। আমি পারি না। আমি হাঁটতে পারি না সুবল। কতদিন আমি হাঁটি না। কতদিন আমি মাঠে মাঠে হেঁটে বেড়াইনি। বলে দুঃখী এক মুখ নিয়ে সুবলের দিকে চেয়ে থাকল। তারপর সামনের মাঠে যে আলো জ্বলছিল, সামনের পার্কের বেঞ্চগুলোতে যে মানুষগুলো বসেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, জানো সুবল কেউ বিশ্বাস করে না। আমি ট্রেনে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিলাম, ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না। বলে সে আঙুলে সমস্ত ফুলপরি, জলপরি, রাজা এবং অন্যান্য পুতুলদের উদ্দেশ্য করে দেখাল।

সুবল বলল, যা তুমি আবার হাঁটতে পারবে না কেন? তুমি ঠিক হাঁটতে পারো।

—আমি হাঁটতে পারি তাই না সুবল? আমি ট্রেনে হেঁটেছিলাম তাই না সুবল। বলে সে খুব উচ্ছ্বল হয়ে উঠল।

—তুমি এখন হাঁটতে পারো।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল টুকুন খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। সে আর সুবলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না। কী যেন ভাবছে। সে সুবলকে বলতে চাইল, আমি আর হাঁটতে পারি না। তোমাকে ইচ্ছা হয় বারবার হেঁটে দেখাই। কিন্তু সুবল আমি সত্যি পারি না এখন। গায়ে শক্তি নেই। হাতে পায়ে স্থবির একভাব সব সময়।

টুকুনের চোখ ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল ফের। ভিতরে লজ্জাকর অনুভূতি। বড় মাঠ সামনে, আর এতসব ট্রাম বাস চোখের উপর দিয়ে ছুটছে, এতসব মানুষজন পথ পার হয়ে যাচ্ছে—ওদের দেখে টুকুনের ভিতর সব সময় অসহিষ্ণু ভাব। টুকুন ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিল।

সুবল যেই দেখতে পেল, টুকুনদিদিমণির চোখ ফের ঘোলা হয়ে যাচ্ছে—সে বলল, টুকুনদিদিমণি, তুমি হাঁটতে পারো। তুমি হেঁটে হেঁটে ইচ্ছা করলে, অনেক দূরে চলে যেতে পারো।

আমি হাঁটতে পারি সুবল তুমি বলছ?

টুকুন এবার তার খেলনাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, কিরে রাজা এখন বুঝতে পারছিস, আমি হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিলাম। এই দেখ সুবল, পাখিয়ালা সুবল, সব দেখেছে। ওদের দেশে খরা বলে ও কলকাতায় চলে এসেছে। ওর সঙ্গে ট্রেনে কত কথা বলেছি। ওর পাখিকে আমি খেতে দিয়েছি। আমি তোদের মতো নেঙ্গু নইরে। তোদের মতো এক জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে থাকি না।

সুবল বলল, এই যে পাখি দেখছ, ওর কেউ ছিল না। একদিন ফিরে আসার সময় দেখি গাছের নীচে পড়ে ছটফট করছে। ওর মা বাবা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখে বুঝি পালিয়েছিল। পাখিটা নড়ে না, খায় না, পাখির চোখ ঘোলাটে। এই পাখি সকলে বলল মরে যাবে, আমি পাখিকে নিয়ে মাঠে চলে গেলাম, সবুজ কীটপতঙ্গের ছানা খুঁজে বের করলাম। অতল জলের স্বাদ মুখে দিলাম। নদীর জলে স্নান করালাম, সুবচনি দেবীর মন্দিরে গিয়ে মানত করলাম, মা আমার পাখিকে উড়িয়ে দে আকাশে, উড়িয়ে দে সব, পাখির চোখে নদীর জল লেগে পাথরের মতো কালো হয়ে গেল। সবুজ কীটপতঙ্গের ছানা খেয়ে পাখা গজালো, অতল জলের স্বাদ পেয়ে পাখি তাজা হল—কিন্তু হায় পাখি আমার আকাশে ওড়ে না, চলে না ফেরে না। পাখিকে নিয়ে কী কষ্ট! মাঠে নেমে পাখিকে বলতাম ঐ দেখ বড় মাঠ, ঐ দেখ বড় গাছ, আপন প্রাণের তেজে পাখি আকাশে উড়ে যা! সে কী দৌড়ঝাঁপ গেছে। খরা চলছে গ্রামে মাঠে, মানুষ রোদে বের হতে চায় না, আমি পাখিকে

শুধু বললাম, পাখি, আপন প্রাণের তেজে পাখি আকাশে উড়ে যা। একদিন দুদিন গেল, মাস গেল, এবং মাঝে মাঝে আমরা নদীতে জলের সন্ধানে বের হতাম, পাহাড় চারপাশে, কত গাছপালা ফুল ফল পাখি ছিল, খরায় সব পুড়ে গিয়েছে। চারদিকে তাকালে কান্না পায়, জল খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে পাখিকে বলতাম—উড়ে যা। আপন প্রাণের আবেগে উড়ে যা। বলে সুবল নিজের পাখিকে বলল, উড়ে যা, তোর টুকুনদিদিমণি দেখুক—সঙ্গে সঙ্গে পাখি উড়তে থাকল ডিগবাজি খেতে থাকল—কোথাও উড়ে গিয়ে নিমেষে ফিরে এল, রাজার মাথায় বসেছে কিন্তু মলমূত্র ত্যাগ করলে মনে হল চোখের নীচে রাজার পিচুটি। রাজা যেন হাপুস নয়নে কাঁদছে।

তখন সুবল বলল, দেখ দিদিমণি দেখ, তোমার রাজার চোখে পিচুটি, রাজা কেমন মুখগোমড়া করে আছে। টুকুন ঘাড় ফিরিয়ে রাজাকে দেখতে পেয়েই হো হো করে হেসে উঠল।—ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে। পাখি তোমায় উচিত শাস্তি দিয়েছে। পাখিটার কিন্তু কোনও ভ্রুক্ষেপ ছিল না। পাখি আকাশে ওড়ার মতো ঘরের ভিতর দোল খেয়ে উড়ছে।

সুবল বলল, দিদিমণি ওর পাখায় কত রাজ্যের স্বপ্ন দেখো।

সুবল বলল, দিদিমণি পাখির পায়ে কত রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখো।

তারপর সুবল কেমন নেচে নেচে বলতে থাকল, আকাশ দেখো, সমুদ্র দেখো, দেখো দেখো মাঠ দেখো, পাহাড় দেখো, পাখিটা সেই দেখার মতো ঘরের ভিতর উড়তে থাকল, সমুদ্র দেখার মতো বাতাসের উপর ভাসতে থাকল, নদী দেখার মতো এঁকেবেঁকে সোজা উপরে নীচে উঠে গেল। টুকুন সব দেখছিল। জাদুকর তার পাখির খেলা দেখাচ্ছে। জাদুকর এই ঘরে পাখির খেলা দেখিয়ে সকল দুঃখ যেন দূর করে দিচ্ছে।

টুকুন মনপ্রাণ ঢেলে এই পাখির খেলা দেখতে থাকল। ভিতরে সেই শির শির ভাবটা কাজ করছে। ভিতরে, সেই প্রাণের ভিতরে শির শির ভাবটা কাজ করছে। যেন শরীরের সর্বত্র রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে। শরীরের ভিতরে কোথাও এক হীরামন পাখি এতদিন চুপচাপ ঘুমিয়ে ছিল এই পাখির খেলা দেখতে পেয়ে সে—পাখি আকাশে ওড়ার জন্য ডানায় যেসব রাজ্যের ক্লান্তি জমে ছিল এতদিন, তাই উড়িয়ে দিল। প্রাণের ভেতরে এক পাখি আছে, ওড়ার পাখি, সেই পাখির আজ কতদিন পর যেন ওড়ার প্রত্যাশায় চোখে মুখে হাসির আনন্দ, হায় এই হাসির আনন্দ কোথাও শেষ পর্যন্ত থাকে না, মানুষেরা এই হাসির আনন্দ প্রাণের কখন যেন বড় হতে হতে হারিয়ে ফেলে।

টুকুন ধীরে ধীরে দেখল অনেকক্ষণ ওড়ার পর পাখিটা ক্লান্ত হয়ে সুবলের মাথায় গিয়ে বসেছে। রাত বাড়ছিল। সুবল ধীরে ধীরে জানালা থেকে নেমে ফের দেবদারু গাছের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। টুকুন জোরে চিৎকার করতে চাইল, সুবল তুমি আবার কাল এসো। আমি জানালায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব। এবং পিছনে দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল নার্স দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। টুকুন এতক্ষণে বুঝতে পারল নার্সের ভয়ে সুবল চুপি চুপি কিছু না বলে পাখি নিয়ে চলে গেছে।

সাত

জনার্দন বুঝতে পারল, আর রক্ষা নেই। মাটি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। মরুভূমির মতো উত্তাপে গাছপালা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কোথাও সামান্য রস সঞ্চিত নেই। এখন এই পাহাড় ঘেরা অঞ্চলে শুধু মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকা। জনার্দন মন্দিরের ভিতর পায়চারি করছিল। হাত—পা শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। চোখে আর প্রায় দৃষ্টি ছিল না। সে এখন আর পাহাড়ের ওপর উঠে পাথর নিক্ষেপ করতে পারছে না। সমস্ত উদ্যম নিঃশেষ হয়ে গেল।

দাবানলের মতো জ্বলে সূর্য অস্ত চলে গেল। জনার্দন অভ্যাসমতো বের হয়ে পড়ল। চোখের দৃষ্টি কমে আসছে বলে সে ধীরে ধীরে পরিচিত পথ ধরে পাহাড় থেকে নেমে সমতল পথ ধরে হাঁটতে থাকল। আজ প্রায় চারদিন হল জনার্দন শুধু জল খেয়ে আছে। জনার্দন আজও শেষবারের মতো বের হয়ে পড়ল। যদি

কোনও আহার্য বস্তু সংগ্রহ করতে না পারে, যদি পাহাড়ময় এবং মাঠময় কোনও মৃত জীবজন্তু অথবা ঘাসপাতা সংগ্রহ করতে না পারে তবে মনে হচ্ছিল মৃত্যু অবধারিত। এই মৃত্যু ওকে গ্রাস করবে ক্রমশ। এখন আর পায়ে শক্তি নেই যে সে দূরের কোনও শহরে অথবা গঞ্জে চলে যাবে। ষাট সত্তর মাইল হেঁটে যাবার শক্তিটুকু জনার্দনের শেষ হয়ে গেছে। সে হাঁটছিল এবং মাঝে মাঝে আবেগে মা মা বলে ডেকে উঠছিল।

জনার্দনের হাঁটতে হাঁটতে মনে হল সংসারে একরকমের তেষ্টা আছে যা কোনওকালে নিবারণ হয় না। একরকমের অভাব আছে যা কখনও দূর হয় না। আর একরকমের অহঙ্কার আছে যা কোনওকালে শেষ হয় না। জনার্দনের সেই অহঙ্কার। শস্যশ্যামলা এই দেশে প্রথম পিতৃপুরুষেরা আসেনি। পাহাড়ি অঞ্চল ছিল। সেখানে লোকালয় বিশেষ ছিল ন। নির্জন এক পাহাড় ঘেরা প্রান্তরে সামান্য ক'ঘর আদিবাসীর ভিতর তার কোনও পিতৃপুরুষ এসেছিল সুবচনি দেবীর ভার কাঁধে নিয়ে। সে এসেছিল বলে, দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে, এবং দিনমান এই মাঠের ভিতর উপুড় হয়ে পড়ে থেকে সব ঘাসবিচালি তুলে নিয়েছিল বলে বর্ষার শেষে কী ফসল, কী ফসল। এত ফসল হয় মাটিতে মানুষের জানা ছিল না। পাহাড়তলি অঞ্চল থেকে মানুষজন ফসলের লোভে চলে এসেছিল—আর যায়নি। তার পূর্বপুরুষ এক বন্ধ্যা মাটিকে উর্বরা ভূমি করে সংসারে প্রায় পির সেজে গেল। তারপর থেকেই বংশের ভিতর এক নিদারুণ অহঙ্কার। উৎসবে, পালাপার্বণে মানুষের সুখে দুঃখে সব সময় এই দেবীর সেবাইত প্রায় ঈশ্বরের সমতুল্য। জনার্দন হাঁটতে হাঁটতে ফের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, মা মা—মা সুবচনি তুই নিষ্ঠুর হলে চলবে কেন—আমার অহঙ্কার মুছে দে মা। সামান্য বৃষ্টি দে মা। রাগ করে মা কার ঘরে বসে আছিস। বৃষ্টি দে মা, মাঠে ঘাসবিচালি গজাক। পাখি—পাখালি উড়ে আসুক মা। গাছে গাছে ফুল ফুটুক। ফল হোক মা গাছের শাখা—প্রশাখাতে। তোর লীলা মা আর কতকাল চলবে।

কিন্তু হায় কার কথা কে শোনে। শেয়াল ডাকছে না। কুকুরের আর্তনাদ নেই কোথাও। চারিদিকে বীভৎস জ্যোৎস্না! সাদা আলো মাঠময়। সেই মাঠের ভিতর বসে একসঙ্গে কারা যেন নিত্য কেঁদে চলেছে। জনার্দন একটু থমকে দাঁড়াল। কারা কাঁদছে! ঠিক যেখানে নদী সামান্য বাঁক নিয়েছে, যেখানে ক'ঘর মুন্ডা জাতীয় আদিবাসী ছিল, এবং যেখানে পেটের জ্বালায় ঘরের এক বউ ফাঁসি দিয়েছিল সেইসব মাঠে এবং গাছের ভিতর একদল মেয়ে যেন হাজার হবে, তার বেশিও হতে পারে বসে বসে কাঁদছে। জনার্দনের প্রায় পা চলছিল না। এমন বীভৎস দৃশ্য জনার্দন কোনওকালে যেন দেখেনি। হাজার ঘোড়া ছুটছে। ঘোড়ার পিঠে সব নারী—পুরুষের মুখ ঝুলছে। দেহ নেই। শুধু মুখ। তারপর একটা কালো ঘোড়া যেন ছুটে গেল, সেই ঘোড়ার পিঠে শুধু এক তরবারি। তারপর মনে হল সুবচনি দেবী মাঠের ভিতর ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। ছোট সুবচনি দেবী হাত পা বিশাল করে, স্তনে সন্তান ঝুলিয়ে ঠিক কোনও ভৈরবীর মতো দু হাত ওপরে তুলে জনার্দনের দিকে এগিয়ে আসছে। আর মনে হল হাজার হাজার কঙ্কাল সেই সুবচনি দেবীর চারপাশে আনন্দে নৃত্য করছিল। জনার্দন এবার বলল, মা আমার আর কোনও অহঙ্কার নেই মা। আমি ক্ষুধার জন্য অন্ধ হয়ে যাচ্ছি মা। মা আমার এই পিতৃপুরুষের দেশকে শ্মশান করে দিলি মা। আমি যে মা বড় ঘোরে পড়ে যাচ্ছি। জনার্দন হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকল।

জনার্দন ধীরে ধীরে আরও নীচে নেমে এল। সে একনাগাড়ে হাঁটতে পারছিল না বলে কোথাও সামান্য সময় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। জলের জন্য সে নেমে যাচ্ছে। খাদ্য অন্বেষণের জন্য সে নেমে যাচ্ছে। যেখানেই সে বসত—চারপাশে শুধু মৃত গাছের ডাল। হাওয়া দিলে মরমর শব্দ করে কিছু গাছপালা ভেঙে পড়ত। জনার্দনের ইচ্ছে যায় তখন, মৃত ডালে, গাছে গাছে এবং সর্বত্র আগুন ধরিয়ে দিলে কেমন হয়। মা সুবচনিকে পুড়িয়ে মারলে কেমন হয়। ভাবতে ভাবতে জনার্দন হা হা করে হেসে উঠল।

আবার জনার্দনের হাঁটা। দক্ষিণের মণি পাহাড়ে উঠে গেলে হয়তো এখন কিছু কাঁটাজাতীয় গাছ মিলতে পারে। কম জল হলে ওরা বেশি গজায়। পাথরের ফাটল থেকে রস চুষে ওরা বড় হয়। কিন্তু শরীর দুর্বল,

মণি পাহাড়ে উঠে যাবার সাধ্য যেন একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেছে জনার্দনের। সে হেঁটে হেঁটে শেষ যে পাহাড়ের মাথায় রোজ উঠে পাথর নিক্ষেপ করত তার নীচে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। জ্যোৎস্না রাত বলে পাহাড়ের শেষ দিকের অংশটুকু একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। সে এবার সেই যোজকের নীচের অংশটুকুতে এসে দাঁড়াল। পাথরে পাথরে জায়গাটা খুব উঁচু হয়ে গেছে। এবার নদীতে জল এলে প্রায় হ্রদের মতো জায়গাটা ঘিরে জল ধরে রাখবে। সে জলের আশায় বৃষ্টির আশায় আকুল হতে থাকল। বৈশাখ চলে গেছে, জ্যৈষ্ঠ যাব যাব করছে। অথচ একবিন্দু বৃষ্টি নেই। এবারেও মা সুবচনি এ—অঞ্চলে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। রাগে দুঃখে জনার্দন পাথরের ওপরই খামচাতে থাকল।

দুঃস্থ মানুষ জনার্দন অহোরাত্র খাদ্য অন্বেষণের পর ক্লান্ত হয়ে নদীর স্রোতের উঁচু অংশটাতে চুপচাপ বসেছিল। ভোর হতে আর দেরি নেই। হরিণী তার দুই শিশু সন্তান নিয়ে এবার নেমে আসবে। ওদের জলপান করানো হলে জনার্দন পেট পুরে জলপান করবে। তারপর, মন্দিরের ভিতর সারাদিন পড়ে থাকা ক্ষুধার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে মাঝে মাঝে দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়া—হায় জনার্দন প্রায় এখন কিছুই ভাবতে পারছিল না। সামনে যেসব গঞ্জ ছিল সেও সুনসান। কোনও কোলাহল নেই, ক্রমশ এক অন্ধকার এই পাহাড়ঘেরা মাঠে নেমে এসে সব অঞ্চলটাকে ভূতপ্রেতের রাজত্ব করে দিল।

জনার্দন মনে মনে খেঁকিয়ে উঠল, না হয় না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল যে কোনও মই বেয়ে এবার প্রায় আকাশের কাছাকাছি উঠে যাবে, এবং আকাশটাকে মা সুবচনির খাঁড়া দিয়ে দুভাগ করে দেবে। দু ভাগ করে দিলেই ঝর ঝর করে জল নামবে। সে এই ক্লান্ত শরীরেও মই বেয়ে ওঠার মতো দু হাত তুলে দিল আকাশের দিকে। তারপর চিৎকার করে বলতে চাইল, জল দে। আমি যদি তোর কাছে পাপ করে থাকি, আমার প্রাণের বিনিময়ে জল দে। বলে সে বালিয়াড়ির ওপর সটান শুয়ে পড়ল এবং হাত দুটো পিঠের উপর যেন দুটো হাত বাঁধা অবস্থায় ওকে বলি দেওয়া হচ্ছে এমন ভঙ্গি নিয়ে বালির উপর শুয়ে পড়ল।—এবার দে এক কোপ। ভ্যাঁ। জনার্দন বালির ওপর কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে থাকল এবং ব্যা ব্যা করে ডাকতে থাকল। যথার্থই যেন ওকে সুবচনি দেবীর মন্দিরে পাঁঠার মতো বলি দেওয়া হচ্ছে এখন।

না এভাবে পড়ে থেকে লাভ নেই—জনার্দন উঠে পড়ল। নিশুতি রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে মাঠ, গাছ, পাহাড় যেন দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে তাকে হত্যা করবে বলে। জনার্দন উলঙ্গ ছিল বলে উপবীত ডানদিকের কোমরের কাছে ঢলঢল করছিল। মনে হচ্ছিল উপবীত ওর শরীরে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সে উপবীতে হাত রেখে হাঁকল, কে আসবি আয়, কার কত হিম্মত আছে আয়, কত লড়বি এই ঠাকুরের সঙ্গে আয়—কারণ জনার্দনের মনে হচ্ছিল শুধু সুবচনি নয়, শুধু এই অঞ্চলের মানুষজন নয়, সকলেই যেন, যেন গাছ, ফুল, পাখি, পাহাড় সকলে মিলে ওর সঙ্গে তঞ্চকতা করছে। অথবা রসিকতা করছে—হায় জনার্দন তোদের ফসলের অহঙ্কার ভালোবাসার অহঙ্কার এবারে সব মুছে যাবে।

ঠিক তক্ষনি লাফিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে আসছে হরিণী আর তার দুই শিশু। সোনার হরিণের মতো দেখাচ্ছিল প্রায়। ভোর রাতের জ্যোৎস্নায় ওদের চোখগুলো বড় উজ্জ্বল ছিল। বালিতে পায়ের দাগ পড়েছে। ওদের শরীর এত নরম এবং উজ্জ্বল যে জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছিল শরীর থেকে পিছলে যাচ্ছে। ওরা নেমে আসছিল এবং পিছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। জনার্দনের এখন আর মৃত্যুভয় থাকছে না। মাঠ এবং পাহাড়কে এখন দৈত্যের মতো মনে হচ্ছে না। এখন যেন জনার্দন আর একা নয়। সে এবং এই তিন বন্যপ্রাণী মিলে চারজন। সে প্রায় সুবচনি দেবীর মন্দিরে যেমন একা একা কথা বলে দিন কাটায় অর্থাৎ সেই সুবচনির সঙ্গে কথা বলে, এবং সুবচনির হয়ে কথার উত্তর দেয় তেমনি এই নদীর খাতে হরিণদের সঙ্গে প্রায় একা একা কথা বলার স্বভাব।—তা হলে তোরা এলি। তোদের জন্য আমি কখন থেকে বসে রয়েছি। তোরা তো বাপু দ্রুত ছুটতে পারিস, কোথায় কোনও বনে দ্রুত ছুটে যাস কে জানে। আহারের কোনও অসুবিধা হচ্ছে নাত! জনার্দন ওদের সঙ্গে প্রায় সাধু ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করে দিল।

সে ওদের নাম রেখে দিয়েছে এতদিনে।

সে সবচেয়ে ছোটটাকে ডাকল—পলা এই পলা তুইত বাপু ভারী দুষ্টু। শিঙে মুখ ঘসে সুখ খাচ্ছিস। পলা পা দুটো হঠাৎ এবার পিঠের উপর রেখে প্রায় মাথার কাছে মুখ নিয়ে এল। ওর মাথার নীচে এবং গা চেটে দিচ্ছে। বোধহয় ঘাম ছিল শরীরে, এবং ঘাম শুকিয়ে নুনের গন্ধ ছিল শরীরে, পলা মনের সুখে জিভ দিয়ে পিঠ ঘাড় গলা চেটে দিতেই জনার্দন এক ধরনের সুখ পেল—অতীব সুখ, লোভের বশবর্তী সে সুখ আহারের সুখ, এমন সুখ বুঝি কতদিন সে পায়নি—সে ভিতরে আহারের এক সুখ আছে ভাবতেই মনে হল কোথায় যেন আগুন জ্বলছে, কাঠের আগুন, বন্য মানুষেরা সেই কাঠে মাংস পুড়িয়ে চিবুচ্ছে। ওর জিভ স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়, জিভে জল এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে খপ করে পলাকে ধরে বুকের কাছে টেনে আনল, এবং ওদের জলপান করানোর কথা মনে থাকল না। আহারের লোভে, দীর্ঘদিনের অনাহার জনার্দনকে প্রায় পাগলের মতো করে ফেলছে। সে পলাকে নিয়ে এবার মন্দিরের দিকে দ্রুত ছোটার জন্য মাঠের দিকে উঠে যেতে থাকল।

সুবলের পাখিও দ্রুত আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উড়ে যাচ্ছে। দ্রুত যেন পাখি সকলকে হারিয়ে দেবে। দেখো হুই আকাশে উড়েছে। জানালার পাশে আর কেউ নেই এখন। সুবল এবং টুকুন।

ভোরবেলা, নার্স এখনও আসেনি ঘরে। সুবলের কেবল গমনের অপেক্ষা। ওর দেবদারু গাছের নীচে থেকে জানালা দিয়ে ঘর স্পষ্ট, নার্স না থাকলেই টুকুনদিদিমণির সঙ্গে কথা, কত কথা, রাজ্যের কথা, রাজারানিদের কথা, রাজা ঘোড়ায় চড়ে শিকারে যাচ্ছেন তার কথা—টগবগ করে ঘোড়া ছুটছে তার কথা—ঘোড়া ছুটছে, দিদিমণি—সেই ঘোড়া, কালো ঘোড়া ছুটছে। সামনে পাহাড়, পথ উঁচু টগবগ করে উঠে যাচ্ছে, থামছে না, ঘোড়ায় চড়ে যেন রাজা যুদ্ধে যাচ্ছেন। সুবল পায়ে ঠিক ঘোড়ার মতো তাল দিতে থাকল। বলল, দেখো আমার পাখি কালো ঘোড়ার মতো, বাজপক্ষী ঘোড়ার মতো রাজার দেশে চলে যেতে পারে। সে যে কত বড় রাজার দেশ! দেশে কোনও দুঃখ নেই, কত গাছ, কত ফুল ফল পাখি—রাজার দেশে মানুষের মুখে হাসি আর আনন্দ। সামনে সমুদ্র, রাজার দেশে হায় কোনও দুঃখ জাগে না। কোটাল পুত্র, রাজার পুত্র মাণিক্যের আলোতে দুখের জন্য জাগে। দিদিমণি দুঃখ না থাকলে কষ্ট না থাকলে প্রাণে, আপনি বাঁশি বাজে না।

টুকুনকে খুশি রাখার জন্য, সামান্য সুবল আবোল তাবোল যা মনে আসে যা মুখে আসে বলতে থাকে। টুকুনের সামান্য হাসি দেখার জন্য সে তার পাখি নিয়ে এসে জানলায় দাঁড়ায়। জানলায় দাঁড়ালে টুকুনের মনে হয় সুবল এসেছে পাখি নিয়ে। এই পাখির জন্য সে ট্রেনে হাততালি দিতে পারছিল, এই পাখির জন্যে সুবলের জন্য সে হেঁটে গিয়েছিল। ওর মনে হয় ওর আর আলস্য থাকার কথা নয়, আর দূরে থাকার কথা নয়। আকাশে পাখি উড়তে থাকলে—অথবা ঘোড়া ছুটছে টগবগ...তখন ঘোড়ার মতো শক্তি যেন পায়ে খেলা করতে থাকে। রাজার হাতে অসি, অসি খেলা হচ্ছে, সুবল দুহাত দিয়ে ছোট্ট একটা তালপাতার মতো বাঁশের বাঁট দিয়ে অসি বানিয়ে রাজার মতো খেলা দেখাচ্ছে। যেন এক রাজা যুদ্ধে যাবার আগে সেনাপতিদের অসির নিয়মকানুন বোঝাচ্ছে।

অথবা ওর হাতে কোনও কোনও দিন লাঠি থাকত। মেলার দিনে সকলে যেমন লাঠি খেলা দেখায়—দূর থেকে ছুটে এসে লাঠিতে মাথায় বাড়ি মারে অথবা এক দুই তিন, এক পা, দু পা, তিন পা সামনে গিয়ে ফের পিছনে—লাঠি ঠিক কোমরের সামনে রেখে ফের এক পা, দু পা এগিয়ে যাওয়া—দেখলে মনে হবে সুবল যেন পায়ের ওপর পাইকদের মতো নাচানাচি করছে। জানলা থেকে টুকুন ওর সব রকমের নাচন—কোঁদন দেখে হাসত। ওর পায়ে কী শক্তি কী শক্তি! পাখির পাখায় কী রাজ্যের স্বপ্ন। মনে হত টুকুনের সমস্ত শরীরে সহসা বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে।

তারপর সুবল যখন ক্লান্ত হত অথবা নার্স ঘরে ঢুকলে সে ভালোমানুষের বাচ্চার মতো দেবদারুর নীচে গিয়ে বসে বলত, এসে যান বাবু দেখে যান বাবু, জুতো সাফ করে যান—এবং বলত, দু আনা পয়সা দেবেন

—সুবল বেশি চায়না, শুধু খেতে পরতে চায়। বলত, আর এই পাখি আছে, পাখির জন্য কিছু সঞ্চয় করে নিচ্ছি। সে মন দিয়ে জুতো সাফ করে। সে পাখিকে টেরিটি বাজার থেকে কিনে আনা কীটপতঙ্গ খাওয়াত। ওর সুখের পাখি শখের পাখির জন্য প্রায় সময় সে স্বপ্ন দেখত। স্বপ্নে টুকুনদিদিমণি খুব সুন্দর এক জরির টুপি মাথায় দিয়ে কনে বউ সেজে বসে আছে। সুবল লাঠি নিয়ে দু'পাশে নাচানাচি করছে। সুবল রাজার পাইক যেন। সুবল লাঠি নিয়ে কনে বউকে খেলা দেখাচ্ছে লাঠির। পরনে জরির কাপড়, মালকোঁচা মেরে সে কাপড় পরেছে। মাথায় পাগড়ি সুবলের। পাগড়িতে পালক আছে। সে রাজার মতো অথবা রাজপুত্রের মতো কোনও কোনও সময়, যেন ঘরে কনে বউ ফেলে হরিণ শিকারে যাচ্ছে আর সেই শিকারের গল্প ভোর হলে অথবা বিকাল হলে বলা চাই।

সে বলত—সে এক হরিণ টুকুনদিদিমণি। হরিণের বনে হরিণ আছে। রাজার সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ আছে। বনে ঘন বন আছে। দু'চোখে বনের পথ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে সমতল মাঠ আছে, মাঠে ঘাস আছে। রাজার পিঠে তিরধনুক। একটি হরিণ জল খাচ্ছিল। মাঠের ভিতরে এত হরিণ অথচ একটা হরিণ জল খাচ্ছে। ছোট হরিণ—শুধু লাফায়, নাচে আর ঘাস খেতে শখ যায়, কিন্তু নরম ঘাস না হলে, কুয়াশায় ভেজা ঘাস না হলে হরিণ শিশু ঘাস খেতে পারে না।

রাজা ছুটছেন। বুঝলে দিদিমণি বনের ভিতর দিয়ে রাজা ছুটছেন। হরিণ ছুটছে। শিকার ধরার জন্য রাজা ছুটছে। কী বেগে ছুটছে! চারিদিকে পাহাড়, ওপরে মধ্যিখানে হ্রদের পারে হরিণী ছুটছে। কী বেগে কী তালে তালে পায়ের খুরে আগুন জ্বলছে। পাথরে ঘসা লেগে পায়ের খুর জ্বলছে। হরিণীর বাচ্চা একা একা পথে তখন মাঠের ওপাশে হ্রদের জলে মুখ দিয়ে বসে রয়েছে। মা বুঝি আসছেন।

—বুঝলে দিদিমণি বিপদ বুঝতে পেরেছিল হরিণের বাচ্চারা।

—সে মাকে দৌড়তে দেখে সেও দৌড়তে থাকল।

—রাজা ধরতে পারল সুবল?

—না! কী করে পারবে। হ্রদের পারে আসতেই রাজা দেখল পাথরের ঘসা খেয়ে ঘোড়ার পায়ে ফোসকা পড়েছে।

—ঘোড়ার পায়ে ফোসকা।

—বাপরে, আগুন জ্বলছিল পাথরে। হরিণের খুরে আগুন লেগেছিল।

—অঃ। টুকুন যেন আবার যথার্থই সবটা বুঝে ফেলেছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে দেখল টুকুন, সুবল চলে যাচ্ছে। বড় জ্বালাচ্ছে। নার্স চিৎকার করতে চাইল। কিন্তু অবাক টুকুন খাটের উপর বসে রয়েছে। মুখে কোনও অবসাদের চিহ্ন নেই। সব কিছু কেমন অলৌকিক মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে ডায়াল করে বলল, সুরেশবাবু, সুরেশবাবু আছেন?

—কে।

—আমি সারদা বলছি।

সহসা এই ফোন সুরেশবাবুকে বিস্মিত করেছে। কোনও অঘটনের আশঙ্কা করলেন তিনি। তার বুক কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে আসছে। নার্স সারদার গলা কাঁপছে বলতে—সে ঠিক স্পষ্ট বলতে পারছে না। দুঃসহ খবরের জন্য বুঝি ওর গলা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু একি বলছে! কী বললে! কী বলল!

—টুকুন খাটের উপর বসে দিব্যি সেই সুবল ছোঁড়াটার সঙ্গে কথা বলছিল।

—ঠিক ঠিক বলছ?

—ঠিক। আমি দরজা দিয়ে ঢুকতেই সুবল পালিয়ে গেল।

—ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছ?

—না।

—আগে তাকে খবর দেওয়া উচিত ছিল।

—এমন আনন্দের খবর আপনাকে আগে না দিয়ে তাকে দিই কী করে?

—শোন আমরা যাচ্ছি এখুনি। বলে ফোন ছেড়ে দিলেন সুরেশবাবু।

তারপর কিছুক্ষণের ভিতরেই ওরা সকলে এসে গেল। ডাক্তারবাবু এলেন। তিনি টুকুনকে দেখে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। টুকুন কিছু কুঁচফল এবং চন্দনের বীচি নিয়ে এখন বিছানার ওপর একা একা আপন মনে খেলা করছে, সে ভিড় প্রায় লক্ষ্যই করল না। রাজার গল্প, হরিণের গল্প, রাজপুত্রের গল্প অথবা এই যে এক পাখিয়ালা সুবল যার আপন প্রাণে নিরন্তর বেঁচে থাকার উদ্যম যে—কোনও এক খরা অঞ্চল থেকে চলে এসে এই শহরে ছুটে বেড়াচ্ছে সেই সুবল, বালক সুবল রাজার মতো ওকে কেবল উৎসবের কথা বলে গেল। বেঁচে থাকার কথা বলে গেল। আপন প্রাণের তেজে উড়ে যাবার কথা বলে গেল। সে চন্দনের বীচি কুঁচফল এবং রঙবেরঙের পাথরগুলো দেখতে দেখতে কেমন নিবিষ্ট হয়ে পড়ল।

—টুকুন তোমার শরীর ভালো হয়ে যাচ্ছে! মা মাথায় হাত রেখে বললেন।

—টুকুন একবার মার দিকে তাকাল। কোনও কথা বলল না।

ডাক্তারবাবু বললেন, আমার হাত ধর টুকুন।

টুকুন ডাক্তারবাবুর হাত ধরল।

—এবারে উঠে দাঁড়াও।

—আমি পারব না ডাক্তারবাবু।

—সুবলের একটা পাখি আছে টুকুন।

—ওর পাখিটা ভারী দুষ্টু। ও রাজার মাথায়—বলে হো হো করে হেসে উঠল।

—তুমি দাঁড়াও। সুবল আজ আবার কখন আসবে।

—কখন আসে বলে না। ওদিকে একটা দেবদারু গাছ আছে, তার পাশে কোথায় যেন থাকে।

—তুমি দাঁড়াও। এইত উঠতে পারছ।

—আমি পারব না ডাক্তারবাবু।

—এইত হচ্ছে। আচ্ছা শোন তুমি সুবল এলে থাকতে বলবে, ওর সঙ্গে আমি কথা বলব। আচ্ছা শোন, ঠিক আছে, কাল আবার আমরা হাঁটার চেষ্টা করব।

ডাক্তারবাবু টুকুনকে বিছানায় রেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং নার্সকে ইশারা করতেই নার্স বারান্দায় বের হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু নার্সের পেছনে পেছনে বের হয়ে ফিস ফিস করে বললেন, সুবল কখন আসে।

—ঠিক থাকে না। আমি না থাকলেই চলে আসে। ও যেন কী করে টের পায় কখন আমি থাকি না।

—ঠিক আছে। ও আসবে। ও টুকুনের সঙ্গে কথা বলবে। তবে যেন একনাগাড়ে বেশিক্ষণ ও না থাকে। তোমার প্রতি সুবলের যে ভয়টা আছে সেটা সব সময় রাখবে।

—আমি ওকে বেশি আসতে দিই না।

—খুব বেশি না দিলেও তোমাকে মাঝে মাঝে কাজের অছিলায় বাইরে বেশি সময় থাকতে হবে। সুবল এসে কথা বললে ও প্রাণের ভেতর এক অশেষ আনন্দ পায়। এক ধরনের উত্তেজনার জন্ম হয়। আমরা সকলে যা পারিনি, সামান্য এক পাখিওয়ালা তাই করে দিয়ে গেল।

—তবে ওকে ভিতরে নিয়ে এলে হয় না?

—না। তা হয় না সারদা। ওর যদি মনে হয় সুবল এখানেই থাকবে, সুবলের আর যাবার জায়গা কোথাও নেই, তবে ওর প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। কারণ এখন সুবল ওর কাছে জাদুকরের মতো। স্রেফ অলৌকিক জাদুকর। আসে যায়, কখনও হারিয়ে যায়। আবার আসে। প্রত্যাশা ওকে বড় এবং ভালো করে তুলবে। বলে ডাক্তারবাবু অন্যমনস্কভাবে কেবল তুড়ি মারতে থাকলেন।

সুরেশবাবু বাইরে এসে বললেন কেমন বিস্ময়ের ব্যাপার লাগছে সব!

সুরেশবাবুর স্ত্রী বললেন, ডাক্তারবাবু টুকুন সত্যি হাঁটতে পারবে?

—সব এখন পাখিয়ালা সুবলের উপর নির্ভর করছে।

—কেন কেন।

সুরেশবাবুর স্ত্রীর মুখ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

—টুকুনের কাছে সুবল এখন আশ্চর্য এক জাদুকর। ওর পাখি, ওর কুঁচ ফল, চন্দনের বীচি, রঙবেরঙের পাথর আর সারদা যা বলল, কীসব আজগুবি গল্প বলে সে নাচতে থাকে কেবল। তার অর্ধেকটা বোঝা যায়, অর্ধেকটা বোঝা যায় না। রাজার গল্প, হরিণের গল্প, বন পাহাড়ের গল্প, এবং পাখির গল্প বলে সে কেবল ছোটার অভিনয় করে। তখন টুকুনের সুবলের পা দেখতে দেখতে বুঝি মনে হয়—হরিণের মতো সেও ছুটছে, মনে হয় ঘোড়ার মতো সেও ছুটছে, গল্পের সঙ্গে এই যে ছোটা, ছোটা আর ছোটা—প্রাণের ভিতর এই ছোটা, কেবল আবেগের জন্ম দেয়। রক্তে উত্তেজনা আসে। হাতে পায়ে সেই উত্তেজনায় রক্ত বইতে থাকে। টুকুনকে তখন খুব স্বাভাবিক দেখায়। এই ছোটার ভিতর সেই উদ্যমের কথাই বলা হচ্ছে সুরেশবাবু। আমরা এই উদ্যম হারিয়ে কেমন ক্রমশ টুকুনের মতো স্থবির হয়ে যাচ্ছি। বলে ডাক্তারবাবু কেমন হাঁসফাঁস করতে থাকলেন!—আমাদের জীবনে এখন সুবলের মতো এক পাখিয়ালা চাই। যে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসা দিয়ে আমাদের এই কঠিন রোগ সারিয়ে তুলবে। বলে তিনি ফের অন্যমনস্কভাবে হাতে তুড়ি মারতে থাকলেন।

হাতে তুড়ি মারতে থাকলেন ডাক্তারবাবু, জনার্দন ছুটতে থাকল মাঠ দিয়ে। বুকে পলা। হরিণ শিশু পলা জনার্দনের বুকের ভিতর চুপটি করে আছে। কোনও ভয়ডর নেই। কান খাড়া করে দেখছে পেছনে ওর মা অপলা, বোন অচলা আসছে। ছুটে ছুটে আসছে না। কারণ জনার্দন ভাবছিল সে খুব দ্রুত ছুটছে, কিন্তু জনার্দনের মনে নেই বোধ হয়—ওর শরীর বড় ক্লিষ্ট, শরীরে কোনও শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। চোখ মাঝে মাঝে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ছে। মনে হয় সব কিছু ঝাপসা। আবার কেমন সামান্য জল খেলে চোখের দৃষ্টি ফিরে আসে।

জনার্দন ছুটছিল। কারণ সে অন্য দুই হরিণকে ভয় পাচ্ছিল। শুধু ফাঁকা মাঠ। বালি শুধু মাঠে। এখনও রোদ ওঠেনি বলে বালিতে কোনও উত্তাপ জমছে না। পাহাড়ের নীচটা ক্রমশ সাদা হয়ে উঠছে। অন্য পাশে চাঁদের মরা গোল সোনার বাটি ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। দু—একটা শকুন উড়ে যাচ্ছিল কোথাও। কোনওদিকে এই শকুনেরা উড়ে যাচ্ছে অন্যদিন হলে জনার্দন একটু অপেক্ষা করে দেখত। কিন্তু আজ এই পলা তার বুকে। এই পলার চোখ ওকে ভয় দেখাচ্ছে—জনার্দন ক্লিষ্ট শরীর নিয়ে ছুটছিল আর মাঝে মাঝে পেছনের দিকে তাকাচ্ছিল। ওরা এখনও জনার্দনকে অনুসরণ করছে। ওরা অর্থাৎ দুই হরিণী। অচলা, অপলা। সে এবার নুয়ে একটা পাথর তুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল। পাথরটা বেশি উঁচুতে উঠল না। কিছুদূরে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। হরিণীরা সেই পাথর নিক্ষেপের জন্য অল্প সময় থমকে দাঁড়াল। পাথরটা গড়িয়ে আসছে। জনার্দন ওদের ভয় দেখানোর জন্য থেমে থেমে পাথর ছুঁড়ে যাচ্ছিল। আর হাত তুলে—যা আমার সঙ্গে কেন! যা বলছি! ভয়ে কেমন টেঁসে যাচ্ছিল জনার্দন। জনার্দন পিছন ফিরে তাকালে ওরাও থেমে যেত। জনার্দন ছুটতে থাকলে ওরাও ছুটত। জনার্দন পাথর নিক্ষেপ করলে ওরা দু পা তুলে পাথর রোখার চেষ্টা করত। অথবা যেন পাথরটাকে গুঁতো মারতে আসছে তেমনি শিং বাগিয়ে ধরত।

পাহাড়ের ভিতর দূরে সুবচনির মন্দির দেখা যাচ্ছে। চারপাশে বনের মতো। পাতা নেই কোনও গাছে। ফলে গাছগুলো যেন মৃত। শুকনো এক ভাব—মনে হয় আগুন লাগলে দাবানল জ্বলবে। চারিদিকে তাকানো যাচ্ছে না। চারিদিকে মরুভূমির মতো হাহাকার। মাটি, মরুভূমি বুঝি গ্রাস করছে। জনার্দনের আর পা চলছিল না। সুবচনি দেবী কিছুতেই প্রসন্না হচ্ছেন না। তিনি প্রসন্ন হলে সংসারে আর দুঃখ কীসের! ঠিক তক্ষুনি পলা ওর বুকে ডেকে উঠল। ভয়ে ডেকে উঠল। জনার্দনের চোখে লোভ লালসা ভেসে বেড়াচ্ছে। জনার্দন থর থর করে কাঁপছিল। যত এগিয়ে যাচ্ছে, সুবচনি দেবীর মন্দিরের দিকে উঠে যাচ্ছে, ঠিক তত সে দৃষ্টিহীন হয়ে

পড়ছে। এবং মন্দিরের ভিতর ঢুকেই পিছন ফিরে তাকাল। দেখল ঠিক মন্দির সংলগ্ন একটা মৃত অর্জুন গাছের নীচে দুই হরিণী বসে রয়েছে। ওরা ওদের বাচ্চাকে ফিরিয়ে নিতে চায়।

জনার্দন আর অপেক্ষা করতে পারল না। সে ভয়ে ওদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। কারণ জনার্দনের ভয় ওর ক্ষীণ শরীর সামান্য আঘাতেই ভেঙে পড়বে। যদি হরিণী ওকে আক্রমণ করে তবে ওর পেট ফুঁড়ে যাবে। কিন্তু দরজা বন্ধ করতে মনে হল, ওর কোলের ওপর থেকে হরিণ শিশুটা লাফিয়ে নীচে পড়ে গেল আর মনে হল সে ক্রমশ যে দৃষ্টিহীনতায় ভুগছিল, এখন সেই দৃষ্টিহীনতা ওকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে। সে অন্ধকার দেখল চারিদিকে। সে হরিণ শিশুকে ডাকল, পলা পলা। সে লোভের গলায় ডাকল। পলা, মুখে সেই নোনতা স্বাদ, বনে সেই আগুনের ছবি যেন, কোনও আদিম মানুষ বনের ভিতর হরিণের মাংস পুড়িয়ে খাচ্ছে। পলা সুবচনি দেবীর পেছনে চলে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে। জনার্দনের চোখের ছবি দেখে বুঝতে পারছিল যেন মানুষটা ওকে এবার চিবিয়ে খাবে। ভয়ে পলা কোনও শব্দ পর্যন্ত করল না। একবার উঠে গিয়ে দরজার কাছে মাথা ঠুকল। বের হবার চেষ্টা করল।

জনার্দন—অন্ধ জনার্দন দরজায় শব্দ শুনে ছুটে গেল। কিন্তু কোথায়! অন্যদিকে বোধহয়। সে শব্দ শুনে এবার হরিণ শিশুকে ধরার জন্য ওৎ পেতে থাকল। এবং প্রায় অজগর সাপের মতো সে মেঝের ওপর শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হরিণের পায়ে জাপটে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু হায়! হরিণ শিশু লাফাচ্ছিল, নাচছিল—ওর এখন প্রায় খেলার মতো হয়ে গেল। চারিদিকে পাথরের দেয়াল। ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য বাতাস আসছে। জনার্দন দরজা বন্ধ করে রেখেছে। জনার্দন অন্ধ। সুবচনি দেবীর খাঁড়া মাথার ওপর ঝুলছে। ফুল বেলপাতা শুকনো। যেখানেই পলা গিয়ে দাঁড়াক না কেন, মনে হয় ঐ দিকে। মনে হয় এখন পলা কাসর ঘণ্টার নীচে, মনে হয় পলা এখন ঢাক ঢোলের নীচে, মনে হয় পলা এখন সুবচনি দেবীর মাথার ওপর উঠে বসে আছে। অথবা মনে হয়, পলা ঘরময় হেগে মুতে বেড়াচ্ছে।

জনার্দন সারাদিন ধরে পলাকে ধরার চেষ্টা করল। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ওর রাগে দুঃখে চোখ মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। সামান্য এক হরিণ শিশু ওকে নিয়ে রঙ্গ তামাশা করছে। সে হুংকার দিয়ে উঠল। যেখানে খাঁড়াটা ঝুলছিল তার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর খাঁড়াটা দড়ি থেকে খুলে ছুটে গেল মায়ের পাশে —মা আমার ক্ষুধা পেয়েছে। মা আমি না খেতে পেয়ে অন্ধ হয়ে গেছি। শরীরে শক্তি নেই মা। সে খাঁড়া নিজের মাথায় রেখে কেমন পাগলের মতো শুয়ে পড়ল মেঝের উপর। পলাকে পুড়িয়ে মাংস খাবার ক্ষমতা তার আর থাকল না।

কিন্তু হায়! সব পাগলের কাণ্ড। আত্মহত্যার মতো এই ঘটনা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। জনার্দনের মনে হচ্ছিল সে মরে যাচ্ছে। খাঁড়ার ঘায়ে ঘাড়ের কিছুটা অংশ কেটে গেছে। ভোঁতা খাঁড়ার আঘাত ভালো করে লাগেনি। তবু ঘাড়ের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে শান ভেসে যাচ্ছিল। এবং মনে হল এবার জনার্দন সত্যি মরে যাবে। কিন্তু পলার কথা মনে হতেই মনে হল ঘরের ভিতর আবদ্ধ থেকে এক অবলা পশু শেষে মরে যাবে! সে কেঁদে উঠল, মা মাগো। আমাকে আর সামান্য শক্তি দে। আমি মা দরজাটা খুলে দি।

শান ভেসে যাচ্ছে রক্তে। ওর জিভে সেই রক্তের স্বাদ নোনতা লাগল, সে তাড়াতাড়ি উপুড় হয়ে সেই রক্ত চাটতে থাকল। আহা আহা খাদ্যবস্তু। এমন খাদ্যবস্তু সে যেন কতকাল আহার করেনি। নিজের রক্ত পানে সে উল্লাসে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতে পারল। সে অন্ধ হলেও রক্তটুকু সে চেটে চেটে খেয়ে ফেলল। খেয়ে ফেলতেই ওর মনে হল কতকাল পর আহার করেছে। সে কতকাল পর আহার করে উল্লাসে জয়ঢাক বাজাচ্ছে। জয়ঢাক, ঢাক ঢোল বাজাচ্ছে। সে বাজাচ্ছিল না অন্য কেউ বাজাচ্ছে।—কই রে পলা গেলি কই। সে উঠে দাঁড়াতে পারল, সে হেঁটে যেতে পারল। দরজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারল। টলতে টলতে সে দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেল। খিল খুলে দিয়ে বলল, যা অবলা হরিণ শিশু চলে যা। যদি কোনওকালে বৃষ্টি হয় তবে বলবি—এই সংসারে জনার্দন চক্রবর্তী বলে একটা লোক ছিল, সে তার সব ভালোবাসা দিয়ে, মন্ত্র দিয়ে এই দেশের প্রাণপ্রাচুর্যকে রক্ষা করতে চেয়েছিল—পারেনি।

একি! কীসের এত শব্দ! মনে হয় পৃথিবী দুলে উঠছে। মনে হয় পাহাড় টলছে। মনে হয় আকাশ ভেঙে পড়ছে। মনে হয় ঝড়ে দেবীর মন্দির গাত্রে পাথর ছুটে আসছে। যেন এক প্রলয়। জনার্দন দু'হাত তুলে সেই উলঙ্গ রাত্রির ভিতর ডাকল, পলা, অপলা, অচলা কোথায় গেলি। ঝড়ে মরে যাবি। তোরা মরে গেলে এই অঞ্চলে আমার চেষ্টার সাক্ষী কেউ থাকল না। তোরা মন্দিরের ভিতর চলে আয়। এই ঝড়ে পড়লে তোরা মরে যাবি।

কিন্তু জনার্দন ওদের কোনও সাড়া পেল না। মনে হল অর্জুন গাছটা ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। মনে হল ভিতরে যত ফুল বেলপাতা ছিল সব উড়ে যাচ্ছে, মনে হল সেই হরিণ শিশুরা এখন লাফিয়ে চলছে। আর আর আর মনে হল—এটা কী হচ্ছে। বৃষ্টি। বৃষ্টি! মা, মা, বৃষ্টি হচ্ছে। মা মা, মাগো সুবচনি তোর এত কৃপা, তোর এত কৃপা। মা আমি যে আর কিছু ভাবতে পারছি না।

জনার্দন মন্দিরের ভিতর পর্বত প্রমাণ দৈত্যের মতো লুটিয়ে পড়ল।

আট

ডাক্তারবাবু ভিতরে ঢুকে বললেন, তুমি আজ বাড়ি যাবে টুকুন।

—সত্যি!

—সত্যি।

টুকুন বলল, আমি সত্যি বাড়ি যাব। ওর চারপাশে যা কিছু আছে—এই ভেবে একবার দেখল সব। তেমনি জানালা খোলা। মা—বাবা আসবেন। কখন আসবেন এই ভেবে টুকুন অধীর হয়ে উঠল। নার্সিং হোমের এদিকটায় একটা সবুজ মাঠ। এবং জানলা খুললেই চোখে পড়ে হাজার মানুষের মিছিল—এই কলকাতা শহর এত মানুষ কেন? কোথায় যায়—কী করে এরা, টুকুন ভেবে পায় না। কিন্তু টুকুন যেজন্য জানলায় বসে আছে এবং খোলা রেখেছে, নার্স এলে বলেছে, সুবল এসেছিল সিস্টার? সুবল কি আমার ঘুমের ভিতর ঘুরে গেছে?

সিস্টার বলল না।

—সে কেন এল না। আমি বাড়ি চলে যাব—সে না এলে কী করে আমি বাড়ি যাব?

সিস্টার বলল, তোমার মা—বাবা এসে নিয়ে যাবে।

—মা—বাবা তো সব সময়ই আসছে, ওরা আমাকে যখন খুশি নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সুবলকে যে আমার বলা হয়নি, আজ আমি চলে যাব। সে এখানে এলে আমার ঠিকানা পাবে কী করে?

—আমি দেব। তোমার বাড়ির ঠিকানায় চলে যাবে। তোমাদের কত বড় বাড়ি, চিনতে ওর অসুবিধা হবে না।

—সে তো বলেছে, টুকুনদিদিমণি, আমি কলকাতার পথ—ঘাট চিনি না। তুমি যখন বাড়ি যাবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিয়ো।

—সে ঠিক চলে যাবে।

—কিন্তু মা কী ওকে নিতে চাইবে?

—নেবে না কেন? এত বড় একটা অসুখ তোমার সে সারিয়ে দিল। আমরা সবাই যা করতে পারিনি, কোথাকার এক পাখিয়ালা এসে সব করে দিল, ভাবা যায় না।

—কোথাকার বলতে নেই সিস্টার। সুবল খুব ভালো ছেলে। সে আমাকে চন্দনের বীচি, কুঁচফল দিয়েছিল।

—খুব ভালো। ঐ যা একটা পাখি রেখেছে বাঁশের চোঙে আর লম্বা আলখাল্লার মতো পোশাক। মনে হয় আমরা তিন চারজন ওর ভিতর ঢুকে যাব।

—সিস্টার আমি একটু জানালার দাঁড়িয়ে থাকতে চাই এখন।

—আমি ধরছি।

—না আমি নিজে হেঁটে যাব। সুবল যে কখন আসবে।

সুবল এলেই যেন টুকুনের সব হয়ে যায়। সে কখনও জানালা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না। সে ক'দিন আগে মাত্র উঠে বসতে পেরেছে। গতকাল তাকে ধরে ধরে হাঁটা শেখানো হচ্ছিল। বারবার হাঁটতে গিয়ে টুকুন পড়ে যাচ্ছিল। পারছিল না। নার্স এবং আয়া মিলে দু'পা হাঁটতে সাহায্য করেছে। একে ঠিক হাঁটা বলে না, কিছুটা সান্ত্বনা দেবার মতো ব্যাপারটা ছিল—তুমি হাঁটতে পার টুকুন, আর কী, এবারে তোমাকে আমরা অনেক দূরে নিয়ে যাব। কোনও বড় পাহাড়ে। সেখানে পাইন গাছ থাকবে, শীত থাকবে, বরফের পাহাড় জমবে। তুমি ফারের কোট গায়ে দিয়ে লম্বা সরু দুটো লাঠি হাতে নিয়ে দু'পায়ে স্কেটিং করবে। এ—পাহাড় থেকে সে—পাহাড়। এ—উপত্যকা থেকে সেই অন্য উপত্যকায়—অনেকটা পাখিয়ালা সুবলের মতো ভাষা, সুবল যে জানালায় এসে বলত, টুকুন দিদিমণি, দ্যাখো কেমন পাখি উড়ে যায়, দ্যাখো কেমন ঘোড়া ছোটে, দ্যাখো কেমন নিরিবিলি আকাশে মেঘেরা উড়ে বেড়ায়—তুমি টুকুনদিদিমণি, রাজার মেয়ের মতো ঘোড়ায় চড়ে স্ফটিক জলের নীচে রুপোর কৌটা খুঁজতে যাবে না? আমি তোমায় নিয়ে যাব। তখন টুকুন কেমন ছেলেমানুষের মতো বড় বড় চোখে তাকায়। হাতের ইশারাতে সুবল যা কিছু দেখায়—টুকুনের মনে হয় সব সত্যি। সে সব পারে। সে রাজার মেয়ের মতো রাজ্যের সব দুঃখী রাজপুত্রদের স্বয়ংবর সভা ডাকতে পারে সেই সুবল কেন যে এখনও এল না!

টুকুন বলল, কী সুন্দর দিন!

সিস্টার বলল, ভারী সুন্দর।

—সুবল আমাদের ট্রেনে উঠে এলে পুলিশ এসেছিল সিস্টার।

—পুলিশ।

—হ্যাঁ পুলিশ। ওরা তো জল খাবে বলে মাঝ—রাস্তায় ট্রেন আটকে দিয়েছিল।

—ও মা, কী বলে টুকুন।

—হ্যাঁ সত্যি সিস্টার। ওদের দেশে খুব খরা। জল নেই। লঙ্গরখানা বন্ধ। জলের অভাবে চাষবাস হয় না। গাছপালা পুড়ে গেছে। সারা মাঠ খাঁ খাঁ করছে।

—সত্যি?

—সত্যি সিস্টার। আমাদের ট্রেনটা থামিয়ে দিলে বাবা তো ভয়ে কাঠ। ওদের কী চেহারা! সুবলকে এখন দেখে চেনাই যায় না। ওর শরীরে মাংস ছিল না। লিকলিকে। কাঠির মতো হাত—পা। অথচ কী সুন্দর হাসিমুখ সুবলের, কী সুন্দর সরল চোখ!

সিস্টার বলল, গ্রামের মানুষদের এমনই মুখ চোখ হয় টুকুন।

টুকুন বলল, না দিদিমণি, হয় না। আমাদের কামরায় কেবল তো সুবল ওঠেনি, আরও অনেকে। ওদের দেখলে সিস্টার আপনিও ভয় পেতেন। আমি তো ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলাম, কিন্তু সুবল এসে শিয়রের কাছে দাঁড়াতেই আমার মনে হয়েছিল সিস্টার, একজন বালক সন্ন্যাসী এসে দাঁড়িয়েছে।

সিস্টার না বলে যেন পারল না, টুকুন তুমি খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারছ দেখছি।

—সিস্টার আমি জানি না, কী করে এমন সুন্দর কথা বলতে শিখে গেছি। আগে মা বলত, আমি একটাও কথা বলতাম না। সব তাতেই আমি বিরক্ত হতাম। শুধু চুপচাপ শুয়ে থাকা ছিল আমার কাজ। আমি এখন কেমন উঠে বসতে পারি, হাঁটতে পারি।

সিস্টার জানেন—টুকুন ঠিক হাঁটতে জানে না। টুকুনের বয়স কত—এই বারো—চোদ্দো হবে, টুকুনের অসুখ কবে থেকে, সেই কবে থেকে যেন, সাল—তারিখ সবাই ভুলে গেছে—এত লম্বা অসুখ মানুষের কী করে হয়—কী যে লম্বা অসুখ, ঠিক ঘোড়দৌড়ের মাঠের মতো, রেসের মাঠে যেমন একটা ঘোড়া অনন্তকাল ছুটেও শেষ করতে পারে না, তেমনি মনে হয় টুকুন এক অনন্তকালের ঘরে অসুখের দরজায় বারবার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এমন অনেকবার হয়েছে। সে বেশ ভালো হয়ে গেছে। হেসে খেলে বেড়িয়েছে—আবার কী করে যে

একটা অসুখের ভিতর পড়ে যায়—সে জানে না কী করে সে রুগণ হয়ে যায়, ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখের নীচটা ফুলে যায়। তখন শরীরের যাবতীয় কিছুতে কড়া পাহারা এবং এই করে কতকাল থেকে মা—বাবা বেশ একটা প্রতিযোগিতার ভিতর পড়ে গেল টুকুনের। প্রতিযোগিতা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের।

টুকুন বলল, এখনও সুবল আসছে না।

—এসে যাবে।

—আমি জানলায় যাচ্ছি। বলে টুকুন নিজেই উঠে বসার চেষ্টা বলল। ওর হাত—পা লম্বা। গায়ে মাংস সামান্য লাগায় মুখটা বেশ ভরা দেখাচ্ছে। সব কিছুর ভিতর আছে কেবল ওর দুটো সুন্দর চোখ। মনে হয় আশ্চর্য নীল চোখ। চোখের মণিতে এখনও ছায়া দেখা যায়। কেউ এসে পাশে দাঁড়ালেই ছায়াটা নড়ে ওঠে। সিস্টার টুকুনকে পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে চাইলে হাতটা ঠেলে দিল।—না সিস্টার, আপনি দেখুন আমি ঠিক ঠিক উঠে যাচ্ছি। আমার এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না। বলে সে অনায়াসে উঠে বসে, বলল, কেমন ঠিক আমি উঠতে পেরেছি।

টুকুনকে আজ সকালেই হলুদ রংয়ের একটা ফ্রক পরানো হয়েছে। নরম সিল্কের। রংটা ভারী উজ্জ্বল। লতাপাতা আঁকা ফ্রক। কোথাও দুটো প্রজাপতি মুখোমুখি বসে—এবং নানা রংয়ের ছবি ফ্রকে। ওর সেই খেলনাগুলোর মতো। এই বয়সেও টুকুন খেলার জগতে থাকতে ভালোবাসে। এই খেলনার জগতে সে কখনও রানি হতে ভালোবাসে, অথবা রাজকন্যা। ওর কুদুমাসি বেড়ালটা ভারী বজ্জাত। যখন টুকুন এমন ভাবে, তখন বেড়ালটার গোঁফ নড়ে ওঠে। টুকুনের তখন ইচ্ছে হয় আছাড় মেরে ভেঙে ফেলতে। সে পারে না। কারণ সে উঠতে পারে না, হাঁটতে পারে না। ক'দিন কোনও হুঁশ ছিল না। সুবল এসে খুঁজে পেতে ঠিক জানলায় আবিষ্কার করে ফেলে, আবার ওকে উৎসাহ দিল। বাঁচার উৎসাহ। কী এক জাদুকরের মতো সুবল হাত—পা নেড়ে কেবল নেচে নেচে গ্রাম্য সংগীত সুর করে বলে যেত।

এখনও সুবল আসছে না। সিস্টার অবাক—আজ এমন প্রতীক্ষা একজন মানুষের জন্য টুকুনের, যে এলেই বলবে তুমি যাবে আমাদের বাড়িতে। এই আমাদের ঠিকানা। দেখবে খুব বড় বাড়ি। সামনে বড় জলাশয়। চারপাশে অনেক দিনের পুরনো পাঁচিল। ভিতরে অজস্র গাছপালা। এবং জলাশয়ের পাশে সুন্দর এক অট্টালিকা। অট্টালিকার ছায়া যখন সেই জলাশয়ে ভাসতে থাকে তখন মনে হবে সুন্দর এক রাজকন্যার সন্ধানে কোনও রাজপ্রাসাদে ঢুকে গেছ।

সিস্টার অবাক, ভারী সুন্দর পা ফেলে ঠিক ওর মনে আছে, সে এমন পা ফেলে হেঁটে গেছে—সেই কবে, এখন ভারী স্বপ্নের মতো মনে হয়—সে একজন মানুষের উদ্দেশ্যে এমন পা ফেলে হেঁটে গেছে, বাড়িতে কীসব আলো জ্বালানো হয়েছিল সেদিন, সকাল থেকে শানাই বেজে চলেছে, সে সকাল থেকে হলুদ রংয়ের শাড়ি পরেছিল, এবং পায়ে পায়ে হাঁটা, প্রতীক্ষা, আশ্চর্য প্রতীক্ষা থাকে মানুষের। সে কখনও জানে না কীভাবে সেইসব প্রতীক্ষার দিনগুলি মরে যায়। এখন টুকুন জানলায় যেভাবে হেঁটে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে গুণে গুণে পা ফেলে, কেউ যেন দুপাশ থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যেমন তাকে কেউ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, পীড়িতে বসিয়ে দেবার জন্য, লাল বেনারসি, চুমকি—বসানো ওড়না, মুখে কপালে ঘাম, পা গুণে গুণে হাঁটা, টুকুন ঠিক সেইভাবে জানলায় হেঁটে যাচ্ছে।

টুকুন বলল, সিস্টার আপনি বলেছিলেন আমি হাঁটতে পারি না।

—আমি দেখেছি টুকুন। তুমি ঠিক হাঁটতে পারো।

—আজ মা—বাবাকে বলবেন কিন্তু আমি জানালা পর্যন্ত হেঁটে গেছি।

—বলব।

—কী সুন্দর লাগে।

—আমি তোমাকে ধরে থাকব।

টুকুন জানলার গরাদে হাত রেখে বেশ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কষ্ট হচ্ছিল—কষ্ট হোক, পায়ে এভাবে রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে, মেয়েটা একদিন ঠিক অশ্বের মতো হয়তো দৌড়ে যাবে। কত জায়গায় না গেছে। এই অসুখ নিরাময়ের জন্য মিঃ মজুমদার হিল্লি—দিল্লি কম করেননি। অথচ মেয়েটা সেই যে কী হয়ে থাকল, চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, আর ভালো হতে চাইল না। তারপর সেই খরার দেশের ওপর দিয়ে ট্রেন এসে গেলে, ট্রেন আটকে দিল মানুষেরা। ট্রেনের জল লুটে—পুটে খেয়ে নিল। খেয়ে নিয়ে কেউ নেমে গেল না। ওরা শহরে—গঞ্জে চলে যাবে বলে ট্রেনে বসে থাকল। তারপর অন্য স্টেশনে, পুলিশ। কড়া পাহারায় সব মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল। টুকুন শুয়ে শুয়ে আশ্চর্য এক মানুষের গল্প করার সময় এমন বলেছে।

—জানেন সিস্টার, সুবলের একটা বাঁশের চোঙ ছিল। কত যে রাজ্যের কীটপতঙ্গ ওর পকেটে।

—ওসব দিয়ে ও কী করত?

—ওর পাখির জন্য ধরে এনেছিল।

—পাখিটার কী নাম?

—কী যে নাম জানি না।

—ট্রেনে উঠে তোমাদের কামরায় সরাসরি?

—আমি দেখলাম, ওরা এসেই বাথরুমে চলে গেল। জলের কল খুলে দিল। অঞ্জলি পেতে কেবল জল খেতে থাকল।

—তারপর?

—তারপর অবাক আমরা, কী করে সুবলের কোল থেকে সব পোকামাকড় উড়ে গেল। এবং সারাটা কামরা ভরে গেল।

—ও মা, তাই বুঝি?

—বাবা ভীষণ বিরক্ত। কিন্তু যতসব ক্ষুধার্ত লোক একটু জলের জন্য যখন এমন করতে পারে তখন ভয়ে বাবা কিছু বললেন না। পোকাগুলো সারাটা কামরায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা বসতে পারছি না। আমাদের মুখ—চোখ ঢেকে গেছে।

—সত্যি!

—সত্যি সিস্টার! কিন্তু সুবল নিমেষে সব সাফ করে দিল।

—কী করে?

—কিছু না। সে তার বাঁশের চোঙ থেকে বলল, যা পাখি উড়ে যা! পাখি উড়ে গেল। উড়তে থাকল। সব এক দুই করে খেতে থাকল। বড় বড় পোকামাকড় সব ধরে এনে সুবলের চোঙের ভিতর পুরে দিতে থাকল পাখিটা।

তারপর টুকুন অনেকক্ষণ কোনও কথা বলল না। সে চুপচাপ, চারপাশের মাঠ, রাস্তা, ট্রামগাড়ি, বাসগাড়ি দেখছিল। বেশ চলছে কলকাতা শহর। চলে যাচ্ছে, কেবল চলে যাচ্ছে। কেবল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দালান কোঠাগুলি আর লাইটপোস্ট, ইলেকট্রিক তার এবং নিরবধি কালের এই আকাশ।

এমন দেখতে দেখতে সে তন্ময় হয়ে যায়। তখন মনেই হয় না, এই শহরের কোথাও সুবল বলে একজন বালকের নিবাস রয়েছে। যে এসেছিল তাদের সঙ্গে, যাকে মা ব্যান্ডেলে নামিয়ে দিল। যার কেউ নেই। মা নেই, বাবা নেই। সংসারে সুবল একা এক মানুষ। অথচ আশ্চর্য, তার কোনও ভয় নেই। মা—বাবা না থাকলে সংসারে কী যে ভয়। টুকুনের ভয়ে চোখ বুজে এল।

সে চোখ বুজেই বলল, জানেন সিস্টার, সুবলের কেউ নেই। মা নেই, বাবা নেই, কেউ না থাকলে কী কষ্ট না।

—খুব কষ্ট। এবার এসো তোমাকে শুইয়ে দিচ্ছি। এতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে নেই।

—আমার কিন্তু কোনও কষ্ট হচ্ছে না।
—তা না হোক। তবু তোমার এখন শুয়ে থাকা উচিত।
সিস্টার জানে বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা ওর নেই। এবং যদি দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় তবে কেলেঙ্কারি। সে বলল, আমি জানলায় আছি, সুবলকে আসতে দেখলেই বলব সুবল আসছে।
—আপনি ঠিক চিনতে পারবেন না।
—আমি এত দেখলাম, কেন চিনতে পারব না!
—না। আমার মনে হয় আপনি ভুলে গেছেন। সে থাকে জানালার বাইরে। আপনি ভিতরে। আপনি তাকে কতটুকু দেখেছেন!
তা ঠিক। সিস্টার খুব একটা বেশি দ্যাখেনি। ছেলেটা এলেই কেমন বিরক্তিকর ঘটনা। সিস্টার দূরে অন্য কাজে মন দিত। কী যে এত কথা এমন একটা সুন্দর বড় ঘরের মেয়ের সঙ্গে—কোথাকার হাভাতে একটা ছোঁড়া, সে এলেই কেমন টুকুন হাতে পায়ে বল পায়। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, সে এলে তাকে যেন টুকুনের সঙ্গে কথা বলতে অ্যালাউ করা হয়—সুতরাং সিস্টার আর কী করে এবং এখন মনে হল, সুবলকে সে খুব একটা ভালো লক্ষ্য করেনি।
টুকুন এবার ধীরে ধীরে বলল, জানেন সিস্টার কেউ একা, এমন ভাবতে আমার কেন জানি ভারী কষ্ট হয়। আমার তখন কিছু ভালো লাগে না।
টুকুন একা—এটা ভাবতে ওর আরও কষ্ট। কখনো কেউ একা থাকলে—কেউ না থাকলে—টুকুনের মনে হয় সে যদি এমন একা হয়ে যায়। কেউ নেই। বাবা নেই, মা নেই। ওর দেখাশোনার মেয়ে শেফালি নেই—কী যে হবে তখন—ওর কী যে কষ্ট, ঠিক সুবলের মতো সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। কেউ কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে না। একটা গাছের নীচে বসে থাকলে তার ভেউ ভেউ করে শুধু কান্না পাবে।
এ—জন্যেই ওর ভিতর সুবলের জন্য কেমন মায়া পড়ে গেছে। সে জানে ওর যা বয়েস—এ বয়সে অনেক কিছু হবার কথা। অথচ কী আশ্চর্য, তার শরীরে কোথাও সে সব লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। মা—বাবার কথাবার্তা অথবা ডাক্তারের কথাবার্তা থেকে সে ধরতে পারে—জননী হতে গেলে যা যা লাগে এই বয়সে তার কিছুই তার ভিতর স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। সে কেমন দুঃখী গলায় এবার বলল, সিস্টার আমাকে ধরুন। আমি পায়ে হেঁটে আর যেতে পারছি না।
মেয়ের এমনই রোগ। হতাশা বুকে। এখন মনে হয় মেয়ের বয়স ষোলোর মতো। ফ্রক কী খালি গায়ে রাখলেও কোনও ক্ষতি নেই। সে যেন ইচ্ছা করলে একটা সিল্কের গেঞ্জি পরে থাকতে পারে। পুরুষমানুষের মতো হেঁটে বেড়াতে পারে। এবং এ—ভাবেই মেয়ের অসুখ বেড়ে গেল। এখন মনে হয় বয়স আরও বেশি টুকুনের, হিসাব করলে ষোলো—সতেরো। ফ্রক গায়ে কচি বালিকা সেজে বসে আছে—এবং ইহজীবনে বুঝি টুকুন আর এ—বয়স পার হবে না। অথচ আশ্চর্য সুন্দর মুখ টুকুনের। মেয়েদের এমন সুন্দর মুখ হয়! আহা আশ্চর্য চোখের তারায় কী যে মায়া। সে সুবলের জন্য এখন বিছানায় শুয়ে কেমন প্রার্থনা করছে। ঈশ্বর, যাদের কেউ নেই, তুমি তাদের আছো। তুমি তাদের দ্যাখো।
সে শুয়ে আছে। পা দুটো সোজা। একটা সাদা চাদরে ঢাকা। এবং ফের মোমের মতো মুখ হয়ে গেছে। চোখ প্রায় স্থির। কেমন কষ্টদায়ক মুখের ছবি। তাকে কফিনের ভিতর রাজকন্যার মমির মতো লাগছে এবং এ—ভাবেই সিস্টার দেখে অভ্যস্ত। এই যে একটু সময় জানালায় গিয়ে দাঁড়াল সেটাই বড় বিস্ময়ের ব্যাপার। টুকুনকে যারা দেখেছে, তাদের কাছে টুকুনের এমন ভঙ্গিতে শুয়ে থাকার ব্যাপারটাই বরং স্বাভাবিক, টুকুন যে জানালায় হেঁটে গিয়ে সেই সুবল নামক বালকের জন্য প্রতীক্ষা করছিল কে বলবে।
টুকুন বলল, জল খাব সিস্টার।
সিস্টার জল দিলে বলল, সে এলে আমায় কিন্তু ডেকে দিয়ো। আমার এখন খুব ঘুম পাচ্ছে।

নয়

সুবল সকাল সকাল উঠেই ফুটপাথের কলে স্নান করে নিয়েছে। সে একটা ঘর এখনও পাচ্ছে না। সে যা আয় করছে, বাবুরা ওর ভাজা—ভুজি কিনে যা দেয়, তাতে ওর দু বেলা ছাতু খেয়ে বেশ চলে যাচ্ছে। আর পয়সা বাঁচে না যা দিয়ে সে একটা ঘর, খুপরি ঘর ভাড়া নিতে পারে। এখানে সে দু—একজন লোকের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পরিচয় করে ফেলেছে, যেমন অজিত সাহা লোকটি তাকে অন্য ব্যবসা করতে বলছে—এই যেমন মটর কিনে সেদ্ধ করে রং মিশিয়ে মটরশুঁটির মতো বাজারে বিক্রি করা। সিনেমার শো ভাঙলে সে অনায়াসে এই সব বিক্রি করতে পারে।

সুবল বলেছিল, রং মেশাতে হবে কেন?

—রং না মেশালে শুকনো মটর মনে হবে, সবুজ মনে হবে না।

—রং তো লোকে খায় না!

—খায় না, খেতেও নেই। ওতে অক্সাইড থাকে, পেটে ঘা করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

—ওতে মানুষের ক্ষতি হয় অজিতদা।

—মানুষের ক্ষতি হলে তোর কী? তোর ক্ষতি না হলেই হল।

—তা হলে এটা তো ভালো না। মানুষের ক্ষতি হলে কিছু আমার ভালো লাগে না। তুমি অন্য ব্যবসার কথা বলো।

—তবে যা করছিস তাই কর। ফুটপাথে শুকিয়ে মর।

—আমি তো একা মানুষ, আমার তো চলে যাচ্ছে।

—তোর অসুখে—বিসুখে কোথায় থাকবি?

—গাছের নীচে।

—শালা তবে খরার দেশ থেকে চলে এলি কেন?

—ওখানে বর্ষা নামলে চলে যাব। এ—শহরে আমি থাকব না অজিতদা।

—কেন, ভালো লাগে না? তোকে একদিন সিনেমায় নিয়ে যাব। দেখবি তখন তোর এই শহরটার উপর মায়া পড়ে যাবে।

—তাই বুঝি?

—তবে আবার কী!

—আমার পাখিটা এখানে থাকতে চাইছে না।

—রাখ তোর পাখি। কোথাকার কী একটা রেখেছিস, ছেড়ে দে চলে যাক। সঙ্গে শুধু উটকো ঝামেলা রেখেছিস।

—ছেড়ে দিলে চলে গেলে মন্দ হত না। কিন্তু যায় না। আমাকে নিয়ে যাবে বলছে।

—শালা তোর পাখি তবে কথাও বলে!

—বলে তোমরা ঠিক বুঝতে পারো না। বলে সুবল হেসেছিল। তবু সুবল এই অজিত সাহার উপর রাগ করে না। বরং দু—একদিন কিছু কামাতে না পারলে অথবা পয়সা কম পড়লে সে তার কাছ থেকে ধার নেয়। দু—একদিন অজিত সাহা ওর বস্তিতে খুপরি ঘরে ডেকে দুটো ভালো—মন্দ খাইয়েছে। সুবল অনেকদিন ভাত খায়নি। সে টুকুনদিদিমণিকে বিকেলে দেখতে যায়। একদিন টুকুনদিদিমণির নার্স দেখে কেমন বিরক্ত হয়ে দশটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছিল, যেন ভিক্ষে চাইছে সুবল, সুবল হেসে বলল, না মা—জননী, আমি ভিখারি নই। টুকুনদিদিমণি আমি ভিখারি! টুকুনদিদিমণি আমাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। আমার কেমন এই টুকুনদিদিমণির জন্য মায়া পড়ে গেছে।

সুবলের আর যাবার জায়গা কোথাও নেই, তবে ওর প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। কারণ এখন সুবল ওর কাছে জাদুকরের মতো। স্রেফ অলৌকিক জাদুকর। আসে যায়, কখনও হারিয়ে যায়। আবার আসে। প্রত্যাশা

ওকে বড় এবং ভালো করে তুলবে। বলে ডাক্তারবাবু অন্যমনস্কভাবে কেবল হাতে তুড়ি মারছিলেন।

সুরেশবাবু বাইরে গিয়ে বলেছিলেন, কেমন বিস্ময়ের ব্যাপার লাগছে সব।

সুরেশবাবুর স্ত্রী বলেছিল, টুকুনের জীবনে স্বাভাবিকতা তবে আসবে ডাক্তারবাবু?

—সব এখন সেই পাখিয়ালার ওপর নির্ভর করছে।

পাখিয়ালার নাম শুনেই টুকুনের মা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। তাই বলে একটা রাস্তার ছেলে! অন্য কেউ হলে হয় না! কত সুন্দর সুপুরুষ সব তরুণ রয়েছে তাদের চারপাশে। টুকুনের মা আর কোনও কথা বলতে পারল না। ছেলেটা তন্ত্র—মন্ত্র জানে। কোথাকার ছেলে, খরা অঞ্চল থেকে উঠে এসে কী করে যে টুকুনকে ট্রেনে নিজের মতো করে ফেলল!

অথবা সেই সব দৃশ্য। টুকুনের মা এখনও যেন মনে করতে পারছে—টুকুন জেগে দেখেছিল, সুবল দরজা খুলতে পারছে না। টুকুন বাবাকে দেখেছিল দরজা লক করে দিতে। সুতরাং সুবল দরজা খুলতে পারছিল না। টুকুন সুবলকে কিছু বলার জন্য উঠে বসতেই জানালায় দেখতে পেল একজন পুলিশ ওদের কামরার দিকে ছুটে আসছে। প্ল্যাটফরমে হইচই। মানুষের ছুটোছুটি এবং কান্না। যারা জল চুরি করে খেয়েছিল অথবা লুট করেছিল, তাদের এখন ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টুকুন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ডেকেছিল, সুবল সুবল, দরজা খুলবে না। দরজা খুললে ওরা ঢুকে পড়বে ঘরে।

সুবল বলেছিল, আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে?

—তাড়াতাড়ি এদিকে এসো সুবল, বলে সে ব্যাংকের নীচে সুবলকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারপর লম্বা চাদর দিয়ে পর্দার মতো একটা আড়াল সৃষ্টি করে সুবলকে অদৃশ্য করে দিয়েছিল।

সুবল ট্রেনে তখন সব পোঁটলাগুলো শিয়রের দিকে রেখে দিয়েছিল। বাংকের ওপর টুকুন চুপচাপ শুয়ে। চাদরটা দিয়ে বাংকের নীচটা ঢেকে দিয়েছে। ওর ভিতর একটা ছেলে শুয়ে আছে পালিয়ে, কেউ টের পাচ্ছে না। টুকুনের মা—ও জানত না। টুকুন পরে সব বলেছিল।—জানো মা, আমি দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলাম।

সে—সব কথা তখন টুকুনের মা বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণ সে তো কিছু দ্যাখেনি। পাশের বাংকে সে ঘুমাচ্ছিল। ফার্স্ট ক্লাস কামরা, রিজার্ভ।

জেবের ভিতর ছিল তখন পাখিটা। সুবল একটু আলগা হয়ে শুয়ে ছিল নীচে। পাছে পাখিটা চাপা পড়ে মরে না যায়। পাখিটা তখন জড়পদার্থের মতো, যেন শীতে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে, অথবা পাখিটার ঘুম পাচ্ছিল বোধহয়—খুব জড়সড়ো হয়ে জেবের একটা দিকে বসে আছে। তারপর মনে হয়েছিল সুবলের, ঘুম এসে গেলে পাখিটা জেবের ভিতর চেপটে যেতে পারে, সেজন্য সে শিয়রে রেখে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুম যাবার চেষ্টা করেছিল। পাখিটা শিয়রে জড়সড়ো হয়ে বসে আছে। নড়ছে না। যেন পাখিটারও ভয়, পুলিশ পাখিটাকে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি এদের দলে, সুতরাং নিস্তার নেই।

টুকুন রগণ এবং দুর্বল। টুকুন কোনোরকমে উঠে বসেছিল এবং চাদরটা ঠিক মেঝের সঙ্গে মিলে আছে কিনা দেখার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল। টুকুন ক্ষীণকায়, লম্বা। সিল্কের দামি ফ্রক গায়ে ঢল ঢল করছিল। শুধু সামান্য মুখে সতেজ সুন্দর চোখ কালো জলের মতো গভীর মনে হচ্ছিল। দরজায় তখন ঠক ঠক শব্দ। টুকুন কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মা এবং বাবা শেষরাতে ঠান্ডা বাতাসটুকু পেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। সুতরাং টুকুন নিজে ধীরে ধীরে উঠে গিয়েছিল এবং দরজা খুলে দিয়েছিল—লম্বা একটা পুলিশের মুখ গোটা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টুকুন খুব আস্তে আস্তে বলল, আমাদের কামরায় কেউ জল খেতে আসেনি।

—কেউ ভিতরে পালিয়ে নেই তো?

—না না, কেউ নেই। কেউ আসেনি। ট্রেন ওরা থামিয়ে দিলেই আমরা দরজা লক করে দিয়েছিলাম।

সিস্টারের ভয়ে সুবল ক'দিন হল নার্সিংহোমের দিকে পা বাড়ায়নি। এই শহরে একমাত্র টুকুন দিদিমণিই ওর জন্য প্রতীক্ষায় বসে থাকে। তাকে দেখালে খুব খুশি হয়। এবং কেন জানি এ—ভাবে সুবলের কাছে টুকুন খুব আপনজন হয়ে গেল।

অথচ ভয়, সিস্টার তাকে নানাভাবে ভর্ৎসনা করেছে। সেদিন সিস্টারের চোখে কী এক কঠিন বিরক্তি দেখে সে আর যেতে সাহস পায়নি। তা ছাড়া অজিতদা ওকে অন্য একটা সুন্দর ব্যবসার কথা শিখিয়ে দিয়েছে। সে বড়বাজার থেকে চিনাবাদাম কিনে আনছে। এবং ফুটপাথে সে উনুন জ্বালিয়ে বেশ ভাজাভুজি রেখে বিক্রি করছে। সে এখানে এসে একটা ব্যাপার দেখে খুশি। দেশে থাকতে কী না ওরা অসহায় ছিল। এমন একটা সুন্দর দেশ পর পর ছ'বছর খরাতে শস্যবিহীন দেশ হয়ে গেল। তবু অন্যান্য বছর সামান্য বৃষ্টিপাতের দরুন কিছু ফসল হয়েছিল—এবার যে কী হল! দেশ ছেড়ে মানুষ পালাল। সে আর থাকে কী করে! ওর ইচ্ছা ছিল টুকুনদিদিমণিদের সঙ্গেই চলে যাবে। দিদিমণির মা—টা যেন কেমন। ঠিক সিস্টার যেমন মুখ করে রেখেছিল, দিদিমণির মা—টার তেমনি রাগী রাগী ভাব। সে ভয়ে ব্যান্ডেলে নেমে গেল। তারপর এক আশ্চর্য বিকালে এতবড় জানালায় দিদিমণিকে আবিষ্কার করে অবাক।

কিন্তু এখন সে এমন একটা কাজ নিয়ে ফেলেছে যে সে যেতে পারছে না। ওর জুতো—পালিসের সব কিছু অজিতদার বাড়িতে আছে। অজিতদার বউয়ের খুব সিনেমা দেখার স্বভাব। সে সুবলকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তার এসব ভালো লাগে না। সে সময় পেলে বরং টুকুনদিদিমণির কাছে চলে যাবে।

টুকুনদিদিমণির কাছে গেলেই তাকে নানারকম গল্প বলতে হয়। সে আজ যাবে ঠিক করেছে। চার—পাঁচদিন হয়ে গেল দিদিমণিকে না দেখে কেমন সে কিছুটা দুঃখী সুবল বনে গেছে। সকাল সকাল কলের জল থেকে স্নান করেই মনে হয়েছে, দিদিমণির সঙ্গে দেখা না হলে কাজে উৎসাহ পাবে না। সে তাড়াতাড়ি কিছুটা ভাজাভুজি বিক্রি করে নেবে, তারপর বিকেলে হাতে সে কোনো কাজ রাখবে না। আগে ওর খুব একটা ঝামেলা ছিল না। যখন খুশি চলে যেতে পারত। এখন পারে না। সে আগে হাতে তার জুতোর বাক্সটা রেখে দিত। এখন তার সম্বল একটা উনুন, একটা চট, একটা চালুনি, একটা কাঠের ট্রে, একটা ভাঙা কড়াই, কিছু বালি, এতগুলো দিয়ে যে যখন তখন যেখানে সেখানে যেতে পারে না।

সে আজ ভাবল, সব রেখে দেবে শেফালী বউদির কাছে। শেফালী বউদির রং কালো। কেবল গুন গুন করে হিন্দি গান গায়। সব সিনেমার গল্প এসে কাউকে না কাউকে বলা চাই। রাতের বেলায় সুবল গেলে তাকে বসিয়ে গল্প। এক কাপ চা খেতে দেয় তখন। কালো রংয়ের শেফালী বউদির খুব তাজা চোখ মুখ। এবং সবসময় পান খাবার স্বভাব। ছোট দুটো ঘর। তাই যতটা সম্ভব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে। কাগজের ফুল তৈরি করে নানা রংয়ে সাজিয়ে রাখার স্বভাব। এবং কারুকার্য করা ডিমের খোলা—কোনটা লাল রংয়ের, কোনটা হলুদ রংয়ের। পাশে একটা বড় পুকুর। জানালা খুললে পুকুরের জলে অনেককে নাইতে দেখা যায়। অজিতদা না থাকলে জানলা খুলে শেফালী বউদি কার জন্য মনে হয় জানলায় অপেক্ষা করে। সুবলের এটা কেন জানি ভালো লাগে না।

সুতরাং সুবল সব টুকিটাকি কাজ সেরে ফেলার সময় শেফালী বউদির কথা ভেবে কেমন সামান্য কষ্ট পেল। এই শহরে বড় একটা কষ্ট আছে সবার। যেমন অজিতদার, বউদির। ওদের কাছে যেন কিছু জিনিস খুব দুর্লভ। সেই দুর্লভ কিছু পাবার জন্য ওরা এমন করছে। ওর কাছে দুর্লভ বলতে টুকুনদিদিমণি। দিদিমণিকে দেখলেই ভিতরে সুবল প্রাণ পায়। সুবল দিদিমণির জন্য কী যে সুন্দর একটা খেলা শিখে ফেলেছে, আজ গেলে সেই খেলাটা দেখাতে পারলে খুব আনন্দ পাবে।

সে তার টুকিটাকি মালপত্র সব মাথায় করে এক সময় শেফালী বউদির ঘরের দিকে রওনা হল। সে যাবার সময় একটা সুন্দর সাজানো পান কিনে নিল। নিজে সে পান—টান কিছু খায় না। অজিতদা ওকে একদিন একটা বিড়ি দিয়েছিল খেতে। সে খেতে গিয়ে খক খক করে কেশেছে ভীষণ। সেই থেকে বিড়ি ব্যাপারটাকে ভীষণ ভয় পায় সে।

সে হাঁটছিল। তাকে খুব একটা দূরে হেঁটে যেতে হয় না। বড় রাস্তা থেকে কিছুদূর হেঁটে গেলেই গোলবাগান বস্তি। দুপাশে ছোট ছোট সব খুপড়ি ঘর, টিনের চাল। একটা হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের ডিসপেন্সারি। তারপর একটা লোক দুটো লেদ মেসিনের দোকান নিয়ে সারাদিন কাজ চালিয়ে যায় এবং রোয়াকে চায়ের দোকান। একটা ছোট মুদি—দোকান, কলের জল পড়ছে এবং কলের পাড়ে ভীষণ ভিড়। সে এখানে এলেই সবাই ঝুঁকে পড়ে। সুবল তোর পাখিটা দেখি। দেখা না রে পাখিটা। কেউ কেউ একটা মাকড় ধরে এনে বলে, নে, এটা খাওয়া। সে জানে কোথায় কী বলতে হয়। সে মানুষকে আঘাত করতে জানে না। সে মিথ্যা কথাও বলতে জানে না, সে ইচ্ছা করলে বলতে পারে না, পাখিটা এখন আমার জেবে নেই। বললেই ওরা সরে যায়। কিন্তু বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। সে কোনোরকমে তাড়াতাড়ি রাস্তাটা পার হয়ে যায় তখন। চৌকাঠে ঢুকে গেলে কেউ তখন আর বিরক্ত করতে আসে না।

শেফালী অসময়ে সুবলকে দেখে বলল, সুবল, এ—সব নিয়ে অসময়ে?

—একটু কাজ আছে বউদি।

শেফালী ওর মাথা থেকে এক এক করে টুকিটাকি জিনিস নামাতে নামাতে বলল, কোথায় যে রাখি!

—আজ রাখো, কাল সকালে নিয়ে যাব। তোমার জন্য একটা পান নিয়ে এসেছি।

—সুবল, তুমি আমাকে ভালোবাসো?

সুবল অবাক। বউদি তাকে ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে। তবু কেমন যেন গা—টা শির শির করে উঠল। এই শহরে এলে মানুষ বুঝি সব কিছু একটু তাড়াতাড়ি শিখে ফেলে। সে বলল, তুমি পান খেতে ভালোবাসো। অজিতদা কোথায়?

শেফালী ঠোঁট উলটে বলল, জানি না।

—আজ আসেনি?

—না।

—কেন আসে না?

—একবার জিজ্ঞাসা কর না!

—না, খুব খারাপ বউদি। আমি ঠিক জিজ্ঞাসা করব। বলেই সুবল হেসে দিল।—তুমি ঠাট্টা করছ বউদি। দাদা ঠিক এসেছে।

—না রে! তোর সঙ্গে আমি মিথ্যা বলি না।

সুবলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে বলল, কোনও খবর নিয়েছ?

—ঠিক চলে আসবে। কোথায় খোঁজ করব বল? কোথায় যায় আমাকে বলে যায় না।

সুবল বুঝতে পারল, বউদি সত্যি কিছু জানে না। সে নিজেই একটা জলচৌকি টেনে দিল। বসতে বসতে বলল একটু জল খাব।

শেফালী জল এনে দিলে বলল, কাল ক'টায় বের হয়েছে?

—রাতে।

—রাতে ক'টায়?

—বেশ রাত। যেন শেফালী ইচ্ছা করেই আর বেশি বলতে চাইছে না,—শেফালী সুবলকে মাঝে মাঝে রাজা বলে ডাকে। যদিও জানে রাজা খুব ভালো ছেলে। রাজার নতুন গোঁফ উঠছে বলে, খুব ভালো লাগে দেখতে। এই নতুন গোঁফ—ওঠা ছেলেদের খুব ভালো লাগে। রাজা আগে খুব নোংরা জামাকাপড় পরে থাকত। শেফালী ওকে কিছু কিছু ট্রেনিং দিয়ে বেশ এখন সাফসোফ রাখার ব্যবস্থা করেছে। আগে চুল ছিল বড় বড়। চুল কাটত না। ইদানীং চুল কাটছে। এবং বড় একটা শিখা ছিল মাথায়, সেটাও ছোট করে ফেলেছে। খুব খেয়াল না করলে বোঝা যায় না শিখাটা আছে মাথায়।

শেফালী বলল, সব ফেলে কোথায় যাচ্ছ?

—টুকুনদিদিমণির কাছে।
—তুমি যে বলেছিলে আর যাবে না? সিস্টার পছন্দ করে না।
সুবল বলল, আমার বউদি, আপনজন বলতে টুকুনদিদিমণি। ভেবেছিলাম যাব না। কিন্তু কাল থেকে মনটা টুকুনদিদিমণির জন্য কেমন করছে।
—কবে যেন গেছিলে?
—গত বুধবার।
—আর মাঝে যাওনি?
—না।
—টুকুন ঠিক জানলায় রোজ দাঁড়িয়ে থাকবে?
—জানি না বউদি। ওর মা আমাকে দেখতে পারে না। ওদের অসুবিধা হবে বলে একটা বড় স্টেশনে আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল।
—ভীষণ খারাপ। বড়লোক হলে মানুষ ভালো হয় না। বড়লোকেরা খুব স্বার্থপর।
সুবল সে—সব কথায় গেল না। সে বলল, আসতে আসতে দেখলাম, একটা বড় গির্জার সামনে দুটো ছেলে ফুল বিক্রি করছে। বেশ ভালো কাজ।
—কেন, তুমি ফুল বিক্রি করবে নাকি?
—দাদা এলে জিজ্ঞাসা করব, কোথায় ফুল কিনতে পাওয়া যায়।
—এ কাজটা খুব ভালো হবে। তোমার খুব সুন্দর মুখ রাজা। তুমি যদি ফুল বিক্রি করো তবে লোকে অনেক ফুল কিনবে।
—সত্যি কিনবে?
—সত্যি। প্রথম দিনের একজন খদ্দের তুমি আমাকে পাবে।
—আমি তোমাকে এমনি দেব।
—তবে তোমার ব্যবসা হবে কী করে রাজা?
—একটা ফুল দিলে ব্যবসা নষ্ট হয় না। যখন চিনাবাদাম ভেজে বিক্রি করি, কেউ কেউ দুটো একটা এমনি খায়। খেয়ে পছন্দ হলে নেয়। তুমিও আমার তেমন।
—আমার একটা ফুলে কিছু হবে না রাজা। একটা ফুল দিয়ে মালা গাঁথা হয় না।
—কত ফুল লাগবে?
—একগুচ্ছ।
—তাই নেবে!
—না রাজা, এমনি নেব না।
—তাহলে কী করতে হবে?
—সে পরে বলব। বলেই শেফালী বলল, যাও, আপনজনের কাছে যাও।
সুবল এতক্ষণে মনে করতে পারল সে টুকুনদিদিমণিকে একমাত্র আপনজন বলেছে। সে বউদির ঠাট্টাটা ধরতে পেরে বলল, তোমার নিজের লোক। অজিতদা কত ভালো লোক।
—ভালো লোক না ছাই!
—তুমি কেবল বউদি অজিতদার নিন্দা কর। দাদা এলে বলে দেব।
—বলে দ্যাখ না যদি একটু রাগ করে। লোকটার রাগ অভিমান বলতেও কিছু নেই। যা খুশি করবে। মান—সম্মান বুঝবে না। অপমান বলতে কিছু নেই।
সুবল দেখল কথা অন্যদিকে যাচ্ছে। সে উঠে পড়ল। সে একটা বল নিয়েছে হাতে। শেফালীর ইচ্ছা সুবল আর একটু বসুক। এখন এই বিকেলটা শেফালীকে বড় একা একা কাটাতে হবে। এখানে এ ঘরের কেউ

দেখতে পাচ্ছে না সুবলকে সামনে নিয়ে বসে রয়েছে। সুবল এলেই মনের ভিতর একটা অদ্ভুত রহস্য খেলা করে বেড়ায়। ওর নরম চুল এবং চোখ দেখলে যেন কোনও আর দুঃখ থাকে না। বেশ জড়িয়ে ধরে ছেলেটাকে চুমু খেতে ইচ্ছা হয়। এবং সুন্দর করে সাজানো পুতুলের মতো অথবা সে যে—সব সিনেমায় নানারকমের কল্প—কাহিনী দেখে তেমনি সব কল্প—কাহিনীর বাসিন্দা হতে ইচ্ছা হয়। সুবলকে না দেখলে তার এমন বুঝি হত না।

শেফালী বলল, পাখিটার খেলা আজ দেখালে না?

সুবল বুঝতে পারছিল, কিছু না কিছু বলে তাকে আটকে রাখছে। সে বলল, আজ আমার একটু তাড়া আছে। বলে সে বারান্দা থেকে নেমে চৌকাঠ পার হয়ে রাস্তায় নামল।

সুবলের বেশ ভালো লাগছিল হাঁটতে। সে সাফসোফ হয়ে যাচ্ছে। জামা পাজামা সব ধবধব করছে। সে কলের পাড়ে এসব গতকাল কেচে নিয়েছিল। পয়সা হলে সে আরও দুটো ঢোলা পাজামা পাঞ্জাবি করে নেবে। একটা টিনের স্যুটকেস কেনার খুব বাসনা। একটা টিনের স্যুটকেস কিনে ফেলতে পারলেই সে সব কিছু অতি প্রয়োজনীয় যা আছে স্যুটকেসের ভিতর রেখে দেবে। আর কেন জানি মাঝে মাঝে টুকুনদিদিমণিকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আর মাঝে মাঝে আর একজন মানুষকে তার চিঠি লিখতে ইচ্ছা হয়। সেই যে কাপালিকের মতো মানুষ জনার্দন চক্রবর্তী। যিনি তাদের নিয়ে শেষ চেষ্টা করেছিলেন জল আবিষ্কারের। এবং তিনি পাহাড়ের ওপর কোনও ঋষি পুরুষের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। হাতে একটা লাঠি। নদী পাহাড় খাত ভেঙে উপত্যকার ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। যদি নদীগর্ভে চোরা স্রোত থাকে, সেজন্য তিনি সব মানুষদের, যারা আর অবশিষ্ট ছিল, শেষ পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছিল, তাদের নিয়ে শেষ চেষ্টা। দূরে দূরে সব এক একজন করে মানুষ ক্রমান্বয়ে দিনমান বালি খুঁড়ে চলছিল—জলের আশায় মানুষের এমন মুখ—চোখ হয় সুবল এখন চিন্তা করতেই পারে না।

সারাদিন কেটে গিয়েছিল, রাত নেমে এসেছিল, না, কোথাও জল নেই। মানুষটিই তাদের অনেকদূর হাঁটিয়ে, প্রায় ক্রোশ—দশেক হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—এবং ট্রেন আটকে দিতে বলেছিল। জল লুটেপুটে খেতে বলেছিল। এখন মানুষটা কেমন কে জানে! চিঠি দিলে সেখানে আর কে যাবে। কে আর পৌঁছে দেবে।

মনের ভিতর মানুষটার মুখ—চোখ, আলখাল্লার মতো পোশাক, এবং দিনমানে সে হয়তো অন্নহীন হয়ে সুবচনি দেবীর মন্দিরে পড়ে আছে। এমন মানুষ সে কোথাও দেখেনি। এই একমাত্র মানুষ যার বিশ্বাস ছিল দেবী কখনও না কখনও সুপ্রসন্না হবেন। এবং কোনও পাপ মানুষকে এভাবে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সেই পাপের খণ্ডন কী কোনও এক অলৌকিক উপায়ে করতে চেয়েছিলেন। এবং মানুষেরও তেমন একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোখের ওপর দেখেছেন দেবীর মহিমা কী ভাবে বার বার মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে। সংসার আর সুজলা—সুফলা হচ্ছে না। সুবলের সেই মানুষটার জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। ওকে ফেলে চলে এসে সে যেন ঠিক কাজ করেনি। খুব স্বার্থপরের মতো ব্যাপারটা হয়ে গেছে।

সুবল দেখল সে ভাবছে বলে খুব একটা এগোতে পারছে না। অন্যমনস্ক হয়ে গেলে সে কেমন ঝিমিয়ে হাঁটে। সেই গির্জাটা পার হয়ে যাচ্ছে সে। গির্জায় বাঁশ বেঁধে রং করছে। গেটে একজন লোক বসে রয়েছে। ভিতরে বড় কারখানা। কাচের বাক্স করে নিয়েছে একটা লোক। তার ভিতরে বসে ফুল বিক্রি করছে। লোকটার কাজই সবচেয়ে ভালো। মানুষের শেষদিনে মানুষকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে।

অথবা সুবলের ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে এমন সব গির্জায় কেবল রং করে বেড়ায়। অথবা মন্দিরে। মসজিদে, মসজিদে কারুকাজ করা যেসব পাথর আছে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। মানুষের সুখদুঃখ ব্যাপারটা সুবলকে খুব ভাবায়!

অথচ এর ভিতর টুকুনদিদিমণির মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে খুব দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। গাছের মাথায় সূর্যের আলো। এবং সব সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়েরা পার্কে খেলা করে বেড়াচ্ছে। দোকানগুলোতে মানুষের ভিড়। কী

পোশাক, কী সুন্দর সব মানুষ! কোনও অভাব—অনটন নেই। শেফালীবউদি খুব সুন্দর পোশাক পরে যখন সিনেমায় যায়, তখন ওর তাকিয়ে থাকতে খুব ভালো লাগে। সব মানুষগুলোই সেজে—গুজে কেমন সুন্দর সুসজ্জিত হয়ে থাকে। এমন পরিপাটি পোশাক, মুখ—চোখ, সে তার গ্রামে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। মানুষ এ—ভাবে সুখে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে সে কল্পনাও করতে পারেনি। খুশিমতো আলো জ্বেলে নেয়। জল তুলে নেয়, রাস্তা পার হয়ে যায়, হুস—হাস গাড়ি চলে যায়, বাজারে বাজারে প্রচুর শাকসবজি মাছ মাংস! ওর একবার মনে আছে গ্রামে মাংস হবে। গোবিন্দ বণিক একটা পাঁঠা কিনে এনেছিল। বাবা কী করে পাঁচসিকা পয়সা সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন দুর্দিন এলে খরচ করবেন। কিন্তু বণিক সেই পাঁঠাটা কাটলে বাঁশতলায় কী ভিড়! বাবাও লোভে পড়ে পাঁচসিকার মাংস কলাপাতায় কিনে এসেছিলেন। সেবারই শেষ মাংস খাওয়া। তবে বাবা মাঝে মাঝে পাখি ধরে আনতেন। ওরা পাখির মাংস খেত। মা খুব পাখির মাংস খেতে ভালোবাসত বলে বাবা অনেকদিন খুব রাত থাকতে পাহাড়ে চলে যেতেন। বালিহাঁসের ডিম, ডিম না হয় হাঁস ধরে আনতেন।

সুবলের ধারণা ছিল পাখি ধরা খুব সহজ কাজ। কিন্তু বাবা প্রায়ই কিছু আনতে পারতেন না। মা রাগ করে কিছুই না খেয়ে থাকত। এমনিতে না খাওয়া ছিল তাদের অভ্যাস, আর একটু চাল— ডাল হলেই মা মাংস দিয়ে ভাত খেতে চাইত। বাবার ওপর রাগ করে মা—টা তার মরে গেল।

সুবলের এখন ধারণা হয় বাবা উদ্যমশীল ছিল না। যেমন সে—ও খুব নয়। কোনওরকমে দিন চলে গেলেই হল। কিন্তু এখানে এসে সে নানাভাবে দেখছে খুব সহজে দিন চলে গেলে জীবনের কোনও মানে থাকে না। চারপাশে এত প্রাচুর্যের ভিতর সে কতদিন আর ফুটপাথে দিন কাটাবে। ওর একটা ঘর না হলে চলছে না। সে ভাবল, বলবে টুকুনদিদিমণিকে, আমি আর গাছতলায় থাকব না। আমাকে একটা ঘর বানিয়ে নিতেই হবে।

সুবল রাস্তায় কত কিছু ভাবতে ভাবতে হাঁটছে। শহর ধরে হাঁটলেই যেন এমন হয়। অথচ খারাপ দিনগুলোতে সে একটা ভাবনাই ভাবত, জল কোথায় পাবে? জল পেলে কখনও পাহাড়ে যা সব লতা মূল ছিল, যেমন পেস্তা আলোর গাছ, এবং তার মূল অথবা ফল কিছু সিদ্ধ করে খেলে কোনওরকমে তাদের দিন চলে যেত। জল যে কী দুর্লভ ছিল! এখন এই শহরে এটা ভাবতে পর্যন্ত হাসি পায়। জলের জন্য তারা প্রাচীনকালের মানুষদের মতো নদীগর্ভে এক এক করে মাইলের পর মাইল বালি তুলে মানুষ—সমান গর্ত করেও যখন দেখল নদীর চোরাস্রোতে পর্যন্ত জল নেই, তখন যার যেদিকে চোখ যায় সেদিকে চলে যাওয়া যেন।

অথচ এখানে এসে আর জলের কথা মনে হয় না। সে চারপাশে দেখে নানা আকর্ষণ। সকাল হলে গাছে তেমন পাখি ডাকে না, অথচ আকাশ নীল, ট্রামলাইনের তার নীল সুতোর মতো অজানা রহস্য হয়ে যায়। কত দূরে এই সব ট্রামলাইন চলে গেছে সে জানে না। পয়সা হলে সে একদিন সারাদিন ট্রামে চড়ে ঘুরবে। শহরে বড় রাস্তায় কখনও কখনও গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে সে হেঁটে যেত। আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। এবং দুটো একটা গাড়ি গেলে মনে হত এক বড় মাঠের ভিতর দিয়ে একা একা সে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ তার পাশে নেই। তাকে ঠিক পথ চিনে মাঠ পার হয়ে যেতে হবে।

এত সব ভাবতে ভাবতে সে দেখল এক সময় দূর থেকে টুকুনদিদিমণির জানলাটা দেখা যাচ্ছে। সে এবার প্রায় রাস্তা ধরে ছুটতে চাইল। কারণ সে দেখতে পাচ্ছে, ঠিক স্পষ্ট নয়, এখনও স্পষ্ট নয়, তবু মনে হচ্ছে জানলাটা বন্ধ। এখন শরৎকাল। আকাশে নানা বর্ণের মেঘের খেলা। কখনও বৃষ্টি, কখনও নির্মল আকাশ। অথচ এ—সময় জানালা বন্ধ। টুকুনদিদিমণি কখনও জানালা বন্ধ করে না। ওর মনে হল হয়তো ক'দিন ওকে আসতে না দেখে হতাশায় জানলা বন্ধ করে দিয়েছে।

ওর খুব খারাপ লাগছিল। সে কেন যে এল না, কেন যে সিস্টারের ওপর অভিমান করে এল না! যদি অন্য কিছু হয়, যদি টুকুনদিদিমণির ছোট পাখির মতো আত্মাটা উড়ে চলে যায়! এসব মনে হতেই কেমন ওর

বালকের মতো বুকভরে কান্না উঠে আসতে চাইল। সে বলল, দিদিমণি, এবার থেকে ফের আগের মতো রোজ আসব। আমি এসেছি।

কিন্তু সে গিয়ে যা দেখল—সত্যি অবাক, জানলা বন্ধ। সেখানে কেউ আছে বলেও মনে হয় না।

সুবল পাগলের মতো জানলায় শব্দ করতে থাকল।

সহসা জানলা খুলে, প্রায় পাঁচ সাতটা মানুষ ওকে তেড়ে এল। সে ওদের কাউকে চেনে না। ওরা সবাই একসঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে আছে।

তবু এরই ভিতর সে যা দেখল, একজন খুব মোটামতো মানুষ বিছানায় বসে আছে। ওর পাশে একটা নলের মতো কী যেন। মাঝে মাঝে দুটো সরু হলুদ রংয়ের নল সে টেনে নিয়ে দরকার হলে নাকে দিচ্ছে আবার খুলে রাখছে। মোটা গোঁফ লোকটার। সুবল ওদের তবু বলল, আমার টুকুন দিদিমণি এ—ঘরে ছিল। আমি ওকে দেখতে এসেছি।

লোকগুলো কোনও কথা বলল না। মুখের ওপর জানলা বন্ধ করে দিল।

এগার

এটা একটা বড় বাড়ি। খুব বড়। কলকাতার ওপর এতবড় বাড়ি সচরাচর দেখা যায় না। বাড়িটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। খুব ছিমছাম, পরিপাটি নরম ঘাসের চাদর বিছানো চারপাশে। সামনে একটা ছোট্ট পাহাড়। দু'দিকে দুটো পথ চলে গেছে। পাঁচিল লম্বা, দু'মানুষ—সমান উঁচু পাঁচিল বাড়িটার চারপাশে। পাঁচিলের পাশে সব ছোট ছোট আউটহাউস। এবং নানা বর্ণের করবীফুলের গাছ। গাছের নীচ দিয়ে হেঁটে গেলে বোঝাই যায় না এ—বাড়িতে কোনও দুঃখ জেগে আছে।

অথচ একটা মেয়ে, ছোট্ট জানলায় বসে রয়েছে। সে এখন জানলা আর বন্ধই করে না। সে আসবে। ঠিক আসবে। কারণ সুবল না এসে পারে না। ওর পাখিটা যখন সম্বল আছে, সে আজ হোক কাল হোক, জানলায় পাখিটাকে পাঠিয়ে দেবে। টুকুন আছে দোতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায়। নীচে মালীরা বড় একটা বাগান করছে। কত সব ফুলের সমারোহ এখন। শেফালীগাছে কত অজস্র ফুল। এবং সকাল হতেই গীতামাসি যখন জানলা খুলে দেয়, সে দেখতে পায় কত সব পাখি এসেছে গাছটায়। সে সুবলের পাখিটাকে তার ভিতর খোঁজার চেষ্টা করে। যদি ওদের সঙ্গে ছদ্মবেশে মিশে থাকে পাখিটা।

আর কী সুন্দর মনে হয় পৃথিবী। ওই যে সকাল হল, কিছুক্ষণ পরই রোদ এসে নামবে, এবং সামান্য শিশিরের টুপটাপ শব্দের মতো পাখিরা এসে বসেছে গাছগাছালির ভিতর—তার যে কী ভালো লাগছে!

এই দক্ষিণের বারান্দায় কাচের জানলা সব। ভিতরে টুকুনের মনোরঞ্জনের জন্য নানারকমের খেলনা। এখন এই ক'মাসেই বোঝা যায় টুকুনের বয়স আর খেলনার জগতে নেই। সে সুবলের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই শারীরিক কীসব অনুভূতি যেন তাকে ক্রমে গ্রাস করছে। সে এখন সুন্দর সুন্দর বই পড়তে ভালোবাসে। দি প্রিন্স অ্যান্ড দি পপার গল্পটি বড় ভালো লাগে। কখনও সে আতোয়ান দ্য স্যাঁত—একজুপেরির ল্য পতি প্র্যাঁস পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে যায়। সেই সাহারা মরুভূমির বুকে নায়ক, সে বিমান বিকল হয়ে যাওয়ায় ওখানে পড়ে গেছে, সাত—আট দিনের মতো মাত্র পানীয় জল আছে—আর আশ্চর্য সেই মানুষটা যখন একাকী, নিঃসঙ্গ মানুষের বসতি থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে এবং শুধু আকাশ সীমাহীন দেখা যাচ্ছে, কিছু নক্ষত্র, আর কাঁটাগাছ মরুভূমির, তখন কিনা সকাল হলে, সুন্দর এক ছোট্ট রাজপুত্রের কণ্ঠ সে শুনতে পায়—আমাকে একটা ভেড়ার বাচ্চার ছবি এঁকে দাও না!

টুকুন যেন সেই ছোট্ট রাজপুত্রের সঙ্গে সুবলের একটা আশ্চর্য মিল খুঁজে পায়। এখন অপেক্ষায় আছে, তার জন্য কেউ একটা সুন্দর ছবি এঁকে দেবে। টুকুন আজকাল বরং ঘর থেকে খেলনাগুলো সরিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। পরিবর্তে ওর ঘরে এখন আলমারি—ভর্তি বই। এবং সুন্দর সুন্দর সব ভালোবাসার কথা সেখানে লেখা আছে।

আবার টুকুন আজকাল নানারকম গ্রহ—নক্ষত্রের বই পড়তে ভালোবাসে। বিশাল সৌরমণ্ডলের কথা ভেবে সে কেমন মুহ্যমান হয়ে থাকে। সেখানে সামান্য টুকুন অথবা তার অসুখ, সে বড় হচ্ছে না, তার শরীরের সব লক্ষণগুলো কোথায় যেন আটকে আছে—এসব বড় তুচ্ছ। তখন তার কেন জানি বাবা—মা—র ওপর ভীষণ করুণা হয়। মা—বাবা কেন যে মুখ করুণ করে রাখে! মা কিছুতেই কেন যে সুবল এ—বাড়িতে আসুক চায় না! বাবার সঙ্গে ওই নিয়ে মা—র ভীষণ মন—কষাকষি! বাবা শেষ পর্যন্ত মা—র কথাতেই রাজি—তাই বলে একটা রাস্তার ছেলে কখনও টুকুনের সঙ্গী হতে পারে না। আমি বরং রণবীরকে বলব ওর ছেলে ইন্দ্রকে যেন পাঠিয়ে দেয় এখানে থাকবে। কী সুন্দর সুপুরুষ রণবীর। ওর ছেলে বাপকেও ছাড়িয়ে গেছে। এমন কথার পর বাবা আর সিস্টারকে ঠিকানা দিতে পারেননি! সুবল এলে পাঠিয়ে দিতে বলেননি।

তবু টুকুনের ধারণা, সুবল আসবে। কারণ সে কেন জানি সুবলকে এ—গ্রহের বাসিন্দা বলে ভাবতেই পরে না। সেই ছোট রাজপুত্রের মতো তার বাড়ি অন্য কোনও গ্রহে হবে। সে কোনও অলৌকিক যানে চড়ে এখানে নেমে এসেছে। সুবল নিজের সঠিক ঠিকানা জানে না। তার গ্রহটা খুব ছোট। একটা বাড়ির মতো গ্রহটা। সে সেখানে এতদিন থাকত বোধহয়।

সেই ছোট্ট রাজপুত্রের গল্পের মতো মনে হয় সত্যি এই সৌরজগতে কত তো গ্রহ আছে। সংখ্যায় তারা কত কেউ বলতে পারে না। কত সব ছোট্ট গ্রহ আছে যা দূরবিনে পর্যন্ত ধরা পড়ে না। অথবা কখনও কখনও বিন্দুর মতো ধরা পড়লে জ্যোতির্বিদরা সংখ্যা দিয়ে তার অবস্থান অথবা নাম প্রকাশ করে থাকে। বড়দের তবু নাম আছে একটা—পৃথিবী, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র। কিন্তু ছোটদের জন্য কেউ নাম দেয় না। কোনও জ্যোতির্বিদ কোনও একটা গ্রহ আবিষ্কার করে বসলে একটা সংখ্যা দিয়ে দেন। গ্রহাণু ৩০৪০৮৩, একটা সংখ্যা দিয়ে হয়তো ঠিক নির্ণয় করা যায়। সেই রাজপুত্র তেমন একটা ছোট্ট গ্রহের বাসিন্দা। ছোট্ট রাজপুত্রের কথা ভাবলেই সুবলের আশ্চর্য সুন্দর মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠে।

সুতরাং সকাল হলেই টুকুন বুঝতে পারে—এই পৃথিবী কত সব ভারী মজার ব্যাপার নিয়ে বেঁচে আছে। এই পৃথিবীর মাটিতেই সাহারা মরুভূমিতে এক ছোট্ট রাজপুত্রের সঙ্গে লেখকের দেখা হয়ে গেছিল। বড়রা এ—সব বিশ্বাস করবে না। যেমন বড়রা বিশ্বাস করবে না, ছোটরা যদি ছবি এঁকে দিয়ে বলে, এই ছবিতে একটা বাঘ এঁকেছি, বাঘের মুখে হরিণ—ওরা বলবে, ধ্যৎ, তা হয় নাকি, এটা তো রহমৎ মিঞার গোঁফ হয়ে গেল। তা হয় কী করে! এই নিয়ে কথা কাটাকাটি করেও বড়দের বিশ্বাস করানো যাবে না—কখনও কখনও কোনও ছোট রাজপুত্র অন্য গ্রহাণু থেকে চলে আসতে পারে। টুকুন ভাবল, এসব কথা শুধু একজনকেই বলা যাবে—সে সুবল, সুবল শুনলে বলবে, হ্যাঁ দিদিমণি আমাদের ছিল একটা নদী, বড় নদী শুকিয়ে গেল—সে যেমন বলেছিল, দিদিমণি স্বপ্নে দেখেছি, আমরা চলে আসার পর জনার্দন চক্রবর্তী ফিরে গেছে নদীতে। যেখানে দিনমানে আমরা গর্ত করেছিলাম—সেখানে কী নির্মল জল। জলের ভিতর একটা হরিণ শিশু পড়ে গেছে।

সুবল যখন এমন বলে, তখন মনে হয় সব কিছু সত্যি হতে পারে। সে এলে গল্পটা বলা যাবে। বলা যাবে ছোট্ট রাজপুত্র বারবার একটা কথা কেবল বলেছিল, আমাকে একটা ভেড়ার বাচ্চা এঁকে দাও। মানুষটা কী করে তখন, সে বলেছিল, আমি ছবি আঁকতে জানি না।

ছোট্ট রাজপুত্রের এক কথা, দাও না আমাকে একটা ভেড়ার বাচ্চা এঁকে।

মানুষটা ভাবল ভারী বিড়ম্বনা। এমনিতে উড়োজাহাজটা বিকল হয়ে গেছে। সাত—আট দিনের মাত্র জল আছে এর মধ্যে, কিছু না করতে পারলে মরে যেতে হবে। তখন এমন ছোট্ট রাজপুত্র কী করে যে এখানে! সে বলল, ছোট রাজপুত্র আমি ছেলেবেলাতে একটা ছবি এঁকেছিলাম।

রাজপুত্র বলেছিল, তাই বুঝি?

—কিন্তু কী জান, আমি যা ভেবে আঁকলাম, তা সত্যি হল না।

—মানে?

—আমি একটা অজগরের মুখে হাতির ছবি এঁকেছিলাম।

—বাবা! বেশ তো!

—না, বেশ নয়?

—কেন নয়?

—কেউ বিশ্বাসই করল না ওটা অজগরের হাতি গেলার ছবি।

—ওরা কী বলল?

—ওরা বলল, ওটা একটা টুপি।

ছোট্ট রাজপুত্র হা হা করে হেসে উঠল। —বড়রা খুব অঙ্ক ভালোবাসে। অঙ্কের হিসাবে না মিললে ওরা বিশ্বাস করতে চায় না। যেমন দ্যাখো, বিশ্বাস করতে চায় না কেউ আমার বাড়ি একটা গ্রহাণুতে। কিন্তু লামারতিন নামে এক জ্যোতির্বিদ আবিষ্কার করেছিল—সেটা সতেরোশো বাইশের জানুয়ারির আটাশ তারিখ হবে, আমার গ্রহের নম্বর পর্যন্ত ঠিক করে দিয়েছিল.....

—কত?

ছোট্ট রাজপুত্র বলল, তিন আট সাত পাঁচ...ছোট রাজপুত্র বলতে থাকলে আর শেষ হয় না।

টুকুনের মনে হত সে নিজেই সাহারা মরুভূমিতে একটা ছোট্ট এরোপ্লেন নিয়ে নেমে গেছে এবং যা কিছু কথা সব তার সঙ্গে হচ্ছে।

এমন একটা সকালে যখন সে এসব ভাবছিল, এবং জানালা দিয়ে সুন্দর ফুলের সৌরভ ভেসে আসছিল, তখন ইন্দ্র এসে হাজির।

টুকুন বলল, ইন্দ্র, আজও সুবল এল না।

—আসবে।

—তুমি ওকে আমার ঠিকানাটা দিয়ে আসবে?

—ও কোথায় থাকে?

—তা জানি না। সে একটা দেবদারু গাছের নীচে শুয়ে থাকে জানি।

ইন্দ্র জানে টুকুনের এমনই কথা বলার ধরন। টুকুনকে আজ শাড়ি পরিয়েছে গীতামাসি। টুকুনকে খুব স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল। কিন্তু টুকুনের ভিতর কোনও লজ্জা নেই। সে তার শাড়ির আঁচল বুক থেকে ফেলে দিয়েছে। ইন্দ্র যে পুরুষ সেটা মনেই হয় না টুকুনের চোখ দেখে। ইন্দ্র বেশি সময় সঙ্গ দিতে পারে না। সে সুন্দর করে সেজে আসে। সে যতটা পারে সরু প্যান্ট জামা পরে এবং ওর ভিতর কিছু কৃত্রিমতা থাকে বলে টুকুনের ভারী হাসি পায়। সে কিছুতেই টুকুনকে ছুঁতে চায় না। টুকুন সে এলে ঠিক বান্ধবীর মতো জড়িয়ে ধরতে চায় —আর ইন্দ্র তখন কেমন করে, টুকুন তো এখনও ভালো করে হাঁটতে পারে না। তখন সব কিছু তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। সে আর নড়তে পারে না খাট থেকে।

টুকুন ডাকল, ইন্দ্র কাছে এসো।

ইন্দ্র কাছে গেলে বলল, তুমি আমার হাত ধরো।

ইন্দ্র হাত ধরতে সঙ্কোচ করলে বলল, তুমি ইন্দ্র এমন কেন, সুবলকে যদি দেখতে, সে আমার জন্য সব করতে পারে। আমি ভালো হলে সুবলকে ঠিক নিয়ে আসব।

ইন্দ্র বলল, মাসিমা বলেছে আমরা আজ 'চাঁদমামার সংসার' দেখতে যাব।

—কোথায়?

—ছোটদের নাট্য—সংসদে।

—আমি যাব না।

—তুমি গেলে খুব আনন্দ পাবে টুকুন।

—আমার ভালো লাগে না।
মা এসে বললেন, খুব ভালো লাগবে। ইন্দ্র আর তুমি যাবে।
—আমার ভালো লাগে না মা। আমাকে কেউ ধরে নিয়ে যাবে, আমার এটা ভালো লাগে না।
—ডাক্তার বলেছে, তুমি ভালো হয়ে গেছ। এখন শুধু তোমাকে নিয়ে ইন্দ্র ঘুরে বেড়াবে।
ইন্দ্র বলল, আমি দেখেছি। খুব ভালো।
টুকুন বলল, ওসব বাচ্চাদের বই।
—না, সবাই দেখতে পারে। সবারই ভালো লাগবে।
—আমার এখন রোদ ভালো লাগে। বৃষ্টি অথবা ঝড়। আমার কখনও সূর্য ওঠা দেখতে ভালো লাগে। পাখিরা তখন আশ্চর্যভাবে উড়ে বেড়ায়। আমার কেন জানি মনে হয় সুবল তার দেশে চলে গেছে। সে রোদে বৃষ্টিতে অথবা ঝড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কী সুন্দর যে তাকে লাগছে দেখতে! চোখ বুঝলে আমি সব টের পাই।
তবু ইন্দ্র বারবার চেষ্টা করল। এখন ইন্দ্রের কলেজ বন্ধ। সে এখানেই থাকবে। ইন্দ্রের জন্য নীচে একটা বড় ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্র সকালে একবার বিকেলে একবার আসার কথা। সবই ডাক্তারের পরামর্শ মতো হচ্ছে। যখন পাখিয়ালা সুবলকে মিসেস মজুমদার মাঝে মাঝে আসতে দিতে একেবারেই রাজি হলেন না, তখন আর কী করা। তবু তাঁর ধারণা, জীবনের ভিতরে এই বয়সে যে উদ্দামতা দেখা যায়, ইন্দ্রের শরীর থেকে মেয়েটা তার গন্ধ পেলে হয়তো বাছবিচার না করা এক আশ্চর্য গন্ধে এই পৃথিবীর কোনও এক সকালে সে বড় হয়ে যাবে। এবং পৃথিবীময় তখন সে মনোরম সংগীত শুনতে পাবে—যা সে কোনওদিন টের পায়নি, এত ভালো, এভাবে পৃথিবী ক্রমে তার কাছে আরও বড় হয়ে যাবে। সে তখন ছুঁতে পাবে চারপাশটা।
ইন্দ্র বলল, তুমি না গেলে আমি যাচ্ছি না।
টুকুন বলল, আমাকে শাড়ি পড়লে বড় দেখায়?
—খুব বড়।
—মা—র মতো লাগে?
—মাসিমার মতো লাগবে কেন?
—বা রে, শাড়ি পরলে মাসিমার মতো না লাগলে তবে শাড়ি পরা কেন?
—তোমাকে টুকুনই লাগছে। যুবতী টুকুন।
—বাঃ, আমি যুবতী হব কী করে, বলেই সে কেমন হতাশ মুখে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল। ভীষণ অভিমান সুবলের ওপর। কী দরকার ছিল ট্রেনে দেখা হওয়ার! কী দরকার ছিল পায়ে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দেবার! আমি বেশ তো মরে যাচ্ছিলাম। মরে যেতে আমার ভীষণ ভালো লাগছিল। সবার আগে মানুষের সব দুঃখ বুঝতে না বুঝতে চলে যেতাম তবে। তুমি কেন যে আমার শরীরে আবার প্রাণের সাড়া এনে দিলে! দিলে তো একেবারে ভালো করে দিলে না কেন। কখনও কখনও এত ভালো লাগে সবকিছু—আবার কখনও কেমন হতাশা। আমার কী আছে বল? ইন্দ্র আমার কাছে আসে দায়ে পড়ে। ও তো আমাকে ভালোবাসে না। আমার কিছু নেই। আমি এখনও বাচ্চা মেয়ে হয়ে আছি। ওর কেন আকর্ষণ থাকবে বল?
এভাবে কত সব ভাবনা এসে মাঝে মাঝে টুকুনকে ভীষণ অভিমানী করে রাখে—পাখিটাকে পাঠিয়ে দিতে পারছ না? সে আমার কত খবর নিয়ে যেত। আমার কত গল্পের বই আছে। সেখানে কতরকমভাবে সব মানুষ সমস্ত সৌরজগতের খবর নিয়ে বেড়াচ্ছে, আর তুমি তোমার পাখিটাকে পাঠিয়ে আমার খবরটুকু নিতে পারছ না!
টুকুন এখন দেখল ইন্দ্র আর নেই। এতবড় একটা সম্পত্তির ওপর ইন্দ্রের লোভটা সে কী করে যে টের পায়। ইন্দ্রের বাবা খুব খুশি। আগে এ বাড়িতে ওদের গলা সে কখনও শুনেছে মনে করতে পারে না এখন এ বাড়িতে ইন্দ্রকে নিয়ে আসায়—ওরা খুব আসে। বাবার মুখ দেখলে টের পায় টুকুন তিনি আর কাজে

কোনও উৎসাহ পাচ্ছেন না। চারপাশ থেকে বাবাকে কারা যেন অক্টোপাশের মতো গিলে খাচ্ছে। কখনও কখনও এমন হয়ে যায় যে টুকুন ইন্দ্রকে একদম সহ্য করতে পারে না। কিন্তু স্বভাবে টুকুন ভারী মধুর। সে রাগ করে কেন জানি কথা বলতে পারে না। রাগ করে কথা বলতে পারলে সে কবে ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দিত।

টুকুন বুঝতে পারে এভাবে একজন তরুণ বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। সে যখন খুব বিনয় করে বলে, আমি আসি টুকুন, আবার পরে আসব—তখন টুকুনের ভারী হাসি পায়। কেন যে মিথ্যা অভিনয় করছে ইন্দ্র! ওর বলতে ইচ্ছা হয়, তোমাকে আর কখনও আসতে হবে না। তুমি আমার কাছে এসে কোনও উৎসাহ পাও না। উৎসাহ না পেলে কিছুই জমে ওঠে না। যদি সুবলকে দ্যাখো, দেখবে সে যে কোথাকার সব রাজ্যের ফুল ফল পাখির খবর নিয়ে আসছে।

সুতরাং ইন্দ্র চলে গেলে ঘর ফাঁকা। মা এসে কিছুক্ষণ পাশে বসে থেকে গেছে। গীতামাসি আসবে নানারকমের খাবার নিয়ে। সে একটা দুটো খাবে, বাকিটা খাবে না। তারপর ওর যা কাজ, জানালায় বসে মালিদের বাগানের কাজ দেখা। প্রতিটি গাছ ওর এত চেনা যে, এখন ইচ্ছা করলে সে যেন বলে দিতে পারে কোথায় ক'টা নূতন কুঁড়ি মেলেছে, কখন ফুল ফুটবে, ক'টা ফুল ক'টা গাছে ফুটে রয়েছে। ম্যাগনোলিয়া গাছে দুটো ফুল ফুটেছিল কাল। সাতটা কুড়ি। তিনটা ফুটবে ফুটবে ভাব। আগামীকাল তিনটা ফুল ফুটবে। আগে এইসব ভালো জাতের ফুল তুলে এনে ওর ঘরে নীল রংয়ের ভাসে সাজিয়ে রাখত গীতামাসি। কিন্তু সে বারণ করেছে, ফুলেরা গাছে থাকলে বেশি ভালো লাগে। ওরা যে কীভাবে ফোটে! কখনও কখনও রাত জেগে দেখতে ইচ্ছা হয়। সে এভাবে আজ পর্যন্ত একটা ফুলের কাছাকাছি যেতে পারল না। ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারল না। কান্নায় ওর গলা বুজে আসে তখন।

সুবল এলে বুঝি সত্যি সত্যি সে এবার ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারত। শরীরে তার নানারকমের ঘ্রাণ, সুন্দর সুন্দর সব ইচ্ছারা খেলা করে বেড়াত। সুবল এলে এইসব ইচ্ছা কেন যে জেগে যায়। এবং সে তখন যেন ইচ্ছা করলে ছুটতে পারে।

সে বলল, গীতামাসি আমাকে ছোট্ট রাজপুত্রের বইটা দাও তো।

টুকুন 'বৈমানিকের ডায়রি'টা তুলে নিয়ে সেই ছোট্ট রাজপুত্রের গল্পটা পড়তে থাকল।

বৈমানিক লিখেছে, প্রতিদিন আমি তার গ্রহ, সেখান থেকে তার যাত্রা তার ভ্রমণ বিষয়ে খানিকটা করে জেনেছিলাম। এভাবে তৃতীয় দিনে বাওবাব গাছের গল্পটা জেনেছিলাম।

সেটাও আমার সেই ভেড়ার ছবি আঁকার কল্যাণেই জানতে পেরেছি।

কারণ দেখেছিলাম, ওর মুখে ছোট্ট সংশয়ের রেখা। সে যেন কী ভাবছে। কী যে ভাবছে আমি জানি না। চারপাশে বিরাট সাহারা, আমার কাছে আর পাঁচ দিনের মাত্র জল আছে। এর ভিতর উড়োজাহাজটাকে মেরামত করে নিতে না পারলে, আমি আর ফিরতে পারব না। আমার ছোট্ট বন্ধুটির সঙ্গে সারা মাস কাল বোধহয় এই মরুভূমিতেই ঘুরে মরতে হবে। আমি বললাম, কিছু বলবে?

—অনেকক্ষণ থেকে ভাবছি কিছু বলব, কিন্তু—

—কিন্তু কী?

—তুমি যে—ভাবে কাজ করে যাচ্ছ—

—হ্যাঁ কাজ করছি। না হলে দেশে ফেরা যাবে না।

—কিন্তু তুমি ঠিক জানো তো ভেড়ারা গুল্ম খায়?

—হ্যাঁ খায়।

—যাক বাঁচা গেল। কী যে ভাবনা হচ্ছিল!

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না সে এমন বলছে কেন! আবার ছোট্ট রাজপুত্রের ভারী গলায় প্রশ্ন—ওরা বাওবাব খায়?

আমি হেসেছিলাম। এমন একটা প্রাণ—সংশয়ের ভিতর আছি, আর সে কিনা এমন সব প্রশ্ন করছে—ভেবে অবাক, বললাম—বাওবাব তো গুল্মজাতীয় গাছ নয়। তুমি যদি একপাল হাতি নিয়ে যাও এবং তার ওপর তোমার ভেড়াটাকে চাপাও, তবু বাওবাবের পাতার নাগাল পাবে না।

—আঃ। ছোট্ট রাজপুত্রকে খুব যেন চিন্তিত দেখাল। তারপর খুব জোরে হেসে নিল, তুমি একটা কথা জানো না, সব গাছই বড় হবার আগে ছোট থাকে। ছোট্ট থেকে বড় হয়।

—তাহলে তুমি বাওবাবের চারাগাছের কথা বলছ?

ছোট্ট রাজপুত্র কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখল। আর একটা সংশয় যেন দানা বাঁধছে। প্রশ্ন করল, ভেড়া যদি গুল্ম খায় তাহলে বলতে হবে ফুলও খায়।

—ওরা যা পায় তাই খায়। আমাদের দেশে কথাই আছে, ছাগলে কী না খায়, পাগলে কিনা বলে!

—ছাগল ব্যাপারটা কী?

বুঝতে পারলাম ছোট্ট রাজপুত্র ছাগল ব্যাপারটা জানে না। আমি বললাম, সে এক রকমের ভেড়ার মতোই দেখতে জীব। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে আবার সংশয় ফুটে উঠছে। সে কিছু আবার প্রশ্ন করবে বুঝতে পারলাম।

—আচ্ছা যে ফুলের কাঁটা আছে—

—যে ফুলের কাঁটা আছে ওরা তাও খেয়ে নেবে।

তখন আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম বিমানের কাজে। একটা লোহার ডাণ্ডা ভিতরে ঢুকে গেছে! ওটাকে বের করতে না পারলে শান্তি নেই। জলও ক্রমে আমার কমে আসছে। খুব শঙ্কিত ছিলাম এজন্য। পাশে ছোট্ট রাজপুত্রের একের পর এক প্রশ্ন। আর আশ্চর্য, কোনও প্রশ্নের যতক্ষণ পর্যন্ত জবাব না পাবে—একনাগাড়ে সে তা জানতে চাইবে। মনে মনে কিছুটা বিরক্ত। যা মনে আসছে তাই আবোল—তাবোল কিছু বলে সান্ত্বনা দেবার মতো বললাম, কাঁটা দিয়ে কিছু হয় না। ওগুলো আমার মনে হয় ফুলগুলির দুষ্টুমি।

ছোট্ট রাজপুত্র বলল, ও। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কেমন ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, তোমার কথা মানি না। যা মনে আসছে বলে যাচ্ছ। ফুলেরা দুর্বল আর সরল বলে কাঁটা না থাকলে চলে না। ও—ভাবে কাঁটা আছে বলেই কারও কারও কাছে ওরা ভয়ানক।

কোনও জবাব দিচ্ছিলাম না। এতবড় একটা মরুভূমির মতো জায়গায় ছোট্ট রাজপুত্র আমার সঙ্গী। সে যদি আমাকে ফেলে চলে যায়—ভাবতেই গা—টা ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি ডাণ্ডাটা খোলার জন্য খুব জোরে হাতুড়ি মারলাম। একেবারে ওটাকে উপড়ে আনতে চাইছি।

ছোট্ট রাজপুত্র ফের বলল, তুমি কী ভাব ফুলেরা—

—না না, আমি কিছুই ভাবছি না। কেবল আবোল—তাবোল বকে যাচ্ছি। আমার মাথাটা ঠিক নেই। তা ছাড়া দেখছ না দরকারি কাজে ব্যস্ত।

ছোট্ট রাজপুত্র আমার দিকে ভারী বিস্ময়ের চোখে তাকাল। বলল দরকারি কাজ! সে কী জিনিস আবার?

আমি কিছু বললাম না। আমার কিছু ভালো লাগছিল না।

হাতের আঙুলে, হাতুড়িতে তেল—কালি মাখা। বেয়াড়া একটা যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে আছি সেই কখন থেকে। ছোট্ট রাজপুত্র আমায় কেবল এখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এবং বুঝতে পারছিলাম ভীষণ রেগে যাচ্ছে। সে ফের বলল, তুমি বড়দের মতো কথা বলছ।

আমি কিছু বলছি না। এমন কী তাকাচ্ছিও না।

সে বলল, তুমি সব ভুলে গেছ, গুলিয়ে ফেলছ।

ছোট্ট রাজপুত্র এভাবে চটে যাচ্ছে। সে কোনও ছোট গ্রহাণু থেকে পাখিদের ডানার মতো একরকম কীসব লাগিয়ে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে এসে এমন একটা বেরসিক লোকের দেখা পাবে

বোধহয় আশাই করতে পারেনি। ওর সোনালি চুলগুলি কী যে মাখনের মতো নরম, ওর চোখ কী যে নীল—সে আর যেন আমার এই অবহেলা মোটেই সহ্য করতে পারছে না।

সে এবার একনাগাড়ে বলে চলল, একটা গ্রহের কথা জানি আমি। সেখানে ঘন লাল রংয়ের একটা লোক থাকে। কখনও একটা ফুল শুঁকে দ্যাখেনি। সে কোনওদিন সাদা জ্যোৎস্নায় হেঁটে বেড়ায়নি, আকাশের তারা দ্যাখেনি, কাউকে সে ভালোবাসেনি। সে একটা যোগ অঙ্ক ছাড়া কিছুই করেনি। সারাদিন তোমার মতো বলত, আমি ভারী ব্যস্ত মানুষ। আর অহঙ্কারে পা পড়ত না। একটু থেমে ছোট্ট রাজপুত্র দুহাতে বালি ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, সে কী একটা মানুষ! সে তো একটা ব্যাঙের ছাতা!

—একটা কী? হাতের সব কাজ ফেলে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

—একটা ব্যাঙের ছাতা। রাগে ছোট্ট রাজপুত্র একেবারে সাদা হয়ে গেছে। ওর সোনালি চুল ছোট পাখির বাসার মতো বাতাসে যে কাঁপছে।

সে ক্রমান্বয়ে রাগে দুঃখে বলে চলল, লাখ লাখ বছর ধরে ফুলেরা কাঁটা তৈরি করছে। আর লাখ লাখ বছর ধরে ভেড়ারাও ফুল খেয়ে যাচ্ছে। যে কাঁটা কারুর কোনও কাজে আসে না, ফুলেরা তাই বানাতে গিয়ে এত কষ্ট করে কেন, সেটা জানা কী দরকারি নয়? এই যে লড়াই ফুলের সঙ্গে ফুলের কাঁটার, ভেড়ার সঙ্গে ফুলের—সেটা একটা যোগ অঙ্কের চেয়ে বেশি দরকার নয় জানার।

আর কথা বলতে পারছিল না ছোট্ট রাজপুত্র। কোনওরকমে ধীরে ধীরে বলছিল—কেউ যদি একটা ফুলকে ভালোবাসে, যে ফুল লক্ষ লক্ষ তারার ভিতর তাদেরই একটি হয়ে ফুটে আছে, এবং তখন যদি একটা ভেড়া ফুল খেয়ে ফেলে—আর যদি আকাশের তারারা সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় ভয়ে, তখন কী সেটা আমাদের জীবনে বড় সমস্যা নয়?

এবং এভাবে ছোট্ট রাজপুত্র আর কথা বলতে পারছিল না। হঠাৎ কেন যে ফুঁপিয়ে ওঠে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। রাত নেমে এসেছিল। যন্ত্রপাতি ফেলে এবার উঠে দাঁড়ালাম। এই মরুভূমির রুক্ষতা, সীমাহীন বালুরাশি, তৃষ্ণা, মৃত্যুভয়—সবই কেমন তুচ্ছ বলে মনে হল। কেন জানি মনে হল আমার গ্রহ এই পৃথিবীতে এক ছোট্ট রাজপুত্র চলে এসেছে—যার নিয়মকানুন সব আলাদা, যাকে আমায় সান্ত্বনা দিতে হবে। ওকে হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিলাম। একটা ফুলের মালার মতো হাতের ওপর দোলাতে লাগলাম। তাকে সান্ত্বনা দিলাম, যে ফুল ভালোবাস তুমি, তার কোনো বিপদ হয়নি। তোমার ভেড়ার একটা মুখ—ঢাকা এঁকে দেব। আর তোমার ফুলের জন্য একটা বর্ম। আর ভেবে পেলাম না ওর হয়ে আমি আর কী বলব। বুঝতে পারছিলাম না তাকে কীভাবে আর শান্ত করব। কী করে তার মান পাব। চোখের জলের রাজ্যটি সত্যি বড় রহস্যময়।

টুকুন বুঝতে পারল না এভাবে বইটি পড়তে পড়তে সে—ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেন। এ—ধরনের কান্না তার বুক বেয়ে কখনও উঠে আসেনি। সেই নির্বান্ধব ছেলেটি এখানে কোথায়! সে তার কাছে এলে যেন এখন বলতে পারত, আমরা এখানে থাকব না, সেই ছোট গ্রহাণুতে চলে যাব। তুমি আমি ছোট্ট রাজপুত্র একসঙ্গে থাকব। ওর ফুলকে পাহারা দেব।

এবং এভাবে টুকুন কখনও কখনও সন্ধ্যায় অথবা রাতে নিজের বিছানা থেকে বড় জানলা দিয়ে অন্ধকার আকাশ দেখতে থাকে। এবং সব উজ্জ্বল গ্রহ দেখতে দেখতে কোনও বিন্দুর মতো অনুজ্জ্বল কিছু দেখলেই মনে হয় বুঝি সেই গ্রহাণুতে ছোট্ট রাজপুত্র থাকে। সুবলকে নিয়ে সে যদি সেখানটায় যেতে পারত!

বার

সুবল সেদিন শেফালীবউদির কাছে ফিরে আসবে ভেবেছিল। সে গিয়ে যখন দেখল টুকুন দিদিমণি হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছে, তখন ওর আর কিছু ভালো লাগছিল না। কেউ তাকে আর কোনও খবরও

দিল না। সে দুবার চেষ্টা করেছে সেই সিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে। কিছুতেই সুবলের সঙ্গে সিস্টার দেখা করতে চায়নি।

তবু যা হয়ে থাকে, মনের ভিতর এক অসীম বিষণ্ণতা। সে যখন তার গ্রাম মাঠ ফেলে চলে আসছিল, তখন কী ভীষণ মায়া তার গ্রাম মাঠের জন্য। সে বারবার বলেছে, আমি আবার ফিরে আসব মা সুবচনি। সুবচনি দেবী ওদের খুব জাগ্রত দেবতা। তার যতদূর মনে আছে, বাবা—মা ওর কী একটা অসুখে একবার সেই দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়েছিল। সে সেই পূজা দেখেছিল, না অন্য মানুষের মুখে শুনে শুনে সে তার বাবা—মার সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে রেখেছে, এখন আর মনে করতে পারে না।

সুবল জানত না এই শহরে এসে সে এক আশ্চর্য মায়ায় জড়িয়ে পড়বে। এতবড় শহরে কী করে যে টুকুনদিদিমণি তার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেল! এখন নিজের ওপরেই তার রাগ হচ্ছে। সে যদি দেবদারু গাছটার নীচেই আস্তানা গেড়ে নিত! কিন্তু ওর কী যে হয়ে গেল, বেশি পয়সার লোভে সে অন্য ব্যবসা করতে গিয়েই মরেছে। সে সময় কম পেত। আগের মতো খুশিমতো দুজোড়া জুতো পালিশ করে গাছের নীচে ঘুমিয়ে যেতে পারত না। এখন কেন জানি ঘুমিয়ে পড়লেই মনে হয় কেউ তার সবকিছু চুরি করে নিয়ে যাবে। তার এমন কিছু হয়েছে, যা চুরি যাবার ভয়। তার আর আগের মতো কোনও স্বাধীনতা নেই। সে বুঝতে পারে, এইসব শহরে এলেই মানুষের স্বাধীনতা চুরি যায়।

সে যখন শেফালীবউদির ওখানে ফিরল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। সে ইচ্ছা করলে ফুটপাথে রাত কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কেন জানি সে আজ খুব পরিষ্কার হয়ে গেছিল, এমনকি সঙ্গে সে পাখিটাকে নিয়ে যায়নি। তার হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়েছিল, পাখিটাকে খাওয়ানো হয়নি। নানা কারণেই সে ফিরে না এসে পারেনি। আর এমন পরিচ্ছন্ন পোশাকে ফুটপাথে রাত কাটাতেও কেমন খারাপ লাগছিল।

শেফালী সুবলের মুখ দেখেই বুঝল, টুকুনের সঙ্গে সুবলের কিছু একটা হয়েছে।

সে বলল, মুখ গোমড়া কেন রাজা?

—তোমার কাছে থাকব বউদি আজ। দাদা এখনও ফেরেনি?

—না। একটু থেমে বলল, সিস্টার আবার বুঝি ধমক দিয়েছে?

সে জবাব দিল না কিছু। গলায় সুবলের মাফলার জড়ানো স্বভাব। সে তার গ্রামে দেখেছে, কেউ বাবুবনে গেলে গলায় একটা কমফর্টার জড়িয়ে রাখে। সে—ও আজ গলায় একটা কমফর্টার জড়িয়ে গিয়েছিল। সে সেটা একটা দড়িতে ঝুলিয়ে ঝুড়ির ভিতর থেকে পাখিটাকে বের করল। সে পাখিটার জন্য ইচ্ছা করলে একটা খাঁচা কিনতে পারে। কিন্তু খাঁচায় পাখি রাখার ইচ্ছা সুবলের হয় না। পাখি সেই যে কবে বাঁশের চোঙে আশ্রয় নিয়েছিল, আর সে অন্য আশ্রয়ে যেতে চায়নি। সে বলল, পাখি তোর টুকুনদিদিমণি চলে গেছে।

পাখি পাখা নাড়ল। যেন বলতে চাইল, কোথায়?

—জানি না।

শেফালীর ঘুম পাচ্ছিল। সুবল কিছু খাবে হয়তো। ওকে জল—নুন দিতে হবে। বাকিটা সুবল নিজের কাছে রাখে। ছোলার ছাতু, লংকা একটু চাটনি। সে একটা থালায় এসব রেখে শেফালীবউদিকে হয়তো বলবে এক গেলাস জল দাও তো বউদি, খেয়েনি।

কিন্তু আজ সে—সব কিছুই করল না সুবল। বরং পাখিটাকে খাওয়াল। তারপর পাখিটার সঙ্গে কী যেন ফিস ফিস করে বলল, এবং এক সময় মনে হল, ওর টুকুনদিদিমণিকে খুঁজতে যাওয়া দরকার। সে শেফালীবউদিকে বলল, একটু কষ্ট করতে হবে। আমার যা কিছু—এই যেমন কড়াই, চিনেবাদাম, ছোলা—মটর সব এখানে কিছুদিনের জন্য থাকল। কবে ফিরব ঠিক নেই। পাখিটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

—দেশে যাচ্ছ নাকি? অবাক চোখে তাকাল শেফালী।

—দেশে আমার কেউ নেই। আমাদের কেউ নেই। তবে স্বপ্ন দেখেছি একদিন জনার্দন চক্রবর্তী দেবীর মন্দিরের বাইরে একটা হরিণকে ধরার জন্য ছুটছে। কী যে স্বপ্ন! স্বপ্নটার কোনও মানে হয় না।

—কিন্তু এত রাতে? কিছু খেলে না। তুমি কী পাগল!

সুবল হাসল। সুবলের লম্বা পাজামা, লম্বা পাঞ্জাবি গেরুয়া রংয়ের এবং সন্ন্যাসীর মতো মুখ শেফালীকে কেমন কাতর করছে। সে বলল, খেলে না। টুকুনের কাছে গেলে—দেখা হল কিনা বললে না। সিস্টার কী বলল বললে না। কী হয়েছে তোমার?

—টুকুনদিদিমণি হাসপাতাল থেকে চলে গেছে।

—তাহলে দেখা হয়নি?

—না।

এক আশ্চর্য বিষণ্ণতা ধরা পড়ছে সুবলের চোখে মুখে। অথবা দেখলে মনে হয় সুবল মনে মনে কিছু স্থির করে ফেলেছে। তাকে এখন শেফালী কিছুতেই আটকে রাখতে পারবে না। শেফালী তবু বলল, কিছু খেলে না!

—কিছু খেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

—তুমি তো দেখছি শহরের মানুষের মতো হয়ে যাচ্ছ।

সুবল চোখ তুলে তাকাল।

—তোমার তো এমন হওয়া উচিত না রাজা।

সুবল কিছু বলল না। সুবলের যেমন স্বভাব কথার ঠিক জবাব দিতে না পারলে একটু হেসে ফেলা, তেমনি সে হেসে দিল।

এই হাসিটুকু ভারী সুন্দর। এমনভাবে হাসলে বড় বেশি সরল মনে হয়। তখন ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হয়। আদর করতে ইচ্ছা হয়। এত যে মনের ভিতর তার অশান্তি—কেমন নিমেষে উড়ে যায়। তার মানুষ ঘরে থাকে না। মানুষটা সংসার চালাবার নামে কোথায় থাকে, কোথায় যায় সে বলতে পারে না। এবং মদ্যপানে মানুষটা কখনও অমানুষ হয়ে গেলে শহরের সব দুঃখ একসঙ্গে ধরা যায়। তখন সুবলের মতো একজন সরল গ্রাম্য বালকের সঙ্গ পেতে বড় ভালো লাগে।

শেফালী বলল, তুমি রাজা আজ কোথাও যেতে পারবে না।

সুবল দেখল শেফালীবউদির চোখে ভীষণ মায়া। ভীষণ এক টান। এবং এই শহর, নির্বান্ধব শহরে সে কেন জানি আর না করতে পারে না।

শেফালী বলল, আমি কটা গরম রুটি সেঁকে দিচ্ছি। একটু আলুর তরকারি। বেশ খেতে ভালো লাগবে।

সুবল বলল, তুমি আমার জন্য এত রাতে এসব করবে?

—বাঃ করব না! তোমার দাদা এসে যদি জানতে পারে রাজা রাতে না খেয়ে বের হয়ে গেছে, তবে আমাকে আস্ত রাখবে!

সুবল বুঝতে পারে এই শহরের কোথাও নানা ভাবে নানা বর্ণের দুঃখ জেগে আছে। এই সংসারে এমন এক দুঃখ। অভাব—অনটনের সংসারে একটা মানুষ সবসময় কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে! কেমন একটা পালিয়ে বেড়ানোর স্বভাব অজিতদার। কোথায় যে এই মানুষের আস্তানা সে সঠিক জানে না। খুব কম সময় সে অজিতদাকে এখানে দেখেছে। এবং শেফালীবউদির চোখ দেখে মনে হয়েছে সে—ও সঠিক ঠিকানা অজিতদার জানে না। ওর মনে হল টুকুনদিদিমণির সঙ্গে অজিতদার সঠিক ঠিকানাটাও সে খুঁজে বের করবে। সে বলল, দাও তবে। আজ আর বের হচ্ছি না। যখন বললে, তখন আজ রাতটা এখানেই কাটানো যাক।

সুবল কেমন স্মার্ট গলায় এখন কথাবার্তা বলছে। সে দেখল বারান্দায় উনুনে বউদি আঁচ দিচ্ছে। এবং বউদিকে দেখে মনে হচ্ছিল কিছুদিন থেকে দাদার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার অভাব হচ্ছে। অথবা বউদির এমন একটা জায়গা ভালো লাগছে না। কারণ বউদি খুব পরিপাটি এবং সেজেগুজে থাকতে ভালোবাসে।

অজিতদার খুব ইচ্ছা বউদির জন্য সে যাবতীয় কিছু করবে। এতসব অট্টালিকা এই শহরে, বউদির জন্য এমন একটা অট্টালিকা চাই। এবং যখন সে নানাভাবে চেষ্টা করেও কোনওরকমে একটু সুন্দরভাবে বাঁচবার

মতো ব্যবস্থা করতে পারে না, তখন কেমন হীনমন্যতায় ভোগে। এবং এভাবে সংসারে অশান্তি নেমে এলে মনে হয় শেফালীবউদিকে অজিতদা কোথা থেকে যেন চুরি করে নিয়ে এসেছে। অনেক কিছুর প্রলোভনে শেফালীবউদি সবকিছু পিছনে ফেলে চলে এসেছিল। বউদি কতদিন কতভাবে তাকে নানারকম সব গল্প শুনিয়েছে। এবং আজকের এই রাতে খাওয়া একটা বেখাপ্পা ঘটনা। ওর সঙ্কোচ হচ্ছিল।

শেফালী বলল, বেশ গরম পড়েছে। চান করে নাও।

কলতলা খোলা। সেখানে সে পাজামা খুলে চান করতে পারে না। এবং শরীরে সব অস্পষ্ট জলের রেখা চারপাশে ভেসে উঠেছে। সে ছুঁলেই বুঝতে পারে নরম, খুব নরম ত্বকে বাবুইয়ের বাসার মতো গুচ্ছ গুচ্ছ কীসব ভেসে উঠেছে। এবং এভাবে ওর এক লজ্জা নিবারণের কথা মনে হয়। সে বলল, বউদি আমি বরং রাস্তার কল থেকে স্নান করে আসি।

শেফালী বলল, এত রাতে রাস্তার কলে চান করলে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।

পুলিশকে বড় ভয় সুবলের। সে বলল, আমি বরং হাত—মুখ ধুয়েনি।

শেফালী বলল, রাস্তায় গাছের নীচে শুয়ে থাকলে এত গরম লাগে না রাজা।

ঘরে শুলে ভীষণ গরম। চান না করে নিলে ঘুমোতে পারবে না।

—তাহলে আমি যখন চান করব, তুমি কিন্তু তাকাবে না।

—তাকালে কী হবে? শেফালী হেসে দিল।

সুবল বলল, আমি বড় হয়ে গেছি বউদি। বলেই সে কেমন ছেলেমানুষের মতো লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখল।

—আমার বড় তোয়ালে—ওটা পরে নাও।

—তোমাদের অসুবিধা হবে না? অজিতদা খারাপ ভাবতে পারে।

সুবল আর কিছু না বলে বেশ বড় একটা তোয়ালে নিয়ে নিল। সংসারে অজিতদার যা কিছু রোজগার সব শৌখিনতার জন্য। সুবল এতসব সুন্দরভাবে ভাবতে পারে না। তবু যখন তোয়ালেতে এক মনোরম গন্ধ, সে তোয়ালেটা মুখে নিয়ে কেমন ঘ্রাণ নিতে থাকল। এমন রঙবেরঙের তোয়ালে নিশ্চয়ই বউদির। সে ঠিক টুকুনদিদিমণির মতো এক আশ্চর্য সুবাস পায় বউদির শরীরে। আর কেন জানি সুবলের মনে হয় এই শহরে, সে যতবার যতভাবে যুবতী মেয়েদের অথবা ফ্রকপরা মেয়েদের সান্নিধ্যে এসেছে, কেমন এক ফুলের সুবাস সবার গায়ে। সে ভাবল, সে যখন ফুল বিক্রি করবে তার শরীরেও এমন একটা মিষ্টি গন্ধ থাকবে।

শেফালীবউদির চটপট সব হয়ে যায়। সুবল গড়িমসি করছিল খুব। ওর তো এমনভাবে বাঁচার স্বভাব নয়। এ যেন আলাদা ব্যাপার। সে একটা আলাদা স্বাদ পাচ্ছে। খুব নিরিবিলি একটা ঘরে, বউদি, বউদির রান্না, ঝালের গন্ধ, এবং আলোর ভিতর বউদির কপালে ঘামের চিহ্ন কেমন এক আকর্ষণ তৈরি করছে। সে সুবল, সংসারের নিয়ম—কানুন সঠিক তার জানা নেই, সে জানে না, এভাবে কোনও যুবতী বালককে রেঁধে—বেড়ে খাওয়াতে পারে, সে ভারী এক রহস্যের স্বাদ পেয়ে যাচ্ছে, সে বলল, বউদি এখানে এলে আমার আর যেতে ইচ্ছা হয় না। অজিতদা যে কী করে তোমাকে ফেলে এতদিন নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে বুঝতে পারি না।

শেফালী বলল, তুমি থেকে যাও না রাজা।

—আমার যে বউদি টুকুনদিদিমণির কাছে যেতে হবে।

—কে যে এক টুকুনদিদিমণি তোমার।

—না, খুব ভালো। আমাকে দেখলেই দিদিমণির প্রাণে যেন জল আসে।

—তুমি ঐ ভেবেই সুখে থাক।

সুবল বলল, আমি যখন ফুল বিক্রি করব তখন একটা করে ফুলের গুচ্ছ দিদিমণিকে দিয়ে আসব।

—তুমি ওকে কোথায় পাবে?

—কেন, এই শহরে।

—সে কী খুব ছোট ব্যাপার?

—আমি যখন ফুল নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করব তখন আমার ডাক শুনলে ঠিক দিদিমণি টের পাবে। জানালা খুলে দিলে আমাকে চিনতে পারবে।

আমি বলব, দিদিমণি তোমার ফুল।

শেফালী এই সরলতার জন্য কেমন মুগ্ধ হয়ে যায়। সে বলল, তুমি দাঁড়াও রাজা। ঝোলটা হয়ে গেলে তোমাকে জল পাম্প করে দেব।

শেফালী জল পাম্প করে কেমন ছেলেমানুষের মতো বলল, রাজা তুমি সাবান মাখ না কেন?

—সাবান কোথায় পাব?

—আমি তোমাকে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছি। আমাকে তোমার দাদা পামঅলিভ কিনে দেয়।

—আমার গায়ে মেখে দিলে তোমার শরীরের মতো গন্ধটা হবে?

—হ্যাঁ। ঠিক আমার শরীরে তুমি স্নান করে এলে, যেমন গন্ধ পাও ঠিক তেমনি।

—তবে দাও। খুব সুন্দর গন্ধ শরীরে থাকলে আমার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে ভালো লাগে।

—শেফালী ছুটে ছুটে কাজ করছিল। ওর যেন এটা একটা খেলা হয়ে গেছে। সুবলকে নিয়ে খেলা। সুবল কলের নীচে বসে আছে। সুবলের পিঠে শেফালী সাবান মাখিয়ে দিচ্ছে। বড় নরম শরীর সুবলের। ওর ঘন চুল কী কালো। কপাল প্রায় যেন ঢাকা। লম্বা ভুরু। চোখ ভাসা, এবং পদ্মফুলের মতো জলের ওপর যেন গাছের ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে।

কী যে ভালো লাগছিল শেফালীর—এমনভাবে সাবান মাখিয়ে দিতে! ওর শরীরের ভিতর এক আশ্চর্য অহঙ্কার আছে, শেফালী কেমন পাগলের মতো ওর শরীর নিয়ে, ঠিক একটা ছোট্ট পাখির মতো ওর অহঙ্কার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সুবল বলছে, বউদি ঠিক আছে, এবার বাকিটা আমি ঠিক পারব।

—না, তুমি পারবে না রাজা। তুমি কিছু জানো না।

—জানি, ঠিক জানি। দাও, দ্যাখো কী করে মাখতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি। তুমি এমন করছ, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

কিন্তু শেফালী আজও আশা করেছিল, অজিত ফিরে আসবে, কিন্তু যা খবর পাঠিয়েছে ওর মানুষ দিয়ে, অজিত কবে আসবে ঠিক নেই, কবে আসতে পারবে সে বলতে পারবে না। কিছু টাকা পাঠিয়েছে। ভীষণ হতাশা ছিল মুখে। এই সুবল এখন সব আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে নতুন বাতির মতো। —তোমার শরীরে রাজা কী ময়লা, বলেই সে বগল তুলে ঘষে দিতে দেখল, কালো মসৃণ ছোট সুন্দর সব চুলের গুচ্ছ—ঠিক কলমি ফুলের মতো রং। ঠিক কালো নয়, কিছুটা তামাটে রং। সুবলের কেমন কাতুকুতু লাগছিল। সে হো হো করে হাসতে থাকল।

শেফালী বলল, তুমি এমন বড় হয়ে গেছ আগে বলোনি কেন রাজা?

সুবল কোনও জবাব দিতে পারল না। একেবারে চুপ মেরে গেল। সত্যি ওর ভীষণ খারাপ লাগছিল। এবং ভয়ে ক্রমে গুটিয়ে যাচ্ছিল।

এভাবে হৃদয়ের কাছাকাছি থাকার যে বাসনা মানুষের, মানুষ যার টানে বড় রকমের কঠিন কিছু করতে পারে না, এবং এভাবে সুবলের ব্যথিত মুখ দেখে শেফালী কেমন থমকে গেল। বলল, তুমি এমন দুঃখ পাবে জানতাম না।

সুবলের ভিতর এক পাপবোধ এভাবে জন্ম নিলে—এই শহরের গ্লানিকর সব ছবি তাকে তাড়া করে বেড়াতে থাকে। ওর মনে হল, সকাল হলেই সে ফুলের সন্ধানে চলে যাবে।

সঙ্গে থাকবে পাখিটা। যা সামান্য সম্বল আছে এই দিয়ে সে এই শহরের বড় রকমের পাপখণ্ডনের নিমিত্ত আবার রাস্তায় নেমে গেল। সেই যে এক দেশ, যে দেশে সে জন্মেছে, কী যে পাপ ছিল, টুকুনদিদিমণির

এমন অসুখ!

সে নানাভাবে ফুলের সন্ধান করে বেড়াল। বই—পাড়ার কাছে খুব বড় ফুলের দোকান আছে। সেখানে সন্ধান নিয়ে সে জেনেছে, কিছুদূর ট্রেনে গেলে, একজন মানুষ আছে। মাঠে তার কেবল ফুলের চাষ। সে রজনিগন্ধার চাষ করতেই বেশি পছন্দ করে। ওর কেন জানি মনে হল, এই পৃথিবীতে একমাত্র সেই লোকটির সঙ্গেই তার এখন বন্ধুত্ব হতে পারে।

সুবল লোকটার সন্ধানে চলে গেল।

একটা নীল রঙের ট্রেনে চড়ে একটা সাদা রংয়ের স্টেশনে সে নেমে পড়ল। যে লোকটা নীলবাতি নিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে তার কাছেই খবর পেল—লোকটি একটা ভাঙা কুটিরে থাকে। ওর সম্বল একটা লণ্ঠন। সে তার দুই বিঘা জমিতে নানারকমের ফুলের চাষ করে থাকে। বেলফুলের জন্য আছে কাঠা চারেক ভুঁই। রজনিগন্ধার জন্য আছে কাঠা দশেক। গাঁদাফুল এবং অন্য মরশুমি ফুলের চাষের জন্য সে রেখেছে বাকি জমিটা।

তার বাড়ি যেতে হলে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। সে গেলেই একটা ফুলের গুচ্ছ এনে তুলে দেবে। সেখান থেকে তোমার খুশিমতো ফুল পছন্দ করে কিনে আনবে। গুচ্ছের ভিতর সে সব সময় তাজা এবং ভালো ফুলগুলো রাখে। ওর মুখে লম্বা সাদা দাড়ি। ভীষণ কালো রং মানুষটার। সে একটা লুঙ্গি পরে। মাথায় তার একটা ফেজ টুপি। মানুষটা ধার্মিক। পাঁচ বেলা নামাজ। আর ফুল ফোটানো তার কাজ। পৃথিবীতে অন্য কাজ আছে বলে সে জানে না।

মানুষটার আবার ভীষণ বাতিক। সে যে জমি থেকে মৃতের জন্য ফুলের তোড়া তৈরি করে, সেই জমি থেকে কখনও ফুলশয্যার মালা গাঁথে না। সুবল লোকটির পরিচয় পেয়ে খুব খুশি। সুবল বলল, আমার খুব ইচ্ছা ফুলের চাষ করি তোমার মতো।

—ফুলের চাষ কোর না। দুঃখ পাবে।

সুবল বলল, দুঃখ মানুষের জন্য। মানুষটার কাছে এসে সুবল তার মতো ধার্মিক কথাবার্তা বলতে পেরে আনন্দ পাচ্ছে।

—তা হলে এই বয়সে সুখ—দুঃখ নিয়ে তোমার ভাবনা আছে?

—ভাবনা কী নিয়ে ঠিক জানি না বুড়োকর্তা। তবে এটুকু মনে হয়েছে, তুমি খুব আনন্দে আছো। তুমি শহরে যাও না?

—শহরে কোনওদিন যাইনি। আগে ফুলের চাষ করতাম নেশার জন্য। এখন এটা পেশা হয়ে গিয়ে ভালোই হয়েছে। শুনেছি আমার ফুলের খুব সুনাম বাজারে। মানুষেরা মরে গেলে শুনেছি আমার ফুল তাদের চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপারটা ভাবতে খুব আনন্দ পাই।

—সুন্দর সুন্দর বউরা শুনেছি বিকেলে ছাদে ঘুরে বেড়ায়। তাদের খোঁপায় আমার এই সব বেলফুলের মালা জড়ানো থাকে! বুড়ো মানুষটি সুবলকে এমনও বলল।

সুবল বলল, তুমি আনন্দেই আছো। ফুল বিক্রি করাও খুব আনন্দের। আমার তো তেমন পয়সা নেই।

বুড়ো লোকটি বলল, আমার কাছে একদিনের ধারে পেতে পারো। তার বেশি নয়।

—কিন্তু আমার ঠিকানা নেই।

—ঠিকানা! মানুষটা ঠিকানার কথা বলতেই কেমন চোখ বড় বড় করে ফেলল। মানুষের কোনও আবার ঠিকানা থাকে নাকি?

—থাকে না? এই যে তোমার ঠিকানা, ফুলের মাঠ, একটা সবুজ কুটির এবং নদীর ধারে বড় রাস্তা।

লোকটি বলল, অঃ। এই ঠিকানার কোনও দাম নেই। আমি তোমার ঠিকানা চাই না। তুমি তো একদিনের জন্য ধার নেবে। বাকিটা তো আমার ওপর।

যাই হোক, সুবল লোকটির কাছে অনেক বেলফুল চাইল।

লোকটি বলল, এসো।

সুবল লোকটির সঙ্গে হাঁটতে থাকল।

বেলফুলের জমিতে এসে বলল, তুমি এই এই গাছ, বুড়ো এক দুই করে গাছের নম্বর বলে গেল, এগুলো তোমার। তুমি এসব গাছ থেকে ফুল নেবে। বলেই সে সুবলের মুখে কী দেখল। বলল, দাম অর্ধেক হয়ে যাবে। গাছের সেবা—যত্নের ভার নিলে, ফুলের দাম কমে যায়।

সুবল অর্ধেক দামেই ফুলের বন্দোবস্ত নিল।

সুবল খুব সকালে আসত। গাছে জল দিত। গাছগুলোর গোড়া খুঁচিয়ে দিত নিড়িকাচি দিয়ে। নদীতে স্নান করত। জোয়ারে জল থাকত খুব নদীতে। সে জল বয়ে আনত নদী থেকে। মাটিগুলো টেনে গেলে অথবা গোড়া শক্ত হয়ে গেলে, সুবলকে খুব চিন্তিত দেখাত। অথবা পোকা লাগলে সে কী করবে ভেবে পেত না। বুড়ো মানুষটা তখন নানারকমের শুকনো পাতা সংগ্রহ করত বন থেকে। শুকনো নিমপাতা অথবা কচুরিপানা। সব সে আগুন জ্বেলে একরকমের ছাই সংগ্রহ করত। ছাই ছড়িয়ে দিত গাছে গাছে পাতায় পাতায়।

আর সকাল হলেই সুবল দেখতে পেত ঝোড়ো হাওয়ায় পাতা থেকে সব ছাই উড়ে গেছে। পোকামাকড় সব মরে গাছের নীচে পড়ে গেছে। পাতাগুলো গাছের কেমন সবুজ হয়ে গেছে। আর কী আশ্চর্য সাদা রংয়ের ফুল—চারপাশে গন্ধে ভীষণ আকুল করছে। এমন একটা ফুলের মাঠে দাঁড়ালে কোথাও দুঃখ আছে বোঝা যায় না।

এই কুটিরের পাশেই সুবল আর একটা কুটিরে বানিয়ে নিয়েছে। সে নদী থেকে মাটি কেটে এনেছে। বুড়ো মানুষটা তাকে সাহায্য করেছে নানাভাবে। এতদিন একা থেকে বুড়ো মানুষটার একরকমের স্বভাব হয়ে গিয়েছিল—মানুষ কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। আর যেসব ফুলের দালালরা আসত, ভারী খারাপ লোক। নানাভাবে তাকে ঠকাত। একমাত্র সুবল এক মানুষ, কেমন সরল, এবং ঠকানো কাকে বলে জানে না। সে আসার পর তার চাষ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। এবং সময়মতো আজকাল বর্ষা আসে। ভালো ভালো ফুল হয়। গোলাপগুলো কী যে বড় হয়ে ফুটছে। গোলাপ চাষের ভার এখন সুবলের উপর। ছেলেটা ভারী পয়া। যেন সুবল বললে সব তার নামেই লিখে দেবে।

এই লোকটিকে দেখে সুবলের কখনও কখনও জনার্দন চক্রবর্তীর কথা মনে হয়। খুব দাম্ভিক, কিছুতেই হার মানবে না প্রকৃতির কাছে। এই মানুষেরও একটা তেমন অহঙ্কার আছে। তার মতো ফুলের চাষ এ—তল্লাটে কেউ জানে না। সে ফুলের চাষ করে যা উদ্বৃত্ত হয়েছে, একটা মসজিদ বানিয়েছে। সে সেখানে মাঝে মাঝে গরিব মানুষের জন্য শিরনি দেয়। তার স্বভাব উলটো। একটা ইঁদারা করে দিয়েছে। সে এসবের ভিতরেই ধর্মকে খুঁজে বেড়ায়। এবং সুবল এখানে আসার পর সে একটু যেন হাতে সময় পেয়েছে। মাঝে মাঝে চারপাশে যখন তার অজস্র গোলাপ, তখন সে একটা বড় লম্বা মানুষ হয়ে যায়। ওকে একটা ফুলের বনে ফেরেস্তার মতো মনে হয়।

একদিন সকালে উঠে বুড়ো মানুষটা দেখল, সুবল ঘরের দাওয়ায় চুপচাপ বসে আছে। পাখিটা খুব ওকে জ্বালাচ্ছে। সে মাত্র নামাজ পড়ে এদিকে এসেছে সুবলকে বলতে, যেন সুবল গোলাপের দালালি করার লোকটা এলে ভাগিয়ে দেয়। এবার থেকে সব ফুল সে সুবলকে দিয়ে দেবে। গোরুর গাড়িতে সুন্দর করে স্তবকে স্তবকে কলাপাতায় মোড়া ফুলের গুচ্ছ। শেষ—রাত থেকে উঠে তুলে ফেলতে হয়। সকাল সকাল স্টেশনে ওগুলো চালান দিতে হয়। রোজ ফুল যায় না। একদিন অন্তর একদিন। কিন্তু সে এসে সুবলকে এমনভাবে বসে থাকতে দেখবে ভাবতে পারেনি।

বুড়ো লোকটা কাছে গিয়ে বলল, তোর আজকাল ফিরতে এত রাত হয় কেন রে?

সুবল তাকাল। খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

বুড়ো মানুষটা এমন একটা মুখ মাঝে মাঝেই সুবলের দেখেছে। চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছে, ফুলের কুঁড়ি বেছে নিচ্ছে সুবল, সাতটা কথা বললে একটা কথার জবাব দিচ্ছে। বুড়ো লোকটা এবার কেমন খেপে গেল, বলল, সুবল ফুলের মাঠে কেউ দুঃখ নিয়ে বাঁচলে আমার ভালো লাগে না।

—দুঃখটা তুমি কর্তা কোথায় দেখলে?

—সকালে এমন মুখে বসে আছিস কেন?

—তুমি জানো না কর্তা, আমি কতদিন থেকে তাকে খুঁজছি।

বুড়ো লোকটা বুঝতে না পেরে বলল, সে সবাই খোঁজে, কেউ পায় না। আমিও তো তাকে খুঁজছি। পাচ্ছি কোথায়?

সুবল বলল, তুমি বুড়োকর্তা এমন কোনও মেয়ে দেখেছ, কেবল যার অসুখ? অসুখ ছাড়ে না। দাঁড়াতে পারে না, হাঁটতে পারে না। কেবল শুয়ে থাকে। মুখটা তার বেলফুলের মতো সাদা।

বুড়োকর্তা হা হা করে হেসে উঠল। বলল, মেয়েই দেখিনি জীবনে। তার আবার অসুখ, তার আবার ভালো থাকা! আর তাই নিয়ে তুই মুখ গোমড়া করে রেখেছিস!

সুবল বুড়োকর্তার দুঃখটা কোথায় ধরতে পারে। এমন একজন কুৎসিত মানুষকে, কেউ হয়তো ভালোবাসেনি। যখন ঘরে বিবি আনার বয়স ছিল, তার পয়সা ছিল না, তার মুখের চেহারাতে আছে নৃশংস এক ছবি। নিষ্ঠুর মুখচোখ দেখলে কেউ কাছে আসতে সাহস পায় না।

কেবল সুবল জানে—কী কোমল ধর্মপ্রাণ মানুষটি। সে বলল, আমি ভেবেছিলাম, তাকে খুঁজে ঠিক বের করব। তার খুব অসুখ। আমাকে দেখলে ও খুব খুশি হয়।

অথবা তার যেমন ধারণা। সে গেলেই টুকুনদিদিমণি ভালো হয়ে যাবে। এমন এক সরল বিশ্বাস টুকুনের চোখ—মুখ দেখে তার গড়ে উঠেছে বুঝি। সে তো কখনও টেরই পায় না টুকুনদিদিমণি অসুস্থ। সে গেলে জানলা পর্যন্ত হেঁটে আসতে পারে। কত কথা। টুকুনকে নিয়ে সে কত কথা। টুকুনকে নিয়ে সে সারা বিকেলে শুধু গল্প আর গল্প। এবং এভাবেই মানুষের মনে অজান্তে এক অহঙ্কার গড়ে ওঠে। সে জনার্দন চক্রবর্তীর মতো রুক্ষ মাঠে বান ডাকাবার চেষ্টা করছে।

বুড়োকর্তা বলল, তুমি পাবে। তাঁকে ঠিক খুঁজে পাবে। ভালো মানুষেরা তাঁকে একদিন খুঁজে পায়।

সুবল বুঝতে পারল বুড়োকর্তা ঈশ্বরের কথা বলছেন। সে আর বুড়োকর্তাকে ঘাঁটাল না! ঈশ্বর—বিশ্বাসেরই মতোই ওর ধারণা, সে একদিন না একদিন টুকুনদিদিমণিকে ঠিক জানালায় আবিষ্কার করে ফেলবে।

তের

টুকুনকে নিয়ে সুরেশবাবু আবার একটা কষ্টের ভিতর পড়ে গেছেন। শুধু এখন শুয়ে থাকে আবার। মাঝে একটু ভালো হলে সুরেশবাবু টুকুনকে নিয়ে একটা স্পেস অডিসি দেখে এসেছেন। টুকুন স্পেস অডিসি দেখার পর কেমন সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে ফেলেছে হাজার লক্ষ কোটি গ্রহ—নক্ষত্রের ভিতর দিয়ে যখন মহাযানটি ছুটছিল, তখন নিশ্চয়ই তার পাশে ছিল ছোট্ট রাজপুত্রের গ্রহাণু। অথবা সেই যে এক বাতিয়ালা ছিল এক ছোট গ্রহাণুতে তার কথাও মনে পড়ছে। তার গ্রহাণুর পাশ দিয়ে যাবার সময় মহাযানটি নিশ্চয়ই উঁকি মেরে দেখেছে, বাতিয়ালা সন্ধ্যা হলেই গ্যাসের একটা বাতি জ্বেলে দিচ্ছে।

সুরেশবাবুও মনে মনে সেই পাখিয়ালাকে খুঁজছেন। তাঁর দৈবে এখনও বিশ্বাস আছে। ডাক্তারবাবু পর্যন্ত মত দিয়েছিলেন। কেবল টুকুনের মার জন্য সিস্টারকে ঠিকানা দেওয়া গেল না। তিনি তিন— চারদিন আগে সিস্টারকে ফোন করেছিলেন পাখিয়ালা এসেছিল কিনা আর? সিস্টার বলে দিয়েছিল—না।

টুকুন এখন আর কিছু বলে না। সে ছোট্ট রাজপুত্রের বইটাই বারবার আজকাল পড়ছে। স্পেস অডিসি দেখার পর এই গ্রহ—নক্ষত্র—সৌরজগৎ অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা ধারণা মনের ভিতর গড়ে উঠল—বেঁচে থাকা এই গ্রহে বড় অকিঞ্চিৎকর ঘটনা—অথবা টুকুনের মনে হয় সে কত অপ্রয়োজনীয় এই

সৌরমণ্ডলের ভিতর। অন্তত ছোট রাজপুত্রের মতো বাঁচারও একটা মানে ছিল। তার ছিল তিনটে আগ্নেয়গিরি, ছ'টা পাহাড়, দুটো নদী, একটা হ্রদ, একটা সমুদ্র। সে আসার আগে সমুদ্রের ওপরটা বাওবাবের পাতায় ঢেকে দিয়েছিল, সে গ্রহাণু থেকে বিদায় নেবার সময় আগ্নেয়গিরির মুখগুলো হাঁড়ি দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল। নদীর জল কলাপাতায় ঢাকা। এবং ক'টা বাওবাবের চারা ছিল, সব উপড়ে ফেলেছিল। কিন্তু পরিজ পাখিদের ডানায় ভর করে গ্রহাণু থেকে নেমে আসার সময় তার মনে হয়েছিল বাওবাবের চারা একটা বেঁচে থাকলে, ওর মূল শেকড় এত পাজি যে তার ছোট গ্রহটিকে ঝাঁঝরা করে দেবে।

টুকুন জানলা দিয়ে নানারকম ফুল ফুটতে দেখলেই রাজপুত্রের কথা মনে করতে পারে, সুবলের কথা মনে হয়। সে বিমর্ষ হয়ে যায়। খেতে তার ভালো লাগে না, ইন্দ্রকে আজকাল একেবারেই সহ্য করতে পারছে না। মা এসে ইন্দ্রের সম্পর্কে সব গল্প করে যাচ্ছে। ইন্দ্র কলেজের পড়া শেষ হলেই সরকারি স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে চলে যাবে। এসব খবর অর্থহীন টুকুনের কাছে খুবই অর্থহীন। ওর এসব কথা শুনলে ভারী হাসি পায়। সে বলতে পারে, আমার কাছে এমন সব ইতিহাস লেখা আছে, যা তুমি আদৌ জানো না। কত যে অকিঞ্চিৎকর—এই বিদেশ যাওয়া। মা, তুমি ইন্দ্রকে আমার ঘরে আর পাঠাবে না। ওর মুখ পুতুলের মতো। সব সময় মুখটা একরকমের থাকে। সে একটা কথা শুধু জানে,—টুকুন আজ তোমার কেমন লাগছে? শরীর তোমার কেমন?

অন্য কথা জানে না বলে টুকুনের মনে হয় ইন্দ্র এই দুটো কথাই শুধু সারাজীবন ধরে মুখস্থ করেছে। অন্য কথা সে জানে না। তার আত্মীয়স্বজনের ছেলেমেয়েরা কেউ বড় আসে না তার ঘরে। ওর অসুখটা যদি অন্য কারও শরীরে সংক্রামিত হয়—এই অসুখ—কী যে অসুখ—কেউ টের পায় না, একটা মেয়ে সবকিছুর ভিতর কেমন সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে বেঁচে আছে।

সকাল থেকেই আজ এই অঞ্চলে গণ্ডগোল চলেছে। গীতামাসি টুকুনকে এমন বলেছিল। পাঁচিল পার হলে ফুটপাথ। লাইটপোস্টটার নীচে দুটো মানুষের মাথা কারা কেটে রেখে গেছে। সকাল থেকে হইচই। পুলিশ। কোথায় পাশে গুলি চলছে। তিনজন ধরাশায়ী। বিকেলে একটা বড় মিছিল যাচ্ছিল, সেখানে বোমা।

বোমা মিছিল আর নানারকমের অসুখ নিয়ে বেঁচে আছে এতবড় শহরটা। যেমন একটা অসুখ এই শহরের, সব বড় বড় বাড়ি, প্রাসাদের মতো বাড়িগুলো রাতে ফাঁকা থাকে নীচে ফুটপাথে লোক শুয়ে থাকে—শীতে অথবা ঝড়বৃষ্টিতে কষ্ট পায়। টুকুন বুঝতে পারে না এমন কেন হয়। যখন বাড়িগুলো ফাঁকা, লোকজন কম, গরিব সব মানুষদের সেখানে আশ্রয় দিলে কী যে ভালো হয়। কিংবা কেউ খায়, কেউ খেয়ে হজম করতে পারে না, কেউ না—খেয়ে পেটের জ্বালায় ফুটপাথে পড়ে থাকে। অথবা কী যে ধনাঢ্য পরিবার, তার বাবা তাকে নিয়েও বেশ একটা খেলায় মেতে গেছে, কত বেশি সুখ সে টুকুনের জন্য এনে দিতে পারে এমন খেলা। টুকুনের ঘরটা হলঘরের মতো। নানাবর্ণের দেয়াল। ভিতরে চন্দনের মতো গন্ধ। এবং সব সময় কী যেন গীতামাসি স্প্রে করে দিয়ে যায়। বড় বাথরুম। শ্বেতপাথরের দেয়াল। বিখ্যাত সব চিত্রকরদের ছবি। একটা ছবি, বনের ভিতর একটা বাঘ। পিছনে শিকারি হাতির পিঠে। বাঘের সঙ্গে দুটো বাচ্চা।

আবার ওর খাটটা মেহগনি কাঠের। নানারকমের কারুকাজ করা খাটে সে একা শুয়ে থাকে। এতবড় খাট যে, সে একা শুয়ে থাকে, এ—পাশ ও—পাশ করে কতবার যে অন্য প্রান্তে যেতে চায়—কিন্তু পারে না। সে চুপচাপ কাত হয়ে শুয়ে থাকে, তার পায়ে গীতামাসি আলতা পরিয়ে দেয়। চুল বিনুনি করে বেঁধে দেয়। সে সিল্কের লাল—হলুদ ছোপের ফুল—ফল আঁকা কেমন লুঙ্গির মতো একটা পোশাক পরে। ফুল—হাতা সাদা রংয়ের জামা। চোখ কেমন নীল নীল—এবং বুকে সে কোনও ধুকপুক শব্দ শুনতে পাচ্ছে না ভালোবাসার জন্য। কেবল সেই নির্বান্ধব ছেলেটির জন্য ওর মায়া। সে এলে হয়তো উঠে বসতে পারত।

এবং চারপাশে নানারকমের গণ্ডগোল। গণ্ডগোলের শহরে গণ্ডগোল বাদে কী আর থাকবে! এই সন্ধ্যায় যখন একটা গ্রহাণুতে এক বাতিয়ালা গ্যাসের আলো জ্বেলে দিচ্ছে, তখন কিনা এই গ্রহের সব সৌন্দর্য হরণ

করে নেবার জন্য মানুষ মানুষকে অকারণ মেরে ফেলছে। টুকুন জানালায় দাঁড়িয়ে তার দোতলার ঘর থেকে দেখতে পেল, রাস্তার দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য মানুষ পাঁচিল টপকে ছুটে আসছে।

দারোয়ানদের ঘরগুলোর পাশে যেখানে লম্বা গ্যারেজ, তার পাশে একটা লোক টপকে এসে কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। সে যেন রাস্তা থেকে প্রাণ বাঁচাতে এসে অন্য একটা ট্র্যাপে পড়ে গেল। পুলিশের লোকগুলো ছুটছে। যাকে পারছে তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। পাঁচিল টপকে একটা লোক এ—বাড়িতে ঢুকে গেছে, পুলিশের নজর এড়ায়নি। পুলিশও বেশ গোঁফে তা মেরে লাফ মেরে পাঁচিলের এ—পাশে এসেই দেখছে ফাঁকা।

টুকুন চুপচাপ শুয়ে দেখছে আর মজা পাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে—সেই পালানো লোকটা একটা বনকরবীর ডালে বসে আছে। নানারকমের লতাপাতায় গাছটা ঢাকা। এবং টুকুন একেবারে অবাক, রক্তের ভিতর তার হাজার ঘোড়া সবেগে ছুটছে, ওর মুখ—চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে, এবং সে কেমন অধীর হয়ে যাচ্ছে—সে তার ভিতর আশ্চর্য এক তাজা ভাব, অথবা মানুষের যা হয়ে থাকে, সময়ে সংসারের সব নিয়ম—কানুন সহসা পালটে যায়, বোঝানো যায় না এমন কেন হয়, টুকুন কেমন হয়ে যাচ্ছে, টুকুন উঠে বসল খাটে। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরে কেউ নেই। সে পিছনের দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল। ঘোরানো সিঁড়ি বাগানে নেমে গেছে। মালিরা কেউ নেই। এবং সে এ—সময় পাগলের মতো ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে যাচ্ছে। সে কিছু দেখে ফেলেছে, সে যে নিজের ভিতর এখন নিজে নেই, অথবা তার এটাই নিজের, এতদিন সে একটা মেকি ভয়ে খাটে শুয়ে রয়েছে, এ—মুহূর্তে কোনটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না। টুকুন পাগলের মতো ম্যাগনোলিয়া ফুলের গাছটা পার হয়ে গেল।

এখন যদি সুরেশবাবু দেখতে পেতেন—অথবা গীতামাসি কিংবা মা, কেউ এ—ঘটনা বিশ্বাসই করতে পারত না। ওদের চোখে এটা কোনও ভৌতিক ব্যাপার হয়ে যেত।

টুকুন এবার গোলাপের বন পার হয়ে গেল। সে দেখতে পাচ্ছে পুলিশটা চারদিকে তাকাচ্ছে।

টুকুন এবার বনকরবী গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। পুলিশটা তার দিকে আসছে।

এখন সন্ধ্যা। বাগানের নানারকমের ফ্লুরোসেন্ট বাতি। টুকুন পুলিশ আসার আগে ডাকল, সুবল।

সুবল এতক্ষণে লতাপাতার ফাঁকে দেখছে—দিদিমণি। সে প্রায় পাগলের মতো নেমে আসছে এবং লাফ দিয়ে ঝুপ করে টুকুনের পায়ের কাছে পড়ল।

—দিদিমণি তুমি!

—তাড়াতাড়ি এসো। বলে টুকুন আবার সুবলকে নিয়ে বাগানের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুবলের হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ। ব্যাগে কিছু রজনিগন্ধা। তার গন্ধ এখন সুবলের গায়ে। সে এখানে যে ভয়ে ছুটে এসেছে বোঝা যাচ্ছে। এভাবে একদিন টুকুনদিদিমণিকে আবিষ্কার করতে পারবে ভাবতে পারেনি। অনেকটা গল্পগাথার মতো। এমন সব মেলানো গল্প শেফালীবউদি তাকে বলত। সে এতটা কখনও আশা করেনি। আশা করেনি বলেই সে কেমন আরও গ্রাম্য সরল বালক হয়ে গেল। নিজের এই আনন্দ সে কিছুতেই হইচই করে প্রকাশ করতে পারছে না।

টুকুন ওকে যেভাবে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে—সে সেভাবে যাচ্ছে।

টুকুনকে দেখে সুবল বিশ্বাসই করতে পারছে না, এই টুকুনদিদিমণি। খুব বেশি একটা হেঁটে এলে জানালা পর্যন্ত আসতে পারত। সে এতটুকুই দেখেছে। এমনভাবে একেবারে স্বাভাবিকভাবে সে কোনওদিন টুকুনকে হাঁটতে দেখেনি। কী সহজ সরল ভাবে ওর হাত ধরে নানারকমের গাছের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। টুকুনের পরনে কী সুন্দর পোশাক। কেমন সকালের গোলাপের মতো তাজা রং পোশাকের রংয়ে। এবং গোলাপের পাপড়ি মতো নরম পোশাক। প্রায় ফ্লুরোসেন্ট আলো যেন পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

পুলিশটা এখন পাঁচিলের এদিকটায় একটা মানুষ খুঁজছে। পুলিশটার মনে হয়েছে, যারা বোমা ছুঁড়েছিল রাস্তায় তাদের একজন কেউ হবে কারণ লোকটার হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে

বোমা ছুঁড়ে মারা সহজ। প্লাস্টিকের ব্যাগ আছে বলেই পুলিশটা এখন ওৎ পেতে আছে। সুবল বাগানের ঝোপজঙ্গল থেকে বের হয়ে এলেই ধরবে। প্লাস্টিকের ব্যাগে যে রজনিগন্ধার গুচ্ছ থাকতে পারে—কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। পুলিশেরা ফুলের কথা বিশ্বাস করে না।

টুকুন বলল, সুবল তুমি এতদিন আসনি কেন?

সুবল বলল, টুকুনদিদিমণি, এটা রাজবাড়ি?

—যা, রাজবাড়ি হতে যাবে কেন? আমাদের বাড়ি।

—তোমাদের বাড়ি? এতবড় ফুলের বাগান! এত ফুল! টুকুনদিদিমণি, আমি রোজ ফুল তুলে নিয়ে যাব এখান থেকে। তার এসব দেখে এত আনন্দ হচ্ছে সে কী কথা বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না। তবু কিছু বলতে হয় বলে যেন বলা, টুকুনদিদিমণি আমি তোমাকে রোজ ফুল বিক্রি করতে করতে খুঁজেছি। শেষদিকে কেমন ভেবেছিলাম তোমাকে আর খুঁজে পাব না। তুমি বাদে আমার তো এ শহরে আর কেউ নেই।

টুকুন বলল, সুবল তাড়াতাড়ি এসো।

সুবল বলল, এটা কী ফুল গাছ?

—তোমাকে পরে চেনাব। ঐ দ্যাখো পুলিশটা বাগানের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে।

সুবল দেখল সত্যি। ওকে দেখে ফেলেছে।

টুকুন বুঝতে পারল পুলিশটার চোখে ওরা ধুলো দিতে পারবে না। কিংবা সুবলকে নিয়ে জানাজানি হলে মা আবার সুবলের এখানে আসা বন্ধ করে দেবেন। এটা বাড়ির দক্ষিণ দিক। মা—বাবা থাকেন পুবের মহলাতে। এই মহলে সে থাকে, আর ভিতরের দিকে থাকে গীতামাসি। ও—পাশ দিয়ে কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে। কেউ ওর ঘরে উঠে আসতে হলেই সে টের পায় কেউ আসছে। কারণ কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হয়। সেই শব্দ এক দুই করে গুণে গুণে কী যে একটা স্বভাব হয়ে গেছে টুকুনের, কোন শব্দে কে আসে টের পায়। মা উঠে আসছেন, না বাবা, না গীতামাসি, না ডাক্তারবাবু না ইন্দ্র—সে সব টের পায়। পায়ের শব্দ কারও একরকমের হয় না।

সে এবার দাঁড়াল এবং এটা বোধহয় একটা রক্তকরবী গাছ। সে বাতির আলোতে ঠিক বুঝতে পারছে না। গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সে পুলিশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। এবং পুলিশ হামাগুড়ি দিয়ে কিছু বনঝোপের মতো জায়গা পার হয়ে সামনে দাঁড়াতেই চোখ মেলে তাকাতে পারল না। একটা ফুলপরির মতো মেয়ে। যেন পাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। সে চোখের পলক ফেলতে পারছে না। কোনও দেবীমহিমা টহিমা হবে। সুবল ওপাশে একটা বড় পাথরের স্ট্যাচুর নীচে বসে রয়েছে। ওকে একেবারেই দেখা যাচ্ছে না।

পুলিশটার মনে হল সে কোথাও কিছু গোলমাল করে ফেলেছে। সে বোধহয় ছুটেই পালাত। কিন্তু সুন্দর গলায় যখন টুকুন বলছে, তুমি এখানে কী চাইছ? কাকে খুঁজছ?

—আমি কিছু খুঁজছি না মেমসাব।

টুকুন এমন কথাবার্তা আরও শুনেছে। সে অবাক হল না। বলল, কেউ নেই এখানে।

—কেউ আমার মনে হয় এই বাগানেই লুকিয়ে আছে।

—সে আমাদের সুবল। সে খুব ভালো ছেলে।

পুলিশ খুব বোকা মুখ করে রেখেছে। টুকুন বলল, সুবলের একটা পাখি আছে। সে এক আশ্চর্য পাখি। এমন পাখি আমি কোনওদিন দেখিনি।

পুলিশ বলল, তাই বুঝি?

টুকুন বলল, সে এসেছে এক খরার দেশ থেকে।

পুলিশ বলল তাই বুঝি?

টুকুন বলল, সে এখন শহরে ফুল বিক্রি করে।

এবং এটুকু বলার পর টুকুন সুবলকে ইশারায় ডাকল। সুবল স্ট্যাচুর ওপাশ থেকে খুব অপরাধী মুখে উঠে আসছে।

টুকুন বলল, এই আমাদের সুবল।

সুবল বলল, আমার নাম সুবল।

টুকুন বলল ওর একটা পাখি আছে। সুবলের দিকে তাকিয়ে বলল, সুবল তুমি পাখিটা আজ এনেছ?

—না দিদিমণি।

—কাল সুবল পাখিটা নিয়ে আসবে।

—আসব।

—আর এই দ্যাখো, বলে সুবলের প্লাস্টিকের ব্যাগটা হাতে তুলে নিল। —দ্যাখো শুধু ফুল আছে। ফুল। সুবল এর ভিতরে ফুল নিয়ে আসে।

—ব্যাগের ভিতর আজকাল কেউ ফুল রাখে জানতাম না মেমসাব।

টুকুন বলল, ব্যাগের ভিতর অনেক কিছু রাখতে পারে। শুধু ফুল থাকবে কেন? সন্দেশ থাকতে পারে, বই থাকতে পারে।

—না, আজকাল মেমসাব শুধু ব্যাগের ভিতরে বোমা থাকে। আর আমাদেরও শালা এমন বজ্জাতি বুদ্ধি, ব্যাগ দেখলেই পিছন ধাওয়া করো, কী আছে না আছে দেখার দরকার।

টুকুন বলল, তবে তুমি যেতে পারো।

পুলিশ একটা সেলাম ঠুকে বলল, খুব বেঁচে গেছিস সুবল। মেমসাব দেবতা। তোকে বাঁচিয়ে দিল!

টুকুন বলল, এসব কেন বলছ?

—মেমসাব আমাকে তো কাউকে ধরে নিয়ে যেতেই হবে। সুবল না হলে সেটা সফল হতে পারে না।

—বিনা দোষে ধরে নিয়ে যাবে?

—আমাদের শুধু ধরার কাজ। বিচারের কাজ সরকারের।

—তার জন্য যাকে তাকে? টুকুনের আর দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না। এখন পুলিশটাকে বিদায় করতে পারলে বাঁচে। কিন্তু কিছুতেই যেন যেতে চাইছে না। সে বলল, বড় আজগুবি ব্যাপার। আমি যাচ্ছি।

পুলিশ আর দাঁড়াল না। সে সুবলের দিকে ভীষণ কটমট করে তাকাল। এটা কী করে আজগুবি হয় সে বুঝতে পারে না। না, এরা একটা আজগুবি দেশে বাস করছে, সংসারে কী ঘটছে ঠিক খবর রাখছে না? পুলিশ যাবার সময় বলল, মেমসাব যাচ্ছি। আমার খুব ভুল হয়ে গেছে।

ভুল হয়ে গেছে বলল, এজন্য যে সে জানে বড়লোকদের মেয়েরা এমন হয়ে থাকে। কোথাকার একটা ফুলয়ালার জন্য প্রাণে হাহাকার। এখন ওর সারা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। সে কোথায় যে আর একটা লোক পাবে! একজনকে ধরে না নিয়ে গেলে বড়বাবু তাকে আস্ত রাখবে না। সে এখন কী যে করে! রাস্তায় তিনজন গেছে। অ্যাম্বুলেন্স এসে ওদের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। যারা গণ্ডগোল করল তাদের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে মরার দায়িত্ব নিতে পারছে না। তা ছাড়া এখন রাস্তায় একটাও লোক নেই। শুধু একটা কুষ্ঠরুগি আছে। তাকে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু অসুখটা বড় খারাপ। একটা খারাপ অসুখের লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া ঠিক না।

এইসব নানারকম ভেবে যখন পাঁচিল টপকে পুলিশ রাস্তায় নেমে গেল তখন টুকুন কিছুটা যেন হালকা হল। সে বলল, সুবল এসো।

সে সুবলকে নিয়ে এবার নরম ঘাস মাড়িয়ে হাঁটছে। সামনে সেই ঘোরানো সিঁড়ি। টুকুন খুব তর তর করে উঠে যাচ্ছে। সুবল ওর পায়ের দিকে তাকাচ্ছে। কী সুন্দর আর সতেজ মনে হচ্ছে। পায়ে আলতা। সুবলের বারবার কেন জানি মনে হচ্ছে—নীলকমল—লালকমল ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে। সেই সব রাজপুত্রেরা বুঝি এমন বাড়িতেই থাকত।

এমন একটা প্রাসাদের মতো বাড়ি এই শহরে আছে, অথবা এখনও থাকতে পারে—সে সব দেখতে দেখতে কেমন অবাক হয়ে যাচ্ছে। সে বলল টুকুন দিদিমণি আমি যাব কী করে?

—তোমাকে যেতে হবে না সুবল। তুমি এতবড় বাড়িতে থেকে গেলে কেউ টের পাবে না।

সুবল সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে এসেই দেখল সাদা রংয়ের কেমন মসৃণ মেঝে। একেবারে সাদা সবটা। দেয়াল, মেঝে, বারান্দা এমনকী পোশাক নানাবর্ণের যে আছে তাও অধিকাংশ সাদা রংয়ের।

সুবল বলল, আমার এ—ফুলগুলো তোমার পছন্দ হয় টুকুনদিদিমণি?

—খুব। বলে সে বুকের কাছে ফুলগুলো তুলে নেবার সময়ই মনে হল, সে তো বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না। এখন এমন কী করে হচ্ছে? কী করে সে এটা করে ফেলল। ওর চোখ বুজে আসছে। সে বলল, সুবল, সুবল তুমি আমাকে ধরো। আমি পড়ে যাব।

সুবল দেখল আশ্চর্য মায়া চোখে মেয়ের। ধীরে ধীরে চোখ বুজে ফেলছে দাঁড়াতে পারছে না। বুকের ওপর ফুলগুলো ধরা আছে। বুঝি পড়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে বিড় বিড় করে বলছে এবং সুবল শুনতে পাচ্ছে, সেই নিঃশব্দ এক ভাষা থেকে সুবল টের পাচ্ছে—টুকুন তাকে ফেলে আর কোথাও যেতে বারণ করছে। এবং টুকুন দিদিমণি যেন পড়ে যাচ্ছিল। সব মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নিজের অক্ষমতার কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, হাত—পায়ে আর শক্তি পাচ্ছে না টুকুন। কেমন স্থবির হয়ে যাচ্ছে।

সুবল ধীরে ধীরে টুকুন দিদিমণিকে শুইয়ে দিল। ফুলগুলি পাশে রেখে দিল। সে পায়ের কাছে বসে থাকল। চোখ মেলে না তাকালে সে এখান থেকে চলে যেতে পারে না।

চোদ্দ

তারপর একটা খেলা হয়ে গেল। সংসারে এমন খেলা কে কবে খেলেছে জানা নেই। সুবলকে নিয়ে টুকুন নূতন এক জগৎ সৃষ্টি করে ফেলেছে।

সুবল, টুকুন চোখ মেলে তাকালে বলেছিল, টুকুন তুমি ভালো হয়ে গেছ। টুকুনকে খুব অবুঝ বালিকার মতো দেখাচ্ছে। সুবলের টুকুনকে আর দিদিমণি বলতে ইচ্ছা হয় না। কারণ টুকুনকে অসহায় এবং কাতর দেখাচ্ছিল। সে যা করেছে এতক্ষণ, সিঁড়ি ধরে যে নীচে নেমে গেছে, গোলাপ গাছগুলোর পাশ দিয়ে যে হেঁটে গেছে, সে কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছে না। বিশ্বাস না করতে পারলে যা হয়, ভিতরের উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়।

সে বলল, টুকুন তোমার কোনও অসুখ নেই। তুমি ভালো হয়ে গেছ।

—তুমি সুবল সত্যি বলছ?

—সত্যি টুকুন। তুমি উঠে বোস। আমি নেমে গেলে দরজা বন্ধ করে দেবে। সুবল এই বলে উঠে এসে রাস্তায় গণ্ডগোল কমেছে কি না, না আবার কারফিউ দিয়ে দিল—এসব জানার জন্য উদগ্রীব হলে টুকুন বলল, সুবল তুমি কোথায় থাকছ?

—অশ্বিনীনগর স্টেশনে নেমে যেতে হয়।

—এত দূরে চলে গেলে কেন?

—খুব দূর না তো। শিয়ালদা থেকে বিশ মিনিট লাগে।

—তবে তো খুব কাছে।

—খুব কাছে। শুয়ে শুয়ে তোমার কথা বলতে ভালো লাগে টুকুন?

—না।

—তবে উঠে বসছ না কেন? এই দ্যাখো বলে সে বলল, তুমি রেডিয়োটা চালিয়ে দাও না।

—কী হবে?

—কারফিউ দিলে বলে দেবে।

—কারফিউ হলে যাবে কী করে?

—কিন্তু যাওয়া দরকার। আমি না গেলে বুড়ো মানুষটা ভয়ানক ভাববে।

—বুড়ো মানুষটা তোমাকে বুঝি খুব ভালোবাসে?

—ভালোবাসে না ছাই! কেবল কাজ। কাজ করো। কাজ করলে লোকটা সবাইকে ভালোবাসে। কাল আমাদের বনে যাবার কথা আছে।

—কী করবে গিয়ে?

—সব শুকনো পাতা জড়ো করব। তারপর যখন সন্ধ্যা হবে, সেইসব শুকনো পাতায় আগুন দেব।

—কী মজা।

—খুব মজা! শীতের সময় আগুন দিলে বুড়ো লোকটা বলেছে জীবজন্তুরা পর্যন্ত সব চলে আসে।

—ওরা আসে কেন?

—আগুন পোহাতে। একটু থেমে সুবল বলল, তুমি রেডিয়োটা খুলে দাও, আচ্ছা টুকুন, কেউ আবার চলে আসবে না তো? কত বড় ঘর তোমার। কেউ চলে এলে কী হবে?

—কেউ এলে কী হবে সুবল?

—আমাকে আসতে দেবে না। তোমার মা আমাকে যদি পুলিশে দেয়!

টুকুনের মুখটা সত্যি শুকিয়ে গেল। সে এটা ভাবেনি। না বলে না কয়ে পাঁচিল টপকে সে চলে এসেছে, পুলিশে দিয়ে দিলে যা হোক ওদের একটা কাজ মিলে যাবে।

সুবল বলল, আমি আর আসব না। আমি এতটা ভাবিনি।

টুকুন বলল, আমার পাশের ঘরটায় গীতামাসি থাকে। বিকেলের খাবার দিয়ে সে নীচে নেমে যায়। উঠে এলে টের পাব সুবল। কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হবে।

—গীতামাসি তোমার দেখাশোনা করে?

—হ্যাঁ। ওকে, দ্যাখো, ঠিক হাত করে নিতে পারব।

—কিন্তু তোমার মাকে টুকুন?

টুকুন উঠে বসল। যেন একটা পরামর্শ না করলেই নয়। সে বলল, এদিকে এসো। সুবলকে নিয়ে ওর বাথরুমের দিকে চলে গেল। ওর দু—পাশে দুটো জলের কল। বড় বড় দুটো থাম। এবং কিছু জালালি কবুতর একসময় কার্নিশে ছাদের অলিন্দে বসবাস করত, তারা এখন কেউ নেই। টুকুনের অসুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা নাকি উড়ে গেছে। সুবলকে এসব দেখাল টুকুন, বলল সুবল, মা এলে আমরা টের পাব। তোমার কোনও ভয় নেই। পায়ের শব্দ আমি টের পাই। কোনটা গীতামাসির, কোনটা ডাক্তারবাবুর। সব আমি জানি। ওরা এলে তোমাকে আমি ঠিক লুকিয়ে ফেলব। সে দোতলার অলিন্দে নিয়ে গেল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। সুবলের কাছে এটা প্রায় রাজার দেশ। টুকুন এক রাজকন্যার মতো। সে যেন এক রাখাল বালক। তার কাছে আছে মৃতসঞ্জীবনী সুধা। সুধা রসে মেয়েটা এখন নির্ভাবনায় হাঁটছে। সুবলের আছে এক ভালোবাসার জাদুমন্ত্র, অথবা সুবলকে নিয়ে হেঁটে এই যে ঘরের পর ঘর, নানাবর্ণের ছবি, এবং সব বিচিত্রবর্ণের কারুকাজ করা খাট—পালঙ্ক পার হয়ে যাচ্ছে—এ যেন তার কাছে ভারী মজার। যেন হাজার হাজার দৈত্য আসবে সুবলকে তুলে নিতে। টুকুনের কাছে আছে দৈত্যের প্রাণ। কোথায় ওরা দাঁড়িয়ে পাখিটার পাখা পা এবং গলা ছিঁড়বে তার যেন একটা পরামর্শ চলেছে।

এসব হলেই মেয়ের মনে হয় না তার কোনও অসুখ আছে। এসব হলেই মনে হয় পৃথিবীতে বেঁচে অনেক সুখ। এক অপার অভাববোধ এই বালকের জন্য। সংসারে ছেলেটি যত অপাঙক্তেয়, তত টুকুনের কাছে সে মহার্ঘ। টুকুন আনন্দে, কারণ যখন প্রায় সব ঠিক হয়ে গেল তখন আনন্দে প্রায় ছুটে ছুটে যাচ্ছিল। বলল সুবল তোমাকে এখানে আসার একটা সুন্দর রাস্তা দেখিয়ে দেব। তুমি ফুল বিক্রি করে রোজ এখানে আসবে।

আমি কী সুন্দর ছোট্ট রাজপুত্রের গল্প পড়ে রেখেছি। তুমি আসবে বলে বসেছিলাম। তুমি না এলে কাকে আর আমার গল্প শোনাব।

কাঠের সিঁড়ির মুখের দরজাটা টুকুন বন্ধ করে দিল। কী বড় বড় শার্সির নীল রংয়ের দরজা। টুকুন অনায়াসে টেনে টেনে বন্ধ করে দিচ্ছে। সুবল ওকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে সাহায্য করলে সে বলল, আমি পারব সুবল। বলে হাসল।

সুবল যেতে যেতে বলল, এটা কী?

—এটা পিয়ানো। বলেই টুকুন দুহাতে ঝম ঝম করে বাজাতে থাকল। কতদিন থেকে পিয়ানোটা কেউ বাজায় না। না, ইন্দ্র মাঝে দু'একদিন বাজিয়েছে। যখন টুকুন শুয়ে থাকে মা কখনও বাজান। লম্বা একটা খাতা পিয়ানোর ওপর। সুবল দেখল কেমন গোটা ঘরটা ঝম ঝম করে উঠছে। এবং ক'টা চড়াইপাখি ঝাড়—লণ্ঠনে বসেছিল, পিয়ানো বাজালে পাখিগুলো উড়ে উড়ে বাগানের ভিতর চলে গেল।

সুবল দেখছে—কী সুন্দর বাজাচ্ছে টুকুন। এমন একটা সুন্দর বাজনা পৃথিবীতে আছে তার যেন জানা ছিল না। চুলগুলো বব করা টুকুনের। বিনুনি বাঁধা নয়। হাতের আঙুলগুলো চাঁপা ফুলের মতো। পায়ে আলতা আছে বলে খুব সুন্দর লাগছে। এবং সে পাজামার মতো কোমল পোশাক পরে আছে, আর লম্বা, টুকুন প্রায় তার মতো লম্বা। সে বয়সানুপাতে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। সে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পেল। কারণ বড় বড় দুটো আয়না, পৃথিবীতে এতবড় আয়না দিয়ে কী হয় সে জানে না। গোটা ঘরের প্রতিবিম্ব এখন এই আয়নার ভিতর। সে তন্ময় হয়ে টুকুনদিদিমণির পিয়ানো বাজনা শুনছে।

আর তখন কাঠের সিঁড়ির মুখে কারা উঠে আসছে যেন। ওরা দুজনে এত বেশি গভীরে ডুবে আছে যে কেউ টের পায়নি, অথবা শুনতে পাচ্ছে না সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির সবাই ছুটে আসছে এদিকে। কারণ অসময়ে পিয়ানো বাজাচ্ছে কেউ, সে কে।

আশ্চর্য এক মেলডি ভেসে বেড়াচ্ছে বাড়িময়।

সুবলেরই প্রথম মনে হল দরজায় কারা আঘাত করছে। সে টুকুনকে ঠেলে দিয়ে বলল, টুকুন কারা দরজায় ধাক্কা মারছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মতো ব্যাপারটা হয়ে গেল। টুকুন বাজানো বন্ধ করে দিল। সুবল লুকিয়ে পড়ল টুকুনের খাটের নীচে। তারপর খুব সহাস্যে দরজা খুলে দিলে দেখল সবাই, টুকুন দরজা খুলে দিচ্ছে। ওরা হাসবে না কাঁদবে স্থির করতে পারছে না। মা বললে, টুকুন তুমি পিয়ানো বাজাচ্ছিলে?

—হ্যাঁ মা।

—সত্যি?

—হ্যাঁ মা।

টুকুনের মা টুকুনকে বুকে জড়িয়ে ধরল। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। সে বলল, তুমি আর একবার বাজাবে?

—এক্ষুনি?

—তোমার বাবা এলে তাকে বাজিয়ে শোনাও না। তিনি খুব আনন্দ পাবেন।

—বাবা আসুক।

—আমি জানি টুকুন ঠিক একদিন সুস্থ হয়ে যাবে।

গীতামাসি বলল, কোথাকার একটা রাস্তার ছেলেকে ধরে আনতে যাচ্ছিলেন বড়বাবু।

মা বলল, আজকালকার ডাক্তারও হয়েছে তেমন। তারপর কী ভেবে বলল, একবার ইন্দ্রকে ডাকো না?

—সে তো নেই দিদিমণি?

—কোথায় গেল?

—সে তো এসময়ে ক্লাবে রোয়িং করতে যায়। ইন্দ্রকে খুশি রাখার জন্য মা—র যে কী করার ইচ্ছা। কারণ এখানে বসে থাকতে চায় না ইন্দ্র। আজ ইন্দ্র এলে খুব খুশি হবে।

টুকুন এখন চাইছে সবাই চলে যাক। কিন্তু সে যে কেন পিয়ানো বাজাতে গেল। সবাই এখন এটা গল্পগাথার মতো ব্যবহার করবে। ছুটে আসবে। এখন যেভাবে হোক সুবলকে বের করে দিতে হবে। ওর ভিতরে সুবলের জন্য একটা দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছে। এবং নানাভাবে সে চিন্তা করছে। কী করলে যে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সবাই এসে টুকুনকে দেখে যাচ্ছে। ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সে এখন আবার সাদা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়বে ভাবল। কেবল সুবলের জন্য সে শুয়ে পড়তে পারছে না। খাটের নীচে একবার উঁকি দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল। ওদিকে কেউ গেলে পা দেখে ফেলবে। এবং এমন একটা ভয়াবহ সমস্যার মোকাবেলা সে জীবনে করেনি। এবং এইসব সমস্যা অথবা তাড়না তাকে এখন বড় বেশি স্বাভাবিক করে রেখেছে। সে বলল, মা আমার আবার ভালো লাগছে না কেন জানি। আমার ঘুম পাচ্ছে।

গীতামাসি, যারা সবাই চাকর এবং অন্যান্য সব পরিজন এসেছিল তাদের চলে যেতে বলল। গীতামাসির কাজ এখন কত বেড়ে গেছে এমন ভাব। সে বলল, দিদিমণি, টুকুন এবার ঠিক বড় হয়ে যাবে।

এ—ছাড়া টুকুনের মার কত সব দুশ্চিন্তা এবং মনের ভিতর সংশয় থেকেই যাচ্ছে। টুকুন এভাবে আরও দু'একবার খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছিল। অবশ্য প্রতিবারই পাখিয়ালা সুবল ছিল কাছে। এবার সে নেই। কিন্তু এমন ম্যাজিকের মতো ব্যাপারটা ঘটবে আশা করতে পারেনি।

মা বলল, টুকুন আমি তোমার জন্য একজন পিয়ানোর শিক্ষক দেব।

টুকুন বলল, আমি শোব মা। আর বসে থাকতে পারছি না।

গীতামাসি টুকুনকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিচ্ছেন।

মা বলল, এটা কী করছ গীতা?

গীতামাসি বলল, টুকুন আবার আগের টুকুন হয়ে যাচ্ছে।

খাটের নীচে যেই না শুনতে পেল সুবল, টুকুন আবার আগের টুকুন হয়ে যাচ্ছে, সে বোধহয় জোরজার করে উঠেই আসত—কেবল টুকুন চাদরটা একটু ফেলে দিয়ে ওকে একদিকে ভালো করে আড়াল করে দিচ্ছে।

টুকুন শুয়ে পড়লে মা বলল, তুমি যে বলেছিলে, বাবা এলে বাজাবে?

—কাল বাজাব মা। খুব দুর্বল লাগছে।

—তা ঠিক। একদিনে বেশি ভালো না। তুমি বরং একটু শুয়ে থাক। বাবা এলে আমরা আসব।

মা চলে গেলে গীতামাসি বলল, টুকুন এখন তোমার দুধ, আপেল, সন্দেশ খাবার সময়! বের করে দিচ্ছি।

—কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি মাসি দরজাটা ভেজিয়ে দাও না।

দরজা ভেজানোর কথা উঠলেই মাসি উঠে পড়বে। কারণ বারবার এক কথা শুনতে ভালোও লাগে না। নিজের ঘরে গিয়ে বেশ পান—দোক্তা খেয়ে উত্তরের বারান্দায় চলে গেলে, নীচ থেকে যারা উঠে আসে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করা যায়।

গীতামাসি বলল, কিন্তু এখন তো তোমার এসব খাবার সময়।

টুকুন বুঝতে পারল, না—খাইয়ে ছাড়াবে না। সে বলল, তুমি রেখে যাও, আমি ঠিক খেয়ে নেব।

—অন্যদিন আমার সামনে তুমি খাও। আজ কেন এমন বলছ?

—আজ তোমার সামনে খাব না। কিছুতেই খাব না।

টুকুনের জিদ উঠলে একেবারে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। সেজন্য ভয়ে ভয়ে গীতামাসি বাইরে বের হয়ে এলে সে নিজে উঠে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল। ডাকল, সুবল বাইরে এসো। ওরা সবাই চলে গেছে।

সুবল বের হয়ে এলে টুকুন বলল, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

সুবল বলল, আমার ফুলের থলেটা দেখছি না।

—ওটা আমি ঠিক জায়গায় রেখে দিয়েছি। তুমি যে কী বোকা না! ওটা দেখলেই ওরা বলত না, এই থলেটা কার, কী করে এমন একটা বিশ্রী থলে এখানে আসতে পারে। দরকার পড়লে ডিটেকটিভ লাগিয়ে দিত।

সুবল শহরের অনেক ব্যাপার যেমন ঠিক বোঝে না, তেমনি ডিটেকটিভ কথাটাও বুঝতে পারলে না। সে বলল, ডিটেকটিভ কী টুকুন?

—ওরা চোর গুণ্ডা বদমাশ ধরে বেড়ায়। কেউ যদি খুন হয়, কে খুনটা করেছে তাকে খুঁজে বের করে।

—আমার সামান্য থলেটার জন্য এতবড় একটা ব্যাপার তবে ঘটে যেতে পারে?

—সুবল তুমি জানো না, এটা যে কী অসামান্য অপরাধ! আমার মা—র চোখ দেখতে সব টের পাই সুবল।

ওরা বাথরুমে ঢুকলেই সুবল বলল, জল দেখলেই চান করতে ইচ্ছা হয় টুকুন। বাঃ কী মজা! পাতাল থেকে ফোয়ারার মতো জল উঠে আসে, কী মজা প্রথম প্রথম ভাবতাম। খরা অঞ্চল থেকে আসার পর, দিনে কতবার যে রাস্তার কলে চান করতাম।

—তুমি চান করে নেবে?

—তোমার চানের ঘরটায় কী সুন্দর গন্ধ। মারবেল পাথরে কারুকাজ করা সব পাথরের দেয়াল—কী মসৃণ! সুবল দেয়ালের গায়ে হাত দিয়ে কী যেন দেখছে। ভীষণ মসৃণ। হাত পিছলে পিছলে যাচ্ছে। নানারকম গন্ধ সাবান। তেল। শ্যামপু সব। এসব সে ঠিক চেনে না, কী দিয়ে কী হয়, এবং মনে হয় সুবলের শরীরে ঘামের গন্ধ। টুকুন সুবলকে হাত ধোয়ার জন্য বাথরুমে নিয়ে এসেছিল। যা খাবার আছে সে সুবলকে খেতে দেবে। কিন্তু এখানে এসে সুবলের যে কী হয়ে গেল—সে চান না করে খাচ্ছে না। সে খুব পরিশ্রম করে—তার চোখে—মুখে আশ্চর্য দৃঢ়তা। টুকুন এসব দেখে ভাবল, চান করে নিলে তাকে আরও বেশি তাজা দেখাবে।

টুকুন বলল, সুবল তুমি চান করবে?

—মন্দ হয় না, টুকুন।

টুকুন শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে বলল, এটা দিয়ে এভাবে জল পড়বে। বাথরুমের সব বুঝিয়ে দিয়ে বলল, তুমি চান করে নাও। আমি দাঁড়াচ্ছি। সুবল বলল, টুকুন, আমি দরজা বন্ধ করে দেব।

টুকুন দরজা বন্ধ করার কারণ খুঁজে পেল না। সুবল তো তার কাছে ছোট্ট এক বালক বাদে আর কিছু না। সে তো সেই যেন দুই শিশু নদীর পারে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে কোনও জামাকাপড় নেই। কেবল ওরা ছুটছে।

টুকুন বলল, আমাকে তোমার লজ্জা কী?

সুবল বুঝতে পারল টুকুনদিদিমণি এখনও স্বাভাবিক নয়। সে বাথরুমের দরজাটা খোলাই রাখল। সে একটা তোয়ালে পরে নিয়ে জামা পাজামা পাশের ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রাখল।

টুকুন বেশ মনোরম চোখে দেখছে। সুবলের কী সুন্দর হাত। পুষ্ট বাহু। এবং পিঠের শক্ত কাঁধ খুব মজবুত। সে শাওয়ারের নীচে বসে গায়ে মাথায় সাবান মাখছে। বস্তুত সুবলেরও একটা অসুখ হয়ে গিয়েছিল—সে খরা অঞ্চল থেকে চলে এসে যখন কলকাতা নগরীতে এত প্রাচুর্য বিশেষ করে জলের—ভাবা যায় না—সে এখনও ফাঁক পেলে যেখানে সেখানে চান করে নেয়। শরীরে ওর কী যে গরম বেঁধেছে কিছুতেই ঠান্ডা হচ্ছে না। সে এখানে এসেও এই লোভ সামলাতে পারেনি।

টুকুন বলল, আমি তোমাকে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছি।

সুবল জানে, টুকুনের কোনও ইচ্ছাকে অবহেলা করতে নেই। টুকুন কত বড়, কত বড় বাড়ির মেয়ে, টুকুন যা বলবে তাকে এখন তাই করতে হবে। সে এভাবেই বুঝে ফেলেছে, এর ভিতর এক নতুন প্রাণের সাড়া দেখা দিচ্ছে। এখন কিছুতেই সেখানে ভাঁটার টান আনলে চলবে না। সে বলল, তুমি টুকুন পারবে?

—বা রে পারব না কেন?

—আমার বিশ্বাস হয় না টুকুন—সেই রাজার ঘোড়ায় চড়ে যাবার কথা মনে আছে? হরিণ ধরতে যাচ্ছে রাজা। হরিণ প্রাণের ভয়ে ছুটছে। রাজা, ঘোড়া পাহাড়ের ওপর দৌড় দিচ্ছে। পাথরে পাথরে ঘসা লেগে ঘোড়ার খুরে আগুন লেগে গেছে।

—সত্যি কী সুন্দর হরিণ না। টুকুন সুবলের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কী সুন্দর মজবুত সুবল। টুকুন বলল, আমিও চান করব। সে বলল, আমাকে সাবানটা দাও। সে একেবারে শিশুর মতো জলের নীচে খেলা করতে থাকল। সুবলও কখন এমন হয়ে গেছে। ওরা দুজনে গল্প করছিল—পাশের ওদিকটার যে দরজা বন্ধ আছে এবং কেউ আর একদিকটায় আসতে পারবে না ওরা জানে।

এবং এভাবে কী হয়ে যায়। সুবল স্নানের সময় শরীর থেকে সব জল শুষে নিতে গিয়ে দেখল, তোয়ালেটা কী করে কখন শরীর থেকে খসে পড়ে গেছে। সে তোয়ালে ব্যবহারের নিয়মকানুন ঠিক জানে না। আর টুকুন ওকে অপলক দেখছে। স্থির। চোখে বিস্ময়। সে টুকুনের এমন চেহারা দেখে একেবারে ফ্রিজ হয়ে গেছে। দুজনেই দুদিকে, একটা ফ্রিজ শটের মতো। সুবলের যেন মুহূর্তের জন্য কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল।

পনের

সুবল চলে যাবার পর গোটা ব্যাপারটা টুকুনের মাথায় কেমন একটা অদ্ভুত নেশা ধরিয়ে দিল। সে ভিতরে ভিতরে ভীষণ একটা অভাবের কথা ধরতে পারছে। সে সংসারে খুব একা—পৃথিবীতে যে মৃত্যু এবং গ্রহাণুতে চলে যাওয়া বাদে অন্য কিছু আছে তার জানা ছিল না। সে এটা যে কী দেখে ফেলল। ওর চোখ বুজে আসছে। সুবল আবার কখন আসবে—শুধু প্রতীক্ষা।

ওর চোখে এখন কিছুটা স্বপ্নের মতো ঘটনাটা ঝুলে আছে। এক আশ্চর্য মহিমাময় শরীর সুবলের। এবং শরীরের সর্বত্র এক কঠিন অবয়ব, কী শক্ত, অথচ ভারী কোমল, লাবণ্যে ভরা, লম্বা সুবল, যার শিশুর মতো সরল মুখ এখন আরও সুন্দর মনে হচ্ছে। সে একটা পুরুষের শরীর, এবং শরীরের সবটা একসঙ্গে এভাবে কখনও দেখতে পায়নি।

ওর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বাবা এঘরে কিছুক্ষণ এসে বসে থেকে গেছেন। নানারকম প্রশ্ন করেছেন। বলেছেন, টুকুন তুমি আমাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাবে না? ডাক্তারবাবু এসেছেন, তিনিও শুনতে চান।

টুকুন কেবল বলছিল, বাবা আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। সে ইচ্ছে করেই হাই তুলছে। বলছে, আমাকে তোমরা আর কষ্ট দিয়ো না।

রাতে গীতামাসি একটা কম আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। আলোটার রং কেমন তামাটে। এবং এই আলোটা না জ্বালালে, অন্যদিন টুকুনের ঘুম আসত না। আজ অন্যরকমের। সে গীতামাসিকে বলেছে—সবুজ আলোটা জ্বালিয়ে দেবে?

—সবুজ আলো জ্বাললে তুমি তো ঘুমোতে পারো না।

—তুমি দাও গীতামাসি। তামাটে রং আজ আমার ভালো লাগবে না।

টুকুন গীতামাসিকে আরও বলেছিল, এই দ্যাখো আমার বালিশের নীচে কিছু রজনিগন্ধা আছে। ওগুলো রুপোর ফুলদানিতে রেখে আমার মাথার কাছে রেখে যাও। আমার চারপাশে আরও কিছু রাখো, যাতে আমাকে আরও সুন্দর দেখায়। শেষপর্যন্ত 'আমাকে সুন্দর দেখায়' সে বলতে পারেনি। কেমন লজ্জা এসে গেছিল। তার এমন একটা অনুভূতি এতদিন কোথায় যে ছিল! ওর শির শির করছে শরীরটা। এবং চাদর দিয়ে গোটা শরীরটা ঢেকে রাখতে ইচ্ছা হচ্ছে। এটা যে কী হয়ে যাচ্ছে ভিতরে। ওর জল তেষ্টা পাচ্ছে। সে টিপয় থেকে হাতির দাঁতের মিনা—করা জলদানি তুলে জল খেল। তার হাত কাঁপছে। ঠোঁট কাঁপছে। ভিতরে কীসের যেন ঝড়। যেন কোথাও বাদলা দিনে সে বৃষ্টি—ভিজে এক বড় মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। ওর পায়ে সবুজ ঘাসের চিহ্ন। ওর চোখে—মুখে বৃষ্টির ছাট। পরনে সাদা সিল্ক লতাপাতা আঁকা নীল রংয়ের। পায়ে

তেমনি আলতা। হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা, নখে নীল রংয়ের পালিশ। নখগুলো কিছুটা লম্বা, কিছুটা উজ্জ্বল, সে হাতের ওপর হাত রেখে নিজের সুন্দর হাত পা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। সে আর টুকুন থাকছে না। সে কল্যাণী হয়ে যাচ্ছে। সে কল্যাণী মজুমদার হয়ে যাচ্ছে। সে তার ভালো নামটা অথবা বড় হয়ে যে নামটা ব্যবহার করার কথা, কতদিন পরে মনে করতে পারছে।

টুকুন পাশ ফিরে শুল। সেই গ্রহাণুর ছোট্ট রাজপুত্রের কথা কিছুতেই মনে আসছে না। অথবা সেই মরুভূমির কথা। মরুভূমিতে যদি সেই মানুষটা এখনও তার উড়োজাহাজটা ঠিক করে উঠতে না পারে—তার খুব কষ্ট। তার বাড়ি—ঘর, যদি তার স্ত্রী থাকে—খুব একটা কষ্টের ব্যাপার—সে এখন কেবল এসব মনে করতে পারছে।

ওর আঙুলে রক্তের তাজা একটা ভাব জেগে যাচ্ছে। সে এই শরীরে মনোরম এক স্বপ্ন নিয়ে শুয়ে আছে।

সুবল আর তার কাছে এখন শুধু পাখিয়ালা নয়। সে একজন মানুষ। ওর শরীরে এক সুন্দর রাজপুত্রের বাস। সে টের পেয়েছে—এই শরীরে ঈশ্বর এমন কিছু দিয়েছেন যার সৌরভ মানুষকে বড় করে তোলে। মানুষ বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়। তার কাছে এই অর্থটার মানে জানা ছিল না। সুবল আজ তাকে কী যে করে দিয়ে গেল।

সুবল, সুবল এক মানুষ, লম্বা, কালো চুখ, চোখ লম্বা, নাক সামান্য চাপা। ওর ঘাড় শক্ত। পিঠ চওড়া। বুকের পাশে দুভাগ এবং দুই হাতের নীচে সামান্য বনরাজি নীলা। সে যখন স্নান করছিল—সেইসব কারুকাজ করা সুন্দর সুদৃশ্য এক শরীরে কীযে সব আকর্ষণের খাঁজ রেখে দিয়েছে।

তার বাবা একটা তাজা সিংহের ছবি একবার তুলেছিল ক্যামেরাতে। ছবিটা তার দেখতে খুব ভালো লাগত। সেই তাজা সিংহের সঙ্গে সুবলের শরীরের কোথায় যেন একটা মিল আছে।

টুকুনের চুল, জামা, পাজামা ভিজা। টুকুনকে কোথাও মেয়ে মনে হয় না। শুধু মুখে মেয়ের মতো নরম এক ছবি। যা খুব কষ্টের আর দুঃখের মনে হচ্ছিল।

কোথাও ঘণ্টা বাজছে। রাত এখন বারোটা। কোথাও রেলগাড়ির শব্দ। না, সে নিজের ভিতরেই এক রেলগাড়ি চালিয়ে দিয়েছে। গাড়িটা তাকে নিয়ে ছুটছে। গাড়িতে সে এবং সুবল। সাদা জ্যোৎস্নায় তার সুবলের হাত ধরে বেড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্দ্রর কথা মনে হল। কাল ইন্দ্র এলে সে আর ঠিকমতো বুঝি কথা বলতে পারবে না।

গীতামাসি এসে বললেন, অনেক রাত হয়ে গেছে। তুমি শোও।

—তুমি শুয়ে পড়োগে?

—বড়বাবু কী বললেন?

বাবা বললেন, টুকুন এবার তুমি সত্যি ভালো হয়ে গেছ।

ওরা কেউ বেশিক্ষণ ছিল না। এমন একটা উত্তেজনার ভিতর বেশি সময় টুকুনকে বিরক্ত করা ঠিক না। বাড়ি থেকে চারপাশে সব মানুষের কাছে খবর পৌঁছে যাচ্ছে টুকুন ভালো হয়ে উঠছে। টুকুন কতকাল পরে পিয়ানো বাজিয়েছে। টুকুনের রক্তকণিকারা আবার উদ্যমশীল হচ্ছে।

এইভাবে এই সংসারে কোথাও কখন কীভাবে যে খরা লেগে যায়। সেটা কখনও মানুষের শরীরে, প্রকৃতির ভিতর এবং কলকারখানায় হতে পারে। সুরেশবাবু জানেন, চারপাশে যে এত ঘেরাও লকআউট এবং শ্রমিকেরা নিজেদের দাবি সম্পর্কে সচেতন—অথচ কাজ হচ্ছে না, উদ্যমশীল না হলে যা হয়ে থাকে, একটা জাতি মরে যাচ্ছে।

তিনি বেশিক্ষণ ছিলেন না। মা—মাসিরা কী যে কলরব করে গেছে! গীতামাসি বলেছে, ওর শরীর খারাপ করবে। টুকুন এত ভিড় সহ্য করতে পারবে না। আবার কেউ কেউ ভাবছে টুকুনের তো এমন নাকি আরও দুবার তিনবার হয়েছে। সুতরাং খুব একটা আশা করা ভালো না।

গীতামাসি বলল, টুকুন না ঘুমালে শরীর আবার খারাপ করবে।

—আমার ঘুম আসছে না গীতামাসি। সে দেখল পায়ের হাঁটুর ওপরে ওর ফ্রক উঠে গেছে। সে তাড়াতাড়ি শরীর ঢেকে দিতে গেল। এই হাঁটু এই বয়সে বের হয়ে থাকা কেমন সঙ্কোচের। সে বলল, আমি শাড়ি পরব গীতামাসি।

—কাল থেকে পরবে।

—না। আমি এখন পরব।

জিদ ঠিক আছে। গীতামাসি মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল। তবু কিছু বলার উপায় নেই। শাড়ি এলে টুকুন বলল, দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। তুমি যাও গীতামাসি। সে গীতামাসিকে যেন জোরজার করেই বের করে দিল। রেডিয়োটা খুলে দিল। ছায়াছবির গান হচ্ছে। সে প্রতিটি গানের সঙ্গে এখন গলা মেলাচ্ছে। সে ঘরেই আয়নার সামনে দাঁড়াল। তার কোনও কষ্ট হচ্ছে না হাঁটতে। সে যে কী করে শরীরে এমন শক্তি পাচ্ছে! এবং কখনও কখনও যেন মনে হয় সে একটা হালকা পাখির মতো এখন এই গানের সুরের সঙ্গে ভেসে বেড়াতে পারে।

সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখল। কতদিন পর সে আয়নার সামনে যেন দাঁড়াল। এতবড় আয়নায় সে কবে থেকে নিজের মুখ দেখতে ভুলে গেছিল। সহসা যেন মনে পড়ছে—মুখ না দেখলে, আয়নায় মুখ না দেখলে, কী করে বড় হয়ে যাচ্ছে বোঝা যাবে না।

সে দাঁড়িয়ে আয়নায় মুখ দেখল। ধীরে ধীরে সবুজ হালকা ফ্রকটা খুলে ফেলতে থাকল। শরীরে মাংস লাগতে চায় না। তবু সে বুকে হাত রাখল। ধীরে ধীরে হাত বুলাল। ওর কেন জানি কান্না পাচ্ছে। কেন জানি শরীরের ভিতর আশ্চর্য যে চেতনা নিয়ে বড় হবে স্বপ্ন দেখছে, সেখানে তার কিছু জন্ম নিচ্ছে না। যেন এখন থেকে সে প্রতিদিন এভাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেবল অপেক্ষা করা এবং স্মৃতি, কী যে স্মৃতি মানুষের—সুবল তার কাছে একটা প্রথম আদিম মানুষ, যে মানুষের আদিমতা নিয়ে সোজা সহজভাবে তাকিয়েছিল। এবং দৃশ্যটা ভাবতে কী যে ভালো লাগছে। সে যেন এমন একটা দৃশ্য ভেবে ভেবে সারারাত ভোর করে দেবে। হয়তো সকালে ফুল ফোটার মতো দেখবে, সে—ও শরীরের ভিতর ক্রমে ফুটে উঠছে। ওর ভীষণ ভালো লাগছে এভাবে ভাবতে!

এবং এসব ভাবনাই মেয়েকে এক সকালে সত্যি সত্যি বড় করে দিল। সে আয়নায় দাঁড়িয়ে এসব কী দেখছে। সে যে বড় হচ্ছে তার প্রমাণ শরীরে ভেসে উঠছে। কতকালের রাত জাগা, অথবা সুবল এলে ওকে নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে এই হলঘরের মতো ঘরে অথবা দক্ষিণের বারান্দায় এবং কথা আছে সে যখন গান গাইবে, অথবা পিয়ানো বাজাবে, কিংবা রেডিয়োর গানের সঙ্গে গলা মেলাবে—তখন এই ঘরে কেউ থাকবে না। সে ওর খুশিমতো সুবলকে নিয়ে এক আশ্চর্য সুন্দর জগৎ তৈরি করেছে—যা সে কোনওদিন ভুলে যেতে পারবে না। ইন্দ্র আসে ঠিক, তবু ইন্দ্র এলে সে কেমন উদাসীন হয়ে যায়। কারণ ইন্দ্রের স্বভাবটা কিছুটা কেন জানি আজকাল মেয়েলি মনে হচ্ছে। বরং এই সুবল যার কিছুটা সন্ন্যাসী তরুণের মতো মুখ, সে খুব সৎ এবং সব সময় নিজের মতো করে ভাবে—যে ছোট্ট রাজপুত্রের গল্প শুনে হেসেছিল, বলেছিল—সে আর তার গ্রহাণুতে ফিরে যেতে পারবে না। পৃথিবীর গাছ পাখি ফুল ফল এমন সে আর পাবে কোথায়। কেউ এখানে এলে আর কোথাও যেতে চায় না। বড় মায়া আর ভালোবাসায় পৃথিবী মানুষকে আটকে রাখে। টুকুনের মনে হয়েছিল, সুবলই তার সেই ছোট্ট রাজপুত্র। তাকে বাদ দিয়ে কিছুতেই বাঁচতে পারে না। সুবল তার ছোট্ট গ্রহাণুতে আর ফিরে যেতে পারবে না।

ষোল

একটা বাওবাব গাছের বড় দরকার সুবলের, এমন মনে হলে—চারপাশে যা কিছু, যেমন একটা নদী আছে, নদীর পারে বন আছে আর এ পারে আছে ফুলের উপত্যকা, এর ভিতর বাওবাবের চারা লাগিয়ে দিলে বেশ একটা সুন্দর পৃথিবী সে গড়ে তুলতে পারত, এবং এমন উপত্যকায় একদিন ওর ভারী ইচ্ছা

টুকুনকে নিয়ে আসবে। সে আর টুকুন। বুড়ো মানুষটা আজকাল আর ঘর থেকে বের হতে পারে না। সুবল তার জন্য সুন্দর টালির ঘর করে দিয়েছে। লাল টালি, মাটির দেয়াল, দেয়ালে নানারকমের কারুকাজ, ফুলফল, লতাপাতা সব ছবিতে আঁকা।

বুড়ো মানুষটা চলাফেরা তেমন আজকাল করতে পারে না বলে, সে তার জন্য আর বুড়ো মানুষটার জন্য রান্না করে। নামাজের সময় হলে সে মনে করিয়ে দেয়—এখন তোমার কর্তা জহোরের নামাজ। বুড়ো মানুষটা চোখে আজকাল ভালো দেখতে পায় না। কোথাকার কে সুবল এসে এখন এই ফুলের উপত্যকায় রাজা হয়ে গেল প্রায়। সে সুবলকে সব দিয়ে যাচ্ছে। কারণ বুড়ো মানুষটার তো কেউ নেই। সে সুবলকে সব দিয়ে যেতে পেরেছে বলে ভীষণ খুশি। এমনভাবে সে হালকা হতে পারবে কখনও ভাবতেই পারেনি। বড় চিন্তা ছিল তার, এমন সুন্দর একটা ফুলের উপত্যকা কাকে দিয়ে যাবে, ওর তো কেউ নেই। যারা আছে তারা সব ফুলের দালাল। কী লোভ বেটাদের। এসেই একটা বড় রকমের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলত—তা মিঞা, তুমি এমন একটা কাজ করলে কী করে!

—কী করে আবার, পরিশ্রম করে?

—শুধু পরিশ্রমে হয়?

—কেন হবে না?

—হয় না মিঞা।

তারপর সে থেমে একটু কী ভাবত, তারপর বলত, হ্যাঁ আর আছে অহঙ্কার। আমার হাতের অহঙ্কার। আল্লা আমার সঙ্গে আমার অহঙ্কারের জন্ম দিয়েছেন।

সে ঠিক ঠিক বুঝতে না পারলে বুড়ো মানুষটা বলত, আমি চাই আমার মতো এমন ফুলের চাষ কেউ আর করতে পারবে না। দিনমান খেটে, রাতে নদী থেকে জল এনে, রাতে কখনও বনে পাহাড়ের সব পাতা পুড়িয়ে এমন সব সার তৈরি করতাম—ভেবে অবাক হবে, সে সার না দিলে—ফুল কখনও এমন বড় হয় না। একটু থেমে সে ফুলের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত। তারপর বলত, আমি চাই না দুনিয়ায় আমার চেয়ে কেউ বেশি ফুলের চাষ ভালো জানুক।

সুবলের সঙ্গে সুখে দুঃখে ইমানদার মানুষটা এমন বলত।—আমার একটা লোভই আছে সুবল, কেবল জমি কিনে ফুলের চাষ বাড়িয়ে যাওয়া।

বুড়ো লোকটা আরও সব গল্প করত ওর সঙ্গে। সে ফিরে যখন বন থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে রাতের আহার তৈরি করত—তখন বুড়ো মানুষটার গল্প আরম্ভ হত। কারণ সে চোখে দেখতে পায় না বলে, রাজ্যের সব গল্প মনে করতে পারে। সুবলকে সে সব দিয়ে দেবার পরই কেমন আরও বেশি বুড়ো হয়ে গেল। সুবল যাদের নিয়ে চাষবাস বাড়াচ্ছে তাদের সন্ধ্যা হলেই ছুটি দিয়ে দেয় বলে, জায়গাটা কেমন আরও বেশি নির্জন হয়ে যায়। নদীতে কখনও নৌকার লগির শব্দ কানে আসে। বৈঠা মেরে কেউ হয়তো গান গেয়ে চলে যায়। আর সূর্যাস্ত হলে যখন হাত—পা ধোবার জল এনে দেয় টিউকল থেকে, বুড়ো মানুষটা কেমন আন্দাজে গল্প আরম্ভ করে দেয়। নীচে যেসব ঘাসের চটান আছে তার একপাশে সুবল রান্না আরম্ভ করে দেয়। সোজা রান্না। নদী থেকে মাছ আসে। বুড়ো মানুষটা চাপিলা মাছ খেতে খুব ভালোবাসে। বিকেলে সেই মানুষটা এসে বেশ কয়েকটা বড় মাছ রেখে দিলে আন্দাজে হাত দিয়ে টের পায় মাছগুলো খেতে খুব ভালো লাগবে।

বুড়ো মানুষটার সামনে একটা হ্যারিকেন জ্বালা থাকে। মাদুরে সে বসে থাকে। পা দুটো তার ভাঁজ করা। মাথায় সাদা কাপড়ের টুপি। নানারকমের কারুকাজ টুপিতে। খুব সূক্ষ্ম সুতোর কাজ। সুবল ওর লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, টুপি রোজ ধুয়ে রাখে। খুব সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার শখ এই মানুষটার, যেমন সে ভাবে এই সরল পৃথিবীতে আল্লা অথবা ভগবান যেই হোক না সব কিছু রেখে দিয়েছেন মানুষের জন্য। মানুষ সেটা পরিশ্রম করে পাবে। ওর খুব ভাবতে কষ্ট হয়, সে কিছু এখন আর করতে পারে না। কাজ না করলে ঈশ্বর চিন্তা হয়।

মাঝে মাঝে সে যখন এমন ভাবে তখন তার হাই ওঠে। সুবলের মাছের ঝোল টগবগ করে ফুটছে। সে সুন্দর কালোজিরে সম্ভারে বেগুন দিয়ে জিরে লংকার কেমন সব সুস্বাদু খাবার করে। অথবা সে যখন মাছ সাতলায় তার ঝাঁঝ নাকে লাগলে বেশ খিদেটা বেড়ে যায়। তখন আর বুড়ো মানুষটা বসে থাকতে পারে না। সে বারান্দা থেকে নেমে সুবলের কাছে চলে গেলে, মনে হয় বেশ একটা নির্জন পৃথিবীতে তারা বেঁচে আছে। অনেক দূরান্তে বন থেকে কিছু জীবজন্তুর ডাক, অথবা পাখপাখালির আওয়াজ এবং সে চুপ করে থাকলে পৃথিবীর যাবতীয় কীটপতঙ্গের আওয়াজ টের পায়। সে তখন চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। কিছুটা যেন গল্প করে সময় পার করে দেওয়া অথবা গল্প করে খিদের কথা ভুলে থাকা। তাই ওর গল্পে এমন সব কথা থাকে —বুঝলি, আল্লা আমাদের খুব সরল।

সুবলের স্বভাব অন্য রকমের।—তুমি আবার কেন চাচা বাইরে এলে। ঠান্ডা না লাগালে বুঝি চলে না। সুবলের মাঝে মাঝে শখ হলে বুড়ো মানুষটাকে চাচা বলে ডাকে। এমন একটা ডাক খোঁজ সে চায়! সে ভালোবাসে সুবল তাকে চাচা বলে ডাকুক।

সে উনুনের পারে বসে কেমন কিছুটা তাপ নেবার মতো হাত বাড়িয়ে বলল, তোর উনুনের আঁচটা ভালো লাগছে। তারপর কেমন যেন সরল মানুষের মতো বলা, আমার খুব খিদে লেগেছে সুবল। তুই আমাকে খেতে দে। তোর কেবল কাজ আর কাজ।

—তুমি না বললে চাচা, আল্লা মানুষের জন্য পৃথিবীতে সব কিছু রেখে দিয়েছেন। পরিশ্রম করে তাকে সেটা পেতে হবে।

—খিদে লাগলে সব ভুলে যাই।

—আমি তো তোমার জন্য তাড়াতাড়ি করছি। সারাদিন পর দুটো খাবে—

—আমি কাঠ ঠেলে দিচ্ছি। তুই যা! কলাপাতা কেটে আন।

—রাতে কেউ গাছ থেকে পাতা কাটে!

—ওরা যে বলল, তুই কেটে রাখিসনি।

ওরা মানে যারা কাজ করে। কাজের শেষে ফিরে যাবার সময় বুড়ো মানুষটার কাছে এসে ওরা দাঁড়ায়। বলে, চাচা যাচ্ছি।

—যা। একটু থেমে বলে সুবল তোদের টাকাপয়সা দিয়েছে?

—দিয়েছে চাচা।

—আমাদের জন্য দু জোড়া কলাপাতা কেটে রেখে যাস। নিত্য এটা কেমন বলার স্বভাব মানুষটার।

ওরা বলল, সুবল বলেছে কেটে রাখবে। আমাদের কাজ সারতে সারতে একটু দেরি হয়ে গেল চাচা।

—ও কী করছে?

—আসছে। নলচিতা গাছের দুটো বেড়া কার গোরু ভেঙে দিয়ে গেছে। আজ সারাদিন আমরা ওটাই করলাম। ও ঘুরে ঘুরে দেখছে আরও কোথাও এমন হয়েছে কী না!

—আমাকে ও আজকাল কিছু বলে না।

—বললে তুমি কষ্ট পাবে।

—আমি কষ্ট পাব কেন?

—তোমার এমন সুন্দর বাগান কেউ নষ্ট করলে কষ্ট পাবে না?

—সে তো শুনছি খুব চাষবাস বাড়াচ্ছে।

—ওর জন্য আমাদের এখন আর শহরে যেতে হয় না চাচা। সুবল আমাদের শহরের চেয়ে বেশি পয়সা দিচ্ছি।

এমন বললেই বুড়ো মানুষের যা হয়—সেই ঈশ্বরপ্রীতির কথা, অর্থাৎ আল্লা আমাদের খুব সরল। তিনি পৃথিবীতে চান সরল এবং ভালো মানুষেরা বাঁচুক। তারপরই তিনি সেই মহামহিমের জন্য কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ

করে রাখেন, যেন বুঝতে পারেন, আছেন, চারপাশেই আছেন তিনি। সব লতাপাতার ভিতর ফুলফলের ভিতর, এবং সব গ্রহনক্ষত্র আর সৌরলোক, যা কিছু আছে চারপাশে—তিনি আছেন। কোনও উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন। তিনি রাজার রাজা। তিনি সবচেয়ে প্রাজ্ঞ। যা কিছু আছে আকাশে, আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁর। তিনি জানেন সব কিছু—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁর অন্তর্লোকের রহস্য। তিনিই জানেন একমাত্র কী আছে সামনে আর কী আছে পিছনে। তাঁর আসন আকাশ আর পৃথিবীর ওপরে বিস্তৃত আর এই দুইয়ের তিনি নিশিদিন রক্ষাকারী। তিনি তার জন্য এতটুকু ক্লান্ত বোধ করেন না। আর সেজন্য তিনি মহীয়ান, মহামহিম।

সুবল তখন এসে বলল, চাচা তুমি খাবে।

মানুষটার চোখমুখ কেমন উদাসীন দেখায় তখন। চুপচাপ বসে থাকে। খাবার কথা সে ভুলে যায়। তাকে যে খেয়ে নামাজ পড়তে হবে সে যেন তা আর মনে রাখতে পারে না। সেই থেকে, অর্থাৎ সেই যখন পরিশ্রমী মানুষেরা চলে গেল, এবং সে বসে থাকল একা মাদুরে—তারপর সুবলের ফুলের চাষবাস দেখে ফেরা, এবং এসব কেমন যেন তার উদাসীনতার ভিতর পার হয়ে গেছে। সে যে উত্তাপ নেবার জন্য উনুনের পাশে বসেছিল, সেও কিছুটা বোধহয় সেই অন্তর্যামীর ইচ্ছা, সে যে খিদে লেগেছে বলেছে, সেও বোধহয় তাঁর ইচ্ছা। এবং এই বুড়ো মানুষের যা স্বভাব খেতে খেতে কেমন আনমনে হয়ে বসে থাকা তাও।

সুবলেরও স্বভাব হয়ে গেছে, খাও চাচা। তোমার মাছ বেছে দিচ্ছি। এই বলে সে বেশ ডেলার উপর মাছ রেখে দিলে হাত টিপে টের পায় মানুষটা—সুবল বড় যত্নে সব কিছু করে যাচ্ছে।

সে তখন বলবে, সুবল তুই তোর ধর্ম মানিস?

—ঠিক বুঝি না চাচা। ধর্মের কথা মনে হলেই সেই জনার্দন চক্রবর্তীর কথা মনে হত। আর আমাদের ছিল সুবচনি দেবীর মন্দির। ওর ভীষণ বিশ্বাস ছিল, দেবীর ক্রোধে আমাদের দেশটায় খরা এসে গেল।

বুড়ো মানুষটা বলল, তোরা সবাই চলে এলি, সে থেকে গেল।

—ওর ছিল প্রচণ্ড অহঙ্কার। ও ছিল ঠিক তোমাদের মুসার মতো।

রাতে যখন ওরা শোয়, ঘরের দু—পাশে দুটো বাঁশের মাচান, মাচানে নকশি কাঁথার বিছানা, তার পাশে ফুল, বেলফুল, রজনিগন্ধা অথবা গন্ধরাজ ফুল এবং কখনও সব নীল অপরাজিতা, জবা ফুল, চামেলি, চাঁপা কত যে ফুল নিয়ে বেঁচে আছে এই উপত্যকা আর তার ভিতর আছে একটা লাল টালির ঘর, সেখানে সুবল আর চাচা শুয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে কেবল নানারকম গল্প করে যাওয়া। বুড়ো মানুষটা খুব বেশি মুসার গল্প বলতে ভালোবাসত। সেই থেকে সুবল একটা মানুষের সঙ্গে কেবল জনার্দন চক্রবর্তীর মিল পায়, তার নাম মুসা। মুসার মতো আত্মবিশ্বাস ছিল মানুষটার। কেবল লাঠিটা ছিল না হাতে। অথবা যে লাঠি ছিল, সেটা বুঝি ঈশ্বরপ্রদত্ত ছিল না। না হলে মুসা সেই যে তাঁর লোকদের জন্য জল চাইলেন, আর তখনই দৈববাণী, তোমার আসা (লাঠি) দিয়ে পাথরে মারো। সেই মুসা তার লাঠি দিয়ে পাথরের পর পাথর ছুঁয়ে গেল, আশ্চর্য, নীল পর্বতমালার নীচে, শুকনো মরুভূমিতে বারোটি জলের প্রস্রবণ। জল পান করো মনুষ্যগণ। আল্লাহ যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও আর পান করো! অন্যায়কারী হয়ে দেশে অপবিত্র আচরণ করো না।

যখন সেই উপত্যকায় সাদা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে থাকত, আর ফুলেরা ফুটতে থাকত, এবং সব ফুলেদের ফোটার ভিতর আশ্চর্য উল্লাস থাকত, বুড়ো মানুষটা শুয়ে শুয়ে তা টের পেত। সে বলত, সুবল আমাকে নিয়ে একটু ঘুরে বেড়াবি। আমাকে একটু গোলাপের বাগানে নিয়ে যাবি। অথবা চামেলি গাছটার নীচে তুই আর আমি কিছুক্ষণ বসে থাকব।

ছেলেমানুষ সুবল। সারাদিন খাটাখাটনি করে তার ঘুম পায়। সে এখন সপ্তাহান্তে যায় বড় শহরে। টুকুন এখন কত বড় আর লম্বা হয়েছে। সে যায় সদর দরজা দিয়ে। টুকুন আরও সুন্দর করে সাজে তখন। এবং যে দিনটাতে সে শুনেছে ইন্দ্র আসে না। টুকুনের ভয় কেন যে ইন্দ্রকে নিয়ে। সেতো কোনও পাপ কাজ করেনি।

টুকুনদিদিমণির মুখ চোখ, এবং যখন সেই পিয়ানোতে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে চোখ বুজে গান গায়, ওর ববকরা চুল ঘাড়ে রেশমের মতো উড়তে থাকে তখন সে কেমন এক আশ্চর্য সুষমা টের পায় টুকুনের শরীরে। ঈশ্বর টুকুনকে যেন এতদিন অপবিত্র করে রেখেছিল। টুকুনের শরীর দেখে অর্থাৎ টুকুনের সব কিছু মা হবার জন্য যখন উন্মুখ, টুকুনকে কী করে আর ঈশ্বর অপবিত্র রাখেন। পবিত্র মুখে সুবলের জন্য ভীষণ মায়া। সুবলও যখন আসে বেশ সুন্দর পোশাকে আসে। সে তার ঘাড়ে একটা রঙবেরঙের ব্যাগ রাখে। ব্যাগে থাকে যাবতীয় সব কেয়াফুল। সুবল এলেই সব মানুষেরা টের পায় সুন্দর সুগন্ধে গোটা বাড়িটা ম ম করছে। অথচ কেউ টের পায় না, একজন মানুষ গ্রাম থেকে চলে আসছে, সদর দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, ঘোরানো সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে, এবং এ সময় টুকুন ঠিক থাকবে। অন্য দিকের দরজা ঠিক বন্ধ থাকবে—কিন্তু রোজ এখন এটা করতে পারে না। টুকুন ভালো হয়ে গেছে বলে তাকে ইন্দ্রের কাছে গাড়ি চালানো শিখতে হয়। ভালো হয়ে গেছে বলে আত্মীয়স্বজনেরা, বন্ধুবান্ধবেরা তাকে ঘিরে থাকতে ভালোবাসে। অথচ সুবল টের পায়—বড় অস্বস্তি টুকুনের। সে যখন যা ভাবছে, একটা বাওবাব গাছের চারা পেলেই টুকুনদিদিমণিকে এখানে নিয়ে আসতে পারবে। এবং এতসব ভাবনায় সে রাতে বড় ক্লান্ত থাকে। ওর ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু বুড়ো মানুষটা টের পেয়েছে ফুলেরা ফুটছে। সে সাদা জ্যোৎস্নায় বসে চুপি চুপি ফুলেদের ফুটতে দেখবে। এবং মনে হয় যে তখন মহামহিম আলাহ্‌র করুণা সব ফুলে ফুলে আশ্চর্যভাবে টের পায়। বুড়ো মানুষটা চুপচাপ তখন, কেবল গাছের নীচে বসে থাকতে ভালোবাসে।

সেও বসে থাকে চাচার সঙ্গে। সামনের জমিটা বেলফুলের। হেমন্তের শেষাশেষি এটা। শীতকাল আবার আসবে। এখন সাদা জ্যোৎস্নায় শীতটা ওদের বেশ লাগছিল। একটা পাতলা কাঁথা বুড়োর গায়ে দিয়েছে সুবল। এমন জবুথবু হয়ে বুড়ো মানুষটা এখন ফুলের সৌরভ নিচ্ছে।

এমন দেখলেই সুবলের বলতে ইচ্ছা হয়, চাচা তুমিতো অনেক জানো, এখানে কোথায় বাওবাব গাছ পাওয়া যায় বলতে পার?

অনেকক্ষণ পর বুড়ো মানুষটা সুবলের দিকে তাকায়।—কীরে আমাকে কিছু বলছিস!

—একটা বাওবাবের চারা না হলে যে চলছে না।

—এটা এখানে পাবি কোথায়? সেতো ছোট্ট রাজপুত্রের দেশের গাছ।

এমনি হয়, কারণ ওদের কথা কিছুই সংগোপনে থাকে না। সুবল যেসব গল্প টুকুনের কাছে শুনে আসত, সব এসে হুবহু বুড়ো মানুষটাকে বলত। ইদানীং তো সুবলের সন্ধ্যার পর কথা বলার আর কেউ থাকে না। কেবল বুড়ো মানুষটার সঙ্গে যত কথা। সে উনুনে মাটির হাঁড়িতে ভাত সেদ্ধর সময় অথবা যখন ডাল সেদ্ধ হয় উনুনে এবং আগুনের তাপে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে যায়—তখন নিবিষ্ট মনে যত রাজ্যের গল্প সে চাচার সঙ্গে জুড়ে দেয়।

—ছোট্ট রাজপুত্রের দেশে যদি আগ্নেয়গিরি থাকে, যদি নদী থাকে, এবং সমুদ্র থাকে তবে আমাদের পৃথিবীতে একটা বাওবাব থাকবে না।

—তা বটে। বলে কেমন একটা হাই তুলল।

—তোমার ঘুম পাচ্ছে চাচা। এবারে ওঠো।

—তোর ঘরে শুয়ে থাকতে এখন ভালো লাগবে।

—খুব।

—তুই তবে মানুষ না।

—তা যা খুশি বলতে পারো।

কেমন আসমান, তারা, চাঁদ, আর দ্যাখ যেদিকে চোখ যায় তোর মনে হবে একটা ফুলের জগতে বসে আছিস। দূরের জ্যোৎস্নায় কেমন ফুলের সৌরভ ভেসে যাচ্ছে দ্যাখ।

বুড়োরা এমন ধরনের কথা বলেই থাকে। সুবল সেজন্য মনে কিছু করে না। কেবল মাঝে মাঝে কথায় সায় দিয়ে যায়। এবং কথা না থাকলে টুকুনের কথা ঘুরে ফিরে আসে।

—জানো চাচা, টুকুন দিদিমণি এখন গাড়ি চালাতে শিখছে।

—টুকুনের জন্য তোর খুব কষ্ট সুবল। কারও জন্য কোনও কষ্ট মনে মনে পুষে রাখবি না। তবে দুঃখ পাবি।

—তুমি বুড়ো হয়ে গেছ বলে এমন কথা বলছ।

বুড়ো হলে মানুষ অনেক কিছু বুঝতে পারে সুবল।

সুবল এবার বলল আমার কোনও কষ্ট নেই। আমি গাঁ থেকে এসেছি। জলের জন্যে এসেছিলাম। এখন ফুল বেচে খাই! তুমি আছো, এমন একটা ফুলের উপত্যকা আছে আর কিছুদূর গেলে নদী, তার পাড়ে বন আছে, আমার দুঃখ কী চাচা।

—তোর কথা শুনলে আমি সব বুঝি। তোর কতটা কষ্ট আমি ধরতে পারি।

ওরা এভাবে কখনও সকাল করে দেয়। এবং যখন ফুলের দালালেরা আসে, সুবল ফুল তুলে দেয় তাদের। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো মানুষকে খাইয়ে এবং নামাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে সুবল চলে যায় নদীতে। সে নদীর পাড়ে সব ছেড়ে জলে নেমে যায়। তার এভাবে নদীর জলে সাঁতার কাটতে ভীষণ ভালো লাগে। ও—পাশে বন, বনে নানারকম গাছ, সে সব গাছের নাম জানে না, বুড়ো মানুষটা জানে। সে আগে মাঝে মাঝে বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে বনে আগুন জ্বালতে গেলে কখনও কখনও সে কিছু গাছের নাম জেনে নিয়েছে। বাকিগুলো জানা যায়নি। জানতে জানতে কখন বুড়ো মানুষটা চোখে কম দেখতে থাকল। তাকে আর রোজ নিয়ে সে নদীর ওপারে যেতে পারত না। তাকে একা একা বনের শুকনো পাতা ঘাস কুড়িয়ে আনতে হত সারের জন্য। এবং এই সার তৈরি করা সে বুড়োর কাছেই জেনেছে। তিনি বলেছেন, তোমায় এই দুনিয়াতে আল্লা সব দিয়ে দিয়েছেন, তুমি বাপু করে কম্মে খাও। এমন কিছু নেই যা সংসারে অবহেলার। গাছ তার অতিরিক্ত সব কিছু অর্থাৎ পাতা ডাল, সময় হলে পরিত্যাগ করে, তুমি তা থেকেই অমূল্য সব বস্তু নির্মাণ করে নিতে পারো। বুড়ো মানুষটা আল্লার কথায় এলেই কেমন সাধুভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করে।

সুতরাং সাঁতার কাটতে কাটতে সে কখনও নদীর ওপারে ওঠে, বনে ঢুকে যায়। বনে কোনও মানুষের ছায়া থাকে না। বড় শহর থেকে ঘণ্টাখানেকের পর ট্রেনে এলে, এবং একটা বড় মাঠ পার হয়ে গেলে এমন একটা নদী, এমন একটা ফুলের উপত্যকা, এমন একটা ছোট্ট বন, সবুজ লতাপাতা ঘাস নিয়ে ক্রমে ঈশ্বরের পৃথিবীতে বড় হচ্ছে টের পাওয়া যায় না।

সুবল বেশ হেঁটে যাচ্ছিল। একা এই বনের ভিতর একজন আদিম মানুষের মতো তার হেঁটে যেতে ভালো লাগছিল। সেই যে সে মুসার গল্প শুনেছে, সেই যে সে আদম ইভের গল্প শুনেছে, অর্থাৎ প্রাচীনকালে মানুষ বনে পাহাড়ে থাকত অথবা প্রথম মানুষ আদম—ইভের জ্ঞানবৃক্ষের ফল চুরি করে খাওয়া সব তার একসঙ্গে মনে পড়ছে। এবং মনে হয় সে বেশ ছিল, ভালো ছিল, যেন সে ট্রেনে চড়ে শহরে চলে এসেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেছে। কেমন তার উচ্চাশা, এবং আকাঙ্ক্ষা তাকে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে খুব ছোট করে দিচ্ছে। এমন মনে হলেই চুপচাপ একটা গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টুকুনদিদিমণির কথা মনে হয়। দিদিমণির সেই রুগণ মুখ, বিবর্ণ ছবি চোখে ভেসে ওঠে—তারপর সে কী করে যে আশ্চর্য এক পাখির খেলা দেখিয়ে দিদিমণিকে নিরাময় করে তোলার সময় তার জানা ছিল না, এক আশ্চর্য জাদুকরের খেলায় সে দিদিমণির ভিতরে ভালোবাসা সঞ্চার করেছে। পৃথিবীতে বুড়ো মানুষটাই কেবলমাত্র তার কষ্টটা বুঝতে পারে। সে যে নিশিদিন ফুল ফুটিয়ে বেড়ায় কেউ জানে না দুঃখটা কোথায়। টুকুন দিদিমণির সঙ্গে এখন সে একা একা কথা বলতে পারে। সে সেজন্য এখন বনে ঢুকে গেলে দেখতে পায় যেন সে ছোট্ট রাজপুত্র হয়ে গেছে। একটা বাওবাবের নীচে সে আর টুকুনদিদিমণি দাঁড়িয়ে। বুড়ো মানুষটা যাচ্ছে হেঁটে! ফুলের সৌরভ তখন কেবল ভেসে আসছিল। বুড়ো মানুষটা তখন লাঠি তুলে যেন বলছে, সুবল তোর ঈশ্বর তোকে অহঙ্কার

দিক, তুই ভালোভাবে বেঁচে থাকতে শেখ। ঈশ্বরের পৃথিবীতে ভালোবাসার দাম সবচেয়ে বেশি। তাকে হেলা ফেলা করতে নেই।

সতের

ইন্দ্র বলল, বেশ হাত দেখছি।

—বেশ বলছ?

—এমন একটা জ্যামের ভিতর থেকে বেশ কায়দা করে গাড়িটা বের করে দিলে।

—তাহলে আমি একা একা চালাতে পারব বলছ?

—সে তো কবে থেকে তুমি চালাতে পারো।

—তবে মা দিচ্ছে না কেন?

—মাসিমার ভীষণ ভয়।

টুকুনের বলতে ইচ্ছা হল ভয় না হাতি। মা একা ছেড়ে দিচ্ছেন না, পাশে সেই যে যুবক বড় হচ্ছে ফুলের উপত্যকায়, সেখানে সে না চলে যায়। মা টের পেলে বলেছিল একদিন, টুকুন এটা তোমাকে মানায় না।

টুকুন যেন বুঝতে পারছে না, এমনভাবে বলেছিল, কী মানায় না মা?

—তুমি তা ভালো করেই বোঝ।

টুকুনের মনে হল, সেটা সে আজও ঠিক বোঝে না। সে আসত পালিয়ে পালিয়ে। পাঁচিল টপকে আসত। তার এমন নিত্য আসার সময় একদিন ধরা পড়ে গেলে—বাড়িতে হইচই। মা, বাবা, সব মানুষেরা ওকে বলেছিল, ছিঃ ছিঃ টুকুন, তুমি কত বড় বংশের মেয়ে।

টুকুনের বলার ইচ্ছা হয়েছিল, সে এলে আমি মা আমার ভিতরে থাকি না। কী সুন্দর এক জগতের সে বাসিন্দা মা। সে তার ফুলের উপত্যকায় নিয়ে যাবে মা, সেখানে গেলে মানুষের বুঝি কোনও দুঃখ থাকে না!

মা বলেছিল, আমাদের দিকটা একবার ভেবো।

সুবল কিছু বলছিল না। সে সত্যি অপরাধ করে ফেলেছে। তার উচিত হয়নি এভাবে। সে কিছুটা মাথা নীচু করে রেখেছিল। কেবল মজুমদার সাহেব পাইপ টানতে টানতে কেমন একটা মজা অনুভব করেছিলেন। এবং সে যে একেবারে ভীষণ কিছু করে ফেলেনি সেটা যেন মজুমদার সাহেব হ্যাঁ বা না—র ভিতর কিছুটা প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি এমনভাবে কথা বলেছিলেন যে, দ্যাখো সুবল, তুমি এভাবে না এসে সদর দিয়ে এলেই পারো। তুমি তো সুবল ফুল বিক্রি করে খাও। তোমার তো মানুষের ভালো দেখাই স্বভাব। তুমি কেন তবে এভাবে আসবে।

সুবলও ভেবেছিল, তা ঠিক, এভাবে না এসে সে সদর দিয়েই আসবে। সে বলেছিল, আমি সদর দিয়েই তবে আসব।

টুকুনের মার চোখ মুখ ভীষণ খারাপ দেখাচ্ছে। কী নির্লজ্জ বেহায়া। দ্যাখো। মান অপমান বোধটুকুও নেই। টুকুনের মা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তবে এতদিন নচ্ছার ছোঁড়াটা এভাবে পালিয়ে এসে কীনা করেছে। সে বলল, তুমি আসবে না। এলে তোমাকে পুলিশে দেব।

টুকুন বলল, পুলিশে দেবে কেন মা? সে চোর না মিথ্যাবাদী।

—দেখছো মেয়ের সাহস। বলেই টুকুনের মা ভীষণ জেদি মেয়ের মতো দুপদাপ কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে এল। এবং মজুমদার সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, সব তোমার আসকারাতে। তুমিই এজন্য দায়ী।

—রাগ করছ কেন? ব্যাপারটা একবার ভেবে দ্যাখো না।

—ভাববার কী আছে! তুমি বরং ভাবো। তোমাদের যা খুশি করবে। আমি কিচ্ছু বলব না। এতবড় বাড়ি, তুমি এতবড় মানুষ, তার মেয়ে এমন হলে মান সম্মান আমাদের থাকবে!

আর তখনই মজুমদার সাহেব দেখলেন, পার্লারে বেশ লোকজন জমে গেছে। সদর থেকে দারোয়ান হাজির। আমলা কর্মচারীরা হাজির। তিনি বললেন আপনারা যান। এবং এই যান বলতেই যান—একেবারের কথাতেই কেমন নাটকের কুশীলবের মতো যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন মাত্র আছেন, তিনি টুকুনের মা, টুকুন আর সুবল। মজুমদার সাহেব বললেন, সুবল বোস। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের সুবলের চোখ দুটো ভারী সুন্দর।

টুকুন বলল, ওর মুখটাও ভারী সুন্দর। আর সুবল কী লম্বা, না বাবা।

সুবল এসব বুঝতে পারছে না। ওর চেহারার প্রশংসা হচ্ছে। সে সাদা পায়জামা পরছে। ঝোলা গেরুয়া পাঞ্জাবি। সে রঙবেরঙের ব্যাগ রেখেছে বগলে। ভিতরে নানা বর্ণের ফুল। এবং আশ্চর্য গন্ধের ফুল। এই ঘরে এমন ফুলের সৌরভ যে বেশিক্ষণ রাগ নিয়ে বসে থাকা যায় না। ফুলের সৌরভে মন প্রসন্ন হয়ে যায়। এবং সবারই মন যখন প্রসন্ন হয়ে যাচ্ছিল, বাড়ির সবারই অর্থাৎ দাসীবাঁদিদের পর্যন্ত তখনও কিনা টুকুনের মা ভীষণ অপ্রসন্ন। সেই ছোঁড়া তিন চার বছর যেতে না যেতে কী হয়ে গেল। ট্রেনের সুবল আর এ সুবল একেবারে আলাদা মানুষ। আর বেশ জালটি পেতেছে। অসুখ ভালো করার নামে সেই যে ছারপোকার মতো লেগে থাকল আর যাবার নাম নেই। সে বলল, বাপু তুমি এখানে আসবে না। আমি সোজা কথার মানুষ, সোজা ভাবে বুঝি। টুকুন এখন বড় হয়েছে। সুবলও যে বড় হয়েছে। সুবলও যে বড় হয়েছে সেটা বলল না। —খুব খারাপ এভাবে আসা।

—আর আসব না। সুবল এমন বলে উঠতে চাইলে, মজুমদার সাহেব লক্ষ্য করলেন টুকুনের চোখ মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

তিনি কী বুঝতে পেরে বললেন, না না, তুমি আসবে বৈকি।

টুকুনের মুখ চোখ ফের এটুকু বলে লক্ষ্য করতেই বুঝলেন, যে রক্তশূন্যতা সহসা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, এ কথার পর তা আবার কেমন স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি এবার বললেন, রোজ আসবে না। ওর তো এখন অনেক কাজ। পড়াশোনাটা আবার আরম্ভ করতে হচ্ছে। সকালে ইন্দ্র গাড়ি চালানো শেখায়। বুধবার সন্ধ্যায় টুকুন ক্লাবে সাঁতার শিখতে যায়। সোমবার রাতে গিটার বাজনা শিখছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ খুব ব্যস্ত টুকুন। টুকুনের ভালো তো তুমি চাও। তুমি বরং এক কাজ করবে। রবিবার বিকেলে তুমি আসবে। টুকুন সেদিন ফ্রি থাকার চেষ্টা করবে। কী বলিস টুকুন!

এসব শুনে টুকুনের মা কী যে করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মানুষটা যে দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছে! কোথাকার কে একটা ছেলে—তাকে মুখের ওপর বলতে পারছে না, না তুমি আসবে না। কী অসহায় চোখ মুখ মানুষটার। টুকুনের মার এসব ভাবতে ভাবতে মাথাটা কেমন গরম হয়ে যাচ্ছে। ওর নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছিল। মেয়েটাকে এভাবে একটা অপোগণ্ড মানুষের সঙ্গে ছেড়ে দিচ্ছে! মান সম্ভ্রম বলে কিছু নেই আর কী আশ্চর্য মানুষটা সুবলের সঙ্গে কথা বলছে ঠিক সমকক্ষ মানুষের মতো।—তুমি সুবল এখন কী করছ? আহা ঢং! সে নিজের কাপড়ের আঁচল অস্থির হয়ে একবার আঙুলে জড়াচ্ছে আবার খুলছে। ওপরে সিলিংফ্যানটা পর্যন্ত তাকে ঠান্ডা করতে পারছে না। ঘড়িতে সাতটা বাজে। চারপাশে নানারকম আলো জ্বলছে। দেয়ালে সব বিচিত্র ছবি। নানা রঙের ছবি। কোথাও বাঘ হরিণের পেছনে ছুটছে। কোথাও শিকারি, টুপি খুলে গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছে, আবার কোনও ছবিতে সূর্যের রং চড়া। আর সূর্য ওঠার নাম নেই অথচ একদল রাজহাঁস জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। এবং ঝাড়লণ্ঠনে একটা চড়ুই পাখি, আলো—আঁধারের খেলায় এসময় বেশ মেতে গেছে। ঠিক নীচে জেরার মুখে সুবল।

এটা চড়াই পাখি না সুবলের পাখি রাতের বেলায় টের পাওয়া কঠিন। এবং কঠিন বলেই পাখিটা নিজের খুশিমতো কার্নিশে বসে বেশ ডেকে চলেছে। সে বুঝতে পারছিল বুঝি বেচারা টুকুনের মা বেশ বিপাকে পড়েছে। এই বিপাক থেকে রক্ষা পাবার কী যে উপায় স্থির করতে না পেরে খুব অস্থিরচিত্ত হয়ে গেছে।

এবং এভাবে টুকুনের সঙ্গে মাত্র রবিবার এক বিকেলে, একটা বিকেলই মাত্র সুবল থাকে তার সঙ্গে। সপ্তাহে এসময়টা টুকুনের খুব মনোরম। সে যেন এসময়টার জন্য সারাটা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকে। আজ শনিবার ইন্দ্র ওকে রেড রোডে নিয়ে এসেছে। রেড রোডে ইন্দ্র গাড়ির স্টিয়ারিং টুকুনের হাতে দিয়ে বেশ চুপচাপ বসে আছে। টুকুন নানাভাবে বেশ অনায়াসে গাড়ি চালাতে পারছে বলে ইন্দ্রের ভাবনা কম। আর টুকুন সেই স্ল্যাকস এবং ঢোলা ফুলহাতা সার্ট অর্থাৎ ফুলফল আঁকা সিল্কের পাতলা পোশাক পরে বেশ অনায়াসে গাড়ি চালিয়ে মাঠের চারপাশে, কখনও গঙ্গার ধারে ধারে আবার এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসের পাশ দিয়ে এবং মেডিকেল কলেজ ঘুরে সোজা ফুলবাগান পার হয়ে ভি—আই—পি। তারপর আরও সোজা লেক টাউন, কেষ্টপুর এবং দমদম বিমান ঘাঁটি ডাইনে ফেলে কোনও গ্রামের ভিতর গাছের ছায়ায় সহসা গাড়ি থামিয়ে দিলে মনেই হয় না কিছুকাল আগেও এ—মেয়ের কথা ছিল মরে যাবে। আগামী শীতে অথবা বসন্তে মরে যাবে। সুবল এসে ঠিক এক জাদুকরের মতো তাকে কী করে যে ভালো করে তুলেছে?

এভাবে টুকুন আজ বিশ্বাসই করতে পারে না, তার একটা অসুখ ছিল। সে যে শুয়ে থাকত সব সময় এবং হেঁটে যেতে পারত না, এমনকি দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল, কিছুতেই সে তা বিশ্বাসই করতে পারে না। সে যেন এমনই ছিল। তার কথা ছিল অনেক দূর যাবার। ঠিক মানুষের খোঁজে সে আছে। ইন্দ্র চেষ্টা করছে ওর পাশে পাশে থাকার। কিন্তু ইন্দ্রকে সে এখনও তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। ইন্দ্রকে পাত্তা দিলে মা খুব খুশি হবে—অথচ সে কেন যে পারে না। বেশ এই যে গাছের নীচে সে এবং ইন্দ্র বসে আছে, ইন্দ্র ফ্লাস্ক থেকে টুকুনকে চা ঢেলে দিচ্ছে, সবটাই কেমন আলগা মানুষের মতো ব্যবহার। এবং চা ঢেলে দেবার সময় ইন্দ্র দেখল, কী সুন্দর আঙুল, চাঁপার ফুলের মতো ছুঁয়ে দিলেই কেমন মলিন হয়ে যাবে—আর বাহুতে কী লাবণ্য—এবং টুকুনকে এত বেশি ঐশ্বর্যময়ী মনে হয় যে, একটু ছুঁতে পেলেই—সব হয়ে যায়—সে এই ভেবে টুকুনের পাশে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলে, টুকুন বলল, তুমি আমাকে একজায়গায় নিয়ে যাবে?

—কোথায়?

এমন একটা জায়গা, যেখানে কেবল ফুল ফোটে।

—জায়গাটা কোথায় আমার চেনা নেই।

সুবল সেখানে থাকে।

—সেই ফুলয়ালা সুবল!

সেই ফুলয়ালা সুবল, কথাটা তার ভালো লাগে না। সুবল সম্পর্কে সে আরও কিছু বলতে পারত, কিন্তু ইন্দ্র এই নিয়ে ঠাট্টা—তামাশা করবে। মাকে গিয়ে বলবে। সুবলকে নিয়ে ঠাট্টা—তামাশা তার ভালো লাগে না। মার কাছে সুবল একটা শয়তানের মতো। সুবলকে কীভাবে জব্দ করা যায়, অথবা সুবল একটা উইচ, সে মন্ত্রের দ্বারা বশ করেছে টুকুনকে, এসব গ্রাম্য লোকেরা নানারকমের তুকতাক জানে, এমন এক সুন্দর রূপবতী কন্যা আর ধন—দৌলত দেখে টুকুনকে সুবল বশীকরণ করেছে, এসব মা সব সময় ভেবে থাকে। আত্মীয়স্বজনের কাছে মা এসব বলে না। কেবল ইন্দ্রের বাবা এলে মা সব বলে। কী যে করা এখন। কারণ মার ইচ্ছা কোনও শুভ দিনে ইন্দ্র এসে ওর হাত ধরুক এবং এই যে কলকাতা শহর, রাস্তাঘাট, অথবা মেম

রিয়েল—কখনও কখনও উটকামাণ্ড একটা বড় নীল উপত্যকায় ইন্দ্রের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, এসব হলেই মা ভাবে টুকুন নিরাময় হয়ে যাবে। টুকুনের একটা অসুখ ছেড়ে আর একটা অসুখ এবং এটা মার কাছে ভীষণ অসুখ। বরং মার ইচ্ছা টুকুন আবার শুয়ে থাকুক, সে আর উঠতে না পারলে কোনও কষ্টই যেন নেই তার, তবু যে পারিবারিক সম্ভ্রম বজায় থাকে। মেয়েটা যা করছে, কিছুতেই পারিবারিক সম্ভ্রম আর রাখা যাচ্ছে না। মার হতাশ মুখ দেখলে টুকুন তা টের পায়।

টুকুন দেখল, বেশ একটা জায়গা, এমন নিরিবিলি জায়গায় তার বসে থাকতে ভালো লাগে। কাল সুবল আসবে। সুবল বলেছে, একটা বাওবাবের চারা পেলেই লাগিয়ে দেবে তার উপত্যকায়। এবং গাছটা ডালপালা মেলে ধরলে টুকুনকে নিয়ে যাবে। টুকুনকে এসেই যা সব গল্প করে তার ভিতর থাকে, কেবল

বুড়ো মানুষটা। নদীতে যে সে সাঁতার কাটে তাও বলে থাকে এবং কখনও তার কিছু ভালো না লাগলে নদীর ওপারে যে বন আছে, বনের ভিতর সে একা একা হেঁটে বেড়ায়—সে সব কথাও বলে।

অথবা টুকুনের ভারী সুন্দর লাগে যখন সুবল বলে, মাঠের ভিতর শীতের জ্যোৎস্নায় ভাত ডাল রান্না ও মাছের ঝোল রান্না। জ্যোৎস্নায় কলাপাতা বিছিয়ে ঘাসের ওপর বিছিয়ে খাওয়া ভারী মনোরম। এসব বললে, টুকুনের সেই ছোট্ট রাজপুত্রের মতোই মনে হয়, সুবল এমন একটা দেশের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে যেখানে তাকে আজ হোক কাল হোক চলে যেতেই হবে। সুবল কলাপাতা কেটে আনবে গাছ থেকে, সে ডাল ভাত রান্না করবে। রান্না করতে সে ঠিক জানে না। সুবল তাকে ঠিক শিখিয়ে নেবে। সে যা জানে না সুবলের কাছে জেনে নেবে। বিকেল হলে সে এবং সুবল যাবে নদীতে। কোনও মানুষজন না থাকলে নদীর অতলে ডুবে ডুবে লুকোচুরি খেলতে তার ভীষণ ভালো লাগবে।

ইন্দ্র দেখছে, টুকুন অনেকক্ষণ কিছু কথা বলছে না। কেমন চোখ বুজে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে।

ইন্দ্র বলল, কী ভাবছ টুকুন?

—ভাবছি, সুবল এখানে কোথায় বাওবাব পাবে?

—ইন্দ্র বলল, বাওবাব মানে?

—বা তুমি জানো না, বাওবাব এক রকমের গাছ, খুব পাতা, ওর শেকড় অনেকদূর পর্যন্ত চলে যায়।

—এমন গাছের নাম তো আমি জীবনে শুনিনি বাবা।

—টুকুন কেমন অবাক হল, বলল, বলছ কী, তুমি বাওবাব গাছের নাম জানো না! সে কী!

ইন্দ্র বলল, সুবল তোমার মাথাটি বেশ ভালো ভাবে খেয়েছে।

—তুমি ইন্দ্র যা জানো না, তা বলবে না।

—তবে কে এসব খবর দিচ্ছে তোমাকে।

—কে দেবে? বইয়ে এসব লেখা আছে।

—কোন বইয়ে?

টুকুন ওর সেই বইটার নাম করলে ইন্দ্র বলল, ওগুলো রূপকথা।

টুকুন বলল, মানুষের জীবনটাতো রূপকথার মতো। তাই না! এই যে সুবল কে কোথাকার মানুষ, এখন ফুলের গাছ কেবল লাগায়। কত রকমের সে ফুল নিয়ে আসে।

ইন্দ্র কেমন খেপে গেল এসব শুনে। মাসিমা ঠিকই বলছেন, তোমার একটা অসুখ সেরে আর একটা হয়েছে।

টুকুন লাফ দিয়ে উঠে বলল—সেটা কী?

—এই যে তুমি সব রূপকথা বিশ্বাস করছ।

—তোমরা বুঝি কর না?

—আমরা কী করি আবার?

—অনেক কিছু কর। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ভাবছে মা। ইন্দ্র এবার কেমন মিউ মিউ করে জবাব দিল, সেটার সঙ্গে রূপকথার কী মিল আছে?

—মায়ের কাছে এটা রূপকথার শামিল। মা তোমাকে নিয়ে খুব স্বপ্ন দেখছে। অথচ জানো, মা জানে না, আমি বিয়ে—থা করছি না।

—সেটা তোমার ইচ্ছায় হবে বুঝি?

—কার ইচ্ছায় তবে?

—মাসিমা মেসোমশাইয়ের।

টুকুন উঠে দাঁড়াল। কী যেন খুঁজছে মতো। সে বলল কোথায় যে সুবল বাওবাব পাবে। নদীটা ওর ফুলের জমি ভেঙে নিচ্ছে। বাওবাবের চারা নদীর পাড়ে পাড়ে লাগিয়ে দিতে পারলে খুব ভালো হত। ওর শেকড়

অনেক দূর চলে যায়। ছোট্ট গ্রহাণুর পক্ষে যা খুব খারাপ পৃথিবীর পক্ষে তা খুব দরকারি।

আঠার

রাত থাকতেই সুবলের ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। তখন আরও চার—পাঁচ জন লোক আসে। ওরা একসঙ্গে কাঁচি দিয়ে চারপাশ থেকে, যেসব ফুল ঠিকমতো ফুটে গেছে, আর বড় হবে না, সে—সব ফুল তুলে নেয়। প্রত্যেকের সঙ্গে বেতের ঝুড়ি থাকে। ফুলটা রেখে দেবার সময় খুব যত্নের দরকার হয়। রাস্তায় চার—পাঁচটা ছোট গাড়ি থাকে। গাড়িগুলো ছোট রেলগাড়ির মতো দেখতে। গাড়িতে বেশ নানাভাবে চৌকো মতো ঘর। এবং এক—একটা ঘরে ছোট ছোট ফুলের চুবড়ি সাজানো। কেবল রজনিগন্ধার ডাঁটগুলো সে আঁটি করে বেঁধে রাখে। মাঝে মাঝে ফুলের ওপর জল ছিটিয়ে দিতে পারে। সে অন্ধকারেই বুঝতে পারে কোথায় কে কী করছে। বেশ বড় এই ফুলের উপত্যকা। নদী ঢালুতে নেমে গেছে। নদীর পাড়ে দাঁড়ালে লাল ইঁটের দেয়াল এবং টালির ছাদের ঘরটা আশ্চর্য মায়াবি মনে হয়। সে অন্ধকারেও টের পায় জল তুলে আনছে সবুর মিঞা। সে ভারে জল আনছে। নিতাই তোলা ফুলে জল দিয়ে যাচ্ছে। কালু এখন তৈরি, যাবে স্টেশনে ফুল নিয়ে। সে অবশ্য ইচ্ছা করলে গাড়ি নিয়ে শহরে চলে যেতে পারে। কখনও কখনও দেরি হয়ে যায়, তখন অন্য জায়গা থেকে ফুল চলে আসে, ফুলের দাম ঠিকঠাক পাওয়া যায় না। ভোর রাতে যে গাড়িটা যায় এবং যে গাড়িতে এ অঞ্চল থেকে ডাব, মুরগি, হাঁস ডিম যায় শহরে, সেই গাড়িতে সুবল তার সব ফুল তুলে দেয়। দালালদের ফুল দিলে সে ঠিক পড়তা করতে পারে না। মোটামুটি ফুলের কারবারে অনেক মানুষ জন খাটছে। এবং মাইল দুই গেলে, এক জনপদ গড়ে উঠেছে। ফুল সব মানুষদের—এ অঞ্চলের, এমনকি যারা শহরে গেছিল—তারা পর্যন্ত ফিরে এলে তাদের নিয়ে বেশ একটা ফুলের চাষবাস করে দিলে বুড়ো মানুষটা খুব খুশি।

সে বুড়ো মানুষটার জন্য একটা বড় কাঞ্চন গাছের নীচে বেদি বাঁধিয়ে দিয়েছে। দিনের নামাজ বুড়ো সেখানে করে নেয়। রাতেও সেখানে মানুষটা নামাজ পড়ে। এবং চারপাশে থাকে তখন সাদা কাঞ্চন ফুল। বিকেলে কোনও কোনও দিন গাড়িতে ফুল যায়। তখন সুবল বেশ সুন্দর একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, পায়ে সাদা কেডস এবং হাতে কিছু রজনিগন্ধা নিয়ে যখন গাড়ির মাথায় বসে থাকে, বুড়ো মানুষটার মনে হয়, সুবল যাচ্ছে ফুলের গাড়ি নিয়ে—সুবল না হলে এমন একটা ফুলের গাড়ি কে যে চালায়। যখন দু—পাশে মাঠ এবং ঘাস মাড়িয়ে গাড়ি যায়, সাদা কাঞ্চন গাছটার নীচে সে দাঁড়িয়ে থাকে। ভীষণ এক উজ্জ্বল রোদ খেলা করে বেড়ায়। নদী থেকে হাওয়া উঠে আসে। এবং সুন্দর এক জীবন। এভাবে যখন মানুষেরা টের পায় ফুলের জমিটা ওদের—কী আপ্রাণ উৎসাহ তাঁদের তখন পরিশ্রম করার।

কোনও কোনওদিন সে ফুল নিয়ে স্টেশন যায় না। দুপুরের খাবার অথবা রাতের খাবার এখন কালু তৈরি করে দেয়। সে যতটা সময় এসব করবে, ততটা সময়ই তার নষ্ট। সে চাষবাসের কথা তখন ভালো করে ভাবতে পারে না। সেজন্য সে যখন বিকেলে চুপচাপ ফুলের উপত্যকা ধরে হেঁটে যায় তখন চারপাশের সব কিছু কেমন স্নিগ্ধ হয়ে যায়। সে এভাবে একটা নিজের পৃথিবী গড়ে তুলেছে। সবাই চায় তার নিজের একটা পৃথিবী থাক। সবাই চায় সেই পৃথিবীর সে রাজা হয়ে থাকবে। যেমন বুড়ো মানুষটা ফুলের চাষ সম্পর্কে প্রায় রাজার মতো, যেমন জনার্দন চক্রবর্তী তার বিশ্বাস সম্পর্কে প্রায় ঈশ্বরের শামিল—সুবল যেমন একসময় ভাবত, টুকুনদিদিমণি মরে যেতে পারে, এমন মেয়ে অসময়ে মরে গেলে ভীষণ কষ্টের।

এবং এভাবে সে যখন চারপাশে তাকায়—দেখতে পায় সব রাস্তার ধারে ধারে গন্ধরাজ ফুল। গ্রীষ্মকাল চলে যাচ্ছে। বর্ষা আসছে। ক'দিন আগে খুব বৃষ্টি হয়েছে। ফল ফুলের গাছগুলো ভীষণ তাজা। সে নতুন কলম করছে গোলাপের। গোলাপের ডাল কেটে সে মাথায় গোবর ঠেসে দিয়ে কাদামাটিতে পুঁতে রেখেছে। সামান্য বৃষ্টি পেয়ে কাটা ডালগুলো কুঁড়ি মেলেছে। সে এসব দেখতে যায়। এদিকটায় রাস্তার দুপাশে সব বড় বড় গন্ধরাজ ফুলের গাছ। গাছের পাতা কী আশ্চর্য সবুজ। এবং চারপাশে গাছের সাদা ফুল। নীচে নুড়ি

বিছানো পথ। বৃষ্টিতে এতটুকু কাদা হয় না। সবুজ ঘাস রাস্তার ওপর। এবং হেঁটে টের পাওয়া যায় বুড়ো মানুষটার টালির বাড়ি অথবা ওর ঘরটা এবং এই চাষবাস মিলে জায়গাটা যেন একটা পুরানো কুঠিবাড়ি হয়ে গেছে। কত সব আশ্চর্য কীটপতঙ্গ উড়ে এসে বাসা বেঁধেছে। কিছু সোনা পোকা পর্যন্ত সে এই ম্যাগনোলিয়া ফুলের গাছগুলোর চারপাশে আবিষ্কার করেছিল। এবং এখানে উড়ে এসেছে নানাবর্ণের পাখি। আর এসেছে ছোট্ট সব খরগোস, কাঠবিড়ালি। এখানে এসে যেই সবাই জেনে ফেলেছে—সুবলের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা খুব আনন্দের।

আর এভাবেই সুবল তার এই পৃথিবীতে ছোট রাজপুত্রের মতো বেঁচে থাকতে চায়। সে আর যায় না টুকুনদিদিমণির বাড়িতে। সে টের পায় তাকে নিয়ে ভীষণ একটা ঝড় উঠেছে টুকুনদিদিমণির বাড়িতে। সে টের পেয়েই গত দু রোববার একেবারে ডুব মেরেছে। এমনকি বড় শহরে ফুল নিয়ে গেলে পাছে তার লোভ হয় একবার টুকুনদিদিমণির সঙ্গে দেখা করার, সেজন্য সে নিজে আর শহরে যাচ্ছে না। স্টেশন পর্যন্ত গিয়েই ফিরে আসে। ফুলের সব বিক্রি বাট্টা, যারা কাজ করে তাদের ওপর। ওর যেন কেবল ইচ্ছা সে কত বড় ফুল আর কত বেশি ফুল চাষবাস করে তুলতে পারছে, এবং এভাবে সে সবার জন্য এবং নিজের জন্য অর্থাৎ এই যে ঈশ্বর পরিশ্রমী হতে বলছে, সে কতটা পরিশ্রমী হতে পারে তার যেন একটা প্রতিযোগিতা। বস্তুত সে চাইছিল কাজের ভিতর ডুবে গিয়ে টুকুনদিদিমণির কথা ভুলে যেতে।

সুতরাং বিকেল হলেই যখন তার লোকেরা গাছে গাছে জল দিয়ে যায়, যখন জমির আগাছা বেছে নবীন উঠে দাঁড়ায় এবং বুড়ো মানুষটার ছবি কাঞ্চন ফুলের গাছটার ছায়ায় ভেসে ওঠে—তখন সে গাছের পাতায় পাতায়, ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে জীবনের সৌরভ খুঁজে বেড়ায়। ভাবতে অবাক লাগে টুকুনদিদিমণির ওপর তার ভীষণ একটা লোভ আছে। ঠিক সেই অজিতদার স্ত্রীর মতো যেন। এবং এভাবে সে মাঝে মাঝে নিজেকে ভীষণ অপরাধী ভেবে ফেলে। যত তার বয়স বাড়ছে, টুকুন দিদিমণির ওপর তত তার লোভ বাড়ছে। এবং এটা টের পেলেই সে আর এইসব ফুলেরা যে সৌরভ নিয়ে বেঁচে থাকে তা মনে করতে পারে না। এবং শেষটায় সে দিশেহারা হয়ে গেলে কঠিন অসুখের ভিতর যেন সেও পড়ে যায়। সে বলল, যেন নিজেকে শুনিয়ে বলল—আমি খুব খারাপ মানুষ টুকুনদিদিমণি। এতদিনে আমি এটা টের পেয়েছি।

আর তখনই সেই উপত্যকার ওপাশে যে একটা বড় রাস্তা চলে গেছে, মনে হল সেই রাস্তায় একটা গাড়ি এসে থেমেছে। এখন বিকেল। সূর্যাস্তের সময় গাছপালার ভিতর দিয়ে রোদ লম্বা হয়ে পড়েছে। গাড়িটা নীল রঙের। ভীষণ ঝকঝকে। আর সূর্যাস্তের বেশি দেরি নেই। ফলে সূর্য তার আশ্চর্য লাল রং নিয়ে এক্ষুনি গাছপালার ওপর ছড়িয়ে যাবে। এবং এমন একটা সৌন্দর্যের ভিতর হালকা সিল্কের পোশাক পরে যদি কেউ ফুলের উপত্যকায় নেমে আসে—যেখানে কেউ নেই, আছে সুবল, আর বুড়ো মানুষটা, তার যত রাজ্যের নানাবর্ণের ফুল, নদীর নির্মল জল। ওপারে বন। বনের গাছপালা ভীষণ নিবিড় তখন সুবল অপলক না তাকিয়ে থাকে কী করে! ক্রমে অনেকটা হেলে দুলে সে যেন চলে আসছে। সুবল দৃশ্যটা বিশ্বাস করতে পারছে না। তার কাছে কিছুটা স্বপ্নের মতো লাগছে। সে চোখ মুছে ভালো করে দেখছে সব। সে মুগা রঙের পাঞ্জাবি পরেছে। পায়ে তার ঘাসের চটি, এবং সে আজ ধুতি পরেছে। বিকেল হলেই স্নান করার স্বভাব সুবলের। সে বেশ পরিপূর্ণ সেজেগুজে যখন নদীর ঢালুতে একটু চুপচাপ বসে থাকবে ভাবছিল, যখন ফুলের গাড়িটা টংলি টংলি শব্দ তুলে মাঠের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তখন কিনা আশ্চর্য সুন্দর এক মেয়ে প্রায় যেন রাজকন্যার শামিল, পায়ের গোড়ালির ওপর সামান্য শাড়ি তুলে প্রায় যেন ধীরে ধীরে উড়ে আসছে।

সুবল কাছে এলেই বুঝতে পারল, টুকুনদিদিমণি।

সুবল এবার হাত তুলে গন্ধরাজের ডাল ফাঁক করে ডাকল টুকুনদিদিমণি।

টুকুন, চারপাশে তাকাল। সে সুবলকে দেখতে পাচ্ছে না। সুবল যে গন্ধরাজ ফুলের গাছগুলোর ভিতর চুপচাপ অদৃশ্য হয়ে আছে টুকুন টের পাচ্ছে না। সে চিৎকার করে বলল, সুবল তুমি কোথায়?

—আমি এখানে টুকুনদিদিমণি।

—আমি যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না সুবল।

—তুমি আমাকে দেখতে না পেলে হবে কেন। কাছে এসো। কাছে এলেই টের পাবে আমি ঠিক এখানে আছি।

কী ভীষণ প্রতীক্ষায় মগ্ন চোখ মুখ টুকুনের। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখল কেবল ফুল আর ফুল। কত যে ফুল ফুটিয়ে রেখেছে সুবল। সুবল যে গন্ধরাজ গাছগুলোর পাশে পাশে হাঁটছে টুকুন টের পাবে কী করে। সে তো কেবল দেখছে, ফুল আর ফুল। আর দেখছে, বড় একটা কাঞ্চন ফুলের গাছ। সাদা ফুলে ছেয়ে আছে। নীচে পরিপাটি করে কিছু বিছানো। এবং বুড়ো মতো একজন মানুষ বসে আছে। বরফের মতো, সাদা দাড়ি, পরিপাটি সাদারঙ গায়ে লম্বা আলখাল্লা, পরনে খোপকাটা লুঙ্গি, মাথায় সাদা টুপি। হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে। মুখ কী প্রসন্ন। হাত সামনে রেখে সে আছে মাথা নীচু করে। চুল এত সাদা যে দূর থেকে একটা বড় কদমফুলের মতো লাগছে। আর আশ্চর্য মানুষটা ওর গলার স্বরে এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না। মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। নিবিষ্ট মনে বুঝি ঈশ্বর চিন্তা করছে। এমন ঈশ্বর চিন্তায় মানুষ কখনও এত মগ্ন থাকে সে যেন টুকুনের জানা ছিল না। সে বুঝতে পারল—এই সেই বুড়ো মানুষ। সুবল যার গল্প কতবার করেছে। বলেছে, টুকুন দিদিমণি আমার দেশটা তোমার রাজপুত্রের ছোট গ্রহাণুর চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়।

টুকুন দেখল, সত্যি এটা একটা আলাদা দেশ। যেন দুঃখ দৈন্য বলে এখানে কিছু নেই। কেবল ফুলের আশ্চর্য সৌরভ। এবং এই সৌরভের ভিতর বসে আছে এক বৃদ্ধ মানুষ। টুকুন মুখে আঙুল রেখে ইশারা করল অর্থাৎ যেন বলছে এটা ঠিক হবে না সুবল, মানুষটা প্রার্থনায় মগ্ন, তখন এসো তুমি আমি বসে ওকে চুপচাপ দেখি।

আর তখন সুবল এসে পাশে বসলে বেশ সুন্দর দৃশ্য তৈরি হয়ে যায়। এক বুড়ো মানুষ বয়স যে কত, কে জানে তার সঠিক বয়স কী, সে নিজেও হয়তো জানে না, তার বয়স বলে কিছু আছে, এই পৃথিবীর যেন সে আদিমতম মানুষ, সুন্দর করে এই পৃথিবীর শেষ ঘ্রাণ শুষে নিচ্ছে। এখন তাকে দেখলে এমনই মনে হয়।

কিছু কাঞ্চন ফুলের পাপড়ি তখন ঝরে পড়ছিল ওদের ওপর। হাওয়ায় দুটো একটা পাপড়ি বেশ উড়ে উড়ে দূরে চলে যাচ্ছে। কেমন একটা বাতাসের হিল্লোল। ক—দিন আগে বৃষ্টিপাতের দরুন দারুণ সবুজ আভা, এবং তার ভিতর অজস্র ফুলের সুবাস এসে যেন যথার্থ এক অন্য গ্রহাণু সৃষ্টি করছে।

আর তখন সেই মানুষ যদি চোখে দেখতে পেত তবে একটা ছবির মতো মেয়ে ঘাসের ওপর বসে আছে। স্থির। নিশ্চল। এতটুকু নড়ছে না। সুবলকে পর্যন্ত চেনা যাচ্ছে না এবং বুড়ো মানুষটা এভাবে বুঝতে পারে তার কাছে সবচেয়ে সুন্দরতম জায়গা, এই ফুলফলের উপত্যকা। যা কিছু সুখ, যা কিছু আকাঙ্ক্ষা সব সে এর ভিতর ঈশ্বরপ্রাপ্তির মতো টের পায়। সে কিছুটা অনুমানের ওপর বলল, তোরা।

—আমরা চাচা।

—এই তোর সেই মেয়েটা।

সুবল হাসল।—কোন মেয়েটা?

—যে মেয়েটা ভাবত, আর বাঁচবে না।

—হ্যাঁ চাচা সেই মেয়ে।

—এখন কী ভাবছে মেয়ে?

—আমি আপনাকে দেখছি। কিছু ভাবছি না।

টুকুন দুষ্টুমেয়ের মতো কথা বলল।

—আমাকে। আমি তো বুড়ো মানুষ।

সুবল বলল, চাচা কিন্তু দেখতে পায় না।

টুকুন বলল যাঃ।

—হ্যাঁ।

—তবে আমাদের যে বলল, তোরা!

—ওর আর একটা ইন্দ্রিয় তৈরি হয়েছে। সে টের পেয়ে যায়। তার এই নিজের হাতে তৈরি ফুলের উপত্যকাতে কে এল কে গেল। কোন গাছে কী ফুল ফুটেছে সে এই কাঞ্চন ফুল গাছটার নীচে বসে ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে।

টুকুন বলল, আমার অসুখ, আমি বাঁচব না, আপনাকে এমন কে বলেছে?

বুড়ো মানুষটার যা স্বভাব, দাড়িতে হাত বোলানো এবং যেন এভাবে বলে যাওয়া—টুকুন সুবল তো কাজের ফাঁকে জল আনার সময়, অথবা সব আগাছা বেছে দেবার সময় কেবল একজনের কথাই বলে থাকে—সেতো তুমি। তোমার নাম টুকুনদিদিমণি। তুমি বিছানাতে একটা মমির মতো শুয়ে থাকতে। সুবলের মুখ দেখলে তখন বুঝতে পারতাম—সে নানাভাবে তোমাকে নিরাময়ের চেষ্টা করছে। ঠিক সে যেমন এই ফুলের উপত্যকায় এসে চারপাশে যা কিছু আছে, সব কিছু নিয়ে মগ্ন হয়ে গেল, তেমনি সে মগ্ন ছিল, তুমি কী কী করলে আনন্দ পাবে—সুবল কতভাবে যে তখন এই সব মাঠে বড় বড় নানা বর্ণের ফুল ফোটাবার চেষ্টা করেছে। সুবল তোমার জন্য সবচেয়ে দামি ফুলের গুচ্ছ নিয়ে যেত। এভাবে আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। ঈশ্বরের পৃথিবীতে তুমি একটা অসুখে ভুগছিলে। অসুখটা ছিল তোমার মনের। তোমার বড় বেশি ছিল বিশ্বাসের অভাব। তোমার সব আকাঙ্ক্ষা মরে যাচ্ছিল। সুবল আবার তোমাকে আকাঙ্ক্ষার জগতে ফিরিয়ে আনল—তার কাছে তুমি একদিন না একদিন ফিরে আসবেই। কতদিন বলেছি তোর টুকুনদিদিমণিকে আসতে বলিস এখানে। দেখে যাক—পৃথিবীর আর একটা ছোট জায়গা আছে—যেখানে মানুষেরা কেবল ফুল ফোটায়। মানুষ তার নিজের স্বভাবেই সুন্দর পৃথিবী গড়তে ভালোবাসে।

টুকুন বলল, চাচা তুমি সত্যি দেখতে পাও না।

—যাঃ দেখতে পাব না কেন! এখন আমি সবচেয়ে ভালো দেখি। এতদিন যা আমার চোখের আয়ত্তে ছিল তাই দেখতাম। এখন তো আরও দূরের জিনিস এই ধর হাজার লক্ষ মাইল দূরে এই সৌরলোকের কিংবা মহাবিশ্বের কোথায় কী আছে সব যেন নিমেষে দেখে ফেলি। সুবল আমাকে যে ছোট্ট রাজপুত্রের গল্প শুনিয়েছিল আমি এখন তার মতো এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে নিমেষে চলে যেতে পারি। কোনও কষ্ট হয় না। না দেখলে কী করে টের পেতাম তুমি আজ আমার বাগানে এসেছ।

এভাবে এক বুড়ো মানুষ তার ফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে এখন সব কিছু দেখতে পায়। আগে সুবল ওর কোরান শরিফ পাঠের জন্য একটা ছোট্ট মতো কাঠের র‍্যাক করে দিয়েছিল। বিকেল হলেই বুড়ো মানুষটা কাঞ্চন ফুলের গাছটার নীচে গিয়ে বসত। চোখে ভারী কাচের চশমা লাগিয়ে সে নিবিষ্ট মনে পড়ে যেত সুর ধরে। তার সে নানারকম ব্যাখ্যা শোনাত সুবলকে। সুবল বসে বসে শুনত সব। একটু মনোযোগের অভাব দেখলেই ধমক লাগাত। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ থাকবে না কেন? আল্লা ঈশ্বর তো আলাদা নন।

সুবল বলল, এখন সময় পাই না। এখন শুক্রবারে চাচার জন্য নীলপুর থেকে আসে আক্রম খাঁ। সে সারাটা দিন নামাজের ফাঁকে ফাঁকে চাচাকে কোরান পাঠ করে শোনায়।

টুকুন বলল, আর কীভাবে দিন কাটে তোমার?

—আমার এভাবেই দিন কেটে যায়।

সুবল কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। পাশে টুকুন হাঁটছে। ফুলের সৌরভের কাছে টুকুনদিদিমণির দামি প্রসাধন কেমন ফিকে হয়ে গেছে। সে বলল, এটা শ্বেতকরবী। বলে সে কটা ফুল হাতে তুলে নিলে টুকুন বলল, আমাকে দাও।

এবং টুকুন ফুল কটা নিয়ে খোঁপায় গুঁজে দিল। ববকাট চুলে আজ নকল চুল বেঁধে খোঁপা করেছে দিদিমণি। এবং খোঁপায় ফুল গুঁজে দিলে টুকুনদিদিমণিকে আর শহরের মেয়ে মনে হয় না, কেমন এক বনের দেবী হয়ে যায়। ওর বড় ইচ্ছা একদিন সে টুকুনদিদিমণিকে নিয়ে ও—পারের বনে যায়। এবং সারাদিন বনের ভিতর চুপচাপ বসে থাকা, অথবা গল্প, দিদিমণি আর কী কী নূতন বই পড়েছে, সুবল তো বই পড়তে

পারে না, টুকুনদিদিমণির সঙ্গে দেখা হলেই নানারকম গল্প শোনার ইচ্ছা এবং টুকুনদিদিমণি কীযে সব সুন্দর সুন্দর পৃথিবীর খবর নিয়ে আসে। তার ইচ্ছা বনের দেবীকে ঠিক একদিন বনে নিয়ে যাবে। এবং বনের ভিতরে ছেড়ে দিয়ে সেই যে সে একজন কাঠুরের গল্প শুনেছিল, কাঠুরে রোজ কাঠ কাটতে যেত বনে, এবং দেখতে পেত এক ছোট্ট মেয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, সে মেয়েকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে যেত, ফলে তার কাঠ কাটা হত না, সে কাঠ না কেটেই চলে আসত এবং এভাবে সংসারে তার ভারী অভাব—অথচ সে দেখে বনের ভিতর রোজই মেয়েটা রাস্তা হারিয়ে ফেলে, এবং তাকে গ্রামের পথ ধরিয়ে দিতে হয়। কাঠুরিয়ার কাঠ কাটা হয় না। এবং এভাবে কাঠুরিয়া জানে না, এক বনের দেবী তাকে নিয়ে খেলা করছে। তারপর সে অভাবের তাড়নায় আর বাড়ি ফিরে না গেলে একটা ফুলের গাছ দেখিয়ে বলেছিল ছোট্ট মেয়েটা, একটা চাঁপা ফুল রোজ এ—বনে ফুটবে। সেটা তুই নিয়ে যাবি। সে কথামতো চাঁপা ফুল বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখেছিল—চাঁপা ফুল স্বর্ণ চাঁপা হয়ে গেছে। একটা ফুল বিক্রি করলে তার অনেক টাকা হয়ে যায়। সে রোজ বনে এসে সেই ফুলটা কখন ফুটবে সেজন্য বসে থাকে। বসে থাকতে থাকতে মনে হয়, এই বনের কোথায় যেন এক শ্রীহীন রূপ ফুটে উঠেছে। সেই মেয়েটি, যে তাকে নিয়ে খেলা করে বেড়াত তাকে না দেখতে পেলে বুঝি ভালো লাগে না, এই চাঁপা ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে সে রোজ রোজ কী করবে। সেই মেয়েটা তাকে যে এভাবে বেল্লিক করে দেবে সে ভাবতেই পারে না। সে দেবীর দেখা পেয়েও পেল না। সে বলত, বনের দেবী তুমি আমার কাছে এমন ছোট্ট হয়ে থাকলে কেন। বনের দেবী তুমি আমাকে এমন লোভে ফেলে গেলে কেন। আমার যে এখন হাজার অভাব। বেশ ছিলাম মা জননী, কাঠ কাটা, কাটা কাঠ বেচে পয়সা, স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে মিলে আহার—তারপর সন্ধ্যা হলে আমার বউ পিঁদিম জ্বালাত। আমার সুখ ছিল, স্বস্তি ছিল। এখন মা জননী এত টাকা আমার, অথচ দ্যাখো বউটার মোটরগাড়ি না হলে চলে না। এবং সেই গল্প মনে হলে সুবলের মনে হয় টুকুনদিদিমণি বনের দেবী হবে ঠিক, কিন্তু ছোট মেয়ে সেজে তার লোভ বাড়াবে না। সে বলল, দিদিমণি ওপারে একটা সুন্দর বন আছে। যখন কিছু ভালো লাগে না, নদী সাঁতরে আমি ওপারে বনে উঠে যাই। চুপচাপ গাছের নীচে বসে থাকি।

এভাবে ওরা কথা বলতে বলতে অনেকদূর চলে এসেছে। সামনে সেই ছোট্ট নদী। যেমন ছোট্ট উপত্যকা নিয়ে সুবলের ফুলের চাষ তেমনি ছোট্ট নদী নিয়ে, ছোট্ট একটা বন নিয়ে সুবল বেশ আছে। আর কী নির্মল জল নদীতে। টুকুন নেমে বাবার সময় দুপাশের জমিতে দেখল অজস্র অপরাজিতা ফুটে আছে। নানারকম বাঁশের মাচান ছোট ছোট। সেখানে ফুলের লতা বেয়ে বড় হচ্ছে সজীব হচ্ছে। একেবারে সবুজ রঙ, ফুলের রঙ নীল, ভিতরটা শঙ্খের মতো সাদা। এবং টুকুনের ইচ্ছা হল এ—ফুলের একটা লম্বা মালা গাঁথে। ফুলের সৌরভ নেই কোনও। অথচ কী সুন্দর নরম ফুলের মালা। এমন মালা হাতে গলায় পরে সর্বত্র ঠিক নূপুরের মতো বেঁধে কেমন সেই যেন শকুন্তলার প্রায় তপোবনে তার ঘুরে বেড়ানো। টুকুন বলল, আমি নদীতে সাঁতার কাটব।

—অবেলায় সাঁতার কাটলে অসুখ হবে।

টুকুন বলল, আমি তুমি সাঁতার কেটে সুবল ওপারে উঠে যাব। বনের ভিতর হারিয়ে গিয়ে দেখব, কী কী গাছ আছে। তুমি গাছের নাম বলে যাবে, আমি গাছ চিনে রাখব। কত বড় হয়েছি, অথচ দ্যাখো কোনটা কী গাছ ঠিক চিনি না।

সুবল বলল, বনের ভিতর গেলে আমার কেবল ভয় হয় তুমি বনদেবী হয়ে যাবে।

—তা হলে কী হবে?

—তুমি আমাকে লোভে ফেলে দেবে।

—সে আবার কী।

—সে একটা লোভ। সোনার চাঁপাফুল। পেলে আর ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয় না। তখন অসুখটা বাড়ে।

টুকুন দেখেছে, সুবল চিরদিন এভাবেই কথা বলেছে। কথায় কেমন হেঁয়ালি থাকে, সে কখনও ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অথচ মনে হয়, সুবল যা বলে তা সত্যি। সে বলল, সোনার চাঁপাফুলটা কী?

—সে একটা লোভ দিদিমণি।

—সেটা কী?

—সেটা এক কাঠুরিয়ার গল্প।

—কে বলেছে?

—আমাদের বুড়োকর্তা।

—তবে শুনতে হয়। বলে সে শাড়ি সামান্য তুলে নদীর জলে সামান্য নেমে গেল। বালির জন্য পা দেবে যাচ্ছে না। কী সুন্দর আলতা পড়েছে টুকুন দিদিমণি। জলের নীচে পায়ের পাতা মাছরাঙার মতো দেখাচ্ছে। সুবল এমন দেখলেই কেমন লোভে পড়ে যায়। ওর শরীর ফুলের সৌরভের মতো কাঁপে। সে টের পায় চোখ মুখ কেমন জ্বালা করছে। কিন্তু টুকুন দিদিমণিকে সে কেন জানি ছুঁতে ভয়। কীসব আশ্চর্য সুবাস শরীরে মেখে রাখে! কী নরম সিল্ক পরে থাকে, আর কী রঙবেরঙের লতাপাতা আঁকা পোশাক! সবটা এমন যে সে ভালো করে চোখ তুলে কখনও কখনও দেখতে ভয় পায়। এবং এমন হলেই সুবল বলে, বেশ ছিল কাঠুরিয়া। টুকুন একটু জল অঞ্জলিতে নিয়ে কী দেখে ফেলে দেবার সময় বলল, কী বেশ ছিল?

—এই তোমার বেশ ছিল। সে পরিশ্রমী মানুষ ছিল। কাঠ কাটত। কাঠ বিক্রি করত। কাঠ বিক্রির পয়সায় চাল ডাল এবং সবাই রাতে বেশ পেট ভরে খেত। তারপর কী ঘুম। কোনো হুঁশ থাকত না। তার কোনও রোগভোগ ছিল না।

টুকুন বলল, সে তবে সুখী লোক ছিল?

—খুব। সে নদী পার হত সাঁতরে। গায়ে তার অসুরের মতো শক্তি। সে তার পরিশ্রমের বিনিময়ে খাদ্য পোশাক এবং আশ্রয় পেত। একটু থেমে সে বনের দিকে চোখ তুলে কী খুঁজল। তারপর বলল, বুড়োকর্তা বলেছে, এটাই নাকি ঈশ্বরের বিধান। তার পবিত্র পুস্তকে বুঝি এমনই লেখা আছে। সে এখানে একটু সাধুভাষায় কথা বলার চেষ্টা করল। কাঠুরিয়া ঈশ্বরের নিয়ম থেকে সরে গেল। বনদেবী তাকে লোভে ফেলে নিরুদ্দেশে গেল।

টুকুন দেখল কেমন উদাসীন চোখে সুবল ওকে দেখছে।

—কী দেখছ সুবল?

—তোমাকে দেখছি টুকুনদিদিমণি। কাঠুরিয়া তারপর থেকে ফুলটার জন্য রাতে ঘুম যেতে পারত না।

—আমাকে দেখে সেটা তোমার মনে হল?

—তোমাকে দেখে কিনা জানি না, আজকাল আমার মাঝে মাঝেই এমন হয়।

—সেজন্য আমাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ!

—ছেড়ে ঠিক দিইনি। যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তোমার মা এজন্য ভীষণ কষ্ট পায়। কেউ কষ্ট পেলেই আমার খারাপ লাগে। বলে সে বালির চরের দিকে হেঁটে যেতে থাকল। ওপারের বনের ছায়া ক্রমে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ওদের দুজনের ছায়াও বেশ লম্বা হয়ে নদীর চর পার হয়ে যাচ্ছে। ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। একজনের শরীরে শহরের সুগন্ধ। অন্য জন ফুলের সৌরভ শরীরে মেখে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতেই বলা, কাঠুরিয়ার তখন বড় ভয় হয়, সেই চাঁপাফুলটা কে না কে চুরি করে নিয়ে যায়!

—কার আবার দায় পড়েছে—কে জানে যে বনে সোনার চাঁপা ফুটে থাকে।

—জানতে কতক্ষণ। সে তো ততদিনে লোভে পড়ে গেছে। সে শহরে যায়—স্যাকরার দোকানে ফুলটা বিক্রি করে, ওরা লোক লাগাতে পারে—দ্যাখো তো রোজ মানুষটা ফুল পায় কোথায়? সেজন্য সে রোজ এক দোকানে চাঁপাফুল বিক্রি করে না, আজ শহরের উত্তরে গেলে, কাল দক্ষিণে। এভাবে সে চিন্তাভাবনায় বড় উদ্বিগ্ন থাকে। সে একদিন দেখতে পায় আয়নায়, সব চুল পেকে যাচ্ছে, মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। সে

কেমন অল্প বয়সে বুড়ো মানুষ হয়ে যাচ্ছে। আর যা হয় সে চাঁপা ফুলটা চুরি যাবে বলে, রাত না পোহাতে বনে চলে যায়। তারপর বনের পাতালতার ভিতর নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকে। চারপাশের পোকামাকড়েরা ওকে কামড়ায়। সে ভ্রূক্ষেপ করে না। সে তো জানে না এভাবে লোভের কীটেরা তাকে দংশন করে ক্রমে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

সুবল এবার বালির চরে বসে পড়ল। এখন ওদের ছায়া লম্বা হয়ে পড়ে নেই। বরং ছায়াহীন এক মাঠ, দূরাগত পাখির ডাকের মতো তাদের কেমন নির্জন পৃথিবীতে যেন নিয়ে এসেছে। সুবলের যা হয়, এমন এক নিরিবিলি নির্জন পৃথিবীতে বসে থাকলেই বুঝি তার ভালো ভালো কথা বলতে ভালো লাগে। সেজন্য বোধহয় সাধুভাষায় কথা বলতে পারলে ভীষণ খুশি হয়। সে বলল, টুকুনদিদিমণি কাঠুরিয়া দিন—রাতের বেশি সময়টাই বাড়ির বাইরে থাকত। সে যখন ফিরত শহর থেকে গাড়িতে, তাকে বড় ক্লান্ত দেখাত। ফিরে এসে দেখত, বউ তার রেলগাড়িতে চড়ে কোথায় গেছে। ছেলেরা বলত, মায়ের ফিরতে রাত হবে বলে গেছে বাবা।

টুকুন বলল, এভাবে সুখী মানুষটা পরিশ্রম ছেড়ে দিয়ে দুঃখী মানুষ হয়ে গেল।

এবং এভাবেই টুকুনের মনে হয় তার বাবাও ভীষণ কষ্টের ভিতর পড়ে গেছে। বাবার জীবনের সঙ্গে কাঠুরিয়া জীবনের কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে। টুকুন বলল, জানো বাবার জন্য আমার ভারী কষ্ট লাগে। কাঠুরিয়ার মতো বাবাও আমার দুঃখী মানুষ। বাবাও আমার আরও কত গাড়ি, কত বাড়ি বানানো যায়—সেই আশায় একটা বড় রেলগাড়িতে চড়ে বসে আছে। কিছুতেই নামতে চাইছে না।

সুবল সহসা অন্য কথায় চলে এল। বলল, কোথায় যে একটা চারা পাই। ওটা পেলেই আমার এ—ফুলের উপত্যকা ভরে যাবে। আমার আর কিছু লাগবে না।

টুকুন বলল, আমিও গাছ খুঁজছি। বাবাও খুঁজছেন।

কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় গাছটা আসলে পৃথিবীতে নেই।

তারপর ওরা আর কোনও কথা বলল না। চুপচাপ বসে থেকে এই সব বন উপবনের নানারকম বর্ণাঢ্য শোভার ভিতর ডুবে গেল। ওরা শুনতে পাচ্ছে—কীটপতঙ্গেরা সব ডাকছে। পাখিরা নদী পার হয়ে যাচ্ছে। খরগোসেরা দল বেঁধে শস্যদানা খাবার লোভে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। আরও কত কী—কী যে আশ্চর্য মহিমময় এই পৃথিবী। অথচ কখন সোনার চাঁপা ফুটবে, সেই আশায় একটা গিরগিটির মতো গাছের ডাল দেখছে কাঠুরিয়া। চারপাশে তার এতবড় পৃথিবী, আর এমন সুন্দর দিন গাছপালার ভিতর বর্ণাঢ্য সব শোভা নিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, সে জানতেও পারছে না। লোভ তাকে সব কিছু থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।

টুকুনের আজ এখানে এসে কেন জানি মনে হল, মানুষেরা ক্রমে গিরগিটি হয়ে যাচ্ছে। সুন্দর দিনগুলি তারা আর ঠিক ঠিক দেখতে পাচ্ছে না। কাঠুরিয়ার মতো বনে—জঙ্গলে শুয়ে আছে, কখন সোনার চাঁপা ফুটবে গাছে, আর খপ করে তুলে নেবে। তারা কিছুতেই পরিশ্রমী হবে না। পরিশ্রমী না হলে সুন্দর দিনেরা মানুষের কাছ থেকে ক্রমে সরে যায়।

এই ফুলের জগতে সুবলকে দেখে কেবল টুকুন কেমন এখনও সাহস পায়। সুন্দর দিনগুলো ঠিক ঠিক কোথাও একসময় আবার এভাবে ফিরে আসে। এবং এভাবে মানুষের পৃথিবীতে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকে।

উনিশ

তখন শহরে মিছিল যাচ্ছে। মিছিলের স্লোগান—ঘেরাও চলছে, চলবে। স্লোগান, আমাদের দাবি মানতে হবে।

বড় বড় লাল শালুতে দাবির ঘোষণা। বেশ বড় বড় করে লেখা—বেতনের একটা নিম্নতম হার।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে মিছিলের দিকে চেয়ে এক ভিখারিনি, পাগলিনি—প্রায় ভীষণ হাসছিল। আর হেঁকে হেঁকে বলে যাচ্ছিল—দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর।

মজুমদার সাহেবের ড্রাইভার বলল—স্যার, আর এগুনো ঠিক উচিত হবে না।

মজুমদার সাহেবের ড্রাইভার খুব পুরানো লোক। এবং কী হবে না হবে সেটা তার মনে করিয়ে দেবার স্বভাব। সে বলল—মিছিল শেষ হলেই গাড়ি জ্যামে পড়ে যাবে।

মজুমদার সাহেব টুবাকো টানেন। পাইপে ধোঁয়া উঠছে না। তিনি বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে ফের কটা টান দিয়েও যখন দেখলেন ধোঁয়া উঠছে না, তখন কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। ক্লাবে আজ একটা বড় রকমের লাইসেন্সের লেনদেনের ব্যাপার আছে। ট্যান্ডন সাব আসবেন। তাঁকে খুশি করার ব্যাপারও একটা আছে। মিস ললিতাকে সেজন্য তিনি ফোনে বলে রেখেছিলেন, আর রাস্তায় নেমে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপারের ভিতর আটকে যাওয়া। তিনি কেমন বিরক্ত মুখে বললেন—দিন দিন এসব কী হচ্ছে বুঝি না।

ড্রাইভার বলল—স্যার বরং গাড়ি বাড়িতে নিয়ে যাই।

কোনো উপায় নেই বুঝতে পারলেন। কেবল তারা যাচ্ছে। আর চারপাশে গাড়ির হর্ন। এভাবে ক্রমে এই রাস্তা একটা গাড়ির পিঁজরাপোল হয়ে যাবে কিছুক্ষণের ভিতর। তিনি যে এখন কী করেন। তাঁর হাত—পা কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে। অথবা এই সব মিছিলের মানুষদের ধরে শহরের বাইরে বের করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি বললেন—দ্যাখো ব্যাক করতে পারো কিনা।

এবং তখনই পাগলিনি হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে—দু—ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। হাতে তার লাঠি। লাঠির মাথায় পালক। পাগলিনিকে ভীষণ দাম্ভিক মনে হচ্ছে। মজুমদার সাহেব বললেন—দ্যাখো পাশ কাটাতে পারো কিনা।

তারপর ফিরে এসে ফোন। প্রোগ্রাম ক্যানসেল। ভিতর বাড়িতে এ—সময় কারও থাকার কথা না। টুকুনের যাবার কথা আছে একাডেমিতে। ইন্দ্রকে নিয়ে যাবে। এখন টুকুন ভীষণ ভালো গাড়ি চালাতে পারে। ওঁর ইচ্ছা হাতের সব কাজ হয়ে গেলে একবার গাড়িতে স্বামী স্ত্রী টুকুন সবাই কাশ্মীর যাবেন। খুব জমবে। টুকুনের মা নিশ্চয়ই দরিদ্র—বান্ধব ভাণ্ডারে চাঁদা আদায়ের জন্য মিঃ তরফদারের কাছে গেছে। সেখান থেকে ফিরতে ওর রাত হবার কথা।

অথচ এমন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে মনটা খচ খচ করছিল। তবে তিনি ট্যান্ডন সাবকে জানেন ভীষণ লোভী মানুষ। আশ্চর্য সৎ টাকাপয়সার ব্যাপারে। এক পয়সা ঘুষ তিনি নেন না কথিত আছে। তবে যে দেবতা যাতে খুশি। ললিতা সম্পর্কে এমন একটা ছবি তৈরি করে রেখেছেন ট্যান্ডন সাবের মনে যে তাঁর আর সূর্যাস্ত না দেখে উপায় নেই। নদীর পারে খোলামেলা বাতাসের ভিতর একটা নিরিবিলি গাছের ছায়ায় ট্যান্ডন—সাব আর ললিতা। সব ব্যবস্থা মজুমদার সাহেব নিপুণভাবে করে রেখেছেন। অথচ এই সময়টায় কিনা মিছিলের লোকগুলি—কাজ না করে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে পয়সা কামাতে চায়! কী যে স্বভাব মানুষের এবং এটা বাঙালিদের ভিতর খুব বেশি এমন মনে হলে তাঁর কেন জানি মনে হয় আর এ বাঙালি জাতিটাকে বাঁচানো গেল না।

রামনাথ ব্যক্তিগত খানসামার কাজও করে, এ সময়ে সাহেবের ফাইফরমাশ খাটার সে মানুষ, মুখ লম্বা করে দাঁড়িয়েছিল—কী যে আদেশ করবেন তিনি।

এবং রামনাথ ভাবতেই পারেনি, এমন অসময়ে সাহেব তার কুটিরে ফিরে আসতে পারেন! তার পোশাক—আসাক ভারী বিশ্রী—সে তাড়াতাড়ি প্যান্টের বোতাম আঁটতে ভুলে গেছে। সে দাঁড়িয়ে ছিল অ্যাটেনশান হয়ে। পাগড়ি তার ঠিক ছিল না। স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ হতেই তার মনে হল কী যেন দেখছেন মজুমদার সাব।

সে একটু হকচকিয়ে কেমন বোকার মতো হেসে দিল।

তারপর যা হয়, তাঁর অঙ্গুলি সংকেতই যথেষ্ট। রামনাথ দেখল ওর প্যান্টের বোতাম আলগা। নীচে কিছু পরার স্বভাব নেই বলে এমনটা হয়। সে জানে আরও ক—বার তার এমন হয়েছে। এবং মজুমদার সাবের লাস্ট ওয়ার্নিং ছিল। রামনাথ এখন ভীষণ কুপোকাত। সে বলল—সাব আর হবে না।

মজুমদার সাহেব মনটা ভালো না। তিনি তাঁর এটাচড বাথরুমে এখন ঢুকে বেশ ঠান্ডা জলে স্নান করবেন। তাঁর বাঁধানো দাঁত এখন টেবিলে একটা মোমের বাটিতে ভেজানো থাকবে। এবং তখন কিনা রামনাথ হাতজোড় করে দাঁড়াল। সাহেব কেমন অবাক চোখে তাকালেন। এ—ব্যাপারে যে তিনি একটা লাস্ট ওয়ার্নিং ওকে দিয়ে রেখেছিলেন, বেমালুম ভুলে গেছেন। টুকুনের মা—র ফিরতে অনেক রাত হবে। মিছিল—টিছিলের ব্যাপার দেখিয়ে একটা বেশ অজুহাত তৈরির সুবিধা পেয়ে যাবে।

কারণ এই শহরে মিছিলের পরই জ্যাম আরম্ভ হয়। এবং জ্যাম ভাঙতে ভাঙতে রাত যে কত হয় কত হতে পারে কেউ যেন জানে না। এবং এভাবে টুকুনের মা যত রাত করেই ফিরুক মজুমদার সাহেব কিছু বলতে পারেন না। রাত তাঁরও হয়। তবে তিনি একটা ব্যাপারে খুবই ভালো মানুষ, টুকুনের মাকে খুব ভালোবাসেন। ললিতার মতো মেয়েরা ট্যান্ডন সাবদের মতো মানুষের ভোগে লাগে—মজুমদার সাব সেখানে সামান্য কৌশলী ব্যান্ড—মাস্টার মাত্র।

এবং এভাবে আজকের ব্যান্ড—মাস্টার মজুমদার সাহেব নিজে হয়ে যাচ্ছেন। বাথরুমে স্নান করার সময় তাঁর কথাটা মনে পড়ল। মাথায় শাওয়ারের জল। হাতে নানা রঙের পাথর সব—দামি, ভাগ্য ফেরানোর ব্যাপারে সেই যৌবনকাল থেকে পরে আসছেন। এখন দু—আঙুলে দশটা—ক্রমে বয়েস বাড়লে বিশটা হয়ে যাবে। বাথরুমের আলোটা সাদা মতো দেখাচ্ছে। পেটে চর্বি, এবং লোমশ শরীর থেকে টুপটাপ জল পড়ছে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে টুকুনের মা—র কাছে নিজেকে কেমন একটা বনমানুষ মনে হল। ভাবল, টুকুনের মা—র আসতে দেরি হওয়া স্বাভাবিক। মুখে চোখের ভয়ঙ্কর ঈর্ষা কেমন এক উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো হয়ে গেলে আয়না থেকে চোখ তুলে নেন তিনি। খুব সুগন্ধযুক্ত সাবানের ফেনার ভিতর লম্বা টবে শুয়ে শুয়ে ঠান্ডা জলে কী যে ভালো লাগে পাইপ টানতে। এবং অনেক টুকিটাকি কাজ তিনি এভাবে শুয়ে ঠান্ডা জলের ভিতর সেরে ফেলতে পারেন। রামনাথ তখন তাঁর অনেক কাছের মানুষ হয়ে যায়। দরজায় পাহারা—আভি কোই মাত ঢোকনা। সাব নাহানে মে গিয়া।

—রামনাথ।

রামনাথ বুঝল, বাবুর নকল দাঁত এবার তাকে দিয়ে আসতে হবে। অথচ কী যে বয়স। এমন সামান্য বয়সে দাঁত কেন পড়ে যায় সব সে ভাবতে পারে না। সব না এক পাটির কিছু অংশ সে জানে না। এমন একটা মোমের পাত্রে তা ঢাকা থাকে, এবং সে যখন ভিতরে দিয়ে আসে তখন সাহেবের মুখে এমন একটা ফুলো ভাব থাকে যে দেখলে মনে হবে তাঁর একটা দাঁতও পড়েনি এবং রামনাথ জানে না, মেমসাব আজও জানে কিনা, দাঁত নকল না আসল। কনফিডেনসিয়াল সব। সে এ—ঘরের টুঁ শব্দটি দরজার বাইরে বের হতে দেয় না। এখানে এই স্নানের সময়টুকু স্নানের ঘরে ঢুকলেই তাঁর বের হতে হতে দু—ঘণ্টা—রামনাথের মনে হয় ঠান্ডা জলে কীসব গন্ধদ্রব্য একটার পর একটা ঢেলে, তিনি আশ্চর্য এক নীল সমুদ্রের বাসিন্দা হয়ে যেতে চান। সে তখন যেই খোঁজ করুক না—সাব নাহানে মে হ্যায়। ব্যাস তার এক কথা। এমনকি তখন মেমসাব কেমন সন্তর্পণে চলাফেরা করেন। তিনি পর্যন্ত ঢুকে বলতে সাহস পান না, আমি দেখব, দাঁত আসল না নকল।

তারপর যা হয়ে থাকে...নকল দাঁতের শৌখিনতা মানুষের মনে সেই কবে থেকে যেন। সে জানে বোঝে নকল দাঁতেরা খুব উজ্জ্বল হয়। পুরানো দাঁত পরে থাকতে বুঝি ভালো লাগে না মানুষের। উজ্জ্বল দাঁত পরে, হাসিটুকু উজ্জ্বল রেখে, সব সময় মানুষ তার নিজের গোড়ালি উঁচু রাখতে চায়। এবং এর ভিতরই থেকে যায় অসুখটা। টুকুনের ছিল—কিন্তু মজুমদার সাব অথবা মেমসাহেবের কোনও অসুখ নেই কে বলবে। প্রাচুর্য অনায়াস হলে মানুষের নকল দাঁতের দরকার হয়। মজুমদার সাব এটা যে বোঝেন না তা নয়, খুব বোঝেন। উদ্যম বিহনে কিবা পূরে মনোরথ—উদ্যমই সব। অথচ কোথায় যে মানুষেরা উদ্যম বিহনে ভুগে ভুগে অনায়াস প্রাচুর্যের লোভে কখনও মিছিলের ভিতর, কখনও কারখানার ভিতর, আবার কখনও বড় বাড়ির

সদরের এক কঠিন অসুখ—আর, এভাবে একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বের মতো ঘটনাটা আবিষ্কার করে কেমন তিনি উৎফুল্ল হলে, দরজার ও—পাশে ক্রিং ক্রিং করে ফোন বেজে উঠল।

তিনি রামনাথের গলা পাবেন আশা করে বসে আছেন—কে রে? তিনি রামনাথকে উদ্দেশ করে বাথরুম থেকে বললেন।

—সাব ইন্দ্র দাদাবাবু।

—ইন্দ্র দাদাবাবু।

—হ্যাঁ সাব।

—ছোঁড়াটা জ্যামে পড়ে গেল বুঝি!

—তা কিছু বলছে না।

—তবে কী বলছে?

—মেমসাবকে চাইছে।

—ধরো। আসছি।

তিনি একটা নীল রঙের তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে বেশ ছুটে এসে ফোনটা ধরলেন—হ্যালো কে?

—আমি ইন্দ্র বলছি মেসোমশাই!

—কী ব্যাপার!

—ব্যাপার খুব ভীষণ।

—রাস্তায় আটকা পড়েছ?

—রাস্তায় না, একাডেমিতে। পাশের একটা দোকান থেকে ফোন করছি।

—আটকা পড়েছ মানে?

—টুকুন আমাকে না বলে না কয়ে কখন বের হয়ে গেছে গাড়ি নিয়ে।

—কোথায় গেছে?

—জানি না।

—কখন গেছে?

—অনেকক্ষণ।

—গেছে যখন, ঠিক ফিরে আসবে। মজুমদার সাব এইটুকু বলে ফোন ছেড়ে দেবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে ইন্দ্র আরও কিছু বলবে। কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন সে কিছু বলতে ইতস্তত করছে।

—টুকুন আমাকে বলল, একটু বোসো। আমি আসছি।

—আসছি যখন বলেছে, ঠিক চলে আসবে।

—সে বাড়ি ফিরে যায়নি তো?

—তোমাকে না নিয়ে বাড়ি ফিরবে কী করে!

—কী জানি, ওর যা মেজাজ।

—কতক্ষণ হল গেছে?

—ঘণ্টা দুইয়ের ওপর হবে।

মজুমদার সাবের মুখ সামান্য সময়ের জন্য খুব উদ্বিগ্ন দেখাল তারপর ভাবলেন কোনও জ্যামে পড়ে গেছে। তিনি বললেন—আজ তোমাদের বের হওয়া উচিত হয়নি। কী করে যে ফিরবে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার তো যাবার কথা ছিল ওদিকে, কিন্তু কিছুতেই যেতে পারলাম না। রাত দশটার আগে জ্যাম ছাড়বে বলে মনে হয় না।

—এদিকে তো শুনছি মাঠে ভীষণ গণ্ডগোল। পুলিশ আর জনতার খুব মারধর হচ্ছে। যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।

—তোমার তো দোকানে থাকা উচিত হবে না এ—সময়। টুকুন ফিরে এসে তোমাকে না পেলে ভাববে।

—কিন্তু এমন হওয়া তো উচিত না। কেমন বেপরোয়া। হুঁশ করে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। সোজা রবীন্দ্রসদন পার হয়ে বাঁদিকে ঘুরে গেল।

—কোথায় যেতে পারে তোমার মনে হয়।

—কী করে বলব। তবে কদিন থেকে বলছিল ওর বাওবাব গাছের খুব একটা দরকার।

—বাওবাব গাছ! সে আবার কী!

—সে আমিও জানি না। সুবল একটা বাওবাবের চারা খুঁজছে।

—কত রকমের যে গাছ আছে পৃথিবীতে!

ইন্দ্র মনে মনে হাসল। মেয়ের মতো বাপেরও বুঝি একটা রোগ আছে। মেয়েটা কোথায় গেল, এতটুকু চিন্তা করছে না। সে এবার বলল—মাসিমা কোথায়?

—এ সময় তো তুমি জানো ও বাড়ি থাকে না। আমিই কেবল অসময়ে বাড়িতে। একটু থেমে বললেন—শোন, তুমি দেরি কোরো না। ও এসে তোমাকে জায়গামতো না দেখলে খুব চিন্তায় পড়ে যাবে।

ইন্দ্র এবার হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না। সে বলল—ঠিক আছে, যাচ্ছি। সে মজুমদার সাবকে কিছু বলে চটাতে ভয় পায়। টুকুনের সায় নেই, মেসোমশাইরও সায় না থাকলে ওর হিসাব উলটে যাবে। সে ভয়ে বলতে পারল না টুকুন আমাকে এসে না দেখলে খুব খুশি হবে, সে এতটুকু ঘাবড়ে যাবে না। বললেই যেন সে ধরা পড়ে যাবে—সে খুব অক্ষম, টুকুনকে সে এতদিনেও হাত করতে পারেনি। এবং অন্য যুবকেরা তো বেশ গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়িয়েই আছে—এক ফাঁকে এই সাম্রাজ্যের ভিতর কী করে লাফিয়ে পড়া যায়। টুকুনের এক মাস্টারমশাই পর্যন্ত—ছোঁড়া খুব দামি গাড়িতে আসে পড়াতে। মেসোমশাইর কাছে ওর খুব সুনাম! আশ্চর্য যে একজন পেটি শিক্ষক কীভাবেই বা আশা করে টুকুনের মতো মেয়েকে পাবার—তবে যে টুকুনের অসুখ। অসুখ না থাকলে এমনভাবে সে একটা পাখিয়ালার জন্য বাওবাবের চারা খুঁজে বেড়াচ্ছে!

হঠাৎ ইন্দ্রের খেয়াল হল, যা, মেসোমশাই ফোন ছেড়ে দিয়েছে! সে হঠাৎ কী ভাবতে গিয়ে বলতে গিয়ে বলতে পারল না, আমি ঠিক জানি ও কোথায় গেছে! কিন্তু ওটা যে আর বলা হল না! মেসোমশাই ফোন ছেড়ে দিয়েছে। সে আবার ভাবল ডায়াল ঘুরিয়ে বলবে—কিন্তু তক্ষুনি মনে হল টুকুন যদি চলে আসে। সে সত্যি যদি ওকে না দেখে ভীষণ ঘাবড়ে যায়! এমন ভাবতে ইন্দ্রের ভীষণ ভালো লাগে এবং ভালো লাগাটা সে কখনও সত্যি সত্যি মনে মনে মেনে নেয়। কী হবে সব জানিয়ে—মেয়েটার অসুখ বড় কঠিন অসুখ এক—যা সে নিত্যদিন দেখে দেখে কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। কোথাকার এক পাখিয়ালা, কোথাকার এক পেটি শিক্ষক—যারা সহবত জানে না তারা পর্যন্ত টুকুনের কাছে খুব দামি মানুষ।

ইন্দ্র সুতরাং রাস্তা পার হয়ে যায়। সেই গাছটার নিচে গিয়ে বসে থাকে। এবং গাড়িগুলোর যাওয়া—আসার পথে সে কেবল ভাবে—এই বুঝি টুকুন এল। ক্রমে রাত বাড়ে এভাবে। ওর ভালো লাগে না। মাকে ফোন করে গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলবে ভাবল। মা জিজ্ঞাসা করবে—কী হল, তোকে তো টুকুন পৌঁছে দিয়ে যায়। আজ তোর এমন কথা কেন! সে কেন জানি তার মাকেও বলতে ভয় পায়—মা, টুকুনের অসুখে আমাকে জড়াচ্ছ কেন। মেয়েটা আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না। তারপরই মনে মনে ভীষণ রাগ, এবং এক কঠিন মুখ, এ—মুখ যে তার নিজের সে ঠিক তখন বুঝতে পারে না। কেমন নৃশংস মুখ হয়ে যায়। পেটি শিক্ষকের কথা সে ছেড়ে দিতে পারে, তার ওপর সে ভরসা রাখতে পারে; কিন্তু মনে হয় বারবার সে হেরে যাবে একজনের কাছে—তার নাম সুবল—এক পাখিয়ালা। ফুলের রাজ্য তৈরি করে সে এক স্বপ্নের দেশের মানুষ হয়ে গেছে টুকুনের কাছে। তার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, টুকুনের স্বপ্নটাকে সে যে ভাবে পারে ভেঙে দেবে। এবং তার আজই ইচ্ছা হল, একবার গোপনে সে সুবলের দেশটা দেখে আসবে—কীসের আকর্ষণ, এমনভাবে তাকে ফেলে পালিয়ে যাবার কী এমন আকর্ষণ! তারপরই কেন জানি সে জোর করে হেসে ফেলে—কীযে সব আজেবাজে সে ভাবছে! টুকুন না বলে গাড়ি নিয়ে গেছে বলে অভিমানে যত সব বাজে সন্দেহ।

হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে। কোথাও জ্যাম—ট্যামে আটকে গেছে। তা ছাড়া যদি.....যদি....একটা অ্যাকসিডেন্ট! ওর কেমন ভয় ধরে গেল। এভাবে বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না। সব খুলে বলা দরকার। একটা ট্যাকসি—এই ট্যাকসি। এভাবে দুবার তিনবার ট্যাকসি ডেকে শেষবার পেয়ে গেলে—সোজা টুকুনদের বাড়িতে। সে এসেই বলল—টুকুন ফেরেনি মাসিমা?

মাসিমার মুখ ভীষণ ভার। জ্যামে তিনিও আটকে গিয়ে অসময়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন। হাতের এতটা সময় কী কে করেন! মিঃ তরফদারের সঙ্গে তাঁর দেখা না হওয়ায় তাঁর খুব খারাপ লাগছে। এবং তখন যেন হাসতে হাসতে বলা—শুনছ, টুকুন ইন্দ্রকে গাছতলায় বসিয়ে গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে গেছে।

—ভালো করেছে।

মেজাজ ভালো না থাকার ব্যাপারটা মজুমদার সাব বেশ ধরতে পেরে মনে মনে হাসছিলেন।

এবং ঠিক পরে পরেই ইন্দ্র এসে যখন বলল—মাসিমা টুকুন ফেরেনি! কেমন হুঁশ ফেরার মতো তিনি ঘড়ি দেখলেন—মেয়েটার জন্য কেমন প্রাণ কেঁদে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার—তুমি কী। মজুমদার সাবকে ভীষণ গালাগাল—তুমি এতবড় নিষ্ঠুর। আমার একটা মাত্র মেয়ে তাও তুমি এমনভাবে চুপচাপ আছো।

—আরে ঠিক চলে আসবে। মনে হয় সুবলের কাছে গেছে।

—সেই পাখিয়ালাটা! ছিঃ ছিঃ। তুমি এখনও চুপচাপ বসে আছ? ইন্দ্র, তুমি পরিমলকে ধরো তো।

—আরে করছ কী! পুলিশ কমিশনার—টমিশনার আবার ডাকছ কেন? আমি তো আন্দাজে বললাম।

টুকুনের মা ঘড়ি দেখছে কেবল। নটা বেজে গেছে। সুবলের কাছে গেছে কী, যায়নি, কেউ তো ঠিক জানে না, হয়তো মীনাদের বাড়ি গেছে, মীনার কথা মনে হতেই জোনার কথাও মনে হল। যা খামখেয়ালি মেয়ে। টুকুনের মা সব ওর বান্ধবীদের এক এক করে যখন ফোন শেষ করে উঠবে তখন সবার চোখে অন্ধকার। এবার বোধ হয় পুলিশ কমিশনার—টমিশনার দরকার আছে। কিন্তু এতবড় বাড়ির একটা ব্যাপার, স্ক্যান্ডাল হতে কতক্ষণ—আরও কিছু সময় দেখা দরকার। হয়তো কিছুই হয়নি। পুলিশে ছুঁলেই আঠারো ঘা। সুতরাং ইন্দ্র, মজুমদার সাব, টুকুনের মা এবং মজুমদার সাবের পার্সোনেল সেক্রেটারি চুপচাপ কী করা যায় ভাবছিলেন—তখন মনে হল কেউ বলতে বলতে আসছে—টুকুনদিদিমণি আসছে।

ওরাও দেখল টুকুনদিদিমণি আসছে। ভীষণ সজীব। পেছনে ধীর পায়ে আসছে সুবল। কত লম্বা দেখাচ্ছে ওকে। খুব হাসিখুশি। বাড়ির ভিতর যে একটা ব্যাপার ঘটবে সুবল যেন বুঝতে পেরেছে। তবু সে এতটুকু আমল না দিয়ে বলল—টুকুনদিদিমণি একাই ফিরতে চেয়েছিল, এতটা রাস্তা একা আসবে—ঠিক সাহস পেলাম না।

মজুমদার সাব খুব সংযত গলায় বললেন—এভাবে টুকুন তোমার যাওয়া উচিত হয়নি। আমরা খুব ভাবছিলাম।

ইন্দ্র বলল—আর একটু হলেই পরিমল মামাকে ফোন করব ভেবেছিলাম।

টুকুনের মা বলল—তুমি আর বাড়ি থেকে কোথাও বের হবে না।

সুবল বলল—আমি যাচ্ছি টুকুনদিদিমণি।

মজুমদার সাব বললেন—না, বোস।

টুকুনের মা বলল—না, তুমি যাও সুবল। অনেক রাত হয়েছে।

সুবল বলল—সেই ভালো।

টুকুন বলল—একটু দেরি করে গেলে কিছু হবে না। এগারোটার লাস্ট ট্রেন পেয়ে যাবে। একটু কফি করে দাও মা।

মা যে কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। মেয়েটা এত বেহায়া। ইন্দ্র বলল—এটাও একটা অসুখ।

টুকুন বলল—কী অসুখ!

—এই অসুখ!

মজুমদার সাব খুব বিব্রত বোধ করছেন। তিনি বললেন—তুমি আর এসো না সুবল। তোমাকে নিয়ে সংসারে খুব অশান্তি।

টুকুন ভাবল, সবাই তবে তোমরা শান্তিতে আছো! সুবল এলেই যত অশান্তি। ঠিক আছে। সে বলল—সুবল, আমি কাল যাব।

টুকুনের মা থ, মেয়ের এত সাহস! ছেলেটা তুকতাক করে একেবারে মাথাটা খেয়েছে। এবং সুবল যখন চলে গেল, তখন টুকুনের মা—র ভীষণ মাথা ধরেছে। কী যে হবে!

কবে একবার ওর বাবা একটা বেয়াড়া চাকরকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন, এবং কুয়োতে ফেলে দিয়ে মাটি বুজিয়ে দিয়েছিলেন, কেন যে বাবা এমন করেছিলেন, সে জানত না। কেবল সে দেখেছে ঐ চাকরটার মৃত্যুর পর মা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সব সময় জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এবং চোখ উদাস। এখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

বুঝতে পারে বাবা বেশি বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। সে শেষ পক্ষের মেয়ে। বাবার সঙ্গে মা—র বয়সের তফাত কত যে বেশি ছিল, সে যেন সেটা এখনও অনুমান করতে পারে না। মা—র চোখ মুখ কী পবিত্র ছিল, মা বড় করে সিঁদুরের টিপ কপালে দিতেন। খুব মোটা করে আলতা পরতে ভালোবাসতেন, মা—র চোখে মুখে ছিল অসীম লাবণ্য। মা কখনও কঠিন কথা বলতে জানতেন না। ঝি—চাকরদের কাছে মা ছিলেন দেবীর মতো, অথচ বাবার সংশয় ভীষণ এবং এই সংশয় থেকে সংসারে ঝড় উঠেছিল।

এসব কথা মনে হলে মাথা ধরাটাও আরও বেড়ে যায়। টুকুনের জন্য তার এমন একটা কিছু মনে হয়েছে। এবং সে যেতে যেতে দেখল বড় বড় আয়নায় ওর প্রতিবিম্ব পড়ছে। সে নিজের মুখের দিকে নিজেই তাকাতে পারছে না। ভীষণ কুৎসিত দেখাচ্ছে মুখ। সমাজে সে মুখ দেখাবে কী করে! মিঃ তরফদার এ—নিয়ে বেশ রসিকতা করবেন। কান গরম হয়ে যাবে। পায়ের রক্ত মাথায় উঠে আসবে। সে তার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে দেখতে পেল—দেয়ালের সব বড় বড় ছবি ওর দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে। অথবা সব ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে যাচ্ছে। এবং ওর পিছনে ছুটে আসছে। আর ঘড়িতে তখন সাড়ে দশ। রেল স্টেশনে গাড়ি ছাড়ার শব্দ। কেমন বেহুঁশের মতো সে তার ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। আর একটু বাদে এ—ঘরে সেই কাপুরুষ মানুষটা ঢুকবে। মুখে লাগানো তার নকল দাঁত। ওকে চেটেপুটে খাবার জন্য আসবে। সে এসে যাতে চেটেপুটে না খেতে পারে সেজন্য দরজা বন্ধ করে দিল।

দরজা বন্ধ দেখলে মানুষটা ফিরে যাবে এবং সারা রাত ছটফট করবে বিছানায়। ওর ঘুম আসবে না। সকাল হলে সে মানুষটার কাছে যা চাইবে ঠিক পেয়ে যাবে। সে জানে সারা দিন পর শরীর চেটেপুটে খেতে না দিলে মানুষটার কামনা—বাসনা মরে না। সে তার মেয়ে টুকুনকে সুস্থ করে তোলার জন্য আবার কী করা যায় ভেবে যা স্থির করল সে বড় নৃশংস। ভাবতেও ভয় হয়।

কুড়ি

আর তখন টুকুন দরজা—টরজা পার হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

প্রায় সে ছুটে ছুটে সিঁড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে গেছে। কী যে মহার্ঘ বস্তু তার শরীরে আছে—যা সুবলের কাছে গেলেই ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। নদীতে স্নানের দৃশ্য মনে হলে সে কেমন লজ্জায় গুটিয়ে আসে। ওর চোখ মুখ তখন বড় সুষমামণ্ডিত মনে হয়। তার কাছে সুবল এক আশ্চর্য মানুষ। সে এতক্ষণ সুবলের ফুলের উপত্যকায় জ্যোৎস্না রাতে চুপচাপ বসেছিল পাশাপাশি। ফুলেরা সব ওর শরীরের চারপাশে বাতাসে দুলেছে। আর সেই বুড়ো মানুষের সুর ধুয়ে পড়ে যাওয়া সব সুরা বাতাসে এক সুন্দর সজীবতা গড়ে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে সুবল সেই সব সুরার অর্থ করে দিলে—মনে হত আশ্চর্য এই জীবন—সে আছে মানুষের পাশাপাশি—যার শরীরে আছে নানা বর্ণের ফুলের সৌরভ।

সে এভাবে এমন একটা মুগ্ধতার ভিতর আছে যা ভাবা যায় না। ঘরে ঢুকেই সে পিয়ানোর রিডে ঝম ঝম শব্দ তুলে হাত চালাতে থাকল। এবং আশ্চর্য সব সিমফনি গড়ে তুলতে চাইছে সেই সব শব্দের ভিতর। যেমন যেমন সে সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধ্যা এবং রাতের প্রথম দিকে সারা জ্যোৎস্নায় ঘোরাঘুরি করেছে সে ঠিক তেমনি রিডের ওপর হাত চালাতে থাকল।

প্রথমে সে গোটা রিডের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে দু' হাতের আঙুল চালিয়ে গেল। যেন সে সুবলের কাছে যাবে বলে মোটরে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে। তার রাস্তাটা ঠিক জানা নেই। রিডে যে জন্য মাঝে মাঝে টুকুনের হাত কাঁপছে। হাত কাঁপলেই মনে হয় ইতস্তত মোটরটা রাস্তা ভুল করে ফেলেছে। ভুল করেই ফের শুধরে নিচ্ছে—তখন আবার দু'হাতের সমস্ত আঙুল কোমল লতার মতো দুলে দুলে যেন সুতার বাঁধা সরু সরু সব পুতুলের হালকা পা রিডগুলোতে কখনও অল্প, কখনও বেশি নরম এবং কখনও ছোট ছোট অক্ষরে লিখে যাবার মতো তার মনের উদ্বিগ্ন ভাব এবং আকুতি ফুটিয়ে তুলতে চাইছে পিয়ানোতে।

এভাবে একটি মেয়ে এমন সব সুর তুলে ফেলছে এমন সব সুন্দর ঝংকার তুলছে পিয়ানোতে যে সমস্ত বাড়িটা যেন সুরের ঝংকারে ভাসছে। কখনও হালকা মেঘের ওপর—কখনও জলে গলে যাবার মতো, আবার মনে হয় স্থির হয়ে আছে বাড়িটা—সাদা জ্যোৎস্নায় সব কেমন করুণ হয়ে আছে।

ঘরে ঘরে আর কেউ ঘুমোচ্ছে না এখন। সুরের ইন্দ্রজালের ভিতর সবাই ডুবে যাচ্ছে। এমন ঝংকার যে—মনে হয় কোথাও দু'জন পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে, কোথাও ওরা দুজন পাশাপাশি সাঁতার কাটছে নির্মল জলে। আবার মনে হচ্ছে বনের ভিতর দাপাদাপি। একজন আগে ছুটে যাচ্ছে আর একজন পিছনে! পাতা পড়ার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। বনের মর্মর শোনা যাচ্ছে আবার শোঁ শোঁ ঝড়ের বেগে গাছের ডালপালা ভাঙার শব্দ! আর খুব কান পাতলে বোঝা যায় এখন টুকুন যে ঝংকার তুলছে রিডে, সবই নদীতে নেমে যাবার আগের দৃশ্য। প্রথমে দুজনে ধীর পায়ে জলে নামছে। খস খস শব্দ। শাড়ি হাঁটুর ওপর উঠে আসছে। তারপর ঝুপঝাপ—দু'জনে নেমে যাচ্ছে। জলে সাঁতার কাটছে। খুব লঘুপক্ষ হয়ে জলে ভেসে যাচ্ছে। এত আস্তে এখন পিয়ানোতে আঙুলগুলো নড়ছে টুকুনের যে মনে হয় আঙুলগুলো অবশ হয়ে গেছে। টুকুন চোখ বুজে বাজাচ্ছে। এবং সেই দৃশ্যের ভিতর জলের নীচে ডুব দেবার শব্দ, অথবা পা দুটো ঠিক মাছের মতো যে খেলছে জলের নীচে তার শব্দ, অথবা লুকোচুরি খেলার জন্য গভীর জলে ক্রমে ডুবে যাওয়া, ডুবতে ডুবতে গভীরে ডুবে যাওয়া আরও তলায় এবং শেষে কিছু জলের ওপর ফুটকুরি তোলার আওয়াজ—সবটাই এখন নিপুণভাবে টুকুন রিডের ওপর বিস্তার করার চেষ্টা করছে।

আর চার পাশে ওপরে নীচে যত কামরা আছে, যত মানুষ আছে এই প্রাসাদের মতো এক অবিশ্বাস্য সিমফনি একের পর এক বাজিয়ে যাচ্ছে। একটা বাজাচ্ছে—শেষ করছে বাজনা, মিনিটের মতো বিরতি, তারপর আবার, ঝমঝম শব্দ। যেন ভীষণ বেগে প্রপাতের জল নেমে আসছে। বাড়িটা জলের নীচে ডুবে যাচ্ছে। আর নিশ্বাস বন্ধ করে একের পর এক সবাই এসে এবার পার্লারে জড়ো হচ্ছে। পার্লারে সব আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। সবাই মুখোমুখি বসে। কেউ ওপরে যেতে পাচ্ছে না। কেমন এক মুগ্ধতায় সবাই বসে রয়েছে মুখোমুখি। ঝাড়—লণ্ঠনে সব আলো জ্বলছে। দেয়ালের পুরানো পেন্টিং পর্যন্ত সজীব দেখাচ্ছে।

এবং মেয়েটা বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই। সে তার ঘরে খুব অল্প আলো জ্বেলে রেখেছে। একটা মোম জ্বাললে যতটা হয় ঠিক ততটা। সে সেই সিল্কের শাড়িটাই পরে আছে। ওঁর কাঁধ থেকে আঁচল খসে পড়েছে। ওর চুল উড়ছিল পাখার হাওয়ায়। আর ও ভীষণ ঘামছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ক্রমে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সে এবার বাজিয়ে গেল—একদল পাখি উড়ে যাচ্ছে। মেষপালকেরা ঘরে ফিরছে। গোরু—বাছুরের ডাক ভেসে আসছে। বাতাসে নদীর জলে ঢেউ। কেউ যেন সেই জলে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে তার শব্দ। তারপর চুপচাপ বসে থাকলে যে এক নিরিবিলি ভাব থাকে তেমন এক ভাব। কত অনায়াসে যে মেয়েটা এমনভাবে সামান্য কটা রিডে আশ্চর্য সব সিমফনি গড়ে যাচ্ছে।

এবং সব শেষে ওরা শুনছে ক্রমে বাজনা দ্রুত লয়ে উঠতে উঠতে ঝম—ঝম শব্দ। বুঝি যুবক—যুবতী সাঁতরে নদী পার হচ্ছে। এবং নরম ঘাস মাড়িয়ে ছুটছে। তারপর বনের ভিতর আদম—ইভের মতো ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষে জ্ঞানবৃক্ষের ফল থেকে যা হয় এক আশ্চর্য মাদকতা, অথবা মুগ্ধতা এবং অপার বিস্ময়বোধ শরীর সম্পর্কে কী যে ভালো লাগে, ভালো লাগার যেন শেষ থাকে না—অন্তহীন ঈশ্বরের অপার ইচ্ছা শরীরে খেলে বেড়ালে কেমন আবেগে বলার ইচ্ছে—তুমি আমায় দ্যাখো, সবকিছু দ্যাখো, আমাকে তোমার ভিতর নিঃশেষ করে দাও। এই ভাবে সব কিছু নিঃশেষে হরণ করে নিলে মনে আছে টুকুন সুবলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। কত সহজে সে—সবও বাজিয়ে যাচ্ছে!

তারপর এক সময় টুকুন পাশের টুলটাতে বসে পড়ল। এবং পিয়ানোর রিডে মাথা রেখে চোখ বুজে থাকল। তার এখন আর উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। দরজায় বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন। ডাকছেন, টুকুন। এটা কী হচ্ছে! এত রাতে তুমি এমনভাবে বাজালে আমাদের ভয় লাগে। তুমি দরজা খোল।

ইন্দ্রও বলছে, টুকুন দরজা খোল।

টুকুনের মা বলল, এক অসুখ সেরে অন্য অসুখে মেয়েটা ভুগছে। আমার কী যে হবে!

—কী হবে আবার! টুকুনের বাবা ধমক দিতে গিয়েও ইন্দ্রকে দেখে কিছু বলতে পারলেন না।

—কিছু হবে না বলছ! মানুষ এভাবে কখনও পিয়ানো বাজাতে পারে?

—পারে না?

—টুকুন কতটুকু বাজনা শিখেছে! যে এতেই সে এমন একটা আশ্চর্য লয় তান শিখে ফেলবে।

—এটা তো মনের ব্যাপার। তুমি সব তাতেই এত ভয় পাও কেন বুঝি না।

—না, ভয় পাব না, একটা ডাইন এসে আমার মেয়েটাকে কী করে ফেলল। বলে, দরজায় নিজের কপাল ঠুকতে থাকল।

টুকুন আর বসে থাকতে পারল না; দরজা খুলে বলল, তোমরা এখানে কেন? মার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা তুমি কী করছ!

—না এখানে থাকব না। এটা কী বাড়ি না ভূতের বাসা!

—পিয়ানো বাজালে ভূতের বাসা হয়।

মজুমদার সাহেব বাধা দিলেন কথায়। টুকুন মা লক্ষ্মী। তুমি এবার খেয়ে শুয়ে পড়। বাজাতে ইচ্ছা হয় সকালে উঠে বাজিয়ো।

গীতামাসি বলল, আমি সব গরম করে রেখেছি।

টুকুন আর কথা বাড়াল না। বাথরুমে ঢুকে সে সব খুলে ফেলল। শরীর কেন যে এত পবিত্র লাগছে। কেন যে এত হালকা লাগছে। শরীরে যা কিছু মুক্তাবিন্দু সব সে ধীরে ধীরে সাবানের ফেনায় তুলে ফেলল। সুবল এভাবে একটা ফুলের উপত্যকায় কিংবদন্তির মানুষ হয়ে যাবে কখনও যেন টুকুন জানত না। ওর ফুলের গাড়িগুলোর টংলিং টংলিং শব্দ টুকুন এখনও যেন শুনতে পাচ্ছে। এবং ওর চুপচাপ থাকা, বড় লম্বা শরীর, কালো গভীর চোখ, ঢোলা পাঞ্জাবি সব কিছু আর সে ফুলের জগতে আছে বলেই ওর ভিতর এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যেন জেগে উঠেছে। সুবল বলেছে—যা কিছু এখানে দেখছ—আমার বলতে কিছু নেই। যারা কাজ করে তাদের। যা কিছু লাভ অলাভ তাদের। ওরা না থাকলে—এভাবে একটা ফুলের উপত্যকা গড়া যায় না।

টুকুন ভেবেছিল, এটা খুব সত্যি। এবং টুকুনের কাছে এটাই খুব বিস্ময়ের ব্যাপার যে সে এভাবে সবকিছু কবে বিশ্বাস করতে শিখল।

সুবল বলেছিল—এটা একটা আমার অহঙ্কার টুকুনদিদিমণি—মানুষের ভালোর জন্য কতটা দূরে যাওয়া যায় দেখা।

এ—কথাটাও টুকুনের খুব ভালো লেগেছিল। এবং মনে হয়েছিল—একটা বিরাট অসুখের শিকার তার মা—বাবা। কখনও সে মা—বাবাকে শান্তিতে বসবাস করতে দ্যাখেনি। ওর ইচ্ছা হয়েছিল বলতে, আমাদের বাড়িতে এমন একটা সুন্দর ফুলের উপত্যকা গড়তে পারো না। কিন্তু বলতে গিয়ে ও থেমে গেল। কারণ সে তার মায়ের ভয়ঙ্কর দুটো চোখ তখন সামনে ভাসতে দেখেছিল।

আর তখন টুকুনের মা এবং বাবা ইন্দ্রকে গাড়িবারান্দায় ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসছিল। মনে হল ঝি চাকর পাশে কেউ নেই। দু—পাশে ঘরগুলো ফাঁকা। ফরাসে যারা কাজ করে তারা বারান্দায়—মেমসাব ঢুকে গেলেই ওরা সব এদিককার আলো নিভিয়ে দেবে। কেবল বড় একটা আলো জ্বলবে গাড়িবারান্দায়। এবং নিয়নের আলো জ্বালিয়ে রাখা হবে লম্বা করিডোরে।

একটু ফাঁকা পেয়ে আর সবুর সইছে না, টুকুনের মা কঠিন গলায় ডাকল। —শোন।

মজুমদার সাব দাঁড়ালেন।

—কাল আমি ইন্দ্রের বাবাকে কথা দেব।

—কী কথা!

—আগামী আষাঢ়েই বিয়ে। আমি আর একদণ্ড নষ্ট করতে চাইছি না।

—সে তো ভালো কথা।

—কাল থেকে টুকুনের বাইরে বের হওয়া বারণ।

—আবার যদি পুরানো অসুখটা দেখা দেয়।

—সে অনেক ভালো।

—মন খারাপ থাকলে যা হয়, পুরনো দুঃখ ফের ফিরে আসতে পারে।

—এটা হলে আমি বেঁচে যাই।

—মা হয়ে তুমি এমন কথা বলছ!

—আমি আমার মান—সম্মানটা বুঝি। তুমি তোমার কারখানা কারখানা করে সেটা পর্যন্ত হারিয়েছ।

—আর কারখানা থাকছে না।

টুকুনের মার মুখে কেমন ব্যাজার হয়ে গেল।

—সত্যি আর থাকছে না। আমি লক—আউট করব ভাবছি। ওরা স্টে—ইন—স্ট্রাইক করছে। আমি লক—আউটের কথা ভাবছি। দরকার হলে ক্লোজার।

—কিন্তু এসব করলে তুমি খাবে কী, আমরা খাব কী!

—সে দেখা যাবে।

ওরা এভাবে কথা বলতে বলতে ওদের শোবার ঘরের দরজায় চলে এসেছে। দুটো ঘর আলাদা। ওরা এক ঘরে শোয় না। ভিতরের দিকে একটা দরজা আছে—যা ইচ্ছা করলে দুজনেই দুদিক থেকে খুলে ফেলতে পারে। মজুমদার সাব স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব ভাবনা হচ্ছে!

টুকুনের মা এখনও যুবতী—লম্বা, চুল কোমর পর্যন্ত এবং চোখে ভীষণ মায়া। আবার এই চোখ কখনও কখনও খুব খারাপ দেখায়। মনেই হয় না টুকুনের মার স্নেহ মমতা বলে পৃথিবীতে কিছু আছে। এবং যা হয়ে থাকে, দুঃখী মুখ করে রাখলে মায়াবী এক ছবি চারপাশে দেখা যায়। তিনি তাঁর স্ত্রীকে দরজাতেই বুকের কাছে টেনে নিলেন। তারপর যা হয় দরজা খোলার তর সয় না। ওরা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে যায়। মজুমদার সাব নানাভাবে অভয় দেন—আমি তো আছি, আমার লাইসেন্স আছে। উদ্যম বিহনে পূরে কিবা মনোরথ। মাঝে মাঝে যেমন কবিতাটা আবৃত্তি করতে ভালোবাসেন, তেমনি এটা আবৃত্তি করে স্ত্রীকে নরম বিছানায় কিছুক্ষণের জন্য উদাসীন করে রাখলেন।

এবং এই উদাসীনতার ফাঁকে শরীরের সব কিছুর ভিতর আছে এক অহমিকা, ঠিক ঠিক জায়গায় হাত দিলে তিনি তা ধরতে পারেন। এবং এভাবে তিনি বেশ কিছু সময় স্ত্রীর শরীরে পার্থিব সুখ—দুঃখ খুঁজে যখন

ক্লান্ত, তখন মনে হল চারপাশে কেমন একটা দমবন্ধ ভাব। রামনাথ ওপাশের দরজায় বসে ঝিমোচ্ছে। তাকে ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে দেবার আগে বললেন, আমার ঘরের সব জানলাগুলো খুলে দে তো।

দরজা—জানালা খুলে দিলেও ভিতরের কষ্টটা যাচ্ছে না। তিনি টেবিল থেকে একটা গেলাস তুলে জল খেলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। লম্বা সিল্কের স্লিপিং গাউনের ফাঁকে শরীরের সবকিছু দেখা যাচ্ছে। পেটে তিনি এই বয়সেও চর্বি জমতে দেননি। খুব মিতাহারি। এবং শরীরের প্রতি অধিক যত্নের দরুন নকল দাঁত থাকলেও তাঁকে এখনও যুবা লাগে। খুব যুবা। তিনি অনায়াসে নিজেকে কমবয়সি বলে চালিয়ে যেতে পারেন। যৌবন ধরে রাখার কী প্রাণান্তকর ইচ্ছা। এবার তিনি প্রথম কেমন নিরালম্ব মানুষের মতো শুয়ে পড়লেন। তিনি ছোট বয়সের কথা ভাবলেন। তাঁর ছোট বয়সে মা তাঁকে তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি থাকবেন। পড়াশোনা করবেন। এবং বড় দুঃখের দিন—অনেক দূরে ছিল স্কুল। গ্রাম, মাঠ, কিছু ফলের বাগান পার হয়ে যেতে হত। টিফিনের পয়সা থাকত না। রাস্তায় শীতে অথবা বসন্তে পড়ত খিরাইর জমি, তিনি এবং অন্য সব ছেলেরা মিলে খিরাই চুরি করে স্কুলের টিফিন, অথবা বর্ষার দিনে ছিল শালুক আর শাপলা, গ্রীষ্মে নানারকম ফলপাকুড়—যেমন আম, জাম, জামরুল—এভাবে একটা সময় কেটে গেছে তাঁর। এখন কেন জানি মনে হয় বড় আরামের দিন ছিল সেগুলো। আত্মীয়াটি খুব নিগ্রহ করত তাঁকে। সে—সব এখন তাঁর মনেই হয় না। বরং কী যেন একটা জাঁতাকলে পড়ে সব সময় ভীতু মানুষের মতো মুখ করে রাখার স্বভাব এখন। ভালোভাবে হাসতে পর্যন্ত ভুলে গেছেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় এ—থেকে নিষ্কৃতি পেতে। নিজেই একটা নিজের গোলকধাঁধা বানিয়ে এখন যে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সেই অভিমন্যুর মতো ভিতরে ঢোকার পথটা বুঝি কেবল জানা আছে। বাইরে বের হবার রাস্তা তাঁর জানা নেই।

তারপর গভীর রাতে ঘুম এলে তিনি একটা ভীষণ জড়বৎ মানুষের পৃথিবীতে কিছু অস্থির ছবি একের পর এক দেখে গেলেন। ছবিগুলো তাঁর চোখের ওপর লম্বা হাত—পা—ওয়ালা কঙ্কাল সদৃশ চেহারায় নাচছে। কেউ হয়তো হাত—পা বাড়িয়ে কোমর দুলিয়ে নাচছে। এবং সুন্দর এক মেয়ের চেহারা, সে এসেছে তাদের ভিতর নাচবে বলে। কেমন বায়ুহীন, অন্নহীন জগতে সে এসেছে দেবীর মতো। তারপর কী যে মোহে সেই সব লম্বা হাত—পা—ওয়ালা মানুষের ভিতর সে মিশে গেলে দেখতে পেল, ওরও হাত—পা ক্রমে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। কেমন আগুনের ঝড়ো হাওয়ায় ওর সব মাংস খসে পড়ছে। এখানে এলে বুঝি কেউ সঠিক চেহারায় ফিরে যেতে পারবে না। সেও নাচছে কোমর দুলিয়ে, মাঝে মাঝে হাত এত বেশি লম্বা করে দিচ্ছে যে সে ইচ্ছা করলে আকাশের সব গ্রহ—নক্ষত্র পেড়ে আনতে পারে। এবং আকাশের সবকটা নক্ষত্র হেলেদুলে যেন একটা খেলা, ওরা বেশ সুন্দর মেয়ে হয়ে যাচ্ছে কখনও। এবং অন্নহীন, বায়ুহীন পৃথিবীতে ওরা আকাশের সব গ্রহ—নক্ষত্র ফুলের মতো পেড়ে পৃথিবীকে শ্রীহীন করে দিচ্ছে। তিনি তাঁর স্ত্রীর মুখও সহসা এদের ভিতর দেখে ফেললেন।

স্ত্রীর মুখ দেখতে পেয়েই মনে হল স্বপ্নটা কুৎসিত। তিনি আরও সুন্দর স্বপ্ন পছন্দ করেন। তবে কীভাবে যে সেই সুন্দর স্বপ্ন দেখা যায়! তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল—এই বাড়িটা আরও বড় হয়ে যাক। গেটে টুপি পরা দারোয়ান থাকুক। অনেক দাসদাসী, কর্মচারী। পঁচিশ—ত্রিশটা কারখানার মালিক তিনি হতে চান। আজ কলকাতা, কাল সান—ফ্রান্সিসকো এভাবে বিদেশিনীদের নিয়ে স্ট্যাচু অব লিবার্টির নীচে বসে থাকা। অথবা চোখের ওপর কেন যে সেই একশো আটতলা বাড়িটা ভেসে উঠছে না। অথচ স্বপ্নের ভিতর তিনি দেখলেন একটা কাচের বোয়েম। বোয়েমটা এক দুই করে অনেক তলা। এত ছোট বোয়েমে এক তলা থাকে কী করে! স্বপ্নের ভিতর গুনতে সময় লাগে না। সেই বোয়েমে তিনি বুঝতে পারলেন একশো আটতলাই আছে। এবং হাজার, দু'হাজার তারও বেশি হবে ফ্ল্যাট। লক্ষের ওপর মানুষের চিড়িয়াখানা। বোয়েমটা একটা দণ্ডের ওপর বসানো। কেমন কেবল চোখের ওপর ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। আর যা দেখা গেল আশ্চর্য! পৃথিবীটা এই একটা বোয়েমের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে। এবং তিনি দেখতে পেলেন সেখানে পঞ্চানন দাসের স্ত্রী সুমতির

গলায় দড়ি। এটা বোধহয় আত্মহত্যা। তিনি যেহেতু পঞ্চাননকে ডেকে চাকরি দিয়েছিলেন, যদিও এখন পঞ্চানন ইউনিয়ন করে লিডার বনে গেছে, তবু চাকরির সুবাদে তাকে তুই—তুকারি করতে বাঁধে না।

—এটা তোর বউ?

—আজ্ঞে স্যার।

—আত্মহত্যা?

—আজ্ঞে...!

—কেন?

—ঠিক জানি না স্যার। দুপুরের শিফটে খেয়ে কারখানায় গেছি—বউ সুন্দর করে রেঁধেবেড়ে খাইছে। কারখানায় খবর পেলাম যে গলায় দড়ি দিয়েছে।

—নিশ্চয়ই বকেছিলি।

—না স্যার। ইদানীং আমি ওকে কিছু বলতাম না।

—আগে বলতিস।

—আগে কথায় কথায় মারধোর করেছি। অভাব—অনটনে মাথা ঠিক থাকত না। তবে আমাদের খুব মিল ছিল।

—এখন।

—এখন তো আপনার দয়ায় সে—সবের কিছু নেই।

—তবে স্টে—ইন—স্ট্রাইক করেছিস কেন?

—হুকুম স্যার।

—কার হুকুম?

—ইউনিয়নের।

—কত মাইনেতে ঢুকেছিলি?

—ত্রিশ টাকা।

—এখন কত?

—তিনশ' টাকা।

—ক' বছরে?

—ছ' বছরে?

—প্রডাকসান কত বেড়েছে?

—কিছু না।

—কতটা করতে পারিস ইচ্ছা করলে?

—তা দ্বিগুণ। মন দিয়ে কাজ করলে আমরা স্যার কী না করতে পারি?

—মন দিতে কুণ্ঠা কেন?

—যখন হয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে।

—এভাবে বেশিদিন চলে না! আমি ক্লোজার করব।

—ক্লোজার?

—কিন্তু কী কথায় কী কথা এসে গেল। তোর বউটা আত্মহত্যা কেন করল!

—স্যার বলেছি তো জানি না।

—ঠিক জানিস। তিনি এক ধমক লাগালেন। স্বপ্নে বোধহয় তিনি জানেন, ধমক লাগালে পঞ্চানন তেড়ে আসবে না। অথবা ঘেরাও—র ভয় দেখাতে পারবে না। আর বাছাধন তো বেশ আটকে গেছে কাচের বোয়েমে। এখান থেকে বের হবার আর উপায় নেই।

তিনি বললেন, সব জানিস। পুলিশের ভয়ে এখন মুখে কুলুপ দিয়েছিস।

পঞ্চানন চুপ করে থাকল। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। তারপর লাশ, পুলিশ নিয়ে গেলে মিনমিনে গলায় বলল, স্যার পয়সা হলে ফটিনস্টি করার বাসনা হয়।

—সেটা কার?

—বউর।

—তোর হয় না?

—হয়। তবে কাজ করে সময় পাই না। কারখানায় কাজ, ইউনিয়নের কাজ করে ফিরতে বেশ রাত হত। বাড়ি ফিরলে সুমতি খুব সতীসাধ্বী মুখ করে রাখত। মুখ দেখলে কেউ তাকে অবিশ্বাস করতে পারবে না। অথচ কী আশ্চর্য দেখুন, তলে তলে সে বেশ একজন নাটকের লোককে ভালোবেসে ফেলেছে। টের পেলে কত বললুম—তুই ভুল করছিস। তোর ছেলেপুলেদের কথা ভাব। তখন স্যার কী বলব, সুমতি কোনও জবাব দিত না। চুপচাপ সংসারের কাজ করে যেত। যেন আমি মিথ্যা মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে বলছি। সতীসাধ্বী বলে ওর কিছু আসে যায় না।

এবং যখন ফের আত্মহত্যার কথায় এল মজুমদার সাব, তখন পঞ্চানন দাঁত বের করে হেসে দিল। —হ্যাঁ স্যার, এমন একটা করে ফেলেছি। এবং এভাবেই সংসারে টাকাপয়সা বাড়তি ঝঞ্ঝাট বয়ে আসে। কে যেন এমন বলে যাচ্ছিল। পঞ্চাননের এটা সঠিক টাকা রোজগার নয়। সে নানাভাবে ফাঁকি দিয়ে প্রাপ্যের ঢের বেশি আদায় করেছে। সংসারে এখন এসব টাকায় একটা বাড়তি খরচা তৈরি হয়। এবং এভাবেই পাপ এসে সংসারে বাসা বাঁধে।

পঞ্চানন বলল, স্যার আমরা উদ্যমশীল হলে আমাদের এমন অবস্থা হত না।

খুব ভালো লাগল এমন কথা শুনতে। যাক লোকটার ক্রমে চৈতন্যোদয় হচ্ছে। এবং সেই যে লাঠির ওপর, অথবা মনুমেন্টের মতো একটা উঁচু লম্বা লাঠির ওপর বোয়েমটা ঘুরছে এবং নাটক হচ্ছে প্রতি ঘরে, নাটকের কুশীলবদের চাউনি প্রেতাত্মার মতো দেখাচ্ছে—ওরা সবাই হাড়গোড় বের করা মানুষ, মজুমদার সাব এসব দেখে ঢোক গিললেন। মনে হল বুকে কষ্ট হচ্ছে, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে অন্ধকারে দেখলেন, কেউ তাঁর ঘর থেকে সরে যাচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, জল।

তারপর যা হয় ডাকাডাকি, লোকজন উঠে এলে, সবারই মুখে এক কথা, কী করে এ—ঘরে কেউ ঢুকতে পারে। তিনি বলে চলেছেন, জানো আমার মনে হচ্ছিল কেউ আমার গলা টিপে ধরেছে।

এভাবে স্বপ্নের ভিতর একটা ভীষণ অবিশ্বাস দানা বেঁধে যায় মানুষের মনে। মজুমদার সাবকে সকাল বেলাতে কেমন যেন খুব বিমর্ষ দেখাতে থাকল। তিনি আর রাতে ঘুমোতে পারেননি। স্ত্রীকে বলেছেন ডেকে, সে যেন তাঁর পাশে শোয়। পাশে শুলেও ভয়টা কিছুতেই গেল না। কেমন সারারাত চোখ বুজে পড়ে থাকলেন। লাইসেন্সের জন্য মনে খুব উৎকণ্ঠা ছিল। এবং কারখানার লক—আউটের ব্যাপারেও একটা ভয়াবহ টেনসান যাচ্ছে। এসব মিলে তিনি রাতের ঘটনার কার্যকারণ মেলাতে গিয়ে বুঝতে পারলেন—হিসাব ঠিক মিলছে না। তাঁর ভয়টা ক্রমে আরও বেড়ে গেল। সকালে খবর এল, সত্যি গত রাতে গলায় দড়ি দিয়ে পঞ্চাননের বউ আত্মহত্যা করেছে।

এবং এমন খবরেই মজুমদার সাবের আবার কেমন দম বন্ধ হবার উপক্রম। তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করলেন। আবার মনে হচ্ছে গলায় শ্বাসকষ্ট। ঠিক রাতের মতো অবস্থা। ডাক্তার এসে বলল, আপনাকে এবার কেবল শুয়ে থাকতে হবে। বিছানা থেকে একদম উঠবেন না। নড়াচড়া একেবারে বারণ।

মজুমদার সাব বুঝতে পারলেন হার্টটা তাঁর একেবারে গেছে। তাঁর হার্টের যখন অসুখ, এবার সংসারে এত যেসব করছেন, কেন যে করছেন, বরং এখন টুকুনকে ডেকে বললে হয়, মা তুই পারবি না, তোর সেই ফুলের উপত্যকাতে নিয়ে যেতে। যেখানে মানুষেরা নিজের জন্য ভারী সুন্দর একটা ফুলের উপত্যকা তৈরি

করছে। আমারও ইচ্ছা ছিল এমন। কিন্তু কীভাবে যে আমি একটা কাচের বোয়েমের ভেতরে বাস—করা মানুষ হয়ে গেলাম।

মজুমদার সাব বুঝতে পারছিলেন, ওপরে আবার কেউ নানারকম ঝংকার তুলে নানাভাবে আশ্চর্য সব সিমফনি গড়ে তুলছে। তাঁর ভীষণ ভালো লাগছিল শুনতে। মানুষেরা সব সময় সুন্দর সব সিমফনি গড়তে চায়। গড়ায় স্বপ্ন থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পারে না। কেন যে সে একটা অসুখে পড়ে যায়!

একুশ

সকালবেলা যখন এমন অবস্থা, যখন টুকুন বাবার পাশে বসে আছে এবং টুকুনের মা ভীষণ বিশ্বস্ত মুখে কাজকর্ম করে যাচ্ছে, তখন মনেই হল না, সংসারে স্বামী স্ত্রীতে এতটুকু অবিশ্বাস আছে। বরং অসুখটা যেন দুজনকে সহসা বারমুখী থেকে ঘরমুখী করে দিল। এবং এমন একটা অসুখ নিয়ে মজুমদার সাবকে চিরদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, টুকুনের মা চিরদিন এবার নীরবে মানুষটাকে সেবাশুশ্রূষার সুযোগ পাবে। এত বছর গেছে, এমন একটা সুযোগ যেন তার এই প্রথম। ফলে সে খুব যত্ন নিয়ে দেখাশোনা করে যাচ্ছে। যদিও ইতিমধ্যে দুজন নার্সের কথা উঠেছে, এবং ওদের নিয়োগের ব্যাপারে বাইরের ঘরে কথাবার্তা চলছে তখন টুকুনের মা ভাবছে—এসব নার্স—টার্স কী দরকার, সে নিজেই যখন আছে তখন অনর্থক, নিজের মানুষটাকে পরের হাতে ছেড়ে দেওয়া কেন! তারপরই মনে হল হাতের কাছে কাজের লোক থাকলে মন্দ হয় না। সুতরাং সকালবেলাতে যে একটা জরুরি কথা ছিল টুকুনকে বলার, সেটা বুঝি আর বলা হল না। ইন্দ্রের বাবাকেও যে বলার ছিল কিছু, এখন এই অসময়ে আর কী হবে বলে, বরং তিনি ভালো হয়ে উঠুন, তারপর সব করা যাবে।

কিন্তু মজুমদার সাব কথাটা ভোলেননি। তিনি দেখলেন খুব বিষণ্ণ মুখে বসে আছে টুকুন। সকালবেলাতে এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে। নাকে মুখে এসে চুল উড়ে পড়ছে। এবং রাতে একেবারে মেয়েটার ঘুম হয়নি বোঝা যাচ্ছে। চোখ ভীষণ ভিতরে ঢুকে গেছে। হয়তো টুকুন ওর মার চেঁচামেচি থেকে টের পেয়েছে, এবাড়ি থেকে তাকে আর একা বের হতে দেওয়া হবে না। এমনকি, গাড়িতে ড্রাইভার থাকবে। সে আর একা ইচ্ছামতো ঘুরতে পারবে না। মেয়েটার জন্য ভীষণ কষ্ট হয় মজুমদার সাবের। অথচ কেন যে মেয়েটা এভাবে একটা ফুলের উপত্যকায় হেঁটে যাবার আকর্ষণে পড়ে গেল। চারপাশে টুকুনের কত সুন্দর সুন্দর ছেলেরা আছে, কত বড় বড় পার্টিতে তিনি মেয়েকে নিয়ে গেছেন অথচ, একেবারে উদাসীন টুকুন। কিছুতেই টুকুন তার বন্য স্বভাব ছাড়তে পারছে না।

মজুমদার সাব বললেন, তুমি এত চুপচাপ কেন টুকুন?

টুকুন বোকার মতো একগাল হেসে দিল। অর্থাৎ বাবাকে সে অভয় দিতে চাইল যেন, কোথায়? আমি তো বেশ হইচই করে আছি বাবা।

মজুমদার সাব এবার হেসে বললেন, আমি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠব টুকুন।

—তোমার কিছু হয়নি বাবা। ডাক্তারবাবু অনর্থক তোমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

ওমা, একি কথা! এ যে দেখছি টুকুন একেবারে সুবলের মতো কথা বলছে।

টুকুন ফের বলল, তুমি বাজে দুশ্চিন্তা ছেড়ে দাও, দেখবে ভালো হয়ে যাবে!

এখানে যেন টুকুন কোথায় প্রায় ডাক্তারসুলভ কথা বলে ফেলল। সেতো এ—বাড়ির মেয়ে। সে টের পায় সংসারের জন্য বাবাকে অনেক পাপ কাজ করতে হয়। এমন একটি স্ট্যাটাসের ভিতর বাবা উঠে এসেছেন যে তার জন্য তিনি সারাটা দিন কী না করছেন। বাবা কোথায় কীভাবে কী করছেন সে জানে না, কিন্তু বাবার মুখ দেখে সে টের পায়, উদ্বিগ্ন চোখেমুখে বাবার এক অতীব ভয়। সব সময় যেন তিনি জীবনে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। সবকিছু ঠিকঠাক রেখে যাবার জন্য বাবার এই সব পাপ কাজ, বাবাকে খুব সহসা প্রাণহীন করে দিল।

টুকুন বলল, বাবা তুমি একটু ভালো হয়ে ওঠো। ভালো হলে তোমাকে রোজ বিকেলে এক জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে গেলে তুমি নিরাময় হয়ে যাবে।

টুকুন 'ভালো হয়ে উঠবে' না বলে 'নিরাময়' কথাটা ব্যবহার করল। নিরাময় কথাটা বলতে তার কেন জানি এ—সময় ভালো লাগল।

অর্থাৎ একদিনেই টুকুনের আশ্চর্য বিশ্বাস জন্মে গেছে, মানুষ নিজেই পারে এই আশ্চর্য সুন্দর জগৎ তৈরি করতে—যেখানে মানুষ এতটুকু নিরাপত্তার অভাব বোধ করবে না। সেখানে সবাই সবার জন্য ভাববে। এবং এমন একটা জগৎ এভাবে তৈরি হয়ে যাবে একদিন। অহেতুক ভয় থাকবে না। ভয় থেকে কোনও অসুখ জন্মাবে না। বাবার অসুখটা সে বুঝতে পেরেছে ভয় থেকে হয়েছে। সব সময় এক ভয়, যা কিছু আছে মানুষেরা লুটেপুটে নিয়ে যাবে।

আবার সে বলল, বাবা ওখানে গেলে সত্যি তুমি ভালো হয়ে যাবে।

টুকুনের মার যেন এতক্ষণে মনে পড়ল কথাটা। সে বলল, টুকুন তুমি বড় হয়েছ। এখন আর একা কোথাও যাবে না! বাড়ি থেকে বের হবে না।

টুকুন বুঝতে পারল মা তাকে সেই ফুলের উপত্যকায় যেতে বারণ করছে। কিন্তু সেই ফুলের উপত্যকার কথা মনে হলেই কেমন তার চোখ বুজে আসে। সে যদি যায়, মা ভীষণ অশান্তি করবে। এবং এই অশান্তি বাবার পক্ষে আরও ক্ষতিকারক। সে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা না বললে আমি আর কোথাও যাব না।

সে বাবার জন্য এই সংসারে কোনও অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় না।

এবার টুকুন উঠে ওপরে চলে গেল। সকালে মুখ ধুয়ে সে এক গেলাস ফলের রস খায়। ঘরে গিয়ে দেখল, গীতামাসি সব ঠিক করে রেখেছে। ফলের রস খেতে তার ভীষণ বিস্বাদ লাগল। সে এখন এ বাড়িতে প্রায় বন্দি জীবনযাপন করবে, কোথাও গেলেই মার ধারণা হবে, সেই ফুলের উপত্যকায় সে চলে গেছে!

এভাবে বাড়িতে সে কিছুদিন আটকা পড়ে গেল। হেমন্তের শেষাশেষি বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। কারখানা ক্লোজারের পর খুব বাড়াবাড়ি গেছিল ক'দিন, এখন বোধ হয় ওটা সামলে উঠেছেন। ইউনিয়নের তরফের লোক এসে দেখা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ডাক্তারের দোহাই পেড়ে ওঁর সেক্রেটারি তা ঠেকিয়ে রেখেছেন।

যেমন টুকুনকে নিয়ে বাবা—মা একদিন সব পাহাড়ি জায়গায় শরীর ভালো করবার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন, তেমন টুকুন তার বাবাকে নিয়ে নানা জায়গায় ক'মাস থেকে এল। যেমন কিছুদিন ওরা ছিল নৈনিতালে। দেরাদুনেও গেছে। অর্থাৎ এভাবে যাবতীয় পাহাড়ি জায়গায় আশ্রয় নিয়েও যখন দেখেছে বাবার শরীরে সম্পূর্ণ নিরাময়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তখন ফের ফিরে আসা।

মাঝে মাঝে টুকুন বাবার পায়ের কাছে বসে থাকত। বাবা বুঝতে পারতেন, টুকুন কেমন বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে ফের। বাবার রুগণ মুখে টুকুন তা ধরতে পারলেই হেসে দিত। বলত, বাবা আমি কত যে চেষ্টা করছি, চুপচাপ আগের মতো শুয়ে থাকলে কেমন হয়, সেই আগের মতো নিঃসাড় পড়ে থাকতে গিয়ে দেখেছি একেবারেই ভালো লাগে না শুয়ে থাকতে। তোমাকে বলিনি বাবা, বললে কষ্ট পাবে, ভেবেছি, কম খেয়ে না খেয়ে শরীর দুর্বল করে ফেললেই আগের অসুখটা ফের আমাকে আশ্রয় করবে। কিন্তু বাবা তোমাকে কী বলব, একবেলা না খেলেই চোখে অন্ধকার দেখছি। তখন গীতামাসিই হেসে বাঁচে না।

একটু হেসে টুকুন আবার বলল, আমার আর অসুখের ভিতর ফিরে যাওয়া হবে না। এভাবে সারা মাস ঘরে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে আমার অসুখের ভিতর ফিরে যাওয়া ভালো ছিল বাবা। তোমরা আমাকে আর সেখানে যেতে দাও না।

মজুমদার সাব বুঝতে পারেন টুকুন মায়ের উপর অভিমান করে এমন একটা অসুখের ভিতর ফের ফিরে যেতে চাইছে। তিনি বললেন, তুমি ভারী বোকা মেয়ে। বিয়ে হলে দেখবি, এসব অভিমান আর থাকবে না।

টুকুন বলল, বাবা আমার বিয়ের জন্য তোমরা এত ভাবছ কেন। যাকে আমার পছন্দ নয়, তার সঙ্গে কেন তোমরা আমাকে জুড়ে দিতে চাইছ?

কেমন মনটা খারাপ হয়ে যায় এমন কথা শুনলে। কিন্তু মেয়ের জেদ। মজুমদার সাব চুপ করে থাকেন।

টুকুন বুঝতে পারে বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। সে বলল, ঠিক আছে তোমাদের যা ইচ্ছা তাই হবে।

মজুমদার সাব সেই বিকেলেই বললেন, তুই যে বলেছিলি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি। সেখানে গেলে আমি ভালো হয়ে যাব।

—তুমি যাবে বাবা?

—যাব। কিন্তু তোর মা যদি জানে!

—তবে তুমি জানো কোথায় নিয়ে যাব তোমাকে?

—জানব না!

—কী করে বুঝলে আমি তোমাকে আমাদের সেই ফুলের উপত্যকায় নিয়ে যাব?

—পৃথিবীতে মা তুই তো একটা জায়গার কথাই ঠিক জানিস। টুকুন কেমন মাথা নীচু করে রাখল।

—একটু যা মিথ্যে কথা বলতে হবে।

—কী মিথ্যে!

—বলবি, আমাকে নিয়ে তুই হাওয়া খেতে যাচ্ছিস মাঠে।

—বলব।

—বলবি আমরা গ্রাম মাঠ দেখে বেড়াচ্ছি।

—বলব।

—বলবি গ্রাম মাঠের ভিতর দিয়ে গেলে নির্মল বাতাস বুক ভরে নেওয়া যায়।

—বলব বাবা।

—আর বলবি ডাক্তারের পরামর্শমতো সব হচ্ছে।

—বলব।

ডাক্তার এলে মজুমদার সাব ফিস ফিস করে বললেন, একভাবে শুয়ে বসে থাকতে ভালো লাগছে না হে ডাক্তার। সকালে বিকেলে গাড়িতে ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়। এই যেমন ধরো, বেহালার ভিতর দিয়ে গিয়ে যদি ডায়মন্ড হারবার রোডে পড়ি। অথবা ফুলবাগান হয়ে কাঁকুড়গাছি পার হয়ে সোজা সলট লেক, লেক টাউন পিছনে ফেলে এরোড্রাম পার হয়ে বারাসাতের রাস্তায় চলে যাই।

—খুব ভালো। ঘুরে বেড়ান না। এতে যদি মন ভালো থাকে ক্ষতির তো কিছু দেখছি না।

—তুমি একবার তোমার বউদিকে বুঝিয়ে বলো। ও তো বিছানা থেকে উঠতেই দিতে চায় না। ডাক্তার হেসে বলল, বলব।

—আমার টুকুন মা আছে, ভারী সুন্দর গাড়ি চালায়। কাজেই বুঝতে পারছ, আজে বাজে ড্রাইভিং হবে না।

ডাক্তার বলল, ঠিক আছে। আপনার এখন খিধে কেমন?

—কিছু না। এখন মনে হয় হাওয়া খেয়ে পেট যে ভরে প্রবাদটা একেবারে মিথ্যা না।

ডাক্তার কিছু ওষুধ পালটে দিল। টুকুনের মা এলে বলল, বউদি, দাদার একটু বেড়ানো দরকার। বাড়িতে বসে থাকলে মন মেজাজ দুই—ই খারাপ হবার কথা। টুকুন ওঁকে নিয়ে সকাল—বিকেল গ্রাম মাঠ দেখে এলে মনটা প্রফুল্ল থাকবে। দেখা গেছে অসুখ অনেক সময় এভাবে সেরে যায়।

টুকুনের মা বলল, আমার সঙ্গে থাকা দরকার। ঝি—চাকর দিয়ে কী সব হয়! টুকুন কী সব বোঝে!

মজুমদার সাব হেসে ফেললেন, তুমি সেই সেকেলে আছো। এখনকার মেয়েরা অনেক কম বয়সেই সব শিখে ফেলে। কী বলো হে ডাক্তার? টুকুন তো আমার লক্ষ্মী মেয়ে। সে না পারলে আর কে পারবে।

এভাবেই ঠিক হয়ে যায় টুকুন যাবে। আর যাবে মজুমদার সাব। সঙ্গে থাকবে পুরানো চাকর রামনাথ। ইন্দ্র ঘ্যান ঘ্যান করছিল—সেও যাবে। কিন্তু মজুমদার সাব সব জানেন বলে বললেন, ইন্দ্র তোমাদের ক্লাব এবার সেমিফাইনালে উঠেছে। সবটা তোমার কৃতিত্ব। ফাইনালে ওঠা চাই। আমাদের সঙ্গে বিকেলে কাটিয়ে দিলে দেখবে—ওই পর্যন্ত। এবার যে শিল্ড ঘরে তোলা চাই।

মজুমদার সাব এভাবে বেশ ম্যানেজ করে এক বিকেলে বের হয়ে পড়লেন।

ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর করে তিনি গাড়ি—বারান্দায় এলেন। টুকুন এবং রামনাথ দুপাশে দাঁড়ালে তিনি ওদের কাঁধে ভর করে সিঁড়ি ভাঙলেন! দুপাশে সব বাড়ির এবং অফিসের কিছু আমলা কর্মচারী, ফরাসের লোক খাস খানসাম রামনাথ সবাই মিলে বড়কর্তা বিকেলে যে বের হচ্ছেন এবং মানুষটি অসুখে ভুগলে কী যেন একটা ভয়—এতবড় বাড়ির বৈভব আর থাকবে না, সামনে কৃত্রিম পাহাড়ের পাশে ছোট্ট হ্রদ, হ্রদে কিছু পাখপাখালি এমন শৌখিন বাড়ি এ—তল্লাটে হয় না অথচ এখন এমন বাড়িটা ধীরে ধীরে শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে। দুবছরের ওপর কারখানা ক্লোজার, দুবছরের ওপর এভাবে সাব বাড়িতে শুয়ে আছেন, দুবছরের ওপর, কারখানার শ্রমিকেরা স্টেশনে স্টেশনে কৌটো ফুটো করে পয়সা মাগছে—এসব দৃশ্য সবার মনে পড়ে গেলে ভারী খারাপ লাগে।

গাড়িতে মজুমদার সাব সামনে বসেছেন। পাশে টুকুন। টুকুনের চুল শ্যাম্পু করা। ঘাড় পর্যন্ত চুল পরিপাটি বিছানো। মনে হয় দেবদেবীর চুলের মতো—কী কোমল আর মিহি, হাত দিলে যেন ছোঁয়া যায় অথবা চুল শ্যাম্পু করা থাকলে আকাশের মতো ভারী দেখায় মুখ। চুলের ভিতর আছে আশ্চর্য এক গন্ধ। টুকুন পরেছে হালকা চাঁপা রঙের শাড়ি। শাড়িতে লতাপাতা আঁকা এবং নানা রকমের বর্ণাঢ্য শোভা—এমন একটা শাড়ির সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। এবং মজুমদার সাব বেশ লক্ষ্য করে বুঝেছেন, মেয়ের খুব পছন্দ আছে—কী রঙ ওকে মানায় সে যেন জানে। আশ্চর্য স্নিগ্ধ স্বভাবের মনে হচ্ছে টুকুনকে। এবং শাড়ির এমন রঙের সঙ্গে ও শরীরের কোমল আভা অথবা বলা যায় লাবণ্য একেবারে মিলেমিশে গেছে। হালকা প্রসাধন পর্যন্ত। ঠোঁটে যে সামান্য রঙ তাও এত স্বাভাবিক যে মানেই হয় না টুকুন ঠোঁটে রঙ লাগিয়েছে। বরং এটুকু না লাগালেই ওকে যেন এই পোশাকের ভিতর সামান্য শ্রীহীন করে রাখত।

আর এভাবে এক মেয়ে—বোধ হয় এটা হেমন্তকাল—বেশ গাড়ি ছুটিয়ে যাচ্ছে। সে দোকান থেকে ফুল আনার সময় সুবলের কিছু খোঁজখবর রেখেছে। কারণ শহরের সব ফুলের দোকানগুলো বলে দিতে পারে সুবলের কথা, সুবলের ফুল একদিন এই শহরে না এলে সব অন্ধকার দ্যাখে, সেই সুবলের খোঁজখবর সব তার কাছে থাকবে সে আর বেশি কী—এবং এভাবে সেও তার খোঁজখবর সুবলকে দিয়ে গেছে। সুবলের ওইটুকুই লাভ। সে টুকুনদিদিমণির চিঠি অতি যত্নে রেখে দিয়েছে। সে তার জন্য তপোবনের মতো আলাদা একটা আশ্রম করে দিয়েছে। বুড়ো মানুষটা মারা গেছে গত শীতে।

কাঞ্চন ফুলের চারপাশে সবুজ ঘাসের কাঠা চারেকের মাঠ। সেখানে ঘাসের ছায়ায় কাঞ্চন সৌরভে বুড়ো মানুষটা আছে। তার কবর শান বাঁধানো। কাঞ্চন ফুল দিন—রাত পাঁপড়ি ফেলছে সেখানে। বিকেলে যখন হাতে কোনও কাজ থাকে না, সুবল সেই ঘাসের ভিতর কাঞ্চন গাছটার নীচে চুপচাপ বসে থাকে। এসব খবর টুকুনদিদিমণিকে সে তার লোক মারফত জানিয়েছে। সে চিঠি লিখতে আজকাল পারে। কিন্তু হাতের লেখা এত খারাপ যে দিদিমণিকে চিঠি লিখতে লজ্জা পায়। টুকুনদিদিমণির সঙ্গে কতদিন দেখা নেই—বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না, সে যেন বুঝতে পারে টুকুনদিদিমণি বারান্দায় অথবা রেলিং—এ কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে পারলেই ওর ভীষণ কষ্ট হয়—সব ফেলে চলে যেতে ইচ্ছা হয়—কী এক আকর্ষণ শরীরে তার—কিন্তু টুকুনদিদিমণির অপমান ওর কাছে আরও কষ্টকর। এখন তো সে আর আগের মতো পাঁচিল টপকে যেতে পারে না। সে কেমন যেন ক্রমে স্বভাবে শহরের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। গাড়িগুলো শহরে ফুল নিয়ে যাচ্ছে—তাদের টংলিং টংলিং শব্দ কানে এলে চোখ বুঝে পৃথিবীর যাবতীয় সুষমা সে শুষে নিতে পারে। এবং টুকুনদিদিমণির আশ্চর্য ভালোবাসা সে তখন ভিতরে ভিতরে বড় বেশি অনুভব করতে পারে।

মজুমদার সাব বললেন, তোর সুবল বাওবাব গাছ দিয়ে কী করবে রে টুকুন?

টুকুন এমন কথায় ভীষণ লজ্জা পেল। বলল, বাওবাব গাছের কথা তুমি কী করে জানলে?

—সে জেনেছি।

—ওটাতো বাবা একটা গল্পের গাছ।

—মানে!

—মানে ছোট্ট রাজপুত্রের একটা দেশ আছে। সেটা একটা ছোটো গ্রহাণু। শিশুদের জন্য লেখা গল্প। সেখানে বাওবাব গাছের কথা আছে।

—তুই জানিস না, বাওবাব বলে সত্যিকারের গাছ আছে। জায়গায় জায়গায় নামটা পালটে যায়।

এখানে রাস্তাটা একটা বড় পুকুরের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে বলে টুকুনকে খুব ধীরে ধীরে টার্ন নিতে হল। এখন হেমন্তকাল বলে বেশ শীত শীত ভাব। চারপাশে ধানের জমি। কাঁচা পাকা ধানের মাঠ। চাষিরা মাঠের আলে আলে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছে। কারণ বোঝাই যায়—ধান তোলার সময় হয়ে আসছে। খুব খুশি ওরা, ফসল ভালো, এবং এভাবে এই মাঠের সব জমি, চাষিদের মুখে আকাশের নীলিমা এবং কিছু পাখির কলরব টুকুনকে ভীষণভাবে আপ্লুত করছে। সে বাবার শেষ কথাটা ঠিক মন দিয়ে শুনতে পায়নি।

মজুমদার সাব ফের বলে যাচ্ছেন—আমি একটা বইয়ে পড়েছি, কেনিয়াতে কাণ্ডুরার জঙ্গলে এই গাছ আছে। ছবিতে যা দেখেছি, তাতে মনে হচ্ছে ঠিক আমাদের দেশে বাবলা গাছের মতো। আমার মনে হয় সুবল সেজন্য বাওবাব খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—আমি ঠিক জানি না বাবা। সুবলকে জিজ্ঞাসা করে দেখব।

—তোর মনে আছে যখন প্রথম সুবল গাড়িতে উঠে এসেছিল?

—মনে আছে বাবা।

—খুব হাসি পেত দেখলে! ওর পাখিটার খবর কীরে?

—সে ওটা ছেড়ে দিয়েছে বাবা।

তারপর ওরা সেই ফুলের উপত্যকাতে ধীরে ধীরে গাড়ি এগিয়ে নিল। বড় রাস্তা। তারপরই উঁচুনীচু মাঠ, চন্দনের গাছ, এবং নানারকম লতাগুল্মের বন। বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা নেমে গেছে, একটু বন থেকে বের হলেই সামনে এক বিস্ময়কর দেশ। নানা জায়গায় নানা ফুল। ওরা দূর থেকেই ফুলের গন্ধ পাচ্ছে। এতসব ফুলের গন্ধ মিলে, যেমন গোলাপ, রজনিগন্ধা, গন্ধরাজ, চামেলি, চাঁপা, বেল ফুল এবং টগর, জুঁই—কত যে সব ফুল এবং ফুলের বাস।

মজুমদার সাব বললেন, টুকুন সুবল এখন একটা দেশের রাজা।

টুকুন বলল, না বাবা, সে রাজা নয়। সে বলে, সে এর কিছু নয়। যারা কাজ করে তারাই সব। এবং সে দেখেশুনে বেড়ায় বলে তার একটু থাকবার জায়গা ওরা দিয়েছে। ওই যে দূরে দেখছ, উঁচু জায়গায় আশ্রমের মতো ঘর, ওখানে সুবল থাকে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না, টংলিং টংলিং শব্দ, দেখতে পাচ্ছ না, তুমি দেখতে পাবে না, ওপাশের রাস্তা দিয়ে একটা ফুলের গাড়ি চলে যাচ্ছে। তোমার কষ্ট হচ্ছে নাতো হাঁটতে? আমি তোমাকে ধরব?

মজুমদার সাবের এই প্রথম মনে হল তাঁর শরীর ভালো নেই। এভাবে হেঁটে যাওয়া ঠিক না, কিন্তু আশ্চর্য তার কষ্ট হচ্ছে না, তিনি বেশ হেঁটে যেতে পারছেন।

মজুমদার সাব বললেন, টুকুন আমি বেশ হেঁটে যেতে পারছি রে।

—আমি তোমাকে ধরব!

—কী বললি!

—তুমি যদি পড়ে টড়ে যাও?

—সুবলটা কোথায়?

—এখন সূর্য অস্ত যাবার সময়। সে হয়তো যারা খাটে তাদের এখন আগামী কাজকর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছে। ওদের টাকাপয়সা, সে এখানে নতুন দেশ গড়েছে বাবা। মানুষের জন্য একটা ভালো আবাস তৈরি করেছে।

মজুমদার সাব হেঁটে যাচ্ছিলেন। যেন ভিতরে থাকে মানুষের এক দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছা, সেই শৈশব থেকে স্বপ্ন, বড় হওয়ার স্বপ্ন। মানুষের মাথা উঁচু করে হেঁটে যাবার স্বপ্ন, সব তাঁর হয়েছে, অথচ কোথায় যেন তিনি মানুষের চিরটা কাল অনিষ্ট করে বেড়িয়েছেন। সুবলের মতো তার জীবনেও ছিল অসীম দুঃখদারিদ্র্য—তিনি তা জয় করতে গিয়ে এটা কী করে ফেলেছেন! বড় হতে যাওয়ার মানে কেমন বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। সুবলকে দেখে, সুবলের উপত্যকা দেখে তাঁর মনে হল, পৃথিবীতে এভাবে বড় হলে অনেক পাপ থেকে মানুষ বেঁচে যায়। তিনি কেমন এবার দ্রুত হাঁটতে থাকলেন। সেই কুটিরে ওঁর যাওয়া চাই। সেখানে গেলেই বুঝি তিনি আশ্চর্যভাবে ঠিক ঠিক নিরাময় হয়ে যাবেন।

বাইশ

এভাবেই এখানে প্রতিদিন সূর্য ডোবে। ও—পাশের বনের ভিতর মনে হয়, সূর্য হারিয়ে যায়। কখনও হলুদ রঙ নিয়ে, কখনও বেগুনি অথবা নীল নীলিমাতে আগুন ছড়িয়ে সূর্য রোজ ও—পাশের জঙ্গলে হারিয়ে যায়। বনের পাখিরা ডাকে। নদীতে বড় বড় গাছের ছায়া ধীরে ধীরে নেমে আসে এবং এভাবে পৃথিবী ক্রমে অন্ধকার হয়ে ওঠে।

সুবল লোকজনের বিদায় করে নিজের আশ্রমের মতো ঘরের বারান্দায় বসে থাকে। সে দেখতে পায় পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। গাছের ছায়া লম্বা হয়ে যাচ্ছে, নদীর জলে অন্ধকার নেমে আসছে। এ সময় মনে হয় কেউ আসবে, ঠিক পালিয়ে চলে আসবে, সে তাকে বেশিদিন না দেখে থাকতে পারে না। এমন একটা আশ্চর্য ফুলের উপত্যকা আর কোথাও নেই সে জানে। আর তখনই মনে হয় দূরে ছায়াছবির মতো ভেসে উঠেছে টুকুনদিদিমণি। এমন ফুলের উপত্যকা পেয়ে টুকুনদিদিমণি প্রায় যেন ভেসে ভেসে চলে আসছে। সে চোখ মুছে ফের উঠে দাঁড়াল। না, সে অলীক কিছু দেখছে না, ওর ভিতরটা কী যে করছে! টুকুন, হালকা বাদামি রঙের প্রায় ফুলের গাছগুলো মাড়িয়ে ছুটে আসছে। সঙ্গে কেউ আছে, বয়সি মানুষ, তিনিও যুবকের মতো হেঁটে আসছেন। সুবল বুঝতে পারছে না, টুকুনের সঙ্গে কে আসছে! তার বারান্দা ফুলের ডালপালায় ঢাকা। ওর ভিতর থেকেই চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, টুকুনদিদিমণি, আমি এখানে।

এখন হেমন্তের সময়। হেমন্তে ফুলের চাষ তেমন জমে না। মানুষজন যারা আছে, খেটে খেটে হয়রান, পাম্পে জল তুলে আনছে, নদী থেকে জল এনে অসময়ে সে যা চাষাবাদ করছে ফুলের, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। দূরে দূরে সব সাদা কোঠাবাড়ি, ছবির মতো উজ্জ্বল এক ছোট্ট ছিমছাম শহর যেন। পাকা রাস্তা চলে গেছে উপত্যকার ভিতর দিয়ে। নানা জায়গায় সব জলের ফোয়ারা এবং অসময়ে সব ফুলেরা ফুটে আছে। শীতে সে মাইলের পর মাইল গোলাপের চাষ করে থাকে, কে কত বড় গোলাপ ফোটাতে পারে—সুবলের কাছে কে কত বড় মানুষ তার দ্বারা প্রমাণ হবে। আমি এক মানুষ, আমার আছে এক বড় অহঙ্কার, ফুলের মতো ফুল দ্যাখো কী করে চাষাবাদ করে গড়ে তুলেছি। সুবলের মনে হল তখন, টুকুনের কেউ এসেছে সঙ্গে। ওরা, চাঁপা ফুলের যেসব সারি সারি গাছ আছে তার নীচে দিয়ে হাঁটছে। মেহেদি পাতার গাছ চারপাশে সবুজ হয়ে থাকে বলে কীযে সুন্দর লাগে সুবল যখন হেঁটে যায়। লম্বা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, ঢোলা সাদা রঙের পাজামা আর ঘাসের চটি, সুবলকে তখন কেমন বনের দেবতা টেবতা মনে হয়!

সুবল কাঞ্চন গাছের নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। দুটো একটা কাঞ্চন ফুল এখনও ফুটছে। সাদা পাঁপড়ি বুড়োমানুষটার সমাধিতে পড়ছে। আর চারপাশে কী সবুজ ঘাস, ঘাসে এখন সব সাদা ফুল, সব ফুলগুলোই যেন বলছে, আমরা বুড়োমানুষটার হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব। ফুলগুলো দেখলে সুবলের এমনই মনে হয়। সে আর সেখান থেকে বেরতে পারে না।

সুবল কাঞ্চনের ডাল মুখের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলতেই দেখল, ও আর কেউ নয়, টুকুনের বাবা। সে প্রথমেই অবাক, তারপর কেমন অস্বস্তি, তারপর মনে হল বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়ার শামিল, বোধ হয়

এক্ষুনি তিনি তাকে তাড়া করবেন, অথবা যেমন তিনি মানুষের সূর্য বগলদাবা করে পালাচ্ছিলেন, এখানে তিনি তেমন কিছু করে ফেলবেন। দূরে নদীর পাড়ে তার দামি গাড়িটা। ডিমের মতো ঘাসের ওপর ভেসে আছে গাড়িটা। সূর্যাস্ত, বনের ছায়া, নদীর জল, সব মিলে সাদা রঙের গাড়িটাকে অতিকায় রাজহাঁসের ডিম ছাড়া ভাবতে পারছে না সুবল। টুকুনের বাবাকে দেখে সে সত্যি ঘাবড়ে গেছে। সে আর পালাতে পর্যন্ত পারল না। ফুলের উপত্যকায় সে একজন বনবাসী মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

অথচ তিনি কাছে এসে বললেন, বাওবাব গাছ এনেছি হে।

সুবল ভেবে পেল না এমন কথা কেন! বলল, বাওবাব গাছ!

—কেন টুকুন যে বলল, তোমার এমন সুন্দর ফুলের উপত্যকাতে একটা বাওবাব গাছ না থাকলে মানাচ্ছে না।

সুবল কেমন সহজ হয়ে গেল। ওর আর টুকুনের বাবাকে ভয় থাকল না। সে ভেবেছিল, আবার কী ঘটেছে, টুকুনকে নিয়ে কী অশান্তি দেখা দিয়েছে সংসারে যে, টুকুনের বাবা এখানে পর্যন্ত ছুটে এসেছেন! সে তো আর যায় না। টুকুনের মা ওর যাওয়া পছন্দ করেন না, এ—নিয়ে বড় অশান্তি গেছে, সে টুকুনকে যেহেতু টুকুনদিদিমণি ডাকে, সেজন্য তার কোনও অশান্তি ভালো লাগে না। সে দেখল তখন টুকুনও কেমন সহজ হয়ে গেছে। পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে বলছে, তুমি আমাকে বলতে না, একটা বাওবাব গাছ পেলে এই উপত্যকাতে লাগিয়ে দিতে।

—কিন্তু সে তো রূপকথার গাছ। ছোট্ট রাজপুত্রের দেশে পাওয়া যায়।

টুকুনের বাবা বললেন, ছোট্ট রাজপুত্রের দেশে যা পাওয়া যায়, এখানে তা থাকবে না সে কী করে হয়?

সুবল বলল, আজ্ঞে তা ঠিক। আমার খুব ইচ্ছা—পেলে লাগাই। তবে রূপকথার গাছ তো, পাওয়া যায় না। যা কিছু ভালো, এই ফুলগাছ, লতাপাতা সব এনে লাগাতে ইচ্ছা হয়। তবে গল্পের গাছ তো পাওয়া যায় না। টুকুনদিদিমণি জানে সব। ওটা একটা অন্য গ্রহের গল্প।

—এসো। বলে তিনি সুবলের আশ্রমের মতো ঘরটার দিকে হাঁটতে থাকলেন। হাঁটতে হাঁটতেই বললেন, সব গ্রহের গল্পই আমরা বানিয়েছি। ছোট্ট রাজপুত্রের গ্রহটাতে একজনের মতো থাকার জায়গা আছে।

—তা আছে।

—ওর একটা ভেড়ার বাচ্চা আছে।

—তাও আছে।

—ওর গ্রহের সমুদ্র শুকিয়ে যাবে ভয়ে পাতায় ঢেকে রাখে।

—তা রাখে। আসলে আমরা চাই যে গ্রহেই মানুষ থাকুক, ঈশ্বর তার থাকা খাওয়ার নিরাপত্তা রাখবেন। রাজপুত্রেরও তা ছিল।

সুবল ভেবে পাচ্ছে না এমন সুন্দর সুন্দর কথা টুকুনের বাবা কী করে বলছেন! সে তো জানে টুকুনের বাবার খুব অসুখ। স্ট্রাইক, লক—আউট, ক্লোজার নানারকমের হাঙ্গামায় মানুষটা হৃদরোগে ভুগছেন। অথচ এখানে একেবারে অন্য মানুষ। যদিও এই মানুষটা তার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেননি। টুকুনের জন্য ভীষণ মমতা তাঁর। টুকুন যা ভালোবাসে, তিনিও তা ভালোবাসেন। টুকুনের জন্য সুবল যখন ফুল নিয়ে যেত, দেয়াল টপকে, টুকুনের ঘরে পালিয়ে ফুল দিয়ে আসত, তখন সে জানত না ধরা পড়লে খুব সহজভাবে তিনি বলবেন, বড় বাড়িতে এভাবে আসতে নেই। সদর দিয়ে আসবে। টুকুনের তো সময় থাকে না। রোববারে আসবে। বিকেলে সে তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারবে। রোববারের বিকেলে টুকুনের কোনও কাজ থাকে না।

টুকুনের বাবা বললেন, এসে খুব ভালো লাগছে। এমন একটা ফুলের উপত্যকা কোথাও থাকতে পারে জানা ছিল না। আমি তো বেশ হেঁটে যাচ্ছি, হাত তুলে তিনি বললেন, ডাক্তারদের কথা আর শুনছি না। বেশ আছি হে। তা তুমি কেমন লাভ টাব কর!

—লাভ!

—এই ফুল বেচে। টুকুন বলল, তোমার নাকি লাখ টাকার ফুল বিক্রি হয় মাসে! তারও বেশি। এত টাকার ফুল বিক্রি করে খুব লাভ হওয়ার কথা।

—লাভ টাব বলে তো কিছু নেই।

—তবে কী আছে?

—যা আছে তাকে আরও বাড়ানো।

—সেটা কার জন্য?

—যারা কাজ করে, যারা এখানে থাকে খায়.....

—তবে তুমি কে?

—আমিও কাজ করি।

—কিন্তু বুড়ো মানুষটা তোমাকে দানপত্র করেছে না?

—তা করেছে।

—তবে তুমি মালিক। তোমার এখানে লেবার আনরেস্ট নেই শুনেছি!

সুবল বুঝতে পারল বিষয়ী মানুষ, তিনি বিষয়—আশয় ছাড়া বোঝেন না। সে তাঁকে বলল, বসুন।

তিনি এমন বড় উপত্যকার বিচিত্র বর্ণের সব ফুল এবং মানুষেরা এখনও কেউ কেউ কাজ করছে দেখে কেমন অবাক। —এরা বুঝি ওভার—টাইম খাটছে।

সুবল বলল, না। কাজ বোধ হয় শেষ করে উঠতে পারেনি।

—তোমার ফুলের গাড়ি কখন যায়?

—ভোর রাতে।

—কতজন লোক এখানে কাজ করে?

—তা অনেক হবে। তার হিসাবটা......

—তুমি কী হে। কোনো হিসেবপত্র রাখো না।

—না, মানে কী জানেন সবাই কাজ করে না তো। সবাই....।

—ওরা কোথায় থাকে?

তিনি আবার বললেন, এ—পাশের ছোট্ট একটা ছিমছাম শহরের মতো চোখে পড়ল। ওখানে কারা থাকে?

—এরা থাকে।

—এসব তুমি ওদের করে দিয়েছে।

—আমি করিনি। ওরা নিজেরাই করে নিয়েছে।

—তা হলে তোমার এখানে সত্যি গোলমাল হয় না।

সুবল হেসে বলল, কীসের গোলমাল?

—এই বোনাস নিয়ে, ইনক্রিমেন্ট নিয়ে।

সুবল ভেবে অবাক হয়ে যায়, এসব কথা সে শোনেনি। যখন সবই ওদের, ওরা যৌথভাবে খেটে এমন একটা উপত্যকা বানিয়ে ফেলেছে, কেন যে ওরা গোলমাল করবে, বুঝতে পারে না।

টুকুনের বাবা বললেন, সুবল তোমাকে আর চেনা যায় না। টুকুন তোর মনে আছে আমরা ট্রেনে আসছিলাম, তখন বিহার পূর্ণিয়া অঞ্চলে কী খরা। নীল রঙের বেতের চেয়ারে বসে তিনি কথা বলছিলেন। একটা নীল রঙের লণ্ঠন কেউ জ্বেলে দিয়ে গেছে। তিনি ফের বললেন তোমার পাখিটার কথা খুব মনে হয়।

সে অনেকদিন আগের কথা। ওরা তিনজনই মনে করতে পারে—কোথায় কবে এক প্রচণ্ড খরায় সব জ্বলে যাচ্ছিল, একদল তৃষ্ণার্ত লোক ট্রেন আটকে জল লুট করেছিল, এবং সুবল সেও এসেছিল জল খেতে।

জল খেতে এসে অবাক, এক মেয়ে কী সুন্দর, মোমের পুতুলের মতো বাংকে শুয়ে আছে, উঠতে পারে না, কথা বলতে পারে না, কেবল চেয়ে থাকে, আর কী সুন্দর মুখ তার, দেখতে দেখতে সুবল অবাক হয়ে যায়। জল পান করতে হবে, অথবা সে তার তেষ্টার কথা ভুলে, কেমন ভেবে পায় না, কোথাও এমন সুন্দর মোমের মতো নরম চোখ অথবা কুঁচফলের মতো নাক থাকতে পারে। সে মেয়েটিকে তার জেবের পাখির খেলা দেখিয়েছিল। সুবল, এক আশ্চর্য বালক, জাদুকরের শামিল তখন। টুকুনের বাবা দেখেছিলেন, টুকুন সুবলকে বাংকের নীচে লুকিয়ে রেখেছে, পুলিশ এলে বলছে না নেই, এ—কামরায় কেউ আসেননি। যে মেয়ের মরে যাবার কথা যার কঠিন অসুখ যে ক্রমে স্থবির হয়ে যাচ্ছে তার এমন স্বাভাবিক কথাবার্তা শুনে তিনি চোখ বড় করে ফেলেছিলেন। অথচ টুকুনের মা—র কী যে স্বভাব, কোথাকার এক নচ্ছার ছেলে উঠে এসেছে, তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি, চাল নেই, চুলো নেই, হয়তো মন্ত্র—তন্ত্রও জানে, মেয়েটাকে বশ করার তালে আছে, প্রায় জোরজার করে ব্যান্ডেলে গাড়ি এলে তিনি সুবলকে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

অথচ সুবল মনে করতে পারে, এক হাসপাতালে আবার দেখা টুকুনের সঙ্গে। সে তার পাখিটাকে নিয়ে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে ডাব কেটে বিক্রি করত। সে ভেবেছিল, তখন শহরে এটাই সবচেয়ে ভালো কাজ। সে প্রায় নিজের মতো করে একটা জলছত্রও দিয়েছিল। আরও অনেক কাজ, এবং কাজের ভিতরই সে ফের হাসপাতালের জানালায় আবিষ্কার করেছিল টুকুনদিদিমণিকে। সে তখন প্রাণপণ, সেই জানালায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর নানারকম আশ্চর্য গল্প, রূপকথার গল্প, জাদুকরের দেশে মুণ্ডমালার গল্প বলে টুকুনদিদিমণিকে সাহস দিত। বেঁচে থাকতে বলত। কারণ সে বিশ্বাস করতে পারত না, পৃথিবীতে সুন্দর মেয়েরা কখনও মরে যায়।

সুবলের এমন প্রাণপণ খেলা দেখে টুকুনেরও ভারী ছুটতে ইচ্ছা হত। টুকুন এই যে এখন বসে আছে, সুবল বসে রয়েছে সামনে, বাবা পাশে, বাবা সন্দেশ দুধ খাচ্ছেন, সুবল চা খাচ্ছে, সে চা ডিম ভাজা খাচ্ছে, এরই ভিতর যেন এক আশ্চর্য সৌরভ সে পায় সুবলের শরীরে, সুবলের কথা মনে হলেই সেই সব পুরনো দিনের কথা মনে হয়—এবং সুবলই পৃথিবীতে একমাত্র বাওবাব গাছ খুঁজে আনতে পারে—তার বিশ্বাস হয়। সে ভাবতে থাকে, সুবল না থাকলে, সে বুঝতে পারত না, ছোট্ট রাজপুত্রের কোনও গ্রহাণু থাকতে পারে, আর সেখানে আগ্নেয়গিরির মুখ ঢেকে রাখার জন্য বাওবাব গাছের পাতা লাগে।

তারপর আরও কীসব দিন গেছে টুকুনের। সুবল একবার এল ফুল নিয়ে। সব দামি গোলাপ, তখন সুবলকে চেনা যেত না। সে পালিয়ে আসত, আর কী রোমাঞ্চ, সে এলেই মনে হত শরীরের যাবতীয় অসুখ কেমন সেরে গেছে! টুকুন তখন নাচতে পারত, সে জোরে পিয়ানোতে নানা বর্ণের স্বর তুলতে পারত। যেন কবিতার মতো এক ঘ্রাণ আছে সুবলের চোখে মুখে, সুবল এলেই শরীরের সব কষ্ট এক মায়াবী সৌরভে মুছে যেত। ঘরের সাদা অথবা হলুদ রঙের দেয়ালে টুকুন মাঝে মাঝে তখন বনের দেবী হয়ে যেত।

এবং এভাবে এক শাহেন—সাহ মানুষ, সব অহঙ্কার মুছে আজ এখানে চলে এসেছেন। সুবলের ভারী ভালো লাগছে। তিনি বললেন, তোমার বুড়ো মানুষটা কোথায় থাকত?

—এ ঘরেই।

—তোমাকে খুব ভালোবাসতেন তিনি?

টুকুন বলল, বাবাকে দেখাবে না! অর্থাৎ টুকুন বাবাকে সেই বুড়ো মানুষটার সমাধি দেখাতে চায়। কতদিন টুকুন পালিয়ে এসে সবুজ ঘাসে কাঞ্চনের ছায়ায় চুপচাপ বসে রয়েছে। কতদিন পালিয়ে এসে বেশ রাত করে ফিরেছে। টুকুনের মা শেষ দিকে নানাদিক ভেবে ওর বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরিবারের মান—সম্মানের কথা ভেবে, তা ছাড়া টুকুনের এটা পাগলামি ছাড়া কী, কোথাকার এক ফুলয়ালা, যার চাল নেই, চুলো নেই, শহরে এখন ফুল বিক্রি করে খায়, তেমন এক মানুষের সঙ্গে টুকুনের এসব ঘটনা বড় পীড়াদায়ক। তিনি টুকুনকে আর বের হতে দিতেন না।

আর বিকেলে কী মনে হয়েছিল টুকুনের বাবার, হঠাৎ এসব হতেই বুঝি ভিতরে একটা গোলমাল দেখা দেয়। যা এতদিন সত্য জেনেছেন, সব মনে হয় অহমিকার কথা। সেই ফুলওয়ালার কাছে যেতে মনে হয়, টুকুন নিশিদিন যায়, গল্প করতে ভালোবাসে। —বাবা, সুবল তো তোমার মতো ভাবে না, সে তো তোমার যম দুঃখ পায় না। এখানে তো মানুষেরা মানুষের মতো কাজ করছে। নদী থেকে জল আনছে। লতাপাতা থেকে সার বানাচ্ছে। চারপাশে নানারকম পাম্প সেট, যখন যেখানে জল দরকার চলে যাচ্ছে। কারও নালিশ নেই, কারও তেমন ব্যক্তিগত উচ্চাশা নেই, বেশ তো ওরা। সারা উপত্যকাময় কীসব সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে আছে।

এবং এভাবেই তিনি মেয়েকে নিয়ে এসেছেন এখানে। স্ত্রী জানেন না। মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। যেন দেখতে চান, যথার্থই পৃথিবীতে কোনও ফুলের উপত্যকা গড়ে উঠতে পারে কী না। তিনি বললেন, চলো, কাঞ্চন গাছগুলোর নীচে গিয়ে বসি।

সুবল বুঝতে পারল, তিনি সেই বুড়ো মানুষটার সমাধির পাশে বসে থাকতে চান। সুবল যেতে যেতে বলল, বুড়ো মানুষটার একমাত্র অহঙ্কার ছিল, কেউ ওর মতো ফুলের চাষ জানে না। ফুলের দালাল ঠকিয়ে ফুল নিয়ে যেত, কিছু মনে করতেন না। কেবল বললেই হত, মিঞাসাব আপনার ফুলের মতো ফুল আর কার আছে। তিনি তার পরিশ্রমের পয়সা পেতেন না। একটু থেমে বলল, ফুলের দালালি করতে এসে এখানে থেকে গেলাম। কেমন বুড়োমানুষটার জন্য মায়া হল। এর কাজ করতে কষ্ট হলে কাজ করে দিতাম। বন থেকে পাতা এনে দিতাম। পাতা পুড়িয়ে তিনি জমির সার বানাতেন! তাঁর কাছে আশ্চর্য সব খবর জেনে নিলাম। তার ফুলের চাষ এত কেন ভালো, বনের কোন গাছ, কী পাতা কোন সময়ে পোড়ালে কোন ফুলের উপকারে আসে, পৃথিবীতে কেউ বোধ হয় ওঁর চেয়ে তা ভালো জানতেন না। তখন বুড়ো মানুষটার আমি বাদে আর কেউ ছিল না।

বাবা বললেন, সুবল তোমার অহঙ্কার হয় না? শহর থেকে কত মানুষজন এই ফুলের উপত্যকা দেখতে আসছে—এতবড় এক ফুলের উপত্যকা তুমি গড়ে তুলেছ এখানে। সব মানুষের জন্য রেখেছ সমান দায়িত্ব, বড় শহরে সকালে যায় সারি সারি ফুলের গাড়ি, তোমার মনে হয় না রাজার মতো বেঁচে আছ?

সে বলল, আজ্ঞে না। আমার তখন বুড়ো মানুষটার কথা মনে হয়।

—কী বলেন তিনি?

ওরা সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে বসে রয়েছে। টুকুন এখন নানা বর্ণের ফুলের ভিতর ঘুরে ফিরে কেমন মজা পেয়ে গেছে, সামান্য জ্যোৎস্নায় ছুটতে পর্যন্ত ইচ্ছা করছে। তখন সুবল বলছে বুড়োমানুষটার কথা। সে বলল, তিনি বলতেন, আল্লা খুব সরল। তিনি চান পৃথিবীতে সরল এবং ভালোমানুষরা সুখে থাকুক। তারপরই সুবল কেমন চুপ হয়ে যায়। একটু পরে থেমে থেমে সুবল বলল, তিনি বলতেন, সব লতাপাতার ভিতর, ফুলফলের ভিতর এবং সব গ্রহ—নক্ষত্র, অথবা এই যে সৌরলোক, যা কিছু আছে চারপাশে, সবার ভিতর তিনি আছেন। কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন। তিনি রাজার রাজা। তিনি সবচেয়ে প্রাজ্ঞ। যা কিছু আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে—সব তাঁর। তিনি জানেন সবকিছু। সৃষ্টি—স্থিতি—প্রলয় তাঁর অন্তর্লোকের রহস্য। তিনি জানেন একমাত্র কী আছে সামনে আর কী আছে পেছনে। তাঁর আসন আকাশ আর পৃথিবীর ওপরে বিস্তৃত। আর এ—দুয়ের তিনি নিশিদিন রক্ষাকারী। তার জন্য তিনি ক্লান্ত বোধ করেন না।

সুবল কী দেখল এবার। সে দেখল টুকুন ঘাসের ভিতর কাঞ্চন ফুলের পাঁপড়ি সংগ্রহ করছে। কী সুন্দরভাবে উবু হয়ে বসেছে। কী মায়ায় ভরা মুখ! সে কিছুতেই বেশি আশা করতে পারে না। সে বলল বুড়োমানুষটার কথা মনে হলে নিজেকে কিছুই ভাবতে ভালো লাগে না। এমন কথা শুনলে আপনার বিশ্বাস হবে কিনা জানি না।

টুকুনের ভারী আশ্চর্য লাগে সেই সুবল, ফুটপাতে সে ঘুরে বেড়াত, যার কোনও ঠিকানা ছিল না, নিজের বলতে কিছু ছিল না, কী করে সেই মানুষ এমন সুন্দর একটা ফুলের উপত্যকা যা মাইলব্যাপী কী তারও বেশি হবে কতদূর গেছে সে ঠিক জানে না, কীভাবে গড়ে তুলেছে!

সুবল ফের বলল, তিনি প্রায়ই মুসার কথা বলতেন। বলতেন বারোটি প্রস্রবণের কথা। লোকদের জন্য তিনি জল চাইলেন। মরুভূমিতে কোথায় জল! অথচ দৈববাণী, মুসা তার লাঠি দিয়ে বারোটা পাথরে বাড়ি মারলেন। জল উপছে ঠান্ডা জলের প্রস্রবণ। মুসা বললেন, জল পান করো মনুষ্যগণ। আল্লাহ যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও আর পান করো। অন্যায়কারী হয়ে দেশে অপবিত্র আচরণ কোরো না।

সামান্য জ্যোৎস্নায় টুকুন বুঝতে পারল, বাবার মুখ কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। আসলে কী সুবল বাবাকে অন্যায়কারী ভাবছে। অন্যায়কারী ভেবে গল্পটা বলছে! বাবাও কী ভেবে ফেলেছেন তিনি অন্যায়কারী। সংসারের জন্য তিনি অনেক অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন। রাতে এজন্য তিনি ঘুমোতে পারেন না। মনে হয় কেউ তাঁকে গলা টিপে মারতে আসছে।

তারপরই বাবার মুখ ফের কেমন সরল সহজ হয়ে যায়। তিনি বলতে থাকেন, তোমার এখন শুধু দেখছি একটি বাওবাব গাছ হলেই হয়ে যায়।

সুবল কেমন বোকার মতো বলে ফেলল, হয়ে যায়।

টুকুন হাসবে কী কাঁদবে বুঝতে পারছে না। কারণ সুবল বাবার কথা ঠিক ধরতে পারছে না।

আর এভাবেই জীবনের কোনও সুসময়ে কিছু ভালো কাজ করে ফেলতে ইচ্ছা হয়। টুকুন সুবলকে ভীষণ ভালোবাসে। টুকুনের জন্য পৃথিবীর সব দামি অথবা মহার্ঘ যুবকেরা অপেক্ষা করছে। অথচ টুকুন সেই শৈশব থেকে এই পাখিয়ালার প্রেমে পাগল। মানুষের স্বভাবে কীযে থাকে! বাড়ির সবাই যখন ভেবেছে সাময়িক খেয়াল, তখন বাবা বুঝতে পারেন, টুকুন এমন একজন সৎমানুষকেই সারাজীবন ধরে চেয়েছে। সে এর চেয়ে বেশি কিছু চাইতে পারে না। তিনি তো দেখছেন যেসব যুবকেরা টুকুনের পাশে ঘোরাফেরা করে, এই যেমন ইন্দ্র, সে টুকুনকে না পেলে রুমপাকে বিয়ে করবে। ওতে ওর আসে যায় না। কিন্তু এই ফুলের উপত্যকাতে এসে বুঝতে পেরেছেন, সুবল পৃথিবীর চারপাশে নিরন্তর খুঁজে যাবে একটি বাওবাব গাছ, না পেলে সে একা হেঁটে যাবে। কারণ ওর চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায়, গল্পের গাছটা ওর খুব দরকার। গল্পের গাছটা এই উপত্যকাতে না লাগাতে পারলে ওর ভারী দুঃখ থেকে যাবে। সারাদিন পরিশ্রমের পর মানুষের এমন একটি গাছের ছায়ার দরকার। আজীবন তিনিও তা চেয়েছেন। সঠিক গাছের ছায়া পেলে হয়তো তিনি এমন অন্যায়কারী হয়ে যেতেন না।

এবং এভাবেই টুকুন এখন প্রায় সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, সুবলের পাশে হাঁটতে পারলে পৃথিবীতে সে আর কিছু চায় না এবং ভেবে ফেলেছে, সেই ছোট্ট রাজপুত্রের গ্রহাণুর মতো এটা সুবলের গ্রহাণু। এখানে মানুষের কোনও কষ্ট নেই, এখানে মানুষেরা খেটে খায়, পরিশ্রমের বিনিময়ে বাঁচে। সুবলকে খুব বড় মনে হয় তখন। আর রাগ হলে ভাবে ভীষণ অহঙ্কারী।

বাবা বললেন, বুঝলে হে সুবল, দেখেশুনে মনে হল, খুবই দরকার বাওবাব গাছের।

সুবল বোকার মতো যেই বললে, খুবই দরকার, তখন টুকুন ফিস ফিস করে বলল, এই কী যা—তা বলছ।

তিনি গাড়ির কাছে গিয়ে বললেন, বাড়িতে আছে। বড় হচ্ছে। যখন সময় হবে নিয়ে আসবে। বুঝতে পারছি, গাছটা না হলে তোমার এমন সুন্দর ফুলের উপত্যকা সত্যি শ্রী—হীন হয়ে থাকবে। মনে হয় তোমার এই উপত্যকাতে বাওবাব গাছ লাগিয়ে দিতে পারলেই আমার ঘুম আসবে। আমি ভালো হয়ে যাব।

মানুষের হাহাকার

এক

রোজকার মতো আজও সে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেল। প্রথমে আস্তে, পরে বেশ জোরে। কেউ ডাকছে, কীরে ঘুম ভাঙল না। কত ঘুমোবি। কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ না পেলে কেমন ভীতু গলা হয়ে যায় দাদুর। তখন আরও জোরে—নানু ও নানু, ঘুমোচ্ছিস না জেগে আছিস? এত বেলায় কেউ ঘুমোয়! ওঠ, আর কত ঘুমোবি? কথা বলছিস না কেন?

সে সকালে ঘুম থেকে উঠে একদিন চুপচাপ বসেছিল, ইচ্ছে করেই সাড়া দেয়নি। ইচ্ছে করেই ঘুম থেকে উঠে দরজা খোলেনি, জানালা খোলেনি—কেমন আর্ত গলা তখন দাদুর, 'নানু দরজা খোল ওঠ ভাই।' নিচ থেকে ছোট মাসি, দিদিমা পর্যন্ত ছুটে এসে দরজায় হামলে পড়েছিল। 'নানু নানু!' সারা বাড়িটা তটস্থ হয়ে উঠেছিল। ভারি মজা। এরা সবাই ভেবেছে, সেও একটা কিছু তার বাবার মতো করে বসবে।

নানু বিছানায় পাশ ফিরে অত্যন্ত সহিষ্ণু গলায় সাড়া দিল—'কী হচ্ছে!' এই একটা কথাই যথেষ্ট। সে ঘরেই আছে, সে জেগে আছে, কিছু একটা করে বসেনি, তার সাড়া পেলেই দাদু এটা বেশ বোঝে। তারপর বীণাদি আসবে—'তোমার চা দাদাবাবু'। চা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ওই একটি কথাই বলবে, আর কিছু বলবে না। ওরা কি জানে, চা—এর কথা শুনলে নানু আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারবে না। দরজা খুলে দেবে।

নানু উঠে পাজামা পরল। একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে দরজা খুলে দিল। বীণাদির যা স্বভাব, 'খুউব! চা রাখার সময় ওই আর একটি কথা। তারপর টেবিলে চা রেখে আর কথা না বলে দরজাটা ভেজিয়ে চলে যায়। এটাও নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। আগে নানুকে বলতে হত, দরজাটা যাবার সময় ভেজিয়ে দিয়ে যেয়ো। কখনও কখনও ভুলে যেত বাণীদি। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। এই সংসারে সব কিছুই অভ্যাস—এবং মনে হয় নানুর বেঁচে থাকাটাও একটা অভ্যাসের ব্যাপার। এবং দাদুর বিশ্বাস এই অভ্যাসটা নানুর ঠিক গড়ে ওঠেনি। অথবা বাবার মতো সে অভ্যাসটার প্রতি বিরক্ত হয়ে যদি কিছু করে ফেলে। বাবা, তার বাবা। নানুর এ—কথাটাও চায়ে চুমুক দেবার সময় মনে হল। ভারি সুন্দর ছিল তার বাবা দেখতে। খুব উঁচু লম্বা নয়, মাঝারি সাইজের। তার বাবাটির চোখ মুখ ছিল ভীষণ মায়াবী। বাবার কথা মনে হলে, তার চোখ এখনও ঝাপসা হয়ে আসে। সে গোপনে কাঁদে।

শহরের এদিকটায় এখন অনেক নতুন ঘরবাড়ি উঠে যাচ্ছে। সে জানালায় বসে দেখল ক'টা পাখি উড়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি পার হয়ে। বাড়িটা পুবমুখো বলে, সূর্য উঠলেই রোদ এসে যায়। সামনে অনেকটা জমি। সেখানে কিছু ফুলের গাছ। এই যেমন কিছুদিন আগে একটা কলকে ফুলের গাছ ছিল।

সে এখানে আসার পরই দাদু একদিন কলকে ফুলের গাছটা কেটে ফেলল। বাড়ির কাজের লোকটাকে বেশ সতর্ক গলায় ডেকেছিল সেদিন, 'নিধু গাছটা বুড়ো হয়ে গেল। ফুল হয় না। রেখে লাভ নেই। বরং এখানে একটা শ্বেতজবার গাছ লাগিয়ে দিবি।' নানু বলেছিল, 'দাদু এমন সুন্দর গাছটা তুমি কাটছ!' দাদু হেসেছিল 'গাছ সুন্দর হয় না। ফুল না হলে গাছ দিয়ে কী হবে।'

—তা ঠিক। সে চলে এসেছিল এবং জানালা থেকে সে দেখতে পেয়েছিল কলকের গোটাগুলি খুব সতর্ক চোখে তুলে নিচ্ছে দাদু। তার ভারি হাসি পেয়েছিল।

চা শেষ হতে না হতেই সে জানে দাদু আবার উঠে আসবে। খবর দেবে, নানু কাগজ এসে গেল। আয়।

সকালে এটাও অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই শৈশবে সে যখন স্কুলে পড়ত, বাবা বেঁচে থাকতে, বাবা ও জ্যাঠামণি তখনও একসঙ্গে এক বাড়িতে, জ্যাঠামণির জন্য ইংরেজি কাগজ—আর বাড়ির সবার জন্য একটা বাংলা কাগজ—সে খেলার পাতাটা প্রথম দেখত, তারপর সিনেমার পাতা, এবং পরে সব কাগজটাই পড়ার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সে চা খাবার সময় দেখল একটা রেলগাড়ি যাচ্ছে। এই জানালাটা দিয়ে অনেক কিছু দেখা যায়। সামনে বড় একটা পুকুর, কিছু গাছপালা, বাড়িঘর, এবং বড় রাস্তা থেকে একটা পথ বেঁকে বাজারের দিকে গেছে। সেখানে চায়ের দোকান, লোহা লক্করের দোকান, একটা ম্যাচ কারখানা, ক্লাব ঘর, ছোট্ট খেলার মাঠ, গোটা

দুয়েক তিনতলা বাড়ি, বাড়ির জানালা, একজন বুড়ো মতো মানুষ ব্যালকনিতে বসে থাকে। এবং সব পার হয়ে রেল—লাইন।

এ—ঘরে দুটো জানালা, সামনে পুবমুখী দরজা, তারপর রেলিং ঘেরা বারান্দা। এখানে আসার পর এ—ঘরটাই থাকার মতো মনে হয়েছিল তার। দোতলার এক প্রান্তে আলগা এই ঘরটায় সে কিছু বই আমদানি করেছে। গোপনে সে বইগুলি পড়ে। বইগুলি পড়লেই কেন জানি পৃথিবীটাকে তার বদলে দিতে ইচ্ছে করে। এবং একতলার কোনো শব্দই এখান থেকে শোনা যায় না। ঘরের মধ্যে আছে একটা আলনা। ওটায় সে তার জামাকাপড় রাখে। একটা টেবিল, কিছু বি—কম পার্ট ওয়ানের বই এবং চেয়ার একটা। এক পাশে লম্বা খাট, দুটো মোড়া। সুটকেসটা খাটের নীচে। ওতে টুথ ব্রাস, পেস্ট, দাড়ি কামাবার সাজসরঞ্জাম সব থাকে। যেন কোথাও যাবার কথা থাকে তার সব সময়—সে সেজন্য কাজ হয়ে গেলে আবার স্যুটকেসের ভিতর পুরে রাখে। একটা তাক রয়েছে। ওটা খালি।

মানুষ যেখানেই থাকে সেটা এক সময় বড় নিজস্ব হয়ে যায়। অথচ তার মনে হয়, সে কিছুদিন এখানে থাকবে, তারপর আবার কোথাও চলে যাবে।

বাসা বাড়িতে সে বড় হয়েছে। সে শুনেছে বাড়ি বদলের স্বভাব তার বাবার যেমন বাতিক ছিল, জ্যাঠামণিরও। এক বাড়িতে দু—তিন বছরও কাটত না, সে তার দশ—বারো বছরের জীবনে এটাই দেখে এসেছে। বাবা মরে যাবার পর মার সঙ্গে সে তার দাদুর বাড়িতে চলে এসেছিল। একতলার একটা ঘরে তখন সে তার মায়ের সঙ্গে থাকত। তারপর মেসো খবর পেয়ে পাটনা থেকে চলে এলেন—মাকে বললেন, তুমি আমার ওখানে চল, কিছুদিন বেড়িয়ে আসবে। ওরা চলে গেল সেখানে—তখন অন্য একটা বড় শহরে মেসোর বদলি হবার কথা। বড় মাসি ওদের নিয়ে গাড়ি করে কখনও রাঁচি, কখনও হাজারিবাগ গেছে। কেবল ঘুরে বেড়িয়েছে। সে বোঝে এত বড় একটা শোক সামলে উঠতে মার সময় লেগেছিল। তারপর সংসারে যে কী হয়, সে বুঝতে পারত না। মা একদিন বলল, আমরা একটা বড় শহরে চলে যাব নানু তোমার মেসো আমার জন্য একটা চাকরি ঠিক করেছে। তুমি ওখানেই পড়বে।

বাবার মৃত্যুর জন্য তার এক বছর পড়া হয়নি। পৃথিবীটা ছিল তখন হাহাকারে ভরা। সর্বত্র সে দেখত, তার পাশে পাশে কেউ হেঁটে যাচ্ছে। আর যেন বলছে, নানু ভয় পাবি না। আমি আছি। মানুষ মরে শেষ হয়ে যায় না। সে তার মাকে বলত, মা বাবা এমন কেন বলে? তখন যা হয়ে থাকে, দাদু এবং মা তাকে গয়াতে নিয়ে গিয়ে পিণ্ডদান করাল। প্রয়াগে সে এবং দাদু ত্রিবেণীর জলে ডুব দিল। পৃথিবী থেকে তার বাবার স্মৃতি মুছে দেবার জন্য সংসারে তখন আপ্রাণ চেষ্টা। কেউ ভুলেও বাবার কথা তার সামনে উচ্চারণ করত না। মাও না। কিছুদিন মা পাথর হয়েছিল—তারপর মেসো সেই যে 'বেড়াতে চল' বলে নিয়ে গেল সেই শেষ, শোকের শেষ। মার মুখে হাসি ফুটে উঠল। গাড়িতে মা জানালায় মুখ বাড়িয়ে বলেছিল, মনীষদা ওই দেখো চা—ওলা যাচ্ছে। ডাকো, চা খাব।

মেসো বলেছিলেন, গাড়িটা এখানে অনেকক্ষণ থামবে। চলো নীচে নেমে খাই। নানু নামক বালকের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুমি বসো। আমরা এক্ষুণি আসছি।

কত আগেকার কথা অথচ মনে হচ্ছে তার, এই সেদিন যেন সব ঘটে গেল। মা নেমে গেল মেসোর সঙ্গে। মেসো কী একটা ঠাট্টা করল মাকে। মা মেসোকে সামান্য ঠেলা দিয়ে কী একটা রসিকতা করল এবং যেন জীবনে কিছুই থেমে থাকে না—সে দেখল তার মা যখন উঠে আসছে, তখন জোর হাসছে মেসোর কথায়।

নানু মাথা নীচু করে বসেছিল তখন। মার এমন হাসি তার একদম ভালো লাগেনি। সে তখনও মাথা নীচু করে চা খাচ্ছে। সে যখন কথা বলে কারও সঙ্গে, মাথা নীচু করে কথা বলে—কীভাবে যেন তার মাথাটা কারা ষড়যন্ত্র করে হেঁট করে দিচ্ছে। প্রথম ষড়যন্ত্রকারী কে? এই প্রশ্নটা অনেকদিন থেকে তার মাথায় ঘুরছে। বিশেষ করে এখানে আসার পরই মনে হয়েছে সব ষড়যন্ত্রকারীদের সে খুঁজে বার করবে। সব আত্মীয়দের বাসায় যাবে—এবং খোলাখুলি সবার সঙ্গে সে বাবার মৃত্যু সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে।

এখানে আসার পর বছর পার হয়ে গেল। দাদু সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। কোথাও বের হতে দেয় না। যেখানে সে যাবে সঙ্গে দাদু যেতে চাইবেন। মানুষটাকে এক এক সময় তার দারুণ ভালো লাগে, এক এক সময় মনে হয় এই মানুষটার প্রতি তার করুণা হবারই কথা। আবার কখনও কী যে ঘৃণা! সে তখন চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি যাও, দাদু আমার সামনে তুমি এসো না। তুমি তো পি ডবল্যু ডির হেড ক্লার্ক ছিলে। একজন কেরানি কত আয় করে। এই আয়ে এত পয়সা কখনও হয়, মেয়েদের তুমিই নষ্ট করেছ—তোমার মেয়েরা কে কী আমার জানতে বাকি নেই। তখন মনে হয়, ছিঃ ছিঃ দাদুর সম্পর্কে এত সব খারাপ চিন্তা তার মাথায় আসে কী করে!

সকালে উঠে ঘুম ঘুম চোখে চা ভাবা যায় না! চা খেলেই যেন শরীরের সব জড়তা নষ্ট হয়ে যায়। সে টান টান হয়ে ওঠে। রক্ত মাংসে মজ্জায় অস্থিরতা জাগে। সে দাঁড়ায়। জানালা খুলে দিয়ে মুক্ত হাওয়া নেয় বুক ভরে। তারপর নীচে ছোটমাসির দরজায় গিয়ে দেখল, মাসি ঘরে নেই। তার জামা প্যান্ট মাসি জোর করে ঘর থেকে তুলে আনে। ধুয়ে ইস্ত্রি করে আবার রেখে দেয় তার ঘরে। তা রাখেনি। কোথায় রাখল তার জামা প্যান্ট! দাদুর ঘরে ঢুকেই অবাক। মাসি আজ সকাল সকাল দাদুর ঘরে ঢুকে গেছে। দাদু পঞ্জিকার পাতা ওলটাচ্ছে। ওকে দেখেই বলল, বোসো। সে বসল না। মাসির দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কি কিছু হয়েছে ছোটমাসি?

মিতা সামান্য চোখ কুঁচকে বলল, আমার আবার কী হবে?

না এই বলছিলাম, কেমন দেখাচ্ছে তোমাকে, এত সকাল সকাল এখানে।

দাদু তখন বলল, পাঁচটা আঠারো গতে একাদশী।

নানু বলল, দাদু ছোটমাসি আজ একাদশী করবে!

দাদু জানে, নানুর মাথার মধ্যে কেউ গুণ টেনে নিয়ে যায়। একদিন নানু বলেও ছিল কথাটা। আমার মাথার মধ্যে কেউ গুণ টানে—'গুণ টানে' এইরকম কথা নানুই বলতে পারে। বরং বলতে পারত, ধুনুরি তুলো ধোনে। তার বন বন ডবকা শব্দ মাথার মধ্যে বাজে। কিন্তু তা না বলে গুণ টানে—ভারি আজগুবি কথাবার্তা নানুর। সুতরাং বুড়ো রাসবিহারী সামান্য তামাকের পাতা মুখে ফেলে দিয়ে বললেন, তোমাকে আজ ছোটমাসির সঙ্গে একটু বেলঘরে যেতে হবে।

নানু বলল, আমার কাজ আছে। বুড়ো রাসবিহারী আবার চোখ তুলে দেখলেন নাতিকে তারপর কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, তোমার এত কী কাজ!

আমার কলেজ আছে। সময় হবে না। মাসি আমার জামা প্যান্ট কোথায়!

মিতা লম্বা ম্যাকসি পরে আছে। চুল ঘাড় পর্যন্ত বর করা। চোখে বাসি আই ল্যাস। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। চোখের নীচে রাজ্যের অন্ধকার। দিদিমা কলতলায় কাউকে বকছে। ঠিক এই সময়ে সহসা ছোটমাসির মুখটা বুড়ি হলে কী রকম দেখাবে—এই দিদিমার বয়সে, এবং ভেবেই সে বুঝতে পারল, আগামী ২০২০ সালের ২২ এপ্রিল ছোটমাসি দেখতে হুবহু দিদিমা—যতই চামড়া টান করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বের হক—ছোটমাসিকে কেউ আর ছোটমাসি রাখতে পারবে না। বুড়ি দিদিমা, গালে মাংস নেই, ফলস দাঁতে যখন হাঁ করবে—তখন শরীরের সবকিছু জারিজুরি ধরা পড়ে যাবে। সে বলল, মাসি তুমি হাঁ কর তো?

মাসি বলল, হাঁ করে কী হবে?

হাঁ করই না, দেখব।

কী দেখবি?

কোথাকার জল কতদূর গড়াবে ভেবে মিতা বলল, দেখে কী হবে?

কটা দাঁত আছে গুণে রাখব।

দাদু সহসা উঠে দাঁড়ালেন। না, পারা যাচ্ছে না। নানু আমার সঙ্গে এসো।

কোথায়।

চল বসার ঘরে। আমার কিছু বই আছে ওগুলো তুমি গুণবে। তখন নানু ভাবল এক সময় একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন দাদু। কপালকুণ্ডলা উপন্যাস মা প্রথম দাদুর লাইব্রেরি থেকে পায়। দাদুর চিন্তাশক্তি, কিংবা বলা যায় বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত প্রখর। দাঁত না গুণে বই গুণতে বলছে। বুড়োটা বড় বেশি চালাক। সে বলল, দাঁত গোনা আর বই গোনা এক কাজ দাদু? তুমি বল, এক কাজ কী না?

রাসবিহারীর কপাল ঘামছিল। ছটি জীবিত কন্যার জনক তিনি। মরে গেলে জামাতারাই তার এই সম্পত্তির মালিক হবে। তিনি এখন তা চান না। কারণ নানু কেন জানি বুকের মধ্যে একটা জায়গা নিয়ে বসে যাচ্ছে। সেই জামাইয়ের মৃত্যু দিন থেকেই—তখন নানুর বয়স আর কত। একটা জাবদা খাতায় তাঁর সব কিছু লিখে রাখার অভ্যাস। তিনি লিখেও রেখেছিলেন। ওটা খুলে আর একবার দেখা দরকার। বেঁচে থাকতে থাকতে আর দুটি কাজ তাঁকে সম্পূর্ণ করে যেতে হবে। এক নম্বর মিতার বিয়ে, দুই নম্বর নানুর জন্য ভালো একটা কাজ এবং সুন্দর টুকটুকে নাত—বউ। তাহলে মোটামুটি লাইফ—সারকল সম্পূর্ণ। একজন মানুষের পৃথিবীতে আর কী লাগে!

মিতার বিয়ের জন্য ভালো একটা ছেলে পেয়েছেন। খোঁজখবর নিতে হবে পাত্রপক্ষ যা চায় মিতার সে—সব গুণ ষোলো আনা আছে। দাবি দাওয়া যথেষ্ট। পাত্র দেখা হয়নি। সেজ—জামাইয়ের অফিসের ক্যালকাটা ব্রাঞ্চে ছেলেটা কাজ করে। এই সব কথাগুলিও রাসবিহারীর মাথায় টরে টক্কা বাজিয়ে গেল। তবু কপাল খুবই ঘামছে। এক বয়সে ভাবতেন, দুটো ডাল ভাতের সংস্থান করতে পারলেই জীবন ধন্য। তারপরের কালে ভাবতেন, সন্তানগুলি বড় হলেই সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এবং মেয়েরা বড় হতে থাকলে ভাবলেন, বিয়ে দিতে পারলেই লেটা চুকে গেল। কিন্তু এখন দেখছেন, নানুর কিছু একটা না হলে তিনি মরেও স্বস্তি পাবেন না। অথচ এই নানু দিনকে কী হয়ে যাচ্ছে! তিনি বললেন, কাল রাতে এত দেরি হল কেন তোমার ফিরতে?

আচ্ছা দাদু তুমি সত্যি করে বলত, তোমার ছোট মেয়ের দাঁত কটা?

আমি কী করে জানব?

বাবা হবে, অথচ খবর রাখবে না কটা দাঁত মেয়ের?

তুই যখন বাবা হবি, তখন খবর রাখিস সব কিছুর।

কী বললে!

রাসবিহারী প্রমাদ গুনলেন। নানুর চোখ ভীষণ টকটকে লাল। নানুর মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে। তিনি বললেন, নানু দাদুভাই, আমার শরীর কেমন করছে।

নানু বলল, ডাক্তার ডাকব! ও ছোট মাসি!

না, না, তুই ওপরে যা! আমার শরীর এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি হাঁ করে ওকে দেখাতে পার না। তোমার এত গুমর।

নানু দাদুর দুরবস্থা দেখলে খুব স্বাভাবিক হয়ে যায়। তার চোখ দুটো আর লাল থাকল না এবং সে পাশে বসে বলল, দাদু তোমার বয়স হয়েছে। এখনও এত ভাব কেন বল তো। এ—বয়সে মানুষের ঠাকুর দেবতা ছাড়া আর কী থাকে!

নানু মাঝে মাঝে কত ভালো কথা বলে। মনেই হয় না তখন, এই শেষ বয়সের নাতিটা আত্মঘাতী হতে পারে। বরং বিবেচক, বুদ্ধিমান—নানু বড় কর্তব্যপরায়ণ। তিনি বললেন, নানু তোমার জ্যাঠামণি আজ বিকেলে আসবে। বাড়ি থেকো।

সে বলল, বাবার বড় ভাইয়ের কথা বলছ?

এই মুশকিল। কোনো কথা নানু কী ভাবে নেবে বুঝতে পারেন না রাসবিহারী। এখন যা কথাবার্তা নানুর, —তাতে মনে হয় জ্যেঠুর সম্পর্কে তার আর তিলমাত্র শ্রদ্ধা নেই। তিনি নানুর দিকে একবার ভালো করে তাকালেন। মিতা ঘরে নেই। সে কোন ফাঁকে ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। কখন আবার নানুর মনে পড়ে যাবে ছোট মাসি দাঁত না দেখিয়েই চলে গেল! সুতরাং রাসবিহারী নানুকে কিছুটা অন্যমনস্ক করে রাখতে

চাইছেন। নানুর জ্যাঠামণি অবনীশ এবং তার বউ দুজনেই আসবে। নানুর খোঁজখবর নিতে আসে। কারণ আফটার অল নানু অবনীশের ছোট ভাইয়ের ছেলে। আত্মীয়—স্বজন এমনিতেই প্রীতিশের মৃত্যু নিয়ে নানারকম কথাবার্তা বলে থাকে। আড়ালে এও শোনা যায় অবনীশের বউর স্বার্থপরতা প্রীতিশকে ভীষণভাবে মর্মাহত করেছিল। অবনীশ বিয়ে করেছিল বেশি বয়সে। ওদের এখন একটি মেয়ে। মেয়েটির বয়স আট। বউ শিক্ষকতা করে। ভালো ইস্কুলে মাস্টারি এবং কোচিং—এর আয় থেকে বেশ বাড়িঘর বানিয়ে আদর্শ স্বামী—স্ত্রী এখন তারা। অবনীশ একটা অফিসে আছে।

নানুর দিকে তাকিয়ে এতগুলি কথা রাসবিহারী মনে মনে ভেবে ফেললেন। অবনীশের কথাবার্তায় সব সময়ে খুব বিপ্লবী মেজাজ। রাজনীতি থেকে হাল আমলের সাহিত্য সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং পৃথিবীতে কোথাও কিছু হচ্ছে না, একমাত্র চীন দেশটি সম্পর্কে তার এখনও আস্থা আছে—না হলে যেন সে আর বেঁচে থাকতেও রাজি ছিল না। অবনীশ কথাবার্তা হাফ বাংলা হাফ ইংরেজি ঢং—এ বলতে অভ্যস্ত।

নানু কিন্তু বংশের কোনো কৌলীন্যই পায়নি। নানু দেখতে তার মার মতো কিন্তু ভীষণ লম্বা এবং অল্প বয়সেই দাড়ি গোঁফ উঠে যাওয়ায়, তাকে এই আঠারো উনিশ বছরে একজন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবকের মতো লাগে। সে কখনও দাড়ি কামায়, কখনও কামায় না। কলেজে যায়, তবে কলেজ করে না। এবং যা খবর, তাতে দুশ্চিন্তা একমাত্র সার করে রাসবিহারীকে বেঁচে থাকতে হবে। নানু তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা একমাত্র তার ছোট মাসিকেই বলে। এবং কখনও কখনও এমন সব সাংঘাতিক কথাবার্তা কানে আসে যে রাসবিহারী নিজের মৃত্যু কামনা করতে বাধ্য হন।

এই যেমন এখন নানু একটা চেক কাটা লম্বা পাজামা পরে স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে বসে কাগজ পড়ছে। চশমা চোখে—খুব অল্প বয়সেই চোখ খারাপ হয়ে যাওয়ায় বাবা তাকে চশমা পরিয়ে গেছে। এখনও সেই চশমাটাই চোখে। চশমার পাওয়ার বদলানো দরকার—কিন্তু মানুষের মনে কী যে থাকে—নানু বাবার দেওয়া চশমা কিছুতেই চোখ ছাড়া করবে না। রাসবিহারী জানে নানুর ইচ্ছা না হলে এই পাওয়ার বদলানোর কম্ম তার কেন, তার প্রপিতামহেরও সাধ্য নেই। ওর মার স্বভাব ঠিক উলটো। যখন যেমন, অর্থাৎ নেই বলে বসে থেকে লাভ নেই, সময়ের সঙ্গে শরীরের সঙ্গে তাল দিয়ে চলার স্বভাব। হাহাকারের মধ্যে একজন মানুষ কতক্ষণই বা থাকতে পারে। তুই ছেলে হয়ে মার দুঃখটা বুঝবি না। অবুঝের মতো মাথা খারাপ করবি। আজকাল তোর মার বয়সে কত মেয়ের বিয়ে হয়—আকছার এ—বয়সটা আজকালকার মেয়েদের প্রায় বিয়ের বয়স। পঁয়ত্রিশ—ছত্রিশ একটা বয়স!

তখনও দুম করে নানু বলে ফেলল, আচ্ছা দাদু তোমার তো বয়েস হয়েছে।

রাসবিহারী বললেন, বয়েস ত হবেই।

এ বয়সে মানুষ কিছু সত্য কথা বলে থাকে।

মানুষ সব সময়ই সত্য কথা বলে।

তুমিও বলেছ?

যখন যেমন দরকার। মানুষের সত্যাসত্য সঠিক কি, মানুষ কখনও বলতে পারে না।

নানু তর্কে যেতে চাইল না। এখানে আসার পর থেকেই ভাবছে, কেবল ভাবছে—কাকে দিয়ে সে আরম্ভ করবে, মাকে দিয়ে, দাদুকে দিয়ে, জ্যাঠামণিকে দিয়ে, না অন্য কাউকে দিয়ে? কিন্তু আজ সকালে মনে হল, দাদুকে দিয়েই শুরু করা যাক। বলল, দাদু, তুমি অনেক বেশি জানো। কিন্তু এটা কি জানো বাবা কেন আত্মহত্যা করলেন?

রাসবিহারী চিৎকার করে উঠলেন, নানু কে বলেছে তোমার বাবা আত্মহত্যা করেছেন?

আমি জানি দাদু, তোমরা যতই গোপন রাখো সব জানি। বাবা কুড়িটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছিলেন। বাবা লিখে রেখে গেছিলেন, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। তার আগের রাতে মা আমাকে নিয়ে তোমার কাছে চলে এসেছিল। ঠিক বলিনি? আমার সব মনে আছে। আমার বাবা, প্রিয় বাবা, আমাকে নিয়ে কত স্বপ্ন

দেখতেন। তিনি দুম করে মরে যাবেন কেন, তাঁকে তোমরা সবাই মিলে কিছু একটা করেছ—আমার কাজ সেই কিছুটা কী বের করা।

রাসবিহারী উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাত পা কাঁপছিল। তিনি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। নানু চোখ তুলে দেখল, মানুষটা অনেক নুয়ে পড়েছে।

সে বলল, চলে যাচ্ছ কেন দাদু। আমার কথার জবাব দাও। এই আত্মহত্যায় কার হাত ছিল বলে যাও? তাদের সবাইকে আমি ফাঁসিকাঠে ঝোলাব।

দুই

তখন সকাল বেলা। সকালসকাল স্নান করে নেবার অভ্যাস রমার। তখনই কেউ এসে ডাকল, 'রমা আছে!'

রমা বাথরুমে। রমা স্কুটারের শব্দে টের পায় সে এসে গেছে। রমা অনেক দূর থেকে শুনতে পায়, নীল রঙের স্কুটার চড়ে সে আসছে। অনেকদূর থেকে আওয়াজটা অতীব এক ভোমরার মতো শব্দ করতে থাকে। যেন দূরান্তে আছে লোকটা, স্কুটারে চাপলেই গড় গড় শব্দ, কোনো দূরবর্তী জায়গা থেকে শব্দটা ভেসে আসে। রমা তখন স্থির থাকতে পারে না।

দোতলায় বারান্দায় বোধহয় কেউ নেই। বাবা ঠিক কাগজ পড়ছে। মানুষটা নীচে দাঁড়িয়ে রোজকার মতো বলবে, রমা আছে। আশ্চর্য অভ্যাস মানুষটার। রমা যাবে কোথায়? রমা আছে কী নেই কথাটা অবান্তর। আসলে জানান দেওয়া, এলাম। স্কুটারের শব্দে টের পায় সবাই সে এসেছে। অধিকন্তু নীচে দাঁড়িয়ে বলা, রমা আছে? রমার ভারি হাসি পায় কথাটা ভেবে।

আজ ছুটির দিন। ছুটির দিন হলেই অরুণ সকালসকাল চলে আসে। রমা অন্য দিনকার চেয়ে ছুটির দিনে আরও একটু বেশি সময় নিয়ে বাথরুমে ঢোকে। যেন ছুটির দিনে সহজে সব কিছু সাফ—সোফ হতে চায় না।

আর গরমের দিনে কোথাও বের হতে হলে স্নান না করে বের হওয়াও যায় না। ফুরফুরে বাতাসে চুল উড়বে। শরীরে মেখে নিতে ভালো লাগে সব মনোরম গন্ধ। এবং লোকটার গায়ে মিশে থাকতে তখন কী যে আরাম লাগে! যথার্থ পুরুষমানুষের গন্ধ অরুণের শরীরে! কী সুন্দর গন্ধটা! ঠিক স্কুটারের মতই মনে হয়, যত সে বাতাসে ভর করে আসছে ততই গন্ধটা ক্রমে এগিয়ে আসে। এবং এভাবে নীচে এসে না ডাকলেও টের পায়, কোথায় কত দূরে আছে মানুষটা। রমা আছে, এমন প্রশ্নে সে অরুণের মধ্যে একজন কাপুরুষেরও গন্ধ পায়।

রমা জানে, অরুণকে দরজা খুলে দেবার লোকের অভাব নেই বাড়িতে। অরুণ সোজা বারান্দা ধরে সিঁড়িতে উঠে আসছে জুতোর শব্দে তাও সে টের পায়। এবং এমনই যখন সব কিছু তখন একটু দেরি করলেও ক্ষতি নেই। সে ঠিক উঠে আসবে ধীরে ধীরে। জুতোর শব্দ সিঁড়িতে। ওর উঠে আসা, বসা এবং প্রতিটি কথাবার্তা শোনার জন্যে তখন মাথায় জল ঢালে না রমা। কেমন গোপন এক অভিসার নিজের সঙ্গে নিজের।

একটু বাদেই সে সেজেগুজে বের হবে মানুষটার সঙ্গে। কখন ফিরবে ঠিক নেই। কোনো কোনোদিন অরুণ বড় ফাজিল হয়ে যায়। ফিরতে চায় না। রাত করে ফিরলে ঠান্ডা গলায় বাবা বলবে, 'তোমরা বড় হয়েছ। সবই বোঝ। আমার বলার কিছু নেই।'

রমা তখন বাবাকে বলতে চায়, বাবা, আমি কী বড় হয়েছি! বড় হওয়াটা কী! আজকাল সে নিজের সঙ্গে দুষ্টু দুষ্টু খেলা যখন আরম্ভ করে দেয়, মনেই হয় না পৃথিবীতে কোনো দুঃখ আছে।

অরুণের নতুন স্কুটার কেনার পর এমন হয়েছে। ছুটির দিনগুলো ভারি মজার। সকাল হলেই অরুণ নীচে এসে ডাকবে—রমা, রমা। রমা তো তৈরি। তবু অরুণকে একটুক্ষণের জন্য ওপরে উঠে যেতে হয়।

দোতলায় তিনখানা ঘরের একখানা বসার ঘর। সিঁড়ি দিয়ে ঠিক ঢোকার মুখে বাথরুম, তারপর সরু করিডোর। বাঁদিকে বসার ঘরের মুখেই রান্নাঘর। করিডোর দিয়ে ঢোকবার সময় প্রায় রান্নাঘরের সবই দেখা যায়। লোকজন এলে বাড়িটার কোনো আব্রু থাকে না।

সে উপরে এলেই দেখতে পাবে বাথরুমের দরজা বন্ধ। কেউ ভেতরে আছে। তখন জল ঢালার শব্দে, মগের ঠুংঠাং আওয়াজে সে টেরও পাবে বাথরুমে কে আছে, আর টের পেলেই যা হয়, সব কিছু তার চোখের ওপর তখন ভাসতে থাকবে। ভাবতেই রমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। নিজের শরীর বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার এক আশ্চর্য বাসনা জাগে।

রমার ছোট ভাই মানু তখন রেলিঙে ঝুঁকে পড়েছে। এই মানুষটি এলে ছোটখাটো দুঃখ আর সংসারে ভেসে থাকে না। যেন সব সময়ই মানুষটার এই পরিবারের জন্য কোনো না কোনো সুখবর বয়ে আনার কথা। মানুর তো খুব প্রত্যাশা, একদিন যেমন দিদির চাকরির খবর নিয়ে এসেছিল, তেমনি তারও চাকরির খবর আনবে। বোধহয় বেলায় ঘুমোয় বলে, টেরই পায়নি, নীচে অরুণদা দাঁড়িয়ে আছে। বাইকের শব্দ থেমে গেছে। সে স্বপ্নের ভেতর বাইকের একটা শব্দ শুনতে পেয়ে যেন জেগে উঠেছিল। তারপর রেলিঙের ধারে এসে দেখেছে ঠিক অরুণদা, পাশে তার নীল রঙের স্কুটার, সুন্দর ব্যাকব্রাশ করা চুল, লম্বা বেলবটস আর রংদার বুশ—শার্ট।

বিগলিত হাসি মানুর—অরুণদা যে কী দারুণ লাগছে তোমাকে! ঘড়ি? ব্যান্ডটা দেখি—কবে কিনলে—সব ম্যাচ করা। দিদি বাথরুমে।

এই বাইকের শব্দ তো এ—বাড়ির বুকে একটা ছোট রেলগাড়ি চালিয়ে দেয়। সবাই নড়েচড়ে বসে। মা ঘোমটা টেনে বলে, 'দ্যাখ অরুণ বুঝি এল।'

বাবার আজকাল ভীষণ ভয়, আতঙ্ক, যেন সব জায়গাতেই গণ্ডগোল লেগে আছে। কারণ শহরের দিনগুলো কোনো না কোনো জায়গায় ভয়ংকর খবরের মতো কাগজের পাতায় ভেসে থাকছে। বাবার যা স্বভাব, ঠিক বলবে, 'অরুণ, তোমাদের ওদিকটাতে কোনো গণ্ডগোল হয়নি তো আর।'

রমা শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে এমন ভাবছিল। সবাই একটা যেন কী ভেবে ফেলেছে। অরুণ ওর অফিসে রমাকে এত ভালো মাইনের একটা কাজ জোগাড় করে দিতেই সহসা সবার সে বড় নিজের মানুষ হয়ে গেছে। এবং অরুণের জন্য সংসারের সব মানুষদের একটা কৃতজ্ঞতাবোধ জন্মে গেছে। দাদা পর্যন্ত অরুণকে আজকাল সমীহ করে কথা বলে!

অথচ অরুণ এ—সংসারে এসে স্বস্তি পায় না। এই যে রমাকে নিয়ে ছুটির দিনগুলোতে বের হয়, সম্পর্কটা যে সত্যি কী, কখনও ভেবে সে অস্থির হয়ে ওঠে, অথচ না এসেও পারে না, যে সংসারের একটা বড় কর্তাগোছের মানুষ রমা, ওর ইচ্ছেতেই এখন সব হয়। রমার ইচ্ছে না থাকলে সে কখনও এতটা এগোতে পারত না। যেন রমাই বুঝিয়ে দিচ্ছে, আমার নিজের মানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়াব, ভয়ের কি। আর এমন সুপুরুষ, ভালো মাইনের কাজ করা মানুষ, তোমরা যতই চেষ্টা কর, কিছুতেই আমার মতো মেয়ের জন্য আনতে পারতে না। সংসারে আমার ভার কত হালকা হয়ে গেছে, বুঝতেই পারছ তোমরা। তারপরই রমার মুখে কেমন দুঃখী দুঃখী দেখায়। আসলে ভেতরে অশুভ ছায়া তখন নড়েচড়ে বেড়ায়। সে জানে সেটা কী। সে বোঝে কতটা দূরে সে স্কুটারে উড়ে যেতে পারে।

আর তখনই বারান্দায় জুতোর শব্দ। রমা শাওয়ার বন্ধ করে জুতোর শব্দ শুনল। বসার ঘরের দিকে যাচ্ছে। ঠিক একজন বুড়ো মানুষের মতো মনে হয়। বারান্দা ধরে বসার ঘরে মিলিয়ে যাচ্ছে, যেন কোনো রুগণ মানুষকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং এত করেও এই ভারিক্কি রুগণ শব্দটা রমা দূর করতে পারেনি অরুণের। বাড়িতে অরুণের এতটা কাপুরুষের মতো স্বভাব রমার পছন্দ না। যেন বাড়িতে চোর ঢুকেছে। বাড়িতেই এমনটা। কিন্তু যখন স্কুটার চালিয়ে দেয়, নীল আকাশের নীচে ধাবমান স্কুটার আর সে, পাগলের

মতো অরুণ কত দূরে যে যেতে চায়। সে মাঝে মাঝে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'এই পড়ে যাব। মরে যাব। আস্তে।'

অরুণ তখন আরও মজা পায়।

রমা যতটা পারে কোমর ধরে বসে থাকে। যত নীল আকাশ দুরন্ত ছেলের মতো দামাল হয়ে ওঠে, চারপাশের বাড়িঘর, গাছপালা যত দ্রুত ধাবমান দৃশ্যাবলি হয়ে যায় তত সে খামচে ধরে অরুণকে। যেন সে তখন পারলে অরুণের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চায়।

আর অরুণ এক উন্মুক্ত আকাশতলে প্রায় শক্ত বাহুতে ব্যালান্সের খেলা খেলতে খেলতে কোন এক সুদূর গোপন গহন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে—রমা সত্যি থই পায় না। এমন একটা জীবন ছেড়ে দিতেও তার ভয় লাগে। সে তখন একা হয়ে যাবে। ভারি নিঃস্ব। পৃথিবীতে এমন কোনো নবীন যুবকের আর সন্ধান পাবে না, যে তাকে অরুণের মতো সুদূরে নিয়ে যেতে ভালোবাসে।

রমা বুঝতে পারল, অরুণ বসার ঘরে ঢুকে গেছে। সে এবার শাওয়ার পুরো খুলে দিল। শরীরে বৃষ্টিপাতের মতো এক স্নিগ্ধ করুণা। সে বুঝতে পারছিল, অতলে ডুবে যাচ্ছিল সে। সব জেনেও কিছু আর তার করার নেই।

আগে দাদা বাবা মিলে কী না করেছে। এখন দাদার ধারণা অরুণ ইচ্ছে করলে মানুকেও একটা চাকরি দিতে পারে। দাদা বাবা সবাই সেজন্যে স্কুটারের শব্দ পেলে ছুটে চলে যায়। কে আগে প্রাণ করিবেক দান এমন যেন ভাব। রমা হেসে বাঁচে না। শাওয়ারের জল মাথায় মুখে সর্বাঙ্গে—কি যে ঠান্ডা! শরীরের রোমকূপে বিন্দু বিন্দু জলকণা ক্রমে গভীরতর হচ্ছে। সারা শরীরে সাবানের ফেনা, পাম—অলিভের সৌরভ আর তখন সেই দুষ্টু লোকটা বাবা দাদার সঙ্গে সরল বালকের মতো ঠিক গল্প জুড়ে দিয়েছে। কে বলবে, ওর উদ্ভট সব পরিকল্পনা যে—কোনো কুটবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চেয়ে প্রবল।

আয়নায় রমার শরীরের সবকিছু ভেসে বেড়াচ্ছে। শরীরে কী যে মোহ থাকে মানুষের, শেষ হয়ে যায় না, বার বার ঘুরে ফিরে নিজেকে দেখতে কেন যে এত ভালো লাগে—আচ্ছা অরুণ, তুমি বসে গল্প করছ, কিছু ভাবছ না তো। এই মিথ্যুক মারব! আমি বাথরুমে, তুমি কিছু ভাবছ না! তুমি আমাকে মনে মনে দেখতে পাচ্ছ, আমি এখন কী কী করতে পারি ঠিক তুমি জানো সব। তুমি খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছ, আমি জানি। আমার হয়ে গেল বলে। বের হলেই সাবানের গন্ধটা ভুর ভুর করবে তোমার নাকে। তেলের সুগন্ধ চুলে। তুমি তো খুব ভালোবাসো এসব গন্ধ নিতে। স্নান সেরে বের হলেই জানি আমাকে দেখতে খুব ভালো লাগে তোমার। পাগলামি করবে না। আজকাল যা করছ। কিন্তু তুমি তো জানো, আমার কী কী ইচ্ছে হয়, আমার কিন্তু ভয় লাগে অরুণ। সত্যি ভয় লাগে। কোনো বড় হলঘরে ঢুকে যাবার মতো ভয়।

অরুণ তখন বলল, এই যে মানুবাবু, তোমার ক্লাব তো হেরে গেল।

মানুর রাতে ভালো ঘুম হয়নি। হাই উঠছিল। দিদি না আসা পর্যন্ত কেউ না কেউ একজন ওরা জেগে থাকে। দাদা বাজার করতে যাবে—দাদাকে সে ঢুকে বলল, তুমি যাও। অতিথির অসম্মান না হয় আবার! মানু অথবা বাবা, যে কেউ একজন হলেই চলে! মা মানদাকে দিয়ে ঘরের ঝুল পরিষ্কার করাচ্ছে। মানু খুব বিষণ্ণ গলায় বলল, এত ক্লিকবাজি থাকলে হারবে না!

অরুণ বলল, ক্লিকবাজি কারা করছে?

কারা আবার। সাপোর্টাররা ভাবছেন ছেড়ে দেবে।

ঠ্যাঙাবে বলছ?

কিছু একটা হবেই।

এসব কথা খুবই অদরকারি অরুণের কাছে। তবু কিছু কথা অদরকারি হলেও বলে যেতে হয়। কাগজটা এক ফাঁকে তুলে প্রথম পাতার খবর দেখল। জনগণের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা—অরুণ প্রথম দু—চার

লাইন পড়তে পড়তে কিছুই ভালো লাগছে না—র মতো রেখে দিল কাগজটা। মানুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা হলে কিছু একটা হবেই।'

হবে না বলছেন! পর পর হেরে যাওয়া কত আর সহ্য করা যায় বলুন।

শুনলাম ক্লাবের সেক্রেটারি বিলেত চলে যাচ্ছেন?

গুজব। কতরকম যে গুজব রটাচ্ছে শত্রু—পক্ষরা।

মানুষের এই স্বভাব। সে নিজেই কোনো না কোনো জটিল সমস্যা নিজের জন্য সৃষ্টি করে নেয়। মুখ চোখ দেখে অরুণ বুঝতে পারছিল, মানু রাতে ভালো ঘুমোতে পারেনি। সে কোনো ক্লাবের একনিষ্ঠ সমর্থক নয়। যে জেতে তার পক্ষ নিতে শুধু তার ভালো লাগে। বরং এই সকালে অদরকারি কিছু কথাবার্তা বলতে গিয়ে বুঝল, মানু ভীষণ সিরিয়াস হয়ে উঠছে। ওর হাসি পায়। সে মানুকে সামান্য উত্তপ্ত করতে পেরে বরং খুশিই। সারা সকালে ওই একটা বিষয়েই তর্ক করা যেতে পারে। খেলোয়াড়দের প্রশংসা, নিন্দা দুটোই এখন তর্কের বিষয়বস্তু হতে পারে। জার্সির রং দেখে ঘাবড়ে যায় সে বলতে পারত, যদিও কোনো কিছুই তার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না, বরং বাথরুমের দিকে চোখ—কখন খুট করে দরজা খোলার শব্দ হবে। কখন রমা বের হবে স্নান সেরে। দৃশ্যটা দেখার জন্যই সে একমাত্র উন্মুখ। পর্দায় প্রায় নগ্ন কোনো দৃশ্যের মতো তার কাছে অতীব প্রয়োজন রমার এই বের হওয়া। সে তবু বলল, মন খারাপ!

হবে না!

কেউ ডাকছে মনে হচ্ছে।

ওই তো ডেকে নিয়ে গিয়ে এখন লাগবে পেছনে।

যাবে না। তবে বল অন্তত বাড়িতেই আছ।

কিছু বলব না। আপনি একটু উঠে গিয়ে বলুন না অরুণদা, মানু নেই।

অরুণের উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। যদি রমা ঠিক তখনই বের হয়ে যায়। রমার স্নানের দৃশ্যটা সে আজকের দিনটায় দেখতে পাবে না! ওই যে কী হয়, একবার ডায়মন্ডহারবারে সাগরিকায় দুপুরবেলা খাওয়া—দাওয়া করে খাবার পর বাথরুমে হাতমুখ ধুতে গিয়ে রমা বেরই হচ্ছিল না। যখন বের হল, তখন একেবারে স্নিগ্ধ ছবি রমার। স্নানটান শেষে মেয়েদের এত কেন যে ভালো লাগে।

তার বলতে ইচ্ছে হল, মানুবাবু, তোমার এমন একটা দৃশ্য দেখার জন্য বসে থাকতে ইচ্ছে হয় না। অথচ নীচে ডাকছে, তখন গলা পাওয়া যাচ্ছে—মানু আছিস?—মানু?

অরুণ অগত্যা জানালার পর্দা সরিয়ে বলল, ও তো নেই। এলে কিছু বলব?

বলবেন এসেছিল। বললেই বুঝতে পারবে। আমার নাম নানু।

অরুণ ভাবল বেশ সময় এটা মানুষের। একটা কিছু নিয়ে থাকা। কোনো ব্যর্থতাই ব্যর্থতা নয়। ওদের সময় কত সহজে কেটে যায়। ওর সময় লম্বা, দীর্ঘ, এবং একমাত্র রমা কাছে থাকলে সময় কীভাবে কেটে যায় সে টের পায় না। সে মানুকে বলল তোমার বন্ধু নানু এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মানুর মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

তখনই রমা খুট করে দরজা খুলে ফেলল। প্রায় আবির্ভাবের মতো লাগছিল। এমন উঁচু লম্বা মেয়ে সে কমই দেখেছে। চুল ঘন, মিহি চুলে তোয়ালে জড়ানো। হাতে ভেজা সায়া, শাড়ি, ব্লাউজ। বাসি কাপড় ধুয়ে একেবারে পরিচ্ছন্ন রমা। ভেতরের রক্তপ্রবাহ কেমন মাতাল সমুদ্রের মতো ওকে ধাক্কা মারে। এত উষ্ণতা জীবনে থাকে কেন! তার নিজের কিছু আছে, উলটে পালটে দেখতে দেখতে বছর দু'বছর না ঘুরতেই জীর্ণ বাসের মতো হয়ে যায় কেন! প্রকৃতির কোন কুটবুদ্ধি শরীরে তার খেলে বেড়ায়। কতবার মনে হয়েছে এটা ঠিক না। গোপনে সে একটা ভারি পাপ কাজে লিপ্ত হবার জন্য উন্মুখ। অথচ এই মেয়েটা তাকে নিয়ে বেশ খেলাচ্ছে। কোথাও যখন গভীরে ডুবে যেতে ইচ্ছে হয়, রমার বালিকার মতো দুঃখী মুখ। তখন সে আর গভীরে নেমে যেতে পারে না। চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়, রমা প্লিজ। রমা মরে যাব।

রমা তখন পাশ কাটিয়ে বারান্দায় শাড়ি মেলতে যাচ্ছে। পালিয়ে পালিয়ে কিছুটা দেখছিল। খুব অবহেলা ভরে। চোখে বিন্দুমাত্র লোলুপতা ছিল না। আবার মানু অজস্র কথা বলে যাচ্ছে। সে হুঁ—হা করছে। সিগারেট টানছে। রমার সঙ্গে গোপনে যে কিছু কথাবার্তা হয়ে গেল মানু হয়তো টেরই পেল না। এই বাড়ি, ঘরদোর, আসবাবপত্র সবই ওর কাছে বড় মহার্ঘ হয়ে যায় রমার জন্যে। সে কেমন দীনহীনের মতো কেবল সব কিছু তাকিয়ে দেখে।

রমা নিজের মনেই বলল তখন, এই তুমি পালিয়ে পালিয়ে এত কী দেখছ! চোর কোথাকার! কী ভেজা বেড়ালের মতো বসে আছে দ্যাখ। কিছু যেন খুঁটে খেতে জানে না বাবু। রমা বারান্দা থেকে বলল, কী অরুণদা মানুর সঙ্গে বেশ জমে গেছ। আমরা যে বাড়িতে আছি দেখে তা মনে হয় না।

আরে না না। তুমি যাবে তো?

কোথায়!

বা রে বললাম না, জীবনবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন।

না গেলেই নয়?

দ্যাখ ভেবে। যাও তো সঙ্গে নিতে পারি।

না গেলে ভারি খারাপ দেখাবে?

অরুণ এসেই কত সব জীবনবাবুর বিয়ে, অন্নপ্রাশন, বউভাত, পিকনিকের কথাবার্তা বলে যে সুখ পায়। আগে এটা সত্যি বিয়ে অন্নপ্রাশন ছিল। পরে কিছুদিন যেতে না যেতেই দাদার মনে সংশয়, তারপর কিছুদিন সে এ—বাড়িতে আসতই না। দাদাই খবর দিয়ে ফের আনিয়েছে। ওদের ভুবনেশ্বরে সেলস এম্পোরিয়ামে একটা পোস্ট খালি আছে। যদি অরুণ চেষ্টা চরিত্র করে মানুকে ঢুকিয়ে দিতে পারে। সংসারে অরুণই একমাত্র ভরসা।

রমা নিজের ঘরে ঢুকে গেছে তখন। গলায় ঢুকে পাউডার ঢেলে দিচ্ছে। গলা বাড়িয়ে একবার মাকে বলল, অরুণদাকে চা দাও, মা।

ও—ঘর থেকে অরুণ বলল, কিচ্ছু না।

মা বলল, তুই ফিরবি কখন?

ফিরতে রাত হবে।

মা আর কিছু আজকাল বলতে সাহস পায় না। বসার ঘরে বাবা একা। বয়স বাড়লে মানুষেরা খুব নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। বাবা একদিন বলেছিলেন, এবারে বল আর কতদিন ঝুলিয়ে রাখবে।

রমা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেছিল। বলেছিল, বললে কী হবে!

বললে কী হয় তোমরা জানো না।

চাকরিটা তবে থাকবে না।

যেন বাবার মনে পড়ে যায় সত্যি, তবে চাকরি থাকবে না। মেয়েটা তার উঁচু লম্বা বলেই এমন একটা দামি চাকরি পেয়ে গেল। শ্যামলা রং। চোখ বড় চিবুক সামান্য চাপা। তবু রমার মুখে এক ধরনের কোমল ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে—কোনো মানুষের পক্ষে লোভনীয়। রমা নিজের টাকায় একাই বাড়ির আজকাল সব প্রাচুর্য রক্ষা করতে পারে। আসলে চাকরির শর্তটা এই রকমের। আসলে যারাই আসবে সেই বিরাট অফিস বাড়িটাকে, যেখানে রমা কাচের ঘরে বসে থাকে, সবার সঙ্গে সামান্য হেসে কথা বললে লোকগুলির মনের ভেতর এক সুন্দর জগৎ তৈরি হয়ে যায়, জটিল সব লেন—দেন অফিসের দোরগোড়ায় এসেই সহজ সরল হয়ে যায়। আসলে মেয়েটা তার গৌরব। অফিসবাড়ির অনেক কূটতর্ক ওর হাসিতে জলের দামে বিকোয়।

এ—সব কারণেই তিনি দ্বিধা এবং সংশয়ে ভুগছেন। কিছু স্থির করতে পারছেন না। বরং নিবেদিত যৌবন রমার—এমনই তিনি ভাবেন। তিনি মাঝে মাঝে ভাবেন, তারপর কী হবে!

তারপর কী হবে কেউ জানে না।

অরুণ নিজেও জানে না তারপর কী হবে।

আর রমাও বসে থাকে না তারপর কী হবে ভেবে। সে বরং অরুণ আছে বলেই তার সঙ্গে কিছুটা তারপর কী আছে জীবনে বুঝতে পারে। আর অফিস বস যেহেতু অরুণের আপন মামা, কেউ আর রমাকে ঘাঁটাতে চায় না। বরং অরুণ হাতে ধরে নিয়ে এসেছিল বলে, অরুণের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখে ফেললে, কেউ চটে যেতে পারে না। অরুণের কোনো আত্মীয় হবে। একবার তো জীবনবাবুই দেখেছিল, স্কুটারে একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলজ্বল করছে। যে—কোনো সময় দাউ দাউ করে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করতে সাহস পাননি। অরুণবাবুর স্ত্রী যখন যুবতী এবং লাবণ্যময়ী, স্ত্রীর চোখেই দৃশ্যটা পড়বে একদিন। তখন যা হবার হবে। মজা দেখার মতো অন্তত জীবনবাবুর এই জীবনে একটা ঘটনা ঘটে যাবে। সেই আশাতেই তিনি লেজারে কেবল যোগ করে যাচ্ছেন। বিয়োগ করছেন না।

তিন

বিকেল মরে আসছে। গাছপালা থেকে রোদ ক্রমে সরে যাচ্ছিল। পার্কের বড় পুকুরে একদল মানুষ ডুবছে ভাসছে। কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে বুড়ো মানুষের জটলা। তারা সবাই মুখোমুখি বসে। কী কথা বলছে নানু শুনতে পাচ্ছে না। সে বলেছিল একটা বেঞ্চিতে। মাথায় কাকেরা উড়ছে। শিরিষের লম্বা একটা ডাল নেমে এসেছে তার মাথার ওপর। ও—পাশটায় কিছু ছেলের পায়ে একটা লাল বল। এবং যেখানে যেমন সুবিধা জোড়ায় জোড়ায় যুবক যুবতী। তার মনে হল বাবা মাকে নিয়ে বিশ বছর আগে এমনি কোনো নিরিবিলি জায়গায় বসত। তারপর তাদের বিয়ে হয়েছিল। স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেলে, সে সব দেখতে পায়। জীবনের প্রথম কোনো স্মৃতি তার পেছনে, আরও পেছনে যেতে যেতে মনে হয় তার, সে সেই যখন মাতৃজঠরে অথবা তারও আগে শরীরের রক্ত কণিকার সামান্য ডি এন এ—তার আরও আগে যখন অপার্থিব কিছু মনের মধ্যে পাখা বিস্তার করতে থাকে, তখন তার মনে হয় সে সুদূর অতীতে চলে গেছে। সেখানে একজন বুড়ো মানুষ চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, হাত ধরে আছে এক ছোট্ট শিশু—সাদা কেডস জুতো পায় লাফিয়ে লাফিয়ে এটা কী ওটা কী বলছে। এমন কেন মনে হয়, কিংবা কোনো গাছপালা মাঠ পার হয়ে তার নীল কুটির—পাশে একটা বড় দীঘি তাতে অজস্র পদ্মফুল ফুটে আছে। কিছু পদ্মফুল আর এক যুবতীকে সে দেখতে পায়—স্নান করায় শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছবির মতো স্পষ্ট। আকাশটা সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো মানুষগুলো আরও ঘন হয়ে বসেছে। সে তাদের একটা কথাও শুনতে পাচ্ছে না। সে নড়ে চড়ে বসল। তারপর উঠে দাঁড়াল। হেঁটে গেল কিছুটা। পায়চারি করার মতো। সে পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। বুড়ো মানুষদের—মুখগুলি আবছা—যেন মৃত্যুর কাছাকাছি এই মানুষগুলি। আজ শেষ কিছু সত্য কথা বলার জন্য এক ঠাঁই হয়েছে। সে কাছে গেল। আর মনে হল একটা বুড়োও আর কথা বলছে না। এরা যেন সব বুড়ো মানুষের ডামি! এরা পরস্পরের দিকে ভারি সংশয়ের চোখে তাকিয়ে আছে। নানু বুঝতে পারল সব বুড়োরাই তাকে দেখে আর একটাও কথা বলছে না; তার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল—এবং এটা হয়েছে—সেইদিন থেকে—যেদিন মেসো এবং মাকে ভয়ংকর একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থায় দেখে চোখ তার জ্বলে উঠেছিল, পায়ের রক্ত ঝা করে মাথায় উঠে গিয়েছিল—হাতে কিছু একটা থাকলে কী করত বলা যায় না—বুড়ো মানুষরাও কী সেটা টের পায়। মার ঠোঁটে লাল রঙের লিপস্টিক, মা সিল্কের শাড়ি পরতে ভালোবাসে। মা, তার মা বাবার কোনো স্মৃতিই আজ শরীরে ধরে রাখেনি। সে বাবার একটি ছবি বুকের মধ্যে রেখে দিয়েছে। সে ছবিটাও ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

সে আবার এসে বেঞ্চিটাতে বসল। বেশ বাতাস দিচ্ছে! গরমকাল। গতকাল সন্ধ্যায় ঝড় হয়ে গেছে শহরে। বৃষ্টিপাত হয়েছে। এখন এই বিকেলে ঠান্ডা বাতাসে শরীরে ঘেমো গন্ধ নেই। তার চুল বড়, তার চোখে হাই পাওয়ারের চশমা এবং মাঝে মাঝে মানুষের মুখ সেই চশমার ভেতর কঠিন রুক্ষ এবং ইতরের

মতো দেখায়। অবনীশ নামে একটা লোকের চোখ চশমার কাচে ধরা পড়লেই সে বুঝতে পারে—লোকটা এখন পেছনে হেঁটে যাচ্ছে। তাকে দেখলেই পায়ে পায়ে পেছনে হেঁটে সরে যেতে থাকে।

আজ একবার অবশ্য সে গিয়েছিল মানুর কাছে। এখানে আসার পর কেন জানি কলেজে এই মানুকে ভারি ভালো লেগেছিল। গিয়ে দেখেছে মানু বাড়ি নেই। বাড়ি থাকলে সে এখানে হয়তো আসতই না। অথচ মাথার ভিতরে যে কখন কী হয়ে যায়। মাঝে মাঝেই মনে হয়, হত্যাকারী কে, একবার তদন্ত করে দেখলে হয়। আবার কখনও মনে হয় সে কিছুই আর ফিরে পাবে না। মানুষ যা হারায় সে আর তা ফিরে পায় না।

আর তখনই নানু দেখল, পায়ের কাছে একটা লাল বল। ছোট ছোট শিশুরা সেই লাল বল পায়ের কাছ থেকে তুলে নিয়ে গেল। মাথার ভিতর সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের নানা স্মৃতি ভেসে ওঠে। একটা লাল বল জেঠু হাতে দিয়ে বলেছিলেন কবে যেন, এটা তোমার। সেই লাল বলটা সে হারিয়েছে। তখনই নানুর কান্না পায়। বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এক আশ্চর্য নিঃসঙ্গতায় সে ডুবে যেতে থাকে। মনে করতে পারে না তখন, কেন এই পার্কটায় সে এসে বসে থাকে। সেই দুপুর থেকে এখানে—একা। কলেজ যাবার নাম করে সোজা চলে এসেছে এখানে—এবং এসেই মনে হয়েছে, খুব অসময়ে এসে গেছে। সুনীল কাকা এখন অফিসে। তাঁকে পাওয়া যাবে না। সন্ধ্যা না হলে বাড়িতে সে ফিরবে না। অকারণ আগে থেকে গিয়ে দরজায় খুট খুট করে লাভ নেই। অথচ সে সারাটা বিকেল আসল কথাটা একবারও মনে করতে পারেনি। স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা চালিয়েছিল আজ। ওর মনে হয়েছিল এই পার্কটায় সে শৈশবে এসেছে। দৌড়ে বেড়িয়েছে। লাল বল নিয়ে খেলা করছে। অবনীশ নামক এক অবিবাহিত যুবক ছিল তার বন্ধুর মতো—যা সে চেয়েছিল, তা যত দুর্লভই হোক এনে দিয়েছে। এখন মানুষটাকে বললে কেমন হয়, তুমি তো আমার শৈশবে সব দুর্লভ বস্তু সংগ্রহের জন্য প্রাণপাত করেছ, এখন এনে দিতে পারো না বাবার একটা ছবি। তোমার বউ তোমার মেয়ে আমাদের সব বন্ধুত্ব মুছে দিল। তুমি ভুলে গেলে আমার সামান্য অসুখে তোমার চোখে ঘুম থাকত না। তোমরা এখন এত স্বার্থপর হয়ে গেছ।

সে উঠে দাঁড়াল। একা বসে থাকলে হিজিবিজি চিন্তা মাথায় ঝপাৎ করে ঢুকে যায়।

সে হাঁটছিল পার্কের এখানে সেখানে। আলোর ডুম জোনাকির মতো স্থির হয়ে আছে। পার্কটা শেষ হলে একটা কাঁটাতারের বেড়া এবং গেট। সে গেট পার হয়ে ডান দিকে দেখল, দুজন মাঝবয়সি লোক অন্ধকার রাস্তাটায় হেঁটে যাচ্ছে। পাশে গাছপালা নিবিড় এবং কেমন এক অরণ্যের গন্ধ। কোনো মেয়ে খিল খিল করে হাসছে। তার মনে হল, সে কতদিন হাসে না। সেই ভয়ংকর দৃশ্যটা তার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। তার মা, মা না ভদ্রমহিলা, না পড়ন্ত বয়সের যুবতী মাকে কেন সে যে আর কতদিন থেকে মার মতো ভাবতে পারে না, আর তার তখনও একটা ভীষণ কষ্ট হয়—ষড়যন্ত্র করে শেষ পর্যন্ত এই শহরটায় তার নির্বাসন হয়েছে। এবং তখনই মনে হল, সামনে সেই বাড়িটা। সে খুট খুট করে দরজায় কড়া নাড়বে ভাবল, কিন্তু পাশের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। কোনো বনভূমির জ্যোৎস্নার মতো চোখ তুলে তাকে দেখছে।

সে বলল, এটা সুনীল বসুর বাড়ি?

হ্যাঁ।

তিনি আছেন?

এখনও ফেরেননি।

সে আবার সিঁড়ি থেকে নেমে এল। আর একটু ঘুরে আবার আসবে ভাবল। তখনই সেই তরুণী, তাকে বলল, বসুন, বাবা এক্ষুণি এসে যাবে, বলে দরজা খুলে দিল। দরজায় আরও দুটি সুন্দর শিশুর মুখ—তারাও তাকে দেখছে। নবনীতার কেউ হয়। ছোট ভাইবোন থাকলে মেয়েরা আরও সুন্দর হয়ে যায় নবনীতাকে দেখে এটাও টের পেল নানু।

নানুর চোখ এখন অন্য দিকে। সে দেয়াল দেখতে দেখতে ঘরে ঢুকে গেল। চোখে মুখে অতীব এক উদাসীনতা। সে যেন ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছে। তার কিছু জরুরি কাজটাজ আছে, অন্তত বসার

ভঙ্গি দেখে তা বোঝা গেল না। বরং মনে হচ্ছিল, নানু শেষ পর্যন্ত সঠিক জায়গার খোঁজ পেয়ে গেছে। অথবা বহু দূরের পথ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে। কোথাও আর যাবার কথা নেই, কোথাও আর ফেরার কথাও নেই। সে বসেই জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, এক গ্লাস জল দেবেন? খাব। কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে চোখ তুলে তাকাতেই বুঝল মেয়েটি ঘরে নেই।

এবার সে কেন জানি কিছুটা স্বস্তি বোধ করল।

বসার ঘরটা সে দেখছে। ঠিক আগের মতো নেই। নতুন চুনকামের গন্ধ। সামনে সেন্টার টেবিল। দু'দিকে দুটো লম্বা সোফা, একটা বেতের চেয়ার নীল রঙের, একটা টেলিভিশন সেট, দেয়ালের র‍্যাকে অনেক বই, গ্রন্থাবলী নতুন নতুন, একটা মাটির ঘোড়া এক কোণায়—খুব ছিমছাম, নীল রঙের পর্দায় লেসের কাজ। সে এবার মনে করার চেষ্টা করল, প্রথম যেদিন অবনীশের সঙ্গে এখানে এসেছিল—তখন ঘরটায় এ—সব ছিল কিনা! অনেক কিছুই ছিল না। অথবা আগে যা ছিল এখন আর কিছু নেই।

কেবল মনে হল সুনীলকাকার মেয়ে নবনীতা কুট করে তার হাত কামড়ে দিয়েছিল।

নানু সব স্পষ্ট মনে করতে পারছে। স্মৃতির এই খেলায় একমাত্র সে দেখেছে কখনও হেরে যায় না। যে দরজা খুলে দিয়েছিল, তার মুখ সে দেখেনি। আর দেখার সময়ও নয় এটা। তার এখন কত সব জরুরি কাজ, কারণ, সুনীলকাকা আর বাবা একসঙ্গে এক সময় এক অফিসে কাজ করত। সুনীলকাকা বাবার অধীনে কাজ করত এবং খুবই সমীহ করত বাবাকে। মেয়েটা কুট করে কামড়ে দিয়েছিল বলে, কাকা নবনীতাকে সেদিন মারবে বলে শাসিয়েছিল। তার সবই মনে পড়ছে।

সে ভীষণ একটা জরুরি কাজে এসেছে। এসেই তার নানারকম চিন্তা—ভাবনা—কীভাবে যে আরম্ভ করবে কথাটা? কারণ, সাত আট বছর আগেকার কথা সুনীল কাকা ভুলেও যেতে পারে। তবু সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একের পর এক জেরা করে যাবে। প্রথম প্রশ্নটা সে কী করবে ভাবল। যেমন এলে পরে পায়ে টুক করে একটা প্রণাম ঠুকতে হবে। প্রণাম ঠুকলে সে দেখেছে, গুরুজনেরা খুব সদাশয় হয়ে যান। প্রণাম ঠুকে কাজ উদ্ধার করা খুব সহজ হবে ভাবল। তারপর পরিচয় দেবে। সে এখন যাদবপুরের দিকে আছে বলবে। মার কথা জানতে চাইলে বলবে, ভালো আছে, আসলে ভালো নেই বললে নানারকম সংশয় দেখা দেবে।

সে এক গ্লাস জল চেয়েছিল, কেউ নেই, অথচ জল খেতে হবে। সে এবার ঘড়ি দেখল। সাতটা বেজে গেছে। তার বাড়িফেরার কথা চারটের মধ্যে—দাদু বারান্দায় পায়চারি শুরু করে দিয়েছেন। বারান্দায় বুড়ো মানুষটার মুখ বড়ই দুঃখী। বুড়ো মানুষটার বড় আশ্রয় ছিল একটা—যা হোক নানু অন্তত জানে না, তার বাবা আত্মহত্যা করেছে। এখন আর তার সেই আশ্রয়টুকুও নেই। তখনই মনে হল কেউ ঢুকছে বাড়িতে। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে কেউ এ—বাড়িতে উঠে আসছে।

সে দরজার কাছে সরে দাঁড়াতেই দেখল, তিনি ঢুকছেন। হাতে ব্রিফকেস। কালো প্যান্ট পরা, সাদা শার্ট এবং কালো রঙের কোট। মাথার সামনেটায় কিছু কাঁচা—পাকা চুল। আগে গোঁফ রাখতেন, এখন মসৃণ মুখ। সে টুক করে প্রণাম করতেই সুনীলকাকা সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'আরে থাক থাক।' আজকালকার উঠতি বয়সের ছেলেরা এতটা বিনয়ী হয়, সুনীলকাকার বোধহয় জানা ছিল না। ভালো করে মুখটা দেখছিল নানুর। নানু ভাবছে দেখি চিনতে পারে কী না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, তুমি প্রীতিশদার ছেলে?

যাক মনে রেখেছে। সে বলল, হ্যাঁ।

কত বড় হয়ে গেছ।

সে কিছু বলল না।

বোস। তারপরই হাঁক দিল, নবনীতা দেখ কে এসেছে। তোমার মাকে ডাক। সুনীলকাকা গলার টাই আলগা করে প্যান্ট টেনে বসে পড়ল। বলল, কতক্ষণ?

সে বলতে পারত, অনেকক্ষণ। সেই দুপুরে বের হয়েছে। এখন বাজে সাতটা। সে তার কিছু না বলে বলল, এই মাত্র।

তোমরা সবাই ভালো আছ?

ভালো নেই বলতে পারত, সেটা ঠিক হবে না ভেবে বলল—ভালো। সবাই ভালো।

বউদি একটা কী কাজ নিয়েছে শুনলাম।

ঠিকই শুনেছেন। গলাটা আবার শুকনো লাগছে নানুর। সে বলল, এক গ্লাস জল। খুব তেষ্টা পেয়েছে।

আরতি এক গ্লাস জল।

আরতি এ—বাড়ির কাজের মেয়ে। এক ডাকেই হাজির। জল রেখে গেল। কিন্তু নবনীতা অথবা আর কেউ এল না। এখন তার মনে পড়েছে, কাকিমার ঠোঁটের নীচে একটা বড় তিল আছে। মুখটা মনে নেই—তিলটার কথা মনে আছে।

তখন সুনীলকাকা বলল, তুমি বস, আমি আসছি।

সুনীলকাকা ভিতরে ঢুকে গেল। এবং পরক্ষণেই নাটকের পাত্র—পাত্রীরা যেভাবে মঞ্চে ঢোকে—ঠিক সেভাবে প্রথমে কাকিমা, পরে নবনীতা। সে ভালো ছেলের মতো কাকিমাকেও টুক করে প্রণাম করে ফেলল। তার যা কাজ তাতে খুব ঘনিষ্ঠতার দরকার হবে। যেন সে এ—বাড়িরই ছেলে।

সুনীলকাকার স্ত্রীর নামটা সে মনে করার চেষ্টা করল। না, পারছে না। আপাতত এটার খুব প্রয়োজন নেই। তবু কেন যে মাথার মধ্যে কারা টরেটককা বাজায়—বাজাবার সময় সে শুনতে পেল, তুমি বড় হয়ে গেছ। নবনীতা, তোর নানুকে মনে পড়ে?

নবনীতা বলল, আমাদের বাড়ি খুব আসতে তুমি?

খুব মিথ্যে কথা। সে সুনীলকাকার বাড়িতে কখনও—সখনও বাবার সঙ্গে অথবা বাবার দাদার সঙ্গে আসত। খুব বেশি না। যাতায়াতের পথে বাড়িটা ছিল বলে মাঝে মাঝেই দেখা হয়ে যেত। এবং নবনীতার একটা ডল পুতুল ছিল। ভেতরটা ফাঁকা। তাতে নবনীতা চকলেট ভরে রাখত। মাথায় টুপি ছিল পুতুলটার।

তখনই নবনীতা বলল, চিনে আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি? কত দিন পর!

নানু হেসে দিল। বলতে পারত, তুমি মেয়ে কথা না খুঁজে পেয়ে যা ইচ্ছে বলে যাচ্ছ। শৈশবের কথা কেউ ভুলে যায়! কেউ পারে ভুলতে।

সে বলল, দোতলায় নতুন ঘর হয়েছে দেখছি।

নবনীতা লম্বা ফ্রক পরেছে। ফাঁপানো চুল ঘাড় পর্যন্ত। এবং ডিমের মতো মসৃণ মুখ। যেন এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে আসছে। আড় চোখে সে নানুকে দেখছে সেটাও সে টের পেল। যুবতী হবার মুখে এই মেয়ের চোখ টল টল করছে।

নবনীতার মা বলল, তুমি দেখনি ঘরটা?

আমাদের সময়ে ছিল না।

সহসা নবনীতা বলল, এত ঘামছেন কেন নানুদা?

নানু সত্যি ঘামছিল। নবনীতা উঠে পাখা ফুল স্পিডে চালিয়ে দিয়ে আবার বসল। তার কথাবার্তায় কোনো সংকোচ ছিল না। নানু যেন কিছুই লক্ষ্য করছে না, এমনকি নবনীতাকেও দেখছে না,—কেউ বসে আছে সামনে তাও তার যেন খেয়াল নেই—এমন চোখমুখ করে রেখেছে। অধিকাংশ সময় সে মুখ না তুলেই কথা বলছিল। সে একটি ভালো ছেলের মুখোশ পরে আছে এখন। এই যে কাকিমা, মারই বয়সি—শরীরে যৌবন ধরে রাখার কী প্রাণান্তকর চেষ্টা তার। কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল মা আর মেয়ে যেন দু বোন। একবার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, আচ্ছা কাকিমা, আপনার আর কেউ আছে? কাকা মরে গেলে কারও সঙ্গে প্রেম করতে পারেন। তারপরই তার মনে হল প্রীতিশ নামক যুবক পাশের গলিটা পার হয়ে বড় একতলা বাড়ির নীচে আজ থেকে আট বছর আগে আত্মহত্যা করেছিল। সে এখানে জানতে এসেছে তার বাবা কেন আত্মহত্যা করলেন।

তখন কাকিমা বলল, তোমার বাবা বড় ভালোমানুষ ছিলেন।

সে বলল, ভালোমানুষ ছিলেন বুঝি! তারপর বলার ইচ্ছে হয়েছিল, আপনি জানলেন কী করে! বাবা ভালোমানুষ কী খারাপ মানুষ সেটা তো আমার মা—ই একমাত্র বলতে পারে। আপনি কি...।

তখনই কাকিমা বলল, তোমার বাবাকে মনে পড়ে? তখন তো তুমি খুবই ছোট ছিলে।

সে কী ভেবে বলল, না। তারপর কেমন অতলে ডুবে যাচ্ছিল। কীভাবে যে বলবে, আমার বাবা আত্মহত্যা করেছিল কেন জানেন—কিন্তু বলতে পারল না।

নবনীতার মনে হল মার যে কী স্বভাব! নানুদাকে এ—সময় তার বাবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে কী লাভ। কেমন দুঃখী মুখ এবং কাতর দেখাচ্ছে। সে বলল, নানুদা শোলে দেখেছ?

নানু যেন শুনতেই পায়নি। সে দুজনের দিকে তাকিয়েই যেন প্রশ্ন করল, বাবার ছবি আছে এ বাড়িতে?

ছবি। দাঁড়াও। হ্যাঁরে নবি, প্রীতিশকাকার কোনো ছবি আছে? অ্যালবাম খুলে দেখবি।

নবনীতা বলল, না নেই।

নানু কেমন শক্ত গলায় বলল, থাকতেও তো পারে। খুঁজে দেখ না।

তখন সুনীলকাকা বেশ সাফসোফ হয়ে বসার ঘরে ঢুকে গেল। লম্বা পাজামা পাঞ্জাবি পরেছে। স্নান করায় শরীরে দামি সাবানের গন্ধ। মুখে পাইপ। বেশ কম বয়সে সুনীলকাকা খুব উঁচুতে উঠে গেছে। প্রায় আত্মস্থ এক মানুষ, সুখী এবং জীবনে যা যা দরকার সবই হাতের নাগালে। অনেকদিন পর তার বসের ছেলে এই বাড়িতে—সে কেমন আছে এটা দেখুক—এমনই স্মিত হাসিতে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমাদের ডিস্টার্ব করলাম না তো।

নানু এখন কিছুই শুনতে চায় না। সে আরও শক্ত হয়ে গেল। বলল, সুনীলকাকা, তোমার কাছে বাবার ফোটো আছে?

সুনীল কথাটার খুব গুরুত্ব দিতে চাইল না।—আছে বোধ হয় দেখতে হবে।

নানু বলল, এখন একবার দেখবে। বাবার একটা ফোটো আমার খুব দরকার।

কেন বাড়িতে নেই?

না।

সে কী! নবনীতা প্রায় চিৎকার করে উঠল।—বাড়িতে বাবার ছবি থাকে না সে কী করে হয়!

কখন যে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে এদিকটায়। সামান্য ঝড়ও। নানুর ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেছে। রাস্তাটা এদিকের কতদিন মেরামত হয়নি। হবে কী না কেউ বলতেও পারে না। উঁচু নিচু খানাখন্দ—কোথাও বসে গেছে অনেকটা। ইঁট বের হয়ে পড়েছে—ফলে নানু যতটা দ্রুত হেঁটে রাস্তা অতিক্রম করবে ভেবেছিল, ঠিক ততটা জোরে হাঁটতে পারছে না। পা উঁচু নিচুতে পড়ে যে—কোনো সময় মচকাতে পারে। সে ঘড়িতে দেখল এগারোটা বেজে গেছে।

সুনীলকাকার বাড়ি থেকে বের হয়ে—সোজা রাস্তায় দাঁড়িয়ে জানালায় কারও মুখ দেখার চেষ্টা করছিল নানু। তাদের বাড়িটাতে অন্য কেউ থাকে এখন। বাবার মতো সেই মানুষটা সকাল সন্ধ্যায় এসে জানালায় হয়তো দাঁড়ায়। সে খুব বায়না করলে—বাবা কখনও ওকেও তুলে দাঁড় করিয়ে দিতেন জানালায়। তার মনে হয়েছিল, কেউ তেমন এখনও এসে এই জানালাটায় দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িতে তার মতো কেউ হয়তো জেদ ধরলে জানালাটায় তুলে দেওয়া হয়। সেই ঘরটা এবং জানালাটা তাকে ভীষণভাবে কেমন এক আকর্ষণে ফেলে দিয়েছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে কুজনে মন্দ কথা ভাবতে পারে—সেজন্য নানু, কিছুক্ষণ পার্কের বেঞ্চিতে বসে থেকে আবার রাস্তাটায় গেছে—জানালাটার কাছে গেছে। ঘণ্টাখানেক এরকম টানাপোড়েনের মধ্যে সহসা মনে হয়েছিল রেলিং—এ কেউ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে—তার যাওয়া আসা লক্ষ্য করছে। ফলে সে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। এসব কারণে ফিরতে তার এত রাত। কাল একবার নবনীতাকে গিয়ে সে বলবে, আমাদের আগের বাসাটায় এখন কে থাকে? ওখানে যাব। তুমি আমাকে নিয়ে চল।

তারপরই মনে হয়েছে নবনীতাদের সঙ্গে আলাপ নাও থাকতে পারে। নবনীতা নাও যেতে পারে। নবনীতা না গেলে, বাড়িটায় তার যাওয়া মুশকিল। সোজাসুজি যদি চলে যায়, গিয়ে বলে এ—ঘরটাতেই আমার বাবা মা থাকতেন, এ—ঘরটাতেই আমি অনেকদিন থেকেছি—ওই রেলিংটা দেখছেন, সেখানে থাকত আমার কাঠের ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে বসে আমি দোল খেতাম। আমার বারবারই এখানে চলে আসতে ইচ্ছে করে।

রাস্তার অন্ধকারে নানু ফিরছে। পাশাপাশি বাড়িগুলোতেও কেউ জেগে নেই, কেবল দোতলায় রেলিং—এ দাদু এক অতিকায় জড়দগবের মতো। সে একটা ক্যালভার্ট পার হয়ে বাড়িটার গেটের কাছে ঢুকে গেল। দাদু ঝুঁকে অন্ধকারে কিছু আঁচ করলেন, তারপর নিঃশব্দে নেমে আসতে থাকলেন। নীচের একটা আলো জ্বেলে দিলেন তিনি। নিঃশব্দে লোহার গেট খুলে দিলেন। নানুর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে সোজা সিঁড়ি ধরে উঠে গেল। ছোট মাসি এবং দিদিমা শুয়ে পড়েছে। এদিকের ঘরবাড়ি মাঠ গাছপালা এখন কেমন নিশুতি রাতের মতো।

নানু এখন চায় চুপচাপ শুয়ে পড়তে। তার খেতে পর্যন্ত ভালো লাগছে না। বাবার মুখটা কেমন, বাবার মুখ, সেই হিজিবিজি আঁকা মানুষের ছবির মতো, কোনো একটা ছবি—সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে যেন ভেসে যায়। সে কেমন অসহায় বোধ করতে থাকল। মনে হয় তার শেষ অবলম্বনও চলে যাচ্ছে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য তার দরকার বাবার পাশাপাশি থাকা। তিনিও কেমন স্মৃতি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছেন।

এইসব ইচ্ছের কথা মাঝে মাঝে আর কাউকে বলতে পারলে ভালো লাগত। অথচ সে দাদুর বাড়ি চলে আসার পর এমন কাউকে পেল না যাকে বলতে পারে, জানো আমার বাবা কুড়িটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে মারা গেছেন। জানো আমার মা আর আমাকে আগের মতো ভালোবাসে না। তার কোনো টান নেই—সংসারে আমি বড় একা। মাঝে মাঝে এও মনে হয় সে তার একমাত্র কাছের মানুষ মানুকে বলতে পারে। সে তার আগের জীবনের অনেক কথাই মানুকে বলেছে। ক্লাসের অফ পিরিয়ডে ওরা লাইব্রেরির মাঠে চলে গেছে এবং কত কথা—কিন্তু মানুষের সংগোপনে এমন কিছু কথা থাকে যা বুঝি কাউকে বলা যায় না। এই যে সে হত্যাকারীর খোঁজে বের হয়েছিল, মানুর সঙ্গে দেখা হলে হয়তো তার সে ইচ্ছাটা এত প্রবল হত না আজ।

দাদু ঘরে এসে বলল, চল খাবি।

নানু বলল, চল।

নীচের তলায় সে ভেবেছিল সবাই শুয়ে পড়েছে। এখন দেখছে সবাই জেগে! দাদু, দিদিমা, মাসি এবং সে। টেবিলে বসে সবাই একসঙ্গে খাবে। রান্নার মেয়েটা টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছিল আগেই—ওরা বসলে ঢাকনা খুলে দিল, প্লেট সাজিয়ে গেল। হাতে মুখে জল দেওয়ায় নানুর চোখ মুখ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল।

দাদুর দিকে তাকিয়ে নানু বলল, তোমরা খেয়ে নিলেই পারতে।

দিদিমা বলল, তুমি না এলে খাই কী করে?

ছোট মাসি বলল, তুই কোথায় গেছিলি? এত কী কাজ! দিদিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব। তুই আমাদের খুব জ্বালাচ্ছিস।

নানু খুব স্পষ্ট গলায় বলল, বাবার ফোটোর খোঁজে গেছিলাম।

কোথায়? দাদু উঠে দাঁড়ালেন।

তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন দাদু?

না, মানে তুই ফোটো খুঁজতে কোথায় গেছিলি? ফোটো তো বাড়িতেই অনেক আছে। কত লাগবে?

কোথায়? তোমরা তো এতদিন বলেছ, ফোটো নেই।

তখন তুমি ছোট ছিলে, বাবার কথা মনে হলেই কষ্ট পাবে ভেবে তুলে রাখা হয়েছিল।

নানু বলল, অঃ। তারপর আর কিছু বলল না। তার মনে পড়ল, সেই অনেক আগে একবার বাবার ফোটো চেয়ে পায়নি। কোথাও পায়নি। তার মনে হয়েছিল, কোথাও নেই—বাবার ছবিটা বাড়িতে ভারি বিপজ্জনক।

নানু এখন বড় হয়ে গেছে। নানু এখন বাবার সেই স্মৃতি বুকে বয়ে বেড়ায় না। সহজেই দেওয়া যেতে পারে ভেবেই হয়তো দাদু সেই স্মৃতি স্বীকার করলেন, আছে। তিনি দেবেন।

নানু খেয়ে উঠে ওপরে চলে গেল। সে এখন আর মনে করতে পারছে না, কেন সে সুনীল কাকার বাড়ি গিয়েছিল। ফোটোর জন্য না অন্য কিছু জানতে—আসলে কী সে মনের মধ্যে একটা তুমুল প্রতিহিংসার ঝড় নিয়ে বড় হচ্ছে। যার জন্য মাঝে মাঝেই মনে হয়, সে একটা কিছু ঠিক করবে। সেটা কী। সেটা কী কোনো শূন্যতা, জীবনে বিশ্বাসের অভাব। না অন্য কিছু!

তারপরই সে দরজা বন্ধ করে দিল। সে চিৎকার করে বলল, আমার কোনো পরিচয় নেই—আমি বাস্টার্ড। আমার মাকেই আমি পৃথিবীতে একমাত্র চিনি, চিনতে পারি, বলতে পারি তিনি আমার মা, তিনিও আমার প্রতি বিরূপ। কাছে রাখতে ভয় পেয়েছেন। 'জননী আমার ধাত্রী আমার'—কবিতার লাইন সে বলে গেল, জননীগো—তুমি আমায় এক আশ্চর্য শূন্যতায় ভাসিয়ে দিলে? নানু শেষে কী ভেবে হেসে দিল, বলল, ধেড়ে খোকা, ধাতস্থ হও। সংসারে কেউ কারও নয়। ভেউ ভেউ করে এত কাঁদছ কেন? সে জানালা খুলে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করল।

তখনই নানু দেখল বনভূমিতে জ্যোৎস্না। অপার্থিব এক ঈশ্বরের পৃথিবী সামনে। জ্যোৎস্নায় যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সহসা তার নবনীতার কথা মনে পড়ে গেল। ন—ব—নী—তা বলে সে টেনে টেনে দেখল কতটা লম্বা করে কথাটা বলা যায়।

নবনীতা বলেছিল, শোলে দেখেছেন? কতদিন সে কোনো সিনেমা দেখেনি। সেই বিতকিচ্ছিরি ঘটনাটা দেখার পর থেকেই সে গুম মেরে গিয়েছিল। মা অর্থাৎ শ্রীমতী রানু মানে রানুবালা, তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায় না। নানুর মনে হয়েছিল শ্রীমতী রানুবালার এটা কলঙ্ক। কলঙ্ক মাথায় করে শেষ পর্যন্ত রানুবালা কতদিন বাঁচবে, না মরে যাবে। একদিন রানুবালাকে কাঁদতে দেখে তার মুখ কুঁচকে গেছিল। সে বলেছিল, লোকটা এ—বাড়িতে এলে অনর্থ ঘটবে।

রানু চিৎকার করে উঠেছিল, তুই কী বলতে চাস?

সেই উল্লুকের বাচ্চা এখানে আসবে না। এলেই খুন করব।

কী বলতে চাস তুই!

খুন করব বললাম। দরকার হলে তোমাকেও।

রানুবালার মুখ ভীষণ শুকিয়ে গেছিল। ক'দিন থেকে গুম মেরে আছে নানু। মনীশদার সঙ্গে সেদিন খারাপ ব্যবহার করেছে। নানু কী সব টের পেয়ে গেছে....

রানুবালা তারপর ঘরের সেই জায়গাটা বাইরের কোনো ফুটো দিয়ে দেখা যায় কিনা, তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। খুঁজতে গিয়েই মনে হয়েছে, ছেলে তার বড় হয়ে গেছে। আর একসঙ্গে থাকা যায় না। বাবাকে লিখেছে নানুকে পাঠিয়ে দেব। এখানে পড়াশোনা একদম করে না। দিনকে দিন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কতক্ষণ নানু জানালায় দাঁড়িয়ে আছে, টের পায়নি। মানুষের যে কী হয়! আজ সকালে এক রকম, বিকেলে এক রকম। সন্ধ্যায় সে যা ছিল, এখন আর তা নেই। আকাশ এবং এই পরিব্যাপ্ত জীবনে কী আছে কী নেই সে এখনও জানে না। তবু এক সুদূর থেকে মাঝে মাঝে এই পৃথিবীতে কেউ টরেটক্কা শব্দ পাঠায়। নানু আজ প্রথমে বুঝতে পারছে, সে তার বাবার জন্য কিছুই করতে পারে না। কারণ বনভূমিতে আজ সন্ধ্যায় জীবনে প্রথম জ্যোৎস্না দেখেছে।

ঘুমোবার আগে সে বিছানায় চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম। সে আলো নিভিয়ে দিল তারপর। শুয়ে কপালে হাত রাখল। এবং চোখে সেই লাবণ্যভরা মুখ। নবনীতা ভারি বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়েছিল। ক্রমে সেই চোখ নরম হতে হতে এক সময় ভারি অন্তরঙ্গ হয়ে গেলে, নবনীতা চোখ নামিয়ে নেয়। পৃথিবীতে সে এমন সুন্দর লজ্জার চোখ কেউ নামিয়ে নিয়েছে,

জীবনে দেখেনি। সিনেমায় দেখেছে, বন্ধুদের কাছে সে গল্প শুনেছে, কিন্তু জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেনি। সে বলল, নবনীতা। সে বলল, ন....ব...নী....তা। সে বলল, ন...ব...নী...তা।

চার

আজও আবার রমাকে নিয়ে অরুণ বের হয়ে গেল। ভুবনবাবু কান পেতে শুনলেন স্কুটারের শব্দ। দূরে আরও মিলিয়ে যাচ্ছে। তাঁর এমন সুন্দর মেয়েটাকে নিয়ে একটা লোক মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায়। বুকের ভেতর কষ্টটা টের পান। অসহায় চোখ মুখ দেখলে মায়া হবার কথা। ভুবনবাবু কত কিছু আশা করেছিলেন। তাঁর সংসার খুব বড় নয়। ভানু যেবারে হল, তিনি চাকরি খোয়ালেন। রমা যেবারে হল, তিনি প্রমোশান পেলেন আর মানু যখন নীরজার পেটে, চাকরিতে জটিল অবস্থা। সংসারে মেয়েটাকেই বার বার মনে হয়েছে পয়া। মেয়েটার কপালে খুব সুখ থাকার কথা। এবং মনে মনে যা কিছু স্বস্তি সবই রমাকে কেন্দ্র করে। সেই মেয়েটা ক'মাসের মধ্যে কেমন হয়ে গেল। একটা লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে খারাপ দেখায়, এখন আর তেমন বলতেই সাহস পান না।

এবং সারাটা দিন অস্বস্তিতে কাটে। এই যে রমা বের হলে গেল, এবং কোথায় যাবে, যাবার সময় তো বলে গেল কোন এক অমলবাবুর বউভাত। কখন ফিরবে রমা? একবার খুব সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যা হোক রমা খুব একটা মুখ করেনি। ভালো মতই বলেছে, ফিরতে সন্ধ্যা হবে।

ফিরতে সন্ধ্যা হওয়ার ব্যাপারটা খুব ভয়ের নয়। কতদিন তো রমার ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। তিনি বারান্দায় পায়চারি করেন। রাস্তায় স্কুটারের শব্দ পেলেই বুঝতে পারেন, রমা এল। অরুণের স্কুটার অন্য দশটা স্কুটার থেকে যেন আলাদা। শব্দটা তাঁর ভারি চেনা। দশটা স্কুটারের ভেতর কোনটা অরুণের তিনি আজকাল ঠিক টের পান। ঘরের ভেতর বসে বুঝতে পারেন, মানু সদর খুলছে। ওরা এল।

অথবা স্ত্রীকে বলবেন, এত রাত করে যে ফিরছে, কিছু বল না কেন?

তুমিও তো বলতে পারো।

আমার কি শোভা পায়। তুমি মা। স্ত্রীজাতির কলঙ্কটা কী তা বোঝো। তুমি বললেই ভালো হয়। আমার পক্ষে বলা শোভা পায় না।

নীরজা যে কিছু বলেনি এমন নয়। কিন্তু রমা এমন গম্ভীর মুখে তখন চেয়ে থাকে যে তিনি সাহস পান না। রমা মাঝে মাঝে মাকে ভীতু দেখলে হেসে ফেলে।—আচ্ছা মা, আমি তো তোমার মেয়ে, তবে ভয় পাও কেন?

নীরজা ভিতরে আরও গুটিয়ে যায় তখন। রমা তো জানে না, ওর বয়সে তিনি খুব ভালো ছিলেন না। অথচ সব মায়েরাই তো এমন মুখ করে রাখে যে মনেই হয় না, যৌবনে কী একটা যেন হলে ভালো হয়, সব থেকেও কিছু একটা নেই, সব মায়েরাই যে সব বাচ্চাদের অজ্ঞাতে গোপনে কিছু করে ফেলতে পারে, রমা বুঝি তা জানে না। নীরজার চুলে পাক ধরেছে। বয়সানুযায়ী একটু বেশি পেকেছে। কপালে বড় সিঁদুরের ফোটা সতী—সাধ্বী করে রেখেছে। নীরজা বলতে পারত, আমাদের কালটা একটু অন্যরকমের ছিল। অতটা খোলামেলা ছিল না। তোমরা বড় খোলামেলা। ভয়টা সেজন্যই বেশি।

রমা মাকে জড়িয়ে বলত, আমাকে তুমি কী ভাবো মা?

নীরজা কিছু তখন বলতে পারত না। কারণ সংসারটা সত্যি আর আগের মতো নেই। জীবনধারণের জন্য কত কিছু আজকাল দরকার হয়। সাধাসিধে ভাবে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই আজকালের ছেলেমেয়েদের কাছে। যা আছে চারপাশে দেখে নাও, জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে। নীরজা আজকাল নিজের কাঙালপনাও মাঝে মাঝে টের পায়। মেয়েকে খুব বেশি একটা কিছু বলতে পারে না।

ভানু বাজারের থলে রেখেই বলল, মানদাকে বল চা করে দিতে। আমি বের হব।

কোথায় বের হবে সবাই জানে। নীরজা বলল, মানদা বাজারটা সাজিয়ে রাখ। দাদাবাবুকে চা করে দাও। ডিম ভেজে দাও টোস্টের সঙ্গে।

মানু গুনগুন করে তখন গান গাইছিল। মানু উবু হয়ে রেডিয়োর নব ঘোরাচ্ছে। ছুটির দিনে সকালেই বাড়িটা একে একে খালি হয়ে যায়। মানুবাবু এখনও ঘরে আছে দেখে ভানু বিস্মিত হল। গতকাল হেরে এসেছে। হেরে গেলে বাড়িতেই ঘাপটি মেরে বসে থাকে। কেউ ডাকলেও সাড়া দেয় না। মন ভালো নেই মানুর তবু একবার জিজ্ঞেস করল, অরুণ চলে গেছে?

দিদিকে নিয়ে চলে গেছে।

তোর কাজের কথা কিছু বলল?

না।

একবার জিজ্ঞেসা করলে পারতিস।

মানু কিছুতেই সেন্টারটা পাচ্ছে না। দাদার কথা খুব অবহেলা ভরে যেন শুনছে। বাড়ির ভেতর একটা জঘন্য ঘটনা ঘটছে দিনের পর দিন। অথচ সবাই চোখ বুজে আছে। কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। কেমন ব্যক্তিত্বহীন বাবা। দাদা স্বার্থপর হয়ে উঠছে। মানু একটা চাকরি পেলেই পড়াশোনা ছেড়ে দেবে। দাদাও নিজেরটা বুঝে নেবার জন্য আজকাল বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—সে কঠিন এবং রুক্ষ গলায় জবাব দেবে ভাবছিল আর তখনই বাবার কাশির শব্দটা বেয়াড়া রকমের। সে আর সাহসই পেল না কিছু বলতে। কেবল দাদার দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল।

তখন বোঝাই যায় দিদির এমন অসামাজিক আচরণে সবারই সায় আছে। অরুণ এলে তাদের সবাইকে খুব ভদ্র হয়ে যেতে হয়। যতটা নয় তার চেয়ে বেশি। যেমন বাবা দাদা মা সবাই তখন একটা সুন্দর মুখোশ পরে ফেলে। পবিত্র সব কথাবার্তা। যেন কোনো দেবদূত অরুণদা। দেবদূতরা তো শরীরের কিছু বোঝে না। মানু বন্ধুদের কাছে খুব গর্বের সঙ্গে বুকে টোকা মেরে আর কথা বলতেও পারে না। বিশেষ করে কলেজে নানুর সঙ্গে দেখা হলে মাথাটা তার নুয়ে আসে। নানু গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে। খুব সিরিয়াস জীবন সম্পর্কে। রাজনীতি নিয়ে কথা উঠলে নেতাদের সে চোর বাটপাড় ছাড়া ভাবে না। কী হয়ে গেল দিদিটা! আমরা কী হয়ে গেলাম!

দিদির আগের সুনাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বোঝাই যাচ্ছিল। সে তো নিজেও কম হাঁটাহাটি করছে না, সে যদি কোথাও চাকরি পেয়ে যেত, তবে, তবেই বা কী, দিদি কী এমন একটা রঙিন জগৎ থেকে নেমে এসে বলবে, খোকা, আমি ফের ভালো হয়ে গেছিরে।

মানু তখন শুনতে পাচ্ছে বড়দা শিস দিচ্ছে ঘরে। বড়দা ফিরবে প্রায় একটায়। বাড়ি থেকে সকালে বের হবার সময় শিস দিয়ে গান গায় দাদা। মানু দাদার এত উচ্ছ্বাস কেন টের পায়! ছুটির দিনে প্রিয়নাথ কাকার বাড়িতে সকালটা কাটিয়ে আসবে। মন্দাকিনী বউদি আজকাল খুব যত্ন করছে। প্রিয়নাথ কাকার বিধবা পুত্রবধূ মন্দাকিনী বউদি। গত অক্টোবরে রাঁচির কাছে কার অ্যাকসিডেন্টে দাদা মারা গেলেন। বাবা কি টের পায় সব। বাবা কি টের পেলেই কাশতে থাকে খক খক করে।

মানু সেন্টারটা কিছুতেই পেল না। জয়ার কাছে একবার যাবে। জয়া তো এখন পার্লারে বসে কবিতা লিখছে। কোথায় একটা কাগজে জয়ার কবিতা বের হয়। আজকাল গিয়ে কাছে বসে থাকলেও জয়া টের পায় না, একজন তরুণ যুবক ওর সামনে বসে আছে। সে কবিতা—টবিতা পড়তে ভালোবাসে না। বোঝেও না। বরং খেলার খবর যত আছে—কে কোন সালে কার কাছে কত পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে গড় গড় করে বলে দিতে পারে। উঠতি খেলোয়াড় টমসনের ফাস্ট বলের গতি কত, অমৃতরাজ ভ্রাতৃদ্বয় শেষ পর্যন্ত ডেভিস কাপের ফাইনালে উঠতে পারবে কী না, না উঠতে পারলে ওর রাতের ঘুমটাই মাটি হবে। বরং তাকে বললে, সে সহজেই খেলা বিষয়ক রচনা লিখে দিতে পারে। কবিতার মাথামুণ্ড সে কিছুই বোঝে না। জয়া

তাকে একদিন বলেছিল, মানু তোমার এমন সুন্দর চোখ, তুমি কবিতা লিখতে পারো না কেন? তোমার চোখে যদি চুমো খাই রাগ করবে?

মানু বলেছিল, যাঃ তুমি তো মেয়ে। চোখে চুমো খাবে কী।

চোখে চুমো খেলে আমি সুন্দর কবিতা লিখতে পারব। এসো না খাই।

কী হবে কবিতা লিখে?

তুমি বুঝবে না মানু। মানুষ কী সুন্দর হয়ে যায় কবিতা লিখতে পারলে।

চোখে চুমু না খেলে কষ্ট হবে তোমার?

খুব।

তবে খাও। সে চোখ বুজে দাঁড়িয়েছিল।

জয়া তখন উঠে চারপাশে কী দেখে নিল। বাঘা পায়ের কাছে লেজ নাড়ছে। সে উঠে পড়তেই বাঘা উঠে পড়েছিল। সুন্দর জি আর মিনি স্কার্ট পরা মেয়েটার শরীরে কী যে আশ্চর্য গন্ধ! সে চোখ বুজেছিল—কারণ, বুঝতে পারছিল দুহাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে নিয়েছে জয়া। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠছিল তখন। জয়ার বাবা ওপর থেকে বলেছিল, 'বাঘা অসময়ে ডাকছে কেন রে!'

জয়া চুমো খেতে খেতে বলেছিল, বাঘা খুব অসভ্য হয়েছে বাবা। সময় অসময় বোঝে না।

মানু একদণ্ড দেরি করেনি। ধাঁই করে লাথি মেরেছিল বাঘার পেটে। বাঘা আর একটুও চিৎকার করেনি। জয়ার ঠোঁটে মিষ্টি গন্ধ। সে বাড়ি ঢুকে বাথরুমে সাবানে ঘষে ঘষে গন্ধটা তুলে ফেলেছিল। পালিয়ে সিগারেট খাওয়ার মতো কোনো গন্ধ যদি দিদি টের পেয়ে যায়—মানুটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সংসারে নষ্ট হয়ে গেলে কেউ আর তখন ভালোবাসতে চায় না। সে এ জন্যে সব সময় ভালো থাকতে চেয়েছে। উঠতি বয়সে যা সব ইচ্ছে থাকে, তারও আছে। সে একদিন সিগারেট খেতে পারল না পালিয়ে। কতদিন ভাবত নানুকে নিয়ে সে বাবুঘাটে চলে যাবে, অথবা গড়ের মাঠের ঠিক মাঝখানটায়। দু'জনে দুটো সিগারেট কিনে নেবে মেট্রোর নিচ থেকে। তারপর সন্তর্পণে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে যখন বুঝবে কেউ নেই, পরিচিতি কোনো মুখই তাকে আর দেখছে না, তখন সিগারেট জ্বালিয়ে বেশ বড়দের মতো টানবে। ইচ্ছেটা সেই কবে থেকে। পরীক্ষায় সে ভালো করতে পারে না কেন বোঝে না। কেবল খেলা সম্পর্কে ভারি উৎসাহ তার। আসলে সে খেলা পাগল বলে, অন্য দশটা কুকর্ম করার সময় একেবারেই পায়নি। তার বয়সের ছেলেরা কত সব অভিজ্ঞতার কথা বলে। সে একটাও বলতে পারে না। তবু যা হোক জয়াকে মাস দুই আগে ভাগ্যিস হাতের কাছে পেয়ে গেল। জয়া তাকে মাঝে মাঝে আজকাল সাহসী হতে বলছে।

দিদির এই সকালে বের হয়ে যাওয়াটা ভালো লাগছিল না। বাবা কিছু বলে না। দাদাও বের হয়ে যাচ্ছে। কেমন সবাই আলগা হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। ছ'মাস আগেও এটা ছিল না। কেমন সবাই মিলে সুন্দর একটা সংসারের ছবি ছিল বাড়িতে। দিদির চাকরিটা দাদাকেও কেমন স্বার্থপর করে ফেলেছে। সে বুঝি ভাবছে, এবার চলে যাবে। এতদিন তো টানা গেল, এবার ছুটি।

মা তখন ডাকল, মানু খেয়ে যা।

ওর খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এবং কেমন বিরক্ত গলায় বলল, রেখে দাও।

রেখে দেবটা কোথায় শুনি! তোমাদের সবার খাবার নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকব?

কে বলেছে বসে থাকতে?

নীরজা আজকাল দেখেছে মানু প্রায়ই মুখে মুখে উত্তর করে। স্বভাবটা কেমন চোয়াড়ে হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। বড়টাকে কিছু বলতে পারে না। মেজটা তো স্বাধীন হয়ে গেল চাকরি পাবার পর। ছোটটা পর্যন্ত মুখ করছে। নীরজা অগত্যা মানুর সকালের জলখাবার প্লেট দিয়ে তার ঘরে ঢেকে রেখে দিল। যখন খুশি খাবে। মুখে কিছু বলল না।

আজকাল বাড়ির খাবারের মেনু পালটে গেছে। আগে ছিল দুখানা রুটি, সামান্য আলুর তরকারি। দিদির চাকরিটা সংসারে প্রাচুর্য এনে দিয়েছে, ডিমের পোচ, মাখন, স্লাইস পাউরুটি, এক গ্লাস হরলিক্স। এত খাবার দেখে, তার বমি পাচ্ছিল। দিদি রুমাল উড়িয়ে কোথায় যায়, কী করে, সব বুঝতে পারে। একদিন ভেবেছিল বলবে, দিদি তুই আর যাস না। আমি কাঁচামালের ব্যবসা করব। আমাদের ঠিক চলে যাবে। তারপর মনে হয়েছিল ইস, কে শুনবে তার কথা। আর বাবা যদি জানতে পারে বাজারে আনাজপাতি বিক্রি করার কথা ভাবছে সে, তবে আর রক্ষে থাকবে না। মানসম্মান এভাবে খোয়াতে রাজি নই।

সে একটা জামা গায়ে দিল। সকালটাতে কিছু করার থাকে না। অন্যদিন দাদার অফিস, দিদির অফিস থাকে বলে বাজারটা সে করতে যায়। সকালের কাগজটা দেখা হয়ে গেলেই যেন সারাদিনের কাজ তার শেষ। গল্পের বই সে দু—একবার পড়ার চেষ্টা করছে, কোনো মজা নেই কোথাও। বরং এ পাড়ায় সে অনেকের ফুট—ফরমাস খেটে দেয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, কেউ মরে গেলে কাঁধ দেওয়া, দত্তবাড়ির বউ যাবে রামগড়ে, কে যাবে সঙ্গে, ভুবনবাবুর ছেলে মানুর কথা তখন সবার মনে পড়ে যায়। মানু পাড়ায় এভাবে বেশ ইজ্জত নিয়ে বেঁচেছিল। দিদিটা রুমাল উড়িয়ে বউভাত খেতে যাচ্ছে। বাবার এত সুখ সয় না বোধহয়। কেমন সব সময় শঙ্কিত মুখ। একটা জ্যান্ত উটের ছবির মতো বাবা গলা বাড়িয়েই আছে।

সেও নেমে গেল সিঁড়ি ধরে। কোথায় যাবে জানে না। বের হতে ইচ্ছে ছিল না। এই সময়টাই বোধহয় সবার ভালো না লাগার সময়। বিকেলে দো—আসমান দেখা যাবে। জয়া তাকে দিয়ে টিকিট কাটিয়ে রেখেছে। সকালটাই বড় বেশি একঘেয়ে। হাবুল পালের রোয়াকটাই সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা। ওরা পাঁচ—সাতজন নানা রকম খবরে মেতে থাকতে পারে তখন। কিন্তু হেরে গেছে দল। সে মানত পর্যন্ত করেছিল। কালীবাড়িতে লাল জবা দেবে। গেলেই ছেঁকে ধরবে পিছনে লাগবে। তবু আড্ডা ছাড়া হাতের কাছে এখন তার করার কিছু নেই। এবং যেতেই রুমন বলে ফেলল, কত টেম্পারেচার?

কোনো টেম্পারেচার ওঠেনি।

আয় না দেখি।

মন ভালো নেই রুমন। ঝামেলা করবি না।

কী ঝামেলা করলাম মাইরি। বুককি শালা মাইরি তোকে কী বলবে বলে কখন থেকে বসে আছে।

কিছু বলতে হবে না। কে শুনছে ওর কথা।

বুককি বলল, খাঁ খাঁ করছে গুরু।

সবারই খাঁ খাঁ করছে। কেউ ভালো নেই। চুপচাপ বসে থাক। অথবা গান গাও, শুনি!

বুককি বলল, অসময়ে গান গাইতে বলছ?

গা না। যা মনে আসে।

চাঁদবদনী ধনি নাচ তো দেখি গাইব?

গা না। কে বারণ করেছে। যেটা ভালো লাগে গা।

রুমন বলল, আমি নাচব তবে।

মানু বলল, না তোমায় নাচতে হবে না।

বুককি চোখ বুজে ফেলেছে। ওর গানের গলা ভালো। হুবহু নকল করে ফেলতে পারে একবার শুনে। অথচ কোনো প্রচেষ্টা নেই। কে জানে চেষ্টা থাকলে হয়তো সেও একটা কিশোরকুমার হয়ে যেতে পারত। আসলে বুককি যতটা আড্ডাবাজ হুল্লোড়ে ততটা সিরিয়াস নয় জীবনে। অথচ সব সংগীত সম্মেলনে বুককিকে দেখা যাবে বাইরে গাছের নীচে বসে আছে। নিবিষ্ট মনে গান শুনতে সে ভালোবাসে। মানু বলেছিল, তুই তো গান শিখতে পারিস। চর্চা করিস না কেন?

এই যে করছি। বলেই সে গান জুড়ে দেয়। চর্চা তো তোমরা এলেই শুরু হয়ে যায়। তোমাদের ভালো লাগলে আর কার ভালো লাগল না লাগল গ্রাহ্য করি না। যেন এ কটি বন্ধুর জন্যেই সে অতি যত্নে গলায়

গান তুলে ফেলে। এবং ওদের যতক্ষণ না শোনাবে বুককি কেমন অস্বস্তিতে থাকে।

বুককি বেশ মজার গান জুড়ে দিয়েছে। চাঁদবদনী ধনি নাচ তো দেখি। ওরা রেলিঙে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা পার্ক, সেখানে সকালে টেনিস খেলে কেউ কেউ। হকার্স কর্নারে দোকানপাট খুলছে। পাড়ায় কে কোন বাড়িতে থাকে সবই তারা জানে। তরুণী মেয়েরা অথবা যারা কৈশোর পার হয়ে যাচ্ছে সবার একটা করে তাদের নিজস্ব নাম আছে। ধবলী যাচ্ছে, যদি চাঁদবদনী ধনি নাচ তো দেখি বুককি না গাইত, তবে ঠিক চেঁচিয়ে বলত, ধবলী যায়, কী হবে হায় এই সব পঙ্গপালের।

যেন সত্যি আর একটা গান। অথচ বুককি সত্যি গানটা মন দিয়ে গাইছে। গান শুনে যে নিস্তেজ পর্বটা ছিল মানুর, নিমেষে কেমন উবে গেল। বলল, বুককি তুই কী বলবি বলেছিলি রে?

গুরু দোষ নেবে না বল।

দোষ নেব কেন!

দোষ হলে ক্ষমা করে দেবে বল।

এই হচ্ছে বুককি। আসল কথাটা বলার আগে এত বেশি ভনিতা করবে যে শোনার সব আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়।

বুককি! কেমন চেঁচিয়ে উঠল মানু!

রুমন বলল, তোর কি মেজাজটা আজ ঠিক নেই রে!

মানু কিছু বলল না।

হার জিত তো খেলায় আছেই।

রুমন! খুব স্থির গলা মানুর।

কেমন হতচকিত রুমন। বুককি বলল, দোস্ত তুমি যা দেখাচ্ছ তারপর আর দেখছি কিছু বলাই যাবে না।

মানু হাতে বালা পরেছে বছর খানেক হয়ে গেল। সে ডান হাতের বালা বেশ টেনে ওপরে তুলছে। মানু ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লে এমন করে থাকে। ওর কেন যে মনে হয় ঠিক এই সময়ে দিদি কিছু করছে। দিদিকে জোর করে কেউ কিছু করছে। সে রোয়াকে বসে পড়ল। পিন্টিদের বাড়ির তিনতলার জানালার দাঁড়িয়ে পিন্টির কাকা সিগারেট খাচ্ছে। পিন্টি একবার পুজোর মণ্ডপে রাত জেগেছিল। পিন্টির শরীরে এক রকমের সুন্দর গন্ধ আছে। সে মেয়েদের আলাদা গন্ধ টের পায়। জয়া পিন্টি বুলার শরীরে এক এক রকমের গন্ধ।

মানু মনে মনে হেসে ফেলল। যত সব বাজে ভাবনা তাকে সব সময় বিপর্যস্ত করছে। যেমন, দিদি যখন কলেজে পড়ত, একটু দেরি হলেই তার মনে হত, এই বুঝি কেউ এসে খবর দিয়ে যাবে অ্যাকসিডেন্ট। দিদির খাতায় রোল নাম্বার, ইয়ার এবং কলেজের নাম যদি না থাকে, কোনো ঠিকানায় তাকে খুঁজে পাবে না। এবং দিদি ফিরে এলেই বলেছিল, তোর খাতায় রোল নাম্বার, কলেজের নাম লিখে রাখিস তো?

রমা কিছুই বুঝতে পারত না। মানু এ—ধরনের কথা কেন বলছে, রমা একবার দেখেছিল, ওর ব্যাগে একটা চিরকুট। কী খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিল। নাম, ঠিকানা লেখা। এবং ঠিক মানুর হাতের লেখা।

মানুর এই ধরনের অশুভ চিন্তা করার একটা বাতিক আছে। বাবা যখন অফিস থেকে রিটায়ার করে তখন বয়স তার খুব একটা বেশি না। বাবা একটু রাত করে ফেললেই জানালায় দাঁড়িয়ে ছটফট করত মানু। আর মনে হত, কেউ বলছে—এটা কি ২৩/১০ এর বাড়ি? এখানে ভুবনবাবু বলে কেউ থাকেন? আপনি ভুবনবাবুর কে! তিনি হাসপাতালে।

মানু বলল, বুককি নির্ভাবনায় বলতে পারিস।

গুরু তোমার জয়া কিন্তু প্রেম করছে।

কার সঙ্গে?

সে তো গুরু জানি না।

ওর অনেক কবি বন্ধু আছে। জয়া বলেছে, কবি বন্ধুদের নিয়ে জয়া মাঝে মাঝে বেড়ায়।

বুককির মুখটা মানুর কথায় কেমন ফ্যাকাশে দেখাল। সে ভেবেছিল জোর একটা খবর দেবে আজ মানুকে। কিন্তু মানু কোনো উত্তর দিল না। কলেজ স্ট্রিটের পিছনের দিকটার একটা রেস্টুরেন্টে সে জয়াকে দুদিন দেখেছে। পর্দা ঘেরা সব কেবিনে নানা রকমের নষ্টামি করার জায়গা। বদনাম আছে জায়গাটার। উঠতি কলেজ পালানো সব ছেলেমেয়েদের খুব ভিড় হয়। সহজে কেবিন পাওয়া ভার। একবার ঢুকে গেলে কেউই বের হতে চায় না। এমন জায়গায় সে জয়াকে দেখেছিল। সঙ্গে সুন্দর মতো তার বয়সি একটা ছেলে।

বুককি বলল, কবি বন্ধুরা বুঝি খুব ভালো ছেলে হয়?

অন্তত তোমাদের মতো না।

রুমন বলল, মাইরি, আমিও কবিতা লিখতে আরম্ভ করব ভাবছি।

ভেবে দ্যাখ না। চাট্টিখানি কথা না। কবি হতে চাইলেই কবি হওয়া যায় না। জয়ার নাম আছে।

বুককি বলল, ছেলেটার যদি ফ্যাচাং করার ইচ্ছে হয়ে যায়।

মানু বলল, ফ্যাচাং করার ইচ্ছে হবেই না। কবিতা ভারি মধুর ব্যাপার। কবিরা কবিতা ছাড়া কিছু বোঝে না, জানে না।

রুমন বলল, বিকেলে তোর খেলা আছে?

বিকেলে আমি আর জয়া দো—আসমান দেখতে যাচ্ছি।

আর সেই আশায় সেদিন ম্যাটিনিতে সে হলের নীচে দাঁড়িয়েছিল জয়া আসবে—সে আর জয়া হলে ঢুকবে। টিকিট জয়ার কাছে। জয়ার জন্যে চারপাশের ভিড়ের ভেতর যখন উন্মুখ ছিল তখনই মনে হল দূরে জয়া কারও সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। সে কাছে গিয়ে বলল, এসো। শো আরম্ভ হয়ে যাবে।

জয়া বলল, তুমি যাও মানু। বলে একটা টিকিট দিয়ে দিল। আমার যাওয়া হবে না। তোমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম।

তার মানে?

আমার আজ কবিতা পাঠ আছে। এর নাম কালিদাস! ও আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে বাড়ি গেছিল।

মানুর মাথাটা ঝিম ঝিম লাগছিল। ভেতরে একটা ক্রুদ্ধ বাঘ হাই তুলছিল। সে কিছু বলতে পারল না। কবিরা খুব সুন্দর কথা বলে! জয়া কত সুন্দরভাবে কথাটা বলল। সে কোনো রকমে বলল, আপনিও বুঝি কবিতা লেখেন?

কালিদাস বলল, জয়ার জন্য লিখি। জয়ার খুব ভালো লাগে আমার কবিতা। মানুর ইচ্ছে হয়েছিল জানার, তার জন্যে কেউ কিছু লেখে কিনা। কিন্তু সে দেখল, ওদের যাবার এত তাড়া যে আর একটা কথাও বলার সময় নেই। সে ভ্যাবলাকান্তর মতো দাঁড়িয়ে থাকল। সামনের বাসটায় দৌড়ে উঠে গেল জয়া আর তার কবিবন্ধু। সে দুঃখী মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থেকে টিকিটটা মুখে পুরে দিল। তারপর শক্ত দাঁতে কট কট করে কাটতে থাকল।

পাঁচ

সকাল সকাল নানুর আজ ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠেই জানালা খুলে দিল! বাইরে এসে দাঁড়াল। রাস্তাটার ওপারে একটা ছোট্ট মতো লাল বাড়ি। বারান্দা থেকে বাড়িটার সব কিছুই স্পষ্ট। এই প্রথম সে লক্ষ্য করল, একটা বাচ্চা মেয়ে সাদা ফ্রক গায়ে দিয়ে লনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর মনে হল, বাড়িটায় রয়েছে বড় একটা ছাতিম গাছ। ছাতিম ফুলের গন্ধ—আহা, একবার সে মেসোমশাই মা—

এই পর্যন্ত মনে হতেই তার চারপাশ অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকল। এক কুৎসিত জগৎ থেকে সে পরিত্রাণের কথা ভাবছিল। সবাইকে সে ক্ষমা করে দিয়েছে। কারণ তার এখন বনভূমিতে জ্যোৎস্না। নবনীতা,

ভারি সুন্দর নাম। নবনীতা তার হাত কামড়ে দিয়েছিল। এবং সেই দাঁত আর তার নেই। নবনীতা এখন নতুন এক পৃথিবী তার কাছে।

অন্তত এমন সুন্দর পবিত্র ইচ্ছের কথা সে মানুষকে বলতে পারে। একদিন ওদিকে সে গিয়েছিল। মানুদের বাসাটা সে দেখে এসেছে। সুন্দর মতো এক যুবা গলা বাড়িয়ে বলেছে মানু নেই। মানু বাড়ির গল্প করতে খুব ভালোবাসে। দিদির গল্প, বাবার গল্প, মার গল্প—কিছুই বাদ রাখেনি। খুব খোলামেলা এবং সরল সাদাসিদে ছেলে। কিন্তু কী আশ্চর্য কিছুদিন থেকে সেই মানুও কেমন গম্ভীর। সংসারে মানুর তো তার মতো হারাবার কিছু নেই। মানু সবার ছোট। তার বাবা রিটায়ার করেছেন সাত আট বছর। এবং এ—সময়ে মনে হল বাবা যদি আরও কিছু বেশি দিন বেঁচে যেতে চেষ্টা করতেন। অন্তত মার চুলে পাক ধরা পর্যন্তও যদি তিনি অপেক্ষা করতেন।

তারপরই ফের নবনীতার কথা মনে হতেই শিস দিতে দিতে সে নীচে নেমে গেল।—ও দাদু তোমার ঘুম ভাঙল না। দিদিমা, মাসি তোমরা কোথায়—চা কই। এখনও তোমরা ঘুমাচ্ছ। মিতা দরজা খুলে দেখল নানু নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে। মিতা কাছে গিয়ে বলল, কী রে দিলি সকালের ঘুমটা মাটি করে।

—কেমন ঠান্ডা বাতাস। চল না সামনের রাস্তাটা পার হয়ে বড় মাঠটায় নেমে যাই।

এখনও এখানে একটা বড় মাঠ রয়েছে। এ—অঞ্চলে এখনও অনেক ফাঁকা জায়গা, গাছপালা আছে। হেঁটে গেলে অনেকটা দূর হেঁটে যেতে ইচ্ছে করে। দক্ষিণের মৃদুমন্দ হাওয়া গাছপালার মধ্যে বয়ে যায়। আশ্চর্য এক প্রশান্তি তখন বাড়ি—ঘরে। মনেই হয় না মানুষের কোনো দুঃখ আছে।

নানু আজ সকাল সকাল স্নান করল। চা, জলখাবার খেল দাদুর সঙ্গে। মাসি সকালবেলায় সহসা দুটো মেহেদি হাসানের গজল গেয়ে ফেলল। এবং মনেই হয় না কোথাও এ—বাড়িতে কারও কোনো গোপন দুঃখ আছে।

নানু আজ পড়ার বইগুলিও উলটে পালটে দেখল। তার মনে হচ্ছে এ—সব পড়ে মানুষের আখেরে কিছু হয় না। শুধু পণ্ডশ্রম। ফলে তার জোরে জোরে গান গাইতে ইচ্ছে করছে। বইগুলি সরিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখল। নরম দাড়ি গালে। ভালো করে আজ আবার দাড়ি কামাল। গালে হাত রেখে বুঝল বেশ মসৃণ। চশমার ভেতর চোখ দুটো ভারি স্নিগ্ধ। কোনো জ্বালা নেই। তারপর খুব ধীরে সুস্থে দাদুর ঘরে এসে বসল। ফোন তুলে ভাবল নবনীতাকে ফোন করবে। তখনই মনে হল, নম্বর তার জানা নেই। বিকেলে আবার একবার যাওয়া দরকার। এবং সে ভাবল, গেলেই ত হবে না, একটা অজুহাতের দরকার। তখনই মনে হল, নবনীতাকে নিয়ে সেই বাড়িটায় একবার যাবে। যেখানে সে তার বাবা মা এবং ঠাকুমার সঙ্গে বছরের পর বছর ছিল।

তখন অবশ্য জেঠু তাদের সঙ্গে ছিল না। কোথায় সংসারে একটা কাঁটা বিধে যায়, জেঠু এক সকালে, সেই ধুমসো মোটা মতো মেয়েছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে এসে বলেছিল, এই হাসি। এম এ পাশ। মাস্টারি করে। আমি বিয়ে করব মা। অবনীশ শেষ পর্যন্ত এমন একটা রাক্ষুসে ডাইনির পাল্লায় পড়ে যাবে ঠাকুমা স্বপ্নেও ভাবেনি। রাক্ষুসীটা আসার পর থেকেই এমন একটা সুখী সংসার দুদিনে কেমন হতশ্রী হয়ে উঠল।

তখন সংসারে এটা থাকে না, ওটা থাকে না। খরচ কেন এত বেশি হয়। সে শুতে পায় না জেঠুর সঙ্গে। মা নিত্যদিন বাবাকে গালমন্দ করে। বাবার ভীষণ খরচের হাত। সংসারে জেঠুর টাকা পয়সা দেওয়া ক্রমে কমে যেতে থাকল। এবং এক সকালে সেই রাক্ষুসীটাকে নিয়ে অন্য বাসায় উঠে গেল। বাবা সেদিন এত বেশি আঘাত পেয়েছিলেন যে দু'দিন কিছুই খাননি। এসব মনে হলেই তার চোখ জ্বালা করতে থাকে এবং আক্রোশ জমে ওঠে। অথচ আজ সকালে সে ভেবেছিল—সব রকমের আক্রোশ মন থেকে সরিয়ে দেবে। সে তো সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

রাসবিহারী সকালে নানুর এই পরিবর্তনে কিছুটা বিস্মিত হলেন। তিনি নানুকে বললেন, কাল তোমার ফিরতে এত দেরি হল কেন?

নানু কাগজ ওলটাচ্ছিল। সে দাদুর দিকে না তাকিয়েই বলল, এক জায়গায় গেছিলাম।
সে তো বুঝতে পারছি। সেটা কোথায়?
বেশি দূর না।
দিনকাল ভালো না। তোমার জন্য আমরা চিন্তা করি, সেটা একবার মনে রেখো।
আর হবে না।
রাসবিহারী নাতির এমন কথায় আরও অবাক হয়ে গেলেন। ভালো মানুষের যে স্বভাব, প্রায় সে রকম কথাবার্তা নানুর। তিনি বললেন, তোমার জেঠু কাল ফোন করেছিলেন।
কোত্থেকে?
অফিস থেকে।
কিছু বলল।
বলেছে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে।
তাই বুঝি। তারপর কাগজটা রেখে হাত পা সটান করে বলল, তুমি কী বললে?
তুই পড়াশোনা একদম করছিস না বললাম।
নানু আর কথা বলল না। সে ভাবল আজই দুপুরে একবার ফোন করবে জেঠুকে। অফিসে এলেই তার ফোন পাবে জেঠু। সে বলবে, কাল তোমার ওখানে যাব জেঠু। কতদিন তোমাকে দেখি না। সংসারে আমার বড়ই প্রিয়জনের দরকার।
তারপর আর কেন জানি তার সময় কাটে না। কলেজ যাবে কী যাবে না ভাবছিল। একবার মনে হল কলেজে গেলে, সময়টা দ্রুত কেটে যাবে। মানু ক'দিন ধরে কলেজ কামাই করছে। ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের খেলা এলেই সে কলেজে আসে না। আজ হয়তো আসতে পারে। এলে নবনীতার সঙ্গে তার যে আলাপ হয়েছে সে—কথা বলবে। জানতে চাইবে, নবনীতার এমন কথাবার্তায় কী মনে হয়। মনে হয় কী নবনীতা তাকে গোপনে কিছু দিতে চায়। তারপরই ভাবল—যা, সে এ—সব মানুকে বললে, নবনীতাকে ছোট করা হবে। বরং কোনো ক্রাইসিস দেখা দিলে সে মানুর পরামর্শ নেবে।
কলেজে আজ তিনটে ক্লাস—জে এমের ক্লাসে সে খুব মনোযোগ দিয়ে কনসাইনমেন্ট কাকে বলে, তার বিল ভাউচার কেমন হয় শুনল। এবং ব্যাংকিং—এর ক্লাসে সে আজ কিছু নোটও নিল। অনেকদিন পর মনে হয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য জীবনে এ—সব দরকার। কৃতী মানুষ না হতে পারলে নবনীতার মান সম্মান রাখতে পারবে না।
কলেজ ছুটির পর সে একটা রেস্টুরেন্টে বসে দুপিস পাউরুটি, ডিম এবং এক কাপ চা খেল। এবং তখনই মনে হল এ সময় রওনা হলে ঠিক পাঁচটার মধ্যে নবনীতার বাড়িতে পৌঁছতে পারবে।
যখন পার্কটায় এল, তখন মনে হল রোদের আঁচ এতটুকু কমেনি। গ্রীষ্মের দুপুর সহজে শেষ হতে চায় না যেন। নবনীতা এখন কী করছে! ওর পরীক্ষা আসছে বছরে। তারপরই মনে হল গ্রীষ্মের ছুটি, নবনীতাদের ছুটি হয়ে যেতে পারে। কাল বাদে পরশু তার কলেজও বন্ধ হয়ে যাবে। নবনীতা বাড়িতেই থাকবে—না কী নবনীতার অন্য কোনো প্রেমিক আছে—যদি থাকে তবে! এই প্রশ্নটা তাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল।
নানু তাদের পুরানো বাসাবাড়িটা পার হয়ে যাচ্ছে। তার মনেই নেই এ সেই বাড়ি, যেখানে বসে সে বাপের আদ্যশ্রাদ্ধ করেছিল। মাথা নেড়া, গায়ে নতুন মার্কিন কাপড়, প্রায় সন্ন্যাসী বালকের মতো তাকে দেখাচ্ছিল।
এ—বাড়িতেই তার শৈশব কেটেছে বলা চলে—বাবা জেঠু ঠাকুমা মা এবং সে! মা তখন বাড়ির বধূ। বড় করে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে লম্বা সিঁদুর এবং খুব সকালে প্রাতঃস্নান, তারপরই রান্নাঘরে ঢুকে বাড়ির মানুষদের জলখাবার থেকে অফিস স্কুলের সময়মতো ঝাল—ঝোল ভাতের ব্যবস্থা এক হাতে। জেঠু তাকে একটা মিশনারি স্কুলে দিয়ে আসত। তখন সব কিছুই ছিল মায়া মাখানো, এমনকি বাড়ির বেড়ালটাও

খেল কী না লক্ষ্য থাকত সবার। অথচ আজ নানু বাড়িটা পার হয়ে গেল, লক্ষ্যই করল না বাড়িটার দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। বাবা গ্রীষ্মের দিনে রোজ সকালে বাড়িটার রোয়াকে এসে বসত। কোথা থেকে বয়ে আসত ঠান্ডা হাওয়া। বাবার চুল উড়ত। সে পেছনে এসে কখনও ঝাঁপিয়ে পড়ত। বাবা তখন বলত, নানু পাশে বোস। ওই দেখ কে আসছে। ধরে নিয়ে যাবে। ওর ছোট বুকটা কেঁপে উঠত—যেন কেউ নিয়ে যাবার জন্য সত্যি আসছে। সে ভয় পেয়ে বলত, বাবা আমি দুষ্টুমি করব না। তোমার পাশে চুপচাপ বসে থাকব। বাবা বলত ঠিক আছে, বলে দেব, নানু খুব ভালো ছেলে। এত ভালো থেকেও শেষ পর্যন্ত কারা তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। এক অদৃশ্য অশুভ ভয়ংকর হাত তাকে উদাসীন মাঠে রেখে চলে গেছে। এখন সেই উদাসীন মাঠ থেকে সে দু—হাত তুলে ছুটছে—আর কিছুদূর গেলেই সে জলছত্র পেয়ে যাবে। নবনীতা সেখানে গাছের নীচে একজন দুঃখী মানুষকে কতদিন পরে জলদান করবে।

সে দূর থেকেই নবনীতাদের জানলা দেখতে পেল। বুকের ধুকপুকানি বাড়ছে। সহসা নবনীতা এত প্রিয়জন হল কী করে। চারপাশে সব লুণ্ঠনকারীরা। সে গোপনে বলল, নবনীতা আমি এসে গেছি।

তারপরই নানুর খেয়াল হল বাড়িটার দরজা জানালা বন্ধ!

সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। প্রথমত কেমন সংকোচ, সে যে—এত দূর আবার চলে এসেছে কাকিমা যদি টের পায়, আসলে নবনীতাই তার আকর্ষণ। এ—সব মনে হতেই যতটা দ্রুত ভেবেছিল, দরজায় দাঁড়িয়ে বেল টিপবে, ঠিক ততটা দ্রুত সে কিছু করতে পারল না। এবং মনে হল, সে গতকালই এখানে এসেছিল—একটা দিন মাঝে পার হয়নি, নবনীতাও লজ্জায় পড়ে যেতে পারে, বেহায়া ভাবতে পারে তাকে। এত সহজে উতলা হওয়া ঠিক না। সে বেল টিপল না। সারাদিন একবারও মনে হয়নি কথাটা। সে নীচে নেমে কী করা উচিত ভেবে দেখবার জন্য পার্কটায় গিয়ে বসবে ভাবল।

তখনই মনে হল কেউ ডাকছে, এই নানুদা চলে যাচ্ছ কেন?

সে ওপরে তাকিয়ে দেখল, জানালার ফাঁকে ভারি মিষ্টি মুখ। আধভেজানো জানালায় রোদ এসে পড়েছে, রোদে ওর চোখ মুখ চিক চিক করছিল।

তারপরই কেমন গম গম করে বেজে উঠল বাজনা—শরীরের রক্তে সেই নিবিড় ধ্বনিমাধুর্য নানুকে কেমন ভালোমানুষ করে তোলে।

দরজা খুলে দিলে নানু বলল, সব বন্ধ। ভাবলাম কোথাও চলে গেছ।

কোথায় যাব?

এই কোথাও। তারপর মাথা নীচু করে সেই আগের মতো নানু বলল, তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজে এলাম নবনীতা।

আগে বোস। তারপর না হয় কাজের কথা বলবে।

কতদিন নানুর কোনো প্রিয়জন ছিল না। সে সবাইকে ঘৃণা করে এসেছে। মানুষের কিছুই তার ভালো ঠেকেনি। সবাইকে মনে হয়েছে ফেরেব্বাজ, ধান্দাবাজ। যা খুশি সে বলে ফেলতে পারত। কিন্তু এখন সে কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না। সে লাজুক বালকের মতো শুধু বসে থাকল। নবনীতা তাকে বসতে বলেছে। তাকে দোতলার ঘর থেকে ডেকে ফিরিয়েছে—এতসব মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার ওপর কৃতজ্ঞতায় চোখ কেমন ঝাপসা হয়ে গেল।

নবনীতা বলল, তুমি বসো। আমি আসছি।

কিন্তু আশ্চর্য। বাড়িতে যেন আর কেউ নেই। নবনীতার ভাইবোনেরও কোনো সাড়া পাচ্ছে না। কাকিমা কোথাও যেতে পারে, নবনীতা একা বাড়িতে। ওর শরীরটা ভীষণ দুলে উঠল। সে বলল, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি পারব না।

নানুর এই স্বভাব, অর্থাৎ শরীরের মধ্যে কোনো অশুভ ইচ্ছের প্রভাব বাড়তে থাকলে সব সময় এমন বলে সংযম রক্ষা করতে চায়।

তখনই নবনীতা ফিরে এল। সে খুব তাড়াতাড়ি শাড়ি পরে এসেছে। শাড়ি পরলে নবনীতাকে যুবতীর চেয়েও বেশি নারী মনে হয়! একজন নারী জীবনে কত দরকার, নবনীতাকে দেখার আগে নানু টের পায়নি।

নবনীতা আঁচলে গা ঢেকে বসল। বলল, আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেব নানুদা।

নানু এবং নবনীতার মাঝখানে শুধু একটা সেন্টার টেবিল। মাঝখানে এক গজ রাস্তা পার হতে হয়। অথচ এই এক গজ রাস্তা কত যোজন দূরে মনে হচ্ছে। আহা এই নারী সুধা পারাবার। অস্থিমজ্জায় রক্তে মাংসে বড় বেশি পটু নবনীতা।

সে বলল, নবনীতা কাকিমা কোথায়?

মা রবীন্দ্রসদনে গেছে আদিপাউস দেখতে।

তুমি গেলে না। ওরা কোথায়! তোমার ভাইবোন।

বাবার সঙ্গে গেছে! তুমি আদিপাউস দেখনি।

না।

দেখলে না কেন?

কী হবে দেখে?

কী হবে আবার! মানুষ নাটক দেখে কেন? সিনেমা দেখে কেন! আমি তো আজকাল কবিতার সকাল শুনতে যাই। কেমন একটা নতুন জগৎ মনে হয়।

কতদিন কিছুই দেখিনি।

এয়ারপোর্ট দেখেছ?

না।

একদিন দেখে এসো।

তুমি সঙ্গে গেলে যাব।

বারে আমি যাব কী করে! মা আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে দেবে কেন?

দিলে কী হবে?

নবনীতা হেসেছিল। —তুমি সত্যি বড় সরল নানুদা। তোমার মতো মানুষ এখনও তবে পৃথিবীতে দু—একজন আছে।

জানো আমার খুব ইচ্ছে করে....তারপরই নানুর মনে হল, একদিনের আলাপে নবনীতাকে তার ইচ্ছের কথা বলতে পারে কিনা। সে সামান্য থেমে নবনীতার দিকে তাকাল। নবনীতা ছাপা হলুদ কলকা পাড়ের সিল্ক পরেছে। গায়ে সবুজ ব্লাউজ। গলায় সাদা পাথরের মালা। চোখে কাজল কিংবা ভ্রূ—প্লাক করা হতে পারে—কিংবা নবনীতার ভ্রূ এতই সুন্দর যে দেখলে মনে হয় আলগা হয়ে বসে আছে ভ্রূজোড়া। তখনই নবনীতা বলল, নানুদা তুমি কিছু খাবে?

কী খাব?

যা বলবে?

কত কিছু খেতে ইচ্ছে করছে নবনীতা—কিন্তু কে দেয়।

খুব ফাজিল।

নানু নিজের দিকে তাকাল। সে খুবই চঞ্চল হয়ে পড়ছে। নবনীতা এই বয়সে সবই কি বুঝতে পারে। সে ভেতরে ভেতরে কতটা অস্থির হয়ে পড়েছে এটাও কি চোখ মুখে ধরা দেয়। এমন কেন হচ্ছে। না কী এমনই স্বভাব তার, সহজেই সব জয় করে নেবার স্বভাব। কেউ যদি চলে আসে—কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তার। সে বলল, নবনীতা তোমার আর কোনো প্রেমিক নেই তো?

ও মা, কী সব বিতিকিচ্ছিরি কথা বলছ নানুদা।

না এমনি বললাম। আচ্ছা তুমি কখনও পাহাড়ে গেছ?

যাব না কেন। ওইতো সেদিন আমরা রাঁচি থেকে ঘুরে এলাম। পাহাড়ে গেলে মন ভারি উদাস হয়ে যায়, না নানুদা?

যাও না। জেঠিমাকে নিয়ে তো যেতেই পার। কেদারবদরি যাওয়া তো খুব সহজ। সোজা ট্রেনে হরিদ্বার.....

নানু বলল, মা আর আমাকে নিয়ে কোথাও যাবে না।

নবনীতা উঠে জানালার পর্দাটা আরও বেশি ঠিকঠাক করে দিল। তারপর রেকর্ড প্লেয়ার থেকে সুন্দর একটা ভেনচারের মিউজিক তুলে নিল। এবং নানুর দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন লাগে ভেনচারের মিউজিক। আর শুনবে?

নানু আজ যথার্থই সুন্দর এবং সতেজ। সে উঁচু লম্বা, তার ওপর উঁচু হিলের জুতো পরেছে। হাত—পা লম্বা, একজন তরুণের ঠিক যা যা থাকলে সুপুরুষ মনে হতে পারে নানুর সব আছে। এবং ওর দিকে সব সময় নবনীতা সোজা তাকাতে পারছে না। মাঝে মাঝে নানুদা ভারি সরল মানুষ হয়ে যায়—এটাই বড় বিপদ। সবাই তো আর একরকমের নয়। কে কোন কথার কী মানে করে বসবে কে জানে!

নানুদা তোমার লাল বলটা আছে?

লাল বলটা মানে?

ওই যে সকালেই দেখতাম তুমি একটা লাল বল নিয়ে পার্কের দিকে তোমার জেঠুর হাত ধরে চলে যাচ্ছ।

তুমি দেখতে।

বা, মা যে বলত, ওই দ্যাখ মিঃ চক্রবর্তীর ছেলে, কী সুন্দর। কাঁদে না।

তুমি বুঝি কাঁদতে খুব।

কে জানে!

জানো নবনীতা অনেকদিন থেকে সেই লাল বলটাই খুঁজছি। কীভাবে যে বলটা আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। বলেই নানু কেমন দুঃখী মুখ করে ফেলল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। যেন কোনো সুদূরে সেই লাল বলটা গড়িয়ে চলে যাচ্ছে—সে ছুটে কিছুতেই আর তার নাগাল পাচ্ছে না। মার মনীষদাই প্রথম টের পাইয়ে দিল তাকে, বলটা চুরি গেছে। কোথাও তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এবং সঙ্গে সঙ্গে মগজে সেই আগুনের আংরা ধিকি ধিকি জ্বলে উঠলে সে বলল, ঈশ্বর আমি তো সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি, তবে আর আমার মাথায় ধক ধক রেলগাড়ি চালাচ্ছ কেন। সে তাঁর ঈশ্বরের কথা এ—সময় শুনতে পেল। তিনি বলছেন, সামনে দ্যাখ। —কী দেখছ?

নবনীতা।

সে কেমন?

তুলনা হয় না।

মাথার মধ্যে রেলগাড়ি আর চলছে?

না।

নবনীতা বলল, কার সঙ্গে কথা বলছ?

ও না না। নবনীতা আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

তবে শুনতে পাচ্ছি না কেন?

শুনতে পাচ্ছ না। তবে জোরে বলি।

সে তখন খুব ধীরে ধীরে বলল, লাল বলটা খুঁজে পেয়েছি। নবনীতা আমার লাল বলটা এখন বুঝতে পারছি কার কাছে আছে।

কার কাছে? নবনীতা খুব হতচকিত গলায় বলল।

বলটা তোমার কাছে আছে। তুমিই আবার লাল বলটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারো।

আমার কাছে? কী বাজে বকছ নানুদা! আমি লাল বলটা দিয়ে কী করব!

তোমার কাছেই আছে। কাল সহসা জানলায় তোমার মুখ দেখে টের পাই। আশ্চর্য এক জ্যোৎস্না দেখতে পাই বনভূমিতে খেলা করে বেড়াচ্ছে।

নানুদা তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না তো!

না, আমি ঠিক আছি। সত্যি বলছি আমার মাথার কোনো গণ্ডগোল নেই। আগে ছিল। হুঁসহাস রেলগাড়ি মাথার মধ্যে ঢুকে যেত। তোমাকে দেখার পর সব আমার নিরাময় হয়ে গেছে নবনীতা।

নবনীতা এবার উঠে দাঁড়াল। নানুর দিকে আর তাকাতে পারছে না সে। একজন অসহায় যুবক মাথা নীচু করে এ—ভাবে পায়ের কাছে বসে থাকলে বড়ই অস্বস্তি। সে অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইল। এখন আপাতত চা জলখাবার সামনে রাখার ইচ্ছে। সে ভিতরে ঢুকে কাজের মেয়েটিকে বলল, চা দাও! দেখ ফ্রিজে মিষ্টি আছে। বের করে দাও।

ছয়

ভুবনবাবু খেতে বসার সময় দেখছিলেন, মানু খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠতে যাচ্ছে। সাধারণত ভুবনবাবু এবং মানু আজকাল এক সঙ্গেই খায়। তাড়াতাড়ি খেতে দেখে বলেছিলেন, আস্তে খা। বিষম খাবি। গলায় আটকে যাবে।

ভুবনবাবুর কথাতেই যেন মানু জল চেয়েছিল। গলায় সত্যি আটকে যেতে পারে। বড় বড় ড্যালা, খাদ্যনালির পক্ষে বা কষ্টকর এবং বেশি জোরে ঢোক না গিললে সবটা ভেতরে যায় না, যে—কোনো সময় কিছু একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে—বাবা তাকে সব সময় এত বেশি সাবধানে রাখতে চায় যে মাঝে মাঝে করুণা হয়। তবু সে যতটা পারে বাবাকে সমীহ করে চলে।

বোধ হয় ভুবনবাবু আরও কিছু বলতেন। নীরজা ভাতের থালা এগিয়ে দিয়েছিল। সামান্য ঘি, তিন—চার টুকরো পটল ভাজা, বড় স্টিলের থালার মাঝখানে নৈবেদ্যর মতো ভাত চুড়ো করা। এবং ছোট বাটির একবাটি মুগের ডাল। এমন সুন্দর খাবার দেখে ভুবনবাবু বোধহয় বাকিটুকু বলতে ভুলে গেছিলেন।

ঠিক ওঠার সময় তিনি মানুকে বললেন, যতীন সেনের কাছে একবার বিকেলে যা দেখি। বলবি, বাবা আপনাকে যেতে বলেছে। আর একটা ঠিকুজি এসেছে। ভানুর কুষ্ঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।

মানু খুবই বিরক্ত। কুষ্টি ফুষ্টি তার ধাতে সয় না। সে বুজরুকি ভাবে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছার সময় সে বলল, কাল যাব।

আজ না গেলে ওর সঙ্গে দেখা হবে না।

মানু সাড়া না দিলে অগত্যা ভুবনবাবু বললেন, যাবে কোথায়!

ভুবনবাবু তখন ভাত মেখে খাচ্ছিলেন। নীরজা তাকিয়ে আছে। চৌকাঠের কাছে মানু। সে বাবার বাকি কথাটা শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে!

তোর বুঝি অনেক কাজ? রাসবিহারীবাবু কালও ভানুর অফিসে লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছেন।

আমার আবার কাজ! ম্যাটিনিতে টিকিট কাটা আছে।

তাহলে ফেরার পথে দেখা করে আসিস।

কী বলব?

ওইতো রাসবিহারীবাবু মেয়ের ঠিকুজী পাঠিয়েছেন।

মানু আর দেরি করেনি। রাসবিহারীবাবু, কেন লোক পাঠায় সে—সব জানার ইচ্ছে তার বিন্দুমাত্র নেই। বাবা ছক মিলিয়ে যাচ্ছেন। ছক ছাড়া কোনো কাজ হয় না। এবং এই নিয়ে কত যে ছক এ বাড়িতে এল। এবারে এসেছেন রাসবিহারীবাবু। সে মনে মনে হেসে ফেলল। তারপর সে ঘরে ঢুকে জামা গলিয়ে বের হয়ে পড়েছিল।

এবং ভুবনবাবু খেয়ে উঠে যখন করিডরে হেঁটে যাচ্ছিলেন—মনে হয় কেমন নিস্তব্ধ এই আবাস। কারও কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ছুটির দিন, সবারই থাকার কথা, বড়টার তো একটায় বাড়ি ফিরে আসার কথা, আসেনি, বোধহয় প্রিয়নাথের বাড়িতে যাবে। প্রিয়নাথ দাবা খেলতে পছন্দ করে—খেলাটি প্রিয়নাথই ভানুকে শিখিয়ে নিয়েছে। প্রিয়নাথ ছেলের মৃত্যুর পর বাড়ি থেকে একেবারে বের হয় না। কেবল সন্ধ্যার দিকে পাশের আশ্রমে যায়। গীতাপাঠ, কীর্তন প্রভৃতির ভেতর কিছুক্ষণ ডুবে থাকতে ভালোবাসে। প্রিয়নাথ যৌবনে ঘোর নাস্তিক ছিল। সেই প্রিয়নাথ ধর্মে এমন মজে গেছে দেখে তার সামান্য হাসি পাচ্ছিল। প্রিয়নাথের নাতনি কাকলি মাঝে মাঝেই ভানুকে ডেকে নিয়ে যায়। কী যে জরুরি কাজ এত, তিনি বোঝেন না। ভানুকে আজকাল এ বাড়ির বড় ছেলে ভাবতে কষ্ট হয়। দায়—দায়িত্ব সবই ঠিকঠাক বহন করছে, কিন্তু তবু মনে হয় সংসার—বিচ্ছিন্ন মানুষ। দু—একবার মেয়ে পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু ছেলের ভারি অমত। যা রোজগার তাতে বিয়ে করা বিলাস—ভুবনবাবু নিজের অক্ষমতাকেই যেন তখন বেশি করে দায়ী করেন। মা—বাবা ভাই বোনের দায় যার এত, বিয়ে করা তার পক্ষে শোভা পায় না। সে—জন্য একটা অপরাধবোধে মাঝে মাঝে ভীষণ কাবু হয়ে যান ভুবনবাবু। সংসারে ঠিক যেভাবে রাশ টেনে রাখা দরকার পারেন না। আলগা রশিতে সবই ঢিলেঢালা হয়ে যায়। তার গাম্ভীর্যকে কেউ আর বেশি আমল দেয় না।

তিনি তার বিছানায় এসে বসলেন। সামান্য শুয়ে থাকা। কিছু গাছপালা সম্পর্কিত বই, এবং তাঁর ভেষজ গুণাগুণ কী কী আছে, জানার খুব আগ্রহ তাঁর। এটা ইদানীং হয়েছে। পেটের নীচের দিকে একটা ব্যথা টের পান। মাঝে মাঝে ব্যথাটা তীব্র হয়ে ওঠে। মুখ ফুটে খুব একটা চিৎকার চেঁচামেচি করার স্বভাব না, তলপেটে হাত দিয়ে শুয়ে থাকেন অসার মানুষের মতো। ইদানীং কবিরাজি ওষুধে ভালো ফল পেয়েছেন। দেশীয় গাছ—গাছড়ার প্রতি এ—জন্য আকর্ষণ তার দিন দিন বাড়ছে। প্রিয়নাথের পুত্রবধূ বড় একটা পাঠাগারে কাজ নিয়েছে। সে—ই এ—সব পেলে তাকে পাঠিয়ে দেয়।

সুতরাং জানালা খুলে বসলেন তিনি। পাখা চালিয়ে খুব একটা লাভ নেই। গরম গুমোট হাওয়া। বরং গাছপালার অভ্যন্তরে যে হাওয়া বয়ে যায়, তাতে কিছুটা ঠান্ডা ভাব থাকে, পাখার হাওয়ায় শরীরে গিঁটে গিঁটে আজকাল ব্যথা ধরে যায়। সংসারের অনেক কিছুই আজকাল তার অপ্রয়োজনীয় ঠেকছে। পাখা না চালিয়ে বাইরের হাওয়ার জন্য জানালার কপাট আরও ভালো করে খুলে দিলেন।

তখন নীরজা একা রান্নাঘরে। কবে যে নীরজা এ—ভাবে ভারি একা হয়ে গেল, সব মানুষই বুঝি একদিন এ—ভাবে একা হয়ে যায়। তার সেই যৌবন, নীরজার মায়াবী মুখের কথা আর মনে পড়ে না। বাবা, মা, ছোট কাকা বড় পিসি সব মিলে যৌথ সংসারে নীরজা এসেছিল। তারপর নীরজার শহর বাস। সন্তানদের জন্যে সকাল বিকাল একদণ্ড তার বিশ্রাম ছিল না। কে স্কুল থেকে ফিরল, কার ফিরতে দেরি হচ্ছে, কেউ সময়মতো না ফিরলে বাসস্টপে ছুটে যাওয়া এবং ভুবনবাবুর তখন দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। সেই ছেলে মেয়েরা এখন বড় হয়ে গেছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

কেউ একবার বলেও না, মা, তুমি কেমন আছ! ছুটির দিনে নীরজার আজকাল সবাইকে নিয়ে বেশ খাওয়া—দাওয়ার পর পুরানো দিনের গল্প করতে শখ জাগে কিনা একবার জিজ্ঞেস করবেন ভাবলেন। নীরজা তোমার ইচ্ছে হয় না, তক্তপোশের নিচ থেকে পানের বাটা বের করে পা ছড়িয়ে বসার। তুমি জাঁতিতে সুপুরি কাটতে কাটতে গল্প করবে, আমরা শুনব। অথচ দ্যাখ তোমার কেউ নেই। এত করে যে সবাইকে বড় করলে, ওরা কারা?

নীরজা বোধহয় খেতে বসেছে। নীরজা কী খায়, অথবা কীভাবে খায় দেখার ভারি ইচ্ছে হল। নীরজা কখনও খায় মনে হয় না। দুষ্টু বালকের মতো পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন। অনেকদিন পরে স্ত্রীর সঙ্গে একটু দুষ্টুমি করার ইচ্ছে হল। তক্তপোশ থেকে নেমে সন্তর্পণে মুখ বাড়ালেন। নীরজা আলগা করে জল খাচ্ছে! সেই একটাই গ্লাস, গ্লাসটার সঙ্গে নীরজার বোধ হয় নাড়ির টান আছে। জল খাবার সময় নির্দিষ্ট

গ্লাসটি তার চাই। অনেক উঁচু থেকে জল ঢেলে বেশ খাচ্ছে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে। ভারি তৃষ্ণার্তের মতো! সংসারে এত তৃষ্ণা কীসের!

দরজায় ভুবনবাবু।

নীরজা চোখ মেলে তাকাল। ও মা তুমি! ঘুমাওনি! কী দ্যাখছ!

ভুবনবাবু বললেন, তোমাকে।

নীরজা খুব শান্ত গলায় বলল, আমার আর কিছু দেখার নেই।

ভুবনবাবু দরজার ওপর উবু হয়ে বসলেন।

শোও না গিয়ে।

ভুবনবাবু বললেন, তুমি খাও। আমি একটু বসি।

আর জায়গা পেলে না বসার?

নীরজা!

অসময়ে মানুষটার চোখ—মুখ খুব ভালো ঠেকছে না। নীরজা সামান্য মাছের ঝোল দিয়ে ভাত নেড়েচেড়ে নিচ্ছিল। মানুষটা ঠায় বসে আছে। তার খাওয়া দেখছে।

নীরজা বলল, ঘুম আসছে না?

তুমি আর এক হাতা ভাত নাও। মনে হয় তোমার পেট ভরেনি।

নীরজা খেতে খেতে বলল, তবে এক হাতা ভাত দাও।

অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে গেল ভুবনবাবুর। তখন নীরজা আর সে। রাতের বেলা নীরজা খেতে বসে প্রায়ই ডাকত, ভাত দাও। ভাত লাগবে।

যেন নীরজা মানুষটাকে সব সময় কাছে কাছে রাখতে ভালোবাসত। এবং শরীরে তখন কী যে মোহ। শরীরে সব সময় আশ্চর্য সৌরভ মেখে ঘুমোত নীরজা। কাজে গেলে নীরজার জন্যে মনটা পড়ে থাকত বাসায়। কতক্ষণে ছুটি হবে, কতক্ষণে আবার দরজা খোলার সঙ্গে নীরজার মুখ দেখবে। এবং কত রকমের কূট চিন্তা যে মাথায় এসে ভিড় করত তার।

রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করবার সময় ভুবনবাবু বললেন, নীরজা একটা কথা আছে?

নীরজা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছিল। —কী কথা।

লুডো খেলতে ইচ্ছে করছে।

বুড়ো বয়সে ও—সব শখ ভালো না!

খুব বুড়ো হয়েছি?

নীরজা কিছু বলল না। মানুষটা কিছুদিন থেকেই কেমন অন্যমনস্ক। রমার চাকরিটা হবার পর কিছুদিন ভারি খুশি ছিলেন, তারপর আবার আগের মতো। অরুণ এলে যতটা কথা বলা দরকার, ততটাই। এবং যেহেতু মানুর একটা চাকরি দরকার, অরুণের সঙ্গে বরং একটু বেশিই কথা বলেন। মাঝে মাঝে কথা বলতে গিয়ে হেসেও দেন।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর নীরজা বেশ পা ছড়িয়ে বসবে একটুক্ষণের জন্য। বেশ সুন্দর করে আপন মনে সুপুরি কাটবে। পান খাবে। তারপর একটু গড়িয়ে নেওয়া স্বভাব। তখন মানুষটা তক্তপোশে শুয়ে থাকে। ঘুমিয়ে থাকে কী জেগে থাকে বোঝা যায় না। খুব দরকারি কথা মনে পড়ে গেলেও জিজ্ঞেস করে না নীরজা। কারণ মানুষটার আজকাল ঘুম এমনিতেই কম হয়। সব সময় কেমন সন্ত্রস্ত থাকেন। নীরজা মাঝে মাঝে না বলে পারে না, এখন তো তুমি সুখের নাগাল পেয়েছ। এত ভাবার কী আছে বুঝি না।

সুখের নাগাল পেয়েছেন ঠিক। সংসারে হা—অন্ন বলতে আর কিছু নেই। বরং বেশ উঁচু মধ্যবিত্তের যা যা লাগে সবই একে একে ছেলে মেয়ে দুজনে মিলে করে ফেলেছে। বেশি ভাড়ার বাড়ি, বসার ঘর, সোফা সেট, এবং কদিন পর বাড়িতে একটা ফ্রিজ—টিজ হয়তো চলে আসবে। মানুর চাকরিটা হয়ে গেলেই

বোধহয় ওটা হয়ে যাবে। এবং তিনি বুঝতে পারেন, তখন তিনি আরও একাকী। অরুণের পিছনে মেয়েটা ছুটছে। রমার এ—বয়সে এত স্বাধীনতা সহ্য হবে কিনা বুঝতে পারছেন না। যদিও তিনি এ—কালের বাবা, অথচ এ—কালের সন্তানদের ঠিক বুঝতে পারেন না যেন—কেমন দুঃখী মুখে একটা আশঙ্কা লেগে থাকে সব সময়।

তিনি বললেন, রমাকে নিয়ে অরুণ কোথায় গেল?

অফিসের কোন বাবুর যেন বউভাত।

আসলে সবই বলে গেছে রমা। কিন্তু কেউ কোনো গুরুত্ব দেয়নি। ভবিতব্য ভেবে ছেড়ে দেওয়া। বিয়ের জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করতেও আজকাল ভরসা পাচ্ছেন না। ফের সংসারে আবার কিছুটা হা—অন্ন ঢুকে যেতে পারে। এত বড় সমস্যায় মানুষ কখনও পড়ে যায় ভুবনবাবুর জানা ছিল না।

নীরজা বলল, ওষুধ খেয়েছ?

না।

নীরজা জল ও ওষুধ দিলে ভুবনবাবু বললেন, ওরা কখন ফিরবে বলে গেছে?

মানু বলেছে শো দেখতে যাচ্ছে। ফিরতে সন্ধে হবে।

রমা?

ও কখন ফিরবে ঠিক নেই?

কেন ঠিক থাকে না, তুমি একবার ওটা ভেবে দেখেছ?

কিছু ভাবি না। অত ভাবলে সংসার চলে না।

রমার বিয়ে দেওয়া উচিত।

উচিত, করলেই হয়। কে বারণ করেছে। নীরজা ক্ষুণ্ণ গলায় কথাটা বলল।

মেয়ে তোমার রাজি হবে কিনা একবার জিজ্ঞেস কর তো?

রাজি হবে না কেন?

ভুবনবাবু আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না। কেবল মুখ ফিরিয়ে বললেন, ওদের কোনো টান নেই।

নীরজা দু'কুচি সুপুরি আলগা করে মুখে ফেলে দিল। বলল, টান না থাকলে এত কেউ করে না।

ছুটির দিনে দেখেছ কেউ বাসায় থাকতে চায় না।

নীরজা ভুবনবাবুর দুঃখটা কোথায় বুঝতে পারছে। মানুষটা সব সময় সবাইকে কাছে পিঠে নিয়ে থাকতে চায়। কাজের দিনে এমনিতেই কেউ বাড়ি থাকতে পারে না। কথাও বিশেষ হয় না। বড় ছেলে আজকাল অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফেরে না, প্রিয়নাথের বাড়িতে দাবা খেলে রাত করে ফেরে! তিনি সবাই না আসা পর্যন্ত বারান্দায় পায়চারি করেন, দোতলার বারান্দায় বসলে রাস্তার অনেকটা দেখা যায়। কে কতদূর আছে কে কখন ঢুকছে সবই তিনি টের পান। এবং সবাই এলে তিনি আর কোনো কথা বলেন না। ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েন। এ—বাড়িতে ভুবনবাবু বলে কেউ আছে তখন বোঝা যায় না। কেবল রমা এলে বলবে, বাবার খাওয়া হয়ে গেছে? বাবা শুয়ে পড়েছে? শুয়ে থেকে মেয়ের এমন দু—চারটে কথা শুনতে পান। রাতে আজকাল রমা প্রায়ই বাড়িতে খায় না। কোথাও না কোথাও সে খেয়ে আসে। বাইরের হাবিজাবি খাওয়া আজকাল এত বেড়েছে যে তিনি যথার্থই শঙ্কা বোধ করেন।

ভুবনবাবু বললেন, খুব দুঃসময় আমাদের।

নীরজা এ কথার কোনো তাৎপর্য খুঁজে পেল না। বলল, এ—কথা বলছ কেন?

এখন রাহুগ্রাসের সময়। সাবধানে থাকা ভালো। বৃষ রাশির পক্ষে সময়টা খুব শুভ নয়। মানুকে বললাম যতীন সেনের কাছে যেতে। ও আমাদের কুষ্ঠি বিচার করে রাখবে। শান্তি স্বস্ত্যয়নের দরকার হতে পারে। ছেলেরা কেউ কথা শোনে না। এত কী কাজ, আসার সময় যতীনের কাছে হয়ে এলে কী যে মহাভারত

অশুদ্ধ হয়ে যাবে বুঝি না। তা—ছাড়া রাসবিহারীবাবুও তাঁর মেয়ের ঠিকুজী পাঠিয়েছেন। সেটাও দেখা দরকার।

মিলে গেলে আমি আর দেরি করব না নীরজা। বিয়েটা ভানুর দিয়ে দেওয়া দরকার।

বয়স বাড়লে মানুষ বাতিকগ্রস্ত হয়ে যায়। আজকাল মানুষটার খুব করকোষ্ঠীর প্রতি বিশ্বাস জন্মে গেছে। যাত্রা শুভ কী অশুভ, এসব বাছবিচার করে চলার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। নীরজার এতে খুব একটা অবিশ্বাস নেই, কিন্তু তার জন্যে সব সময় আতঙ্কিত হয়ে থাকা কেমন হাস্যকর লাগে। সে বলল, তুমি দিন দিন বড় ভীতু হয়ে পড়ছ।

নীরজা জানে মানুষটা এবার অনেক কথা বলবে। সে মেঝেতে ফল—ফুল আঁকা দামি সতরঞ্চি পেতে নিল! শুয়ে শুয়ে বাকিটুকু শোনা যাবে।

ভুবনবাবু বললেন, নীরজা তোমার ভয় করে না?

কীসের ভয়?

মেয়ে তোমার কিছু একটা করে ফেলতে পারে!

বড় হয়েছে। ছোট নেই। হলে ফলভোগ করবে। নীরজা কেমন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তোমার যখন এত সংশয়, মেয়েকে না ছাড়লেই পারতে। বাইরে বের হলে একটু স্বাধীনতা দিতেই হয়।

আগে বুঝতে পারিনি এতটা হবে।

যখন বুঝলে এতটা হচ্ছে তখন আর চুপ থাকা কেন। বলে দাও না, এ বাড়িতে থাকতে হলে চাকরি করা চলবে না। চাকরির জন্যে আগে তুমিও তো কম লোককে ধরাধরি করনি। ভাগ্যিস অরুণের সঙ্গে পরিচয় ছিল। এখন দুঃখ করে আর লাভ নেই।

তোমার বড় ছেলে দুপুরে কোথায় কী করছে তাও তুমি জান না।

সব জানি। বুঝি। কিন্তু এখন ওদের হাতে। কিছু বলতে পারি না।

আস্কারা দিয়েছ! বুঝবে।

আমার আর বোঝার কী আছে। সব বুঝে ফেলেছি। তুমি এখন বোঝো। সারাজীবন তো নিজের গোঁ নিয়ে থাকলে। কারও অধীন হয়ে থাকতে পারলে না। এখন নিজের কাছে নিজেই হেরে যাচ্ছ। মজা মন্দ না।

সাত

ভারি দুরন্ত হয়েছে কাকলি। চুল বব করা। দৌড়াতে গেলে গোটা শরীর যেন নেচে বেড়ায়। শাদা শাটিনের ফ্রক পরতে পছন্দ করে মেয়েটা। কাকাবাবুকে দেখলে ওর দুষ্টুমি আরও বেড়ে যায়। দাদু কাকাবাবু সকাল থেকে সেই যে উবু হয়ে বসেছে ওঠার নাম নেই। কাকলি দৌড়ে এসেছে দরজায়। মুখ বাড়িয়ে বলছে, তোমরা চান করে নাও। মা চান করতে বলছে।

প্রিয়নাথ বললেন, এই হয়ে গেল।

ভানু প্রিয়নাথের মুখ দেখল। সংসারে মন্দাকিনী বউদি, কাকলি এবং বুড়ো মানুষটা। ঠিক বুড়ো নয়, প্রৌঢ় বলা চলে প্রিয়নাথকাকাকে। বয়স বাবার চেয়ে কিছু বেশিই হবে। তবু কী করে যে কাকা হয়ে গেলেন! প্রিয়নাথকাকা, একসময় বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। প্রিয়নাথ কাকা একসময় মা'র ভীষণ খোঁজখবর করতেন। এবং এখনও মা, একবার পুরীতে প্রিয়নাথকাকা কত অবহেলা ভরে সমুদ্রের ঢেউ থেকে তাকে তুলে এনেছিল তার গল্প করতে ভালোবাসে। সেবারে প্রিয়নাথকাকা সঙ্গে না থাকলে জলে ডুবেই মরতে হত। মা ঠেস দিয়ে বলত, তোমার বাবা যা একখানা পুরুষ! বয়সকালে প্রিয়নাথকাকা খুবই সুপুরুষ ছিলেন। আধ পাকা চুল। বাবার চেয়ে কম বয়সি মনে হয়। নিজে সুন্দর, বউমাকে বাড়ির মতো মানিয়ে এনেছিলেন। ভয় ছিল বাড়ির নীল রক্ত যেন কলুষিত না হয়। কাকলির উরু দেখা যাচ্ছিল ফ্রকের নীচে। বয়স তো খুব বেশি না। তার চাল ভুল হয়ে যাচ্ছে।

সে হেরে গেলে প্রিয়নাথকাকা খুশি হয় খুব। আর এই নিয়ে মন্দাকিনী বউদি হাসি ঠাট্টা করতে ভালোবাসে। —মন কোথায় থাকে?

প্রিয়নাথ শেষ চালে এসে দেখলেন, কিস্তি দেবার মতো গুটির বল নেই। সারাদিনই ছকের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে। সুতরাং বললেন, তুমি বসো। স্নানটা সেরে নিচ্ছি। এবং কাকলিকে ডেকে বললেন, ভানুকে একটা কাপড় বের করে দে।

প্রিয়নাথ চানের ঘরে চলে গেলেই কাকলি ছুটে ঘরে ঢুকে পড়ল। বলল, তুমি ভারি মিথ্যুক।

ভানু বুঝতে না পেরে বলল, মিছে কথা কখন বললাম?

তোমাকে মারব। বলেই চুল খামচে ওর পিঠে ঝুলে পড়ল।

সান—ফ্লাওয়ার চলে গেছে বললে কেন?

আছে নাকি?

আমার বন্ধুরা তো দেখে এল।

তোকে সাউন্ড অফ মিউজিক দেখাব।

না দেখব না।

ক্রেজি বয়। খুব ভালো বই।

মেয়েটি ওর ঘাড়ে ঝুলে এভাবে অজস্র কথা আর আদর খাবার ছলনাতে বেশ জড়িয়ে যাচ্ছে। ভানুর এত ভালো লাগে কেন এটা। ইচ্ছে হয় কোলে নিয়ে ফাঁপানো চুলে বিলি কেটে দেয়। মেয়েটা বুঝতে পারে মা এখন কোথায়। তার ঘিলুতে সব সময় এই বাড়ির একটা প্রতিবিম্ব ভাসে, প্রৌঢ় মানুষটি সব সময় সতর্ক নজর রাখছেন। অথচ এই প্রৌঢ় মানুষটি না থাকলে সে যখন তখন হুট হাট এ বাড়িতে আসতে পারত না।

যেমন এখন রান্নাঘরে মন্দাকিনী বউদি, এ ঘরে সে আর কাকলি। স্নানের ঘরে প্রিয়নাথ কাকা বেশ সময় নিয়ে চান করতে ভালোবাসেন। মন্দাকিনীর চটির শব্দ পাওয়া যাবে, এ—দিকে এলেই টের পায় কাকলি মা আসছে। তখন সামনে বসে মেয়েটা পা দোলাবে। মন্দাকিনী হলুদ ছোপের হাত আঁচলে সামান্য মুছে বলবে, তোমাকে জ্বালাচ্ছে?

ভানু হেসে বলবে, খুব।

সে বলল, কাকলি রোমান—হলিডে দেখবে নাকি?

মাকে বল না!

মন্দাকিনীকে বললে, সেও বায়না ধরবে, আমাকে নিয়ে চল! এবং প্রিয়নাথকাকা মনে করেন সঙ্গে কাকলি থাকলে যে—কোনো জায়গায় ভানুর সঙ্গে মন্দাকিনী যেতে পারে। আজ রান্নার লোকটা কামাই করেছে। কামাই না করলেও ছুটির দিনে শ্বশুরকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ায় বউদি। এবং ভানু এলে বুঝতে পারে, এত বড় একটা শোক, সহজেই মন্দাকিনী বউদির উবে যায়। কাকলি পর্যন্ত সে—দিনের সেই শোককে আর মনে করতে পারে না। ভানুকে দেখলে ওরা দুজনেই ভারি খুশি হয়ে ওঠে।

ভানু এখন বুঝতে পারে না আকর্ষণটা কার প্রতি তার প্রবল! কাকলি, না মন্দাকিনী। কাকলিকে ফ্রকে আর মানায়ও না। তবু মন্দাকিনী আরও কিছুদিন হয়তো কাকলিকে বালিকা সাজিয়ে রাখবে। এবং সে টের পায়, এই বালিকা সাজিয়ে রাখার ভেতর মন্দাকিনীর যে খুব একটা বয়স না, এখনও দীর্ঘ সময় ধরে সে যুবতীর মতো বেঁচে থাকতে পারে, কারণে অকারণে ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠলে, সদ্য পাশ করা যুবতীর চেয়ে কম যাবে না, এ—সব বোধহয় বলতে চায়। এবং বিয়ের সময় কত বয়স, কবে কাকলি হয়েছে, এই হওয়ার ভেতর জন্মের তারিখ বলে—টলে আজকাল মন্দাকিনী খুব একটা সুখ পায়। এবং ওর যে কী হয় তখন! নির্দোষ কথাবার্তা। অথচ ব্যাপারটার ভেতর এমন সব ঘটনা বা দৃশ্য থেকে যায়, যা তাকে ভীষণ প্রলুব্ধ করে। আর এ—সব কথাবার্তা যে খুব গোপনে হয় তাও না। প্রিয়নাথকাকার সামনেই যে—কোনো অছিলায় একবার মনে করিয়ে দেওয়া, বাবা তো আমাকে বালিকা বয়সেই নিয়ে এল। বালিকা বয়েস!

বয়েসটা তরুণীর হলে ক্ষতি ছিল কী! এবং গত চোদ্দই জুন সকালবেলায় বউদি বলেছিল, বুঝলে ভানুবাবু, বালিকাবধূতে আলাদা সুখ আছে। আসলে কী বালিকা বয়সে বিয়ে হলে খুব একনিষ্ঠ থাকা যায় এমন কিছু বলতে চায় মন্দাকিনী! না অন্য কিছু? না পবিত্র আধারে প্রবিষ্ট হবার মতো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা শুধু বালিকাবধূতেই! কোনটা?

প্রিয়নাথকাকা স্নান সেরে যাবার সময় উঁকি মেরে বললেন, যাও ভানু, আমার হয়ে গেছে।

মন্দাকিনী বউদি সকালেই বোধহয় আজ স্নান সেরে নিয়েছে। রবিবার ভানুর ছুটির দিন। এ—দিনটাতে মন্দাকিনীও ছুটি করে নিয়েছে। এবং ভানু আজকাল কখনও কোনো হলের নীচে প্রতীক্ষা করে থাকে। মন্দাকিনী বউদিকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ারও একটা কাজ আছে তার।

প্রিয়নাথ নানাভাবেই ভানুকে এ বাড়ির জন্যে ভারি দরকারি ভেবে থাকেন। সুতরাং প্রিয়নাথ বললেন, বউমা ওকে একটা কাপড় দাও!

মন্দাকিনী বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল। বলল, কী কিছু পরতে হবে না।

ভেতরে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। বোধহয় শুনতে পায়নি। সে বলল, ও ও মশাই কাপড় নেবেন না!

কাকলিও এসে গেছে। কেমন একটা মজা পায় এই মানুষটির কথাবার্তায়। ভেতরে মানুষটা চান করছে। শরীরে কী থাকে, স্নানের সময়ের কিছু কিছু দৃশ্য এ—সময় ওদের দুজনই ভেবে ফেলে। দুজন দু—রকম ভাবে। মন্দাকিনী খুব সরল বালিকার মতো মুখ করে আছে। কাকলি ভারি গম্ভীর। এবং দরজা সামান্য ফাঁক করে কাপড়টা নেবার সময় বোধহয় কেউ খুব একটা ভালো থাকছে না ভেতরে। লম্বা লোমশ ভেজা হাত, মন্দাকিনীর শরীর কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে। এবং কাকলির দৃশ্যটা বেশ মধুর লাগছিল। অথবা বলা যায় মানুষটার গায়ের গন্ধ কেমন স্নানে আর সাবানে মিশে গেছে। পরিচ্ছন্ন সুগন্ধযুক্ত সুশ্রী মানুষ, বয়স তিরিশের কোঠায়, এবং মুখে খুব বিনীত বাধ্যের ছাপ, এ মানুষকে পছন্দ না করে উপায় থাকে না।

কাকলির বায়না কত। আজকাল যে—কোনো বায়না, গোপনে অথবা সবার সমক্ষে এই মানুষটাই তামিল করে থাকে। রোমান—হলিডে দেখে কী হবে! সাউন্ড—অফ মিউজিক, একান্ত না হলে লাভ স্টোরি, সে ভেবেছিল ফিসফিস গলায় বলবে, লাভ স্টোরি বইটা দেখাবে ভানুকাকা? আমাদের ক্লাসের মাধুরী অনীতা দেখেছে। আমাকে দেখাবে? পালিয়ে তোমার সঙ্গে একদিন দেখে আসব। কেউ টের পাবে না? ফন্দি ফিকির ভাবতে সময় লাগে না কাকলির। ভানুকাকার ফোন নাম্বার জানা। বারোটা তিনটে, এবং তিনটের সময় বই দেখে ফিরলে দাদু ঠিক ভাববেন, কাকলি স্কুল থেকে ফিরছে। কোনো কিছুর জন্যে এমনিতেই আর দাদু তাকে তিরস্কার করেন না। কেবল মাঝে মাঝে দাদুর মুখ কেন জানি গম্ভীর হয়ে যায়। তখন সে বুঝতে পারে দাদু ভীষণ রাগ করেছেন। আর সে তখন এমন বিমর্ষ হয়ে যায় যে দাদু কিছুতেই আর গম্ভীর থাকতে পারেন না। —কাকলি কোথায় রে!

এই যে দাদু। সে লাফিয়ে দাদুর কাছে চলে যায়।

লেকের ধারে যাবি নাকি?

আমার ভাল্লাগে না। অতসী আসবে বিকেলে।

আমার সঙ্গে তোর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না, না রে?

কেন, যাইতো। তোমার সঙ্গে সেদিন রেখা পিসিদের বাড়ি গেলাম তো।

আগে তো পা উঠিয়েই থাকতিস!

কাকলি বলবে, এখনও থাকি।

দাদু আর তারপর কিছু হয়তো বলবেন না। পত্রিকার কিছু কিছু কাটিং রাখার একটা স্বভাব আছে দাদুর। সবদিন রাখেন না। কখনও কোনোদিন রাখলে কাগজটা আলাদাভাবে তুলে নিয়ে বিছানার নিচে রেখে দেবেন। বিকেলে কাকলি এলে তাকে নিয়ে বসবেন। গঁদ এবং শাদা ফুলস্কেপ কাগজে এঁটে দেবেন দাদু কাটা কাগজগুলি। সে তা রোদে বিছিয়ে সামান্য শুকনো করে ফাইলে সাজিয়ে রাখবে। এবং কখনও দাদু ওর বই

অথবা চশমা হাতে দিয়ে বলবেন, রেখে দে এবং নানারকমের সব হজমি ওষুধ খাবার পর আদর করে হাতে দেবেন! বলবেন, খা।

সুতরাং এ—বাড়িতে কাকলির বাবা নেই বলে সে হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার কথা ছিল, দাদু, ভানুকাকা এবং মা মিলে সেটা পুষিয়ে দিচ্ছে। বরং সে এখন তার বান্ধবীদের সঙ্গে একটু রাত করে ফিরলেও দাদু কিছু বলেন না। বাবা থাকতে একটা সুন্দর রেকর্ড প্লেয়ার কিনে দিয়েছিল তাকে। তার প্রিয় গানের রেকর্ড আলমারিতে সাজানো। বাবার মৃত্যুর পর মাস দুই ভীষণভাবে মুহ্যমান ছিল। তখন দাদু যে সব গান সে শুনতে ভালোবাসত, তার কোনো একটা রেকর্ড—প্লেয়ারে বাজাতেন। যেন বাড়িটাকে আবার স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে দাদুর শেষ চেষ্টা। শোকে বাড়িঘর অন্ধকার হয়ে থাকবে মনে হতেই বুঝি দাদু ডেকে এনেছিলেন ভানুকাকাকে। এই বাড়ির ব্যালকনিতে একজন মানুষ অফিস থেকে ফিরেই রাতের আকাশ দেখতে ভালোবাসত। এখন আর তা যেন কারও মনেই নেই। সবাই কেমন সহজেই সব কিছু মেনে নিয়েছে।

প্রিয়নাথ আজকাল নিরামিষ খেতে ভালোবাসেন। মাছ—টাছ খেতেই চান না। মন্দাকিনী তবু জোরজার করে খাওয়ায়। বাইরে প্রিয়নাথের আধুনিক মানুষের মতো ব্যবহার। ভেতরে তার এখনও একজন প্রাচীন মানুষ আছে। যে চায়—মন্দাকিনী আচার—বিচার মেনে চলুক। একজন সদ্যবিধবার পক্ষে আচার—বিচার কথাটা খুব জোর গলায় বলা ঠিক না। মাছটা মাংসটা মন্দাকিনী এখনও খাচ্ছে না। খেলে তিনি খুব একটা বাধাও দেবেন না। তবু যতদিন না খায় ততদিনই যেন একটা স্বস্তি আছে। মাছ মাংসের সঙ্গে শরীরের লোভ —লালসা বাড়ে বই কমে না। তিনি সেটা বোঝেন। এবং এ—জন্য নিরামিষ খাওয়ার ঝোঁকটা ইদানীং বেড়েছে। কাকলির অন্য রকমের স্বভাব। নিরামিষ খেতেই পারে না। তাছাড়া প্রোটিন জাতীয় খাবার বালিকা বয়সে খুবই দরকার। কাকলির জন্যে মাছ, কখনও মাংস অথবা ডিম বাড়িতে করতেই হয়। খেতে বসে মন্দাকিনী আজকাল জোরজার করে সামান্য মাছ—মাংস প্রিয়নাথকে খেতে দেয়। প্রিয়নাথও যেন কিছুটা বিরক্ত মুখে কোনোরকমে শুধু গলাধঃকরণ করা আর কিছু না, না হলেই ভালো ছিল, তবু শরীর বলে কথা, মন্দাকিনী সব সময়েই শরীরের কথা মনে করিয়ে দেয় প্রিয়নাথকে। —খান বাবা। না খেলে শরীর টিকবে কী করে। তার যেন বলার ইচ্ছে, শরীর যে সব বাবা। তার যে ইচ্ছের শেষ নেই। প্রিয়নাথের মুখোশ পরে থাকার স্বভাব সব সময়। ভেতরের লোভ তিনি সামলাতে পারেন না। খুব সহজেই খেয়ে নেন। খুব স্বার্থপরতার মতো দেখায়, এ—জন্য একদিন খাবার পর হজমি খাবার সময় ডেকেছিলেন, বউমা।

মন্দাকিনী হাত মুছতে মুছতে প্রিয়নাথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বউমার দিকে তিনি চোখ তুলে তাকাতে পারেননি। বড়ই পুষ্ট শরীর এবং নিরামিষ আহারে লাবণ্য বোধহয় শরীরে আরও বেড়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়ে যান তিনি। বলেন, বউমা একটা কথা ছিল।

মন্দাকিনী শুধু তাকিয়ে ছিল শ্বশুরের দিকে, কিছু বলেনি। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথায় এলে শ্বশুরমশাই এ—ভাবেই কথা আরম্ভ করেন।

আমি বলছিলাম কি......

আবার প্রিয়নাথ কথা শেষ না করেই অন্যদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছিলেন। মন্দাকিনী তখনও কিছু বলেনি।

বলছিলাম, আজকাল কেউ আর অত মেনে—টেনে চলে না।

তুমি ইচ্ছে করলে.....', আবার কথা শেষ না করেই সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজছিলেন।

মন্দাকিনী তখন বলেছিল, আমার বাবা কোনো কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। আপনি এ নিয়ে ভাববেন না।

প্রিয়নাথ খুব খুশি হয়েছিলেন। বউমা এমনিতে খুবই বুদ্ধিমতী। কে কী পছন্দ করে বউমা ঠিক বুঝতে পারে। তিনি তখন আরও উদার হয়ে যান। বলেছিলেন, বউমা বাকি জীবনটা তোমার পড়ে থাকল। আমার দুর্ভাগ্য। চোখের ওপর দেখতে হবে সব।

এই চোখের ওপর দেখতে হবে সব, সেটা কী দেখতে হবে। দেখতে হবে, একজন সদ্য বিধবা যুবতী কীভাবে শরীরের সব ইচ্ছে নষ্ট করে দেয়। সব প্রলোভন জয় করে ফেলেছে, আসলে এটাকে কি প্রলোভন বলা চলে! একজন মানুষের স্মৃতি কতদিন বয়ে নিয়ে যাওয়া চলে! একজন মানুষের স্মৃতি তাকে কতদিন সুস্থ রাখতে পারবে—এটা কী তিনি কেবল দেখতে চান, খাদ্যবস্তুতে ভেজাল না থাকুক। এমনভাবে সব চলুক, সংসার ভেঙে না যায়, সব ঠিকঠাক চলছে, আহারে কিছু মাছ মাংস থাকুক, অথচ কেউ টের পাবে না, গোপনে সবাই সব কিছু খেতে পছন্দ করে থাকে।

মন্দাকিনী বলেছিল, বাবা, আজকাল আপনি বড্ড বেশি ভাবেন। আমার কপালে এমনই লেখা ছিল। আর আমার তো কোনো কষ্ট হয় না।

প্রিয়নাথ বউমার দিকে তাকিয়ে মনে মনে হেসেছিলেন। কষ্ট হয় না কথাটাই মিথ্যে। তবু শুনতে ভালো লেগেছিল। শরীরের কষ্ট কেউ লাঘব করতে পারে না। রুচির কথা যদি ধরা যায়, এটাও একজন প্রৌঢ় মানুষের কথা ভেবে, কারণ একমাত্র পুত্রের শোক মানুষের কাছে যে কী ভয়াবহ মন্দাকিনী সেটা বুঝতে পারে। সাধারণ রুচিতে বাধে বলেই কোনো কষ্টই কষ্ট বলে মনে করছে না মন্দাকিনী। এবং প্রিয়নাথ কখনও কখনও নিজেকে একজন সতর্ক প্রহরীর মতো দেখতে পান। যেন বাড়িটার চারপাশে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। কখন দরজা খোলা পেয়ে চোর—ছ্যাঁচোড় ঢুকে যাবে ঠিক কি!

আর দিন যত যাচ্ছে প্রিয়নাথ বুঝতে পারছিলেন, যতই সতর্ক থাকুন, কিছু না কিছু অভ্যন্তরে ঘটেই যাচ্ছে। এবং যতই তিনি সতর্ক থাকুন না, অভ্যন্তরে যে সংকট, তা থেকে বউমার ত্রাণ নেই। ত্রাণ কথাটাই তাঁর মনে হয়েছিল। এবং নিজেকে এত সতর্ক রাখতে কেমন একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল। যেহেতু খুব বিবেচক মানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে, এবং বিবেচক হতে গিয়েই টের পেয়েছিলেন, সংসারে তিনি যে গণ্ডী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন সেটা একজন মানুষের ওপর অবিচারের শামিল! স্ত্রী গত হওয়ার পরে বুঝতে পারতেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর ভয়াবহ সব ইচ্ছেরা ইঁদুরের মতো কুরে কুরে খেত। এবং তিনি নীরজা নামক এক যুবতীর দরজায় কতদিন আহম্মকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতেন। দরজা খোলা পেলে নীরজা কখনও কিছু দিয়ে বলত, আর না। ভারি লোভ। এত লোভ ভালো না। তখনই মনে হত সংসারে তিনি একটা গর্হিত কাজ করে বেড়াচ্ছেন। ভুবন সাদাসিধে মানুষ। স্ত্রীর প্রতি তার অন্ধ বিশ্বাস। বিশ্বাসের ঘরে এ—ভাবে সিঁদ কাটা ঠিক হচ্ছে না। মনে মনে অহরহ একটা অনুশোচনা ছিল, অথচ কিছুতেই তিনি অভ্যন্তরে পেরেক পুঁতে দিতে পারেননি। এই অসহায় দৃশ্যাবলি আজকাল তাঁকে খুব কাবু করছে। এবং নীরজার সন্তান ভানুর প্রতি কিঞ্চিৎ টানও অনুভব করছেন। সংসার ঠিকঠাক রাখার জন্যে এটা যে কত বড় দুর্বুদ্ধি ঠিক টের পান। তবু তিনি বুঝতে পারেন, কিছু আর করার নেই। নিয়তি এ বাড়িতে আর একটা পাপ কাজ করিয়ে নেবেই। তিনি শুধু নিমিত্ত মাত্র।

ভানু এসো। ভাত দিয়েছে!

ভানু লুঙ্গির মতো করে পরেছে কাপড়টা। চুল ব্যাকব্রাশ করা। জামাটা গায়ে গলিয়ে নিয়েছে। ভেতরে গেঞ্জি নেই। বুক খোলা। ভেজা লোম বুকে লেপ্টে আছে। এবং বুক খোলা বলে, প্রায় বুকের সবটাই দেখা যাচ্ছে। কী ঘন লোম। কাল কুচকুচে। এবং উষ্ণতা ভারি গভীর। মন্দাকিনী ডালের বাটি আলু পটলের ডিস রাখার সময় গোপনে দেখে ফেলল। এবং এই দেখে ফেলাটাই কাল। দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের খাওয়া দেখছিল আর ভেতরে ভীষণ জ্বালা অনুভব করছিল। কিছুতেই যেন প্রলোভনের হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারছিল না।

প্রিয়নাথ বললেন, তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না। এ—বয়সে এত কম খেলে চলে!

ভানু বলল, এমনই তো খাই।

মাংসের বাটিটা বেশ ভরে দিয়েছে মন্দাকিনী। ভানু মাংসের বাটির দিকে তাকিয়ে মন্দাকিনীকে বলল, এত দিয়েছ কেন? এত আমি খাই?

কী খায় না খায় মন্দাকিনী তা কি জানে! প্রিয়নাথ সহসা অন্যমনস্কতার দরুণ বিষম খেলেন।

জল খান বাবা।

তাড়াতাড়ি প্রিয়নাথ জল খেলেন। এবং নাকে মুখে ভাতের কণিকা সব সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। নিজের ব্রহ্মতালুতে হাত চেপে দিলেন দুবার। তারপর গলা খাকারি দিয়ে যেন অস্বস্তিটা লাঘব করার চেষ্টা করলেন।

এত আয়োজন! বলে ভানু আবার মন্দাকিনী বউদিকে দেখল। কাকলির খাওয়া হয়ে গেছে বলে সে বসে ছিল একটা মোড়ায়। কাকলি মার দিকে তাকিয়ে বলল, কী যে বল না কাকু! আয়োজন কোথায়। এটুকু দই খেতে পার না?

খেতে সবই পারি। তবে একটা তো পেট! কত খাব।

প্রিয়নাথ বললেন, যা—ই বল, বাঙালিদের খাবার খুব স্বাস্থ্যসম্মত। তেতো দিয়ে আরম্ভ। টক দিয়ে শেষ।

সহসা তিনি এমন কথা কেন বললেন ভানু বুঝতে পারল না। সে কথায় সায় দিল শুধু, তা ঠিক।

আমরা জানি না বলে, আমাদের যত হজমের গোলমাল।

ভানুর স্বাস্থ্য প্রবল। উঁচু লম্বা মানুষ। কোনো অসুখ—বিসুখ ইদানীং তার হয়নি। বাড়িতে মা খাবার সবসময় বেশ রিচ করে রাঁধে। বাবার জন্যে আলাদা রান্না হয়। ঝাল—টাল মা বেশি খায়। মশলা তেল বেশি দিতে ভালোবাসে। খুব একটা শরীর খারাপ হয় না তার। কিন্তু এ বাড়ির রান্না কম মশলায়। তেল ঝাল মশলা পরিমাণ মতো। তবু বুঝতে পারে মন্দাকিনীর অসুখটা ভেতরে রয়েই যাচ্ছে। কিছুতেই নিরাময় হচ্ছে না।

আসলে এটা অসুখ না স্বাভাবিক জীবন! যুবতী নারী বলতে যা বোঝায়, তার স্বাধীনতা থাকলে যা যা থাকে হাতের মুঠোয়, সবই করতে ভালোবাসে মন্দাকিনী। কিন্তু কখনও কোনো চপলতা দেখেনি। কাছে কাছে রাখতেই পছন্দ করে। অথচ প্রশ্রয় দেয় না। কেবল একটা আকর্ষণ রেখে দিয়েছে শরীরে। এমন পোশাক পরে থাকে যেন মায়াবী সব কিছুকে দূরে সরিয়ে রাখার ইচ্ছে। সাধাসিধে। এতেই আরও গন্ধটি প্রবল হয়ে যায়। পৃথিবীর যেখানেই সে থাকুক নাকের ডগায় বিধবা যুবতীর গন্ধটা লেগে থাকে।

মন্দাকিনী তখন বলল, কাকলি, তোর কাকার বিছানা করে দে।

একটু একা থাকলেই মন্দাকিনী কাজের ফাঁকে ঘরে ঢুকতে পারে। দুটো একটা কথা। কখনও চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে মন্দাকিনী জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। কপাট ভেজিয়ে দেয়। কাকলি দুষ্টুমি করতে ভালোবাসে। তখন প্রৌঢ় মানুষটা টের পায় একজন যুবক কত সহজে বাড়িটাকে স্বাভাবিক করে রেখেছে। ভানু এলেই যেন বাড়িটা প্রাণ পেয়ে যায়। তিনি তখন চোখ বুজে যৌবন বয়সের কিছু দৃশ্য দেখতে পান। নীরজা ঠিক এভাবে তাকে দেখলে চঞ্চল হয়ে উঠত। পৃথিবীতে এটা যে কী, শরীরে অথবা রক্তে এটা যে মানুষের কী এক আশ্চর্য অনুভূতি—কোনো বাধা নিষেধই কেন যে গ্রাহ্য করে না—এমন এক রহস্যময়তা টের পেয়ে পুত্রের ছবিটা দেখলেন। মুখে ভালোমানুষ, মৃত্যুটার সঙ্গে একটা ছোট কেলেঙ্কারি জড়িত। যদিও টের পায়নি কেউ। মন্দাকিনীর কী ছিল না! তিনি অঙ্ক কষে বের করতে বসে যান। তারপর বুঝতে পারেন, সবারই সব থাকে। ব্যবহারে পুরানো হয়ে গেলে আকর্ষণ কমে যায়। আর সংসারে চুরি করে খাবার স্বভাব, মানুষের বোধহয় সহজাত ব্যাপার। ঠেকানো যায় না। ছেলেটা গোপনে আর একটা প্রেম করছিল, বোধহয়। না হলে রাধা এবং সে একই গাড়িতে থাকবে কেন! রাধা আর সে একই সঙ্গে খাদে পড়ে শেষ হবে কেন!

আট

আমরা কোথায় যাব বলতো?

দাঁড়াও না। ঠিক কোথাও যাব। ভালো করে ধরে রাখো।

রমা মুখটা অরুণের পিঠে লাগিয়ে বলল, খুব ভালো লাগছে! না!

অরুণ যতটা সম্ভব স্পিড তুলে প্রায় হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিল যেন। দু—পাশের বাড়িঘর মাঠ দ্রুত সরে যাচ্ছে। ভি—আই—পির এই রাস্তাটা অরুণের ভারি প্রিয়। নিশ্চিন্তে সোজা সিটে বসে থাকতে পারে। মনে হয় কখনও নিজে ঘোড়সওয়ার, কখনও মনে হয় সে পৃথ্বিরাজের মতো ঘোড়ায় ছুটে যাচ্ছে। পিছনে জয়রাজ দুহিতা সংযুক্তা। রাজার মেয়ে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

অরুণ বলল, তোমার বাবার নাম ভুবন না হয়ে জয়রাজ হলে ভালো হত।

রমা চেঁচিয়ে বলল, বুঝতে পারছি না, কী বলছ!

আসলে হাওয়ায় পিছলে যাচ্ছে সব শব্দ। জোরে না বললে কিছুই স্পষ্ট হচ্ছে না। অরুণ বলল, বলছি, তুমি রাজার মেয়ে।

রাজার মেয়ে হতে যাব কোন দুঃখে?

তোমাকে কী যে করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

কী করতে ইচ্ছে হচ্ছে?

রাজার মেয়েকে কী করতে ইচ্ছে হয়?

যাও জানি না। তুমি ভারি অসভ্য কথা বলতে পার।

অরুণ জোরে হেসে উঠল।

এই কী হচ্ছে। একটা কিছু না ঘটিয়ে ছাড়বে না!

ভালোই তো! হলে মন্দ কী!

এই বুঝি ইচ্ছে।

আরও দু—চারটে গাড়ি অতিক্রম করে অরুণ হাওয়ার পিঠে ভর করে যেন চলে যাচ্ছে। ক্রমে উল্টোডাঙ্গা, লেকটাউন, এয়ারপোর্ট পার হতেই রাস্তাটা ফের সরু হয়ে গেল। তেমন নিশ্চিন্তে আর বাতাসে ভেসে যাওয়া যাবে না। সে স্পিড সামান্য কমিয়ে দিতেই একটা ঝাঁকুনি খেল রমা। তারপর স্পিড একেবারে কমিয়ে দিয়ে অরুণ বলল,—এসো, এখানে সুন্দর নিরিবিলি একটা চায়ের দোকান আছে। চা খাব।

রমা বলল, কোথায় যাবে বলতো?

একটা কথা যে কতবার বললে তুমি রমা! এখন একটু ঘুরব। সন্ধ্যায় চাঙোয়াতে খাব। বিকেলে একটা কিছু আজ হবে।

হতে দিচ্ছেটা কে!

রমার মুখের দিকে তাকাল অরুণ। হতে দিচ্ছেটা কে—বলে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। কেমন চাপা লজ্জা চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। এমন সব কথাবার্তা অরুণ আজকাল প্রায়ই বলে। আসলে শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। রমার ভীতু মুখ দেখলে সেও শেষ পর্যন্ত কেমন হয়ে যায়। কাপুরুষের মতো মুখ করে রাখে। ছেলেমানুষের মতো শুধু বলা, আর পারছি না।

রমা তখন মজা পায়। বলে, কেন, ঘরে তো বউ আছে। দুঃখটা সেখানেই সারিয়ে নেবে।

অরুণ আর বেশি কিছু বলতে সাহস পায় না। ঘরে সত্যি অমলা রয়েছে। সবই জানা। কোনো রোমহর্ষক ঘটনা আর ঘটে না। ডাল ভাতের মতো অমলা ওকে শুধু খেতে দেয়। বললেই মাদুর পেতে দেবার মতো। অথবা মনে হয় ওটা পাতাই আছে যে—কোনো সময় গড়িয়ে নিলেই হল। আর এ—ভাবেই বুঝি অমলা দিন দিন শরীরের সব রহস্য নষ্ট করে ফেলেছে। কোনো আকর্ষণ বোধ করে না। এই যে ছুটির দিনে সে বের হয়ে পড়েছে দশটা কাজের অজুহাত দেখিয়ে অমলার তাতেও কোনো রাগ নেই। ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং ছুটির দিনটা সে বাপের বাড়ি যেতে পারবে বলে খুশিই হয়।

চা দাও তো। দু—কাপ।

রমা বলল, গরম জলে ভালো করে ধুয়ে দেবে। ভাঙা ফাটা কাপে দেবে না।

রমার এটা বাতিক। কোথাও বাইরে গেলে, চা—টা খেলে এ কথাগুলো নির্ঘাত একবার বলবেই। এবং সে জানে রমা দু—এক চুমুক চা খেয়েই বলবে, কী বিশ্রী চা। খাওয়া যায়!

ঘোরার ফলে কিছু নির্দিষ্ট দোকানি রমারও চেনা হয়ে গেছে। এ—জায়গাটা নতুন। রমাকে নিয়ে সে এ—জায়গাটায় নতুন এসেছে। সে মাঝে মাঝে বারাসাত এরিয়াতে কাজ থাকলে স্কুটার থামিয়ে একবার না একবার যাবার আসবার পথে এখানে নেমেছে। দোকানির ছোকরা চাকরটা অরুণকে খুব ভালো না চিনলেও কিছুটা মুখ চেনার মতো! সে গরম জলে পরিপাটি করে কাপ প্লেট ধুলো। চা দেবার সময় বলল, আর কিছু দেব?

রমা বলল, না কিছু না।

অরুণের এখন সময় কাটানো দরকার। দুপুরের রোদ খুব একটা তেজি না যেন। হাওয়া দিচ্ছে। ওর ইচ্ছে ছিল, ফ্লাস্কে করে সামান্য চা আর চিপস সঙ্গে নেবে। অমলাকে বললেই সব করে দিত। কিন্তু রমাকে তোলার সময় কাঁধে চায়ের ফ্লাস্ক দেখলে সংশয় দেখা দিতে পারত ভুবনবাবুর। সবাই তার সঙ্গে যদিও আচরণে খুব মেহেরবান হয়ে যায়, তবু সে বুঝতে পারে তলে তলে রমাদের বাড়িতে খুব একটা সুনজরে কেউ তাকে দেখে না। কেবল মাসিমা খুব সরল মুখ করে রাখে। যেন স্কুটারে চড়ে হাওয়া খেতে যাচ্ছে। খুবই পবিত্র ঘটনা।

রমা বলল, দুপুরের রোদে এ—ভাবে ঘুরে বেড়ালে লোকে পাগল বলবে।

অরুণ চারপাশটা দেখল। খদ্দের খুবই কম। অন্য অনেকদিন সে দেখেছে, খদ্দের গিজগিজ করছে। একটা বড় অশ্বত্থ গাছের নিচে দোকানটা। বেশ একটা নিরিবিলি ছায়া আছে। টুল পাতা বাইরে। দুজন চাষী মতো মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে।

রমা সব চা—টাই খেল। বাড়ি থেকে সামান্য খেয়ে বের হয়েছে। এখানে চা, আরও দু—একবার চা হবে, তারপর অরুণ কোথায় যাবে সে জানে না। ঠা ঠা রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াতে এত সুখ রমা আগে টের পেত না। কী শীতে কী বসন্তে এবং এই দাবদাহের ভেতরও যেন এক শান্ত সলিলা ভাব। কোনো কষ্টই কষ্ট মনে হয় না।

রমা এবারে ফিস ফিস গলায় বলল, খালি বাসাটা কি বারাসতে?

অরুণ পিছনে ফিরে দেখল। দুষ্টুমি হচ্ছে বোঝা যায়। রমা বিশ্বাসই করছে না বোধহয়, খালি বাসায় হাত পা ছড়িয়ে বসার সুযোগ কলকাতায় কোথাও থাকতে পারে! বড় হোটেলের ঘর পাওয়া যায়। রমা অবশ্য জানে এত সাহস অরুণের কোনোদিন হবে না। একটা পরিচয় তো দিতে হবে। আর তা ছাড়া কোথায় কোন ছলনা ওৎ পেতে আছে কে জানে! কাগজে কত সব কেলেঙ্কারির খবর থাকে। কেলেঙ্কারির ঠিক আগে বোধহয় ওরা এভাবেই একটা নীল স্কুটারে চড়ে বেড়ায়। বড় কোনো হোটেল ঘরের কথা এলেই সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক দূষিত আবহাওয়ার কথা মনে হয়। অরুণ আর যাই করুক এতটা সাহস হবে না তার। সে বলল, কী কিছু বলছ না যে।

জায়গাটা তোমার খুব পছন্দ হবে রমা।

অরুণ এবার স্কুটারে চেপে হ্যান্ডেলটা সামান্য ঘুরিয়ে দিল। রমা বসল। আঁচল গুঁজে দিল কোমরে। ঘাম হচ্ছে খুব। রুমালে মুখ মুছল। চুল খোঁপা থেকে কিছু আলগা হয়ে গেছে। সেগুলো ফের খোঁপায় গুঁজে দিল। তারপর অরুণের পিঠের ওপর নিজেকে চেপে ধরল। প্রায় দুরন্ত বেগে স্কুটারটা সব মানুষজন, জ্যাম ভিড় কাটিয়ে দু—পাশে মাঠ ফেলে চলে যেতে থাকল। তারপর। এবং ক্রমে বিন্দুবৎ হয়ে ভেসে থাকল একটা আশ্চর্য সুখ। প্রকৃতির কূট খেলা তখন আরম্ভ হয়ে গেছে শরীরে।

মানু তখন হাঁটছিল। মানুষজন, গাড়ি বাড়ি, ট্রামের তার ফেলে সে একটা নির্জন জায়গার খোঁজে চলে এসেছে। চুপচাপ কোথাও বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। মুখের ভেতর টিকিটের কাগজ দলা পাকানো।

চুইংগামের মতো সে চিবিয়ে খাচ্ছে কেবল। জয়া সুন্দর শাড়ি পরেছিল আজ। পাশে বসে শো দেখার আরামটুকুও তাকে ওরা দিল না। সব ইচ্ছে কোথাকার দুটো কবি এসে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল। কিছুই ভালো লাগছিল না। কিছু ভিখিরি বসে আছে রেলিঙের ধারে। শুকনো রুটি রোদে আরও শুকিয়ে নিচ্ছে। একটা ওর বয়সি ছেলে কাক শালিক তাড়াচ্ছে। এবং বড় নিবিষ্ট চোখে পাহারা দিচ্ছে। খাওয়ার সুখ কত আরামের ওদের চোখ মুখ দেখলে টের পাওয়া যায়। মানুর বলতে ইচ্ছে হল তোমাদের মতো আমিও ভিখিরি। কাঙাল বলতে পারো। সে রেলিঙের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। শহরে কত কিছু ঘটে যাচ্ছে। ওই যে বুড়োটা, হাতে রেশন ব্যাগ নিয়ে ট্রামে উঠবে বলে দৌড়াচ্ছে, সে জানে না পাশেই আছে তার হাজার কিশিমের হতাশার ছবি।

এমন কী অহংকার, মেয়ে তোমার, অনায়াসে দুজন কবি আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে তোমাকে। মানুর ভেতরে ভেতরে জেদ বাড়ছিল। সে একটা ঢিল তুলে ছুঁড়ে দিল। এবং কত দূরে গিয়ে পড়ছে, আর এভাবে কত দূরে সে ঢিল ছুঁড়তে পারে তা দেখে নিচ্ছে। মানুষের মাথায়, গাড়ির জানলায় লাগলে কেলেঙ্কারি হবে সে জানত। তবু কেমন ভেতরের একগুঁয়ে একটা স্বভাব আছে তার। সে যা আশা করেছিল, যা সকাল থেকে তাকে স্বপ্নের ভেতর জমিয়ে রেখেছিল, কবি ছোঁড়া দুটো তছনছ করে দিয়ে গেল। সে কিছুই বলল না। এখন মনে হচ্ছে তার কিছু বলা উচিত ছিল। নিজের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা আরম্ভ করে দিল এ—ভাবে।

তুমি একটা আহম্মক।

কী করব। জয়া এমনভাবে বলল,—

আরে মেয়েমানুষ তো, ধরে রাখতে হয়। সবই তোমাকে বলে দিতে হবে। বলতে পারলে না, রাখো কবিতা। বাড়াবাড়ি করলে চেঁচামেচি শুরু করে দেব।

কী ফল হত তাতে?

অনেক কিছু হত। ভয় পেত।

জয়া দুঃখ পাক আমি এটা চাই না?

তাহলে তুমি দুঃখ পাও এটা সে চায় কেন?

তা তো বলতে পারব না।

তুমি কাপুরুষ। কেউ এভাবে মুখের গ্রাস ছেড়ে দেয় না।

মানু কিছুক্ষণ তারপর অন্যমনস্কভাবে ফের হেঁটে গেল। আইসক্রিমের বাক্স টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা লোক। দুজন হাফ—যুবতী বালিকার মতো আইসক্রিম মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে ওরা হাসছিল। এবং সে তখনই বুঝতে পারল ওর হাতে একটা বড় ঢিল। এমন সুন্দর ছেলেটা ইঁটের টুকরো হাতে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে! কার মাথা ফাটাতে যাচ্ছে! ওর মাথার গোলমাল আছে ভেবে হয়তো তারা হাসছে। সে গোপনে ঢিলটা হাত থেকে ফেলে দিল। হাত ঝাড়ল। একবার বলবে নাকি—এই মেয়েরা, তোমরা এখানে কেন! ঘরে ভালো লাগে না কেন! তোমাদের কেউ আসবে? আচ্ছা, তোমরা সেজেগুজে বের হয়েছ বেড়াতে, সত্যি বেড়াতে চাও তো না অন্যকিছু? চারপাশে সবুজ মাঠ, গাছপালা, এবং মনের ভেতরে কেবল দুষ্টুমি—সব বুঝি! জয়াটা যে কী করল আজ! গন্ধে গন্ধে ওর কবি বন্ধুরা ঠিক পিছনে হেঁটে যাচ্ছে। মেয়েদের গন্ধ পুরুষেরা এত পায়, পুরুষের গন্ধ মেয়েরা পায় কিনা একবার জিজ্ঞাসা করবে নাকি! পুরুষের গন্ধ পাও না! আমি যে হেঁটে যাচ্ছি, তোমাদের ভালো লাগছে না!

এবং সে দেখল সত্যি হাঁ করে ওদের দিকে সে তাকিয়ে আছে। আর ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

সে বলল, না আপনাদের আমি কিছু বলছি না।

বড় মেয়েটার চুল দু'বেণীর। ছোট মেয়েটার কোমর খুব সরু। গেঞ্জি পরেছে। বুক উঠছে নামছে নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। বড়টা সামান্য লাজুক প্রকৃতির। মানুর দিকে সামান্য চোখ তুলেই নামিয়ে নিয়েছে। ছোটটা

সাহসী। সে এগিয়ে এসে বলল, কিছু বলছেন?

আপনারা এখানে কতক্ষণ?

ঘড়ি দেখে বলল, বিশ মিনিটের ওপর।

তাহলে বলে লাভ নেই।

মানুর প্রতি যে—কোনো কারণেই ছোটটার কৌতূহল বেড়ে গেল। বোধহয় ওরা দুবোন। কিংবা বোধহয় দুজনেই কলেজের বান্ধবী। অথবা প্রতিবেশী। ঘরে ভালো লাগে না। হেঁটে হেঁটে চলে এসেছে ময়দানের এদিকটায়। এবং গাছপালায় ছায়ায় বসে আইসক্রিম খাচ্ছে। শহরের ঘরে ঘরে এই এখন ক'টা যুবতী আছে, ক'শো, ক'হাজার অথবা ক'লক্ষ, যেমন সে জানে তার দিদি, এবং জয়া, মন্দাকিনী বউদি সবাই কোথাও যেতে চায়। কোথাও যাওয়ার সুখ অথবা অসুখের ভিতর পড়ে গিয়ে নিদারুণ হয়ে উঠেছে। জয়াটা শুধু দু'জন কবির সঙ্গে চলে গেল। কবিতা পাঠ এত কী মধুর, অথচ অসুখের মতো ওটাও একটা সুখ কিনা কে জানে! তাকে ফেলে তো চলে গেল। কত বড় অসুখ হলে জয়া তাকে ফেলে যেতে পারে এতক্ষণে সে এটা টের পাচ্ছে। এবং টের পেলেই মনে হল মাথাটা দু'ফাঁক করে দিলে কী ক্ষতি ছিল! কবিতা বের হয়ে যেত সব ফাঁক করা খুলি দিয়ে।

ছোটটা আর কিছু বলছে না। অবোধ বালিকার মতো তাকে দেখছে। বোধ হয় দয়া হল। বলল, বলে লাভ নেই কেন!

ফিরে গেছে হয়তো!

সময়মতো আসেন না কেন?

দেরি হয়ে গেল। বাস ট্রামের যা অবস্থা।

বাড়ি থেকে আগে বের হতে হয়।

আপনারা বাড়ি থেকে আগে বের হয়েছেন?

অনেক আগে। আগে এলে তো দোষের হয় না!

তা হয় না।

বড় মেয়েটার চুল কোঁকড়ানো। চোখ টানা নাক একটু চাপা। বেশ উঁচু লম্বা। প্রায় দিদির মতো হবে। শাড়ি পেটের নীচেও খানিকটা নেমে গেছে। শাড়ির ফাঁকে নাভির নীচেও বেশ কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। সে বলল, আপনাদের ওরা কখন আসবে?

এসে পড়বে। দশ মিনিট অ্যালাউন্স দেওয়া আছে।

মাত্র দশ মিনিট!

দশ মিনিট কতটা সময় আপনি জানেন না! ছোটটা খুক খুক করে হাসতে থাকল।

ওরা আসবে তো ঠিক?

এখনও সময় যায়নি।

একবার দেখুন না! বলে সে সেই ইঁটের টুকরোটা আবার কুড়িয়ে আনল।

ক্যাচ ধরতে পারেন?

মীনা তো প্রাকটিস করছে।

তবে আর কি। ওপরে ছুঁড়ে দিচ্ছি ক্যাচ লুফতে পারলে ওরা ঠিক আসবে।

কথাটা কতটা বিশ্বাসের বোঝা না গেলেও সময় কাটানোর পক্ষে মন্দ না। মীনা বলল, দিন দেখি।

সে বেশ উঁচু করে ছুঁড়ে দিল। মীনা খপ করে ধরতে গেলে সে দেখল তার বুক লাফিয়ে উঠল। শরীর ওর কাঁটা দিয়ে উঠল। সে ইচ্ছে করলে পাগলের মতো এখন সত্যি কিছু করে ফেলতে পারে। জাপটে ধরতে পারে। যে—কোনো যুবক এখন লম্পট হয়ে গেলেও দোষের না। ওর মাথা ঝিমঝিম করছিল। দিবালোকে একটা হত্যাকাণ্ডের জন্যে সে ক্রমে কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

নয়

রাসবিহারী বাগানে কিছু নতুন গাছগাছালি লাগান এ—সময়টাতে। বীজ পুঁতে দেন। কলম লাগান। গাছে ফুল না ফুটলে ফল না ধরলে এ—সময় সব সাফসোফ করে নতুন গাছপালা পুঁতে যান। এই একটাই হবি এখন রাসবিহারীর। বয়স হয়ে গেছে, শরীরের সামর্থ্য কমে আসছে—তবু এই বাড়িটার প্রতি তাঁর ভারি মমতা। এবং গাছপালার মধ্যে যতক্ষণ ডুবে থাকেন ততক্ষণই তাঁর স্বস্তি। কত রকমের খবর বুড়ো বয়সের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। মেয়েদের এক একজন এক এক রকমের খবর পাঠায়—কারও বরের বদলি, কেউ পেটের আলসারে ভুগছে, কারও ছেলে বদমেজাজি—যেন বুড়ো বয়সে কোনো ভালো খবর পেতে নেই। চিঠি এলেই অদ্ভুত শঙ্কায় ভোগেন রাসবিহারী। আর ক'মাস থেকেই মিতার ঠিক পিঠের দিদি অমলা রবিবারে এখানে চলে আসে। অরুণের রবিবারে প্রায় কাজ থাকে। সপ্তাহে একটা ছুটির দিন তাও কাজ। এবং অমলা বাড়িতে এসেই হইচই শুরু করে দেয়। সকালে মিতাকে নিয়ে বের হয়ে যায়। দুপুরে ঘুমোয়, তারপর, কাকার বাসায় যাবে বলে চলে যায়। ঢাকুরিয়ায়। সেখান থেকে বেশ রাত করে ফেরে। একদিন রাসবিহারী ছোট ভাই বঙ্কুবিহারীকে প্রশ্ন করেছিলেন, অমলার দেখছি তোমার প্রতি খুব টান। বঙ্কুবিহারী জানে অমলা ওর বাড়িতে মাসে দু—মাসে এক আধবার যায় কিছুক্ষণ থাকে, কাকিমা এবং ছোটদের বলে যায়, যাচ্ছিরে। একটু মার্কেটিং করতে যাব। কখনও বলে টিকিট কাটা আছে, কলামন্দিরে যাব। একা একা ঘুরতে মেয়েটা খুব ভালোবাসে।

ঠিক এ—সব ভাববার সময়ই মনে হল অমলা আসছে। হাতে মীনা করা বড় বটুয়া। কাঁধে ব্যাগ। ওতে ওর রাতে পরার জন্য শাড়ি সায়া ব্লাউজ থাকে। এক সময় সান্টু আসত খুব এ—বাড়িতে। সান্টু তার ছোট বোনের দেওর। অমলার বিয়ের পর সান্টুর এ—বাড়ি আসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ইন্ডিয়ান অকসিজেনে সান্টুর ভালো মাইনের চাকরি অথচ তখন কেন যে অমলার পছন্দ না সান্টুকে তিনি এখনও তা বুঝে উঠতে পারেন না। অথচ একটা প্রবল টান রয়েছে দু'জনের মধ্যে, এবং এটা তিনি নিজে ঠিক চোখে না দেখলেও কোনো এক গোপন খবর থেকে তা টের পান।

ইদানীং এখানে আসা অমলার বেড়ে যাচ্ছে কোন টানে বুঝতে কষ্ট হয় না। অমলা এসেই যেমন বাবাকে প্রণাম করে তেমনি প্রণাম করে সোজা ভিতরে ঢুকে গেলেই আবার একটা প্রবল শঙ্কা সেই বুকের মধ্যে গুড় গুড় করে উঠল।

সেদিক থেকে স্ত্রী হেম খুব সুখে আছেন। তার এখনও একটাই কাজ—বাড়ির রান্নাবান্না এবং ঠাকুর চাকরের প্রতি সজাগ সতর্ক চোখ। হেমের বিশ্বাস, এরা সবাই দুর্বৃত্ত। সংসারের সব জিনিস গোপনে চুরি করে নিয়ে যায় ফলে সারাদিন এ—ঘর ও—ঘর। এটা ওটা সামলাচ্ছে। মাঝে মাঝে মিতার সঙ্গে ধর্মমূলক ছবি এলে দেখতে যায়। নানুর জন্য তার দুর্বলতা কম। মেয়েটার জন্য একটাই সমস্যা—বড় হয়ে গেছে, বিয়ে দিয়ে দাও—ধিঙ্গি করে আর কতদিন রাখবে। সংসারে এই বয়সে সাধারণ একজন নারীর যে স্থান হেমের তাই হয়েছে। কালেভদ্রে রাসবিহারীর মনে হয়, হেম তার স্ত্রী। বরং হেমকে বাড়ির পাহারাদার ভাবতেই এখন বেশি ভালো লাগে। সব সময় সন্তর্পণে সব কিছুর প্রতি নজর রাখছে। কোনো কিছু অপচয় হবার উপায় নেই।

রাসবিহারীর মনে আছে, হেম যৌবনে বিকেল হলেই গা ধোয়া, পাট ভাঙা শাড়ি পরা, গলায়, কাঁধে, মুখে পাউডার এবং সুঘ্রাণ ছড়িয়ে বসে থাকত। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—এটা হেমকে না দেখলে বোঝা যেত না। তবে শেষ পর্যন্ত একের পর এক কন্যাদের জন্ম দিয়ে বোধ হয় হাঁপিয়ে উঠেছিল। একদিন শুতে গিয়ে দেখে রাসবিহারী, বিছানা আলাদা—হেম আলাদা ঘর নিয়েছে। এবং সেই থেকে ক্রমে যে দূরত্ব বাড়ছিল তা এখন চরমে। প্রায় সারাদিন দুটো চারটে কথা ছাড়া ওদের আর কোনো সম্পর্ক আছে অথবা ছিল তা বোঝাই যায় না। রাসবিহারী দুটো বীজ পুঁতে দেবার সময় ভাবলেন, সংসারের বুঝি এই নিয়ম।

রাসবিহারী বুঝতে পারেন মেয়েরা তাদের মায়ের মতই। নানুর মা এখন কী করে দিন কাটায় তিনি তা বুঝতে পারেন। সংসারে সব কথা খুলে বলা যায় না। একবার নানু তার মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—

খুব দরকার ছিল চাকরি করার!

নানুর মা বলেছিল, বারে আমার ভবিষ্যৎ আছে না।

সত্যি তো ভবিষ্যৎ বলে কথা। তিনি বোঝেন, ভবিষ্যৎ বস্তুটি কী। তিনি নিজেকে দিয়েই এটা বুঝতে পেরেছেন। ভবিষ্যৎ মানে শেষ পর্যন্ত একটা বড় ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে যাওয়া। সবাই অবলম্বন পেয়ে তাকে নিরালম্ব করে রেখে গেছে একটা পত্র—পুষ্পহীন বৃক্ষের মতো। রাসবিহারী নিজেকে এখন কোনো পত্র—পুষ্পহীন বৃক্ষের মতোই ভাবতে ভালোবাসেন। আর এ—সব কথা বেশি করে মনে হয়—যখন বুঝতে পারেন নাতিটার ভার না নিলেই ভালো হত। কিন্তু ওই যে বলে ফাঁনদে পড়িয়া বগা কান্দে। .....আর তখনই তিনি দেখলেন, নানু এদিকে আসছে। সকালের হাওয়ায় নানু বাগানে পায়চারি করতে বের হয়েছে। মুখে ব্রাস, দাঁত মাজছে—ফস ফস করে কথা বলার চেষ্টা করছে। রাসবিহারী সেই কথার এক বর্ণ বুঝতে পারছেন না।

নানু বলল, দাদু এই গরমে তোমার গাছ বাঁচবে?

বাঁচবে না কেন ভাই, বাঁচাতে জানলেই বাঁচে!

এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি ভালো করে।

জল দিতে হবে।

এ—সব কথা একেবারেই অকারণ। আসলে রাসবিহারী এখন নানুকে যে—কথাটা বললে খুশি হতেন সেটা হচ্ছে, তুমি রোজ রাত করে বাড়ি ফিরলে আমি খুব উদ্বিগ্ন থাকি। আরও কিছুদিন বাঁচতাম, তুমি আর তোমার মা মিলে সময়টা খুবই সংক্ষিপ্ত করে দিলে।

নানু বলল, আজ জেঠুর বাড়ি যাব ভাবছি।

তোমার জেঠু অবনীশ কাল দুপুরে ফোন করেছিল।

কী বলল?

বলল তুমি রোববারে যাবে।

আজ গেলে কী হবে?

তোমার জেঠিমার শরীর ভালো নেই।

তবে রোববারেই যাব।

তাই যেও। মানুষের সুবিধা অসুবিধা বুঝতে হয়।

সবাই কি বোঝে?

না বুঝলে চলবে কেন?

না সবাই বোঝে না দাদু। বলে মুখ থেকে সে থু থু ফেলল। তাহলে আমাকে এখানে চলে আসতে হয় কেন?

এ—সব কথায় রাসবিহারী ভীত হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন সংসারের সেই মৃত ছবিটা আবার নানু তুলে দেখাতে চায়। একটা জোড়াতালি দিয়ে যা তিনি ভুলতে চেয়েছেন, এবং যা কিছু তিনি মেনে নিয়েছেন, অর্থাৎ সায় না থাকলেও ইজ্জতের খাতিরে মুখ বুজে আছেন, সেই নানু আবার তা ছিন্নভিন্ন করে দিতে চায়। তিনি অন্য কথায় চলে এলেন, তোমার মুখ ধোওয়া হলে বল। একসঙ্গে চা খাব।

নানু বলল, এখন তো দেখছি মার সঙ্গে জেঠুরও খুব ভাব। প্রায়ই নাকি চিঠি দেয়। আমার খবরাখবর নেবার কথা বলে। আগে ও সব কোথায় ছিল! ভিন্ন বাড়ি দেখে জেঠু উঠে গেল কেন! আমার বাবা কি সত্যি খুব খারাপ মানুষ ছিলেন?

রাসবিহারী প্রমাদ গুণলেন। সাতসকালে নানু আবার কী ঝামেলা না বাধায়। তিনি তাড়াতাড়ি বাগান থেকে ঘরের দিকে হাঁটা দিলেন। নানু পাশে পাশে যাচ্ছে। এবং মনে হচ্ছে রাসবিহারীকে কেউ এখন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থা দেখে নানু হেসে ফেলল। বলল, অত ছুটবে না, পড়ে যাবে।

রাসবিহারী ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, আমি দৌড়লাম কোথায় আবার।

নানু ফের খুব অমায়িক গলায় বলল, আচ্ছা দাদু তোমরা সব সময় বাবার সম্পর্কে এত চুপ থাক কেন? আমি সবই জানি। বাবার মৃত্যুর জন্য কে কে দায়ী তাও জানি যেমন ধর, এক নম্বর খুনি আসামি সেই ধুমসো ভদ্রমহিলাটি, দু নম্বর আমার মা, তিন নম্বর জেঠু। ওরা তিনজন বাবার সংসারে তিনটে ফ্রন্ট খুলেছিল। বাবা ভেবেছিলেন—একটা ফ্রন্ট খোলা আছে, সেখান দিয়ে অন্তত পালানো যাবে—কিন্তু দেখা গেল সেখানেও একজন দাঁড়িয়ে আছে।

রাসবিহারী বললেন, সেটা আবার কে?

নানু মাথা নীচু করে বলল, আমি। আমাকে দেখে বাবা নিজেকে খুব অসহায় বুঝতে পেরেছিলেন। বেশি টাকা রোজগার করবেন বলে কাজ ছেড়ে দিলেন—কারণ সংসারে তখন টাকার দরকার খুব। সংসারে বেশি সুখের জন্য বেশি টাকার জন্য বাবা ব্যাবসা করতে গেলেন এবং ফেল মারলেন। তখন বাবার চারপাশ ফাঁকা। দাদা বউদি ফ্ল্যাট নিয়ে উঠে গেছে। বাবা তবু ভয় পেতেন না। মার গঞ্জনা শুরু হল। একদিন মনে আছে, মা আমার সামনে বাবাকে বলেছিল, পুরুষের রোজগার না থাকলে বেঁচে থেকেও লাভ নেই। পাশে আমি দাঁড়িয়ে। বাবা মাথা নীচু করে ঘর থেকে বের হয়ে গেছিলেন।

রাসবিহারী বারান্দায় দাঁড়িয়ে। নানু মুখোমুখি। এমন একটা নাটকের সময় মিতা বাথরুমে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখছে। হেম চা চিনি মাখন ডিম বের করে ডাকছেন, ও কালোর মা, সব নিয়ে যা।

নানু দেখল দাদু তাকে অপলক দেখছে। কেমন বিমূঢ়। শূন্য দৃষ্টি। আবার না হেসে পারল না। —দাদু, ও দাদু, খুব মিথ্যে বলেছি! তুমি অত ভয় পাও কেন। আমি তো এখন সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

রাসবিহারীর এবার বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসছে। নানুর মাথায় আবার রেলগাড়ি চলছে। রেলগাড়ি চলতে থাকলেই নানু অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। রাসবিহারী ভাবে, নানু যা স্বভাবের তাই হয়ে গেছে। তখন নানুকে আর অত খারাপ লাগে না।

রাসবিহারী খুরপিটা রাখার জন্য বাইরের দিকে আউট—হাউসে হেঁটে গেলেন। এখন হাত মুখ ধুয়ে সামান্য জলযোগ। তারপর পত্রিকা এসে যাবে এবং চা। পত্রিকা পড়তে পড়তে বেলা দশটা। তারপর চান, এবং আহার। আহারের পর দিবানিদ্রা, শেষে আবার চা এবং বিস্কুট। বেলা পড়ে এলে হাতে লাঠি এবং সান্ধ্য—ভ্রমণ। মোটামুটি জীবনের এই রুটিন দাঁড়িয়েছে রাসবিহারীর।

তখন ঘরে ঢুকে অমলা বলেছিল, কার সঙ্গে কথা বলছিসরে এত?

কেন তোমার কি ফোনের দেরি হয়ে যাচ্ছে?

অমলা বলল, খুব ফাজিল হয়েছ।

অরুণ মেসোমশাইকে বল একদিন যাব ওদের অফিসে।

কী দরকার।

চাকরি টাকরি যদি হয়।

তোমার চাকরি হলেই হয়েছে।

বোঝাই যায় নানু দুপুরে ফোনে কার সঙ্গে কথা বলছিল। খুব সংযত কথাবার্তা। কিছুক্ষণ কথা বলার পর শিস দিতে দিতে ওপরে উঠে গিয়েছিল। সে তার অমলা মাসিকে আর ফিরে তাকিয়েও দেখল না। সে জানে এখন অমলা মাসি ফোনটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

তারপর নানু সুন্দর পোশাক পরে করিডরে পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছিল। তারপর একটা সিগারেট খেয়েছিল গোপনে। এবং এক সময় কী সংকেত পেয়ে নীচে নেমে বাস রাস্তার দিকে হেঁটে

গেল।

তারপর নানু সিনেমা হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। এখন সে জটিল চিন্তাভাবনা মাথায় রাখতে ভালোবাসছে না। কারণ এমন একটা আনন্দের দিন তার আসবে সে কখনও কল্পনা করেনি। বনভূমিতে 'জ্যোৎস্না' আসছে। ফোনের সেই সংকেত থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত সে বড়ই অধীর। তাকে স্পষ্ট বলেছে, ঠিক আছে যাব।

তুমি একা আসবে কিন্তু!

সে কি। একা কী করে আসব। বাড়ি থেকে ছাড়বে কেন। বাবা ফিরে এসে শুনলে কী ভাববে। বকবে না? জানো, মা বলছিল নানু যেন কেমন হয়ে গেছে!

তুমি কী বলেছ?

আমি কী বলব আবার!

না, এই যদি বলে দাও লাল বলটা তোমার কাছে আছে, বলেছি। তুমি বলেছ, না নেই। আমি বলেছি, হ্যাঁ আছে—এইসব আর কি।

আমার বয়ে গেছে বলতে।

নানুর মাথার মধ্যে কথাগুলি বিজ বিজ করছিল। রাস্তা, মানুষজন, ভিড় এবং হকারদের চিৎকারের মধ্যে সে একটা লম্বা মতো মানুষ হয়ে যেতে চাইছে। সে অনেকদূর থেকে নবনীতাকে আবিষ্কার করতে চায়। কিন্তু ক্রমে সময় যাচ্ছে। এখানে সে আধ ঘণ্টার মতো দাঁড়িয়ে নবনীতাকে আবিষ্কার করতে পারল না। তবে কী নবনীতা তাকে ধোঁকা দিল।

নিজের সঙ্গে নিজের এই কথা নানুর আজন্মকালের। নানু সব সময় পৃথিবীতে একটা বাতিঘরে সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। নবনীতা তার বাতিঘর। যেন নবনীতা ইচ্ছা করলেই তাকে এখন নিরাময় করে তুলতে পারে। এবং তখনই দেখল নবনীতা আসছে। বড় মহিমময়ী। শাড়ি পরেছে। কানে গোল ইয়াররিং। মনটা মুহূর্তে বিশাল সাম্রাজ্য হয়ে গেল তার। সে ছুটে গিয়ে বলল, ও এলে তবে!

কী করব, এত করে বললে না এসে পারা যায়!

কী যে ভালো করেছ না। এসো কোথাও বসে একটু খাই কিছু।

শুধু আইসক্রিম খাব।

আর কিছু খাবে না?

না। আমাকে কিন্তু ছটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে।

কী হবে না ফিরলে?

মা বাবা ফেরার আগেই যেতে হবে।

সে যেও। নবনীতা...ন...ব ...নীতা।

এই কী হচ্ছে! গান করছ কেন?

কী গান করলাম।

এই যে ন—ব—নী—তা।

জানি না নবনীতা, যখনই একটু সময় পাই, তখনই জানালা খুলে আকাশ দেখি, তখনই সব আনন্দের প্রকাশ, আজকাল আমার একটি শব্দে শুধু আনন্দের প্রকাশ—

ন—ব—নী—তা!

নবনীতা ঠোঁট টিপে চোখ বাঁকিয়ে বলল, আহা কী কথা! নবনীতা না ছাই।

নানু বলল, নবনীতা, কী যে ভালো লাগছে। এমন সরল প্রকাশ, নানুর নবনীতাকে কেমন একটা টানের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। নবনীতা পাশাপাশি হাঁটছিল। শাড়ি পরায় তাকে আর কিশোরী ভাবা যাচ্ছে না। যেমন নানুকে দেখেও বোঝার উপায় নেই সে কৈশোর পার হয়ে সবে যৌবনে পা দিয়েছে। বরং দুজনকেই পৃথিবীর

আদিম নরনারীর মতো মনে হচ্ছিল। সে আর নবনীতা বুনো ফুলের গন্ধ নিতে ছুটছে। এই বয়সে মানুষের আর কিছুরই দরকার নেই—কেবল ছুটে যাওয়া হাত ধরে, কোথাও হ্রদের ধারে বসে থাকা, কখনও নদীর জলে প্রতিবিম্ব দেখা অথবা কোনো এক সবুজ পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট ডাকবাংলোয় রাত্রি যাপন। যদি শীতের সময় হয় সামান্য উষ্ণতা চাই, গ্রীষ্মের সময়ে অজস্র বৃষ্টিপাত—নানু কত কিছু নবনীতাকে নিয়ে ভেবে ফেলে।

কিন্তু নবনীতা এখনও এতটা ভেবে দেখেনি। তার কাছে শহরটা শহরই থাকলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে কিছু মিছে কথা বলে, এই একটু ঘুরে যাওয়া, আইসক্রিম খাওয়া, খুব সাহসী হলে সে ভাবতে পারে সন্ধের অন্ধকারে একটু মাঠে বসে নিরিবিলি নানুদাকে ডেকে নেওয়া। বাবা আসেন সাতটার পর, মা দিবানিদ্রা যান। তারপর ক্লাবে যান। দুপুরে কিংবা সকালে সে মাকে শুধু বলে রাখে বিকালে একটু বের হব মা। অগ্নির কাছ থেকে কিছু ক্লাস—নোটস নিতে হবে।

বাবা মাঝে মাঝে বসার ঘরে তাকে ডাকেন। এবং কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন, তুমি সত্যি বড় হয়ে গেছ। বিয়ে দিয়ে দেব।

আর তখনই সে বাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বল, একথা আর বলবে!

সুনীল তখন তার স্ত্রীর শরণাপন্ন হয়ে বলে, দেখে যাও তোমার মেয়ে আমাকে মেরে ফেলল। বড় হয়েছে বললে কেউ এভাবে রেগে যায়।

এই বড় হওয়া যে কী মজার। যখন একা থাকে, কিংবা গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে বুঝতে পারে, তাকে কেউ কোথাও নিয়ে যাবে বলেছে। এবং সব সময়ই সে যেন তাকে বলে যাচ্ছে, আমার ভয় করে।

নানু তখন দুটো আইসক্রিম নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ফিরছে। একটা নবনীতার হাতে দিয়ে বলছে, নাও। নবনীতা ঠিক পদ্মকলির মতো আইসক্রিমটা ধরে আছে।

যদি কেউ দেখে বুঝবে এই নর এবং নারীর মধ্যে এখনও আশ্চর্য পবিত্রতা বিরাজ করছে। এখনও কোনো দ্বিতীয় ভূখণ্ডে ওরা পা রাখেনি। বড় সুসময় এদের এখন। এই সুসময়ে প্রীতিশ আর রাণু কুড়ি বছর আগে ঠিক এই হল ঘরটায় আইসক্রিম খেয়েছিল। কেউ না জানলেও চারপাশের ইট পাথর দালান কোঠা তার সাক্ষী। অথচ মানুষ তার পবিত্র সময় বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না।

নানু ডাকল, ন—ব—নী—তা।

নবনীতা একেবারে পোষা বেড়ালের মতো নানুর গা সংলগ্ন হয়ে হলের ভিতরে ঢুকে গেল। অন্ধকারে সব অস্পষ্ট। নানু হাত ধরে আছে।

দশ

ও মা আপনি বসে পড়লেন কেন?

মানু ছুটে আসছিল। সামনে এমন একজন তরুণী! খোলা মাঠ, নীল আকাশ এবং দূরে অশ্বারোহী মানুষ, গাড়ি যাচ্ছে দ্রুত, এ—সবের ভেতর মাথাটা তার গোলমাল করে ফেলছিল। সে সাপ্টে ধরবে, তারপর যা হবার সব হবে, ভেতরে সে এইসব ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে উঠছিল। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য অথবা মাতালের মতো টলতে টলতে ছুটে যাচ্ছিল। খোলা আকাশ নিচে দিবালোক, কিছুই তার খেয়াল ছিল না। সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তারপরই মার মুখ চোখে ভেসে উঠল। মা, দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে! বাবা বারান্দায় পায়চারি করছে। এত সব নিজের মানুষরা নড়েচড়ে উঠলে, সে আর ছুটতে পারেনি। মাথা ধরে বসে পড়েছে। এটা সে কী করতে যাচ্ছে!

মীনা বলল, কী হয়েছে আপনার?

জবা বলল, আপনার কোনো অসুখ আছে?

মানু কোনোরকমে বলল, বোধহয় আছে।

বোধহয় আছে মানে! জবা সামান্য ঝুঁকে কথাটা বলল। এমন সুপুরুষ একজন যুবকের কথা বলতে কেন এত কষ্ট বুঝতে পারছে না।

মানু বসেই থাকল। বুড়ো মানুষের মতো লাগছে নিজেকে। সে খুব সময়মতো নিজেকে নিরস্ত করতে পেরেছিল। এবং এটাই তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কেন তার এটা হল! নিজের ওপর সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। সবার কী হয় সে জানে না, কিন্তু তার এটা একটা খারাপ স্বভাব। কোনো সুন্দরমতো যুবতী দেখলে সে অনেকটা পথ তার পিছু পিছু হেঁটে যায়। হেঁটে যেতে ভালো লাগে। তীব্র আকর্ষণ বোধ করে। এবং যুবতীর সবকিছুতে যে রহস্য, সেই রহস্যের অভ্যন্তরে পৌঁছবার জন্য সে এইমাত্র ছুটে এসেছিল, অথচ বাহ্যিক সব নিয়মকানুন তাকে কারাগারে বন্দী মানুষের মতো করে রেখেছে। তার মনে হয়েছিল সে একটা আত্মহননের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। যদি মায়ের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাজার মুখ তার মাথায় বিদ্যুতের মতো ক্রিয়া না করত, যদি ঘটনাটা ঘটেই যেত, তবে কাল সকালে খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে যেত সে। এই দুঃসাহসী, দুঃসাহসী না লম্পট, কোন শব্দ ব্যবহার করত সাংবাদিকরা ঠিক এ মুহূর্তে তার মাথায় আসছে না। রাতে সে বাড়ি ফিরতে পারত না। ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নিত সব সাধু ব্যক্তিরা। এত সাহস তোমায়! পুলিশ, ব্যাটনের গুঁতো মেরে বলত—হারামি বদমাস স্কাউন্ড্রেল! তুমি ভরদুপুরে ভদ্রলোকের মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছ! শ্লীলতাহানি! তোর কী শূয়রের বাচ্চা মা বোন কেউ নেইরে!

জবা বলল, অসুখ থাকলে আসেন কেন?

হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না—র মতো সে এলিয়ে দিয়েছে শরীর। এবং ঘাসের ভেতর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। সামনে জবা মীনা দাঁড়িয়ে আছে, ওরা খুব বিব্রত বোধ করছে। সে কিছুই লক্ষ্য করল না! চোখ বুজে পড়ে থাকল। দিদি কোথাও রুমাল উড়িয়ে যাচ্ছে স্কুটারে। সে হাওয়ায় রুমাল উড়তে দেখল।

জবা মীনা ভীষণ অস্বস্তির ভেতর পড়ে গেছে। পিন্টু এবং গোপাল এলে এত ভয় লাগত না, ফেলে চলে যেতেও পারছে না। আজকাল কত রকমের ঘটনা ঘটছে শহরে। ব্যর্থ প্রেমে আত্মহত্যা নয় তো! মীনা বলল, কী খেয়েছেন?

মানুর খুব অবাক লাগল কথাটা শুনে। সে সোজাসুজি বলল, ভাত।

ভাত তো সবাই খায়। আর কিছু খাননি তো?

মাছ, ডাল, কাসুন্দি।

তবে চোখ আপনার টানছে কেন!

নেশাখোরের মতো লাগছে নাকি! সে তো নেশা করেনি। কিছুক্ষণ রোদে রোদে ঘুরেছে। কিছুক্ষণ নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন হয়েছে। একসময় মনে হয়েছে সব মানুষের মাথা ঢিল মেরে ভেঙে দেবে। একসময় মনে হয়েছে পাশের মেয়েটিকে সাপ্টে ধরে তলপেটে চুমু খাবে। আর কিছু তো সে ভাবেনি। সে শুয়ে থেকেই বলল, আমাকে আপনারা মাতাল ভাবছেন?

চোখ লাল, বসে পড়লেন, টলছিলেন, আমাদের কী দোষ।

সে বলল, আমি যদি কিছু একটা করে ফেলতাম, মাতাল ভাবতে পারতেন। এই যদি জড়িয়ে টরিয়ে ধরতাম!

আপনি কিছু করতেই পারতেন না।

আমি পারি। কিন্তু আপনাদের এত বিশ্বাসের পর সত্যি আর পারব না।

মীনা বলল, আমাদের বন্ধুরা এসে পড়বে। আলাপ করিয়ে দেব।

জবা বলল, গোপাল খুব ভালো। খুব হাসাতে পারে।

মীনা বলল, পিন্টুর মুখে সব বিগ বিগ টক। রোববারে মাঠে আমরা ঘুরে বেড়াই। জ্যোৎস্না উঠলে বাড়ি ফিরি। কতদিন আমরা ওই যে গাছটা দেখছেন, তার নিচে বসে কেবল গান গেয়েছি।

ওর মনে হল সত্যি এমন মেয়েদের সঙ্গে বসে গান গাওয়া যায়। আর কিছু করা যায় না। আর কিছু করতে ভালোও লাগবে না।

কিছু দূরে ক্লাব টেন্টের পাশে মানু দেখল, একজন ফুচকাঅলা ফুচকা বিক্রি করছে। কোথা থেকে সব মানুষজন, ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে। এত বড় শহর এত মানুষজন, হাউসগুলোতে শো হচ্ছে, ভিড়, ফুচকাঅলা ফুচকা বিক্রি করছে, চা—অলা হেঁকে যাচ্ছে, চাই চা, কিছুই তার কাছে এখন খুব প্রয়োজনীয় নয়। জয়া কবিতা পাঠ করছে। কবিতা পাঠ না অন্য কিছু। দাদা দুপুরে বাড়ি এলই না। মন্দাকিনী বউদির কাছে সে রুপোর কৌটায় সোনার ভ্রমরের খোঁজ পেয়েছে বুঝি। সংসারে সবাই কী তবে কাজকর্মের ফাঁকে এমন একটা ইচ্ছের ভেতর ডুবে যেতে ভালোবাসে। খোঁড়া, অন্ধ, বেকার, ফেরেব্বাজ, কৃপণ, অকৃপণ, ধনী, দরিদ্র, এটা না হলে বুঝি বেঁচে থাকতে পারে না। একবার কলেজে নানুকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে নাকি! তারপরই মনে হল—বাবা! যা গম্ভীর ছেলে। হয়তো জবাবে এমন দার্শনিক কথা বাতলাতে শুরু করবে যে তার কোনো ছাই মাথামুণ্ডু বুঝবে না। তখন হাওয়ার গন্ধ ভেসে আসছিল, কেবল মেয়েদের সুঘ্রাণ চারপাশে।

জবা বলল, এই!

মীনা বলল, এই কী ভাবছেন?

মানু বলল, গন্ধ পান না?

জবা বলল, হ্যাঁ, পাই?

কীসের গন্ধ পান?

মুচকি হাসল জবা। বলল, আপনি কোথাকার কী লোক, বলব কেন?

খুব খারাপ লোক না। ভুবনেশ্বরে আমার একটা সেলস এম্পোরিয়ামে কাজের কথা চলছে। কাজটা হয়ে গেলেই সুন্দর মতো কোনো মেয়েকে আমি ভালোবেসে ফেলব ভেবেছি।

এ রাম! এখনও বাসেননি!

এখন তো সবাইকে ভালো লাগে। সুন্দর দেখলেই ইচ্ছে করে হাত ধরতে।

আমাদেরও ইচ্ছে করে।

সে বোকার মতো তাকিয়ে বলল, কী ইচ্ছে করে?

জবা বলল, কী পাজি, সব জানতে চায়। আপনাকে বলব কেন?

মানু বলল, বলুন না, এখানে তো আর কেউ শুনতে আসছে না।

মীনা বলল, কিছু বলিস না রে পেয়ে বসবে।

জবা বলল, ন্যাকা।

মানু মীনার দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা আমাকে ন্যাকা মনে হয়। তারপর কিছুই না ভেবে বলল, বসুন না। দাঁড়িয়ে আছেন কেন।

জবার বসতে অসুবিধা নেই। সে জিনস পরেছে। হাফ—হাতা টপ পরেছে। গলায় সরু সোনার হার। পুষ্ট শরীরে সব কিছু বাড়বাড়ন্ত। প্রতিটি নখে সুন্দর রূপালি পালিশ। আঙুল সরু সরু আর লম্বা। হালকা একটা রুপোর আংটি কড়ে আঙুলে। চুল শ্যাম্পু করা, কিছুটা বাদামি রঙের। সে সহজেই বসে পড়তে পারল।

মীনার লাল শাড়িতে রুপোলি চুমকি বসানো। হাতের বটুয়া লাল রঙের। বগলকাটা ব্লাউজ লাল রঙের। গলায় লাল পাথরের মালা। সে বসার সময় প্রথমে হাঁটু মুড়ে বসল। তারপর শাড়ি টেনে পায়ের পাতা ঢেকে দিল।

মানুর মনে হল সহসা চারপাশে একটা স্বপ্নের পৃথিবী তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কথা বললে সে ওদের জিভ দেখতে পাচ্ছে। টকটকে লাল! এদের দুজনের কেউ কনস্টিপেসনের রুগি নয়। যেমন তার বাবা মা এবং আজকাল দাদাও আয়নায় জিভ দেখে। পাকস্থলী পরিষ্কার রাখার জন্যে ঘুম থেকে উঠেই ত্রিফলার জল খায়।

আসলে জবা মীনাদের শরীরের সব কোষগুলোই দারুণ তাজা! রক্তকণিকারা মাথা কুটে মরছে হাওয়া খাওয়ার জন্য।

বিকেলের মাঝামাঝি সময়। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। গাছটা মাথার ওপর ছায়া দিচ্ছে নিরন্তর। দুটো একটা পাখি ডাকছিল। মানু পা গুটিয়ে বসেছিল। জবা মীনা মাঝে মাঝেই দূরে কিছু দেখছে। ওদের আসার কথা, ওরা আসছে না কেন! অথচ অন্যদিন ওরা এসে দেখেছে, গোপাল পিন্টু বসে আছে অথবা পায়চারি করছে। ট্রাম অথবা বাস থেকে নামতে না নামতেই ওরা দৌড়ে এসেছে। অবশ্য সব সময়ই এটা হয় না। আবার কোনোদিন ওরা আগে চলে এসেছে। আসলে কত আগে বের হওয়া যায়, বাড়িতে সময় কাটে না, রাস্তায় বের হতে পারলেই, কী যেন হিল্লোল বয়ে যায় শরীরে।

মানু মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছে। মানুষের জীবন ভারি মায়াবী। জবা মীনাকে আর মনেই হয় না অপরিচিত। যেন সে তাদের কতবার দেখেছে, কত কালের চেনা। দূরে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ, সামনে সমান উঁচু ম্যাচ বাক্সের মতো বাড়িগুলো। ট্রামের ট্রাকশানে কখনও বিদ্যুতের ঝিলিক। পিছনে ফোর্ট উইলিয়াম। এবং কত প্রাচীন অথবা নবীনা এই শহর।

মানু বলল, হাফ—হাতা টপে আপনাকে দারুণ মানিয়েছে।

জবা নিজের বুকের দিকে তাকাল। বুকটা ধুকপুক করছে।

মীনার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে শাড়িতেই বেশি সুন্দর দেখায়। এটা আপনি বোঝেন কী করে!

মীনা হাঁটুর ওপর হাত রেখেছে আড়াআড়িভাবে। চিবুক রেখেছে হাতের ওপর। মীনা সোজা তাকিয়েই বলল, আমাদের খুব ভাগ্য ভালো!

মানু বলল, এ বয়সে মেয়েদের ভাগ্যটা ভালোই থাকে।

সে কথা বলছি না মশাই। বলছি, ভাগ্যিস তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি।

দেখা হলে কী হত?

স্বার্থপর হয়ে যেতেন না। আমরা যে আছি একবারও চোখ তুলে দেখতেন।

মানুর কী রকম যেন একটা বড় রকমের ব্যথা বুকের গভীরে বেজে উঠল। একটা ভারি দীর্ঘনিশ্বাস বয়ে গেল সত্যি। জয়ার কবিতা পাঠ বোধহয় জীবনেও শেষ হবে না। সে সত্যি কথা বলে ফেলল, আসলে মানুষ বোধহয় পবিত্র হয়ে গেলে কিছু আর গোপন রাখতে পছন্দ করে না। —জয়ার সঙ্গে শো দেখব বলে এসেছিলাম। হাউসে দেখা হতেই জয়া বলল, বাড়িতে দুজন কবি হাজির। কবিতা পাঠ আছে। আমাকে ফেলে ওদের সঙ্গে জয়া চলে গেল।

আর সেই থেকে একা ঘুরছেন? জবা বলল, আমরা হলে মারামারি করতাম।

মানু বলল, পারতেন।

খুব পারতাম।

মানু নীচের দিকে তাকাতে পারছে না। সেই জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে দামি টেরিকটনের ভাঁজটা ওকে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল। এবং সে চুরি করে যতবার সেদিকে তাকাতে গেছে, জবার চোখে চোখ পড়ে গেছে। তার মুখ অতর্কিতে জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেছে।

আপনার লাভার বুঝি পদ্য লেখে?

লাভার! তা লাভারই বলতে পারেন। খুব লঘুস্বরে লাভার বললে, ছোটই করা হয় জয়াকে। সে মনে মনে বলল, আমি ঠিক কিছুই জানতাম না। জয়া চোখে চুমু খাবার পরই আমার মাথা গোলমাল হয়ে গেছে। আগে তো রোয়াকে বসে আড্ডা মারতুম, মেয়েদের দেখলে আমার বন্ধুরা টপ্পা গাইত, শিস দিত, কিন্তু জয়াটা আমার চোখে চুমো খেয়ে যে কী করল এটা! জয়ার কথা ভাবলেই মাথা এখন ঝিম ঝিম করে। চোখ বুজলে জয়াকে দেখতে পাই। দু'জনে আমরা একটা কিছু করে ফেলব এবার।

মীনা বলল, এই আবার আপনি ভাবতে শুরু করেছেন।

আমাকে বলছেন!

তবে কাকে? চলুন উঠুন। কোথাও বসে একটু খাওয়া যাক।

আমাকে আপনারা খাওয়াবেন!

আসুন না। দেখি কতটা কী খাওয়াতে পারি।

ওরা!

ওরা এসে দেখবে আমরা নেই।

মীনা, জবা এবং মানু মাঠ পার হয়ে চলে যাচ্ছে। এবং যদি কোনো গ্রহান্তরে টেলিপ্যাথি থাকে, ধরা যাবে, সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এক যুবক দুজন যুবতীর পিছু পিছু খাবার লোভে হেঁটে যাচ্ছে।

জবা মীনা গান গাইছে। হাত ধরাধরি করে ওরা দুজনে গান গাইতে গাইতে হেঁটে যাচ্ছে। শরীরে ভারি আনন্দ হিল্লোল। কোষে কোষে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওরা বিহ্বল হয়ে পড়ছে। গানের ভেতর কেবল কিছু পাওয়ার জন্য পাগল।

এগারো

জয়া বলল, আর কতদূর?

আয় না। বলে একটা সরু গলিতে কালিদাস ঢুকে গেল। তারপর পানের দোকান থেকে দুটো সিগারেট কিনে জয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, পান খাবি?

মিষ্টি পান খাব।

এই তিনটে মিঠে পাতা লাগাও।

কালিদাস পকেটে খুচরো খুঁজছিল।

জয়া বলল, আর কে কে আসছে?

বিনয় বলল, অনেকের তো আসার কথা। না এলে বোঝা যাবে না।

জয়া এলিভেটেড সু পরেছে। মাঝারি ধরনের লম্বা শরীর, মনে হয় জয়া সবার থেকে লম্বা থাকতে চায়। সু পরায় মোটামুটি লম্বাই হয়ে গেছে। কালিদাস বেঁটে মতো মানুষ—ওর মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে জয়া এবং সারাক্ষণ তার দেহ থেকে ক্রিমের একটা সুন্দর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কালিদাস বিনয় পিছনে পিছনে এসেছে গন্ধটা শুকতে শুকতে। প্রায় দুটো কুকুরের শামিল—এবং জয়ার পিছনটা এত মনোরম যে সারা রাস্তায় ওরা আর কোনো দৃশ্য দেখেনি। শাড়ি সিল্কের হলে যা হয়, পিছনে লেপ্টে থাকে। ফলে চলার সময় শরীরের সঙ্গে শাড়িটার বেশ একটা ছন্দ থাকে। এই ছন্দ যে কত আনন্দের বেদনার এবং দুঃখের তারা এখনও জানে না।

বিনয় বলল, জয়া, ওই ছেলেটি কে রে?

ও মানু। খুব ভালো ছেলে। জয়া বলল, তোদের মতো না। তোরা তো কবিতা লিখিস। মানুর ওসব বাই নেই। ভালো ছেলে। ওর চাকরি হলে আমাকে বিয়ে করবে বলেছে।

কালিদাস বলল, আমরা কী দোষ করলাম?

তোরা তো বলিসনি বিয়ে করবি।

আজই বলে রাখলাম।

বিনয় বলল, জয়া তোর পান।

সে পানটা হাতে নিয়ে খুলে দেখল। চুন বেশি হলে গাল পুড়ে যায়। দেখল ঠিকই আছে। আরও দু'কুচি ভাজা সুপারি চেয়ে নিল হাত পেতে।

বিনয় বলল, আমি পান খাচ্ছি না। রেখে দিচ্ছি।

বললেই পারতিস কিনতাম না। কালিদাস দু'টো পান এবং সিগারেটের পয়সা দিয়ে দিল।

জয়া দেখেছে বিনয়ের একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে। আরও দুবার তাকে নিয়ে দু—জায়গায় কবিতা পাঠের জন্যে গেছে। পান কিনে খেয়েছে। বিনয় খায়নি। বিনয় হাত পেতে বলেছে, জয়া দে। প্রথম দিন সে বুঝতে পারেনি, সে বলেছিল, কী দেব! বিনয় পানের ছিবড়ে চাইছে। এবং জয়া বলেছিল, কী কাঙাল রে তুই!

কাঙাল কী। তোর এঁটো খেতে আমার ভালো লাগে। তারপর এক সময় অবসর বুঝে বলে ফেলেছিল, জয়া, তুই আমার একটা কথা রাখবি?

কী কথা!

তোর জিভের ডগা থেকে আমি একটু পান নেব।

ঠিক আছে, নিস।

এবং এক বিকেলে কলেজস্ট্রিট থেকে একটা দামি পান কিনে সত্যি সে সোজা চলে গিয়েছিল জয়াদের বাড়িতে। জয়ার বাবা অফিসে। জয়ার পিসি স্কুলে। মা রুগণ। দিনরাত শুয়ে থাকে। এবং জয়ার একমাত্র সঙ্গী বাঘা পায়ের নিচে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। তখন শহরের রাস্তায় সবে মাত্র আলো জ্বলে উঠছে। বিনয় বেল টিপে ধরতেই দরজা খুলে গেল। জয়ার পরনে মখমলের পোশাক। একেবারে লম্বা গাউনের মতো পায়ের পাতা অবধি। হাতে রুপোর বালা। চুল ঘোড়ার লেজের মতো টান করে বাঁধা। বিনয় ঢুকেই খুব ফিস ফিস গলায় বলেছিল, এনেছি।

কোনো নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে যেন সে ঢুকেছে। চোখে মুখে খুব একটা থমথমে ভাব। —তুই, একা আছিস তো?

কী হবে একা থাকলে।

বিনয় কলাপাতার ভাঁজ থেকে একটা পানের খিলি বের করে বলেছিল, নে খা।

পান খেলে ঠোঁট টুকটুকে লাল হয় না জয়ার। জয়া কতদিন ঠোঁট উলটে দেখেছে। মোটেই লাল হয়নি। সে বলল, ঠোঁট লাল হবে তো?

হবে। খা না। কে আবার এসে পড়বে তখন আর হবে না। তাড়াতাড়ি খা তো—

জয়া খেতে খেতে প্রায় সবটাই খেয়ে ফেলেছিল। বিনয় দেখছে। —এই রে সবটা খেয়ে ফেলেছিস! কী কথা ছিল?

ও! বলেই জয়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। নে—জিভের ডগা সামান্য বের করে দিল। আর বিনয় কাছে আসতেই আবার জিভটা ভেতরে পুরে ফেলল। বিনয় হতাশ গলায় বলেছিল, এই জয়া এমন করিস না। মাইরি, মরে যাব। জয়া খুব কুঁচকে বলেছিল, তুই দাঁত মাজিস না।

আজকাল রোজ দাঁত মাজি। বিনয় দাঁত বের করে দেখিয়েছিল।

আচ্ছা নে।

জয়া মা কালীর মতো অনেকটা জিভ বের করে রেখেছিল। এবং মিষ্টি পানের অতীব সুমধুর গন্ধ। বিনয় জিভ থেকে সবটা চেটে খেয়ে বলেছিল, কী আরাম! জয়া তোরা যে কী না! তোরা আমাদের দেখছি মেরে ফেলবি।

কালিদাস তখন বলল, এসে গেছি।

দরজায় নীরদ দাঁড়িয়ে। সতরঞ্চি পাতা। দু—একজন ইতিমধ্যে এসে গেছে। জয়া চেনে না এদের। নীরদ বলল, জয়া, ভিতরে বস গিয়ে। নীরদ ওদের তুলনায় সামান্য বেশি বয়সের মানুষ। এবং গলায় একটা গম্ভীর স্বর রেখে দেয় সব সময়। কবিতার ক্ষেত্রে সে কিছুটা অভিভাবকের মতো। ওরা সবাই নীরদদা বলে ডাকে। সব কবিতার আসরেই মানুষটিকে দেখা যায়। নিজে খুব ভালো কবিতা লিখতে পারে না। তবে কবিতা—অন্ত প্রাণ। ভালো কবিতা কী, মানুষটা বোঝে। এবং এই কবি অন্তপ্রাণ মানুষটিকে জয়া শ্রদ্ধা করে। মান্য করে। সে ভেতরে ঢুকে ভালো মেয়ের মতো বসে পড়ল। খাতাটা এক পাশে।

কালিদাস বলল, এই হচ্ছে আলোক, এই হচ্ছে কাশী আর এই আমাদের জয়া। পৃথিবীর নতুন নতুন সব খবর এর ঝোলায় ভরা আছে।

ওরা হাত তুলে নমস্কার করল জয়াকে। জয়া দেখল একজন বড় গোঁফঅলা মানুষ। লম্বা গোঁফ। গালপাট্টায় অধিকাংশ মুখটা ঢেকে আছে। লোকটার নাম কাশী। কাশীনাথ দত্ত। ওর কবিতার বিষয় মৃত জীবজন্তু নিয়ে। যুবতী নারীর কোনো গন্ধ নেই কবিতায়। জয়া মনে মনে বলল, কিচ্ছু হবে না। গবেট। গবেট ছাড়া মুখটাতে লোকটার আর কোনো চিহ্ন নেই।

ক্রমে ক্রমে আরও দুজন, পরে একজন, আবার একজন শেষে পাঁচ—সাতজন এল। কবিতা পাঠ করতে বেশ সময় লাগবে। চারটেয় আরম্ভ হওয়ার কথা। কিন্তু যার বাড়িতে কবিতা পাঠ, তিনি কোথায়! তার দেখা নেই। অথচ সুন্দর করে সতরঞ্চি পেতে রেখেছে। মাঝখানে মাটির কাজ করা ফুলদানি! একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ফুটে আছে ওপরে। দেয়ালে রবিঠাকুরের ছবি। আর কোনো ছবি নেই। সতরঞ্চির ওপর ফুল—ফল আঁকা চাদর পাতা। সবার খুব গম্ভীর চোখ মুখ। কবিতা ব্যতিরেকে আর কিছু জানা নেই। পাশেই জয়া, কিছুক্ষণের ভেতরেই ফুল্লরা, আর একজন কেউ হবে, সেও যুবতী, এল। তবে এত কালো আর শীর্ণ যে কেউ ওর দিকে তাকাচ্ছে না। ফুল্লরা দেখতে মন্দ না, তবে জয়া সবার চেয়ে সুন্দরী। কেবল যখন কোনো সভায় সেই বজ্জাতটা আসে, নবীনা না কী যেন নাম, তখন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। এবং তখন কালিদাস, বিনয়, এমনকি যে নীরদদা এত গম্ভীর মানুষ, তিনিও খুব বিচলিত হয়ে পড়েন! জয়া সে সব ঘরোয়া আসরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বড়লোকি চাল, গাড়ি, সোফার উড়ু উড়ু চুল, চোখে টানা আইল্যাশ আর দামি পারস্য দেশের আতর বোধহয় শরীরে মেখে রাখে। যতক্ষণ থাকে একইভাবে গন্ধটা ম ম করে। জয়ারও কম জানা নেই। বাজারে কার কী রকম গন্ধ সব সে জানে। কেবল নবীনার গন্ধটা তার এখনও জানা নেই, কোথায় কোন পৃথিবীতে কিনতে পাওয়া যায়। নবীনা মেয়েটিই একমাত্র ঈর্ষার উদ্রেক করতে পারে তার।

নীরদদা এবার বোধহয় বেশ গুরুগম্ভীর গলায় কবিতা কত পবিত্র ব্যাপার এ সম্পর্কে সামান্য বক্তব্য রাখবেন। যিনি উদ্যোক্তা তাকেও দেখা গেল। আদ্দির পাঞ্জাবি, ফিনলে ধুতি পরে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে হাত তুলে সবাইকে অভিবাদন করলেন। নীরদদা তখন তার কথাবার্তা আরম্ভ করে দিয়েছেন। হাত তুলে ইশারায় বসতে বললেন। ধূপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ খাতা খুলে দেখছে কিছু। জয়ার কিছু দেখতে হয় না। তার কবিতা মুখস্থই থাকে। তবু কোথাও আটকে গেলে অসুবিধা হবে ভেবে খাতাটা অথবা দুটো একটা মুদ্রিত কবিতা সামনে রাখার স্বভাব।

সেই কাশীনাথ দত্ত উঠে বলল, নীরদদা, আজ আপনাকে দিয়েই কবিতা পাঠ আরম্ভ হোক।

সে হবে'খন। বোস।

প্রায় এক ধমকে বসিয়ে দেবার মতো। জয়ার ভীষণ হাসি পাচ্ছিল, সে এক ফাঁকে সামান্য হেসেও নিল। তারপরই মনে হল, বাথরুমে গেলে মন্দ হত না। সে চারপাশে তাকাল। মানুটা খুব দুঃখ পেয়েছে। মানুর জন্যে একটা দুঃখবোধ শরীরে খেলা করে বেড়াচ্ছে। কবিতা পাঠ ভারি উজ্জ্বল ঘটনা জীবনে। একটা সুখানুভব খেলা করে বেড়াচ্ছে শরীরে। গুঁফো লোকটার চোখ মাঝে মাঝে তাকে বিব্রত করছে। সামান্য অস্বস্তিও বোধ করছে। এ সব অনুভূতি একই শরীরে খেলা করে বেড়ালে সে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এবং সে জানে কবিতা পাঠ প্রথম তাকে দিয়েই আরম্ভ হবে। সে উঠে এক মিনিট সময় চেয়ে নিল নীরদদার কাছে। তারপর বলল, আজ কিন্তু সবার শেষে আমি।

নীরদদা আবারও হাত তুলে ওকে বসতে বললেন। তিনি সুন্দর বর্ণনা সহকারে কবিতার কথাবার্তা বলতে পারেন। এবং বলতে বলতে ভারি নিমগ্ন হয়ে যান। চারপাশে কোথাও দুঃখ—টুঃখ আছে বোঝাই যায় না। এই বড় শহরে ফুটপাতে লোক থাকে, একবেলা আহার জোটে না মানুষের, মৃত্যু এবং ঈর্ষা অথবা অনুতাপে দগ্ধ হয় শহর—এখন এই সরু গলির অন্ধকারে টের পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হয় সর্বত্রই ফুল ফুটে আছে। কেবল কবিতা পাঠই মানুষের একমাত্র কাজ।

নীরদ হাজরা বলে চলেন, শরীর মন ঈশ্বর অথবা যন্ত্রণা মানুষের কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে। কবিতা দুঃখ জাগায়। কিছু না পাওয়ার দুঃখ থেকেই কবিতার জন্ম। আমরা নিয়তি—তাড়িত, অথচ কখনও পরাজিত হতে চাই না।

ফুল্লরা তখন শাড়ি টেনে পা ঢেকে দিল। ফুল্লরা আলতা পরেছে। ফুল্লরা আজ চুলে শ্যাম্পু করেছে। ওর চুল সারা পিঠে ছড়িয়ে আছে। কবিতা পাঠের সময় ফুল্লরার খুব ঘাম দেখা দেয়। দুটো রুমাল ওর বটুয়াতে থাকে। একটা ঘামের আর একটা গন্ধের। গন্ধের রুমাল বের করে সে চশমা মুছছে।

গুঁফো কাশীনাথের চোখ ট্যারছা হয়ে যাচ্ছে। সে বার বারই জয়ার পিঠের খালি অংশটা দেখার চেষ্টা করছে। সুড়সুড়ি লাগছিল জয়ার। সে শাড়ির আঁচল টেনে ভালো করে পিঠ ঢেকে দিল।

এবং গুঁফো কাশীনাথ ভাবল এই মেদ মাংস ভেদ করে একটা ফুসফুস থাকে মানুষের। অন্তঃকরণ থাকে পাশে। দুটোই এখন জ্বলছে আর নিভছে। এবং শরীরে করাত চালালে দুটো আলাদা ভাগে ফুসফুসের অর্ধাংশ, অন্তঃকরণ সবটাই একদিকে, পাকস্থলী, মূত্রাশয় সব সমান দু'ভাগ হয়ে যায়। সে পাশাপাশি বসা দুজন মেয়ের শরীর ভাগ করে দেখছিল। সে অ্যানাটমির ছাত্র। মেয়েদের দেখলেই ফুসফুস এবং জরায়ু দুটোর রঙের কতটা আসমানজমিন ফারাক বুঝতে পারে।

কালিদাসের কাছে জয়া দেবীর মতো। নাকে নথ পরে থাকলে জয়াকে সরস্বতী ঠাকুরণ ভাবা যেত অনায়াসে। বসার ভঙ্গিটা ঠিক তেমনি। জয়ার বুক ভারী উঁচু এবং প্রবল। শাড়ির অভ্যন্তরে থাকতে চায় না যেন। সে চুরি করে এখন মাঝে মাঝে তাই দেখছে।

এবার কবিতা পাঠ আরম্ভ হোক, নীরদ হাজরা বলে উঠলেন।

তখনই গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল দরজায়। জয়ার মুখটা কালো হয়ে গেল।

নবীনা এখানে আসবে, কালিদাস বলেনি। জয়ার মুখটা কালো হয়ে গেল। না আসবারই তো কথা। তবু চুপি চুপি ঠিক বলে রেখেছে। কালিদাস এবং বিনয় এখন আর ওর দিকে তাকাবেই না। শুধু ওরা কেন, সবাই। সে এলেই সবাই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। নীরদদা দরজা ঠেলে বাইরে বের হয়ে গেলেন। এবং নবীনা যখন এল, প্রায় সম্রাজ্ঞীর মতো। নবীনাকে এলিভেটেড সু পরতে হয় না। ঈশ্বর আসল জায়গাতেই জয়াকে মেরে রেখেছে। সে কেবল তীব্র ঈর্ষাবোধে কাতর হতে থাকল।

নবীনা সবাইকে এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ নীরদদাকে তুই তুকারি করে। এমন একটা ভঙ্গি কথাবার্তায় অথবা চালচলনে, যে সে এই সব যুবকদের থোরাই কেয়ার করে। যেন এদের সবার জন্যে সে কিছুটা দিতে পারে। কার জন্যে ঠ্যাং, কার জন্যে জঙ্ঘা, কার জন্য বুক, চিবুক অথবা ঠোঁট সবাই কিছুটা কিছুটা পাবে, সবটা পাবে না। সবটা সে কোনো একজনকে দিতে পারে না। জয়া কিন্তু সবটা একজনকেই দিতে পারে। জোর জবরদস্তি না করে দু'মাস আগের এক সকালে ওর চোখে মানু চুমো খেয়েছিল। মানুটা এত বোকা! বুঝতে এত সময় নেয় কেন তার মাথায় আসে না। সে কেমন নীরস গলায় বলল, নবীনাদি, তোর আসতে এত দেরি কেন রে!

আর বলিস না ভাই। উমাশংকর এসেছিল। উঠতেই চায় না। ওর কোথায় জলছবির কারখানা আছে, ওটা দেখাতে নিয়ে যাবে। প্রেস খুলেছে নতুন। কবিতার বইয়ের জন্য ঝোলাঝুলি করছে।

ফানটুস! ভেতরে এই একটা শব্দ বেলুনে পিন ফুটিয়ে দেবার মতো বের হয়ে গেছিল প্রায়। সে বলল, তোর মাইরি ভাগ্য বলতে হবে।

কালো মতো, রোগা মতো মেয়েটা বলল, নবীনাদি তোমার মতো ভাগ্য ক'জনের আছে। আমাদের একটা কবিতার বই ছাপিয়ে দাও না।

হবে হবে। বলে পা আলগা করে বসে পড়ল নবীনা। তারপর বলল, এখনও আরম্ভ হয়নি।

হবে এবার। তুমিই আরম্ভ কর। নবীনা থাকলে আর কারও যেন আরম্ভ করার অধিকারই নেই। নবীনা আসায় নীরদদা গর্বে ডগমগ করছেন। ফুল সেসান! নীরদদা গৃহকর্তার দিকে তাকালেন। এ সময়ে একরাউন্ড

চা হলে মন্দ হয় না। গৃহকর্তা কোঁচা দুলিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

জয়ার মনে হল, আজই সব সে একজনকে দেবে। দিয়ে দেখবে কবিতার চেয়ে কত বেশি তীব্র সুখ। এবং এ সময় মানুর জন্যে প্রবল টান বোধ করল। মানুকে বাড়ি ফিরেই ডেকে পাঠাবে। তার চোখ মুখ উত্তাপে জ্বলছিল। যেন প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে জ্বর আসছে। রোমকূপে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিচ্ছিল। সে আর সত্যি বসে থাকতে পারছে না। কবিতা—ফবিতা মাথায় উঠেছে।

নবীনা তখন বলল, কী রে জয়া, শরীর ভালো নেই! এমন করছিস কেন?

জয়া বলল, বোধহয় ভালো নেই।

কালিদাস, বিনয় এবং অন্য সবাই বুঝতে পারছে সেই রোগটা বুঝি দেখা দিয়েছে জয়ার। নবীনা এলেই জয়ার অস্বস্তি ফুটে ওঠে।

নীরদদা বললেন, পাখাটা জোরে চালিয়ে দাও অমিয়। জয়া বড্ড ঘামছে।

নীরদদা চায়ের কাপগুলো এগিয়ে দিচ্ছিলেন! নবীনা ঝুঁকে আছে তার কবিতার ওপর। কাশীনাথ পাতা উলটে যাচ্ছে। বিনয় কালিদাস ফিস ফিস করে কী সব বলছিল। বিনয় উঠে চা এগিয়ে দিল জয়াকে, ফুল্লরাকে। আবার বসে পড়ে সেই ফিস ফিস কথাবার্তা আরম্ভ করলে জয়া ধমকে উঠল, ভালো হচ্ছে না বিনয়। কী যা তা সব বলছ, শুনতে পাচ্ছি।

তোমাকে বলছি না।

যাকেই বলছ, সে আমার গোত্রের।

কালিদাস বলল, নো আর সত্যি কথা নয়। কবিতা পাঠ এবার কার?

কাশীনাথ তাকাল নীরদদার দিকে। শেষের দিকে হলে কিছুটা অসম্মান সে ভেবে থাকে। এবং নীরদ সেটা জানে।

নীরদ বলল, কাশী এবার তুমি পড়ো। গম্ভীর গলায় পড়ো।

জয়ার হাই উঠছিল। এখনি কবিতার গোটা শরীরটা চিরে ফেলবে হারামি লোকটা। আরে মানুষের ভেতরে কী থাকে এটা তোমার কাছে কে জানতে চায়, বাইরে সে কী ভালোবাসে তার কথা বল। জয়া হয়তো বলেই ফেলত ধমাস করে, নীরদদা উঠি। ভাল্লাগছে না। এবং তখনই মানু মাথার ভেতরে হেঁটে যায় তার। সে বুঝতে পারল তার কবিতার গভীরতা একমাত্র এই বয়সে মানুই প্রথম পরিমাপ করে দেখতে পারে।

কাশীনাথ দুবার গলা খেকারী দিল। তারপর বলল, একটু জল।

একগ্লাস জল হোস্ট ব্যক্তিটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে আনল।

কাশীনাথ জল খেল চুক চুক করে।

এই জল, বলে সে কবিতার লাইনটা দুবার দুরকমভাবে ঘুরিয়ে বলল, জল এই, এই জল। ভেতরে যতদূর যায়। দেখবে গভীর হলুদ অন্ধকার। আরও নীচে তার কোনো পরিমাপ নেই।

কাশীনাথের কবিতায় পরিমাপ শব্দটির খুব বেশি বোধহয় ব্যবহার আছে। জয়া কী তবে গভীরতা পরিমাপ করার ব্যাপারে কাশীনাথের কবিতা থেকে ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে। ভাবতেই গা—টা কেমন গুলিয়ে উঠল জয়ার। সে উঠে বলল, দাদা যাই।

সে কি!

হা হা করে উঠল সবাই।

আমার শরীরটা ভালো নেই।

কেন কী হল!

ঠিক বুঝতে পারছি না।

নবীনা বলল, জয়া তোমার কবিতা শুনব বলে এত কাজের ভেতরেও চলে এলাম।

আর একদিন শুনবে।

নীরদ ঠিক বুঝতে পারল না কেন জয়ার শরীর খারাপ, কেন সহসা কবিতা পাঠের আসর ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। জয়াকে আজ ইচ্ছে করেই শেষের দিকে রেখেছে। মেয়েটা সত্যি কবিতা ভালো লেখে। এবং সবার শোনার আগ্রহ থাকে। অন্য সময় ভালো কবিতা দিয়ে সে আরম্ভ করে দেখেছে সবাই কোনো অজুহাত দেখিয়ে কবিতা পাঠ শেষ না হতেই চলে যায়। এবং যারা নতুন, অথবা কবিতার মুদ্রাদোষে আক্রান্ত, খবর পেলেই গন্ধে চলে আসে যারা, ফাঁকা মাঠে পড়ে যায়। সুতরাং নীরদ এবার ভেবেছে, ভালো সবকিছু শেষের দিকে।

কালিদাস বলল, এই বোস, আমি তোকে এগিয়ে দিয়ে আসব।

কোথায়?

যেখানে যাচ্ছিস রাগ করে।

সেটা কতদূর যখন জানিস না, কথা বলিস না বোকার মতো।

নীরদদা বলল, তোমার যাওয়া উচিত হচ্ছে না জয়া। বরং তুমি তোমার কবিতা পড়েই যাও। কাশীনাথের হলে তুমি পড়বে।

জয়া হেসে ফেলল। আচ্ছা নীরদদা আপনি কী!

কেন বলত!

আপনি আমাকে কী ভাবেন! কেমন গম্ভীর গলা জয়ার।

নীরদ বললে, কী ভাবি!

খুব ছেলেমানুষ ভাবেন!

ধুস, মেয়েরা বারো পার হলেই আর ছেলেমানুষ থাকে না। তোমার তো সে হিসেবে অনেক বয়েস।

গাছ—পাথর নেই।

গাছ—পাথরের কথা বলতে চাই না। এ—বয়সে মেয়েরা নিজের সম্পর্কে খুব সচেতন হয়ে ওঠে এটা বুঝি।

কাশীনাথ কবিতার খাতা বন্ধ করে দিয়ে বলল, আপনারা আর কতক্ষণ কথা বলবেন?

নীরদ খুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল কথাটায়। সত্যি যখন কবিতা পাঠ হচ্ছে, এভাবে জয়ার সঙ্গে কথা বলার সময় পরেও পাওয়া যাবে। সে বলল, আচ্ছা তা হলে জয়া তুমি যাও।

জয়া বাইরে এসে ভাবল কাজটা অনুচিত হয়েছে, আসলে সে যে কেন বলেছিল দাদা আমার কিছু ভালো লাগছে না বুঝতে পারছিল না। এখন মনে পড়ছে মানুর জন্য সত্যি মনটা খারাপ হয়েছিল। একা সিনেমায় ছেড়ে চলে এল, মানু কত কিছু ভাবতে পারে। মানুকে তার খুব ভালো লাগে। লম্বা হাত পা, চোখ বেশ সুন্দর, এবং চুলে কী যে তার মহিমা আছে, এখন যে হাড়ে হাড়ে সে এটা টের পাচ্ছে। সে তখনই দেখল পেছনে কালিদাস ছুটে আসছে। কালিদাস হাঁকছে, এই জয়া দাঁড়া।

জয়া দাঁড়াল না। হন হন করে হাঁটতে থাকল। কেমন বেহায়াপনা আছে কালিদাসের ভেতর।

কী রে শুনতে পাচ্ছিস না।

জয়া গলির মোড়ে এসে দাঁড়াল। কালিদাস কাছে এলে বলল, কীরে এত চিল্লাচ্ছিস কেন!

চল তোকে আমি এসকট করি।

আর কিছু করবি না?

করতে দিলি কই।

জয়া বলল, সব এত সোজা ভাবিস কেন? জয়াকে ভীষণ গম্ভীর দেখাল। জয়ার উঁচু হিলের জুতোর ফাঁকে গোড়ালিটা দেখা যাচ্ছে। কী লাবণ্য এই পায়ে। কালিদাসের উপুড় হয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু মেজাজ মনে হচ্ছে সত্যি জয়ার ভালো না। সে পাশাপাশি হাঁটতে থাকল শুধু। কী কথা বলবে ঠিক বুঝতে পারল না।

অগত্যা যা হয়, কবিতার কথা। এবং দুটি একটি টিপ্পনি কাটল নবীনা সম্পর্কে। কাশীনাথ বুড়ো হাবড়া জাহান্নামে যাওয়া সব চিন্তা ভাবনা, যুবতীদের শরীর নিয়ে এত হ্যাংলার মতো লেখার কী আছে—এসবই কথা প্রসঙ্গে জয়াকে বলতে থাকল। জয়া কখনও না কখনও হ্যাঁ করে যাচ্ছে। এবং ট্রাম স্টপ আসতেই প্রায় চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠে গেল। এবং হাত নেড়ে কালিদাসকে টা টা করল। কালিদাস কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে দেখল, ট্রামটা বেশ দ্রুত চলে যাচ্ছে। জয়ার শাড়ির আঁচল অতি অল্প হাওয়ায় উড়ছিল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। জয়ার তো এ—ট্রামে ফেরার কথা নয়।

বারো

এই বাড়িটায় নানু আরও ক'বার এসেছে। একবার সে এসে দেখেছিল, কেউ নেই, কাজ করে যে বালিকাটি শুধু সেই আছে। আর একবার এসে দেখেছিল, জেঠু বের হয়ে গেছে কোথায়। জেঠুর মহিয়সী ভূড়ি দুলিয়ে ব্যাগ দুলিয়ে মেয়ের হাত ধরে কোথায় রওনা হবার জন্য বের হচ্ছে। ওকে দেখেই, আরে নানু এলি। ও—মা কত দিন পর এলি। তোর বুঝি আমাদের কথা মনে থাকে না। তোর জেঠুর তো ঘুম নেই দুচোখে, তোর কথা ভেবে। যাক তবু যে এলি। বোস। তারপরই সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, ডাল বসিয়ে দে। পোস্ত বাটা আছে। মাছ টাছ তো আর পাওয়া যায় না।

নানুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুমি খেয়ে যাবে। জেঠি তার বেশি সোহাগে তুই তুকারি করে। আর বিরক্ত হলে তুমি তুমি করে।

নানু বলেছিল, জেঠু কোথায়।

মহীয়সী বলেছিল, আসবে। তুমি কিন্তু চলে যেও না আবার। তোমার জেঠু তবে খুব খারাপ ভাববে।

নানু বলেছিল, না না। জেঠুর সঙ্গে দেখা করে যাব।

খেয়েও যাবে।

তা যাব।

আমি যাচ্ছি বুঝলে। এই কণা, শুনতে পাচছিস না, মহীয়সী চিৎকার করে সেই বালিকা চাকরাণীকে ডেকে, বলেছিল, নানুবাবুকে চানের জল তুলে দিস। রান্না হলে গুল দিস। পুকুর থেকে জল এনে সাদা শাড়িটা কাচবি। কলের জলে ধুলে তোমার একটা দাঁতও আস্ত রাখব না।

জেঠুর মেয়েটা তখনই কুঁই করে উঠল। চল মা। যাবে না।

নানু বলেছিল, এই হাবলা।

আমাকে হাবলা বলবে না আমার নাম কুটু।

নানু চুল নেড়ে বলেছিল, কেমন আছিস। যাবি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে। ছোট্ট বোনটিকে মাঝে মাঝে নানুর ভারি আদর করতে ইচ্ছে হয়। সে বলেছিল, কোথায় যাচ্ছিস, আমার সঙ্গে থাক।

কুটু বলেছিল, না। মার সঙ্গে আমি যাব।

নানু বলেছিল, আমি তোর দাদা। দাদার কথা শুনতে হয়।

বের হবার আগে আর কী কী আদেশ জারি করা বাকি আছে ভেবে বোধ হয় সেই মহীয়সী বারান্দায় দু—বার পায়চারি করল, একবার শোবার ঘরে ঢুকে তালা ফালা সব জায়গা মতো দেওয়া আছে কিনা দেখে নিয়েছিল। শোবার ঘরের জানালা বন্ধ করে দরজার শেকল তুলে সেখানেও একটি বৃহৎ ঘণ্টার মতো তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। কেবল খোলা রেখে গেল বাইরের ঘরটি—সেখানেই জেঠু না আসা পর্যন্ত নানুকে অপেক্ষা করতে হবে। বড়ই সাবধানী মহিলা। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে ঠকতে রাজি না। নানুর স্বভাব কেমন কে জানে! নানুর মনে হয়েছিল, তখনই সে চলে যায়—কিন্তু গেলে জেঠু কষ্ট পেতে পারে—জেঠু, আহা সেই জেঠু যে তাকে হাত ধরে পার্কে নিয়ে যেত, লাল বল নিয়ে তার সঙ্গে খেলা করত। একজন মহীয়সীর

পাল্লায় পড়ে জেঠুর লাইফ জেরবার—এবং তখনই মনে হয়েছিল, সারাদিন থেকে জেঠুর জীবনের বাকি সময়টা কেমন করে কাটে দেখে যাবে।

বাথরুম খোলা ছিল বলে একবার সেখানে ঢুকতে পেরেছিল। আর বাকি সময়টা ভীষণভাবে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল বালিকাটি একহাতে সব কাজ কেমন করে একে একে করে যাচ্ছে। ওর ভারি চা খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। এবং সেজন্য সে মুখ বাড়িয়ে বলেছিল, কীরে এক কাপ চা হবে? বালিকাটি ভারি কাঁচুমাচু চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিল—তখনই বুঝেছিল, কত অসহায় এই মেয়েটি।

জেঠু এল বারোটা বাজে বাজে সময়ে। নানুকে দেখেই খুব ছেলেমানুষের মতো জড়িয়ে ধরেছিল, তুই এলি তবে! কেমন আছিস। তোর জেঠিমা বাড়ি নেই। থাকলে কী খুশি হত।

নানু বলেছিল, দেখা হয়েছে।

ওয়েল। দেন, বাড়ি চিনে আসতে কোনো ট্রাবল ফেস করতে হয়নি তো!

নানু বলেছিল, আমি তো আরও এসেছি। জেঠি ছিল। তোমার অফিসে ফোনে জানিয়েছিলাম মনে নেই? ট্রাবল ফেস করতে হবে কেন।

ও ইয়েস, ইয়েস। ইউ কেম। ভেরি গুড, নাউ ইউ কমপ্লিট ইউর বাথ। আমিও চানটা সেরে নেই। তারপর দুজনে জানালা খুলে শুয়ে পড়ব।

নানু জানে জেঠু সারাক্ষণ বক বক করতে ভালোবাসে। এবং জেঠু একটিই রেকর্ড চালিয়ে দেয়। রেকর্ডে সব মহৎ ব্যক্তিদের উক্তি এবং জীবন সম্পর্কে অতিশয় কঠিন সত্যের প্রকাশ থাকে। আরম্ভ হল বলে। প্রথম দিন শুনলে মনে হবে, বড়ই পণ্ডিতপ্রবর। দ্বিতীয় দিন শুনলে মনে হবে বড়ই রাজনৈতিক সচেতন। তৃতীয় দিন শুনলে মনে হবে, দেশের একজন চিন্তানায়ক তিনি! চতুর্থ দিনে আদর্শ শিক্ষক, পঞ্চম দিনে পরম রসিক, ষষ্ঠ দিনে ধর্মপরায়ণ, সপ্তম দিনে কবিয়াল, অষ্টম দিনে হাপুর বাজারের দালাল, নবম দিনে কোতোয়ালের পুত্র, দশম দিনে রমণীরঞ্জন, একাদশ দিনে একটি আস্ত আরশোলা। অর্থাৎ দশ দিনের ওপর জেঠুর সঙ্গে যে ব্যক্তি আলাপ করেছে তার বিন্দুমাত্র ভাবতে কষ্ট হয় না, মানুষটা জীবনে কোথাও এতই জেরবার যে পা রাখার আর জায়গা নেই। আস্ত একটি ভাঁড়। এ—হেন ব্যক্তিটি খেতে বসে বলেছিল, পোস্ত আলু আর ডাল বড়ই ডেলিসিয়াস ফুড। আমার ফেবারিট লাঞ্চ।

ভোজ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করতে নানুর খুবই কষ্ট হয়েছিল। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, আসলে সেই মহীয়সী তোমার জন্য আর কিছু বরাদ্দ করেনি। তুমি যা রোজগার করো এবং মহীয়সী যা রোজগার করেন, সঞ্চয়ের জন্য। বেঁচে থাকার চেয়ে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বড়ই আরামদায়ক। অথবা তোমাকে একটি আস্ত অশ্ব বানিয়ে চেপে বসেছেন, এখন তোমার সওয়ারি নিয়ে শুধু ছোটা বাদে অন্য কোনো গত্যন্তর নেই। তবু নানু সাধারণত এই কাপুরুষ মানুষটিকে দুঃখ দিতে চায় না। সেও জেঠুর সঙ্গে খেতে খেতে বলেছিল, বড়ই সুস্বাদু খাবার!

যাইহোক আজ সে খবর দিয়ে এসেছে। এতদিনে জেঠির শরীর ভালো হয়ে যাবার কথা। এবং পেটের চর্বির নীচে বড়ই আন্ত্রিক গোলযোগ। মাঝে মাঝে যখন ঢেকুর তোলে তখন কাছে তিষ্ঠোয় এমন নরাধম জগতে কমই আছে। সেদিন সে বাড়ি ঢুকেই দেখেছিল মহীয়সী পা ছড়িয়ে বসে আছেন। কুলোয় পোয়াটেক খেসারীর ডাল। কাঁকর এবং আবর্জনা বাছার কাজটি তিনি সারছিলেন। এ—হেন সময়ে নানুর প্রবেশ। জেঠি আপাতত বিড়ম্বনা এবং বিরক্তি লুকিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলেছিলেন, হ্যাঁরে এসেছিস। তবু যে তোর জেঠির কথা মনে পড়ল।

রান্নাঘরে আজ সে অন্য এক বালিকাকে দেখতে পেল। ঠিক বালিকা বলা চলে না, কিশোরী, ছেঁড়া ফ্রক গায়ে—চোখ দুটো ভারি মিষ্টি। গরিব দুঃখী ঘরের মেয়ে—শীর্ণকায়, কতদিনের উপবাসের কত বড় দুর্ভাগ্য হলে এমন একটি পরিবারে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পায়। জেঠু ভেতর থেকে কাঁধটা সামান্য স্রাগ করে লম্বা প্যাকাটির মতো মুখ বার করে দিয়ে বলল, হ্যালো নানু। এসে গেছ। মাই লিটল চ্যাপ। ভিতরে চলে এসো। বসে পড়। লুডু খেলছি। কুটুর সঙ্গে। উড য়ু লাইক টু প্লে লুডু।

শোবার ঘরটিতে নানুর ঢুকতে সাহস হচ্ছে না। কারণ এক্ষুণি জেঠি বাজারে যাবে। সেদিন যা দেখেছে তাতে মনে হয়েছে, যাবার আগে জেঠি আজও শোবার ঘরে জীবজন্তুসহ তালা বন্ধ করে চলে যাবে। ফাঁক পেলে কে কখন জান মাল দুই তছরূপ করে নেবে সেই একমাত্র ভয়। তখনই ছোট ছোট কাপে চা নিয়ে এল সেই কিশোরী। নানু এত সকালে এসে উপস্থিত হবে হিসেবের বাইরে ছিল। দুখানা করে স্যাঁকা পাউরুটি এবং চা। নানু আসায় স্যাঁকা রুটির ভগ্নাংশ বেড়ে গেল। মেয়েটি একটা স্টিলের বড় থালায় চা সাজিয়ে এনেছে। এবং নানু দেখল, বড়ই জবু থবু হয়ে হাঁটছে মেয়েটি। ওর ফ্রকের পেছনটা একটা হিংস্র বাঘের থাবায় পড়েছিল বোঝা যায়। বাঘ না বাঘিনী এখনও নানু সেটা আন্দাজ করে উঠতে পারেনি।

জেঠি বলল, নানু চা নে। তারপর রুটির প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলল, খা। তুই এত সকালে আসবি বুঝতে পারিনি। ঘরে মাখন ডিম আজই ফুরিয়ে গেল। আর তোমার জেঠু এমন জায়গায় বাড়ি করেছে যে যদি কিছু পাওয়া যায়। নানু জানে সবই মিথ্যা বাক্য। জায়গাটি জেঠিই পছন্দ করেছে—বাজার বেশি দূরেও নয়। সবই পাওয়া যায়। সে শুকনো রুটি একদম খেতে পারে না। অগত্যা চায়ে ভিজিয়ে তিনবারের মাথায় খেতে গিয়ে দেখল অভাগা রুটি সবটুকু চা শুষে নিয়েছে। এ—সব কারণেই নানু জেঠুর বাড়ি আসতে চায় না।

কুটু বলল, এই দাদা, খেলবে তো ঠিক হয়ে বস।

নানু বলল লুডু খেলছিস, পড়াশোনা নেই।

জেঠু বলল, আছে, পড়াশোনা আছে। তবে সকাল থেকেই বায়না, তুমি আসছ, সুতরাং পড়বে না। বললাম পড়বি নাত কী করবি? কুটু বলল লুডু খেলব। তাই লুডু নিয়ে বসেছি।

নানু বলল, খেলতে চাইলেই খেলতে দেবে। সময় অসময় নেই?

জেঠি বলল, আর বলিস না। কুটুকে নিয়ে আর পারছি না। একদম কথা শোনে না। কী যে হয়েছে!

নানু অগত্যা খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। এবং একবার জেঠিকে বলবে ভাবল, যাবার সময় কিন্তু আজ আবার তালা মেরে যেও না। তোমার ঘরে এমন কিছু মহার্ঘ বস্তু নেই যা হারাবার। কারণ তুমি জীবনের সব কিছু আগেই হারিয়ে বসে আছ। বয়স বাড়বে, এখন পেটের আন্ত্রিক গোলযোগ, পরে সেটা বুকে উঠবে, শেষে মুখে—জীবনের সবটাই ব্যর্থতায় তোমার ভরা। আমার বাপকে দেখে শেখা উচিত ছিল জীবন কাকে বলে।

যাই হোক নানু শেষ পর্যন্ত লুডু খেলতে বসে গেল। জেঠি বাজারে যাবার আগে সেই কিশোরীকে ডেকে বলল, জল হলে ভাত বসিয়ে দিবি। মশলা বাটবি—জিরে ধনে লংকা আদা। চাবির রিংটা বটুয়াতে ভরে নিয়ে বের হবার মুখে বলল, ভাত বসিয়ে ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে মুছে ফেলবি। পেছনে লেগে আমি কাজ করাব না। একদিন বললে শুনে রাখবি। সেই একদিন আজই কী না নানু বুঝতে পারল না। জেঠি গড় গড় করে বলেই যাচ্ছে, চায়ের বাসন ধুয়ে তুলে রাখ। ছাড়া সায়া শাড়ি জলে ধুয়ে দড়িতে ঝুলিয়ে দিবি। ক্লিপ এঁটে দিবি। গোনা গুনতি ক্লিপ বুঝিয়ে দিতে হবে। একটা যেন না হারায়। তারপর বের হবার মুখে বলল, বিকেলে কিছু গোবর কুড়িয়ে আনবি।

বাড়ির চারপাশে এখনও কিছু ফাঁকা মতো জায়গা আছে। সেখানে গোরু চরে বেড়ায়। অনায়াসে একটু হিসেবি হলে ঘুঁটে কিনতে হয় না। আর জেঠি বাজার থেকে ফিরে এসেই বলল, তাড়াতাড়ি মাছটা বসিয়ে দে। একটু চাটনি কর। এবং দশটা বাজলেই বলল, সব নামিয়ে রাখ। এই নে টাকা, রেশন নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি আসবি। তারপর কিশোরী মেয়েটির নাম ধরে বলল, লীলা প্লাসটিকের বালটিতা কোথায় রেখেছিস। খুব মৃদু শব্দ এল রান্না ঘর থেকে—আমি জানি না মাসিমা।

জেঠির ঝংকারে বাড়িটা মুহূর্তে কেঁপে উঠল, তুমি জান না তো কে জানে! আর কে এ—বাড়িতে খেতে আসে!

লীলা আর কিছু বলল না। নানুর কেন জানি এ—সময় কিশোরী বালিকাটির মুখ দেখতে ইচ্ছে হল। পৃথিবীতে কেন এরা জন্মায়, বড় হয়! কী দরকার এমন মুখ ঝামটা খাওয়ার। ওর বুকের মধ্যে কোনো জলছবির রং ধরা আছে কী না একবার প্রশ্ন করে জানলে কেমন হয়। চোখ দুটো বড়ই মায়াবী। একবার মাত্র

নানুর দিকে সামান্য চোখ তুলে তাকিয়ে ছিল—বড়ই বিহ্বল চোখ। অবোধ। নানুর কেন জানি জেঠির গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হয়েছিল তখন।

তখনই কুটু বলল, আর খেলব না। তুমি পার না। বাবাকে বলল, তোমার কিছু হবে না বাবা। তুমি বার বার হেরে যাচ্ছ।

নানু বলল, হারলি তো তুই।

বাবার জন্য হারলাম।

নানু বলল, খেললি তুই আর হারলি বাবার জন্য।

তাই ত। বাবার গুটি বাঁচাতে গিয়েই তো দান নিলাম না।

অবনীশ বলল, তাই হয় নানু। তোমার মা চিঠি দিয়েছে তোমাকে?

দেয় মাঝে মাঝে।

আসবে লিখেছে?

আসতে পারে।

তোমার মাকে নিয়ে, তারপর কী ভেবে, অবনীশ সবটা শেষ করল না। স্ত্রীর নাম ধরে ডাকল। ও—ঘর থেকে তখন জবাব, অত চিল্লাচ্ছ কেন। বলতে হয় এখানে বলে যাও। অবনীশ সুড় সুড় করে উঠে গেল। তারপর ফিরে এসে বলল, তোমার মা এলে এখানে নিয়ে আসবে। ক—দিন এখানে থাকবে।

নানু বলল, দেখা যাবে। বলেই সে বাইরে বের হয়ে বারান্দায় পা দিতেই দেখল, জেঠি দরজায় দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে বকছে। —এতক্ষণ লাগে! ওখানে কী পাত পেড়ে খেতে বসেছিস। আজ একবার ফিরে আয় কত ধানে কত চাল দেখাচ্ছি। এক ফোঁটা জল রেখে যায়নি বাথরুমে।

নানু বলল, কখন তুলবে। এক দণ্ড তো বসে নেই।

জেঠি নানুকে যে—কোনো কারণেই হোক ভয় পায়। সেটা সেই বাবার আত্মহত্যাজনিত অপমান বোধ কী না নানু জানে না।

জেঠি খুব বিপদে পড়ে যাচ্ছিল নানুর কাছে। সুতরাং বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্য বলল, যাও চান সেরে নাওগে। কী করবে কপাল। জেঠির বাড়িতে এসেছ বেড়াতে, সেখানেও জল তুলে চান করতে হচ্ছে।

নানু জল তুলে চান টান করে বের হয়ে দেখল জেঠি দরজা হাট করে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। চোখ মুখ লাল। এবং মনে হচ্ছে, রাগে দুঃখে জেঠির এবার চুল খাড়া হয়ে উঠবে। বাথরুমে ঢোকার মুখে দেখেছিল, জেঠির খোপা বাঁধা। বের হয়ে দেখল, খোপা খোলা, এবং মনে হল কিছুক্ষণের মধ্যেই চুল পট পট করে দাঁড়িয়ে যাবে। নানু বুঝতে পারল, আজ লীলার কপালে খুবই দুর্ভোগ আছে। ঘণ্টা দেড়েক হয়ে গেল। কী করছে মেয়েটা?

এমন সময় লীলা চাল, চিনি, গম, তেল নিয়ে বাড়ি এল। আর অমনি জেঠি করালবদনী হয়ে গেল—লম্বা দুই হাত আরও লম্বা করে দিল, অনায়াসে লীলার বড় বড় চুল খামচে ধরল—তারপর টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে সজোরে লাথি, মুখে পিঠে পায়ে—যেখানে যতটা সম্ভব লাথি চালাতেই নানু মাথা ঠিক রাখতে পারল না। বলল, এ—সব কী হচ্ছে!

জেঠু বলল, মাই লিটল চ্যাপ, তুমি মাথা গলিও না। সব এক সময় ঠিক হয়ে যাবে। সংসার এমনই জায়গা।

নানু বলল, তার মানে!

মানে ঝড় একদিক থেকে কেটে গেল। যে রক্ত তোমার জেঠির মাথায় উঠে গেছিল চড়াৎ করে তা সহজেই এবার স্বাভাবিক হয়ে আসবে। নইলে অনর্থ ঘটত। তোমার জেঠি হয়তো সংজ্ঞা হারাত। মাথায় রক্ত ওঠা বলে কথা।

নানু বসার ঘরে গুম মেরে বসেছিল। কারণ লীলার এই নির্যাতন তার মাথার মধ্যে কে আবার রেল গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে। তার মনে হয়েছিল, জেঠুর তবে এই সংসার! জেঠুর এই হেনস্থা দেখে তাজ্জব। জেঠুর সামনে লীলাকে এত মারধোর করতে সাহস পায় কী করে! জেঠুকে বিন্দুমাত্র সমীহ করেন না মহিলা বোঝাই যায়। জেঠির সঙ্গে জেঠুর একদা প্রেম হয়েছিল—কেমন সব অবিশ্বাস্য ঠেকে। কুটু আস্তে আস্তে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। কেউ আর কোনো কথা বলছে না। লীলা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রান্না ঘরে একটা আহত জন্তুর মতো ঢুকে গেল। একটুও কাঁদল না। বাড়িটা এখন ঠান্ডা। জেঠি খাটে বসে হাঁপাচ্ছিল বোধ হয়। এবং লোডশেডিং বলে, জেঠু পাখা খুঁজছে। সংসার এত বিরক্তিকর—জেঠু বলল, এই লীলা পাখা কোথায়? কোথায় যে সব তোরা রাখিস! কুটু বাথরুমে মাথায় জল ঢালছে—কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। নানু তখন চিৎকার করে বলল, পাখা দিয়ে কী হবে?

জেঠু বলল, বাতাস!

নানু বলল, কাকে?

অবনীশ বলল, তোমার জেঠিকে। কেমন করছে দেখে যাও।

নানু বলল, তুমি দেখ। আমার দেখে কাজ নেই।

অবনীশ বড়ই একা। সে পাখাটা দেখল খাটের ও—পাশে পড়ে আছে। টেনে আনল পাখাটা। তারপর হাওয়া করতে লাগল। বোঝাতে থাকল—তুমি কেন মিছিমিছি মাথা গরম করো বুঝি না। মাথা গরম করলে কার ক্ষতি। তোমার না লীলার।

নানুর মুখে তখন কূট হাসি খেলে গেল। —জেঠু তাহলে তোমার এই সংসার। এই জীবন। জেঠু লীলাকে মুখ দেখাতে ফের তোমার লজ্জা হবে না! আমার কিন্তু হবে। এমন অসহায় একটা মেয়ের ওপর নির্যাতন করো তোমরা! তোমাদের ফাঁসি হওয়া উচিত না! বল, বিচারে তোমাদের কী কী শাস্তি প্রাপ্য। অথচ সে একটা কথা বলতে পারছে না। নবনীতা যদি জানে, তার পরিবারে এসব হয়, একজন অসহায় মেয়ের ওপর নির্যাতন হয়—কী ভাববে!

এত স্বার্থপরতা মানুষের মধ্যে থাকলে লীলারা যাবে কোথায়! কী সুন্দর চোখ মেয়েটার। নিরীহ নিরপরাধ। সে সহসা ডাকল, লীলা লীলা।

তারপরই ভাবল সে এটা কী করতে যাচ্ছে।

নানুর মাথার মধ্যে রেলগাড়ি চলছে! নানু বারান্দা পার হয়ে গেল। দেখল, জেঠু পাখায় বাতাস করছে। সে দাঁত শক্ত করে ফেলল। এবং রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, লীলা তোমার এত দেরি কেন?

লীলা জবাব দিল না।

কেন এত দেরি? বল। চুপ করে থাকলে কেন?

অবনীশ তাড়াতাড়ি পাখা ফেলে ছুটে এল—কী হচ্ছে নানু। তুমি আবার কী আরম্ভ করলে!

নানু শান্ত গলায় বলল, জবাব না দিলে, লীলাকে আমি খুন করব।

পুলিশ আসবে নানু।

যা হয় হবে।

অবনীশ বলল, লীলা বলে দে মা। কেন নানুকে রাগাচ্ছিস, জানিস ত এ—বাড়িতে রাগলে মাথা কার ঠিক থাকে না।

তখন লীলা বলল, দাদাবাবু লাইনে অনেক লোক ছিল। না দিলে আসি কী করে।

অবনীশ বলল, নে এবারে যা লীলা বলেছে, লাইন পড়েছিল লম্বা। আসে কী করে! আর ওর দোষ কী বল! সমাজে শোষণ নানাভাবে চলছে। ফেরেববাজ না হলে এ—দেশে নেতা হওয়া যায়! সুস্থ মস্তিষ্কের লোক কটা আছে। আয় এবার।

নানু হাত ছাড়িয়ে নিল, তারপর বলল, লীলা তুমি কেন এখানে মরতে এসেছ।

লীলা চুপ।
অবনীশ কেমন হতবাক।
জেঠি উঠে বসেছে।
লীলা আজই তুমি চলে যাবে।
অবনীশ চিৎকার করে উঠল, নানু তোর সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
নানু ফের বলল, লীলা আজই তুমি চলে যাবে।
লীলা ঘরের কোণ থেকে জবাব দিল, কোথায় যাব দাদাবাবু।
নানু আর একটা কথা বলতে পারল না। সে কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। সত্যি তো কোথায় যাবে? মেয়েটির যাবারও জায়গা নেই। সে সোজা বসার ঘরে ঢুকে পায়চারি করতে থাকল। সমস্ত পরিবারটাকে তার এ—সময় পুড়িয়ে মারতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কুটু, কুটু বড় ভালো মেয়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে, দাদা আয়। খাবি না।
কুটুর কথার মধ্যে কী যেন আশ্চর্য নিরাময়ের সঞ্জীবনী সুধা ছিল। নানুর মাথার মধ্যে ফলে রেলগাড়িটা আর চলছে না। কুটুকে সে কাছে ডেকে আদর করল। এক মাথা চুল, মিহি উলের বলের মতো। সে মাথার চুল এলোমেলো করে দিল কুটুর। তারপর ভাবল, কুটু বড় হলে যদি তার মার মতো, জেঠির মতো হয়ে যায়। সে কুটুকে বলল, চল আমরা কোথাও চলে যাই।
বিকেলে নানু দেখল সবাই ঘুমিয়ে আছে। সে বসার ঘরে শুয়ে ছিল। কুটুকে নিয়ে ওর বাবা মা দরজা বন্ধ করে ঘুমচ্ছে। লীলা রান্নাঘরেই বোধহয় সব সময় থাকে। খাওয়া শোওয়া সব তার ও—ঘরে। লীলার কোনো সাড়া—শব্দ সে পাচ্ছিল না। তাছাড়া কেন জানি লীলার কথা ভেবে আশ্চর্য এক দুঃখ বোধে সে নিরন্তর পীড়িত হচ্ছিল। সংসারে মানুষের যে কত রকমের দুঃখ। এক সময় সে ডাকল, লীলা আমাকে এক গ্লাস জল দেবে।
মুহূর্তের মধ্যে দেখল, লীলা দরজায় এক গ্লাস জল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, ভিতরে এসো।
লীলা সন্তর্পণে ঢুকে জল এগিয়ে দিল।
নানু বলল, বোস।
লীলা দাঁড়িয়েই থাকল।
নানু বলল, তোমার কে কে আছে?
লীলা কিছু বলল না।
নানু পকেট থেকে কিছু এক টাকার নোট বের করে বলল, তোমার কাছে রাখো। ভালো মন্দ খেতে ইচ্ছে হলে খাবে। আর মাইনে পেলে শাড়ি কিনে নেবে। তোমার আর ফ্রক পরে থাকা ঠিক না।
লীলা কী—বলতে গিয়ে বলতে পারল না!
নানু অভয় দিয়ে বলল, বল ভয় কী!
আমার টাকা নেই দাদাবাবু। সব টাকা মাকে পাঠিয়ে দেয় মাসিমা।
তোমার মা আছে তা হলে?
লীলা আবার তেমনি চুপ।
তুমি বললেই পারো, কাজ করো তুমি, টাকা তোমাকে দিতে হবে।
লীলা চারপাশে ভালো করে তাকিয়ে বলল, দাদাবাবু দোহাই ও—সব কথা বলবেন না। মাসিমা শুনতে পেলে আমার আর রক্ষে থাকবে না। মার সঙ্গে ওই কড়ারে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।
নানু বলল, ঠিক আছে। তুমি যাও।
লীলা চলে যাচ্ছিল। নানু ফের ডাকল, টাকা কটা নিয়ে যাও।
না দাদাবাবু, মাসিমা জানতে পারলে আমাকে আস্ত রাখবে না।

ধুস তোমার মাসিমা। যা বলছি করো।

দোহাই দাদাবাবু।

লীলা কেমন পাথর হয়ে যাচ্ছে। ওর ছেঁড়া ফ্রক গায়ে, চুল কোমর পর্যন্ত।

নানু বলল, কাল আসব। তোমার সায়া শাড়ি কিনে আনব। তোমাকে পরতে হবে। লজ্জা করে না পুরুষের সামনে তোমার বের হতে।

লীলা এবার ভেউ ভেউ করে কেঁদে দিল। —দাদাবাবু, তুমি ভগবান।

নানু বলল, গুলি মার ভগবানকে।

তারপর নানু ভগবানকে সত্যি গুলি মেরে উঠে পড়ল। লীলা চলে যাচ্ছে—আবার সেই রান্নাঘরে কিংবা দাওয়ায় বসে থাকা—নিরপরাধ এই কিশোরীর জন্য নানু আজ এই প্রথম ভারি মায়া বোধ করল।

তেরো

ঠিক দুপুরে খাওয়ার পর প্রিয়নাথের সামান্য দিবানিদ্রার অভ্যাস। শুলেই ঘুম আসে না। দোতলার ঘরটা ওর খুবই নিরিবিলি। কাকলি এ সময় নিজের ঘরে বসে ছবি—টবি আঁকে। অথবা খুব মৃদু শব্দ বাজে রেডিয়োর। হরলিক্সের আসর বোধহয় শুনছে। ঘড়ির কাঁটার মতো একটা শব্দ এবং কিছু প্রশ্ন, প্রশ্নগুলি কাকলি শুনে নিজেই একটা জবাব খাড়া করে রাখে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের জন্য কত রকমের প্রোগ্রাম করে থাকে রেডিয়ো। এবং এ—বাড়িতে প্রয়োজন কাকলিরই সবচেয়ে বেশি। তিনি অবশ্য সাড়ে সাতটার খবর নিবিষ্ট মনে শোনেন। যেন আজকালকার মধ্যেই কোনো বিপজ্জনক খবর আবার রেডিয়োতে ভেসে আসবে। কোথাও কিছু একটা হচ্ছে। যেন সব ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্য কারা গোপনে প্রস্তুত হচ্ছে। তার বুক কাঁপে। পাশে ধর্মজীবন বাবাজীর আশ্রম আছে। সন্ধ্যায় সেখানে গীতাপাঠ, রামায়ণ পাঠ এবং ধর্মাধর্মের ওপর নানারকম আলোচনার সুবন্দোবস্ত আছে। বুড়ো মানুষদের জন্যে খুবই জরুরি এটা, তিনি অন্যমনস্ক থাকার জন্য কিছুটা সময় সেখানে অতিবাহিত করেন। কত রকমের বয়সের ছাপ মারা মুখ। যৌবনে ওরা কতটা তেজি ঘোড়া ছিল মাঝে মাঝে ভাববার চেষ্টা করেন। কত রকমের যে সংকট শরীর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়। একটা বয়সের পরে আবার তা নিভে আসে। এবং তখন সেই যে বলে না প্রকৃতির কূটবুদ্ধি অথবা নির্জনে তার খেলা—মানুষ টেরও পায় না, অহরহ রক্তে মাংসে মজ্জায় এবং স্নায়ুতে কী তুমুল তুফান তুলে পালের দড়িদড়া ছিন্ন—ভিন্ন করে দিচ্ছে। এবং ওই সময়টাতে জীবনের সঠিক অর্থ কী, জীবন কী, জীবন মানে তো মাটির হাঁড়ি কলশি নয়, ভেঙে গেলেই অকেজো হয়ে যাবে—এবং দেখেছেন যত ভেঙে যায়, তত তার তেজ বাড়ে এবং তখন এক অন্যমনস্ক বৃদ্ধের ছবি এবং মৃত্যু ভয়। অদৃশ্য অস্পষ্ট অন্ধকারের ভয়। দিন যত যাচ্ছে ভয়টা তাকে ক্রমশ শিথিল করে দিচ্ছে। পুত্রের নিহত হওয়ার ঘটনা খুব একটা আর ভাবায় না! স্ত্রী গত হয়েছে দেড় দু—যুগ আগে। মাঝে মাঝে স্বপ্নে এক বালিকার ছবি দেখতে পান। সে বেণী দুলিয়ে হেঁটে যায় তাঁর পাশে।

বাবা আপনার জল।

প্রিয়নাথ বসে থেকেই জলটা খেলেন।

তোমার এখনও খাওয়া হয়নি!

এই হয়ে যাবে। আপনি শুয়ে পড়ুন না।

ভানু চলে গেল।

যায়নি। ও ঘরে আছে। পত্রিকা পড়ছে।

ওকে বল, যেন চলে না যায়। ওর সঙ্গে খেলা শেষ হয়নি। একটু গড়াগড়ি দিয়েই লড়ব।

মন্দাকিনী সামান্য হাসল। বলল, বলব।

প্রিয়নাথ জানে এ বাড়িতে এই যুবক কত প্রয়োজনীয়। খুব কম বয়স থেকেই এটা তার চরিত্রের দোষ বা গুণ যাই—ই বলা যাক—দুঃখ—টুঃখ একদম দু'চোখের বিষ। শোকতাপকে আমল দেওয়াই মানুষের

অনুচিত।

এ—জন্য ভেতরের প্রাচীন মানুষটার সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায় মাঝে মাঝে। তখন প্রিয়নাথ কিছুটা নির্মোহ হয়ে পড়েন। এই নির্মোহ স্বভাবের জন্যেই সে অনায়াসে নীরজার সঙ্গে কিছুটা পাপে লিপ্ত হতে পেরেছিল। এই নির্মোহ স্বভাবের দরুনই বিধবা পুত্রবধূর সামনে একজন যুবকের উপস্থিতি আদৌ কষ্ট দেয় না। প্রাচীন মানুষটা ভেতর থেকে বের হয়ে আসতে চাইলেই থাবা মেরে বসিয়ে দেন। বলেন, তুমি বুড়ো জান না, কিছু বোঝো না, বাইরের কেলেঙ্কারির চেয়ে এটা অনেক ভালো। ও—বাড়ির সঙ্গে দীর্ঘদিনের সখ্যতা। ভানু আগেও এ—ভাবেই চলে আসত, থাকত, দাবা খেলত, সেই রেওয়াজটাই আছে। একজনের মৃত্যুতে কিছুই ব্যতিক্রম হয়নি।

এবং শুয়ে পড়ে চোখ বুজলেন প্রিয়নাথ। সামাজিক সম্মান—বোধটাই ওকে বেশি তাড়া করে। মন্দাকিনীর যা বয়েস ধরে রাখা যেত না। ভানু থাকতে বয়েসটা বাড়িয়ে দিতে পারলে ফ্রন্টে কিছুটা সুবিধা মিলতে পারে। যদ্দিন চলে চলুক। প্রিয়নাথের হাই উঠছিল। যা রেখে যাচ্ছেন তাতে দুটো

প্রাণীর হেসে খেলে চলে যাবে। কাকলির দুষ্টু দুষ্টু গলা এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটা কী ঘুমিয়ে পড়ল! এবং প্রিয়নাথ ভুলে গেছেন একটা শো দেখার কথা আছে কাকলির। কাকলি এবং তার ক্লাশের বান্ধবীরা মিলে কোথায় যেন একটা বাচ্চাদের ফিল্ম দেখতে যাচ্ছে। স্কুল থেকে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং কিছুটা নিশ্চিন্তে দিবানিদ্রায় মগ্ন হওয়া যায়। তিনি পাশ ফিরে শুলেন। হাতটা মাথার কাছে। পা দুটো ভাঁজ করে শুয়েছেন।

মন্দাকিনী দুটো শব্দ একই সঙ্গে পেল।

কাকলি বলল, যাচ্ছি মা। ভানু কাকা যাচ্ছি। তুমি কিন্তু চলে যাবে না। কথা আছে।

ভানু বুঝতে পারে না মেয়েটা এমন সব কথাবার্তা শিখল কার কাছে! কথা আছে বললেই যে কিছু আড়াল আবডাল, কিছু সংশয়, কিছু লজ্জা মিশে থাকে মেয়েটা বোঝে না।

শ্বশুরমশায়ের নাক ডাকছে, মন্দাকিনী ঘরের দরজা অতিক্রম করার সময় টের পেল।

তখনই দ্রুত এক জলতরঙ্গ বাজনা সারা শরীরে খেলে যায় মন্দাকিনীর, শরীর কাঁপে থর থর করে। কানে কেমন ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ। এমন নির্জন বাড়ি যে মনে হয় মন্দাকিনী বেশিদূর এগোতে পারবে না। সামান্য আওয়াজই ভয়ংকর শোনাবে। সে ওই ভানু নামক যুবকের ঘরে তখন পা টিপে টিপে হেঁটে যেতে চায়। অথচ কোথায় কী ভাবে যে কিছু প্রবল বাধা থাকে, ভানুর ইচ্ছে কী, কেন এ—বাড়িতে পড়ে থাকতে ভালোবাসে সব টের পেয়েও মন্দাকিনী জল খায় ঢক ঢক করে। শুনিয়ে শুনিয়ে জল খাচ্ছে। খাবার পর, কিছু সময় পার করে সে অনেকটা খায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেশ আয়াস ও তৃপ্তির সঙ্গে খায়। যেন জানান দিচ্ছে, হয়ে গেল।

জানালার পর্দা ফেলা। মন্দাকিনী করিডোর ধরে হেঁটে গেল। ভানু মরার মতো চোখ বুজে পড়ে আছে। কে বলবে বাইরের পৃথিবীতে ট্রাম বাস গাড়ি ঘোড়া এবং স্টেশনে বানভাসি জলে মানুষ উঠে আসে? অথবা কোথাও বড় রাজনৈতিক ঝড়, ভিয়েৎনামে অনেক রক্তপাত, লিবিয়া নামক একটা দেশ আছে কে বলবে! এবং বারান্দায় ছায়া ছায়া কিছু নড়ছে। ওদের কোনো কথা হয়নি, ওরা দুজনই একটা বিষয়ে এতদিন পরও ফয়সালা করতে পারেনি, কতটা এগোনো দরকার! একজন পুরুষের সান্নিধ্য উষ্ণতা দেয়, কিন্তু নিকটবর্তী হয়ে প্রপাতের জলে ডুবে যাওয়া এখনও হয়ে ওঠেনি। অথবা তেমন একটা সুযোগ হয়ে উঠছে না। আজ যেন সবাই মিলে একটা সুযোগ করে দিয়েছে দুজনকে। কাকলি চলে গেল। প্রিয়নাথকাকার নাক ডাকছে। এবং বাড়ির রান্নার মেয়েটির কামাই। করিডরে আর পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

ভানু জোরে হাই তুলল। সে জানান দিল, ঘুম আসছে না।

মন্দাকিনী দেয়ালে ভর করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

ও—ঘরে প্রিয়নাথের নাক ডাকছে বাঘের মতো। যেন প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে পড়ে সব জন্তু জানোয়ার ছুটোছুটি লাগিয়েছে।

ভানু ঘাড় তুলে দেখল পর্দা ফেলা দরজার। নিচে ঠিক রেলিঙের কাছে প্রিয়নাথের বেড়ালটা থাবা চাটছে।

মন্দাকিনীর পা কাঁপছিল। দাঁড়াতে পারবে না মনে হচ্ছে। এ—ভাবে শরীর অসাড় হয়ে যায় কোনোদিন টের পায়নি। এমন একটা দুপুর বিকেলের মাঝামাঝি সময়ে শরীরে এটা যে কী হচ্ছে!

মন্দাকিনী ভাবল ঘরে ঢুকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেবে। কী মানুষ রে বাবা! কিছু বোঝে না। গাছের চারপাশে বেড়া না থাকলে গোরু ছাগল তো খাবেই। মন্দাকিনী নানাভাবে নিজেকে দমন করতে চাইছে।

তখন নিচে বাতাবি লেবু গাছটায় দুটো চড়ুই কিচির মিচির করছে। এবং একটা আর একটাকে তেড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির কূটখেলা পাখি দুটোর ভেতরে জেগে উঠছে। মন্দাকিনী আর সত্যি পারছে না।

সে না পেরে ভাবল, নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে। সে উপুড় হয়ে মৃত স্বামীর জন্য কিছুক্ষণ কাঁদবে ভাবল। আশ্চর্য কোনো দুঃখেই সে ব্যথাতুর হতে পারছে না। এমন কেন হয়। সে যেন বলল, ঈশ্বর আমি এটা চাইনে! আমি ভালো থাকতে চাই। কিন্তু শরীরে যেন রক্তপাত হচ্ছে। তারপরই মনে হল এটা পাপ। পাপ পাপ! সে দুবার পাপ কথাটা উচ্চারণ করল। তারপরই মনে হল, সুখ সুখ। সে দুবার সুখ কথাটা উচ্চারণ করল।

তারপরই আবার ভেতর থেকে কে কথা কয়ে উঠল, সুখই পুণ্য। তাকে অবহেলা করতে নেই। সে ফের উচ্চারণ করল, এটাই আমার পাপ, এটাই আমার পুণ্য।

চোদ্দ

রমা দাঁতে ঘাস কাটছিল। সে ভীষণ রকমের উজ্জ্বল সাদা সিল্ক পরেছে। শরীর ভালো করে ঢেকে বসেছে। পায়ের কাছে অরুণ, লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। স্কুটারটা রাস্তার পাশে দাঁড় করানো। নীল রঙের স্কুটারে কোথা থেকে একটা শালিক পাখি উড়ে এসে বসেছে। শেষ জ্যৈষ্ঠের খাঁ খাঁ দুপুর। মাঠে গভীর নলকূপ থেকে জল উঠছে। ভট ভট শব্দটা প্রকৃতির ভেতর বে—আক্কেলে জোতদারদের মতো যেন হাঁকছে কেবল। আর মাটি যত ভিজে যাচ্ছে চাষ—আবাদের নিমিত্ত সব চাষীরা তত লাঙল ঢুকিয়ে দিচ্ছে অভ্যন্তরে। সে ঘড়ি দেখল। কিছুতেই ঘড়ির কাঁটা চারটেয় এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে না। এখন উঠতে হবে। কিছু খুনসুটি করেছে রমার সঙ্গে। এবং রমাকে সে উত্তপ্ত করতে চেয়েছে। সকাল থেকেই বুঝি রমা টের পেয়ে গেছে, ভয়ে রমা ঠান্ডা মেরে যাচ্ছে ক্রমশ।

সে বুঝিয়েছে, কীসের এত ভয় বুঝি না।

রমা বলেছে, তুমি অরুণ, মেয়েদের কী ভয় বুঝবে না।

আজকালকার তুমি কিছু খবর রাখ না রমা!

একটা বালিকাও তো জানে, কীসে কী হয়। আমি রাখব না কেন। তবে তুমি নিজের দিকটা দেখছ অরুণ।

এত সব তবে কী দরকার ছিল। আগে বললেই পারতে।

আমি কী জানি, সত্যি তুমি একটা জায়গা ঠিক রেখেছ।

না, মনে হচ্ছে, ঘরে বউ আছে বলে তুমি আমাকে পর পর ভাবছ।

পর পর ভাবতে পারছি না বলেই তো যত কষ্ট। তুমি এলেই স্নায়ুতে তোলপাড় আরম্ভ হয়ে যায়। ঘরে তোমার কে আছে কিছুই মনে থাকে না।

থাক তবে। বরং চল, বাড়িতেই রেখে আসি তোমাকে।

সেই ভালো ছিল। কিন্তু ফিরলে মা ঠিক ভাববেন, তোমার সঙ্গে আমার ঠিক বনিবনা হচ্ছে না। ওরা কষ্ট পাবেন।

রমা বলতে পারত কত রকমের সংকট অরুণ এক জীবনে। ফিরে গেলেই মা বাবা অস্থির হয়ে উঠবে। মানুর জন্যে এমন একটা দামি চাকরির তুমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ, আমিই হেতু, আমার কথা তোমার কাছে দিব্যজ্ঞানের মতো—সেটা হারাতে ওরা রাজি নয়। ওরা টের পায়, তুমি আমার কতটুকু ক্ষতি করতে পার। ওরা সব জেনেও চুপচাপ আছে। সংসারে সুখ ব্যাপারটা ভারি দরকার। আমার কাছে অবশ্য এটা খুব অন্যায় ঠেকছে।

তারপর থেকেই দুজনে চুপচাপ। প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে শহরে ফিরতে। কোথাও কোনো রেস্তোরাঁয় যাবে, তারপর কোনো ঘরে, সাদা বিছানা এমনই সব কথা হতে হতে রমা দু'হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়েছে। দুজনই খাওয়ার কথা যেন ভুলে গেছে। আগে একটা ফয়সালা হওয়া দরকার। অরুণ রমাকে ঠিক বুঝতে পারে না। রমা কিছুটা আস্কারা না দিলে সে সাহস পেত না। সেই রমাই গাছের নিচে বসে কেমন সতী—সাধ্বী হয়ে গেল। আসলে প্রকৃতি উদার, উদাস। বাধা বন্ধন না মানার কথা শেখায়। কিন্তু সে কোন প্রকৃতির কোলে উঠে এসেছে! সামান্য পাপবোধ সেও অনুভব করে থাকে। কিন্তু শরীরটা তো ব্যাকরণ নয়, যে নির্দিষ্ট সূত্র ধরে এগোবে।

এবং তার এতটা উদ্যম বিনষ্ট হতে যাচ্ছে ভেবে মুখ কালো করে রেখেছে। কমল এবং তার বউ গোপালপুরে গেছে। ফ্ল্যাটের চাবি দিয়ে গেছে ওকে। ফ্ল্যাটটা ক'দিন ওর জিম্মায় থাকবে। চাবিটা দিয়ে যেত না। কিন্তু কমলের বোন এবং ভগ্নিপতির আসার কথা। ওদের টিকিট কাটা, এবং ফ্যাসাদেই পড়ে গেছিল। চাবিটা অরুণ রাখতে রাজি হওয়ায় খুব সুবিধে হয়েছে। ওরা চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে, অফিসে অরুণ নামক একজন সেলস অফিসারের কাছে চাবি রেখে যাচ্ছে। দরকার মতো যেন নিয়ে নেয়। এবং এমন সুযোগ রমা হাতছাড়া করবে সকালেও ঘুণাক্ষরে টের পায়নি। সুতরাং আর কোনো কথা বলার ইচ্ছে হল না রমার সঙ্গে।

তাহলে ওঠো। ফিরব।

রমা উঠে দাঁড়াল। চোখ মুখ থমথম করছে অরুণের। তাকানো যাচ্ছে না। ভারি কষ্ট ভেতরে বুঝতে পারছে। ভারি বেচারা মনে হচ্ছে অরুণকে।

রমার কেমন কষ্ট হল মুখটা দেখে। সে বলল, চল!

তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব কোথাও।

সেই ভালো।

তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেব, না নিজেই ট্যাক্সি করে চলে যাবে?

সে দেখা যাবে।

গাড়ি স্টার্ট দেবার সময় বলল, খুব খারাপ মানুষ আমি না?

খারাপ ভালো বলিনি তো।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত অনিষ্ট কিছু ঘটল না।

এতে আবার শরীরে অনিষ্ট হবার কী আছে বুঝি না।

অরুণ এবার কেমন চিৎকার করে বলতে চাইল, তবে তুমি কী চাও? সে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে নিলে। তারপর বাতাসে ভেসে যাবার মতো গাড়ি ছেড়ে দিল।

ওরা কেউ আর একটা কথা বলল না।

খাবার অর্ডার দিয়ে দুজনেই দুদিকে তাকিয়ে থাকল।

রমা মাঝে মাঝে অবশ্য চোখ ঘুরিয়ে দেখছে। কালো ট্রাউজার, চেক—কাটা বুশ শার্ট পরণে পুরুষ মানুষটা কেমন দুঃখী বালকের মতো মুখ করে আছে। তার ঘুড়ি কেটে গেছে মনে হয়।

কাউন্টারে চাইনিজ মেয়েটি বসে দাঁত খুঁটছে। একজন মোটা মতো চাইনিজ ভদ্রলোক উবু হয়ে ফিস ফিস গলায় কথা বলছে। একটা ষণ্ডা মতো মানুষ কোণার টেবিলে গিয়ে বসল। ও—পাশের কেবিনের ভেতর

দু'জোড়া পা দেখা যাচ্ছে! একজন পুরুষের এবং একজন যুবতী—টুবতী হবে। তবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পায়ের পাতা থেকে শাড়ি মাঝে মাঝে উঠে যাচ্ছিল।

রমা ন্যাপকিন বিছিয়ে নিল হাঁটুর ওপর। অরুণের দিকে একটা প্লেট এগিয়ে দিল। খাবার স্পৃহা দুজনের কারও আছে বলে আর মনে হচ্ছে না। অরুণ চামচ দিয়ে সামান্য নেড়ে চেড়ে একটু ঝোল ঢেলে নিল।

খাওয়া হয়ে গেলে রমা বলল, দেখি বিল।

বয় বিল নিয়ে এলে অরুণ পার্স বের করল।

আমি দিচ্ছি। রমা ব্যাগ থেকে টাকা বের করতে গেল।

অরুণ ঠান্ডা গলায় বলল, না।

একদিন না হয় আমি দিলামই।

কী দরকার। সে তিনটে দশ টাকার নোট বের করে দিল। আইসক্রিমের সুগন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে তাদের।

তুমি রাগ করছ কেন?

কোথায় রাগ দেখলে। সে খুব আস্তে আস্তে বলল শুধু, সত্যি, বোকা মনে হচ্ছে নিজেকে।

কথাটা ভেতরে গিয়ে কেন যে বিঁধল রমার। সে বলল, আমিও তো কম যাই না। তোমার কী দোষ? তারপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, অরুণ, তুমি বুঝবে না।

এতে আর বোঝাবুঝির কী আছে?

আছে বইকি? আমি কি পাথর, আমার কি শরীরে কিছু নেই! আমার কি ইচ্ছে টিচ্ছে বলে কিছু নেই!

অরুণ উঠে দাঁড়াল। সিগারেট জ্বালল। তারপর বের হবার সময় বলল, বার বার মনে হচ্ছে রমা, নিজেকে শুধু অসম্মান করে গেছি। অমলাকে অসম্মান করেছি। তুমি সেই মজাটা কতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে কেবল চোখ মেলে সেটাই দেখতে চেয়েছ। কাজের সময় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছ, এটা ঠিক না।

অরুণ রাস্তায় নেমে আরও কেমন ক্ষেপে গেল। বলল, ন্যায় অন্যায় বোধটা আমারও কম নেই রমা। তবু বুঝি মানুষের অসুখটা ভেতরেই আছে। সে কিছুতেই নষ্ট হতে না পারলে শান্তি পায় না। তোমার ধারণা কিছু হলেই পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। সেটাতো আমার দিক থেকেও হতে পারে। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ।

রমা মাথা নিচু করে রেখেছে। রোদ্দুর। ভীষণ গরম। এই রোদ্দুর এবং দাবদাহ ওদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করছে না। একটা কঠিন সংকটের মুখে ওরা পড়ে গেছে এখন।

বরং আমারই বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা। তুমি তো যে—কোনো দিন শরীর পবিত্র আছে বলে, নতুনভাবে জীবন গড়ে ফেলতে পারবে। আসলে আমি তো তোমার মনের মানুষ না। আর তুমিও জানো আমরা যত দূরেই যাই না কেন একটা বিন্দুতে গিয়ে কখনো আমরা মিলতে পারব না। অমলা তো কোনো দোষ করেনি।

রমা বলল জানি।

সহসা অরুণের মনে হল সত্যি সে একজন অপরিচিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। রমার মুখ কঠিন থমথমে। সে কেমন ভয় পেয়ে গেল। বলল, চল, দিয়ে আসি, ওঠো।

রমা পিছনে বসতেই কী যে হয়ে যায়—সেই এক সুমধুর সমীরণে যেন ভেসে যাচ্ছে। পাশের একটা দোকানে আশ্চর্য মিউজিক বাজছে। মিউজিক বাজলে ভেতরে রক্তের ঝড়টা প্রবল হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারছিল, ভয়ংকর অবমাননায় অরুণ কাতর হয়ে পড়েছে। একজন পুরুষের এমন উদার এবং নিবিষ্ট আপ্যায়ন সে কেন যে কিছুতেই ঠেলে ফেলতে পারছে না। ভেতরটা কেমন অবশ অবশ লাগছে। ঘুম পাচ্ছে মতো। যা হয় হবে। জীবনটা তো সত্যি ব্যাকরণ নয়। সে বলল, অরুণ আমি যাব।

নিয়ে তো যাচ্ছি।

তোমার সেই ফ্ল্যাটে যাব!

অরুণের ভেতরটা সহসা বিদ্যুৎ চমকের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সে বলল, সত্যি বলছ রমা। সত্যি।

রমা কিছু বলল না। কেবল মুখটা পিঠে ঘসে দিল অরুণের। অরুণ আবার বাতাস কাটিয়ে বের হয়ে যেতে থাকল। অতীব অকিঞ্চিৎকর, জীবনের অন্য সব কিছু—নতুন গ্রহ সন্ধানের মতো মনে হচ্ছে রমার সবকিছু। সে ভেসে যাচ্ছে, রমা ধরে রেখেছে, কেমন এক গোলকধাঁধার ভেতর মাথাটা দুলে উঠছে তার। তখনই মনে হল তার, কিছু টুকিটাকি জিনিস সঙ্গে নেওয়া দরকার। সে বাইক ঘুরিয়ে দিল সাঁ করে।

পনেরো

রাসবিহারী সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে দেখলেন, কেমন নির্জন এবং ফাঁকা বাড়িটা। বাইরের বাগান থেকে নিধু খুরপি কোদাল তুলে নিয়ে যাচ্ছে কলতলায়। কেউ আলো জ্বালেনি বাড়ির। হেম কিংবা মিতার তো যাবার কথা নেই কোথাও। দরজা জানালাও সব হাঁট করে খোলা। তিনি প্রথমে দরজার ভেতরে ঢুকে নিজের ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন। তারপর লাঠি এক পাশে রেখে বেশ জোর গলায় ডাকলেন, মিতা মিতা। কোনো সাড়া নেই। নানু এখনও ফিরে আসেনি। অবনীশ কি নানুকে থেকে যেতে বলেছে! নাদন কী আবার এ—বাড়িটায় এসেছিল। মিতা কি নাদনের সঙ্গে কোথাও গেছে। তিনি এটা পছন্দ করেন না। মিতা বাবার পছন্দ অপছন্দের দাম দেয়। বাবা অপছন্দ করে বলেই একসময় রাসবিহারী দেখেছেন, নাদন এ বাড়িতে আসা কমিয়ে দিয়েছে। মিতা বলতেও পারে নাদনকে, তুমি আর আমাদের বাড়িতে এসো না। বাবা তোমার আসা পছন্দ করেন না। সেই মেয়েটাও নেই। তিনি বুঝতে পারছেন বয়স যত বাড়ছে তত সংকট চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে তাকে। তিনি আবার ডাকলেন, হেম তোমরা কোথায় সব! আর তখনই যেন ও—ঘর থেকে হেমর ক্ষীণ গলা পাওয়া গেল। —এখানে, কেন কী হয়েছে?

বাড়িটাতে আলো জ্বালা নেই।

কী হবে জ্বেলে?

রাসবিহারী পাশের ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলে দেখল হেম শুয়ে আছে। শরীর খারাপ। না হলে হেমর শুয়ে থাকার কথা না। তিনি মোড়া টেনে পাশে বসলেন। —শরীর ভালো নেই?

না। খুব সংক্ষিপ্ত জবাব।

কী হল?

কিছু হয়নি!

সহসা রাসবিহারীর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল, কিছু হয়নি তো শুয়ে আছ কেন। কিন্তু তিনি জানেন, এতে সংসারের অনর্থ বাড়বে বই কমবে না। তিনি দেখেছেন, বাড়িতে ঝি চাকর কামাই করলেও হেমর শরীর খারাপ হয়ে যায়। বিকেলে ঠিকা ঝি বীণার কামাই হলে হেম গজ গজ করে। সব একটা মানুষের আসকারাতে গেল এমনই ভাব হেম। মাইনে কাটলে ঠিক শিক্ষা হয়—কিন্তু রাসবিহারী জানেন, লোকজনের যা সমস্যা তাতে এক দু দিনের মাইনে কেটে কিছু হয় না। আবার নতুন একটা লোক ঠিক করতে রাসবিহারীর মাথার ঘাম পায়ে নেমে আসবে। অথচ কাজের লোক এলেই দেখা যাবে হেমর সংশয় বেড়ে যাচ্ছে। এবং এমন নিষ্ঠুর আচরণ করবে মাঝে মাঝে যে রাসবিহারীর মনে হয় হেমর মন বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। কেমন নির্মম এবং অবিবেচক হয়ে পড়ছে দিনকে দিন। একে ঠিক অবুঝ বলা যায় না, বরং যেন ছ'টি মেয়ের জননী করার জন্য শেষ বয়সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। রাসবিহারী সে—জন্য ঠান্ডা মাথায় বললেন, রান্নার লোকটা আসেনি!

আবার সংক্ষিপ্ত জবাব, না।

মিতা কোথায়?

দেখতে গেছে কেন এল না।

নানু ফিরে আসেনি?

জানি না।

এরপর আর কী করা যায়। তিনি উঠে পড়লেন। একটু চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে এসেই তার চা খাবার অভ্যাস। তিনি রোজ হাত মুখ ধুয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পান কাজের মেয়েটা চা দিয়ে গেছে। আজ কপালফেরে তাও জুটবে না। তিনি ডাকলেন, নিধু। তুই একবার যা তো পঞ্চাননের কাছে। ওদের বস্তিটা জানিস কোনদিকে?

সে বলল, জানি কর্তা।

এই নিধুই সংসারে একমাত্র সরল মানুষ যার কোনো চাহিদা নেই। সে এসেছিল, দূর বালেশ্বর থেকে। রাসবিহারীর হাতে পায়ে ধরে একটা বেয়ারার কাজ জুটিয়েছিল। এবং রিটায়ার করার চার পাঁচ বছর আগে নিধু রাসবিহারীর খাস বেয়ারা হয়ে যায়। সেই থেকে দশ বারো বছর ধরে দু'জনের একসঙ্গে জীবন কাটছে। এই নিধুকেও খুব একটা পছন্দ নয় হেমর। উটকো লোক মনে করে থাকে নিধুকে। বাড়ির বাগান দেখাশোনা করার জন্য দুবেলা, দু—কেজি চালের ভাত খাওয়ানোটা কোনো বিবেচক গেরস্থর কাজ নয়। রাসবিহারী জানেন, এটাও হেমর বাড়াবাড়ি, নিধু ভাত সামান্য বেশি খায়—আটা খেয়ে ওর সহ্য হয় না, সে—জন্য নিধু এ বাড়ির দুবেলাই অন্ন ধ্বংস করে। ধ্বংস শব্দটি হেমর দেওয়া। এই শব্দটি তিনিও এ—সময় ব্যবহার করলেন এ—জন্য যে নিধুর উচিত ছিল খোঁজ খবর নেওয়া। হেম ইচ্ছে করলে নিধুকেই পাঠাতে পারত। কিন্তু ভেতরে এত জ্বালা এই রমণীর যে মিতাকে পাঠিয়ে এক সঙ্গে রাসবিহারী এবং নিধুর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া গেল। বুঝে দেখো তুমি যাকে গুরুঠাকুর করে রেখেছে সংসারে তাকে দিয়ে কী কাজটা হয়!

রাসবিহারী নিধুকে পঞ্চাননের খোঁজে পাঠিয়ে সামান্য বিশ্রাম নেবেন ভাবলেন।

বাথরুমে ঢুকে হাতমুখ ধুলেন, ঘরে এসে পাখা ছেড়ে দিলেন। তারপর মুখে এক টুকরো হরীতকী ফেলে চিবুতে থাকলেন। জিভে লালা জমতেই মাথার ঘিলুর মধ্যে কে যেন খোঁচা দিতে থাকল। বুঝতে পারলেন নানুর জন্য চিন্তা হচ্ছে। খচ খচ করছে মনটা। এই ছেলেটা বাড়ি না থাকলেই আজকাল কেমন একা লাগে রাসবিহারীর। অমলা কখনও বাসায় ফিরে যাবার আগে বাড়ি হয়ে যায়। অমলা তার আরও কাছের। সে কী করছে না করছে এই জন্য কেন যে তেমন চিন্তা হয় না। যা হবার হবে। তিনি নানুর জন্যও এমন ভাবতে পারলে অনেক দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেতেন। আসলে তিনি বুঝতে পারেন মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলেই পর হয়ে যায়। সম্পর্ক আলগা হয়ে যায়। একটি পুত্র সন্তান থাকলে সম্পর্ক এতটা বোধ হয় আলগা হত না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুক বেয়ে এ—সময় তাঁর উঠে এল। তারপরই মনে হল, আসলে সবারই হাজার সমস্যা। মানুষের বয়স যত বাড়ে সমস্যা তত বাড়ে। এখন তাঁর মেয়েদেরই হাজার রকমের সমস্যা। কোনো কোনো সমস্যার খবর তিনি রাখেন, কিছু তাঁকে আঁচ করে নিতে হয়—বাকিটার তিনি কিছুই জানেন না। আর তখনই মনে হল বারান্দা পার হয়ে কেউ চলে যাচ্ছে। তিনি ডাকলেন, কে রে?

আমি।

তিনি বুঝতে পারলেন, মিতা ফিরে এসেছে।

কী বলল?

আসবে। ওর মেয়েটার জ্বর হয়েছে।

এই আসবে। শব্দটিতে রাসবিহারী আশ্চর্য রকমের একটা স্বস্তি বোধ করলেন। না হলে রাতের খাবার নিয়ে এই বাড়িতে একটা কুরুক্ষেত্র হত। মিতা রান্নাঘরে গেলেই সব ভণ্ডুল করে দেয়। সুতরাং হেমর শরীর খারাপ সত্ত্বেও কাজ কাম করত, সায়া শাড়ি ঠিক থাকত না আর রাসবিহারীর চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করত, বে—আক্কেলে মানুষের কপালে এই লেখা থাকে বলত। এমনকি এক সময় চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে ফিট হয়ে যেতেও কসুর করত না। যেন তেন প্রকারেণ বুঝিয়ে দেওয়া কাপুরুষ মানুষের এমনই হয়। কেউ ভয় পায় না, কেউ ভয় পায় না। সেদিনকার নানু সেও মুখের ওপর কথা বলে।

তিনি ফের ডাকলেন, মিতা চলে গেলি!

মিতা দূর থেকে জবাব দিল, আমাকে কিছু বলছ।
একটু শুনে যাবি।
মিতা বলল, আসছি।
তারপর খানিকটা সময় কেটে গেছে। নিধু ফিরে এসেছে। সে গলা বাড়িয়ে বলল, এসে গেলি! আর নিধুর মুখটা সহসা আলোর মধ্যে আবিষ্কার করে কেমন ভড়কে গেলেন রাসবিহারী। আশ্চর্য নিশ্চিন্ত মুখ। মানুষের এমন নিশ্চিত মুখ কী করে হয়! তিনি কতদিন পর, কতদিন পর কেন, যেন এই প্রথম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তোর আর কে আছে? তুই এখানে আর কতদিন পড়ে থাকবি! তোর জমানো টাকা বুঝে নিয়ে দেশে চলে যা। ওতে বাকি জীবন আরামে কেটে যাবে তোর। তারপরই মনে হল নিধু ওর চেয়ে বয়সে বড়ই হবে। নিধুর দেশে ছেলেমেয়ে সবই আছে। একবার মাত্র ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল, বউর অসুখ শুনে। তিনমাস পরে এল। বলল, চুকে বুকে গেল সব বাবু। তারপর আর কোনো টান বোধ করেনি দেশে ফিরে যাবার! বরং এখন দেখলে মনে হয়, তিনি শহরের প্রান্তে যে খোলামেলা জায়গা নিয়ে বাড়িটা করেছেন এটাই তার প্রাণ। ফসল তোলার সময় কিছুদিন সোনারপুর তাকে চলে যেতে হয়। সেখানে পঞ্চাশ বিঘার বড় একটা জোত আছে রাসবিহারীর। ধান, পাট, কলাইর দিনে কলাই সবই সে বুঝে আদায় করে নিয়ে আসে। তারপর বলতে গেলে বাড়ির দুটো গাভী, গোয়ালঘর আর এই বাগান মিলে তার জীবন। মানুষ কীভাবে কোথায় যে অবলম্বন পেয়ে যায় কেউ বোধ হয় বলতে পারে না।
তখনই হাজির মিতা! বলল, ডাকছিলে কেন?
নানু আজ ফিরে আসবে ত।
আমাকে কিছু বলে যায়নি।
আমাকেও তো বলেনি।
নানু কাকে বলে!
সত্যি নানু কাউকে কিছু বলে যায় না। পৃথিবী সুদ্ধু লোকের ওপর নানুর আক্রোশ। অমলা কতবার বলেছে, আমাদের বাসায় যাস নানু। যদি একবার যেত! সেজ মাসি কত বলে গেছে, যাস। কিছুই তোয়াক্কা করে না ছেলেটা। মা যার এমন তার আর কী হবে! তাঁর মনে হল, মেয়েদের জন্মসূত্রেই দোষ থেকে গেছে। এখন বুঝতে পারেন সব কটা মেয়েই ছিল তার অবাঞ্ছিত। ওদের কপালেও অবাঞ্ছিত কিছু লেখা থাকবে তাতে আর বিস্ময়ের কী!
রাসবিহারী বললেন, ও তো অবনীশের বাড়িতে গেছে। বিকেলেই ফেরার কথা। বলে ঘরের দেয়ালে চোখ রাখলেন। তাঁর ঘরটার দেয়ালে কিছু ছবি আছে। বিশেষ করে একটি ছবি খুবই বড়। ছবিটি সি আর দাশের। পাশে নেতাজীর ছবি। উত্তরের দেয়ালে আছে মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ। তা ছাড়া বিদ্যাসাগর মশায়েরও একটা ছোট ছবি টাঙানো আছে। এত সব মহাজনের এই দেশ, এই দেশে তিনি জন্মেছেন বলে গর্বিত। অথচ তাঁর পরের প্রজন্ম থেকেই কেমন দোষ পেয়ে গেল।
রাতে নানু ফিরলে রাসবিহারী বললেন, তোমার মা চিঠি দিয়েছে।
নানু বলল, আচ্ছা দাদু, বাবা আমার নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন। সেটা কত টাকা?
এমন কথায় রাসবিহারী খুবই বিস্মিত হলেন। বললেন, দেখতে হবে।
তুমি জান না কত?
সুদে আসলে যা আছে তা মন্দ না।
ঠিক আছে কত টাকা আমার জানার দরকার নেই। আমাকে কালই ব্যাংকে নিয়ে চল, তুমি তো জান, বছরখানেক হয়ে গেল আমি সাবালক হয়ে গেছি।
দাদু বললেন, টাকার খুব দরকার?

দরকার অদরকারের কথা হচ্ছে না। বাবা তাঁর দুঃসময়েও এ' কটা টাকা আমার অ্যাকাউন্ট থেকে তোলেননি। এখন আমি সে টাকা সদ্ভাবে খরচ করতে চাই।

রাসবিহারী বললেন, ঠিক আছে, তোমার টাকা তুমি বুঝে নেবে। তবে তোমার মাকে জানালে হত না।

নানু চিৎকার করে উঠল, সে কে?

অগত্যা রাসবিহারী প্রসঙ্গ পালটে বললেন, নবনীতা বলে কেউ আছে?

হ্যাঁ আছে।

তোমাকে ফোন করেছিল!

কখন?

দুপুরে।

কিছু বলল?

না। বাড়ি নেই জেনে কিছু বলল না।

ঠিক আছে। নানু তড় তড় করে নিচে নেমে ফোন করল, এবং অপর প্রান্ত থেকে গলা পেয়ে বলল, কাকিমা আমি নানু বলছি। নবনীতা আছে?

এত রাতে কোথায় যাবে?

এই কোথাও যদি বেড়াতে যায়।

না বাড়িতেই আছে। দিচ্ছি। ধর।

নবনীতা।

আমাকে ফোন করেছিলে?

হ্যাঁ। কেমন ঘুমকাতুরে গলা। নানুদা আগামী রোববার আমাদের সঙ্গে যাবে?

কোথায়?

আমরা হাজারদুয়ারী যাচ্ছি।

কে কে?

আমার মাসি, মেসো, দাদা, দাদার বন্ধুরা। আমি যাব, মা যাচ্ছে। বাবা শুধু যাবে না।

নানু মুখ কুঁচকে বলল, তোমার আবার দাদা এল কোত্থেকে?

ন'মাসির ছেলে। বরুণদা। খুব ভালো গিটার বাজায়।

খুব গেঞ্জাম হবে মনে হচ্ছে।

তা একটু হবে।

নবনীতা তুমি যদি না যাও কেমন হয়?

নবনীতা কেমন অপর প্রান্তে আমতা আমতা করতে থাকল।

সে কী করে হবে! মা আমাকে রেখে যাবে না।

কেন রেখে যাবে না!

নবনীতা বলবে কী বলবে না করেও বলে ফেলল, ধরা পড়ে গেছি।

আমরা তো কিছু করিনি। তুমিই বল। আমরা কিছু করেছি।

আজকালকার মায়েরা ও সব বিশ্বাস করতে চায় না। আমরা তো এ বয়সে কত কিছু জেনে ফেলেছি।

যাকগে যাবে কী যাবে না তুমি বুঝবে। তারপরই দুম করে বলল, আমি গেলে কাকিমা মনে কিছু করতে পারে।

মাকে বলেছি।

তুমি জানলে কী করে আমি যাব।

বা রে আমি যাব, তুমি যাবে না সে কী করে হয়। তাই বললাম, নানুদা যাবে বলেছে।

তোমার মা কী বলল!

বলল, এই মানে!

ঠিক করে বল। মানে ফানে বুঝি না।

বলল, ওর মাথার ঠিক নেই। সঙ্গে নিবি, সামলাতে পারবি তো।

নানু কেমন কাতর গলায় বলল, সত্যি নবনীতা আমার মাথার ঠিক নেই। কী করতে কী করে বসব আমি নিজেও আগে থেকে বুঝতে পারি না। তুমিই বরং ঘুরে এসো। বলে নানু ফোন নামিয়ে রাখল।

তারপর সে কিছুক্ষণ ফোনের পাশে গুম হয়ে বসে থাকল। তার মধ্যে মাথা খারাপের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে—কিন্তু সে বুঝতে পারে আসলে যদি একজনও সুস্থ মানুষ থাকে, তবে সে। কারণ সে যখনই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় অথবা কখনও বাসে কিংবা কোনো গাছের নিচে যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন মনে হয় রাস্তার ফুটপাথে বড়ই দুঃখী মানুষের ভিড়। লীলার কথা তার মনে হল। কিছু একটা করার মতো হাতের কাছে কাজ পেয়ে সে মুহূর্তে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল।

সে উঠে আবার সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। সে ভেবে ফেলেছে পড়াশোনা আর তার হবে না। মাথার মধ্যে নানা রকম চিন্তা ভাবনা—এবং সংসারে বড় হতে হতে সে যা দেখল, খুব কম মানুষের জীবনেই বোধ হয় এত কম বয়সে এমন বোধোদয় ঘটে। আজই যা সে দেখে এল, তাতে মনে হয়েছে মানুষের জীবন শেষ পর্যন্ত যদি তার জেঠু অবনীশের মতো হয়ে যায়, অথবা বাবার মতো হয়ে যায় কিংবা দাদুর মতো—তা হলে জীবনযাপনের মহিমা কোথায়। সংসারে সে নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ করল। মানুষ এমন অসহায় বোধ করলেই বুঝি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার ঝুঁকি নেয়। যদি তাই হয়, তবে জেঠুর তো বেঁচে থাকার কথা না। এমন একটা নিষ্ঠুর মেয়েমানুষ নিয়ে জেঠু কোন প্রবল প্রাণশক্তির জোরে এখনও বেঁচে আছে, ভাবতেই তার বিস্ময় লাগল।

আর তখনই নানু দেখতে পেল, কুটু, সেই ছোট্ট মেয়ে বব করা চুল, দু চোখ পৃথিবী সম্পর্কে অপার বিস্ময় নিয়ে জেগে আছে। কুটুর কত রকমের প্রশ্ন, বাঘ কেন মানুষ খায়, ভিখিরি ভিক্ষা চায় কেন, পাখিরা উড়ে কোথায় যায়, আকাশের তারারা দিনের বেলায় কোথায় থাকে, চাঁদের বুড়ি সুতো কাটে কেন এবং শেষ প্রশ্ন তার বোধ এমন সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মানুষ চলেই বা যায় কেন। এগুলো খুবই জটিল প্রশ্ন। সহজে তার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব না। বিকেল বেলাটা কুটু এমন অজস্র প্রশ্ন করেছে তাকে। এই কুটুই সংসারে বেঁচে থাকার মতো একমাত্র জেঠুর শেষ অবলম্বন। আত্মহত্যার আগে কুটুর মতো বাবা যদি তার কথা ভেবেও অন্তত আর কিছুদিন বেঁচে থাকত—অন্তত মার শেষ বয়স পর্যন্ত, তাহলে কোনো অঘটনই ঘটত না।

সেই যেদিন বাসায় ঢুকে দেখল, মেসো অসময়ে বসে আছে বাড়িতে, মার সঙ্গে হৈ—হল্লা করছে, মা পিঠে পায়েস করছে, যেন উৎসব বাড়িতে—সেদিন সে স্কুলের বইপত্র ফেলে সোজা বাইরে ছুটে চলে গেছিল—ভিতরে কীসের যে হাহাকার—সেই থেকে পড়াশোনায় সে মন বসাতে পারত না। কোনোরকমে সে ক্লাসের পর ক্লাস পার হয়ে গেছে, এই পর্যন্ত। পালাবে পালাবে করে তার কত বছর কেটে গেল! আজ আবার মনে হচ্ছে, সব ছেড়ে ছুড়ে পালালে কেমন হয়। তখনই দেখল সেই লীলার মুখ ছল ছল করছে। সে বুঝতে পারছে—জীবনের কোথাও দু'জনের মধ্যে একটা ভারি মিল রয়ে গেছে।

ষোলো

মন্দাকিনী কেমন নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। সে ভারি চঞ্চল হয়ে পড়ছে। পা টিপে টিপে কোথাও যেতে না পারলে শরীরের জ্বালা মিটবে না। চোখ মুখ জ্বলছে। শরীরে এটা যে কী থাকে। কিছুতেই মরে না। স্বামীর মুখ সে ক'বার ধ্যানে দেখার চেষ্টা করল। যদিও কিছু ব্যভিচার ছিল মানুষটার, তবু যখন কাছে আসত ঠিক থাকতে পারত না। আসলে এই শরীর তাকে খুব সহজেই সহনশীল করে রেখেছিল। রাতে ফিরে মানুষটা অপরাধী মুখে তাকালেই কেমন জল হয়ে যেত সব রাগ! অভিমানটা শরীরে বেশিক্ষণ পুষে রাখতে পারত না। অথবা জ্বালা বলা যেতে পারে—মন্দাকিনীর যে চরম আকাঙ্ক্ষা

বীজ বীজ করছে! কতক্ষণে শরীর জুড়াবে। সে দুটো একটা অভিমানের কথা বলেই হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকত। মানুষটা তখন তাকে লুটেপুটে খেলে সে পরম শান্তি বোধ করত এবং ঘুমিয়ে পড়ত।

এখন তেমনি জ্বলছে। স্বামীর মৃত্যুর পর; কিছুদিন শরীরটা বেশ ঠান্ডা ছিল। শোকতাপ বোধহয় কিছুদিনের জন্য শরীর ঠান্ডা করে রাখতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি কত উদার—সে কোনো শোকতাপই গায়ে জড়িয়ে থাকতে দেয় না। ক্রমে কেমন সব ফিকে হয়ে যায়।

ভানু আগেও আসত এ—বাড়িতে। তখন থেকেই ক্ষণে ক্ষণে মনে হত একটা প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে সহজেই। কারণ সে সহজেই জানে কী আকর্ষণ এ—বাড়িতে ভানুর, কেন সময় পেলেই চলে আসে, মানুষটাকে সে দাদা দাদা করত। মানুষটা খুব একটা গ্রাহ্য করত না। কতটা আর লুটে খাবে। কিংবা এমনও হতে পারে, আমি যখন আর একটা লাট্টু ঘোরাচ্ছি, তখন এই পুরনো লাট্টু তোমাকে দিয়ে দিলাম বাপু। ইচ্ছে করলে ঘোরাতে পারো।

এবং তখনই মনে হত মন্দাকিনীর তবু মানুষের শেষ পর্যন্ত কিছু একটা থেকে যায়, ইচ্ছে হলেই হাত পাতা যায় না! কী যেন সংকোচ থাকে। অথবা শালীনতাবোধ মন্দাকিনীকে এতদিন পর্যন্ত পবিত্র রাখতে সক্ষম হয়েছে। পবিত্র কথাটা তার কাছে এ সময় খুবই হাস্যকর। তবু শ্বশুরমশাইর প্রতি এটা একটা কর্তব্য, অথবা শৈশবের কিছু ধর্মাধর্ম, যার ভেতর সে বড় হয়ে উঠেছিল, যার থেকে বের হয়ে আসা খুব সহজ নয় বলে মনে হয়েছে, এই বেলা তার মনে হল, সব ভেঙে তছনছ করে দেওয়া যেতে পারে।

সে পর্দা তুলে দেখল একবার। ভানু পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে কী না বোঝা যাচ্ছে না। কেউ কী এমন একটা নিরিবিলি সুযোগ উপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে! আর যে—দিনই সে ভানুর সঙ্গে রাত করে ফিরেছে, কিছু কোথাও খেয়ে যখন ফিরছে, সবসময় একধরনের সাধাসিধে কথা। অধিক কিছু না। অথচ কত কিছু সহজেই হতে পারত।

মন্দাকিনী কিছুতেই মুখ খুলতে পারছিল না। আর ভানু নিজে থেকে কোনো কথা তুলতে পারছিল না। কোনো অঘটনের আশায় দু'জনেই বসে আছে। যে ভাবেই হোক সহসা সেটা ঘটে যাবে! এমন সুযোগ ভানু অবহেলায় নষ্ট করে দিচ্ছে কেন, ভানু ভানু! সে চিৎকার করে উঠত প্রায়, তখনই প্রিয়নাথের নাকের শব্দ আরও প্রবল, ভানু তুমি কী করছ, কেউ নেই। তুমি কী ঘুমোচ্ছ! মন্দাকিনীর শরীর কেমন অবশ হয়ে আসছিল। সে দ্রুত পায়ে পর্দার ভেতর ঢুকে আরও সতর্ক হয়ে গেল। ভানু পাশ ফিরে তেমনি শুয়ে আছে। একটা কাপুরুষ! সামান্য সাহসটুকু নেই। একজন মেয়ের পক্ষে এটা খুবই অশোভন। নীচে মনে হল কেউ সিঁড়ি ভাঙছে। সে ফের দরজায় মুখ বাড়াল। না মনের ভুল। এবং নিজেকে ভারি বেহায়া মনে হচ্ছে। সে তো চেয়েছিল একজন পুরুষমানুষ যেমন বেড়ালের মতো ওৎ পেতে থাকে, ভানুও মাছ খাবার লোভে তেমনি ওৎ পেতে থাকবে। সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা। তারপর বেশ আরামে আহার।

আহারের কথা মনে হতেই মন্দাকিনীর প্রবল জ্বর এসে গেল শরীরে। চোখ জ্বালা করছে। তবু অশোভন, খুবই অশোভন, কিন্তু শরীর ক্রমে নিরালম্ব হতে থাকলে সমাজ সংস্কার বিনষ্ট হয়ে যায়। সে ডাকল, ভানুবাবু ঘুমোলে!

ভানু বলল, ওম।

ঘুমোলে!

না—আ!

পুরুষমানুষের অত ঘুম ভালো না।

মন্দাকিনী আর কী বলবে! বসবে পাশে! মানুষটা কী! উঠতে পারছে না। সে আর কতদূর এগোবে।

মন্দাকিনী বলল, তুমি এবারে বিয়ে করো ভানুবাবু।

করব ভাবছি। বাবা ঠিকুজি কোষ্ঠী মেলাচ্ছে।

করব নয়। করে ফেলো। নিশ্চিত হই।

তোমার কী চিন্তা।
পুরুষমানুষ বিয়ে না করে থাকে কী করে!
করব।
না, করে ফেলো।
ভানু এবার মন্দাকিনীর দিকে চোখ তুলে তাকাল। তাকাতে পারছে না। মন্দাকিনীর চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে, এবং কেমন অভিমানীর মতো জানালায় ঠেস দিকে দাঁড়িয়ে আছে। ভানু উঠে বসল। মাথাটা তার ধরেছে। সে ঠিক করতে পারছে না কী করবে! একবার প্রথম দিকে ভানুর একটু হাত লাগতে মন্দাকিনীর প্রবল ধমক খেয়েছিল। মন্দাকিনীর হয়তো তা মনে নেই। কিন্তু বেচারা পুরুষ মানুষ সেই যে মনে করে বসে আছে আর এগোতে পারছে না। কোনো ভুল বোঝাবুঝি হলে আবার ঠিক প্রিয়নাথকাকার কানে উঠাবে। এখানে আসাই বন্ধ হয়ে যাবে। কী যে আছে এ বাড়িতে! কাকলি এবং মন্দাকিনী দুজনেই তাকে ভারি বশে রেখেছে। বরং কাকলীর সঙ্গে সম্পর্কটা বেশ খোলাখুলি। সে যদিও খুব একটা বাড়াবাড়ি করতে পারে না, কারণ সেই ধার্মিক পিতা ভুবনবাবুর মুখ মাঝে মাঝে অসহায় করে রাখে তাকে। লম্পট নিজে হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু লম্পটের ছেলে লম্পট হয়, এবং ভুবনবাবু নামক ব্যক্তিটি তবে হয়তো আত্মহত্যা করেই বসবেন। মুহূর্তে ভানুর মগজের ভেতর এতগুলো চিন্তা ভাবনা করাত চালাচ্ছিল। তার সামনে সেই লাস্যময়ী নারী, শুধু বুকের কাপড় আলগা করে নেই, যেন দু ফুট মতো জায়গায় পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে মন্দাকিনী! এবারেও যদি বেড়াল লাফ না দেয় তবে মন্দাকিনী আর কতটুকু সাহায্য করতে পারে। মন্দাকিনীর এ হেন দৃশ্য দেখে ভানুবাবুর চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। এবং তখন মন্দাকিনী সরল বালিকার মতো ভানুর হাত ধরে কাছে টেনে নিল। লেপ্টে যেতে গিয়ে মনে হল ও—ঘরে প্রিয়নাথ নামক ব্যক্তিটি হাই তুলছে। মা তারা করুণাময়ী। বউমা ও বউমা। জল দাও ওষুধ খাব।
দৌড়ে ছুটে মন্দাকিনী কাপড়চোপড় সামলে—যাই বাবা, আপনিতো খুব যা হোক ঘুমোলেন। কাকলি কখন গেছে ফেরার নাম নেই, ও ভানুবাবু ওঠো, বেলা যেতে দেরি নেই—সহসা এত সব কথা বলে মন্দাকিনী চোখে মুখে বাথরুমে ঢুকে জল দিতে লাগল। ভানুবাবু ফের সটান শুয়ে পড়েছে। এবং যত জোরে সম্ভব নাক ডাকাবার চেষ্টা করছে!
প্রিয়নাথই শেষ পর্যন্ত উঠে এসে ভানুবাবুর ঘুম ভাঙালেন। কী হে খুব যে ঘুম। তা হবে। এই বয়সে সব কিছুই বেশি বেশি থাকে। ঘুম, আহার, তারপর কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন প্রিয়নাথ কাকা। প্রিয়নাথকাকা কি শেষ কথাটা মৈথুন ভেবেছিলেন! সে উঠে পড়তেই মন্দাকিনী এক কাপ চা রেখে গেল। মুচকি হেসে গেলে বোঝা গেল দু'জনের ভেতর শেষ পর্যন্ত যখন জানাজানি হয়ে গেছে তখন সময় বুঝে আহারে বসে গেলেই হবে।
প্রিয়নাথকাকা তাঁর ঘর থেকে হাঁকলেন, হবে নাকি আর এক হাত।
ভানুবাবুর মন মেজাজ কেমন তিরিক্ষি হয়ে গেছে। এবং ভেতরে অসহ্য কষ্ট—বোধ, যেন যেটা হবার কথা ছিল, সেটা শেষ পর্যন্ত এই স্বার্থপর লোকটার জন্য হল না, তার সঙ্গে খেলতে তার আদপেই আর ইচ্ছে নেই। কিন্তু না খেললে সারাটাক্ষণ থাকে কী করে! এই একটা বড় রকমের সুবিধা প্রিয়নাথকাকা এ বাড়িতে আসার জন্য করে রেখেছে। হেলায় হারানো ঠিক না। সে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে প্রিয়নাথকাকার ঘরে ঢুকে গেল। প্রিয়নাথ একবার মুখ তুলেও দেখল না। হাত তুলে ইশারায় বসতে বলল। তারপর কী ভেবে বললেন, বেশিক্ষণ খেলব না।
এবং কাকলী ফিরে এলেই খেলা বন্ধ করে উঠে পড়লেন। বললেন একটু ঘুরে আসি।
প্রিয়নাথকাকার এই ব্যবহারটা ভানু বুঝতে পারে। কাকলী ওর মায়ের প্রহরী। কিন্তু প্রিয়নাথকাকা কী জানে আজই মন্দাকিনী বউদি তাকে সাপটে ধরেছিল! এতদিন সে যেটা চাইছিল, কারণ ভানু বুঝতে পারে, তার ভেতর ভুবনবাবুর কাপুরুষতা বেশ বর্তে গেছে। কাপুরুষ না হলে এক স্ত্রীতে কেউ বেশিদিন মত্ত

থাকতে পারে না। সব সময় মুখে সাধু সাধু ভাব, যেন গোল্লায় যাচ্ছে সব, এবং আহাম্মুকির এক শেষ। ভানু এ কারণেই নিজে সাহস করে সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। সে যুবতীদের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশাও করেনি। তাছাড়া মেয়েদের চরিত্র সে ঠিক বোঝেও না। অনেক সুযোগ এ বাড়িতে সে আজ বুঝতে পারল, হেলায় হারিয়েছে। আজই স্পষ্ট বুঝতে পারল, সে যে লোভে এ বাড়িতে আসে মন্দাকিনী বউদির সেই লোভ। কেবল দুজনেই সাহসের অভাবে পরপর এতগুলো দিন অকারণে কাটিয়ে দিয়েছে।

প্রিয়নাথকাকা এখন ধর্মসভায় বসে ঈশ্বর সম্পর্কিত ভাবনায় ডুবে আছেন, না বাড়িতে বউমা কাকলী ভানুবাবু তিনজন কে কী করছে তার একটা ছায়াছবি চোখে তাঁর ভাসছে।

মন্দাকিনী তাড়া লাগাচ্ছিল, কাকলী পড়তে বসগে। ভানুবাবু এঘরে এসো। তুমি থাকলে ও পড়তে চায় না।

ভানু বলল, এই কাকলী পড়তে বোস। তোর মা বকছে আমাকে।

তুমি যাবে না। গেলে পড়ব না বলছি।

বউদি তোমার মেয়ে পড়বে না বলছে।

চুপ করো ভানুকাকা। সে মুখে দুহাত চাপা দিল ভানুর। তারপর কী ভেবে কেমন অভিমানের গলায় বলল, আচ্ছা পরে দেখবে। বলেই সে টেবিলে চলে গেল। ভানু দরজা পার হয়ে মন্দাকিনীর ঘরে ঢোকার মুখে বলল, যাই। খুব চিন্তা করবে।

মাসিমা জানে তুমি কোথায় আছো। মায়েরা সব বোঝে।

ভানু বলল, তবু এখন যাওয়া উচিত।

বাবা এসে খোঁজাখুঁজি করবেন।

বলবে চলে গেছি।

বোস না!

বসে কী হবে?

মন্দাকিনী মুচকি হাসতে পারল না এবার। ভেতরের দাহ আগুনের ফুলকির মতো দু চোখে ভেসে উঠল। কী যে করে! কিছু করতে না পারলে এই মহামূল্য সময় তার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। খুব বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছিল মন্দাকিনী। যেন এক্ষুনি পারলে কাকলীকে নীচের তলায় অথবা অন্য কোথাও ছলছুতোয় পাঠিয়ে এই সর্বনাশা আগুনের প্রজ্বলন থেকে রেহাই পায়। পবিত্র আধারে প্রবিষ্ট হতে না পারলে কারও আজ রেহাই নেই। সে দুবার উঁকি দিল। এবং কতটা বেপরোয়া হলে সে ঝাঁপিয়ে টেনেহিঁচড়ে ভানুবাবুকে তুলে নিতে পারে, এবং কাকলী যে ও ঘরে পড়ছে, মাথায় তাও কোনো বিদঘুটে শব্দ তুলছে না, কেমন একটা মাতাল রমণীর মতো দরজার পাশে আড়াল তৈরি করে ডুবে গেল তারা। কোনো পরোয়া নেই। প্রায় পাগলিনীর মতো সাপটে ধরেছে ভানুবাবুকে। এবং অতীব পবিত্রতা বিরাজ করছিল চোখে—মুখে। পৃথিবীর সবকিছু এখন এই নারী এবং পুরুষের কাছে অকিঞ্চিৎকর।

ও—ঘরে কাকলীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। বাথরুমে যাবার সময় মন্দাকিনী কেমন সতর্ক। এবং অপরাধীর মতো চোখ তুলে একবার দেখতেই বুকটা হিম হয়ে গেল। জানালায় চোখ কাকলীর। কেমন উদাস চোখমুখ। কাকলী কি.......আর ভাবতে পারছিল না। যেন এতক্ষণে চৈতন্য হয়েছে, কাকলী বাড়িতেই ছিল। কাকলী যদি......আর এসব মনে হতেই ভানুবাবুর উপর কেন যে মনটা ভীষণ বিষিয়ে গেল। সে হাতে মুখে জল দিয়ে বাইরে বের হয়ে দেখল, ভানুবাবু চলে যাচ্ছে। যাবার সময় কাকলীর সঙ্গে কোনো কথা বলে গেল না। কতকাল থেকে এই বাড়িটা ধ্রুবতারার মতো কেবল ভানুর মগজের ভিতর দপ দপ করছিল। সব চেনাশুনা হয়ে গেলে বুঝি রহস্য মরে যায়। মন্দাকিনী সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে ডাকল, ভানুবাবু।

ভানুবাবু ভালোভাবে তাকাতে পারছে না।

তুমি চলে যাচ্ছ?

ভানু চোখ না তুলেই বলল, হুঁ।
কবে আসছ।
আসব ঠিক।
কাকলীর সঙ্গে কথা বলে গেলে না।
ভয় লাগছে।
কীসের ভয়?
ঠিক জানি না।
এসো ওপরে এসো বসো! এখন চলে গেলে ভালো দেখাবে না। উনি আসুন।
ভানু কেমন বাধ্য ছেলের মতো ওপরে উঠে এল। মন্দাকিনীর বুকটা সেই যে কেমন হিম হয়ে আছে আর স্বাভাবিক হচ্ছে না। সে করিডোর দিয়ে যেতে যেতে বলল, খুকু দেখ ভানুকাকা চলে যাচ্ছিল।
কাকলীকে কখনও আদরের গলায় ডাকলে মন্দাকিনী খুকু বলে ডাকে। মন্দাকিনী দেখল কাকলী কিছু বলছে না। সে ভানুর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। ভানুবাবু আর কী করে, সে কাকলীর ঘরে ঢুকে বলল, কিরে পড়ছিস না।
কাকলী এবার চোখ তুলে তাকাল। কিছু বলল না।
মন্দাকিনী ওপাশ থেকে বলল, তোর অঙ্ক কটা দেখে রাখ না।
কাকলী অঙ্কের খাতা বার করে ছুড়ে দিল ভানুবাবুর দিকে।
কত প্রশ্নমালা?
কাকলী উঠে গিয়ে দেখাল সব।
ভানুবাবু অন্য সময় হলে বলতে পারত। কাকলীর মন খারাপ আরও কতবার হয়েছে। ভানুবাবু তার স্বাভাবিক কথাবার্তায় ওকে সহজেই উৎফুল্ল করে তুলতে পারত। এবং কী কী কথা বললে, কাকলীর মেজাজ আবার স্বাভাবিক হবে সে জানে। অথচ কী একটা সংকোচ ভিতরে রয়ে গেছে। কাকলীর সঙ্গে সে খুব স্বাভাবিক কথা বলতে পারছে না। অঙ্ক বই—এর পাতা উলটে যাচ্ছে কেবল।
কাকলীই বলল, তুমি ভানুকাকা ভালো না।
কেমন চমকে গেল ভানু।
তুমি মার সঙ্গে আর মিশবে না।
ভানুর, এতটুকু মেয়ের এমন স্পষ্ট কথা শুনে, কান লাল হয়ে উঠল। এই মুহূর্তে আর বসতে ইচ্ছে করছে না।
কাকলী বলল, তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারতে!
এত সহজ করে এমন কথা মেয়েটা কী করে বলতে পারল!
কিছু বলছ না কেন?
ভালোবাসব।
কবে!
দেখি কবে পারি।
কথা দিতে হবে।
ভানু বলল, অঙ্ক করো। তোমার মা শুনতে পাবে!
তোমরা এতক্ষণ ও—ঘরে কী করছিলে!
কই কিছুই না তো।
সত্যি বলছ!
সত্যি।

তিন সত্যি।

তারপর ভানু কেমন মরিয়া হয়ে বলল, কী করছিলাম উঠে গিয়ে দেখলেই পারতে।

আমার সাহস হয়নি। একবার উঠেও কী ভেবে বসে পড়লাম। তোমরা ছোট হয়ে গেলে আমার কিছুই থাকবে না ভানুকাকা। বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল কাকলী।

ভারি বোকা মেয়েতো! বলে ভানু সেই স্বাভাবিক ভানুবাবুর মতো কাকলীর চুল এলোমেলো করে দিয়ে শিস দিতে দিতে নিচে নেমে গেল। মন্দাকিনী আর ভানুবাবুকে আটকে রাখল না।

সতেরো

কী গো, তোমার ঘুম ভাঙবে না?

ভুবনবাবু, স্ত্রীর আলতো গলার স্বর শুনতে পেলেন। তিনি চোখ বুজে পড়ে আছেন। সময় বড় দীর্ঘ, কিছুতেই তার সময় কাটতে চায় না। বিকেলে এ—সময় তিনি এক কাপ চা খান, তবু উঠতে ইচ্ছে করছে না।

নীরজা ফের বলল, ওঠো। কত আর ঘুমোবে। চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছি কিন্তু।

ভুবনবাবু উঠে পড়লেন। বাথরুমে ঢুকে চোখ মুখে জলের ঝাপটা দিলেন। ভেজা গামছায় মুখ মুছে বের হয়ে এলেন। তারপর রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, ভানু ফেরেনি এখনও?

কোথায় আর ফিরল।

ওরা কি কেউ বাড়ির কথা ভাবে না?

যা দিন কাল, ভেবে আর কী হবে?

ভুবনবাবুর মনটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে গেল। ছেলের জন্যে তো মায়েরই ভাবনা থাকার কথা। কিন্তু নীরজার অদ্ভুত নিস্পৃহ স্বভাব। জীবনের এই শেষ অঙ্কে যেন আরও বেশি নিস্পৃহ স্বভাব। তিনি হয়তো বলেই ফেলতেন, পেটের দোষ, কিন্তু তিনি জানেন, বললেই পার পেয়ে যাবেন না। এমন সব কুৎসিত কথা নীরজা অনায়াসে বলে যাবে যে তখন আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না।

ওপাশের রাস্তার তিনতলার কার্নিশের নিচে সূর্য হেলে গেছে। বারান্দায় ছায়া আছে এখন। বোধহয় মানদা এসেছে। বারান্দা মুছে দিচ্ছে। বারান্দায় কিছু বেতের চেয়ার আছে। একটা ইজিচেয়ার আছে। ইজিচেয়ারটা ভেঙে গেছিল, বাবার অসুবিধা হচ্ছে ভেবে রমা সারিয়ে দিয়েছে। শরীর এলিয়ে দিলেন চেয়ারটাতে। মানুষের এ সময়টা বুঝি খুবই অর্থহীন। ছেলের বিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে সংসারটাতে বেঁচে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যেত। কিছুই হচ্ছে না।

প্রথম যৌবনে মনে হত, ছেলেপিলেরা দাঁড়িয়ে গেলেই এ জীবনের জন্য ছুটি নেওয়া যাবে। এবং প্রথম যখন ভানু অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে নিয়ে এসেছিল, তিনি যথার্থই কিছুটা হালকা বোধ করছিলেন এবং ক'মাস আগে যখন রমার চাকরি হয়ে গেল; বেশ বড় রকমের একটা দায়িত্ববোধ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন ভেবেছিলেন। কেবল মানুটার চাকরি। সেটাও হয়ে যাবে হয়তো। কিন্তু ইদানীং মনে হচ্ছে তার কোনো কাজই শেষ হয়নি। তাঁর মুক্তি মেলেনি। বরং তিনি এখন আরও বেশি টেনসনের মধ্যে আছেন। মুখের ওপর কিছু বলতে সাহস পান না। দশ রকমের অজুহাত দেখিয়ে দেবে। বাড়ি সময়মতো না ফিরলে যে বাবা—মার চিন্তাভাবনা থাকে এটা তারা আজকাল একেবারেই বুঝতে পারে না বুঝি।

নীরজা চা রেখে গেল আর সঙ্গে দুটো বিস্কুট একটা সন্দেশ। ভুবনবাবু প্রথম সন্দেশ ভেঙে খেলেন। তারপর চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খেলেন। মেয়েটা এখন কী করছে কে জানে। আজকাল তো হামেশাই দুর্ঘটনা ঘটছে। মানুটা বের হয়ে গেল। একবার বলেও যায় না কোথায় যায় এরা! সবাই ধীরে ধীরে আলাদা সত্তা ধারণ করছে। একই সংসার একই আবাস, একরকম দুঃখ। তিনি এতদিন বাড়ি থেকে যে দুঃখটা দূর করার জন্য আপ্রাণ খেটেছেন সেটা একবিন্দু নড়েচড়ে বসেনি।

বরং মনে হয় সবাই এখন ঠিক ওর মতো নিজেদের জগৎ তৈরি করতে ব্যস্ত। তিনি যেমন নীরজা ভানু রমা মানুকে নিয়ে একটা সত্তা আবিষ্কার করেছিলেন, ওরাও তেমনি, কোনো মন্দাকিনী, কোনো জয়া, কোনো অরুণ ছানাপোনা নির্মাণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওরা যে তাঁর কেউ না, এটা উপলব্ধি করে কেমন হতাশ হয়ে পড়লেন। চা কেমন যেন বিস্বাদ লাগছিল। চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে।

মন্দাকিনীর সঙ্গে ভানুর একটা অবৈধ সম্পর্ক ঠিক কীভাবে গড়ে উঠেছে তিনি জানেন না। বিয়ে দিলে হয়তো সব সেরে যাবে। প্রিয়নাথ আছে বাড়িতে। সে তো টের পায়। যদি সত্যি হয়, যদি সম্পর্কটা সুস্থই না থাকে, এই অবেলায় বাড়ি ফিরলে ভানুকে নিজের আত্মজ ভাবতে তার কষ্ট হবে। ভানু আলাদা একটা অস্তিত্ব। সে ক্রমে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। যেন অভ্যাস বসে সংসারের বাজার, বাসা ভাড়া, জামাকাপড় শুধু জুগিয়ে যাচ্ছে। আর কোনো প্রবল টান অথবা আকর্ষণ এ—সংসারের জন্যে তার নেই। তিনি এবারে ডাকলেন, নীরজা।

নীরজা হাত মুছে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

তুমি বলতে পারো তোমার ছেলেমেয়েরা এখন কে কোথায় কী করছে?

লোকটা আজকাল যখন তখন এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করে ফেলে। নীরজা খুব একটা অবাক হল না। বলল, ওরা কিছু তো একটা করছেই। বাড়ি ফিরলে জিজ্ঞেস কোরো।

তুমি টের পাও না!

না।

আমি কিন্তু টের পাই।

সেই এক কথা বলবে। বলবে ওরা আর আমার কেউ নয়। ওরা আমার জন্যে যতটুকু করছে, সবটাই ওদের মান—সম্মানের জন্যে। আমাদের সময়ে কিন্তু এমনটা ছিল না। বিয়ের পর তোমাকে কলকাতার বাসায় আনব কথাটা কত বছর যে বাবা—মাকে বলতেই পারিনি। থেকে থেকে পেটের ব্যামোটা ধরাতে না পারলে বোধহয় শেষপর্যন্ত সাহসই পেতাম না। বেশ একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে তবে নিয়ে এসেছিলাম।

নীরজা বলল, তুমি বুড়োমানুষ, বাড়ি থেকে বের হতে চাও না। তোমার মতো ওরা যখন হবে, ওদের তাই হবে। বাইরে একটু ঘুরে না বেড়ালে সংসারে ওরা বড় হবে কী করে! বুঝবে কী করে জীবনটা শুধু যোগ বিয়োগ নয়, গুণ ভাগও আছে।

নীরজার সঙ্গে কথায় তিনি কখনও পারেন না। আর তাছাড়া এই বুড়ো মানুষটা হয়তো তাঁর সেই যৌবনেও এমনি তাকে তাড়া করেছে। স্ত্রীর প্রতি যতই সংশয় থাকুক, প্রিয়নাথ এলেই সেটা বোঝা যেত, তিনি তো, আর আহাম্মক নন, যে কিছুতেই বুঝতেন না, তবু ভেবেছিলেন, যৌবন সবাইকে একটু বেয়াড়া স্বভাবের করে দেয়, ছেলেপুলে হলে সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হয়েও গিয়েছিল। যদি মাথা গরম করতেন, তবে সংসারে অশান্তি বাড়ত। এবং চরম সহ্য পরীক্ষার দ্বারা নীরজার ভেতর বোধহয় পাপবোধই জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। এক সময় নীরজা সত্যি নিরাময় হয়ে গেল। এই বুড়োটে স্বভাবই তাকে কোনো আত্মহত্যা অথবা খুন থেকে রেহাই দিয়েছে। আজকের ছেলে—ছোকরাদের ভিতর এটা দেখা যায় না। ভয়টা সেইজন্যেই। মানু তো দিন দিন যা উগ্র স্বভাবের হয়ে উঠছে! কাউকে আর গ্রাহ্য করে না। সবাই যেন ওর শত্রু। সহিষ্ণুতা ও আত্মসংযম বলতে এদের আর কিছু নেই।

এবং মানুর জন্যই আজকাল তার বেশি ভয়। তিনি দেখলেন, কথার আর কোনো জবাব দিচ্ছে না বলে নীরজা চলে যাচ্ছে। তিনি ফের ডাকলেন, নীরজা।

নীরজা এবার একটু ক্ষুণ্ণ গলায় বলল, আমার কাজ আছে।

নীরজা সংসারে এত যে কাজ করছ, কী হচ্ছেটা বিনিময়ে।

কী হচ্ছে না। সবই হচ্ছে।

এটাকে হওয়া বলে।

আমি তো সংসারে এটুকুও যে হবে আশা করিনি। তুমি যা মানুষ ছিলে।

ভুবনবাবু জানেন নীরজার খোঁটা দিয়ে কথা বলার স্বভাব। সময় সময় দারিদ্র্যের জ্বালা নীরজাকে সহ্য করতে হয়েছে। অভাবের ভিতর একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বচ্ছলতা মানুষকে বড় দূরে সরিয়ে রাখে। সংসারের জন্যে যদি অভাববোধ না থাকল তবে মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে। তার মনে আছে একবার ইলিশের মরশুম চলছে, অর্থাভাবে গোটা ইলিশ একদিনও আনতে পারছেন না। ব্যাগের ভিতর থেকে ইলিশ মাছের রুপোলি লেজটা উঁকি মারবে কতদিন এমন আশা করেছে নীরজা। বাবার কড়া নাড়ার শব্দ পেলেই রমা ছুটে গেছে ব্যাগ খুলে দেখেছে, গোটা ইলিশ নেই। মানু বলেছে, বাবা তুমি আনবে না? তিনি বলেছেন, দেখি মাইনে পাই, একদিন আনব। এবং স্বপ্নে পর্যন্ত ভানু দেখেছে বাবা আস্ত ইলিশ নিয়ে বাজার থেকে ফিরেছে। আর যেদিন এল সত্যি সত্যি সে এক উৎসবের ব্যাপার। গোল হয়ে বসা, সবার খাওয়া একসঙ্গে। আজকাল একসঙ্গে বসে খাওয়া কালেভদ্রে হয়ে থাকে। এত যে করা, শেষে কি সবই এমন একটা বিচ্ছিন্ন খাপছাড়া জীবনের জন্য! ভুবনবাবু ভারি বিচলিত হয়ে পড়লেন।

নীরজা দেখল কেমন ঝুঁকে আছে মানুষটা। চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে। কপালের দিকে যৌবনেই সামান্য টাক পড়েছিল, সেটা আর বাড়েনি। চেহারাতে বেশ একটা সৌম্যকান্তি ফুটে উঠেছে। ধুতি কখনও লুঙ্গির মতো পরেন না। বেশ কোঁচা দুলিয়ে ধুতি পরার অভ্যাস। বাড়িতে এখন বাটিকের কাজ করা লুঙ্গি চল হয়েছে। দুই ছেলেতে বাসায় ফিরে কতক্ষণে শরীর হালকা করবে, কতক্ষণে লুঙ্গি মাথায় গলিয়ে দিয়ে বেশ আরাম করবে, —আর মানুষটার তখন গজ গজ বেড়ে যায়। বামুনের বাড়ি, লুঙ্গি, কী যে হচ্ছে আজকাল, এবং এটা নীরজা বুঝতে পারে অনেক কিছু অপছন্দের মতো এটাও একটা অপছন্দ। এবং সব যেমন সরে যাচ্ছে এটাও তার সয়ে গেছে। কেবল নিজে কখনও দলের নাম লেখাবেন না কিছুতে।

নীরজার মনে হল, আসলে মানুষটা সব অনাসৃষ্টি থেকে নিজেকে পৃথক রাখতে ভালোবাসে। অথবা নিজে সাধু থেকে যদি পরিবারের সবার মঙ্গল করা যায়। নিজের এই সাধু স্বভাবের জন্যেই তার বিশ্বাস সংসারে খুব একটা অধর্ম বাসা বাঁধতে পারবে না। নীরজা মনে মনে তখন না হেসে পারে না। সে বলল, কী আর কথা বলছ না কেন?

ভুবনবাবু সহসা জেগে ওঠার মতো তাকালেন। বললেন, তুমি এখনও আছো!

থাকব না কেন। সহজ কথাটা মেনে নিতে এত বাধে কেন!

ওরা বাড়ি না থাকলে তোমার কষ্ট হয় না?

ওরা বড় হয়েছে।

বড় হলেও তুমি মা। তোমাকে তো কেউ বলে না, মা তুমি কেমন আছো?

ওরা ভালো থাকলেই আমি ভালো। সেটা বুঝতে পারে।

ওরা কী সত্য ভালো আছে!

আছে বইকি।

তোমার চোখ নেই নীরজা। তুমি কিছু টের পাও না।

সব টের পাই। মানুষ শিখতে শিখতে বড় হয়। একটু কিছু শিখুক না।

এটা তো শেখা না, শরীরকে পীড়ন করা।

নীরজা বলল, সবই সংসারে দরকার হয়। তোমার মতো ওরা যে ভীত হয়নি, উদাসীন হয়নি, এতে আমার সাহস বাড়ে।

তুমি কী সত্যি সত্যি তবে এটা চাইছ?

আমি কে চাইবার! চাইলেও যা হবে, না চাইলেও তাই হবে। সেজন্যে ভাবি না। সময়মতো সবাই ঠিক ফিরে আসে।

তোমার কথা শুনলে মনে হয় নীরজা, পৃথিবীতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। সময়ে সব ঠিকঠাক হয়ে যায়।

নীরজা এবার কী বলবে ভেবে পেল না। ধীরে ধীরে পরাজিত হওয়ার মতো বলল, ওরা তোমার সন্তান, তেমন কিছু করবে না।

ভুবনবাবুর মাথাটা আবার ঝুঁকে গেল। বলল, নীরজা, ওরা তোমারও সন্তান। ভুললে চলবে কেন!

আঠারো

কলেজ থেকে ফেরার পথে পিয়া মাঝে মাঝে মোড়ের পানের দোকানটার সামনে দাঁড়াত। বলত, তুই দাঁড়া, আমি একটা পান খেয়ে আসছি। সে পানের খিলি এনে বলত, তুইও খা। দেখবি কী সুন্দর লাল টুকটুকে ঠোঁট হয়। সামান্য পান চিবিয়ে ঠোঁট উলটে দেখাত, কীরকম রে!

খুব লাল।

জয়া বলত, আমার লাল হয় না।

যে যত বেশি ভালোবাসতে জানে তার ঠোঁট তত লাল হয় জানিস।

অদ্ভুত সব কথা বলত পিয়া। আমি এখন ভালোবাসায় ডুবে আছি। কী সুখ কথাটা বলেই পিয়া চোখ বুজে ফেলত। মুখটা পিয়ার আশ্চর্য লাবণ্যে ভেসে যেত। চোখ ভারী ভারী দেখাত। চিবুক রাঙা হয়ে উঠত। গোপনে বোধহয় পিয়া কিছু করছে। লজ্জা সংকোচ পিয়ার একদম আজকাল নেই। সুখ কত তীব্র একদিন জানার ইচ্ছে হয়েছিল জয়ার। বলেছিল, এই তোর কেউ আছে?

বলব কেন?

বল না। আমি কাউকে বলব না। আমারও তো কী যে হয় রে। রাতে বিছানায় গেলেই যেন একজন যুবার শরীর আমার পাশে শুয়ে থাকতে চায়। এত দুষ্টুমি আরম্ভ করে দেয় কী বলব, ঘুমই আসে না।

যুবকটি কে? আমি চিনি? প্রিয়া বলল।

পৃথিবীর সব যুবকদেরই বলতে পারিস। সুন্দর মতো যুবক দেখলেই সারাদিন মনটা আনচান করে। রাতের বেলা কী করি বল। বিছানায়ও দেখতে পাই সে লম্বা হয়ে পাশ ফিরে আছে।

পিয়া বলল, খুকি। তোমার কিছু হবে না।

আমার ভয় করে।

এবং এই ভয় সূত্রে ধীরে ধীরে তার সব জানা হয়ে গেছে। কোথায় কত নম্বর ধর্মতলায় কত টাকার বিনিময়ে শরীর ফের পবিত্র হয়ে যায় তাও তার জানা। কী কী ব্যবহারে রহস্যময় আধারে ডুব দিলেও দাগ ধরে না তা জানতেও বাকি নেই। কেবল ভেবেই গেছে। মানুই তার একমাত্র মানুষ যার কাছে সহজেই সে তার ইচ্ছের কথা বলতে পারে। মানুকে সে যেটুকু দিয়েছিল, পৃথিবীর কোনো কাকপক্ষী টের পায়নি, জয়া মানুর চোখে চুমো খেয়েছে! কী আরাম! ট্রামটা তখন গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে গেছে। এখানে নেমে উলটোদিকে যাবে। পঁয়তাল্লিশ নম্বরেই সহজ হবে। কালিদাসকে না হলে এড়ানো যেত না। সে ভাবল এবার সেই দোকানটায় যাবে। একবার পিয়া লাল ত্রিকোণ চিহ্নিত কিছু কিনে বলেছিল 'তুইও কিনে নে'। কখন কাজে লেগে যাবে টেরও পাবি না। সে পিয়ার মতো মহিলা হতে পারেনি, বরং পিয়ার এমন একটা নষ্ট চরিত্র তাকে পীড়া দিয়েছে। অথচ আজ ওর কী যে হচ্ছে যেন সে লাল ত্রিকোণের সাহায্য না নিয়ে কিছুতেই আর বাঁচবে না। মানুটা কোথায় কী করছে কে জানে।

সে খুব বিনীতভাবে কথাটা বলল। এবং দোকানি বোধহয় সামান্য বিস্মিত হয়েছে কথাটায়। কারণ এ মুখ তার ঠিক চেনা নয়। এখানে এ—পাড়ায় কোনো কোন বাড়িতে কী কী ভাবে পরিবার পরিকল্পনা চলছে মোটামুটি তার জানা। জানাশোনার ভিতর এ মেয়েটা কিছুতেই পড়ছে না। জয়া মুখ ঘুরিয়ে প্যাকেটটা কিনে কোনোরকমে দোকানিকে সে দু টাকার নোট দিয়ে দিল। এত বেশি ঘামছিল যে কিছুতেই ফেরত পয়সাটা আর হাত পেতে নিতে পর্যন্ত পারেনি। এবং বাসে উঠেও মনে হয়েছিল সবাই দেখে ফেলেছে। কার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই ওর ভীষণ সংকোচ হচ্ছিল।

সারাটা বাস কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। এবং সেই প্রবল এক পুরুষ বিশাল দু বাহু নিয়ে সাপটে ধরেছে এমনই একটা দৃশ্য সারাক্ষণ চোখের ওপর ভেসে চলছিল। শহরের গাছপালা, বাড়ি, ঘর, ট্রাম, বাস, ভিড় কিছুই সে অনুভব করতে পারছিল না। বটুয়ায় সেই নিষিদ্ধ বস্তুটি সারাক্ষণ তাকে উদভ্রান্ত করে রেখেছে।

এবং সে বাড়ি ফিরে এলেই মা বলল, জয়া এলি। আমার পাশে একটু বোস না। সারাদিন কোথায় যে টো টো করিস।

বারে আজ আমাদের কবিতার আসর ছিল না।

কোথায়?

কালিদাস বিনয় এসে নিয়ে গিয়েছিল। ভবানীপুরের দিকে।

তুই কবিতা পড়লি?

বারে পড়ব না।

কোন কবিতাটা পড়লি।

ওগুলো তোমাকে শুনাই নি।

জয়া যে কবিতা পাঠ করেনি, সে চলে এসেছে এবং ভেতরে মানু নামক যুবকের ভয়ংকর দাপট সারাক্ষণ মাতালের মতো রেখেছে, এবং এই বটুয়ার ভেতরে রয়েছে এক সঞ্জীবনী সুধা, যার বিনিময় সে জীবনে প্রথম গভীরে আরও সুগভীরে ঢুকে যাবার জন্য ছটপট করছে—সে সম্পর্কে মাকে কিছুই আঁচ করতে দিল না। খুব স্বাভাবিক গলায় গান গাইল। হাতের আঙুল বটুয়া ঘোরালো! পায়ে পায়ে বাঘা ঘুর ঘুর করল। সেলফের অত্যধিক নিচে লুকিয়ে রাখল তার অন্তর্যামীকে। এবং বাথরুমে ঢুকে তারপর শুধু স্নান। কী কী আছে এই শরীরে প্রায় নাভিমূলে সেই স্বর্ণ কেশদামের মতো অতীব বিলাসিনী রাই। সে স্নান করতে করতে ডাকল মন্টু মন্টু।

কোনো সাড়া নেই।

মা মন্টুর সাড়া নেই কেন!

মা শুনতে পাচ্ছে না কিছু। বিছানায় শুয়ে থেকেই বলছে, কিছু বলছিস জয়া।

মন্টু কোথায় মা?

মন্টু কোথায় জানি না, তো।

আজ আসুক! মাথাটা ভাঙব—বাড়ি না থাকলে স্বাধীন।

বাথরুম থেকে বের হয়ে ঘাড় গলা এবং চুল মুছতে নীল আলোটা জ্বেলে দিল করিডোরের। তারপর ফের ডাকল, মন্টু তুমি কী আমার মতো মরেছ!

মন্টু বলল, যাই দিদিমনি! আমি মরিনি।

দ্যাখ তো, মানুবাবু বাড়ি আছে কিনা!

কিছু বলব?

থাকলে এই চিঠিটা দিয়ে আসবি। খুব দরকার।

আর এসব কথাগুলো বলতে গলা কাঁপছিল জয়ার এবং কেমন একটা জ্বরের মতো ঘোরে পড়ে আছে। ঘোরের ভেতরই সে এতসব করতে পারছে। সামান্য অসুস্থতা শরীরে না জন্মালে বুঝি এতটা বেপরোয়া হওয়া যেত না। সে হাত পা লম্বা করে শুয়ে পড়ল। আলোটা চোখে বড় লাগছে। উঠে আলোটা নিভিয়ে দিল। এবং পৃথিবীতে মা বাবা কিংবা পিসির আদুরে সব ন্যাকামো চিন্তাভাবনা কিছুই আর মাথায় নেই। কেবল এক যুবককে দেখতে পাচ্ছে, সুদূর থেকে হেঁটে আসছে, কত কাল, কত যুগ ধরে হেঁটে আসছে আর বারবার শরীরে মিশে যাচ্ছে। সে কেমন জ্বালা বোধ করল। চোখ জ্বলছে। ওর মনে হচ্ছিল, মানু আসতে না আসতেই সে মরে যাবে।

স্কুটারটা কিছুদূর বাতাসে ভেসে গিয়ে ঝুপ করে একটা জায়গায় থেমে গেল।

রমা বলল, কী হল অরুণ!

অরুণ দেখল, নাকের ডগা দিয়ে আর একটা স্কুটার বের হয়ে যাচ্ছে। এত দ্রুত বের হয়ে গেল বোঝা গেল না কিছু। আরোহী একেবারে বাঘের মতো বাতাসের ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল। মরীচিকা মতো সে কিছু দেখেই তার গতিপথ পালটে সামনের আরোহীকে ধাওয়া করল।

রমা বলল, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ!

অরুণ কিছু বলল না। চোখে ভারী গগলস। মাথায় লোহার টুপি এবং কোমরে বেল্ট থাকলে তাকে এখন দস্যুর মতো মনে হতে পারত। সে রেড রোড ধরে হাওয়ার আগে ছুটে যেতে চাইছে।

রমা দেখল, নিমেষে বাস—স্ট্যান্ড পার হয়ে কখন মিন্টের পাশ দিয়ে অরুণ বেগে ছুটে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে স্কুটারের স্পিড তোলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কোথায় যাবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

স্কুটারটা বাঁক ঘুরতেই দূরে আর একটা স্কুটার রমার চোখে ভেসে উঠল। ঠিক ওর মতো কেউ যেন পিছনে বসে রয়েছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সোজা ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে একটা হলুদ বলের মতো দিগন্তে চলে যাচ্ছে স্কুটারটা। রমা এবার আর্ত গলায় বলল, অরুণ কোথায় যাচ্ছ! এত জোরে চালিয়ো না। মরে যাব অরুণ।

অরুণের যেন কিছু শোনার সময় নেই। সামনে আড়াল পড়ছে একটা ট্রাকের। দেখা যাচ্ছে না আর। সূর্য এবার দিগন্তে হেলে পড়ছে। কিছু কাঞ্চন ফুলের গাছ দু—পাশে। মাঠ, জলা জমি, উর্বরা শস্যক্ষেত্র পার হয়ে সে চলে যাচ্ছে। রমা কিছুতেই আঁচল কোমরে গুঁজে রাখতে পারছে না। খোঁপা খুলে গেছে। এবার সব চুল পালের মতো উড়বে। সামনের ট্রাকটা অরুণ নিমেষে পার হয়ে গেল। জীবন নিয়ে এক আশ্চর্য ছিনিমিনি খেলায় মেতে উঠেছে অরুণ। দূরের স্কুটার তার আরোহী এবং যুবতী কিছু যেন চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে, অরুণ যত দ্রুত পারছিল তাদের চেষ্টা করছে ধরার।

রমা বলল, অরুণ তোমার কী হয়েছে।

বাতাসের বিশাল থাবায় সব শব্দ গন্ধ ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। রমার কোনো কথাই আর তার কাছে স্পষ্ট নয়। সে কেবল পাগলের মতো হাঁকপাঁক করছে সামনের স্কুটারটা ধরার। আর তারপরই বিশাল একটা দ্রুতগামী যান উঠে এল রাস্তায়। সবকিছু আড়াল দিয়ে একেবারে চিরস্থায়ী হয়ে গেল। যেন আশ্চর্য নিয়তি খাড়া হয়ে আছে সামনে। দ্রুতগামী যান নিশ্চল নিথর। সে চিৎকার করে উঠল, শা...আর কিছু প্রকাশ করতে পারল না। টলতে টলতে স্কুটার থেকে নেমে লাফিয়ে গেল সামনে। আর দূরে দেখল স্কুটারটা বিন্দুবৎ হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ছোটো হতে হতে তার আর দেখা পাওয়া গেল না। প্রকৃতি ভীষণ নির্দয় নিষ্ঠুর। হা হা করে যেন গাছপালা মাঠ, আকাশ হাসছিল।

রমা বলল, কী হয়েছে তোমার।

পেছনে কে বসেছিল।

রমা বলল, লোকটার কেউ হবে।

তুমি মেয়েটার মুখ দেখেছ?

স্পষ্ট কিছু দেখিনি। চুল খোলা ছিল।

অরুণ কেমন নিস্তেজ গলায় বলল, আমি শেষ।

কী বলছ যা তা!

আমার আর অহংকার করার মতো কিছু থাকল না।

অরুণ কী হয়েছে তোমার, বলবে তো?

কিছু হয়নি। চলো।

এবং সোজা সে রমাকে ওর বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল, একটা ফোন করব।

রমা অরুণকে নিয়ে নিচের তলায় গেল। ফোনে অরুণ বলল, অমলা আছে?

কে?

আমি অরুণ বলছি।

ও অরুণ মেসো। কেমন আছেন।

অরুণ বুঝতে পারল না কে কথা বলছে। বিরক্তি এবং অধৈর্য আর কী যে বলবে, যেন পারলে সে এখন গালাগাল দিতে পারলে বাঁচে। তারপরই মনে হল মেজদির ছেলে এখানে বেশ কিছুদিন থেকে আছে। বেয়াদপ ছোকরাটার সঙ্গে তার এখনও দেখাই হল না। যখনই গেছে তখনই শুনেছে বাড়ি নেই। বোধহয় সেই। এবং এতসব ভাবার তার সময়ও ছিল না। তড়িৎপ্রবাহের মধ্যে সব কথাগুলি বড় দ্রুত টরে টক্কা বাজিয়ে গেল। সে বলল, অমলা আছে?

অমলা মাসির কথা বলছ?

তবে আর কার কথা বলব?

অমলা বলতে কত মেয়ে আছে পৃথিবীতে।

সামনে থাকলে হয়তো গালে চড় বসিয়ে দিত একটা। ছোকরার মার সঙ্গে বনিবনা হল না বলে এখানে চলে এসেছে। অমলা কতবার নাকি বলেছে, যাস আমাদের বাসায়। ধুস সে কেন আবার মাথার মধ্যে এতসব টরে টক্কা নিয়ে বেঁচে থাকবে। চোখমুখ জ্বলে উঠছিল। রাগে দুঃখে সে কী যে বলে ফেলত। কিন্তু নিজেকে খুব সামলে নিয়ে বলল, মিতা আছে? মিতাকে ফোনটা দাও।

ছোটমাসি নভেল পড়ছে।

তোমার ন'মাসি কোথায় জান?

মানে অমলা মাসি। সকালে একবার দেখেছিলাম। তারপর আর দেখিনি। দাদুকে ডেকে দেব। দাদু জানতে পারে।

এই দাদুই খেল ছোকরাটাকে। একটা কথার সোজা জবাব দেয় না। একেবারে সব সময় আশ্চর্য রকমের বেয়াড়া কথাবার্তা। অরুণ বলল, তাই দাও।

তখনই ও—পাশ থেকে আবার কথা—ছোটমাসি এসে গেছে।

তুই কার সঙ্গে এত কথা বলছিস নানু?

অরুণ মেসো। অমলা মাসিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

মানে?

মানে অরুণ মেসো জানতে চাইছে—এখানে অমলা মাসি আছে কি না। বলেই সে ফোন ছেড়ে আবার রা রা করে গান গাইতে থাকল।

অরুণ ও পাশ থেকে সব শুনে আরও অস্থির হয়ে উঠল। বুঝতে পারছে নানু নামে ছোকরাটা যথার্থই ইতর।

মিতা বলল, অরুণদা।

হ্যাঁ।

দিদিতো ছোটকাকার বাসায় যাবে বলে দুপুরে বের হয়ে গেছে। মুখটা অরুণের ভারি ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল।

তারপরই মিতা বলল, আপনি কোত্থেকে বলছেন? বাসায় দিদি ফিরে যায়নি।

অরুণের সত্যি মনে হল ভুল করে ফেলেছে। আগে বাসায় না গিয়ে এভাবে ফোন করা ঠিক হয়নি। কাকে না কাকে স্কুটারের পেছনে বসে থাকতে দেখে এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়া ঠিক হয়নি। সে কেমন নিস্তেজ গলায় বলল, না এমনি ফোন করেছিলাম। তারপর অরুণ ভাবল আর কী বলা যায়। শেষে সামান্য বানিয়ে বলল, বাসায় ফিরতে একটু দেরি হবে দিদিকে বলো।

যদি সোজা চলে যায়!

তা হলে আর বলতে হবে না। তোমাদের ফোন করতে পারে!

অরুণের মাথাটা তারপরেই কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। সামনে রমা দাঁড়িয়ে আছে—এই রমাকে নিয়ে আজ পাতালে প্রবেশ করার তালে ছিল—সামান্য একটা স্কুটার তার মাথার মধ্যে কীসব গণ্ডগোলের ছবি জুড়ে দিয়ে গেল—আর সেই থেকে কী যে ভীষণ সংশয়। সে পাগলের মতো রমাকে বলল, যাচ্ছি!

রমা অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে পারছে না।

ভুবনবাবু তখন দৈনিক কাগজটা নীরজাকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। নীরজা চোখে আজকাল ভালো দেখতে পায় না। দিনের বেলাতে সাত পাঁচ কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। সন্ধের সময় তিনি নীরজাকে একটু অবসর বুঝে কাগজটা পড়ে শোনান। তিনি পড়তে পড়তে বললেন, শুনতে পাচ্ছ।

নীরজা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ে যাও না।

তিনি আবার বললেন, শুনতে পাচ্ছ। বাকিটা যেন এমন শোনাত সিঁড়িতে পায়ের শব্দ...।

তুমি পড়ে যাও না!

তিনি পড়লেন, বাড়ছে পারিবারিক হিংসা। কমছে মানুষের সহিষ্ণুতা। বিবাহ বিচ্ছেদ তো বাড়ছিলই। বাড়ছে আত্মহত্যা। অজ্ঞাত রহস্যময় মৃত্যু বিশেষত নারীদের। তিনি কাগজটা রেখে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাবেন ভাবলেন। কিন্তু যেতে সাহস পেলেন না! রমা বিপর্যস্ত হয়ে ফিরছে। হিংসা দ্বেষ লোভ, শারীরিক মোহ, স্বার্থপরতা সব মিলে মেয়েটার অস্তিত্বে ঝড় তুলেছে বুঝি।

রমা তখন সোজা বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে দিল। বিকট শব্দ করে জল চারধারে লাফিয়ে ছড়িয়ে ওকে ক্রমে ঠান্ডা করে দিতে লাগল। আর একটা ব্যথাতুর কাতর যন্ত্রণা শরীর বেয়ে যা তাকে সারাদিন অতিশয় সব নিষ্ঠুরতার ভিতর দৌড় করিয়ে মেরেছে ক্রমে শীতল হতে হতে কেমন হিমঠান্ডা হয়ে গেল। আর আশ্চর্য এত কান্না কেন বুক গুমরে উঠে আসছে তার! কী যে থাকে, অপমান আর লাঞ্ছনার যেন শেষ নেই জীবনে। যুবতীর সব ঐশ্বর্য হেলায় লোকটা আস্তাকুঁড়ে কোন অহংকারে ছুড়ে দিতে পারল বুঝল না। তার মরে যেতে ইচ্ছে করছিল।

আরও রাত করে ফিরল ভানু। সে কেমন গুমরে বসে থাকল কিছুক্ষণ। মানু ফিরে এলে নীরজা বলল, জয়া তোকে যেতে বলেছে কী একটা বই নিয়ে। মানু বলল, কাল যাব।

দুবার খোঁজ করেছে। তাছাড়া একটা ছেলে এই চিঠিটা দিয়ে গেছে। নীরজা বলল।

করুকগে। মানু রেডিয়োর নব ঘুরিয়ে আর একটা নতুন সেন্টার ধরার চেষ্টা করার সময় চিঠিটা খুলে ফেলল—সেই অহংকারী ছেলেটার চিঠি। চিঠিতে লিখেছে, বুঝতে পারছি তুমি আর ভালো নেই। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় মানুষ ভালো থাকে না। এখন চাই সৎ মানুষ, পরিশ্রমী মানুষ। ঠিকঠাক বেঁচে থাকার জন্য আজ এটা আমাদের বড় বেশি দরকার। মানু রেডিয়ো বন্ধ করে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে বিরাট উদার আকাশ। তার নিচে কত অবহেলিত জনপদ। সে যেন কবে থেকে কোথাও যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠছে।

সবাই ঠিক ঠিক ফিরে আসায় ভুবনবাবু আজকের মতো রাতে ভালো ঘুমাতে পারবেন। কাল পরশু এবং তারপর অন্য কাল পরশু কী হবে তিনি জানেন না। শুধু এটুকু জানেন, যতদিন আছেন নির্বিঘ্নে আর জীবন কাটাতে পারবেন না। সমস্যা দিন দিন সবার মতো তারও কেবল বাড়ছে। আগে একমাত্র সমস্যা ছিল তিনি নিজে, নীরজা এলে দু'নম্বর সমস্যা। সন্তান হলে তিন নম্বর সমস্যা। ওরা যত বড় হতে থাকল, তত অজস্র সমস্যায় নিপীড়িত হতে থাকলেন তিনি।

উনিশ

নানুর ঘুম আসছিল না। সে পাশ ফিরে শুল। জানালা খোলা। আকাশে কিছু নক্ষত্র। সে শুয়ে শুয়ে এক দুই করে নক্ষত্র গুনতে থাকল। সব দেখা যায় না। যতবার গুনছে ততবারই মনে হচ্ছে অসংখ্য নক্ষত্র বাদ পড়ে

গেল। অনেকক্ষণ এসব করার পর হাতে মুখে জল দেবার জন্য বারান্দায় এল। পাশে বাথরুম। বাথরুমে ঢুকে ঘাড়ে গলায় জল দিল। চোখে জলের ঝাপটা দিল। বেশ নিশুতি রাত—কিছুক্ষণ বাইরের ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকল। একটা রেলগাড়ি এইমাত্র চলে গেল। শেষ বাস গুমটিতে ঢুকে যাচ্ছে। সে মানুর কাছে গিয়েছিল, ভেবেছিল মানু কলেজে আসবে। ওর সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার ছিল। সে একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। এত বড় শহরে মানুকেই সব খুলে বলতে পারে।

ঘুমটা হয়তো এজন্যই আসছে না। মানুষের জীবন এক—একটা সময় আসে যখন একজন কাছের জন দরকার হয়ে পড়ে। সারাদিনটা আজ বিদঘুটে সব ঘটনার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। শেষমেশ অরুণ মেসোর ফোন। আশ্চর্য, মাসিদের কী কোনো রোগ আছে—অমলা মাসি দেখতে কী সুন্দর—কেমন মিষ্টি কথা বলে, চোখ দুটো দেখলে বড় পবিত্র পবিত্র লাগে। মাসি কোথায় যায় মেসো খবর রাখে না কেন এবং ফোন ধরে কেন জানি অমলা মাসির খোঁজ করতেই তার মার মুখ মনে পড়ে গেছিল। যেমন মা তাকে একা রেখে কোনো কোনো দিন বেশ রাত করেই ফিরেছে। সে ভারি ছটফট করত। অথচ তার ভিতরের দুঃখ অথবা অভিমানের কোনো দামই দিত না। মেসোর ফোন পেয়ে প্রথম মনে হয়েছিল, বেশ জব্দ তুমি বাপ—বউ কোথায় জান না। তারপরই মনে হয়েছে—সে মানুষটাকে দেখেই নি। কেমন দেখতে অরুণ মেসো—বিয়ের সময় সে অথবা মা কেউ আসতে পারেনি। এখানে আসার পরও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে সে কখনও যায়নি। ওর মনে হয়েছে সবাই জানে তার বাবার আত্মহত্যার খবর। যে ছেলের বাবা আত্মহত্যা করে তার মাথা তুলে কথা বলারও যেন অধিকার নেই। এসব কারণেই তার কোথাও আর যাওয়া হয় না। অথবা কী এ—সময়ে মানুষেরা সব্বাই গ্রন্থিমোচনে ব্যস্ত। সম্পর্কহীন মানুষই কী শহরে বেশি—ঠিক তার মতো। ফলে এইসব আজেবাজে চিন্তায় নানুর সত্যি ভালো ঘুম হল না রাতে। শেষ রাতের দিকে সে একটা দীর্ঘ স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নটা জলজ্যান্ত একটা চাটুর। গোল চাটুটা আগুনে দগদগে লাল। চাটুটা ঘুরছে। এবং চাটুটার মধ্যে বাবার সেই চশমাটা। চশমার একটা কাচে নানুর মুখ আর একটা কাচে নবনীতার মুখ। নবনীতা ঠোঁট টিপে হাসছিল।

অদ্ভুত সব ঘটনার মধ্যে স্বপ্নটা শেষ হয়ে গেল। সে দেখল একটা রাজবাড়ি, দরজায় এক হাত গন্ডারের ছবি—এবং ফুটপাথে অজস্র না খেতে পাওয়া মানুষের বিপ্লব। রাজবাড়ির পাঁচিল থেকে ইঁট খসিয়ে কারা নিয়ে যাচ্ছিল। দলের মধ্যে সেও একজন। আবার একটা মস্ত মই দেখল সে সিঁড়ির মতো আকাশে উঠে গেছে। সিঁড়িটা ধরে বেশ উঠে যাচ্ছিল। কখন যেন কারা সিঁড়ির নিচটা আলগা করে দিল। সিঁড়িটা শূন্যে ঝুলে আছে। নিচে দেখল লীলা দাঁড়িয়ে বলছে, তুমি কোথায় যেতে চাও দাদাবাবু। নেমে এসো। সে লাফ দিয়ে পড়তে গিয়ে মনে হল, ডানা গজিয়েছে এবং নীল আকাশের নিচে তখন সে আর লীলা। ওরা পাখি হয়ে গেছে। তখনই দেখল একটা বড় মাঠ, মাঠে নবনীতা ছুটছে। পেছনে ওর বাবা ছুটছে। নবনীতার ম্যাকসি বাতাসে উড়ছিল। চুল উড়ছিল। নবনীতাকে ধরার জন্য এখন আর তার বাবা ছুটছে না, তার পাড়ার দাদারা ছুটছে। একটা নদীর ধারে নবনীতা এসে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে চেয়ে আছে। তখন নবনীতার গায়ে পোশাক নেই। সে দূরে দেখতে পাচ্ছে দাদারা আসছে—ওদের হাতে গাছের ডাল, ইঁটের টুকরো। নবনীতা প্রাণভয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল। এখানেই স্বপ্নটা শেষ। দেবী বিসর্জনের মতো জলে ঝাঁপ দিলে যে শব্দ হল সে শব্দমালা তাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল। সে উঠে দেখল সকাল হয়ে গেছে। তার অনেক করণীয় কাজ। এবং বাথরুম থেকে আরম্ভ করে সকালের খাবার সে তাড়াতাড়ি শেষ করল। তারপর ব্যাংক এবং দাদু এই দুই কর্তাব্যক্তির সঙ্গে দিনটা কেটে গেল তার।

এর কিছুদিন পরেকার কথা। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর গরম হাওয়া বইছে। বৃষ্টি হবে হবে করেও হচ্ছে না। রোজই খবরের কাগজে বড় করে বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের কথা থাকে। কিন্তু দিন শেষে না ঝড় না বিদ্যুৎ। কেবল এলোমেলো বাতাস। প্রবল দক্ষিণা বাতাসে ভ্যাপসা গরম এবং সূর্য হেলে গেলে কিছুটা ঠান্ডা আমেজ নেমে আসছে শহরে। শহরতলির একটা বাড়িতে লীলা তখন ভাঙা আয়নার সামনে চুল বাঁধছিল।

তখনই খুট খুট শব্দ দরজায়। এই পড়ন্ত বিকেলে মামাবাবুর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসতে পারে ভেবে সে দরজা খুলতেই দেখল, দাদাবাবু। খুব মিষ্টি হাসি মুখ। হাতে কীসের একটা প্যাকেট। লীলা বলল, ওরা কেউ বাড়ি নেই।

নানু বলল, তুমি আমাকে ঢুকতে দেবে তো।

লীলা সরে দাঁড়াল। ওর চুল বাঁধা এখনও শেষ হয়নি। সে কিছু না বলেই চুল বাঁধতে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। বসার ঘরটায় তালা ঝুলিয়ে যায়নি, তাই রক্ষা। নানু বসার ঘরে ঢোকার আগে বলল, দরজা বন্ধ করে দিয়ে যাও।

দরজা বন্ধ করতে গিয়ে লীলার হাত কাঁপছিল।

চা করতে পারবে?

লীলা রান্নাঘর থেকে বলল, কিছুই বাইরে নেই দাদাবাবু।

ঠিক আছে। তুমি এসো। ও ঘরে তুমি কী করছ?

লীলার গলাটা কেমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। দাদাবাবুর চোখের দিকে সে তাকাতে পারে না। তাকালেই ভিতরটা গুড় গুড় করে ওঠে। সে বলল, কী হবে গিয়ে?

এসোই না।

মামিমা বকবে।

কে বকবে?

মামিমা।

গুলি মারো মামিমাকে। আসতে বলছি আসবে।

লীলা কোনোরকমে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এল। ভারি ভয় তার। সে ভয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল।

এই নাও। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন। আমি বাঘ না ভালুক। ভয় পাচ্ছ কেন?

লীলা ভেতরে ঢুকে বলল, কী নেব?

দেখই না খুলে।

লীলার মুখটা ভীষণ লাল হয়ে গেছে। চোখ দুটোতে আশ্চর্য নীরবতা। এবং বুকের মধ্যে সমুদ্রের ঝড়। সে তাকিয়ে থাকল শুধু।

কী হল, নাও। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। ছেঁড়া ফ্রক গায়ে দিয়ে লোককে না দেখালে বুঝি ভালো লাগে না।

লীলা খুব শান্ত হবার চেষ্টা করছে। সে বলল, দাদাবাবু আপনি খুব ছেলেমানুষ।

তুমি বুঝি খুব বুড়ি।

নানুর কথার কোনো জবাব না দিয়ে বলল, আমাকে আস্ত রাখবে না।

সাহস হবে না লীলা।

লীলা আর জোর পাচ্ছে না। সে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল। সমস্ত শরীর তার ভেঙে আসছে। কতকাল পর একজন ভালো মানুষের কাছ থেকে এই সহৃদয় ব্যবহার। সে বলল, দাদাবাবু কপালে আমার এত সুখ সইবে না।

নানু লীলাকে হাত ধরে টেনে তুলল—ওঠো। তুমি যাও। পরে এসো। আমি দেখব লীলা। তোমাকে শাড়ি পরে কেমন লাগে দেখব।

লীলা অগত্যা উঠে চলে গেল। এবং যখন শাড়ি পরে এসে সামনে দাঁড়াল, নানু প্রথমে তাকাতে পারল না। সে বলল, ন...ব...নী...তা।

লীলা কিছুই বুঝতে না পেরে বলল, আমি যাব?

নানু ভারী আবেগে সেই কথাটাই শুধু বলল, ন...ব...নী...তা। গানের মতো করে বলল।

নানু আজকাল কোনো কারণে ভারী আবেগ বোধ করলে শিস দেবার মতো বলে ওঠে নবনীতা। তার সব আনন্দের প্রকাশ এই একটিমাত্র কথাতেই। সব দুঃখ এবং হতাশা থেকে আজকাল এই একটা মাত্র কথাই জীবনে তাকে মুক্তি এনে দেয়। সে বলল, নবনীতা আবার আমি আসব।

লীলা বলল, ওরা বাড়ি থাকলে আসবেন।

নানু বলল, আমার খুশিমতো আসব। আসলে নানু একটা কিছু করতে চায়। সেটা যে কী সে নিজেও জানে না। রোজই সকালে উঠে ভাবে, সে একটা ভয়ংকর সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে এবং সেই সিদ্ধান্তটা যে কী ঠিক কিছু তার কাছে স্পষ্ট নয়। ভিতরে এক ধরনের অস্থিরতা দানা বাঁধছে। কলেজে যাচ্ছে না। মানুর সঙ্গে দেখা নেই। মানুর সঙ্গে দেখা হলে ভালো লাগত। কিন্তু তার এখন কোথাও যেতেও ইচ্ছে করছে না। একা এবং নিজের মধ্যে থাকার স্বভাব ধীরে ধীরে তার গড়ে উঠছে সে এটা ক্রমশ টের পাচ্ছে।

এবং সত্যি সে আর একদিন খুশিমতো চলে এল। যখন শহরে ঘুরে সিনেমা দেখে অথবা কোনো পার্কে চুপচাপ বসে থেকে তার কিছু ভালো লাগে না, তখনই মনে হয়, অসহায় সেই তরুণীর কাছে তার ভালো লাগবে।

একদিন কী হল, একটা বড় রেস্তোরাঁয় বসে ফ্রাইড রাইস, চিকেন কারি, এবং আইসক্রিম খেতে তার মনে হয়েছিল, লীলা জানে না, ফ্রাইড রাইস এবং চিকেন কারি বলে কোনো সুন্দর খাবার আছে। সে নিজে খেয়ে এক প্যাকেট ফ্রাইড রাইস এবং চিলি চিকেন নিয়ে সোজা সেই শহরতলির বাড়িটার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। সকালের দিকে বৃষ্টি হওয়ায় বেশ ঠান্ডা আমেজ রয়েছে বাতাসে। এবং বর্ষা এবারে চলে আসবে বলে হাওয়ায় আর্দ্রতা অনুভব করা যাচ্ছে। শহরতলিতে নেমেই দেখল, গাছপালা সবুজ, ঝোপঝাড় জলের গন্ধ পেয়ে বেড়ে উঠেছে—পাশাপাশি অন্য সময়ের চেয়ে যেন বেশি উড়ছে। বলতে গেলে বেশ সুসময়। সে লীলার জন্য এক প্যাকেট ফ্রাইড রাইস নিয়ে আসতে পেরেছে। ভারি তৃপ্তি বোধ করছিল মনে মনে। এবং যখন দরজা ঠেলে বাড়িটায় ঢুকল, দেখল, জেঠু কলতলায় বসে চায়ের বাসন ধুচ্ছে।

দাদা এসেছে। দাদা এসেছে। কুটু এসে নানুকে জড়িয়ে ধরল। জেঠি অসময়ে শুয়ে আছে। ঘটর ঘটর টেবিল ফ্যানটা চলছে। তাকে দেখে জেঠি উঠে বসল, এলি? আমার শরীরটা ভালো নেই বাবা। শুয়ে আছি।

সে ভেবেছিল, সেদিনের মতো বাড়ি কেউ থাকবে না। সে এবং লীলা শুধু থাকবে। লীলাকে বলবে, তুমি আমার সামনে বসে খাও। লীলা যখন খাবে অথবা লজ্জায় লীলা যদি খেতে না পারে সামনে বসে তখন সে বলবে লজ্জা কী মানুষই তো খায়। না খেলে কেউ বাঁচে। কিন্তু সেই লীলাকেই দেখতে পাচ্ছে না। সে তখন সোজা বলল, লীলা কোথায় জেঠি?

জেঠির মুখ কুঁচকে গেল। বলল, আর বলিস না বাবা, এমন মেয়ে কোথায় কী কেলেঙ্কারি করবে, তাই ছাড়িয়ে দিয়েছি।

কীসের কেলেঙ্কারি জেঠি?

এই মানে, আমরা বাড়ি থাকি না, কিছু হলে কলঙ্কের ভাগী। মেয়েটার স্বভাব ভালো না বাবা।

নানুর মাথায় সেই যে বলে না, একটা রেলগাড়ি ঢুকে যায় মাঝে মাঝে, সেটা আবার ঢুকে যেতে থাকল। সে দাঁড়িয়ে প্রথমে মাথার মধ্যে গোটা রেলগাড়িটাকে ঢুকতে দিল। তারপর যখন রেলগাড়িটা মাথার মধ্যে ঢুকে চোখ তুলে লাল লাল হয়ে গেল, মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, পেশি ফুলে উঠতে থাকল, তখনই জেঠির চিৎকার, ও মা দ্যাখ এসে ও কুটু তোর বাবা কোথায়, তাড়াতাড়ি আসতে বল, নানুর চোখমুখ কেমন হয়ে যাচ্ছে।

কলতলা থেকে অবনীশ কাপ প্লেট ফেলে ছুটে এল, কী হয়েছে নানু? তোর কী হয়েছে?

নানু বলল, কিছু হয়নি তো।

জেঠি বলল, তোমার মরণ। দেখছ না নানুর চোখ কোথায় উঠে গেছে।

নানু বুঝতে পারছিল না, সে একটা অন্যরকমের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। খবরটা শোনার পর সে কিছুতেই আর ধাতস্থ হতে পারছে না। সবকিছু তচনচ করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। তখন জেঠু সামনে দাঁড়িয়ে শুধু বলল, বোস। দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

কুটু বলল, দাদা হাতে তোমার কী দেখি?

নানু হাত সরিয়ে নিল। কুটু আবার কোমর জড়িয়ে বলল, দাদা তুমি রাগ করেছ?

কুটু ফের বলল, না দাদা আমি তাড়াইনি। মা লীলাদিকে চুল ধরে বের করে দিয়েছে।

তখনই মহীয়সী বলল, কুটু চুউপ। তুমি আমার হাড়মাস জ্বালিয়ে খাচ্ছ। কে বলেছে আমি বের করে দিইছি। নারে নানু কুটুর কথা তুই বিশ্বাস করিস না।

নানু কিছুই আর শুনতে পাচ্ছে না। কতদিন ধরে সে একটা অন্ধকার পথে হেঁটে যাচ্ছিল। কতদিন ধরে চারপাশে কেউ আলো জ্বেলে দেয়নি।

লীলাকে দেখার পর মনে হয়েছিল, ভারী অসহায় এই মেয়ে—আশ্চর্য আকর্ষণ রয়েছে লীলার চোখে মুখে—সে লীলার জন্য প্রাণপাত করতে পর্যন্ত পারে।

সে কুটুকে বলল, লীলা কোথায় গেছে জানিস?

কুটু বলল, না।

সে অবনীশকে বলল, লীলা কোথায় আছে তুমি জান?

অবনীশ তাকাতেই তার স্ত্রী চোখ টিপে দিল। অগত্যা সে বলল, কোথায় আর যাবে। কোথাও কাজটাজ আবার ঠিক করে নিয়েছে হয়তো।

ওর বাড়ির ঠিকানাটা দেবে?

অবনীশের স্ত্রী বলল, লাবণ্য জানে। লাবণ্যই ঠিক করে দিয়েছিল।

লাবণ্য কে? কোথায় থাকে?

সত্যি ফ্যাসাদে পড়া গেল। অবনীশের স্ত্রী বলল, মাথা খারাপ করিস না নানু। ঝি—মেয়ের জন্য তুই মাথা খারাপ করিস না।

নানু বলল, আমার মাথা খারাপ, ভালোই বলেছ। আমার মাথা খারাপ, বাবার মাথা খারাপ, বাবা মরে যাবার পর তো তোমরা পুলিশকে এমনই সব বলেছিলে। অথচ তোমরা বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী। তুমি, তোমাকে আমি খুন করব।

ওগো, ও কী বলছে।

অবনীশ বলল, নানু, আয় ঘরে আয়।

কোথাও যাব না। বলো, লীলা কোথায় আছে?

খুন হওয়ার চেয়ে ঠিকানা দেওয়া অনেক সহজ। অবনীশের স্ত্রী একটা গাঁয়ের নাম বলল, একটা রেল স্টেশনের কথা বলল। চার ক্রোশ পথ হেঁটে যেতে হয় বলল। একটা বড় অশ্বত্থ গাছের নিচে নদী বয়ে গেছে বলল। এবং নদীটা পার হলেই মেঠো পথ ধরে গেলে লীলাদের বাড়ি দেখা যায়।

গাঁয়ের নাম, স্টেশনের নাম নিয়ে নানু বের হল। অশ্বত্থ গাছের নিচে নদী এবং নদী পার হয়ে মেঠো পথ খাঁ খাঁ মাঠ এবং শেষে কিছু গ্রাম গঞ্জ। গ্রাম গঞ্জ পার হলে আবার খাঁ খাঁ মাঠ তারপরই খড়ের বাড়ি—লীলা এমন একটা বাড়ি থেকেই এসেছে। সে আর দেরি করল না। বাইরে এসে সাইড ব্যাগের মধ্যে খাবার গুলি পুরে রাখল। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। গাছপালা সবুজ হয়ে আছে, এবং পাখিদের কলরব সবই আগের মতো। শুধু লীলা নেই। লীলা না থাকলে এইসব কত অর্থহীন। নানু টের পেল। সে হাঁটছে ঠিকই কিন্তু পায়ে জোর পাচ্ছে না। কতদূরে লীলা চলে গেছে। আর তারপর এক সকালে সেই স্টেশনে নেমে সে হাঁটা দিল। কথামতো অশ্বত্থ গাছ এবং নদী পেয়ে গেল। নদী পার হলে মেঠো পথ ধরে সে এগোতে থাকল। কথামতো সে খাঁ খাঁ মাঠও পেয়ে গেল। খড়ের মাঠ দিগন্ত বিস্তৃত রোদে সব যেন পুড়ে যাচ্ছে। সে হাঁটছে। সে হেঁটে

যাচ্ছে। দুপুর গড়াতেই দূরে দেখতে পেল খড়ের ঘর। একটা পরিত্যক্ত গাঁ। মানুষজন সব কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

যত খড়ের বাড়িটা এগিয়ে আসছিল, তত বুক ধুকপুক করছিল নানুর। সে কত গ্রাম—মাঠ—গঞ্জ ভেঙে এসেছে, তার ব্যাগে এখনও খাবার রয়েছে। খাবারগুলো পচে যাচ্ছে। এগুলো খেলে লীলার অসুখ হতে পারে। এ কথাটা মনে হওয়ামাত্র সে খাবারগুলো ফেলে দিল। শূন্যদিগন্ত, চারপাশে, অন্য টিলার মতো উঁচু জায়গায় সেই খড়ের বাড়িঘর নিয়ে একটা গাঁ। লীলা এখানে বড় হয়েছে—এমন নীরস অনুর্বর ভূমিতে লীলার জীবন কেটে গেছে ভাবতেই সে দেখল, একটা লোক এক কাঠা ধান নিয়ে রাস্তায় বসে আছে নদী পার হয়ে যাবে বলে। নানু তাকে লীলার কথা বললে, সে চিনতে পারল না। নানু লীলার মার নাম বলল, লোকটা বলল, এগিয়ে যান, ধুলো দফাদারের বউয়ের হল গে এই বেটি।

সেই উঁচু টিলার মতো জায়গাটা ক্রমে এগিয়ে আসতে থাকল। দু—পাশে শুধু ধু ধু প্রান্তরের মতো খড়ের মাঠ। কোথা কিছু ছাগল, রাখাল বালক এবং শীর্ণকায় গভীর দল চোখে পড়ল তার। দূর থেকে গাঁটা যতটা পরিত্যক্ত মনে হয়েছিল আসলে ততটা পরিত্যক্ত নয়। গরিব—দুঃখীদের বাস এই গাঁয়ে। কোনো বড় বাড়িঘর এখনও চোখে পড়ছে না।

বারবারই তার মনের মধ্যে একটা সংশয় পাক খাচ্ছে। লীলা আছে তো। লীলা যদি এখানে না এসে অভিমানে কোথাও চলে যায়! যদি লীলাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়! যদি লীলা নদীর জলে ডুবে মরে—অথবা সবসময় কেন জানি লীলার সেই বড় বড় চোখ তাকে বারবার তাড়া করে আসছিল। হয়তো লীলা একটা গঞ্জের মতো জায়গায় গাছের নিচে শুয়ে আছে। একটা পুঁটলি মাথায়। না খেয়ে না খেয়ে চোখে কালি পড়ে গেছে। চুল উসকোখুসকো। অথবা কোনো নির্জন নদীতীরে মেয়েটা আউল—বাউলের মতো কেবল হেঁটে যাচ্ছে। নানুর মনে কত রকমের যে কুচিন্তার উদয় হচ্ছে।

এবং তখনই সেই ঘরের সামনে সে হাজির। ভাঙা মাটির দেয়াল, খড়ের ছাউনি, কিছু কলাগাছ, একটা ছাগল খুঁটিতে বাঁধা, দুটো মোরগ ঘাড় বাঁকিয়ে ওকে দেখল, সে বাধ্য হয়ে গলাখাঁকারি দিল একটা। কেউ বের হচ্ছে না। সে এবার বলল, ধুলো দফাদার আছো? তবু সাড়া নেই। চারপাশে ঝোপ—জঙ্গল, পেছনে বাঁশের ঝাড় কেমন অত্যন্ত শ্রীহীন মানুষের আবাস। সে একটা গাছের গুঁড়িতে অগত্যা বসে পড়ে ডাকল লীলা, লীলা।

এবার কেউ যেন সাড়া দিল। ঘরের ভেতর থেকে কারও গোঙানি আসছে। তাহলে কেউ আসছে। আর তখনই সে দেখল জঙ্গলের ভিতর থেকে চার—পাঁচটা নগ্ন কচিকাচা ছেলেমেয়ে বের হয়ে আসছে। তাকে দেখেই চোখে ওদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। কলকাতায় নকশালবাবুরা সব গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি যদি তাঁদের কেউ হন। সে বলল, লীলা আছে? লীলা? ওর কথা শুনে ওরা যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে এসেছিল আবার তেমনি লাফিয়ে লাফিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তখনই মনে হল সে কোনো এক নারীকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে বনের গভীরে। সে বুঝতে পারল, লীলার কণ্ঠস্বর। ওর ভিতর থেকে কে যেন বলল, তখন, ভগবান লীলাকে আমি খুঁজে পেয়েছি। সে জোরে ডাকল, লীলা—লীলা।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই নারী এসে হাজির। মলিন বসন। চোখে অপার বিস্ময়।—তুমি দাদাবাবু?

কোথায় ছিলে? কখন থেকে ডাকছি।

শেয়াল মুরগি ধরে নিয়ে গেছে। খুঁজতে গেছিলাম।

ওর চারপাশে সেই কাচ্চাবাচ্চা। প্রায় দু গন্ডা, লীলার কোলে একটা সাত আটমাসের বাচ্চা। এরা কারা? এই প্রশ্নটাই নানুর মাথায় বিজবিজ করছিল।

তখন সেই নারী সুধা পারাবার বলল, দাদাবাবু, কেন তুমি এলে?

বারে কতদিন তোমাকে দেখি না। এখন আমাকে আগে এক গেলাস জল খাওয়াও তো।

একটা নিকেলের তোবড়ানো গেলাসে নানুকে লীলা জল এনে দিল। তারপর বলল, একী চেহারা করেছ শরীরের।

সব ঠিক হয়ে যাবে।

লীলা হাসবে কী কাঁদবে ভেবে পেল না। বাড়িঘরের এই দশা, কোথায় এমন পাগল মানুষটাকে যে সে বসতে দেবে। ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় লেপ্টে আছে তার জননী। জ্বর কতদিন থেকে। লীলাকে বলছে কে রে লীলা।

লীলা শুধু বলল, দাদাবাবু।

কোথাকার দাদাবাবু?

আমি যেখানে ছিলাম মা।

সহসা আর্তচিৎকারে সেই জননীর গলা ভয়ংকর হয়ে উঠল! তোর মরণ হয় না কেন রে, তোরে যমে দেখে না কেন রে, তুই আবার মরতে ফিরে এলি, কটা তোর বাপ আছে যে খাওয়াবে? দাদাবাবুর সঙ্গে পীরিত করতে গিয়ে তোর কাজ গেল রে। লীলা বলল, মা চুপ চুপ। দাদাবাবু খুব ভালো মানুষ।

সঙ্গে সঙ্গে কেমন জল হয়ে গেল লীলার মা। সত্যি বলছিস ভালোমানুষ। ভালোমানুষের বংশ তবে মারধর করে তোকে তাড়িয়ে দেয় কেন?

নানু বুঝতে পারল অভাবে অনটনে লীলার মার মাথাটি গেছে। সে ঘরে ঢুকে বুঝল, আসলে এটা মানুষের আবাসই নয়। খড় বিচালী সরে গিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। একদিকের মাটির দেওয়াল ধসে পড়েছে। এক কোণায় একটা তালপাতার চাটাইয়ে এক অস্থিচর্মসার রমণী পড়ে আছে। শুধু গলার আর্ত চিৎকারই সম্বল। নানু শিয়রে বসে বলল, ধুলো দফাদার কোথায়?

পাত্তা নেই। কোথায় থাকে, কী খায়, কেউ জানে না বাবু। আমার গতরে আর রস নেই।

নানু বলল, তোমার কী হয়েছে মা?

আমার মরণ অসুখ ধরেছে বাবা।

কিছুই হয়নি। তুমি দেখো ভালো হয়ে যাবে। তারপর লীলার দিকে তাকিয়ে বলল, ডাক্তার পাওয়া যায় না এখানে?

স্টেশনে আছে, সে তো অনেক দূর।

গাঁয়ের কাউকে পাঠাবে? টাকা দিচ্ছি সাইকেলে যদি যায়।

লীলার মা উঠে বসল। বলল, তুমি সাক্ষাৎ দেবতা বাবা। ভগবান আমার কপালে এত সুখ।

নানু বলল, উঠে বসো না। খুবই দুর্বল দেখছি। এবং লীলার একটা ভাই কোথাকার একজন খাকি প্যান্ট পরা মানুষকে নিয়ে এসে বলল, শ্রীহরিদা এয়েচে।

সে শ্রীহরিকে বলল, এই টাকা নাও। লীলার দিকে তাকিয়ে বলল, কী কী আনতে হবে বলে দাও। ঘরে তো কিছুই নেই মনে হচ্ছে। তারপর নানু শ্রীহরির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমিও রাতে এখানে খাবে।

সন্ধ্যার দিকে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে ডাক্তার এল। অষুধ এবং পথ্যি দিয়ে নানুর দিকে তাকিয়ে বলল, মহাশয়ের কোথা থেকে আগমন?

নানু বলল, কলকাতা থেকে।

সেই একবার কলকাতায় গেছিনু। কতকালের কথা! এখন চোখে ভালো দেখতে পাই নে। কোথাও যাই না।

নানু পাঁচটা টাকা দিলে অনন্ত মাঝি বলল, তিন পুরিয়া করে অষুধ থাকল। দিনে তিনবার। বার্লি আর কাগজি লেবু। ভালো খেলে শরীর সুস্থ হয়ে যাবে। সকালে ভাত দিতে পারেন কাল। শিঙি মাছের ঝোল হলে ভালো হয়। গাঁদাল পাতার ঝোলও দিতে পারেন।

তারপর ঘণ্টি বাজিয়ে চলে গেল ডাক্তার অনন্ত মাঝি। নানু উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল মাথার ওপরে আজ কতদিন পর মুক্ত আকাশ। লীলা চাল ডাল তেল বুঝে নিচ্ছে শ্রীহরির কাছ থেকে। শ্রীহরি বলল, বিড়ি আনলাম দাদাবাবু এক প্যাকেট। নানু বলল, বেশ করেছ। তোমার গাঁটা আমি দেখব শ্রীহরি। এবং তখনই লীলা বলল, দাদাবাবু তুমি থাকবে কোথায়?

নানু বলল, সে নিয়ে ভাববে না। উঠোনে একটা চাটাই পেতে দিয়ো। তাতেই হবে।

যেন কতদিন পরে নানু প্রবাস থেকে ফিরে এসেছে। আশ্চর্য মুক্তির স্বাদ। যেন নতুন জীবন শুরু হল। সে কোথাকার নানু, তার বাবা আত্মহত্যা করেছিল, মা একটা নতুন লাল বল পেয়ে তার কথা ভুলে গেল এবং সে কত যে অসহায় ছিল, এখন আর তা কিছুই মনে পড়ছে না। জীবন জুড়ে এক নতুন অস্তিত্বের আস্বাদ। লীলা এরই মধ্যে একটা ফুলতোলা আসন নিয়ে এল। নানুকে বারান্দায় বসতে দিল। এবং এত সংকোচ লীলার যে সে প্রায় সবসময়ই নির্বাক—নানুই যেমন একসময় বলল, আমি চান করব লীলা। অবশ্য এখানে আসার আগে তার মনে হয়নি রাতের পোশাক দরকার, জামাকাপড় আলাদা দরকার। সে এক জামাকাপড়ে এখানে চলে এসেছে। এখন এই রাতটা কাটাতে পারলে তার ভাবনা নেই। সকালে উঠে যেমন একজন গৃহীমানুষ সওদা করতে যায়, সে তেমনি কাল সওদা করতে যাবে। সঙ্গে লীলা থাকবে। এবং এমনই যখন ভাবছিল তখন লীলা বলল, দাদাবাবু পুকুরের জলে চান সইবে?

খুব সইবে। অর্থাৎ যেন বলার ইচ্ছা নানুর, তুমি এত সইতে পারো, আর আমি এটুকু সইতে পারব না।

লীলা বলল, তোমাকে কী পরতে দিই বলতো। কিছু নেই। আমার ধোওয়া শাড়িটা নাও। ওটা পরবে। নানু দেখল, তার দেওয়া একটা শাড়ি লীলা সুন্দর করে ভাঁজ করে রেখেছে সামনে। তারপর নানু চান করল পুকুরের জলে। ছোট ছোট দু'গণ্ডা ভাইবোন, কিছু লীলার বাবার, ধুলো দফাদারের—এ পঙ্গপাল বলা চলে, শহরের এমন ছিমছাম ভদ্রমানুষ দেখে সবসময় ব্যাকুল হয়ে আছে—কখন কী লাগবে এগিয়ে দেবার জন্য দু'গণ্ডা ভাইবোন মিলে নানুকে চান করাতে নিয়ে গেল। আকাশে তখন কিছু নক্ষত্র উঠে গেছে। পুকুরের জলে চান করে আশ্চর্য পবিত্র মনে হচ্ছে জগৎ সংসার।

লীলার পরের ভাইটা কোথা থেকে কলাপাতা কেটে নিয়ে এল। ধুলো দফাদারও কোত্থেকে খবর পেয়ে ভাত খাবার লোভে ছুটে এসেছে। লীলা এক হাতে খোলা আকাশের নিচে উনোনে রান্না করছিল। অদূরে একটা আসনে নানু বসে আছে। দু'গণ্ডা কাচ্চাবাচ্চা তাকে ঘিরে আছে। গাঁয়ের কেউ কেউ খোঁজখবর নিতে এল—নতুন মানুষটা কে? লীলা বলল, দাদাবাবু। এই পর্যন্ত। আর কিছু বলতে তার এই সময় ভারি সংকোচ হচ্ছিল।

নানু বলল, ও লীলা তোমার রান্নার আর কত দেরি? আমার খুব খিদে পেয়েছে।

তখন লীলা মুগের ডাল সম্ভার দিচ্ছে। মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, চাটনি। কলাপাতা সার সার পেতে দেওয়া—লীলার মুখ ঘামছে। উনুনের আলোতে লীলাকে কোনো সুদূর নীহারিকাপুঞ্জের মতো মনে হচ্ছিল, হাতে একগাছা করে কাচের চুড়ি। আহা লীলা জীবনে আর এত পবিত্রতা নিয়ে কখনও কিছু রাঁধেনি। মুগের ডালের চমৎকার গন্ধটা বাতাসে ম ম করছিল।

ধুলো বলল, তুমি এসেছ যখন দুদিন থেকে যাও। হ্যাঁ আমাকে কাল এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দেবে কিন্তু।

নানু বলল, আর কী চাই তোমার?

আমার খুব বাসনা ছিল একটা শান্তিপুরী ধুতি পরি!

নানু বলল, হবে।

লীলার ভাইবোনগুলো সমস্বরে বলে উঠল, আমার জামা চাই, আমার প্যান্ট চাই।

নানু বলল, হবে। হবে।

লীলা তখন ধমক না দিয়ে পারল না। এই গোবড়া, সন্টি, মন্তি, কালো, এদিকে আয়। দাদাবাবু তুমি অত আসকারা দেবে না। সুখের গন্ধ বড় গন্ধ। তখন লীলার মা পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে দরজায় বসে। চাঁদের হাট দেখছে। এবং বলছে, লীলা আমায় দুটো খেতে দিস।

নানু বলল, আজ না মা। কাল খাবেন। কাল মাগুর মাছ নিয়ে আসব। ঝোল ভাত। আজ আপনাকে বার্লিই খেতে হবে।

লীলার ভেতরে তখন ঝড় বইছিল। মানুষটার জন্য তার মায়ার শেষ নেই। অথচ সে বড়ই অভাগী। মনে হয় ছুঁয়ে দিলেই মানুষটার জীবনে তাদের মতো বিড়ম্বনা নেমে আসবে। সে ভাবল কাল যে করে হোক ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দেবে। এদের সে ভালো করেই জানে। দু'হাতে নানুবাবু টাকা ওড়ালে ধুলো দফাদারও বাড়ি থেকে আর বের হবার নাম করবে না। সংসারের এতবড় হাহাকারের জন্য দায়ী যারা তাদের সে ক্ষমা করতে পারে না। লীলা মনে মনে শান্ত হতে চাইল। স্বার্থপর কূট এই ধুলো দফাদার—মাকে ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে পাঁচ বাচ্চার জননী করে দিল। সে জানে বাবা বেঁচে থাকতে এত বিড়ম্বনা ছিল না তাদের জীবনে। বাবা বেঁচে থাকলে, তাকে একটা সুন্দর মানুষ দেখে বিয়েও দিয়ে দিত। এবং তখনই কেন যে মনে হল সুন্দর মানুষটা দেখতে ঠিক নানুবাবুর মতো হত। এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের আস্পর্ধার কথা ভেবে লীলা হতচকিত হয়ে গেল।

তখনই ধুলো মেটে হাঁড়িতে এক হাঁড়ি জল নিয়ে এল। গাঁয়ের শেষ মাথায় সরকারি নলকূপ থেকে ধুলো জল এনেছে। উৎসবে কেউ বসে থাকে না। সেজন্য জলটা কাঁধে করে নিয়ে এসেছে। এবং ভাঙা তোবড়ানো এনামেলের গেলাসে জল, কলাপাতায় গরম ভাত, এবং টুকরো কাগজি লেবু এবং বেগুন ভাজা। লীলা কোমরে আঁচল গুঁজে সবাইকে ভাত দেবার আগে নানুর পাতে সুন্দর করে ভাত বেড়ে দিল। সেই সময় নানু তাকাল লীলার দিকে, লীলা তাকাল নানুর দিকে—বড়ই সুখে নানুর বুক বেয়ে অজস্র কান্না অত্যধিক বেগে বের হয়ে আসতে চাইল। সে চোখ নামিয়ে নিল। ভাত মেখে খাবার সময় কেউ লক্ষ্য করল না—নানু গোপনে আজ কাঁদছে।

কুড়ি

সারারাত রাসবিহারী ভয়ংকর উচাটনের মধ্যে কাটিয়েছেন। নানু রাতে বাড়ি ফেরেনি। সকালে তিনি তবু একবার কী ভেবে দোতলায় নানুর ঘরে উঁকি দিয়েছিলেন, না নেই। দরজার শেকল তোলা। তিনি এখন কী করবেন বুঝতে পারছেন না। পুলিশে জানাবেন? অবনীশকে! আজকাল যত্রতত্র মানুষ খুন হচ্ছে। পুলিশ তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর মাঠে কিংবা নদীর পাড়ে লাশ ফেলে রেখে চলে আসছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে নরমেধ যজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। আর কার কাছে খবরটা দেওয়া যায়। ঘুম না হওয়ায় চোখ জ্বালা করছে। তিনি ধীরে ধীরে নেমে আসছেন সিঁড়ি ধরে। এখনও এ—বাড়ির কেউ জানেই না নানু রাতে বাড়ি ফেরেনি। কারণ নানুর ফেরার জন্য শেষ খাওয়ার পর কিছু কথাবার্তা থাকলে হেমর, অথবা হেম যদি প্রসন্ন থাকে, একটু পান জর্দা খাবার ফাঁকে পাড়ার কারও কারও বাড়ির গুপ্ত খবর দিতে যতটুকু দেরি কিংবা যাকে বলা যায় অপেক্ষা—ততটুকুই নানুর জন্য অন্য সবার চিন্তা। অন্য সব বলতে অবশ্য দু'জনই। হেম আর মিতা। এরা কেউ নানুর জন্য এর বেশি কোনো টান বোধ করে না।

হেমর ঘরের দরজা বন্ধ। ঘুম থেকে ওঠেনি। মিতার ঘুম ভাঙতে বেলা হয়। সবারই আলাদা ঘর। ঘরগুলির পাশ কাটিয়ে গেলেন—কাউকে ডাকলে না। খুব সকালে তিনি সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠেছেন—আকাশ ভালো ফর্সা হয়নি। সিঁড়ি ধরে নেমে করিডোর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় মনে হল, আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। ভিতর ঘরটা পার হলেই হেমর ঘর। তারপর তাঁর ঘর, শেষে বসার ঘর। হেঁটে যেতে যেতে তিনি বুঝতে পারছিলেন, আলাদা ঘরে থেকে সবাই ক্রমে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি কাচের জার থেকে খালি পেটে এক পেট জল খান। যৌবন থেকেই কনস্টিপেসান। যৌবন থেকেই এই জল খাবার অভ্যাস। ইদানীং তিনি সকালে পায়চারি করে ভালো ফল পেয়েছেন। জলটা খেয়েই পথে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ান এবং এক সময় তার ঠিক বাথরুমে যাবার সময় হয়ে যায়। তিনি আজকাল আরও একটি অভ্যাস গড়ে তুলেছেন। সকাল বিকাল বাথরুমে যাবার আগে সামান্য খৈনি মুখে দেন। এটি নিধুর দান। নিধুই তাঁকে শেষ বয়সে একটা নেশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তিনি হাতে সামান্য খৈনি পাতা এবং চুন কৌটা থেকে বের করে নিলেন।

আশ্চর্য এখন তাঁর এসব ভাববার সময় নয়। তিনি যে সারারাত ঘুমোননি, কেউ এটা টেরই পায়নি। ঘর বারান্দা লন এই সারারাত করেছেন। এখন তিনি ঢক ঢক করে জল খাচ্ছেন—যদি অবনীশের বাড়িতে নানু থেকে যায়, তবে ফিরতে সাতটা আটটা হবে। এই সময়টুকু তাঁকে অপেক্ষা করে দেখতে হবে। তারপরই কেমন তিনি সংসারের সবার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। যেন সবাই মিলে তাঁর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করছে। ষড়যন্ত্রটা এই নানুকে কেন্দ্র করে মনে হল তাঁর। এই বয়সে এত ভাবনা তিনি আর বইতে পারছেন না।

অথচ রাসবিহারীকে দেখলে মনে হবে না ভিতরে ভিতরে এতটা বিচলিত তিনি। নিধু বারান্দায় এসে ডাকল, বাবু।

রাসবিহারী বাইরে বের হয়ে এলেন।

কিছু বলবি?

দড়ি কিনতে হবে। টেপি দড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে।

কিনে আনবি।

নিধু চলে যাচ্ছিল। তিনি ফের ডাকলেন, কারণ কাল রাতে কেবল নিধুকেই বলা হয়নি। নিধু কাছে এলে বললেন, দাদাবাবু তোকে কাল কিছু বলে গেছে?

না ত।

ওতো রাতে ফিরে আসেনি।

কোথাও থেকে গেছে।

কোথায় থাকবে।

কেন তেনার জ্যাঠার বাড়িতে।

জানি না। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা। এত করে বলেছি পকেটে ঠিকানা রাখবি।

নিধু ঠিক বুঝতে পারছিল না, পকেটে ঠিকানা রাখলে কী হয়। সে চলে যাচ্ছিল।

রাসবিহারী বললেন, এই শোন।

নিধু কাছে এসে দাঁড়াল।

কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে?

কীসের গণ্ডগোল।

এই মানে...তারপরই মনে হল কতটা বিচলিত হলে এমন হয় এই প্রথম তিনি টের পেলেন। যেন সারা কলকাতা শহরের কোথাও গণ্ডগোল হওয়ায় ট্রাম বা বাস বন্ধ ছিল এবং সেজন্য নানু ফিরতে পারেনি। রাতে অবশ্য নিধুকে একবার ডেকে তুলে বলেছিলেন, পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাস চলছে কিনা দেখে আয় তো।

সে রাস্তা থেকে দেখে এসে বলেছিল, চলছে বাবু।

তারপর তিনি বলেছিলেন, ফোন করবেন। কিন্তু কাকে—তখন রাত বারোটা। সবাই ঘুমে মরে আছে। রিসিভার হাতে নিয়ে বসেছিলেন, পুলিশ বাদে আর কাকে এত রাতে ফোন করা যায়। তাঁর একবার মনে হয়েছিল, কাউকে করা যায় না। সবাই তাঁর উচাটনে বিরক্ত বোধ করবে। তিনি রিসিভার তুলে নামিয়ে রেখেছিলেন।

তাঁর মনে হয়েছিল, বেলঘরেতে মেজ—জামাইকে খবরটা দেওয়া দরকার। অরুণকে দেওয়া দরকার। এবং তাঁর মনে হয়েছিল, নানুর খুব রাত করে ফেরার অভ্যাস বলে মাঝে মাঝেই খুব বেশি বিচলিত হয়ে পড়লে এমন দরকারের কথা মনে পড়ছে তাঁর। এসব যখন ভাবতেন তখনই দেখতে পেতেন সদর খুলে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি লনে ঢুকছে। কালও ভেবেছিলেন, নানু ঠিক এসে যাবে। অনেক দূর পর্যন্ত তিনি অস্পষ্ট অন্ধকারে তাকিয়ে থেকেছেন—রাস্তায় কেউ ফিরলেই মনে হয়েছে, বোধহয় নানু আসছে। পাতা নড়লে মনে হয়েছে কারও ছায়া নড়ছে। কুকুর হেঁটে গেলে মনে হয়েছে, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আসছে কেউ। এবং এসব করতে করতেই রাতটা কাবার হয়ে গেল। সদর খুলে একবার তিনি একা রাস্তায় গিয়েও দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণ। কেউ আর ফিরছে না। সব বাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, বড়ই সৌভাগ্যবান এরা। এদের সবাই অন্তত আজকের রাতের মতো ফিরে এসেছে। তাঁর একজন এখনও আসেনি। তারপরই মনে হয়েছিল এত রাতে একা দরজা খোলা রেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। তিনি নিধুকে সঙ্গে নিতে পারতেন। কিন্তু নিধু ঠিক পরদিন হেমকে বলবে এবং নাতির দুশ্চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না ভেবে মুখ বেঁকিয়ে হাসবে হেম। কারণ নানু ওদের কাছে জাহান্নামে যাওয়া ছেলে। ইদানীং ওটা নানুর আরও বেড়েছে। এই বাড়ার মূলেও আছেন তিনি। বড়ই উভয় সংকটে পড়ে গেছেন রাসবিহারী।

তখনই মনে হল হেম দরজা খুলে বের হয়ে এসেছে। হেম এই সময় ঈশ্বরের নাম করতে করতে বের হয়ে আসে। হেম যে কার মঙ্গল প্রার্থনা করে রাসবিহারী ঠিক বুঝতে পারেন না। আসলে হেম নিজেরই জন্য প্রার্থনা করে বোধহয়। পৃথিবীতে এমন স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর রমণীর হাতে তাঁর জীবনটা কেটে গেল। পরজন্মে বিশ্বাস আছে বলেই রক্ষে। কিন্তু এতসব কথা কী তখন আর মনে থাকবে।

রাসবিহারীর একবার ইচ্ছে হল বলে, নানু ফিরে আসেনি। কিন্তু কী হবে বলে। তিনি খৈনিটা ঠোঁটের ফাঁকে ফেলে দিলেন। তারপর দেখলেন বীণা সদর দরজা দিয়ে ঢুকছে। বীণাকে ঢুকতে দেখেই বললেন, তোমাদের নানুবাবু কাল ফেরেননি।

কোথায় গেছেন?

কোথায় গেছেন তিনিই জানেন। তারপরই একটু থেমে বললেন, তোমাদের ওদিকে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে?

ন তো!

কিছুটা স্বস্তি। রাসবিহারী ফের বললেন, যা রাস্তাঘাট! রোজই কোথাও না কোথাও গণ্ডগোল।

বীণা বলল, কোথাও থেকে গেছে। বন্ধুবান্ধবের কাছে। খুব নিজের লোকের মতো কথাগুলো বলল বীণা।

ওরতো বন্ধুবান্ধবও নেই।

কেন ওই যে মানুবাবুর কথা বলে!

মানুবাবুরা কোথায় থাকে তুমি জানো?

এ বাড়িতে নানুবাবুর সঙ্গে বীণার তবু কিছু কথা হয়। রাসবিহারীর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা এবং মিতার সঙ্গে নানুবাবু খুব প্রয়োজনে কথা বলে থাকে। অথবা এক ধরনের জেদ দেখা দিলে মাথায় মিতাদির পেছনে লাগার স্বভাব নানুবাবুর। সে মাসে দু—মাসে এক আধবার। অন্যসময় নানুবাবু নিজের ঘরেই শুয়ে বসে কাটিয়ে দেয়। বই পড়ে, খবরের কাগজ পড়ে, কলেজ যায়, রাত করে ফেরে—জামাকাপড় কেচে দেয় বীণা, ঘর ঝাঁট দেয় বীণা, চা—জলখাবার দেয় বীণা—সুতরাং এ—বাড়িতে রাসবিহারীর পরই নানুর সঙ্গে বীণার সামান্য মধুর সম্পর্ক। সুতরাং মানুবাবুর কথাও তার জানার কথা থাকতে পারে। সে বলল, না বাবু।

কেমন বিরক্ত হলেন রাসবিহারী।

তোমরা কোনো খবরই রাখো না।

বীণার কাজ অনেক। এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুধু কথা বললে চলবে না। হেমর খুব পছন্দও নয় বাড়ির কর্তাব্যক্তি এভাবে সাতসকালে এত কথাবার্তা বলুক। রাসবিহারী বললেন, ঠিক আছে যাও।

আসলে রাসবিহারীর আশঙ্কা—যদি নানু গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে যায়, কিংবা জড়িয়ে যায়। যদি নানু আর না ফেরে—যদি নানু তার বাবার মতো কিছু একটা করে ফেলে। দুর্ঘটনার জন্য তিনি সবসময় নানুর পকেটে একটা ছোট চিরকুট রাখতে পছন্দ করেন। চিরকুটে ঠিকানাটা লেখা থাকে। যেখানেই দুর্ঘটনাটা ঘটুক খবর পেতে যেন দেরি না হয়। প্রথম প্রথম তিনি বলতেন, বুঝলে নানু, কলকাতার রাস্তাঘাট খুবই খারাপ। কাগজ খুললেই দেখতে পাবে দুর্ঘটনায় মৃত্যু। সঙ্গে একটা ঠিকানা রেখে দেবে সবসময়।

নানু হেসে বলেছিল, ওটা কী মৃতসঞ্জীবনী।

রাসবিহারীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, সবকিছু নিয়ে তোর ঠাট্টা।

তুমিই বল দাদু যদি ঘটেই যায়, ওটা আমার কতটা উপকারে আসবে।

আমাদের খবরাখবর পেতে হবে না। এমন বলতে গিয়ে সেদিন রাসবিহারীর মনে হয়েছিল—বড় স্বার্থপরের মতো কথাটা শোনাবে। তিনি আর তাকে কিছু বলেননি—শুধু বিকেলে তিনি সেদিন নানুর ঘরে বসে ওর বইখাতায় সর্বত্র এ—বাড়ির ঠিকানা লিখে রেখেছিলেন। অর্থাৎ কলেজ করে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে যেন ভাবনার নেই। খাতাটায় ঠিকানা লেখা আছে। পুলিশের চোখে, না হয় অন্য কারও চোখে এটা পড়বেই। এবং একটা সুন্দর ডায়েরিতে ঠিকানা লিখে নানুকে দিয়ে বলেছিলেন, ডায়েরি ব্যবহার করতে শেখো, সঙ্গে রাখতে শেখো। ভবিষ্যতে কাজে আসবে।

নানু কলেজে অথবা বাড়ির বাইরে বের হলেই রাসবিহারী ওর ঘরে ঢুকে দেখতেন, সঙ্গে ডায়েরিটা নিল কিনা। প্রশ্ন করলে এমন ট্যারা জবাব দেবে যে আর একটাও কথা বলতে ইচ্ছা হবে না। আসলে ওর মাথার মধ্যে সেই যে রেলগাড়িটা ঢুকে গেল আর বের হল না। নানুই বলেছিল, দাদু বিরক্ত করবে না। মগজের মধ্যে আস্ত একটা রেলগাড়ি ঢুকে আছে। রাসবিহারী ওর কথাবার্তার ধরন দেখেই বুঝতে পারেন কখন সেটা ঢুকে যায়, কখন সেটা বের হয়ে আসে। তিনি ওর টেবিল হাটকেই দেখতে পেতেন, লাল ডায়েরিটা টেবিলে পড়ে আছে। সঙ্গে নিচ্ছে না। মাঝে মাঝে সেজন্য চিরকূট রেখে দিতেন ওর জামা অথবা প্যান্টের পকেটে। একদিন নানু হেসে বলেছিল, দাদু তুমি বড় ভীতু স্বভাবের মানুষ। অথচ দাদু, তোমার মেয়েরা এক একজন কংকাবতী। এটা কেমন করে হয়।

রাসবিহারী ঢোক গিলে ফেলতেন। নানুর কথার জবাব দিতে পারতেন না। পারতেন না যে তা ঠিক নয়, পারতেন। তবে খুব রূঢ় শোনাত। এমনিতে মাথাটা গেছে, তার ওপর বাপের মৃত্যুর জন্য দায়ী আসামিদের এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কী যে হবে! এবং তখনই তিনি হেঁকে উঠলেন নিধু—নিধু, দেখত কাগজ দিতে এত দেরি করছে কেন!

নিধু রাস্তার দিকে চেয়ে বলল, আজ্ঞে আসবে। সময় হয়নি বাবু।

তিনি এখন কী যে করেন! বাথরুমেও ঢুকতে পারছেন না। যদি কাগজটা এসে যায়। কাগজটা পড়লে তিনি কিছুটা স্বস্তি পাবেন। কোনো গণ্ডগোলের খবর থাকলে কাগজে ঠিক থাকে। সে শহরের যেখানেই ঘটুক। এই কাগজটা পড়ার পর চিন্তা করবেন, কোথায় কীভাবে খোঁজখবর নেওয়া যায়।

এবং কাগজটা এলে প্রথমেই সারা পাতায় তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কাগজে একটাও মৃত্যুর খবর নেই। শুধু কিছু নিরুদ্দেশের খবর আছে। এই কলমে নানুর একটা ছবি মাপতে হবে। যা একখানা বাড়ি, নানুর ছবিও হয়তো সময়কালে ঠিক হাতের কাছে পাওয়া যাবে না। আর তখনই মিতা হাই তুলতে তুলতে ঘর থেকে বের হয় আসছে। সামনে মিতাকে দেখেই তিনি কাগজটা সরিয়ে রেখে বললেন, হ্যাঁরে নানুর ছবি আছে বাড়িতে?

এই সাতসকালে বাবা নানুর ছবির কথা জিজ্ঞেস করায় খুব অবাক হয়ে গেল মিতা। সে বলল, কেন নাতির বিয়ে ঠিক করেছ নাকি।

রাসবিহারী বুঝতে পারেন সবকিছুর মূলে হেম। মেয়েরাও ঠিক তাকে সমীহ করে না। এ ছাড়া এই বাড়িতে নানুকে জায়গা দেবার পর থেকেই সবাই কেমন তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন,

আছে কী না বলো। বিয়ে দেব কী দেব না সেটা আমি বুঝব।

তুমি রেগে যাচ্ছ কেন বাবা?

এমন কথা তোরা বলিস। জানিস কাল রাতে নানু ফেরেনি। কেমন ছেলেমানুষের মতো নালিশ জানালেন যেন রাসবিহারী।

মিতা দেখল তার বাবা, তার বাবা রাসবিহারী, শ্যামলা রঙের দোহারা চেহারার মানুষ। চোখে নিকেলের চশমা। হাতে কাগজ। দুশ্চিন্তায় চোখের নিচে কালি। তিনি ধুতি পাট করে পরে আছেন। তাই পরে থাকেন। এবং তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। বাবার জন্য বুকটা মিতার ভিতরে কেমন গুড় গুড় করে উঠল। এমন শূন্য দৃষ্টি সে বাবার চোখে কখনও দেখেনি। বলল, বাবা ও ফেরেনি, ফিরবে।

কখন আর ফিরবে।

মিতা খুব যেন বয়সি মেয়ে হয়ে যাচ্ছে। তার আর হাই উঠছিল না। সে বাবার পাশে বসে বলল, তুমি সেজদিকে বরং লিখে দাও, সে যেন তার ছেলেকে নিয়ে যায়। ওর জন্য তোমার আয়ুক্ষয় হচ্ছে বাবা।

রাসবিহারী মনে মনে এ—কথাটা সত্য ভাবেন। যদি বুড়ো বয়সে এই উটকো ঝামেলা ঘাড়ে এসে না চাপত তবে তিনি আরও কিছু বেশিদিন বাঁচতেন। হেমর নিষ্ঠুরতার জন্যও একসময় তাঁর এ কথাটা মনে হত। দীর্ঘদিন সয়ে সয়ে ওটা ভুলে গেছিলেন। নানু আসার পর থেকে আবার সেই আয়ুক্ষয়টা চলছে এমন মনে হল তাঁর।

দুপুরেই রাসবিহারী সব আত্মীয়স্বজনকে ফোনে জানালেন, নানু কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি। পুলিশে খবর দেওয়া হবে কিনা এটা যেন বসে সবাই ঠিক করে। কারণ রাসবিহারী এখন আর একজন উঠতি যুবকের দায় নিজের ঘাড়ে একা রাখতে সাহস পাচ্ছেন না। কোথাও গিয়ে নানু যদি আত্মহত্যাই করে বসে তবে আবার একটা কেলেঙ্কারি। এখন বসে ঠিক করা দরকার কী করা হবে।

প্রথমে তিন জামাইয়ের অফিসে ফোন, তারপর অবনীশের অফিসে। রাসবিহারী বললেন, আমি রাসবিহারী বলছি।

অঃ তাওইমশাই ভালো আছেন? নানুকে একবার দেখতে যাব ভাবছিলাম, কিন্তু আপনাদের মেয়ের শরীরটাতো ভালো না, রাস্তায় চলাও আজকাল ভেরি রিসক। কখন কোথায় কারা পুলিশ খুন করছে, স্কুলে আগুন দিচ্ছে, বিদ্যেসাগর মশাইর মুন্ডু উড়িয়ে দিচ্ছে—কী অরাজক অবস্থা—বাড়ি থেকে বের হতেই ভয় করে। ইয়েস অ্যানাদার কোয়েশ্চান হচ্ছে নানুর মা চিঠি দিয়েছে? আমরা তো অনেকদিন পাইনি। নানুর ব্রেন ভেরি ব্যাডলি অ্যাফেকটেড। ওটাও ওর মাকে জানানো দরকার। আপনার কী মনে হয়?

যাক তবু কথা শেষ করল। তিনি জানেন, তাঁর এই আত্মীয়টি হরবকত কেবল কথা বলে! কথা বলতে আরম্ভ করলে শেষ করতে চায় না। ভদ্রতা বোধটা পর্যন্ত গেছে। অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় রাসবিহারী বললেন, নানু কাল রাতে ফেরেনি।

মাই গড। হোয়াট হেপেনড!

কী হেপেনড আমি জানিনা। তোমাকে জানানো দরকার তাই জানালাম। ফোন নামিয়ে রাখবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু ও—প্রান্ত থেকে গলা সরু করে সে অজস্র কথা বলে যাচ্ছে—নাথিং কেন বি ডান। বলুন আপনি কী করতে পারেন। আমাদের সামাজিক স্ট্রাকচারটা ভেঙে না ফেললে কিছু করা যাবে না। নানু এই সামাজিক স্ট্রাকচারের এগজামপল।

রাসবিহারী অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন—কিন্তু কথা শেষ না হলে ছাড়েন কী করে!

আমরা ওকে সামারিলি ডিসমিস করে দিয়েছি। নো হোপ। যত পড়ান আই মিন, ডে বিফোর ইয়েসটারডে নানু কেম টু মাই হোম, অঃ হো নো নো, নট ডে বিফোর ইয়েসটারডে। ইট ইজ অন সিকসটিনথ। এসেই আমাদের মেড—সারভেন্টের ঠিকানা চাইল। সব তো বলা যায় না। স্ক্যান্ডাল। পারিবারিক স্ক্যান্ডাল।

রাসবিহারী যেন কোনো সূত্র খুঁজে পাচ্ছেন—তিনি অধীর গলায় বললেন, বল বল তারপর কী!

তারপর স্ক্যান্ডাল! বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় এটা হবেই। ইট মাস্ট হেপেন।

রাসবিহারী জানেন, এখনই ঠিকমতো ধরিয়ে দিতে না পারলে, তাঁর এই পরম আত্মীয়টি কথার সূত্র হারিয়ে ফেলবে। তিনি বললেন, নানু কবে গেছিল তোমার ওখানে যেন?

সিকসটিনথ।

কী বলল নানু যেন?

বলল লীলা কোথায়?

লীলা।

আমাদের মেড—সারভেন্ট। আমরা বাড়ি থাকি না, নানু মাঝে মাঝে বাড়ি না থাকলে চলে আসত। তারপরই যেন দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, আফটার অল উই লিভ ইন সোসাইটি। সব করা যায় কিন্তু সোসাইটির ভ্রূকুটিকে সামারিলি ডিসমিস করা যায় না।

রাসবিহারী ভাবলেন, এই রে আবার অন্য নৌকায় উঠে পড়তে চাইছে। প্রায় তিনি ঠ্যাং চেপে ধরার মতো বললেন,

নানু কী বলল?

বলল, লীলা কোথায়?

সে কোথায়?

ওকে তো আপনাদের মেয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। নানু ইজ আওয়ার কমপ্লিটলি লস্ট বয়। কী বলব, পারিবারিক কথা, মেয়েটা নেই জেনে নানু আপনাদের মেয়েকে খুন করবে বলে শাসিয়ে গেছে। বাট দিস মার্ডার ইউ থিংক হাউ আগলি টক। সমাজব্যবস্থা কতটা জাহান্নামে যেতে বসেছে ভাবুন। তুই তোর মাতৃসমাকে একথা বলতে পারলি। তোর কী এই শিক্ষা হল। তুই প্রীতিশের ছেলে, আর তুই আমার ভাইপো হয়ে জেঠিকে খুন করতে চাস!

রাসবিহারী এত সব কিছুই জানতে চান না। নাতির জন্য তাঁর মধ্যে যে উদ্বেগ ছিল, সেটা যেন কিছুটা প্রশমিত হচ্ছে। হয়তো নানুর আরও খবর ওর জেঠা এখন দেবে। তিনি বললেন, তারপর ও কোথায় গেছে জান?

কী হবে জেনে! হোয়াই আই স্যাল ফিল এনি ইনটারেস্ট—আপনি বলুন, ইফ ইট উড বি ইয়োর কেস আপনি কী করতেন!

রাসবিহারী বললেন, সত্যি। কী করব বলো কোথায় ফেলি! তোমাদের ওখান থেকে কোথাও যাবে কিছু বলেছে?

ইয়েস যাবে বলেই নানু ক্লাইমেকসে এসে গেল। বলল, ঠিকানা না দিলে খুন করব।

কার ঠিকানা?

আর কার সেই মেয়েটার।

তোমরা ওকে ঠিকানা দিয়েছ?

না দিয়ে উপায়। খুন হওয়ার চেয়ে ঠিকানা দেওয়া কত সহজ কাজ বলুন। এট লাস্ট উই গেভ দ্য অ্যাড্রেস।

ভালো করেছ।

ভালো করিনি বলুন। যদি খুন হয়ে যেত, তবে আবার পুলিশের ঝামেলা, কোর্ট কাছারি, উই হ্যাভ টু সুট এ কেস এগেইনস্ট হিম।

রাসবিহারী বুঝতে পারলেন, ফোনে এত কথা হয় না। তবে নানু মেয়েটির ঠিকানা নিয়ে চলে যেতে পারে কারণ সে তার টাকাপয়সাও বুঝে নিয়েছে, এ অবস্থায় রাসবিহারীর আপাতত কিছু করার নেই। এখন জামাইদের নিয়ে এ বিষয়ে কিছু একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা দরকার। এই বয়সে আর এত উদ্বেগ বয়ে

বেড়াতে পারছেন না। তারপরই মনে তিনি কেমন প্রশান্তি বোধ করলেন। নানুর মধ্যে ভালোবাসার জন্ম হচ্ছে। ভালোবাসা শব্দটি কতদিন পর বড় প্রিয় শব্দ মনে হল তার। কাজ করতে করতে আর সংসার করতে করতে হেমর সঙ্গে একসময় সব মানুষের মতো ভালোবাসা শব্দটি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সব বিস্তারিত জানা দরকার। ফোনে সব শোনা যায় না ভালো করে। তিনি অবনীশকে বললেন, বিকেলে আমার তিন জামাই আসবে। বিষয় নানু। যদি তুমি আসো খুব ভালো হয়। তোমাদের পরামর্শ এখন আমার খুবই দরকার। যদিও রাসবিহারী জানেন, এই মানুষটির কাছে তার পরামর্শ চাইবার মতো কিছু নেই, কিন্তু নানুর জেঠু এই স্বত্বাধিকারে পরামর্শ করা বাঞ্ছনীয়। পরে যেন কোনো অনুযোগের ভাগী হতে না হয়। রাসবিহারী ফোন ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলেন, তখনই আশ্চর্য কান্না কান্না গলা অবনীশের—আই ক্যান সেড টিয়ার্স ফর নানু বাট আই ক্যান ডু নাথিং মোর। সো হোপলেস আই অ্যাম তাওইমশাই।

তুমি এসো।

যাব।

তারপরই রাসবিহারী মিতাকে ডেকে বললেন, নানুর কিছুটা খোঁজ পাওয়া গেছে। ওর জেঠু বলল সব। নানু আমাদের হাতের বাইরে চলে গেল। কিন্তু ঘটনাটা কী মেয়েকে বললেন না। লজ্জা বোধ করলেন। তারপরই মনে হল কলঙ্ক। একটা ঝি—মেয়ের জন্য নানুর মতিভ্রম হবে তিনি কখনও এমন ভাবেননি। কিন্তু ভালোবাসা শব্দটি কতদিন পর মাথায় এসেছে। এটা মাথায় এলে নানু কখনও আর আত্মহত্যা করতে পারে না। রাসবিহারী সহসা আশ্চর্য রকমের হালকা বোধ করলেন কথাটা ভেবে। তিনি প্রায় লাফিয়ে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যেতে থাকলেন।

একুশ

দুপুরে প্রচণ্ড জোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ভুবনবাবু জানালা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়লেন। দিবানিদ্রার অভ্যাসটি নীরজারই দান। খাওয়া হয়ে গেলেই নীরজাকে দেখা যাবে তার ঘরের বিছানার চাদর ঝেড়ে বিছানা ঠিক করে দিচ্ছে। মানুষটা শোবে। যত বিশ্রাম পাবে মানুষটা তত বেশিদিন বাঁচবে। তার শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় থাকবে ততদিন। তাছাড়া ভুবনবাবুর আগে যাবারও একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছে নীরজার মনের মধ্যে রয়েছে। তালে কত সতী লক্ষ্মী প্রমাণের তার আর কিছু বাকি থাকে না। পাশ ফিরে শোবার সময় ভুবনবাবু মুচকি হাসলেন। মানুষের কত রকমের যে ইচ্ছে থাকে।

আর তখনই মনে হল রাসবিহারীবাবুর মেয়ের কোষ্ঠি নিয়ে যতীন সেন আজ আসবে। এই মানুষটি তাঁর দেশের মানুষ। যতীন সেনের বাবাও ভালো জ্যোতিষী জানতেন। ভুবনবাবুদের সব কোষ্ঠি ঠিকুজি তাঁরই করা। এ দেশে এসে যতীন সেন বাবার বিদ্যেটা তুলে দেয়নি। এল. আই. সি—তে ভালো কাজ করে। আর সকাল সন্ধ্যা এই পুণ্য কাজটাও সেরে বেড়ায়। যতীন সেন এ কাজটাকে ভারি পুণ্য কাজ ভেবে থাকে। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গেলে খুব নিষ্ঠা আছে কাজে। যতীন সেনের কিছু কিছু কথা ফলেও ভুবনবাবুর জীবনে। বিশেষ করে নীরজা জ্যোতিষ বলতে এক যতীন সেনকেই বোঝে। সবরকমের কাজকর্মের পরামর্শে যতীন সেনকে প্রায়ই এ বাড়িতে আসতে হয়—তাছাড়া কিছুক্ষণ ফেলে আসা দেশ—বাড়ির গল্প করতেও ভালোবাসে যতীন সেন। এলে সহজে আর উঠতে চায় না। নীরজাকে সবসময় বউদি বউদি করে। আজ যতীন সেন আসবে বলেই নীরজা মানদাকে দিয়ে আলাদা মিষ্টি আনিয়ে রেখেছে। এই সব সাতপাঁচ ভেবে ভুবনবাবুর হাই উঠছিল, ঘুম এল না। উঠে বসলেন, বাইরে বের হয়ে দেখলেন বেলা বেশি গড়ায়নি। তিনটে বাজে। আর কী যে হয় আজকাল, কেউ আসার কথা থাকলেই ঘুমটুকু আর আসে না চোখে। আজকাল মাথাটাকে তিনি আর ফাঁকা রাখতে পারছেন না কিছুতেই। মানুটা সারাদিন বাড়িতেই থাকে না। কোনো দিন দুপুরে খেতেও আসে না। নানুর সঙ্গে আজকাল নতুন নতুন মুখ দেখা যায়। ওরা কারা! মানুকে বলে, এক কথা, ওরা বন্ধু। ব্যস ওই কথা—কেমন ছেলে, কোথাকার ছেলে, কার ছেলে, বংশমর্যাদা কী এসব আর

তিনি জিজ্ঞেস করতেই সাহস পান না। যতীন সেন এলে এবারে সাফ সাফ বলবেন। দেখতো আর কত দেরি মানুর কাজের। একটা কাজটাজে ঢুকে গেলে বাঁচি যতীন। পড়াশুনা যখন হবে না তুমি গুণে বলে দাও না—এ বছরের মধ্যে ওর কোথাও কিছু হবে কিনা?

যতীন সেন এর আগেও বলেছে সময় হলেই হবে।

সময়টা কবে হবে আর। এবারে তিনি একটা নির্দিষ্ট সময় চান। তা ছাড়া আজকাল ভুবনবাবু পাথর—টাথরে বিশ্বাস জন্মে গেছে। রাহুর অবস্থান খারাপ বলে তিনি একটা বেশ বড় আকারের গোমেদ ধারণ করেছেন। রমাকে যতীন সেন একটি মুনস্টোন পরতে দিয়েছে। এতে ভুবনবাবুর মনে হয়েছে—সংসারে কিছু শান্তি ফিরে এসেছে এবং বেশ উন্নতিরও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভানুকে অবশ্য কোনো আংটি ধারণ করার ব্যাপারে এখনও রাজি করতে পারেননি। পরস্ত্রীর প্রতি টানটা ক্রমশই মনে হচ্ছে বাড়ছে ভানুর। এজন্য তিনি নিজেই দায়ী। বয়েস হলে বিয়ে দিতে হয়। শরীর তো অবুঝ! তার একটা কিছু চাই।

এবং এ সময়েই তিনি নিচে সিঁড়িতে কারও শব্দ পেলেন। যতীন সেন হতে পারে ভেবে তিনি করিডোর ধরে হেঁটে গেলেন। তারপর সিঁড়ির দরজা খোলার মুখে দেখলেন অন্য একজন কেউ। লোকটাকে তিনি চেনেন না। শুধু বললেন, কী চাই?

ভুবনবাবু আছেন?

আমি ভুবনবাবু।

চিঠি দিয়েছে।

কে?

যতীন সেন।

দেখি।

ভুবনবাবু চিঠি না খুলেই বললেন, ভিতরে আসুন।

আমি আর বসব না। তিনি আসতে পারলেন না। কোথায় একটা তাঁর মিটিং আছে। বড় গোছের নেতা—তিনি ভোটে দাঁড়াবেন। মনোনয়নপত্র দাখিল করার জন্য দিন দেখবেন। যতীন সেন আজ সেখানেই গেছেন।

ভুবনবাবু বললেন, বেশ। কবে আসবে কিছু লিখেছে কিনা ভেবে তিনি চিঠিটা খুললেন। লোকটি দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, আচ্ছা যাই।

ভুবনবাবু এক হাতে চিঠিটা রেখে অন্য হাতে দরজা ঠেলে দিলেন। চশমা না হলে তিনি কিছুই দেখতে পান না। বারান্দায় এসে বসার আগে টেবিলের ওপর থেকে চশমা প্রথমে নিলেন।

তারপর বাইরে এসে চিঠি খুলতে অবাক। বিরাট একটা ফুলস্কেপ পাতায় মাত্র দুটো লাইন লেখা। রাজযোটক—আপনি এ—বিয়েতে অমত করবেন না। মেয়ের কর্মফল খুবই ভালো। এত ভালো রাশিফল আমি অনেকদিন হাতের কাছে পাইনি। বিশেষ অসুবিধা থাকায় যাওয়া হল না। ইতি—আপনার বিনীত যতীন সেন। সঙ্গে মেয়ের কোষ্ঠি ভাঁজ করা খামের মধ্যে। সেটা তিনি একবার খুলে দেখলেন। বয়স বাইশ। বাইশ বয়সটা এ—কালে মেয়েদের খুবই কম বয়েস। তাঁর মনে হল, বয়েসটা আরও বেশি হলেও ক্ষতি ছিল না। ভানু আগামী মাঘে ত্রিশ পার হয়ে যাবে। এবং তাঁর মনে হল, অনেকটা বয়েস ভানুকে তিনি আটকে রেখেছেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন, একুশে। চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম তিনি টের পেয়েছিলেন, একজন বালিকার শরীরে আশ্চর্য সুঘ্রাণ। তাঁর বয়সে যদি ভানু এটা টের পায় তবে পাক্কা ষোলোটি বছর তিনি ভানুকে এভাবে বন্দি করে রেখে ভালো কাজ করেননি। জীবনে ষোলোটা বছর কম কথা না। মানুষ যদি সময়ে আহার না পায় তবে সে গোপনে কিছু করবেই। তিনি এজন্য ছেলেমেয়েদের খুবই কম বয়সে বিয়ের পক্ষপাতী। এবং এসব ভাবনার সময়ই সহসা দেখতে পেলেন, তাঁর আত্মজা কিশোরী রমা সবে তখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেছে। শাড়ি পরছে কতকাল আগে থেকে যেন। সংসারে তিনি সবার সামনে বিরাট বাধা।

তিনি নীরজা উভয়ে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন—কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। আসলে মেয়েদের এবং ছেলেদের সব গোপন ইচ্ছেগুলি তাঁদের চোখের ওপর নিদারুণ হয়ে দেখা দিলে তিনি ডাকলেন, নীরজা, নীরজা।

নীরজা কাছে এলে ঠিক যেমন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, সেভাবে তাকিয়ে থাকলেন ভুবনবাবু। নীরজা তুমি বুঝছ আমি কী ভাবছি! নীরজা, আমার ছেলেরা বড় হয়ে গেছে কবে, মেয়ে বড় হয়ে গেছে কবে—ওদের শরীরে কবে বান এসে গেছে অথচ ওরা এতদিন ঠিক আছে কী করে—না কী কিছুই ঠিক নেই—সবাই গোপনে খাওয়া—দাওয়া ঠিকমতোই করে যাচ্ছে।

নীরজা বললেন, তোমার যে আজকাল কী হয়েছে!

কী হবে আবার?

ডাকলে কেন?

এতক্ষণে মনে হল, তিনি নীরজাকে আসলে একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলেন। নীরজার বিয়ে হয়েছিল তেরো বছরে। নীরজার সঙ্গে তাঁর মনে আছে শুভ—রাত্রিতেই সবকিছু জানাজানি হয়ে গেছিল। এবং তেরো বছরের মেয়ের মনে যে ভয় থাকার কথা ছিল, অর্থাৎ তিনি ভাবছিলেন হাত দিলে মেয়েটা ঠান্ডা মেরে, অথবা ভয়ে সরে শোবে এমন সব কিছু ভেবে যখন হাত রাখতে গেলেন —তখন আশ্চর্য নীরজা চিত হয়ে শুয়েছিল। তিনি পাশে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে নীরজা চোখ বুজেছিল। তিনি হাত দিলে নীরজা ভয়ংকর উদ্যমশীল হয়ে পড়েছিল। তেরো বছরটা কত মারাত্মক একজন মেয়ের পক্ষে ভুবনবাবু সেদিনই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। এবং গভীরে প্রবেশ করতে যদিও দু'চারদিন সময় লেগে গেছিল—কিন্তু তেরো বছরের বালিকা হিক্কা—ধ্বনি তিনি যেন এখনও কান পাতলে শুনতে পান। রমার বয়স বাইশ। তেরো এবং বাইশের মধ্যে কত পার্থক্য। এই বয়সটা রমা পার করে দিয়েছে—বড়ই পবিত্র চোখ মুখ মেয়েটার অথচ শরীরে নীরজার মতো কষ্টটা তার যাবে কোথায়?

তিনি বললেন, মানু কোথায়?

মানু তো ঘরেই ছিল।

ভুবনবাবু ডাকলেন, মানু আছিস?

মানুর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

নীরজা বলল, আবার বোধহয় বের হয়েছে।

কোথায় যায়! তারপরই কী ভেবে বললেন, তুমি দেখেছ কী সব বই—টই ঘরে নিয়ে আসে মানু?

কী বই?

ওর ঘরে ঢুকে মাঝে মাঝে দেখো।

তুমিই তো দেখেছ।

তুমি মা। তোমার দেখা খুব দরকার।

নীরজা বলল, আমাকে এজন্য ডেকেছিলে?

ভুবনবাবু এবার যথার্থই যেন মনে করতে পারলেন না কীজন্য নীরজাকে ডেকেছিলেন। নীরজা চলে গেলেই মনে হল তিনি আজ জানতে চেয়েছিলেন নীরজা ঠিক কত বছরে একজন মানুষের সঙ্গ কামনা করেছিল। বয়েসটা কী আট সাত না দশ। কোনটা। মেয়েরা কত বয়সে একজন পুরুষকে ঠিক নিতে পারে। একজন পুরুষের কথা তিনি জানেন, সেটা তিনি নিজে। চোদ্দো থেকে পনেরোয় মনে হয়েছিল, একজন মেয়ের শরীরে আশ্চর্য সুঘ্রাণ। তিনি সে সুঘ্রাণ পাবার জন্য প্রায় ষোলোতেই পাগল পাগল বোধ করতেন।

তিনি এবার ঘরে ঢুকে বললেন, নীরজা আমাকে চাবিটা দেবে।

তিনি আলমারির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। নীরজা হয়তো শুনতে পায়নি। আবার ডাকলেন, নীরজা চাবিটা দেবে?

মানদা ঘরে ঢুকে বলল, মাকে কিছু বলছেন?

চাবিটা দিতে বল।

নীরজা এই অবেলায় চাবি দিয়ে কী হবে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বের হব নীরজা।

কোথায় যাবে?

রাসবিহারীবাবুর বাড়িতে।

সেটা কোথায়?

ঢাকুরিয়ার কাছে। ঠিকানা চিঠিতে আছে। কত নম্বর বাসে যেতে হবে তাও লেখা আছে।

সেই সম্বন্ধের ব্যাপারে?

হ্যাঁ।

বারে তুমি একা যাবে কেন। কী যে তোমার বাই। রমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। প্রিয়নাথ ঠাকুরপো আছে তাকে সঙ্গে নাও। তা ছাড়া খবর দেবে তো দেখতে যাচ্ছ। খবর না দিয়ে যায় নাকি।

আমার অন্য কাজ আছে নীরজা।

নীরজা বললেন, জানিনা। যা খুশি করো।

সবই বড় দেরি করে ফেলেছি।

এতদিনে বোধোদয়। বলে ঠোঁট বাঁকাল নীরজা।

নীরজা, তুমি আমাকে একদম মান না।

মানার কাজটা সারাজীবন ধরে কতটা করেছ?

আমি কিছুই করিনি। তুমি আমাকে আর আগের মতো ভালোবাস না।

বুড়ো বয়সে ঢং হচ্ছে।

বুড়ো হলে কী মানুষের কোনো ইচ্ছে থাকতে নেই?

ইচ্ছে থাকবে না কেন। ইচ্ছের কী শেষ আছে।

ভুবনবাবু বললেন, আমি আজই যাব। যদি চাবি না দাও, এভাবেই চলে যাব।

নীরজা বাধ্য হয়ে একবার মানুর ঘরে উঁকি দিলেন। মানু বের হয়নি। আসলে সে দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে। সে আজকাল কোথাও বের হলেও দরজায় তালা লাগিয়ে যায়। নীরজা জানালায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, মানু দেখ তোর বাবা কী আরম্ভ করেছে। কিন্তু মানু সাড়াশব্দ না করায় চেঁচিয়ে ডাকলেন, ও মানু তোর বাবা কী করছে উঠে দ্যাখ।

মানু পাশ ফিরে শুয়ে বলল, বাবার কী হয়েছে?

কী হবে আবার। উঠে দেখতে পারো না।

মানুর মনে হল বাবার কিছু একটা হয়েছে। বড় আর্ত গলা মার। সে দৌড়ে বের হয়ে এসে দেখল, বাবা আলমারির সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন।

সে মাকে বলল, কী হয়েছে?

কী জানি! এখন বলছে কোথায় মেয়ে দেখতে বের হবে।

ভুবনবাবু কেমন অপরাধীর গলায় বললেন, তোমাকে বলেছি আমি মেয়ে দেখতে যাচ্ছি?

তবে কী করতে যাচ্ছ?

আমার অনেক কথা আছে বুড়ো মানুষটার সঙ্গে। বলেই তিনি ফের চাবিটার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন।

মানু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। আজকাল প্রায়ই সে দেখছে মায়ের সঙ্গে বাবার খিটিমিটি চলছে। এসব সময়ে সে প্রায়ই চুপচাপ থাকে। আর দিদির জন্য মাথায় যে তার একটা শিরঃপীড়া আছে সেটা তখন কেন জানি চাগিয়ে ওঠে। সে গুম মেরে যায় তখন।

ভুবনবাবু বললেন, অনেকদিন আমার সঙ্গে কোনো বুড়ো মানুষের দেখা হয় না নীরজা। আজ আমি আমার সমবয়সি একজন মানুষের কাছে যাব। কথা বলব। কথা বললে বুঝতে পারছি মনটা হালকা হবে।

কী যে বলে মানুষটা! আজকাল প্রায়ই এমন সব কথা বলে যাতে করে বড়ই অপরিচিত লাগে মানুষটাকে। এতদিন যাকে নিয়ে ঘর করেছে সে যেন এই মানুষ নয়। সে ছিল অন্য মানুষ। যত দিন যাচ্ছে তত নীরজার কাছে ভুবন নামে একটা পৃথিবী আলগা হয়ে যাচ্ছে। নীরজা বাধ্য হয়ে বলল, প্রিয়নাথ ঠাকুরপো আছে। ওঁর বাড়িতে যাও। সেও তো তোমার বয়সি মানুষ।

প্রিয়নাথ! ভুবনবাবু দু'বার প্রিয়নাথ নামটি উচ্চারণ করলেন। মেয়েদের কবেই বিয়ে হয়ে গেছে। প্রিয়নাথের। ছেলের মৃত্যুর পর সে বোধহয় আরও হালকা হয়ে গেছে। সংসারের মায়া মমতা তার এখন কাকলীকে নিয়ে। কাকলীর বয়সে নীরজাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। এ—সময়ে প্রিয়নাথের সঙ্গে দেখা হলে কাকলীর কথা তিনি বলতেন। প্রিয়নাথ, কাকলীর ভিতরে কষ্টের উদ্রেক হচ্ছে এটা তুমি যত সত্বর টের পাবে তত মঙ্গল হবে সংসারের। এবং তখনই প্রিয়নাথের বিধবা পুত্রবধূর কথা তাঁর মনে হল। এমন কাম ও যৌবন নিয়ে প্রিয়নাথের বিধবা পুত্রবধূই বা দিন কাটাচ্ছে কী করে । ভানু আর কতদিন। অথবা যে সংশয়টা মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে সত্যি নাও হতে পারে। প্রিয়নাথ জীবিত থাকতে ঘরের মধ্যে কোনো ব্যাভিচার চলবে সেটি বিশ্বাস করাও পাপ। তিনি বললেন, চাবিটা দাও নীরজা। আমি যাব।

নীরজা আর না পেরে চাবির গোছাটা ছুড়ে দিল। যা খুশি করো।

মানু আর থাকতে না পেরে বলল, কোনো খবর থাকে তো দিন, আমি দিয়ে আসি।

যাবি তুই!

তোমরা যা করছ?

যদি যাস তবে আর আমি যাব না। চিঠি নিয়ে যা। ওদের দিনক্ষণ দেখে আসতে বলবি। আমরা পরে যাব। তুই যাবি আমাদের সঙ্গে?

মানুষ সোজাসুজি বলল, না।

ঠিক আছে, আমি রমা তোর মা আর প্রিয়নাথ সঙ্গে যাবে।

ভুবনবাবু এবার কলম এবং প্যাড নিয়ে বসলেন। চিঠি লিখলেন, আপনার ছোট কন্যা মিতাকে দেখতে আমাদের অমত নেই। তবে প্রথমে আপনারা এসে দেখে যান। পরে আমরা যাব। পছন্দ হলে কথাবার্তা হবে। এই কয়েকটা কথা লিখে তিনি মানুকে চিঠিটা দিতেই, চিঠির উপর ঠিকানা দেখে মানু কেমন বিস্মিত হল। এই ঠিকানায় আজ তার এমনিতে যাবার কথা। নানু চলে যাবার আগে একটা চিঠি রেখে গেছে। চিঠিতেও এই ঠিকানা লেখা আছে। রাসবিহারী নানুর দাদু। সেই দাদুর কাছে মানুকে আজ তবে দুটো চিঠি নিয়ে যেতে হচ্ছে। একটা নিখোঁজ মানুষের চিঠি, অন্যটা বিয়ের চিঠি। সে ভাবল ভবিতব্য আর কাকে বলে?

তখন কাকলী বিছানায় শুয়ে। জানালা দিয়ে আকাশ দেখেছিল। বৃষ্টি হওয়ায় বেশ ঠান্ডা। সারাদিন পেটের নীচে আবার সেই ফিক ব্যথাটা সে টের পাচ্ছে। ব্যথাটা উঠলে কাকলী স্কুলে যায় না। স্নান করতে ভালো লাগে না। খেতে ভালো লাগে না। কেবল শুয়ে থাকে। মুখে একটা ক্লিষ্ট ছাপ থাকে। সে জানে ব্যথাটা সন্ধ্যার দিকে সেরে যাবে এবং তারপরই সে ঋতুমতী হবে আবার। মাস ছয়েক ধরে এমনই চলছে। এবং তার মাও টের পায় তখন ভিতরে মেয়েটা বড় হয়ে যাচ্ছে। গরম জলে তলপেটে সেঁক দিতে বলে। এবং সন্ধ্যার দিকেই কাকলী বাথরুমে ঢুকে গেল। মার কাছে থেকে সে কিছুই জেনে নেয়নি। সংসারে যে এটা হয়, এবং একেই নারীত্ব বলে আসছে মানুষেরা, অর্থাৎ কাকলী বুঝতে পারে সময় বড় সুসময়। তিন—চারটে দিন তার একটা গা ঘিন—ঘিন ভাব থাকলেও কেমন মনের মধ্যে একজন পুরুষের জন্য হাহাকার বাজতে থাকে। ভানুকাকা রাতে মার সঙ্গে এ বাড়িতে আসবে। সে বাথরুম থেকে বের হয়েই আয়নার সামনে দাঁড়াল। দাদু এখন নিচে নেমে যাবে। রান্নার মেয়েটা শুধু বাড়িতে। একা কাকলী এখন আয়নার সামনে। দরজা বন্ধ। জানালাও বন্ধ করে দিল কাকলী। আয়নার সামনে ফ্রক খুলে, বগলে পাউডার দেবার

সময় কেমন এক নীলাভ রঙের মধ্যে সে ডুবে যায়—শরীরের প্রতিটি অংশ বড় বেশি ফুটে বের হচ্ছে। সে শরীরের চারপাশটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল। পৃথিবীতে কোথাও কোনো অন্য কষ্টে আছে, কাকলীকে দেখে এখন আর এতটুকু বোঝার উপায় নেই। সে পাউডারের ব্রাশ আলতো করে মুখে বুলিয়ে কাজল দিল চোখে। খুব লম্বা কাজল চোখে সে নিজের সৌন্দর্যে কেমন মুগ্ধ হয়ে গেল। যেন কোনো যুবক এখন চারপাশে কেবল নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। কাকলী সুন্দর লেস দেওয়া ফ্রক গায়ে বের হয়ে রেকর্ড প্লেয়ারে একটা আশ্চর্য মিউজিক দিয়ে দিল। সে খুব নিভৃতে মিউজিকের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে দেখল, ভানুকাকার সঙ্গে এক বড় সবুজ মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। ভানুকাকা তাকে ক্রমে একটা অজগরের মতো পেঁচিয়ে ধরছে। ভিতরে প্রচণ্ড উষ্ণতার জন্ম হচ্ছে। শরীর কাঁপছে থির থির করে মুখ কাঁপছে প্রতিমার মতো। সে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। তার ঘুম চলে আসছে।

মানু চিঠির নম্বরটা মিলিয়ে দেখল—না, সে ঠিকই এসেছে। সামনে সুন্দর লন, পাঁচিলের পাশে কিছু গন্ধরাজ কাঠ—মালতীর গাছ। গেটে সবুজ বোগেন—ভেলিয়ার ঝাড়। নানুর দাদুর রুচি আছে।

লন পার হলেই দোতলা বাড়ি। ওপরের ঘরগুলিতে একটাও আলো জ্বলছে না। সেটা যেন নিচের ঘরগুলিতে পুষিয়ে নেওয়া হচ্ছে। নিচের ঘরগুলোতে বেশ মানুষজনেরও ভিড়। এ—বাড়ি থেকে একটা ছেলে উধাও হয়ে গেছে এত আলো জ্বলতে দেখে সেটা আদপেই অনুমান করা যায় না। প্রায় উৎসবের মতো বাড়িটা। নিচের ঘরে সে রাস্তা থেকে মানুষজনের চলাফেরা টের পাচ্ছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে মানু ঝুঁকে দেখল, কাছে কেউ নেই—সে গেট খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, খুলছে না। কোথায় আটকে যাচ্ছে। গেট থেকে সোজা লাল নুড়ি বিছানো পথটা বারান্দায় সিঁড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। নানু ওর সঙ্গে দেখা করে বলেছিল, এই চিঠিটা তুই দিয়ে আসবি। চিঠিটাতে নানু লিখেছে, দাদু আমি লীলাকে খুঁজতে যাচ্ছি। কবে ফিরব, কী ফিরব না ঠিক নেই। আমার জন্য তুমি চিন্তা করবে না। এবং এই চিঠি পৌঁছে দেবার ভার মানুর ওপর রেখে গেছে। আরও কত কথা বলে গেল নানু। সে একবার তার খোঁজেও এসেছিল। কিছু সমস্যার কথা বলার ছিল তখন। কিন্তু লীলা চলে যাবার পর তার নাকি মনে হয়েছে জীবনে তার একটিই সমস্যা—এবং সে লীলাকে আবার খুঁজে পেলেই সে সমস্যাটা মিটে যাবে। অদ্ভুত গম্ভীর রাশভারি ছেলে নানু—অথচ কাল ওকে খুব উদাস দেখাচ্ছিল। লীলা! কে এমন প্রশ্ন করেছিল মানু। জবাবে নানু বলেছে, লীলা কিশোরীর নাম। লীলা বড় সুন্দর নাম। শুনেই তোমার বোঝা উচিত মানু লীলা বড় ভালো মেয়ে। তারপর নানু সহসা গান গেয়ে ওঠার মতো বলেছিল ন...ব...নী...তা। আজকাল নানুর মনের মধ্যে পৃথিবীর কোনো সৌন্দর্য নাড়া খেলেই এমন একটা শব্দে সে তা প্রকাশ করতে চায়।

সে এবারে গেট খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। সন্তর্পণে সে হেঁটে যেতে থাকল। এ বাড়ির জন্য দুটো চিঠি তার হাতে। কোনটা আগে দেবে অথবা কোন খবরটা তার আগে দেওয়া উচিত। এ সময় সে বুঝে উঠতে পারল না।

বারান্দায় উঠতেই অবাক। চার পাঁচজন লোক খুব গম্ভীর মুখ করে বসে আছে। আর আশ্চর্য সে এখানে এসে দেখল অরুণদাও এ—বাড়িতে হাজির। সে কখনও অরুণদাকে ধুতি—পাঞ্জাবি পরতে দেখেনি। সে দেখেই সহসা ডেকে উঠল, অরুণদা তুমি!

বারান্দায় আবছা অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি দেখেই অরুণের মনে হল ভারী চেনা গলা। বুকটা ওর কেঁপে উঠল। সে বের হয়ে বলল, তুমি, কী ব্যাপার।

আপনি এখানে!

এই মানে...অরুণ আমতা আমতা করতে থাকল।

মানু বলল, এ—বাড়িতে রাসবিহারী রায় কে?

অরুণের ভিতরটা আবার কেমন ঘাবড়ে গেল। মানু কী তার সঙ্গে যে রমার সম্পর্ক আছে, গোপনে সে একটা কিছু করছিল, সে খবর এ বাড়িতে পৌঁছে দিতে এসেছে।

তখন রাসবিহারী বের হয়ে এলেন। কোথাকার কোনো উটকো লোক অথবা যদি কোনো দুঃসংবাদ বয়ে আনে কেউ সবাই কেমন তটস্থ ভঙ্গিতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলল, কাকে চাই?

রাসবিহারী রায় আছেন?

রাসবিহারী বলল, আমি রাসবিহারী।

চিঠি আছে। আগে সে বাবার চিঠিটা রাসবিহারীর হাতে দিল। বলল, আমার বাবার নাম ভুবনমোহন গাঙ্গুলী।

ভিতরে এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন! কে একজন যেন কথাটা বলতেই সে ওদের সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ঘরের দেয়ালে বিদ্যাসাগরের ছবি। সি. আর. দাশের ছবি, নেতাজীর ছবি এবং গান্ধীজীর ছবি। এইসব ছবি কোনো বাড়িতে দেখলেই মনে হয় মানুর মানুষগুলো ভালো নেই। অথবা ভালো না থাকতে পেরে বড় মানুষদের দোহাই দেবার জন্য ছবিগুলিকে সাক্ষী রেখেছে। ওর তখন ঠোঁট কুঁচকে যায়। আপনারা বেশ মাছের তেলে মাছ ভাজছেন মশাইরা। সে চিঠিটা হাতে দিয়ে বলল, বাবা নিজেই আসতেন। কিন্তু ওঁর শরীর ভালো না। আমরা আসতে দিইনি।

অরুণ এখন একেবারে অপরিচিতের ভঙ্গি করে বসে আছে। এবং মুখগুলি দেখেই মনে হল ওরা কোনো গোপন শলাপরামর্শ করছিল এতক্ষণ। ওর মতো একজন মানুষের আগমনে ভেস্তে গেছে। সে বলল, বসব না। বলেই আর একটা চিঠি যখন বের করতে যাবে তখন হা হা করে উঠলেন রাসবিহারী। সে কী সে কী। তুমি এসেই চলে যাবে কেন বোস। মানু বলল, আরও একটা চিঠি আছে। আপনাকে দিতে বলেছে।—ও আমাদের বাসায় কাল সকালে গেছিল। চিঠিটা আপনাকে দিতে বলেছে।

প্রথম চিঠিটা পড়ে শেষ করেছেন মাত্র—তারপরই নানুর চিঠি। রাসবিহারী মাথার মধ্যেও নানুর মতো একটা রেলগাড়ি ঢুকে যাচ্ছে। এই প্রথম বুঝতে পারলেন, তিনিও ইচ্ছে করলে আস্ত একটা রেলগাড়ি মাথার মধ্যে ঢুকতে দিতে পারেন। সবটা ঢুকে গেলে চোখ মুখ কিছুটা অস্বাভাবিক লাগল দেখতে। অবনীশ তখন চিৎকার করে উঠল, সর্বনাশ, তাওওইমশাই আপনার চোখ দেখছি নানুর মতো হয়ে যাচ্ছে। নানু কী লিখেছে?

রাসবিহারী বললেন, নানু লীলার খোঁজে চলে গেছে। নানু নিরুদ্দেশ।

রাসবিহারী তারপর মানুর দিকে তাকিয়ে বললেন, নানু তোমার সঙ্গে বুঝি পড়ে?

মানু বলল, হ্যাঁ। পড়ে।

নানু আর কিছু বলে যায়নি?

না। আমি যাই।

বোসো বাবা। ভিতরে এসে বসো। এখুনি যাবে কী!

তিনি ফের বললেন, অরুণ দেখতো অমলা কী করছে। তোমার মাকে বলো, ওকে একটু মিষ্টি দিতে। কত সব সুখবর আজ আমার। আমার কী হবে। তারপর অরুণ উঠে যেতে চাইলে মানু বলল, অরুণদা বাইক এনেছ? তোমার গাড়িতে যেতাম।

অরুণকেও চেন!

অরুণদা আমাকে চাকরি দেবে বলেছেন, না অরুণদা।

অরুণ বোকার মতো তাকিয়ে থাকল। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। কোনো শব্দই কানে যাচ্ছে না।

রাসবিহারী বাহবা নেবার জন্য, অর্থাৎ দেখো আমি কত বড় মানুষের শ্বশুর বোঝানোর জন্য যেন বললেন, অরুণ আমার জামাই। এরাও জামাই। আর এই হল নানুর জ্যেঠু অবনীশ। ইয়েস বয়, তোমাকে নানু কী বলেছে ফের ফিরে আসবে?

চিঠিতে তো তেমন কিছু লেখা নেই।

আই মিন এনি ডিসকাসান?

মানু বলল, না। ওর ডিসকাসান করার বাড়তি সময় হাতে ছিল না।

তারপর মানুর কেন জানি মনে হল এই মুখগুলি সব মুখোশ পরা। সে রাসবিহারীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তাহলে যাই।

আরে না না। বোস। আমরা শিগগরিই খবর পাঠাব কবে যাচ্ছি।

মানুর মনে হল, টাক মাথার লোকটা আবার বোধহয় ডিসকাসানের কথা তুলবে। আসলে নানু তাকে যা বলেছে খুবই সংক্ষিপ্ত। যা পরিচয় তাতে নানুর এর চেয়ে বেশি বলারও কথা নয়। সে রাস্তায় দাঁড়িয়েই চিঠি দিয়েছে। একবার মাঝে খুঁজে গিয়েছিল, পায়নি। এবং সেজন্য তার কোনো অনুযোগই নেই। নানুর সঙ্গে একদিন দিদিরও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। নানুর দিদির সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। দিদি যে খারাপ হয়ে গেছে নানু কী সেটা টের পেয়ে গেছিল!

তখন অরুণদা খুব ভালো মানুষের মতো রাসবিহারীকে বলল, বাবা, মানু আমার খুব পরিচিত। ওদের বাড়ির সবাই। মিতার সঙ্গে ভানুবাবুর বিয়ে হলে বেশ মানাবে। ভানুবাবু মানুষটিও খুব ভালো। সংসারের প্রতি বড়ই কর্তব্যপরায়ণ।

কী আশ্চর্য আমি এত সবের কিছুই জানতাম না।

মানু কী বলবে ভেবে পেল না। সে কেবল বলতে পারত, অরুণদা তুমি দিদিকে নিয়ে বাইকে কতদূর যেতে চাও! কিন্তু কিছুই না বলে সে দেয়ালে বিদ্যাসাগরমশাইর ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর একটু মিষ্টিমুখ। সে যতক্ষণ ছিল, 'ওর আর নানু সম্পর্কে একটা কথাও বলেনি। মিতার সম্বন্ধের ব্যাপার আর এ বাড়ির এক ছেলে গতকালই নিরুদ্দেশ। তাও একটি ঝি—মেয়ের জন্য। আর সেই খবর বয়ে এনেছে ছেলের ছোট ভাই। এসব ভেবেই হয়তো ওরা নানু যে তাদের আত্মীয় হয় তা আর দ্বিতীয়বার মুখ ফুটে বলতে চাইল না।

বাড়িতে ফিরে মানু নিজের ঘরে কিছুক্ষণ বসে থাকবে ভাবল। কারণ সে আজ তার বাড়ির জন্য দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা মা এবং দিদির জন্য বিশেষ করে। অরুণদা নানুর মেসো। অরুণদাকে নিয়ে বাবার অনেক স্বপ্ন। ভালো জামাইর জন্য একটা বয়সে বাপেদের বড় দুর্ভাবনা। মেয়েকে যে এত বড় করা তা একজন ভালো সুপাত্রের কাছে ভোগের নিমিত্ত তুলে দেওয়া। ভোগের নিমিত্ত কথাটিই তার মনে হল। রাসবিহারীবাবু ভোগের নিমিত্ত একজনকে বড় করে তুলেছেন ঘরে। ভানুবাবু ভোগের নিমিত্ত। দিদির নিমিত্ত হয়তো এতদিনে অনেকবারই হয়ে গেছে। দিদি এখন শুধু এঁটো বাসন। পড়ে থাকলে কেবল মাছি ভন ভন করবে।

বাড়ি ফিরলেই বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কীরে দিয়ে এলি?

সে বলল, হ্যাঁ। তারপর মানুর আর কিছু বলতে ইচ্ছা হল না। দাদা এখনও বাড়ি ফিরে আসেনি। দিদি শুয়ে গল্পের বই পড়ছিল। মাথার কাছে রেডিয়োতে রবীন্দ্রসংগীত। দিদির মুখ ভারী উৎফুল্ল ছিল। দাদার বিয়ের চিঠির কথা শুনেই সে লাফিয়ে উঠেছিল। তারপর আঁচল ঠিক করে বাবার ঘরে হাজির। —কবে আমরা দেখতে যাব?

মানু সহসা কেন জানি ছোটলোকের মতো তখন চিৎকার করে উঠল, তোমায় যেতে হবে না।

রমা অবাক। মানু কখনও এভাবে কথা বলে না। বাবা অথবা মার সঙ্গে ঠান্ডা কথাবার্তা মাঝে মাঝে বলে থাকে। মাথা গরমও করে থাকে মাঝে মাঝে। কিন্তু তার সঙ্গে মানু সব সময় বেশ সহজ হয়ে কথা বলে। মানুর জামা—প্যান্ট হাতখরচা সবই রমা দেয়। ছোট ভাইটির জন্য তার ভারি মমতা। অরুণদাকে সে ধরে রেখেছে—ঠিক কিছু একটা হয়ে যাবেই। হায় সেই মানুর চোখ বাঘের মতো হয়ে যাচ্ছে কেন। রমা তাকাতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে।

বাবা বললেন, আজকাল যে তোদের কী হয়েছে বুঝি না। একটুকুতেই রেগে যাস। রমা গেলে কী হবে!
মানু ভাবল, সত্যিতো দিদি গেলে এমন কী অনিষ্ট হবে। দিদিকে জানতেই হবে সব। বাবা—মাকেও। তারপর আর বোধহয় বাবা এ—বিয়েতে রাজি থাকবেন না। মেয়ের জামাইবাবুর খবরে বাড়ির সবার সংশয় দেখা দিতে পারে। সে এবার বলে ফেলল, বাবা মেয়েটি অরুণদার আত্মীয়।
নীরজা বলল, তাই নাকি। ওমা আমরা তো তা জানি না।
মানু বলল, মেয়েটি অরুণদার স্ত্রীর ছোট বোন।
ভুবনবাবু বললেন, অরুণ মানে অরুণের কথা বলছিস তো!
তাই বলছি। বুঝতে এত কষ্ট হচ্ছে কেন?
সবার মুখ কেমন থম মেরে গেল। মা দিদির দিকে তাকিয়ে কী যেন আঁচ করার চেষ্টা করল। তখন দিদি সরল গলায় বলল, অরুণের স্ত্রী আছে বলে কী হয়েছে?
ভুবনবাবু শুধু বললেন, কিছু হয়নি। তারপর বারান্দার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অথবা বলা যায় ভুবনবাবুকে সহসা একটা বড় রকমের অন্ধকার সহসা গ্রাস করে ফেলল। রমা দেখল তার সামনে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই। সে কেমন একা নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। তারপর যেন জনান্তিকে বলা, একটা লোক বিয়ে করেছে বলে চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হয়ে যাবে! আমি তো জেনেই মিশছি। মানুর জন্য কী চেষ্টা করছে জানো!
রমা আবার কী বলতে যাচ্ছিল—ও—ঘরে মানু ফুল ভলিউমে রেডিয়ো ছেড়ে দিয়েছে। রমার কথাগুলি শব্দের মধ্যে অসংখ্য বুদবুদ তুলে তলিয়ে যেতে থাকল। এবং রাতে বাবা অসুস্থ বলে কিছুই খেলেন না। নীরজা কোনোরকমে দরকারি কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। পরদিন সকালে দেখা গেল মানু নিচে একটা লোকের চুলের মুঠি ধরে টেনে আনছে। লোকটা নীরোদবাবুর ড্রাইভার। সে গাড়ি চাপা দিয়ে কাউকে হত্যা করেছে। মোড়ের মাথায় হল্লা। গাড়ি ভেঙে দিয়েছে। এবং গাড়িতে আগুন দেওয়া হচ্ছে। দোষ, সে গাড়ি গ্যারেজ করতে গিয়ে দেখতে পায়নি পাশে কেউ বাচ্চা রেখে বাবুদের বাড়িতে কাজ করতে গেছে। ড্রাইভার না জেনেই একটা দু মাসের বাচ্চার বুকে গাড়ির চাকা তুলে দিয়েছে। রক্তাক্ত চাকার নিচ থেকে সেই শিশুর আর্তনাদ মানু শুনতে পাচ্ছিল। এবং সে জানে চুলের মুঠি ধরে এখন না নিয়ে এলে, ড্রাইভারকে সাহসী বিবেকবান মানুষেরা খুনই করে ফেলবে। সে নীরোদবাবুর ড্রাইভার অনিমেষকে আপাতত একটা ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। পুলিশের ভ্যান না আসা পর্যন্ত সে এখান থেকে নড়তে পারছে না।

বাইশ

নানুর সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল। এখনও সূর্য ওঠেনি। অথচ ঘুম ভেঙে গেল। এত সকালে ওঠার অভ্যাস কোনোদিন নেই। এবং সুনিদ্রা হলে যা হয়, নানু উঠেই আড়মোড়া ভাঙল, হাই তুলল। ছেঁড়া মাদুরের ওপর কারুকাজ করা কাঁথা লীলা পেতে দিয়েছিল। অর্থাৎ এত অভাবের মধ্যেও লীলার পরিচ্ছন্নতা বোধ খুবই তীব্র। ঘুমের এজন্য কোনোই ব্যাঘাত ঘটেনি। বরং কতকাল পর ঘুমের শেষে এক আশ্চর্য প্রশান্তি। সে দেখল, তরুলতার ফাঁক দিয়ে লাল সূর্য উঠে আসছে। আর চারপাশে তরুলতার সবুজ ঘ্রাণ, হালকা হলুদ রঙ। এবং একধরনের নির্জনতায় সে ডুবে যাচ্ছিল। বাড়িতে কেউ নেই যেন। গোবড়া সন্টি মন্তিরা গেল কোথায়, লীলা কোথায়! তখনই মনে হল সে কি কাল কোনো স্বপ্নের মধ্যে লীলাকে আবিষ্কার করেছিল। আসলে সে কি লীলার খোঁজ করতে করতে এক গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে! এসব মনে হতেই বুকটা গুড় গুড় করে উঠল। তখনই দরজার ভিতর কাশি শোনা গেল। লীলার মা কাশছে। সে অবাক হল, এমন কেন হয়, সবসময় লীলাকে তার এত হারাবার ভয় কেন! সে ডাকল, লীলা! লীলা!
লীলা দুধ আনতে গেছে বাবা।
দুধ দিয়ে কী হবে?
আজ্ঞে আপনি চা খাবেন না!

নানু জেঠুর বাড়িতে গেলেই বলত, চা করো লীলা। লীলা করতে পারত না। লীলার কষ্ট হত তখন। সে কী ভালোবাসে না বাসে লীলা এত টের পায় কী করে! লীলা তো তখন রান্নাঘর থেকে বের হতে চাইত না। ডেকে ডেকে সারা হতে হত। দাদাবাবুরা বোধহয় ভালো হয় না। লীলা এর আগে অন্য কোথাও কাজ করেছে কী না এখনও জানে না। ভাবল লীলা ফিরে এলে জিজ্ঞেস করবে—লীলা আমি কী খুবই খারাপ। আমি কী তোমাকে অসম্মান করব ভেবেছ! তারপর নানুর মনে হল লীলাকে আসলে এসব কথা সে কখনও বলতেই পারবে না। লীলাকে এসব বললেই মাথা নিচু করে রাখবে। এমনকি চোখ থেকে টস টস করে জলও ফেলতে পারে।

সে এবার বাইরে বের হয়ে এল। সত্যি মুক্ত আকাশ। যত দূরেই সে চায় দূরদিগন্ত প্রসারিত মাঠ সামনে। কেমন শস্যবিহীন, এবং অনুর্বর। লীলাদের বাড়ির তিন দিকেই আগাছা এবং জঙ্গল। সামনে সদর রাস্তা। দূরের গঞ্জে বোধহয় চলে গেছে।

তখনই ভিতর থেকে লীলার মার ক্ষীণ গলা পাওয়া গেল, ও গোবড়া গেলি কুথি! বাবাকে জল দে। হাত মুখ ধুবে বাবা।

নানু বলল, আমি দেখছি গোবড়া গেল কোথায়। আসলে নানু লীলার ভাইদের নাম এখনও ঠিক ঠিক জানে না। কোনটাকে লীলা গোবড়া বলে কাল রাতে ডেকেছে সে এখনও তা মনে করতে পারল না! পর পর লীলার চারটি ভাই। সব কটির রঙ শ্যামলা—চোখ বড় বড়, হাত পা কাঠি কাঠি। শুধু মাথাটা সম্বল করে এরা বেঁচে আছে। ছোটটা এত শীর্ণ যে জোরে কথা বলতে পারে না। তারপরই কোলে পর পর দুটো। একটা ঘরে আছে সে টের পেল। বাকিগুলির একটাও বাড়ির ত্রিসীমানায় নেই। ধুলো কাল খেয়েই চলে গেছে। বলেছে, আজ আবার আসবে খেতে। নানুকে বলে গেছে, বাবা আপনি থাকুন। নিজের বাড়ি মনে করে থাকুন। কথাবার্তায় এত সুন্দর যে মনেই হয় না লোকটার মনে কোনো পাপ চিন্তা আছে। এসব ভাবতে গিয়েই সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। শ্রীহরি লোকটিকেও তার ভালো লেগেছে।

নানু হাঁটতে হাঁটতে সদর রাস্তায় চলে এল। এই রাস্তাটাই গতকাল তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। একটা নদী পার হলে রাস্তাটা পাওয়া যায়। কিছু গ্রাম গঞ্জ পার হয়ে দুক্রোশের মতো ফাঁকা মাঠ। ফাঁকা মাঠের মাথায় এই গ্রাম! গ্রামটার নাম তার জানা ছিল। আবার দু ক্রোশ হেঁটে গেলে সামনে কোনো গ্রামটাম পাওয়া যেতে পারে। উত্তরে বিশাল একটা বনভূমি আছে বলে তার মনে হল। আসলে ওটা বনভূমি না অন্য কিছু এখনও ঠিক জানে না। লীলাকে নিয়ে সব একবার দেখবে ভাবল। কিন্তু লীলা সোমত্ত মেয়ে—তাকে নিয়ে ঘুরলে কথা হতে পারে। লীলার বড় ভাইটা যদি সঙ্গে থাকে অথবা শ্রীহরি, শ্রীহরিই তার যেন সহায়—সেই সব খবর দিতে পারবে।

লীলা দূর থেকেই দেখল দাদাবাবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। সে লোহারদের বাড়ি গেছিল দুধ আনতে। এ গাঁয়ে ওরাই এখনও দু বেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে পায়। অনেক জমিজমা—কিছু আবাদ হয় কিছু অনাবাদি। পুকুরে মাছ আছে গোয়ালে গোরু আছে। এখনও শ্যাম লোহার গাঁ ছেড়ে যায়নি। ওর অন্য ভাইরা শহরে চলে গেছে। পাটকলে কাজ করে তারা। লোহারদের সেজ বউ শহরের ইস্কুলের মাস্টারনি। সেই লীলাকে কাজ ঠিক করে দিয়েছিল। গাঁয়ের দুঃস্থ পরিবারগুলির ভরসাও এই লোহার পরিবার। সম্বৎসরই এই লোহার পরিবারকে ধরে কেউ না কেউ শহরে কাজ নিয়ে চলে যায়। লীলাকে নিয়ে গিয়েছিল লাবণ্য বউদি। নেবার সময় বলেছিল, মাকে, খাবে থাকবে সঙ্গে ত্রিশ টাকা মাইনা। পূজায় শাড়ি পাবে—কাজকর্ম বলতে তিনজন লোকের দেখাশোনা। এই কড়ারেই লাবণ্য বউদি লীলাকে নিয়ে গিয়েছিল। ত্রিশটা টাকা মার অনেক। ত্রিশ টাকায় এখনও এক মণ ধান পাওয়া যায়। এক মণ ধান লীলাদের সংসারে অনেক। এক মণ ধানের জন্য মা তাকে প্রায় বিক্রি করে দিয়েছিল। দাদাবাবুকে নিয়ে সে এখন কী যে করে! মানুষটা যেন এ—পৃথিবীরই মানুষ নয়।

লীলাকে দূর থেকে দেখেই নানু চিৎকার করে বলল, লীলা কী ফাইন। লীলাকে দূর থেকে বড় রহস্যময়ী নারীর মতো মনে হচ্ছে। লীলার হাতে একটা এনামেলের গেলাস। গেলাসটা হাতে নিয়ে বড় সন্তর্পণে হাঁটছে লীলা। সামনে পেছনে লীলার সেই সৈন্যবাহিনী—কেউ দৌড়ে আসছে, কেউ হেঁটে আসছে, কেউ লাফিয়ে আসছে। লীলা কাছে এসে বলল, তুমি দাদাবাবু হাত মুখ ধুয়ে নাও। তখনই নানু সামান্য থেমে বলল, গোবড়া কার নাম?

গোবড়া এগিয়ে বলল, আমি গোবড়া।

লীলার বড় ভাইটিকে নানু বলল, তুই একবার শ্রীহরিকে ডাকবি?

লীলা সামান্য হেসে বলল, ডাকতে হবে না। চায়ের গন্ধে ও এমনিতে চলে আসবে।

আর আশ্চর্য নানু দেখল, ঠিক চায়ের গন্ধে শ্রীহরি সত্যি চলে এসেছে। মুড়ি চা—প্রায় গোল হয়ে বসে গেল। খেতে খেতেই নানু বলল, শ্রীহরিদা, তোমাকে একটা কথা বলব?

বলেন বলেন। আজ্ঞে আপনি বলবেন না তো কে বলবে!

প্রথমে তুমি আমাকে এখানকার সব ঘুরিয়ে দেখাবে।

যথার্থ কথা। আজ্ঞে দেখাব।

তোমার তো একটা দেখছি ভাঙা সাইকেল আছে?

তা আছে দাদাবাবু।

ওটাতে দুজন যাওয়া যায়?

ও আমার পুরনো বান্দা। বড় বিশ্বাসী দাদাবাবু। —কোথায় যাবেন।

চম্পাহাটিতে।

কখন?

এখুনি বের হব।

লীলা বলল, দাদাবাবু রাতে তোমার ঘুমের কষ্ট গেছে। এখানে থাকলেই কষ্ট। তোমাকে বরং শ্রীহরিদা ট্রেনে তুলে দিয়ে আসুক।

নানু বলল, আমাকে চলে যেতে বলছ?

লীলা নিজের মাথা খেয়ে ভাবল, কেন যে এমন কথা বলতে গেল! মানুষটা এত ভিতর থেকে কষ্টের কথা বলে যে স্থির থাকা যায় না। মানুষটার মাথাও বোধহয় ঠিক নেই। মামিমা ঠিকই বলত, নানুটা পাগল হয়ে যাচ্ছে। তা না হলে এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় লীলার খোঁজে কেউ চলে আসতে পারে। সুস্থ মস্তিষ্ক হলে দাদাবাবু আর দশজন দাদাবাবুর মতো হতেন। সে নানুকে আর একটা কথা বলতেও সাহস পেল না।

তখন নানু কেমন ছেলেমানুষের মতো শ্রীহরিকে বলল, আচ্ছা শ্রীহরিদা তুমি আমাকে একটু থাকবার জায়গা দেবে? আমাকে কেউ কাছে রাখতে সাহস পায় না। কেন এটা হয় বলো তো! সবাই তাড়িয়ে দেয়।

এমন কথায় লীলার মুখ খুবই ব্যাজার হয়ে গেল। সে তবু শক্ত হয়ে থাকল। কোনো কথা বলল না।

শ্রীহরি বলল, আরে দাদাবাবু আপনি একটা মানুষ—একটা মানুষের ভাবনা কী বলেন। আমারে দ্যাখেন আমি একটা মানুষ, সেই কোন সালে বাপ গেল, মনে নেই, সেদিন মা চিঠি পেল—বড়ই ভাগ্যবান না হলে কপালে এত সুখ লিখা থাকে শ্রীহরির।

লীলা মাথা নিচু করে রেখেছে বলে, সে গোবড়াকে বলল, কীরে তোর দিদি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তুই কিছু বলবি না।

লীলার মা তখন ভিতর থেকে বলল, আপনি চলে যাবেন কীগো বাবা, ঝোল—ভাত খাব বলে বসে আছি। জিয়ল মাছের ঝোল। ও লীলা তুই কী রে—বাবা কি তোদের পর। না বাবা দু'দিন থেকে খেয়ে যান —লীলা কে এ বাড়ির! তুই কেরে আবাগির বিটি আমার বাবাকে তাড়িয়ে দিস!

লীলা বুঝতে পারে মানুষের স্বার্থপরতা কতটা হীন হলে এতটা নিচে নেমে কথা বলতে পারে মা। দাদাবাবু কিছুই বুঝবে না। দাদাবাবু তার মার এই লোভের দিকটা টের পেলে ভালো হত। আঙুল উঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, দাদাবাবু অভাবে আমাদের কারও মাথা ঠিক নেই। আমাদের মধ্যে থাকলে তুমিও মাথা ঠিক রাখতে পারবে না। তোমার যা আছে আমরা সব রাক্ষসের পাল দুদিনে শেষ করে দেব! তুমি আমাদের কত খাওয়াবে? শেষে মানুষটার দিকে চোখ তুলতেই লীলা কেমন সংকুচিত হয়ে গেল। যেন সত্যি মানুষটাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে অগত্যা বলল, তুমি যেন কোথায় যাবে বললে দাদাবাবু!

চম্পাহাটিতে যাব। কিছু মাছ টাছ, তোমার জন্য সায়া শাড়ি বলেই সে শ্রীহরির দিকে তাকাল। তারপর বলল, যদি আমি একটা ঘর করে থাকি তোমরা বাধা দেবে না তো কেউ?

শ্রীহরি বলল, কে বাধা দেবে। কত জায়গা পড়ে আছে। দিন দিন ঝোপঝাড় বাড়ছে, মানুষজন গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, পাঁচ কুড়ি টাকা দিলে আপনাকে এক কাঠা ভুঁই দেব দাদাবাবু!

নানু লাফিয়ে উঠল, সত্যি বলছ! এত সস্তা!

কেউ আসে না। জমিতে কিছু ফলে না। জল হলে কিছু হয়, না হলে সম্বৎসর অজন্মা। এ—পোড়া দেশে কে থাকে দাদাবাবু বলেন।

শ্রীহরির কথায় নানু হাতের কাছে যেন এক বড় আকাশ পেয়ে গেল। অনাবাদি থেকে থেকে ক্রমে খড়ের জমি হয়ে যাচ্ছে। লীলার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি তাড়িয়ে দিলে কী হবে। শ্রীহরিদা আমার আছে। আমি শ্রীহরিদার কাছে থাকব।

লীলা বলল, সেই ভালো। এখন যেখানে যাবে বলছিলে তাড়াতাড়ি যাও। ফিরতে বেশ বেলা হবে। শ্রীহরির দিকে তাকিয়ে বলল, শ্যাম লোহারের সাইকেলটা দ্যাখো পাও কিনা। তুমি চাইলে না করবে না। পেছনে বসে যেতে ওঁর কষ্ট হবে।

নানু বলল, আমার কষ্টে তোমার কী আসে যায়?

লীলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমার কেন আসতে যাবে, আমি আপনার কে?

নানু লীলার কথায় বিমর্ষ হয়ে গেল। লীলা আঘাত পেয়েছে। সে লীলাকে আঘাত দিতে চায় না। এখানে আসার পর সে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। এখন আর কেন জানি তার কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। সে তাড়াতাড়ি কথা ফিরিয়ে নিয়ে বলল, লীলা কিছু মনে করো না। তুমি আঘাত পাবে জানলে সত্যি এভাবে বলতাম না।

লীলার চোখ জলে ভার হয়ে গেল। এই মানুষটার মধ্যে কী যে আছে! কথায় কথায় আজকাল তার চোখে জল আসে। এমনটা তার আগে কখনও হত না। সাইকেল নিয়ে এলে শ্রীহরিকে লীলা বলল, তুমি একটা ভালো দেখে মাদুর নিয়ে এসো। বালিশ চাদর কিছু ঘরে নেই। রাতে আমি ভালো ঘুমতে পারিনি।

নানু বলল, তোমার আর কী লাগবে বলে দাও।

লীলা বলল, আমার? সামান্য হেসে বলল, যা বলেছি ঐটুকু মনে করে এনো। তা হলেই আমার সব হয়ে যাবে।

তারপর লীলা শাড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে উদ্ধব দাসের বাড়ি গেল। উদ্ধব দাসের বউ কামিনীর কাছ থেকে কোদালটা চেয়ে নিল। গোবড়া এবং সে মিলে বাড়ির আনাচে কানাচে যে ঝোপজঙ্গল ছিল সব সাফ করে ফেলল। মানুষটার মর্জি বোঝা ভার। কতদিন থাকবে, কে জানে। সাপের উপদ্রব আছে। এতক্ষণে মনে হল, একটা টর্চ বাতি আনতে বললে ভালো করত। চারদিক থেকে সে সতর্ক থাকতে চায়। পুকুরের জল সহ্য নাও হতে পারে। সে গোবড়াকে দিয়ে এক কলসি জল আনিয়ে নিল—এবং স্নান সেরে রান্নার জন্য উনুনে শুকনো খড়কুটো গুঁজে দিল। সন্টি মন্তিকে পাঠাল মাঠে, ওরা ছাগল দুটোকে ঘাস খাওয়াবার জন্য নিয়ে গেল। মোরগগুলি ঠুকরে ঠুকরে ঘাসের পোকামাকড় খাচ্ছে। ছোট বোনটা কাঁদছিল—একটু বাড়তি দুধ ছিল,

সবটা গরম করে খাওয়াল। শ্যাম লোহারকে বলতে হবে—এ' কদিন দুধের দরকার হবে। একটু বেশি দুধ চাই। বাবু মানুষের ছেলে দাদাবাবু। ভালোমন্দ খেতে অভ্যস্ত।

এখন কত সব এমন ভাবনা মাথায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে লীলার। বাপ ধুলো দুপুর হলেই চলে আসবে—এখানেই খাবে। সে বড় এনামেলের হাঁড়িটা চাপিয়ে মাকে বলল, এসো মাথাটা ধুয়ে দি। ওরা ফিরে এলে সময় পাব না!

রাস্তায় নানু বলল, শ্রীহরিদা এখানে চাষ—আবাদ বুঝি ভালো হয় না?

শ্রীহরি বেশ দ্রুত সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। পাশে নানু। বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দে শ্রীহরি নানুর কথা বুঝতে পারছিল না। সে নানুর দিকে তাকিয়ে বলল, আজ্ঞে আমাকে কিছু বললেন?

নানু বুঝতে পারছে আর জোরে তাকে কথা বলতে হবে। ওরা এখন পাশাপাশি যাচ্ছে—এখানে রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত। নানু প্রায় শ্রীহরির সংলগ্ন হয়ে এল—এখনও সে সাইকেল ভালোই চালায়, কতদিন সাইকেল চড়া অভ্যাস ছিল না, কতদিন পর আবার একটা সাইকেলে সে সকালের মাঠে বের হয়ে পড়েছে। সে বেশ জোরে বলল, শ্রীহরিদা এখানে চাষ—আবাদ কেন হয় না?

জল নেই। জল হলে সোনা ফলতে পারে।

নানু বলল, তুমি চাষ বোঝো শ্রীহরিদা?

ঐটাই সংসারে বুঝি দাদাবাবু।

তুমি নাকি পুলিশে নাম লিখিয়েছিলে?

ওরে ব্বাস, ও—কথা আর বলবেন নি!

কেন কী হয়েছে?

কাল রাতে লীলা যখন ওর বিছানা করে দিচ্ছিল, তখন শ্রীহরিদার সম্পর্কে অনেক খবর দিয়েছে। কোথাও গিয়ে থাকতে পারে না মানুষটা। গাঁয়ের টানে চলে আসে। ওর মামা পুলিশে কাজ করে—সেই বাউণ্ডুলে ভাগ্নেকে পুলিশে নাম লেখাতে বলেছিল। শ্রীহরিদা সাইকেল থেকে হাত তুলে হাওয়ায় দুলিয়ে বলল, আর যাচ্ছিনে ও লাইনে।

কোন লাইনে যাবে তবে?

ও একটা লাইন ঠিক ধরে নেব।

নানু বলল, আমারও যে একটা লাইন ধরতে হবে শ্রীহরিদা। খেতে হবে তো!

কী যে বলেন! শ্রীহরি খুব লজ্জায় যেন পড়ে গেছে নানুর এমন কথা শুনে। কোনো মরণে ধরেছে যে নানুবাবুকে লাইন ধরতে হবে! সে তো আর তার মতো উলটোপালটা লোক নয়। শ্রীহরি বলল, চম্পাহাটির ঘোষালরা খুবই অর্থবান লোক দাদাবাবু। ছোট ঘোষালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আমাকে খুব ভালো চোখে দেখে। সলা করলে দুটো একটা বুদ্ধি দিতে পারবে ছোট ঘোষাল।

নানু শ্রীহরির কথায় হেসে ফেলল। —কেন তুমি কোনো সলা দিতে পারবে না?

আমার কথা কে লয় দাদাবাবু। আমি একখানা আবার মানুষ!

নানু বলল, আমার একখানা ঘরের দরকার।

সে করে দেবনে।

কোথায় করবে?

লীলাদের বাড়িতেই দেবনে।

ওরা দেবে কেন?

শ্রীহরি বলল, আপনি দাদাবাবু পাগল আছেন।

ও—কথা কেন হরিদা! সবাই আমাকে পাগল ভাবে কেন?

আপনি আর থাকার জায়গা পেলেন না! এমন একটা আজাগাঁতে চলি এলেন! মাথায় খুন আছে!

নানু বলল, হরিদা আমি আর কোথাও সত্যি যাব না। মাথায় আমার সত্যি খুন আছে।
সত্যি বলছেন?
হ্যাঁ হরিদা।
শ্রীহরির কেন জানি এই বাবু মানুষটাকে বেশ ভালো লেগে গেছে। গতকাল গাঁয়ের সবাই খবরটা জেনে গেছিল। শ্রীহরিই বাড়ি বাড়ি বলে বেড়িয়েছে, লীলার দাদাবাবু এয়েছে। এই দাদাবাবুটি কে, এই নিয়ে গাঁয়ের কেউ কেউ টীকাটিপ্পনি কেটেছে। তবে এখন যা সময়কাল কার ঘরে কে আগুন দেয়। সব ঘরেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। খিদের আগুন। একটা লোকের দয়াতে ধুলো দফাদারের বিটি বউ ছানাপোনারা ভরপেট খাচ্ছে, এজন্য কোনো কোনো ঘরে কিছুটা হিংসার উদ্রেক হচ্ছিল। লীলার ভয় অন্য রকমের। পাঁচ রকমের কথার ভয় তো আছেই, তার ওপর এই দাদাবাবুর মর্জির কথাও সে জানে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ভয় পুতনা রাক্ষসীর মতো সেই বিশাল জীবটিকে, যার চোখের পলকে লীলার বুকের জল নিমেষে শুকিয়ে যেত। সে যদি চলে আসে। এবং এসেই যা করবে, দরকার হলে পুলিশ—টুলিশও নিয়ে আসতে পারে—এতসব ভয়ের মধ্যে সারাটা রাত লীলার কেটেছে—লীলা সারারাত ভালো ঘুমাতে পারেনি, এবং মনে হয়েছে দাদাবাবুকে যে করে হোক বুঝিয়ে সুজিয়ে ট্রেনে তুলে দিতে হবে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলে লীলার নিশ্চিন্তি। কিন্তু সকালে লীলা বলতে গিয়েই থেমে গেছিল। তেমনি শ্রীহরিও থাকা নিয়ে কোনো আর কথা বলতে পারল না নানুকে। রোদে শ্রীহরি ঘামছিল। দাদাবাবুর মুখটাও লাল হয়ে উঠেছে রোদে। সামনে রোদ পড়লে যা হয়। শহুরে মানুষের এত কষ্ট সহ্য হলে হয় শেষপর্যন্ত। নানুর সেসব কোনো হুঁশই ছিল না। দেখলেই বোঝা যায় বেঁচে থাকার এক প্রচণ্ড আবেগে সে টগবগ করে ছুটছে এখন। সে গুন গুন করে গাইছে..... ন—ব—নী—তা।

তেইশ

আজও নবনীতা ফোনের ডায়াল ঘোরাল। এ সময়টাতে কেউ বাড়ি থাকে না। এ—সময়টাতে আরতী মাসি ঘুমিয়ে থাকে। সে শুধু একা। ক'দিন স্কুল বন্ধ—কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার সিট পড়েছে স্কুলে। স্কুল ছুটি থাকলে দিনটা বড় দীর্ঘ মনে হয়! বিকেল বেলাটায় সে প্রতিদিনই ফোন করছে—কিন্তু আশ্চর্য একটাই জবাব, সে বাড়ি নেই। কোথায় গেছে বললে কিছু বলছে না। বাড়ির ছেলে কোথায় গেছে বলতে এত সংকোচ কেন নবনীতা বুঝতে পারে না। নানুদা বেটাছেলে, মেয়ে হলে এক কথা ছিল—একজন পুরুষমানুষের খবর দিতে ওদের এত দ্বিধা কেন নবনীতা বুঝতে পারে না। নানুদের বাড়ির নম্বর ঠিকানা কিছুই সে জানে না। ভাগ্যিস সে ফোনের নম্বরটা চেয়ে রেখেছিল। এবং এখন নবনীতার একটাই কাজ, যখনই একা থাকে, নিরিবিলি থাকে, রিং করে বলে, হ্যালো নানুদা আছে? নানুদা নেই! আবার হ্যালো, নানু আছে, নানু নেই। হ্যালো কে আপনি? আমি মিতা, আমি দাদু, আমি নানুর দিদিমা—নানুদা নেই কেন? কোথায় গেছে? কবে আসবে?
অপর প্রান্ত থেকে এক জবাব, জানি না।
কিন্তু আমার যে নানুদাকে খুব দরকার ছিল। ওকে বললেন আমি ফোন করেছিলাম। বলবেন কিন্তু। আমার নাম নবনীতা। ওর বাবার বন্ধুর মেয়ে আমি। আমার বাবার নাম....
ততক্ষণে ফোন ছেড়ে দিয়েছে। সে বাধ্য হয়ে আজ বাবার নামও বলল। কারণ সে যে বাজে মেয়ে নয়, সে খুব ভালো মেয়ে—বাবার নাম বলতেও যার কুণ্ঠা নেই কোনো, সে কেন নানুদা কোথায় জানতে পারবে না।
নবনীতা চুপচাপ রিসিভারটা হাতে নিয়ে বসে থাকল। বড় নিষ্ঠুর নানুদার আত্মীয়স্বজন। সে তো নানুদাকে খেয়ে ফেলবে না। বরং বাড়িতে ভয় নানুদাই তাকে খেয়ে ফেলবে। আসলে নানুদার চোখে এক আশ্চর্য মায়ার খেলা আছে। মানুষের বাবা আত্মহত্যা করলে বোধহয় এমনই চোখমুখ হয়ে যায়। কেমন চোখের

মধ্যে এক অতল গভীরতা। নবনীতা সব ভুলতে পারে—কিন্তু নানুদার চোখের অতল গভীরতার কথা ভুলতে পারে না। নানুদা ঠিকই বলেছিল, অনেক দাদা জুটে গেল তোমার নবনীতা। তবে আর ভাবনা কী। সত্যি এ বয়সে কী করে যে অজস্র দাদা জুটে যায়! দাদারা আজকাল বাড়িতে আসছে—তারা বেল বটস পরে চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা করে গোঁফ সরু করে তার দিকে চেয়ে থাকতে ভালোবাসে। এবং শরীরের সব পোশাক ভেদ করে দাদারা সবাই তার সব কিছু দেখতে চায় আজকাল। একজন দাদা তো একদিন একা পেয়ে জোরে জড়িয়ে ধরল, চুমো খেল। সে বাধা দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পেরে উঠল না। নিজের মধ্যেই কী যে থাকে! একটা ইচ্ছে ইচ্ছে ভাব সহসা শরীরে মাথাচাড়া দিয়ে যে উঠল আর তাতেই সে কাত হয়ে গেল। কিন্তু পরে সম্বিত ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দাদাটিকে ধিক্কার দিল। বলল, আপনি আমাদের বাড়িতে আর আসবেন না। এলে বাবাকে বলব, আপনি ভালো না। এ—ছাড়া নবনীতা অন্য দাদাদের কথাটা বলে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। সেই যে ভয় পেল দাদাটি, তারপর থেকে সত্যি আর এ মুখো হচ্ছে না। নবনীতার মনে হয়েছিল কাপুরুষ। পৃথিবীতে কারও কাছে এসব কথা বলা যায় না, আহাম্মকটা তাও যদি জানত।

যাই হোক নবনীতার দিন ভালো কাটছে না। স্কুল থেকে ফিরেই বলত নবনীতা, কেউ আমায় ফোন করেছে?

না তো!

কেউ করেনি!

না তো!

কোনো ফোন আসেনি!

বাবা রাত করে ফেরেন। বাবা মাঝে মাঝে নেশা করে বাড়ি ফেরেন। মাও সংসারে এত অঢেল সময় যে বাড়িতে একা বসে থাকতে পছন্দ করে না। মার বন্ধুবান্ধবরা মিলে একটা কাটা কাপড়ের এজেন্সি নিয়েছে পার্ক স্ট্রিটে। হাল ফ্যাশানের ডিজাইনের ফ্রক নানা জায়গায় চালান দিয়ে মার হাতে আজকাল অনেক পয়সা আসছে। মা বলেছে এখন আর ভাড়াবাড়ি নয়। নতুন ফ্ল্যাট। ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনসে। ওখানে উঠে গেলে নানুদার সঙ্গে জীবনেও আর তার দেখা হবে না। অন্তত উঠে যাবার আগে নানুদার ঠিকানা তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। নানুদা ফিরে এলে তাকে ফোন করলে অন্য কোনো নবনীতা জবাব দেবে। তার আগে সে একবার ভাবল এক্সচেঞ্জ থেকে খোঁজখবর নিয়ে জানার চেষ্টা করবে বাড়ির ঠিকানাটা কী। একবার সে বাবাকে দেখেছিল, এভাবে বাড়ির ঠিকানা পেতে। ঠিকানা পেলে কোনো দাদার সঙ্গে সে ঠিক ও—ঠিকানার পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আজকাল বাড়িতে খুব কড়াকড়ি চলছে। সেই যে নানুদার সঙ্গে গোপনে সিনেমা দেখে এসেছিল সেই থেকে। এ—বয়সে নাকি ছেলেমেয়েদের মাথা ঠিক থাকে না। যে—কোনো অসম্ভব ঝুঁকি জীবনে নিতে ভ্রুক্ষেপ করে না তারা। তাকে কোথাও যেতে হলে আরতী মাসিকে সব বলে যেতে হয়।

নবনীতা রিসিভারটা এবার রেখে দিল। খুব একা এবং নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে নিজেকে। কটা দিন তার বেশ হৈ—হুল্লোড়ের মধ্যে কেটে গেছে। বহরমপুরে বাবার মেসো থাকে। সেখানে দুদিন, গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়ার মধ্যেও ছিল আশ্চর্য আনন্দ। সবাই মিলে গাড়ি করে গিয়েছিল লালবাগ, তারপর নদী পার হয়ে খোসবাগ। সিরাজের কবরের পাশে সুন্দর মতো আমবাগান, সেখানে সবুজ ঘাস, ওরা ঘাসের ওপর বসে গরম ফুলকো লুচি মাংস খেয়েছে।

নানুদাটা যে কী—সঙ্গে থাকলে কী ক্ষতিটা ছিল!

এ—সময় মনে হল নবনীতার এ—বাড়িতে কেউ রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে দিয়েছে, নতুন দম্পতি একতলার বাসাটায় উঠে এসেছে। সঙ্গে একজন অফিসেরই বেয়ারা অথবা পিয়ন থাকে বাড়িতে। সকাল বিকেল স্বামী স্ত্রী সেজেগুজে কোথায় যায়। আজ বোধহয় যাওয়া হয়নি। নতুন বউকে ছেড়ে এক দণ্ড কোথাও গিয়ে থাকতে বোধহয় মানুষটার কষ্ট হয়। অফিস যায় সবার শেষে, আসে সবার আগে। ছাদে উঠলে

বউটি তার সঙ্গে আলাপও করেছিল। মিষ্টি হাসিখুশি মুখ। নতুন বিয়ে হলে সবারই এমনটা হয়। ওর ইচ্ছা হল, উঁকি দিয়ে দেখে এখন বউটি কী করছে। অসময়ে আজ রেকর্ড প্লেয়ার বাজছে কেন! সিঁড়ির কার্নিশ থেকে হাঁটু গেড়ে বসলে, ওদের শোবার ঘরটা স্পষ্ট, জানালায় কারুকাজ করা পর্দা, বাতাসে উঠে গেলেই কিছুটা আব্রু খুলে যায়। দেখা যায় গোদরেজের লকার, নতুন পালিশ করা খাট, ছোট সেন্টার টেবিলে, শিয়রের কাছে এক গেলাস জল রেকাবে ঢাকা। এসব দেখতে দেখতে নবনীতার কখনও কখনও গলা শুকিয়ে যায়।

সে উঠে এসে দেখল বউটি সামনে দাঁড়িয়ে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঘসছে। পাশে মানুষটি বসে আছে। পা দোলাচ্ছে। আর সিগারেট খাচ্ছে। একবার উঠে খচ করে কী যেন টিপে দিল। বাজছে কোনো মিউজিক। অবেলায় মানুষটা এমন কেন করছে? সারা রাতটা তবে কী করবে? এসব মনে হতেই দেখল বউটি বড় করে সিঁদুরের টিপ পরছে। প্রসাধন করছে। এবং সায়া শাড়ি খুলে ফেলছে। নবনীতা বুঝতে পারছে না সায়া শাড়ি খুলে ফেলার আগে এত করে প্রসাধন করার কী দরকার থাকতে পারে। পুরুষমানুষটাকে দেখতে পাচ্ছে না। সে পর্দার আড়ালে এবং তারপরই বাতাসে ঢেউ খেলে গেলে সে দেখল, সেই পুরুষমানুষ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। বউটি এগিয়ে যাচ্ছে। দিনের বেলায় আলো জ্বেলে নিয়েছে। পর্দা ফেলা বলে যে সামান্য অন্ধকার ছিল সেটাও থাকতে দিল না। নবনীতার চোখমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকল। সেই আগের মতো গলা কাঠ—নিচে মনে হল খুট খুট শব্দ। আরতি মাসি চলে আসতে পারে। দৌড়ে নিচে নেমে গেল এবং খাটে হাত পা বিছিয়ে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ।

আরতি এ—ঘরে এলে নবনীতা জলটা খেয়ে কী করবে বুঝতে পারল না। সন্ধ্যায় সংস্কৃতের মাস্টারমশাই আজ আসবেন। কিছু টাস্ক করা বাকি। এগুলো করে রাখা দরকার ছিল। কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। শরীরে আজকাল যে কী হয়! নানুদার কথা ভাবলেই মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। নানুদা বড় নিষ্ঠুর তুমি। তোমাকে এত ভালো লাগে, তুমি তা টের পাও না কেন।

সে উঠে এবার দেরাজের কাছে গেল। সেখানে একটা বড় অ্যালবামে নতুন ফোটো। ফোটোগুলি সে দেখবে বলে অ্যালবামটা টেনে বের করল। দাদারা কত রকমের ছবি তুলেছে তার। একটা গাছের নিচে বসে আছে সেই ছবি, দৌড়াচ্ছে সেই ছবি—সুন্দর সুন্দর সব ফ্রিজ সট। কখনও বাতাসে চুল উড়ছে, কখনও চোখ উদাস, কখনও নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে। এতসব ছবি তার নিজের। সে প্রায় দেখতে নায়িকার মতো। সিনেমায় সে যদি একটা চান্স পেত। তাঁর চোখ মুখ যে—কোনো উঠতি নায়িকার চেয়ে সুন্দর, সে উঁচু লম্বা। একবার কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিল—নায়িকা চায়। তার ইচ্ছে একটা ছবি গোপনে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু ওর ওই একটা আলস্য আছে—হবে হবে করে শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠে না।

নানুদাকে প্রথম দিন দেখেই ভেবেছিল বাঃ বড় সুন্দর হয়েছে দেখতে নানুদা। যুবক সন্ন্যাসীর মতো দেখতে। রেশমের মতো দাড়ি গোঁফ গালে। হাত দিয়ে ইচ্ছে হয়েছিল দেখতে কত নরম—কোনো উলের বলের মতো কিনা—আর এসব ভাবলেই মাথাটা ঝিম ঝিম করে—সে তার মনের কথাটা কিছুতেই দুম করে বলে ফেলতে পারেনি। আবার দেখা হলে বলবে, নানুদা তুমি আমাকে ভালোবাসবে? আমি তোমার যা ভালো লাগবে তাই করব। কিন্তু সে মানুষটার পাত্তা নেই।

তখনই সে কী ভেবে তার সবচেয়ে সুন্দর ম্যাকসি বের করে ফেলল। গলায় মুখে পাউডার বুলাল। কপালে সুন্দর করে লাল টিপ পরল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল—এমন শরীর নিয়ে তার এখন কান্না পায়। তার কিছুই ভালো লাগে না কেন! পড়াশোনা ভালো লাগে না। এখন শুধু বেড়াতে ভালো লাগে। সে চিৎকার করে বলল, আরতি মাসি আমি কাকলীদের বাড়ি যাচ্ছি।

আরতি বলল, কাকলীদের বাড়িতে এখন কী করতে যাবে!

কাজ আছে।

কী কাজ বলবে তো! দিদি এলে কী বলব!

দিদি আসার আগেই ফিরে আসব।

আমি কিছু জানি না!

ভারি ঝামেলা দেখছি—পড়া দেখে আসব, তাও তোমাদের জ্বালায় জানতে পারব না।

পড়ার কথায় আরতি আর কিছু বলতে পারল না। দাদামণি মেয়ের পড়াশোনার ব্যাপারে খুবই আলগা। এই একটা বিষয়ে আরতির মাতব্বরি নবনীতার ওপর খাটে না। যেতে না দিলেই দাদামণি এলে নালিশ করবে—আমি কী করব, আরতি মাসি যেতে না দিলে আমি কী করব। তখন দাদামণির দুটো একটা ধমক খেতেও হতে পারে। আরতি অগত্যা বলল, যাও। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে। দিনকাল ভালো না—যেখানে সেখানে খুন টুন হচ্ছে।

আজকাল পত্রিকার খুব খুনের খবর ফলাও করে বের হচ্ছে। ক'দিনের মধ্যে চেতলার কাছে একটা সতেরো বছরের মেয়ে খুন হয়েছে, শোভাবাজারের কাছে একটি তেরো চোদ্দো বছরের মেয়েকে কারা তুলে নিয়ে গেছে। কিশোরী মেয়েদের কারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে—আন্ত—রাজ্য মেয়ে চালানকারীদের উপদ্রব বাড়ছে এমনই সব খবর পত্রিকায় আজকাল লেখা থাকে। পত্রিকা পড়লে নবনীতার গা—টা শির শির করে। সে বলল, যাব আর আসব।

আসলে নবনীতা এখন বের হতে চায়। চারপাশে কেবল আনন্দ উজাড় করে দিচ্ছে প্রকৃতি। ঠান্ডা বাতাস বইছে। পার্কের কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া গাছগুলিতে ফুলের সমারোহ। সেজেগুজে সব মানুষেরা যেন কোথায় যাবে বের হয়ে পড়ছে! এ—সময়ে একা ঘরে থাকতে কার মন চায়! এবং বিকেল বেলাটার যেন কী মোহ আছে—তাকে সবসময় ঘর থেকে বের করে নিতে চায়। একটু পার্কে ঘুরে বেড়ানো, কিংবা রাস্তায় যেতে যেতে সুন্দর যুবকদের দিকে দূর থেকে সামান্য চোখ তুলে তাকানোর মধ্যে আছে আশ্চর্য এক মনোহারিণী জীবন। সে কাকলীর বাড়িতে যাবার পথে এসবই দেখবে। কাকলী যদি ওর সঙ্গে একটু বেড়াতে বের হয়, ওর ইচ্ছে, সে কাকলীকে নিয়ে একদিন যাবে মানুদের বাড়িতে। কারণ একা যাওয়া ঠিক হবে না। কোনো মেয়েই কোনো যুবকের বাড়িতে একা যেতে বোধহয় পছন্দ করে না। সে আজ ভারি সেজেগুজে বের হয়েছে। খোঁপায় গুঁজেছে গোলাপ ফুল। রানি ক্লিয়োপেট্রার জীবন নিয়ে একটা ছবি সে দেখেছিল। নিজেকে সে আজ ক্লিয়োপেট্রার মতো দুর্ধর্ষ করে তুলেছে।

রাস্তায় নেমেই সে বুঝতে পারল সারা পৃথিবী এ—মুহূর্তে তাকে উঁচু হয়ে দেখছে। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই ভয়ংকর লোভী দৃষ্টি তার শরীরটার প্রতি। এমনকি পার্কের বুড়ো লোকগুলিও বাদ গেল না। ভারী দৃপ্ত এবং অহংকারী হয়ে উঠছে তার শরীর। সে সোজা হেঁটে যাচ্ছে। কোনোদিকে দেখছে না মতো সে হাঁটছে। আসলে সে সবই দেখছে। গ্রীষ্মের রোদ্দুর মেঘমালায় ছেয়ে যাচ্ছে বলে পার্কের চারপাশে সবুজ সমারোহ। বাতাসে কোনো ধূলিকণা উড়ছে না। নির্মল পৃথিবীতে সে এখন যুবতী নারী। মন এ—সময়টাতেও এত চঞ্চল হয়ে ওঠে যে কোনটা সে চায় কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

ক্লিনিক হাউজের রোয়াকে সেই বকাটে ছোকরারা আজও তাকে দেখে শিস দিল। এবং অশ্লীল দুটো একটা কথাবার্তা—যেন এদের মা বোন নেই—এবং আর যা মনে হয়, এরা তো তাকে ভালোবাসতেও পারে। ভালোবাসার জিনিস দূরের মনে হলেই ক্ষেপে যায় যুবকেরা। ঠিক নানুদার মতো এরা তাকে আর ভাবতে পারে না।

একদিন মনে হয়েছিল, বাবাকে বলবে সব, পরে ভেবে দেখেছে বাবা শুনলে কী ভাববে। নবনীতা জানে এদের থেকে ভয়ের কিছু নেই। সে একবার ভাবল, কাছে গিয়ে বলবে, এই আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে? এই একটু বেড়াব। তখন কী হবে নবনীতার তাও জানা। সবাই এত ভালো ছেলে হয়ে যাবে যে কে আগে প্রাণ করিবে দান গোছের হয়ে যাবে। তার ইজ্জত রক্ষার্থে ওরা তখন হেলায় জীবন দান করতে পারে। এসব মনে হয় বলেই নবনীতা কিছু মনে করে না। অশ্লীল কথাবার্তা নতুন শিখলে যা হয়। এবং সে যে খুব একটা

কড়াশাসনে রয়েছে, সেও জেনে ফেলেছে ওদের সব কথার অর্থ কী। আসলে একটাই অর্থ, আমরা বড় হচ্ছি, তোমরা বড় হচ্ছ, আর অপেক্ষায় থাকতে পারছি না।

নবনীতা কেমন স্বগতোক্তি করল, সে তো আমারও। সে এবারও আরও দূরে এসে বুঝল ওদের আর দেখা যাচ্ছে না। এদের মুখগুলি তার চেনা। চুল বেশ লম্বা করে ঘাড় পর্যন্ত ছেঁটে দেওয়া। একটা কালোটুপি ঘাড় পর্যন্ত বসিয়ে দিলে যা হয়—এরা সুচলো দাড়ি রেখেছে সিনেমা হিরোদের মতো, চুল কাটে সিনেমা হিরোদের মতো। সবকিছুই ভাবে সিনেমা হিরোদের মতো। স্বপ্নও দেখে সিনেমা হিরোইনের। নবনীতার তাই শখ সে একদিন বড় হিরোইন হয়ে যাবে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে তার এটা বেশি করে মনে হয়। অবশ্য এখন নানুদার মতো একজন যুবক তার পাশে থাকলে ভালো হয়। খুশিমতো খাওয়া গেলেই হল—জীবনের আর কী দরকার এ—সময় আর সে কিছু মনে করতে পারে না।

নবনীতা দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ল খুট খুট করে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। ওপরে জানালা খোলা। কেউ বাড়ি না থাকলে জানালা বন্ধ থাকত। কাকলী বাড়ি থাকলে এতক্ষণ দৌড়ে নেমে আসত। সে কড়া নেড়ে আবার ডাকল কাকলী।

তখন বুড়ো মতো মানুষটার গলার শব্দ পাওয়া গেল। কাকলীর দাদু সিঁড়িতে কে কে করে নেমে আসছে।

আমি নবনীতা দাদু।

আরে নবনীতা। প্রিয়নাথ ভারী প্রসন্ন গলায় কথাটা বলল। এসো এসো।

কাকলী বাড়ি নেই?

ওরা গেছে ভুবনের বাড়িতে।

নবনীতা বলল, তা হলে যাই। কাকলীকে বলবেন, আমি এসেছিলাম।

এসো না। ওরা এক্ষুনি চলে আসবে।

নবনীতা ইতস্তত করছিল। বুড়ো মানুষদের তার কেন জানি কখনও ভালোমানুষ মনে হয় না। কাকলীর দাদু খুব শক্ত সমর্থ মানুষ। চুল এখনও কালো রেখেছে। চুল কালো না কলপ মাখে বুড়োটা। সে বলল, কাকলীর আসতে খুব দেরি হবে নাতো?

না না। এল বলে।

নবনীতা দরজার ভিতরে ঢুকে গেল। বাড়িতে আর কেউ নেই কিনা সে এখনও জানে না। মাসিমা থাকবে না কারণ কাকলীর দাদু, ওরা তা হলে বলত না। রান্নার মেয়েটা যদি থাকে। সে ভেবেছিল কাকলীকে নিয়ে সে বেড়াতে বের হবে। কিন্তু কাকলী নেই। সে আবার কী ভেবে বলল, থাক আজ দাদু, কাল আসব।

প্রিয়নাথ লম্বা পাজামা পাঞ্জাবি পরেছে। বেশ দীর্ঘকায় মানুষ। সিঁড়িতে আরও লম্বা হয়ে গেল যেন কথাটা শুনে! —ভয় কী এসো না।

না না ভয় নয়। আমি বলছিলাম কী....। কাকলীর সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

প্রিয়নাথ বলল, বোস, ওরা চলে আসবে।

নবনীতা কী করবে বুঝতে পারছে না। সে যে খুব আর বালিকা নেই, সে যে ইচ্ছে করলেই দাদুর ঠাট্টা তামাসার মধ্যে আগের মতো মজা পায় না সেটা বোঝায় কী করে! তবু শালীনতা বোধ ওর খুব তীব্র। খুবই খারাপ দেখায় না গেলে। সে উঠে প্রিয়নাথের ঘরে বালিকার মতো মুখ করে ঢুকে গেল। এবং বেশ দূরত্ব রেখে সে একটা চেয়ারে বসল।

আর এই ঘরটাতে এলেই সে একজন বুড়ো মানুষের গন্ধ পায়। প্রিয়নাথ না থাকলেও সে টের পেত এ—ঘরে একটা বুড়ো মানুষ থাকে। কিন্তু এখন সে এই গন্ধটা পাচ্ছে না কেন! সে দেখল প্রিয়নাথ জানালার পর্দা সরিয়ে দিচ্ছে। দরজার পর্দা সরিয়ে দিচ্ছে। দরজার পর্দা সরিয়ে দিতে দিতে বলল তোমার বাবা কেমন আছেন?

ভালো।

একদিন মাকে নিয়ে বেড়াতে এসো।

আসব।

আসলে দুই প্রজন্মের ফারাক এত বেশি যে—কোনো কথা খুঁজে পাওয়া ভার। প্রিয়নাথ বারবারই নবনীতার সুন্দর পোশাক লক্ষ্য করছে। তাদের সময়ে মেয়েরা এত সুন্দর করে সাজতে জানত না। তার ভারি আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল নবনীতাকে। কিন্তু ওই যে বয়েস, মনে হচ্ছে বড় তাড়াতাড়ি জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই বয়েসও কেন আকাঙ্ক্ষার এত বেশি চাড় ভেবে পায় না।

নবনীতারই বা ভালো লাগবে কেন! সে উসখুস করছিল। দু—বার উঠে গিয়ে রাস্তায় উঁকি দিয়েছে। অথবা নিচের সিঁড়িতে যদি পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুই না। কাকলীর দাদু ঘরের মধ্যে কৌটা খুলে কী খুঁজছে। দুটো বোতলের ছিপি খুলে ফেলল। এবং সে যে এ—ঘরে আছে তা যেন খেয়াল নেই তার।

তখন বাধ্য হয়ে নবনীতা বলল, আমি যাই দাদু।

আরে না না। চা করছি। চা খাও। ততক্ষণে ওরা এসে যাবে।

নবনীতা কী বলবে বুঝতে পারল না। না, বলতে পারত, কিন্তু চায়ের প্রতি ওর একটা আজন্ম প্রলোভন আছে। সে বলল, কেউ তো নেই।

তাতে কী হয়েছে। আমি কী খুব বুড়ো মানুষ ভাব! মনে হল প্রিয়নাথ এবার সত্যি যুবক হয়ে যাবে। সে প্রায় একজন যুবকের মতোই ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এবং রান্নার গ্যাস জ্বেলে জল চাপাল।

নবনীতার এটা খারাপ লাগছিল। সে বলল, আমি করছি। আপনি এ—সময় বুঝি চা খান?

ওই অভ্যাস। তবে সবই তো ছেড়ে দিয়েছি। এটা এখনও আছে। তুমি করবে! আহা আমার কী সৌভাগ্য। এসো না ভিতরে। তুমি তো আমার নাতিন। এত সুন্দর করে সাজো কেন?

নবনীতা লজ্জা পেল। কিছু বলল না।

এই বয়সে আমরা এত সাজতে জানতাম না। তোমাকে আদর করলে রাগ করবে নবনীতা!

সে কপট রাগ দেখিয়ে বলল, যান আমাকে কেন, কাকলীকে করতে পারেন না!

প্রিয়নাথ হাসল। বলল, ওকে তো সব সময় করি—তোমাকে করলে কেমন না জানি লাগবে।

নবনীতার চোখমুখ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

তখন এই শহরে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। বাসে ট্রামে অফিস ফেরত মানুষেরা গাদাগাদি করে ফিরছে। ভাবতেই পারবে না একজন উঠতি যুবতী একজন প্রৌঢ় মানুষের সামনে এমনভাবে মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। চোখমুখ লালচে। নবনীতার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হতে পারে। সে বলল, না যাই। কাকলী এলে কিন্তু বলবেন, ওকে আমার খুব দরকার।

প্রিয়নাথ তখন হা হা করে হেসে উঠল। এবং তুই তুকারি আরম্ভ করে দিল কথাবার্তায়। বলল, তুই কী রে! আমাকে দাদু ডাকিস, আদর করলে তোর কী ক্ষতিটা হবে! এই বলে কাপে চা ঢালল। তারপর বলল, নে না। এই নে বলে সে ক্রিম ক্রেকার বিস্কুট, ফ্রিজ থেকে দুটো সন্দেশ দিল বের করে।

নবনীতা কেমন বোবার মতো হাতে তুলে নিল সব। বুড়ো মানুষটা আসলে তাকে নিয়ে মজা করছে। সে সব সত্যি ভেবে সামান্য আহাম্মকের কাজ করেছে। খুব কাচুমাচু গলায় বলল, আপনি কিন্তু কাকলীকে কিছু বলবেন না।

বললে কী হবে?

না বলবেন না।

কেন দোষের কী আছে। আমি তো তোকে নিয়ে বিছানায় শুইনি!

ভারী অসভ্য আপনি।

প্রিয়নাথ তার গাল টিপে বলল, সব বুঝিস তা হলে!

নবনীতার হাত পা কাঁপছিল। কত তাড়াতাড়ি চা খাওয়া যায় যেন তার পাল্লা দিচ্ছে। তারপর প্লেট মেঝেতে রেখে সে প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকল।

প্রিয়নাথ বলল, এই তুই চলে গেলে সব বলে দেব। বলব, তুই আমাকে ভালোবাসিস। তুই আমার বউ। বেশ জমবে।

নবনীতার কেমন দ্রুত শ্বাস ওঠানামা করছিল। বুড়ো মানুষটা কী সত্যি কিছু করতে চায়—না মজা—না পাগল, তাও সে বুঝল না। সে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকল। তার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। মাথাটা কেমন তার ঘুরছে।

চব্বিশ

নীরজা বলল, ওগো এসো, ঘরে এসো।

বারান্দায় ভুবনবাবু এক কোণে একটা নীল রঙের বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলেন। সামনের রাস্তায় একটা ভিখারি হেঁটে যাচ্ছে। পর পর দুটো বাস পাল্লা দিচ্ছে। একটা আর একটাকে পেছনে ফেলে ছুটতে চাইছে। রাস্তার ওপাশে মাঠ এবং নতুন ঘরবাড়ি উঠছে। তিনি ঘরের ভেতরে খুব কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন। বারান্দায় ছোট ছোট কাচ্চা—বাচ্চারা দাপাদাপি করছে, রেলিং—এ ঝুঁকছে এবং ভিতরে কেউ হাসছে জোরে, কিছু যেন হাত থেকে পড়ে গেল—নীরজা এইমাত্র ডেকে গেল। আবার কেউ ডাকতে আসবে। রমা অথবা মন্দাকিনী। অরুণ এবং অমলা—আজও আসতে পারে। ছোট শ্যালিকা মল্লিকা এসেছে। অনেকদিন পরে ভানুর আশীর্বাদ উপলক্ষে রমাই নিয়ে এসেছে। আরও অন্যান্য আত্মীয়। এবং ভুবনবাবু মনে হয় সবাই কেমন বড় দূরে সরে গেল। দাদা বউদি ভাইয়েরা এবং ভাইপোরা। ভুবনবাবুর এক বিরাট আত্মীয়স্বজনের সংসার ছিল, আজকের আশীর্বাদে সামান্য ক'জন মানুষের উপস্থিতি তাকে কেমন ভিতরে ভিতরে পীড়া দিচ্ছে।

ওদিকে বারান্দায় বেশ হাসি ঠাট্টা হচ্ছিল। মন্দাকিনীর গলা স্পষ্ট। বেশ জোরে কথা বলতে পারে। এবং আশ্চর্য ভঙ্গি মেয়েটার। ওর স্বামীর মৃত্যু সেদিন হয়েছে। আচ্ছা, মানুষ কী শোক দীর্ঘদিন বয়ে বেড়াতে পারে! বয়ে বেড়ানোটা স্বাভাবিক, না সেখানে জীবনের লক্ষণ আছে। এত সহজে যে শোক মন্দাকিনী ভুলতে পেরেছে ওটাতো জীবনেরই লক্ষণ। কিন্তু তিনি মন্দাকিনীর উচ্চস্বরে কথাবার্তার মধ্যে খুঁত ধরতে যাচ্ছেন কেন! আসলে কী মন্দাকিনী এবং ভানুর মধ্যে একটা সংশয়ের ব্যাপার ছিল বলে! আজতো আশীর্বাদের দিন। এ—দিনে এসব কথা মনে আসছে কেন! মন্দাকিনী এ—বাড়িতে আশীর্বাদের সময় থাকবে সেটা পছন্দ ছিল না বলে! মনে মনে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বারান্দার নিরিবিলি জায়গা কী তাই বেছে নিয়েছেন!

রমা ডাকল, বাবা আসুন!

ভুবনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। রমা কী আগেই জানত অরুণের বউ আছে! সে জেনেই কী মিশত? তখনই অমলা দরজায়—আসুন মেসোমশাই। সব মুখগুলি কত পবিত্র দেখতে এখন! কে বলবে এরাই কখনও কী যে ভয়াবহ হয়ে যায়। আচ্ছা, তিনি ভয়াবহ কথাটা ভাবছেন কেন! মানুষের যে স্বভাবই এই। সে ধার্মিক, লম্পট, সে সরলমতি কখনও কুটিল মতি। সে লোভী আবার উদাসীন!

এজন্য কখনও স্বার্থপর দৈত্য এবং কখনও বিদ্যাসাগরমশাই। তিনি ভিতরে ঢুকে অরুণকে বললেন, নানুর খোঁজে কেউ তোমরা গেছিলে?

অরুণ এরকম কথা এই সময় প্রত্যাশা করেনি। সে বলল, না, মানে.....অরুণ কেমন সত্য গোপন করতে চাইছে।

তোমরা ওর খোঁজখবর নিচ্ছ না, বাবা নেই ছেলেটার!

অরুণ কাঁচুমাচু গলায় বলল, যাব ভাবছি।

কোথায় যেন গেছে!

মানু তো কিছু বলে না। মানু এখন দেখছি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। দেখা কোথায় হয় যে তার কাছ থেকে নানুর খবর নেব। সারাদিন কোথায় কী করে বেড়ায় তাও জানি না। নানুর মা বিয়েতে আসবে তো?

আসার কথা আছে। তবে সরকারি কাজ ছুটিছাটা নিয়ে নানা ঝামেলা। নানুর মা আমাদের বিয়েতে আসতে পারেনি।

অমলা এক কোণায় দাঁড়িয়ে জানালায় মুখ রেখেছে। ওর মুখ স্পষ্ট নয়। অমলাদের বাড়ি থেকে ওর জামাইবাবু এবং অরুণ এসেছে আশীর্বাদ করতে। আশীর্বাদের কাজ প্রায় শেষ—ভানু বড় আসনে বসে আছে শুধু বাবার জন্য। বাবা মাথায় সামান্য ধানদূর্বা দিলেই তার ছুটি। সে উঠব উঠব করছিল—কিন্তু এতক্ষণ অমলা এবং অরুণই জোর করে বসিয়ে রেখেছে।

ভুবনবাবু আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, তখন রমা অরুণের দিকে তাকাল অরুণ ভুবনবাবুর দিকে—গোপন বেদনার ঝড় কোথা থেকে যে উঠে আসে কখন কে জানে, রমা হাত বাড়িয়ে বলল, বাবা ধরুন। হাতে ধানদূর্বা দিয়ে বলল, দাদার মাথায় দিন।

ভুবনবাবু কেমন যন্ত্রের মতো হাত তুলে পুত্রের মাথায় দিলেন। সবই হচ্ছে, কিন্তু কেন জানি প্রবল জোর পাচ্ছেন না ভিতর থেকে! সংসারে একটা বড় রকমের ফাটল দেখা দিয়েছে। তখনই সবাই উলু দিল। নীরজা এবং মন্দাকিনীর উলু বেশ তীক্ষ্ন। মল্লিকাও কম যায় না। বড়ই নিষ্প্রভ রমার উলু তার চেয়েও নিষ্প্রভ অমলার।

তখন ভুবনবাবু বললেন, মানু কোথায়?

রমা বলল, আপনার ছোট পুত্রটির কথা আর বলবেন না, একদণ্ড যদি বাড়ি থাকে।

মনে মনে ভুবনবাবু বললেন, ওর দোষ কী। সংসারে সবাই সব টের পায়। তোমরা মনে করো কেউ কিছু বোঝে না। কিন্তু রমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভুবনবাবুর কষ্ট হল! যেন রমা এক গোপন দুঃখ আজকাল লুকিয়ে রাখছে। কত পালটে গেল সব। এক জীবনে তিনি কী না দেখলেন! এক সময় মানুষের সামনে বড় রকমের আদর্শ থাকত। তাদের সময় কত সব শ্রদ্ধেয় মানুষ বেঁচেছিলেন। একবার মনে আছে ভুবনবাবু প্রায় ত্রিশ মাইল রাস্তা ঝড়বৃষ্টিতে হেঁটে গিয়েছিলেন। সঙ্গে একটা চিঠি। তাঁদের স্কুলের অনাদি মাস্টারমশাই চিঠিটা পৌঁছে দিতে বলেছিলেন। তখন স্বদেশি যুগ, গান্ধীজীর স্বরাজ আন্দোলনে কত মানুষ জীবনের সবকিছু অবহেলা করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নেতাজীর কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আসা, আরও কত উত্তেজক খবর তখন মানুষের জীবনে একটা আলোড়ন তুলত। এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মানু কিংবা সেই ছেলেটা কী যেন নাম, হ্যাঁ নানু একটা ঝি—মেয়ের খোঁজে চলে গেল, তারা এ—ছাড়া আর কী করবে! তিনি বললেন, অরুণ বাইরে এসো। কথা আছে।

অরুণ সেই ঘটনার পর অনেকদিন এ—বাড়িমুখো হয়নি। এই বুড়ো মানুষটাকে মনে মনে সে ভয় পায়। এবং সমীহ করে। কথাবার্তা কম বলেন। খুবই সহিষ্ণু মানুষ। এখন ডেকে নিয়ে কী বলবে কে জানে!

অথচ ওরা যখন পাশাপাশি বসল, তখন ভুবনবাবু অন্য মানুষ। তিনি বললেন, বিয়েতে আমরা কিছুই চাইনি। শাঁখা সিঁদুর দিয়ে বিয়ে দিলেও আপত্তি নেই তুমি জানো। কিন্তু একটা কথা—মিতা এ—বাড়িতে এসে সুখী হবে তো! মানু বড়ই অবুঝ ছেলে। ওকে নিয়েই আমার ভয়।

অরুণ বলল, আপনি কিছু ভাববেন না। আজকালকার ছেলে এ—রকমেরই সবাই। বয়স হলে, চাকরি করলে তারপর বিয়ে হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর কী ভেবে বলল, নবীনদার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি। ওকে ডাকি।

ভুবনবাবু বললেন, ডাকো।

নবীন এলে অরুণ বলল, এই দাদাটি আমার বোম্বাই থাকে। কাগজে কাজ করে।

কোন কাগজে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপে আছে।

খবরের কাগজের লোকদের সম্পর্কে ভুবনবাবু এক ধরনের শ্রদ্ধা আছে। তিনি বললেন, বসুন। আপনারা খবরের কাগজের লোক কত খবর রাখেন।

নবীন বলল, ওই বাইরে থেকে এমনটা মনে হয়।

ভুবনবাবু কথাটা শুনেও শুনলেন না। তিনি বললেন, কাগজে আজকাল খুব আশার কথা লেখা থাকে।

নবীন বুঝতে পারল না ভুবনবাবু কেন এ—কথা বলছেন।

প্রায়ই দেখি দেশের নেতারা কেবল হোপস দিচ্ছে, বেকার থাকবে না বলছে। কিন্তু দিন দিন যে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে।

নবীন বলল, দেশের সম্পদ কম। জনসংখ্যা বেশি। আন্ডার ডেভালাপড কান্ট্রিগুলোর এই একটা বড় বিষফোঁড়া।

মানুষের স্বাধীনতা নিয়ে আজকাল কাগজে খুব লেখা হচ্ছে।

সত্যিকারের স্বাধীনতা এখনও অর্জন করা গেল না।

মহান ব্যক্তিদের মাথা কাটা হচ্ছে। কারা করছে জানেন?

ভুবনবাবু খুবই অসংলগ্ন হয়ে পড়েছিলেন কথাবার্তায়। আসলে একটু আলাপ করা। সত্যবাদী কাগজগুলির একজন এই লোকটা। দেশের লোক ঈশ্বরের পরই খবর কাগজ সত্য ভেবে থাকে। সেই দপ্তরের একটা লোক তাঁর বাড়িতে আজ অতিথি। এটা একটা বড় রকমের অহংকার তাঁর জীবনে। তিনি নবীনের সঙ্গে কী বিষয় নিয়ে কথা বলবেন—ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছেন না। তিনি অগত্যা অরুণের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সবাই চা মিষ্টি খেয়েছ ত!

অমলা তখন বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রাসবিহারীবাবুর মেয়েদের চেহারায় আভিজাত্য আছে। অমলা কাছে আসতেই বললেন, এসো মা! আমরা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছি।

অমলা হাসল। রমাও তখন উঁকি মারছে। বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, জানো তো নবীন আমাদের একজন জাঁদরেল রিপোর্টার। ওর এক কলমের খোঁচায় কত কিছু হতে পারে। তারপর নবীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের খুব দৌড়ঝাঁপ করতে হয়।

তা করতে হয়।

আচ্ছা কাগজে যে দেখি দেশের গরিবদের নিয়ে সরকারের খুব মাথাব্যথা সেটা কি সত্যি। না লিখতে হয় বলে লেখা। জনমনে সুড়সুড়ি দেওয়া।

নবীন বলল, কাগজ বিক্রি চায়। জনগণ যাতে খুশি তাই লেখা হয়। সরকারও চায় যে—কোনোভাবে ক্ষমতা দখলে রাখা।

অথচ দেখো আমরা সব সত্য ভেবে রোজ সকালে সন্ধ্যাপাঠের মতো কাগজ পাঠ করি।

অভ্যাস।

এই অভ্যাসের কথা আসতেই ভুবনবাবুর মনে হল, সত্যি এটা অভ্যাস। এক সময় ছিল, যখন খবরের কাগজ সম্পর্কে তার কোনো স্পৃহা ছিল না। তখনও দিন চলে যেত। এখন খবরের কাগজ না পেলে দিনটা বড়ই ফাঁকা ঠেকে। কোথায় কী ঘটছে জানার জন্য বড়ই উদগ্রীব তিনি। ভুবনবাবু এবার নবীনের দিতে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের নানুও একটা খবর হতে পারত।

নবীন বলল, নানু মানে, রানুদির ছেলের কথা বলছেন!

ভুবনবাবু বললেন, কেন তুমি ওকে চেন না?

মানে ওকে খুব ছোট দেখেছি।

নানুকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে হয়। একটা ছেলে সংসারের সবকিছুই অবহেলায় ফেলে চলে গেল—সে না জানি কত বড়!

নানুর সম্পর্কে কোনো কথা উঠলেই ভুবনবাবু বুঝতে পারছেন অরুণরা খুব ঠান্ডা মেরে যায়। কিন্তু যা বুঝেছেন তাতে তো নানুকে খুবই পরোপকারী এবং আদর্শবাদী যুবক বলে মনে হয়। তিনি বললেন, বিয়েতে নানুকে আসতে বলো, আমি তার সঙ্গে আলাপ করব। বাবা নেই, মা দূরে থাকে, বড়ই একা।

অরুণ কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কভঙ্গিতে বলল, কারও কথা শোনে না। মানুবাবুকে পাঠাব, যদি আসে।

আমার কথা বোলো। নিশ্চয়ই আসবে। ছেলেটা নাকি আমাদের বাড়িতেও এসেছে। কত ছেলেইতো আসত মানুর কাছে—আমি ঠিক এখন মনে করতে পারছি না নানুটা কে!

সবই অহেতুক কথাবার্তা। মন্দাকিনী বারান্দায় আলো জ্বেলে দিল। সব ঘরে এখন আলো জ্বালা হচ্ছে। এই বাসা বাড়িটা যেন মুহূর্তে প্রাণ পেয়ে গেল। অথচ ভুবনবাবুর মনে হয় যতই আলো জ্বালা হোক, বাড়ির চামচিকেটা ঠিক উড়বেই।

সংসারে এই একটা চামচিকে নিয়তই উড়ছে। চামচিকেটা একটা উদ্বেগের মতো, এই উদ্বেগ নিয়ে সব সময় দিন কাটে। বিয়ের পর থেকেই ভুবনবাবুর এটা হয়েছে। এখন মনে হয় শুধু ভুবনবাবুর জীবনে হবে কেন সবার জীবনে চামচিকেটা অন্ধকারে উড়ে বেড়ায়। এবং এজন্যই ভুবনবাবু আসল কথাটা এবার পাড়লেন। বললেন, অরুণ তোমার তো অনেকের সঙ্গে আলাপ, তুমি রমার জন্য একটা ভালো বর দেখে দাও। নবীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকেও বলছি। তোমরা তো আমার এখন আর পর নও।

রমা সামান্য ঠোঁট বাঁকিয়ে উঠে গেল। ওরা না থাকলে সে হয়তো ভুবনবাবুকেই ধমক দিত। তুমি আর সংসারে মানুষ পেলে না, তুমি অরুণকে আমার বর খুঁজে দিতে বলছ। তুমি তো জান না, ও কত বড় স্বার্থপর। ও বউ বাদে এখন আর কিছু বোঝে না। আচ্ছা, অমলার চেয়ে আমি দেখতে খারাপ! এ—কথা মনে হতেই সে বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে কতদিন পর যেন নিজেকে খুঁটিয়ে দেখল। মনে মনে বলল অরুণ তুমি আমাকে কী ভাব জানি না, তবে মনে রেখো মরে গেলেও আমি বিয়ে করছি না।

এই সংসারে এখন আরও সব ঘটনা ঘটছে। মানুর ঘরে কাকলী বসে একটা সিনেমা ম্যাগাজিন ওলটাচ্ছে। দু বার ভানু এসে বলেছে, কী কাকলী তুমি এত চুপচাপ?

কাকলী সাড়া দেয়নি—সে একটা ফ্যাশান ম্যাগাজিনে ডুবে আছে। ভানু ফের বলল, তোমার মা কোথায়?

কী জানি! খুব তাচ্ছিল্য গলায় ফুটে উঠল। তারপরই বলল, ভানুকা এবার থেকে তো তুমি আমাদের ভুলে যাবে।

যা পাগলি!

আমাদের কথা মনে থাকবে না।

খুব থাকবে।

তোমার তো ভালোবাসার মেয়ে চলেই আসছে।

সংসারে সবাইকে ভালোবাসতে হয়। ভানুবাবু কেমন দার্শনিক অথচ শয়তানের প্রতিভূর মতো কথাটা একটা অবোধ কিশোরীকে শুনিয়ে দিল।

তারপর দরজা দিয়ে বের হতে গিয়ে করিডোরে মন্দাকিনীর সঙ্গে ভানুর গায়ে গা লেগে গেল। মন্দাকিনীকে আইবুড়ো মেয়ের মতো দেখাচ্ছে। গলায় হার, হাতে দু গাছা সোনার চুড়ি এবং ঠোঁটে খুবই হালকা লিপস্টিক। মন্দাকিনী ফাঁক বুঝে ভানুবাবুর শরীরে একটা চিমটি কেটে দিল। ভানুবাবু বলল, এই কী হচ্ছে!

খুব তো নেবে। চোখে মুখে তো লালা উপছে পড়ছে।

কেমন দেখলে?

কাকে?

কাকে আবার?

ও মিতাকে! ধুস। তোমার পাশে ও কিছু না। অমলা আসছিল, ওরা কথা পালটে নিল। ও ভানুবাবু কাকলীকে দেখেছ?

দেখগে মানুর ঘরে চুপচাপ বসে আছে।

অমলা চোখ তুলে ভানুবাবুকে দেখল। উঁচু লম্বা মানুষ—অরুণের মতোই সুপুরুষ। মিতার সঙ্গে মানাবে খুব। এবং সেই এক দৃশ্য চোখে ভাসে—বিয়ে কেন হয়, কীজন্য এই শুভ কাজ, একজনকে ধরে আনা, অর্থাৎ বড়ই সুসময় চলে যাচ্ছে জীবনে, তাকে অবহেলায় ফেলে রাখতে নেই, জমি উর্বর, শুধু শস্য বুনে দিলে সুজলা সুফলা ধরণি। অমলা ভানুর দিকে চেয়ে এইসব ভেবে সামান্য হাসল। ভানুবাবুও সামান্য হেসে পাশ কাটাতে গেলে দু হাত তুলে দিল অমলা—কোথায় যাচ্ছেন?

কোথাও না।

খুব ভালো করে ঘুমাবেন।

কেন বলুন তো।

চোখে কালি পড়ছে কেন!

অঃ। ও ঠিক হয়ে যাবে।

অমলা তারপর বাথরুমের দিকে চলে গেল। রমা বাথরুমে আছে, অমলা দরজায় শব্দ করতেই রমা বের হয়ে এল। ....ও তুমি। তোমাকেই খুঁজছি।

রমা এই অমলাকে আজ প্রথম দেখল। মানু সেদিন বাড়িতে এসে সব ভেঙে দেবার পর কী কারণে অনেকদিন অরুণ এবং রমা পাশ কাটিয়ে গেছে। কোনো কথা বলেনি দু'জন তারপর বাবার চিঠি অরুণের হাতে দিতেই সম্পর্কটা আবার জোড়া লেগে গেল। চিঠিতে বাবা আশীর্বাদের কথা লিখেছিলেন! এখন আর মানুকে পাঠাতে হয় না। রমাই যা কিছু দরকারি কথা পাত্রীপক্ষকে অরুণের মারফত জানিয়ে দেয়।

অমলা বলল, আমরা এবার যাব।

অমলা সুন্দর লতাপাতা আঁকা সিল্কের শাড়ি পরেছে। পায়ের পাতার ওপর পড়ে আছে সায়ার কারুকাজ করা লেস। মুখটা ডিমের মতো মসৃণ, সামান্য চাপা। হাসলে গালে টোল পড়ে। ডানদিকের গজদাঁত অমলাকে কেমন সোহাগী করে রেখেছে। রমা বলল, যাবেইতো। এত তাড়াতাড়ি কেন। তোমার কর্তাকে কেউ খেয়ে ফেলবে না।

অমলা চোখ টেনে কপালে তুলে বলল। —আমার বড় ভয়, কেউ যদি সত্যি খেয়ে ফেলে! তারপর রমাকে জড়িয়ে ধরে হা হা করে হেসে দিল।

এই সেই মেয়ে—সামনের বাইকে অরুণ আগেই কী ঠিক দেখেছিল—না ছুটেছে, তার নিজের জনকে অন্য কেউ সহজেই নিয়ে চলে যেতে পারে। অনেকদিন ভেবেছে অরুণকে বলবে, কী হল, বাড়ি গিয়ে কী দেখলে?

কিন্তু বলি বলি করেও বলা হয় না। তা—ছাড়া সেদিন আর অরুণ আগের মতো সহজেই ডেকে নিতে পারত না—কেমন সাধুপুরুষ হয়ে গেছিল। রমার কাছে অরুণ দিনকে দিন দূরের মানুষ হয়ে যাচ্ছিল। মানুষ দূরের হয়ে গেলে সংসারের গোপন কথা আর জানার অধিকার থাকে না। রমার মনে হয়েছিল, সে অরুণের ওপর তার অধিকার হারিয়েছে।

অমলা বলল, আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন?

না এমনি। রমা আঁচলে মুখ মুছল। তারপর বলল, আর এক কাপ চা খাও। বাবার সঙ্গে ওরা বোধহয় জমে গেছে।

মেসোমশাই অরুণ বলতে দেখছি অজ্ঞান।

অরুণ এবাড়ির খুবই নিজের মানুষ। ওর উপকারের কথা আমরা ভুলতে পারব না অমলা।

ওতো একটা অকম্মা লোক। ওকে দিয়ে কারও কোনো উপকার হয়!

রমা কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। অরুণের ওপর তার কোনো অভিমান নেই। কোনো রাগ নেই, যেটুকু সে অরুণের কাছে পেয়েছে তার স্মৃতিটুকু ভারী অম্লান এবং এখন বুঝতে পারে রমা যত দিন যাচ্ছে, অরুণকে ভিতর থেকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলছে। সে জানে আরও যত দিন যাবে যত গভীরতা বাড়বে। অরুণ যত ওকে পাশ কাটিয়ে যাবে তত অঘটন তীব্রতর হবে। এবং দিন যত যাচ্ছে বুঝতে পারছে এক ভয়ংকর কষ্টের মধ্যে সে পড়ে যাচ্ছে। এই কষ্ট থেকে রেহাই পেতে হলে তাকে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। একই অফিস বাড়িতে কাজ করা তার পক্ষে ক্রমে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

অমলা বলল, দাদার বিয়েটা হয়ে গেলেই তোমার লাগিয়ে দেব।

রমা বলল, দিয়ো। এইটুকু বলেই সে সরে পড়ল। একটা গোপন দুঃখ নিয়ে সরে পড়ল। কেন যে সে এভাবে মরতে গেল। প্রথমে খেলার ছলে যা সে নিয়েছিল, এখন বুঝতে পারছে তাই ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড দাপাদাপির সৃষ্টি করেছে। সে ফের বাথরুমে ঢুকে চোখে জলের ঝাপটা দিল। তারপর মাকে বলল, মানদা কোথায়?

মানদা অন্য ঘর থেকে বলল, যাই দিদিমণি।

আর এক কেতলি জল বসাও। আমি যাচ্ছি!

মল্লিকা বলল, তুই ওদের সঙ্গে কথা বল। আমি করছি।

মল্লিকা মাসিকে বলল, আমি করি না? তোমরা সবই করছ।

মল্লিকা তবু বলল, যা তো। বলে প্রায় ঠেলে ঠুলে রান্নাঘর থেকে বের করে দিল রমাকে। আসার পর থেকে মল্লিকা দেখেছে, রমা রান্নাঘরেই আছে। সেই সকাল থেকে—মাছ তরিতরকারি কোটা, মাছ ভাজা, টক, মিষ্টান্ন, ছোলার ডাল সব এক হাতে করেছে। রমা এত কাজের, কী পরিচ্ছন্ন সব কাজ! কেমন লক্ষ্মীশ্রী সব কাজে। নীরজা আজ শুধু বসে বসে হুকুম করছে আর সামনে পানের বাটা নিয়ে বসে আছে।

এবং সবার আগে রমা ছোট ভাইটিকে রান্নাঘরে বসিয়ে খাইয়েছে। কারণ সে জানে ভাইটির অভিমান বড় বেশি। আগে কত আবদার করত, এখন আর কোনো আবদার করে না। মানু অরুণকেও সহ্য করতে পারে না। তাকে ঘৃণা করে। মাঝে মাঝে রমার অসম্ভব জেদ মাথায় চেপে যায়, সংসারের জন্য এত করি, দিনরাত খাটি, বাড়ি এসে এক দণ্ড বিশ্রাম পাই না, আমার এতটুকু সুখ পর্যন্ত তোমরা হরণ করে নিতে চাও! আমি যাব। অরুণ এলেই যাব। কিন্তু আজকাল সে বুঝেছে সে ভুল করেছে। ভাইকে আদর করে আজ সে বসিয়ে রান্নাঘরে খাইয়েছে। মানু যা পছন্দ করে পাতে তা বেশি বেশি করে দিয়েছে। না খেলে বলেছে, এখনও আমার ওপর তোর রাগটা যায়নি!

সেদিনই বেশ রাত করে ফিরল মানু। চোখমুখ গম্ভীর। ভুবনবাবু বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। সবাই বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে থাকেন। কিন্তু এসেই মানু বলল, সে এক্ষুনি বের হয়ে যাবে আবার। সে বলল, বাবা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যান।

ভুবনবাবু এই প্রথম চিৎকার করে উঠলেন, তুই কোথায় যাবি এত রাতে?

কাজ আছে।

কী কাজ?

চিৎকার রমা নীরজা ভানু সবাই বের হয়ে এসেছে। সারাদিন খাটা খাটানি গেছে। সবাই শুয়ে পড়েছিল। কেবল ভুবনবাবু জেগে। মানু এলে দরজা বন্ধ করে দেবেন। এখন সবাই দেখছে মানু নিজের ঘরে কীসব তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। এবং একটা ব্যাগের মধ্যে সব ভরে নিচ্ছে।

ভুবনবাবু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

নীরজা একটা কথা বলতে পারছে না।

ভানু কাছাকাছি যেতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না।

রমা শুধু ঘরে ঢুকে বলল, পাগলামি করিস না। কোথায় যাচ্ছিস। বলে ব্যাগটা টেনে নিতে গেলে কেমন অনেক দূর থেকে ভারী অপরিচিতের গলায় যেন বলল, আঃ কী করছ! সে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, কাল সকালে পুলিশ আসতে পারে, আমার খোঁজে। বলবেন কিছুই জানেন না। বলে সে কাউকে আর কথা বলতে না দিয়ে তড় তড় করে নিচে নেমে রাস্তার অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

পঁচিশ

পরদিন পুলিশ এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজল বাড়িটা। ওরা এটা ফেলছে, ওটা টেনে নামাচ্ছে, এবং কথায় কথায় শালা বানচুত বলছে ভুবনবাবুকে। শালা বানচুত শব্দটি তাঁর প্রতি কেউ কখনও জীবনে ব্যবহার করেনি। তিনি স্থির ধীর মানুষ। সৎ মানুষ। পুত্রের কল্যাণে পুলিশ যা কিছু মুখে আসে গালাগাল করে গেল তাঁকে। তাঁর পরিবারের কেউ গালাগাল থেকে রেহাই পেল না। মানুকে বেজন্মার বাচ্চা বলল কয়েকবার।

পুলিশ ঘিরে রেখেছে বাড়িটা। দু বার দুটো ব্যাটনের বাড়ি খেল ভানু—বল কোথায় গেছে হারামির বাচ্চা। দেশটাকে জ্বালিয়ে খেল। তারপর পুলিশ অফিসারটি একসময় খুব অমায়িক গলায় ডেকে নিয়ে গেল ভুবনবাবুকে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

রাস্তায় মানুষজন জমে গেছে। রমা রান্নাঘরে নীরজা রান্নাঘরে। মানদা কেবল বলছে, এ—কোন আপদ! পুলিশ সব খুঁজে পেতে দুটো লিফলেট পেল। লিফলেট দুটো দোমড়ানো, বোধহয় একটিতে সুপুরির কুচি রেখেছিল নীরজা এবং একটায় হরীতকী। সেই দুটো সম্বল করে গোঁফে তা দিয়ে একটা বড় রকমের খোঁজখবর মিলে গেছে মতো পুলিশের দলটা বড়বাবুর জন্য দাঁড়িয়ে থাকল।

তখন পুলিশ অফিসারটি দরজা বন্ধ করে বলে গেল, বুড়ো হয়েছেন, কত কিছু দেখতে হবে। আজকাল মানুষ বড়ই ধান্দাবাজ। আপনারা সেকেলে লোক টের পান না। ছেলেটাকে আপনার চোট্টারা সর্বনাশ করে তবে ছাড়ল। কোথা গেছে বলুন! আমরা ধরে এনে শুধরে দেব। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে।

ভুবনবাবু বললেন, জানি না।

পুলিশ অফিসারটি বলল, বড়ই দুঃখময়। দেশে বড় লোক কেবল বড় লোক হচ্ছে, গরিব কেবল গরিব হয়ে যাচ্ছে।

দু দলই লড়াই করবে বলে হাঁকপাঁক করছে। আমাদের হয়েছে মরণ। কার দিকে যাই বলুন। আপনার ছেলেটি কোন দলে গেছে আপনি জানেন! সেটা খুব ভালো দল না। মনীষীদের যখন তখন মাথা কাটছে। আপনি নিশ্চয় জানেন। বাবা যখন পুত্রের খবর আপনি জানবেনই। বলুন—ধরে আনি। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে দি।

ভুবনবাবু বললেন, জানি না।

দেশটা দেখতে দেখতে কী হয়ে গেল বলুন। এখন শুধু ধান্দাবাজদের রাজত্ব। রাজনীতি বলুন, অর্থনীতি বলুন সমাজ সংস্কৃতি বলুন সব ধান্দাবাজাদের মুঠোয়। আপনারা সৎমানুষ, সে—সব পথে যাবেন কেন। ছেলেটা আপনার রত্ন। রত্নগর্ভা আপনার স্ত্রী। কোথায় আছে নিশ্চয় জানেন। বলুন বলে ফেলুন।

আমাদের সামনে কোনো আদর্শ নেই। অথচ দেখুন এই দেশেই নেতাজী জন্মলাভ করেছেন। গান্ধীজী বলুন, তিলক বলুন, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, নেহরু কত নাম করব বলুন, তাঁরা সবাই আমাদের এই ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছেন। শিক্ষা, স্বার্থত্যাগ শিক্ষা, অহং শিক্ষা—কী শিক্ষা না দিয়ে গেছেন তেনারা। কিন্তু হল কী—হল কচু। চোর বাটপার জোচ্চোর। ইতর নেমকহারামে দেশটা ছেয়ে গেল। কী বলেন, ঠিক বলিনি! তা যাক এখন বলুন আপনার সুপুত্রটি গেল কোথায়!

ভুবনবাবুর এক কথা, জানি না।

কিন্তু আপনি না জানলে তো হবে না। এত জানেন আর এটা জানবেন না সে কী করে হয়। বয়স হয়ে গেল, দুদিন বাদে নিমতলা যাবেন, মিথ্যে কথা বললে নরকে জায়গা হবে না, ধর্মাধর্ম জ্ঞানতো অন্যের চেয়ে

আপনার কম না! মিথ্যা কথা বললে কত বড় পাপ হয় জানেন, মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, পড়েছেন নিশ্চয়ই—সামান্য মিথ্যাকথা, অশ্বত্থামা হত নর নহে ইতি গজ, ঠিক মিছা কথাও নয়। একটু ঘুরিয়ে বলা, একটু আস্তে গলা খাকারি দিয়ে বলা, তাতেই কী না নরক দর্শন হয়ে গেল। বলেন এটা ঠিক হল—আমরা কত মিছা কথা বলি আমাদের কী হয়—কচু হয়। মহাভারতেই ও—সব লেখা হতে পারে। তারপরই কী ভেবে বেলাইনে চলে যাচ্ছেন ভেবে অফিসারটি ঘুরিয়ে বলল, না না কী যেন বলেন, মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। আপনি বড়ই পুণ্যবান মানুষ, বলে ফেলুন, আপনার সাধের বিপ্লবী পুত্রটি কোন নিরুদ্দেশে গেল!

ভুবনবাবুর সেই এক কথা—জানি না।

শুনুন, জানতে হয় কী করে জানিয়ে দিতে পারি। সবই পারি। কিন্তু আমাদেরও বাবা মা ভাই বোন আছে। মনে করবেন না আমরা কলাগাছ ফুঁড়ে বসুন্ধরায় হাজির হয়েছি। সব পারি—আপনি পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি, হাত চালাতে লাগে। সেজন্যই বলছিলাম বলে দিন—ও—সব বিপ্লবে টিপ্লবে বিশ্বাস করবেন না, ও বয়সে আমরাও অনেক বিপ্লব টিপ্লব করার কথা ভেবেছি, মিছিলে ঝান্ডা উড়িয়েছি, তারপর চাকরি হয়ে যাবার পর সাধু পুরুষ হয়ে গেছি। এখন মাগ ছেলে বাদে আর কিছু বুঝি না মশাই। আমার অত রাখঢাক নেই। ডমফাই করতে ভালোবাসি না। দুটো পয়সা কী করে হবে, সেই ধান্ধাতেই থাকি। যা দিনকাল, চোখ বুজলে মাগ ছেলে সব রাস্তায়। আদর্শ ধুয়ে জল খাব? রাশিয়া চীন আমেরিকায় নানা রকমের মগজ ধোলাইর কারখানা আছে, কিন্তু শালা আমাদের দেশিমগজ ধোলাইর মতো মহাকার্যোদ্ধারকারী বটিকা আর একটিও নেই। জয়া বলে একটি প্রেমিকা আছে আপনার পুত্রের সেটা কী জানা আছে?

ভুবনবাবু বললেন, জানি না।

আপনি দেখছি মশাই একেবারে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু সব খবরই পুলিশের খাতায় আজকাল লেখা হয়ে থাকে। জয়া মেয়েটিকে এনে দু হাত এক করে দিলেই বিপ্লবের কেতাতে আগুন ধরে যেত। আপনারা এত প্রাজ্ঞ হয়ে কেন যে এটা বোঝেন না। দু তিনমাসের মধ্যে আপনার ছেলেটির অধোগতি হয়েছে। হরিবল। পুলিশ অফিসারটি ধার্মিক পাঁঠার মতো তারপর একটা হাই তুলল। কিছুতেই কাজ হবে না। আস্ত ত্যাঁদোর লোক। জায়গামতো না নিয়ে গেলে হবে না। পুলিশ অফিসারটি টুপি টেনে দরজা খুলে তারপর দুলাফে বের হয়ে গেল।

ভুবনবাবু স্থির চোখে বসে থাকলেন।

নিচে পুলিশ ভ্যানটি গর্জে উঠল।

রমা এবং ভানু ছুটে দেখল, বাবা স্থির নিষ্পলক।

রমা ডাকল, বাবা কী বলল লোকটা?

ভুবনবাবু রমাকে দেখলেন।

কী বলল?

কিছু না।

এতক্ষণ শাসাচ্ছিল, আপনি কিছু বলছেন না! ভানু কেমন বিরক্ত গলায় কথাটা বলল।

কপাল। বলে ভুবনবাবু উঠে পড়লেন।

রমা নীরজা ভুবনবাবুর পেছন পেছন গেল। ভুবনবাবু করিডোর ধরে হেঁটে কোথাও যাবেন যেন।

রমা বলল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

জয়াদের বাড়ি যাব।

জয়াদের বাড়ি এখন যেতে হবে না।

কেন, গেলে কী হবে?

রাস্তায় লোকজন জড়ো হয়েছে। নিচে নামলেই আপনাকে আজে বাজে প্রশ্ন করবে। আপনি এখন কোথাও বের হবেন না।

ভুবনবাবু পুত্রকন্যার কথায় নিরস্ত হলেন। চারপাশের মানুষ তামাশা দেখতে ভিড় করেছে। ভুবনবাবু ধীরে ধীরে মানুর ঘরে ঢুকে ওর খাটে বসে পড়লেন। ছেলেটা এমন কী করত যার জন্য পুলিশ এ—ভাবে তাকে অপমান করে গেল! এই অপমান লাঞ্ছনা নির্যাতন শেষ বয়সে তাঁর কপালে লেখা ছিল তবে। মনে মনে বললেন, মানু বাপের দিকটা দেখলি না একবার। সংসারে আমি তো কোনো অপরাধ করিনি। তুই কোথায় গেলি তাও বলে গেলি না। এত উদ্বেগ নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে! তারপরই মনে হল, না বলে গিয়েছে ভালোই করেছে। পুলিশ তাকে সহজে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। নির্যাতন শেষ পর্যন্ত এমন হতে পারে যে তিনি সব ফাঁসও করে দিতে পারতেন। আর ঠিক দুপুরেই এল দুজন পুলিশ, তারা ভুবনবাবুকে থানায় ধরে নিয়ে গেল।

বিপদের সময় রমার একমাত্র মানুষ অরুণ, যাকে সে ফোনে সব বললে ছুটে এল। সব খুলে বললে, অরুণ বলল, দেখছি। এখন বিকেল হয়ে গেছে, গোবিন্দদা এখানে আছেন। তাছাড়া অরুণের দূর সম্পর্কের এক দাদা বিধানসভার সদস্য। দেশ স্বাধীন হবার আগে বিপ্লবী ছিল, এখন কংগ্রেসি। যখন যে দল ভারী সেখানে নাম লেখাবার প্রবণতা আছে মানুষটার। মানুষটা খুবই রাশভারি, খুব প্রভাব আছে উঁচু মহলে। ছয়কে নয় করতে বড়ই ওস্তাদ মানুষ। অরুণ বুঝতে পারছে এ—সময়ে দাদার স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। মনে মনে সে তার দাদাকে ঘৃণা করে। কারণ সে জানে, ভদ্রলোকের রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে। গুণ্ডা বদমাসরা সব এখন এম এল এ। লম্পট হলে তো কথাই নেই—তার দাদাটির ক্ষেত্রে সবই প্রযোজ্য। সে তার শরণাপন্ন হয়ে বিকেলের দিকে ভুবনবাবুকে বাড়ি নিয়ে আসতে পারল।

কিন্তু এ কী চেহারা মানুষটার! উদভ্রান্তের মতো চোখ। কারও সঙ্গে একটা কথা বলছেন না। পাগল পাগল চেহারা। সিঁড়ি ধরে উঠতে পারছিলেন না। শরীরে হাত দিলেই কঁকিয়ে উঠছেন। রমা বাপের এমন অবস্থা দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল! ভানু কেমন হঠকারী যুবক হয়ে গেল, বলল শালাদের আমি খুন করব।

অরুণ বলল, কোথায় লেগেছে মেসোমশাই।

ভুবনবাবু, বললেন, জল খাব রমা।

ওরা সবাই বুঝতে পারল, পাঁজাকোলে করে তুলে নিয়ে যেতে হবে। রমা মুখ নিচু করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সব রাগ কেন জানি এখন মানুর ওপর গিয়ে পড়ছে। নীরজা দরজায় হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে। ভুবনবাবুকে বিছানায় শুইয়ে দিলে, রমা জল নিয়ে এল। ভুবনবাবু উঠে বসতে চাইলেন। অরুণ বলল, বসতে পারবেন?

ভুবনবাবু উঠে ততক্ষণে বসে পড়েছেন। জলটা খেলেন। তারপর বললেন, তোমাদের একটা কথা বলছি, মানু যদি বাড়ি ফিরে আসে, ওকে কিন্তু এসব কিছু বল না।

অরুণ বলল, পুলিশের অত্যাচার দিন দিন বাড়ছে। অথচ যা চেহারা দেখছি কোনদিক থেকে ঝড় উঠবে বলা যাচ্ছে না। সেও বলল, মানুকে না বলাই ভালো। ওদের দলটাও বসে নাই। তারপরই অরুণ বলল, আচ্ছা রমা, মানু এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তোমরা কেউ আগে তো আমায় বলনি!

এই প্রথম রমা কেমন মানুর পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলল, একে নষ্ট হওয়া বলে অরুণ!

তা হলে তোমাদের আসকারাতেই এটা হয়েছে!

রমা বলল, না তাও না। যা সময়কাল অরুণ, এটাই হওয়ার কথা। আমরা ধরে বেঁধে কতদিন আর সব ঠিকঠাক রাখব। তারপর রমা বুকের আঁচল টেনে বলল, তবে আমরা ওকে আসকারা দিইনি। বাড়িতে খুব বেশি একটা সময় মানু এদিকটায় থাকতও না। পড়াশোনাও মন দিয়ে করল না। অবশ্য ওরই বা দোষ কী বল—চারপাশে যা সব দেখছে!

কী দেখছে?

কী দেখছে না বল?

হঠাৎ রমাকে বিপ্লবী কথাবার্তা বলতে দেখে অরুণ এই পরিবারের এত দুঃখের সময়েও না হেসে পারল না।

তুমি হাসছ?

না হাসছি না।

দেখছ না চারপাশে কেমন সব ধান্ধাবাজ মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর কেমন অপরাধীর গলায় বলল, আমরাও অরুণ ভালো ছিলাম না।

অরুণ আর কথা বলতে পারল না। এই পরিবারে সবারই বুকে কথাটা বড় বেশি বাজল। সংসারে পাপ ঢুকে গেলে এমন হয়—এই এক বিশ্বাস নিয়ে ভুবনবাবু আপাতত চোখ বুজে পড়ে থাকলেন। নীরজা পায়ের কাছে বসে ভুবনবাবুর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।

সন্ধ্যার পরই লোডশেডিং। পাড়াটা অন্ধকার। কেমন নিঝুম হয়ে গেছে। পাশের বাড়িটার একতলায় ব্যাংকের অফিস। ওপরের তলায় ব্যাংকের এজেন্টের কোয়ার্টার। ওদের বাড়িতে এ সি জ্বলে, চারপাশে যখন অন্ধকার থাকে, তখন ও—বাড়িটায় আলো জ্বলে। সেই আলোতে ভুবনবাবুর ঘরটা কেমন আবছা ফ্যাকাশে বিবর্ণ রঙ ধরেছে। টেবিলে ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে গেছিল নীরজা। ভুবনবাবু এখন অন্ধকার পছন্দ করছেন বলে আলোটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর সেই সময় মনে হল খুট খুট করে কেউ কড়া নাড়ছে। গোপনে মানু ফিরে এল না ত! ভুবনবাবু খুবই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি উঠতে যাবেন, তখন মনে হল কেউ দরজা খুলে দিচ্ছে। তিনি দরজার মুখে গিয়ে দেখলেন, চুপি চুপি কেউ করিডরে ঢুকতেই নীরজা দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। অস্পষ্ট আলোতে তিনি বুঝতে পারলেন না কে ঢুকছে। রমা নীরজা দু জনই আছে। তারাও কিছু বলছে না। তিনি বললেন, কে!

বুককি।

বুককি! সে কে!

ভুবনবাবু মানুর বন্ধুদের খুব একটা চেনেন না। আলো থাকলে তিনি মুখ দেখলে চিনতে পারতেন।

রমা বলল, গোবিন্দবাবুর ছেলে।

অঃ।

তারপরই মনে হল সে যদি মানুর খবর রাখে। রাখারই কথা। বলে যেতেও পারে তাকে! তিনি বললেন, বুককি এদিকে আয়।

খুব সতর্ক বুককি। সে এসে ঘরে ঢুকেই ফিস ফিস করে বলল, জয়াকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ!

জয়াকে!

রমা বলল, জয়াকে দিয়ে কী হবে?

পুলিশের ধারণা জয়া সব খবর রাখে মানুর।

ভুবনবাবু বললেন, জয়া যদি বলে দেয় সব।

রমা নীরজা দাঁড়িয়েছিল। বুককিও দাঁড়িয়ে আছে। ভুবনবাবু খাটে বসে আছেন। আবছা বিবর্ণ অন্ধকারে তিনি বুককির মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না। কার কাছে কী আবার বলে ফেলবেন ভয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে আছো কেন, আলোটা এ ঘরে দিতে পারছ না?

রমা তাড়াতাড়ি টেবিল ল্যাম্প এনে রাখলে ভুবনবাবু বুককিকে চিনতে পারলেন। এ বাড়িতে মাঝে মাঝে এসেছে। তিনি বললেন, তুমি জানো মানু কোথায় গেছে?

বুককি কেমন ইতস্তত করতে থাকল।

আমি তো ওর বাবা! ও যতদিন ফিরে না আসবে আমি আর ঘুমোতে পারব না, জানো।

চিন্তা করবেন না। ও ভালো আছে।

কোথায় আছে?

সে আমিও জানি না মেসোমশাই। মানু এদিকে কেমন হয়ে গেছিল।

ওর কাছে প্রায়ই চিঠি আসত। আমিই দিতাম চিঠিগুলি।

তোমাকে কে দিত?

রোগা মতো একটা ছেলে দিয়ে যেত।

তুমি জানতে না, কোথায় থাকে সে।

না। বারবারই এক কথা বলত।

কী বলত?

বলত, অতসব জানার দরকার নেই। মানু বলেছে চিঠি তোমাকে দিতে। তুমি দিয়ে আসবে।

মানুর কাছে আসত না কেন?

এ পাড়ার কেউ কেউ তাকে চিনে ফেলতে পারে। ভয়ে আসত না।

তখনই মনে হল, গৌরীবাবুর ছেলে আজ সাত আট মাস হল পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। বুককি ঠিক এ—পাড়ার ছেলে নয়। সে থাকে জমির লেনে। দুটো বাস স্টপেজ পার হয়ে তাকে এখানে আসতে হয়। জয়া বুককিদের পাড়ার মেয়ে।

রমা বলল, ছেলেটা রোগা ফর্সা মতো?

ঠিক ফর্সা নয়, শ্যামলা রঙ।

চোখ বড় বড়?

চোখ বড় নয় বরং বেশ লম্বা বলা যেতে পারে।

এ পাড়ায় বছরখানেক আগে নানারকম খণ্ডযুদ্ধ লেগে থাকত। কোথায় উত্তরবঙ্গের একটা জায়গায় জোতদার খুন হল তারপর থেকেই ক্রমে শহরটায় কেমন একটা চাপা আক্রোশ কারা ছড়িয়ে যাচ্ছে। শহরের উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে যারা বাঁচছে, যারা বস্তিতে থাকে, যাদের জীবনধারণের কোনো অবলম্বন নেই, তাদের পক্ষ হয়ে এই বিপ্লব। অন্নহীন মানুষের জন্য লড়াই। সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে মানুষের মুক্তি নেই এমন সব কথাবার্তা চারপাশে কারা ফিস ফিস করে কানে কানে যেন কেবল বলে যাচ্ছিল।

রমা জানত কোনোরকমে যদি একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারত মানুকে তবে এই কানাকানির ভয় থাকত না। এবং একসময় সে অরুণকে বলেছিল, যে—কোনো একটা কাজ দিয়ে অরুণ ওকে এখন বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তুমিত জানো, উঠতি ছেলেদের কী ছোঁয়াচে রোগে ধরেছে। ওকে ভুবনেশ্বর পাঠিয়ে দাও। ওখানে তো আমাদের একটা সেল—এম্পোরিয়াম আছে। তুমি ইচ্ছে করলেই পারো।

অরুণ বলেছিল, একটু সময় দিতে হবে।

রমা বলেছিল, কিন্তু জানোতো আমাদের পাড়াটা ভালো না। নষ্ট হয়ে যেতে কতক্ষণ। রমা কিংবা নীরজা অথবা ভুবনবাবু যা আশঙ্কা করেছিলেন শেষ পর্যন্ত মানু তাই হয়ে গেল।

ভুবনবাবু বললেন, জয়াকে ছেড়ে দিয়েছে?

না।

তুমি বসো না। নীরজা একটা মোড়া এনে দিল। নীরজার চোখমুখ শুকনো। ভানু বাড়ি নেই। অরুণ আর ভানু সেই দাদাটির সঙ্গে পরামর্শ করতে গেছে। কারণ পুলিশের পাল্লায় পড়লে সহজে আর রক্ষা থাকে না। কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে নিয়ে যাবে সেজন্য আগে থেকেই সতর্ক থাকা ভালো। মস্তান দাদাটিকে পুলিশ খুবই ভয় পায়। তার কারণ দাদাটি তার বাড়ির বসার ঘরে একটা এমন ছবি টাঙিয়ে রেখেছে, যা দেখলে পুলিশের হৃৎকম্প না উঠে উপায় নেই। সেই ফোটোটাই তার তুরুপের তাস।

ভুবনবাবু খুব বিস্ময়ের গলায় বললেন, জয়া ওখানে থাকবে কোথায়?

পুলিশ লক—আপে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভুবনবাবু আর্ত চিৎকার করে উঠলেন, পুলিশ লক—আপে!
রমা বলল, ও কী মিসায় অ্যারেস্ট হয়েছে?
সে জানি না।
ভুবনবাবু বললেন, ভাবতে পারছি না! তিনি নিজের ওপর দিয়ে যা প্রত্যক্ষ করে এসেছেন, তার যদি বিন্দুমাত্র জয়াকে জিজ্ঞেস করে কিংবা দৈহিক নির্যাতন করে, এবং আরও কিছু উৎকট দৃশ্য চোখের ওপর ভাসতেই কেমন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা পারোনা বুককি, এখনই গিয়ে থানাটায় আগুন ধরিয়ে দিতে? একটা সামান্য মেয়ে, কী ভালো মেয়ে, শুনেছি মেয়েটা সাত পাঁচে থাকে না, কবিতা লেখে, সেই মেয়েটাকে তোরা নিয়ে গেলি!
রমা বলল, কী বলছ যা—তা বাবা!
ভুবনবাবুর খেয়াল হল, জয়ার পর রমা। এমনকি রমার পর নীরজাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে। পুলিশের হাতে অসীম ক্ষমতা। তিনি মুখে কুলুপ এঁটে দিলেন। আর একটা কথা বললেন না।
নীরজাই কেমন বোকার মতো বলল, ওকে মারধোর করেনি ত কথা বার করার জন্য?
ওর মাতো শুনেই অজ্ঞান। ওর বাবা ছুটোছুটি করছে। ওর পিসিমার দেওর পুলিশে কাজ করে। রুমন আরও সব পাড়ার ছেলেরা থানায় গেছে। পিসিমা গেছে ওর দেওরের কাছে।
ভুবনবাবু শুধু বললেন, কী যে হবে!
তারপর সবাই চুপ। বুককিও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ছেলেটাকে। কার কোপ কার ঘাড়ে পড়বে কেউ বলতে পারে না। কেমন ভীতসন্ত্রস্ত চোখমুখ। পুলিশ যদি জানে সেই পত্রবাহকের কাজ করছে তবে তাকেও ধরে নিয়ে যেতে পারে। এখন ছুতো পেলেই হয়েছে। বুককি বলল, আজ রাতের ট্রেনে আমিও চলে যাব। মুর্শিদাবাদে আমার মাসিমা থাকেন। তারপরই থামল, না বলা ঠিক হচ্ছে না। বড়ই গোপন রাখা দরকার। কোথা থেকে কীভাবে ফাঁস হয়ে যাবে কেউ জানে না। পুলিশের গুপ্তচর এখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে। তা না হলে জয়ার সঙ্গে মানুর সামান্য সম্পর্ক আছে সেটাই বা টের পেল কী করে পুলিশ। সে উঠে পড়ল। —আমি যাই।
ওরা কেউ আর একটা কথা বলল না। সে উঠে চলে গেল। সকালবেলায় দৈনিক কাগজে ভুবনবাবু দেখলেন, আবার দুজন পুলিশ খুন! ভুবনবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুনের খবরগুলি পড়লেন। পরদিন আবার দেখলেন, খুন, এবার ম্যানেজার এবং পর পর পাঁচদিন, পাঁচ জায়গায় পাঁচটি ম্যানেজার খুন দিনের বেলা, চার পাঁচটি ছেলে প্রকাশ্য রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েছিল। বাস ট্রাম সব থামিয়ে দিয়েছে। সব লোক নিমেষে ফাঁকা, দরজা—জানালা বন্ধ করে দিয়েছে ভয়ে সবাই। ম্যানেজারকে টেনে এনে গলার নলি কেটে ওরা উধাও হয়ে গেছে। যাওয়ার আগে দমাদম বোমা ফাটিয়েছে রাস্তায়।
একটা কিছু হচ্ছে। তারই নাম বুঝি বিপ্লব। গাঁয়ে গঞ্জেও সব বীভৎস খবর। স্কুল কলেজে হামলা ছাত্র নিহত হচ্ছে। আগুন দেওয়া হচ্ছে। যেন আজকালকার মধ্যে মুক্তি মিলে যাবে মানুষের। দেয়ালে দেয়ালে লেখা ফুটে উঠছে সত্তর দশক, মুক্তির দশক। সরকার হিমসিম খাচ্ছে, পুলিশ হিমসিম খাচ্ছে। ভয়ে আর কেউ পুলিশের কাজ নিচ্ছে না। কয়েক মাসের মধ্যে বিত্তবান মানুষের মধ্যে ভয়ংকর সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়তে থাকল।
শীতকালে ভানুর বিয়ে হয়ে গেল। নম নম করে কাজ করা হল। মল্লিকা বিয়েতে তার বড় মেয়েকে নিয়ে এসেছিল। মাঝে ভুবনবাবু একদিন মল্লিকাদের বাড়ি গেছিলেন। স্বামী মারা গেছে পাঁচ সাত বছর আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিল। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করত। বড় মেয়ে মিনু সেই সংসারের হাল ধরেছে। মেয়েটা ভালোই রোজগার করে। এখনও মল্লিকার ঘর বেশ রুচিসম্মত। মিনু কী কাজ করে কোথায় কাজ করে বললে মল্লিকা কেন জানি এড়িয়ে গিয়েছিল। মল্লিকা আত্মীয় স্বজনের কাছেও একটা বড় যায় না। ভানুর আশীর্বাদের দিন প্রায় জোর করেই মল্লিকাকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি দেখেছেন, সব

সময় মল্লিকা খুবই বিষণ্ণ থেকেছে। নিজের অভাবের কথা একসময়ে সে আত্মীয়স্বজনদের জানিয়েছিল। তখন কেউ বড় একটা সাহায্য করেনি। ভুবনবাবুরও ক্ষমতা ছিল না সাহায্য করার। এবং অভিমানবশেই আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে মল্লিকা দূরে সরে গেছে। বউভাতের দিন মল্লিকা মিনু দু'জনেই এসেছিল। মিনু মেসোমশাইর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সময় কেন জানি কেঁদে ফেলেছিল।

তিনি ভেবেছিলেন, মানুর কথা ভেবে বুঝি মেয়েটা কেঁদে ফেলেছে। তিনি তাড়াতাড়ি তাকে তুলে বলেছিলেন, আমার কপালে এই লেখা আছে মিনু। তুই এজন্য কাঁদিস না।

বলা ভালো মানুর আত্মগোপনের পরের সপ্তাহে থানার পুলিশ অফিসারটিও খুন হয়েছিল। গুজব জয়াকে সেই পুলিশ অফিসারটি ধর্ষণ করেছিল। কে বা কারা অদৃশ্য এক রন্ধ্র থেকে গুলি করেছিল এবং যাবার সময় ওর পুরুষাঙ্গটি কেটে দিয়ে গেছে।

ছাব্বিশ

নানু এখান থেকে চলে যাবার পর দুখানা চিঠি লিখেছে। চিঠি দুটো রাসবিহারী খুব যত্নের সঙ্গে তার নিজস্ব কাঠের বাক্সে রেখেছিলেন। তিনি ভাবলেন, চিঠি দুটো ফের আর একবার পড়ে দেখবেন। আজ দুপুরে রানুরও চিঠি এসেছে। চিঠিতে এবার রানু নানুর সব খবর জানার জন্য খুব উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এতদিন পরে ছেলের জন্য এই উদ্বেগটুকুতে রাসবিহারী বিশেষ প্রসন্ন। নানু মার কথা তার চিঠিতে কোথাও উল্লেখ করেছিল কী না, যদি না করে থাকে—আসলে কী একটা বয়েস হয়ে যায়, যখন ছেলেমেয়েরা নিজস্ব এক জগতের বাসিন্দা হয়ে যায়—তখন সম্পর্কে চিড় ধরে বোধহয়। কিন্তু আশ্চর্য চিঠি দুটো খুঁজে পেলেন না। তিনি তো চিঠি দুটো তার কাঠের বাক্সেই রেখেছিলেন। এখন আর কাউকে ডেকে বলতে পারেন না, তোমরা আমার বাক্স কেউ হাঁটকেছ। শেষ দিকে মিতার এই স্বভাব ছিল। টাকাপয়সার দরকার হলে সে অনেক সময় বাক্স হাঁটকাত। টাকাপয়সা তিনি সবসময় বইয়ের ভাঁজে রাখেন। বাক্সটায় তার কিছু ধর্মগ্রন্থ আছে। পাতার ভাঁজে ভাঁজে টাকা, চিঠি, পুজোর ফুল বেলপাতা, এবং তাবিজ ও একটি রুদ্রাক্ষের মালা সবই ঠিক আছে অথচ চিঠি দুটো নেই।

তিনি অগত্যা মেয়ের চিঠির জবাব লিখতে বসলেন। লিখবেন, নানু ভালো আছে। ওর পর পর দুখানা চিঠি পেয়েছি। ওখানে ও জমিজমা কিনে চাষ—আবাদ করবে বলে জানিয়েছে। শহর তার ভালো লাগছে না। সে লিখেছে, আমি একটা নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছি দাদু। ফুল ফল গাছপালার কথাও লিখেছে। রাতের জ্যোৎস্না খুব মায়াবী। সকালের সূর্য আশ্চর্য প্রাণপ্রাচুর্য এনে দেয়। দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, আর রাতের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে অজস্র নক্ষত্রমালা দেখতে দেখতে প্রায়ই তার মনে একটা প্রশ্ন জাগে, এবং সে প্রশ্নটা বাকি জীবনের সত্যাসত্য নিয়ে। নানু লিখেছে, দাদু তুমি নিজেও এই পৃথিবীতে এনে এমন একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। শেষে লিখেছে, আমি যে লাল বলটা হারিয়েছিলাম, এখানে এসে সেটা ফিরে পেয়েছি।

পরের প্যারাতে কী লিখবেন ভাবলেন, নানু সম্পর্কে চিঠি থেকে তার এই কথাটুকু মনে হয়েছে। তিনি নানুকে লিখেছিলেন, মাকে চিঠি দিয়ো। রানুকে চিঠি দিলে পত্রে তার উল্লেখ থাকত। পত্রে নানুর চিঠির কোনো উল্লেখ নেই দেখেই বুঝতে পারলেন, নানু তার মাকে কোনো খবরই দেয়নি। এমনকি আর কাউকে সে চিঠি লেখেনি। অবশ্য নানু যে স্বভাবের তাতে আর কাউকে সে চিঠি লিখতেও যাবে না। চিঠি পাবার পর মনে হয়েছে একবার তিনি সত্যি নানুর কাছে চলে যাবেন। কিন্তু স্টেশন থেকে পাঁচ সাত ক্রোশ হেঁটে গেলে নানুর সেই স্বপ্নের দেশ। এ—বয়সে এতটা পথ হাঁটতে পারবেন কিনা সংশয়ে এখনও তাঁর যাওয়া হয়ে উঠল না। সংসারে তিনি এখন মুক্ত। অথচ কথাটা যত সহজে ভাবতে পারলেন জীবনযাপনে যদি তার বিন্দুমাত্র আঁচ পাবার চেষ্টা করতেন। হাজার রকমের গেরো তাঁকে সবসময় বিড়ম্বনার মধ্যে রেখে দিয়েছে। হেমর শরীর দিনকে দিন খারাপের দিকে। ইদানীং শ্বাসকষ্টে ভুগছে। ওষুধপত্রে কাজ দিচ্ছে না। টোটকা করেছে কিছুদিন, তারপর দেবস্থানে গিয়েছে। বর্তমান গুরুর খোঁজে আছে। কোনো এক ব্রহ্মচারীর খবর পেয়ে দুদিন সেখান থেকে ঘুরে এসেছেন। কিন্তু গুরুটিকে পছন্দ হয়নি। তবে বাড়িতে সাঁইবাবার ছবি ঝুলিয়ে

কিছুদিন বেশ প্রশান্তিতে ছিল, কিন্তু শ্বাসকষ্ট বাড়তেই সে বলেছে, আমাকে প্রভুর কাছে নিয়ে চলো। মনে মনে তার প্রভু ঠিক হয়েই আছে—অযথা গুরুর খোঁজাখুঁজি করেছে। শীতের শেষে ভেবে রেখেছেন, এবার প্রভুর কাছে হেমকে নিয়ে যেতেই হবে। প্রভুর দর্শনে যদি হেম আরোগ্য লাভ করে। নানুর কাছে কবে যাবেন কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারছেন না।

চিঠি লিখতে বসে এই সব হাবিজাবি রাসবিহারীর মনে আসতে থাকে। মানুষের মৃত্যুভয় সব আত্মপ্রত্যয় নষ্ট করে দেয়। অথচ সহজভাবে ভাবলে, এটাই কী নিয়ম, এভাবেই মানুষ সংসার করতে করতে একদিন শেষ হয়ে যায়, এটা বোঝা উচিত। হেমকে এসব বলেও লাভ নেই। বয়স হলে রক্তের জোর কমে আসে, শরীরের ক্ষমতা কমে আসে, মহাপ্রস্থানের পথে তখন রওনা হতে হয়। এবং এসময় কিছু তীর্থস্থান দর্শনে মনে প্রসন্নতা আসে। তিনি লিখলেন, তোমার মার শরীর ভালো না। ভাবছি তোমার মাকে নিয়ে কিছুদিন দক্ষিণভারত ঘুরে আসব। তারপর কী লেখা যায়—মণীষের কথা লিখবেন কিনা ভাবলেন। তাঁর বড় মেয়েটি রুগণ। মণীষের সঙ্গে রানুর অবৈধ সম্পর্কটি তিনি এ—বাড়িতেই টের পেয়েছিলেন। কিন্তু চোখ বুজে থাক ছাড়া উপায় ছিল না। শরীর বলে কথা। তারপর তিনি আরও দু—লাইন লিখলেন, ভানুর চিঠি পেয়েছি, সে ভালো আছে। মিতা গত রবিবারে ভানুকে নিয়ে এসেছিল। ওরা দুপুরে এখানে খেয়েছে।

তারপরের লাইন লিখতে গিয়েই মনে হল, আসলে মানুষের মুক্তি বলে কিছু নেই। তিনি মুক্তি খুঁজছেন, আসলে সেটা সব কিছুর সঙ্গে শুধু কমপ্রমাইজ করে চলা। নানুও কী তাই করছে। না সত্যি সে মানুষের আরও বড় সত্যাসত্য আবিষ্কার করে ফেলেছে। কারণ রাসবিহারীর ধারণা মানু আর দশটা ছেলের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। সে বড় একটা কিছু করে ফেলতে চায়। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মনে হল সামান্য একটা ঝি—মেয়ের জন্য যে চলে যায়, তার পক্ষে বড় কিছু করা অসম্ভব। তিনি লিখলেন, নানু চিঠিতে ঝি—মেয়েটির কোনো কথাই লেখেনি। তারপরই মনে হল, এ—বাক্যাংশটি রানুকে পীড়া দেবে। ভেবে কেটে দিলেন। বেশ ভালো করে কেটে দিলেন। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা তিনি চাইলেন না। শেষে লিখলেন নানু ভালো আছে। তুমি এলে আমি মানুর কাছে যাব। বুঝিয়ে বলব, দেখি কী হয়। সে সেই যে চলে গেল আর একবারও এল না। যদিও এসে থাকে কলকাতায়, আমার এখানে এল না। আর একটা কথা লিখছি, মণীশ তো স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আছে, তুমি কী ওকে দিয়ে পুলিশের মারফত নানুকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারো না। আসলে সে ওখানে পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করে আছে। মণীষের এত প্রভাব শুনছি, আর এতো সামান্য কাজ—একটা ঝি—মেয়ের জন্য ভদ্রসন্তান দেওয়ানা হয়ে যায় কবে কে দেখেছে। তিনি যে বাক্যাংশ কেটে দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাই আবার লিখলেন। মনের সেই আদিম সংস্কারের জায়গাটা খুঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে দিয়ে তাই লেখাল। তিনি তারপর কিছুক্ষণ টেবিলে বসে থাকলেন। চিঠি লেখা শেষ হয়েও হচ্ছে না। শরীর থেকে চাদরটা সরে যাওয়ায় শীত শীত অনুভব করলেন। চাদরটি ফের ভালো করে জড়িয়ে নিতেই মনে হল, ও—ঘরে হেম খুব কাশছে। হেমর ঘরে আজকাল তার যেতেও ভয় লাগে। সব সময় একটা না একটা অনুযোগ। যেন হেমর সব কষ্টের হেতু তিনি নিজে।

রাত বাড়ছিল। এত বড় বাড়িটাতে এখন তিনি আর হেম। কেন এই বাড়িটা যে করতে গেলেন! যৌবনে মানুষের কত স্বপ্ন থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সবই কাচের পাত্রের মতো মনে হয়। জীবনের ইচ্ছাগুলো বড়ই ক্ষণভঙ্গুর, তবু সব আগলে একটা প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো এই আবাসে তিনি বেঁচে আছেন। সামনের জানলা খোলা, লনে জ্যোৎস্না। কিছু গাছপালা ডুবে আছে। এই গাছপালাগুলোই মনে হয় তাঁর শেষ বেলার সঙ্গী। এবং বাড়িটিতে যদি তার নিজের রোপণ করা গাছপালাগুলি না থাকত, তবে যে—কোনো পান্থনিবাসের মতো বাড়িটাকে ছেড়ে তিনি অন্যত্র চলে যেতে পারতেন। তার সেজন্য এতটুকু কষ্ট হত না। কিন্তু গাছপালা বোধহয় মানুষের নীরব বন্ধুত্ব কামনা করে। শেষ বয়সে এটা তিনি বেশি টের পান বলে কোথাও গিয়ে দুচার দিনের বেশি থাকতে পারেন না। এ বাড়িটাতে এখন গাছপালাগুলিই তাঁর আকর্ষণ। হেম যে এতদিনের সঙ্গী ছিল, সেও দিনকে দিন অদ্ভুতভাবে জীবন থেকে সরে যাচ্ছে। যদি হেমর মৃত্যু হয় তার কোনো কষ্ট হবে

না। বরং কেন জানি কিছুদিন থেকে মনে মনে তিনি হেমর মৃত্যু কামনা করছেন। এই গেরোটা মানুষের খুবই বড় গেরো।

চিঠিটা ভাঁজ করলেন। কাল সকালেই চিঠিটা ডাকে দিতে হবে। রানু বিয়েতে এসেছিল মাত্র দুদিনের ছুটি নিয়ে। তখন ছেলে সম্পর্কে প্রায় নীরব ছিল। অথচ তার এই চিঠিটাতে নানুর জন্য ভারী আবেগের সঞ্চার হয়েছে। এতদিনে কী রানু শরীরের দিক থেকে কোথাও কিছু খামতি টের পেয়েছে। সে বুঝেছে কী শরীরের রক্তমাংসে আর তেমন বান ডাকার ব্যাপারটা নেই। ক্রমশ তা কমে আসছে। অথবা বয়সের রেখা ক্রমে শরীরে দগদগে ঘায়ের মতো ফুটে উঠছে। এখন তার একমাত্র সম্বল বলতে শ্রীমান দুর্গাদাস ওরফে নানু।

তিনি চিঠিটা টেবিলে রেখেই বাইরে বের হয়ে এলেন। শীতের জ্যোৎস্না তাঁর বাড়ির সর্বত্র এখন ছম ছম করছে। রাস্তায় দুটো কুকুর দৌড়ে যাচ্ছিল, আউট হাউসে নিধু ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। গোরুর ঘরে খচ খচ শব্দ হচ্ছিল। দূরে শেষ বাস অথবা রিকশার টুংটাং শব্দ তিনি লনে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলেন। শুনতে পেলেন, বহু দূর থেকে এক বালক, হাত তুলে তাঁকে যেন ইশারায় ডাকছে। বহুদূর অথবা যেন কোনো গতজন্মের ঘটনা, সেই বালকের হাত ধরে কেউ হাঁটছে। বাবার হাত ধরে সে কোথাও যাচ্ছে। তাঁর মনে হল বাবা এমনি শীতের রাতে তাকে লণ্ঠন নিয়ে আনতে যেতেন মাস্টারমশাইর বাড়ি থেকে। সে বাবার হাত ধরে বাড়ি ফিরত। বাবা বলতেন, সদা সত্য কথা বলিবে। বাবা প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষদের জীবনী বলতেন, রাসু তুমি বড় মানুষ হবে। এইসব ভাবলে তিনি কেমন বিমর্ষ হয়ে যান। তিনি চেয়েছিলেন এক, হলেন অন্য। প্রবঞ্চনা শঠতা বাদে এক সময় জীবনে তাঁর কোনো সম্বল ছিল না। এখন তাঁর মনে হয় কার জন্য তিনি জীবনে এই শঠতা এবং প্রবঞ্চনা সম্বল করে এখানে এসে পৌঁছেছেন। শূন্য এক মাঠ, খাঁ খাঁ মরুভূমির মতো যেন তাঁকে এখন গিলতে আসছে। তিনি একা লনে দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় পেলেন।

এবং ঘরে ফিরে মনে হল, এক পরিত্যক্ত আবাসে তিনি এসে ঢুকছেন। শুধু ইঁদুরের কিছু খুট খুট শব্দ শুনতে পেলেন। হেমর কোনো সাড়াশব্দ নেই। শ্বাসকষ্ট, যদি কম দম বন্ধ হয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় কেমন ভূতুড়ে একটা অস্তিত্ব অনুভব করে তিনি ভিতরে কেঁপে উঠলেন। এবং খুব সন্তর্পণে হেমর ঘরে ঢুকে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলেন। হেম ঘুমোচ্ছে। হেমর মৃত্যু হয়নি তো! নিশ্বাস পড়ছে কী না ভেবে তিনি হেমর নাকের ওপর হাত রাখতেন, না, নিশ্বাস পড়ছে। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এই বাড়িতে একসময় সব ঘরগুলি শোরগোলে ভরে থাকত। ছয় মেয়ে এবং মেয়েরা বড় হতে থাকলে বাড়িতে যুবক আত্মীয়দের ভিড় লেগেই থাকত। সবসময় তখন হেম ছিল ব্যস্ত। একদণ্ড ওর দম ফেলবার সময় ছিল না। এক হাতে সব সে আগলে রেখেছিল। আত্মীয়স্বজনে বাড়িটা ভরে থাকত। কেউ এলে মেয়েরা ছাড়তে চাইত না। এখন মনে হয় সবই অন্য জন্মের ঘটনা। যদি নানুটাও থাকত। নানুর বউ এবং তখনই আবার একটা ঝি—মেয়ে এবং বংশের কৌলীন্য সব কেমন তার ঘিলুর মধ্যে রক্তের প্রবাহ বাড়িয়ে দিচ্ছে। নিমেষে তিনি একজন অবুঝ অভিভাবক হয়ে উঠলেন। তাঁর মনেই থাকল না, তিনি অসহায়, সবাই তাঁকে ছেড়েছুড়ে চলে গেছে। রক্তের মধ্যে কী যে এক নিছক আভিজাত্য মানুষের থেকে যায়। তিনি সব জটিলতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য অবশেষে বললেন, ঠাকুর সবই তোমার ইচ্ছা।

আসলে এই ইচ্ছার কথা বলে যতই তিনি রেহাই পেতে চান ততই তাঁকে যেন কেউ দম বন্ধ করে মারতে চায়। কেমন এক জ্বালা মাথার মধ্যে কেবল কুট কুট করে কামড়াচ্ছে। আমরা তোর কাছে এত পর হয়ে গেলাম! একটা ঝি—মেয়ে তোর সর্বস্ব হয়ে গেল : এবং এই করে রাসবিহারীর মনে হল সামান্য একটা মেয়ে তাঁদের সব কৌলীন্য কেড়ে নিচ্ছে। প্রথম দিকে যতটা হালকাভাবে নিয়েছিলেন, দিন যত যেতে থাকল তত কেমন গুরুত্ব বাড়তে থাকল আর তিনি ভাবতে থাকলেন, ক্রমেই হেরে যাচ্ছেন। অথচ এই জ্বালা তার আগে তেমন হয়নি। যেন আমার কী যার ছেলে তার কোনো মাথাব্যথা নেই, আমি কেন চিন্তা করে মারি। এ—সবই তাঁকে দীর্ঘকাল চুপচাপ থাকতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু রানুর উদ্বেগপূর্ণ চিঠি পেয়ে তিনি কিছুটা

বিচলিত বোধ করলেন। বিধবা মার তুই একমাত্র ছেলে, কত আশা—ভরসা—আর তুই এখন একটা ঝি—মেয়ের সঙ্গে থেকে সত্য দর্শন করছিস।

আগামীকাল ভুবনবাবুর বাড়িতে তাঁর যাবার কথা। ভুবনবাবুর ছেলেটিরও খোঁজ নেই। নানুর মতো উগ্র রাজনীতির শিকার। ভুবনবাবুর সঙ্গে তাঁর জীবনের কোথায় যেন বড় রকমের একটা মিল আছে। শোবার সময় তিনি জল খেলেন, এবং ঘুমের ওষুধ খেলেন। আজকাল ঘুমের খুব ব্যাঘাত হচ্ছে। সারারাত কোনো কোনো দিন জেগে থাকেন। রাস্তায় গাড়ির শব্দ পান, খুব নিশুতি রাতে পাতা পড়লেও তিনি টের পান, গাছ থেকে পাতা ঝরছে।

পরদিন রাসবিহারীবাবু সকাল সকাল ভুবনবাবুর বাড়িতে চলে গেলেন। দু'জন সমবয়সি মানুষের দেখা হলে কিছুটা হালকা হবেন ভেবেছিলেন তিনি। সেখানে গিয়ে দেখলেন প্রিয়নাথও হাজির। আজকাল কী হয়েছে ভুবনবাবুর, তিনি মাঝে মাঝে কোনো বুড়ো মানুষের সঙ্গে দুদণ্ড কথা বললে সুখ পান। রমা তাঁকে অফিস থেকে ফোনে এমনই বলেছিল। আপনি আসবেন মেসোমশাই। বাবা আজকাল কেমন হয়ে যাচ্ছে। সে প্রিয়নাথকেও অফিস যাবার পথে বলে গেছিল। অন্তত বাবা কিছুটা সমবয়সি মানুষের সঙ্গে থাকলে স্বাভাবিক কথাবার্তায় মশগুল হয়ে থাকতে পারবেন। এবং কিছুদিন থেকেই ভুবনবাবু কতদিন বুড়ো মানুষের সঙ্গে দেখা হয় না বলে বেরই হয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

রাসবিহারী ভুবনবাবুর বাড়ি পৌঁছে দেখলেন, রমা অফিস ছুটি নিয়েছে। ভানুও অফিস যায়নি। মিতা এখনও এ—বাড়িতে রান্নাঘরের ছাড়পত্র পায়নি। প্রিয়নাথবাবু বিধবা বউমাও এসেছেন। অনেক দিন পর তিন সমবয়সি মানুষ বারান্দায় বসে প্রথমে দেশের দ্রব্যমূল্য নিয়ে কথা আরম্ভ করলেন। দ্রব্যমূল্য থেকে, দেশ বাড়ি, শৈশবকাল, বাবা জ্যাঠাদের গল্প, একান্নবর্তী পরিবারের গল্প, এভাবে বর্তমান প্রজন্মের কথাও এসে পড়ল।

রাসবিহারী বললেন, মানুর কোনো আর খবর পেলেন না!

ভুবনবাবু ধুতি কোঁচা দিয়ে পরেন। গায়ে ফতুয়া। চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। সাদা চুল এবং মুখ সদ্য কামানো বলে, খুবই শৌখিন মানুষের মতো দেখতে লাগছিল। ভুবনবাবু খুব লম্বা নন, খুব বেঁটে নন, এখনও অসুখ—বিসুখ কম। এদিকে রাতে দুবার উঠতে হচ্ছে, ব্লাডসুগার করাবেন। ভেবেছেন। রাতে আর ভাত খান না। দুধ রুটি এবং কলা এই প্রায় রাতের খাবারে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও চা—টাই বেশি খান। চা খেতে তিনি ভালোবাসেন। ইতিমধ্যে একবার চা হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় রাউন্ডের চা এসেছে। বেতের চেয়ারে গোল হয়ে বসছেন। তাস পাশা খেলার অভ্যাস থাকলে এ সময়ে এটাই জমে ওঠার কথা। কিন্তু ভুবনবাবুর তাস পাশার নেশা নেই, এক সময়ে বই পড়ার নেশা ছিল, এখন পত্রিকা পড়ার নেশা। পত্রিকার খবর থেকে বিজ্ঞাপন, পাত্র—পাত্রীর খবর এবং আজ কোথায় যাবেন এই শিরোনামায় তিনি কিছু কিছু খবর নিয়ে বিকেল হলেই আজ কোথায় যাবেন জায়গাতে নিঃশব্দে কোনো কোনো দিন চলেও যান। রমার কাছে, ভানুর কাছে এটা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকছে। বাবাতো এমন ছিলেন না। কিছু বললে, বলেন, মহাবোধি সোসাইটিতে গেছিলাম। বেশ বললেন, দয়ানন্দজী। ধর্ম সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেল বলে আজ দেশের এই দুরবস্থা। অবশ্য এখন মানু সম্পর্কে রাসবিহারী কিছু জানতে চাইছেন। কী বলবেন ভাবছিলেন। গোটা চারেক উড়ো চিঠি এসেছে, কে বা কারা করিডোরে রাতে ফেলে যায়। —আমি ভালো আছি বাবা। এই চারটি শব্দ লেখা থাকে। হাতের লেখা থেকে তিনি বুঝতে পারেন ওটা মানুরই চিঠি। কাজেই তিনি বললেন, মনে হয় ভালোই আছে। না থাকলে খবর পেতাম।

প্রিয়নাথ এই মানুষটি যে এমনই জবাব দেবে জানতেন।

প্রিয়নাথ বলল, ভুবন চলো আমরা কোথাও কিছুদিন ঘুরে আসি। রাসবিহারীবাবুও চলুন।

রাসবিহারী পরেছেন সিল্কের পাঞ্জাবি এবং ফাইন ধুতি। পায়ে পামসু মোজা। স্নান সেরে আহ্নিক করে তবে এসেছেন। এখনও সকালের শীত বারান্দায় জমা হয়ে আছে। ভুবনবাবু সুতোর চাদর গায়ে জড়িয়ে

রেখেছেন। প্রিয়নাথের পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। এটাই তার পোশাক। গায়ে জহরকোট। প্রিয়নাথ একসময় স্বদেশি করত। দেশ স্বাধীন হবার পর তার আত্মত্যাগের দৌলতে সরকারের তথ্য বিভাগে বেশ বড় চাকরি করেছে। এবং এখন রিটায়ার করার পর শৌখিন মানুষের মতোই বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। পুত্রের মৃত্যুর জন্য যতটা কাতর হবার কথা তার বিন্দুমাত্র চোখে লেগে নেই। প্রিয়নাথের প্রস্তাবে সবারই সায় থাকা সত্ত্বেও কেউ কোনো জবাব দিলেন না।

কেবল রাসবিহারী বললেন, কোথায় যাবেন?

যেদিকে চোখ যায়, সেদিকে—এখন তো আমাদের সবারই পিছু টান কমে এসেছে।

ভুবনবাবু সামান্য সময় চুপ করে থাকার পর একটু মুচকি হেসে প্রিয়নাথকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কোথায় যাবে? যেখানেই যাও সেই এক দৃশ্য—মনে হবে তুমি বড় পিছিয়ে পড়েছ। সবাই দৌড়াচ্ছে। এটা দেখতে কার ভালো লাগে বলো। তারপরই বললেন, নানু এসেছিল। বলল মেসোমশাই একবার আমাদের দিকটাই ঘুরে আসবেন! মন প্রফুল্ল হবে। বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পাবেন।

রাসবিহারী এমন একটা খবরে ব্যথিত হলেন। নানু এখানে এসেছে অথচ তাঁর কাছে যায়নি। এমন কী তার রাগ হল ভেবে, মিতা কিংবা ভানু কেউ খবরটা দেয়নি। রাসবিহারী বললেন, কবে নানু, এসেছিল?

সে তো মনে করতে পারছি না। কেউ বাড়ি ছিল না। নীরজা দুপুরে নিদ্রায় মগ্ন ছিল। ও আমার সঙ্গেই দেখা করে গেল। বলল, কীসের একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং—এ এসেছিল। মানুর খবর কিছু রাখে কিনা বলতে বলল, ও নিয়ে ভাববেন না। মানু কখনও খারাপ কাজ করতে পারে না। তাছাড়া মানু ভালো আছে। আজ হোক কাল হোক ওর সঙ্গে মানুর দেখা হবেই। কী বিশ্বাস থেকে এমন বলল, তাও বুঝতে পারলাম না। আরও কত কথা। এমন সুন্দর কথা বলতে পারে ছেলেটা—সে বলছে, সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এখন আর কারও ওপর তার কোনো রাগ নেই। জীবনে সৎ এবং পরিশ্রমী হওয়া বাদে মানুষের নাকি আর কিছু করণীয় থাকে না। হালের রাজনীতি নিয়ে কথা হল, উগ্র রাজনীতি নিয়েও সে কথা বলল। আজকের যারাই সৎ দেশে তারা কিছু করতে চায়। কীভাবে করবে ঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তবে একটা কিছু ঠিক হবেই। এভাবে একটা দেশের মানুষ বেশিদিন বাঁচতে পারে না বলেও তার বিশ্বাস। যদি যাই ওর কাছেই যাব।

রাসবিহারী কেমন বিভ্রমের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন। নানুর চিঠির সঙ্গে এসব কথার যেন কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি বললেন আমাকে কেউ খবরটা দিল না!

আপনি জানেন না সে এসেছিল!

না।

ভানু কিছু বলেনি!

না।

তাজ্জব! নানু যে এসেছিল, ওদের আমি বলেছি। গোপনে মানুও আসে। কারও সঙ্গে দেখা করে না। শুধু আমার সঙ্গেই কথা হয় গোপনে। তবে কী জানেন, আজকাল আমার ছেলেমেয়ে বউ কেউ আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না। ভাবে। আমার মাথা খারাপ।

তারপর কেন জানি কেউ আর একটা কথা বলতে পারল না। সবাই দেখল ভুবনবাবু কেমন উদাস মুখ করে বসে আছেন। রাসবিহারী রাস্তা দেখছিলেন। প্রিয়নাথ মাথা নিচু করে বসে আছেন। তিনজন সমবয়সি মানুষ আজ বড় বেশি টের পেলেন কেউ তাঁরা ঠিকঠাক বেঁচে নেই। তাঁদের জীবনের সবকিছু এক অদৃশ্য শক্তি ধীরে ধীরে হরণ করে নিচ্ছে।

নগ্ন ঈশ্বর

এক

শেষ রাতে তুষারঝড়ে পড়ে জাহাজ বন্দর ধরছে।

প্রায় মাসখানেক পর জাহাজ এবং জাহাজিরা লেগুনের মুখে বন্দরের আলো দেখতে পেল।

আর তুষারঝড়ের জন্য জাহাজিরা রেনকোট গায়ে ডেকের উপর ছুটোছুটি করছে, ওরা দড়িদড়া ফেলে দিচ্ছে নিচে। জেটিবয় সেই সব দড়িদড়া অথবা হাসিলের সাহায্যে জাহাজ বন্দরে বাঁধছে। মেজ মালোমকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে না—তিনি দু'হাত তুলে বিচিত্র এক ভঙ্গিতে ডেক—জাহাজিদের দড়িদড়া হাপিজ অথবা হাড়িয়া করতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

তখন জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব অবনীভূষণ পোর্টহোলে উঁকি দিল। শেষরাতে জাহাজ বন্দর ধরছে, জাহাজ সেই কবে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল থেকে নোঙর তুলে সমুদ্রে ভেসেছিল, কবে কোন এক দীর্ঘ অতীতে যেন। তারা বন্দর ফেলে শুধু সমুদ্র এবং সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপ—বালির অথবা পাথরের জনমানবহীন দ্বীপ দেখেছে। তারা সেই দ্বীপের ঝাউগাছ এবং অপরিচিত গাছগাছালি দেখে চিৎকার করার সময় মনে করত—জাহাজ বুঝি আর কোনোদিনও বন্দর ধরবে না। শুধু সমুদ্র, এবং নীল জল, নীল আকাশ আর হয়তো ক্বচিৎ কোথাও সমুদ্রের চিড়িয়াপাখি—দূরে কখনও ডলফিনের ঝাঁক....। পাঁচ নম্বর সাবের মনে হত জাহাজ ওদের নিয়ে অন্তহীন এক সমুদ্রে যাত্রা করেছে। ওরা বন্দরে কোনোদিন পৌঁছাতে পারবে না, জাহাজ ওদের সঙ্গে তঞ্চকতা করছে।

সুতরাং এই তুষারঝড়ের ভিতরও জাহাজিদের প্রাণে উল্লাসের অন্ত ছিল না। মেজ মালোম প্রায় ছুটে ছুটে কাজ করতে জাহাজিদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন। সামনে পাহাড়, আলো, মাটি এবং মানুষের বসতি। ওখানে কোথাও রমণীদের গৃহ আছে। মেজ মালোম উত্তেজনায় রা রা করে গান গাইতে থাকলেন। তুষারঝড়ের জন্য ওঁর কণ্ঠ ভয়ংকর কঠিন মনে হচ্ছিল আর তুষারঝড়ের জন্য সব পোর্টহোল বন্ধ। কাচের ভিতর থেকে এখন অন্যান্য জাহাজিরা বন্দর দেখছে। বন্দরটা ছোট অথচ খুব সুন্দর মনে হচ্ছিল। ক্রমশ আলো ফুটছে, ক্রমশ তুষারঝড় কমে আসছিল। আর এক এক করে সব আলো পথের এবং জেটির এক সময় নিবে যেতে থাকল। দূরের গির্জায় তখন ঘণ্টা বাজছে, জাহাজিরা সকলে ডেকের উপর উঠে এল এবং সকলে রেলিঙে ঝুঁকে পড়ছে। আবেগে উত্তেজনায় জাহাজিরা বন্দরের সকল ঘাস মাটি ফুলকে ভালোবাসার কথা জানাল।

বন্দরের প্রথম দিন এবং রবিবার। জাহাজিদের ছুটির দিন। ওরা হইহই করে আকাশ পরিষ্কার হলেই বন্দরে নেমে যাবে। শুধু তুষারঝড়ের জন্য ওরা বিরক্ত। জাহাজের পাঁচ নম্বর সাব অবনীভূষণ পোর্টহোলে বারংবার হাত রেখে ঝড়ের সঙ্গে তুষারকণা পরখ করছিল। মনে হচ্ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র থেকে উঠে আসা ঠান্ডা বাতাস ক্রমশ কমে যাবে, যেন ওর ইচ্ছা এই ঠান্ডা বাতাস থেমে গেলেই সে তার প্রিয় তামাকের পাইপটি মুখে পুরে যুবতীর সন্ধানে বন্দরে বের হয়ে পড়বে। এইটুকু ভেবে অবনীভূষণ আয়নায় মুখ দেখল। ভয়ংকর মুখ অবনীভূষণের, কালো নিগ্রো—সুলভ চেহারা। চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু—জাহাজে অবনীভূষণকে বাঙালি বলে চেনাই যায় না। অবনীভূষণ শক্ত ধাতের মানুষ। অবনীভূষণ লম্বা আর অবনীভূষণের জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে। অবনীভূষণ মাকে দেখেছে, বাবাকে দেখেনি। 'অবনীভূষণ জারজ'—আয়নায় মুখ দেখার সময় পাঁচ নম্বর সাব কথাটা উচ্চারণ করল। এত দীর্ঘ ঋজু চেহারা অবনীভূষণের, আর এতবড় চোখ এবং মুখ অবনীভূষণের আর এত লম্বা থাবা অবনীভূষণের যে যুবতীরা কোনো বন্দরেই অবনীভূষণকে পছন্দ করে না।

ডেকে সামান্য কাজ অবনীভূষণের। ফরোয়ার্ড ডেকে দু'নম্বর মাস্টের নিচে উইনচ মেসিনের লিভার প্লেট আলগা হয়ে গেছে—ওটা সারাতে হবে। রবিবার তবু ওকে এই সামান্য কাজটুকু করতে হবে। বয়লার স্যুট পরে অবনীভূষণ ডেকে বের হয়ে গেল। চারিদিকে পাহাড়। তুষারঝড় কমে গেছে বলে আকাশ পরিচ্ছন্ন, লেগুনের জল সামান্য সবুজ রঙের; আর দূরে দূরে সব পাহাড় ক্রমশ উপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের কোলে সব পরিচ্ছন্ন লাল নীল কাঠের রঙবেরঙের বাড়ি, ইতস্তত বড় বড় প্রাসাদ এবং ঠিক সেতুর অন্য পাড়ে বড়

বড় কিছু স্কাইস্ক্র্যাপার। লেগুনের দু'পারেই শহর। ঠিক লৌহ আকরিকের গুদামখানার বিপরীত দিকের সেতুর ব্যালকনিতে অবনীভূষণ মানুষের ভিড় দেখল। সূর্য আলো দিচ্ছে সামান্য—খুব নিষ্প্রভ এই আলো, কোনো উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। অবনীভূষণ লেদার জ্যাকেটের ভিতরেও হু হু করে শীতে কাঁপছিল—সামান্য উত্তাপের জন্য পাঁচ নম্বরকে খুব দুঃখিত মনে হচ্ছে।

অবনীভূষণ হাতের কাজ খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলল। তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে নিজের বাংকে শুয়ে প্রতিদিনের অভ্যাসমতো কিছু নগ্ন ছবির উপর চোখ রাখতেই শুনতে পেল এলওয়েতে কে বা কারা যেন পায়চারি করছে। মেজ মালোমের গলার স্বর পাওয়া যাচ্ছে। তিনি খুব দ্রুত এবং জোরে হাসছেন। বোধহয় খুব সকাল সকাল তিনি যুবতী—সন্ধানের জন্য বের হয়ে পড়ছেন। অবনীভূষণেরও ইচ্ছা হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে, যখন পোর্টহোল দিয়ে অন্য তীরে তিমি শিকারের জাহাজ ভিড়তে দেখা যাচ্ছে, যখন দূরে কোথাও এক তৈলবাহী জাহাজ বাঁধা হচ্ছিল, যখন আর কিছু হাতের সামনে করণীয় নেই অথবা 'ট্যানি টরেন্টো' 'ট্যানি টরেন্টো' এক বিশ্রী শব্দ কানের কাছে ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে তখন মেজ মালোমের মতো টিউলিপ গাছের নিচে যুবতীর সন্ধানে বের হয়ে পড়াই ভালো। এত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অবনীভূষণ জাহাজ থেকে সকাল সকাল নেমে পড়তে পারল না। সে রাতের জন্য অপেক্ষা করল। কারণ দিনের বেলা এই চেহারা বড় ভয়ংকর। রাতের বেলায় অস্পষ্ট অন্ধকারে অথবা নিয়ন আলোর ভিতর, ফেল্ট ক্যাপের ভিতর আর বৃহৎ ওভারকোটের জন্য মানুষের মতো মনে হয় ওকে। সুতরাং হাত—পা শক্ত করে সে বাংকেই পড়ে থাকল। শরীরের ভিতর ভয়ংকর কষ্ট এবং উত্তেজনা। বন্দরে এলেই কষ্টটা বাড়ে। বন্দর ধরলেই এই সব জাহাজিরা অমানুষের মতো চোখ—মুখ করে ঘোরাফেরা করতে থাকে—কী যেন এক সোনার আপেল ওদের হারিয়ে গেছে—সেই আপেলের জন্য, সেই সোনার হরিণের জন্য ওরা সবসময় মাটি পেলেই দ্রুত ছুটতে চায়। অবনীভূষণ দ্রুত ছুটতে চাইল।

সন্ধ্যার সময় জাহাজের স্টারবোর্ড—সাইডের কেবিনগুলোর দিকে হেঁটে গেল সে। সেখানে প্রিয় বন্ধু ডেক—অ্যাপ্রেন্টিস উইলিয়াম উড থাকেন। সে দরজায় কড়া নেড়ে ভিতরে ঢুকে বলল, এ কি, তুমি এখনও চুপচাপ বসে রয়েছ! বের হবে না?

উড বলল, ভয়ংকর ঠান্ডা।

অবনীভূষণ বলল, অন্তত সিম্যান মিশানে চল। সেখানে জুটে যেতে পারে।

সুতরাং ওরা উভয়ে সাজগোজ করে বের হয়ে পড়ল। সেই লম্বা ওভারকোট গায়ে অবনীভূষণ, লম্বা তামাকের পাইপ মুখে এবং ভয়ংকর বড় বেঢপ জুতো পায়ে অবনীভূষণ গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল। আর নেমে যাবার মুখেই দেখল মেজ মালোম বন্দর থেকে ফিরছে। মেজ মালোম বেশ সুন্দরী এক যুবতীকে (বয়সে চল্লিশের মুখোমুখি) নিয়ে এসেছেন। যুবতীর পাতলা গড়ন, ছিমছাম চেহারা আর কালো গাউন, সোনালি ব্লাউজের উপর ফারের লম্বা মতো কোট গায়ে...। ওর কোমরে মেজ মালোমের হাত। যেন চুরি করে তিনি এক যুবতীকে জাহাজে নিয়ে যাচ্ছেন। সমুদ্র থেকে তেমনি ঠান্ডা বাতাস উঠে আসছে। তীক্ষ্ন শীতের ভিতর এই সামান্য উত্তাপটুকু অবনীভূষণকে অস্থির করে তুলল। মেজ মালোমকে সে 'গুড—ইভনিং সেকেন্ড' বলতে পর্যন্ত ভুলে গেল। সে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে।

তুষারপাতে গাছের সব পাতা ঝরে গেছে, আর কিছু দিন গেলে এখানে হয়তো বরফের পাহাড় জমে যাবে। বাগানের আপেল গাছগুলোকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল, চেরিফলের গাছগুলো মৃতবৎ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সব অপরিচিত গাছগাছালির ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে বলে কোনো গাছই চেনা যাচ্ছে না, ওরা বৃদ্ধ পপলার হতে পারে, পাইন হতে পারে, এমনকি বার্চ গাছও হতে পারে। এই শীতে পথের দু'পাশে কাঠের বাড়ি এবং লাল নীল রঙের শার্সির জানালা এবং বড় বড় কাচের জানালার ভিতর পরিবারের যুবক—যুবতীদের মুখ। অ্যাকর্ডিয়ানের সুর, গ্রাম্য কোনো লোকসংগীত অবনীভূষণকে ক্রমশ উত্তেজিত করছে। ইতস্তত দু'পাশে বার এবং বার পার হলেই সেই কার্নিভাল। সদর দরজার উপর একটা

লোক হাঙরের মুখোশ পরে বসে নানাভাবে জাহাজিদের প্রলুব্ধ করতে চাইছে। ওরা কার্নিভালে ঢুকল না। ওরা ক্রমশ পাহাড়ের উতরাইয়ে নেমে যাচ্ছে। আর ওরা দেখল, হরেক রকমের রমণীরা মুখে ফুঁ দিতে দিতে চলে যাচ্ছে—স্থানীয় কোনো উৎসব হবে হয়তো—মেয়েরা মাথায় রুমাল বেঁধে শহরের বড় কবরখানার দিকে হাঁটছে। অবনীভূষণের এ—সময় ইচ্ছা হচ্ছিল ওর বড় থাবা দিয়ে ঠিক ছোট পাখি ধরার মতো কোনো যুবতীকে ওভারকোটের পকেটে লুকিয়ে ফেলতে।

তুষারঝড়ের চিহ্ন এখনও এই সব পাহাড়ে এবং ছবির মতো বাড়িগুলোর মাথায় লেগে আছে। কোথাও দেখল, কাচের ঘরে সুন্দরী যুবতী পিয়ানো বাজাচ্ছে, আর দু'পাশে হরেক রকমের দৃশ্য এবং অবনীভূষণ এখন উন্মাদ—সে হন্যে হয়ে যুবতীর সন্ধান করছে। এইসব জাহাজিদের আনন্দ দানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অশালীন পোশাকে নানা বয়সের যুবতীরা ঘোরাফেরা করছে। ওরা এক এক করে সকলে নাচের আসরে নেমে পড়ছে। স্টেজের উপর একদল লোক কালো পোশাক পরে ব্যান্ড বাজাচ্ছে। ঈগল পাখির মতো মুখওয়ালা বাঁশির শব্দ বীভৎস এবং উৎকট মনে হচ্ছিল। পাশের কাউন্টার কাচ দিয়ে মোড়া। সেখানে মেয়েরা মদ বিক্রি করছে। জাহাজিরা কিউ দিয়ে মদ গিলছিল। অবনীভূষণ এবং উড উভয়ে মদ খেল এক গেলাস করে। ওদের পার্টনার নেই, বিশেষ করে অবনীভূষণ এইসব নাচ এতদিনেও রপ্ত করতে পারেনি। সুতরাং অবনীভূষণ আর এক গেলাস মদ নিয়ে পাশের সোফাতে বসে মাংসের পুরের সঙ্গে মদটুকু খেয়ে ফেলল। বাকি মাংসের পুরটুকু সে চেখে চেখে চেটে চেটে খাচ্ছিল আর রমণীরা এই যে নেচে চলেছে, এই যে সুন্দর শরীর এবং উটের মতো মুখটি তুলে নেচে বেড়াচ্ছে, এই যে রমণীরা ঘোড়ার মতো পা ফেলে এক দুই করে সামনে পিছনে পিছনে সামনে—যাচ্ছে আসছে—তা দেখে অস্থির হয়ে পড়ছিল। ফলে অবনীভূষণ ল্যালা ফ্যালার মতো চারিদিকে তাকাচ্ছিল। তারপর সে সহসা আবিষ্কারের মতো দেখে ফেলল দুই সুন্দরী যুবতী যেখানে মদের কাউন্টার, ঠিক তার বিপরীত দিকের টেবলে বসে উল বুনছে। অবনীভূষণ মুখ নীচু করে চুপি চুপি উডের হাত ধরে ওদের দিকে গিয়ে বসল। তারপর চোখ—মুখ টান টান করে বলল, গুড ইভনিং ম্যাডাম এবং পাশে বসে পরিচিত হবার ভঙ্গিতে বলল, এম ভি সিটি অফ গ্লাসগো। সে তার জাহাজের নাম বলল ওদের।

মেয়ে দুজন ওকে স্বাগত জানালে সে কাউন্টারে আবার মদের অর্ডার দিয়ে বলল, ছবির মতো এই শহর। মেয়ে দুজনকে ভিন্ন অলীক স্বপ্নের কথা বলে অথবা সমুদ্রের গল্প বলে ভেজাতে চাইল।

অবনীভূষণ দামি সিগারেট বের করে ওদের একটি করে দিতেই ওরা এসে ওর ঘাড়ের উপর পড়ার মতো ভান করল—সো নাইস। কোনো অলৌকিক ঘটনার মতো অবনীভূষণের সিগার কেস, সিগারেট কেসটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল ওরা।

অবনীভূষণ চুল—সোনা মেয়েটিকে বলল, ইউ লাইক ইট? বলে সে ওর সম্মতির অপেক্ষা করল না; সে চুল—সোনা মেয়ের হাতে যৌতুকের মতো সিগারেট কেস তুলে ধরার সময়ই কাচের জানালায় মুখ বার করে পাহাড়ের উতরাইয়ের ভিন্ন ভিন্ন আলো দেখল। আকাশ পরিচ্ছন্ন বলে, পথঘাট শুকনো বলে পার্কের বেঞ্চে এখন সব যুবক—যুবতীরা বসে নিশ্চয়ই গল্প করছে। অবনীভূষণ এবার উডের দিকে তাকাল, উড তন্ময় হয়ে নাচ দেখছে। সে, অবনীভূষণ অথবা চুল—সোনা মেয়েকে লক্ষ্য করছে না। সুতরাং অবনীভূষণ উডকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে বলল, চল এবার উঠি। প্রায় ঠিক করে এনেছি।

এবার অবনীভূষণ যুবতী দুজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, চলুন অন্য কোথাও।

যুবতী দুজন পরস্পর মুখ দেখল। তখন ব্যান্ড বাজছে উঁচু পর্দায়, তখন সার্কাসের ঘোড়ার মতো পা ফেলে এই নাচের ভিতরই কেউ কেউ বেলেল্লাপনা করছিল। নাচতে নাচতে কোনো এক ফাঁকে দেয়ালের পাশে অথবা সামান্য অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর সব ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গির ছবি। অবনীভূষণ কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছে না। যুবতীরা সব উটের মতো মুখ তুলে কেবল চুমু খাচ্ছে,

কেবল সার্কাসের ঘোড়ার মতো পা মুড়ে বসে পড়তে চাইছে। অবনীভূষণ আবার বলল, চলুন কোথাও। অবনীভূষণ চুল—সোনা মেয়ের হাতে নরম চাপ দিল।

ব্যান্ড বাজছে, হরদম বাজছে। সামনের কাউন্টারে ফের দু—একজন করে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাবিক এসে ভিড় করছে। ওরা কেউ কেউ মাথার টুপি খুলে তিমি শিকারের গল্প আরম্ভ করল। উত্তর সাগরে ওরা গর্ভিণী তিমি শিকার করতে গিয়ে দুজন নাবিককে হারিয়েছে, এমন গল্প করল। ওরা গল্প করার সময় পাশের হিটার থেকে উত্তাপ নিচ্ছিল এবং গর্ভিণী তিমির প্রসব সম্পর্কে রসিকতা করছিল।

ভিড় কাচঘরে ক্রমশ বাড়ছে। মিশনের ডানদিকে মসৃণ ঘাসের চত্বর এবং মৃত বৃক্ষের মতো কিছু পাইন গাছ—তার নিচে বড় বড় টেবিল আর ফাঁকা মাঠে হেই উঁচু লম্বা এক হারপুনার হেঁটে হেঁটে এদিকে আসছে। হারপুনার কাচঘর অতিক্রম করে কাউন্টারের সামনের লোকটির সঙ্গে ফিস ফিস করে কী বলছে। অবনীভূষণ সব লক্ষ্য করছিল। আগের দলটা এতক্ষণ হইচই করছিল মদ খেতে খেতে, কিন্তু হেই উঁচু লম্বা হারপুনারকে দেখে ওরা সব যিশু হয়ে গেল। আর তখন কে বা কারা যেন সেই যুবতী দুটিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা গলায় বড় রাস্তায় হেঁকে হেঁকে বলে যাচ্ছে—ট্যানি টরেন্টো... ট্যানি টরেন্টো... আমাদের বন্ধুবর হারপুনার এবার উত্তর সাগর থেকে গর্ভিণী তিমি শিকার করে ফিরেছে।

উঁচু লম্বা লোকটার টেবিলে সকলে এক এক করে গোল হয়ে বসে গেল। সেই যুবতীরাও ছুটে যেতে চাইল। অবনীভূষণ কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছে না। সে এবার বিদ্রুপ করে বলতে চাইল হ্যাঁগো সতীর দল... তোমরা আমাদের ফেলে যাচ্ছ! সে বিরক্ত হয়ে এবার উডকে বলল, উড, তুমি তো বলতে পারো বুঝিয়ে। তোমাদের সুন্দর মুখ দেখে ....।

উডের কথা যুবতী দুজন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে শুনল। ওরা চুল ঘাড়ে ফেলে উলের কাঁটা ব্যাগের ভিতর ভরে সেই চৌকোমুখ এবং গামবুট—পরা ভদ্রলোক—যে গর্ভিণী তিমি শিকার করে এইমাত্র উত্তর সাগর থেকে ফিরেছে—তার টেবিলের দিকে হাঁটতে থাকল। অবনীভূষণ প্রচুর মদ গিলেছে। ওর শরীর নেশায় টলছিল। অবনীভূষণের ভিতরে ভিতরে এক অপরিসীমা তৃষ্ণা—সে পাগলের মতো চুল—সোনা মেয়ের হাত ধরে ফেলল। কারণ সে যেন সেই চৌকোমুখ হারপুনার, মাথায় যার হাঙরের হাড়ের টুপি, যে বিশ্রী এবং যে ওখানে বসে কটু গন্ধের তামাক টানছে, যার চেহারা দেখলে মনে হয় মেয়েমানুষ সামান্য বস্তু—তার দৃষ্টি একেবারেই সহ্য করতে পারছিল না। সে রাগে—দুঃখে চুল—সোনা মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইলে—হারপুনার ব্যক্তিটি ও তার দলবল লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার সামনে পথ আগলে দিলে। অবনীভূষণ ক্ষিপ্ত এক জানোয়ারের মতো গর গর করে উঠল। হারপুনারের দলবল তখন অবনীভূষণকে এলোপাথাড়ি মুখে মাথায় ঘুষি চালাচ্ছে।

বাইরে সাদা আলোর ভিতর নাক মুছতে গিয়ে অবনীভূষণ দেখল সামান্য রক্ত নাকের ডগায় জমাট বেঁধে আছে। ভিতরে তখন সেই যুবতী হারপুনারের সঙ্গে রসিকতা করছিল এবং হাসছিল।—কাচের ভিতরে সব স্পষ্ট। সুতরাং অবনীভূষণ আর সহ্য করতে পারছে না। সে ফের দরজা অতিক্রম করে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করলে উড হাত চেপে ধরে বলল, অবনী, তুমি বেশ জোরে হারপুনারকে মেরেছ। লোকটা পেটে লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গল গল করে মদ বমি করছে।

অবনীভূষণের ঝুট—ঝামেলা করার আর ইচ্ছা থাকল না। এবং এখানে আর যুবতী অনুসন্ধান করা নিরর্থক ভেবে ওরা পাহাড়ের গায়ে গায়ে অথবা সেতুর দুই পাশে, লোহালক্কড়ের কারখানার দেওয়ালের ছায়ায় এবং যেখানে সব তিমি মাছের চর্বি সংরক্ষণ করার জন্য বড় বড় পিপের সারি সেইসব অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে একসময় শহরের মাঝামাঝি অঞ্চলে এসে গেল।

অবনীভূষণ চড়াই—উতরাইয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় উডকে উদ্দেশ্য করে বলল, আজ এই শীতে সতীর দল গেল কোথায়?

তখন উড সহসা আবিষ্কারের ভঙ্গিতে বলল, ঐ দেখ অবনী, লাইটপোস্টের নিচে যেন দুজন মেয়ে শিস দিচ্ছে। বলে উড দূরের লাইটপোস্টের দিকে হাত তুলে নির্দেশ করল।

অবনীভূষণ বলল, চল তবে।

শীতের রাত। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবনীভূষণের মনে হল ওরা শীতে জমে যাবে ক্রমশ। মনে হল ওরা যুবতী দুজনে বেশিদূর আর অনুসরণ করতে পারবে না। অথবা মেয়ে দুজন এই শীতের রাতে ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। পথের ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে, দূরে দূরে সব পুলিশের বুটের শব্দ এবং ট্রলি বাসের আলো আর পথে পড়ছে না, শহর ক্রমশ যেন নির্জন নিঃসঙ্গ হয়ে আসছে। উড পর্যন্ত আর জোরে হাঁটতে পারছিল না।

একসময় ওরা এবং যুবতী দুজন শোকেসের সামনে মুখোমুখি পড়ে যেতেই উড ঝুঁকে বলল, আস্তানা কত দূর?

দুজন বলল, সরি। বোধহয় অবনীভূষণের লম্বা চেহারা এবং হাতের বড় বড় থাবা, ওদের আতঙ্কিত করেছে।

অবনীভূষণ বলল, সামান্য সময়।

যুবতী শক্ত হয়ে গেল। বলল, না। ওরা বরং উডকে সঙ্গে নিতে চাইল।

উড বলল, আমরা দুজন, একা যেতে পারি না।

অবনীভূষণ এবার মরীয়া হয়ে বলল, মেয়ে, এই লম্বা কোটের পকেটে করে নিয়ে যাব তবে—কেউ টেরটি পাবে না। তারপর অবনীভূষণ চারিদিকে তাকাল যেন যথার্থই সে এই দুই যুবতীকে পকেটে পুরে শহর ত্যাগ করে চলে যাবে।

এবার যথার্থই ভয় পেয়ে গেল ওরা। তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় পড়ার জন্য ছোট সরু গলি অতিক্রম করে নেমে যেতে চাইল। পথ আগলে অবনীভূষণ তার দুই হাতের বড় থাবা দেখাল। সে হাত দুটো অঞ্জলির মতো করে রাখল—তৃষ্ণার জল আর কে দেবে? সে যেন বলতে চাইল কথাটা। এবং সে এই নিঃসঙ্গ রাতের আঁধারে উচ্চস্বরে সেই ট্যানি টরেন্টো, ট্যানি টরেন্টো শব্দের মতো চিৎকার করে নগরীর দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে বলতে চাইল, হায় অবনীভূষণ, এই তৃষ্ণার জল তোমাকে আর কে দেবে!

তারপর অবনীভূষণ সেই যুবতী দুজনকে উদ্দেশ্য করে যেন বলল, আমি তোমাদের সব দেব, তোমরা আমাকে স্পর্শ দাও। সামান্য উত্তাপ দাও।

ওরা উত্তর করল না। বড় রাস্তার উজ্জ্বল আলোর নীচ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আর অবনীভূষণ শুনতে পেল সেই আগের মতো দূরে কারা যেন হেঁকে যাচ্ছে—ট্যানি টরেন্টো... ট্যানি টরেন্টো ..... উত্তর সাগর থেকে এক হারপুনার এক গর্ভিণী তিমি শিকার করে ফিরেছে। অবনীভূষণ দুর্গের পাশে পাশে হেঁটে গেল। সর্বত্র যেন সেই একই ট্যানি টরেন্টো ট্যানি টরেন্টো শব্দ। সে দু'কান চেপে শীতের ঠান্ডায় ট্যাক্সির ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল এবং ট্যাক্সিওয়ালাকে নিজের জাহাজের নাম, ডকের নাম বলে শরীর এলিয়ে দিল। মনে হচ্ছিল হাত পায়ে বড় ব্যথা, সে ঘাড় নাড়তে পারছে না—পরাজিত এক সৈনিকের মতো আত্মগ্লানিতে ডুবে গেল।

গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন পাঁচ নম্বর সাব এবং ডেক—অ্যাপ্রেন্টিস উড হামাগুড়ি দিতে দিতে সিঁড়ি ভাঙছে। ওরা ফেরার পথে প্রচুর মদ গিলেছে; ওরা সিঁড়ি ধরে সোজা হেঁটে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সুতরাং মাস্টার ওদের দুজনকে উঠে আসতে সাহায্য করলেন।

উড স্টারবোর্ড, সাইডের কেবিনগুলোর দিকে হেঁটে হেঁটে চলে গেল।

অবনীভূষণ বালকেডে ভর করে নিজের কেবিনের দিকে হাঁটতে থাকল। স্তিমিত আলো এলওয়েতে। সে বড় মিস্ত্রি এবং মেজ মিস্ত্রির কেবিন পিছনে ফেলে যেতেই মনে হল পায়ের সঙ্গে কী যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। সে যত পা আলগা করতে চাইছে ততই পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। সে এবার নুয়ে পায়ের নিচে হাত

দিয়ে দেখল একটা কালো রঙের গাউন। সে আলোর ভিতর নাকের কাছে সেটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ আলগা করে ঘ্রাণ নেবার সময় দেখল সামনে মেজ মালোমের কেবিন, কেবিনের দরজা খোলা, মেজ মালাম বাংকে উপুড় হয়ে মৃতবৎ পড়ে আছেন। ঘরে সেই বিকেলে ধরে আনা যুবতী নেই। মেজ মালোম এক হাতে কোনোরকমে প্যান্টটা কোমর পর্যন্ত তুলে রেখে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করছেন। অবনীভূষণ বলল, শালা মদ খেয়েছে। বলে, গাউনটা দরজা দিয়ে মেজ মালোমের মুখের ওপর ফেলে দিল। মেজ মালোমের এখন মুখ ঢাকা এবং শরীর প্রায় উলঙ্গ। সে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল মালোমের কেবিন। তারপর এনজিন ঘরের সিঁড়ির মুখে নিজের কেবিনের দরজা খুলতে গিয়ে মনে হল ভিতর থেকে কে যেন বন্ধ করে রেখেছে। সে রাগে দুঃখে অপমানে দরজার উপর ভীষণ জোরে লাথি মারল। দরজা খুলছে না। সে তার অবসন্ন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবার দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সে বলল, বাস্টার্ড, সে গাল দিল, সোয়াইন! সে তারপর বাংলা ভাষায় খিস্তি করে ভিতরে ঢুকে বিস্মিত—সে চোখ গোল গোল করে দেখল, সেই বিকেলের যুবতী ওর বাংকে আশ্রয় নিয়েছে। এবং অসহায় বালিকার মতো চোখ। যুবতীকে এখন বুনো কাকের মতো শীর্ণ মনে হচ্ছে অথবা গর্ভিণী শালিখের মতো রোঁয়া ওঠা। প্রথমে সে কী করবে, ভেবে পেল না। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে সে বলল, কি গো, একেবারে বাঘের মুখে!

যুবতী কিছু বলল না। চোখে মুখে ভয়ের এতটুকু চিহ্ন নেই। যেন এক্ষেত্রে কিছু করণীয় নেই, সব হয়ে গেছে, হয়ে যাবে ভাব। ঝড় এবং জীবনের আর্তনাদ কোথাও থেমে থাকছে না। যুবতী তবু ধীরে ধীরে বাংক ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল। বলল, সরি মিস্টার। সে তার শীর্ণ হাত বালিশের উপর রেখে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল।

অবনীভূষণ যুবতীটিকে পড়ে যেতে দেখেই বুঝল—সেই বিকেল থেকে বাঁদরের হাড় চুষে চুষে যুবতীর এক কঠিন অসুখ, এক কঠিন স্থবির অসুখ—যা এতক্ষণ অবনীভূষণকে এই শহরময়, নগরময় এবং দুর্ভেদ্য অন্ধকারে বারংবার ঘুরিয়ে মারছে।—অবনীভূষণ তাড়াতাড়ি যুবতীকে ধরে ফেলল। না হলে বাংক থেকে যেন পড়ে যেত মেয়েটি, হাত—পা কেটে মাথায় আঘাত লাগতে পারত। যুবতীর পড়ে যাবার মুখে কম্বলটা শরীর থেকে সরে গিয়েছিল। অবনীভূষণ দেখল আঁচড়ে কামড়ে যুবতীর শরীর মেজ মালোম ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। লজ্জা নিবারণের জন্য অবনীভূষণ তাড়াতাড়ি ফের কম্বলটা শরীরে তুলে দিল এবং শুয়ে পড়তে বলে ঘড়িতে সময় দেখল—একটা বেজে গেছে, এখন ওকে সামান্য শুশ্রূষা করলে সামান্য সময়ের জন্য এই বন্দর শুভ—বার্তা বহন করবে। এইটুকু ভেবে অবনীভূষণ দরজা ভেজিয়ে চিফ কুকের গ্যালি পর্যন্ত হেঁটে গেল। নেশার ঘোর কী করে যেন একেবারে কেটে গেছে এবং ভিতরের সব দুঃখ ক্রমশ নিরাময় হচ্ছিল। সমুদ্র থেকে তেমনি ঠান্ডা বাতাস উঠে আসছে। সে গরম জল করে যুবতীর শরীর ভালো করে ধুয়ে সামান্য শুশ্রূষার পর বলল, আমার জন্য সামান্য খাবার আছে। ইচ্ছা করলে আমরা দুজনে ভাগ করে খেতে পারি।

যুবতী কষ্ট করে হাসল,—আপনি আমাকে বরং একটু সাহায্য করুন।

অবনীভূষণ বলল, কী করতে হবে?

সেকেন্ড অফিসারের ঘর থেকে দয়া করে আমার পোশাকটা এনে দিন।

অবনীভূষণ মেজ মালোমের ঘর থেকে পোশাকটা এনে দিলে মেয়েটি বলল, আমাকে দয়া করে বন্দরে নামিয়ে দিন। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলে আমি ঘরে চলে যেতে পারব।

বেশ চলুন। বলে তুলে ধরতেই মনে হল যুবতীর মাথা ঘুরে গেছে। সে বসে পড়ল।

আপনি বন্দরের রাস্তাটুকু হেঁটে পার হতে পারবেন না। বরং এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিন।

আমার ভয় করছে মিস্টার, সে আবার আসতে পারে। অত্যন্ত কাতর চোখে অবনীভূষণের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

আপনি ঘুমোন, আমি বরং দরজায় পাহারা দিচ্ছি।

যুবতী আর কথা বলতে পারল না। চোখ জলে ভার হয়ে গেছে।

আর অবনীভূষণের মনে হল দীর্ঘদিন পর সে এক অসামান্য কাজ করে ফেলেছে। সে বলল, আমি বাইরে বসে থাকছি, আপনি নির্ভয়ে ঘুমোন—বলে অবনীভূষণ দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়ংকর ঠান্ডার ভিতর পা মুড়ে বসে থাকল এবং জেগে জেগে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখল—দ্বীপের স্বপ্ন, বড় এক বাতিঘর দ্বীপে—সব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রগামী। অবনীভূষণ নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে থাকল—তার এতটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনের সাত রাজার ধন এক মাণিক, খুবই হাতের কাছে রয়েছে। তাকে গলা টিপে মারতে নেই। সুতরাং সে উঠল না এবং এই নিদারুণ রাত্রি জীবনের প্রথম আলোর পথ বলে মনে হল অবনীভূষণের।

দুই

সমুদ্রে বৃষ্টি পড়ছে। প্রথমে ইলশে—গুঁড়ি, তারপরে জোরে। জোরে বৃষ্টি নামল। মাস্তুলের গা বেয়ে বৃষ্টি ডেক ভিজাল। এখন ফল্কা ভিজছে। গ্যালির ছাদ থেকে ব্রিজের ছাদ, চার্টরুমের ছাদ সব ভিজছে। কুয়াশা—ঘন ভাব বৃষ্টির। সেলিম ফোকসালে কাশছে। বৃষ্টি সমুদ্র এবং জাহাজ সেলিমের বুকের যন্ত্রণায় কাতর হল না। বৃষ্টি পড়ছে—পড়ছে। সমুদ্রে তরঙ্গ। জাহাজ নীল জলে নোনা রঙে সাঁতার কাটছে। সেলিম শরীরে কম্বল জড়াল তখন। ফোকসাল যখন খালি, বাংকে যখন কেউ নেই, জাহাজিরা যখন ডেকে দড়িদড়া টানছে তখন কম্বলের নিচে শুয়ে বিড়ি ধরানো যাক। সে বিড়ি ধরাল এবং কম্বলের নিচে বিড়ির ধোঁয়াকে ফুঁ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। তারপর কম্বলটা দিয়ে গোটা ধোঁয়াকে চেপে ধরে দরজার দিকে তাকাল। কেউ নেই। কেউ সিঁড়ি ধরে নামছে না। সে নিশ্চিন্ত হল। অথচ পোর্টহোলের কাচে সমুদ্র এবং আকাশের প্রতিবিম্ব। সেলিম সে কাচে নিজের প্রতিবিম্বও দেখল। চোখ দুটো ওর পালক ওঠা মুরগির মতো। চোখ দুটো পোর্টহোলের কাচে আকাশ এবং সমুদ্রের মতো নীল হতে পারেনি। সাদাটে অথবা বরফ—ঘরের চার—পাঁচ মাসের বাসি গোস্তের মতো। সেলিম কাশির সঙ্গে রক্তের দলাটা কোঁত করে গিলে ফেলল এবার।

দুপুর থেকে শুনে আসছে—উপকূল দেখা যাচ্ছে। সকলে ডেকে চিৎকার করছে—কিনারা দেখা যাচ্ছে। সকলে উপরে হল্লা করছে। সেলিম কোনোরকমে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছিল, সেও মাটি দেখবে, মাটি দেখে উত্তেজিত হবে, কিন্তু সিঁড়ির মুখেই সারেঙের ধমক, কোথায় যাচ্ছ মিঞা। মরণের দাওয়াই কানে বাঁধতে চাও? সেলিম ভয়ে ফের ফোকসালে নেমে এসেছিল। সে বাংকে শুয়ে সব যেন ধরতে পারছে—যেন কিছু সমুদ্রপাখি ফল্কায় বসে ভিজছে। পাখিরা ফল্কায় একদা বসতের মতো আশ্রয় নিয়েছে। উপকূল দেখে অথবা দ্বীপ দেখে ওরা উড়ছে। এমন ভেবে সেলিম কাশল। সমুদ্রপাখিরা হয়তো এতক্ষণে উড়ে গেছে। ওর জানার ইচ্ছা হল ওরা আকাশে উড়ছে, না দ্বীপের পাশাপাশি কোথাও উড়ছে। আর কেন জানি এই সময় বারবার ওর বিবির কথা মনে হচ্ছে। বিবির মুখে সুখের ইচ্ছা, শখের ইচ্ছা। সেলিমের শরীরে যন্ত্রণা, বুকে যন্ত্রণা। সে যেন বলতে চাইল—এবার আমরা ফিরব, বিবি। ছোট ঘরে তুই তোর খসমের মুখ দেখবি। জাহাজ এবং সমুদ্র উভয়ই আমাদের বিনাশ করতে পারেনি। আমি ফিরব, ফিরব। আমরা ফিরব। খতে এমন একটা প্রত্যয়ের কথা লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে সেলিমের।

দীর্ঘ সফর, নোনা পানীর অশ্লীল একঘেয়েমি এতদিন ওকে দেশে ফেরার জন্য মাতাল করতে পারেনি। সেলিম দুবার দুটো ওয়াচ করেছে, ফোকসালে এসে শুয়েছে, হাত—পা ছড়িয়ে, অশ্লীল চিন্তা করতে করতে সমুদ্রের বুকে ঘুম দিয়েছে; অথবা হিসাবের কড়ি গুণে—সফর শেষ হতে কত দেরি—এইসব ভেবে স্থান—কাল—পাত্রের কিংবা বন্দরের বেশ্যামেয়ের হিসাবের কড়ি গুণেছে। গুণতে গুণতে ওর একদিন কাশি উঠল। কাশি আর থামছে না। বিকেলে জ্বর এল। বন্দর থেকে বন্দর ঘুরে জ্বর বেড়েছে। শরীর ভেঙেছে। এক বন্দরে কাপ্তানের কাছে আর্জি পেশ করেছে—সাব, একবার হাসপাতালে যাব। কাশির দমকে আর বাঁচছি না। মনে হচ্ছে, মরে যাব।

এই নিয়ে অন্য ফোকসালে কথা হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল, এ বন্দর নিয়ে পাঁচ বন্দর হবে অথচ সেলিম এখনও জাহাজেই আছে। সেই কবে ফ্রি—ম্যান্টেল বন্দরে ওকে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিল, আর নয়, আর জাহাজে রাখা চলবে না। বন্দরে নামিয়ে দিতে হবে। হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এ—অবস্থায় জাহাজে রাখা নিরাপদ নয়।

সেলিম এখনও জাহাজেই আছে। সে কাশছে। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠলেই কোঁত করে ঢোক গিলছে। কিছুদিন থেকে এটা ওর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সে সকলকে বলছে কাশির ব্যামোটা তেমন নয়। ওটা সেরে যাবে। কোম্পানি দামি দামি ওষুধ দিচ্ছে। দিচ্ছে বলেই এবং বাড়িয়ালা গা করছে না দেখে সেও বুঝেছে ওটা ধীরে ধীরে সেরে যাবে। কাশি যখন বেশি হয় তখন সেলিম অপরাধের কথা ভাবে। নিজের অপরাধের কথা। বিবিকে নিয়ে অথবা বন্দরে দেখা কোনো মেয়েকে নিয়ে বিছানায় পড়ে থেকে অশ্লীল ধারণায় অথবা অশ্লীল আবেগে মেখে শরীরে উত্তাপ সঞ্চয়ের বৃথা চেষ্টা না করলেই হত। অথচ রক্ত কম উঠলে ওষুধে কাজ করছে এমত ভেবে সে খুশি হয়। ওর ইচ্ছা ওর দুরারোগ্য রোগের কথা কেউ না জানুক, কেউ না ভাবুক সে দুরারোগ্য রোগে ভুগে মরে যাবে। অথচ প্রত্যয়ের ঘোরে এই ভেবে খুশি—সে ঘরে ফিরবেই। বিবি তার খসমের মুখ দেখে উজ্জ্বল হবেই। এ—শরীরে সে কিছুতেই সমুদ্রে অথবা বিদেশ বন্দরে রেখে যেতে চাইছে না। সে সকলকে শুধু জিজ্ঞেস করছে—জাহাজ কবে ফিরবে? কবে আমরা ঘরের বন্দর পাব?

জাহাজিরা কেউ বলেছে, সিডনি থেকে পুরানো লোহা নিয়ে জাহাজ যাবে জাপানে।

কেউ বলছে, গম নিয়ে তেলবাড়ি।

সেলিম এইসব খবরে বিষণ্ণ হয়েছে। খুব অসহায় ভঙ্গিতে পোর্টহোলে মুখ রেখে দিগন্তরেখায় নিজের দেশকে খুঁজেছে। কখনও অপলক সমুদ্র দেখেছে। জলের নীল বিস্তৃতি দেখেছে।

সেলিম স্থির করল কাপ্তানকে শেষবারের মতো বলবে, আমায় দেশে পাঠিয়ে দিন, মাস্টার। ঘরে ফিরে আমি বিবির কোলে মাথা রেখে মরব। জাহাজে আমি মরব না। বিদেশ—বন্দরে আমি মরব না। শুয়ে শুয়ে সেলিম এইসব ভেবে উত্তেজিত হতে থাকল।

তখন সিঁড়িতে শিস দিচ্ছে বিজন। সেলিম শুয়ে শুয়ে শুনছে। এ—কেবিন সে—কেবিন সে উঁকি মারল। এঞ্জিন—পরীদাররা ঘুমোচ্ছে। এনজিন—পরীদাররা (যারা চারটা—আটটার পরীদার) গল্প করছে। বিজন লক্ষ করল শিস দিতে দিতে, সতেরো মাস সফর ওদের ক্লান্ত করতে পারেনি। বিষণ্ণ করতে পারেনি। জাহাজটা আরও যদি সতেরো মাস সমুদ্রের নোনা জল ভাঙে, যদি আরও সতেরো মাস বন্দরে না ভিড়ায় তবু নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে জাহাজ চালিয়ে যাবে। বিজন দ্বিতীয় সিঁড়ির মুখেই শুনল—সেলিম কাশছে। কাশির জন্য দম নিতে পারছে না। বিজন আর শিস দিল না। প্রতিদিনের মতো সে ফের সেলিমের জন্য কষ্ট পেতে থাকল। সে ফোকসালে ঢুকে বলল, একবার কাপ্তান সাহেবকে বল হাসপাতালে দিতে। এভাবে আর কতদিন বাংকে পড়ে থাকবি। রাতে জাহাজ বন্দর ধরবে।

সেলিম মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরাল। চোখ দুটোতে নোনা পানি অথবা আকাশের রঙ নয়, কালো রঙ নয়, অথবা বেতফলের মতো রঙও ধরতে নয়—অথচ আশ্চর্য এক রঙ ধরেছে যা দেখলে সকলের ভয় হবে। অথচ মায়া হবে। সকলের মনে হবে, সেলিম রহমানে রহিম হওয়ার জন্য শরীর স্থির করতে চাইছে। এবং বাংকের সঙ্গে মিশে গিয়ে অদৃশ্য হতে চাইছে।

বিজন বলল, বলিস তো আমরা সকলে মাস্তার দি'। সারেংকে বলি মাস্তার দিতে। এভাবে আর কতদিন ভুগবি। জ্বর কাশি—দেখে—শুনে তো ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।

সেলিম সহসা উঠে বসল। তারপর আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ এবং করুণাঘন মুখ করে হাসল। তারপর ফের দুঃখময় প্রকাশে বলল, বিজন রে, তোর মতো যদি একটু ইংরেজি বুলি জানতাম, তবে আমার সব হত।

সারেঙ আর কাপ্তান কী বুদ্ধিই ধরেছে খোদাই জানে। তুই সকলকে বলে কয়ে মাস্তার দে। আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে বল। দেশে ফিরে বাঁচি।

বিজন এই বাংকে বসে কী করে যেন বুঝল সেলিমের এই দুরারোগ্য রোগ নিয়ে জাহাজে ষড়যন্ত্র চলেছে। সে ভেবে অবাক হল কেন সে সারেংকে বলল না, ওকে এবার অন্য ঘরে না রেখে উপায় নেই, অথবা কেন যে মেজ মালোমকে ডেকে একবার চিকিৎসার সুব্যবস্থার কথা বলতে পারেনি এতদিন! সেও আজ পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্র দেখল। তারপর উপকূল। উপকূলে পাখিরা ফিরে যাচ্ছে। সেলিমের মুখ পাণ্ডুর। জাহাজটা চলছে এবং সেলিমের শরীর নড়ছে। সেলিমকে দেখলে আত্মহননের কথা মনে হয়। বিজন বাংক থেকে ওঠার সময় সেলিমকে ফের লক্ষ্য করল, ওর কম্বলের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সে হাসল। সেলিমও হাসল। ওরা পরস্পর দুঃখটুকু ধরতে পেরে ফের দুজনই অন্যমনস্ক হতে চাইল। বিজন দরজা ধরে বের হচ্ছে। সারেং—এর ঘরে উঁকি মেরে সে দেখে, তিনি নেই। ফোকসালে নেই। নিশ্চয়ই মেজ মালোমের কেবিনে অথবা ফরোয়ার্ডপিকে আছেন। বিজন ডেকের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকল।

বন্দরে জাহাজ ভিড়বে বলে সারেং ডেক—কসপের নিকট দড়িদড়া সব বুঝে নিচ্ছে। বিজন ডেক অতিক্রম করে কসপের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সে একবার দাঁড়াল। বড় মালোমের পোর্টহোলে উঁকি দিল। বড় মালোম কেবিনে নেই। বিজনের ইচ্ছা হল বড় মালোমকে বলতে—আপনার জাহাজে এমন একটা মারণ রোগ পুষে রাখছেন, সেলিমকে হাসপাতালে দেওয়া হবে না, দেশে পাঠানো হবে না, কোম্পানির টাকা বাঁচানো হবে, অন্যান্য জাহাজিরা পর্যন্ত নিরাপদ নয়—এমতাবস্থায়ও আপনারা চুরি করে মদ গিলতে পারছেন!—আশ্চর্য! সে ভেবে আশ্চর্য হল। সে হাঁটল।

সে সারেঙকে বলল, চাচা চোখ বুজে আর কতদিন থাকবেন?

সারেং ফিসফিস করে বলল, তোমার এত মাথাব্যথা কেন? বেশ তো আছ। সফর করছ। তোমার তো কোনো অসুবিধা করছে না কোম্পানি।

সেলিমের মুখ দিয়ে কফের সঙ্গে রক্ত উঠছে। আপনি জানেন এটা অন্যান্য জাহাজিদের পক্ষে কত ক্ষতিকর। তাছাড়া দেখছি সেলিম বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। এ নিয়ে পাঁচ বন্দর হল অথচ কোনো বন্দরেই ওকে হাসপাতালে দেবার ব্যবস্থা করছেন না।

সব জানি বাপু। সব বুঝি বাপু। অথচ জেনেশুনেও চুপ করে আছি। বাড়িওয়ালার ইচ্ছা নয় সেলিম হাসপাতালে থাকুক। কোম্পানির অযথা এত খরচ করাতে বাড়িয়ালা রাজি হচ্ছে না।

তবে ওকে দেশে পাঠিয়ে দিন। দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

দু—একজন করে তখন অন্য জাহাজিরাও ওর চারপাশে জড়ো হচ্ছে। ওরা শুনছে ওরা সারেং—এর মুখ দেখছে। বিজনকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। সেই লঘু পরিহাসজনিত অথবা হালকা সুরের শিস দেওয়া মুখ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। সমুদ্রের উদার নীল বিস্তৃতিতে ওরা কয়েকজন কেমন অসহায়ের ভঙ্গিতে ডেকে পদচারণা করছে। এনজিনের শব্দ, সমুদ্রের তরল ঠান্ডা হাওয়া ওদের নিঃশব্দ এই ভাবটুকুকে নিদারুণ দুঃখময় করে তুলছে।

রাত্রিতে সব জাহাজিরা যখন একত্রিত হল, একমাত্র আটটা—বারোটার পরীদাররা যখন নিচে বয়লারে কয়লা মারছে, যখন ওরা সকলে শুনল, জাহাজ বন্দর ধরবে সকাল দশটায়—রাতে আর পাইলট—বোট আসছে না, ডেক—জাহাজিরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে, তখন ওরা বিজনের ঘরে জড়ো হয়ে বলল, আমরা সকলে একযোগে বিদ্রোহ করব। আমরা সকলে জাহাজ চালাব না। কাপ্তান আসুক, ডেক—সারেং আসুক, কেউ আমাদের নড়াতে পারবে না। আমাদের কথা শুনলে আমরা ওদের কথা শুনব। সেলিমকে হাসপাতালে পাঠালে অথবা দেশে পাঠালে আমরা কাজে যাব। জাহাজ চালাব।

একজন বলল, জাহাজি বলে আমরা গোরু—ভেড়া নই।

অন্যজন বলল, জাহাজি বলে আমরা বিনা নোটিশে মরব তেমন দাসখত দেওয়া নেই।

অথচ দেবনাথ বলল, বিজন, এটা নিয়ে তোমার ক'সফর জাহাজে?

বিজন বিস্মিত হল। দেবনাথ ভালো ভাবেই জানে এটা ওর ক'নম্বর সফর। ভালো ভাবেই জানে প্রথম সফরে সে কোন কোম্পানির কোন জাহাজে কাজ করেছে। তবু দেবনাথ যখন এমন একটা প্রশ্ন করল এবং দেবনাথ যখন খুব জরুরি ভাবে ওকে প্রশ্নটা করেছে তখন একটা যথোচিত উত্তর দেওয়াই যুক্তিসংগত। সে বলল, তুমি তো জানো দেবনাথ—এটা আমার দু'নম্বর সফর।

এখনও তুমি ঠিক জাহাজি হওনি। তারপর কী ভেবে বিজনকে দেবনাথ অন্য ফোকসালে নিয়ে গেল। এখানে কেউ নেই, কেউ থাকে না। জাহাজিরা এখানে কাজে যাওয়ার আগে জামাকাপড় ছাড়ে। ঘরটা একেবারেই খালি। দেবনাথ ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। এবং বলল, তুমি এর মধ্যে থেকো না। শেষে সকলে বেঁচে যাবে, কেবল তুমি মারা পড়বে। কাপ্তান তোমার নলি খারাপ করে দেবে। তখন তোমার পিছনে ওরা কেউ দাঁড়াবে না। আমি ওদের ভালো করে চিনি।

বিজন কথা বলল না। চুপ করে দেবনাথের পরামর্শ শুনল। শেষে জবাব দিল, কিন্তু সেলিম যে মরে যাবে?

মরে যাবে তো তুমি কী করবে? তোমার উপর ট্যান্ডল আছে, সারেং আছে—ওরা দেখছে না, তুমি দেখে কী উপকারটা সেলিমের করবে? এটা মাত্র তোমার দু'সফর। অনেক দেখবে কিন্তু জাহাজে বিদ্রোহ করলে চলবে না।

তার জন্য কোনো প্রতিকারের দাবি আমরা তুলব না!

দেবনাথ খুব অভিজ্ঞ লোকের মতো বলল, বম্বের নৌবিদ্রোহের আমি আসামি। তাই তোমাকে এতগুলো কথা বললাম। তোমাকে মাস্তার দিতে বারণ করলাম। তা ছাড়া আমি এইসব জাতভাইদের চিনি। ওরা শেষ পর্যন্ত তোমার কথা কেউ বলবে না। ওরা ওদের জাতভাইদের কথা বলবে, সারেঙের কথাই শুনবে। মাঝখান থেকে তুমি ব্ল্যাক—লিস্টেড হবে।

বিজন আর কোনো কথা না বলে দরজা ঠেলে বের হয়ে এল। সে দেখল, সকলে ওর ঘরে তখনও পরামর্শ করছে। সকলে উদগ্রীব হয়ে আছে। বিজনকে দেখে ওরা বলল, চল, মাস্তার দি বোট ডেক—এ।

বিজন দেবনাথের কথাগুলো আর একবারের জন্য ভেবে নিল। আর একবারের জন্য সকলের মুখ দেখল। সকলের মুখ ভয়ানক হয়ে উঠেছে। বিজন বুঝতে পারল—এই সমস্ত মুখের ছবি মিথ্যা হবার নয়। ওরা কখনোই ওকে অন্ধকার পৃথিবীতে ঠেলে দেবে না। বিজন দৃঢ় গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তখন সারেঙ নিচে নেমে এসে ডাকল, ইসকান্দার, সামসুদ্দিন, রহমান, শোভান। ওরা ধীরে ধীরে ঘর থেকে একান্ত বশংবদের মতো বের হয়ে যাচ্ছে। সারেং বলল, কাপ্তান তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

এই ঘটনায় বিজন খুব ভেঙে পড়ল। এবং অসহ্য উত্তেজনায় ভুগতে থাকল। প্রচণ্ড শীতের ভিতর সে ওর নিচের ঘরে পায়চারি করছে। দেবনাথ উপরের বাংকে শুয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে। পোর্টহোল দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে বলে বিজন কাচটা বন্ধ করে দিল। সারেং—এর সেই রক্তচক্ষুর কথা মনে হল এবং ভাবল কত সহজে সব নাবিকদের নিয়ে সে উপরে উঠে গেল। সে এই ফোকসালে, এই ঠান্ডায় পায়চারি করতে করতে ধরতে পারছে। ধরতে পারছে—সারেং ওদের কী বলছে এবং কী বলে ওদের প্রত্যয়কে ভেঙে দিচ্ছে। সেলিম এখনও কাশছে তার ফোকসালে—ফোকসালের অন্য বাসিন্দা কোরাণ—শরীফ পাঠ করছে বাংকে। সে পায়চারি করতে করতে সব শুনল। জাহাজটা নোঙর ফেলে আছে বলে স্টিয়ারিং ইঞ্জিনে কোনো শব্দ নেই। সবাই কেমন নিঃসঙ্গ, সব কেমন নিঃশব্দ যেন। ডেক থেকে সারেং—এর কথা ভেসে আসছে। সকলকে সারেং জোর গলায় কথাগুলো বলল। বলে ওদের ভয়ংকর বিদ্রোহের প্রতিবিম্ব মুছে দিল। সারেং ওদের বলল, তোরা তো জানিস কলকাতা বন্দরে চল্লিশ হাজার নাবিক খোদা হাফেজ বলত, এখন কিছু কিছু লোক ঈশ্বর, ভগবান বলতে শুরু করেছে। তোরা যদি বাঙালিবাবুদের কথায় মাতিস, তোরা যদি জাহাজে বিদ্রোহ করিস তবে তোদের চল্লিশ হাজার চল্লিশে নামতে আর বেশি দেরি নেই।

একসময় কাপ্তান সারেঙকে ডেকে পাঠালেন।

ব্রিজ থেকে কাপ্তান বললেন, কী বলছে সব?

ভাঙা ভাঙা ইংরেজি এবং হিন্দিতে ডেক—সারেং বলতে থাকল, সব গুড, সাব। সব ঠিক হ্যায়। জাহাজি লোক ভেরি গুড, সাব। বাঙালি বাবুলোক নো গুড, সাব। বাঙালি বাবুলোক গিভস ট্রাবল। বাঙালি বিজন, ইয়েস বিজন তেইল রূপায়াকা খালাসি, ও তো সাব রিংলিডার আছে। দুটো—চারঠু ইংলিশ স্পিকিং আছে, সাব। প্যাসেন্টকে লিয়ে কুছ ফাইট দেনে মাংতা। লেকিং নাও অলরাইট, সাব। বিগ বিগ টক লেকিন নো জব। ভেরি লেজি বাগার। সারেঙ এই পর্যন্ত বলে পায়ের কাছে থুথু ফেলল। ফের মুখ তুলতেই দেখল বাড়িয়ালা নিজের কেবিনে ঢুকে গেছেন। কেবিনে পেয়ালা—পীরিচের শব্দ। নিচে অফিসার—গ্যালিতে চিফ কুক আগুন পোহাচ্ছে। সিঁড়ি ধরে নামবার সময় সে এখানেও থুথু ফেলল।

সমুদ্রে সূর্য উঠছে। একদল পাখি উড়ছে আকাশে। দূরে ইতস্তত জাহাজ নোঙর করা। অনেকগুলো বয়া অতিক্রম করে পাইলট—শিপ। অনেকগুলো জেলেডিঙি এই শীতের ভোরেও মাছ ধরতে বের হয়ে পড়েছে। আকাশ নীল, সমুদ্র নীল। জাহাজের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হয়ে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। ওরা সমুদ্র ধরে উপকূলে উঠে যাচ্ছে। উপকূলের স্কাই—স্ক্যাপারগুলো ম্যাচবাক্সের মতো মনে হচ্ছে। এইসব দেখার জন্য জাহাজিরা ডেকে দাঁড়াল। অথবা দড়িদড়া টানার জন্য ডেক থেকে টুইন—ডেকে নেমে যাচ্ছে। এখন ওরা দড়িদড়া টানছে। হাসিল নিচে নামিয়ে দিতে চাইছে। মেজ মালোম গলুইয়ে চলে এসেছেন। বড় মালোম ফরোয়ার্ড—পিকে চলে গেছেন। বিজন হাসিল কাঁধে বড় মালোমের পিছনে ছুটছে। তিনটে টাগবোট এসেছে, পাইলট এসেছেন। পাইলট ডেক থেকে বোট—ডেকে এবং ব্রিজে উঠে গেলেন।

বড় মালোম বললেন, গতকাল তুমি জাহাজিদের উত্তেজিত করেছিলে?

বিজন হাসিল পায়ের নিচে রেখে বলল, হ্যাঁ, স্যার। করেছিলাম।

আমি খুশি হয়েছি শুনে। বড় মালোম কসপকে স্টোর—রুমে যেতে বলে এ—কথাগুলো বিজনকে বললেন।

ওদের ভিতর আর কোনো কথা হল না। একজন জাহাজি ফরোয়ার্ড—পিকে উঠে গেছে। ওরা ওয়ারপিন ড্রাম ঘুরাচ্ছে, ওরা উইঞ্চ চালাচ্ছে। তারপর হাপিজ—হাড়িয়া এই ধরনের কিছু শব্দ। বিজন এবং অন্যান্য জাহাজিরা প্রায় আধঘণ্টা ধরে ফরোয়ার্ড পিকে কাজ করল, বিজন এবং অন্যান্য জাহাজিরা সেলিমের দুঃখ, বন্দরের জীবন এবং দেশে ফেরার অথবা জাহাজে প্রথম দিনের গল্প নিয়ে কিছু সময় মশকরা, কিছু কাঁচা খিস্তি করল। কাজ শেষ হলে নীল উর্দি ছেড়ে ওরা দাঁড়িয়ে থাকল ডেকে। কেউ নিচে নামল না। খাড়ি ধরে জাহাজ বন্দরে ঢুকছে। ওরা দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দৃশ্য দেখল। সমুদ্রের খাড়ি ধরে জাহাজ বন্দরে ঢুকছে। দু'পাশে পাথরের পাহাড়; অতিকায় তিমি মাছের মতো কালো কালো সব পাথর। পাথরের পাহাড়। কুৎসিত এইসব পাথরের পাশে ছোট ছোট অনেক রকমের ফার—জাতীয় গাছ। পাতাগুলো শীতের হাওয়ায় কাঁপছে। নিচে সব নৌকো—বাইচ হচ্ছে। দু'পাশের জনতা চিৎকার করছে। এইসব দৃশ্যে ওরা সকলে মাটির গন্ধ নিতে চাইল এবং এই জনতার মতো উন্মত্ত হতে চাইল। এইসব দৃশ্য দেখে বিজন জাহাজি যন্ত্রণার উপশম খুঁজছে।

অথচ বিজন দীর্ঘ দু'সফরে প্রকৃত জাহাজির মতো বাঁচতে গিয়ে মাঝে মাঝে খুব বিব্রত হয়ে পড়ছে। পরিবারের কিছু সংস্কার, বিশেষত ধর্মের—সে কিছুতেই ছাড়তে পারছে না। এখনও বিফ গ্যালিতে এলে সে ভালোভাবে খেতে পারে না। দেবনাথের মতো গোমাংস—ভক্ষণে তৃপ্তি নেই। জাহাজিদের প্রচণ্ড রকমের ইতর জীবনকে সে গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ এইসব ইচ্ছাগুলো তাকে মাঝে মাঝে টানে। তখন সে কাঁচা খিস্তি করে, শিস দেয়, অযথা ফোকসালে বসে রঙের টব বাজায় এবং কাপ্তান ও তাঁর পারিষদদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে।

বিজন একদা কিছু লেখাপড়া করেছিল অর্থাৎ গ্রামের বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করেছিল। অন্য দশটা অসামাজিক ছেলে—ছোকরার মতো বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজের খালাসিতে নাম লেখায়নি। বেঁচে থাকার জন্য এবং এই জীবনকে আরও দীর্ঘ করার জন্য এই জাহাজের কাজ, জাহাজি হওয়া।

'হালিসহর' এবং 'ভদ্রা'র ট্রেনিং শেষ করেছে একদা, জাহাজের প্রথম সফরে দুনিয়া ঘুরেছে এবং ইংরেজি বুলিতে রপ্ত হয়েছে। জাহাজি হয়ে উপরি পাওনা হিসাবে চটপট পরিবেশকে মানিয়ে চলার স্বভাব এবং দেহজ আবেগধর্মিতার জন্য মানুষের ভালো করার সুকোমল বৃত্তির কিছু অধিকার সহজে পেয়ে গেছে। সেজন্য সেলিমকে কেন্দ্র করে একটি অশেষ দুঃখ ওকে এখনও মাঝে মাঝে উত্তেজিত করছে। খাড়ির সংকীর্ণতা এবং মানুষের এই আনন্দ সেই অশেষ দুঃখকে যেন আরও বাড়িয়ে দিল। সে বড় মালোমকে বলল, কতদিন থাকব এখানে স্যার? যেন তার জাহাজ ভালো লাগছে না।

বড় মালোম বললেন, বলতে পারছি না। ইঞ্জিন রুমে ইন্সপেকশান আছে।

সারেং বলল, সরফাই হবে জাহাজে। জাহাজ বন্দরে বসবে। ঠিক তখনই বিজন দেখল দুজন জাহাজি সেলিমকে ধরে ধরে বোট—ডেকে তুলছে।

কাপ্তানের সামনে দাঁড়িয়ে সেলিম বলল, সাব, আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিন। সারেং ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথাটা অনুবাদ করে শোনাল।

কাপ্তান বললেন, আমিও তা চাইছি। হাসপাতালে দিলে ওরা সহজে ছাড়বে না। জাহাজ এখান থেকে তোমার দেশেই যাচ্ছে। এই বলতে গিয়েই দেখলেন কাশির সঙ্গে সেলিমের মুখে রক্ত। সকলের সামনে ধরা পড়ে যাবে ভয়ে সে এখানেও কফটা গিলে ফেলল। কাপ্তান উপলব্ধি করলেন। তাহলে অসুখটা অনেক দূর গড়িয়েছে। কোম্পানির ওষুধ এবং ইনজেকশন কোনো কাজে আসেনি। তিনি সারেংকে ডেকে বললেন, ওকে সকলের সঙ্গে রাখা চলবে না। ওকে ওপরে তুলে আনো এবং কোনো খালি কেবিনে ফেলে রাখ। ওর ভাতের থালা এবং মগ ভিন্ন করে দাও। তোমরা কেউ ওর জিনিসপত্র ব্যবহার করবে না। কাপ্তান সারেংকে অন্যত্র নিয়ে কথাগুলো বললেন। বললেন, সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে সেলিম খারাপ রোগে ভুগছে। যে ক'টা দিন বাঁচে এ—জাহাজেই বাঁচুক।

তারপর তিনি সেলিমের সামনে বললেন, জাহাজ বন্দরে ভিড়লেই তোমাকে কোম্পানির ভালো ডাক্তার দেখানো হবে। আশা করছি তুমি শীগগিরই ভালো হয়ে উঠবে। 'ঈশ্বর তোমায় করুণা করুন' এই বক্তব্যে তিনি স্বয়ং জেসাস—এর মতো চোখ বুজলেন।

বাড়িয়ালার এই পাদ্রিসুলভ চেহারাতে সারেং বিমুগ্ধ হল। পির—পয়গম্বরের মতো তিনি হয়তো কোনো ওক্তে সারেংকে দোয়া জানাবেন। সে এবারে বলল, সাব, ইউ ফাদার। ইউর শিপ, ইউর ম্যান, ইউ সি সাব এভরিথিং। সারেং এইসব বলে এই মুহূর্তে দোয়া ভিক্ষা করছে। অর্থাৎ সেলিমের প্রতি বিগলিত করুণার অংশীদার হতে চাইছে।

বিজন ডেকে কাজ করতে করতে সব দেখল। সে জাহাজ জেটিতে বাঁধতে দেখল। বন্দরের পথ ধরে সব শহরবাসীরা সামনের ঝুলন্ত ব্রিজের দিকে যাচ্ছে। কিছু টিনের শেড অতিক্রম করে মাঠ। সেখানে মেয়েপুরুষরা এই শীতেও ক্রিকেট খেলছে। সে দেখল সেলিমকে ডেকের উপর দিয়ে দুজন লোক সেই নিঃসঙ্গ কেবিনটায় নিয়ে যাচ্ছে। সেলিম সেখানে থাকবে, সেখানে খাবে, সেখানে শোবে। বিজন এও বুঝল যেন সেলিম আর বেশি দিন বাঁচবে না। জাহাজের ওই ঘরটাতেই অন্য দিন বিজন এবং অন্যান্য কয়েকজন জাহাজি মিলে কিছু পাথর, দুটো বড় গানি—ব্যাগ যত্ন করে এক কোণায় রেখে দিয়েছিল। জাহাজে মৃত্যু হলে সমুদ্রে এই সব পাথর এবং গানি—ব্যাগ দিয়ে সলিল—সমাধি দেওয়া হবে। দেহজ আবেগধর্মিতার জন্য ওর সুকোমল বৃত্তিরা ওকে ফের অশেষ যন্ত্রণাতে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কাপ্তানের নিষেধ আছে বলে সে আর ঘরে ঢুকল না। পোর্টহোলের কাচ ফাঁক করে দেখল, সেলিম বাংকে শুয়ে সেই পাথর এবং গানি—ব্যাগগুলো দেখছে। শরীরটা ওর স্থির। সে এখন কফ চুরি করে গিলে খাচ্ছে না। এখন সে নিচের পাত্রে কফ ফেলছে। এবং সঙ্গে কিছু রক্ত পুঁজ ফেলছে। পোর্টহোল দিয়েই বিজন কথা বলল, বিকেলে ভাবছি কিনারায় যাব। তোর জন্য কিছু আনব কি?

কী আর আনবি। মুখে আমার বিস্বাদ শুধু।

কিছু কমলা, কিছু আপেল?

সে অনেক দাম। অত দামের ফল আনবি না। আমার টাকার বড় দরকার, বিজন। দেশে ফিরব। শরীরের চিকিৎসা আছে, বিবি আছে, বাচ্চা আছে। ওদের জন্য ঘর করতে হবে। জমি করতে হবে। ঘর জমি হলে জাহাজে আর সফর দেব না। জমি—জিরাত দেখে, বিবি বাচ্চা দেখে আল্লার ঘরে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব।

বিজনের মুখে বিষণ্ণ হাসি। পোর্টহোলের কাচ বন্ধ করে দেবার সময় সে ইচ্ছে করেই সেলিমের শরীর থেকে জোর করে চোখ তুলে নিল। ওর খোঁচা খোঁচা দাড়ির ভিতর যে মুখ, যে মুখে একদা বসন্ত হয়েছিল, যে শরীর বাচ্চার জন্ম দিয়েছে—সেই মুখ, শরীর এবং দাড়ি, ওর চোখের সামনে মৃত অক্টোপাসের মতো পচা দুর্গন্ধময় ফুলো ফুলো শব হয়ে যাচ্ছে। সে জোর করে পোর্টহোলের কাচ বন্ধ করে দিল এবং ভয়ে চোখ বুজে ফেলল।

ভোর থেকেই সমুদ্র থেকে হাওয়া উঠে আসছে। ঠান্ডা হাওয়া। বিকেলে সে—হাওয়ার গতি আরও বাড়ল। প্রচণ্ড শীতে বিজন ওভারকোটের পকেটে হাত ঢোকাল এবং কোনোরকমে ম্যাচটা বের করে সিগারেট ধরাল। এখানে হয়তো আরও ঠান্ডা পড়বে, সে ভাবল। প্রচণ্ড শীত মাটির শেষ উত্তাপটুকু যেন শুষে নিচ্ছে। দূরে পাইন গাছগুলো থেকে পাতা ঝরছে। গাছগুলো ক্রমশ হালকা করছে শরীর। তারপর একদিন এই শীতের দৃশ্য প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রস্তরীভূত হবে যেন পাইন গাছগুলো। পাখিরা এদেশে থাকবে না। ওরা অন্য দেশে পালাবে। ওরা অন্য দেশে ঘর বাঁধবে। আর্শির মতো আকাশ। রোদের উত্তাপশূন্য হলদে রঙ জাহাজের উপর ছায়া ফেলে অনেক দূর চলে গেছে। পাইনের শাখা—প্রশাখায় পাখির বাসাগুলো ঝুলছে। রোদ সেখানেও যেন চুরি করে উত্তাপ দিচ্ছে। তারপর জেটি অতিক্রম করে পথ। সে পথের মানুষজন দেখতে নিচে নেমে গেল। একটি বাদাম গাছের নিচে দাঁড়াল। এখানে দুটো পথ। সে কোন পথে যাবে চিন্তা করল দাঁড়িয়ে।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর বন্দর ধরলে এক অনন্য সুখের সন্ধান সে পায় এই মাটির স্পর্শে। বাদাম গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ মাটির স্পর্শ নিল। সামনে শুধু শহর। ইট কাঠ। মাটির কোনো গন্ধ নেই সেখানে। সেখানে শুধু যানবাহন, কিছু কৌরীপাইনের ছায়া, পথের দু'পাশে অথবা এভিন্যুর মোড়ে মোড়ে আলো জ্বলছে—কাচের ঘর, মাংসের দোকান, রেস্তোরাঁ, কাফে, পাব। কোথাও ডেইজি ফুলের প্রদর্শনী অথবা আরও পিছনে সমুদ্রের খাঁড়ির অভ্যন্তরে নৌকা—বাইচ। এইসব ভালো লাগলেও মাটির স্পর্শের মতো সুখপ্রদ নয় যেন এরা। তবু সে হাঁটছে। তবু এই মানুষের ভীড়ে, মাটির গন্ধের জন্যে হারিয়ে যেতে ভালো লাগছে। সে দেবনাথের সঙ্গে বের হয়নি। দেবনাথ জাহাজ থেকে নেমে প্রথমেই কোনো পাব অনুসন্ধান করবে, প্রথমে পেট ভরে অন্তত বিয়ার খাবে এবং কোনো পাব অথবা কুকুরের রেসে না গিয়ে এখন শুধু এইসব সুন্দরী রমণীদের ভিড়ে বিজনের হারিয়ে যাওয়া। সে এই ভিড়ে হারিয়ে যেতে চায়। কেমন এক অশ্লীল শরীরী চিন্তায় দু'দণ্ড সে ওদের সঙ্গে কথা বলে সুখ পায়। অথচ সে ওর দেহজ কামনাকে রূপ দেবার ভঙ্গিটুকু এখনও ইচ্ছে করে আবিষ্কার করেনি। মূলত সে ভালো ভাবের জাহাজি হয়ে বাঁচতে চায়।

সে একটা দোকানে ঢুকে কিছু ফল কিনল সেলিমের জন্যে। মেয়েটি ওর হাতে ফলের প্যাকেট দিয়ে মাথা নোয়াল এবং হাসল। বিজন একগুচ্ছ মিমোসা ফুল দেখেছিল মিসিসিপি নদীর তীরে, কোনো যুবতী ওকে ফুলের গুচ্ছটি দিয়েছিল, এ—মেয়ের হাসি সে—যুবতীকে, স্মৃতির কোঠায় এনে দিল।

সে ফলের দাম দিয়ে প্যাকেট হাতে রাস্তায় নেমে এল। ফেল্ট—হ্যাটটা আর একটু টেনে দিল কপালের উপর। এবং ওভারকোট টেনে পথের ভিড়, বিশেষ করে পথের সব ফুলের মতো মেয়েদের দেখতে দেখতে ঝুলন্ত ব্রিজের রেলিংয়ে এসে দাঁড়াল। সমুদ্র থেকে এখন তেমন জোরে হাওয়া উঠে আসছে না। সে এখানে দাঁড়িয়ে তা টের পেল। দুটো খোলা গাড়িতে পুরুষ—রমণীরা হাসতে হাসতে বন্দর থেকে শহরে উঠে যাচ্ছে। দুজন যুবক—যুবতী পরস্পর কোমর ধরে হাঁটছে। সে দেখল—ওরা দুজন নেমে যাচ্ছে এবং নিচে

নেমে ব্রিজের থামের আড়ালে দাঁড়াল। সে স্পষ্ট দেখল ওরা রাস্তার উপরই প্রকাশ্য আলোতে কোমর জড়িয়ে চুমু খাচ্ছে। এইসব দেখে বিজন হাঁটতে পারছে না। সস্তায় কিছু মদ এবং সস্তায় যৌন সংযোগের তাড়নায় সে বিব্রত হয়ে পড়ল। নাইটিঙ্গেল ধরে রাত যাপনের ইচ্ছায় সে পীড়িত হতে থাকল। অথচ যেমন করে প্রতি বন্দরে এ—ইচ্ছার জন্ম হয়েছে এবং যেমন করে প্রতি বন্দরে এ—ইচ্ছার মৃত্যু—কামনা করেছে আজও তেমন ধারণার বশবর্তী হয়ে সে হাঁটতে থাকল। ভালো ভাবের জাহাজি হতে গিয়ে সে গোলাপি নেশা করে জাহাজে ফিরবে ভাবল।

সে জাহাজের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে এল। সেলিমের ফোকসালের দরজা বন্ধ। দরজার সামনে সে দাঁড়াল। ডাকল—সেলিম, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

সেলিম উঠে দরজা খুলছে। সে বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে দরজা খুলতে সেলিমের খুব কষ্ট। তবু সেমিল দরজা খুলবে এবং ওকে একটু ওর পাশে বসতে বলবে। দু'দণ্ড গল্প করতে চাইবে। দেশের গল্প, জোত—জমির গল্প। বিবি—বাচ্চার গল্প। অথবা মাছ এবং বনমুরগি ধরার গল্প। অথবা বর্ষাকালে কোড়া পাখি ধরবার সময় ধানক্ষেতের আলে কেমন করে নৌকায় ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতে হয় তার গল্প। তখন দেখলে মনে হবে সেলিম যেন এ—জাহাজেও কোড়া ধরছে। কোড়া পাখি শিকার করছে।

দরজা খুললে সে ফলগুলি সেলিমের হাতে দিয়ে বলল, তোর জন্যে এনেছি।

এতগুলো!

বিজন একটু হেসে বলল, ভয় নেই। এবারেও তোর কাছে টাকা চাইব না। আমি তোকে খেতে দিলাম।

বিজন বাইরে এসে দাঁড়ালে সেলিম বলল, কোনো খবর পেলি? জাহাজ কোথায় যাচ্ছে, কবে ছাড়ছে?

ঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না। এজেন্ট—অফিস থেকে কোনো খবর আসেনি। বড়মালোম শুধু বললেন, জাহাজে সরফাই হবে। কাল সব সাহেব—সুবোরা আসবেন। এনজিন—রুমে মেরামতের কাজ আছে অনেক। জাহাজ এখানে কতদিন বসবে কাপ্তান নিজেও বলতে পারেন না।

এবার চুপি চুপি সেলিম বলল, জানিস, কাপ্তানকে আমি বললাম, সাব আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে গেলেই আমি ভালো হয়ে উঠব। কাপ্তান বললেন, সেজন্যেই তো তোমাকে হাসপাতালে দিচ্ছি না। একবার হাসপাতালে গেলে তোমাকে ওরা সহজে ছাড়তে চাইবে না। তার অনেক আগেই তুমি দেশে পৌঁছে যাবে।

বিজনের বলতে ইচ্ছা হল, তা ঠিকই যাবি। তার অনেক আগেই যাবি। সে বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। সারেং এবং কাপ্তান মিলে সেলিমকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সে আর কোনো কথা বলতে পারল না সেলিমের সঙ্গে। সেলিমের বিষণ্ণ দৃষ্টি ওকে অত্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে ডেকে এসে নামল। কী মানুষটা কী মানুষ হয়ে গেল, ভাবল, সে সিঁড়ি ধরে ফের উপরে উঠছে। সমস্ত জাহাজে অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতা জাহাজের উপরে এখন যেন কেউ জেগে নেই। কিছু কিছু জাহাজি বন্দরে নাইটিঙ্গেল ধরতে বের হয়ে গেছে —তাদের ফিরতে দেরি হবে। যারা শুধু নেশা করে ফিরবে তারা একটু বাদেই ফিরবে। বিজন গলুই ধরে হাঁটল। সে এখানে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট ধরাল। অন্য জেটিতে কাজ হচ্ছে বলে তার কিছু শব্দ। নীল আর্শির মতো আকাশ। আকাশে নক্ষত্র জ্বলছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্রগামী জাহাজের আলো অথবা গ্যালির পাশে ইঁদুরের ঘর দেখল। কাল ভোরে এ—জাহাজের মাল নামতে শুরু করবে। অন্ধকার রাত থেকে সব লোক উঠে আসবে ডেকে। ওরা কাজ করবে, গ্যালির আগুনে ওরা হাত—শরীর গরম করবে। আর তখন বাংকে পড়ে পড়ে দেশের কথা ভাবতে ভাবতে কাশবে সেলিম।

ভোরবেলায় বিজন এনজিন ঘরে নেমে গেল। তখন সমস্ত ফল্কায় কাজ হচ্ছে। উইঞ্চ—ড্রাইভার সিগারেট ধরাবার ফুরসত পাচ্ছে না। ক্রেন—মেশিন চালকেরা টুপি মাথায় নিচের ফল্কায় উঁকি মারছে। ফল্কায় সব কুলিদের কোলাহল। এজেন্ট—অফিস থেকে ক্লার্ক এসেছেন। তিনি ঘুরেঘুরে দেখছেন। মেজ মালোম দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন এক ফল্কা থেকে অন্য ফল্কায়। পাঁচ ফল্কায় পাঁচজন লোকের মুখে হাড়িয়া—হাপিজ শব্দ। মাল জাহাজ থেকে উঠছে, ফের বন্দরে নেমে যাচ্ছে।

এইসব দৃশ্যগুলো এখন জাহাজের ডেকে ঝুলছে।

গ্যালিতে ভাণ্ডারী নেই। বাটলারের ঘরে সে ক্রু—দের রসদ আনতে গেছে। ব্রিজে কাপ্তান পায়চারি করছেন, মেজ মিস্ত্রি নিচে নেমে গেছেন। বড় মিস্ত্রি এইমাত্র হাই তুলতে তুলতে টর্চ হাতে নিচে নামছেন। বন্দর থেকে সব কিনারার লোক উঠে আসছে। ওরা ডেক অতিক্রম করে এনজিন—রুমে নেমে গেল। বড় মিস্ত্রি ওদের নিয়ে সব এনজিন—রুমটা ঘুরলেন। বয়লারের ঘর দেখালেন। ছ'টা বয়লারের ট্যাংক—টপ, চক, টানেল পথ, কনডেনসার, এমনকি স্মোক—বক্সগুলো পর্যন্ত। তারপর ওরা বাংকারে বাংকারে ঘুরল। বিজন অন্ধকারে কোণে দাঁড়িয়ে সব দেখল। ওরা উপরে উঠে যাচ্ছে। সে ওদের দেশীয় ইংরেজি কথাগুলো কিছু কিছু ধরতে পারছে। জাহাজ এখানে বসবে অনেক দিন—এমনই ওরা যেন বলল। যেন বলল, জাহাজে অনেক কাজ, জাহাজডুবি হয়নি—জাহাজিদের সৌভাগ্য।

বিজন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেটা পোর্টসাইডের বয়লারের নিচু অংশ। হাঁটু পর্যন্ত ছাই জমে আছে এখানে। নিচে কিছু পুরোনো বেলচে, শাবল, র‍্যাগ, স্লাইশ। কিছু ফায়ার—ব্রিজের প্লেট। ওপরের আলোটা নেই। এখানে অন্ধকার। সে এখান থেকে এনজিন—কসপের ঘরে উঠে গেল। ডেক—কসপের জন্য দুটো তামার প্লেট চাইল। তারপর সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতেই বন্দরের একজন শ্রমিক বলল, গুড মর্নিং, মিস্টার।

ইয়েস, গুড মর্নিং।

বিজন বুঝল লোকটি কাজের ফাঁকে ওর সঙ্গে একটু গল্প করতে চায়। লোকটি হয়তো সস্তায় সিগারেট কিনতে চায়।

লোকটি ফের বলল, ইয়ু গ্যান্ডিম্যান?

বিজন বলল, ইয়েস।

দেবনাথ গ্যান্ডিম্যান?

বিজন বলল, ইয়েস।

দেবনাথের সঙ্গেও ওর আলাপ হয়েছে দেখে বিস্মিত হল।

লোকটি ফের বলল, অল ড্যাড়িওয়ালা পাকিস্তানি?

লোকটি তবে এইসব খবরও রাখে। সে বলল, ইয়েস।

বিজন হেঁটে যাচ্ছে ডেক ধরে। শ্রমিকটি ওর পিছু পিছু এল। এবং পকেট থেকে একটি ইউক্যালিপটাসের বোতল বের করে বলল, ইটস ফর ইউ।

বিজন এবারেও আশ্চর্য হল। দামি এই অয়েলটুকু পেয়ে বিজন খুব খুশি হল। বলল, কাম অন। কত দাম দিতে হবে?

কোনো দাম নেই। আমাকে এক শিশি সরষের তেল দেবে। দেবনাথও দেবে বলেছে। তেলটা আমি মাথায় দিচ্ছি। ইন্ডিয়া থেকে জাহাজ এলেই আমি এ—তেলের জন্য ডেকে কাজ নিয়ে উঠে আসি। তেল সংগ্রহ করি এবং তেলটা মাথায় দি। রাতে আমার ভালো ঘুম হয়।

ওরা সেলিমের কেবিন অতিক্রম করার সময় সেলিম পোর্টহোলের ভিতর থেকে কয়েদির মতো উঁকি দিল। সেলিম বাংকে বসে পোর্টহোল দিয়ে এইসব মানুষদের কাজ দেখছে। হাড়িয়া—হাপিজের শব্দ শুনছে। ড্যারিক উঠতে নামতে দেখছে। এইমাত্র এই পথ দিয়ে বড় মালোম গেলেন। দুটো মেয়ে গেল—বোধ হয় বড় মিস্ত্রির ঘরে অথবা ছোট মিস্ত্রির বাংকে। সে এখানে বসে দূরের পাইন গাছ দেখতে পেল। এবং পোর্টহোলের কাচ পেরিয়ে বিজনকেও চলে যেতে দেখল।

শ্রমিকটি বলল, ম্যান ইজ সিক?

সে বলল, ইয়েস, সিক। টিবিতে ভুগছে।

টিবিতে ভুগছে! হাসপাতালে দিচ্ছে না! বড় আশ্চর্য! যেন শ্রমিকটি ঝুপ করে আকাশ থেকে পড়ল।

বড় আশ্চর্য! বিজন হাঁটতে থাকল। লোকটি ওর পাশাপাশি হাঁটছে। সে বলল ফের, এ নিয়ে পাঁচ বন্দর ঘোরা হল। কাপ্তান এতদিন হাসপাতালে দেবেন দেবেন করছিলেন, এখন শুনতে পাচ্ছি দেওয়া হবে না। জাহাজ দেশে ফিরবে। সেও দেশে ফিরবে।

এসব দেখেও তোমরা চুপ করে আছ!

বিজন দেখল লোকটি যেন এই মুহূর্তে বিদ্রোহ করে সকলকে জানাতে চাইছে, জাহাজে একজন জাহাজি টিবিতে ভুগছে অথচ ওকে হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছে না, কাপ্তান কোম্পানির টাকা বাঁচাচ্ছে। আপনারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পেশ করুন।

শ্রমিকটিকে বেশ চিন্তিত দেখাল। পাশের অন্যান্য কুলিদের সে ঘটনাটা খুলে বলল। ওরা সকলে একত্র জমা হচ্ছে। ওরা এই নিয়ে জটলা পাকাতে চাইছে যেন। ওরা যেন বলতে চাইছে—তোমরা সেলর, তোমরা এইসব সমুদ্রগামী জাহাজগুলোকে বন্দর থেকে বন্দরে নিয়ে যাও, ঝড়ের দরিয়া পার করে জাহাজের কোম্পানির প্রতিপত্তি বাড়াও—আর তোমাদের চিকিৎসা হবে না, তোমাদের জন্যে হাসপাতালের বন্দোবস্ত থাকবে না, কোম্পানি বেইমানি করবে, তোমরা ভেড়ার মতো ঘাস খাবে—সে ঠিক কথা নয়। তোমরা বিদ্রোহ কর। সে বিদ্রোহে আমরা যোগদান করব। তোমাদের একতার অভাব, আমাদের একতা ইচ্ছা করলে ধার নিতে পারো। দেউলিয়া হবার ভয় নেই।

ভিতর থেকে লম্বা লোকটি বের হয়ে বিজনকে বলল, ইউ বেটার গো টু মিস্টার ট্রয়। তিনি সিম্যান ইউনিয়নের সেক্রেটারি। ঠিকানা—পাঁচ কলিন স্ট্রিট; স্টেশনের পাশ দিয়ে যে বড় এভিন্যুটা পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে সেখানে গিয়ে খোঁজ করবে। তাঁকে পেলে, ঘটনাটি খুলে বলবে। তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

বিজন ওদের ধন্যবাদ জানাল। এবং কেবিনে ঢুকে লোকটিকে এক বোতল সরষের তেল দিয়ে বলল, ইউ হ্যাভ ডান এনাফ। আমি আজই মিঃ ট্রয়ের কাছে যাব।

অথচ সে দেবনাথের মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিল—এইসব আবেগধর্মিতার লক্ষণগুলো ভালো নয়। সেলিমের উপকার করে তোর কী আখের হবে এমন ভাব দেবনাথের মুখে। সুতরাং স্পষ্টতই দেবনাথ যেতে রাজি হল না।

বিকেল। শীতের বিকেল। চারটে না বাজতেই শীতের সমুদ্রে অলস সূর্য উত্তাপের জ্বালায় ডুব দিচ্ছে। গাছগুলো নেড়া নেড়া। ইউক্যালিপটাসের পাতা খসে পড়ছে। আকাশ থেকে যেন শীতের তুষার ঝরছে। ঠান্ডা ঠান্ডা, হাত—পা জমে যাবে ভাব। বিজন হাতের দস্তানা টেনে দিল। টুপিতে কপাল ঢেকে দিল। তারপর ধীরে ধীরে গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেল। সমুদ্র থেকে শীতের হাওয়া ফের উঠে আসছে।

ইচ্ছা হল বন্দরে নেমে ট্যাক্সি করার। ইচ্ছা হল দু' শিলিং—এর আপেল কেনার। এবং ইচ্ছা হল এভিন্যুর টিন—কাঠের ঘরের ভিতর ঢুকে দু দণ্ড জুয়া খেলার। তবু সেলিমের জন্য আপাতত হাঁটতে থাকল সে। ধীরে ধীরে হেঁটে গেল, ঝুলন্ত ব্রিজ অতিক্রম করতে পনেরো মিনিট, সিম্যান—মিশান বাঁয়ে ফেলে রেলওয়ে স্টেশন অতিক্রম করতে অনধিক পনেরো মিনিট—তারপরই চড়াই পথে উঠতে গিয়ে কলিন স্ট্রিট মিলবে। নাম্বার ফাইভ কলিন স্ট্রিট। মনে মনে নম্বর মুখস্থ করার মতো উচ্চারণ করল কথাটা এবং দুটো সুন্দরী মেয়েকে রমণীয় হতে দেখে শিস দিয়েও ফেলল। এবং যদি ওরা প্রশ্ন করে ওর শিস শুনে, তুমি সিম্যান?

সে বলবে, ইয়েস।

যদি বলে, ইন্ডিয়া থেকে এলে?

সে বলবে, ইয়েস?

যদি বলে, তুমি গান জানো?

সে বলবে, ইয়েস।

তুমি ক্রিকেট খেতে পারো?

সে বলবে ইয়েস।

সুতরাং ওর গান, খেলা এবং এই শঠতা সবই ইয়েসের কোঠায় পড়বে।

বিজন নিজের মনেই হেসে ফেলল। সুন্দরী রমণীরা এখন ঝুলন্ত ব্রিজের উপরে উঠে যাচ্ছে। ব্রিজের রেলিং ধরে কিছু মেয়েপুরুষ গুঞ্জনে মশগুল। অথচ সুন্দরী রমণীরা ওকে দেখেও প্রশ্ন করল না। ওর শিস দেওয়ার অর্থকে ব্যতিক্রম বলে ভাবল না। সুতরাং সে জোরে জোরে হেঁটে ওদের পিছনে ফেলে নিচে নেমে একটি চলন্ত ফলের দোকান থেকে দু'শিলিং—এর আপেল কিনল। তারপর বুলফাইটের বিজয়ী মাটাডরের মতো এইসব সুন্দরী রমণীদের এবং সুন্দর পুরুষদের ভিড় ঠেলে বের হয়ে গেল। বের হয়ে যাচ্ছে। সে হাঁটছে। এখন যেন সহসা মনে হল সেলিম পীড়িত। সে বাংকে শুয়ে রক্ত তুলছে মুখে। দেশে একমাত্র পিসিমা বেঁচে আছেন, তাঁকে টাকা পাঠাতে হবে। আজও বয়স্কা সুন্দরী রমণীদের দেখলে সে তার মাকে স্মৃতির কোঠায় সংগ্রহ করতে পারে। সে সামনের বয়স্কা সুন্দরী রমণীকে প্রশ্ন করল উড ইউ হেলপ মি? আপনি কি আমাকে কলিন স্ট্রিটে যেতে সাহায্য করবেন?

বয়স্কা সুন্দরী রমণী বলল, তুমি কি স্ট্রেঞ্জার?

সে বলল, ইয়েস। আমি সেলর।

এ বন্দরে প্রথম এলে?

ইয়েস, এই প্রথম এসেছি।

ইওর কানট্রি?

বিজন দেশের নাম করল।

অল রাইট। তুমি এসো। তুমি গ্যান্ডিম্যান। তুমি ভালো লোক আছ এমন ভাব যেন বয়স্কা সুন্দরী রমণীর চোখে।

বিজন শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গেল। সে দীর্ঘস্থায়ী আলাপে রাজি হল না। নতুবা এদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সংশয় আর দুঃসহ রকমের প্রশ্নের মুখে পড়ত—এখনও দুর্ভিক্ষ আছে? এখনও মহামারি হয়? এখনও সন্ন্যাসীরা গাঁজা খেতে খেতে ধর্মালোচনা করে? এখনও হিমালয়ের বুকে নাক জাগিয়ে সাধু মহান্তরা বরফের নিচে ঈশ্বর—উপাসনা করছেন?

প্রায়ই সে এইসব ক্ষেত্রে চটপট উত্তর দেবার ভঙ্গিতে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এবং কিছু বলে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে। সত্য—মিথ্যা—যে—কোনো প্রকার। এসব ক্ষেত্রে সে কখনও নিজেকে ছোট করবে না। নিজেকে, নিজের দেশকে ছোট করার ইচ্ছা তার কোনোদিন হয়নি।

একদা ভিক্টোরিয়া বন্দরে একজন ব্রেজিলিয়ান গার্ল বলেছিল, তোমার চোখ বড় গভীর, তোমার চোখ কবিতার মতো।

সে বলেছিল, আমি যে কবিতা লিখি।

একদা একটি চিলি—কন্যা বলেছিল, তোমার কোমর খুব সরু। তোমার এই দীর্ঘ কোমল চেহারা নাচিয়ের মতো।

সে বলেছিল, একদা আমি ব্যালেতে নাচতুম।

বিজন এইসব ভাবনার ভিতর এভিন্যু ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। রেল—স্টেশন অতিক্রম করে সে ডাইনে মোড় ঘুরল। এখানে সে কিছু ফুলের গাছ দেখল। মিমোসা—ফুলের গুচ্ছের মতো এইসব ফুলেরা গাছে ঝুলছে। যারা পথ ধরে যাচ্ছে, ফুলেরা তাদের শরীরের উপর ঝরে পড়েছে। বিজনের ব্লু—ব্ল্যাক কোটের রঙে জাফরি রঙ ধরাল। সে অনেকক্ষণ এইসব গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। চারিদিকে নিয়ন আলো, কাচের ঘরে আলো জ্বলছে। এই আলোর ভিড়ে এইসব শ্বেতাঙ্গ রমণীদের বিজনের বড় ভালো লাগল। ওর আর ইচ্ছে হচ্ছে না এক পা নড়তে। ওর ইচ্ছে নেই এখন কলিন স্ট্রিটের পাঁচ নম্বর বাড়িতে ঢুকে নীরস আলোচনায় ডুবে যেতে। তার চেয়ে বরং এই ভালো। বিদেশি এইসব ফুলের ভিড়ে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড সাগরের দুঃখকে ভুলে এই সুখ—দুঃখে ডুবে যাওয়া।

অথচ সে দাঁড়াতে পারল না। বন্দরে সেলিম, ওর কাশি, ওর নিরীহ মাছের মতো চোখ বিজনকে তাড়া দিচ্ছে। বিজন ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা অতিক্রম করে বড় হলঘরটায় ঢুকে গেল। গায়ে পেতলের প্লেটে লেখা—পাঁচ, কলিন স্ট্রিট, পাথরের উপর খোদাই করা সাইনবোর্ড। লেখা আছে—জাহাজিরাও আপনার আমার মতো মানুষ।

এইসব বড় বড় হরফে বড় বড় কথা পড়তে পড়তে বিজন হলঘরে ঢুকে গেল। পাথরের দেয়ালে বড় বড় ছবি ঝুলছে। পায়ের নিচে মসৃণ পাথরের ওপর প্রতিবিম্ব ভাসছে। মসৃণ পাথরে ওর চেহারা আয়নার মতো ধরা পড়ছে। বিজন সন্তর্পণে হাঁটল। সন্তর্পণে পাথরের আর্শিতে নিজের মুখ দেখল, কারণ অন্য কোনো মুখ অথবা অন্য কোনো শব্দ এ—হলঘরে ভেসে উঠছে না। সে বিস্মিত হল। পাথরে দেয়ালে কিছু তৈলচিত্র। কিছু দামি আলো এবং এইমাত্র পালিশ—করা জুতোর রঙে এইসব দেয়াল, এইসব ছবি। সে একবার ভাবল বরং চলে যাওয়া যাক। বরং কাল দেবনাথকে বলেকয়ে একসঙ্গে আসা যাবে। এই নিঃসঙ্গ পুরীতে বিজন ভীত এবং বিহ্বল হয়ে পড়ল। অথচ সে এখন দেয়ালের কিছু কিছু তৈলচিত্র চিনতে পারছে—ওরা শেক্সপিয়ার, টলস্টয় এবং আরও সব মনীষীদের পাশে ট্যাগোর—জন্ম ১৮৬১... মৃত্যু ..... কী একটা সালের নাম। ট্যাগোর .... তারপর জন্ম—মৃত্যুর কথা ভেবে ওর কিঞ্চিৎ সাহস জন্মাল। সে চারিদিকে চোখ তুলে একবার তাকাল। উত্তরের দিকে পাথরের দেয়ালের একটা দরজা স্বয়ং খুলে যাচ্ছে। এবং একজন প্রৌঢ় বের হয়ে আসছেন। তিনি যেন কোনো যক্ষপুরী থেকে উঠে আসছেন। সে তাকেই কোনোরকমে প্রশ্ন করল, মিঃ ট্রয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। প্রশ্ন করে ট্যাগোরের ছবির প্রতি ফের নজর ফেলে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গৌরব বোধ করল।

ভদ্রলোক বললেন, দরজা ঠেলে ভিতরে যান। ওর স্টেনো এলবি আছেন। তাঁকে প্রশ্ন করুন। শেষে ভদ্রলোক ওকে গুডবাই ভঙ্গিতে বিদায় জানালেন।

বিজন একান্ত বশংবদের মতো দরজা ঠেলতেই ভিতর থেকে জবাব এল, কাম ইন, কাম ইন!

বিজন এই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কোনো মুখ দেখতে পাচ্ছে না অথচ অপ্রত্যাশিত মেহমানের মতো ডাক ওকে বিচলিত করছে। যেন সে দেয়াল—ঘেরা কোনো যক্ষপুরীতে এসে ঢুকেছে। সেখানে দেয়ালের ভিতর থেকে নারী—কণ্ঠের জবাব, কান ইন, কাম ইন। এবং সে ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে বলেই দেখতে পেল মেয়েটি টেবিলের উপর ঝুঁকে কাজে ব্যস্ত। মেয়েটি একবার চোখ তুলে দেখছে না। দেখল না। কে এল কে গেল, সে দেখল না। সে হাত তুলে ইশারায় ওকে সামনের চেয়ারে বসতে বলছে। ছোট চিলতে করিডরের মতো এই একফালি ঘরে একটি টেবল সহ মেয়েটিকে খুব ভিন্নধর্মী বলে মনে হচ্ছে।

সে চেয়ারে বসে ইতস্তত দেয়ালে নজর দিতেই দেখল মেয়েটির দেয়ালের কীলকেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং—যেন উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্মিত হাসিতে এইসব অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করছেন। ছবিটি হাতে আঁকা বলেই বিজনের মনে হল। কোনো ছবির যেন নকল। এইটুকু দেখে এবং ভেবে বিজনের বিচলিত ভাবটুকু কেটে গেল। সে বলল, মিঃ ট্রয় থাকলে দেখা করতাম।

এলবি চোখ তুলে বিজনকে দেখল। একজন সুপুরুষ বিদেশি যুবাকে দেখল। যুবাকে দেখে চোখেমুখে কোনোও ভাবান্তর নেই। বিজনকে দেখে লেজারে হিসাব কষছে এমন ভাব চোখে। চোখের পাতা পড়ছে না—দৃষ্টি এমন দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ে গভীর। এই নির্লজ্জ ভাবটুকু বিজনের ভালো লাগল না। বস্তুত বিজন খুব আড়ষ্ট বোধ করছে।

তিনি তো নেই। তোমার কী দরকার আমাকে বলে যাও। তিনি এলে বলব।

বিজন বলল, প্রয়োজন আমার অনেক। তোমাকে আমার প্রয়োজনের কথা অনেকক্ষণ ধরে শুনতে হবে।

শুনব।

সব ঘটনাই মিঃ ট্রয়কে কিন্তু বলতে হবে।

এলবি হাসল। এলবি বিদেশি যুবাকে ফের কৌতূহলের চোখ নিয়ে দেখছে। এবং সেই পুরুষের মতো দৃষ্টি —যা বিজন সহ্য করতে পারছে না। সে এলবিকে সাধারণ যুবতীর মতো দেখে, খুশি হতে চাইল।

এলবি বলল, তুমি বল, আমি নোট করছি।

নিজের ভুলটুকু বুঝতে পেরে বিজনও হাসল।—তোমাকে নোট নিতে হবে না। মুখে বললেও চলবে। ঘটনা হচ্ছে পার্থ বন্দরে ....

এলবি এ—সময়ে বাধা দিল বিজনকে, জাহাজটার নাম বল। তোমরা কোন দেশের ক্রু, কোন দেশ থেকে এসেছ সব বলতে হবে।

জাহাজের নাম 'এস এস টিবিড ব্যাংক'। আমরা ইন্ডিয়া থেকে এসেছি।

তারপর?

বিজন জাহাজের সব ঘটনা, সেলিমের বর্তমান অবস্থা, এমনকি সারেং এবং কাপ্তানের গোটা চক্রান্তের কথাও খুলে বলল। বিশেষ করে মেয়েটির স্বাভাবিক আগ্রহে সব খুলে বলতে পারল। এখন সে আর কোনো আড়ষ্টতায় ভুগছে না। এখন সে রবীন্দ্রনাথকে দেখে রীতিমতো উত্তেজিত হতে পারছে। সে এবার একটু ঝুঁকে বলল, এর একটা বিহিত করতেই হবে দয়া করে। নতুবা বেচারা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। বেচারার ঘরে বিবি আছে। ছোট একটি মেয়ে আছে। ওরা সব ওরই পথ চেয়ে বসে আছে।

এখন বিজনকে দেখলে কে বলবে, এ জাহাজি বিজন। কে বলবে এ বিজন কথায় কথায় শিস দেয়। কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলে বিদেশি রমণীকুলে বাহবা নিতে চায়! বিজনের চোখ—মুখ মানুষের ভালো করার প্রবৃত্তিতে বস্তুতই সজল হয়ে উঠেছে এখন।

এলবি বলল, ও ঠিক আছে। মিঃ ট্রয় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না। জাহাজিদের ভালো করাই আমাদের কাজ।

বিজন ওঠবার সময় ফের রবীন্দ্রনাথকে দেখল এবং অদম্য কৌতূহল চাপতে না পেরে বলল, আমরা ট্যাগোরের দেশ থেকে এসেছি। তোমরা ট্যাগোরের ভক্ত দেখছি। দেখি তোমরা এখন আমাদের জন্য কতটা কী করতে পার।

তুমি ভারতবর্ষের লোক? কিন্তু ভারতবর্ষ তো বিরাট দেশ। এখানে পাঁচ বছর আছি। ভারতবর্ষ থেকে আসা কিছু কিছু জাহাজিদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। অথচ দুর্ভাগ্য ওরা কবির ছবি দেখেও কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি। বিশ্রী ধরনের পোশাক পরে এখানে এসেছে। চেয়ারে না বসে মেঝেতে বসে পড়েছে। শীতে দেখেছি ওরা ভয়ানকভাবে কাঁপত। শীতের গরম জামাকাপড় পর্যন্ত নেই।

বিজন বলল, ওরা এখনও আছে। জাহাজে গেলে তুমি ওদের এখনও দেখতে পাবে।

এলবি বলল, ভারতবর্ষের লোক ভাবতে তোমাকে কষ্ট হয়।

বিজন বলল, মাপ করবেন। যারা তখন ছিল এখনও আছে। তাদের জাহাজি জীবনের এক বিচিত্র অধ্যায় আছে। ওরা আসছে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সন্দীপ অঞ্চল থেকে। ওরা অজ্ঞ। চাষি পরিবার থেকে আসছে।

বিজন ভাবল—এইসব জাহাজিদের জাতীয় পোশাকের প্রতি এলবির তীব্র ঘৃণা। বস্তুত লুঙ্গি এবং কাঁধে গামছা ফেলে এইসব জাহাজিদের বড় বড় এভিন্যু ধরে হাঁটা এবং নিজেদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দেওয়া এলবির কাছে বিশ্বকবিরই যেন অবমাননা। সেজন্য বিজনের দুর্লভ ইংরেজি বলার কায়দা এবং উজ্জ্বল বিদেশি পোশাক, উপরন্তু কবির প্রতি শ্রদ্ধাটুকু এলবিকে বিজন সম্বন্ধে অভিভূত করেছে। বস্তুত এলবি ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে সহ্য করতে পারে না। আজও পারছে না। ওর চোখেমুখে এইসব যেন ধরা পড়ছে।

বিজন বলল, ওরা অজ্ঞ নিরক্ষর বলেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ওদের কোনো কৌতূহল নেই।

এলবি সহসা বলল, বাবা কবিকে ইউরোপে দেখেছেন। তুমিও কবির দেশের লোক। তুমি কবিকে দেখেছ?

সহসা এই প্রশ্নে বিজন কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে পড়ল। ওর জাহাজি মনটা ধীরে ধীরে ওর অস্তিত্বকে গ্রাস করছে। সে বলল, নিশ্চয়ই। নিমতলা থেকে বটতলা বেশি দূরে নয়। নিমতলার কাছেই জোড়াসাঁকো। আমার ছেলেবেলায় কত ও—পাড়ায় কত খেলতে গেছি। কতদিন আমরা কবিকে দেখে প্রণাম করেছি। তিনি তখন প্রায় অচল।

তুমি ওঁকে প্রণাম করেছ! তুমি ওঁকে স্পর্শ করতে পেরেছ!

বিজন বিনয়ের আধার হয়ে গেল। বিজন বলল, কবি আমাদের আশীর্বাদ করতেন। বলতেন ভালো ছেলে হবে, দেশের দুঃখ দূর করবে।

এলবি ফের আশ্চর্য এক শ্রদ্ধার ভঙ্গিতে বলল, তুমি ওকে স্পর্শ করতে পেরেছ, প্রণাম করতে পেরেছ!

বিজন দেখল এলবির চোখ দুটো শ্রদ্ধায় গভীর হয়ে উঠছে। এলবি একবার ঘাড় ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখল, একবার বিজনকে দেখল। কবির খুব নিকটের একজন যুবাকে স্পর্শ করার প্রকট ইচ্ছায় সে হাত বাড়িয়ে দিল। যেন বলতে চাইছে—তুমি বি—জন, তুমি কবিকে স্পর্শ করেছ, তুমি কবির দেশের, ঘরের লোক। এলবির মনে এই ভাবগুলো কাজ করছে।

এলবি বলল, বাবা তখন ইউরোপে ছিলেন। বাবা কবিকে ইউরোপে দেখেছেন। বাবা মাকে এবং আমাকে বলতেন, হি ইজ এ সেইন্ট, জাস্ট অ্যাজ পিটার অর পল। বিজন সেই ঋষিপুরুষদের আশীর্বাদ পেয়েছে। এলবি বিজনের আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাইল।

এলবি বলল, তোমরা আর কতদিন থাকবে এ—বন্দরে?

প্রায় মাস দুই। জাহাজ এখানে মাস দুই বসবে। ড্রাইডক হবে। মেরামত হবে।

সহসা এলবি বলে বসল, আমার একটা অনুরোধ তোমায় রক্ষা করতে হবে।

বিজন একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তবু সে বলল, বল; রাখব। যদি ক্ষমতায় কুলোয় নিশ্চয়ই রাখব।

তোমার কাছে আমি ট্যাগোরের কবিতা বাংলা—ভাষায় শুনতে চাই। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। যখন থেকে ট্যাগোরের কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই তখন থেকে ইচ্ছা—তোমার দেশে যাব, ভারতবর্ষকে দেখব। কবির শান্তিনিকেতন দেখব। আমি এইজন্য প্রথম থেকেই টাকা জমিয়ে আসছি। কবির কবিতা বাংলা ভাষায় শুনব—কত দিনের ইচ্ছা আমার!

তার জন্য কী আছে—সেলিমের ঝামেলাটা চুকে যাক। তারপর একদিন তোমায় শোনানো যাবে।

এলবি চোখ বুজল। যেন রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর দেশকে, বিজনকে অনুভব করার জন্যই চোখ বুজল। বিজন এই আবেগধর্মিতায় বিমুগ্ধ হল না। বরং পীড়িত হল। সাহিত্যের অ—আ—ক—খ সম্বন্ধে যার কোনো স্পৃহা নেই, তাকেই এই নিদারুণ সত্যে টেনে আনার কী যে অর্থ, বিজন বুঝতে পারল না। তবু সে ভাবল, হাতে অনেক দিন, পরে ভেবে যা কিছু একটা বলা যাবে।

বিজন এবার উঠতে চাইল এবং বলল, তোমার নামটা জানা হল না।

এলবি বলল, আমাকে সকলে এখানে এলবি বলেই জানে। পুরো নাম সিসিল এলবার্টি। মিস এলবার্টি বলেও ডাকতে পারো।

এলবি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিল, আমি তোমায় কবিতা শোনাব। ট্যাগোরের কবিতা।

বিজন ভাবল, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল। সে উঠে পড়ল।

এ সময় এলবি ওর সামনে এসে দাঁড়াল এবং হ্যান্ডশেক করল। তারপর প্রশ্ন করল, জাহাজ তোমার কোন ডকে নোঙর ফেলেছে?

সাউথ—ওয়ার্ফে। বিজন এবার দৌড়ে পালাবার মতোই হলঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে গেল এবং দুঃসহ ভার থেকে যেন মুক্ত হল।

ডেকে তখন পুরোদমে কাজ চলছে। এনজিন রুমেও। এনজিন—রুমে বড় বড় প্লেট সব স্ক্র্যাপ করা হচ্ছে। বড় বড় সব অক্সিজেনের সিলেন্ডার নামানো হচ্ছে। ফল্কায় ফল্কায় কাজ; জাহাজিরা রঙ করছে ফানেলে, বোট—ডেকে। একজন দুজন করে সকলে উঁকি মেরে যাচ্ছে সেলিমের কেবিনে। বিজন গতকালের ঘটনার কথা কাউকে বলেনি, সে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করতে চায়। শুধু আজ সে কিনারার লোকেদের ডেকে সেলিমের অবস্থা দেখাচ্ছে। দেখাল—এইখানে সেই লোকটি থাকে, তাকে তোমরা দেখে যাও।

প্রচণ্ড শীত এবং হাওয়ার জন্য জাহাজিদের হাতে কাজ তেমন জমছে না। ওরা ফানেলের উপর ঝুলে অথবা বোটের উপর দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছিল। মাঝে মাঝে গ্যালিতে গিয়ে আগুনের উত্তাপ নিয়েছে। শক্ত হয়েছে ওরা এবং রাত্রির কোনো আকস্মিক যৌন ঘটনার কথা ফলাও করে বলে কোনো জাহাজি বাহবা নিতে চাইছে।

বিজন নিচে দাঁড়িয়ে ফানেলে যে রঙ করতে উঠে গেছে তার দড়িদড়া ঢিল দিয়ে অথবা শক্ত করে বেঁধে রেখে কাজে সাহায্য করছে। আকাশ তেমনি আর্শির মতো। বন্দরের পাইন গাছ থেকে তেমনি পাতা ঝরছে। এ শীতেও এনজিন—ট্যান্ডল পুরোনো কোট গায়ে লুঙ্গি পরে নিচে নেমে গেল। জেটি ধরে হাঁটতে থাকল। গতরাতেও এনজিন—ট্যান্ডল শীতে কাঁপতে কাঁপতে বন্দরে নেমে গেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বন্দরের পথ ধরে শহরে উঠে গেছে। পুরোনো বাজারে গিয়ে দু—শিলিং দাম দিয়ে পুরোনো জামাকাপড় কিনেছে। জাহাজিরা আফ্রিকার বন্দরে অথবা ফিজি দ্বীপে ওগুলো বিক্রি করবে। গতরাতে ফেরার পথে ট্যান্ডল শীতে যখন আর হাঁটতে পারছিল না, যখন সস্তায় যৌন সংযোগের দায়িত্ব পালন করে আর হাঁটতে পারছিল না, তখন বুড়ি মেমসাব গাড়ি থেকে এই বুড়ো ট্যান্ডলকে একটা দামি ওভারকোট দয়াপরবশ হয়ে ছুড়ে দিয়েছিল। ভোরে সে দামি ওভারকোটটা সকল জাহাজিদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। বলেছে—শীতে রাস্তায় কাঁপছিলাম, বুড়ি মেমসাব দিয়ে দিল। গতকাল এই ভারতীয় নাবিকদের কথাই দুঃখ করে বলছিল এলবি। বিজন ফানেলের নিচে দাঁড়িয়ে এনজিন—ট্যান্ডলকে শহরে উঠে যেতে দেখছে আর বিরক্তিতে ফেটে পড়ছে।

বিজন ফানেলের পাশ থেকে অন্য জাহাজিকে উদ্দেশ করে বলল, মকবুল, দেখলি এনজিন—ট্যান্ডলের কাণ্ড! আজও এই ভোরে শীতের ভিতর লুঙ্গি পরে বন্দরে নেমে গেল। দেশের জাত—মান সব ডুবাচ্ছে। তোরা কিছু বলতে পারিস না ওকে?

বিজন দেখল মকবুলের মুখেও এমত ইচ্ছা—শীতের রাতে নীলরঙের পায়জামা পরে ছেঁড়া কোট গায়ে বের হয়ে যাওয়া, পথে দাঁড়িয়ে শীতে কষ্ট পাওয়া এবং কোনো পুরুষ অথবা মহিলার দাক্ষিণ্য গ্রহণ করা। বিজন ভাবল, শীতের রাত, রাস্তায় বরফ পড়ছে, তবু নীল মার্কিন কাপড়ের জামা পায়জামা শরীরে এঁটে এইসব জাহাজিদের ভিড় কিনারায়। এইসব জাহাজিরা ভারতবর্ষ থেকে আসে। বড় গরিব, বড় নিঃস্ব। এইসব জাহাজিদের ইংরেজ কোম্পানির মালিকেরা কলকাতা বন্দর থেকে ধরে নিয়ে আসে। তাদের খেতে দেওয়া হয় বাসি গোরুর মাংস, ডাল, ভাত। মাঝে মাঝে বাঁধাকপির তরকারি দিয়ে কোম্পানি বদান্যতা দেখায়। এইসব জাহাজিরা বন্দরে লুঙ্গি পরে, ছেঁড়া ওভারকোট গায়ে শীতের রাতে ঘন আঁধারে বুড়ি মেমসাবদের খুঁজে বেড়ায়। দাম যত কমে হয়, জিনিস যত নীরস হয় ক্ষতি নেই, তবু যৌন সংযোগটুকু রক্ষা করতেই হবে। তখন বিদেশে এলবির মতো রমণীরা ভাবে ওরা অসভ্য, ওরা বর্বর। একদা পৃথিবীর সব বন্দরগুলোতে কলকাতা বন্দরের এইসব নাবিকেরা ঘুরে বেড়িয়েছে। পৃথিবীর সব বন্দরে বন্দরে ভারতবর্ষকে ওরা নোংরা নিঃস্ব প্রতিপন্ন করেছে। আজও করছে। অথচ বিজন ভাবল এর বিরুদ্ধে নালিশ নেই। যতদিন এরা থাকবে —এনজিন—ট্যান্ডলের মতো এইসব লোকগুলোও থাকবে।

বিজন এইসব ভেবে এত বিরক্ত এবং অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে কখন মকবুল ফলঞ্চার দড়িতে ঢিল দিতে বলেছে, কখন ইটন এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ওর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে হাসছে—বিজন

তার কিছুই ধরতে পারেনি।
ইটন বলল, গুড মর্নিং।
বিজন বলল, ইয়েস, গুড মর্নিং।
তারপর ওরা সকলেই লক্ষ্য করল জাহাজে কেমন একটা চঞ্চলতা প্রকাশ পাচ্ছে। অনেকগুলো মোটরগাড়ি এসে বন্দরে থেমেছে। সব লম্বা চৌক মুখওয়ালা লোকেরা জাহাজে উঠে আসছে। ডেকের উপর সব জাহাজিরা, কিনারায় লোকগুলো হাত তুলে আকাশ দেখছে। ইটনও আকাশ দেখল, বিজনও আকাশ দেখল। দেখে বিস্মিত হচ্ছে। ইটনের মুখ রহস্যময় হয়ে উঠেছে, ইটন বলছে—কেমন, কাজ হল তো।
ফানেলের চূড়ায় ঝুলে মকবুল প্রশ্ন করল, আকাশে এরোপ্লেনটা কী লিখছে রে?
বিজন দেখল একটা এরোপ্লেন আকাশটাকে স্লেটের মতো ব্যবহার করছে। গ্যাস দিয়ে বড় বড় হরফে ভোরের খবর দিচ্ছে। 'দি ডেইলি হেরাল্ড'—এর খবর। হয়তো উড়োজাহাজটা ভাড়া করা—কিংবা ওদেরই। বিজন দুটো বড় খবরের পর পড়ল : দি শিপ এস এস টিবিড ব্যাংক উইল বি ব্ল্যাক ব্যানড, ইফ সেলিম......
মকবুল ফানেল থেকে বিরক্ত করছে। মকবুল বারবার প্রশ্ন করছে—আকাশে জাহাজটা কী লিখছে রে? বিজন এইসব পড়ে অধীর হয়ে উঠছে। সে মকবুলকে বলল, সেলিমকে এক্ষুনি হাসপাতালে না দিলে জাহাজের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সিম্যান—ইউনিয়নের সেক্রেটারি এই হুমকি দিয়েছেন।
ইটন বলল, কাল রাতে এখান থেকে যারা কাজ করে ঘরে ফিরেছে তারাই ইউনিয়নে খবরটা পৌঁছে দিয়ে গেছে।
বিজন ভাবল, সব যেন মন্ত্রের মতো কাজ করল। জাহাজে খুবই লোকের ভিড়। সকলে কাজ থামিয়ে দিয়ে লেখাগুলি দেখছে। কোম্পানির এজেন্ট পর্যন্ত জাহাজে উঠে এসেছেন। মিঃ ট্রয় এবং আরও অনেক সব লোক। ক্লার্করা এসেছেন। ওরা প্রথমে ব্রিজে উঠে গেল। কাপ্তানের ঘরে ঢুকে গেল অনেকে। কাপ্তানকে খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। তিনি এই খবরে প্রথমে খুবই অধীর এবং উত্তেজিত হয়েছিলেন। দুই সারেংকে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, কে এ—খবর ইউনিয়নে পৌঁছে দিয়েছে? কার এমন হিম্মত? সেলিমের দরজা কে খুলেছিল? ওর পোর্টহোল কেন বন্ধ ছিল না? এইসব প্রশ্নের শেষে তিনি দেখলেন স্বয়ং এজেন্ট এবং অন্যান্য সব দায়িত্বশীল কর্মচারীরা ওঁর কেবিনে ঢুকে যাচ্ছেন। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না—এত উত্তেজিত। তবু এইসব দায়িত্বশীল কর্মচারীদের দেখে কেমন বিব্রত হয়ে পড়লেন। মিঃ ট্রয় নানারকম প্রশ্ন করে ওঁকে আরও বিব্রত করে তুলেছেন। বিজন, ইটন এবং মকবুল, পরে দেবনাথ পর্যন্ত ফানেলের গুঁড়িতে এসে সন্তর্পণে কাপ্তানের কেবিনের সব কথাবার্তা শুনছিল। ওরা শুনে বলল, শালা ঠিক জব্দ হয়েছে এতদিনে।
বিজন মনে মনে এলবিকে ধন্যবাদ জানাল। এলবির লম্বা চোখ এবং ডিমের মতো মুখের গঠন ওর চোখে এখন প্রীতির জোয়ারে ভাসছে। ওর কালো চুলে মনোরম গন্ধ, বিজন গতকাল তা টের পেয়েছে। গতকালের অসহিষ্ণু ভাবটুকু আর ওর ভিতর নেই। এলবিকে সে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারলে খুশি হবে এমত ধারণায় বোট—ডেকে এবং নিচে ভিড়ের ভিতর এলবিকে খুঁজল। এবং খুঁজতে থাকল। অথচ এলবিকে যেই বোট—ডেকে আসতে দেখল, বিজন তাড়াতাড়ি মাস্তুলের আড়ালে আত্মগোপন করল।
এলবি, মিস এলবার্টি এবং সিসিল এলবার্টি—যে—কোনো নামেই ওকে ডাকা চলে। সে মাস্তুলের আড়াল থেকে যদি এই নামে ডাকে নিশ্চয়ই এলবির সাড়া পাবে। এলবি এখন দু'নম্বর বোটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও যেন কাপ্তানের ঘরের দিকে উঠে যাচ্ছে। বিজন সব দেখেও এলবিকে গুড মর্নিং বলতে পারল না, কৃতজ্ঞতা জানাতে পারল না। এলবির সঙ্গে যে কোনো পরিচয়ই এ—মুহূর্তে এ—জাহাজে মারাত্মক। কাপ্তান তাঁর বিরক্তি ভাবটুকু কলকাতা বন্দর পর্যন্ত পুষে রাখবেন। সারেং সেই ভাবটুকু কলকাতা পর্যন্ত জিইয়ে রাখবেন। তারপর এক শুভদিনে বিজনের নলিতে লাল দুটো দাগ পড়বে। বিজন ব্ল্যাক—লিস্টেড হবে।

সুতরাং সে এলবিকে দেখে আত্মগোপন না করে পারল না। তাই সে এলবিকে দেখেই এই মাস্তুলের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এলবি সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। সে যেন কোনো জাহাজিকে প্রশ্ন করছে, বি—জন, বি—জন কোথায় কাজ করছে?

বিজন আঁতকে উঠল। সে ধীরে ধীরে টুইন ডেকে নেমে গেল এবং দু'লাফে ফল্কা পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে নিজের ফোকসালে ঢুকে দরজা বন্ধ করার আগে অন্য জাহাজিদের বলে দিল, কেউ ওকে যদি খোঁজ করে তবে যেন বলা হয় সে জাহাজে নেই। বন্দরে নেমে গেছে। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাংকে বসে হাঁপাতে থাকল।

কী সর্বনাশ—বিজন ভাবল। বিজন নিজের ভুলের জন্য নিজেই ক্ষেপে গেল। গতকাল যা ওর সবচেয়ে বেশি বলা দরকার ছিল, এলবিকে তাই বলা হয়নি। ওর উচিত ছিল, এ খবর তোমাদের আমি পৌঁছে দিলাম এ কথা যেন জাহাজের কেউ না জানে। তবে আর গরিবের চাকরিটা থাকবে না। সেলিমের সঙ্গে তবে আমিও মরব। অথচ সেই কথাটাই এলবিকে বলা হয়নি।

এলবি এদিকে এসে দেবনাথকেও প্রশ্ন করল, বিজন কোথায়?

দেবনাথ ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, বিজন তো এখানেই ছিল। বলে ইতস্তত এদিক—ওদিক চোখ তুলে তাকাল। তারপর বলল, চল কেবিনে। বোধহয় সে সেখানেই আছে।

নীচে নামবার আগে এলবিকে নিয়ে দেবনাথ একবার ভিড়ে বিজনকে খুঁজে দেখল। তাকে ওরা সেখানে পেল না। সেলিম ভিড়ের ভিতর স্ট্রেচারে শুয়ে আছে। সেলিম কাঁদছে। সারেং বুঝ—প্রবোধ দিচ্ছে। বলছে, ভালো হয়ে গেলেই কোম্পানি তোকে দেশে পাঠিয়ে দেবে। কাঁদছিস কেন? ভালোর জন্যই তোকে হাসপাতালে দিচ্ছে।

বিজন এই বাংকে বসেও যেন টের পাচ্ছে—এইমাত্র সেলিমকে ধরাধরি করে নিচে জেটিতে নামানো হল। সেলিম কাঁদছে। সে বলছিল, বিবির কোলে মাথা রেখে মরব। সে বলেছিল, আমার দেশের মাটিতে আমার কবর হবে। সে এ—কথাগুলো বিজনকে বলেছিল। ওর খুব দুঃখ হচ্ছে এ সময়—সে কাছে থাকতে পারল না, বলতে পারল না—রোজ আমি যাব। বিকেলে যাব। তুই ভয় পাবি না। তুই ভালো হয়ে উঠবি—বলতে পারল না....তখন দরজাটা কে যেন ঠেলছে। সে এই বাংকে বসে দেবনাথের গলার শব্দ পেল। দেবনাথ বলছে—এই, দরজা খোল। দরজা বন্ধ করে ভিতরে কী করছিস?

বিজন দরজা খুলতেই এলবিকে দেখতে পেল। এলবি দেবনাথের একপাশে দাঁড়িয়ে হাসছে।

বিজন বলল, গুড মর্নিং।

তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

কেন, এখানেই তো ছিলাম।

এখানেও খুঁজেছি।

বিজন বিব্রত হয়ে পড়ল।

এলবি ভিতরে ঢুকে বলল, ট্রয়কে কিন্তু সব কথাই খুলে বলতে পেরেছি।

বিজন ধন্যবাদ জানাল। তারপর বলল, বোসো।

ছোট ঘর, সোফা নেই। একটা ইজিচেয়ার আছে, কিন্তু পাতবার জায়গা নেই। ওরা তিনজন এমত কথায় হাসল।

এলবি বলল, আমি বেশিক্ষণ বসব না। হাতে অনেক কাজ। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য দেরি হয়ে গেল। অ্যামবুলেন্স হয়তো এতক্ষণে চলে গেছে। সেলিমকে রয়েল হাসপাতালে রাখা হচ্ছে। আশা করছি বিকেলে ওকে দেখতে যাবে। যেতে অসুবিধা হলে, আমার ওখানে চলে যেও, সেখান থেকে আমি তোমায় নিয়ে যাব। বলে সে আর বসল না। তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল।

ওরা দুজন ফোকসালে বসে এলবির পায়ের শেষ শব্দটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে যেতে শুনল। দেবনাথ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল বিজনের। বলল, কী করে এ—মেয়েকে ধরলি?

বিজন গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং সে এ—ব্যাপারে আদৌ সাড়া দিল না। আদৌ মুখর হল না। সে জবাবে শুধু বলল, পথে আলাপ।

তারপর ওরা দুজনে চুপচাপ। গ্যালিতে মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। ওরা সেই গন্ধ নিচে বসে পেল। ওরা দুজনে কথা বলল না, তখন এক এক করে সকলে এসে নিচে নামছে। যে যার হাত—মুখ ধুলো। থালা—মগ ধুলো। এবং ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেল। ওরা ভোরের এই আকস্মিক ঘটনায় বিস্মিত হয়েছে, খেতে বসে সকলে এমত ভাব প্রকাশ করতে চাইল।

বিজন এই শীতের বিকেলে ডেকে এসে দাঁড়াল। ওর পোশাক এবং মুখের কমনীয়তায় শীতের রঙ অথবা সমুদ্রের রঙ। ওর শরীরের রঙে আশ্চর্য স্নিগ্ধতা। শীতের দেশে ঘুরে এবং সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় শরীরের রঙ কমনীয় হতে হতে কোনো এক ভোরে বিজন যেন বিদেশির মতো কথা বলতে শিখল।

সে রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে দেখল একটা সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে এসে নোঙর ফেলেছে। সে ওদের ফানেলের রঙ দেখেই বুঝল ওটা আমেরিকান জাহাজ। সে বন্দর দেখে বুঝল ওরা এখানে ইস্পাত—জাতীয় দ্রব্য নামাবে। এবং হয়তো কোনো বিকেলে ভেড়ার মাংস অথবা ফলের রসদে বোঝাই হয়ে অন্য বন্দরে পাড়ি দেবে।

শেষে অন্যান্য অনেক জাহাজির মতো সেও সেলিমের রুগণ ফোকসাল অতিক্রম করে গ্যাংওয়ে ধরে বন্দরে নেমে গেল। সে হাঁটতে থাকল। একজন স্থায়ী বাসিন্দার মতো সে এই ঝরা পাইনের পথ ধরে শহরে উঠে যাচ্ছে। ঝুলন্ত সেতু অতিক্রম করে বন্দরের সিম্যান—মিশান বাঁয়ে ফেলে সে উঠে যাচ্ছে। সেই পাঁচ কলিন স্ট্রিট ও সেই মেয়ে এলবি। সে নির্দিষ্ট আস্তানায় উঠে যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকল। মোটরে বসে এলবি এবং ওর ইউনিয়নের হলঘর, ওর চিলতে ঘরটুকু...এলবি সুন্দরী, সে সুখে আছে...এলবির চোখ গভীর, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়....এলবিকে মনে মনে সুন্দরী বিদেশি রমণী অথচ আপনার মতো করে দেখার এক সবিশেষ কৌতূহলে সে পীড়িত হতে লাগল। এবং সহসাই স্মরণ করতে পারল—এলবি যদি বাতিকগ্রস্ত রুগির মতো ফের বলতে থাকে—তুমি ট্যাগোরের কানট্রি থেকে এসেছ, তুমি কবির কাছের লোক, তুমি কবিকে দেখেছ, সুতরাং তুমি কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও। তুমি আমাকে বাংলা ভাষা শেখাও। আমি মূল কবিতার রস পেতে চাই। তা হলে......তা হলে! সে শরীরের আড়ষ্টতায় এমত উচ্চারণ করে কেমন জড়বৎ বসে থাকল, সে ড্রাইভারকে বলতে পারল না তুমি বন্দরে চল, পাঁচ কলিন স্ট্রিট গিয়ে আমার দরকার নেই।

হলঘরের দরজায় বিজন এলবিকে দেখতে পেল। বিজন ট্যাক্সি থেকে নামল ফুটপাথে। এলবি সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে। ওরা পরস্পর অভিবাদন জানাল, তারপর উভয়ে মোটরে চড়ে সেলিমকে দেখতে রয়েল হাসপাতালে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। শীতের সন্ধ্যা। এলবির হাতের দস্তানা লাল রঙের। মোজা বেগুনি রঙের। বব—করা ব্লন্ডচুলে দুটো প্রজাপতি—ক্লিপ। গলায় সরু সোনার চেনে পাথর বসানো। হলদে স্কার্ট, লাল জ্যাকেট শরীরে। শীতের সন্ধ্যায় এলবিকে এই পোশাকে অতীব তীক্ষ্ন মনে হল। শহরের বড় রাস্তা ধরে ওরা চলেছে। আপাতত ওরা কোনো কথা বলছে না। এলবি স্টিয়ারিং ধরেছে। বিজন শহর দেখছে। বড় রাস্তা, সুতরাং বড় বড় সব কাচ—মোড়া আসবাবপত্রের কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের, পোশাকের অথবা মোটরের দোকান। ভিন্ন ভিন্ন সব বিজ্ঞাপন ঝুলছে। এলবি দুটো—একটা কথা বলছে এখন। শহরের এইসব দোকানের এবং কোন মুল্লুক ধরে কীভাবে রয়েল হাসপাতালে যাচ্ছে এইসব খবর দিয়ে নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছে।

এলবি বলল, জাহাজ তবে অনেক দিন থাকল।

তা থাকল।

প্রায় দু'মাসের মতো হবে।

তা হবে।

পাশের পত্রিকাটা তুলে বিজনকে দেখাল। সামনে মোড় ঘুরতে হবে। নীল বাতি জ্বলছে না। সুতরাং এলবি দু'হাতেই পত্রিকাটা বিজনের হাতে তুলে দিল। —খবরটা পড়েছ?

আকাশে দেখেছি এবং পড়েছি। আচ্ছা এলবি,....বিজন একটা প্রশ্ন তুলে ধরার ইচ্ছায় ঘাড়টা বাঁকাল।—আচ্ছা এলবি....তোমাদের ভিতর থেকে কেউ তো বলেনি এ—ঘটনার সঙ্গে আমি যুক্ত? পত্রিকায় তেমন খবর নেই তো! বিজন পত্রিকাটা ধীরে ধীরে নিজের কোলের কাছে নিয়ে এল। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবটুকু পড়ল। এবং এলবির মুখ দেখে যেন বুঝতে পারছে তার আকস্মিক আড়ষ্টতায় এলবি পীড়িত হচ্ছে।

এলবির কঠিন মুখ সহসা নানা রঙে ক্রমশ নরম হচ্ছে।—বিজন, তুমি পাকা জাহাজি হওনি। তুমি দেখছি মিঃ ট্রয়কে খুব কাঁচা লোক ভেবেছ। পত্রিকা পড়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে এ—ব্যাপারে আমরা কিনারার কুলি লোকেদের উপর বেশি নির্ভর করেছি। কথা কী জানো, এখানকার মতো এত জোরালো ইউনিয়ন পৃথিবীর কম বন্দরেই আছে। পাঁচ কলিন স্ট্রিটে পাঁচ বছর থেকে আছি। এ—ব্যাপারে আমি অভিজ্ঞ। তোমাকে জড়ালে কাপ্তান অন্য বন্দরে তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে ভেবেছ?

ওদের মোটর হাসপাতালের দরজায় এসে থামল। মোটর পার্ক করে পার্কবোর্ডে নাম লিখে ওরা সদর দরজা অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

বিজন দেখল, দুটো বিশাল বৃত্তের মতো বাগান দু'পাশে রেখে ওরা উঠে যাচ্ছে। এলবি ব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে সিট—নম্বর এবং ব্লক—নম্বর দেখে নিল। তারপর নম্বর মিলিয়ে ওরা একসময় সেলিমের বিছানার পাশে পৌঁছে গেল।

এলবি বলল, গুড ইভনিং। তোমাকে এখন ভালো দেখাচ্ছে।

বিজন সেলিমের বিছানার পাশে বসে ওর চুলে হাত দিয়ে বলল, এত ভেঙে পড়েছিস কেন? আমি রোজ বিকেলে তোকে দেখতে আসব। জাহাজ এখানে অনেক দিন থাকবে। আশা করি ততদিনে তুই ভালো হয়ে উঠবি।

সেলিম পাশ ফিরে শুল। ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। বুকে কষ্ট, হাতে পায়ে যন্ত্রণা। সেলিম বড় বড় চোখে এলবিকে দেখছে। এলবি কিছু ফল এনেছিল সঙ্গে। সেলিমের টেবিলে ফলগুলো রাখল। সেলিম বড় বড় চোখে এলবিকে দেখছে। সেলিম কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছে এমন ভাব ওর চোখে মুখে। অথচ এইসব যন্ত্রণার ভিতরও সেলিম হাসল। একজন ডাক্তার, দুজন নার্স ওর পাশে এসে এখন দাঁড়িয়েছে। ওরা ওর শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করল। ওরা সেলিমকে বাঁচবার জন্য উৎসাহিত করল।

এলবি একজন সিস্টারকে প্রশ্ন করল, কাল নিশ্চয়ই প্লেট নেওয়া হচ্ছে?

আজ রাতেই হবে। মিঃ ট্রয় সব ব্যবস্থা করে গেছেন।

এলবি সিস্টারের প্রতি মাথা নোয়াল। মেনি থ্যাংকস।

ওরা উঠে পড়ল। সব ভিজিটারের শেষে ওরা প্রশস্ত পথ ধরে বড় বড় সব চত্বর পার হয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে, ফের সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে হাসপাতালের সদর দরজায় এসে হাজির হল। এলবি বলল, চল, একটু ঘুরে আসি। একটু ইউনিভার্সিটির সামনের পার্কটায় বসব। একটু গল্প করব। রাত ঘন হলে তোমাকে জাহাজে পৌঁছে দিয়ে বাড়িতে ফিরে যাব।

মোটরের ভিতর বসে বিজন প্রশ্ন করল, সেলিম শীগগিরই ভালো হয়ে উঠবে—কী বল?

নিশ্চয়ই। খুব জোর দিয়েই যেন এলবি কথাটা বলল। সেলিম ভালো হয়ে উঠলে, তুমি আমি সেলিম জীলঙে যাব। সেখানে আমার বাবা মা থাকেন। বাবা তোমাকে পেলে কিছুতেই ছাড়তে চাইবেন না। তোমাকে পাশে বসিয়ে কেবল ট্যাগোরের কবিতা শুনতে চাইবেন। আমাদের পরিবারের সকলের

'গীতাঞ্জলি'র কবিতা মুখস্থ। বলে এলবি মোটরে স্টার্ট দিল এবং জোরে জোরে বিশুদ্ধ সংগীতের মতো কবিতা উচ্চারণ করল :

> "When the warriors came out first from
> their Master's hall, where had they hid
> their power? Where were their aromour
> and their arms?
> They looked poor and helpless, and
> the arrows were showered upon them
> on the day they came out from their
> master's hall.
> When the warriors marched back
> again to their master's hall where did
> they hide their power?
> They had dropped the sword and
> dropped the bow and the arrow ; peace
> was on the their foreheads, and they had
> left the fruits of their life behind them
> on the day they marched back again to
> their master's hall."

কবিতা আবৃত্তি করার সময় আবার সেই ভাবটুকু এলবির মুখে—তুমি কবির দেশের ছেলে, তুমি কবিকে দেখেছ, প্রণাম করেছ, তোমার ঘনিষ্ঠ হয়ে কবিতা আবৃত্তিতে অশেষ আনন্দ। তখন মোটর চলছে। তখনও এলবি কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে মোটর চালাচ্ছে। শহরের সব ছোট—বড় দোকান, রোশনাই আলো, থিয়েটার হল অতিক্রম করে ওরা পশ্চিমের দিকে চলেছে। এলবি ফের বিশুদ্ধ জগতের বাসিন্দা হয়ে যেন প্রতিধ্বনি করল—পিস ওয়াজ অন দেয়ার ফোরহেডস। অথচ বিজনের কপালে এখন নিষ্ঠুরতার চিহ্ন। সে এলবির এই সাহিত্য—প্রীতিতে পীড়িত হচ্ছে। যেন বলার ইচ্ছা—আমি বাপু জাহাজি মানুষ, আমার ইতস্তত মিথ্যা বলার নিদারুণ অভ্যাস আছে। সাহিত্য—প্রীতি কোনো কালে ছিল না আমার, এখনও নেই।

এলবি বিজনের দিকে মুখ না তুলেই বলল, আমরা এসে গেছি। আমরা এখানে বেশিক্ষণ বসব না। জলপাই গাছের নিচে বসে তুমি কবির কবিতা বল। আমি শুনি।

বিজন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। সে বলতে চাইল—আমি কবির কবিতা আবৃত্তি করতে পারব না। জাহাজি মানুষের কবিতা কণ্ঠস্থ করে লাভ নেই। এই নীরস জীবনে সততার আশ্রয়ে বাঁচা নিরর্থক। তবু এলবি ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এলবিকে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করছে। এলবি যেখানে বসল, সে সেখানেই বসে পড়ল। এলবির প্রতি বিদ্রুপের ইচ্ছায় অথবা মাতাল হওয়ার ইচ্ছায় নিরন্তর সে কঠিন। এলবি এখন কোনো কথা বলছে না। এলবি ঘন হয়ে বসল। এলবি বস্তুত বিজনকে কবির প্রতীকীতে অনন্য করে রাখতে চাইল।

বিজন মরিয়া হয়ে শিশু বয়সের পড়া কোনো কবিতার কথা মনে করতে পারল। (দশম শ্রেণীতে কবির কবিতা সে কিছু পড়েছে।—কিন্তু এখন বিধির বিধানে তাও মনে করতে পারছে না। তা ছাড়া ঘটনাটা এমন শীঘ্র ঘটবে সে তাও ভাবতে পারেনি।) সে আবৃত্তি করল। ওর কণ্ঠ মসৃণ বলে কবিতা আবৃত্তির বিশুদ্ধ ভঙ্গিটুকু এলবিকে আপ্লুত করল।

বিজন টেনে টেনে আবৃত্তি করছে—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।"

ওরা পরস্পর কথা বলতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে ওরা উভয়ে যেন গম্ভীর এবং ঘন। উভয়ে যেন রবীন্দ্রনাথের মতো বিশুদ্ধ ইচ্ছায় পরস্পর মহৎ ভাবটুকু রক্ষা করছে।

বিজন এলবির কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রতীকীতে বাঁচবার ইচ্ছায় এও বলল, মোটরে যে কবিতা আমাকে শোনালে এ—কবিতা তারই মূল ভাষা।

বিজন ভাবল—বন্দরে আমি এলবির চোখে রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাঁচব।

তারপর এলবির মোটর থেকে একসময় বিজন জাহাজে উঠে ফোকসালে ঢুকে দেখল, দেবনাথ বাংকে ঘুমিয়ে আছে। অন্যান্য কেবিনেও বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ানক শীতে সব জাহাজিরা কম্বল মুড়ি দিয়ে জাহাজে ঘুমোচ্ছে। সে ফোকসালে দাঁড়িয়ে কিছু কাশির শব্দ শুনল। দু—একজন জাহাজির আলাপ শুনল। এই শীতে উপরে উঠে হাত—মুখ ধুতে ইচ্ছা হল না। কোনোরকমে লকার থেকে খাবারটা বের করে খেয়ে নিল। তারপর ঠান্ডা জলে কুলকুচা করে পোর্টহোলে মুখ ধুলো এবং বাংকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ইচ্ছায় হাত—পা সটান করে দিল। অথচ ঘুম এল না। ঘুম আসছে না। বিজন অন্য ফোকসালে ফের কিছু জাহাজির আলাপ শুনছে। এখন হয়তো এলবি ঘরে ফিরে অন্য কবিতা আবৃত্তি করছে। এই বাংকেও সে এলবির কাছে মিথ্যার মুখোশের জন্য ছটফট করছে। অথচ সে স্পষ্ট হলে এই সাময়িক মানসিক অস্থিরতার গ্লানিকে ধৈর্য ধরে লালন করতে হত না; এই করে সে এক মিথ্যার জন্য হাজার মিথ্যায় জড়িয়ে পড়ছে।

ওর ইচ্ছা হল একবার দেবনাথকে ঘটনাটা খুলে বলে। সাহিত্য—প্রীতি এবং স্পৃহা দেবনাথের যথেষ্ট আছে। বরং সে দেবনাথকেই সঙ্গে নেবে। অথবা দেবনাথকে প্রশ্ন করে জানবে—ওর কাছে কবির কোনো বই অথবা কোনো কবিতা কণ্ঠস্থ....যদি থাকে তবে...তবে...সে নিঃসংশয় হতে পারছে না তবু। দেবনাথ! দেবনাথ! সে যেন ডেকেই উঠল। মনে মনে ওর এই ডাক এবং এলবির সরল বিশ্বাস, দুটো চোখের ঘনিষ্ঠতা —সব মিলিয়ে ওর চোখে জ্বালা। ওর ঘুম আসছে না। এলবি 'পাখীসব করে রব' ইংরেজি হরফে লিখে নিতে চেয়েছিল। সে হয়তো এইসব মুখস্থ করে অন্য কোথাও আবৃত্তি....কিংবা বাহবা....কিন্তু বিজন বলেছে তখন শরীরটা ভালো নেই। আবার কাল হবে। আবার সে ছলনাকে কেন্দ্র করে বাঁচতে চাইল। এলবির ঘনিষ্ঠতা, সঙ্গ এবং দু'দণ্ডের আলাপ থেকে বিচ্ছেদের নিঃসঙ্গতায় সে বাঁচতে চাইল না। বিশেষত এই বিদেশিনীর কাছে স্পষ্ট হওয়ার দরুন কোনো পরাভবকে স্বীকার করার দরুন কোনো গ্লানিকে সহ্য করতে পারত না। অপমানবোধ বিজনের তীব্র। সেজন্য এই মিথ্যার মুখোশে আপাতত সে জাহাজি। সে খুশি।

ভোরবেলায় জাহাজে অনেক কাজ। সালফার নামানো হচ্ছে। হাড়িয়া—হাপিজ হচ্ছে ফল্কায় ফল্কায়। ভোরে আজ সূর্য উঠল না। আকাশ মুখ গোমড়া করে আছে। সমুদ্রের বাতাস পর্যন্ত। বন্দরের পাইন গাছে কোনো পাখি বসে নেই। শীতের জন্য ওরা অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। শীতের জন্য এইসব জাহাজিরা হি হি করে কাঁপছে। ওরা সাবান—জল নিয়ে আজ ছুটে ছুটে কাজ করতে পারছে না, ওরা স্থাণুর মতো নীল উর্দির ভিতর গুটিয়ে আসছে। ওরা পুরানো জামা—কাপড় সব আফ্রিকার বন্দরে বিক্রি করে এখন পস্তাচ্ছে। শীতের কষ্ট ভয়ানক কষ্ট।

পাশের জাহাজে কীসের যেন শোরগোল। পাশের জাহাজের নাবিকরা পোর্ট—সাইডের ডেকে জড়ো হয়েছে। ওরা রেলিংয়ের উপর ঝুঁকছে। ওদের সকলের চোখ বন্দরের জলের উপর। এই জাহাজের নাবিকরা ঘটনাটা ধরতে না পেরে গলুই—এ জড়ো হয়েছে। মেজ মালোম অন্য জাহাজিদের ডেকে ঘটনার কথা জানতে চাইলেন। পাশ থেকে কে একজন যেন বলল, পাশের জাহাজের তিন নম্বর মিস্ত্রি জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনাটা তারপর আরও বিস্তৃত হল। বন্দরের সব লোক চারপাশে জড়ো হয়েছে। এ—

শীতেও কিছু লোক জলে নেমে অনুসন্ধান করছে তিন নম্বর মিস্ত্রিকে অথচ মিস্ত্রিকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইংলন্ডে ওর স্ত্রী এডালট্রি কেসে জড়িয়ে পড়েছে—এই খবরটা এখন জাহাজিদের মুখে মুখে।

ভোরের এইসব সাত—পাঁচ ঘটনায় বিজন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ওর মনে নেই এবং মনে পড়ছে না—গতকাল এক রমণীয় পরিবেশে কোনো এক সুন্দরী যুবতীর পাশে মরিয়া হয়ে নকল কবির অভিনয় করেছে। মনে পড়ছে না আজও এমন ঘটতে পারে। একজন জাহাজির আত্মহত্যা এবং সালফেটের গন্ধ এই প্রচণ্ড শীত ওকে ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিলকুল বিপরীত ধারণার বশবর্তী করেছে। সে ভাবল মৃত্যুই শ্রেয়, মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ। পিস ওয়াজ অন দেয়ার ফোরহেডস—সে এ—কথাও ভাবল। সেলিমের কপালে শান্তির রেখা ফুটে উঠেছে হয়তো। এলবির সেই মুখ—সেখানেও একদিন শান্তির রেখা নামবে—কেউ বাদ যাবে না। কবিতা আবৃত্তির সময় এলবির সেই গভীর দৃষ্টি, সেই দৃঢ় অথচ প্রীতিপূর্ণ চোখ সে রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে নিঃস্ব পাইনের আঁধারে সহসা যেন দেখল। এলবি তাকে ভালোবাসতে চায়। রবীন্দ্রনাথের মতো করে ভালোবাসতে চায়। বিজন যেন এখন কবির প্রতীকীতে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে ডাকল—দেবনাথ, দেবনাথ, নিচে এসো কথা আছে। বিকেলের কথা রাখার জন্য সে নিচে সিঁড়ি ধরে ফোকসালে ঢুকে গেল। —তুমি তো অনেক বই এনেছ সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের কোনো বই আছে তোমার কাছে? এইসব বলার ইচ্ছা হল।

সে দেবনাথের কাছেই একটি কবিতার সংকলন পেয়ে গেল। সে তিক্ত বিস্বাদে বইটির পাতা উলটাচ্ছে। সে বারবার করে একই কবিতা পড়ল। পড়ে মুখস্থ করল। সে পড়ল।

"জড়ায় আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে"

বিকেলে মোটর নিয়ে এলবি বন্দরে হাজির। বন্দরে সে বিজনের জন্য অপেক্ষা করছে। কিনারার শ্রমিকরা এখন জাহাজের কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরছে। ওরা সকলে এলবিকে অভিবাদন জানাল। কোয়ার্টার মাস্টার তখন খবর দিয়ে পাঠিয়েছে বিজনকে। বিজন একবার গলুই—এ উঠে উঁকি দিয়ে এলবিকে দেখল। সে আবার আবৃত্তি করল সিঁড়ি ধরে নামার সময়। সে একবার সেলিমের হাসপাতালের দৃশ্যে, পরে এই কবিতার সুরে এবং আরও পরে পোশাকের ভিতর ঢুকে গিয়ে অম্লান থাকার ইচ্ছায় শিস দিতে থাকল।

নিচে নেমে ওরা উভয়ে পরস্পরকে অভিবাদন জানাল। বিজন মনে মনে কবিতা আবৃত্তি করল—সেই নির্দিষ্ট কবিতা, সেই সুরে, সেই নিঃস্ব অথচ ভরা কোটালের মতো আবেগধর্মিতায়। অথচ এলবিকে জানতে দিল না মনে মনে সে এখন কবিতা আওড়াচ্ছে। মনে মনে সে এখন কবিতার মতোই বিশুদ্ধ ভাব নিয়ে বেঁচে আছে। সে সেলিমের পাশে বিশুদ্ধ ভাব নিয়ে বসবে। সে সেলিমের মাথায় হাত দিয়ে বিশুদ্ধ শান্তি দেবে। বলবে, তুই ভালো হয়ে উঠবি। বলবে নার্সকে, প্লেট কী বলছে? আর কত দিন সেলিমকে এখানে থাকতে হবে?

গাড়িতে এলবি রাস্তার নাম, জায়গার নাম তারপর আরও কতরকমের কথা—রাজনীতি থেকে খেলাধুলো, এমনকি রয়েল হাসপাতালে দুজন ভারতীয় মেয়ে নার্স ট্রেনিং—এ আসছে এ খবরও দিল এলবি। ওর বাবা পার্থে যাচ্ছেন। মা এবং বাবা হয়তো যাওয়ার পথে একবার এখানে এসেও যেতে পারেন। কারণ এলবি বিজন সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখে দিয়েছে। সুতরাং বাবা আসছেন, মা আসছেন।

এলবি গাড়ি চালাবার সময় একবার হাতের ঘড়ি দেখল। যেন আজ হাতে কিছুটা সময় বেশি আছে। খুব বিশেষ তাড়া নেই কাজের। গাড়ির গতি সাধারণ। এলবি খুব খুশি খুশি হয়ে কথা বলছিল। বলছিল, আশা করি সেলিমের ভালো খবরই আমরা পাব।

ওরা হাসপাতালে কিন্তু শুনল অন্য কথা। মিঃ ট্রয় সেলিমের কাছে এলবির নামে একটা চিঠি রেখে গেছেন। এলবি চিঠিটা পড়ল। এলবিকে এখন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বিষণ্ণতা বিজনেও সংক্রমিত হল।

এলবি বলল, সেলিমের মেজর অপারেশন হবে। বাঁদিকের ফুসফুসটা কাটা ছেঁড়া করবে। এলবি এইসব কথা হাসপাতালের সিঁড়ি ধরে নামার সময় বিজনকে শোনাল।

বিজন বিছানায় বসে সেলিমের সঙ্গে রঙ্গতামাসা করেছিল। দেশে ফিরলে সেলিম বিবিকে প্রথম কোন জাহাজি বন্ধুর গল্প শোনাবে, প্রশ্ন করে বিজন জানতে চেয়েছিল আরও অনেক সব কথা বিজন যেন মনে করতে পারছে না।

আরও দু—একজন জাহাজি ওর পাশে বসে ছিল। সারেং বলে পাঠিয়েছেন তিনি কাল এসে দেখে যাবেন। বিজন সেলিমের বিছানায় শেষ সময়টুকু পর্যন্ত কাটাতে পেরে খুশি। তারপর ভিজিটারদের শেষ ঘণ্টা পড়ল। সিঁড়ি ধরে নামবার সময় সেলিমের অস্ত্রোপচারের কথা শুনল। এবং এই শুনে বিজনের কেমন অন্যমনস্কতা বাড়ছে। এলবি গাড়িতে বসে লক্ষ্য করছে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় বিজন খুব ভেঙে পড়ছে। এলবির এখন বিজনকে আশ্বস্ত করা দরকার।

বিজন বলল, সেলিম আমার সঙ্গে দু'সফর ধরে কাজ করছে। দু'সফর ধরে ওর সঙ্গে মেলামেশা, কখন যে আমরা এত ঘনিষ্ঠ হয়েছি জানি না। এখন বুঝতে পারছি ওর অভাবটা জাহাজে আমার কত বড় হয়ে বাজছে।

তারপর ওরা এইসব স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আলোয় অথবা মনের আরও সব নীল ইচ্ছায় প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে তারপর সেই কবিতার জগতে ফিরে আসা, কবিতার জগতে ডুবে যাওয়া, ইতিহাসের মৃত নায়কের মুখের মতো ছবি হয়ে বসে থাকা এবং অবশেষে মুখোমুখি চুপচাপ বসে থাকা। এমন একদিন হয়নি, অনেক দিন হয়েছে। এরা পরস্পরকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে। এলবি বিজনকে বাড়ি নিয়ে গেছে। ওর হাতের আঁকা ছবি দেখিয়েছে। তারপর কোনো রেস্টুরেন্টে অথবা নীল আকাশের নিচে বসে সেলিমের অস্ত্রোপচারের দিনের কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়েছে।

একদিন এলবি বলল, বাবা, মা কাল আসছেন।

জীলঙ এখান থেকে কত দূর? প্রশ্ন করেছিল বিজন।

খুব বেশি দূর নয়।

কীসে ওঁরা আসবেন?

ট্রেনে আসা যায়। বাবা মোটরে আসছেন। খুব প্লেজান্ট জার্নি। তারপর একটু থেমে এলবি আবার বলল, ওঁদের সঙ্গে আলাপে তুমি খুশি হবে।

আমার সঙ্গে আলাপে ওঁরা খুশি হবেন তো?

এলবি হাসল।

দু'দিন পর এলবি ওর বাবা—মার সঙ্গে বিজনকে পরিচয় করিয়ে দিল। ওঁরা বিজনকে বললেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য তোমাকে আমাদের ভিতর পেয়েছি। পরম সৌভাগ্য, এলবি এ সময় খবর দিয়ে তোমার কথা জানিয়েছে। আমরা সকলেই কবির খুব ভক্ত। তুমি তাঁর দেশের লোক। তুমি ওঁর স্পর্শ লাভ করেছ—এবং আমরা তোমার সঙ্গলাভ করেছি ভেবে খুশি।

এলবির বাবার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে বিজন সত্যি খুশি। ভদ্রলোক অমায়িক। ভদ্রলোক প্রাণোচ্ছল অথচ কথাবার্তায় খুব সংযত। বিজনের মুখ থেকে কবির কবিতা শোনার একান্ত ইচ্ছা ওঁদের। বিজন পর পর কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করল।

ওঁরা খুশি হয়ে বললেন, তুমি আমাদের কথা দাও ডিনারে একদিন উপস্থিত থাকবে। আমরা খুব আনন্দিত হব তোমার উপস্থিতিতে।

দিন স্থির করুন, আসব।

কিন্তু একটা কথা, মিঃ চার্লটন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। একটা সিগারেট ধরালেন এবং পাশে এসে বললেন, আমরা তোমাকে চাইনিজ ডিশ দেব। খুব মনোরম খেতে। কিন্তু...।

এলবি এবার আর একটু খুলে বলল। বাবা চিনে অনেক দিন ছিলেন। এমব্যাসিতে কাজ করতেন। সুতরাং বাবা কোনো ভদ্রলোককে ডিনার—পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেই তাঁকে চাইনিজ ডিস দিতে ভালোবাসেন।

চার্লটন আবার আরম্ভ করলেন, কীন্তু কথা হচ্ছে ট্যাগোরের দেশের ছেলে তুমি বলতে গেলে ঘরের ছেলে। সুতরাং ট্যাগোর কী খেতেন এবং খেতে ভালোবাসতেন নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। মেনুতে ট্যাগের ডিশও একটা থাকবে কী বল? তার প্রিপারেশনের ভার তোমার উপর। কী কী লাগবে বলে দাও, আমি সব সংগ্রহ করে রাখব। আগামী রবিবার ছুটির দিনে আমরা এখানে ফের আসব। এবার তিনি থামলেন। পাশে মিসেস চার্লটন উল বুনতে বুনতে লাফিয়ে উঠলেন, বড় চমৎকার হবে। এলবির পিসিকে বললে হয়। তারপর আরও দু—একজনের নাম তিনি বলে গেলেন।

বিজন বলল, রান্নাতে আমি অভ্যস্ত নই। দেবনাথ বলে একজন জাহাজি আছে, সেও বাঙালি, সে ভালো রাঁধতে জানে। ওকে নিয়ে আসব।

এলবি টেবিলের উপর খাতা রেখে বলল, কী কী সংগ্রহ করতে হবে বল।

কিছুই দরকার হবে না। কারণ মশলাপাতি তুমি এখানে কোথাও খুঁজে পাবে না। সরষের তেলও বোধহয় নেই। দেবনাথকেই বলব সব সংগ্রহ করতে, পারো তো কিছু ডিম, মাংস এবং ভেজিটেবল সংগ্রহ করে রেখ। তাতেই চলবে।

এলবি দীর্ঘদিন পর আজ সকলকে পিয়ানো শোনাল। বিজনের মনে হল, এলবি উলের পোশাক পরে আছে। এলবির সাদা স্কার্ট এবং সাদা জ্যাকেট থেকে সে রঙ যেন চুঁইয়ে পড়ছে। বাইরে শীতের ঠান্ডায় যেন তুষার ঝরছে। ওরা তিনজন আগুনের পাশে বসে উত্তাপ নিচ্ছে। মাঝে মাঝে মিসেস চার্লটন উনুনে কাঠ গুঁজে দিচ্ছেন। মিঃ চার্লটন চীনদেশের গল্প করছেন এখন। সে—দেশের রীতিনীতির গল্প করছেন। এলবি এখন আর পিয়ানো বাজাচ্ছে না। চেয়ারে বসে সেও বিদেশের গল্প শুনছে। সহসা এইসব কথার ভিতর বিজন যেন দেখল ওরা সকলে একই পরিবারভুক্ত লোক হয়ে শীতের রাতে উনুনের পাশে আগুন পোহাচ্ছে। মনে হল বাংলাদেশেরই কোনো পরিবারের ভিতর বসে সে যেন ঠাকুমার গল্প শুনছে।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে দেবনাথ এবং বিজন সকাল সকাল জাহাজ থেকে নেমে গেল। ছুটির দিন। এই শীতের ভিতরও শহরের সব যুবক—যুবতী ছুটি ভোগ করতে দলে দলে বের হয়ে পড়েছে। ওরা সব রেস্তোরাঁয়, পাব—এ অথবা পার্কে কিংবা শহরতলিতে ছড়িয়ে পড়ছে। দেবনাথ এবং বিজন হেঁটে যেতে যেতে সব টের পাচ্ছে। ওদের হাতে ছোট নীল ব্যাগ। ট্যাগোর ডিশের জন্য যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা ওতে। ওরা গল্প করতে করতে অথবা অযথা উচ্ছল হতে হতে হাঁটছে।

ওরা বন্দর ফেলে, জনসন রোড ধরে ছোট পাহাড়টায় উঠে গেল। এখানে ছোট ছোট কাঠের ঘর—নীল অথবা হলুদ রঙের। দরজায় নীল রঙের পালিশ। বাড়ির সংলগ্ন ছোট ফুলের বাগান, সবজির বাগান। প্রচণ্ড শীতের জন্য বাগানে কোনো ফুল অথবা সবজির চিহ্ন নেই। গোলাপেরা শুধু কুঁড়ি মেলার চেষ্টা করছে। ওরা দ—এর মতো পথে, কখনও সিঁড়ি ভেঙে, কখনও ঘুরে ঘুরে এলবির ছোট নীল আস্তানায় গিয়ে হাজির হল। প্রথমেই ছোট কাঠের দরজা।

সংকীর্ণ ফুটপাতের বাঁ—পাশের থামটায় লেখা 'শান্তির নীড়' তামার প্লেটে খুব চকচক করছে। সদর দরজার উপর আইভিলতার গুচ্ছ। পাতা নেই। শুধু লতাগুলো দুলছে। ভিতরে বাঁ—পাশে মুরগির ঘর। ডানপাশে ফুলের বাগান। 'এল' অক্ষরে পথ। পথের দু'পাশে নানা রকমের সামুদ্রিক পাথর। অন্য পাশে কোমর সমান কাঠের রেলিংয়ে কিছু নীল প্রজাপতি বসে আছে; মিঃ চার্লটন এবং মিসেস চার্লটন বের হয়ে এসে ওদের অভিবাদন জানালেন। বললেন, গতকালই আমরা এসে গেছি।

এলবিও সেজেগুজে বের হল। যেন ফুলের মতো এই শীতের হালকা রোদে ফুটে উঠল। এলবি ওদের ভিতরে নিয়ে গেল। বিজন দেবনাথের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিল। এলবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেবনাথকে সমস্ত বাড়িটা দেখাল। এই ওর বাড়ি এখানে সে থাকে, ওই ওর ঘর—এখানে সে রাঁধে, এই ওর ঈজেল—

এখানে সে ছবি আঁকে। দেবনাথ সব ঘুরে ঘুরে দেখল। এলবির একটি বিশেষ রুচি আছে এ বোধ ওর এখন জন্মাচ্ছে। ঘরে সব বড় বড় ক্যানভাস। নানা রঙের ছবি।

ওরা এসে পাশের ঘরটায় বসল। মিঃ চার্লটন কতকগুলো ছোট ছোট কাঠি এনে পাশে রাখলেন। মসৃণ করার জন্য কিছু শিরিষ কাগজ। তিনি সকলকে কাঠিগুলো দেখালেন—এগুলো রাইস—স্টিক। তারপর দু—আঙুলের ফাঁকে কাঠি চেপে ধরার কায়দা—কানুন শেখাতে থাকলেন দেবনাথ এবং বিজনকে। দেখালেন, কী করে স্টিক ধরতে হয়, কী করে মুখে ভাত তুলতে হয়। একটা খালি চিনেমাটির বাসনও রাখলেন সকলের সামনে। ছোটখাটো একটা ডেমনস্ট্রেশন দিলেন।

দেবনাথ এইসব দেখে বিরক্ত হচ্ছিল। সে ঘড়ি দেখল। এখন দশটা বাজে। এখনও এলবি টেবিল সাজাচ্ছে। কখন রান্না হবে এবং কখন খাওয়া হবে এই ভেবে সে উষ্মা প্রকাশ করল।

একটি ঘরকেই এলবি কাঠের পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগ করে নিয়েছে। এ—ঘর থেকে সে—ঘরে যাবার একটি মাত্র খোলা পথ। একটিমাত্র দরজা। দরজায় পাল্লা নেই। দরজায় চাইনিজ সিল্কের দামি পর্দা। পর্দা সরালেই ঘরটা স্পষ্ট। পর্দা সরালেই ধবধবে বিছানা স্পষ্ট। দেবনাথ পর্দা সরিয়ে সব দেখল। বারান্দার দক্ষিণ দিকে চিলতে রান্নার জায়গা। পরে বাথরুম, পাশে ছোট একটি লনের মতো জায়গা। সেখানে গরমের দিনে ইজিচেয়ার নিয়ে বসা যায়। সেখানে একটি ভাঙা ঈজেল এখনও রেলিং—এর সংলগ্ন হয়ে পড়ে আছে। ছুটির দিনে এলবি সেখানে ছবি আঁকে।

ওরা উঁচু জায়গায় বসে বন্দর দেখল। বন্দরের জাহাজ দেখল। এখানে বসে অসীম সমুদ্রের বিস্তৃতি চোখে পড়ছে। পাহাড়ের নিচে সারি সারি ছবির মতো ঘর, ছবির মতো মানুষেরা হাঁটছে। দেবনাথ চারপাশটা চোখ মেলে দেখল।

দেবনাথ ফের ঘড়ি দেখে বাংলাতে বিজনকে বলল, ওরা কি আমাদের নিমন্ত্রণ করে খালি—পেটে রাখার ব্যবস্থা করছে নাকি। এখন বাজে সাড়ে দশটা অথচ রান্নার কোনো আয়োজনই করছে না।

বিজন বলল এলবিকে, সব জোগাড় আছে তো? অর্থাৎ এই কথা বলে বিজন রান্নার প্রসঙ্গে আসতে চাইল।

এলবি ফুলদানিতে কিছু সংগ্রহ—করা ফুল ভরে দিল। তারপর বিবাহিত রমণী—সুলভ চোখে বিজনকে দেখল এবং বলল, সবই এনেছি। তোমাকে ভাবতে হবে না। রান্নাঘরে ঠিক আমরা এগারোটায় ঢুকব। এবং আশা করছি ঠিক বারোটায় রান্না শেষ করতে পারব। ট্যাগোর—ডিশের কী কী মেনু হবে? এলবি দেবনাথকে প্রশ্ন করল।

দেবনাথ বলল, মেনু বেশি করতে হলে অনেক সময়ের দরকার হবে। বস্তুত দেবনাথ ডিমের ঝোল অথবা মাংসের ঝোলই ভালো রান্না করতে পারে। মাংসের ঝোল করতে বেশি দেরি হবে বলে সে বলল, রাইস এবং এগ—কারি।

এলবি বলল, রাইস তো চাইনীজ ডিশেও থাকবে। সুতরাং একমাত্র এগকারি।

একসময় দেবনাথ এবং মিঃ চার্লটন রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। দেবনাথ সঙ্গে করে গুঁড়ো মশলা এনেছে। এলবি দেবনাথকে সিদ্ধ ডিমের কৌটা খুলে বড় বড় কিছু ডিম বের করে দিল। মিসেস চার্লটন এবং বিজন ওঁদের সকলকে কাজে সাহায্য করলেন। গ্যাসের উনুনে আতপ চালের ভাত হল। এই ভাত রান্নার কৌশলটুকু আয়ত্ত করে মিঃ চার্লটন এখন গৌরব বোধ করছেন। তিনি ভাত রান্নার সময় গল্প করছিলেন—কোথায়, কখন এবং কী কৌশলে তিনি এই দুর্লভ বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। বারবারই সেই চাইনিজ মহিলাটিকে তিনি ধন্যবাদ জানালেন। জানালেন ভদ্রমহিলা খুবই আন্তরিক।

এলবি কৌটা খুলে কিছু কর্ন—বিফ বের করে দিল। মিসেস চার্লটন ময়দার ডেলা গোল করে সেই কর্ণ—বিফ ভিতরে ভরে দিচ্ছেন। সেগুলো জলে সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। এ—সময় ভয়ানক উৎকট গন্ধে বিজন ঘরে থাকতে না পেরে বাগানে চলে এল এবং অনেকক্ষণ ধরে একা একা পায়চারী করল।

এক ঘণ্টার ভিতরেই রান্না সব হয়ে গেল। রাতে ছোট একটি ভেড়ার বাচ্চা রোস্ট করে রাখা হয়েছিল। এখন শুধু ওটাকে ফের চর্বি মাখিয়ে গরম করে নেওয়া হল। গ্রিন পিজ সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। কিছু স্যালাড, স্যান্ডউইচ। ইতিমধ্যে মিঃ ট্রয় এসে গেছেন, টনি এসে গেছে, এলবির পিসিও এসে পড়লেন। এবং অন্যান্য আরও দু—একজন অপরিচিত ব্যক্তি, যাঁরা সকলেই মিঃ চার্লটন অথবা মিসেস চার্লটনের বন্ধু পর্য্যায়ে। ওঁরা ঘরে ঢুকে সকলকে অভিবাদন জানালেন এবং পরিচিত হলেন।

খাবার টেবিলে ওঁরা সকলে সকলকে সাহায্য করলেন। খেতে বসার আগে এলবি বলল, আমরা ভগবানের পৃথিবীতে নিত্য দুটো আহার্য গ্রহণের সময় সকলে প্রার্থনা করব। বেচারি সেলিম আরোগ্য লাভ করুক। সকলে দাঁড়ালেন এবং মিনিট দুই কাল সেলিমের নিরাময়ের জন্য অধোবদনে থাকলেন। তাঁরা সকলে প্রার্থনা করছেন। এলবিকে যথার্থই এখন বাঙালি আটপৌরে গৃহিণীর মতো মনে হচ্ছে।

খেতে বসেই খুব উৎসাহের সঙ্গে চার্লটন ভোজ্যদ্রব্যের ফিরিস্তি দিলেন প্রথম। কিছু রাইস—স্টিক পরস্পর পরস্পরকে দিলেন। প্রথমেই চীনেমাটির বাসনে কিছু ভাত এবং আধসিদ্ধ মাংসপুর, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো চার্লটন সকলকে পরিবেশন করলেন। এবং কাঠির সাহায্যে সকলকে খেতে অনুরোধ করলেন।

এইসব আধসিদ্ধ মাংসপুর, ভাত কাঠির সাহায্যে মুখে তুলতে গিয়ে বিজন ওয়াক তুলতে তুলতে বলে ফেলল, যথার্থই চমৎকার আপনার এই চাইনিজ ভোজ্যদ্রব্য। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ চার্লটন মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, বলেছি না, ওরা তারিফ করবে। চীন ভারতবর্ষ পাশাপাশি দেশ। সংস্কৃতিতে সভ্যতায় ওরা প্রায় এক।

দেবনাথ কান্নি মেরে মিঃ চার্লটনকে দেখল। ইচ্ছে হল ডিশের সবগুলো ভোজ্যদ্রব্য চার্লটনের মুখে ছুড়ে দেয়। অথচ সেও বলল, ভেরি নাইস।

দেবনাথ এবার ট্যাগোর ডিশের এগকারি সকলকে পরিবেশন করল। সে জানত লঙ্কার গুঁড়োটা একটু বেশিই পড়েছে। সে জানত ঝাল খেয়ে ওদের জিভ টাটাবে। সে বিদ্রুপ করে বলল, ট্যাগোর ঝাল একটু বেশি খেতেন।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাল চার্লটনের মাথায় উঠে গেল। চার্লটনের মাথায় টাক। তিনি তালুতে ঠান্ডা হাত রাখলেন। ঝাল খেয়ে অন্য সকলের ঠোঁট কুঞ্চিত হচ্ছে প্রসারিত হচ্ছে। সকলে জল খেলেন প্রচুর। এবং গাদা গাদা চিনি খেলেন। চোখ সকলের ভারী হয়ে উঠেছে, লাল হয়ে উঠেছে। ওঁরা তবু কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন, গ্র্যান্ড। ট্যাগোর ডিশ গ্র্যান্ড।

দেবনাথ এবং বিজন ভাতের সঙ্গে ডিমের ঝোল বেশ তৃপ্তি করেই খেল। ওরাও বলল, ট্যাগোর ডিশ গ্র্যান্ড। তারপর ওরা কাঠি দিয়ে ভাত খাওয়ার চেষ্টা করল। কিছু খেল, কিছু নষ্ট হল। তারপর স্যান্ডউইচ, গ্রিন পিজ এবং ল্যাম্ব—রোস্ট খেয়ে ওরা খুশি হতে পারছে। ওদের ওখন সেই ত্রাহি—ত্রাহি ভাবটুকু নেই। শেষে কফি খেয়ে ওরা সকলে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। সকলের মুখ দেখে মনে হবে এখন এইমাত্র টেবিলে বড় রকমের একটা ঝড় বয়ে গেছে।

বিকেলে স্টেশন—ওয়াগনে মিঃ এবং মিসেস চার্লটন জীলঙের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মিঃ ট্রয় ও অন্যান্য দু—একজন আগেই চলে গেছেন। এলবির পিসি গেলেন এইমাত্র। যাওয়ার আগে দেবনাথ এবং বিজনকে ওঁর ঘরে একদিন নিমন্ত্রণ করে গেলেন।

এরপর এলবি বিজন এবং দেবনাথকে নিয়ে হাসপাতালে গেল। হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ওরা তিনজন যখন গাড়িতে উঠতে যাবে তখন দেবনাথ বলল, এবার আমি যাই। জাহাজে আমার একটু দরকার আছে।

গাড়ির ভিতর এলবিকে আজ একটু উচ্ছল বলে মনে হল। এলবি বলল, দেখবে সেলিম ভালো হয়ে উঠবে। ওকে আজকে খুব ভালো দেখাচ্ছিল। সে নিজে এখন হাঁটাচলা করছে। এখন অপারেশন হলে বাঁচি।

বিজন বলল, আমিও আশা করছি আমরা একসঙ্গে দেশে ফিরতে পারব। একসঙ্গে ফিরতে পারলে খুবই আনন্দের ব্যাপার ঘটবে।

এলবি কথা বলল না। এলবি সন্তর্পণে ওর মুখ দেখল। বিজনের মুখে যেন এখন আর কোনো যন্ত্রণার ছবি নেই। যেন সে এমত ঘটনায় যথার্থই আনন্দিত হবে। এলবি স্টিয়ারিং—এ বসে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

ওরা আবার জাফরি—কাটা আলো এবং পাতার ছায়ায় এসে বসল। বিকেল থেকে ঠান্ডা হাওয়া বইছে না। ওরা আজ পাশাপাশি বসল না। ওরা মুখোমুখি বসল। এলবি আজ ইচ্ছা করেই পর পর চার—পাঁচটি কবিতা শোনাল বিজনকে। আর বিজনকে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করার জন্য কোনো অনুরোধ করল না, এমনকী বিজন কতটা আগ্রহ নিয়ে শুনছে তাও লক্ষ্য করল না। এবং এই কবিতা আবৃত্তির সময়েই এলবির একটু মদ খেতে ইচ্ছে হল। বলল, তুমি একটু মদ খাবে, বিজন?

সে রাতে উভয়ে মদ খেয়েছিল। অথচ পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়নি। পরস্পর গোলাপি নেশায় উন্মত্ত হয়নি। তবু কেন জানি বিজন ঘাস থেকে উঠতে পারছিল না। সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওর দস্তানা খুলে যাচ্ছে। পেটের ভিতর এক দুরন্ত যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। সে বলল, এলবি, আমি আর পারছি না।

এলবি সমস্ত শক্তি দিয়ে বিজনকে তুলে ধরল এবং ধীরে ধীরে মোটরের ভিতর এনে শুইয়ে দিল। তারপর বাড়ি ফিরে বিজনকে নিজের খাটে শুইয়ে দিল এবং ফোন তুলে ডায়াল করল। বলল, ক্যারল আছেন? ডঃ ক্যারল। প্লিজ ফাইভ বাই এইট নটিংহিল। পেশেন্ট সিরিয়াস।

ডাক্তার বিজনকে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, কনস্টিপেশনের জন্য এমন হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। দু'দিনেই ভালো হয়ে উঠবে। দু'রকমের পিল থাকল। এখন একটা খাইয়ে দিলেই ব্যথাটা কমে আসবে। পেটে একটু গরম জলের সেঁক দিতে পারেন।

ডাক্তারবাবু চলে গেছেন। এলবি বিজনকে বলে দু'মিনিটের জন্য বাইরে গেছে। বিজন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে দেয়ালের সব ছবি দেখল। বড় বড় সব ক্যানভাসে নানা রঙের ছবি। কবির ছবি দেয়ালে। হলুদ রঙের দেয়াল। এলবির হাতে আঁকা কবির এই ছবি যেন বিজনকে বিদ্রুপ করছে। যেন বলছে বাহবা, যা হোক তোমরা আমাকে নিয়ে তামাসা করলে। বিজন এই যন্ত্রণার ভিতরও প্রথম দিনের কথা ভেবে অনুতপ্ত। বস্তুত সে সঙ্গসুখে অধীর হয়ে ওর প্রথম দিনের ইচ্ছাকৃত তামাসার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল।

এলবি ঘরে ফিরেই বিজনের কপালে হাত রেখে উত্তাপ দেখল। তারপর জল এনে পিল খাইয়ে দিয়ে হট—ওয়াটার ব্যাগে পেটে সেঁক দিতে থাকল। অধীর আগ্রহে সারারাত জেগে ওর পাশে বসে থাকল। ভোর রাতের দিকে যন্ত্রণা থেকে বিজন যেন মুক্তি পেল। বিজন পাশ ফিরে এলবির সেই আন্তরিক এবং প্রীতিপূর্ণ চোখের দিকে চেয়ে বলল, এলবি, তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম।

এলবি ওর কপালে হাত রাখল শুধু। কোনো কথা বলল না। বিজন ওর চোখ দেখেই বুঝল, বুঝতে পারছে এ মুহূর্তে ওকে নিরাময় করে তোলার কী আকুল ইচ্ছা এলবির চোখে।

ভোরের দিকে বিজন ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং ঘুম ভাঙতে ওর দেরি হল। জানালার রোদ ওর বিছানায় এসে নেমেছে। এলবি বাইরের ঘরে আছে। কাকে যেন ফোন করল এইমাত্র। বিজন বিছানায় শুয়ে সব ধরতে পারছে—এলবি জাহাজে ফোন করে কাপ্তানের সঙ্গে কথা বলছে, ওর অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর দিচ্ছে এবং সঙ্গে চার—পাঁচদিনের ছুটি মঞ্জুর করার জন্য ফোনে আবেদন পেশ করছে। এলবি এ—ঘরে এসে দাঁড়ালে বিজন ভাবল, কী দরকার আর থেকে। শরীর আমার ভালো হয়ে গেছে। বেশ সুস্থ বোধ করছি। বরং আজ জাহাজে চলি। কিন্তু এলবির মুখের দিকে চেয়ে বলতে পারল না কথাগুলো। চোখে ওর সারারাত অনিদ্রার অবসাদ। শরীরে ক্লান্তি। এলবি ওর কপালে হাত রেখে বলল, খুব ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে যাহোক।

তাই নাকি!

তা নয়তো কী! একটু মদ খেলে তো, অমনি ঘাসে লুটিয়ে পড়লে।

তুমি তো জানো এলবি, ওটা মদের জন্য হয়নি। ওটা জাহাজে কাজ করার পর থেকেই হচ্ছে। মাঝে মাঝেই হত, কিন্তু এমন কঠিন হত না।

একটু থেমে বিজন বলল, বরং এখন জাহাজে চলি।

তুমি কি পাগল, বিজন। ক্যারল তোমাকে পুরা পাঁচদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কাপ্তানকে এইমাত্র খবর দিলাম। তিনি খুব ভালো মানুষের মতো বললেন, সেজন্য কী আছে। নিশ্চয়ই ও চার—পাঁচদিন ছুটি পাবে।

তুমি তো ছুটি নিলে। কিন্তু এখানে থাকার অর্থই হচ্ছে তোমাকে অসুবিধায় ফেলা।

আমার কোনো অসুবিধা হবে না। পাশের ঘরে আমি থাকব। যখন যা দরকার আমাকে বলবে।

বিজন পুরো পাঁচ রাতই ওই ঘরে থাকল।

পাঁচ রাত ওরা পাশাপাশি ভিন্ন ঘরে শুয়ে জানালায় রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখতে দেখতে অথবা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। অথবা ঘুমিয়ে পড়ার ভান করত। এলবি বালিশের নিচে দুটো হাত সন্তর্পণে ঢুকিয়ে কী যেন বারবার খুঁজত। কী যেন বালিশের নিচে ওর হারিয়ে গেছে। কখনও এলবি রাতের প্রজাপতিদের বিছানার চারপাশে দেখত। ওর প্রতীক্ষার জগতে সেইসব প্রজাপতিরা উড়ে উড়ে একদা অবসন্ন হত এবং সকালের দিকে ওরা ঘুমিয়ে পড়ত। কোনো কোনো রাতে এলবি এই শীতেও জানালা খুলে রাতের প্রজাপতিদের শরীর থেকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এই ঘন রাতে এবং শীতের রাতেও ওর শরীর মধুর এক উত্তেজনায় অধীর হয়েছে। বাঙালি এক নাবিকের শরীরে কবির যুবা শরীরী বৃত্তিকে স্পর্শ করার ইচ্ছায় এলবি সহসা কাতর হত। আর বিজন নিজেকে রবীন্দ্রনাথের অনুগামী ভেবে মেকি সাধুর অভিনয় করে গেল। পর্দার আড়ালটুকু ওদের দুজনকে সেজন্য পরস্পর মহৎ করে রাখল। জাহাজে ফিরে এসে বিজন প্রথম রাতে অনিদ্রায়, দ্বিতীয় রাতে অসহিষ্ণুতায় ভুগে সারাদিন কাজ করার অজুহাতে ডেক—এ পড়ে থাকল। দু'দিন এলবি ইউনিয়নের কাজে শহর ছেড়ে অন্যত্র থাকছে মিঃ ট্রয়ের সঙ্গে। দুদিন দেখাসাক্ষাতের কোনো সুযোগ নেই। বিকেল কাটছে হাসপাতালে। পরবর্তী সময়টুকু আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। খুব নিঃসঙ্গ ভাব জাহাজে। কেউ থাকছে না। বন্দরে নেমে সকলে গলির আঁধারে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এইসব দেখে সে আর পারছে না ; সংযম না আত্মরক্ষায় সে তাও বুঝতে পারছে না।

বস্তুত বিজন এক অহেতুক ঈর্ষায় পীড়িত হচ্ছে। মিঃ ট্রয়কে কেন্দ্র করে এই ঈর্ষার জন্ম। বিজন প্রতি মুহূর্তে নিঃসঙ্গ জাহাজি যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। এলবির অনুপস্থিতি যন্ত্রণার গ্রাসকে কঠোর করে তুলল। নিদারুণ জাহাজি যন্ত্রণায় সে দেবনাথের সঙ্গে গোপনে সস্তায় একটু মদ এবং সস্তায় একটু যৌন সংযোগ—রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হল। কিন্তু মুখের ভাবটুকু সকল সময়ের জন্য সরল নিঃস্বার্থ এবং যৌন জীবনে নিষ্পাপ, যেন এই মহৎ পৃথিবীতে অশ্লীল হবার মতো কিছুই নেই। বিজন দেবনাথের সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে বলল, আর কত দূর তোমার রাতের আস্তানা?

অথচ বিজন রাতের আস্তানায় দর করতে গিয়ে দেখল যুবতী সব সময়ের জন্য চোখ দুটো কোটরাগত করে রেখেছে। প্রতিদিনের যৌন অত্যাচারে গালে অশ্লীল টোল। নগ্ন চেহারাতে জাদুকরের লাঠির মতো ভেল্কি। এবং সমস্ত শরীরে কীসের যেন দাগ! যেন অত্যাচারের অশ্লীল উল্কি পরে নিত্য জাহাজি যন্ত্রণার সাক্ষী থেকেছে। পাশাপাশি দুটো চোখ—এলবির চোখ, এলবির প্রীতিপূর্ণ চোখ......সে পারল না। সে নগ্ন হয়ে নাচতে পারল না রাতের আস্তানায়। মদের গোলাপি নেশা ছুটে গেলে সে যথাসম্ভব সত্বর ছুটে পালাল।

সে জাহাজে ফিরে দেখল ডেক খালি। কোনো জাহাজির সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ডেকের উপর ইতস্তত কিছু আলো জ্বলছে। একটা বেড়াল এ শীতে অফিসার—গ্যালিতে খাবার খুঁজছে। বিড়ালটা শীতে কষ্ট পাচ্ছে এবং ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদছে। সে আরও এগিয়ে গেল। সে শুনল ডেক—ভাণ্ডারী মদ খেয়ে নিচে হল্লা করছে। নিচে নেমে দেখল সকল জাহাজিদের দরজা বন্ধ। যে দু—একজন জাহাজি এখনও ফেরেনি তারা আর এ—রাতে ফিরবে না। সে ধীরে ধীরে নিজের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেবনাথ আগে ফিরে এসেছে। ফোকসালের ভিতরে লকারের শব্দ। বুঝি দেবনাথ লকার খুলছে। বুঝি দেবনাথ বাংকে বসে খাচ্ছে।

বিজন দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে বলল, আমি পারিনি, দেবনাথ—আমি পারিনি। মেয়েটির শরীর দেখে আমার করুণা হল।

এই করুণার কথা ভেবে যখন সে ক্ষতবিক্ষত তখন দেবনাথ খেতে খেতে বলছে—এলবি এসে এই বাংকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে গেছে তোমার জন্য।

তুমি কী বললে?

বললুম রাতের আস্তানায় গেছে।

দেবনাথ! সে চিৎকার করে উঠল। ইচ্ছা হল দেবনাথের গলা টিপে ধরতে। বিজন লক্ষ্য করল, দেবনাথ দুজনের ভাত একাই গিলছে। ওর নেশা এখনও প্রকট। সেজন্য দেবনাথের হাত কাঁপছে। এবং গোল গোল চোখে সে বিজনকে দেখছে।

বললাম তুমি এলবিকে ঠকিয়েছ। তুমি রবীন্দ্রনাথের নামে 'পাখী সব করে রব' শুনিয়েছ। বললাম তুমি পূর্ববঙ্গের ছেলে, বললাম দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসেছ। কোনো এক কলোনিতে পিসিমার বাড়িতে থাক। তোমার বাড়ি বটতলায় নয়। সুতরাং বটতলা থেকে নিমতলা কাছেও নয়। আর কিছু বলল না দেবনাথ। ফের ভাত খাচ্ছে। অথবা বললে যেন এরকম শোনাত—বিজন, আমি ঈর্ষার তাড়নায় ভুগছি। তুমি এমন প্রীতিপূর্ণ চোখের স্নেহচ্ছায়ায় বন্দরের দিনগুলো কাটাবে, তুমি বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মতো বাঁচতে চাইবে, সে আমার সহ্য নয়। সে বলল, কবির প্রতীকী হয়ে তুমি এলবির কাছে বেঁচে আছ, আর আমি কোটরাগত চোখে জাহাজি হয়ে বেঁচে আছি, আমি ঈর্ষার তাড়নায় ভুগছি—আমি পারিনি, আমি পারিনি। ঈর্ষার তাড়নায় আমি একটু বেফাঁস হয়েছি।

বিজন বাংকে শুয়ে পড়ল। কোট—প্যান্ট পরেই শুয়ে আজ যথার্থ জাহাজি কায়দায় রাত যাপন করল।

সকালে জাহাজের কাজ বলতে তার, দেয়াল রঙ করা, দেয়াল সাবান—জলে পরিষ্কার করা—সে সব কাজগুলো আজ নিখুঁতভাবে করল। সে ইচ্ছা করেই এলবিকে ভাবল না। সে ইচ্ছা করেই কাঁচা খিস্তি করল আজ। ভোরবেলায় দেবনাথ ওর পাশে দাঁড়ালে, বলল, আমাকে ছোট করে কী লাভ হল, দেবনাথ?

দেবনাথ ওর দুটো হাত ধরে বলল, বিজন, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার বড় ভুল হয়েছে। গত রাতে টাকার অভাবে মেয়েটাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারিনি। মাথা গরম। বাধ্য হয়ে সস্তায় গলা পর্যন্ত মদ গিলে জাহাজে ফিরেছিলাম।

মাতাল হয়ে জাহাজে ফিরেছি। তোমার বাংকে এলবিকে দেখেই ধৈর্য ধরতে পারিনি। আমি ওকে টেনে তুলেছিলুম। এলবি বিরক্ত হয়ে তাকাতেই তোমাকে দুশমন বলে ভেবেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, বিজন। বলে দেবনাথ যথার্থই ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে ওর পাশে দাঁড়াল।

বিকেলে বিজন হাসপাতালে গেল। সেলিমের অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে। সেলিম ভালো হয়ে উঠছে। সেলিম ফের জাহাজের জাহাজি হয়ে একই সঙ্গে হয়তো ঘরে ফিরতে পারবে। এইসব ভাবনায় দেবনাথ এবং বিজন পথ চলছিল। দেবনাথ বলল, এলবির কাছে তোর একবার যাওয়া উচিত।

কোন মুখে যাব, বল।

আমার বড় ভুল হয়ে গেল, বিজন।

ওরা পরস্পর তাকাল। ওরা পরস্পর হাত ধরে হাসপাতালে উঠে গেল।

সিঁড়ি ধরে উঠবার সময় ভাবল, এলবি যদি আসে, এই হাসপাতালে এলবি যদি ওর জন্য অপেক্ষা করে, যদি বলে—বিজন, তুমি কি যথার্থই রবীন্দ্রনাথের নামে 'পাখী সব করে রব' শুনিয়েছ, তুমি কি যথার্থই কবিকে নিয়ে তামাসা করেছ তখন, তখন সে কী উত্তর দেবে! এইসব ভেবে বিজন, হাসপাতালে ভয়ে ভয়ে, সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকল। এবং যখন দেখল সেলিমের বিছানার পাশে কেউ বসে নেই তখন সে এক অহেতুক আনন্দে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেল।

সেলিমের শরীরে এখনও রক্ত দেওয়া হচ্ছে। সেলিম এত দুর্বল যে, কথা বলতে পারছে না। ওরা ওর পাশে বসল এবং বেঁচে থাকার জন্য উৎসাহিত করল।

বন্দরে বিজন এলবিকে এড়িয়ে বাঁচতে চাইল। সামনে পড়লেই ধরা পড়বে অথবা কলিন স্ট্রিট ধরে হাঁটলেই সাক্ষাতের সম্ভাবনা। সে সেজন্য জাহাজ থেকে কম নামল, বন্দর ধরে শহরে উঠল না এবং বড় বড় পথ ধরে পায়চারি করল না। সে শুধু বিকেলে হাসপাতালে গেল। এবং একদিন সেলিম বলল, সেলিম তখন ভালো হয়ে উঠছে, সেলিম তখন কথা বলতে পারছে—বলল, এলবি রোজ ভোরে আসেন।

জাহাজে সারাদিন কাজের পর যখন ক্লান্ত হয়ে বিজন রেলিংয়ে এসে ভর করে দাঁড়াত তখন ওর মনে পড়ত নটিংহিলের সেই ছোট্ট কাঠের ঘর, সেই ছোট অক্ষরে লেখা 'শান্তির নীড়', সেই ইজিচেয়ারটা এবং পাশের ভাঙা ঈজেলটার কথা। মনে পড়ত ওর কবিতা—আবৃত্তির কথা। এলবি 'গীতাঞ্জলি'র সব কবিতা যেন ওকে বারবার শুনিয়েছে। সে যেন এখন এই রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে সব কবিতাই স্পষ্ট মনে করতে পারছে। ওর একান্ত ইচ্ছা—এলবি যদি আসত, যদি সে ওর সামনে দাঁড়িয়ে সব অভিযোগ করত, যদি বলত, তুমি কবিতার মতো না বেঁচে জাহাজির মতো বাঁচলে! অথচ সে এল না। একদিন গেল, দু'দিন গেল, দু'সপ্তাহ গেল, অথচ সে এল না। পাইন গাছগুলো তখন পাতা মেলতে শুরু করেছে। পাখিরা সব আবার ফিরে এসেছে, গাছে গাছে তারা কোলাহল করছে। বসন্তের আগমনে এই ধরণি যেন উচ্ছল যুবার মতো অথবা গর্ভবতী তরুণীর মতো বয়সি হতে চাইছে। অথচ এলবির আর দেখা নেই।

বন্দরে যতদিন যেতে থাকল তত বিজন এলবির কাছে নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করল। তত সে ভেঙে পড়ল। তত সে নিঃসঙ্গবোধে পীড়িত হতে থাকল। জাহাজ ছেড়ে দেবে ক'দিন পর। সেলিম ভালো হয়ে উঠছে। যে সেতুবন্ধটি গড়ে উঠেছিল সেলিমকে কেন্দ্র করে, সেলিম জাহাজে ফিরে এলে সেটুকুও শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু কোনো এক ভোরে জাহাজে খবর এল, কাপ্তান হাসপাতালের সঙ্গে সংযোগ—রক্ষা করছেন—ডেক—এ ফের উদ্বেগ উত্তেজনা, সারেং ব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যান্য জাহাজিরাও ব্রিজের নিচে অপেক্ষা করছে—জাহাজের সবাই বোটডেকে মাস্তারে দাঁড়িয়ে আছে—তখন কাপ্তান বলছেন ব্রিজ থেকে, সেলিম ইজ ডেড—সেলিম মৃত।

বিকালে সব জাহাজিরা জাহাজ থেকে নেমে গেল। ওরা হাসপাতালের দরজায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মৃত নাবিকের শরীর নিয়ে যাত্রার ইচ্ছায় উন্মুখ হয়ে থাকল। ওদের অবয়বের ইচ্ছা যেন এই আমরা এই সন্ধ্যায় সকলে কবরভূমিতে নেমে যাচ্ছি। আমরা নেমে যাচ্ছি, আমরা নেমে যাব। আমরা মরে যাচ্ছি, আমরা মরে যাব।

শহরবাসীরা নাবিকের শবযাত্রার পথে ভিড় করল। একদল বিদেশি লোক জাহাজি পোশাকে কোনো নাবিকের মৃতদেহ নিয়ে সৈনিকের মতো পা ফেলে হাঁটছে। জানালায় যুবতী আর্শির আলোতে সেই শবযাত্রীদের দেখে মুখ ঘোরাল। কিছু স্বজাতীয় দেখল সেই শবানুগমন—এলবি কফিনের বাঁপাশে পথ দেখিয়ে চলছে। মিঃ ট্রয় এবং কিছু জাহাজি শ্রমিক কফিনের আগে আগে চলছে। ভারতীয় নাবিকেরা পিছনে। বিজন সকলের পিছনে। ওরা নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করছে। ওরা সকলে শহর অতিক্রম করে ক্রমে পাহাড়ের উৎরাইয়ে নেমে গেল। ওরা সকলে আজ কোনো কথা বলল না। কত নিঃসঙ্গ, কত নিঃশব্দ এই যাত্রা! ওরা পরস্পর অপরিচিতের মতো ব্যবহার করল, যেন অথবা, এই শোকাবহ ঘটনায় ওরা পরস্পর সাময়িক বেদনায় আত্মনিষ্ঠ। এলবি পর্যন্ত কোনো কথা বলে বিজনকে কিংবা অন্যান্য জাহাজিদের সমবেদনা জানাল না। এলবি চোখ তুলে বিজনকে দেখল না। অথবা না—দেখার ইচ্ছায় সর্বদা কফিনের আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। অথবা এলবির প্রত্যয় এমনভাবে ভেঙে গেছে যে, সে বিজনকে ফের উৎসাহ দিয়ে বলতে পারল না, সেলিম দেখবে ভালো হয়ে উঠবে।

কবরভূমির সদর দরজা দিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকে গেল। বিজন ছোট বড় সব বেদি দেখতে পেল। গির্জার মতো ছোট—বড় কবরের দেয়াল দেখতে পেল। অনেক সুখ—দুঃখর এপিটাফ চোখে পড়ল। সেলিম এখন কফিনে শুয়ে আছে। সেলিমের স্ত্রী এখন হয়তো দরজায় বসে মেয়েটাকে আদর করছে। অথবা মেয়েকে খসমের খবর দিয়ে সুখ পাচ্ছে। সেলিমের কবর এখানেই হল। সে বিবির কোলে মাথা রেখে মরতে পারল না। এইসব ভেবে বিজনের অশেষ দুঃখ। তবু একবার এলবিকে বলার ইচ্ছা—কিছু, বলার ইচ্ছা—শোকাবহ ঘটনার কথা বলে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করার ইচ্ছা—ওর সেই কবিতা—আবৃত্তির ইচ্ছা—পিস ওয়াজ অন হিজ ফোরহেড।

সেলিমের কবরের উপর প্রথম এলবিই মাটি দিল। সকলের শেষে বিজন মাটি দিতে গিয়ে অসহায় মানুষের মতো কেঁদে উঠল। এই মাটিটুকু দিয়ে সে আজ কত অসহায়, কত নিঃসঙ্গ এমতভাব প্রকাশ করল। এলবি পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিজন শেষ মাটিটুকু কবরের উপর চাপড়ে চাপড়ে দিচ্ছে এবং কাঁদছে। সে যেন এই মাটির স্পর্শ ছেড়ে উঠতে পারছে না। উপরে আলো জ্বলছে। শীতের কুয়াশা আলোর ডুমটাকে অস্পষ্ট করে রেখেছে। সকলে একে একে কবর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সকলেই যেন এই মৃত্যুতে দুঃসহ এক যাতনায় পরস্পর কথা বলতে পারছে না। পরস্পর সান্ত্বনা দিতে পারছে না। সকলেই মাথা নিচু করে পাহাড়ের ঢাল ধরে চড়াইয়ে উঠে যাচ্ছে।

এলবি ডাকল, বিজন, ওঠ। সেলিমকে বহু চেষ্টায়ও বাঁচানো গেল না। মৃত্যুরই জয় হল। প্রভুকে ওর কথা বল। ওর আত্মার শান্তি কামনা কর।

এলবি বিজনকে টেনে তুলল। ওরা পরস্পর তাকাল। তারপর হাত ধরে কবরভূমি ফেলে পাহাড়ের চড়াই ভেঙে সমুদ্রের ধারে এসে বসল। এলবিই বিজনকে এই অসীম সমুদ্রের আঁধারে বসতে অনুরোধ করল।

অন্য তীরে সব বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ। ওরা এপারে নির্জন জায়গায় বসে শোকটুকু ভুলতে চাইল। এলবি বিজনকে এই মৃত্যুশোক ভুলে যেতে অনুরোধ করল। এলবি ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা বলে বিজনের শেষ দুঃখটুকু মুছে দিতে চাইল—মুছে দেবার ইচ্ছায় ওকে শেষ পর্যন্ত নটিংহিলের ছোট কাঠের ঘরে নিয়ে এসে বলল, এ ঘর তোমার। তুমি এখানে থেকে যাও। যেন আরও বলতে চাইল—তোমার জাহাজি নিঃসঙ্গতাটুকু আমি, আমি—সব দিয়ে ভরে তুলব।

বিজন মনে মনে ভাবল—মূলত আমি নষ্টচরিত্রের মানুষ। তুমি আমায় ঘরে রেখে শান্তি পাবে না। বিশেষত কবির প্রতীকী হয়ে দীর্ঘ দিন আমি বাঁচতে পারব না। আমার জাহাজি চরিত্র আমাকে সমুদ্রের মতো অশান্ত করে রেখেছে। বন্দরে বন্দরে চরিত্র নষ্ট করে বেড়াতে না পারলে আমার জাহাজি চরিত্রের শান্তি নেই।

বিজন বলল, আশা করেছিলাম তুমি একদিন অন্তত অভিযোগ করতেও জাহাজে আসবে।

এলবি বলল, ভোরে সেলিমকে দেখে, সারাদিন অফিসে কাজ করে বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত পার্কে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি।

বস্তুত উভয়ে এক দুর্বিনীত অভিমানে পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠ হয়ে অভিযোগ করতে পারেনি। এলবি জলপাই গাছের নিচে বসে যত আশাহত হয়েছে তত এক ক্ষুব্ধ আক্রোশে ঘরে ফিরে মাতাল হওয়ার ইচ্ছায় জানালায় প্রজাপতি গুনেছে। যখন একান্ত উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারেনি তখন রবীন্দ্রনাথের ছবির নিজে বসে একের পর এক কবিতা উচ্চারণ করে এক অশেষ আনন্দে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথবা ঈশ্বরের মতো ইচ্ছায় বিজনকে কবিতার মতো সুস্থ করে তোলার প্রবৃত্তিতে এলবি প্রতিদিন ছটফট করত। রবীন্দ্রনাথের নামে 'পাখী সব করে রব' এবং জাহাজিদের রাতের আস্তানা উভয়ই নষ্ট চরিত্রের লক্ষণ জেনেও সে ঠিক থাকতে পারেনি। বিজনকে রমণীয় স্মৃতির অন্তরে বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণায় সে গর্ভবতী হতে চাইল।

এলবি বলল, তিনমাস ধরে তোমাকে পেয়ে কোনো নাচঘরে যেতে ভুলে গেছি। তুমি এমত আমায় আপনার করে রেখেছ।

এলবি যেন মনে মনে বিজনকে অনুরোধ জানাল, বিজন, তুমি যদি নষ্ট চরিত্রের মানুষ হতে চাও তবে আমায়ও নষ্ট চরিত্রের করে রেখে যাও। আমি আর এমনভাবে বাঁচতে পারছি না। দেয়ালে কবির ছবি, আমরা নিচে বসে এমত ভাবছি আমরা পরস্পর প্রীতির সম্পর্কে বাঁচছি—তুমি আমার আরও ঘন হয়ে বসো, আমার এতদিনের যৌন আদর্শকে ভেঙে দাও ; তোমার হাতে আমি নষ্ট চরিত্রের হয়ে বাঁচি। তোমার স্পর্শে কবির স্পর্শ এমত ভাব নিয়ে বাঁচি। এলবি ফের বলল, তুমি থেকে যাও, বিজন। বাকিটুকু বলতে পারল না। বাকিটুকু এলবির চোখে ধরা পড়ল—এ পৃথিবীতে বিজন ব্যতীত এলবি নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায় দীর্ঘদিন ভুগবে। এ পৃথিবীতে ভারতবর্ষের এক রূপকথার মতো যুবকের ঘন গভীর প্রীতির সম্পর্কে এলবিকে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করে রাখবে।

বিজন ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকল। কোনো কথা বলল না। এলবি দাঁড়াল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল। ঘন হয়ে দাঁড়াল এবং বিজনের শীর্ণ ঠোঁটে ধীরে ধীরে নুয়ে চুমু খেল। বিজন এই ঘটনায় এতটুকু উত্তেজিত হল না বরং সে কেমন ঠান্ডা হতে হতে একসময় ইজিচেয়ারের সঙ্গে যেন মিশে গেল। বস্তুত বিজন কবির প্রতীকীতে বাঁচতে গিয়ে মৃত্যুর মতো শিথিলতায় অথবা কবির প্রতি ঠান্ডা ঈর্ষায় এই ঘন চুম্বনে কোনো যৌন উত্তেজনা পেল না। বরং সে এলবির প্রতি করুণাঘন হল। এলবির মাথা—হাত বুলিয়ে ঈশ্বরের মতো বলল, আবার যদি এ বন্দরে আসি, তোমার ঘরে আসব। জাহাজি মানুষের মতো আসব। বস্তুত বিজন নিজের সহজ সত্তায় এলবির ঘরে বাঁচবার ইচ্ছায় উঠে দাঁড়াল।

বিজন বলল, কাল ভোরে আমাদের জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। তুমি ভোরে যেও।

এলবি উত্তর দিতে পারল না। সে খাটে পড়ে বালিকাসুলভ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বিজন বুঝল এ সময় কোনো কথা বলে এই আশাহত বিদেশিনীকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না। সে সেজন্য অনেকক্ষণ ওর পাশে বসে থাকল এবং ওকে কাঁদতে দিল।

অনেকক্ষণ পর যখন বিজন দেখছে এলবি আর কাঁদছে না, বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে, তখন ওর হাত ধরে টেনে তুলল এবং বলল, চল, জাহাজে তুমি আমায় পৌঁছে দেবে।

গাড়িতে বসে বিজন ভাবল সেলিম এবং তুমি উভয়ে আমার আত্মার আত্মীয়। দুজনকেই আমি এ বন্দরে ফেলে যাচ্ছি। হয়তো পৃথিবীর অন্য কোনো এক বন্দরে আমার জাহাজ ভিড়বে। সেখানে সেলিমের মতো কোনো পাইনের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি তোমার জানালায় সেদিন আত্মার গভীরে যে অজ্ঞাত দুঃখের স্পর্শটুকু পাবে—সে আমারই। তখন তুমি জানালায় বসে এই সমুদ্রকে দেখে কবির কবিতা আবৃত্তি কোরো। সে কবিতার ভিতর আমরা, এইসব মৃত নাবিকেরা ঈশ্বরকে খুঁজব।

বিজন বলল, এলবি, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। এভাবে চুপচাপ গাড়ি চালালে আমার খুব কষ্ট হয়।

এলবি কথা বলার পরিবর্তে ধীরে ধীরে কবিতা আবৃত্তির সময় দেখল এই শহরের পথের সব আলোগুলো এখনও জেগে আছে। ইতস্তত দুটো—একটা মোটর ওদের অতিক্রম করে বের হয়ে যাচ্ছে। পথের মোড়ে মোড়ে পুলিশের বুটের শব্দ। পুলিশ টহল দিচ্ছে। দোকানের শো—কেসে আলো জ্বলছে না। এলবি এই ঘন রাতে বিজনকে কোনো কথাই বলতে পারল না—সে ভেঙে পড়ছে। তাই ধীরে ধীরে শেষ প্রিয় কবিতাটি সে আবৃত্তি করে বিজনকে বিদায় জানাল—

"Art thou aboard on this stromy night
on the journey of love, my friend? The
sky groans like one in despair.
I have no sleep to-night. Ever and
again I open my door and look out on
the darkness, my friend!
I can see nothing before me. I

Wonder where lies thy path!
By what dim shore of the ink-black
river, by what far edge of the frowning
forest, through what mazy depth of
gloom art thou threading thy course
to come to me, my friend?"

তিন

কাকাতিয়া দ্বীপ থেকে ফসফেট নিয়েছে জাহাজটা। জাহাজ আগামী দশদিন পাশাপাশি ওসানিক দ্বীপপুঞ্জ সকল অতিক্রম করে অনবরত জল ভাঙবে। দশদিন জাহাজিরা মাটি দেখতে পাবে না, তেরো মাস সফরে যেমন এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে গিয়েছে, সমুদ্রের নোনা জল ভেঙে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে, তেমনি এ—দশ দিনও শুধু জলই দেখবে অথবা অসংখ্য নক্ষত্র এবং রাতের আঁধারে অন্য জাহাজের আলো।

তখন বিকেলের ঘন রোদের রঙ জেটিতে, ফসফেট—কারখানার প্রার্থনা—হলের গম্বুজে এবং দূরে, দূরে নারকেল গাছের ছায়াঘন চত্বরে অথবা শ্রমিকদের ভাঙা কুটিরে, আকাশ অথবা নীলের গভীরতায় সমুদ্র মগ্ন। জলের নীল অথবা সবুজ ঘন রঙের ছায়া সাহেবদের বাংলোগুলো উজ্জ্বল করে রেখেছে। কিছু শ্রমিক বিকেলের আনন্দ হিসেবে ছোট ছোট স্কীপ নিয়ে বঁড়শি নিয়ে সমুদ্রে ভেসে গেল। এবং তারা এই জাহাজের পাশ দিয়ে গেল। গলুইতে জাহাজিরা ভিড় করে আছে। যেখানে দ্বীপের পাথর সমুদ্রে বাতিঘরের মতো, যেখানে ফার্ন জাতীয় গাছ সমুদ্রের হাওয়ায় নড়ছে, সেখানে দ্বীপের সব শিশুরা অযথা লাফাল, নাচল, গাইল। কখনও সমুদ্রের জলে স্নান করল অথবা সাঁতার কাটল। এইসব দৃশ্যের ভিতর জাহাজটা ছাড়বে। গলুইতে জাহাজিরা ভিড় করে থাকল। মাস্টে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর জাহাজ ছাড়ছে এমন ভাবের কালো বর্ডার দেওয়া নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রিজে কাপ্তান, বড় মালোম। গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার এখনও পাহারা দিচ্ছে। সিঁড়ি এখনও জেটি থেকে তোলা হয়নি, অথচ সকল কাজ শেষ। ডেক, ফল্কা সব জল মেরে সাফ করা হয়েছে। হ্যাচ, ত্রিপল এবং কাঠের সাহায্যে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তবু মেজ মালোম সারেংকে ডেকে গলুইতে চলে এলেন না, কিংবা ওয়ারপিন ড্রাম ঘুরিয়ে বললেন না হাসিল—হাপিজ। বললেন না, তোমরা জাহাজিরা এসো, আমরা বন্দরের নোঙর তুলে সমুদ্রের পাল তুলি।

সমুদ্রের শান্ত নিবিড়তার ভিতর দ্বীপের পাহাড়, ঘর—বাড়ি, কারখানা এবং এইসব দ্বীপের পুরুষ—রমণীরা সকলে যেন রাজকন্যার মতো জেগে সারা রাত ধরে, মাস ধরে এমনকি বৎসর, যুগ যুগ ধরে কোনো এক রাজপুত্রের প্রতীক্ষাতে মগ্ন। সুপারি গাছ, নারকেল গাছ এবং উষ্ণদেশীয় সকল শ্রেণীর গাছ দ্বীপে দৃশ্যমান। সুমিত্র, জাহাজি সুমিত্র, সেজন্য বিকেলে পথে ঘুরতে ঘুরতে কখনও এ অরণ্য অঞ্চলে ঢুকে কাগজি লেবু সংগ্রহ করত। দু'পা এগিয়ে গেলে ওপাশে সমুদ্র, ধারে ধারে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি। সুমিত্র প্রায়ই বালিয়াড়িতে চুপ হয়ে, বালুচরের সঙ্গে ঘন হয়ে এই দ্বীপের নিবিড়তায় মগ্ন থাকত। যেন সে দীর্ঘদিন পর নিজের দেশের মতো দৃশ্যমান বস্তু সকলের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

প্রস্থে দৈর্ঘ্যে তিন গুণিত চার মাইল পরিমিত স্থানটুকু জুড়ে এই দ্বীপ। কিছু সমতল ভূমি, কিছু পাহাড়শ্রেণী। দ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চলে সাহেবদের বাংলো—সকল, পার্ক, বিদ্যালয় এবং ক্লাব—ঘর। পশ্চিমটুকু জুড়ে শ্রমিকদের নিবাস। পাহাড়ের উপর যেখানে কৃত্রিম উইলো গাছের সংরক্ষিত অঞ্চল আছে, যেখানে মার্বেল পাথরের প্রাসাদ এবং দ্বীপসকলের প্রধান কর্তার অবস্থিতি—তার ঠিক নিচে সুপেয় জলের হ্রদ। পাথুরে সিঁড়ি নিচে বালিয়াড়িতে গিয়ে নেমেছে। ছোট নীল হ্রদ অতিক্রম করার স্পৃহাতে সুমিত্র কোনো সিঁড়ির নিচে বসে থাকত। সমুদ্রের বুকে মার্বেল পাথরের স্থাপত্যশিল্প সুমিত্রকে রূপকথার গল্প স্মরণ করিয়ে

দিত। সেখানে একদা সুমিত্র এক যুবতীকে আবিষ্কার করল। যুবতী উইলো গাছের ছায়ায় হ্রদের তীরে বসে ভায়োলিন বাজাত।

সুমিত্র জাহাজ—রেলিংয়ে ভর করে গতকালের কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছে। সে দীর্ঘ সময় সিঁড়িতে বসেছিল এই ভেবে—যুবতী হয়তো এই পথ ধরে অপরাহ্ণ বেলায় অন্য অনেকের মতো সমুদ্রে নেমে আসবে। যুবতীর প্রিয়মুখ দর্শনে সে প্রীত হবে। কিন্তু দীর্ঘ উঁচু পাহাড়শ্রেণীর ফাঁক দিয়ে যুবতীর মুখ স্পষ্ট ছিল না। সুতরাং অন্য দিনের মতো ভায়োলিনের সুরে মুগ্ধ হওয়া ব্যতিরেকে কোনো গত্যন্তর ছিল না। প্রতি দিনের প্রতীক্ষা তার কখনও সফল হল না। এবং সেইসব নিষিদ্ধ এলাকায় যেতে পারত না বলে সমুদ্রে যুবতীর প্রতিবিম্ব দেখে গল্পের ডালিমকুমার হয়ে বাঁচবার স্পৃহা জন্মাত। আহা, আমি ওর চোখে স্পষ্ট হলুম না গো! যখন জাহাজিরা শ্রমিকদের বস্তিতে পুরনো কাপড়ের বিনিময়ে যৌন—সংযোগটুকু রক্ষা করত, তখন সুমিত্র পাথরের আড়ালে বসে উদাস হবার ভঙ্গিতে আকাশ দেখত।

সূর্য এখন সমুদ্রে ডুবছে। নীল সমুদ্রের লাল রঙ এখন পাহাড় এবং পাহাড়শ্রেণীর উপত্যকা সকলকে স্নিগ্ধ করছে। ছোট ছোট স্কীপগুলো ঘরে ফিরছে। ক্লাব—ঘরে ব্যান্ড বাজছে। জেটিতে অনেক মানুষের ভিড়। সুন্দরী রমণীরা, আর পাহাড়ের সব বাসিন্দারা যুবতীকে জাহাজে তুলে দিল। সকল জাহাজিরা গলুইতে ভিড় করে থাকল। সেই যুবতী, চঞ্চল দুটো চোখে, গ্যাঙওয়ে ধরে উঠে আসছে। সন্ধ্যার গাঢ় লাল রঙ যুবতীকে রহস্যময়ী করে তুলছে।

এবার সব ডেক—জাহাজিরা দু'ভাগ হয়ে আগিলা—পিছিলা চলে গেল। উইঞ্চ হাড়িয়া—হাপিজ করল হাসিল। ড্যারিক নামানো হল। যুবতীর বাপকে দেখা গেল কাপ্তানের ঘরে। কিছু কিছু জেটির লোক ডেকে উঠে এসেছিল। ওরা সিঁড়ি তোলার আগে নেমে গেল। যুবতীর বাবা নেমে গেলেন। তারপর জাহাজ ধীরে ধীরে তীর থেকে সরতে থাকল। রুমাল উড়ল অনেক জেটিতে, যুবতী কেবিনে ফিরে যাওয়ার আগে সন্ধ্যার গাঢ় রঙের গভীরতায় ওই দ্বীপের ছবি দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেল। এই তার দেশ, এত সুন্দর এবং রমণীয়।

কেবিনে ঢুকে যুবতী টুপাতি চেরি দেখল কাপ্তান—বয় সবকিছু সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে। চেরি আয়নায় মুখ দেখল, তারপর লকার খুলে রাতের পোশাক পরে বোট ডেকে উঠে যাবার জন্য দরজা অতিক্রম করতেই মনে হল জাহাজটা দুলছে এবং মাথাটা কেমন গুলিয়ে উঠছে। চেরি আর উপরে উঠল না। সে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। নরম সাদা বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে পোর্টহোলের কাচ খুলে দিল। চেরি এখন সমুদ্র এবং আকাশ দেখছে।

দরজায় খুব ধীরে ধীরে কড়া—নাড়ার শব্দে চেরি প্রশ্ন করল, কে?

আমি কাপ্তান—বয়।

এসো।

আপনার খাবার, বলে সযত্নে টেবিল সাজাল।

চেরি বলল, এক পেয়ালা দুধ, দুটো আপেল।

আর কিছু?

না।

আপনার কষ্ট হচ্ছে মাদাম?

না।

উপরে উঠবেন না? বেশ জ্যোৎস্না রাত। বোট—ডেকে আপনার জন্য আসন ঠিক করা আছে।

না, উপরে উঠব না।

বয় চলে যাচ্ছিল, চেরি ডেকে বলল, শোন!

কাপ্তান—বয় কাছে এল। বলল, তুমি কাপ্তানকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

জী, আচ্ছা। কাপ্তান—বয় দরজা টেনে চলে গেল।

তখন ফোকসালে জাহাজিরা চেরিকে কেন্দ্র করে মশগুল হচ্ছিল। সকলে ওর চোখমুখ দর্শনে সজীব। এবং চেরি যেন এই নিষ্ঠুর জাহাজে সকল জাহাজিদের নিঃসঙ্গ মনে সমুদ্রযাত্রাকে সুখী ঘরণির ঘরকন্নার মতো করে রাখছে। আর এমন সময় ডেক—সারেং এলেন, এনজিন—সারেং এলেন। তাঁরা দরজায় দরজায় উঁকি দিয়ে বললেন, তোমরা উপরে যাও, বোট—ডেকে মাস্তার দাও।

জাহাজিরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠল সকলে। ওরা বোট—ডেকে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়াল। ডেক—সারেং ওদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা, বাপুরা, ওঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে যাবে না। কাপ্তানের বারণ আছে। জেনানা মানুষ, কাঁচা বয়েস, তার উপর আবার শুনছি রাজার মেয়ে এবং তিনি নাকি আমাদের কোম্পানির একজন কর্তাব্যক্তি।

সুমিত্র হাসল। —কী যেন বলেন চাচা! উনি তো কাকাতিয়া দ্বীপের প্রেসিডেন্টের মেয়ে।

সারেং বললেন, ওই হল। যে রাজা, সেই—ই প্রেসিডেন্ট।

এখন রাতের প্রথম প্রহর। অল্প জ্যোৎস্না সমুদ্রে এবং জাহাজ—ডেকে। জাহাজিরা গরম বলে সকলে ফোকসালে গিয়ে বসল না। ওরা ফল্কার উপর বসে ভিন্ন রকমের সব কথাবার্তা বলল। দু—একজন জাহাজি অভদ্র রকমের ইঙ্গিত করতেও ছাড়ছে না। এ ধরনের কথাবার্তা শুনে অভ্যস্ত বলে সুমিত্র রাগ করল না। বরং হাসল। দীর্ঘদিনের সমুদ্রযাত্রা সুমিত্রকে বিরক্ত করছে।

সুমিত্র ভাবল, সেই মেয়ে, হ্রদের তীরে বসে বেহালা বাজাত, পাথরের আড়ালে বসে হ্রদে প্রতিবিম্ব দেখে যার রহস্য আবিষ্কারে সে মত্ত থাকত, যার প্রতিবিম্ব সমুদ্রের কোনো রাজপুত্রের ইচ্ছাকে সকরুণ করে রাখত, অথবা সেই প্রাসাদের ছায়া, ঘন বন, সমুদ্রের পাঁচিল এবং উঁচু পাথরের সব দৃশ্য সুমিত্রকে ঠাকুমার গল্প মনে পড়িয়ে দিত....যেন রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে....যাচ্ছে....শুধু পাতালপুরীতে ভোজ্যদ্রব্য, যেন প্রাসাদের পর প্রাসাদ, কোনো জন—মনিষ্যির গন্ধ নেই, ফুলেরা, গাছেরা, পাখিরা এবং পতঙ্গসকল পাথর হয়ে আছে। হ্রদের তীরে খুব নিচু উপত্যকা থেকে সুমিত্র যতদিন চেরিকে দেখেছে, ততদিন পাতালপুরীর দৃশ্যসকল কাকাতিয়া দ্বীপের সকল দৃশ্যমান বস্তুসকলের উপর এক ক্লান্ত ইচ্ছার ঘর তৈরি করে চলে গেছে।

এখন জাহাজিরা সকলে বাংকে শুয়ে পড়েছে। সুমিত্রও দরজা বন্ধ করে কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল। সুমিত্র এই বাংকে শুয়ে পর্যন্ত চেরির কথা ভাবছে—চেরি হয়তো শুয়ে পড়েছে। সিঁড়ি ধরে গ্যাংওয়েতে যখন উঠে আসছিল চেরি, সুমিত্র তাকে স্পষ্টভাবে দেখেছিল। বড় বড় চোখ মেয়েটির—বাদামি রঙ শরীরে, চোখের রঙ ঘন গভীর এবং সমস্ত শরীরে প্রজাপতির মতন হালকা গড়ন যেন ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার ঘর সবটুকু যত্ন দিয়ে তৈরি করেছেন।

জাহাজ এখন সমুদ্রে। তীর দেখা যাচ্ছে না, কেবল দ্বীপ অথবা প্রবালবলয়। ভোরের সূর্য উঠেছে সমুদ্রে। সমুদ্রটাকে দু—ফাঁক করে সহসা যেন সূর্যটা আকাশে উঠে গেল। ডেক—জাহাজিরা এ সময় জাহাজে জল মারছে। এবং অন্য অনেক জাহাজি ইতস্তত রঙের টব নিয়ে মাস্টে, ড্যারিকে রঙ দেবার জন্য ফল্কায় ফল্কায় হাঁটছে। সুমিত্র ভোরে উঠে ওয়াচে যাবার আগে গ্যাংওয়েতে চোখ তুলে দিল। চেরি সেখানে নেই। বোট—ডেক খালি। ব্রিজে ছোট মালোম দূরবিন চোখে লাগিয়ে দূরের আকাশ দেখছে।

সুমিত্র এনজিন—রুমে নেমে যাবার আগে দুখানা ভাঙা চাঁদের মতো রুটি খেল, জল খেল। চা খেল। অন্যান্য জাহাজির মতো প্রশ্ন করে জানতে চাইল, গত রাতে চেরি কেবিনে শুয়ে সারারাত ঘুমিয়েছিল, না, গরমে কেবিনের দরজা খুলে রাতে ডেকে বসে সমুদ্র এবং আকাশের নিরাময় ভাবটুকু লক্ষ্য করে শরীর নিরাময় করেছিল!

সুমিত্র এনজিন—রুমে নেমে যাওয়ার সময় দেখল ডেক—অ্যাপ্রেন্টিস চুরি করে টুপাতি চেরির পোর্টহোলে উঁকি দিচ্ছে। সুমিত্ররও এমন একটা ইচ্ছা যে না হচ্ছে, তা নয়। তারও না—দেখি না—দেখি করে পোর্টহোলের কাচ অতিক্রম করে চেরির অবয়ব দর্শনে খুশি হবার ইচ্ছা। কিন্তু পোর্টহোলের মুখোমুখি

হতে কেমন যেন বিব্রত বোধ করল। সে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ধরে এনজিন—রুমে নেমে কসপের ঘর থেকে তেল মেপে এনজিনের পিস্টনগুলোতে এবং অন্যান্য যুক্তস্থানে তেল ঢালতে লাগল। ওয়াচ শেষে উপরে উঠবে তখন নিশ্চয়ই চেরি কেবিনে পড়ে থাকবে না, সমুদ্র এবং আকাশ দেখার জন্য নিশ্চয়ই বোট—ডেকে উঠে পায়চারি করবে, সে এমত চিন্তাও করল।

ওয়াচ শেষে অন্য পীরদারদের ডেকে দিল সুমিত্র। এনজিন—রুম থেকে সোজা না উঠে, স্টোকহোলড দিয়ে ফানেলের গুঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল, প্রত্যাশা চেরি যদি ব্রিজের ছায়ায় বোট—ডেকে বসে থাকে। সে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে এই ইচ্ছায় যথার্থই বোট—ডেকে উঠে গেল। যখন দেখল ব্রিজের ছায়ায় কেউ নেই, তখন সুমিত্র কেমন বিচিত্র এক অপমানবোধে পীড়িত হতে থাকল।

সুমিত্র স্নান করার সময় ভাণ্ডারীকে বলল, মানুষের কত রকমের যে শখ জাগে চাচা!

ভাতিজার হ্যান মনের দশা ক্যান?

এই কিছু না। সুমিত্র মনে করতে পারল, এনজিন—রুমে সে যতক্ষণ ছিল, সব সময়টা উপরে ওঠার জন্য মনটা ছটফট করেছে। সে চেরির সঙ্গে কী এক আত্মীয় সম্পর্কে যেন ঘনিষ্ঠ। সে মনে মনে এই বোধের জন্য না হেসে পারল না।

এ—ছাড়া সুমিত্র পর পর দু'দিনের জন্য একবারও চেরিকে বোট—ডেকে অথবা গ্যাঙওয়েতে এমনকি ডাইনিং—হলেও দেখল না। যুবতী এই জাহাজে উঠেই নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। দশদিনের সমুদ্রযাত্রা। এ—দু'দিন চেরি জাহাজ—ডেকে একবারও বের হল না। সুতরাং সুমিত্র যতবার এনজিন—রুমে নেমেছে, ততবার কেবিনের পাশে এসে একবার থেমেছে। সে পোর্টহোলের ঘন কাচের ভেতর দিয়ে চেরির কেবিন প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করত। কিন্তু পোর্টহোলের ঘন কাচের ভিতর দিয়ে চেরির কেবিন সবসময় অস্পষ্ট থাকছে। কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মেস—রুম মেট অথবা মেস—রুম বয় এদিকে আসছে না। বুড়ো কাপ্তান—বয় চেরিকে দেখাশোনা করছে। অফিসাররা পর্যন্ত জাহাজে চুপ মেরে গেছেন। যত জাহাজটা চলছে তত যেন নাবিকরা সব ঝিমিয়ে পড়ছে। চেরি দরজা খুলল না, ডেকে বের হল না, পায়চারি করল না। অফিসারসকল প্রতিদিন ডেক—চেয়ারে সাজগোজ করে বসে থাকলেন, অবসর সময় একটু আলাপ অথবা উদ্বিগ্ন হবার ভঙ্গিতে কৃত্রিম ইচ্ছা প্রকাশের জন্য। কখনও কখনও ছোট মালেম দরজা পর্যন্ত হেঁটে আসতেন। তারপর সমুদ্রের নির্জনতা ভোগ করে একসময় কেবিনে ঢুকে সস্তা সব ক্যালেন্ডারের ছবি দেখে ভয়ানক অশ্লীল আবেগে ভুগতেন।

সমুদ্রে নীল নোনা জল, আকাশে ইতস্তত নক্ষত্র জ্বলছে। খুব গরম পড়েছে—উষ্ণমণ্ডলের এই আবহাওয়া জাহাজিদের ফোকসালে বসতে দিচ্ছে না, ওরা শুতে পারছে না গরমে। ওরা উপরে উঠে ফল্কাতে মাদুর বিছিয়ে সেজন্য অধিক রাত পর্যন্ত তাস খেলছে। কেউ জাল বুনছে মাস্টের আলোতে। জাহাজটা চলছে, জ্যোৎস্না রাত। সমুদ্রে অকিঞ্চিৎকর তরঙ্গ এবং সহসা সমুদ্র থেকে ঠান্ডা হাওয়া উঠে এসে জাহাজিদের সুখ দিচ্ছে। এবং প্রপেলারটা অনবরত ঝিঁ ঝিঁ পোকার করুণ আর্তনাদের মতো যেন কাঁদছে। বিশেষ নির্দিষ্ট গতিতে জাহাজটা চলছে, দৃশ্যমান বস্তু বলতে এই নক্ষত্রের আকাশ এবং সমুদ্র। গরমে কাপ্তান ব্রিজে পায়চারি করছেন। দুটো একটা আলো দেখা যাচ্ছে সমুদ্রে। দ্বীপপুঞ্জের জেলেরা এখন হয়তো গভীর সমুদ্রে মাছ ধরছে।

সুমিত্র জাহাজিদের বলল, আচ্ছা ব্যাপার তো! দু'দিনের ভেতর একবারও যুবতীকে ডেকে দেখা গেল না! এ যে দেখছি চাচারা তোমাদের বিবিদেরও হার মানাচ্ছে!

ডেকের বড় ট্যান্ডল বলল, তোমাদের ভয়েই বার হচ্ছে না।

আমরা খেয়ে ফেলব নাকি?

বড় বাকি রাখবে না।

সুমিত্র দেখল তখন বুড়ো কাপ্তান—বয় এদিকেই আসছে। সে এসে ওদের পাশেই তাস খেলা দেখতে বসে গেল।

সুমিত্র বলল, রাজকন্যার খবর কী চাচা?

আর বলবেন না দাদা। রাজকন্যাকে দেওয়ানিতে ধরছে। মাথা তুলতেই পারছে না। শুধু বিছানায় পড়ে থাকছে।

রাজকন্যা কিছু বলছে না তোমাকে?

আমি বুড়োমানুষ, আমাকে কী বলবে দাদা!

অন্য জাহাজি প্রশ্ন করল, মাথা একেবারেই তুলতে পারছে না?

কাপ্তান—বয় বলল, পারছে। বিকেলে দেখছি কেবিনেই পায়চারি করছে। মনে হয়, কালতক ডেকে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

জাহাজটা তখন তেমন দুলছে না। ওরা ফল্কার উপর বসে গল্প করছে। জ্যোৎস্নার আলোতে ওদের মুখ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। গ্যালিতে মাংস সিদ্ধ করছে ভাণ্ডারী। উইন্ডসহোল ধরে নিচ থেকে জাহাজিদের কথা ভেসে আসছে। এবং সেখানেও চেরি—সংক্রান্ত কথাবার্তাতে ওরা নিজেদের কঠিন মেহনতের দুঃখকে ভুলতে চাইছে।

সুমিত্রই সকল জাহাজিদের খবরটা দিল—কাল টুপাতি চেরি ডেকে বের হবে। পরদিন আটটা—বারোটার ওয়াচে সুমিত্র এনজিন—রুমে নেমে কসপের ঘর থেকে তেল মেপে নিল। ক্যানে ভর্তি তেল সে এনজিনের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দিচ্ছে। একটু নুয়ে মেসিনের ভিতর ঝুঁকে পড়ল। তারপর ক্যানের তেল উঠাল, নামাল এবং সে ঘুরে ঘুরে একই কাজের পুনরাবৃত্তি করছে....সে ক্যান উঠাল, নামাল। অন্য কোনো দিকে তাকাতে পারছে না। সে যেন বুঝতে পারছে উপর থেকে সিঁড়ি ধরে কারা নামছে। সে চিফ ইনজিনিয়ার এবং কাপ্তানের গলা শুনতে পাচ্ছে। সুতরাং এ সময়ে কোনো অন্যমনস্কতা রাখতে নেই। এ সময়ে সে তেলয়ালা সুমিত্র। তাকে ক্রমশ উপরে উঠতে হবে। তাকে ছোট ট্যান্ডল থেকে বড় ট্যান্ডল হতে হবে। বড় মিস্ত্রির চোখে যেন কোনো অন্যমনস্কতা ধরা না পড়ে এবং সে যেন জীবনের ঋণ অনাদায়ে পরিশ্রমী তেলয়ালা সুমিত্র। সুতরাং সে ভীষণভাবে রড ধরে মেশিনের ভিতর ঝুঁকে কাজ করতে থাকল। থামের মতো সব মোটা পিস্টন রডগুলো উঠছে নামছে, ক্রাঙ্কওয়েভগুলো ঘুরছে অনবরত এবং এইসব ভয়ংকর শব্দে উপরের কণ্ঠসকল ঢেকে যাচ্ছে। তবু সে এ—সময়ে কোনো রমণীর কণ্ঠ শুনতে পেল এবং চোখ না তুলেই বুঝল বড় মিস্ত্রি আর কাপ্তান চেরিকে নিয়ে এনজিন—রুমে নেমে আসছে। সিলিন্ডারের পাশে দাঁড়িয়ে রেসিপ্রকেটিং এনজিনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বড় মিস্ত্রি তাকে বিস্তারিত বলছেন।

সুমিত্র যেখানে কাজ করছে, সেটা এনজিনের তৃতীয় স্তর। দ্বিতীয় স্তরে চেরি এবং কাপ্তান। চেরি এনজিনটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুমিত্র একবার চেরিকে গোপনে দেখে ফেলল। চেরি সিলিন্ডার পরিদর্শন করে সিঁড়ি ধরে ক্রমশ নিচে নামছে। ওরা সুমিত্রের পাশ দিয়ে যথাক্রমে নিচে নেমে যাচ্ছে। সুমিত্র নিজের পোশাকের দিকে তাকাল—নীল কোর্তা ওকে মোল্লা মৌলভি বানিয়ে রেখেছে। চেরি নিচে নেমে যাচ্ছে। মেশিনের হাওয়ায় ওর চুলগুলো উড়ছে। গায়ে সাদা সিল্কের ফ্রকোট। পরনে নেভি ব্লু স্কার্ট। সুমিত্র নিজেকে আড়াল দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, বড় মিস্ত্রি এবং কাপ্তান চেরিকে এনজিনের মতো দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবে সুমিত্রর দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছে—এরা ইন্ডিয়ান। কোম্পানি ওদের কলকাতা অথবা বোম্বাই বন্দর থেকে তুলে নেয়। খুব কম পয়সায় ওরা বেশি কাজ দেয়।

বড় মিস্ত্রি অনেকটা পাদরিসুলভ ভঙ্গিতে বললেন, বেচারা!

সুমিত্র লজ্জায় মেশিনের ভিতর আরও ঝুঁকে পড়ল। চেরি ওর মুখ না দেখে ফেলে এমত ইচ্ছা এখন সুমিত্রর।

সুমিত্রর এখন কত কাজ। সে ঘুরে ঘুরে এনজিনের সকল স্থানে তেল দিল। চেরি হেঁটে যাচ্ছে, চেরি ফিরেও তাকাচ্ছে না, চেরি পোর্ট—সাইডের বয়লার ককের সামনে দাঁড়াল। বড় মিস্ত্রি বলল, এটা কনডেনসার। সার্কুলেটিং পাম্পের সাহায্যে জল ফের বয়লারে চলে যায়। ফের চেরি এবং বড় মিস্ত্রি ওর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। ওরা গল্প করছে। সে তাকাল না। লজ্জায় সংকোচে সে টানেলের ভিতর ঢুকে গেল। কিন্তু চেরির চোখ দুটো বড় গভীর এবং ঘন। সুমিত্র টানেলের মুখে এসে প্রপেলার শ্যাফটের একপাশে দাঁড়িয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে চেরিকে আড়াল থেকে দেখতে থাকল। চেরি ওকে দেখতে পাচ্ছে না, ওর শরীরের বাদামি রঙ, হালকা পোশাক—প্রজাপতির মতো যেন এনজিনে ও উড়ে বেড়াচ্ছে।

চেরি ইভাপোরেটারের পাশ দিয়ে যেতেই সেই গোপনীয় চোখ দুটোকে আবিষ্কার করে ফেলল। চেরি দেখল দুটো ডাগর চোখ (ঠিক যেন ঠাকুমার গল্পের রাজপুত্রের মতো) রাক্ষসের দেশে চেরিকে কেউ চুরি করে দেখছে। এইসব ভেবে একটু অন্যমনস্কতায় ভুগে যখন আবার চোখ তুলল চেরি, তখন দেখতে পেল চোখ দুটো সেখানে নেই, অন্যত্র কোথায় সরে গেছে।

ভয়ে সুমিত্র একপাশে সরে দাঁড়াল। সে তেল দিল ইতস্তত এবং কাপ্তানকে টুপাতি নালিশ দিলেও যেন বলতে পারে, না মাস্টার, আমি শুধু এনজিনেই তেল দিচ্ছি। টুপাতি এ সময়ে সামনে এসে দাঁড়াল। লজ্জায়, সংকোচে সুমিত্র চোখ তুলতে পারছে না। সে পেটের সঙ্গে অথবা এইসব যন্ত্রের সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছে। চেরি এখন সুমিত্রর কোঁকড়ানো চুল শরীরের বাদামি রঙ দেখছে। ঘাড়ের নরম মাংসগুলো দেখল। তারপর সিঁড়ি ধরে স্টিয়ারিং—এনজিনে তেল দিতে যাবার সময় সুমিত্র শুনল টুপাতি যেন ওর সম্বন্ধে কী বলছে।

সুমিত্র ফোকসালে এসে কাপড় ছাড়ল—কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলল না। উপরে উঠে স্নান করল, কোনো কথা বলল না। খেতে বসে চুপচাপ খেয়ে উঠল। অন্য তেলয়ালা বলল, কী হয়েছে রে? মুখটা খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

অনেকে এমত প্রশ্ন করলেও সুমিত্র জবাব দিচ্ছে না। সে বাংকে বসে অযথা সিগারেট খেল, অযথা কতকগুলি ইংরেজি পত্রিকার সস্তা অশ্লীল ছবি দেখল এবং কোনো আতঙ্কে সে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। এনজিনের ভিতর থেকে সেই চোখ দুটো যেন এখনও ওকে তাড়া করছে। বারবার মনে হচ্ছে চেরির প্রতি চোখের এই স্পর্শকাতরতা সুখকর নয়। পোর্টহোলে সুমিত্রকে উঁকি দিতে দেখেছে এবং সেজন্য নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছে চেরি। কাপ্তানকে নালিশ দিয়েছে হয়তো।

আর বিকাল বেলাতেই বুড়ো কাপ্তান—বয় এল পিছিলে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। সুমিত্র বাংকে শুয়ে ছিল, ঘুম আসছে না। সেই চোখ কেবল ওকে অনুসরণ করছে। কাপ্তান—বয় সারেংয়ের ঘরে উঁকি দিয়ে বলল, সারেংসাব, বাড়িয়ালার ঘরে সুমিত্রর ডাক পড়েছে।

সুমিত্র শুনল, কাপ্তান—বয় এইসব কথা বলে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। সে শুনল, সারেং সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে আসছে এবং ওর ঘরের ভিতরও সেই শব্দ। সুমিত্র ভয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল।

সারেং ডাকল, এই সুমিত্র ওঠ। বাড়িয়ালা তোকে ডাকছে।

সুমিত্র উঠে বসল, আমাকে যেতে হবে সারেংসাব?

কী করি বল? বাড়িয়ালা যে যেতেই বলল।

আমি কিছুই করিনি সারেংসাব। সুমিত্র অপরাধবোধে পীড়িত হতে থাকল। বার বার নামতে উঠতে পোর্টহোলে সহসা কখনও চোখ রেখেছে এবং এক তীব্র কৌতূহল ওকে বারবার এই বৃত্তিতে প্রলুব্ধ করেছে।

সুমিত্র লকার খুলে সাদা জিনের প্যান্ট পরল, জ্যাকেট গায়ে দিল, তারপর পায়ে জুতো গলিয়ে সারেংসাবকে বলল, চলুন। সে সিঁড়ি ধরে উঠবার সময় দৃঢ় হবার চেষ্টা করল। কেউ প্রশ্ন করলে না। কারণ, বাড়িয়ালা একমাত্র জাহাজিদের অপরাধের জন্য তাঁর ঘরে অথবা ডাইনিং—হলে ডেকে থাকেন। সুতরাং সকল জাহাজিরা সুমিত্রকে দেখল সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে। সুমিত্র যেন ওর অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন, সে সেজন্য চোখ তুলল না। সে এখন অন্য কোনো জাহাজিকেই দেখছে না। জাহাজটা যে চলছে এ—বোধও

এখন সুমিত্রর নেই। উষ্ণমণ্ডলের গরম কমে যাচ্ছে, বিকেল হতেই ঠান্ডা—ঠান্ডা ভাব ডেকে, সুমিত্র ডেক ধরে যাবার সময় তাও অনুভব করতে পারল না। সে সারেংয়ের সঙ্গে বোট—ডেক পার হয়ে ব্রিজে উঠে যাবার সিঁড়ি ধরে কাপ্তানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

ওরা এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। সারেং ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করছে এবং কোনোরকমে গলা সাফ করতেই কাপ্তান দরজা খুলে বের হলেন। তিনি ওদের দেখে বললেন, সারেং, তুমি কেন? তোমাকে তো ডাকিনি!

হুজুর, কাপ্তান—বয় যে বলল—

আরে না না, সুমিত্র হলেই চলবে। আমাদের সম্মানীয়া যে যাত্রীটি যাচ্ছেন, তিনি একবার ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

এতক্ষণ সুমিত্র শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বাড়িয়ালার এইসব কথায় সে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করতে পারছে। সে বলল, মাস্টার, আমি যাব?

তুমি একবার পাঁচ নম্বর কেবিনে যাবে। যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, তখন যেতেই হবে।

সুমিত্র ইচ্ছা করলে বোট—ডেক অতিক্রম করে টুইন—ডেকে নেমে অফিসার গ্যালি ডাইনে ফেলে পাঁচ নম্বর কেবিনে হাজির হতে পারে, অথবা অ্যাকোমোডেশান ল্যাডারেরই একটা অংশ ডাইনিং হলে নেমে গেছে—সেই সিঁড়ি ধরে নামলেও চেরির দরজা। একটু ঘোরা পথ অথবা খুব কাছের পথ—কোনটা ধরে যাবে ভাবছিল, ভাবছিল চেরির সহসা এই ইচ্ছা কেন? পাথরের আড়াল থেকে চেরি ওকে নিশ্চয়ই দেখেনি, কারণ সেখানে সুমিত্রর অবয়ব স্পষ্ট ছিল না। সে অন্যমনস্কভাবেই হাঁটছিল। সে সিঁড়ি ধরে টুইন—ডেকে নেমে দেখল কমলা রঙের রোদ ডেকে, কিছু নীল তরঙ্গ জাহাজের চারপাশটায়। পিছিলে জাহাজিরা অনেকে নামাজ পড়ছে। সে নেমে আসার সময় তাদেরও দেখল।

ডেক—কসপ বলল, কিরে সুমিত্র, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? কাপ্তান তোকে কিছু বলেছে?

সুমিত্র কোনো উত্তর না দিয়ে আলওয়েতে ঢুকে দেখল কেবিনের দরজা বন্ধ। সে ধীরে ধীরে কড়া নাড়তে থাকল।

ভিতর থেকে কাপ্তান—বয় বলল, কে?

আমি চাচা, সুমিত্র।

ভিতরে এসো। ভিতরে এসো।

সে পা টিপে টিপে কেবিনে ঢুকল। সে দেখল, কাপ্তান—বয় লকার, টিপয় এবং অন্য সব বাংকের বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছে। চেরির বাদামি রঙের ঘাড় আঙুরফলের মতো রঙ ধরেছে। চেরি ঘাড় গোঁজ করে বাক্সের ভিতর কী যেন খুঁজছে।

কাপ্তান—বয় বলল, সুমিত্র এসেছে মাদাম।

সুমিত্র দেখল সেই আঙুলফলের মতো ঘাড় খুব সন্তর্পণে যেন নড়ছে। যেন বেশি চঞ্চল হতে নেই, উচ্ছল হতে নেই। সে দেখল সুমিত্রকে ঘাড় ঘুরিয়ে এবং যত ধীরে ঘাড় ঘুরিয়েছিল তার চেয়েও ধীরে ঘাড় ফেরাল। —ওকে বসতে বল।

সুমিত্র পাশের ছোট্ট ডেক—চেয়ারে বসল।

চেরি তখনও বাক্সের ভিতর কী যেন খুঁজছে। সে বলল, বয়, তুমি যেতে পারো।

সুমিত্র বাংলায় বলল চাচা, আপনি চলে যাচ্ছেন!

মেয়েমানুষকে এত ভয় দাদা, ফোকসালে তো খুব হইচই করতে।

সুমিত্র জবাব দিতে পারল না। সে চুপ করে বসে থাকল। কাপ্তান—বয় দরজা বন্ধ করে চলে গেল। সুমিত্র এ সময় উঠল এবং দরজা কিঞ্চিৎ খুলে দিল। সে নিচে এনজিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে অথবা সুমিত্রর মুখে উষ্ণবলয়ের শেষ উত্তাপ—চিহ্ন... সে চুপ করে বসে পড়ল ফের। পোর্টহোলের কাচ খোলা, উপরে পাখা

ঘুরছে এবং দরজা দিয়েও কিছু হাওয়া প্রবেশ করতে পারছে, তবু সুমিত্র ঘেমে নেয়ে উঠল। যত সে দৃঢ় হবার চেষ্টা করছে, তত যেন ওর মুখে আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতার ছোপ লাগছে। তত সে অসহায় বোধ করল নিজেকে।

এতক্ষণ পর চেরি মুখ ফেরাল। শরীরে হালকা গাউন, ব্রেসিয়ার স্পষ্ট। চেরি দু'হাঁটু ভাঁজ করে বাংকে বসল। সুমিত্রর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, পোর্টহোলে রোজ উঁকি মারতে কেন?

আর উঁকি মারব না মাদাম।

কেন উঁকি দিতে তাই বল।

দীর্ঘদিন সফর করছি। দেশে জাহাজ ফিরছে না, কেবল জল আর জল।

একটু বৈচিত্র্য চাইছ?

আজ্ঞে।.... সুমিত্র আর কিছু প্রকাশ করতে পারল না। ভয়ে এবং বিষণ্ণতায় আড়ষ্ট বোধ করতে থাকল। ওর পায়ে সুন্দর জুতো, নেলপালিশ নখে, সুগোল হাঁটু পর্যন্ত পা... সে নিচু করে রেখেছে মুখ, তবু ওর সব যেন দেখতে পাচ্ছে সুমিত্র। গাউনের শেষ প্রান্তে লতার গুচ্ছ, পায়ের কোমল ত্বকে কেবিনের আলো... সে আর পারছে না, সে বলল, মাদাম, আর হবে না। আমাকে ক্ষমা করুন।

তুমি তো ভারতবর্ষের লোক সুমিত্র?

সুমিত্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, এবং চোখ তুলে এই প্রথম চেরির চোখ দুটো খুব কাছে থেকে দেখল, এত উজ্জ্বল, এত প্রাণবন্ত চোখ সে যেন ওই প্রথম দেখল। শালীনতার তীব্র তীক্ষ্ন ভাব চেরিকে, চেরির চোখ দুটোকে কঠিন করে তুলেছে। সুমিত্র চেরিকে সহ্য করতে পারছে না। সে বলল, আমি উঠি।

চেরি এবার না হেসে পারল না,—তুমি ভয়ানক ভীতু সুমিত্র। শুনেছি সম্রাট অশোক দিগবিজয়ে বের হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছেলে এবং মেয়েকে এইসব দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই ভারতবর্ষের ছেলে তুমি!

সুমিত্র এবার একটু হালকা বোধ করল এবং ভালো করে কেবিনের চারপাশটা দেখে নিল। এতক্ষণ পরে সে ধরতে পারছে এই কেবিনে ফুলেল তেলের গন্দ, বিদেশি দামি সেন্টে অথবা কোথাও ধূপ দীপ অনবরত জ্বলে জ্বলে চেরিকে, ওর পোশাককে রূপময় করেছে। বাংকের উপর ভায়োলিন। দেয়ালে সুন্দর ক্যালেন্ডার। সমুদ্রে ঢেউ। বাইরে ঢেউ ভাঙার শব্দ। নিচে এনজিন—ঘরের আওয়াজ এবং চেরির চোখ দুটোতে দ্বীপপুঞ্জের কমলালেবুর গন্ধ। চোখ দুটো কমলালেবুর মতোই সজল।

চেরি কাপ্তান—বয়কে দিয়ে দু'কাপ কফি আনাল। চেরি ইচ্ছা করেই দূরত্ব ভেঙে দেবার চেষ্টাতে এক কাপ কফি খেতে অনুরোধ করল। সুমিত্র এরপর ভারতবর্ষের কোনো রাজপুত্রের মতোই দৃঢ় হল এবং বলল, আপনি আমায় কেন ডেকেছেন মাদাম?

সুমিত্রর দৃঢ়তাটুকু কেন জানি চেরির ভালো লাগল না। যে মানুষটা কিছুক্ষণ আগেও এনজিনে ঘাড় গুঁজে কাজ করছিল, যার চোখ দুটো ভয়ে বিব্রত ছিল, সে সহসা এমত দৃঢ় ইচ্ছায় প্রকট হবে, অথচ চোখে কোনো করুণার চিহ্ন থাকবে না, অবাধ্য যুবকের মুখভঙ্গিতে বসে থাকবে চেরি এমত ভাব সহ্য করতে পারছে না। সে ফের প্রশ্ন করল, পোর্টহোলে উঁকি দিয়ে কী দেখার চেষ্টা করতে বল।

মাদাম, আমার সম্বন্ধে আপনি খুব বেশি ভাবছেন।

একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার পোর্টেহোলে উঁকি দিয়েছ তুমি। ভেবেছ, পোর্টহোলের কাচ মোটা বলে আমি কিছু দেখতে পাইনি? সি—সিকনেসে ভুগছিলাম, নতুবা কাপ্তানকে দিয়ে তক্ষুনি ডেকে পাঠাতাম।

সুমিত্র মাথা নিচু করে আগের মতো বসে থাকল।

পরে জেনেছি তুমি ইন্ডিয়ান সুমিত্র। টুপাতি একটা বালিশ টেনে কোলের উপর চেপে বলল, কফি ঠান্ডা হচ্ছে, খেয়ে নাও।

সুমিত্র ভয়ে ভয়ে কফিতে চুমুক দিল। খুব আদর—যত্নে এই মেয়েটি প্রতিপালিত—সে তাও ধরতে পারছে। সে একবার ভাবল, কাপ্তানকে বলে দেয়নি তো; সুমিত্র কেমন শুকনো মুখে কফি গিলতে থাকল। বলল, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এই পথ ধরেই আর এনজিন—রুমে আসব না। আপনি দয়া করে কাপ্তানকে শুধু কিছু বলবেন না। আমি সব করব। আপনি যা বলবেন সব করব। সে কেমন আড়ষ্ট গলায় এইসব বলে দরজা খুলে বের হয়ে গেল। কারও দিকে তাকাল না। সোজা ফোকসালে গিয়ে বাংকে শুয়ে ভয়ংকর অপমানবোধে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকল।

চেরি বাংকেই চুপ করে বসে থাকল। সুমিত্রর পায়ের শব্দও একসময় মিলিয়ে গেছে। পোর্টহোলের কাচে এখন আর কোনো প্রতিবিম্ব ভাসছে না। এতক্ষণ এই কেবিনে সুমিত্রর চোখ মৃত এবং সাদা ছিল, এতক্ষণ চোখ দুটোতে যেন নিঃসঙ্গ ভূতের আতঙ্ক—এইসব ভেবে চেরি নিজের উপরই বিরূপ হতে থাকল। সে সুমিত্রকে কোনো কৌশলেই যেন আয়ত্তে আনতে পারছে না। অথচ দু'দিনের দেওয়ানি চেরিকে যখন এই কেবিনে মৃত্যুর মতো আতঙ্কিত করে রেখেছিল, তখন পোর্টহোলের কাচে কোনো এক যুবকের চঞ্চল চোখ, জীবনের প্রতীক যেন... যেন দর্পণ—তাকে নিয়ত রাজকন্যার মতো করে রেখেছে। ঠাকুরমার গল্পের স্মৃতি এই কেবিনে কোনো এক যুবকের শরীরে রূপ পাচ্ছিল—রাজপুত্র, কোটালপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, এক রাজ্য আক্রমণ করে অন্য রাজ্যে, কত গাছ, কত পাখ—পাখালি কত বন—বাদাড় অতিক্রম করে যাচ্ছে—আহা, ভারতবর্ষের রাজপুত্রেরা ঘোড়ায় চড়ে একদা রাজকন্যা খুঁজতে বের হত, গল্পে রাজপুত্রের চোখ যেমত এই বয়স পর্যন্ত অনুসরণ করেছে চেরিকে—এই কেবিনে সেই চোখ, সেই রাজপুত্র এতক্ষণ ক্লান্ত ঘোড়ার মতো পা ঠুকে ঠুকে নিঃশেষ হয়ে গেল। চেরি উচ্চারণ করল—বেচারি!

বস্তুত টুপাতি চেরি শৈশবের রূপকথার রাজপুত্রের চোখকেই যেন পোর্টহোলে প্রত্যক্ষ করেছিল। দেওয়ানিতে মাথা তুলতে পারছে না, শরীরে ভীষণ ব্যথা, বমি বমি ভাব এবং সারাদিন বাংকে পড়ে থাকা, সে—সময় পোর্টহোলের ঘন কাচে সুমিত্রর চোখ দুটোই এক অসামান্য রূপকথার রাজত্ব, সুখ এবং আনন্দ এই কেবিনে পৌঁছে দিয়ে গেছে। ঠাকুরমার কোলে শুয়ে রাজপুত্রের গল্প শুনতে শুনতে চেরি ঘুমিয়ে পড়ত, যে রাজপুত্রের চোখ দুটো জীবনের এতদিন পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে আসছে, পোর্টহোলে সহসা সেই চোখ দুটোকে যেন আবিষ্কার করেছে চেরি এবং প্রত্যক্ষ করেছে।

রাত্রিবেলায় সুমিত্র ওয়াচে নামার সময় অন্য পথ ধরে গেল।

ওয়াচ থেকে উঠে আসবার সময় কসপ বলল, কাজ রাজকন্যা তোমাকে কী বলল সুমিত্র?

সুমিত্র জবাব দিল, আমার দেশ কোথায়, কী নাম—এইসব নানারকমের কথা। সব মনে নেই।

সাহেবদের ফেলে তোমার দিকে এমন নজর!

কী করি! রাজকন্যার মর্জি বোঝা দায়।

বিকাল বেলায় সুমিত্র দেখল চেরি বোট ডেকে বসে আছে। কাঁটা দিয়ে উল বুনছে। পাশে ছোট মালোম বসে—নিশ্চয়ই গল্প করছেন। ডেক—অ্যাপ্রেন্টিসরাও সেখানে আছে। বেশ গুলজার বলতে হবে। সে পিছিলের ছাদের নিচ থেকে সব দেখল। রঙিন কাগজের মতো মখমলের পোশাক চেরির সমস্ত শরীরে জড়ানো। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত গাউনের শেষ প্রান্ত ঝুলছে। চুলের গুচ্ছ বুফা কায়দায় জড়ানো। ঘাড়ের মসৃণ ত্বক, কমলা রঙের রোদ, কালো মেঘবরণ চুল এই সমুদ্রের নীল নির্জনতাকে ভেঙে দিচ্ছে। সুমিত্র গ্যালিতে ঢুকে, গ্যালির জানালা দিয়ে আড়ালে চেরিকে দেখতে থাকল। অন্যান্য জাহাজিরাও সেখানে এসে ভিড় করছে। ওর এই ভিড় ভালো লাগছে না। ওর মনে হল ফের জাহাজি নিঃসঙ্গতা ওকে জড়িয়ে ধরছে। এই মনোরম বিকেল, কমলা রঙের রোদ এবং ছোট মালোমের উপস্থিতি কেন জানি তাকে কেবল পীড়া দিচ্ছে। সে গ্যালি থেকে বের হয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে ফোকসালে ঢুকে বাংকে শুয়ে পড়ল। এক অহেতুক ঈর্ষার জন্ম হচ্ছে মনে। সে বাংকে শুয়ে চেরির অসামান্য রূপে দগ্ধ হতে থাকল।

কাপ্তান—বয় ছুটতে ছুটতে এসে বলল, সুমিত্র, আবার যে ডাক পড়েছে পাঁচ নম্বর কেবিনে।

সুমিত্র বলল, কেন, চেরি তো বোট—ডেকে বসে আছে দেখে এলাম।
এখন আর নেই। কেবিনে ঢুকেই বলছে, সুমিত্রকে আসতে বল।
কী ফ্যাসাদে পড়া গেল চাচা!
কোনো ফ্যাসাদ নেই। আল্লাতায়লায় ভরসা রাখ। খুশি হয়ে চলে যাও।
কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে সুমিত্র প্রথমে অনুমতি নিল, পরে ঘরে ঢুকে ডানদিকের বাংকে বসল। চেরি সুমিত্রর জন্য প্রতীক্ষা করছিল এমন ভাব চোখে—মুখে। সে—ও সুমিত্রর পাশে বসে পড়ল এবং বলল, জাহাজে কত দিন ধরে কাজ করছ?
এই নিয়ে দু'সফর।
যাত্রী—জাহাজে কোনোদিন চড়নি?
না মাদাম।
তাই তুমি জানতে না অন্যের কেবিনে কখনও উঁকি দিতে নেই।
পোর্টহোল দিয়ে কেবিন অস্পষ্ট বলে আমিও আপনার কাছে অস্পষ্ট—এই ভেবেছি। আপনি ঘরের অন্ধকারে পড়ে থাকতেন, আমি বাইরের আলোতে থাকতাম। সে কথাটা তখন আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি।
তবে বল আমাকে দেখার জন্য চুরি করে উঁকি দিতে?
সুমিত্র মাথা নিচু করে রাখল আগের মতো।
হুঁ এ তো ভালো কথা নয়, সুমিত্র।
সুমিত্র মাথা তুলছে না। সুমিত্রর চোখে—মুখে ফের অপরাধবোধ জেগে উঠছে।
এইসব জাহাজে তোমার কাজ করতে ভালো লাগে?
না মাদাম। কাজ করতে ভালো লাগে না।
তোমার দেশ ভারতবর্ষ, কত বিরাট আর কত অসামান্য দেশ!
আজ্ঞে, মাদাম।
ঠাকুমার কাছে তোমার দেশের রাজপুত্রদের গল্প শুনেছি। সমুদ্রের ধারে ঠাকুমা আমাদের তোমার দেশের রূপকথার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন। এইসব কথা বলে চেরি উত্তেজিত হল অথবা কেমন উত্তেজিত দেখাল চেরিকে। চেরি বলল, চিফ—এনজিনিয়ারের কথায় তোমার কিন্তু প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।
কোন কথায় মাদাম?
তোমাদের সস্তায় নেওয়া হয়। যেন অনেকটা গোরু—ভেড়ার মতো ভাব।
ওঁরা তো ঠিকই বলেছেন মাদাম। আমরা তাঁদের কাছে—
এইসব লোকদের আমি ঘৃণা করি।
সুমিত্র এবার কথা বলল না। সবকিছুই রহস্যময় মনে হচ্ছে। চেরির সকল কথাই কেমন অসংলগ্ন। সুমিত্র বুঝল না চেরি যথার্থ কাকে ঘৃণা করছে। সুতরাং সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল এবং চেরির অসামান্য রূপে বিহ্বল হতে থাকল।
আমি কাপ্তানকে ধমক দিতে পারতাম। কিন্তু দিইনি। এতে তোমাদের আরও বেশি অপমান করা হবে। একটু থেমে চেরি ফের বলতে থাকল, কাপ্তান এবং চিফ—এনজিনিয়ার আমাকে এনজিন—রুমের সবকিছু দেখালেন। তোমাদের দেখালেন, যেন তোমাদের বাদ দিলে এনজিনের নাট বল্টু বাদ যেত।
মাদাম, আমরা নাবিক। এর চেয়ে বড় অস্তিত্বের কথা ভেবে আপনি অযথা কষ্ট পাবেন না।
তার চেয়ে বড় কথা তুমি ভারতবর্ষের ছেলে। গৌতম বুদ্ধ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন।
আপনি দেখছি ভারতবর্ষের প্রতি খুব অনুরক্ত।

আমি একটি মহান জাতির প্রতি অনুরক্ত। এখন চেরিকে দেখে মনে হচ্ছে সে এই মুহূর্তে জাহাজে বিপ্লব শুরু করে দিতে পারে।

আমি উঠি মাদাম। ওয়াচের সময় হতে বেশি দেরি নেই।

যেন চেরি শুনতে পেল না, যেন খুব অন্যমনস্ক। চেরি আবেগের সঙ্গে বলতে থাকল, সুমিত্র, আমিও ভারতবাসী। আমার পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষ থেকে বাণিজ্য করতে এসে এই সকল দ্বীপে থেকে গেল। আর ফিরল না। তোমাকে দেখে আমি তবে খুশি হব না, তোমার অপমানে আমি আমার অপমান ভাবব না?

সুমিত্র ফের স্মরণ করিয়ে দিল তার ওয়াচের সময় হয়ে গেছে। অথচ চেরি এতটুকু কর্ণপাত করছে না কথায়। এবং সেজন্য সুমিত্র চেরির সকল কথারû ভিতর নষ্ট—চরিত্রের লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছে। এই বিষণ্ণ আলাপ সুমিত্রকে চেরি সম্বন্ধে আদৌ কোনো কৌতূহলী করছে না। সুমিত্র মৃত চোখ নিয়ে বসে থেকে সকল কিছুকে বিরক্তিকর ভেবে পোর্টহোলের কাচে ঠান্ডা হাওয়ার গন্ধ নিতে সহসা উঠে দাঁড়াল।

সুমিত্র চলে যাচ্ছে। দরজায় এক পা রেখে দেখল চেরি কথাবার্তায় এখন নরম এবং সহজ হয়ে উঠছে। চেরির মুখ প্রসন্নতায় ভরা। যেন প্রগাঢ় স্নেহ এই জাহাজি মানুষটির জন্য সে লালন করছে। সুমিত্র নির্ভয়ে দরজা টেনে দিতে শুনল, চেরি ভিতর থেকে বলছে, ঠাকুমা আমাদের সকলকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। ভারতবর্ষের রাজপুত্রদের গল্প করতেন। ভয় অথবা বিষণ্ণতা এ—কদিন ধরে সুমিত্রকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, চেরির শেষ আলাপ, প্রগাঢ় স্নেহবোধ সুমিত্রকে নূতন জীবন দান করছে। সে ডেকের উপর দিয়ে প্রায় ছুটে এল। হালকা শিস দিল ফোকসালে নামার সময়।

চেরি বাংকে বসে থাকল। ভয়ানক একঘেয়ে এই সমুদ্রযাত্রা—চেরি ঠাকুমার স্মৃতি মনে করল। সেই সব রাজপুত্রদের ঘোড়াসকলকে মনে করল। অথবা রাক্ষসের প্রাণ রুপোর কৌটায় সোনার ভ্রমরে... যেন পা ছিঁড়ছে হাত ছিঁড়ছে—রাক্ষসটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে... চেরি এই কেবিনে উঠে দাঁড়াল। অথবা নির্জন দ্বীপে রাজকন্যা নিদ্রিত, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে ছুটছে... চেরি ঠাকুমাকে স্মরণ করতে পেরে এইসব ভাবল। সেইসব মনোরম বিকেলের কথা তার মনে হল। যেন সুমিত্রকে দেখেই সে তার কৈশোর—জীবনের কথা মনে করতে পারছে। বিকালের সমুদ্র পাহাড়ের ধারে, ছোট ছোট মাছেরা খেলছে। সমুদ্রের ধারে ওরা ছুটোছুটি করছে। নারকেল গাছের ছায়ায় ঠাকুমা ভারতবর্ষের দিকে মুখ করে বসে আছেন, যেন যথার্থই তিনি ভারতবর্ষকে, তাঁর পিতৃপুরুষের দেশকে, দেখছেন। তখন অ্যান্টনি নারকেল গাছ থেকে ডাব কেটে দিচ্ছে সকলকে। ওরা বালিয়াড়িতে ছুটে ছুটে ক্লান্ত। ওরা ডাবের জল খেতে খেতে ঠাকুমার পাশে বালির উপর শুয়ে পড়ল। তখন সমুদ্রে সূর্য ডুবছে। নির্জন পাহাড়ি দ্বীপে কচ্ছপেরা ডিম পেড়ে গেল এবং ঠাকুমা তাঁর ঠাকুমার—মতো—রূপকথার গল্প আরম্ভ করে চেরির মুখ টিপে বলতেন, তোর জন্য ভারতবর্ষ থেকে এক টুকটুকে রাজপুত্র ধরে আনব। চেরির সেই কৈশোর মন ঠাকুমার কথা যথার্থই বিশ্বাস করে এক রঙিন স্বপ্নে ঠাকুমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ত।

চেরি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পোর্টহোলের কাচ খুলে দিল। পর্দা তুলে দিল, অথচ সেই চোখ দুটোকে আর খুঁজে পেল না। যতক্ষণ সুমিত্র এই বাংকে বসে ছিল, যতক্ষণ গল্প হল, পোর্টহোলের চঞ্চল চোখ দুটোর গোপনীয় ভাব সুমিত্রর চোখে—মুখে ফিরে এল না। কেমন নিষ্প্রভ, কেমন পাথরের মতো চোখ নিয়ে এতক্ষণ ওর কেবিনে বসে থাকল সুমিত্র। সুতরাং সকল দুঃখকে ভুলে থাকবার জন্য পোর্টহোলের পাশে দাঁড়িয়ে ভায়োলিনটা বাজাতে থাকল চেরি। উপরে নিচে, সামনে পিছনে শুধু নিরবচ্ছিন্ন আকাশ, শুধু নীল সমুদ্র এবং মনে হল সমুদ্রে রূপকথার রাজপুত্রেরা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। এবং সেই সব দ্বীপপুঞ্জের অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকদের চেরি পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে দেখল ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্রে সুমিত্রর সমানে সমানে ছুটতে পারছে না। জীবনের প্রথম লগ্নে ভারতবর্ষের এক সুপুরুষ যুবাকে, যুবার কোমল চোখ দুটোকে পরম অপার্থিব বস্তু ভেবে চেরি কেমন প্রীত হতে থাকল। চেরি সেই দিঘির (ঠাকুমার বর্ণিত রূপকথা) সিঁড়িতে সুমিত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। যেন রাজপুত্র কোটালপুত্র নামছে, নামছে। মানিকের আলোয় দিঘির সিঁড়ি

ধরে রাজকন্যার দেশে নামছে। নিঝুম পুরী, কোনো শব্দ নেই। লোক নেই, প্রাণী নেই, পাখি নেই, নিঃশব্দ ভাব। সোনার গাছ। গাছে হীরা—পান্নার ফল। সোনার ঝরনা, সোনার পাখি। একই গাছের ডালে নাচ এবং গান। রাজপুত্র গান শুনতে শুনতে নাচ দেখতে দেখতে সদর দেউড়ি পার হয়ে সাত দরজা ডাইনে ফেলে অন্দরের চাবিকাঠিতে হাত বুলাল। এখানে ছোট নদী বইছে—সুবর্ণরেখা নদী। নদী ধরে পদ্ম ভাসছে—কখনও হীরা, কখনও মাণিক্যের। এবং রাজপুত্র চন্দনকাঠের পালঙ্কে রাজকন্যাকে দেখল। এইসব গল্প শুনে টুপাতি চেরি বলত, আমরা কোনোদিন ইন্ডিয়ায় যাব না ঠাকমা?

ঠাকুমা বলতেন, বড় হলে, যাবে। দেখবে তখন কত রাজপুত্র তোমাদের খুঁজতে বের হয়েছে।

চেরি যেন এই বয়স পর্যন্ত কোনো রাজপুত্রকে অনুসন্ধান করতে করতে সহসা পোর্টহোলের কাচে তাকে আবিষ্কার করেছে।

ছোট বড় ঢেউ উঠছে সমুদ্রে। দূরে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডলফিনরা, ফ্লাইং—ফিসের ঝাঁক বর্শার মতো ছুটে আসছে জাহাজের দিকে। দুটো—একটা দ্বীপ, দুটো একটা আগ্নেয়গিরি আকাশ লাল করছে। দ্বীপে ছোট ছোট পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। জলে, লাল নীল হলুদ রঙের মাছ। তখন সূর্য উঠছে।

আবার বিকাল। সূর্য পাটে বসেছে। পোর্টেহোলের ঘন কাচে কোনো চোখ ধরা দিচ্ছে না। টুপাতি দেখল, সুমিত্র আর অ্যালওয়ে ধরে এনজিনে নামছে না। অথবা এনজিন—রুম থেকে উঠে আসছে না। অভিমানে টুপাতির চোখে জল আসতে চাইল।

সেই বিকালে ছোট মালোম এসে বললেন, আসুন, আমরা একসঙ্গে চা খাই।

চেরি বলল, ক্ষমা করবেন মিস্টার। আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

পরদিন ডিনার—পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেন কাপ্তান। বললেন, আজ আপনি আমাদের গেস্ট। আমরা সকলে একসঙ্গে ডাইনিং—হলে খাব।

চেরি বলল, বেশ হবে।

বুড়ো কাপ্তান উঠলেন। চেরি ফের প্রশ্ন করল, আর ক'দিন বাদে বন্দর ধরবে ক্যাপ্টেন?

তিনি কী হিসাব করে একটি তারিখের উল্লেখ করলেন এবং কাপ্তান কী ভেবে ফের বললেন, সন্ধ্যায় ডাইনিং—হলে, একটু নাচ—গান হোক—এই আমার ইচ্ছা।

বেশ হবে।

আপনি অংশগ্রহণ করলে বাধিত থাকব।

অংশগ্রহণ করব।

ভারতীয় জাহাজিটি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করছে? কাপ্তান কথাপ্রসঙ্গে যেন এই কথাগুলো বললেন।

কোথায় করছে! চেরি এই বলে বড়ো বড়ো হাই তুলল।

ছোঁড়া ভারী বেয়াদপ দেখছি!

ভয়ানক। আবার হাই তুলল চেরি।

দাঁড়ান, ঠিক ব্যবস্থা করছি।

তা করুন। সে কেবল হাই তুলতে থাকল।

এবার আমি আসি।

আচ্ছা।

তখন ঘড়িতে সাতটা বাজল। আটটা—বারোটা ওয়াচের জাহাজিরা বোট—ডেকে উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ওরা ফানেলের পাশ দিয়ে স্টোকহোলডে নেমে যাবে এমন সময়ে কাপ্তান—বয় ছুটে এল। বলল, সুমিত্রকে বাড়িয়ালা তাঁর কেবিনে ডাকছে।

সুমিত্র এই ডাকে ভীত অথবা সন্ত্রস্ত নয়। চেরির চোখে যে স্নেহ দেখেছিল, নিশ্চয়ই তা বেইমানি করতে পারে না। অন্য কোনো কারণ অথবা সারেঙের কানভারী কথা—এমন সব ভেবে সে অ্যাকোমোডেশান ল্যাডার ধরে ব্রিজ অতিক্রম করে কাপ্তানের ঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা খোলা ছিল বলে কাপ্তান তাকে দেখতে পাচ্ছে। কাপ্তান যে চার্ট—রুমে কোনো মানচিত্র দেখছে এমন চোখে সুমিত্রকে দেখে দেখে একসময় বলল, তুমি এই জাহাজে কোল—বয়ের চাকরি করতে?

ইয়েস মাস্টার।

আমি তোমাকে ফায়ারম্যান করেছি?

ইয়েস স্যার।

তারপর ইফাতুলা কার্ডিফে নেমে গেল বলে তুমি গ্রিজার হলে?

ইয়েস স্যার।

ইয়েস, স্যার, ইয়েস স্যার! বেয়াদপ পাজি, ন্যাস্টি হেল! কাপ্তান চিৎকার করতে থাকলেন।

সুমিত্র নিচের দিকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। সুমিত্র বুঝতে পারছে না। ওর বেয়াদপি কোথায় এবং কখন ঘটেছে। তবু স্বীকার করাই ভালো। নতুবা কাপ্তান এখনই লগ—বুক এনে খচ খচ করে হয়তো লিখবেন—সুমিত্র, অ্যান ইন্ডিয়ান সেলর ডাজ নট ক্যারি আউট হিজ জব। সে বলল, ইয়েস মাস্টার, আর কোনোদিন বেয়াদপি হবে না।

তাহলে কোনোদিন বেয়াদপি করবে না বলছ?

না মাস্টার, কোনোদিন করব না।

ফের কোল—বয় হবার যদি ইচ্ছা না থাকে, চেরিকে যথাযথ সম্মান দেখাবে।

সুমিত্র ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর কাপ্তানের কথামতো যখন ব্রিজ পার হয়ে সিঁড়ি ধরে বোট—ডেকে নেমে এল, যখন দেখল সকল জাহাজিরা নেমে যাচ্ছে স্টোকহোলডে, তখন উত্তেজনায় অধীর হতে হতে সে বাংলায় অশ্লীল সব কথাবার্তা বলল চেরিকে উদ্দেশ্য করে এবং এসময় তার একটু মদ খাবার শখ জাগল।

বিকেলবেলা চেরির ঘরে ডাক পড়তেই সুমিত্র তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। এক মুহূর্ত দেরি করল না, অথবা সাজগোজের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াল না। সে অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখল চেরি ভয়ানক ভাবে সাজগোজ করে বসে আছে। কোলের উপর ভায়োলিন। প্রসাধনের তীব্র তীক্ষ্ন ভাব সুমিত্রকে যেন সুচতুর যৌনবিলাসী হতে বলছে। চেরিকে সে দেখল। মখমলের পোশাক দেখল এবং নগ্ন ভঙ্গিতে বসে ঠোঁটে বিদ্যুৎ খেলতে দেখল। চিবুকে ভাঁজ পড়েছে—পায়ের ভাঁজে ভাঁজে কেমন আড়ষ্ট ভঙ্গি।

সুমিত্র চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, কোনো কথা বলল না।

এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোস।

সুমিত্র কোথায় বসবে ঠিক করতে পারল না।

ডেক—চেয়ারটাতে বোস সুমিত্র।

সুমিত্র খুব আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসল।

অমন পুতুল—পুতুল ভাব কেন? কোনো সজীবতা নেই চলাফেরাতে। কেবিনে ঢোকবার আগে পোর্টহোলের চোখ দুটো কোথায় রেখে আসো?

আমাকে ক্ষমা করবেন মাদাম। সেই চোখ দুটো কিছুতেই আর সংগ্রহ করতে পারছি না।

কেন, কেন পারছ না?

আজ্ঞে, কাপ্তান অযথা ধমকালেন।

চেরি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অযথা হো হো করে হেসে উঠল, আচ্ছা কাপ্তানের পাল্লায় পড়েছ।

ইয়েস মাদাম। আপনি কিন্তু ও—কথা আবার কাপ্তানকে বলবেন না।

কাপ্তানকে তুমিও কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারলে না?

সুমিত্র জিভ কাটল।— তা হয় না মাদাম। আমাদের কাপ্তান খুব ভালো লোক। অন্য জাহাজের কাপ্তান ভারতীয় জাহাজিদের সঙ্গে সাধারণত কোনো কথাই বলেন না। সব সারেঙের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। অথচ আমাদের প্রিয় কাপ্তান সকল জাহাজিদের নাম জানেন। তাছাড়া নাম ধরে ডেকে ভালোমন্দ জিজ্ঞাসা করেন। আমি কিছু ইংরেজি জানি বলে তিনি খুব খুশি আমার উপর। এই জাহাজে কোলবয় হয়ে উঠেছি, তাঁর দয়ায় এখন আমি গ্রিজার। জাহাজিদের এর চেয়ে বড় উন্নতি এত অল্প সময়ে হয় না।

তবে বলতে হয় কাপ্তান তোমাকে খুব ভালোবাসেন?

হ্যাঁ মাদাম।

আমি ভায়োলিন বাজাই, কই, কোনোদিন তো বললে না আপনার বাজনা শুনতে ইচ্ছা হয়, ভালো লাগে?

কথার আকস্মিক পরিবর্তনে সুমিত্র ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, সাহসে কুলায় না মাদাম।

সাহসে কুলায় না, না ইচ্ছা হয় না?

সুমিত্র এবার জিভ কাটল। চোখে পোর্টহোলের প্রতিবিম্ব ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠেই ফের মিলিয়ে গেল। —যদি অভয় দেন তো বলি।

সুমিত্র আবার ভাবল কোনো বেয়াদপি করে ফেলছে না তো? সে বলল, না থাক মাদাম।

কেন থাকবে? তুমি বলো। অভয় দিচ্ছি।

সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় আপনার বাজনা শুনেছি, দিঘির পারে উইলোগাছের ছায়ায় বসে রোজ বিকেলে ভায়োলিন বাজাতেন।

তুমি লুকিয়ে এতসব করতে?

কিছু মনে করবেন না মাদাম। আমরা সেলার। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর বন্দরে এলেই একটু বৈচিত্র্য খুঁজি। কেউ মদ খায়... কেউ...। চুপ করে গেল সহসা।—না থাক।

চেরি খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, ডাইনিং—হলে নাচগান হবে। তুমি এসো।

সুমিত্র জবাব দিল, সে হয় না, মাদাম। জাহাজিদের অতদূর যাবার সাধ্য নেই।

চেরি বলল, আমি যদি কাপ্তানকে অনুরোধ করি?

মাদাম, আপনি জাহাজে আর চার—পাঁচ দিন আছেন। আপনি নেমে গেলে সব জাহাজিরা, সব অফিসাররা আমাকে ঠাট্টা—বিদ্রুপ করবে।

চেরি চুপ করে থাকল। অন্যমনস্কভাবেই ছড় চালাল ভায়োলিনের তারে। এই সুর সুমিত্রর সেই পরম অপার্থিব চোখ দুটিকে যেন খুঁজছে।

ছোট মালোম এলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সেই শব্দে সুমিত্র উঠে দাঁড়াল।—আমি তবে আসি মাদাম।

বোস। ছোট মালোমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যাচ্ছি। একটু দেরি হবে। চেরি এবার সুমিত্রকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি রোজ এই পথ ধরে নামবে সুমিত্র, কথা দাও।

আপনি দুঃখ পাবেন মাদাম। আমার চোখ দুটো ফের বেইমানি করতে পারে।

না, কথা দাও।

এই পথ ধরেই নামব। কথা দিলাম।

চেরি বসে ছিল চুপচাপ। সুমিত্র চলে গেছে। ছোট মালোমও চলে গেছেন। সে ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজার দেরি নেই। সে বাংক থেকে নেমে জামাকাপড় বদলাল। সে তার দামি ইভনিং—পোশাক পরে আয়নায় প্রতিবিম্ব ফেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। এ—সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। চেরি প্রশ্ন করল, কে?

আমি, ক্যাপ্টেন স্মিথ।

হয়ে গেছে আমার। আমি যাচ্ছি। বলে চেরি বেহালা হাতে বের হল। কাপ্তানের সঙ্গে চলতে থাকল। ওরা ডাইনিং—হলের দিকে যাচ্ছে। যে সকল অফিসারদের, এনজিনিয়ারদের ওয়াচ নেই তারা পূর্বেই নির্দিষ্ট স্থানে বসে আছে। চেরি ঢুকলে সকলে উঠে সম্মান দেখাল চেরিকে। মালবাহী জাহাজের ছোট ডাইনিং—হল, অল্প পরিসরে কয়েকজন মাত্র পুরুষ। ঘরে নীল আলো। বাটলার, কাপ্তানের আদেশমতো এই ছোট্ট ঘরটিকে বিচিত্র সব রঙিন কাগজে এবং বিভিন্ন রকমের চেয়ার—টেবিলের জেল্লায় জৌলুস বাড়াবার চেষ্টা করেছে। চেরি কেমন খুঁতখুঁত করতে থাকল।

কাপ্তান একটু ইতস্তত করে বলল, সমুদ্রের দিনগুলোতে কোনো আনন্দ নেই। মাদাম। সুতরাং স্বল্প আয়োজন থেকেই যতটা আনন্দ নিতে পারি।

আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি কাপ্তান। সেটা আপনাকেও ভেবে দেখতে বলি।

বলুন।

এই ছোট্ট ঘরে না হয়ে খোলা ডেকে ভালো হয় না?

কাপ্তান এবারও একটু ইতস্তত করল।— আপনি সব জাহাজিদের এ আনন্দে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন?

মন্দ কী! আমার কিন্তু মনে হয় সেই ভালো হবে। ডেকে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। সমুদ্রে ঢেউ নেই। এমন সুন্দর দিন...।

তাই হবে।

সুতরাং চার নম্বর এনজিনিয়ার দৌড়ে গেল ডেকে। ডেকের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়, ড্যারিকে, মাস্টে সবুজ—লাল—নীল আলো জ্বেলে দিল। সতরঞ্চ পেতে সকল জাহাজিদের বসতে বলা হল। তারপর কাপ্তান নিজেই বলতে থাকলেন, আমাদের মাননীয়া অতিথি মিস টুপাতি চেরির সম্মানার্থে এই আনন্দের আয়োজন। আমাদের সমুদ্রের দিনগুলো ভয়ানক নিঃসঙ্গ। সুতরাং সকলেই আজ খোলা মনে আনন্দ করব। এবং এই সম্মানীয়া অতিথির প্রতি নিশ্চয়ই অশালীন হব না।

অফিসারদের জন্য কিছু চেয়ার, কাপ্তান একপাশে এবং তার ডাইনে রেলিংয়ের ধারে চেরি বসল। সমুদ্রে ঢেউ নেই বলে জাহাজ বিশেষ দুলছে না। একটু একটু শীত লাগছে। সকল জাহাজিরা চারপাশে বসে আছে। চেরি সহজ হয়ে দাঁড়াল, প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, আমরা আজ সকলে পরস্পরের বন্ধু। আসুন, আমরা আজ সকলে একসঙ্গে ঈশ্বরের প্রার্থনা করি। এই কথায় সকলে উঠে দাঁড়াল। ওরা প্রার্থনার ভঙ্গিতে আকাশ দেখতে থাকল।

তারপর ছোট মালোম চেরির অনুমতি নিয়ে গান গাইলেন, লেটস লাভ মাই গার্লফ্রেন্ড অ্যান্ড কিস হার...।

মেজ মিস্ত্রি তাঁর ছোট্ট ক্যানারি পাখিটা খাঁচাসহ টেবিলের উপর রাখলেন। শিস দিয়ে পাখিটাকে নানা রকমের অঙ্গভঙ্গিতে নাচালেন। সকলে হেসে গড়াগড়ি দিল।

কাপ্তান কীটসের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন সকলকে।

একটু বাদে এলেন জাহাজের মার্কনি সাব। মুখোশ পরে চারিধারে বিজ্ঞ ব্যক্তির মতো ঘুরে বেড়ালেন কিছুক্ষণ। হাতের লাঠিটা মাঝে মাঝে ঘোরাচ্ছেন, তিনি যেন কী খুঁজছেন, অথবা কী যেন তাঁর হারিয়ে গেছে। শেষে কাপ্তানের কাছে এসে বললেন, দিস ম্যান, মাই ফ্রেন্ড, দিস ম্যান ইজ দি রুট অফ অল ইভলস। সুতরাং আসুন, ওকে খতম করে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে যাই। বলে তিনি তাঁর লাঠিটা কাপ্তানের মাথায় তুলে ফের নামিয়ে আনলেন, না, মারব না। নোবেল কমিটির শান্তি পুরস্কারটা আমার ভাগ্যে ফসকে যাক—সেটা আমি চাই না। এবং দুঃখে দুটো বড় হ্যাঁচ্চো দেওয়া যাক। তিনি বড় রকমের দুটো হ্যাঁচ্চো দিলেন। লাঠিটা আপনারা নিয়ে নিন, বলে ক্লাউনের কায়দায় লাঠিটা ছুড়ে মেরে ফের ধরে ফেললেন। এবারও সকলে না হেসে পারল না।

এনজিন—রুমে যাদের ওয়াচ ছিল, তারা উপরে উঠে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে যাচ্ছে। সুমিত্র সকলের পিছনে বসে আছে। ব্রিজে ঘণ্টা বাজল। এখন সাতটা বাজে। সুতরাং আর আধঘণ্টা এখানে বসে থাকা যাবে। সুমিত্র উঠি—উঠি করছিল, এ সময় চেরি বলল, এবার সুমিত্র আমাদের একটু আনন্দ দিক।

কাপ্তান বললেন, সুমিত্র গান গাইবে।

স্যার, আমাদের গান আপনাদের ভালো লাগবে না।

না সুমিত্র, ঠিক কথা বলছ না। আমরা এখানে কেউ সংগীতজ্ঞ নই। শুধু একটু আনন্দ—সে যেমন করে হোক। একটু আনন্দ, আনন্দ কর।

সুমিত্র একটি সাধারণ রকমের বাংলা গান গেয়ে শোনাল।

এ সময় ডেক—অ্যাপ্রেন্টিস এল পায়ে খড়খড়ি লাগিয়ে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে অথবা শুয়ে বসে নাচল। এবং শেষে চেরি ওর দীর্ঘদিনের অভ্যাসকে বেহালার তারে মূর্ত করে তুলে সকলকে আনন্দ দিল।

তারপর রাত নামছে, ডাইনিং—হলে কাঁটা—চামচের শব্দ। সেখানে বাটলার এবং অন্যান্য বয়সকল ছুটোছুটি করে পরিবেশন করল। সকলে মদ খেল অল্পবিস্তর। চেরি মদ খেয়ে মাতাল হল আজ।

রাত দশটা বেজে গেছে। চেরি নেশাগ্রস্ত শরীরে কেবিনের ভিতর ডেকচেয়ারে বসে আছে। সুমিত্র সকলের পিছনে চুপচাপ বসে ছিল। উইংস থেকে একটি আলোর তির্যক রেখা এসে ওর চোখে পড়েছে। চেরি ক্ষণে ক্ষণে সুমিত্রকে দেখছিল। দুটি পরস্পর গোপনীয় দৃষ্টি ঘনিষ্ঠ হতে হতে এক সময় লজ্জায় আনত হল। সে কেবিনে ঢুকে পোর্টহোলের পর্দা সরিয়ে দিল। ঘুম আসছে না। এ সময় সুমিত্রকে ডেকে পাঠালে হত।

বয়, বয়! দরজায় পায়ের শব্দে চেরি উঠে গেল এবং দরজা খুলে দিল! শরীর টলছে।— বয়, আজ সুন্দর রাত। বয়, তোমার বাড়িতে কে কে আছে? মাদাম, অনেক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়ুন। গেলাসে জল রেখে গেছি।

বয়, তুমি জানো আমি ভারতীয়?

জী, না।

জেনে রাখো আমি ভারতীয়। বড় দুঃখ হয়, আমরা আর সে দেশে যেতে পারব না। বয়, একটা কথা বলব তোমাকে। কিন্তু সাবধান, কাউকে বলবে না।

মাদাম, আপনার শরীর ভালো নেই। শুয়ে পড়ুন।

বয়, সুমিত্র কিন্তু রাজপুত্র হতে পারত। ওর চোখ, মুখ, শরীর সব সুন্দর।

মাদাম, সুমিত্র যে রাজার ঘরের ছেলে। ভাগ্য দোষে—

চেরি এবার কিছু বলল না। সে ধীরে ধীরে উঠে পোর্টহোলে মুখ রাখল।—তুমি যাও, বয়।

মাদাম, দরজাটা বন্ধ করে দিন। কাপ্তান—বয় বের হয়ে যাবার সময় এই কথাগুলো বলল।

চেরি পোর্টহোল থেকে যখন দেখল কাপ্তান—বয় ঘরে নেই, ওর পায়ের শব্দ অ্যালওয়েতে মিশে গেছে এবং যখন মনের উপর শুধু সুমিত্রই একমাত্র দৃশ্যমান তখন দরজা বন্ধ না করে নিচে এনজিন রুমে নেমে সুমিত্রর পাশে গিয়ে দাঁড়ানোই ভালো। চেরি দরজা খুলে বাইরে বের হল। এনজিন—রুমে নামার মুখেই দেখল সুমিত্র তেলের ক্যান নিয়ে উপরে উঠে আসছে।

এই যে, মাদাম!

সুমিত্র, তোমার ওয়াচ শেষ?

না মাদাম, পিছিলে যাচ্ছি, স্টিয়ারিং—এনজিনে তেল দিতে।

রাত এখন কত?

এগারোটা বেজে গেছে, মাদাম।

জাহাজে আর কারা এখন জেগে থাকে সুমিত্র?

অনেকে মাদাম। অনেকে। ব্রিজে ছোট মালোম, এনজিন—রুমে তিন নম্বর মিস্ত্রি, স্টোকহোলডে চারজন ফায়ারম্যান, তিনজন কোল—বয়, কম্পাস ঘরে কোয়ার্টার—মাস্টার, ফরোয়ার্ড পিকে কোনো ডেকজাহাজি।

তুমি এত কষ্ট করতে পারো সুমিত্র!

এখন তো কোনো কষ্টই নেই মাদাম। যখন কোল—বয় অথবা ফায়ারম্যান ছিলাম সে কী কষ্ট!

তুমি আমার ঘরে আসবে সুমিত্র?

আপনার শরীর ভালো নেই মাদাম। আমি আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছি। কারণ চেরির এই উচ্ছৃঙ্খল ভাবটুকু ভালো লাগছে না সুমিত্রর। সে চেরির অন্য কোনো অনুরোধ রাখল না। সে চেরিকে ধরে বলল, আসুন।

কোথায় সুমিত্র?

কেবিনে।

আমার ভালো লাগছে না।

ভালো না লাগলে তো চলবে না মাদাম।

তুমি কেবিনে বসবে, বলো?

বসব।

তোমার ফের ওয়াচ ক'টায়?

ভোর আটটায়।

চেরি কেবিনের দিকে না গিয়ে ডেকের দিকে পা বাড়ালে সুমিত্র বলল, এ তো আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি। রাতদুপুরে জাহাজিরা দেখলে বলবে কী?

কী বলবে সুমিত্র?

কী আর বলবে! আসুন। ধমকের সুরে কথাগুলো বলল সুমিত্র। তারপর জোর করে চেরিকে কেবিনে ঠেলে দিতেই শুনতে পেল—চেরি বলছে—ভালো হচ্ছে না সুমিত্র। আমি মাতাল বলে কিছুই বুঝতে পারছি না ভাবছ। কাল ঠিক কাপ্তানকে নালিশ করে দেব দেখ। আমার উপর জোর খাটালে ঈশ্বর সহ্য করবেন না।

ফের সুমিত্র নিজের অবস্থা বুঝে খানিক বিব্রত বোধ করছে। এমত ঘটনার কথা কাপ্তানকে বললে—তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন না। অথবা মনে হল বৃদ্ধ কাপ্তানকে খবর দেওয়া যায়—চেরি ডেকের অলিগলিতে ঘুরতে চাইছে। চেরি মদ খেয়ে মাতাল এবং চেরির এই সময় যৌনেচ্ছার বড় ভয়ানক শখ। কিন্তু দেখল যে রাত গভীর। ফরোয়ার্ড পিক থেকে ওয়াচ করে ডেক—জাহাজি হামিদুল ফিরছে। ওয়াচের ঘণ্টা বাজছে ব্রিজে। সুতরাং বৃদ্ধ কাপ্তানকে এ সময় ডেকে তোলা নিশ্চয়ই সুখকর হবে না। বরং কাপ্তান—বয়ের খোঁজে গেলে হয়, যথার্থ উপকার এসময় তবে হতে পারে। সে আরও কিছু ভাবছিল তখন চেরি ওর হাতটা পিছন থেকে খপ করে ধরে ফেলল। বলল, দোহাই সুমিত্র, আমাকে একা ফেলে যেও না। খুব ভয় করছে।

সুমিত্র ছোট মালোমের কথা মনে করতে পারল। প্রতিদিন ওয়াচের শেষে অথবা রাতের নিঃসঙ্গতায় ভুগে ভুগে এই দরজার ফাঁকে চোখ রাখার জন্য উপস্থিত ছোট মালোম। এই দরজায় হাত রেখে বলত, বোট ডেকে বড় সুন্দর রাত।

চেরি বলত, আমার শরীরটা যে ভালো যাচ্ছে না থার্ড।

আমরা এখন একটা নির্জন দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, মাদাম।

সেটা আমার দ্বীপের চেয়ে নিশ্চয় বেশি সুন্দর হবে না থার্ড।

চেরি কতদিন এমন সব কথা বলে প্রাণ খুলে হাসত।—তোমাদের থার্ড আচ্ছা বেহায়া! চেরি ভয়ানক টলছিল। সে এখন এক হাত বাংকে রেখে অন্য হাতে সুমিত্রের কলার চেপে বলছে, মাই প্রিন্স।

মাদাম, আপনি কীসব বলছেন!

আমি ঠিক বলছি সুমিত্র। আমি ঠিক বলছি। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও সুমিত্র, নতুবা আমি জোরে জোরে চিৎকার করব। বলব, প্রিন্স প্রিন্স। একশোবার বলব। সকলকে শুনিয়ে বলব। তুমি কী করবে? কী করতে পারছ?

ভয়ে সুমিত্র কাঠ হয়ে থাকল। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বলল, চুপ করুন মাদাম চুপ করুন। আপনার ঈশ্বরের দোহাই।

সুমিত্র দেখল কেবিনের পোর্টহোল খোলা। ফরোয়ার্ড পিকে কোনো জাহাজি যদি এখন এই সময় ওয়াচে যায়, চোখ তুলে দেখলে ওদের দুজনকে স্পষ্ট দেখতে পাবে। সে তাড়াতাড়ি পোর্টহোলের কাচ বন্ধ করতে গিয়ে দেখল—ক্যালেন্ডারটা উড়ছে। সে সন্তর্পণে পোর্টহোল দিয়ে কিঞ্চিৎ মুখ বার করে যখন দেখল কেউ এ—পথে আসছে না, বারোটা—চারটের পরীদাররা সব এনজিন রুমে নেমে গেছে এবং শেষ ওয়াচের পরীদারদের চিৎকার স্টোকহোল্ড থেকে উঠে আসছে তখন দ্রুত পোর্টহোলে কাচ এবং লোহার প্লেট উভয়ই বন্ধ করে দিয়ে চেরির মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল এবং বাংলায় বলল, বেশ্যা! তারপরের খিস্তি উচ্চারণ না করে মনে মনে হজম করে ফেলল। তবে অভ্যস্ত ইংরেজিতে উচ্চারণ করল, মাদাম, আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

বোস সুমিত্র।

সুমিত্র পূর্বে এ—কেবিনে যে সংকোচ নিয়ে যে ভয় এবং মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে বসত আজও তেমন দু'হাতের তালুতে মাথাটা রেখে কেমন অসহায় ভঙ্গিতে বসে থাকল। সে এ—মুহূর্তে কিছুই ভাবতে পারছে না। চার ঘণ্টা ওয়াচের পর ক্লান্ত শরীরটাকে যখন ফোকসালে নিয়ে যাবে ভাবছিল, যখন স্নান সেরে শরীরের সকল ক্লান্তি উত্তাপ দূর করবে ভাবছিল তখন চেরির এই মাতাল ইচ্ছা ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের মতো ক্রমশ ওকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

চেরি বলল, তুমি ইচ্ছা করলে স্নান সেরে নিতে পারো সুমিত্র।

সুমিত্র যেহেতু একদা এইসব কেবিনের দেয়াল সাবান—জল দিয়ে পরিষ্কার করেছে, যেহেতু ওর সব জানা... সুমিত্র সুতরাং উত্তর করছে না।

চেরি বাংক থেকে উঠে ওর পাশে বসল। বলল, মাই প্রিন্স। বলে সুমিত্রর কপালে চুমু দেবার জন্য ঝুঁকে পড়ল।

সুমিত্র উঠে দাঁড়াল এবং বলল, মাদাম, আপনি পাগল।

চেরির পা দুটো টলছে এবং চোখ দুটো তেমনি মায়াময়।

সুমিত্রর এই অপমানসূচক কথায় চোখ দুটো কেমন সজল হয়ে উঠল। নিচে এনজিনের শব্দ। আরও নিচে সমুদ্র অতল থেকে যেন ফুঁসছে। চেরি বলল, আমি ভারতবর্ষে যাব সুমিত্র। তুমি নিয়ে চলো। তুমি আমাকে ঘোড়ার পিছনে নিয়ে কেবল ছুটবে, ছুটবে—কোথাও পালিয়ে যাবে।

চেরির সেই রাজপুত্রের কথা মনে হল। সেই রাজকন্যার কথা মনে হল। রাজকন্যা স্বয়ম্বর সভা অতিক্রম করে দূরে দূরে চলে যাচ্ছে। ঝাড়লণ্ঠন পরিত্যাগ করে আঁধারের আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে। মুক্তোর ঝালর—দ্বারীরা হাঁকছে অথচ নিকটবর্তী কোনো জলাশয়ে প্রতিবিম্ব রাজপুত্রের। সকলের অলক্ষ্যে রাজপুত্র রাজকন্যার জন্য প্রতীক্ষা করছে। চেরির এইসব কথা মনে হলে বলল, তুমি পারো না সুমিত্র, তুমি আমাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে পারো না!

সুমিত্রকে উদাস দেখে ফের বলল, পারো না তুমি? আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না ভারতবর্ষে?

মাতাল রমণীকে খুশি করার জন্য সুমিত্র বলল, নিয়ে যাব।

তোমার দেশের গ্রাম মাঠ দেখব সুমিত্র!

সুমিত্র সহজভাবে কথা বলতে চাইল।—ফুল দেখবে না? পাখি দেখবে না?

ফুল দেখব, পাখি দেখব।

আমার দেশের আকাশ দেখবে না? আকাশ?

সাপ বাঘ দেখবে না? সাপ বাঘ? বিধবা বউ, যুবতী নারী? এইসব বলতে বলতে সুমিত্র কেমন উত্তেজিত বোধ করছিল। সে মরিয়া হয়ে যেন বলে ফেলল, আমি সব দেখাতে পারি। কিন্তু দেখাব না। তুমি নেশায় টলছ। নিজের সম্বন্ধে তুমি সচেতন নও, সুতরাং সব দেখালে অন্যায় হবে।

প্রথমটায় চেরি ধরতে না পেরে বলল, কী বললে? চেরির চোখ দুটো তারপর সকল ঘটনার কথা বুঝতে না পেরে ছোট হয়ে এল।—কাপুরুষ! চেরি সুমিত্রর মুখের কাছে এসে কেমন একটা থু শব্দ করে দরজার পাট সহসা খুলে দিল। গেট আউট, ইউ গেট আউট! এমন চিৎকার শুরু করল চেরি যে সুমিত্র পালাতে পারলে বাঁচে। সুতরাং সুমিত্র ছুটতে থাকল। সে ডেক ধরে ছুটে এসে পিছিলে উঠে দেখল পরীদারেরা সকলে যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। সে এইসব কথা গোপনে লালন করে দীর্ঘ সময় ধরে মেয়েটির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দুঃখ বোধ করল।

তখন চেরি পোর্টহোলের প্লেট খুলে দিল। কাচ খুলে দিল। সে শরীরটাকে বাংকে এলিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—এমন সময় দরজায় শব্দ, কড়া নাড়ছে কে যেন। ধীরে ধীরে এবং সন্তর্পণে। অথবা চোরের মতো। সে বুঝতে পারছে—কারণ চট করে শরীরের মাতাল ভাবটা কেটে গেছে পোর্টহোলের ঠান্ডা হাওয়ায় এবং নিজের বেলেল্লাপনার রেশটুকু ধরতে পেরে লজ্জিত, কুণ্ঠিত। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজার সামনে। বলল, কে?

আমি মাদাম।

আপনি কে?

আমি থার্ড।

আজ তো আকাশে নক্ষত্র নেই। আকাশে মেঘ দেখতে পাচ্ছি। এইসব কথার ভিতর চেরির মাতাল মন ধীরে ধীরে যেন সুস্থ হচ্ছে। এতক্ষণ প্রায় সে সকল বস্তুকে দুটো অস্তিত্বে দেখছিল— দুটো ক্যালেন্ডার, দুটো লকার, চারটে বাংক এবং এমনকি সুমিত্র পর্যন্ত দুটো অস্তিত্বে ওর পাশে বসে ছিল। পোর্টহোলের ঠান্ডা হাওয়ায় সবকিছুই মিলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে। যেন সবই এখন এক অখণ্ড বস্তু। তবু থার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, চলুন কাপ্তানের ঘরে। রাতদুপুরে কেমন জ্বালাতন করছেন টেরটি পাবেন।

এতক্ষণ মাদাম, দয়া করে আপনার কেবিনে কে ছিলেন?

চেরি বিদ্রূপ করে বলল, কেন, আপনি নিজে। তারপর দরজাটা মুখের উপর ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়ে বলল, লক্ষ্মীছেলের মতো ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

কিন্তু সুমিত্র নিজের বাংকে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারল না। সুমিত্রের মনে পড়ল মাতাল রমণী যদি দরজা খুলে শুয়ে থাকে, যদি থার্ড সেই ফাঁকে বেড়ালের মতো সন্তর্পণে ঢুকে পড়ে এবং চুরি করে চেটে চেটে মাংসের স্বাদ নিতে নিতে যদি... ভালো নয়, ভালো নয় সব—এমন ভেবে সে ডেকের উপর উঠে এলো। কাপ্তান—বয়ের দরজায় কড়া নেড়ে ডাকল, চাচা, অ চাচা, একটু উঠুন।

বৃদ্ধ কাপ্তান—বয়ের সারাদিন পরিশ্রমের পর এই বিশ্রামটুকু একান্ত নিজস্ব। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সুতরাং দু—এক ডাকে সাড়া পেল না সুমিত্র। সুমিত্র বারবার ধীরে ধীরে ডাকল, চাচা, অ চাচা! সে জোরে ডাকতে পারছে না, কারণ পিছনে মেসরুম মেট এবং মেসরুম বয় থাকে। তারপর এনজিনের স্কাইলাইট পার হলে ফানেল। ফানেল অতিক্রম করে অ্যাকোমোডেশান ল্যাডার, যা ধরে কাপ্তানের ঘরে উঠে যাওয়া যায়। জোরে ডাকাডাকি করলে বৃদ্ধ কাপ্তানের ঘুম পর্যন্ত ভেঙে যেতে পারে। সুতরাং ধীরে ধীরে সে কড়া নাড়তে থাকল।

বৃদ্ধ কাপ্তান—বয় একসময় দরজা খুললে বলল, চেরির দরজা বন্ধ করে আসুন চাচা। মদ খেয়ে ভয়ানক মাতলামি করছে।

তাড়াতাড়ি কাপ্তান—বয় গায়ে উর্দি চাপিয়ে নিচে ছুটল। গিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। তবু সে ধীরে ধীরে ঠেলে দেখল—দরজা খোলা এবং খুলে যাচ্ছে। চেরি বাংকের উপর বসে ক্যালেন্ডারটা দেখছে নিবিষ্ট মনে। কাপ্তান—বয়ের কোনো আওয়াজই চেরি শুনতে পাচ্ছে না। তখন দরজাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। কিন্তু কী ভেবে ঘরের ভিতর ঢুকল কাপ্তান—বয়। টিপয়ে খাবার জল রাখল, তারপর পিতৃত্বের ভঙ্গিতে বলে উঠল, মাদাম, শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে। এখন প্রায় একটা বাজে।

চেরি বড় বড় হাই তুলছে। সে কম্বলটা নিচে ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল। কাপ্তান—বয় দাঁড়িয়ে ছিল—চেরি কাত হয়ে শুয়ে ক্যালেন্ডারটা দেখছে। ওর পোশাকের গাঢ় রঙের ভাঁজ এখন আর নেই। চোখে অবসাদের চিহ্ন। কেমন এক তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ওর সমস্ত অবয়বে। কাপ্তান—বয় কম্বলটা ওর শরীরের উপর বিছিয়ে দিয়ে বাইরে এল। দরজা টেনে সন্তর্পণে তালা মেরে দিল। ডেকে বের হয়ে দেখল ঠান্ডায় সুমিত্র তখনও পায়চারি করছে।

কাপ্তান—বয় কাছে এসে বলল, দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিলাম।

যাক, বাঁচা গেল। এইটুকু বলে সুমিত্র পিছিলের দিকে উঠে যেতে থাকল।

ভোরবেলায় জাহাজিরা সাবানজল নিয়ে কেবিনের দেয়াল ধুতে অথবা ফল্কা বেঁধে নিচে নেমে অদৃশ্য হতে চাইছে। তখন চেরি বিছানায় উঠে বসল। দরজা বন্ধ দেখল। সে গত রাতের কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছে। সুমিত্র, জাহাজি সুমিত্রর প্রতি চেরির বলতে ইচ্ছা হল, গত রাতের ঘটনার জন্য আমাকে ক্ষমা কর সুমিত্র। এই জাহাজে, সমুদ্রের ভয়ানক নিঃসঙ্গতা এবং তোমার পাথরের মতো শরীরের স্থির অথবা অচঞ্চল উপস্থিতি আমাকে নিয়ত তীব্র তীক্ষ্ণ করছে। আমাকে অস্থির, চঞ্চল করেছে। অথচ তুমি কখনও পুতুলের মতো শরীর নিয়ে, কখনও একান্ত বশংবদের চিহ্ন শরীরে এঁকে আমার কেবিনে সময়, কাল অতিক্রম করার হেতু আমি ক্রমশ এক অস্থির নিয়তির ইচ্ছায় কালক্ষয়ের বাসনায় মগ্ন। কৈশোরের স্বপ্ন তোমার অবয়বে কেবল রূপ পাচ্ছে। আমার প্রিয়তম দ্বীপে এমত ঘটনা ঘটলে কী হত জানি না, আমার বাবা বর্তমান—তিনি আমাকে কী বলতেন জানি না এবং তোমার উপস্থিতি সহসা আমাকে অন্ধকারে নিদারুণ চঞ্চলতার জন্মদানে আমার সম্মানিত জীবনকে বিব্রত করে কেন জানি না, তবু তুমি কখনও এই কেবিনে এসে দাঁড়ালে আমি অধোবদনে লজ্জিত থাকব। তারপর আয়নায় চেরি তার মুখ দেখে উচ্চারণ করল—গত রাতের ঘটনার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো সুমিত্র।

রাতের বিড়ম্বনার জন্যই হোক অথবা অন্য কোনো কারণে, সুমিত্র ভোর রাতের দিকে শরীরে ভীষণ ব্যথা অনুভব করতে থাকল। পাশের বাংকে অনাদি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর যেহেতু চারটে আটটা পরী, যেহেতু এক্ষুনি তেলয়ালা হাফিজদ্দি ওকে এসে ডেকে তুলবে সুতরাং জল তেষ্টাতে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে ওকে ডাকা ভালো।

সুমিত্র ডাকল, অনাদি, ও অনাদি। একটু উঠে জল দে ভাই।

এই রাতে জল চাওয়ায় অনাদি আশ্চর্য হল। সে বলল, উঠে খেতে পারিস না।

শরীরে ভয়ানক কষ্ট।

কেন, কী হল!

মনে হয় জ্বর এসেছে।

অনাদি তাড়াতাড়ি উঠে কপালে হাত রেখে দেখল জ্বরে সুমিত্রর শরীর পুড়ে যাচ্ছে। সে জল দিল সুমিত্রকে এবং শরীরটা টিপে দেবার সময় বলল, রাত একটা পর্যন্ত তুই কোথায় ছিলি রে?

সুমিত্র উপরের দিকে হাত তুলে দেখাল।

কী করছিলি।

চেরিকে পাহারা দিচ্ছিলাম।

চেরি তোকে কিছু বলেছে?

না।

জাহাজের একঘেয়েমি তোর ভালোই লাগছে।

সুমিত্র জবাব দিল না। চুপ করে অন্য দিকে দেখতে দেখতে সুমিত্র কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

ভোরের দিকে সারেং ঘরে ঢুকে বলল, কী রে বা, অসুখ বাধাইছ!

না, তেমন কিছু নয় চাচা। মনে হয় ফ্লু গোছের কিছু। মেজ মালোমের কাছ থেকে একটু ওষুধ এনে দেন চাচা।

সারেংকে চিন্তিত দেখাল। ওর পরী কে দেবে এখন এমতই কোনো চিন্তা যেন সারেঙের মনে। সুতরাং সে একজন ফালতু আগওয়ালকে ডেকে সুমিত্রর পরী দিতে বলে যাবার সময় বলে গেল—পরীতে সুমিত্রর আজ যেতে হবে না এবং তখুনি কোনো কয়লায়ালাকে দিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। সব কাজ হয়ে যাবার পর সারেং যেন খুশি। তবে সুমিত্র যেন ডেকে উঠে ফের ঠান্ডা না লাগায়, বেশি হাঁটাহাঁটি না হয় সেজন্য সারেং শাসনের ভঙ্গিতেও কিছু কথা বলে গেল। বিশেষত, ভাতের জন্য ভাণ্ডারীকে পীড়াপীড়ি করলে নির্ঘাত পরী দিতে হবে এইসব কথার দ্বারা সারেং সকলের উপরে, সে—ই জাহাজের সব খালাসিদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা এমন এক ধারণার ভিত্তিতে সারেং মেজ মিস্ত্রির মতো ডেকের উপর দিয়ে হেঁটে গেল—যেন এনজিনিয়ার হাঁটছে।

শুয়ে ছিল, সে পরীদারদের ওঠানামার সঙ্গে ধরতে পারছে, এখন ক'টা বাজে। পোর্টহোল খোলা ছিল, কিন্তু সে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছে না। উপরের ঘরে ট্যান্ডেলের তামাক কাটার শব্দ ভেসে আসছে। পাশের ফোকসালে কোনো জাহাজি এখন নামাজ পড়ছে। তা ছাড়া সমুদ্রে ঢেউ একটু বেশি আজ। জাহাজটা কিঞ্চিৎ বেশি দুলছে যেন।

মুখটা ওর বিস্বাদ লাগল। সে এক মগ চায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে এখন। ভাণ্ডারী এক মগ চা এনে দিলে ঢক ঢক করে সবটা খেয়ে সমস্ত শরীরে কম্বল ঢেকে পড়ে থাকবে—তারপর যদি ভীষণভাবে ঘাম হয় শরীরে তবে নিশ্চয়ই শরীরটা ঠান্ডা হবে এবং অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ থেকে সে মুক্তি পাবে।

কেবিনে বসে চা—এর সঙ্গে স্যান্ডউইচ, কিছু ফল এবং মাখনের স্বাদ এতবার চেখেও যখন চেরি তৃপ্তি পেল না, যখন আটটা—বারোটার পরীদাররা সকলে নেমে গেছে ধীরে ধীরে অথচ সুমিত্র নামছে না—দূরে সমুদ্রের বুকে সূর্যের ম্লান আলো তেমনি ছড়িয়ে পড়ছে এবং তরঙ্গসকলকে আলোকিত করছে; কিছু উড়ুক্কু মাছ তেমনি ঝাঁক বেঁধে সাঁতার কাটছে, ছোট মালোম দূরবিনে আকাশ এবং সূর্যের অবস্থান প্রত্যক্ষ করছেন তখন চেরির মনে হল ডেকছাদের ছায়া ধরে একটু হেঁটে এই জাহাজের রেলিংয়ে ভর করে একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালে হয়। সমুদ্রের উপর জাহাজের প্রপেলার জল কেটে যাচ্ছে, জলে ফসফরাস জ্বলছিল—সূর্যের ম্লান আলোর জন্য সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকার থাকলে এখন যেন ভালো হত। ফসফরাস জ্বলছে, এইসব দেখে গত রাতের মতো ঘোর উত্তেজনায় ভুগতে পারত। রাতের নিঃসঙ্গতায় এখানে চেরি কতবার এসে ভর করে দাঁড়িয়েছে। রেলিংয়ে ঝুঁকে ফসফরাস জ্বলতে দেখেছে। কখনও সুমিত্র থাকত, কখনও থাকত না। একদিন সে সুমিত্রকে খুশি করার জন্য বলেছিল—দ্বীপে নেমে সোজা আমাদের প্রাসাদে গেলে না কেন? সুমিত্র তুমি...। সুমিত্র এই সময় কোথায়! ডেকসারেং এক নম্বর ফল্কার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। জাহাজিরা সাবানজল নিয়ে মাস্টের উপর উঠে হাসিঠাট্টায় মশগুল। চেরি তখন ডাকল, সারেং, সারেং!

ডেকসারেং দৌড়ে এলে চেরি বলল, সুমিত্র কোথায়? সে তো এখনও নিচে নামেনি। ওর তো আটটা—বারেটা ওয়াচ।

সারেং জবাব দিল, মাদাম, ওর অসুখ হয়েছে।

চেরি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, যাঃ!

জী মাদাম। আপনাকে আমি মিথ্যা বলতে পারি?

ওকে কে দেখাশুনা করছে?

কে করবে মাদাম? কেউ তো বসে নেই। সকলেই কাজ করছে। ও জ্বরে কাতরাচ্ছে।

তোমরা ওকে দেখতে পারো না! জ্বর হয়েছে... একলা ফেলে...

তা দেখি, মাদাম। সারেং নিজের দোষ কাটাবার জন্য বলে গেল, সব ব্যবস্থা করা হয়েছে মাদাম। এনজিন—সারেং মেজ মালোমের কাছ থেকে ওষুধ এনেছে।

তারপর চেরির মনে পড়ল এই মালবাহী জাহাজে সেবা—শুশ্রূষার কোনো ব্যবস্থা নেই। জাহাজিদের জন্য ভালো ওষুধ নেই। কোনো ডাক্তার নেই। সাধারণ রকমের অসুখে মেজ মালোমই ওষুধ দেন। সাধারণ রকমের অসুখে প্রয়োগ করার মতো কিছু ওষুধপত্র এই জাহাজের কোনো এক প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত আছে। কাপ্তানের উপর কোম্পানির উপর চেরির রাগ ক্রমশ বাড়তে থাকল। অথচ চেরি ফোকসলের দিকে হেঁটে যেতে পারছে না। গত রাতের ঘটনাসকল চেরিকে সংকুচিত করছে। যেন এই মুখ সুমিত্রকে দেখানো চলে না। যেন সুমিত্রর ফোকসালে ঢুকলে সে অপমানিত হতে পারে। গত রাতের দুঃসহ অপমানের কথা নিশ্চয়ই সে ভুলে যায়নি। সুতরাং, কী ভেবে চেরি নিজের কেবিনে ঢুকে কিছু ফল তুলে নিল হাতে এবং কাপ্তান—বয়কে ডেকে বলল, যাও সুমিত্রর কেবিনে এই ফলগুলি রেখে এসো। কিছু বললে বলবে বাটলার দিয়েছে। আমার কথা বলবে না।

কাপ্তান—বয় দরজার চৌকাঠ পার হলে চেরি বলল, জ্বর কত এবং কেমন আছে দেখে আসবে।

কাপ্তান—বয় আলওয়েতে হাঁটছিল এবং শুনতে পাচ্ছে, ওকে বেশি নড়াচড়া করতে বারণ করবে। মনে থাকে যেন, আমার কথা বলবে না।

কাপ্তান—বয় খুব ধীরে ধীরে হাঁটছে। কারণ তখনও চেরি নানারকমের নির্দেশ দিচ্ছে।—কম্বল গায়ে না থাকলে দিয়ে দেবে। কাপ্তান—বয় সব শুনে হাসল। বস্তুত চেরি আভিজাত্য বোধে ফোকসালের দিকে হেঁটে যেতে পারছে না। কাপ্তান—বয় বুঝল, চেরির ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। ডেকছাদের নিচে দাঁড়িয়ে একবার পিছন ফিরে তাকাতেই দেখল—দূরে কেবিনের দরজাতে ভর করে চেরি অপলক চোখে কাপ্তান—বয়ের কাছে কোনো খবরের প্রতীক্ষায় আছে। কাপ্তান—বয় এবার সত্বর ছুটে গেল। কারণ ওরও চেরির দুঃখবোধে মনের কোণে এক স্নেহসুলভ ইচ্ছার রঙ করুণ হয়ে উঠেছে।

সিঁড়ি ধরে নামছিল কাপ্তান—বয়। নিচের ফোকসালগুলি সবই প্রায় খালি। কিছু কিছু জাহাজি ডেকে হল্লা করছে। ওরা দেশের গল্পে, বিবিদের গল্পে মশগুল। প্রতিদিনের মতো ফলঞ্চা বেঁধে কেউ কেউ জাহাজে রঙ করছে। কাপ্তান—বয় প্রতিদিনের এইসব একঘেয়েমি দৃশ্য দেখতে দেখতে নিচে নেমে গেল। সুমিত্রর শিয়রে দাঁড়িয়ে কপালে হাত রাখল। ডাকল, সুমিত্র, ওঠ বাবা।

এই সময় কে কপালে হাত রাখল! ডাকল! সুমিত্রর মনে হল বড় প্রীতময় এই জাহাজিদের সংসার। দীর্ঘদিনের সফরে কাপ্তান—বয়কে আপনজনের মতো করে ভাবতে গিয়ে চোখে জল এল। সে ডাকল, চাচা!

কেমন আছ?

শরীরটা বড় ব্যথা করছে।

একটু নুনজল এনে দেব? গরম জল?

গরম জল ভাণ্ডারী দিয়েছে।

কী খেলে।

কিছু না। ভাবছি ভাত খাব না। শরীরটা খুব ঘামছে। মনে হয় ভালো করে ঘাম হলে শরীরটা খুব ঝরঝরে হবে।

যখন কাপ্তান—বয় দেখল শরীরে কোনো উত্তাপ নেই এবং যখন বুঝল ফ্লু—গোছের কিছু হয়েছে তখন আর বেশি দেরি করল না। পকেট থেকে আপেলগুলো বের করে দিয়ে বলল, নাও খাও। খাবে। কী খেতে

ভালো লাগে বলবে। বিকেলে এনে দেব। তারপর সুমিত্রকে একটু বিস্মিত হতে দেখে বলল, বাটলার দিয়েছে। বড় বড় চোখে তাকাবার মতো কিছু হয়নি।

সুমিত্রর শরীরে কম্বল টেনে দিয়ে কাপ্তান—বয় বাইরে বের হয়ে গেল। সিঁড়ি ধরে উঠছে। সুমিত্র শুয়ে শুয়ে উপরে কাপ্তান—বয়ের জুতোর শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে শুনতে পেল। ওর পোর্টহোলটা খোলা নেই। খোলা থাকলেও সে আকাশ দেখতে পেত না। মালবোঝাই জাহাজ। সমুদ্রের জলে মাঝে মাঝে পোর্টহোলটাকে ঢেকে ফেলছে। সমুদ্রের এই জল দেখে গতরাতের কিছু কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছে সুমিত্র। চেরির যৌন ইচ্ছা এবং প্রগলভতা ওর মনে এখনও কামনার জন্ম দিচ্ছে। অথচ সে পারছে না। বারবার এই আত্মঘাতী ইচ্ছা ওকে নিদারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ করছে, রাতে চেরির কেবিন থেকে ফিরে এসে এই ফোকসালে দীর্ঘ সময় পায়চারি করেছে এবং সকল দগ্ধ যৌন ইচ্ছার প্রতি উষ্মা প্রকাশের জন্য বার বার জাহাজিসুলভ খিস্তি করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চেয়েছে।

বিকালে সুমিত্রর জ্বরটা থাকল না। বাংকে বসে সে—শরীর তার এখন হালকা, নিরন্তর এই বোধে খুশি। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে একটি বেঞ্চিতে বসল। সমুদ্রের হাওয়ায় ওর শরীর প্রাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। সে এবার ধীরে ধীরে চার নম্বর ফল্কা অতিক্রম করে ডেক—ছাদের নিচ দিয়ে এলওয়ে পথটাকে দেখল—সেখানে কোনো পরিচিত মুখ ভেসে উঠছে না। সেই মুখ, নরম ঘাড় আর তার কোমল মন সুমিত্রর নিঃসঙ্গ এবং পীড়িত শরীরের জন্য বড় প্রয়োজন। এবং গত রাতের 'বেশ্যা' এই শব্দটি গ্লানিকর সুতরাং উচ্চারণে কিঞ্চিৎ সংযত হওয়া প্রয়োজন। তারপর এই মুহূর্তে নিজেকে ছোটলোক ভেবে ক্ষোভ থেকে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়া গেলে মন্দ কী? চেরির মাতাল যৌনেচ্ছাতে সমুদ্রের নেশা ছিল। ওর ঘরে দ্বীপের আভিজাত্য অনেক দূরের স্মৃতির মতো এবং এইজন্যই বুঝি সমুদ্রের ঢেউ অথবা আকাশ দেখতে দেখতে একটু প্রেম করা চলে—ভালোবাসলে ক্ষতি নেই, তারপর রাত যদি ঘন ঘন শরীরের রমণীয়তায় তন্ময় করে রাখে, যুক্ত করে রাখে তবে বিঘ্নকারী জানোয়ারের মতো ইতর হবার প্রয়োজন কোথায়! সে ভাবল, সুতরাং আজ রাতে চেরির দরজার পাশ দিয়ে একবার হেঁটে যাবে। এবং গৃহপ্রবেশের দিনে গিন্নিমার মতো একবার যৌনসংযোগ ঘটাবে—এই নিরন্তর ইচ্ছার জন্য সে এবার ডাকল— ভাণ্ডারী—চাচা, আমাকে একমগ চা দিন।

ভাণ্ডারী উঁকি দিল গ্যালি থেকে। জাহাজিরা ঘরে ফেরার মতো একে একে সকলে পিছিলে জমছে। ওদের হাতে রঙের টব ছিল। ওরা হাতের রঙ কেরোসিন তেলে মুছে নিচ্ছে। ওরা এবার স্নান করবে। নামাজ পড়বে এবং আহার করবে। তারপর সমুদয় কাজ সেরে ওরা গিয়ে বেঞ্চিতে বসে ন্যক্কারজনক কথাবার্তায় ডুবে ডুবে জল খাবে। সুমিত্র ওদের সকলকে দেখল। ওরা সকলে ওকে এক প্রশ্ন করল, তোমার শরীরটা ক্যামন আছেরে বা? এইসব বলে ওরা ফোকসালে নেমে গেলে ভাণ্ডারী বলল, চা কড়া করে দেব?

তাই দাও।

সুমিত্রর এখন আর কিছু করণীয় নেই। সুতরাং পা ঝুলিয়ে বসে থাকল। শরীরে সমস্ত দিনের সঞ্চিত গ্লানি এই সমুদ্র এবং এক কাপ চা দূর করে দিল। সে এবার জাহাজের অলিগলি না খুঁজে সোজা দিগন্তে নিজের দৃষ্টিতে নিযুক্ত করে তার দেশ বাড়ির চিন্তা—সেখানে কী মাস, কী ফুল ফুটছে অথবা কোন ঋতু হতে পারে, দুর্গাপুজোর সময় হতে কত দেরি, শেফালি ফুল ছড়ানো উঠোন অথবা বৃষ্টি বৃষ্টি... এবং জাহাজে থেকে থেকে বাংলাদেশের মাস কালের হিসাব ভুলে গেল সুমিত্র। অথবা এইসব চিন্তার দ্বারা দেশের আকাশকে উপলব্ধি করার জন্য আঁকু—পাঁকু করতে থাকল সুমিত্র।

ডেক—সারেং বলল, তবিয়ত কেমন?

ভালো চাচা। জ্বরটা মনে হয় সেরে গেছে।

কী খেয়েছিলে?

চাপাটি খেলাম চাচা।

ভালো করেছ।

রাত্রে দেখি বাটলারকে বলে একটা পাঁউরুটি সংগ্রহ করতে পারি কি না।

অনাদি উঠে এল। সে বলল, এখানে বসে শরীরে ঠান্ডা লাগানো হচ্ছে? এক্ষুনি নেমে পড়! বলে, সুমিত্র অনাদিকে অনুসরণ করে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। সারেংয়ের ঘরটা অতিক্রম করে স্টোর রুমের পাশের নির্জন জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে সুমিত্র ডাকল, অনাদি!

কিছু বলবি!

তুই তো সারাদিন পাঁচ নম্বরের সঙ্গে ডেকে কাজ করছিলি?

হ্যাঁ, তা করছিলাম।

চেরিকে ডেকে বের হতে দেখলি না?

না। তবে এলওয়ে ধরে আসবার সময় দেখলাম চেরি বিছানায় শুয়ে আছে।

কিছু করছে না।

ঘরটা অন্ধকার। দরজা জানলা সব বন্ধ করে রেখেছে।

সুতরাং ভালোমতো দেখিসনি।

না।

সুমিত্রকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আশাহত। অনাদি নিজের ফোকসালে চলে গেল এবং পিছনে এসে এ সময় কাপ্তান—বয় ডাকল, সুমিত্র, এই নাও তোমার বিকেল এবং রাতের খাবার। বাটলার দিয়েছে।

চাচা, বাটলার এত সদয় কেন আমার প্রতি?

তা আমাকে বললে কী হবে! বরং বাটলারকে জিজ্ঞেস কর। একটু থেমে বলল, তোমার শরীর এখন কেমন?

ভালো চাচা।

বেশি নড়বে না। এ—জ্বর কিন্তু খুব খারাপ। আবার হলে অনেক ভোগান্তি হবে। বলে চলে যাবার জন্য উদ্যোগ করতেই সুমিত্র কেমন যেন সংকোচের সঙ্গে ডাকল, চাচা।

কাপ্তান—বয় মুখ ফিরিয়ে বলল, কী!

আমার যে শরীরটা খারাপ করেছিল, চেরি জানে?

তা আমি কী করে জানব বাপু।

তোমাকে কীছু জিজ্ঞেস করেনি?

না। আমি কতক্ষণ থাকি ওর কাছে? কাপ্তান—বয় আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমিত্র ফোকসালে ঢুকে ফের বাংকে শুয়ে পড়ল। শরীরটা বেশ দুর্বল মনে হচ্ছে। গত রাতের ঘটনাগুলো ওকে এখনও যেন যন্ত্রণা দিচ্ছে। অথচ একবার চেরির কেবিনে যেতে পারলে সব দুর্ঘটনার যেন অবসান হত। তবু সে নিজের শরীরে কম্বল টেনে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। নির্জনতায় ভুগে কেমন বিস্বাদ বিস্বাদ সব। অনাদি পাশের বাংকে শুয়ে বকবক করছে ছোট ট্যান্ডলের সঙ্গে। এইসব কথা এবং যৌন আলাপ শুনতে ভালো লাগছে না। ফোকসালের সর্বত্র একই জৈব ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মুসলমান বৃদ্ধ পুরুষসকল অযথা বদনা নিয়ে বারবার এই ঠান্ডা দিনেও গোসলখানায় ঢুকে স্নান করছে এবং আল্লা আল্লা করছে।

ফোকসালে ফোকসালে এখন অন্ধকার। এবং সন্ধ্যা অতিক্রম করছে বলে সকলে আলো জ্বলে দিল। কিন্তু সুমিত্রর এই আলো ভালো লাগছে না। আলোটা ওর চোখে লাগছে। সে আলোটা নিভিয়ে দিতে বলল। এবং এই অন্ধকার এখন ওকে গ্রাস করছে। রাত বাড়ছে। ফোকসালে ফোকসালে জাহাজিরা ভিড় করে আছে। ওরা এবার উপরে উঠবে। ওরা রাতের আহার শেষ করে আবার নিচে নেমে আসবে।

সুতরাং সুমিত্র দীর্ঘ সময় এই বাংকে একা আর পড়ে থাকতে পারছে না। রাত যত বাড়ছিল, ঘন হচ্ছিল, তত শরীরের দুর্বলতা যৌনক্ষুধাকে আবেগমথিত করছে। এবং যখন দেখল ফোকসালে ফোকসালে ডেক—

জাহাজিরা ঘুমিয়ে পড়েছে, এনজিন অথবা ডেকসারেং—এর ঘরে আলো জ্বলছে না তখন ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি ধরে চোরের মতো পা টিপে টিপে উপরে উঠতে থাকল।

ডেকে উঠতেই শীত শীত অনুভব করল সুমিত্র। অস্ট্রেলীয় উপকূলের যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত শীতটা যেন বাড়ছে। তত সমুদ্র যেন শান্ত হয়ে আসছে। আজও সে ডেকে এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। মাস্টের আলোগুলি ভূতের মতো রাতের আঁধারে দুলে দুলে ভয় দেখাচ্ছে। ব্রিজে ছোট মালোমও পায়চারি করছেন; ওঁর এখন ওয়াচ নিশ্চয়ই। সুমিত্র আড়াল থেকে দেখল সব এবং খুশি হল। ছোট মালোম কেবিনে থাকেন। সুতরাং চেরির কেবিনে কোনো শব্দ হলে পোর্টহোল দিয়ে উঁকি মারতে পারেন। সে উত্তেজনায় দাঁড়াতে পারছিল না, চুলোয় যাক ছোট মালোম—সে ছুটে এলওয়ে পথে ঢুকে গেল। এবং চেরির দরজার উপর ভর করে সতর্ক গলায় ডাকতে থাকল, মাদাম, মাদাম! আমি এসেছি দরজা খুলুন, যেন বলার ইচ্ছা, আমি যথার্থই কাপুরুষ নই। আপনাকে বেশ্যা বলে নিরন্তর আমি দগ্ধ। আমরা সকলেই উনুনের তাপ চুরি করে শরীর গরম করছি। আপনি দরজা খুলুন মাদাম।

চোরের মতো সুমিত্র কড়া নাড়তে থাকল। রাত বলে এনজিনের আওয়াজ প্রকট। সুতরাং এখন কেউ সুমিত্রর কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাবে না। কেউ এদিকে এলে এনজিন রুমে নেমে যাবার মতো ভান করে দাঁড়িয়ে থাকবে। বড় মালোমের ঘর পর্যন্ত খোলা নেই। সে আবার কড়া নাড়তে থাকল এবং এ—সময়েই দেখল ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। চেরির পায়ের শব্দ ভিতরে। চেরি দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, কে! কে?

আমি সুমিত্র, মাদাম। সে আর কীছু প্রকাশ করতে পারছে না। সে উত্তেজনায় অধীর। সে শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। সমস্ত গা পুড়ে যাচ্ছে। গলা ভয়ে শুকনো, কাঠ। সে কোনোরকমে গলা ঝেড়ে আবার ডেকে উঠল, মাদাম, আমি সুমিত্র।

দরজা খুললে চেরি দেখতে পেল সুমিত্র দরজায় দাঁড়িয়ে ঘামছে। এই শীত—শীত রাতেও এমত ঘাম সুমিত্রর মুখে শরীরে সর্বত্র। কেবিনের আলোয় মুখের বিন্দুসকল ঝলমল করছে। সুমিত্রর চোখের নিচে কালি পড়েছে; বিশেষ করে গত রাতের সেই যুবকটিকে যেন আর চেনাই যাচ্ছে না। চেরি এবার সুমিত্রের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল। পাখা খুলে দিয়ে বলল, বোস। ইজিচেয়ারে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল চেরি। তারপর ধীরে সুস্থে বাংকে বসে বলল, এত রাতে!

সুমিত্র চেরির কণ্ঠে গত রাতের কোনো ইশারাকেই খুঁজে পেল না। একেবারে স্বাভাবিক।

মাদাম!

কিছু বলবে?

চেরি দেখল সুমিত্রর চোখ দুটো জ্বলছে। সমস্ত শরীর থেকে কামনার আবেগ গলে গলে পড়ছে। স্থিরভাবে তাকাতে পারছে না—যেন অবসন্ন সৈনিক কুয়াশার অন্ধকার থেকে পথ খুঁজে খুঁজে অবিরাম হেঁটে হেঁটে কোনো আশ্রমে উপস্থিত। পানীয় জলের মতো যুবতীর চোখ মুখ শরীর তার তৃষ্ণা দূর করার জন্য যেন অপেক্ষা করছে। সে শুধু বলল, আপনি ফুল ভালোবাসেন মাদাম?

ভালোবাসি সুমিত্র।

পাখি?

পাখি ভালোবাসি।

আমার ফুল, পাখি কিছুই ভালো লাগছে না মাদাম।

কেন, কেন?

কী জানি। এই জাহাজ কেবল উচ্ছৃঙ্খল হতে বলছে।

সুমিত্র! খুব দূর থেকে যেন চেরির গলা ভেসে আসছে। গলা আবেগে কাঁপতে থাকল।

আমাকে কিছু বলবেন মাদাম?

তুমি উচ্ছৃঙ্খল হলে আমার যে কিছু থাকল না। নিজের সতীত্ব প্রমাণে চেরি যেন মরিয়া হয়ে উঠল।

না না। আপনি ভুল বুঝবেন না মাদাম। আমি যত্নের সঙ্গে সব পরিহার করে চলেছি মাদাম। অথবা বলতে পারেন, চলার চেষ্টা করছি।

সুমিত্র, কখনও যদি সময় অথবা সুযোগ পাই আমি ভারতবর্ষে যাবই।

ভয়ানক গরিবের দেশ। রাজপুত্রেরা এখন ফুটপাতে হেঁটে বেড়াচ্ছে মাদাম।

চেরি নিজেও তার ইচ্ছার কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারছে না। এক কৃত্রিম আদর্শ উভয়কে সংকুচিত করে রাখছে। অথবা এও বলা যেতে পারে, চেরির ব্যবহার কেবলই মাতৃসুলভ হয়ে উঠছে। সে সুমিত্রর কপালে হাত রেখে বলল, সারাটা দিন আমার কী যে গেছে!

সুমিত্র আর পারছে না। সুতরাং মাথাটা ইজিচেয়ারের উপর আরাম করার জন্যে স্থাপন করল। যেন ঘুমোচ্ছে সুমিত্র এবং দেখলে মনে হবে মৃত। শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড়। সে যেন আর দাঁড়াতে পারছে না। সে হেঁটে যেতে পারছে না ফোকসালে—দেখলে এমনই মনে হবে সুমিত্রকে। দীর্ঘ সময় ধরে চেরিও চুপ করে শুয়ে থাকল বাংকে। এখন ওরা উভয়ে পরস্পর আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করার জন্যে প্রথম শহীদ কে হবে, কে প্রথম যৌন বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্যে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবে এমতই কোনো এক প্রতিযোগিতায় মত্ত। চেরি শুয়ে শুয়ে সুমিত্রর অবয়বে সেই রাজপুত্রের প্রতিবিম্ব দর্শনে আর স্থির থাকতে পারল না। সে যিশুর নাম স্মরণ করে ডাকল, এসো সুমিত্র।

চেরি আবার ডাকল, সুমিত্র এসো। নীল আলো জ্বলছে, দেখ।

সুমিত্র জবাব দিচ্ছে না। এমনকি ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ল না। যেমন শিথিল শরীর নিয়ে পড়ে ছিল তেমনি পড়ে থাকল।

সুমিত্র, সুমিত্র। চেরি বাংকে থেকে নেমে সুমিত্রর ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে দেখল, সুমিত্র যথার্থই ঘুমিয়ে পড়েছে। যে আবেগ এবং যৌনেচ্ছা এতক্ষণ ধরে বাজিকরের মতো আবির্ভূত করে রেখেছিল, সুমিত্রর অসহায় মুখ দেখে সেই রঙ জলের মতো নির্মল হল। চেরি সন্তর্পণে কাছে গিয়ে কম্বলে পা শরীর ঢেকে দিয়ে কেবিনের নীল আলোর ছায়ায় ভারতবর্ষের রাজপুত্রের মুখ দেখতে দেখতে রাত ভোর করে দিল। বাইরে আলো ফুটে উঠছে। পোর্টহোলের কাচ খুলে দিতেই বাইরের ঠান্ডা হাওয়া এই কেবিনের সকল ঘটনাকে প্রীতিময় করে তুলছে। চেরি বাংক থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকে পোশাক পালটাল। শেষে কাপ্তান—বয়ের খোঁজে ডেকে বের হয়ে গেল। ডেক—ছাদের নিচে এসে দাঁড়াতেই দেখল দুটো নির্জন দ্বীপের পাশ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। সবুজ এক প্রান্তর, এই ভোরের মিষ্টি আলো, এবং দিগন্তের ফাঁকে সূর্য উঠছে, শুধু রক্তিম আকাশ, কেবিনে সুমিত্র ঘুমোচ্ছে, চেরির বুক ঠেলে কেমন এক কান্নার চিহ্ন ঠোঁটে মুখে ফুটে উঠল। দূরের দ্বীপ থেকে মাটির গন্ধ ভেসে আসছে, সবুজের গন্ধ এই জাহাজের ফাঁকফোকরে যত অন্ধকার আছে সব নির্মল করে দিচ্ছে। দ্বীপের পাখি সকল জাহাজটাকে দেখে চক্রাকারে উড়তে থাকল। নীল রঙের পাখিরা ডাকল আর আকাশের চারধারে সাদা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এবং তার ফাঁকে ফাঁকে দ্বীপের সকল পাখিরা কোনো এক নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। চেরি ভাবল, এই দ্বীপের কোনো গুহায় তার এবং সুমিত্রর জন্য একটু আশ্রয় কি মিলতে পারে না! একটু আশ্রয়ের জন্য মাটির কাছে তার প্রার্থনা, ঈশ্বর আমার কী হবে!

কাপ্তান—বয় এসে ডাকল, মাদাম।

কফি। দু'কাপ।

ধীরে ধীরে জাহাজটা দ্বীপ দুটোকে পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। সূর্যের আলো দ্বীপের সব অপরিচিত গাছের ফাঁক দিয়ে সমুদ্রে এসে পড়েছে। জনহীন এইসব ছোট ছোট দ্বীপ কতকাল থেকে এমন নিঃসঙ্গ কাটাচ্ছে কে জানে। দ্বীপের ঝোপ জঙ্গলের পাশে সুমিত্র এবং তার জন্য যদি কোনো তপোবন থাকত, যদি একফালি রোদ সেই কুটির—সংলগ্ন উঠোনে এসে পড়ত এবং সারাদিন পর সমুদ্র থেকে ঘরে ফিরে এসে সুমিত্র ওকে জড়িয়ে যদি জীবনের স্বাদ গ্রহণ করত, কত রঙিন স্বপ্ন দেখল চেরি, কত আকাঙ্ক্ষার কথা, বিচিত্র সব শখ

সারাদিন ধরে ডেক পাটাতনে ভেবে ভেবে কখনও অন্যমনস্ক, কখনও বেদনায় বাংকে শুয়ে শুয়ে স্মৃতিকে ধরে রাখোর স্পৃহাতে এক নির্দিষ্ট যুবকের পায়ের শব্দ শুনতে চায়।

তখন সুমিত্র চোখ খুলে দেখল এই কেবিন। গভীর ঘুমের আচ্ছন্ন ভাবটুকুর জন্য বুঝতে পারল না কোথায় এবং কীভাবে, সে দেখল এই কেবিন ওর পরিচিত। তারপর একে একে বিগত রাতের ঘটনার কথা স্মরণ করে সে ফের আতঙ্কিত হল। দিনের আলো পোর্টহোল দিয়ে কেবিনে গলে গলে পড়ছে। চেরি ঘরে নেই। সুতরাং মনে নানা অগোছালো চিন্তা জট পাকাচ্ছে। অথবা রাত হলেই তার কী যে হয়। নিজের এই অপরিণামদর্শিতার জন্য সে দুঃখিত হল। তারপর চেয়ার থেকে সন্তর্পণে উঠে ডেকে এসে দেখল, চেরি দূরের দ্বীপসকল দেখছে। চেরি খুব ঝুঁকে আছে রেলিংয়ে। সে তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনে ঢুকে বিছানায় হাত—পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

কাপ্তান—বয় এসে ডাকল, মাদাম।

এই যে!

আপনার কফি দেওয়া রয়েছে।

দু'কাপের মতো?

হ্যাঁ মাদাম।

চেরি তাড়াতাড়ি কেবিনে ঢুকবে ভাবল, সুমিত্রকে হাতমুখ ধুতে বলবে বাথরুমে। তারপর একসঙ্গে কফি খেতে খেতে দ্বীপের গল্প, ওর দেশ বাড়ি এবং অন্য অনেক সব খবর নিতে হবে—কিন্তু ভিতরে ঢুকেই দেখল, কেবিন ফাঁকা। সুমিত্র নেই। তারপর সে দেখল পোর্টহোলের কাচ খোলা। সে এবার কফির সবটুকু বেসিনে ঢেলে দিল। একটু এগিয়ে গিয়ে কাচ এবং লোহার প্লেট দিয়ে পোর্টহোল বন্ধ করে দিল। যেন সুমিত্রর কোনো প্রতিবিম্ব ভাসবে না এবং লজ্জায় আর অধোবদনও হতে হবে না। নিজের এই দুর্বলতাকে পরিহার করার জন্য সে আজ ভালোভাবে স্নান করল। সুমিত্রকে এড়িয়ে চলার জন্য নানা রকমের পত্রপত্রিকা খুলে বসল বাংকে। মনের বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাগুলিকে সংযত করতে গিয়ে বারবার সে হোঁচট খাচ্ছে। কোথায় যেন এক বিশাল পাথরের বোঝা হয়ে ভারতীয় জাহাজিটা মনের উপর চেপে বসে আছে। চেরি আর পারছে না। চেরি নিজেকে রক্ষার জন্য দরজা খুলে তাড়াতাড়ি কাপ্তানের কেবিনে ছুটে গেল। বলল, আপনার এই বারান্দায় একটু বিশ্রাম নিতে চাইছি।

যতক্ষণ খুশি।

একটি ইজিচেয়ারে বসে সমুদ্র দেখতে থাকল চেরি। এখানে সুমিত্র নেই, শুধু সমুদ্র শুধু ঢেউ। কিছু পারপয়েজ মাছ। কিছু ঢেউ মেঘ হয়ে আছে আকাশে। সমুদ্রের ওপাশ দিয়ে একটা জাহাজের মাস্তুলে নিশান উড়তে দেখছে। কাপ্তান নিচে আছেন। তিনি দূরবিন চোখে রেখে জাহাজটাকে দেখলেন। চেরি উঠে দাঁড়ালে কাপ্তান ওর হাতে দূরবিন দিয়ে বললেন, দেখুন দূরে একটা তিমি মাছ দেখতে পাবেন। চেরি কিন্তু দূরবিন চোখে রেখে সুমিত্রর দিকে চেয়ে থাকল। পিছনের রেলিংয়ে সুমিত্র ঝুঁকে আছে—সে বোধহয় প্রপেলারের শব্দ কান পেতে শুনছে। চেরি দূরবিনটা কাপ্তানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ইজিচেয়ারটা ইচ্ছা করে দূরে সরিয়ে নিল। সুমিত্রকে আর দেখা যাচ্ছে না এবং সে খুশি হওয়ার ভান করে কাপ্তেনকে পরবর্তী বন্দর সম্বন্ধে প্রশ্ন করল, আশা করছি দু'দিন বাদেই আমরা সিডনি পৌঁছাব।

আপনার সমুদ্রযাত্রা ভালো লাগছে না বোধহয়?

চেরি কথা বলল না।

ভালো লাগবে কী করে! যাত্রীজাহাজে যেতে পারলে আপনার এতটা অসুবিধা হত না।

চেরি বলল, কাল বিকেলটা বেশ লাগল।

তা বটে।

আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে ক্যাপ্টেন।

আপনার কথাও আমাদের মনে থাকবে। কাল আপনার ভায়লিনের সুর অপূর্ব লাগছিল।

ক্যাপ্টেন, এবার কিন্তু কথাটা একটু খোশামোদের মতো মনে হল।

না মাদাম, আপনি বিশ্বাস করুন। সকলেই আপনার প্রশংসা করছে। সুমিত্র ভারতীয়, সে পর্যন্ত বলল, মাস্টার, এ সফরের কথা আমরা সকলেই মনে রাখতে বাধ্য হব। তারপর সে আপনার কথায় এল।

চেরির বলতে ইচ্ছা হল, আর কিছু বলেছে, আর কিছু? কিন্তু সম্মানিত জীবনের কথা ভেবে সে ওই প্রগাঢ় ইচ্ছাকে জোর করে থামিয়ে দিল।

কাপ্তান চেরির নিকট থেকে উৎসাহ না পেয়ে চার্ট—রুমে ঢুকে গেল এবং নিজের কাজ করতে থাকল।

চেরি ব্রিজে পায়চারি করছে। একবার উইংসের পাশে ঝুঁকে অথবা কখনও কম্পাসটার সামনে এসে (যেখানে কোয়ার্টার—মাস্টার স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাচ্ছে) নিজেকে বারবার আড়াল করার চেষ্টা করল। সুমিত্রকে আর দেখাই যাচ্ছে না। সুমিত্র পিছিলে কোথাও নেই। সে অ্যাকোমোডেশন ল্যাডার ধরে নেমে বোট—ডেক পার হয়ে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সুমিত্র এখন এনজিন—রুমে। সে হাতঘড়িতে সময় দেখে এমত ধারণা করল। এবং কেন জানি অপার বিষণ্ণতা চেরিকে গ্রাস করছে। এবার দু'হাত ছুড়ে চেরির যেন বলবার ইচ্ছা—কে আছ তোমরা এসো, সুমিত্র নামে এক ভারতীয় যুবক আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমাকে রক্ষা করো!

সুতরাং বিকেলে জোর করে নিজেকে কেবিনে আবদ্ধ করে রাখল। সুমিত্র যে ক'বার এনজিন—রুম থেকে উঠেছে নেমেছে, প্রত্যেকবার চেরির দরজা, পোর্টহোল বন্ধ দেখেছে। বিকেলবেলাতে সুমিত্র কাপ্তান—বয়কে প্রশ্ন করল, চাচা, রাজকন্যার দরজা—জানালা যে সব বন্ধ!

কী জানি, মেয়েমানুষের মর্জি বোঝা দায়। আমাকে বলল, ঘুমালে ডেকো না। বারোটার সময় দরজার কড়া নাড়লাম, খাবার দিতে হবে.... কোনো সাড়াশব্দ না। কাপ্তানকে বললাম—তিনি বললেন, বোধহয় ঘুমোচ্ছে, সুতরাং বাটলারকে বলে দাও যেন খাবারটা গরম রাখার ব্যবস্থা রাখে। ও আল্লা, নিচে নামতেই দেখি হৈ—হল্লা বাধিয়ে দিয়েছে।

সুমিত্র বলল, কাপ্তান আচ্ছা রাজকন্যার পাল্লায় পড়েছে!

তা হবে। কিন্তু কাল রাতে তোমার কথাই বারবার বলছিল।

কেন? কেন?

না, থাক। ওসব আমার বলা বারণ আছে, বলে কাপ্তান—বয় টুইন—ডেকে নেমে গেল।

এবং এ সময় সুমিত্র দেখল চেরি সান্ধ্য—পোশাকে টুইন—ডেক অতিক্রম করে এদিকেই আসছে।

সুমিত্র অন্যান্য সকল জাহাজিদের সঙ্গে কথা বলছে—চেরিকে দেখছে না এমত ভাব ওর চোখে—মুখে। চেরি আফট—পার্টে চলে আসছে। সুমিত্রর গলা শুকনো শুকনো ঠেকছে। চেরি আফট—পার্টে উঠে সুমিত্রকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সুমিত্রর দিকে তাকাল না, অথবা কথা বলল না। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে জাহাজ—ডেকে। সুতরাং সকলে সরে দাঁড়াল। চেরি স্টারবোর্ড সাইডের ডেক ধরে এক নম্বর, দু' নম্বর ফল্কা পার হয়ে ফের অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমিত্র পাশের জাহাজিকে বলল, চেরিকে খুব শুকনো লাগছে, না চাচা?

জাহাজে চড়লে প্রথম সকলেরই একটু শরীর খারাপ হয়। সুখী ঘরের মেয়ে। তা, একটু শুকনো লাগবে।

সুমিত্র এইসব কথা শুনল না। সে পিছিল থেকে নড়ছে না। সে চেরিকে ফরোয়ার্ড—ডেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল। চেরির মুখ শুকনো, সেই হেতু একটা কষ্ট—কষ্ট ভাব সুমিত্রর মনে। চেরি চুপচাপ চলে যাচ্ছে—গেল। সুমিত্র স্থাণুবৎ। এই প্রথম একজন পরিচিত যুবতীর জন্য মনে মনে দুঃখ বোধ করছে এবং যতবার অস্বীকারের ইচ্ছায় দৃঢ় হয়েছে ততবার এক দুর্নিবার মোহ সুমিত্রকে উত্তেজিত করে একসময় নিদারুণ প্রেমে ঘনিষ্ঠ করতে চেয়েছে।

সুমিত্র অনেকক্ষণ স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থেকে সহসা দেখল ডেক এবং অন্যত্র সকল স্থান আলো আলোময় করে জাহাজ গতিশীল। সে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সে ডেক ধরে নেমে গেল। সে হাঁটতে থাকল উদ্দেশ্যহীনভাবে। অথচ একসময় সে নিজেকে দেখল চেরির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চেরির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। মনে হচ্ছে ভিতরে কোনো আলো জ্বলছে না। চেরি অন্ধকারে শুয়ে আছে চুপচাপ। সে ধীরে ধীরে কড়া নাড়ল।

ক্লান্ত গলায় ভিতর থেকে প্রশ্ন করল চেরি, কে?

আমি, সুমিত্র।

সুমিত্র ভিতরের শব্দে বুঝল চেরি খুব দ্রুত কাজসকল সম্পন্ন করছে। আলো জ্বালাচ্ছে, প্রসাধন করছে। সবকিছুতেই ত্রস্তভাব। সুমিত্র এ—সময় এতটুকু ভীত হল না।

চেরি দরজা খুলল। চোখে ভয়ানক ক্লান্তি, তবু সুমিত্রর হাত ধরে এনে ভিতরে বসাল।

আপনাকে আজ খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে। কাল রাতে বুঝি এতটুকু ঘুমোননি?

সুমিত্র, আমি তোমাকে মিথ্যা বলব না। কাল আমি ঘুমোতে পারিনি।

আমি দেখছি মেজ—মালোমের কাছে ওষুধ পাওয়া যায় কী না।

না সুমিত্র, তুমি বোস। ঘুমোতে পারছি না বলে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

কিন্তু আপনার চোখের কোল যে ফুলে উঠেছে!

সব সেরে যাবে। তুমি বোস। একটু কফি খাও। চেরি দরজায় গলা বের করে কাপ্তান—বয়কে ডাকল।

কফি খেতে খেতে চেরি প্রশ্ন করল, তোমার কে কে আছে সুমিত্র?

কেউ নেই।

কেউ নেই?

না।

মা?

না।

বাবা?

না।

আত্মীয়স্বজন?

সুমিত্র এবারেও ঠোঁট ওলটাল।

কী করে এমন হল?

সব দাঙ্গাতে মারা গেছে। আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে ছিল।

ঈশ্বর! চেরি আর কিছু প্রকাশ করতে পারল না। অনেকক্ষণ নির্জনে বসে থাকার মতো চুপচাপ বসে থাকল। দীর্ঘ সময় ওরা হতবাক হয়ে থাকল।

সুমিত্রই কথা বলল, আমি না ডাকতেই এসেছি বলে রাগ করেননি তো?

সুমিত্র, আমি খুব খুশি হয়েছি খুব।

আপনার শুকনো মুখ দেখে আমার আজ কেন জানি বারবারই মনে হল, এই জাহাজে আপনি আমার মতোই একা। আমার মতো আপনারও কেউ নেই। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ধরনের কষ্টে পীড়িত হতে থাকলাম। শেষে বিশ্বাস করুন, কে যেন জোর করে আপনার দরজায় আমাকে এনে হাজির করল।

এইসব কথায় চেরি আবেগে প্রগাঢ় হল। সমস্ত শরীরে এক অদৃশ্য কম্পন। সে তার সকল দৃঢ়তা, সকল প্রত্যয়, সকল সম্মানিত জীবনের আলো গান পরিত্যাগ করে সুমিত্রর দু'হাত চেপে ধরল। কিন্তু আবেগের প্রগাঢ়তায় কিছুই প্রকাশ করতে পারল না। বলতে পারল না, মাই প্রিন্স! আমার আশৈশবের রাজপুত্র! সে মাথা নত করে সুমিত্রর মুখোমুখি বসে থাকল। মনে কোনো আলো জাগল না। নিমজ্জমান তরীর মতো

জীবনের এক প্রবল মাধ্যাকর্ষণে ক্রমশ গভীর সমুদ্রে ওরা মিলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে। এবং একসময় সুমিত্র যখন চোখ তুলল চেরিকে দেখবার জন্যে, তখন চেরি অবাক হতে হতে দেখল, সেই চোখ, সেই বিষণ্ণ চঞ্চল চোখ কাচের জানালায় প্রতিবিম্ব হয়ে ভাসছে। কত ইচ্ছাই না চেরিকে এ সময় বিব্রত করেছে, কিন্তু কোনো ইচ্ছার সফলতাকেই অমৃতময় বলে মনে হল না, সুতরাং চেরি সুমিত্রর প্রিয়মুখ দর্শনে শুধু বিহ্বল হতে থাকল।

রাত্রির বিষণ্ণ আলোতে চেরিকে সুখী করার জন্যে সুমিত্র বলল, তোমাকে যদি রাজা—রানির গল্প বলি, তুমি খুশি হবে?

চেরি শুধু চেয়ে থাকল ফ্যাল ফ্যাল করে।

পরদিন ভোরে সুমিত্র টুপাতির কেবিনে ঢুকে বলল, তোমার সময় হবে?

চেরি বলল, আমার হবে, তোমার হবে কী না বল?

আমার আজ থেকে কোনো ওয়াচ থাকবে না।

কেন?

কাপ্তান সারেংকে বলে পাঠিয়েছে, আজ এবং কালকের জন্যে অন্য কাউকে দিয়ে ওয়াচ চালিয়ে দিতে। সুমিত্র আজ বেশ আরাম করে দুটো পা বাংকের উপর তুলে দিয়ে বসল, তারপর ঠাকুমার মুখে শোনা চম্পা এবং আর দুই সখীর গল্প করে চেরিকে আনন্দ দিল। গল্পটা বলতে বেশি সময় নিল না সুমিত্র। বারোটার পর সাহেবদের লাঞ্চ। চেরি খাবে তখন। সুমিত্র এগারোটা বাজতেই উঠে গেল।

বিকেলে বোট—ডেকে গল্প করতে এসে সুমিত্র দেখল চেরি বসে বসে সমুদ্র দেখছে। সে ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর কী ভেবে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই ব্রিজে কাপ্তানের গলা পেল।

সুমিত্র, গুড আফটারনুন।

গুড আফটারনুন, মাস্টার।

কাল আমরা বন্দর পাব।

কখন স্যার?

সন্ধ্যায়।

চেরি এখনও চোখ তুলছে না, অথবা ওদের দেখছে না।

কাপ্তান বলল, বেশ সমুদ্রযাত্রা আমাদের। কোনো ঝড় নেই, সমুদ্র একেবারে শান্ত।

মাস্টার, আকাশ খুব পরিষ্কার।

সারা রাতই ডেকে জ্যোৎস্না। মাদাম কী বলেন? চেরিকে উদ্দেশ্য করে কাপ্তান ব্রিজ থেকে কথা বলতে চাইল।

চেরি মুখ না তুলে এক ধরনের সম্মতিসূচক শব্দ করল।

সুমিত্র চলে যাচ্ছিল, চেরি ডেকে বলল, সুমিত্র, কাল আমরা বন্দর পাব।

আশা করছি।

বন্দরে আমার এক আত্মীয়া এবং এক বন্ধু আসবেন রিসিভ করতে, তুমি তাদের সঙ্গে পরিচয় করবে না?

নিশ্চয় করব। কী রকম আত্মীয় হন তাঁরা?

একজন পিসিমা। অন্যজন পিসেমশায়ের দাদার ছেলে। একটা মোটর কোম্পানির পরিচালক।

এইসব কথার ভিতর কেবলই তোমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বলো তো আর একটা গল্প শোনাই। খুব আনন্দ পাবে।

না, আর রূপকথা নয়। এবার জীবনের কথা বল। আমি জাহাজ থেকে নেমে গেলে তোমার কষ্ট হবে না?

হবে, খুব কষ্ট হবে।

তোমাকে অযথা মন্দ কথা বলেছি।
এ—কথা এখন আর ভালো শোনাচ্ছে না।
হয়তো আর দেখাই হবে না কোনোদিন। অথচ...
দেখা হবে না কেন? জাহাজে যখন কাজ করছি, তখন নিশ্চয়ই দেখা হবে।
সুমিত্র, তুমি তো জিজ্ঞাসা করলে না তোমার জন্য আমার কষ্ট হবে কি না?
তোমারও হবে। সুমিত্র পাশেই বসে পড়ল। বলল, বেশ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।
এই কথা শুনে চেরি ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছিল। অথচ সুমিত্রকে দেখে মনে হল না, সে চেরির বিদায়বেলাতে কোনো দুঃখবোধে পীড়িত হবে। চেরি বলল, আমার কেবিনে এসো। বলে, সে হাঁটতে থাকল।
একটু বসো না, এই সমুদ্র তোমার ভালো লাগছে না?
এখনই সন্ধ্যা হবে। চল, কেবিনে নীল আলো জ্বেলে তোমার গল্প শুনব।
একটা অনুরোধ করলে রাখবে?
বলো। যা বলবে আমি সব করব।
আমাকে ভায়োলিন বাজিয়ে শোনাবে?
শোনাব। কেবিনে চলো।
কেবিনে নয় চেরি। এই বোট—ডেকে। খোলা আকাশের নিচে বসে।
তাই হবে।
এখন রাত নামছে সমুদ্রে। ফরোয়ার্ড পিকে পাহারা দিতে দুজন জাহাজি চলে গেল। ব্রিজে পায়চারি করছেন মেজ—মালোম। ওরা লাইফ—বোটের আড়ালে বসে আকাশ দেখল, নক্ষত্র দেখল। পরস্পর গল্প করতে করতে একসময় ঘনিষ্ঠ হল এবং পরস্পর হাতে হাত রেখে সমুদ্রের গর্জন শুনল যেন যথার্থই কোনো রাজপুত্র কোটালপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে... ছুটছে। চেরি এ সময় গর্ভিণী তিমির মতো উদগ্র আবেগে ছটফট করতে লাগল।
চেরি ভায়োলিন বাজাতে বাজাতে বলল, কেমন লাগছে সুমিত্র?
শীতের নদীতে কাশফুলের রেণু উড়ছে। প্রজাপতি উড়ছে যেন এবং শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে নতুন বউ। কলের গান বাজছে নৌকার পাটাতনে। দুটো ফুটফুটে ছেলেমেয়ে সাদা ফ্রক গায়ে তখন চরের কাশবনে প্রজাপতি খুঁজে বেড়াচ্ছে—টুপাতি চেরির বেহালার বাজনা সুমিত্রর মনে সে রাতে এমন একটা ভাব সৃষ্টি করেছিল।
তারপর অধিক রাতে যখন পরস্পর বিদায় জানিয়েছিল কেবিনে, চেরি সুমিত্রর চোখ দুটোতে চুমু খেল, যে চোখ দুটো দীর্ঘকাল ধরে চেরিকে অনুসরণ করে ফিরছে।
পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জাহাজিরা কিনারা দেখার চেষ্টা করল। আকাশের কিনারায় কোনো দ্বীপ অথবা মাটির রেখা ভেসে উঠছে কি না দেখল। ওরা খবর পেয়েছে, জাহাজ বিকালে নোঙর ফেলবে। এবং রাতে পাইলট—জাহাজ এসে বন্দরে জাহাজ টেনে নেবে। সুতরাং জাহাজিরা মন দিয়ে কাজ করল, ডেকে ফল্কায়, অথবা ড্যারিকে। ফানেলে কেউ রঙ করল। চেরি একবার ডেকে বের হয়ে সকল কিছু দেখে কেবিনে ঢুকে গেছে। এবং সুমিত্র এই ভোরেও বাংকে পড়ে ঘুমোচ্ছে। কাপ্তান—বয় এল এসময়। ফোকসালে ঢুকে ডাকতে থাকল সুমিত্রকে।
সুমিত্র একটা বড় রকমের হাই তুলে বলল, তারপর চাচা, নতুন কিছু খবর আছে?
কাপ্তান যে আবার ডেকে পাঠিয়েছেন।
সুমিত্র ব্রিজে গেলে কাপ্তান বললেন, বিকালে পাইলট ধরবে জাহাজ। সুতরাং তখন থেকে তুমি আর চেরির কেবিনে যাবে না। পাইলট—জাহাজে ওর আত্মীয়স্বজন আসার কথা আছে।
কিন্তু স্যার...।

আমি সব বুঝি সুমিত্র। মনে রেখো, তুমি জাহাজি। কত বন্দরে কত ঘটনা থাকবে। তোমাকে যে একটু দৃঢ় হতে হবে।

সুমিত্র ব্রিজের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল—আকাশ তেমনি পরিষ্কার। জাহাজিরা সকলেই বন্দরের জন্য উদগ্রীব। যত বন্দরের দিকে এগোচ্ছে জাহাজ, তত জাহাজিরা উৎফুল্ল হচ্ছে, সুমিত্রর মনে একটা দুঃসহ কালো মেঘের অন্ধকার নেমে আসতে থাকল। সে ধীরে ধীরে ব্রিজ থেকে নেমে এল। চেরির কেবিন অতিক্রম করার সময় ইচ্ছা করেই আজ আর পোর্টহোলে চোখ তুলে কাউকে খুঁজল না। হাঁটতে হাঁটতে একসময় ক্লান্ত বোধ করল। ফোকসালে ঢুকে নিজের বাংকে চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

বুড়ো কাপ্তান—বয় এসে সুমিত্রর পাশে বসল।

কিছু খবর আছে চাচা?

না। আমি বুঝি কেবল তোমার দুঃসংবাদই বয়ে আনছি?

তেমন কথা কি আমি বলেছি?

কী জানি বাপু, কেবল খবর আর খবর!

চেরি কী করছে চাচা?

সারাদিন বাইবেল পড়ছে।

আমার কথা কিছু বলছিল?

না।

সুমিত্র পাশ ফিরে শুলো। কোনো প্রশ্ন করার ইচ্ছা নেই। কেবল পড়ে পড়ে ঘুমোতে ইচ্ছা হচ্ছে। বন্দরে জাহাজ নোঙর করলে কোনো পাব—এ ঢুকে মদ খাওয়ার শখ হচ্ছে।

বিকেলে সুমিত্র উপরে উঠে গেল। অ্যাফটার—পিকে ভর করে দাঁড়াল। দূর সমুদ্রে পাইলট—জাহাজটা যেন উড়ে চলে আসছে। এ—সময় চেরিকে দেখার প্রত্যাশা করল সুমিত্র। চেরি ওর আত্মীয়ের জন্য গাঙওয়েতে অপেক্ষা করবে। অথচ চেরি নেই। চেরি এখনও কেবিনে পড়ে আছে। সুমিত্র দেখল পাইলট—জাহাজ থেকে ওর আত্মীয়া—পিসি এবং সেই যুবক উঠে আসছে। হাতে বড় বড় দুটো গোলাপের কুঁড়ি। পাইলট সকলের শেষে উঠে এল। কাপ্তান ওদের সকলকে সঙ্গে করে অ্যালওয়েতে ঢুকে গেলেন। সুমিত্র এইসব দেখে কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল।

সুমিত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপ্তান—বয় এবং মেসরুম মেটের সব কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। পাশাপাশি অন্যান্য জাহাজিরাও এসে ভিড় করেছে। জাহাজিরা সুমিত্রকে কোনো প্রশ্ন করছে না। এইসব ঘটনা ওদের সকলকেই অল্পবিস্তর দুঃখ দিচ্ছে। তখন ওরা সকলেই দেখল চেরি এবং ওরা দুজন, কাপ্তান, বড় মিস্ত্রি, পাইলট—ডেক ধরে হাঁটছে। সুমিত্র তাড়াতাড়ি জাহাজিদের ভিতর নিজেকে আড়াল করে ফেলল। সে চেরিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, চেরি সমুদ্রযাত্রায় যেন ভয়ানক দুর্বল। এখন ওরা পরস্পর বিদায়—সম্ভাষণ জানাচ্ছে। ওরা নেমে গেল। সুমিত্র চেরিকে দেখতে পাচ্ছে না এখন। সে ফের নিচে নেমে বাংকে শুয়ে পড়ল।

চেরি চোখ তুলে এই জাহাজের ডেকে কিছু অন্বেষণ করতে গিয়ে গলায় এক দুঃসহ আবেগের কান্না অনুভব করল—কোথাও কোনো অমৃতের চিহ্ন নেই। চোখ দুটো সজল হতে হতে এক রুদ্ধ আবেগে চেরি ভেঙে পড়ল। এই ঘটনায় প্রিয়জনেরা উদ্বিগ্ন; ভাবল, শারীরিক কুশলে নেই চেরি; ভাবল, দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর প্রিয়জন দর্শনে কোনো পরিচিত আবেগের জন্ম হচ্ছে শরীরে। কাপ্তান নিজেও এই বিচ্ছেদটুকু লালন করতে পারলেন না। তিনি ইচ্ছা করে পাইলটের সঙ্গে জাহাজ—সংক্রান্ত কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। কাপ্তান—বয় যখন বখশিশ নিয়ে উঠে আসছিল, চেরি সন্তর্পণে তাকে কাছে ডাকল। একটি চিরকুট দিল, গোলাপের কুঁড়ি দুটো দিল, অথচ কোনো নির্দেশ দিল না, তারপর চেরি পাইলট—জাহাজের পাটাতনে নেমে ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে মুহ্যমান। কিছুই এখন সে দেখতে পাচ্ছে না যে, যেন এক রাজপুত্র ঘোড়ায়

চড়ে ছুটে ছুটে সমুদ্র অতিক্রম করছে এবং হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে আর পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তাই ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে চেরির দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে।

কাপ্তান—বয় ফোকসালে ঢুকে বলল, এই নাও তোমার বকশিশ। বলে, গোলাপের কুঁড়ি দুটো এবং চিরকুটটি পাশে রাখল।

সুমিত্র বলল, পাইলট—জাহাজটা কত দূরে গেছে?

অনেক দূর।

সুমিত্র এবার চিরকুটটি পড়ল।

যখন আমি বুড়ো হব সুমিত্র, যখন নাতি—নাতনিদের নিয়ে সমুদ্রের ধারে রূপকথার গল্প করব, তখন বলব ভারতবর্ষের এই রূপকথার রাজপুত্র সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে কাকাতিয়া দ্বীপের রাজকন্যাকে খুঁজতে বের হয়েছিল। বলব, ঘোড়ায় চড়ে নয়, রথে চড়ে নয়, জাহাজে চড়ে। বলব, কাকাতিয়া দ্বীপের রাজকন্যাকে খুঁজে বের করেছিল, ভালোবেসেছিল, সোনার কাঠি রুপোর কাঠি নিয়ে হাত বদলেছিল, কিন্তু রুপোর কাঠি ইচ্ছা করেই শিয়রে রাখার চেষ্টা করেনি।

শেষে তার কোনো এক প্রিয় কবির দুটো লাইন লিখেছে,

–Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.

সুমিত্র উপরে উঠে রেলিংয়ে ভর করে দাঁড়াল। দূরে পাইলট—শিপ অস্পষ্ট। ক্রমশ তীরের দিকে চলে যাচ্ছে। মনে মনে সেই লাইন দুটো আবৃত্তি করতে গিয়ে বুঝল, পৃথিবী অমৃতময়। চেরি অমৃতময়। দুঃখ এবং বেদনার কিছুই নেই। পিছনে এ সময় কার হাতের স্পর্শে সে ঘুরে দেখল কাপ্তান ওর পিঠে হাত রেখেছেন, বলছেন, আমার কেবিনে এসো সুমিত্র। আজ আমি তোমাকে খ্রিস্টের গল্প শোনাব।

চার

অবনীভূষণ বিজন এবং সুমিত্রর দীর্ঘদিন জাহাজে কেটে গেছে। অবনীভূষণ এখন প্রৌঢ়। বিজন সুমিত্র উত্তরত্রিশের যুবক। ওরা সফরে ক্রমশ এক প্রাচীন নাবিকের গন্ধ মেখে বন্দর থেকে বন্দরে, এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে এবং এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে ঘুরছে। তারপর একই জাহাজে ওরা তিনজন একদা দূর সমুদ্রযাত্রায় বের হয়েছিল। সে রাতও তুষারঝড়ের রাত ছিল। সে ঘটনার সাক্ষী অবনীভূষণ ছিল, বিজন ছিল এবং সুমিত্র ছিল। শুধু এ ঘটনা অথবা কাহিনী একা এক অবনীভূষণের থাকছে না, বিজনেরও থাকছে না, এমনকি সুমিত্রেরও নয়। এ ঘটনা অথবা কাহিনী ওদের সকলের এবং সকল মানুষের।

ফোকসালে সকলেই প্রায় ঘুমোচ্ছিল। কারণ দীর্ঘ সমুদ্রাযাত্রার পর এই বন্দরের আলো—ঘর—বাতি সবই কেমন মুহ্যমান এবং তুষারঝড় হচ্ছে। সুতরাং জাহাজিরা বন্দর দেখে খুশি হতে পারল না। ওরা ডেকে পায়চারি করতে করতে বন্দরের গল্প করল না। ওরা শীতে অবসন্ন, ওরা কম্বল মুড়ি দিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকল।

বিজন গ্যাঙওয়ের পথ ধরে ফিরছিল। গ্যাঙওয়েতে তুষারঝড়টা মুখোমুখি লাগছে। সুতরাং সে হাঁটতে হাঁটতে চিফ কুকের গ্যালিতে চলে এল। হাত পা সেঁকল এবং চা করে আবার সেই শীতের রাজ্যে ঢুকে জাহাজটা পাহারা দেবার সময় দেখল, দূরে কোথাও কোনো আলোর রেখা ফুটে উঠছে না। তুষার—ঝড়ের জন্যে সব কেমন অন্ধকারময়। বসে বসে সে ঝড়ের শব্দ শুনল, সমুদ্র দূরে গর্জন করছে। জাহাজটা নড়ছিল। যেন জাহাজটা হাসিল ছিঁড়ে এবার ছুটবে অথবা জাহাজের শরীরে এক রকমের শব্দ, যা বিজনকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলছে। মাস্টের আলোগুলি দুলছিল—সে দেখতে পেল। বন্দরের আলোগুলি অস্পষ্ট, বরফের কুচি ওদের অস্পষ্ট করে রেখেছে। সে হাতের দস্তানাটা এবার আরও টেনে দিল।

নিচেও কোনো লোক চলাচল করছে না। ক্রেনগুলো দৈত্যের মতো এই জেটির সকলকে তুষারঝড়ের ভিতর পাহারা দিচ্ছে। উইংসের আলো জ্বলছে না। শুধু জাহাজটা নড়ছিল। এতদিনের এই সমুদ্রযাত্রা এবং প্রপেলারের শব্দ, এনজিন রুমের শব্দ তারপর সমুদ্রের ঢেউ—সবই কেমন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সবই কেমন রাতদুপুরে মাঠের নির্জনতায় ডুবে যাওয়ার মতো। সে এবার ধীরে ধীরে উঠল। বসে থাকলেই শীত বেশি করছে। সে পায়চারি করতে লাগল। এবং ডেক পার হলে গ্যালি, পরে সব জাহাজিদের ফোকসাল। বিজন এত দূর পর্যন্ত হেঁটে গেল না। সে পোর্টহোলের কাচের ভিতর দিয়ে বড় মিস্ত্রির কেবিন দেখল। ওর ঘরে নীল লাল মিশ্রিত এক ধরনের আলো। বড় মিস্ত্রি অবনীভূষণ এত রাতেও একটা বই পড়ছেন। অশ্লীল সব বই এবং নগ্ন সব ছবি দেয়ালে দেয়ালে। বড় মিস্ত্রি জাহাজ নোঙর করলে ঘন ঘন রেলিংয়ে ভর করে দূরে কিছু যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন। প্রত্যাশা যেন কিছুর। অন্ধকার জেটিতে কিছু আবিষ্কারের জন্য পাগল। বিজন বলেছিল, স্যার, বন্দরে কেউ নেই। খালি।

কেউ নেই! কথাটা তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

যথার্থই কেউ নেই স্যার।

অবনীভূষণ চোখের চশমা খুলে রুমালে মুছতে মুছতে কথাটা অবিশ্বাস করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ডেসির আসার কথা অথচ ডেসি এল না। তিনি বিড় বিড় করে তুষারঝড়কে ধিক্কার দিচ্ছিলেন। ডেসি এলে এই জাহাজ মনোরম... বড় কামুক গন্ধ এই জাহাজের অলিগলিতে, নোনা জলের ঘন রঙ অথবা সমস্ত বিষাদ সমুদ্রের—ডেসি একা সামলাত। ডেসি এলে ওর ঘরে রাত যাপনের প্রশ্ন উঠত। অন্যান্য সফরের মতো বন্দরের দিনগুলো উপভোগের সুখ পেত। বড়ই দুঃসময়, এমনকি বেশ্যামেয়েরা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হচ্ছে না, কী অনাবশ্যক দিন—শুধু তুষারঝড়, বরফের কুচি উড়ছে আর রাত বলে, আলো কম বলে সমস্ত শহরটা অদ্ভুত রহস্যময় ঠেকছে। দূরে ইতস্তত কোনো কুকুরের চিৎকার, গির্জাতে ঘণ্টা বাজছে এবং অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি যাচ্ছে, জেটিতে একটা মাতাল পুরুষকে পর্যন্ত দেখা গেল না। কী অবিশ্বাস্যভাবে নসিব বদলা নিতে শুরু করেছে। ডেসির জন্য এই প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে বড় মিস্ত্রি রেলিংয়ে ভর করে প্রতীক্ষা করছিলেন। উত্তেজনায় শরীর অধীর হচ্ছিল। কারণ উত্তর অঞ্চলের অন্য বন্দরে ডেসির চিঠি ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল—চিফ, জাহাজ তোমার ভিড়বে রাতে। যত প্রতিকূল অবস্থাই হোক না, আমি উপস্থিত থাকব জেটিতে। তোমাকে নিয়ে ঘরে ফিরব। চিঠিতে সে ওর বেড়ালের জন্য বড় মিস্ত্রিকে কড মাছের চর্বি আনতে লিখেছিল।

বড় মিস্ত্রি অশ্লীল পুস্তকের ভিতর থেকে ডেসির তলপেটের গন্ধ নিচ্ছিলেন যেন। এবং এ সময়ে পোর্টহোলে প্রতিবিম্ব পড়তেই তিনি প্রশ্ন করলেন, কে?

আমি স্যার, সুখানী। বিজন বলল।

অবনীভূষণ শান্ত গলায় বললেন, সুখানী, আমাকে একটু চা খাওয়াবে ভাই। রাত অনেক হল। ঘুম আসছে না। আর এই রাতে বয়দের জ্বালাতন করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বিজন ফের চিফ কুকের গ্যালিতে ঢুকে গেল। চা করল, তারপর চিফ এনজিনিয়ারের দরজাতে দাঁড়িয়ে ডাকল, আপনার চা এনেছি স্যার। দরজা খুলুন।

বড় মিস্ত্রি ভিতর থেকে বললেন, দরজা খোলাই আছে, ভিতরে এসো।

বিজন দরজার ভিতর ঢুকে দেখল, নীল কাচের গেলাসে এখনও লিকার পড়ে আছে। সে টিপয়তে চা রাখল। তারপর বের হতেই শুনল, তিনি ডাকছেন, সুখানী। সুখানী কাছে গেলে বললেন, কোথাও কেউ নেই?

না স্যার।

কোনো ঘরে কেউ আসেনি?

না স্যার।

যথার্থ কথা বলছ?

হ্যাঁ, স্যার। কোনো কেবিনে কেউ আসে নি।

কাপ্তানের ঘর?

ঘর ফাঁকা স্যার।

ঠিক আছে, যাও। বড় সাব অবনীভূষণ কেবিনের সোফায় বসে চা খেলেন। রাত এখন কত? কাচের ঘরে ঘড়ির কাঁটা নড়তে দেখলেন। রাত বারোটা বেজে গেছে। সমুদ্রে এবার একনাগাড়ে কত দিন? দশ মাসের উপর হবে। হোম থেকে কবে বের হয়েছেন—কত কাল আগের যেন সেইসব দিন, সেইসব বন্দর এবং স্ত্রীর কালো দুটো চোখ এখন পোর্টহোলের কাচে দৃশ্যমান। শরীরে তার যৌবন নিঃশেষ অথচ প্রেমটুকু আলোক—উজ্জ্বল দিনের মতো। সবই তিনি স্মরণ করতে পারছেন অথচ ডেসি এল না—ডেক ছাদে কার পায়ের শব্দ। তিনি এবার কম্বল টেনে শুয়ে পড়লেন। কারণ বাইরে তখনও তুষারঝড় হচ্ছে।

বিজন তুষারঝড়ের জন্য চিফ স্টুয়ার্ডের কেবিন এবং অ্যালওয়ের ফাঁকটাতে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকল। এই ফাঁকটুকু থেকে গ্যাঙওয়ে স্পষ্ট। ওর শরীরে এখন ঠান্ডা হাওয়া লাগছে না। জাহাজ কতদিন পর বন্দর পেল অথচ দুর্যোগের জন্য জাহাজিরা কিনারায় নামতে পারছে না। কাল সকালে এবং অপরাহ্ণ বেলায় যখন জাহাজিরা একে একে জাহাজ খালি করে বন্দরে মানুষজন গাছপালা মাটির টানে নেমে যাবে, তখন ওরা কিংস পার্কে অথবা সান্তাক্লজের চূড়ায় উঠে শহর দেখবে তখন... তখন বিজনের বড় ইচ্ছা এই ঠান্ডায় কোনো যুবতীর উত্তাপ, কাপ্তানের ইচ্ছা কিছু উত্তাপ.... তখন বিজন পাশের কেবিনে বড় পরিচিত শব্দ শুনল। শব্দটা মধুর। শব্দটা ভীষণ উত্তেজনাময়—সে স্থির থাকতে পারছে না। সে ধীরে ধীরে দরজায় কান পেতে শুনতে চাইল—কিছুই শোনা যাচ্ছে না, অস্পষ্ট। সে এ সময় অধীর যুবকের মতো দেয়ালে হাত রাখল।

বিজন এই ফাঁকটুকুতে দাঁড়িয়ে শান্তি পাচ্ছে না। পোর্টহোলের কাচে মুখ রাখা যাচ্ছে না। পোর্টহোলের কাচে কিছুই দেখা যাচ্ছে না—সে এই কেবিনের একটা রন্ধ্রপথ খোঁজার জন্য খুব সন্তর্পণে দেয়াল হাতড়ে বেড়াতে লাগল। দরজার পাল্লা ধীরে ধীরে একটু ফাঁক করতে গিয়ে বুঝল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতরে এবং বাইরে আলো বলে বিজন বুঝতে পারছে না, বিজন এবার বাইরের আলো নিভিয়ে এক ঘন অন্ধকার সৃষ্টি করতেই দেখল পোর্টহোলের উপরে যেখানে স্টিম পাইপ আছে তার পাশে গোলাকার ছিদ্রপথ। সে তাড়াতাড়ি টুলটা গ্যাঙওয়ে থেকে নিয়ে মই বেয়ে ওঠার মতো উঠল। মুখটা কিঞ্চিৎ ঢুকিয়ে দেখল ওরা দুজনই পাশাপাশি শুয়ে আছে। ওরা উভয়ে রাতের প্রথম প্রহরে বোধহয় যৌনক্রিয়ায়û মুখর ছিল। এখন শান্ত। এখন ঘর এবং ঘরণীর মতো ওদের মুখচ্ছবি। কোনো অপরাধবোধের চিহ্ন নেই মুখে। যেন কত দীর্ঘ দিনের আলাপ, যেন কত দীর্ঘদিনের প্রেম এবং সহিষ্ণুতা উভয়কে গভীর শান্তিতে আচ্ছন্ন রেখেছে। বিজন, কম্বলের নিচে ওদের নগ্ন এমন এক ছবির কথা চিন্তা করে টুল থেকে নেমে পড়ল। ওর ওয়াচ শেষ হবে এখন। সুতরাং এই নগ্নতা দর্শনে তৃপ্তি নেই, এতে শুধু উত্তেজনা বাড়ে। মেয়েটির রুক্ষ চুলে সুমিত্রর মোটা শক্ত হাত। অন্য হাতটি কম্বলের নিচে নড়ছিল... কম্বলের নিচে মেয়েটির তলপেটের কাছাকাছি কোথাও ইঁদুরের মতো ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে অথবা যেন শরীরের সকল কুশল চিন্তার কথা ভুলে সারারাত যৌনসংযোগে মগ্ন থাকলে সকলই সুখের আকর.... বিজন আর ভাবতে পারল না, সে তাড়াতাড়ি টুলটা হাতে নিয়ে কেবিনের পাশ থেকে সরে গিয়ে কিঞ্চিৎ ছুট দিল। সে ছুটতে ছুটতে বড় মিস্ত্রির কেবিনের পাশে এসে দাঁড়াল এবং বলতে চাইল, স্যার আমি... আমি যথার্থ কথা বলিনি।

এখন বড় মিস্ত্রি দরজা খুললে বলতে হবে স্টুয়ার্ডের ঘরে চটুল রমণী স্টুয়ার্ডকে পতিব্রতা ভার্যার প্রেম এবং সুখ বিতরণ করছে। সুতরাং কাল ভোরে আপনার দরজার পাশ দিয়ে একজন চটুল রমণী উঁচু জুতো পরে

এবং নিতম্বে রস সঞ্চার করতে করতে জেটিতে নেমে যাবে তারপর আমি অভিযোগের করুণ বিষোদগারে জর্জরিত হব, সে ঠিক নয় স্যার। সুতরাং সকল ঘটনার কথা খুলে বলাই ভালো।

সে ডাকল, সাব।

কে বাইরে? কম্বলের ভিতর থেকেই বড় মিস্ত্রি চোখ পিট পিট করে তাকাতে থাকলেন।

আমি স্যার, সুখানী।

ঘরে এসো। শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে।

বিজন দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল এবং বলল স্যার, আমি যথার্থ কথা বলিনি।

যথার্থ কথা বলিনি! তবে আস্তে বলো। দরজাটা ভেজিয়ে দাও। বড় ঠান্ডা হাওয়া আসছে। বাইরের তুষারঝড়টা মনট্রিলের দিকে যাচ্ছে না তো, অথবা ভ্যানকুবার থেকে জাহাজ আসার কথা ছিল—ওরা কিছু মেয়ে আমদানি করতে পারে হয়তো।

না স্যার। সেসব কথা আমি বলছি না। আমাদের জাহাজে এই ঝড়ের মধ্যেও একজন মেয়ে উঠে গেছে। মেয়েটা চিফস্টুয়ার্ডের কেবিনে আছে।

এমত কথায় বড় মিস্ত্রি অবনীভূষণের চোখ গোল হয়ে উঠল। ওঁর বাসি দাড়িগুলি লম্বা হয়ে গেল যেন। তিনি বললেন, এই ঝড়ের রাতে!

আজ্ঞে স্যার।

ভালো কথা নয়।

নয় স্যার।

তুমি দেখলে?

আজ্ঞে দেখলাম স্যার। টুলের উপরে উঠে উঁকি দিয়ে দেখতে হল ঘুলঘুলিতে।

ওরা কী করছে। অবনীভূষণ ঢোক গেলার মতো মুখ করে থাকলেন।

বিজনকে কিঞ্চিৎ লজ্জিত দেখাচ্ছে। সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাই স্যার।

তুমি তো খুব স্বার্থপর লোক হে। আমি একটু দেখতে যাব ভাবছি আর তুমি কিনা বলছ আমাকে একা ফেলে চলে যাবে!

আমার ওয়াচ শেষ হতে দেরি নেই স্যার।

আরে চলো। বলে তিনি কম্বল ছেড়ে উঠে পড়লেন। ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে বললেন, দেখা যাক না ঘটনাটা কেমনভাবে ঘটেছে। বুঝলে সুখানী, ডেসি নামে একটি মেয়ে আমার কেবিনে আসার কথা ছিল। সেজন্য আমার ঘুম আসছে না। আর ডেসি মেয়ের মতো মেয়ে বটে। ডেসি বেশ্যামেয়েদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। সে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেতে পারে। এক এক রাতে পাঁচটা সাতটা লোককে সে হজম করতে পারে।

তাই বুঝি স্যার! সুখানীকে এ সময় ভয়ানক বোকা বোকা লাগছিল।

একে, দেখে কেমন মনে হল?

স্যার, ওরা এখন শুয়ে আছে। তবে ঘুমোয়নি। ঘুমোলে, কম্বলের নিচে স্যার ইঁদুর নাচত না।

রাত গভীর এবং ঝড়ের গতি বাড়ছে। অ্যালওয়ের দরজা বন্ধ। ঝড়টা ভিতরে ঢুকতে পারছে না অথচ বাইরে ভয়ংকর শব্দে যেন আকাশ ফেটে পড়ছে। যেন জাহাজের মাস্তুল এবার ভেঙে পড়বে। ওরা দুজনে সন্তর্পণে এনজিন রুমের পাশ দিয়ে হেঁটে চলল, উভয়ে হেঁটে যেতে থাকল। পাশের কেবিনগুলোর দরজা বন্ধ। অবনীভূষণ খুব মদ টেনেছিলেন বলে গতিতে শ্লথ ভাব। অথবা বয়সের ভারে ঠিকমতো যে হেঁটে যেতে পারছেন না। তিনি বালকেড ধরে ধরে হাঁটছিলেন। শরীরের ওজন ভয়ানক, হাত পা শক্ত এবং নিবিড় এক মদিরতা ওঁকে এই গতির ভিতর আচ্ছন্ন করে রাখতে চাইছে।

বড় মিস্ত্রি চলতে চলতে খুব আস্তে এবং জড়ানো গলায় বললেন, আমার শরীরটা কিঞ্চিৎ মোটা হয়ে গেছে। এতবার এনজিন রুমে নামা—ওঠা করি তবু ভুঁড়ির হেরফের হচ্ছে না। আপদ!

হ্যাঁ স্যার, আপদ!

পেট মোটা থাকলে যৌনতায় আনন্দ পাওয়া যায় না। তৃপ্তি নেই।

বিজন ভাবল, লোকটা মদ খেয়েছে বলে এত কথা বলছে। কারণ সুখানী জানত দিনের বেলাতে বড় মিস্ত্রি অবনীভূষণ গোমড়ামুখো। কোনো কথা নেই—তিনি চুপচাপ এনজিনে নেমে যান অথবা বাংকে শুয়ে শুয়ে অশ্লীল সব বই পড়েন। অথবা ব্রিজের নিচে ছোট একটা ডেকচেয়ারে বসে পাইপ টানতে টানতে দূরের বন্দর, পাইন গাছ এবং সমুদ্র দেখেন। কোনো কথা বলেন না, কোনো হাসি—ঠাট্টা করেন না জাহাজিদের সঙ্গে। তখন তিনি যথার্থই বড় মিস্ত্রি জাহাজের।

বিজন একটু থেমে বলল, স্যার টুলটা নিয়ে আসি। টুলটা না নিলে ঘুল—ঘুলিতে মুখ রাখা যাবে না।

কেবিনের আলো এবং একটি ক্যালেন্ডারের পাতায় সুন্দর এক হ্রদের দৃশ্য অথবা অ্যালওয়ে পার হয়ে অন্য অফিসারদের কেবিন, স্টোর রুম এবং ডাইনিং হল অতিক্রম করে চিফ স্টুয়ার্ডের ঘর—বাংকে বেশ্যা রমণীর সুন্দর চোখ, আর পারা যাচ্ছে না—সে আগে আগে চলতে থাকল, কোনো কথা বলল না। অন্য কেবিনে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাল না।

বিজন ফিস ফিস করে বলল, এসে গেছি।

যে টুলটা বালকেডের পাশে সন্তর্পণে রাখল। বলল, এবারে উঠুন স্যার। সে আঙুল দিয়ে ঘুলঘুলি নির্দেশ করে দিল।

আমাকে উঠতে সাহায্য কর। বড় মিস্ত্রি মাতাল। তিনি কুকুরের মতো উত্তেজনাতে হাঁসফাঁস করছেন।

বিজন অ্যালওয়ের আলোটা নিভিয়ে দিল। বাইরে ঝড় এবং ঝড়ের গতি বাড়ছে। সুতরাং ওদের কথাবার্তার শব্দ ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বড় মিস্ত্রি ফস করে লাইটার জ্বালিয়ে একটা চুরুট ধরালেন। ওদের মুখ এখন বীভৎস রকম দেখাচ্ছে।

বিজন বলল, স্যার এক কাজ করেন?

এখন কোনো কাজের কথা নয়, সুখানী তুমি বড় বেশি কথা বল।

বিজন কোনো জবাব দিল না অথচ মনে মনে গাল দিল। বেঢপ মোটা বামন।

দেখ সুখানী, আমার ভাড়া করা স্ত্রী যদি কাল জাহাজে আসে, তুমি আবার এ সব ঘটনার কথা বলে দিও না। মেয়েটি খুব সুন্দর। বছর পাঁচেক আগে নাইট ক্লাবে ওর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বুঝলে সুখানী, তুমি তো মদ খাও না অথচ মেয়েমানুষের শরীর পেলে পেটুকের মতো কথাবার্তা বলো।

বিজন বলল, স্যার, আপনি আমার ওপরওয়ালার ওপরওয়ালা। আপনার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে ভয় হয়।

সুখানী, আবার তোমার সেই বেশি কথা।

সুতরাং ভয়ে ভয়ে বিজন টুলটা ধরে রাখল। অ্যালওয়ে অন্ধকার বলে ওরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে না।

আমাকে টুলে উঠতে সাহায্য করো। ফের ধমক দিলেন বড় মিস্ত্রি।

চিফ টুলের উপর উঠে সেই ঘুলঘুলিতে চোখ রাখতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে তিনি এই হালকা টুলে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন না। শরীর টলছিল। তিনি একটি শক্ত টুল অন্বেষণ করলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, শক্ত টুল নেই সুখানী?

আছে স্যার। কসপের ঘরে একটা শক্ত টুল আছে। কসপকে ডেকে তুলব?

না, দরকার নেই। বেশি হইচই করো না, সকলে, কুকুরের মতো এখানে এসে ভিড় করবে। এবং কাপ্তান জানলে রাগ করবেন।

বড় মিস্ত্রি এবার টুল থেকে নেমে পড়লেন। ফিস ফিস করে বললেন, বরং তুমি দেখ ওরা কী করছে। যা দেখবে, সব বলবে। কিছু লুকোলে আমি ধরতে পারব।

বিজন টুলের উপর উঠে ঘুলঘুলিতে চোখ রাখল। গরম হাওয়া ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে। স্টুয়ার্ড এবং মেয়েটি সন্তর্পণে এখন কী যেন লক্ষ্য করছে। খরগোসের মতো ভীত চোখ নিয়ে কী যেন দেখছে। ওরা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। বোঝা যাচ্ছে দুজনই উলঙ্গ। ওরা পরস্পর কী বলছে বুঝতে পারছে না বিজন।

বিজনকে কিছু বলতে না দেখে বড় মিস্ত্রি ক্ষেপে গেলেন।—সুখানী, তুমি নেমকহারাম, পাজি। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন।—তুমি নিজে সব দেখছ অথচ আমাকে কিছু বলছ না।

স্যার, ওরা এখন উঠে বসল।

তারপর সুখানী?

ওরা বোধহয় টের পেয়েছে।

মেয়েটি দেখতে কেমন সুখানী?

রোগা স্যার। মেয়েটি এখন আবার কম্বল টেনে শুয়ে পড়ল।

চিফস্টুয়ার্ড তখন ভিতরে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বলছিল, মর্লিন, কারা যেন বাইরে কথা বলছে। যদি টের পায় তবে নিশ্চয় হামলা করবে।

মর্লিন উঠতে চাইল না। বলল, শরীর আর দিচ্ছে না। বাইরে ঝড়, নতুবা চলে যেতাম সুমিত্র।

সুমিত্র খুব দুঃখের সঙ্গে একটা হাত ওর স্তনের নিচে রাখল এবং কাছে টানল। বলল, অ্যালওয়েতে এখনও যেন কারা চলাফেরা করছে। কথা বলছে। অনেকক্ষণ থেকে এটা হচ্ছে। দরজা খুলে দেখব?

এই সুখানী, হারামজাদা! তুমি আমাকে বাগে পেয়ে খুব কলা দেখাচ্ছ হে।

স্যার, ওরা কিছু করছে না।

নিশ্চয় করছে। তুমি আমায় মিথ্যা কথা বলছ।

ভেতরে মেয়েটি বলল, না, আমার শরীর ভালো নেই সুমিত্র। ঠান্ডায় জমে গেছিলাম। এই ঘর আমাকে উত্তাপ দিচ্ছে। আমি আজ আর একটি লোককেও সামলাতে পারব না। সে অন্য পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল। চিফ স্টুয়ার্ড সুমিত্র হাঁটু ভাঁজ করে রাখল মেয়েটির নিতম্বের নিচে এবং বুকে হাত রেখে ঘন হয়ে শুতে চাইল। অথচ শান্তি পাচ্ছিল না। সে ফের উঠে বসল। পোর্টহোল খুলে সমুদ্রের গর্জন শুনতে চাইল। ওর শরীর নগ্ন। ঠান্ডা হাওয়া ওকে কাঁপিয়ে তুলছে। স্টুয়ার্ড তাড়াতাড়ি রাতের পোশাক পরে বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে শুনল, বাইরে চেঁচামেচি, সুতরাং সে একটা হাই তোলার চেষ্টা করল।

স্যার, আমি মিথ্যা বলছি না।

তুমি আলবাৎ বলছ। খুব আস্তে অথচ ক্ষুণ্ণ গলায় বললেন বড় মিস্ত্রি।

বিজন মরিয়া হয়ে বলল, বলেছি তো বেশ করেছি।

বেশ করেছ! তুমি বেশ করেছ! আচ্ছা... এইটুকু বলে বড় মিস্ত্রি কড়া নাড়লেন, স্টুয়ার্ড, দরজা খোল। আমি বড় মিস্ত্রি। কিন্তু ভিতর থেকে কোনো শব্দ হল না বলে তিনি ফের বললেন—আমি। স্টুয়ার্ড আমি কোনো হামলা করব না। তুমি বললে আমি তিন সত্যি করতে পারি।

তুষারঝড় সকলকেই নিঃসঙ্গ করে রেখেছে। দীর্ঘদিনের সমুদ্রযাত্রা অতিক্রম করার পর এই বন্দর, বন্দরে আলো অথবা কোনো রাস্তার নিচে বেশ্যা রমণীর আপ্যায়ন ওদের জন্য প্রতীক্ষা করল না। বড় সাহেবের ডেসি আসেনি, সুখানী বাইরে গিয়ে একটু মদ গিলতে পারেনি অথবা রমণীর মুখ দর্শন যেন কত কাল পর, কত দীর্ঘ সময় ধরে ওদের নোনা জলের চিহ্ন মুখে, রমণীর নরম নরম মুখ এবং চাপ চাপ আস্বাদন সবই কোন অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত।

এই দিকের কেবিনগুলি ফাঁকা। স্টুয়ার্ডের একমাত্র কেবিন, পরে ডাইনিং হল, সামনে ছোট ঘর অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য। ডেকের নিচে মাংসের ঘর তারপর সোজা সব ফাঁকা কেবিন, কারণ এই শীতের অঞ্চলে

কোনো যাত্রী ওঠেনি। কেবিনে সুতরাং কোনো মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। স্টুয়ার্ড এসব জেনেই মেয়েটিকে অন্ধকার জেটির ওপর থেকে তুলে সিঁড়ি ধরে জাহাজে নিয়ে এসেছিল—কারণ সে জেটি থেকে তখন দেখেছে গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার নেই, সুতরাং এটাই উপযুক্ত সময়। সে সময়ের সদ্ব্যবহার করেও কোনো ফল লাভ করতে পারল না, এত সতর্কতা তবু সব কেমন ফাঁস হয়ে গেল! চিৎকার এবং হামলা আরও বেশি হতে পারে ভেবে সে দরজা খুলে দিল। ভয়ানক শীত এই অ্যালওয়ের অন্ধকারে। কেবিনের আলোতে সে বড় মিস্ত্রির পাথরের মতো চোখ দুটো দেখল। এই সময় চিফস্টুয়ার্ডকে অদ্ভুত রকমের তোতলামিতে পেয়ে বসল।

বড় মিস্ত্রি কেবিনের ভিতর ঢুকে গেলেন। বললেন, আমি তিন সত্য করছি স্টুয়ার্ড, আমি কোনো হামলা করব না। আমাকে একটু সুখ দাও। আমি তবেই চলে যাব। কেমন বেহায়া এবং নির্লজ্জ ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন বড় মিস্ত্রি। তিনি ধমকের সুরে বিজনকে ডাকলেন, এসো। নচ্ছার সব জাহাজি। এটা তোমার বাড়ি নয় সুখানী! এখানে মা বাবা ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে আসবে না, এসো।

সুখানী ভালো ছেলের মতো বড় মিস্ত্রিকে অনুসরণ করল। সে কেবিনের ভিতর ঢুকল না। সে দরজার একটা পাল্লা ধরে উঁকি দিল মাত্র। স্টুয়ার্ডের সবকিছু দেখছে। ভয়ে ওর তোতলামি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। বড় মিস্ত্রির চোখ দুটো চক চক করছে এবং হননের ইচ্ছাতে একাগ্র। জানোয়ারের মতো উদগ্র লালসা মুখে, অবয়বে। সে দেখল, বড় মিস্ত্রি চেয়ার টেনে বসেছেন, দেয়ালে বিচিত্র সব নগ্ন ছবি এবং এই বাংকের অন্য পাশে মর্লিন—ওর কোমল ত্বকের গন্ধ অথবা মুরগির মতো নরম কলজের উত্তাপ বড় মিস্ত্রিকে এতটুকু অন্যমনস্ক করছে না। সে ঘরের ভিতর নিমন্ত্রিত অতিথির মতো বসে থাকল।

মর্লিন কম্বলের ভিতর থেকে উঁকি দিল। ওর সোনালি চুল বালিশের উপর, ওর নীল চোখ শান্ত। বড় মিস্ত্রির বিদঘুটে শরীর ক্রমশ পাশবিকতায় আচ্ছন্ন হচ্ছে। মর্লিন কম্বলের ভিতরে এসব দেখে ভয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে। সে অন্য একটি মুখ দেখল দরজার পাশে। সে মনে মনে বড় মিস্ত্রিকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাইল, ম্যান, আমি জানি তোমাকে নিয়ে কোন কোন ভঙ্গিতে ক্রীড়াচাতুর্য প্রদর্শন করলে তুমি দু'বার, তিনবার অত্যধিক চারবার... কিন্তু শরীর ভালো নেই, বড় কষ্ট এই শরীরে, শীতে শরীর মুখ বিবর্ণ এবং ভিতরে ভয়ানক যন্ত্রণায় ভুগছি। তুমি আজকের মতো রেহাই দাও। এই দুর্যোগ যাক, বসন্ত আসুক—তখন তোমার কত টাকা আমার কত সুখ বিদ্যমান, দেখাব। অথচ মর্লিন কিছু বলতে পারছে না। ভয়ে ওর শরীর কেবল গুটিয়ে আসতে থাকল।

সুখানী দেখল, বড় মিস্ত্রি কেমন পাগলের মতো করছেন। পোশাক আলগা করার সময় তিনি দরজা খোলা কী বন্ধ পর্যন্ত দেখছেন না। সুতরাং সুখানী নিজেই দরজাটা টেনে দিল।

বড় মিস্ত্রি দুটো শক্ত হাত ওর সোনালি চুলের ভিতর ঠেসে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লেন। তিনি মর্লিনের চুলের ভিতর মুখ গুঁজে দিলেন। মর্লিন মৃতপ্রায় পড়েছিল। বড় মিস্ত্রি কম্বলটা শরীর থেকে বাঁ হাতে ঠেলে দিলেন। ঠোঁট দুটো নীল, বিবর্ণ। ঠোঁট দুটো কামড়ে দেবার সময় দেখলেন, কেমন সাপের মতো পিছলে যাচ্ছে। অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় বলছে, ম্যান আমাকে মেরে ফেলো না। আমি আর পারছি না।

মর্লিনের মুখ থেকে তখন থুথু উঠছিল। বাইরে বড় মাস্টের আলোগুলো দুলছে। মেসরুমে বাতি জ্বলছিল। মনসুর আসবে এ সময়। ওর এখন ওয়াচ। মনসুরকে ডাকতে হবে। যতক্ষণ না ডাকবে ততক্ষণ মনসুর শুয়ে থাকবে। সুতরাং সুখানী বিরক্ত হচ্ছে। বড় বেশি সময় নিচ্ছে বড় মিস্ত্রি। সুখানী দরজা ঠেলে উঁকি দিতেই দেখল বড় মিস্ত্রি বড় বেশি বেহুঁস। সে ভিতরে ঢুকে পড়ল। মর্লিনের শরীর থেকে সুখানী বড় মিস্ত্রিকে শক্ত হাতে ঠেলে ফেলে দিল। তারপর টানতে টানতে দরজার বাইরে এনে বলল, আপনি দাঁড়ান। বেশি ইতরামি করলে ভালো হবে না। বলে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বড় মিস্ত্রি অবনীভূষণ অসহায় পুরুষের মতো স্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখলে কাণ্ডটা, কাল আমি ওকে দেখব।

স্টুয়ার্ড বলল, বড় দুর্বল স্যার। শীতে কষ্ট পাচ্ছিল। আমি জাহাজে তুলে এনেছি। টাকা তো মুফতে দেওয়া যায় না। তাই রয়ে সয়ে একটু সুখ নিচ্ছিলাম।

ওরা দুজনই চুপচাপ বালকেডে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল।

স্টুয়ার্ড অত্যন্ত বিচলিতভাবে কথা বলতে থাকল, স্যার, এটা অত্যাচার হচ্ছে ওর উপর। একটা রুগণ মেয়েকে দীর্ঘ সময় ধরে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

তার জন্য আমি কী করতে পারি। বলে, তিনি অ্যালওয়েতে পায়চারি করতে থাকলেন। অন্ধকার আলওয়েতে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সেই থেকে থেকে আগের মতো সমুদ্রগর্জন ভেসে আসছে। তুষারঝড়ের গতি কমছে কী বাড়ছে অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে বড় মিস্ত্রি টের করতে পারলেন না। তিনি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিরক্ত গলায় বললেন, সুখানী বড় দেরি করছে। স্টুয়ার্ডের দিকে এখন নজর বড় মিস্ত্রির। স্টুয়ার্ড এখনও কিছু বলছে না।

তোমার নিশ্চয়ই স্টুয়ার্ড যেতে ইচ্ছা করছে ভিতরে?

স্যার, আপনার কথার উপর আমার কথা বলা সাজে না।

বড় মিস্ত্রি ভাবলেন, এবার কড়া নাড়বেন দরজার। কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। বিজনকে খুব বিব্রত দেখাচ্ছে। চোখ মুখ উদ্বিগ্ন। বলল, স্যার ঘরে মদ আছে? মেয়েটা কেমন করছে স্যার! বড় নিস্তেজ, একটু মদ দিলে হত।

সুমিত্র বলল, স্যার, আমি আগেই বলেছি এত ধকল সে সহ্য করতে পারবে না।

বড় মিস্ত্রি চিৎকার করে বলতে চাইলেন, তুমি একটা অমানুষ, সুখানী। অথচ বলতে পারলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, তুমি একটা পশু, তুমি পশু সুখানী।

স্যার বিশ্বাস করুন, আমি কিছু করিনি।

কিছু করনি!

না স্যার, শুধু আদর করছিলাম। কিন্তু কেবল দেখছি মুখ থেকে ওর থুথু উঠছে সাদা সাদা ফেনার মতো। আমি বারবার আলোতে মুখ দেখলাম। জল দিলাম খেতে। খেল। ফের ওরকম হতেই দরজা খুলে দিয়েছি। আপনারা আসুন।

স্টুয়ার্ড কথা বলতে পারছিল না। বড় মিস্ত্রি বিমূঢ়। নেশার রঙ মুছে যাচ্ছে। এবং তিনি এই সময় সারিবদ্ধ উট দেখলেন, ওরা মরুভূমির উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সারিবদ্ধ উটের দলটা একটা নগ্ন মানুষকে উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শুধু। মানুষটার হাত—পা বাঁধা। তিনি প্রায় চিৎকার করে ওঠবার ভঙ্গিতে বললেন, ওদিকের দরজা বন্ধ করে দাও। আলো নেভাও বাইরের। স্টোর থেকে মদ নিয়ে এসো।

ওরা ভিতরে ঢুকে বাংকের পাশে দাঁড়াল। সবুজ গাউনটা পাশ থেকে তুলে মর্লিনের কোমর পর্যন্ত টেনে দেওয়া হল। সুখানী পায়ের দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে। মর্লিনের বড় বড় চোখ দুটো স্থির। বিবর্ণ হাত দুটো বুকের উপর। মুখের রঙ জলের সঙ্গে গলে গেছে। সাদা এবং অদ্ভুত এক অবয়বের মুখ যা দেখলে ভয় ভীতি ক্রমশ মানুষকে গ্রাস করে।

বড় মিস্ত্রি বললেন, মর্লিন মরে যাচ্ছে সুখানী।

স্টুয়ার্ড বলল, যথার্থই মরে যাচ্ছে মর্লিন?

বড় মিস্ত্রি পুনরাবৃত্তি করলেন, মর্লিন মরে যাচ্ছে সুখানী।

সুখানী বলল, কোনো ডাক্তার....?

ও বাঁচবে না। ডাক্তার ডাকলে সকলে ধরা পড়ে যাব।

স্টুয়ার্ড অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাল, স্যার, আমরা ওকে মেরে ফেললাম।

বড় মিস্ত্রি ধমক দিলেন, আস্তে কথা বল। এত বেশি বিহ্বল হবে না। পোর্টহোল খুলে দেখ ঝড়ের গতি কীরকম? এবং বড় মিস্ত্রি এই নিশ্চিত মৃত্যু জেনে যেন বলতে চাইলেন, এতটুকু পাশবিকতা যে সহ্য করতে

পারে না তার মরাই উচিত।

সুখানী পোর্টহোলের কাচ সন্তর্পণে খুলে মুখ গলাবার চেষ্টা করল। বাইরে ঝড়। এবং জলের উপর অন্ধকার। দূরে সমুদ্রের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটা জাহাজ দেখল সে বাইরে। জাহাজটা লকগেট দিয়ে বন্দরে ঢুকছে। সে সমুদ্রের বুকে পাহাড়টা দেখল, আলো, ঘর বাড়ি দেখল। জাহাজটা এখন এখানেই নোঙর ফেলবে। সে জাহাজিদের হাড়িয়া—হাপিজের শব্দ এবং যাত্রীদের কোলাহল এই পোর্টহোল থেকেই শুনতে পেল। সে বলল, ঝড় কমে যাচ্ছে স্যার। তারপর বলল, পাশে একটা জাহাজ নোঙর ফেলছে।

বড় মিস্ত্রি হাঁটু গেড়ে বসলেন মর্লিনের পাশে। ওর কপালে মুখ হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। বড় মিস্ত্রি ভিতরে খুব কষ্ট অনুভব করছিলেন। ভয়ানক কষ্টবোধে তিনি সুখানীর কোনো কথা শুনতে পাচ্ছেন না। স্টুয়ার্ড স্টোর রুমে গেছে মদ আনতে; তিনি ভালো করে মর্লিনের শরীর ঢেকে বসে আছেন। একটু মদ খেলে যদি উত্তেজনা আসে। অথবা বাঁচবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর ইচ্ছা হল মেজ মালোমকে ডেকে এই ঘটনার কথা, ওষুধের কথা অথবা কোনো বুদ্ধির জন্য... তিনি আর ভাবতে পারছিলেন না। স্টুয়ার্ড এ সময় মদ এনে ওর মুখে ঢেলে দিলে, মদটুকু ঠোঁটের কস বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

স্টুয়ার্ড বলল, কী হবে স্যার!

বড় মিস্ত্রি বললেন, জানতে পারলে ফাঁসি হবে।

এই ধরনের কথায় চোখ গোল গোল হয়ে উঠল স্টুয়ার্ডের। সে দ্রুত বলে চলল, আসুন, তবে ওকে পোর্টহোল দিয়ে জলে ফেলে দিই স্যার। কেউ টের পাবে না।

ওকে ভালো করে মরতে দাও। তা ছাড়া বাইরে যাত্রীজাহাজ এসে থেমেছে।

এখন অনেক রাত স্যার। আসুন ওকে জেটিতে ফেলে আসি।

গ্যাঙওয়েতে সুখানী মনসুর আছে। এইসব ঘটনা কাক—পক্ষীতে টের পেলে পর্যন্ত কপালে দুঃখ থাকে।

কী হবে স্যার? আগে এমন ঘটবে জানলে মর্লিনকে তুলে আনতাম না স্যার। কী কুক্ষণে এই বন্দরে এসেছি। ঝড় ঝড় শুধু ঝড়।

ওদের ভিতর নানা ধরনের কথা হচ্ছিল। এবং এইসব বিচিত্র সংলাপ ওদের তিনজনকেই সাময়িকভাবে এই মৃত্যু সম্পর্কে নির্বিকার করে রাখছে। এ সময় ওরা তিনজনই ওর পাশে বসল। বড় মিস্ত্রি বললেন, এসো, আমরা তিনজনই ওকে কোলে নিয়ে বসে থাকি। ওর মৃত্যু আমাদের জানুর উপর সংঘটিত হোক—এমত এক আবেগদীপ্ত কথায় অবনীভূষণ চোখ বুজলেন। তাঁর মনেই হল না শরীর থেকে যেসব জাহাজি যন্ত্রণা নেমে এই মেয়েটির দুর্বল শরীরে গরল ঢেলেছে তারা এখনও একই শরীরে বিদ্যমান। তিনি যেন কোনো এক উপাসনা গৃহে বসে আছেন এমতই এক গভীর প্রত্যয়ের চোখ। তিনি বললেন, এসো ওকে আমরা শান্তিতে মরতে দিই। কারণ আমরা জানি না ওর নিকট আত্মীয় কেউ আছেন কি না, আমরা কোনো পুরোহিতকেও ডাকতে পারছি না, সুতরাং ঈশ্বরের নাম আমরাই স্মরণ করাব। আর এই গৃহই আমাদের উপাসনাগৃহ।

কেবিনের নীল দেয়ালে একটা মাকড়সা অনবরত নিচ থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে। ওদের তিনজনের কোলের উপর মর্লিনের মুখ, শরীর। দেয়ালে পা ঠেকে আছে। মর্লিনের শরীর কম্বল আবৃত। র‍্যাকে ওর ওভারকোট। হাতের দস্তানা নীল রঙের। চোখ দুটো মর্লিনের ক্রমশ সাদা হয়ে আসছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। ওরা তিনজনই এই মৃত্যুর দ্বারা অভিভূত হচ্ছিল এবং মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ভাবছিল। ওরা দেখল—চোখ দুটো সাদা হতে হতে একেবারে স্থির হয়ে গেল। একটা ঢেকুরের মতো শব্দ, তারপর মৃত্যু।

ওরা মর্লিনের মৃত শরীর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বড় মিস্ত্রি পায়চারি করলেন কেবিনে। দেয়ালে শরীর রেখে মর্লিনের মুখ দেখছিল সুখানী। সে একটু হেঁটে গিয়ে কম্বল দিয়ে মর্লিনের মুখটা ঢেকে দিল। স্টুয়ার্ড দেয়ালে টাঙানো নগ্ন চিত্রের ক্যালেন্ডার থেকে—আজ কত তারিখ, কী মাস, কী বছর এবং বন্দরের নামটা পর্যন্ত

তুলে আনল। স্টুয়ার্ড, বড় মিস্ত্রি এবং সুখানীর নির্বিকার ভঙ্গি দেখে দুঃখিত হল। সে বলল, স্যার, সারা রাত আমরা মড়া আগলে পড়ে থাকব।

বড় মিস্ত্রি কী ভেবে যেন দরজা খুললেন, এবং বাইরে যাবার উপক্রম করতেই সুখানী হাত চেপে ধরল, স্যার, আপনি আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছেন?

তোমাদের ফেলে যাচ্ছি না সুখানী। মর্লিনের জন্য বাইরে একটু জায়গা খুঁজতে যাচ্ছি।

সুখানী বলল, দরজা বন্ধ করে দেব স্যার?

দাও। বড় মিস্ত্রি অ্যালওয়ে ধরে হাঁটতে থাকলেন। গ্যাঙওয়েতে মনসুর বসে আছে। তিনি গ্যাঙওয়েতে নেমে যেতেই মনসুর উঠে দাঁড়াল এবং আদাব দিল। তিনি লক্ষ্য করলেন না ওসব। তিনি জাহাজময় ঘুরে জেটিতে, জেটির জলে মর্লিনকে ফেলে রাখবার জন্য জায়গা খুঁজতে লাগলেন। তিনি কোথাও জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি দেখলেন সর্বত্র এক নিদারুণ নিরাপত্তার অভাব। তিনি দেখলেন, সর্বত্রই যেন কে জেগে আছে। ওঁদের এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এ সময়ে ওঁর ফের মদ খেতে ইচ্ছা হল। কিন্তু এ সময় মদ খাওয়া অনুচিত কারণ মর্লিনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই এখন একমাত্র কর্তব্য। তিনি তারপর দেখলেন ডেকের উপর থেকে একটা শুকনো পাতা উড়ে উড়ে সমুদ্রের দিকে চলে যেতে থাকল। তিনি ভাবলেন, মর্লিনের শরীরে কোনো কোনো আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান..... মর্লিন একবার ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিল অথবা পাশবিকতার চিহ্ন এখনও ওর শরীরে বিদ্যমান কি না অথবা সুখানী এবং স্টুয়ার্ডের শরীরে মাংস ভক্ষণের মতো উদগার নিক্ষেপ করেছে কি না, যা ওদের তিনজনকেই গ্রাস করবে.... তিনি ছুটতে থাকলেন, তিনি তাড়াতাড়ি কেবিনের কাছে এসে ফিস ফিস করে বললেন, স্টুয়ার্ড, দরজা খোল— স্টুয়ার্ড! স্টুয়ার্ড!

কেবিনের দরজা খুললে তিনি ঝড়ের মতো ঢুকে মর্লিনের শরীর থেকে কম্বল তুলে নিলেন। ওর শরীরের শেষ আবরণটুকু খুলে ঝুঁকে পড়লেন শরীরের উপরে। সুখানী এসো, স্টুয়ার্ড এসো। বড় মিস্ত্রি চিবুকের নিচে হাত রেখে বললেন, এই দাঁতের চিহ্ন কার?

সুখানী অত্যন্ত সংকুচিত চিত্তে বলল, স্যার আমার। মর্লিনের সামনে মিথ্যা বলে পাপ আর বাড়াতে চাই না।

বড় মিস্ত্রি তীক্ষ্ণ চোখে মর্লিনকে দেখতে লাগলেন। সুখানীর কথার সঙ্গে নিজেও বিড় বিড় করে বললেন, শরীরের এসব চিহ্ন দেখে পুলিশ ধরে ফেলবে।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যাবে!

আমাকেও নেবে। বড় মিস্ত্রি একবার সুখানীর দিকে তাকালেন।

সুখানী বলল, বড় অমানবিক!

স্টুয়ার্ড বলল, এই তুষারঝড় এ—জন্য দায়ী।

বড় মিস্ত্রি বললেন, পুলিশের ঘরে আমাদের বিচার হওয়াই উচিত। সুতরাং এসো, ওকে এখন আর কোথাও নিক্ষেপ না করে এখানেই ফেলে রাখি।

এইসব কথা বলার পর সকলে দাঁড়িয়ে থাকল। সকলে পরস্পরকে চোখ তুলে দেখল।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, যা হয় তাড়াতাড়ি করুন।

সুখানীর সঙ্গে তোমার এখানেই ফারাক। এসব কাজ তাড়াতাড়ি হয় না।

তাড়াতাড়ি হয় না?

না, হয় না।

স্যার আপনি ঠিক কথা বলেছেন!

আমাদের এখন ভাবতে হবে কোনো অপরাধই আমরা করিনি। এখন শুয়ে পড়লে ঘুমোতে পারব এমন মনের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলেই এই হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। যদিও আমরা জানি মনের

এমন অবস্থা সৃষ্টি করা অসম্ভব। সুতরাং বোস।

বড় মিস্ত্রি ফের বললেন, একটু কফি হলে ভালো হত। সুখানী কী বলছ।

তা মন্দ নয় স্যার।

স্টুয়ার্ড কিন্তু বের হতে চাইল না। কারণ ওর ভয় কফি আনতে গেলেই ওরা এই কেবিন ছেড়ে চলে যাবে এবং ভোরবেলায় যখন সব জাহাজিরা,—তখনও অন্ধকার থাকবে ডেকে, তখনও সূর্য ভালো করে আকাশের গায়ে ঝুলবে না,—সকল জাহাজিরা ডেক—ছাদ অথবা এনজিনে নেমে যেতে শুনবে স্টুয়ার্ডের ঘরে একজন তরুণীর মৃতদেহ—কম্বলের নীচে স্টুয়ার্ড মৃতদেহটিকে আড়াল করে রেখেছিল।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার আমার মাথার ভিতরটা কেমন ফাঁকা ঠেকছে। তারপর ওদের উত্তর করতে না দেখে বলল, স্যার, আসুন মর্লিনকে পোর্টহোল দিয়ে জেটির জলে ফেলে দি।

যখন লাশ ফুলে ফেঁপে জলের উপর ভেসে উঠবে, যখন দাঁতের কামড় দেখে তোমার দাঁতের চিহ্ন নেবে, তখন...?

কোথাও কোনো উপায় নেই।

আপাতত দেখতে পাচ্ছি না।

সুখানী বলল, বড় দুঃখজনক পরিস্থিতি।

বড় মিস্ত্রি অন্যমনস্কভাবে মর্লিনের দস্তানা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন।

স্টুয়ার্ড যেন ক্ষেপে গেল।—স্যার, আমার কেবিনে এসব হচ্ছে! আপনারা আমাকে জপাতে চাইছেন। আপনারা যদি আমাকে এ কাজে সাহায্য না করেন আমি একাই ওকে বয়ে নিয়ে যাব। স্টুয়ার্ড তাড়াতাড়ি কম্বলের ভিতর থেকে মর্লিনকে তুলে কাঁধে ফেলল তারপর দরজা দিয়ে বের হতেই মিস্ত্রি ওর হাত চেপে বলল, তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

স্টুয়ার্ড এবার কেঁদে ফেলল, স্যার, আপনারা এ সাংঘাতিক ঘটনাকে আমলই দিচ্ছেন না! আমাকে আপনারা ফাঁসিয়ে দিতে চাইছেন। ঘরে আমার স্ত্রী আছে, সন্তান—সন্ততি আছে।

এইসব কথায় তিনি যথার্থই অভিভূত হলেন। তিনি ধীরে ধীরে ওর কাছে এগিয়ে গেলেন। চোখ মুখ উদ্বিগ্ন। এবং অবিবাহিত জীবনের কিছু সুখদুঃখের কথা স্মরণ করতে পেরে যেন বলতে চাইলেন, স্টুয়ার্ড তুমি আমি সকলে এক সরল পাশবিকতার মোহে আচ্ছন্ন। কখনও ঘরে, কখনও উঠোনে এবং দূরের যব গম ক্ষেতের ভিতর নগ্ন শরীর আমাদের শুধু কামুক করে তোলে। অথবা এই জাহাজ আমাদের কত দীর্ঘ সময় সমুদ্র এবং আকাশের ভিতর আবদ্ধ করে রেখেছে—শুধু নোনা জল, কখনও প্রবাল দ্বীপ এবং নির্জনতা জাহাজের অস্থির এনজিনের শব্দ, দেয়ালের উলঙ্গ সব ছবি আমাদের নিরন্তর নিষ্ঠুর করে রাখছে। সুতরাং দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর বন্দর এবং রমণীর দেহ স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। মর্লিন মরে গেছে। এসো, ওর শরীর আমরা সযত্নে রক্ষা করি। বন্দরে ঝড়। এ অঞ্চলে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত। দেশটাতে এখন শীতের শেষ—কুয়াশা লেগেই থাকবে। ডেসি এমন দিনে আসবে না।

এতক্ষণ সকলকে চুপচাপ থাকতে দেখে সুখানী মর্লিনের চুল মুঠোর ভিতর তুলে বলল, স্যার দেখুন, এই সোনালি চুল কী অপূর্ব! সুখানী ভাবল, কীভাবে আর কথা আরম্ভ করা যায়। স্টুয়ার্ড ভয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদছে। সুখানী দুঃখিতভাবে বলল, এই সোনালি চুলে মর্লিন স্যার সুগন্ধ তেল মাখত। গন্ধটা কিন্তু এখনও জীবিত মেয়েদের মতো, তারপর সে একটা ঢোক গিলে বলল, স্যার, আপনি পর্যন্ত ভয়ে টেসে গেলেন! কথা বলছেন না! চুপচাপ বসে মর্লিনের হাতের দস্তানা আপনার শক্ত হাতে গলাবার চেষ্টা করছেন। স্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে বলল, এসো, তোমাকে লাশটা নামিয়ে রাখতে সাহায্য করছি।

বড় মিস্ত্রি বাংক থেকে নেমে পোর্টহোলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাচের ভিতর থেকে পাশের জাহাজ স্পষ্ট। কাচ খুলে দিলে জাহজিদের শব্দ পেলেন, যাত্রীজাহাজ বলেই সেখানে মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি পোর্টহোলে মুখ রেখে ভাবলেন, এই পোর্টহোল দিয়ে লাশটাকে হাড়িয়া করে দেওয়া যাক। স্টুয়ার্ডের

ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কান্না আর ভালো লাগছে না। বস্তুত বড় মিস্ত্রি নিজেও এই মৃতদেহ নিয়ে কী করা যাবে ভেবে উঠতে পারছেন না। তাঁর মাথার ভিতরও শূন্যতা এসে আশ্রয় করেছে। তিনি পোর্টহোলে মুখ রেখেই বললেন, স্টুয়ার্ড, সুখানি মর্লিনকে কাঁধে নাও। তাড়াতাড়ি পোর্টহোল দিয়ে গলাবার চেষ্টা করো বলে, তিনি পাগলের মতো পোর্টহোলটাকে টেনে ফাঁক করবার চেষ্টা করতে থাকলেন।

সুখানী বলল, স্যার, আপনারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল।

বড় মিস্ত্রি গোল গোল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তবে আমরা কী করতে পারি সুখানী? সমস্ত জাহাজ ঘুরে দেখলাম মর্লিনকে কোথাও রাখা যাচ্ছে না। যেখানেই রাখতে যাব— সেখানেই ধরা পড়ে যাচ্ছি। তারপর তিনি থেমে থেমে বললেন, আহা, ওকে যদি সমুদ্রে নিয়ে যেতে পারতাম! সমুদ্রে ফেলে দিলে কোনো চিহ্নই পাওয়া যেত না।

সুখানী বলল, স্যার তবে আসুন, ওকে বরফ ঘরে রেখে দি। ভেড়া গোরুর সঙ্গে পড়ে থাকবে। কেউ টের করতে পারবে না। জাহাজ সমুদ্রে গেলে ওকে ফেলে দেওয়া যাবে।

বড় মিস্ত্রির কপাল কুঁচকে উঠল। তিনি আড়চোখে সুখানীর দিকে চাইলেন। যেন, সুখানী এখানে একমাত্র বুদ্ধিমান এবং স্থিরচিত্ত পুরুষ। সুতরাং তিনি ওর উপরই নির্ভর করতে পারেন এমত এক নিশ্চিন্ত মত পোষণ করছেন মনে মনে। তিনি বললেন, স্টুয়ার্ড কী বলে?

স্টুয়ার্ড কোনো কথা বলছে না। সুখানী ওদের দুজনকে অনুশাসনের ভঙ্গিতে বলল, তবে আর দেরি করে লাভ নেই। ওকে কাঁধে তুলে নেওয়া যাক।

মর্লিনের হাত পোর্টহোলে গলানো ছিল এবং মাথাটাও। পোর্টহোল থেকে ওর শরীর ঝুলে পড়ছিল। স্টুয়ার্ড ওর কোমর একটু উপরে তুলে রেখেছে। বড় মিস্ত্রি ডানদিকে দাঁড়িয়ে মর্লিনের তলপেটের নিচে হাত রেখে স্টুয়ার্ডকে ধরে রাখতে সাহায্য করছিলেন।

ওরা তিনজন মিলে মর্লিনকে বাংকে শুইয়ে দিল। ওরা প্রথমেই দরজা খুলে দিল না। সুখানী এখন মাঠে দাঁড়িয়ে কোনো সেনাবাহিনীকে যেন নির্দেশ দিচ্ছে। সে বলল, স্যার, দরজা খোলার আগে আমাদের কান পেতে শুনতে হবে, বাইরে কোনো শব্দ হচ্ছে কিনা। তারপর দরজা খুলে একজনকে ডাইনিং হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অন্য কেউ যদি আসে তবে শিস অথবা হাতের ইশারা। ইতিমধ্যে মর্লিনকে রসদঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর ফের দরজা বন্ধ করে ছাদের ঢাকনা খুলে মর্লিনের লাশ নিচে হাড়িয়া করে দিলেই ভয় থেকে নিষ্কৃতি। সে রাজ্যটা চিফস্টুয়ার্ডের একান্ত নিজস্ব। এবং আশা করব জাহাজ যতদিন না বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে যায় ততদিন স্টুয়ার্ড মর্লিনকে আগলে রাখতে পারবে। তাই বলে সুখানী স্টুয়ার্ডের কাঁধে চাপ দিল।

এনজিন রুমে নেমে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ। অ্যাকোমোডেশান ল্যাডার ধরে ডেক—ছাদে উঠে যাওয়ার পথটাতে বড় মিস্ত্রি কড়া নজর রাখছেন। তাছাড়া ডাইনিং হলের পথটা স্পষ্ট দৃশ্যমান। বড় মিস্ত্রি অ্যালওয়ের আলো নিভিয়ে পাহারাদারদের মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এখন বাইরে ঝড় নেই বললেই হয়। এনজিন রুমে কোনো ফায়ারম্যান হয়তো ওয়াচ দিতে নেমে যাচ্ছে, বুটের ঠক ঠক শব্দ সিঁড়ি ধরে ক্রমশ নিচে নিচে—তিনি সন্তর্পণে অন্ধকার থেকেই বললেন, এবার তোমরা রসদঘরে ঢুকে যাও। কেউ নেই।

সুখানী মর্লিনের মাথার দিকটা ধরেছিল। স্টুয়ার্ড পায়ের দিকটা ধরে বাইরে নিয়ে এল। তারপর রসদঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করার আগে ডাকল, স্যার, তাড়াতাড়ি চলে আসুন। অ্যালওয়ের আলো জ্বেলে দিন।

ওরা ধীরে ধীরে মর্লিনকে একটা টেবিলের উপর শুইয়ে দিল। টেবিল থেকে কাচের ডিস এবং অন্যান্য সব পানীয় পাত্র তুলে অন্য স্থানে রেখে দিল। এই ঘরে অন্যান্য দরজা খুললে জাহাজিদের রসদ, নিচে রসদ ঘর—ভিন্ন ভিন্ন রকমের সব সবজি এবং সবজির গন্ধ আসছে এই ঘরে। ওরা এ সময় মর্লিনের শরীরের উপর ঝুঁকে পড়ল।

স্টুয়ার্ড বলল, কম্বল দিয়ে ঢেকে দি?

বরং ওর গাউনটা নিয়ে এসো।

মর্লিনের নগ্ন শরীর ভয়ানক কুৎসিত দেখাচ্ছে। বড় টেবিলের উপর ওর শরীর মৃত ব্যাঙের মতো—হাত পা দুটো শীর্ণ এবং চুলের সেই গন্ধটা তেমনি ফুর ফুর করে উড়ছে। চোখ দুটো এখনও শুধু স্থির। ওর বুকের পাঁজর স্পষ্ট। স্তনের সর্বত্র মাতৃত্বের চিহ্ন ধরা পড়ছে। স্টুয়ার্ড এবার কেমন শিউরে উঠল। এই শুকনো স্তনের আশে পাশে সহসা সে দেখে জঠরে নিমগ্ন কোনো যুবক যেন হাত বাড়াচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি কম্বল এনে ওর শরীর ঢেকে দিল।

ওরা এখন সকলেই কথা কম বলছে। বড় মিস্ত্রি ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, নিচে হাড়িয়া করে দেওয়া যাক তবে।

স্যার। স্টুয়ার্ড ডাকল।

বলো।

আপনি স্যার আমাদের ওপরওয়ালা। আপনি আমাদের সাহস দিন।

যেন এই পশুবৎ আচরণ অথবা নিষ্ঠুর ইচ্ছার দ্বারা প্রহৃত এই যুবতীর সকল অস্তিত্বের করুণা ক্রমশ জাহাজের ঘুলঘুলিতে মুখ রাখছে। দেয়ালে ওদের ছায়া পড়ছিল। সুখানী কেমন বিকৃতভাবে একটা ঢোক গিলে বলল, আমি নিচে নেমে যাচ্ছি। আপনারা উপর থেকে ওকে হাড়িয়া করুন। এই বিসদৃশ ঘটনা চোখে আর দেখা যাচ্ছে না।

বড় মিস্ত্রি নিচের ঢাকনা খুলে দিল। নিচের ঘরগুলো অন্ধকার। সুখানী সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার আগে নিচের আলো জ্বেলে নিল। স্টুয়ার্ড হাঁটু গেড়ে বসল। নিচের ঘরগুলোতে ভয়ানক ঠান্ডা। আলু, পেঁয়াজ এবং শাক—সবজি এখান থেকে কিছু কিছু চোখে পড়ছে। বরফের ঠান্ডা স্রোত সুখানীকে ভয়ংকর কষ্ট দিচ্ছে। সবকিছু ক্লান্তিকর। সে এবার উপরের দিকে তাকাল। বড় মিস্ত্রি হাতের ইশারায় তাকে ডাকছেন।

ওরা তিনজন বড় টেবিলের সামনে দাঁড়াল। ওরা তিনজন মাথায়, কোমরে এবং পায়ে হাত রাখছে। বড় বড় চিনেমাটির বাসন টেবিলের নিচে, কাবার্ডে টি—সেট সাজানো। মাদক দ্রব্য পানের নিমিত্ত সব পাতলা কাচের পাত্র ইতস্তত সজ্জিত। বড় মিস্ত্রি অন্যমনস্ক ছিলেন। পা সরিয়ে আনার সময় কিছু কাচের পাত্র ভেঙে নিচে গড়িয়ে পড়ল। কাচ ভাঙার শব্দ, টেবিলের উপর বড় দর্পণে তিনজনের প্রতিবিম্ব, মর্লিনের শক্ত শরীর—সবই ভীতিপ্রদ। মর্লিন ওদের দিকে যেন শক্ত চোখ নিয়ে চেয়ে আছে। সুতরাং নিরন্তর এক পাপবোধ ওদের তীব্র তীক্ষ্ন করছিল।

ওরা এবার মর্লিনকে কোলের কাছে নিয়ে শব—বাহকের মতো সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার সময় সন্তর্পণে ছাদের ঢাকনা টেনে খুব ধীরে ধীরে—যেন এতটুকু আওয়াজ না হয় অথবা যেন মর্লিনের গায়ে আঁচড় না লাগে—ওরা মর্লিনকে এ সময় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছিল। অথচ মর্লিনের শরীর মুরগির মৃত ঠ্যাং—এর মতো কদর্য এবং কঠিন। এই আলিঙ্গনের উষ্ণতা ওদের তিনজনকেই ভাবপ্রবণ করে তুলছিল।

মর্লিনের মুখ থেকে সব রঙ মুছে গেছে। চোখে টানা কাজলের চিহ্ন তখন চোখের নিচে এবং ভ্রুর আশেপাশে লেগে আছে। পুতুলনাচের নায়িকার মতো চোখ—মুখ। ওরা মর্লিনকে দরজার সামনে শুইয়ে দিল। বরফ ঘরের তালা খুলে দিল স্টুয়ার্ড—বড় বড় সব মাংস, গোরু, ভেড়া, শূকর এবং গোটা গোটা ধড় হুকের মধ্যে ঝুলছে। অথবা বড় বড় সব টার্কির মাংস—সোঁদা গন্ধ সর্বত্র, প্রচণ্ড ঠান্ডা এই বরফ ঘরে। ওরা তিনজনই ভিতরে ঢুকে তাড়াতাড়ি মর্লিনকে একপাশে রেখে একটা ত্রিপলে ঢেকে বের হয়ে পড়ল। দরজা টেনে সিঁড়িতে ওঠার মুখে প্রথম কথা বলল স্টুয়ার্ড—স্যার, কাল ভোরে যখন চিফ কুক রসদ নিতে আসবে, কী বলব?

রসদ দেবে।

ওরা ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই রসদের ওজন দেখে। দরজাটা খোলা থাকলে দেখার ভয় আছে।

দরজা বন্ধ রাখবে।

দরজা সবসময় বন্ধ রাখলে সন্দেহ করতে পারে। কারণ মেস—রুম মেট গোস্ত কেটে এনে ওজন করে দেয়।

মেস—রুম মেটকে ভোরবেলায় অন্য কাজ দেব। রসদ ভালো দেবে, ওজন বেশি দেবে। সবাই খুশি থাকবে তবে। কেউ সন্দেহ করবে না।

স্টুয়ার্ড তবু সিঁড়ি ধরে উঠল না। সে বরফ ঘরের দিকে পিছন ফিরে তাকাল।

সে নড়ছিল না। সে বিড়বিড় করে কীসব বকছিল। সে দরজাটার সামনে হেঁটে গেল। দরজা খুলতেই দেখল পা'টা মর্লিনের খালি। সে ত্রিপল দিয়ে পা'টা ঢেকে দরজা বন্ধ করে তালাটা লাগাল। তালাটা টেনে দেখল ক'বার। যখন দেখল তালাটা ঠিকমতো লেগেছে—কোথাও কোনো গোপন বিশ্বাসভঙ্গ উঁকি দিয়ে নেই অথবা যখন সবই অতি সন্তর্পণে সংরক্ষিত হল.... আর কী হতে পারে, স্টুয়ার্ড এইসব ভেবে সন্দেহের ভঙ্গিতে বলল, স্যার এটা আমার ভালো লাগছে না। অর্থাৎ এখন মনে হচ্ছে যেন স্টুয়ার্ড নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ছে।

এতক্ষণ পর মনে হল, বড় মিস্ত্রির গলাটা ভিজে যাচ্ছে। এতক্ষণ পর একটা চুরুটের কথা মনে হল। তিনি চুরুটে আগুন দিয়ে বললেন, কেন, কী হতে পারে?

সুখানী মুখ বিকৃত করে বলল, ওর কথা বাদ দিন স্যার।

সুখানী যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।

বেশ চুপ করে থাকলাম।

স্টুয়ার্ড বলল, আর একবার নামলে হয় স্যার।

কেন? আবার কেন?

দেখতাম কোথাও কিছু পড়ে থাকল কি না। স্টুয়ার্ডকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। যেন এই হত্যার জন্য ওকে সকলে দায়ী করে সরে পড়ছে। সে বলল, স্যার, ধরা পড়লে আমি সকলের নাম বলে দেব। কাউকে ছাড়ব না। আপনারা সকলেই ওকে কামড়েছেন।

বড় মিস্ত্রি ধমক দিলেন, স্টুয়ার্ড, তোমার মন অত্যন্ত ছোট।

স্যার, আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন না। আপনারা কাল থেকে যদি এমুখো না হন তবে কী করতে পারি! স্টুয়ার্ডের গলায় কান্না ভেসে উঠল।

সুখানী পায়ের নখে ডেকের কাঠে আঁচড় কাটবার চেষ্টা করছিল। বড় মিস্ত্রি স্টুয়ার্ডের মুখ দেখছেন। সে মুখ বিবর্ণ। তিনি এবার স্টুয়ার্ডের হাত ধরে বললেন, রাতে কোথাও যাব না স্টুয়ার্ড। ছাদের নিচে বরফ ঘরে মর্লিনের পাশে বসে থাকব। কোনো ভয় নেই তোমার।

ওরা তিনজনই এবার যার যার কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। স্টুয়ার্ড নিজের কেবিনের দরজা খুলে দিল। দরজার পাল্লাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। সে দরজা বন্ধ করতে যেন সাহস করছে না। ওর ভয় করছে। এতদিনের জাহাজি জীবন অথচ কখনও এমন নিষ্ঠুর ঘটনার দ্বারা সে আহত হয়নি।

বড় মিস্ত্রি কিছু বলতে পারছেন না। তিনি খুব ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যাচ্ছেন।

সুখানী বলল, শুয়ে পড় স্টুয়ার্ড। রাত আর বেশি নেই।

সুখানীর ঘর ডেক পার হলে। সে ফোকসালে থাকে। জাহাজের শেষ দিকটাতে জাহাজিদের জন্য অনেকগুলো ঘর। সুখানী এবং ডেক—কসপ সেখানে থাকে—পাশাপাশি বাংকে।

সুতরাং সুখানী বাইরে এসে দেখল, রাত কমে যাচ্ছে। সুখানী হাতের দস্তানা খুলে ফেলল। রাত শেষ হচ্ছে। বরফ পড়ছে না। ঝড় নেই। এক শান্ত নীল রঙ জাহাজের শরীরে যেন লেপ্টে আছে। কুয়াশা নেই। সুতরাং শহরের আলো স্পষ্ট। আকাশে ইতস্তত নক্ষত্র জ্বলছে। যেসব জাহাজ উষ্ণ স্রোতে সমুদ্রে মাছ ধরতে বের হয়েছিল ওরা একে একে ফিরে আসছে। সে এই শীতের ভিতর রেলিংয়ে ভর করে দাঁড়াল। রাতের সব ঘটনা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। দেশ বাড়ির কথা মনে হল। স্ত্রীর কথা মনে হল—সন্তান—সন্ততি

অর্থাৎ এক সুনিপুণ সাংসারিক জীবনের কথা ভেবে এই জাহাজি জীবনকে ধিক্কার দিতে থাকল। প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, হৃদয়ের ঘরে সব মরে গেছে, কারণ এই মৃত্যুজনিত বেদনা সুখানীকে আড়ষ্ট করছে না, মর্লিন মরে গেছে—জাহাজের অন্যান্য জাহাজিরা ঘুমে মগ্ন শুধু ওয়াচের জাহাজিরা জেগে ওয়াচ দিচ্ছে। যদি পুলিশ খোঁজ করতে আসে, যদি এই হত্যাজনিত দায়ে একটা লম্বা দড়ি ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে... সুখানী ভয়ে নিজের গলাটা চেপে ধরল এবার। তারপর আরও সব ভয়ংকর দৃশ্যের কথা ভেবে সে চুপি চুপি স্টুয়ার্ডের কেবিনে ফিরে যাবার জন্য পা চালাল। এক দুরারোগ্য ভয় সুখানীকে নিঃসঙ্গ পেয়ে জড়িয়ে ধরছে।

সে স্টুয়ার্ডের কেবিনে এসে দেখল, দরজা খোলা! পাল্লা ধরে স্টুয়ার্ড আগের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকল, এই! এই! হচ্ছে কী! এবং মনে হচ্ছে বজ্রজনিত মৃত্যু। সুখানী ওকে নাড়া দিল বারবার। এবং স্টুয়ার্ডকে টেনে নিল বাংকের কাছে; তারপর ধমক। চুপচাপ শুয়ে থাক। এমন করবে তো খুন করব।

সুখানী ঘুরে গিয়ে বড় মিস্ত্রির কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল। কেবিনের দরজা খোলা। বড় মিস্ত্রি একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে আছেন। শরীরে কোনো জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

সুখানী ডাকল, স্যার, দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন।

বড় মিস্ত্রি টেবিল থেকে নড়লেন না।—দরজাটা টেনে দাও সুখানী। বড় মিস্ত্রি টেবিল থেকে মাথা তুললেন না। মর্লিনের সাদা চোখ ওঁকে তখনও অনুসরণ করছে যেন। তিনি কেবিনে পায়চারি করতে থাকলেন। রাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পায়চারি করার ইচ্ছা। ভোরের বাতাসে পাখিরা যখন উড়বে, যখন কোথাও কোনো হত্যা অথবা রাতের দুর্ঘটনাজনিত দুঃখ মাস্তুলের গায়ে লেগে থাকবে না, তখন বড় মিস্ত্রি বাংকে শুয়ে ঘুম যাবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু অধিক সময় তিনি পায়চারি করতে পারলেন না। তিনি বাংকে শুয়ে পড়লেন।

সুখানী ডেক ধরে হেঁটে চলে গেল। সে নিজের ফোকসালে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকল। আলো জ্বালল না। দরজা বন্ধ করে পোর্টহোল খুলে সামনে মুখ রেখে বসে থাকল। রাতের সব পাখিদের দেখে ইতস্তত ছড়ানো নাবিকদের সব ছবি দেখে এবং দূরের জেটিতে একটি শিশুর কান্না শুনে ওরও মর্লিনের জন্য কষ্ট হতে থাকল!

ওরা তিনজন জাহাজের তিনটি ঘরে পোষা পাখিদের মতো ঘুমোচ্ছিল। বরফ ঘরে মর্লিন। ত্রিপলে শরীর ঢাকা পড়ে আছে। অন্যান্য কেবিনে দীর্ঘদিন পর রাতের এই প্রহরটুকুকে জাহাজিরা আস্বাদন করছে। ঠান্ডার জন্য সকলেই কেমন কুঁকড়ে ছিল। কোয়ার্টার মাস্টার গ্যাঙওয়েয়ের ওয়াচ শেষ করে ফোকসালে ফিরে আসছে। ভোরের আলো ফুটে উঠলে সকলে রেলিংয়ে ভর করছে—জেটি অতিক্রম করে শহরের বাস ট্রাম এবং রমণীদের প্রিয়মুখ... তারপর মাটির স্পর্শের জন্য উদ্বিগ্ন এক জীবন.... আহা এই দেশ, মাটি, পাব, নাইট ক্লাব, সুখ শুধু সুখ, উলঙ্গ এক চিন্তা সব সময়ের জন্য—জাহাজিরা দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর সুখ নামক উলঙ্গ এক নগরে হাঁটছে যেন।

ওরা তিনজন পোষা পাখির মতো স্বপ্ন দেখল।

বড় মিস্ত্রি স্বপ্নের কোলাহলে এক অপার্থিব দৃশ্য দেখে অনেক দূর চলে যেতে থাকলেন। তিনি দূরে সব চীনার গাছ দেখলেন, আকাশ দেখলেন অথবা দেখলেন পাইন আপেলের নীচে সুন্দরী রমণীগণ নগ্ন হয়ে বসে আছে। তিনি বড় বড় চীনার গাছ ফাঁক করে চলে যাচ্ছেন। ডেইজি ফুলের গন্ধ কোথাও এবং সামনে সেই উলঙ্গ নগর। তিনি পোশাক পরিত্যাগ করে সেই নগরে প্রবেশ করে কেবল হ্যাঁচ্চো দিতে থাকলেন।

বড় মিস্ত্রি স্বপ্নের ভিতর বিগত জীবনের কিছু মহত্তম ঘটনা দেখতে পেলেন।

সুখানী স্বপ্ন দেখল—একটা উট মরুভূমি থেকে নেমে আসছে। ওর সঙ্গে দড়ি দিয়ে এক উলঙ্গ নারীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। বরফঘরে ছাল তুলে নেওয়া গোরু অথবা শূকরের মতো দেখাচ্ছে রমণীকে। উট দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এক মরূদ্যানে প্রবেশ করল। সামনে নীল হ্রদ। হ্রদের জলে উট নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে

যুবতী প্রাণ পাচ্ছিল। যখন খেজুর গাছের পাতাগুলি সবুজ গন্ধ ছড়াচ্ছিল তখন সুখানী দেখল যুবতী সেই উটের পিঠে বসে এবং হাজার হাজার পুরুষ সেই যুবতীর জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হচ্ছে। যুবতী বসে বসে প্রেমের আধার থেকে কণামাত্র বিতরণ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুখানী ফের যখন উটটিকে দেখল তখন স্বপ্নের ভিতর উটটি চলাফেরা করছিল—উটের পায়ে দড়ি এবং দড়িতে রমণীর শরীর আবদ্ধ। সেই এক ঘটনা বারবার চোখের উপর পুনরাবৃত্তি হতে থাকল।

সুখানী স্বপ্নের ভিতর শেষ পর্যন্ত এলবিকে দেখল। এলবির সকরুণ চোখ এবং কান্না স্বপ্নের অলি গলি থেকে বের হয়ে আসছে।

আর স্টুয়ার্ড একটা মৃত কৃমি হয়ে বাংকে পড়েছিল। নড়ছিল না। সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ। অথচ ওর স্বপ্নে একটা তাজা গোলাপ ফুল ফুটে ছিল সবসময়। চেরি নামক এক যুবতীর মুখ সেই ফুলের ভিতর থেকে বারবার উঁকি দিচ্ছে। সে শুয়ে শুয়ে শুধু ঢোক গিলল। ওর স্বপ্নের শেষটুকুতে ছিল একটি পুরুষ—অশ্বের নিচে শুয়ে একটি নগ্ন যুবতী বারবার সহবাসের চেষ্টায় ব্যর্থ হচ্ছে।

তারপর জাহাজে ভোর হল। সকলেই উঠে পড়ল একে একে। এখনও জাহাজ—ডেকে অন্ধকার আছে। সারেং সকলকে বলল, টান্টু। ওরা উপরে উঠে এল। ওরা জল মারতে আরম্ভ করল ডেকে। এনজিনের জাহাজিরা এনজিন সারেংয়ের সঙ্গে নিচে নেমে গেল। বয়লারের স্মোকবক্স পরিষ্কার করার জন্য কয়েকজন কোলবয় তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। মেজ মিস্ত্রি একবার নীচে নেমে ব্যালেস্ট পাম্পের আশেপাশে টর্চ মেরে কী যেন অনুসন্ধান করে গেছেন—উপরে এখন ডেকজাহাজিরা ডেকে জল মারছে। রাতে যে তুষারঝড় হয়েছিল জল মেরে তার শেষটুকু যেন পরিষ্কার করে দিচ্ছে। একটু বাদে আলো ফুটবে। এবং রোদ উঠবে।

ডেক—জাহাজিরা গাম—বুট পরে জল মারছিল। হিমেল হাওয়া সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। জেটি অতিক্রম করলে বালিয়াড়ি। এ দেশে এবার বসন্ত আসছে। বালির চরে নতুন ঘর উঠছে। কার্নিভেল বসবে। গাছের পাতাসকল কুঁড়ি মেলেছে। ডেক—জাহাজিরা এই শীতের ভিতর রোদের উষ্ণতার জন্য প্রতীক্ষা করছিল এবং তীরের দৃশ্যসকল দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার গ্লানি মুছে দিচ্ছিল।

ঠিক এ সময়েই স্টুয়ার্ড দরজা খুলে দেখল ভোর হয়ে গেছে। ওর স্বপ্নের কথা মনে হল এবং মনে হল ভাণ্ডারী, চিফ কুক আসবে রসদ নিতে। তারপর গত রাতের মর্লিন, মৃত্যু এবং হত্যাজনিত দায়—সবকিছু ওকে ফের গ্রাস করতে থাকল। সে বাথরুমে গেল না, চোখমুখ ধুল না—রসদ ঘরের ঢাকনা খুলে তরতর করে নিচে নেমে গেল। বরফ ঘরের দরজা খোলার আগে ভাবল, বড় বড় ভালো গোস্ত বাইরে বের করে দরজা বন্ধ করে দেবে। সে মেনুর কথা ভাবল। কী মেনু হবে এমত একটা আন্দাজ করে দরজা খুলতেই সে ভয়ে এবং বিস্ময়ে হতবাক! দেখল, মর্লিনের মুখ খোলা। মর্লিনের মৃত সাদা চোখ ওকে দেখছে। সে সেই ছোট ত্রিপলে মুখ ঢাকতে গিয়ে দেখল পা বের হয়ে থাকছে। সে টানাটানি করল অনেকক্ষণ। কিন্তু পা মাথা একসঙ্গে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিতে পারল না।

স্টুয়ার্ড একা বলে হুক থেকে গোস্ত নামাতে দেরি হচ্ছিল। ওর কষ্ট হচ্ছিল খুব। কী করবে কী না করবে ভেবে উঠতে পারছে না। একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা ওকে সব সময় বিব্রত করছে। ওর গলা শুকিয়ে উঠছে। ছাদে পায়ের শব্দ। ভাণ্ডারী, চিফ কুক নেমে আসছে। ওদের শব্দ পেয়ে সে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে বসে পড়ল। মর্লিনকে টেনে টেনে বরফ ঘরের বালকেডের পাশে নিয়ে গেল। স্টুয়ার্ড দেখল, ওর অনাবৃত দেহের রঙ এবং এই বাসি গোস্তের রঙ হুবহু এক। সে ঝুলানো ষাঁড় গোরুর ভেতর থেকে দেখল ওরা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সে কেমন মাথার ভিতর যন্ত্রণা বোধে অবসন্ন হয়ে পড়ছে। সে দুবার দুর্গা দুর্গা নাম জপতেই ভূতের মতো নতুন এক বুদ্ধির আশ্রয়ে চলে গেল—কপিকলটাকে এগিয়ে এনে মর্লিনকে পায়ে গেঁথে হুকে ঝুলিয়ে দিল। সে নিচে বসে সব দেখতে দেখতে ভাবল—এই অনাবৃত শরীরের রঙ নিয়ে মর্লিন এখন ছাল চামড়া ছাড়ানো গোরু ভেড়া হয়ে গেল। দরজা থেকে মর্লিনের অস্পষ্ট শরীরের রঙ এবং আকার আধপোড়া

শূকরের মতো দেখাচ্ছিল। স্টুয়ার্ড বুঝল, এই ঘরের দেয়াল, ছাদ এবং হুকের সর্বত্র একই দুঃখময় নৈরাশ্যে নিমজ্জিত। সে দরজার ভিতর দিয়ে ঝোলানো গোস্তের সঙ্গে মর্লিনের এতটুকু প্রভেদ খুঁজে পাচ্ছে না। সে এবার কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারল। রসদ বের করে অন্যান্য দিনের মতো কমবেশি করার স্পৃহাতে মেসরুম—মেটকে ডেকে আলু কপির ঘরে হামগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে ঢুকে গেল।

অন্যান্য দিনের মতো চিফকুকের সঙ্গে স্টুয়ার্ডের বচসা হল না রসদ নিয়ে। চিফকুক উলটেপালটে গোস্ত দেখল। ওরা রসদ নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ডেক ভাণ্ডারী এবং এনজিন ভাণ্ডারীও রসদ নিয়ে উপরে উঠে গেল। স্টুয়ার্ড সকলকে দুটো করে আলাদা ডিম দিয়েছে। চিফকুককে আলাদা অক্সটেল দিয়েছে। সকলেই মোটামুটি খুশি। ওরা সকলে রসদ নিয়ে উপরে উঠে গেলে স্টুয়ার্ড ফের বরফ ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। অনেকগুলো ঝুলানো মাংসের লাশ অতিক্রম করে মর্লিনের পিঠ এবং মাথার ডান দিকের অংশটা অস্পষ্ট এক শূকরের মাংসের মতো। টার্কির পেটের দিকটার মতো নিতম্বের ভাঁজ। এই ঘরে মর্লিন শূকর ভেড়া অথবা গোরুর মতো শরীর নিয়ে এখন হুকে ঝুলছে। শুকনো স্তন এবং অন্য কিছু দেখার জন্যই সে এবার ভিতরে ঢুকে মুখোমুখি দাঁড়াল। মর্লিনের তলপেট সংলগ্ন মুখ, সোনালি চুলে এখনও তাজা গন্ধ, অথচ মর্লিনকে মরা মাংস ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। সে পেটের নিচে হাত বুলোতে থাকল অন্যমনস্কভাবে।

যে ভয়টা নিরন্তর কাজ করছিল স্টুয়ার্ডের মনে এ সময় সেই ভয়টা কেটে যাচ্ছে। সে বলল, মর্লিন আমরা তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করব। সে প্রদক্ষিণ করার মতো মর্লিনের শরীরটা একবার ঘুরে ঘুরে দেখল। সে বলল, এই নিষ্ঠুরতার জন্য গতকালের তুষারঝড় দায়ী। অথচ মনে হল— নিরন্তর সে তার অপরাধবোধকে দূরে রাখার স্পৃহাতে এমন সব কথা বলছিল। সে নিজের মনেই হেসে বলল, শুধু মাংস ভক্ষণে তৃপ্তি থাকে না মর্লিন।

তারপর সে দরজা বন্ধ করে উপরে উঠে যাচ্ছে।

জাহাজে দৈনিক কাজ জাহাজিরা করে নিচ্ছে। সারাদিন কাজ। দিন ছোট বলে রাতের কিছু অংশও ওদের কাজের ভিতর ঢুকে গেল। সারাদিন কাজের পর এক সময়ের জন্য বড় মিস্ত্রি, স্টুয়ার্ড এবং সুখানী একত্রে বসেছিল। ওরা কোনো কথা বলেনি। কারণ রাতে একই দুঃস্বপ্ন এসে এদের জড়িয়ে ধরবে ওরা জানত।

ওরা প্রতি রাতে জাহাজের কেবিনে দুঃখী জাহাজির মতো বসে থাকত।

একদিন ওদের পোর্টহোলের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ায় সুখানী বলল, বড় সাব, বাইরে রোদ উঠেছে।

বড় মিস্ত্রি বললেন, সুখানী, চল, মর্লিনকে দেখে আসি।

স্যার, ও—ভাবে মর্লিনকে আমি দেখতে পারব না। স্যার, বরং আমাদের পুলিশের কাছে ধরা দেওয়া ভালো। এভাবে মৃতদেহের উপর কুৎসিত আচরণ করে জাহাজে আমি বাঁচতে পারব না। রাতে স্যার ঘুম হচ্ছে না। যেখানে যখন থাকছি মর্লিন মৃত পাথরের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকছে।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার, আমার সামনে শুধু ঈশ্বরের থাবা। যেখানে থাকছি সেখানেই গলা টিপে ধরতে চাইছে।

বড় মিস্ত্রি দেখছেন ধীরে ধীরে ওরা তিনজনই ভয়ংকর হয়ে উঠছে। বড় মিস্ত্রি বললেন, রাতে আজকাল একই স্বপ্ন দেখছি—আমার স্ত্রী সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছেন। মৃত। চোখ মুখ পচে গেছে।

সুখানীর চোখ মুখ লাল। ওর শরীর বাংকের উপর হিংস্র থাবা নিয়ে বসে আছে।

বড় মিস্ত্রি স্টুয়ার্ডকে বললেন, স্টুয়ার্ড, মর্লিনকে সন্ধ্যার পর হুক থেকে নামিয়ে বাইরে শুইয়ে রাখবে। আমি আর সুখানী শহর থেকে ফুল নিয়ে আসব। ওর পোশাক যেন পরানো থাকে। আমরা মর্লিনকে ভালোবাসার চেষ্টা করব।—সুখানী, তিনি সুখানীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমার মনে হয় যদি যথার্থই আমরা মর্লিনকে ভালোবাসতে পারি, যদি মনে হয় মর্লিনের শরীর প্রীতিময়—তখন আমাদের পাপবোধ নিশ্চয়ই কিছুটা লাঘব হবে। কারণ আমরা সকলেই একদিন এরকম ছিলাম না। আমরা ঘুমোতে পারব। সারারাত কঠিন দুঃস্বপ্ন আমাদের আগলে থাকবে না।

সুখানী বলল, বরং আমাদের জীবনেও কিছু কিছু মহত্তর ঘটনা আছে যা মর্লিনকে ফুল দেবার সময় বলতে পারি।

পাঁচটা না বাজতেই জাহাজ ডেকে রাত নেমে এল। বাইরে ঠান্ডা। শীত যাবার আগে যেন বন্দরটাকে প্রচণ্ডভাবে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ভোরের রোদটুকু এবং আকাশের পরিচ্ছন্নতা এই শীতকে তীব্র তীক্ষ্ন করেছে। ওরা তিনজন গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল। ওরা ওভারকোট পরেছিল, মাথায় ফেল্ট ক্যাপ ছিল ওদের। বড় মিস্ত্রি হাতে একটা স্টিক রেখেছে।

সুখানী সহসা বলল, স্যার স্টুয়ার্ডের ফিরে যাওয়া উচিত। মর্লিনকে জাহাজে একা ফেলে রাখা উচিত হয়নি। অন্য কেউ যদি ওকে আবিষ্কার করে ফেলে?

বড় মিস্ত্রি বললেন, আরে না! তুমিও যেমন—স্টুয়ার্ড ফাঁক পেলেই ওখানে ঘুর ঘুর করবে এবং ধরা পড়ার সুযোগ করে দেবে।

এ সময় ওরা সমুদ্রের ধারে ধারে কিছু পুরুষ এবং রমণী দেখতে পেল। জেটির জাহাজগুলো অতিক্রম করে ছোট এক মাঠ, কিছু টিউলিপ ফুলের গাছ। বার্চ জাতীয় গাছের ছায়ায় ছায়ায় ওরা হেঁটে যাচ্ছে। সমুদ্রের ধারে সব লাল নীল রঙের বাড়ি। এবং সাদা আলো। সমুদ্রের জল বাতাসের সঙ্গে উঠে আসছে। ইতঃস্তত ভিন্ন ভিন্ন পাব এবং নাইট ক্লাবের লাল বিজ্ঞাপন। অন্য দিন হলে স্টুয়ার্ড এইসব নাইট ক্লাবে ঢুকে যেত, ওদের উলঙ্গ নাচ দেখে সারারাত কামুক হাওয়ায় ভেসে বেড়াত। সুখানী, পাবের ধারে অথবা রাস্তার মোড়ে পালকের টুপি পরে সং দেখানোর মতো যারা দাঁড়িয়ে থাকত তাদের একজনকে বগলে চেপে বালিয়াড়িতে নেমে যেত—কিন্তু আজ ওরা তিনজনই শুধু দেখছে, ওরা তাজা ফুল কেনার জন্য পথ ধরে হাঁটছে।

বড় মিস্ত্রি স্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মর্লিনকে জেটির কোন জায়গা থেকে তুলে নিয়েছিল?

জেটির তিন নম্বর ক্রেনের নিচ থেকে।

সুখানী স্টুয়ার্ডকে পুলিশের মতো জেরা করে বলল, সে তখন কী করছিল?

একজন জাহাজিকে সুখ দিচ্ছিল।

কতক্ষণ ধরে?

খুব শীত। সময় আমি হিসাব করিনি।

তুমি ওকে কী বললে?

আমি একটু সুখ চাইলাম।

উত্তরে সে কী বলল?

ওরা উঁচুনিচু পথ ধরে হাঁটছিল। ওরা শহরের বাজার দেখার জন্য এবং ফুল কেনার জন্য উঠে যাচ্ছে। বড় মিস্ত্রি চলতে চলতে লাঠি ঘুরাচ্ছিলেন, যেন তিনি কুকুরের দৌড় দেখতে যাচ্ছেন। হত্যাজনিত কোনো ভয়ই ওদের এখন নেই, এমত চোখ—মুখ ওদের সকলের।

সে বলল, একটু গরম দাও আমাকে, নইলে শীতে মরে যাব।

বড় মিস্ত্রি ধমকের সুরে বললেন, সুখানী, আমরা এই বন্দর—পথ ধরে কোথায় যাচ্ছি?

স্যার, ফুল কিনতে।

কিন্তু গোটা পথটা ধরে তুমি একটা পেটি দারোগার মতো কথা বলছ!

বড় মিস্ত্রিকে খুশি করার জন্য সে বলল, আজ ভোরেও স্যার কাগজ দেখলাম। শহরের কর্তৃপক্ষ মর্লিন সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। শহর থেকে একটি মেয়ে গায়েব হয়ে গেল অথচ...

স্টুয়ার্ড নাকের মধ্যে রুমাল ঢুকিয়ে ভিতরটা পরিষ্কার করল। এবং বলল, নিরুদ্দিষ্ট কলামটা দেখেছিলে?

হ্যাঁ, দেখেছিলাম বইকি। ওতে আছে, এক ভদ্রমহিলার একটি কুকুর নিখোঁজ হয়েছে। কুকুরের যে খোঁজ দিতে পারবে তাকে দশহাজার পাউন্ড পুরস্কৃত করা হবে। স্যার, চলুন, একটা কুকুর ধরে নিয়ে ভদ্রমহিলার কাছে যাই।

ওরা একটা পথের মোড় ঘুরল। এই পথটা একটু অন্ধকার। ওরা ক্রমশ সমুদ্র থেকে দূরে সরে আসছে। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে না আর। বাতাসের সঙ্গে তেমন জলীয় কণাও নেই। আগন্তুক তিনজনকে শহরের পুরুষ ও রমণীগণ দেখছিল। নীল আলো, হিমেল হাওয়া এবং পথের বাস, ট্রামের শব্দ, নাইট ক্লাবের সংগীত, কাফে, বার মিলে একটা রহস্যের অন্ধকার যেন এই পথটার ভিতর ঢুকে স্তব্ধ হয়ে আছে। ওরা এখানে থামল। একটা বাড়ির ভিতর থেকে কিছু কুকুরের চিৎকার ভেসে আসছে। ওরা দেখল, উপরে লেখা আছে 'কুকুর ভাড়া পাওয়া যায়'।

ওরা একসময় একটা সরু লেগুনের পাড় ধরে হাঁটতে থাকল। উঁচুনিচু পথ। সমুদ্র বড় সন্তর্পণে খুব সরু পথ করে শহরের ভিতর ঢুকে গেছে। কতবার ডেসি এবং বড় মিস্ত্রি এখানে নৌকা বাইচ দেখতে এসেছিলেন। ডেসিকে নিয়ে বড় মিস্ত্রি কোন কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন—নৌকা বাইচ দেখার পর লেগুন অতিক্রম করে এক নির্জন স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় একটি বার্চগাছের নিচে অথবা দূরের সব পাহাড়শ্রেণী পার হলে ছোট্ট কিশোরী মেয়ের গ্রাম্য এক পাবে সারাদিন মাতলামি এবং অন্য অনেক সব নগণ্য ঘটনার স্মৃতি ভিতর থেকে বয়ে বয়ে উঠে আসছিল।

বড় মিস্ত্রি, সুখানী এবং স্টুয়ার্ডের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বললেন কারণ যে সেতুটা এই লেগুনকে সংযুক্ত করছে সেখানে হরেক রকম যুবক—যুবতী লেগুনের জলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছে এবং প্রেম নিবেদন করছে। দূরে পাহাড়শ্রেণী, মাথায় লাল নীল অজস্র আলো। লেগুনের নীল জলে সরু সরু স্কিপ বাঁধা। ছই আছে এবং অনেকটা ঘরের মতো—যেখানে ইচ্ছা করলেই কোনো বেশ্যা রমণীকে নিয়ে রাত কাটানো যায়। ডেসি এবং বড় মিস্ত্রি অনেকবার এইসব স্কিপে রাত কাটিয়েছেন—ওদের দুজনকে আজ তিনি এ কথা জানালেন। জাহাজে রোজ রোজ ডেসি যাচ্ছে আর রোজ রোজ তিনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন—এ কথাও জানালেন। নির্মল এই আকাশ, মাথার উপর পাহাড়শ্রেণীর অজস্র আলো এবং দূরের কোনো গ্রাম্য পাবের কিশোরী এক বালিকার মুখচ্ছবি—বড় মিস্ত্রিকে প্রাণ খুলে কথা বলবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিল।

বড় মিস্ত্রি বললেন, কী ফুল কিনবে?

ওরা তখন সেতু অতিক্রম করে নিচে বাজারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

সুখানী বলল, রজনীগন্ধা দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু এখানে তা পাওয়া যাবে না।

সুখানী একটা ফুলের নাম মনে আনার চেষ্টা করছিল। অথচ কিছুতেই সে নামটা স্মরণ করতে পারল না। ফুলগুলি এ অঞ্চলে পাওয়া যায়, ঠিক রজনীগন্ধারই মতো। ফুলগুলির গায়ে মোমের রঙ অথবা যেন কচি আঙুরের স্তবক এবং সুগন্ধময়। সে ভাবল সেই সব ফুলের স্টিক কিনে নেওয়া যাবে।

ওরা বাজারে ফুলের গলিতে ঢুকে গেল।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার আমরা ব্যবহারে যথার্থই মানুষের মতো হবার চেষ্টা করব। আমরা মদ খাব না এই ক'দিন।

এটা ভালো প্রস্তাব বটে। বড় মিস্ত্রি মাথা নাড়লেন।

ওরা ফুল নিয়ে জাহাজে উঠে গেল একসময় এবং ভালোবাসার অভিনয় করার জন্য নাটকের প্রথম অঙ্কের গর্ভে ঢুকে গেল।

কেবিনে ওরা আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল। দেয়ালের সাদা রঙ কেবল এই কেবিনে শূন্যতা সৃষ্টি করছে। ওরা পরস্পর কিছুক্ষণের জন্য অপরিচিতের মতো মুখ করে বসে থাকল। ওয়াচের ঘণ্টা পড়ছে। সারাদিন জেটিতে যে চঞ্চলতা ছিল, রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে আসছে। দূরে সমুদ্র গর্জন করছে।

আকাশ তেমনি পরিষ্কার। এই জাহাজের বুকে নক্ষত্রের আলো এসে নামছে। তিনজন নাবিক বসে থাকল। রাতের নিঃসঙ্গতার জন্য বসে থাকল। ওরা মর্লিনের জন্য মর্লিনের পাশে দুঃখ লাঘবের জন্য বসে থাকল। ওরা আগের মতোই চুপচাপ। দূর থেকে আগত সমুদ্র গর্জন শোনার জন্যই হোক অথবা এই জাহাজের কোনো কক্ষে রমণীর মৃত শরীর হুকে ঝুলছে, রমণীর ঘর সংসার, ওদের দুঃস্বপ্ন সকল... মানুষ এক নির্লজ্জ ইচ্ছার তাড়নাতে ভুগছে এইসব চিন্তা, তারপর সমুদ্র অতিক্রম করে সেই প্রিয় সংসার এবং মাঝে মাঝে পুলিশ নামক এক জন্তুর ডাক... ওরা ভয়ে পরস্পর এখন তাকাতে পারছে না।

স্টুয়ার্ড বলল, আসুন, স্যার, একসঙ্গে নামি। একা একা নামতে ভয় করছে। স্টুয়ার্ড হাতের দস্তানা বের করল বালিশের ভেতর থেকে। ওভারকোট নিল এবং জুতো জোড়া বের করার সময় সুখানী চিৎকার করে উঠল, স্টুয়ার্ড একটা রাস্কেল। স্যার, সে মর্লিনকে হুক থেকে নামায়নি। আমি যাব না স্যার, আমার বীভৎস দৃশ্য সহ্য হবে না।

বড় মিস্ত্রি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো হাসলেন। বললেন, ওটা বীভৎস বললে চলবে কেন সুখানী?

স্টুয়ার্ড বলল, আপনিই বলুন স্যার।

বড় মিস্ত্রি ফের বললেন, আমরা এই মানুষেরা বীভৎস স্থানটুকুর জন্যই লড়াই করছি। সংগ্রাম বলতে পারো অথবা লোভ লালসা, চরম কুৎসিত বস্তুটির জন্য আমাদের কামুক করে রাখে। এবার বড় মিস্ত্রি সুখানীকে দু'হাতে ঠেলে রসদ ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে বললেন, তুমি যদি পা দুটো উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে দেখ, কী দেখবে সুখানী? একটা মুখের মতো অবয়ব দেখবে, নাক দেখবে, গহ্বর দেখবে। শুধু চোখ নেই। কবন্ধের মতো অথবা অন্ধ বলতে পারো। আর অন্ধ বলেই সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করছে। অন্ধ বলেই এত কুৎসিত, এত ভয়ংকর এবং আমাদের এত ভালোবাসা।

রসদ ঘরে আলু পেঁয়াজের গন্ধ। ডিমের শুকনো গন্ধ। বাসি বাঁধাকপির গন্ধ মলমূত্রের মতো। সুখানী ফুলগুলি এবার বুকে চেপে ধরল। স্টুয়ার্ড বরফ—ঘরের দরজা খুলে বড় মিস্ত্রিকে দেখাল—কিছু কি দেখতে পাচ্ছেন স্যার?

বড় মিস্ত্রি যথার্থই কিছু দেখতে পেলেন না। সারি সারি হুকে বড় বড় ষাঁড়ের শরীর ঝুলছে। ভেড়া এবং শূকর। টার্কির শরীর পর্যন্ত। সব এক রঙ। এক মাংস। এবং শুধু ভক্ষণের নিমিত্তই তৈরি। তিনি নিজেই এবার ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, মর্লিন কোথায় স্টুয়ার্ড!

ওরা একটি টেবিল সংগ্রহ করে মর্লিনকে সযত্নে তার উপরে রেখে দিল। পোশাক পরানো হল। পায়ে জুতো এবং ফুলগুলি ওর মাথার কাছে রেখে ওরা বসে থাকল নির্বোধের মতো। বড় মিস্ত্রি পায়ের দিকটায় বসে আছেন। দু'পাশে সুখানী এবং স্টুয়ার্ড। ওরা মর্লিনের মুখ দেখছিল। যত ওরা মৃত মুখ দেখছিল তত ওদের এক ধরনের আবেগ গলা বেয়ে উঠে আসছে। ওর প্রতি আচরণে এতটা নির্বোধ না হলেও চলত এমত এক চিন্তার দ্বারা প্রহৃত হচ্ছে। বড় মিস্ত্রিই বললেন, এই মৃত রমণীর কাছে আমাদের জীবনের এমন কী মহত্ত্ব ঘটনা আছে যা বলতে পারি—তিনি এইটুকু বলে উঠে দাঁড়ালেন—এমন কী ঘটনা আছে জাহাজি জীবনে যা বলে এই তীক্ষ্ন বিষণ্ণতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি?

সুখানী বলল, ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছে। এইটুকু বলে চিবুকে হাত রাখে সুখানী। কিছুক্ষণ কী যেন দেখল সমস্ত ঘরটার ভিতর। পাশের একটা ষাঁড়ের শরীর ঝুলছে। এবং মাঝে মাঝে ওর শরীরে এসে ধাক্কা দিচ্ছে যেন। সে বলল, আমরা সকলেই জীবনের কোনো না কোনো মহত্তর ঘটনা বলব। চিরদিন আমরা এমন ছিলাম না।

স্টুয়ার্ড বলল, মহত্তর ঘটনা বলতে পারলে ফের আমরা ঘুমোতে পারব।

বড় মিস্ত্রি পায়ের কাছটায় বসলেন আবার।

স্টুয়ার্ড দেখল ওদের সকলের চোখ ধীরে ধীরে কোটরাগত হচ্ছে। চোখের নিচে এক ধরনের অপরাধবোধের চিহ্ন ধরা পড়েছে। সে সুখানীকে বলল... আচ্ছা সুখানী, আমার চোখের নিচে কালি পড়েছে!

আয়নায় দেখো। আমার তো মনে হয় তোমারই সবচেয়ে বেশি!

সুমিত্র, বড় মিস্ত্রি অবনীভূষণকে উদ্দেশ্য করে বলল, স্যার, কাপ্তান আমাকে বলেছেন, তোমার কি কোনো অসুখ করেছে স্টুয়ার্ড? তোমাকে খুব পীড়িত দেখাচ্ছে!

অবনীভূষণ বললেন, তুমি আবার বলনি তো, রাতে স্যার ঘুম হচ্ছে না। কেমন এক অশরীরী পাপবোধ চারধারে ঘোরাফেরা করছে। বলনি তো?

আমি পাগল নাকি স্যার! আমি এমন কথা বলতে পারি?

সুখানী এবার কঠিন গলায় বলল, তুমি শালা পাগল। আলবত পাগল। পাগল না হলে একটা রুগণ বেশ্যা মেয়েকে কেবিনে কেউ তুলে আনতে পারে?

স্যার, আপনি শুনুন। নালিশের ভঙ্গিতে বলল সুমিত্র।

সুখানী, তুমি বেশ্যা বলবে না। মর্লিন বেশ্যা হলে তোমার মা—ও বেশ্যা।

বড় মিস্ত্রি তার মাকে বেশ্যা বলেছে—বিজন ভাবল। সে সুখানী জাহাজের আর অবনীভূষণ বড় মিস্ত্রি জাহাজের। সুতরাং বড় মিস্ত্রির বিজনের মাকে বেশ্যা বলার এক্তিয়ার আছে। সুতরাং বিজন চুপচাপ বসে থাকল। কোনো জবাব দিল না। নির্বোধের মতো তাকাতে থাকল ফের ঘরের চারিদিকে।

সুমিত্র আর দেরি করতে চাইল না। সে বলল, স্যার আমার জীবনে একটা মধুর ঘটনা আছে। অনুমতি দিলে বলতে পারি।

বলবে? অবনীভূষণ অদ্ভুতভাবে ঠোঁট চেপে কথাটা বললেন।

হ্যাঁ স্যার, আগেই বলে ফেলি। আগে আগে যদি একটু ঘুমোতে পারি।

বলো।

সুমিত্র গল্প আরম্ভ করার আগে মর্লিনের মুখের খুব কাছে ঝুঁকে পড়ল। বলল, এই মুখ দেখলে, স্যার আমার শুধু চেরির কথা মনে হয়। তখন জাহাজে স্যার তেলওয়ালার কাজ করতাম।

বিজন এবার উঠে দাঁড়াল। আমি সুখানী জাহাজের, তাছাড়া আমি স্যার এই তিনজনের ভিতর সকলের ছোট। আমাকে সকলের আগে বলতে দেওয়া হোক। বলে সেও মর্লিনের মুখের কাছে ঠিক স্টুয়ার্ডের মতো ঝুঁকে পড়ল। সে বলল, এই মুখ দেখলে শুধু এলবির কথা মনে হয়। তখন স্যার আমাদের জাহাজ অস্ট্রেলিয়াতে।

সুমিত্র চিৎকার করে উঠল, বেয়াদপ!

বড় মিস্ত্রি দেখলেন ওরা ঝগড়া করছে—তিনি বললেন, বরং গল্পটা আমিই বলি। বলে তিনি আরম্ভ করলেন—শেষ রাতের দিকে ভীষণ ঝড়ের ভিতর জাহাজ বন্দর ধরেছে। আমি তখন জাহাজের পাঁচ নম্বর মিস্ত্রি। আমাদের জাহাজ সেই কবে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল থেকে নোঙর তুলে সমুদ্রে ভেসেছিল, কবে কোন এক দীর্ঘ অতীতে যেন। আমরা বন্দর ফেলে শুধু সমুদ্র এবং সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপ—বালির অথবা পাথরের জনমানবহীন দ্বীপ দেখছি। সুতরাং দীর্ঘদিন পর বন্দর পেয়ে তুষাররাতেও আমাদের প্রাণে উল্লাসের অন্ত ছিল না। আমাদের মেজ মালোম উত্তেজনায় রা রা করে গান গাইছিলেন...।

অবনীভূষণ কিছুক্ষণ থেমে সহসা বলে ফেললেন, এ কী স্টুয়ার্ড তুমি বাসি বাঁধাকপির মতো মুখ করে বসে আছ কেন? শুনছ তো গল্পটা।

কী যে বলেন স্যার!

বুঝলে তোমাদের অবনীভূষণও বিকেলের দিকে সাজগোজ করে তুষারঝড়ের ভিতরেই বের হয়ে পড়ল। সেই লম্বা ওভারকোট গায়ে অবনীভূষণ, লম্বা তামাকের পাইপ মুখে এবং ভয়ংকর বড় বেঢপ জুতো পরে অবনীভূষণ গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে গেল। আর নেমে যাবার মুখেই দেখল মেজো মালোম বন্দর থেকে ফিরছে। মেজ মালোম বেশ সুন্দরী এক যুবতীকে নিয়ে এসেছেন। যুবতীর পাতলা গড়ন, ছিমছাম চেহারা আর কালো গাউন, সোনালি ব্লাউজের উপর ফারের মতো লম্বা কোট গায়ে।

তুষারঝড়, সুতরাং গাছের পাতা সব ঝরে গেছে। আর পাতা ঝরে গেছে বলে কোনো গাছই চেনা যাচ্ছে না। ওরা বৃদ্ধ পপলার হতে পারে, পাইন হতে পারে এমনকি বার্চ গাছও হতে পারে। আমার সঙ্গে আমার প্রিয় বন্ধু ডেক অ্যাপ্রেন্টিস উড ছিল। শীতে পথের দু'পাশে কাঠের বাড়ি এবং লাল নীল রঙের শার্সির জানালা এবং বড় বড় জানালার ভিতর পরিবারের যুবক—যুবতীদের মুখ, একর্ডিয়ানের সুর, গ্রাম্য লোকসংগীত তোমাদের অবনীভূষণকে ক্রমশ উত্তেজিত করছে।

বড় মিস্ত্রি এবার সুখানীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার সব হুবহু মনে পড়ছে। নাচঘরে অবনীভূষণ দুজন যুবতীকে একলা দেখতে পেল।

তখন ব্যান্ড বাজছে, হরদম বাজছে। মদের কাউন্টারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাবিক এসে ভিড় করছিল। ওরা কেউ কেউ মাথার টুপি খুলে তিমি শিকারের গল্প আরম্ভ করল। উত্তর সাগরে ওরা গর্ভিণী তিমি শিকার করতে গিয়ে দুজন নাবিককে হারিয়েছে এমন গল্পও করল। ভিড় সেই কাচঘরে ক্রমশ বাড়ছিল। মিশনের ডানদিকে মসৃণ ঘাসের চত্বর আর মৃত বৃক্ষের মতো কিছু পাইন গাছ—তার নিচে বড় বড় টেবিল আর ফাঁকা মাঠে হেই উঁচু এক হারপুনার হেঁটে হেঁটে এদিকে আসছে। হারপুনার কাচঘর অতিক্রম করে কাউন্টারের সামনে লোকটির সঙ্গে ফিস ফিস করে কী বলছে। অবনীভূষণ সব লক্ষ্য করছিল। হারপুনার সেই যুবতী দুজনকে উদ্দেশ্য করে হাঁটছে। অথবা তোমাদের অবনীভূষণের মনে হচ্ছিল যেন কে বা কারা সেই যুবতী দুটিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা গলায় বড় রাস্তায় হেঁকে হেঁকে বলে যাচ্ছে.... ট্যানি টরেন্টো... ট্যানি টরেন্টো....

রাত ক্রমশ বাড়ছিল। গল্প ক্রমশ জমে উঠেছে। মর্লিনের সাদা মুখ এবং পায়ের নিচে বসে বড় মিস্ত্রি সব দেখতে পাচ্ছিল। এখন যেন আর সেই মুখ দেখে অবনীভূষণের এতটুকু ভয় করছে না। তিনি এবার প্রিয় মর্লিনকে উদ্দেশ্য করেই যেন গল্পটা শেষ করলেন—অবনীভূষণের মনে হল দীর্ঘদিন পর তিনি এক অসামান্য কাজ করে ফেলেছেন। বুঝলে মর্লিন, তোমার এই বড় মিস্ত্রি সেই জাহাজে আবদ্ধ যুবতীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, আপনি নির্ভয়ে ঘুমোন, আমি বাইরে তুষারঝড়ের ভিতর বসে আপনার পাহারায় থাকছি। বলে তোমার বড় মিস্ত্রি দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ঠিক দরজার সামনে ভয়ংকর ঠান্ডার ভিতর পা মুড়ে বসেছিল এবং জেগে জেগে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন... দ্বীপের স্বপ্ন... বড় এক বাতিঘর দ্বীপে, সব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রগামী—জাহাজের মাস্তুলে তোমাদের অবনীভূষণ 'মানুষের ধর্ম' বড় বড় হরফে এইসব শব্দ ঝুলতে দেখল। অবনীভূষণ নিঃশব্দে হাঁটু মুড়ে মাথা গুঁজে বসে থাকল—তার এতটুকু নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, যেন জীবনের সাত রাজার ধন এক মাণিক খুবই হাতের কাছে রয়েছে। তাকে গলা টিপে মারতে নেই।

বড় মিস্ত্রি জীবনের সেই মহৎ গল্পটুকু বলে সকলকে দুঃখিত করে রাখলেন। মর্লিনের মৃত শরীরে এবার ওরা ফুল রাখল। এবং ওরা যথার্থই এখন এই রসদ ঘরে সেই যুবতীকে প্রত্যক্ষ করল।

সুখানী, বড় মিস্ত্রি ফুল রেখে উপরে উঠে যাচ্ছে। পিছনে স্টুয়ার্ড দরজা বন্ধ করে ফিরছে। ওরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। খোলা ডেকে দাঁড়াল। এই উদার আকাশ এবং শহরের নীল লাল আলো এবং সাগর দ্বীপের পাখিরা কেবল ডাকছে। ওরা এখন সমুদ্রের সিঁড়ি ভেঙে আকাশের তারা গুণতে থাকল যেন এবং এ সময়েই ওরা ঘরে ফেরার জন্য সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ওরা নির্জন ডেক ধরে যে যার আশ্রয়ে চলে গেল। পরস্পর কোনো কথা বলল না। বলতে পারল না।

এরা বন্দরে নেমে সোজা মার্কেটে চলে গেল। পথের কোনো দৃশ্যই ওদের আজ চোখে পড়ছে না। তাজা ফুলের জন্য ওরা সন্ধ্যা না হতেই দোকানে ভিড় করল। ওরা আজও তিনগুচ্ছ ফুল নিয়ে জাহাজে ফেরার সময় কোনো পাব—এ ঢুকে একটু মদ খাবার জন্য আকুল হল না। মর্লিন এক তীব্র পাপবোধের দ্বারা ওদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

স্টুয়ার্ড নিজের কেবিনে চোখ টেনে আর্শিতে দেখল। চোখের নিচটা টেনে টেনে দেখল। রুগণ পীড়িত ভাবটা কমেছে কী না দেখল। বড় মিস্ত্রির চোখ দেখল। বড় মিস্ত্রিকে কিঞ্চিৎ সতেজ মনে হচ্ছে।

সে বড় মিস্ত্রির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, স্যার, আমাকে আগের চাইতে সুস্থ মনে হচ্ছে না?

সুখানী বলল, মোটেই না।

বড় মিস্ত্রি বললেন, আমাদের তিনজনকেই গত রাতের চেয়ে বেশি সুস্থ মনে হচ্ছে।

ওরা সিঁড়ি ধরে নিচে নামবার সময় শুনল, দূরে কোথাও একদল পাখি উড়ে যাচ্ছে। ওদের মুখে খড়কুটো। ওরা আসন্ন ঝড়ের আগে ডিম পাড়ার জন্য পাহাড়ের খাঁজ অন্বেষণে রত। সুখানী সিঁড়ি ধরে নামবার সময় পাখিদের মুখে খড়কুটো দেখল। কেবল বড় মিস্ত্রি শুনলেন পাখিরা পাখায় রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে বিষণ্ণ সুরে কাঁদছে।

স্টুয়ার্ড একধারে ফুলগুলি রেখে মর্লিনের মুখটা ঠিক করে দিল। তারপর গাউনটা টেনে পায়ের নিচটা পর্যন্ত ঢেকে দিল। তারপর বাসি ফুলগুলো যত্ন করে সরিয়ে দেবার সময় বলল, মনে হয় আমরা আমাদের প্রিয়জনের পরিচর্যা করছি। আমাদের এত যত্ন মর্লিন বেঁচে থাকতে পেত!

সুখানী বলল, আচ্ছা স্যার, এসব করার হেতু কী? কী দরকার এই ফুল সংগ্রহের। কী দরকার প্রতি রাতে এ—ভাবে... আমাদের আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস যুক্তির যে ধর্ম থাকছে না।

বড় মিস্ত্রি বাধা দিয়ে বললেন, মৃতের প্রতি সম্মান দিতে হয় সুখানী। মর্লিনকে এখন যত সুন্দর মনে হচ্ছে, যত স্বচ্ছ মনে হচ্ছে, ওকে আমরা এখন যত ভালোভাবে দেখতে পারছি...

স্টুয়ার্ড মাঝপথেই বলে ফেলল, মর্লিন যে সত্যের জোরে বেঁচে ছিল এতদিন, মরে গিয়ে সেই সত্যকে সে আবিষ্কার করল, কী বলেন স্যার? আর সেজন্যই বোধহয় ওকে আমরা এত ভালোবেসে ফেলেছি।

সুখানী বলল, কীসব বলছ পাগলের মতো। বলে যে মর্লিনের শক্ত হাত পাগুলিকে ঠিক করে দিল। চুলগুলি যত্ন করে গুছিয়ে দিল। তারপর টেবিলটাকে প্রদক্ষিণ করার সময় ষাঁড় গোরু অথবা শূকরের মাংস ঝুলতে দেখে জীবন সম্পর্কে কেমন উদাসীন হয়ে পড়ল। সে চেয়ারে বসে মর্লিনের পায়ের কাছে মাথা রেখে ঘুম যাবার ভঙ্গিতে হাত পা টানা দিতে গিয়ে বুঝল এই শরীর এখন মলমূত্রের আধার। অথচ মর্লিনের চোখ পাথরের মতো। বড় মিস্ত্রি মর্লিনকে নিবিষ্ট মনে দেখছেন, স্টুয়ার্ড গল্প আরম্ভ করেছে।

সে বলল, তখন আমি জাহাজের তেলয়ালা সুমিত্র। সে বক্তৃতার কায়দায় বলল, স্যার আপনি আছেন, নচ্ছার সুখানী আছে আর এই সম্মানীয়া অতিথি—আমাদের এই মহত্তর ঘটনার স্মৃতিমন্থনই আশা করি আমাদের সুস্থ করে তুলবে।

সুখানী বলল, তাহলে বুঝতে হবে মাথাটা আর ঠিক নেই।

চুপ রও বেয়াদপ! তুমিই সব নষ্টের গোড়া। বলে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। সে কিছু বলতে পারছিল না; ওর কষ্ট হচ্ছে বলতে। সে আবেগে কাঁপছিল। সে ধীরে ধীরে বিগত জীবনে চেরি নামক এক রাজকন্যার গল্প শোনাল। তার আর চেরির গল্প। জাহাজি জীবনের অপূর্ব এক প্রেম ভালোবাসার গল্প।

স্টুয়ার্ড গল্প শেষ করে মর্লিনের মাথার কাছে দাঁড়াল এবং ওর চোখ দুটোতে চুমু খেল। বলল, আমাদের ছোট এবং স্বার্থপর ভেব না, মর্লিন।

সারা ঘরময় সুখানী এখন কোনো মাংসের শরীর দেখতে পাচ্ছে না। দূর থেকে আগত কোনো সংগীতের ধ্বনি যেন এই ঘরে বিলম্বিত লয়ে বেজে চলেছে। সে থেকে থেকে কবিতার লাইন বারবার আবৃত্তি করল। এবং এই আবৃত্তির ভিতরেই সে এলবিকে স্মরণ করতে পারে।

ওরা তিনজন আজও ফুল রাখল মর্লিনের শরীরে। ওরা উঠে যাবার সময় কোনো বচসা করল না। ওরা কোনো সমাধি ক্ষেত্র থেকে ফিরে আসছে যেন এমত এক চোখ—মুখ সকলের।

বন্দরে এটাই ওদের শেষ রাত ছিল। ভোরের দিকে জাহাজ নোঙর তুলবে। ওরা তিনজন প্রতিদিনের মতো বসল। প্রতিদিনের মতো বাসি ফুলগুলি মর্লিনের শরীর থেকে তুলে ভিন্ন জায়গায় রাখল।

বড় মিস্ত্রি দু'হাত প্রসারিত করে দিলেন টেবিলে। সুখানী দীর্ঘ সময় ধরে উপাসনার ভঙ্গিতে বসে থাকল। সে তখন চোখ বুজে একটি বিশেষ দৃশ্যের কথা স্মরণ করে গল্পটা আরম্ভ করতে চাইছে।

সুখানী বড় মিস্ত্রিকে উদ্দেশ্য করে বলল, তখন স্যার আমার নাম ছিল বিজন। তখন আমি সুখানী হইনি। বলে, গল্পটার ভূমিকা করল।

তারপর আস্তে আস্তে বিজন এক অব্যক্ত বেদনার গল্প শোনাল। জাহাজের বাতাস পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে শুনল বিজনের গল্প। একসময় বিজন গল্প শেষ করে অবসন্ন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। সে এখন মর্লিনের কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিচ্ছে। সে যেন এই কপালের কোথাও কিছু অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

বড় মিস্ত্রি এত অভিভূত যে গল্প শেষ হবার পরও তিনি কিছু সময় ধরে বিজনের মুখ দেখলেন। তিনি বিজনকে মর্লিনের কপালে নুয়ে পড়তে দেখে বললেন, কী দেখছ সুখানী?

সুখানী বড় মিস্ত্রির কাছে এল এবং বলল, Peace is on her forehead. Peace-কে অন্বেষণ করছি স্যার। মর্লিন সারাজীবন ঝড়ে নৌকা বেয়ে এখন গভীর সমুদ্রে বৈতরণী পার হচ্ছে। এইটুকু বলে বিজন পুনরায় এলবির সেই কবিতাটি একটু অন্যভাবে আবৃত্তি করল—

> "She had dropped the sword and
> dropped the bow and the arrow : peace
> was on her forehead, and she had
> left the fruits of her life behind herself
> on the day she marched back again to
> her master's hall."

জাহাজ ছাড়বার সময় ওরা তিনজন নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিল। শীতের প্রকোপ কমে গেছে। সুখানী, স্টুয়ার্ড এবং অন্যান্য সকল জাহাজিরাই বন্দর থেকে চোখ তুলে নিল। বন্দর ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। বন্দরের আলো ঘর বাতি সবই একে একে সমুদ্রের ও—পাশে হারিয়ে গেল। আবার ওরা, সকল জাহাজিরা দীর্ঘদিন এই সমুদ্রে রাত যাপন করবে। ওরা বন্দরের জন্য আকুল হবে ফের। এবং মাটির স্পর্শের জন্য হবে ভয়ংকর মরিয়া।

বড় মিস্ত্রি ডেক ধরে হেঁটে ডেক—কসপের ঘরে ঢুকলেন। বললেন, আমাকে কিছু তক্তা দাও কসপ। করাত, হাতুড়ি বাটালি দাও। কিছু পেরেক লাগবে। সব আমার ঘরে রেখে এসো।

বড় মিস্ত্রি এবং স্টুয়ার্ডের কোনো ওয়াচ ভাগ নেই বলে ওরা খুশিমতো নিচে নেমে যেত। ওরা সন্তর্পণে সকলের আড়ালে সেই কাঠ, পেরেক নিচে নিয়ে গেল।

বড় মিস্ত্রি কানে পেনসিল গুঁজে সেই প্রায়—অন্ধকার রসদঘরে কাজ করতেন। তক্তাগুলোকে পালিশ করে উজ্জ্বল করে তুলতেন মাঝে মাঝে। কিছু পাথর কফিনে সাজিয়ে চট বিছিয়ে মর্লিনের বিছানা, তারপর ওরা গান করত নিচে। দুঃখ এবং বেদনায় সেই গান সমুজ্জ্বল। মাঝে মাঝে ওরা নিজেদের ঘর অথবা স্ত্রী পুত্রদের কথা বলত। ওরা বলত, আমরা যথার্থই মানুষ, ঈশ্বর!

বড় মিস্ত্রি বলতেন, আমার বড় ছেলেটা জলে ডুবে মারা গেল! দুঃখ আমার অনেক স্টুয়ার্ড। স্টুয়ার্ড বলত, কী আশ্চর্য স্যার, আমরা মর্লিনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি দেখুন। সুখানী এসব কথায় থাকত না; সে চুপচাপ একটু ফাঁক পেলেই রসদ ঘর অতিক্রম করে বরফ ঘরে ঢুকে যেত। মাঝে মাঝে বলত, দেখছেন স্যার, মর্লিন অবিকৃতই আছে। মনে হয় মেয়েটা ঘুমিয়ে গেছে।

বড় মিস্ত্রি বললেন, কফিনে কিছু কারুকার্য করলে ভালো হত।

স্টুয়ার্ড বলল, স্যার ধর্মযাজকের কাজটুকু কে করবে?

সুখানী বলল, কেন আমরাই করব। পৃথিবীতে আমরা তিনজন বাদে মর্লিনকে আর কে এত ভালোবেসেছে। এই জাহাজে কাজের ফাঁকে একটু অবসর পেলেই আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি। মর্লিনকে

জীবনের সুখদুঃখের ভাগ দিয়েছি। ধর্মযাজকের কাজ আমরাই করব। আমরা তিনজন ওর শববাহক হব। আমরা তিনজন ওর পরম আত্মীয় এবং আমরা তিনজনই ওর ধর্মযাজক। সুখানী কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গেই কথাগুলি উচ্চারণ করল। তারপর গজকাঠি দিয়ে কফিনের মাপ দেখে বলল, ইচ্ছে হচ্ছে এই কফিনের পাশে একটু জায়গা নিয়ে শুয়ে থাকি। আর উঠব না। সব সুখ দুঃখ প্রিয় মর্লিনের সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যাক।

রাতে বড় মিস্ত্রি বললেন, আমার কাজ শেষ। এসো, এখন আমরা ওকে কফিনের ভিতর পুরে দি।

সুখানী কাতর গলায় বলল, স্যার, আজ থাক। আসুন, আজও আমরা গোল হয়ে বসি। মর্লিনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে আমরা বড় একা হয়ে যাব। জাহাজটা বড় অসহায় লাগবে। এইসব কথার সঙ্গে এক দ্রুত কান্নার আবেগ উথলে ওঠে সুখানীর গলাতে। ঘরে আমার স্যার কেউ নেই। এলবিকে পরিত্যাগ করে আর কোথাও নোঙর ফেলতে পারিনি। প্রিয় মর্লিন আমাকে একটু আশ্রয় দিয়েছিল যেন। স্যার, ওকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেব!

বড় মিস্ত্রি বললেন, আমারও ভালো লাগছে না হে।

স্টুয়ার্ড বলল, আজকে থাক। কালই ওকে গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করব।

পরদিন ওরা তিনজন যখন রাত গভীর, জাহাজিরা কোথাও কেউ জেগে নেই, শুধু ওয়াচের জাহাজিরা এনজিন রুমে এবং ব্রিজে পাহারা দিচ্ছে, যখন সমুদ্র শান্ত, যখন আকাশে অজস্র তারা জ্বলছিল এবং দূরে কোথাও কোনো তিমি মাছের দল ভেসে যাচ্ছে অথবা ডলফিনের ঝাঁক এবং এক কাক—জ্যোৎস্না নীল জলের উপর, জাহাজটা রাজহাঁসের মতো সাঁতার কাটছে তখন শববাহী দলটি গ্যাঙওয়েতে কফিন রেখে সব বাসি ফুলগুলি প্রথমে সমুদ্রে ফেলে দিল। ফুলগুলি দূরে দূরে ভেসে যাচ্ছে, ওরা ফুলগুলি দেখতে পাচ্ছে না। ওরা মর্লিনের জুতো এবং গাউন নিক্ষেপ করল, তারপর হাতের দস্তানা। ওরা এসব ফেলে দেবার সময়ই কাঁদছিল। ওরা কাঁদছিল। তিনজন নাবিকের চোখ থেকে জল কফিনের উপর পড়ছিল। সমুদ্র এবং বন্দর যাদের ঘর এবং এইসব বেশ্যামেয়েরা যাদের ঘরণি সেইসব রমণীদের উদ্দেশ্যে তিনজন নাবিক যেন চোখের জল ফেলছিল। ওরা পরস্পর দুঃখে এতই কাতর, ওরা এতই ব্যথিত..... ওরা কান্নার আবেগ সামলানোর জন্য রুমাল ঠেসে দিচ্ছিল মুখে। ওরা প্রিয় মর্লিনের কফিন কাঁধে তুলে ধীরে ধীরে সমুদ্রের জলে ফেলে, দেখল, আস্তে আস্তে প্রিয় মর্লিন জলের নিচে ডুবে যাচ্ছে। ওরা পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্নার আবেগে এলবির উচ্চারিত সেই কবিতাটি আবৃত্তি করল—

> "When the warriors came out first from
> their Master's hall, where had they hid
> their power? Where were their armour
> and their arms?
> They looked poor and helpless, and
> the arrows were showered upon them
> on the day they came out from their
> Master's hall.
> When the warriors marched back
> again to their Master's hall where did
> they hide their power?
> They had dropped the sword and
> dropped the bow and the arrow; peace
> was on their foreheads; and they had
> left the fruits of their life behind them

on the day they marched back again to their Master's hall.''

দুঃস্বপ্ন

তবে তুমি এখানে দাঁড়াও আমি দেখছি ভিতরে কেউ আছে কিনা!

সোমা দাঁড়িয়ে থাকল। মনীষ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সে উঠে যাচ্ছে। সোমা তাকে উঠে যেতে দেখছে। সিঁড়ির বাঁকে মনীষ হারিয়ে গেলে সোমা সংস্কৃত কলেজের পাশে সেই পুরনো বইয়ের দোকানগুলো দেখল। এখানে সে নানাভাবে এসেছে। মনীষের সঙ্গে সামনের দেবদারু গাছটার নিচেই প্রথম আলাপ হয়েছিল।

এখানে এসে সেই প্রথম আলাপের দিনক্ষণগুলো কেমন মনে পড়ে গেল। বিয়ের পর সে যে এখানে দু—একবার আসেনি তা নয়, এসেছে। প্রথম বেশ কয়েকবারই এসেছে। কিন্তু এলেই সে দেখেছে বন্ধুবান্ধবদের আর আগের কৌতূহল সোমা সম্পর্কে আদৌ নেই। সে ওটা চাইছেও না। তবু মনে হয়েছে কেন জানি মনীষকে বিয়ে করার পর সব পুরুষবন্ধুদের কাছে তার দাম কমে গেছে। সেজন্য পরে আর এদিকে মাড়ায়নি সোমা। বরং মনীষই গিয়ে মাঝে মাঝে খবর নিয়েছে সবার।

তখনই মনে হল পিছন থেকে কে ডাকছে। সে তাকাল। মনীষ নয়। ওর অন্য চেনা পুরুষবন্ধু। বলল, এসো সোমা।

ও কোথায়?

বসে গেছে। আমি তোমাকে নিতে এলাম।

তুমি কেমন আছ?

ভালো। তুমি?

ভালো। তবে মাঝে মাঝে তোমাদের কথা মনে হলে খুব এখানে আসতে ইচ্ছা করে।

হয়েছে থাক। কী করছ বল?

কী আর করব। বাড়িতে আর বসে থাকতেও পারি না। ও অফিস চলে গেলে একা একা ভালো লাগে না বলে কলেজে একটা কাজ নিয়েছি।

ভালো করেছ। যা দিনকাল পড়েছে!

সোমা ওপরে উঠে দেখল জাঁকিয়ে বসে গেছে মনীষ। যেন সে এখানে একাই এসেছে। তার সঙ্গে কেউ ছিল না। সোমা যে ঢুকল সে তা পর্যন্ত টের পায়নি। হা হা করে কী কথায় হাসছে। সোমা কাছে যেতেই বলল, এতগুলো অকালকুষ্মাণ্ড একসঙ্গে বসে আছে দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না সোমা। বসে গেলাম। তুমি বসো। এই বিনু একটা চেয়ার এনে দে তোর বৌদিকে। এতদিন পর আমরা এসেছি, সোমার নামে কিছু আজ সেলিব্রেশান হোক।

বিনু সোমার সহপাঠী ছিল। সে সোমাকে, সোমা বলে ডাকত। তুই—তুকারি করত। সোমা এই বছর চারেকের ভিতর সামান্য ভারী হয়েছে। এবং চুল সে সবসময়ই শ্যাম্পু করত। চোখ খুব টানা, তার ওপর সোমার ভারি বদ স্বভাব ছিল, সে এলেই খুব একটা জাঁকজমক করে আসত না। খুব সাদাসিদে পোশাক, যেন সে ঘরেই ছিল পথ ভুল করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে নেমে এসেছে। বিনু কতদিন বলেছে, এই সোমা শোন, তুই একদিন চোখে কাজল টেনে আয় না। তোকে ভালো করে দেখি।

নিমেষে বিনুর সে সব কথা মনে পড়ে গেল। এবং মনীষ যেহেতু ওর সমবয়সি ছাত্র এবং সহপাঠী, সে তার চোখে—মুখে কোনো পূর্বস্মৃতি ধরা পড়ুক তা চাইল না। খুব হয়েছে। শালা তুমি তো খুব এখন সাঁতার কাটছ আর আমি চেয়ার টেনে মরব এমন বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বলতে পারল না। সে একটা টিনের চেয়ার টেনে নিল। অন্য চেয়ারে নানারকমের মানুষ বসে গেছে। ওর ইচ্ছা ছিল না সোমা একটা সামান্য টিনের চেয়ারে বসুক। সে নিজে উঠে যাবার সময়ই বলে গেল, তুই বস সোমা। আমি নিয়ে আসছি। সোমা বিনুর দিকে তাকাল। কেমন আছিস?

তুই?

খুব ভালো।

আমরা ভালো নেই।

কেন কী হয়েছে? ভালো নেই কেন? একটা বিয়ে করে ফেল।

কী সময় পড়েছে! এ—সময়ে কেউ বিয়ে করে!

সুধীর বলল, এখন বিয়ে বিয়ে ভাল্লাগে না! কে আজ সেলিব্রেট করছে বল?

বিনু বলল, আমার পকেটে ভাই পয়সা নেই।

অশোক বলল, তোর পকেটে কোনদিন পয়সা থাকে?

বিনু বলল, না থাকলে কী করব।

সোমা বলল, তোমরা বিনুকে চটিও না। বরং আমি তোমাদের সবাইকে আমার নামে সেলিব্রেট করছি।

মনীষ বলল, হল! বললাম তোদের আজ কিছু খসাব, এখন শালা উলটো চাপ।

কী হচ্ছে! শালা শব্দ মনীষ উচ্চারণ করায় সোমার যেন সম্মানে লেগেছে। না মাইরি বিনু, এখন আর আমাদের—স্বাধীনতা নেই।

আমাদের বলছিস কেন? বল তোর নেই। একটু খিস্তি—খেউড় করলে সোমা, মানুষ ছোট হয়ে যায় না। কেমন গম্ভীর গলায় বিনু এমন বলল।

তাই বুঝি।

সুধীর ডাকল, এই আবদুল, আজ স্পেশাল কী আছে রে?

চিকেন প্যাটিস, চিলি চিকেন।

ওসব চিলি ফিলি চলবে না? মনীষ তুমি কী খাবে। সোমা শীতকাল বলে একটা মেরুন রঙের চাদর গায়ে দিয়েছে। এবং চাদরে ওর মুখের অর্ধেকটা ঢাকা। সে যখন কথা বলে চাদরটা নামিয়ে নেয়। বিনুর এসব সহ্য হচ্ছে না। অশোকের সঙ্গে এখন পর্যন্ত সোমা কোনো কথা বলছে না। সে একবার রেস্তোরাঁতে সোমাকে খাওয়াবে বলে নিয়ে গিয়ে অযথা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কী সব করতে চেয়েছিল, পারেনি। সেই থেকে সে অশোকের সঙ্গে দেখা হলে বেশি কথা বলত না। বিয়ের পর বন্ধ করেই দিয়েছিল। এখানে ওর যতটুকু অসুবিধা হচ্ছে এই মানুষের জন্য। কিন্তু অশোকই প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিল মনীষের সঙ্গে। এবং অশোক মনীষের খুব বন্ধু লোক। তবে এই যে রক্ষে, অশোক কখনও বন্ধুত্বের দাবিতে ওর বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেনি। কেন জানি আজ অনেক দিন পর সোমার সবার সঙ্গেই ভালো ব্যবহার করতে ইচ্ছে হল।

সোমা বলল, অশোক তুমি কী খাবে?

সে কেমন উদাসীন গলায় বলল, বল কিছু একটা।

কেন, তুমি বলতে পার না? সোমা পুরনো জলছবি মুছে দেবার চেষ্টা করছিল। অশোকই সহসা বলল, তোমরা হঠাৎ? তুমি তো এখন বড়মানুষের বউ।

একটা শো দেখতে এসেছিলাম। অনেকদিন পরে আসা, তাই ও বলল, দেখি আমাদের পুরনো বন্ধুবান্ধব কে আর এখন এখানে আসছে। সে অশোকের কথা গায়ে মাখল না।

ভালো করেছ এসে, অনেকদিন পর তোমাকে দেখলাম।

অশোক কী ওর সেই বিসদৃশ ঘটনা এখন বেমালুম ভুলে গেছে! ওর তো এখন শুধু সেই ঘটনার কথাই মনে হবার কথা। সোমা আজ অশোকের ওপর আর রাগ পুষে রাখেনি। কারণ সে দেখেছে মেলামেশার সুযোগে কেউ একটু বেশি চালাকি করে ভালোবাসা করে, কেউ কম। অশোককে সোমার এখন বরং বোকাই মনে হয়। বলে কয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা অশোকের ছিল না। অশোকের সহিষ্ণুতা ছিল না। ধুম—ধাড়াক্কা সে কিছু না বলেই সবটা করতে চেয়েছিল। তাকে সেদিন সোমার ইতর এবং ফাজিল মনে হয়েছিল। বলেছিল অশোক তুমি এমন ইতর, নীচ, জানতাম না।

অশোক সেদিন কিছু বলেনি। সে মাথা নিচু করে বসে ছিল। একটা কথাও বলেনি। সোমা খাবার ফেলে চলে এসেছিল। বিয়ের পর সে বুঝেছে মনীষও এটাই চেয়েছে। মনীষ ভালোবাসার ব্যাপারে শুধু সহিষ্ণুতা

বেশি।

বিনু বলল, তা হলে অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি।

সুধীর সোমার দিকে তাকাল।

ভয় নেই। যতটা খুশি দিতে পার।

সবাই এবার নড়েচড়ে বসল। মনীষ সবার বড় এমন একটা ভারিক্কি চালে বসে রয়েছে। কারণ এই চারজনের ভিতর সে—ই মোটামুটি এই ভালোবাসার ব্যাপারটাতে কী রহস্য আছে সব জেনে ফেলেছে। সে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, রমেশ দিল্লিতে বড় একটা চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

ও শালা কেরিয়ারিস্ট। ওর কথা তুলে আর আমাদের এমন ভালো দিনটা মাটি করে দিস না মনীষ। সুধীর এটুকু বলে কী বলবে ভেবে একবার সোমার দিকে তাকাল, পরে মনীষের দিকে। ওর যেন মনীষকেই কিছু আঘাত দিতে ইচ্ছা করছে। বলতে ইচ্ছা হচ্ছে মামার দৌলতে তুমিও কম যাও না। কিন্তু সোমা সহসা একসঙ্গে এতটাকা খরচ করতে রাজি হয়েছে, এমন একটা খাবার টেবিলে আর হোস্টকে বিব্রত করে লাভ নেই। সে বলল, তুই নিতাইয়ের খবর জানিস?

না।

সে আত্মহত্যা করেছে।

বলিস কি!

সোমা বলল, আত্মহত্যা কেন?

আত্মহত্যা কেন সে তো সে বলতে পারবে।

এমন মানুষ কখনও আত্মহত্যা করতে পারে!

পারে। সব পারে, মনীষ খুব উদাসীন গলায় বলল।

সোমা বলল, ও তো কাজলকে বিয়ে করেছিল না?

একটা ছেলেও হয়েছে। বিনু বলল।

আহা রে! সোমার মুখটা যথার্থ খুব উদ্বিগ্ন দেখাল।

অশোকের এ—সব মৃত্যু—ফিত্যুর কথা শুনতে আদৌ ভালো লাগে না। চারিদিকে এখন অরাজকতা, রোজ মানুষ খুন হচ্ছে, বারাসতে এগারো জন, সকালে উঠেই এসব দেখতে দেখতে সে ভিতরে বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে থাকে। এখানে সারাদিন পর আসা একটু রিলিফের জন্য। বাড়িতে একগাদা ভাই—বোন। সে স্কুলে যতক্ষণ থাকে শান্তি, এখন আবার সে স্কুলও কর্তৃপক্ষ রোজ রোজ বোমাবাজির জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। কী করে যে দিনটা কাটে তার! সে বলল, স্রেফ আমরা খাব আর সুখের গল্প করব। এত দুঃখ চারিদিকে যে তাকানো যায় না। এখানে এসেও যদি তোমরা আত্মহত্যা—ফত্যা নিয়ে কথা চালাচালি কর—তো উঠে যাব।

ঠিক আছে বোস। মনীষ বলল। কেউ আর এ নিয়ে আলোচনা করবে না। তুই কি এখনও সেই জে.এন.অ্যাকাডেমিতেই আছিস?

কী করব ভাই। চেষ্টা তো করলাম। সুরেন্দ্রনাথে নাইটে একটা পার্ট টাইম হবার কথা ছিল। সে পর্যন্ত হল না। ওরা এইসব আন্দোলনের একটা কিনারা না হলে কিছু করছে না।

অশোককে দেখলেই মনে হয়, সে স্কুলের শিক্ষক বলে কেমন এখনও একটু মনমরা হয়ে আছে। আর সবাই কলকাতার কাছাকাছি কলেজে চাকরি পেয়ে গেছে। সে কোনো কলেজে কিছু করে উঠতে পারল না।

সোমা বলল, তাহলে অশোক তুমি একটা জায়গায় আছ?

অশোক বলল, তা আছি। কখন প্রাণটা যায়। তোমাদের কলেজে কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে না?

হচ্ছে না আবার! পরীক্ষা বন্ধ। বড়দি দুবার চেষ্টা করতে গিয়ে ভীষণ নাজেহাল হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি পারবেন না। কর্তৃপক্ষ স্কুলে পুলিশ পাহারা দেবে বলেছিল। তিনি রাজি হননি।

যা চলেছে!

আমরা কিন্তু আবার সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছি। মনীষ সবাইকে মনে করিয়ে দিল।

বিনু বলল, আমি, সোমা তোকে একটা অনুরোধ করব। রাখবি?

কী অনুরোধ? বলে সোমা মুখ থেকে চাদর নামিয়ে দিল। বিনু এতক্ষণ পর ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছে। বড় সুন্দর ঢলঢলে মুখ। বলল, তুই চোখে কোনোদিন কাজল দিলি না।

ও, সেই কথা?

না, সে কথা নয়। সেই গানটা গাইবি গুনগুন করে, আমরা সবাই শুনব।

কোন গানটা?

এখন নিজের ছায়ায় রচিছে কত মালা...। বড় ভালো লাগত এ—গানটা।

এটা কী গান গাইবার জায়গা?

তোকে জোরে জোরে গাইতে বলছি না। গুনগুন করে গাইবি। আমরা চুপচাপ কান পেতে শুনব।

বাড়িতে আয় না! কত গান শুনতে পারিস দেখব।

সে যাব'খন একদিন।

হয়েছে। কতবার বলেছিস, যাবি। কোনোদিন গেলি না।

যাব এবার ঠিক যাব। গাইবি?

না। এখানে গান গাওয়া যায় না।

মনীষ তুই বলে দেখ না।

তোর কথাই শুনছে না, আর আমার কথা শুনবে?

আবদুল জল রেখে গেল। বিনু অপলক দেখছে সোমাকে। ওর অনুরোধ রাখল না বলে কেমন দুঃখী মুখ নিয়ে বসে রয়েছে। মনীষ সে দুঃখ দেখে বলল, সোমা তুমি গেয়ে শোনাও না গানটা। তা না হলে, আবার একটা আত্মহত্যার খবরপাবে। পুলিশ ধরতেই পারবে না কেন সে আত্মহত্যা করল। মনীষ ব্যবহারে সব সময় ওদের খুব কাছাকাছি আসতে চাইল।

সোমা বলল, কী বাজে বকছ!

দেখলি তো আমাকে ও কী চোখে দেখে!

বিনু বলল, আমি সত্যি আত্মহত্যা করব সোমা। আমি লিখে রাখব, এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী সোমা। বালিশের তলায় রেখে গেলে দেখবে কেমন মজা।

ও বাবা, দরকার নেই, আমি গেয়ে শোনাচ্ছি। সে দু'বার গলা সাফ করে বলল, আচ্ছা তোমরা কী! একটা সময় অসময় নেই? তোমরা কী সবাই পাগল?

এখন খুব সময় অসময় দেখানো হচ্ছে। আগে তো, এই সোমা গা না, ব্যাস, গান আরম্ভ হয়ে গেল। টেবিলে তাল দিচ্ছে নিশীথ। তোমার নিশীথকে মনে পড়ে সোমা?

খুব।

সে বেটা এখন কৃষ্ণনগরে পোলট্রি করেছে।

এই না সে বলত, আমেরিকায় যাবে ডক্টরেট করতে?

কেন, করেছে তো। পোলট্রিতে। নানা জাতের মুরগি ব্রিডিং করাচ্ছে। সুধীর জলের গেলাসগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে এমন বলল। বেটা সারাজীবন হাঁস—মুরগি ব্রিডিং করল। নিজের কিছু হল না।

কার কী হয়েছে? তোমরা বাদে কে কী ব্রিডিং করতে পারছে?

সোমা বলল, আমরা কিন্তু টেবিল ম্যানার্স মানছি না।

সুধীর বলল, আমরা ভুলেই গেছিলাম এখানে একজন মহিলা বসে আছেন। এবং তিনি আমাদের বন্ধুপত্নী।

বিনু বলল, সুধীর তোর মুখ বড্ড আলগা। আজ ক'টা উইকেট ডাউন রে?

সোমা বিনুর এমন কথায় নিজেকে খুব সেকেলে ভাবল।

শীত আরম্ভ হয়ে গেছে। এ—বছর বিদেশ থেকে কোনো টিম খেলতে আসছে না।

পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পত্রিকা পড়ে। রঞ্জি ট্রফি আরম্ভ হতে অনেক দেরি। হয়তো ইংল্যান্ড—অস্ট্রেলিয়ার খেলার কথা বলছে। কিন্তু সে যতটা জানে খেলা আরম্ভ হতে আরও সপ্তাহখানেক বাকি।

সুধীর বলল, আজকের খবর জানি না।

অশোক বলল, শুনেছি শোভাবাজারে সকালের দিকে ওয়ান উইকেট ডাউন খেলা চলছে।

কারা খেলছে?

বলা নিরাপদ তো? বলে সে চারিদিকে তাকল। যা আজকাল দিন যাচ্ছে।

সোমা খুব উদ্বিগ্ন মুখে তাকাল। বলল, কেন কী হয়েছে? বল না শুনি।

ভাই আমার চোখে দেখা নয়। শোনা। চিৎপুরে ট্রাম—বাস বন্ধ।

সোমা এবার বুঝতে পারল। কোন পার্টি কার বিরুদ্ধে খেলছে আজকাল সে—সব আর খুলে কেউ বলতে চায় না। মনীষ এমন লক্ষ্মীছাড়া দেশের যে কী হবে ভেবে মুখ উদাস করে রাখল।

আবদুল খাবার রেখে গেছে। ওরা চিকেন—প্যাটিস এবং ক্রিম কফি খাচ্ছে। তখনই মনে হল সোমার, কয়েকটা টেবিল পার হলে একটা গোলাকার টেবিলে চার পাঁচজন খুব নিভৃতে কী যেন আলাপ করছে। এবং সবচেয়ে উঁচু লম্বা যে মানুষটি ওর দিকে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, সোমার মনে হল মানুষটাকে সে কোথাও দেখেছে এবং খুব চেনা। অথচ সে মনে করতে পারছে না সে কে। কোথায় কীভাবে আলাপ। সোমা একটুকরো প্যাটিস মুখে দিতে দিতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

এ—জায়গা খুব পরিচিত জায়গা। অন্যত্র হলে সোমা ভয় পেত। বারবার ফিরে ফিরে তাকানো ওকে কেমন বিব্রত করে তুলছে। এবং কিছুটা চুরি করে দেখার মতো ভাব চোখে। সোমাও যতটা পারছিল সবার অলক্ষ্যে মাঝে মাঝে সেদিকে তাকাচ্ছে। এবং সেই চোখ যা তাকে কোনো দূরাগত স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে চাইছে।

বিনু বলল, আমাদের কিন্তু সেই গানটা এখনও শোনা হল না।

সোমা বলল, আমার ভালো লাগছে না। সোমার চোখ—মুখে এমন মায়া মাখানো যে বিনু আর ওকে অনুরোধ করতে পারল না। শুধু বলল, সোমা, আমরা বেশিদিন আমাদের মুক্ত জীবনকে ধরে রাখতে পারি না।

অশোক বলল এই আরম্ভ হয়ে গেল নীতিবাক্য।

না রে নীতিবাক্য নয়। ভেবে দেখ তো কী সুন্দর ছিল সেইসব দিনগুলো।

সোমা বলল, আমরা যে যার বাড়ি থেকে কত মিথ্যা কথা বলে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বের হয়ে গেছি। রোদ জল ঝড় মানিনি। ফিরতে রাত হয়ে গেছে। মাকে একবার সাপ্টে ধরে গালে চুমু খেলেই মা—র রাগ সব জল! কী বাবা দস্যি মেয়ে, মা বলত। একবার মনে আছে মনীষ, তোমরা আমাকে ম্যাড হাউসে নিয়ে গিয়েছিলে। জোর করে প্রথম এক পেগ জিন খাওয়ালে লাইমজুস দিয়ে, কী আমার ভয়, কিন্তু বাড়ি গিয়ে স্রেফ বলে দিলাম, মাথা ধরেছে কিছু খাব না। পার পেয়ে গেলাম। বেশ স্বপ্নের মতো মনে হয় দিনগুলো।

তা মনে হবে না কেন? মনীষ বলল, চারপাশে বন্ধুজন, বান্ধবী এবং উড়ে বেড়ানো। মেয়েদের তো ঐ স্বভাব, মধুটি খাব, কাঁটার ঘা—টি খাব না।

বাজে বকো না, সোমা এমন ভর্ৎসনার সুরে বলল। কেবল মেয়েদের বেলায় এটা খাটে না। তোমরাও কম যাও না বাপু। বলেই সোমা তাকাল দূরের টেবিলে, দেখল মানুষটা তাকে আবার চুরি করে দেখছে।

এখন আমরা উঠব। সোমা বলল।

এত তাড়াতাড়ি?

না রে, দিনকাল বড় খারাপ। আটটা বাজতেই রাস্তা ফাঁকা।

অশোক বলল, কী বই দেখলি?

মহান পরিচালকের বই।

কেমন দেখলি?

মনীষ তাকাল সোমার দিকে। খুব ভালো। সোমা কিছু হয়তো বলবে এ—ব্যাপারে। কারণ সোমার ভালো লাগেনি। ওর বোর করেছে। কিন্তু সোমা কিছু না বলতে সে কেমন উৎসাহ পেয়ে গেল। সে বলল, বোঝা যায় ফিল্মের যে আলাদা একটা ল্যাঙ্গোয়েজ আছে। সে তার নিজগুণেই ভাস্বর।

যা ব্বে? সুধীর কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তুই কবে থেকে আবার ফিল্ম ক্রিটিকের কাজ নিলি? শুনেছি তো ক্যাপিটালিস্ট বনে যাবার জন্য দিন—রাত উইকেটে দাঁড়িয়ে বেমক্কা খেলে যাচ্ছিস।

ফিল্ম—ক্রিটিকের কী আছে। তবে সাধারণ দর্শকদের ভালো নাও লাগতে পারে।

ওরা একটা নিটোল গল্প খুঁজতে চায়।

সে গল্পটা বল। সোমা মুচকি হাসল।

মনীষ কিছুতেই বলতে চাইছে না। সে বলল, ওদের কথা বাদ দাও। ওরা এসেছিল খুব একটা মারামারি, অথবা নিটোল প্রেম, কিংবা হত্যা রাহাজানি এসব দেখবে বলে।

তুই এটা কী বলিস! ওঁর মতো পরিচালকের কাছে সেটা কেউ আশা করে না। ওরা নিশ্চয়ই ওঁর ছবি দেখতে ভালোবাসে বলেই এসেছে।

সোমা বলল, বের হয়ে দেখি তিন যুবক আর এক যুবকের কলার চেপে ধরেছে। বলছে, বোঝাও কী দেখলে। একজন বলল, শালা তুমি আমাদের সিডিউস করছ। তুমি না বললে আমরা আসতাম না।

মানে! বিনু বলল।

মানে জানি না। সোমা বলল, দেখলাম, সে আমতা আমতা করে তার তিন বন্ধুকে বোঝাচ্ছে, আজকের দিনের কত বড় সমস্যা তিনি এই সামান্য সময়ের ভিতর তুলে ধরেছেন। প্রায় গীতিকাব্যের শামিল।

এ—ভাবে বই শেষ হয়! আজকের দিনের সমস্যা গীতিকাব্যের মতো!

হয় না?

ধুস শালা! তুমি বোঝ না কিছু, তুমি জান না ওর ডিউপার্ট আছে। ওটা পরে দেখানো হবে। বলে সেই বন্ধুর হাসি নকল করতে চাইল সোমা।

মনীষ সোমার কথায় কেমন ছোট হয়ে গেল। বলল, মুশকিল কী জানিস, এ—দেশের মানুষের একটা স্বভাব আছে, সে স্বভাবটা হচ্ছে যা বুঝি না তাই বোঝার ভান করি।

সোমা বলল, তুমি নিজের দিকে তাকিয়ে বল।

আমি নিজের দিকে তাকিয়েই বলছি, ফিল্ম ওয়ার্লডে এটা রেভলিউশান।

বিনু বলল, আমি দেখেছি। আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হয়েছে।

মনীষ ব্যাগ খুলে টাকা গুনছিল। সে না তাকিয়েই বলল, কী মনে হয়েছে?

তোমরা ব্লো—আপ দেখেছ কেউ?

অশোক বলল, আমি দেখেছি।

বিনু বলল, বইটা এলে তোমরা সবাই দেখো। তারপর আবার আলোচনায় বসা যাবে।

মনীষ বুঝল বিনু এ—ব্যাপারে আর এগুবে না। বিনু বাজে তর্ক করেও না, করতে ভালোও বাসে না।

মনীষ বলল, তবু তোরা সবাই দেখিস। না দেখলে বড় কিছু একটা মিস করবি।

আবদুল টাকার চেঞ্জ ফিরিয়ে দিল। সে বিশটা পয়সা রেখে বাকি সব তুলে সোমার দিকে তাকিয়ে কিছু বলবে এমন ভাবতেই দেখল, দূরের টেবিলে সোমা কাকে দেখছে। প্রায় চুরি করে দেখার মতো।

মনীষের এটা ভালো লাগল না। সোমা যে ধরা পড়ে গেছে সে তার আচরণে এমন কিছু প্রকাশ করল না। সে শুধু বলল, আমরা যাচ্ছি!

দুই

কে এই মানুষ! প্রশ্নটা দুজনের মনেই উঁকি দিয়েছে। সোমার ভিতর নানাভাবে দূরের স্মৃতি উঁকি দিয়ে যাচ্ছে আর মনীষ ভেবেছে সোমা তার কাছে লুকোবার চেষ্টা করছে। টেবিল থেকে উঠে পড়ার সময় সে দেখেছে সোমা এবং সেই মানুষটি কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে ছিল। ধরা পড়ে যাবার ভয়টুকু পর্যন্ত সোমার প্রাণে ছিল না।

ফলে ওরা যখন সিঁড়ি ধরে নামছিল, তখন কেউ কথা বলেনি। চুপচাপ নেমে গেছে। সোমা ভেবেছে মনীষ কথা বলছে না কারণ ওরা পরস্পর ভিন্ন মত পোষণ করছে বই সম্পর্কে। এবং সোমা ওকে ছোট করার জন্য সব বলে দিয়েছে, এমনকি নিজের ভালো না লাগার ব্যাপারও জানিয়ে এসেছে, এসব কারণে মনীষ ওর ওপর রাগ করতে পারে। তবে সে মনীষের এই রাগ অথবা অভিমান মুহূর্তে ভেঙে দিতে পারে, তার হাতে জাদুর কাঠি, সে শুধু দু'দিন শরীর খারাপ যাচ্ছে, কিছু ভালো লাগছে না বলে গলায় র‍্যাপার জড়িয়ে শুয়ে থাকবে। তখনই মনীষের মুখ বড় কাতর। সে কেমন শিশুর মতো মুখ করে রাখে। সে কাছে এসে বসবে। মাথায় হাত বুলাবে। আদর করতে চাইবে। তারপর সেই এক জায়গায় চলে যাওয়া। সে হাত দিতে দিতে যখন জায়গামতো চলে যাবে তখনই বলা—আমার শরীর ভালো নেই, আমি পারব না মনীষ। আমাকে তুমি আর কষ্ট দিও না। এবং তারপরই মনীষের পালা। কী করে এই মেয়ে সোমা যার চোখ বড়, যার লাবণ্য শরীরে বাড়ে দিনে দিনে, যে না হলে তার রাতের জলপান হয় না, সে তৃষ্ণার্ত থাকে। কী নরম আর পুষ্ট বাহু সোমার। সে সোমার শরীরে হাত রাখার জন্য পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য তখন চুরি করে আনতে পারে। সুতরাং মনীষ যে কথা বলছে না, মনে মনে সোমার ওপর চটে গেছে, সেজন্য তাকে সোমা আদৌ আমল দিল না। সোমা চুপচাপ পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে, সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামছে এবং গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেছে।

বেশ শীতের ঠান্ডা। ক'দিন আগে ঝড়—বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় ওরা শীত হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল। ভিতরে ঠান্ডা ঢুকছে। মনীষ ওপাশের দরজায় কাচ তুলে দিলে। এবং নিজের দিকের কাচ তুলে চুপচাপ একের পর এক সিগারেট খেয়ে চলল।

হঠাৎ সোমা একটা ওকের মতো তুলে আর একটু সরে বসল। সে জানে এই ওক দেওয়া মনীষকে উদ্বিগ্ন করে তুলবে। সে বেশিক্ষণ কথা না বলে থাকতে পারে না। সোমা আবার একটু বড় ঢেঁকুর তুলে কেমন কষ্টবোধের ভান করল। এবং সে যেন এখন কিছুই দেখছে না শুধু শহরের ট্রাম—বাস দেখছে। ওদের গাড়ি গড়ের মাঠ পার হয়ে চলে যাচ্ছে। বোধহয় শীতের জ্যোৎস্না মাঠে। এমন জ্যোৎস্নায় আর কেউ বুঝি আজকাল এই মাঠে প্রেম করতে আসে না। সোমার ইচ্ছা হল, বলে, আমরা কতবার এসেছি এখানে, গঙ্গার জেটিতে গিয়ে বসেছি। ফোর্ট উইলিয়ামের র‍্যামপার্টে। সে—সব তোমার মনে পড়ে মনীষ? কিন্তু মনীষ উলটোমুখে গাড়ি—ঘোড়া এবং যে—সব বেশ্যা রমণীরা বের হয়েছে মাঠে খদ্দেরের আশায় তাদের দেখছে। সোমা আবার একটা গলা—জ্বালা ছেঁকুর তুলে ভীষণ কষ্টবোধে কাতর হচ্ছে এমন চোখ—মুখ করে রাখল।

মনীষ আর পারল না। তোমার কী প্যাটিস খেয়ে অম্বল হয়েছে?

না।

তবে এমন ঢেঁকুর উঠছে কেন?

কী করে বলব বল?

কোনো কষ্ট হচ্ছে?

বুকটা কেমন করছে।

জ্বালা জ্বালা করছে না তো?

ঠিক জ্বালা জ্বালা না। কেমন ধড়ফড় করছে।
কাল অসিতকে একটা তবে কল দিচ্ছি।
তুমি যে কী না মনীষ! টাকার গাছ আছে তোমার।
শরীর ভালো লাগছে না বলছ। বুক কেমন করছে—
ঠিক হয়ে যাবে।

আবার চুপচাপ। ওরা হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ঢুকে গেল। বড় সব এমপ্লিফায়ারে গানের সুর ভেসে আসছে। মনীষ বলল, কতদিন আর বড় জলসাতে রাত কাটাই না। চল একদিন আমরা সারারাত গান শুনব।

এই শীতের সময় বড় সামিয়ানার নিচে বসে আলি হোসেনের সানাই অথবা গোলেমালির গান কী মজা! পাশে সোমার মতো মেয়ে বসে থাকবে, চুলে সুন্দর গন্ধ, তসরের বেনারসি পরনে, নীল রঙের ব্লাউজ, আর কপালে বড় সিঁদুরের টিপ চুল টেনে বাঁধা, পায়ে সে কখনও যদি রুপোর চেলি পরে যায় মনীষের মনে হয় রাত নিশীথে সে আর সোমা গানের জলসায় দুই বেহুলা—লক্ষীন্দর। সোমার সুন্দর চোখ দেখলে সে কিছুতেই আর রাগ পুষে রাখতে পারে না।

সোমা বলল, চল এখানেই আজ আমরা বসে যাই।

গেলে ভালো হত, আমরা আবার আমাদের পুরনো দিনগুলো ফিরে পেতাম। বস্তুত এই এক মানুষের রহস্য, কিছুদিন কাছে থাকলে ভিতরের রহস্য মরে যায়। মনীষ বিয়ের আগে সোমাকে দেখবে বলে গাড়ি চালিয়ে সেই দেবদারু গাছটার নিচে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করত। কী মজা ছিল, কী যে মধুর মনে হত, এখন সে সব তার মনে হয় মরে গেছে। এত কাছে থাকলে শুধু বুঝি শরীরটা থাকে।

সোমা ইচ্ছা করেই নানা কথার ভিতর নিজেকে অন্যমনস্ক হতে দিচ্ছে না। সে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেই ধরা পড়ে যাবে বুঝি। সে কে? তাকে সে কোথায় দেখেছে? তার চোখ দেখে মনে হয়েছিল সে কিছু সোমাকে বলতে চায়। তার চারপাশে যে জীবন—প্রবাহ চলেছে, তার থেকে মানুষটা যেন আলাদা।

তার চোখে কী এক ভাষা ছিল, কী এক মাধুর্য ছিল যে কেবল তার অজান্তেই তাকে নদীর পারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সোমা বলল, আমার কিছু ভালো লাগছে না মনীষ। তুমি কেন যে আমাকে কফি হাউসে নিয়ে গেলে?
কী ঘটেছে?
কী ঘটবে?

তবে তুমি এমন বলছ? মনীষ ইচ্ছা করেই ওর সেই অপলক দেখা এবং মতিবিভ্রম হয়ে যাওয়া খানিক সময়ের জন্য, এড়িয়ে গেল! সোমা নিজে থেকে কিছু না বললে সে—ও কিছু বলছে না। সে যেন ব্যাপারটা জানে না এমন চোখে—মুখে থাকল।

ওরা যেতে যেতে ফুটপাথে অজস্র ভিখারি দেখল। শীতের রাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে সব রাস্তায় সারি সারি শুয়ে আছে। কিছু গাছগাছালি আছে এখানে, কিছু অন্ধকার আছে, ভিতরে মনে হল কোনো পুরুষ রমণী পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ। আর দূরে একটা বাচ্চা ছেলে লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

মনীষ গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, ননসেন্স! কলকাতায় ভদ্রভাবে মানুষের চলা দায় সোমা।

সোমা বলল, সবাই শরীর বেচে খাচ্ছে। ওদের আর দোষ কী।

তোমার আজ কী হয়েছে সোমা?
কী আবার হবে।

মনীষের কেমন আর্ত গলা শোনা গেল। গাড়িটা আবার গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। গ্যারেজের তালা খুলে সে ভিতরে গাড়ি রেখে দিল। মাথার ওপর আলো। এবং নানারকমের পোকা সেই আলোর চারপাশে। এমন সুন্দর আলো আর তার চারপাশে কত সব কুৎসিত নীলবর্ণের পোকা। মনে হল দু—একটা পোকা ওর

মাথার ওপর এসে বসেছে। সে হাত দিয়ে সেই সব পোকা ধরতে গেলে দেখল ওরা উড়ে গেছে। হাতে সব পোকা ধরা যায় না, ধরে মারাও যায় না।

গাড়িটা ঢুকিয়ে গেট টেনে দিল এবং বড় একটা তালা ঝুলিয়ে দিল গেটে, গেটের ওপর পেতলের তালা, সেটা লোহার রডের সঙ্গে লেগে কেমন ঢঙ ঢঙ করে শব্দ করছে। সেই শব্দ মনীষের বুকে কী একটা তোলপাড় তুলে ওকে উধাও করে দিতে চাইল। সেই মানুষটা কে? সোমার কে হয়? সোমার আগে কোনো প্রণয় ছিল বলে তার জানা নেই। যদি থাকে সে কী তার ভিতর কেউ? নতুবা সোমার চোখে ওর চোখে এমন দুষ্টবুদ্ধি ধরা পড়ে গেছে কেন? ভিতরে ভিতরে মনীষ গুমরে মরছিল। তার কিছু জেদ আছে। সে সেই জেদের বশেই সোমাকে কিছু প্রশ্ন করল না। সোমাকে সে আপ্রাণ বিশ্বাস করে। মানুষের কিছু দোষ—ত্রুটি থাকে, সে সেটা নিয়ে না জন্মালেও ইনস্টিংক্ট তাকে সে সব বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্মাতে সাহায্য করে। এবং সোমারও যে এমন কিছু ঘটনা ঘটবে তাতে বিচিত্র কী। তবু এ সব ব্যাপারে সে যতটা জানে সোমা জীবনে কোনো কুৎসিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েনি। ওর মতো মেয়ের পক্ষে জড়িয়ে পড়া সম্ভবও নয়। এক সময় সে এই কফি হাউসের অনেককে চিনত। তার কবিতা লেখারও স্বভাব ছিল। সে প্রথমত এই এখানে কবিতার টানেই চলে আসত। কতদিন সে সোমাকে তার কবিতা শোনাবে বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে আর কাপের পর কাপ কফি নিজে খেয়েছে, বন্ধুবান্ধবদের জন্য অর্ডার দিয়ে গেছে। সোমা এলেই ওর প্রাণে জল আসত। সোমার বিধবা মা আর সে। বাবা কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন সে এমন জানত। ওর মা খুব বুদ্ধিমতী এবং হিসেবি। সোমাকে এতটা বড় করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় সে যে হাজির করেছিল তার কৃতিত্ব যত না তার, তার চেয়ে বেশি মায়ের। সোমা বাড়ি থেকে গোনাগুনতি পয়সা নিয়ে বের হত। ওর কোনো কোনো দিন টিফিনের পয়সা থাকত না। সে এলেই প্রথম বলত, কী খাবে সোমা? কী অর্ডার দেব?

সোমার খেতে কোনো আপত্তি থাকত না। যা সে পছন্দ করত তাই সে অর্ডার দিত। তারপর কবিতা পড়া। সোমা ভালো না বললে সে কবিতা যথার্থই কিছু হয়নি তার এমন মনে হত। সে সেই কবিতা যে কতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছে। ওর কিছু কবিতা লিটল ম্যাগাজিনে ছাপাও হয়েছিল একসময়। সবই যেন প্রেমের ব্যাপারে পাল্লা দেওয়া। সে ছাত্র হিসাবে মোটামুটি ভালো। দেখতে রূপবান না হলেও মানানসই। সে তেমন উঁচু লম্বা নয়। তবু সোমার পাশে দাঁড়ালে তাকে বেমানান লাগে না। সে সোমাকে পাবে বলে যা সে করে না তাও করেছে।

যেমন সে একবার সব বন্ধুদের নিয়ে ম্যাড হাউসে গিয়েছিল। অশোক এমন একটা চালিয়াতি মার্কা জীবনযাপন করত এবং আড্ডার টেবিলে তার এমন ব্যাখ্যা রাখত যে মনে হত মাঝে মাঝে এ—সব না করলে, যেমন একটু মদ্যপান, পালিয়ে চুমু খাওয়া ভালোবাসার মেয়েকে এবং রঙিন কোনো ছায়াছবিতে একপাশে সব শেষের রো—তে বসে ফষ্টিনষ্টি, একটু হাত দেওয়ার ব্যাপার না থাকলে প্রেম—ফেমের মূল্য কী। মনীষ সে সব বিয়ের আগেই সোমাকে নিয়ে করেছে। সোমার এতে সায় ছিল। এবং এত বেশি সায় ছিল যে সে কথায় কথায় মাঝে মাঝেই রঙিন ছবিতে একটা মুরগি—মোরগা পাছা তুলে নাচছে এমন দেখতে পেত। সবচেয়ে সেই ছবি যেখানে নায়িকা মুরগি বনে গেছে এবং কক কক করে ডাকছে—অ মোরগা।

মোরগ—মুরগির লড়াইতে সোমা কম যায় না। নাচে ভালো। সব ভালো তার। তবু আজ কেন জানি সোমার চোখে চুরি করে অন্য ঘরে উঁকি দেওয়া ভালো লাগল না। সে ভাবল সোমা যখন একা শুয়ে থাকবে, নীল মৃদু আলো জ্বালিয়ে শিয়রে, সে যখন রবীন্দ্রনাথের গান শুনবে রেকর্ড—প্লেয়ারে এবং অবিকল নকল করে সেই গান গাইবে তখন তার পাশে বসে কোমল, উষ্ণ উত্তাপের ভিতর হাত রাখতে রাখতে বলবে, সে কে সোমা? তুমি চুরি করে কাকে দেখছিলে?

মনীষ চুপচাপ আবার সিঁড়ি ভাঙতে থাকল। মনোরমা এসে দরজা খুলে দিচ্ছে। সে জেগে থাকে। যতক্ষণ না বাবু—বিবি বাড়ি ফিরে আসে ততক্ষণ সে জেগে থাকে। ওদের ফিরতে কোনো কোনোদিন বেশ রাত হয়ে যায়। বোধহয় পার্টি থাকে। পার্টিতে কতরকমের খাবার। সোমা অথবা মনীষের আজকাল সেসব অভ্যাস হয়ে গেছে। তবে রোজ রোজ ভালো লাগে না। মাসে দু—একবার হলে মন্দ নয় এমন ভাব। সে বেশি কিছু খায় না। দু—পেগ জিন, ওর ওতেই ম্যাকসিমাম। মনীষ আজকাল যেদিন খায় চার—পাঁচ পেগ অনায়াসে টেনে আসতে পারে। মনীষকে ছোটখাট একটা ব্যবসা চালাতে হয়। তার বড়মামা ব্যবসায় ফন্দিটা শিখিয়ে দিয়েছে। এবং সে তার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কত সহজে এ তিন—চার বছরে দশগুণ করে ফেলেছে। এবং ওর ধারণা সোমা লক্ষ্মীমেয়ে। সে না এলে লক্ষ্মী তার ঘরে এমন দশভুজা হয়ে আসত না। তার চারপাশে আজকাল মাঝে মাঝে ঝমঝম করে টাকার বৃষ্টি নামে। সে তখন ভেবে পায় না এই শহরে এত ঐশ্বর্য আর এসব মানুষেরা কেন ফুটপাথে থাকে? আসলে ওর মনে হয় তখন, এদের বড় বেশি উদ্যমের অভাব।

সোমা ঘরে ঢুকেই কেমন সোফাতে গা এলিয়ে দিল। এখন মনোরমা আসবে। এসেই জিজ্ঞাসা করবে খাবার গরম করে দেবে কিনা। কারণ খাবার কোনো কোনো দিন ঠান্ডা হয়ে যায়। সোমার নিজেরই ঠিক থাকে না কখন ফিরবে। যেমন আজই ধরা যাক ওদের কথা ছিল ছবি দেখে সোজা বাড়ি চলে আসবে। কোথাও বসবে না। কিন্তু আটকে গেল। এমন কথা ছিল না। এ—স্বভাবটা মনীষেরও আছে সেই প্রথম জীবনের কিছু ঠিকঠাক না থাকার মতো।

সোমা মনোরমাকে দেখেই বলল, আমরা আজ বেশি কিছু খাব না। খেয়ে এসেছি।

মনীষ সোজা বাথরুমে ঢুকে গেছিল। ওর বাইরে কোথাও বাথরুমের দরকার হলে খুব অসুবিধা হয়। ওর নিজের জন্য আলাদা বাথরুম। বাথরুমের চারপাশে বড় আয়না। পাশের বাথরুম সোমার। সোমার বাথরুমেও চারপাশে বড় আয়না আছে। ওদের শোবার ঘরে চারপাশে বড় আয়না। সাধারণত সে ঘরে কোনো আত্মীয়স্বজনের ঢোকার নিয়ম নেই। মনোরমা দিনে দুবার ঢুকতে পারে। একবার সকালে। আর একবার বিকেলে। পৃথিবীর যাবতীয় ন্যুড ছবি ঘরে। দেওয়ালে কোণারকের ডিজাইন। সে এ—ঘরটা নিজের পছন্দমতো তৈরি করেছে। সঙ্গে এ—ঘরেও আলাদা আলাদা দুটো বাথরুম। সেজন্য বাইরে কোথাও বাথরুম ব্যবহার করতে পারে না। বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই ওদের বাথরুমে যাবার স্বভাব। অথচ আজ বাথরুমে ঢুকেই সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। নীলবর্ণের একটা আলো জ্বেলে দিল। সে কেন যে এভাবে একা দাঁড়িয়ে থাকছে, সে কি এখনও সেই রহস্যজনক মুখের কথা ভাবছে? এবং ভিতরে একটা হিংসা, ক্রোধ। অথবা সে কি নিজেকে কোনো অপরিণামদর্শী যুবক ভাবছে? কিছু করণীয় নেই, সব ভবিতব্য। সে যে কেন দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পারল না। কোনো কোনো দিন অত্যধিক মদ্যপান করলে সে এ—ভাবে একা বাথরুমে নীলরঙের আলো জ্বেলে দাঁড়িয়ে থাকে। ভিতরটা তার খালি মনে হয়। সেই বড় গম্বুজের মতো মুখের মানুষটাকে দু'নখে চিরে ফেলতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে জানে তার কাছে অথবা তাদের মতো মানুষের কাছে সে বান্দা। সে যা চাইবে তাই দিতে হবে। যদি সে তার সোমাকে চায়, এমন বৈভবের চাবিকাঠি তাদের হাতে সে না দিয়ে যাবে কী করে। কারণ না দিলেই সোমা আর দশভুজা থাকবে না। সোমা লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যাবে।

বস্তুত একা দাঁড়িয়ে মনীষ যে কী ভেবেছিল নিজেও জানে না। সে বুঝতে পারছে শুধু এলোমেলো চিন্তা ওকে গ্রাস করছে। সে অসহায়ের মতো আয়নায় অবিরাম নিজেকে দেখে চলেছে। বস্তুত সে এতদিনে নিজের এই চেহারা চিনতে পারছে কিনা, এই মানুষই মনীষ দত্ত কিনা, ভেবে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে সে নিজেকে কেন জানি চিনতে পারে না। মাথার ভিতর তার কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

এমন সময় ওর মনে হল পাশের বাথরুমে ফোয়ারা থেকে জল পড়ছে। জল পড়ার শব্দে ওর হুঁশ ফিরে এল। আয়না থেকে সে চোখ নামাল। ওপরের দিকে অহেতুক তাকাল সে। এ—সময়ে সোমা স্নান করছে। সোমা এই শীতের রাত্রিতে স্নান করছে। কিছু অপবিত্রতা তাকে সময়ে সময়ে গ্রাস করে, কী যে সেই

অপবিত্রতা সে বুঝতে পারে না! গভীর রাতে কখনো কখনো বিছানা ছেড়ে সোমা বাথরুমে ঢুকে অনবরত ফোয়ারার নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। আজও ওর এমন হয়েছে। মাঝে মাঝে সে এটা সোমার অসুখ ভাবত। চার বছরের ওপর ওরা এই বাড়িতে উঠে এসেছে। বিয়ের পরই সে এখানে উঠে এসেছে। সে কী জেনে ফেলেছে মনীষ দত্ত এই পৃথিবীর অনেক মানুষের কাছে বান্দা হয়ে আছে? প্রয়োজন হলে মনীষ দত্ত সোমা নামক এক সুন্দরী মেয়েকে অবহেলায় বিক্রি করে দিতে পারে? সে যে কী ভাবছে!

মনীষ যখন বাথরুম থেকে ফিরে এল তখন সে দেখল ঘড়িতে দশটা বাজে। মনোরমা বাইরের বারান্দায় পায়চারি করছে। পার্লারে সে নতুন একটা লাল রঙের কার্পেট বিছিয়েছে কিছুদিন আগে। সেই কার্পেটে কত বিচিত্র সব ফুলের ছবি। ছবিতে কত রঙ—বেরঙের প্রজাপতি। মনোরমা গরম কফি রেখে গেছে। সে একটা চুরুট ধরিয়েছে, কফি খেতে খেতে অফিসের কিছু ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। সে এক বিষাদ কুড়িয়ে এনেছে সঙ্গে এবং এই বিষাদে তাকে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে, কেন যে সোমা এমন রহস্যময় মুখের কাছে ধরা পড়ে গেল বুঝতে পারছে না। আর পারছে না সে। সে এবার সোমা বাথরুম থেকে বের হয়ে এলেই বলবে, তুমি ওকে চেন সোমা? তোমার সঙ্গে ওর কবে আলাপ?

মনোরমা বলল, দাদাবাবু আপনার খাবার ঠিক করব?

মনীষ বলল, সোমা আসুক।

দশটা বাজলে ওরা খেয়ে নেয়। দশটা বেজে গেছে বলেই মনোরমা ওদের খাবার টেবিল সাজাবে কিনা জিজ্ঞাসা করল। সোমা এমন কতদিন এসেই বলে দেয়, আমরা কিছু খাব না, খেয়ে এসেছি। যেন সোমা বাইরে থেকে এসে কতক্ষণে শরীর মুছে ধুয়ে অথবা স্নান করে তার সেই প্রিয় রেকর্ড—প্লেয়ার খুলে গান শুনবে। ওর প্রিয় গান সব থাকে সাজানো। অনেকদিন সে আলো জ্বেলে শুয়ে থাকে। রেকর্ডপ্লেয়ারে তখন বাজছে 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে, উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে'। মনীষ তখন দেখতে পায় একটা নীলরঙের আলোর নিচে সোমা সিল্কের গাউন পরে শুয়ে আছে। সাদা রঙের বিছানায় ঠিক একটা পদ্মফুলের মতো ফুটে আছে মনে হয়। সে এসে ধীরে ধীরে কখনো ডেকে দেয়। সোমা এসো খাবে। কোনো কোনো রাতে সোমা আপন মনে জানালায় দাঁড়িয়ে গায়। তখন অজস্র নক্ষত্র আকাশে। কেমন অসুখী মনে হয়। মনের ভিতর ওর যে কী কষ্টের ছায়া পড়েছে ক্রমে সে বুঝতে পারছে না।

আজও মনে হল বাথরুম থেকে বের হয়ে সে চুপচাপ বসে থাকবে। অথবা আপন মনে সে গাইবে ওর সেই প্রিয় গানটা—গোলাপফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ হোথা যাসনে, ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাসনে। মাঝে মাঝে গাইতে গাইতে চোখ থেকে জল পড়ে সোমার। অথচ কখনো কখনো সে সোমাকে নিয়ে যখন গাড়ি করে বের হয়ে যায়, কোনো পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে হাত ধরাধরি করে অথবা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে যায়, অনেক ওপরে, কেন যে মনে হয় তখন এই পৃথিবীতে সে আর সোমা, সোমা বিহনে সে নদীর পাড়ে একা পড়ে থাকবে—কেবল যেন গাইবার ইচ্ছা, ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে, শুধু তোমারে জানি, তোমারে জানি, ওগো সুন্দরী। চাও কী প্রেমের চরম মূল্য দেব আনি, দেব আনি, ওগো সুন্দরী। সে সোমার হাত ধরে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। চারপাশে উপত্যকাময় অজস্র ফুলের ওপর বাতাস বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোথায় কোন ম্লান অন্ধকার চুপ করে প্রতীক্ষা করছে মনে থাকে না। সে তখন সোমাকে নিয়ে কতদূরে চলে যেতে পারে। তার ভয় থাকে না। অথচ আজ কী যে ভয় তাকে পেয়ে বসেছে!

সোমা স্নান করে এসে এতটুকু শীতে কাঁপল না। ঘরের ভিতর এখন উষ্ণ আবহাওয়া। বড় পবিত্র চোখ—মুখ তার। এয়ার কন্ডিশান মেশিনটা কেমন একটা থেকে থেকে ক্লপ ক্লপ শব্দ করছে। আমার খেলা যখন ছিল তোমার মনে, ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত, যেন আমার আপন সখার মতো—সোমা গুনগুন করে গাইতে থাকল—তখন কে তুমি কে জানত, ওগো সেদিন তুমি গাইলে যে—সব গান, কোন অর্থ তাহার কে জানত শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ, সদ্য নাচত হৃদয় অশান্ত। হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি,

স্তব্ধ আকাশ নীরব শশী রবি, তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত, ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত, খেলা যখন ছিল তোমার সনে....। সোমা মাথা নিচু করে রেখেছে। এবং নিভৃতে গেয়ে চলেছে। মনীষ গান শেষ হলে ডাকল, সোমা।

গানটা শেষ করার পরও তার ভিতরে গানের রেশ থাকছে। সে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে পারল না।

মনীষ কাছে এসে বসল। ওর ঠান্ডা হাত তুলে ডাকল, তুমি ওকে চিনতে?

সোমা কিছু বলল না। মনীষের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

আমি দেখেছি সোমা, তুমি ওকে চুরি করে দেখছিলে, তুমি কি চেন ওকে?

সোমা ঘাড় নাড়ল। না। সে চিনতে পারছে না এমন বলতে চাইল।

তবে সে তোমার দিকে এমন তাকাচ্ছিল কেন?

জানি না।

তুমি কিছু জান না সোমা?

না, কিছু জানি না।

কিন্তু তোমাদের মুখ দেখে মনে হয়েছে যেন কতকালের জানা—চেনা।

ওর চোখ দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে। কতকালের যেন সে চেনা—জানা।

সোমার এই মুখ দেখলে কে বলবে, কিছুক্ষণ আগে কফি হাউসে বসে সোমা ঠাট্টা—মসকরা করেছে, সে ওকে দেখতে দেখতেও ঠাট্টা—মসকরা করেছে। কিন্তু সোমা যখন উঠে আসছিল, সোমা যখন দেখছিল—তখনও মানুষটা তাকে দেখছে এবং কাছে যেতেই কী যে মনে হল তার, সোমা কেমন নিভৃতে চলে গেল। অন্ধকারের অন্তরে সে বারবার তাকে সাড়া দিচ্ছে। সে আর কথা বলতে পারল না। চুপচাপ সিঁড়ি ধরে নেমে এসেছিল। আমি আবার আসব। সোমার চোখে—মুখে এমন আভাস যেন।

মনীষ এ সময় আর ওকে এসব বলে বিব্রত করতে চাইল না। তুমি বরং খেয়ে নাও।

তুমি না খেলে ভালো লাগে?

মনীষের অনুরোধে সে টেবিলে বসল মাত্র। সে খুব যত্নের সঙ্গে মনীষকে পরিবেশন করল। শুধু এটা ওটা নিয়ে সে চেখে দেখল। দেখতে দেখতে বলল, মনীষ, কাল তুমি অফিস যেয়ো না। আমি একা থাকলে মরে যাব, আমার কেমন ভয় করছে।

সোমার রাতে ঘুম আসছিল না। দরজা—জানালা বন্ধ। মনীষ পাশের খাটে ঘুমোচ্ছে। ওর এখন বাইরের বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। সদর বন্ধ। লম্বা করিডোর পার হয়ে গেলে মনোরমার ঘর, সিঁড়ির নিচের ঘরে রসুল থাকে। রসুল মনীষের খাস বেয়ারা। সোমা অথবা রসুল একজন না একজন মনীষের সঙ্গে থাকে। যখন ওরা দূরে বেড়াতে যায় তখন রসুল ওদের পাহারাদার। বড় বিশ্বস্ত রসুল।

সোমার কেন যে ভয় ভয় করছিল! সে মানুষটা তার বাড়ি চিনে যদি চলে আসে। রসুল ওকে চেনে না, রসুল ওকে ঢুকতে দেবে না। সে রসুলকে যদি বলে আমি সোমার সঙ্গে দেখা করব, রসুল এমন একজন চেহারার মানুষকে কিছুতেই ফেরাতে পারবে না। সে এসে বলবে কে একজন এসেছেন মা, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সোমা পায়ে তখন আলতা পরবে। চোখে কাজল। বিনুর বড় ইচ্ছা ছিল কাজল টেনে চোখে বিনুর সঙ্গে সে কোথাও বেড়াতে যায়। সোমা পাশ ফিরে শোবার সময় এমন ভাবল।

ওর কষ্ট হচ্ছিল মনীষের কথা ভেবে। বেচারা সত্যি ভয় পেয়ে গেছে। ভয় পেলে ঘুমোয় কী করে। সে কি ঘুমোচ্ছে, না চুপচাপ শুয়ে আছে? নড়ছে না। ওর ইচ্ছা হচ্ছিল উঠে একবার দেখে—সে ঘুমোচ্ছে কিনা। না ঘুমোলে সে আজ আবার সারারাত ওকে পাশে বসিয়ে রেকর্ড—প্লেয়ার চালিয়ে দেবে। কিছু ইংরেজি গান মনীষের পছন্দ। কিছু ইংরেজি সাহিত্য ওর প্রিয়। এবং ওথেলো নাটকের কিছু সংলাপ। যখন মনীষ অত্যধিক মদ্যপান করে ফেলে তখন মনীষ সোমাকে জড়িয়ে কিছু অবিশ্বাসের সংলাপ একের পর এক বলে যায়। সোমা তখন খিলখিল করে হাসে।

কে সেই মানুষ! মনীষের চিরদিন একটা অবিশ্বাস। সোমা এত বেশি সুন্দর যে ওর বিশ্বাস সোমা কবে যে নদীর পারে চলে যাবে। সে ভয়ে ভয়ে থাকে। সোমাকে তার সব ঐশ্বর্য দেবার জন্য সে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। সোমার আজকাল কোনো শৈলশহরে বাড়ি কেনার ইচ্ছা। বাড়িটা সাদা রঙের হবে। সদরে দারোয়ান। এবং দারোয়ানের চোখ—মুখ একটা কাফ্রির মতো। কানে বড় বড় রিং। হাতে বল্লম নিয়ে সে পাথরের মতো সদরে বসে থাকবে। প্রায় জল্লাদের মতো চেহারা। নীচে অজস্র গ্রাম্য কুটির। সেখানে শীতের রাতে আগুন জ্বেলে পাহাড়ি মানুষেরা যে মাংস পুড়িয়ে খাবে সোমা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে তা দেখবে। অথবা রাতে সোমা এবং সে ওথেলো নাটকের সংলাপ আবৃত্তি করতে করতে সামান্য মদ, নরম চিলি চিকেন, মৃদু আলো, আকাশ ভরা নক্ষত্র উপভোগ করবে। এত করেও পাশ ফিরে শুলে সেই মুখ—অপলক তাকে দেখছে। যেন বলছে সোমা তোমার তো এমন হওয়ার কথা ছিল না।

আমার কী হওয়ার কথা ছিল?

তুমি ভুলে গেছ তা?

কে এমন মানুষ যাকে বলে এসেছে সে অন্যরকমের হবে? সে তার কলেজ জীবনের কথা মনে করার চেষ্টা করল। এই যেমন রমেন আর অনিল। ওদের একজন কি সে! সে ভালো করে ওদের মুখ—চোখ পর পর ভেবে গেল। সাত—আট বছরে সে ওদের ভুলে যাবে? ওদের এত বেশি পরিবর্তন আসবে? ঠিক চিনতে পারেনি বলে ওকে দূর থেকে দেখেছে। ওর চোখের ওপর ওরা মিছিলের মতো ভেসে গেল। রমেন কালো, বেঁটে। চুল ওর ব্যাকব্রাশ করা। চোখ ছোট। মানুষটার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। আর একজন উঁচু, লম্বা, নাক চ্যাপটা, থুতনিতে ভাঁজ, চুল শ্যাম্পু করা সব সময়—সে তো অমিয়। ওদের ভিতর অনিল স্মার্ট। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। কিন্তু চোখে—মুখে বড় বেশি স্বার্থপর সে। তবু অনিলকে সোমার ভালো লাগত।

সে তার অনার্সের অনেক নোট অনিলের কাছে নিয়েছে। কলেজের শেষ প্রান্তে যেখানে জেলখানার পাঁচিল আরম্ভ হয়েছে, যেখানে সার মণীন্দ্র নন্দী, কে. সি. আই—এর স্ট্যাচু আছে তার নিচে বসে ওরা দুজন প্রায়ই গল্প করত। কিছু কিছু সংলাপ সে এখনও মনে করতে পারে। যেমন অনিল প্রায়ই বলত, তুমি সাঁতার জানো সোমা?

কেন জানব না।

অনেক মেয়ে সাঁতার জানে না।

তুমি অনেক মেয়ের মতো আমাকে ভাবলে কী করে?

তুমি তা হলে আলাদা?

আমার তাই মনে হয়।

মেয়েরা কখনো আলাদা হয় না।

কেন হয় না?

ওদের ঈশ্বর গড়েছেন একভাবে।

তুমি ঈশ্বর—টিশ্বর মানো দেখছি।

তুমি মানো না?

না, আমার মানতে ভালো লাগে না।

কেন লাগে না?

এই ঈশ্বরই প্রথম মানুষকে মিথ্যাকথা বলতে শিখিয়েছে বলে।

কী বলছ সোমা?

ঠিক বলছি। এই যেমন ধর ঈশ্বর যে বলেছেন আমি ঈশ্বর—

ঈশ্বর কখনো এমন কথা বলেন?

তবে মানুষ বলছে—ঐ দ্যাখো ওপরে ঈশ্বর আছেন।

মানুষ বলেছে বলতে পারো।
মানুষ কি ঈশ্বর দেখেছে?
মানুষ কল্পনা করেছে।
সোমা মাঝে মাঝে রেগে উঠলে বেশি, আঁচলটা মাথার ওপর টেনে দিত। তারপর খুব যেন ভেবে উত্তর দিচ্ছে, তা হল দেখো সেই কল্পনাটাকেই সত্য ভেবে আমরা কী না করছি। আমরা মন্দিরে মসজিদে মাথা ঠুকছি। ঈশ্বর নিজেই প্রথম মিথ্যার বেসাতি খুলে মানুষকে ভড়কে দিয়েছে।
অনিল চুপ করে থাকত। সে এসব তর্ক পছন্দ করে না। সে হালকা তর্ক করতে চায়। কিন্তু যা মেয়ে সোমা, তাকে এত সহজে ছেড়ে দেবে না। সে বলত, তুমি বলতে চাও, যার কোনো মূল অস্তিত্ব নেই তাকে নিয়ে আমরা মন্দির মসজিদ বানিয়ে নিরুপায় মানুষকে ভয় দেখাচ্ছি?
তা ছাড়া আর কী।
দ্যাখো সোমা, আমরা এ—সব তত্ত্বকথা এখনও তেমন বুঝি না। আমাদের সে বয়স হয়নি। এত সহজে কিছু নস্যাৎ করা ঠিক না।
আমি করতে পারি।
তুমি তবে রাজমহিষী।
অন্য কিছু বল।
আর কী বিশেষণ দিতে পারি?
যা খুশি।
তোমাকে একটা বিশেষণে ডাকব বলে অনেকদিন ভেবেছি। কিন্তু পারিনি। ভয় করেছে।
ভয় করলে থাক। তেমন বিশেষণে আমার দরকার নেই।
তুমি অভয় দিলে—
তুমি পুরুষ নও অনিল। তোমাদের ভিতর তুমি সবচেয়ে স্মার্ট, তার যদি এমন অবস্থা হয় তবে পুরুষ জাতটার ওপর আর বিশ্বাস রাখি কী করে?
তুমি অভয় দিলে আমি বলতাম।
যাক। যা বলছিলাম। তুমি বলে যাও, আমি নোট করে নিচ্ছি। ঐ দ্যাখো, এন. কে. জি. যাচ্ছেন। চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকতে দেখলেই বলবেন, দুপুরবেলায় টাওয়ারের মাথায় আজকাল চাঁদ ওঠে নাকি সোমা?
অনিলের মুখটা ভীষণ লাল দেখাচ্ছিল সেদিন।
আর সোমার কী হাসি পাচ্ছিল। সে মাথায় আঁচল তুলে বলল, অনিল, আমাদের বাড়ি এসো একদিন। তুমি যা ভাবছ সেটা সুবিধামতো ভেবে দেখা যাবে। এখন নোট নিচ্ছি, নোট নিতে দাও।
সে নোট নিতে নিতে অনিলের মুখ চুরি করে দেখছিল। আহা বেচারা, দুঃখে আর তাকাচ্ছে না। কেবল খাতায় মুখ রেখে বলে যাচ্ছে। ভয়ে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। তাকালেই বুঝি সোমা হেসে ফেলে। সে অপমান বোধ করবে আবার! অথচ সোমার শরীরে কী যে আকর্ষণ, উঁচু লম্বা সোমার চোখে কাজল থাকে না। কাজল দিলে এই যুবতীর চোখে এক অকারণ বিষণ্ণতা ভেসে ওঠে।
সোমা পাশ ফিরে আবার মনীষের দিকে তাকাল। ওর শরীর থেকে চাদর সরে গেছে। সে উঠে গিয়ে পাশে বসল এবং শরীরের চাদরটা তুলে দিতেই খপ করে ধরে ফেলল মনীষ।
তুমি ঘুমোওনি তবে?
না, আমার ঘুম আসছে না।
তোমার ঘুম না আসার কী হল?
তুমি তো জান আমার কেন ঘুম আসে না।
আমি আজ আর পারব না বাপু।

লক্ষ্মীমেয়ে। একটু পাশে শোও।

লক্ষ্মীছেলে। এমন করে না। দুষ্টুমি আমার এখন ভালো লাগবে না!

মনীষ উঠে বসল। সাপ্টে ওকে কোলের উপর ফেলে দিয়ে চুমু খেল। ভীষণ খারাপ লাগছে সোমা। আমি পারছি না।

সোমা বলল, ছাড় তো আগে।

মনীষ ছেড়ে দিল।

সোমা জানলা খুলে দিল। কেমন গরমে হাঁপিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে পৃথিবী থেকে যাবতীয় শীত কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। সে এতটুকু ঠান্ডা বোধ করছে না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে কেন জানি মনীষকে পর্যন্ত ভয় পেতে শুরু করেছে।

নিচে লন। সবুজ ঘাস। কিছু লাল গোলাপ। দামি ফ্লোরেসেন্ট বাতি গোলাপের ভিতর। ছোট ছোট টিনের ফ্রেমে সেই আলো জাফরি কাটা। চারপাশে কী সমারোহ বাঁচার। আর একটু দূরে গেলেই ফুটপাথে অজস্র মানুষ, শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। গরিব, খেতে না পাওয়া হাজার হাজার মানুষের মুখ যেন চুপি চুপি পাঁচিলের পাশে এসে জড়ো হয়েছে এবং রাতে যখন সে ঘুম যাবে, সদরে কেউ থাকবে না, সোমা দত্ত ঘুম যাবে, তখন অতর্কিতে আক্রমণ ঘটবে। এইসব অন্নহীন মানুষের ভিতর সেই মানুষের মুখটাও উঁকি দিয়ে আছে দেখতে পেল। তাকে ওরা এ—বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

সোমা কেমন অতর্কিতে হাহাকার করে উঠল—মনীষ মনীষ!

মনীষ ছুটে বের হয়ে গেল? কী হয়েছে! এমন করছ কেন?

সোমা কেমন বোকার মতো তাকিয়ে আছে। সে দেখল শুধু গোলাপ, বড় বড় লাল গোলাপ, শুধু আলো, চারপাশে আলো আর আলো, এই আলো, ফুল এবং নক্ষত্র দেখে কেমন তার বুক কেঁপে উঠেছিল। আর কিছু নেই। মনীষ বারবার ওকে বলেও কিছু জানতে পারছে না।—তোমার যে কী হয়েছে সোমা!

সোমা বলল, আমি জল খাব।

মনীষ টিপয় থেকে কাচের মীনা—করা গেলাস এনে সামনে ধরল।

সে যেবার জার্মানিতে ব্যবসা—সংক্রান্ত টুরে গিয়েছিল, এবং যাদের কলাবরেশনে সে মধ্যমগ্রামের কাছে একটা দুর্লভ কাচের কারবার করবে ভেবেছিল, তাদের উপহার দেওয়া এই গেলাস। দামি। কত দামি মনীষেরও জানা নেই। সোমা এই গেলাসেই জল খেতে পছন্দ করে। সে বলল, আরও জল খাব? এনে দেব?

গেলাসটা দেবার সময় সোমা বলল, না আর লাগবে না।

তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। ভিতরে এসো।

তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

আমাকে তুমি এভাবে ডাকলে কেন?

তোমাকে ডেকেছি!

ডাকলে না?

হঠাৎ কী যে হল।

মনীষ মাঝে মাঝে সোমার কিছু স্নায়বিক দুর্বলতা লক্ষ্য করেছে। ওর ডাক্তার বন্ধুর অভাব নেই। সে কাউকে এ—ব্যাপারে খুব কিছু একটা খুলে বলেনি। বললেই ওর অতীত নিয়ে আলোচনা হবে। এবং অতীতে সোমা কোনো ভয়াবহ কাজে লিপ্ত ছিল কী না, শিশুকালে কোনো অপমৃত্যু দেখেছে কী না, অথবা সে এমন কোনো পাপ কাজের সঙ্গে নিযুক্ত ছিল যা এখন তাকে মাঝে মাঝে অস্থির করে তুলছে।

মনীষ এও জানে বেশি সময় সোমার এটা থাকে না। সে সেজন্য আজ আর কোনো দৈহিক সম্পর্কের কথা ভাবল না। সে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আমি কিছু করব না। ভয় করলে তুমি আমার পাশে শোও। ছুঁয়ে বলছি

তোমাকে ডিস্টার্ব করব না। আমার পাশে শুলেই তুমি ঘুম যেতে পারবে।

সোমা হাসল। বলল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি মনীষ। বিশ্বাস করি বলেই তোমাকে বিয়ের আগেই সব দিয়ে ফেলেছিলাম। কেউ দেয়? বল, মেয়েদের এইটাই তো অহঙ্কার?

মনীষ এমন কথায় আপ্লুত না হয়ে পারল না। সে বলল, এসো সোমা, আমার পাশে শোবে। বলে মনীষ নিজেই দুটো খাট টেনে একসঙ্গে করে নিল। বিছানা বড় করে ফেলল। বালিশ পাশাপাশি রেখে দিল। সোমা নরম বালিশে ঘুম যেতে পারে না। ওর শক্ত বালিশ লাগে। সোমা শোবার আগে আঁট করে খোঁপা বাঁধে। সাদা রঙের সিল্কের গাউন। নানারকম লাল সবুজ সুতোর লতাপাতা আঁকা। ফুলের ওপর প্রজাপতি আঁকা। কোনো কোনো দিন সে খুব কালো রঙের গাউনও পরে। ওর সাদা পা তখন মোমের মতো নরম লাগে। যেন একটু তাপ লাগলেই গলে যাবে। এত নরম আর উষ্ণ যে সে ভয়ে তখন ওকে আলিঙ্গন করতে পারে না। জোরে চাপ দিতে পারে না। হুড়মুড় করে হাড়—পাঁজরা বুঝি তার সব ভেঙে যাবে।

সোমা ওর খাটের পাশে চুপচাপ বসে থাকল। শুল না।

তুমি মনে করতে পারলে?

না।

কোথায় দেখেছ মনে করতে পারছ না?

না পারছি না। আমি যে কী করি! কিন্তু জান, খুব চেনা। এবং কতকালের চেনা মনে হচ্ছে।

তুমি যে বলতে ছেলেবেলা তোমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল, তার মা—মরা ছেলে তোমাদের বাড়ি থেকেই মানুষ?

অমলের কথা বলছ?

হ্যাঁ, অমল।

ওকে দেখলে আমি চিনব না! সে কি বসে থাকার ছেলে! দিদি বলে ছুটে আসত না!

তুমি অযথা ভাবছ। হয়তো চেনাই নয়। তুমি সুন্দর বলে চোখ ফেরাতে পারেনি। পালিয়ে পালিয়ে তোমাকে দেখছিল।

তা এ—ভাবে দেখে?

তোমার মন বড় দুর্বল। সে হয়তো এমনি দেখছিল, এখন তুমি তার নানারকম অর্থ খুঁজছ।

হবে। সে এ নিয়ে আর তর্ক করতে চাইল না। না, ঘুমোনো যাক, বলে সে এক পাশে আলগা হয়ে শুল।

কাছে এসে শোও না, যেন পরপুরুষের কাছে রাত কাটাতে এসেছ।

সোমা বলল, বেশ আছি মনীষ। আমাকে আর টানাটানি কোরো না। আমাকে ঘুমতে দাও।

সে এবার ঘুম যাবার জন্য চোখ বুজল। এবার সে ঘুমোবে। অযথা সে আর আজে বাজে চিন্তা মনে টেনে আনবে না।

চার

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল, সোমা বিছানাতে নেই। সোমার ঘুম থেকে বেলায় ওঠার স্বভাব। মনীষ ঘুম থেকে উঠে একবার চা খেয়ে নেয়। তখনও সোমা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। ওর সুন্দর পা বিছানার ওপর খালি। গাউন ওপরে উঠে থাকে। এ—ঘরে কেউ আসবার যেহেতু নিয়ম নেই, মনীষ ইচ্ছা করেই গাউন টেনে নামিয়ে দেয় না। সে ধীরে ধীরে চায়ের কাপ নিয়ে এ—ঘরে ঢুকে যায়, চা খায়। এবং পায়চারি করতে করতে সোমার অস্বাভাবিক সুন্দর সুঠাম শরীর দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। আজ সে দেখল বিছানা খালি। এত তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়ায়, বাথরুমে গেছে সে এমন ভাবল। সে ডাকল, সোমা আছ? কোনো সাড়া সে পাচ্ছে না।

সে বাইরে এসে দেখল সোমা একটা ইজিচেয়ারে মোটা একটা র‍্যাপার জড়িয়ে বসে আছে। সব শরীর ঢাকা। শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। হলুদ রঙের স্কার্ফ। করুণ শীতার্ত চোখ—মুখ তার। মনীষকে দেখেও সে এতটুকু নড়ে বসল না। প্রায় স্থির পাথরের মূর্তির মতো। যেন কেউ এই সকালে বারান্দার দেয়ালে সুন্দর এই শীতার্ত ছবি এঁকে দিয়ে গেছে। চোখের নিচে ঘুম না যাবার চিহ্ন। ক্লান্ত চোখ—মুখ। সে বলল, তোমার ঠান্ডা লাগবে সোমা।

সোমা কেমন ওম শব্দ করে ফের নিরুত্তর থাকল। মনীষ কেন যে ভীষণ ক্ষেপে গেল, সে বলে উঠল, কী বলছি শুনতে পাচ্ছ? বলছি ভিতরে যাও। ঠান্ডা লাগিয়ে অসুখ বাধাবে।

যেন দেয়ালের ছবি মুহূর্তে জ্ঞান পেয়ে ওর দিকে চোখ তুলে তাকাল। কী বলছে শোনার চেষ্টা করল, তারপর ফের ঘুম গেল দেয়ালে। সোমা চোখ নামিয়ে নিল।

মনীষ বুঝল এবার ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া দরকার। এভাবে ব্যাপারটাকে চাপা দিলে চলবে না। সে ফোন করল, অসিত আছিস?

কে?

আমি মনীষ।

মনীষ দত্ত? কী ভাগ্য! সহসা গরিবের এত্তালা?

শোন, তুই সকালে ফ্রি আছিস?

কেন, কী হয়েছে?

আছিস কিনা বল?

নেই। তবে তুমি বললে করে নিতে হবে।

একটু আমার বাড়িতে আসবি? সোমাকে একটু দেখবি?

কী হয়েছে ওর?

ফোনে সব বলা যাবে না। এলে জানতে পারবি।

সোমা কান খাড়া করে শুনছিল। মনীষ ওকে জোর করে কিছু করতে চায়। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। মনীষ ডাক্তার ডাকছে। আমার কিছু হয়নি মনীষকে এমন বলতে চাইল। কিন্তু বললে কে শুনছে? সে রাতে ঘুমোতে পারেনি। সে এখানে এসে এই শীতের রাতে কেমন কষ্ট অনুভব করতে চেয়েছে। যেন এই যে চারপাশে এত দীন দুঃখী মানুষ সারারাত ফুটপাথে কাটায়, এই যে গ্রামে মাঠে মানুষ অন্নহীন বস্ত্রহীন দুঃখী, সে দুঃখী মানুষের মতো থাকতে চায়। সে তার মুখ দেখার পর চোখ দেখার পর এমন করতে ভালোবাসে।

আর আশ্চর্য, অসিত এলে সোমা তাকেই বলল, আসুন। কী ব্যাপার, এদিকে পথ ভুল করে?

মনীষ এমন স্বাভাবিক চেহারা সোমার আশাই করতে পারেনি। শুধু চোখে—মুখে রাতের না ঘুমোনোর কষ্টকর ছবি। সে সিনেমাতে যে সোমাকে নিয়ে গিয়েছিল এ ঠিক সেই সোমা।

সোমা অনুযোগ করল, আজকাল আর এদিকে একেবারেই আসেন না।

অসিতের চোখ ট্যারচা হয়ে গেল। তবু সে ডাক্তার। অনেক সময় রুগির স্বাভাবিক কাজকর্মের ভিতরই অনিয়ম থাকে, শৃঙ্খলা থাকে না। আপাত মনে হবে সবই ঠিক, অথচ একটু খুঁটিয়ে দেখলে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, না, গোলমাল আছে। সে বসল।

সোমা বলল, কফি না চা? হট না কোল্ড? কী চাই?

অসিত বলল, হট।

সোমা বলল, আজকাল হটই পছন্দ সবার। যা দিনকাল পড়েছে।

অসিত বলল, আজ আমাদের হাসপাতালে চারজন এসেছে।

সবাই বেঁচে আছে তো?

একজন বাদে সবাই টেঁসে গেছে।

কীরকম বয়স?
এই পনেরো থেকে কুড়ি!
আহা রে! কার মার সন্তান!
অসিত সোমার মুখ দেখল। সোমা উঠে গেলে মনীষকে বলল, কিরে, বাপ হবার চেষ্টা করছিস না?
করছি তো। কিন্তু কিছুতেই পা মাড়াচ্ছে না। সব অনিয়ম হতে পারে, কিন্তু ট্যাবলেটটি খেতে ভুলবে না।
আমার তো কিছু খারাপ লাগছে না, কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।
মনীষ গত রাতের ঘটনা সোমার অজ্ঞাতে বললে অসিতকে কেমন চিন্তিত দেখাল।
সোমা এসে দেখল দুই বন্ধু মুখ ভার করে বসে আছে। সোমা বুঝতে পারল মনীষ সব বলেছে। সে হেসে দিল ওদের মুখ দেখে।—কী হল আপনাদের? চুপচাপ?
অসিত তাকাল সোমার দিকে। সোমা আবার হেসে দিল। আপনারা ভাবছেন কী জানি কী হয়ে গেল। কিচ্ছু হয়নি। কাল কফি হাউসে আমার খুব পরিচিত একজন মানুষকে দেখলাম। অথচ চিনতে পারলাম না। এখনও মনে করতে পারছি না। কেবল এটুকু মনে পড়ছে আমি যা হতে চেয়েছিলাম পারিনি।
মনীষ বলল, দ্যাখো সোমা, ছেলেবেলায় আমরা অনেক কিছু ভাবি। ছেলেরা সবাই বিদ্যাসাগর হতে চায়। আর মেয়েরা ভগবতী দেবী। কিন্তু কী জান, যত বড় হই তত দেখি এমন সমাজ—জীবনে আমরা বড় হয়ে উঠেছি, যেখানে কেউ আর ইচ্ছে করলেই সেটা হতে পারে না! বলে সে প্রায় ব্যাখ্যা করার মতো বলল, এই যে ধর যদি আমি চাইতাম বিদ্যাসাগর হব, কিংবা তোমার কোনো পরিচিত বন্ধু বিনুর কথাই ধর, সে তো কম সৎ ছেলে নয়, আমি ওকে জানি, কিন্তু বেচারা কী করবে, টাকার জন্য বস্তাপচা নোট লিখছে এখন। সে জানে এতে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, কিন্তু ওর এতবড় সংসারে কে সাহায্য করবে? ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালে তোমরা ওকে আর চিনতেই পারবে না। আমাদের সবারই এখন ভয়—কাল ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াব। ন্যায় অন্যায় বুঝছি না, যা পারছি সংগ্রহ করে ব্যাঙ্কে জমা রাখছি।
সোমা খুব মন দিয়ে শুনল। তুমি আজকাল ভালো কথাও শিখে গেছ মনীষ! একেবারে নেতাগোছের মানুষের মতো একটা বক্তৃতা করে ফেললে।
বক্তৃতা নয়। তোমাকে তো আমি জানি। তোমাকে আমি এ—সব কথা ক্লাস করার ফাঁকে ফাঁকেও বলতে শুনেছি। ফুটপাথে অথবা কোনো গ্রামে—গঞ্জে মানুষের অপমান দেখলেই তুমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে, বলতে এসব আর দেখা যায় না চোখে। সব ভেঙে ফেলা দরকার।
অসিত এসেছে ডাক্তারি করতে। এখন সে বুঝতে পারছে না কে রোগী। মনীষ না সোমা। সোমার মুখ হাসিতে সব সময় সপ্রতিভ। সে এতটুকু রাগছে না। মনীষ কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে। এবারে অসিত নিজেই সোমার মুখে গোটা ঘটনাটা জানতে চাইল—কাল কী হয়েছে আপনাদের!
কিছুই হয়নি। কেবল আমি ভাবছিলাম ওকে আমি কোথায় দেখেছি।
মনে করতে পারছেন না?
না।
তার জন্য ভাবনার কী আছে।
আমি তো তাই বলছি ওকে।
সময় সময় মানুষের এটা হয়। খুব একটা প্রিয় ঘটনা, যা জীবনে সবচেয়ে মনে বেশি থাকার কথা, সেই ঘটনার নায়ক সামনে হাজির হলে, সাময়িক স্মৃতিবিভ্রম হয়। পরে সেটা আস্তে আস্তে কেটে যায় এবং যখন সব মনে পড়বে, তখন অদ্ভুত হাসি পাবে। আরে, এমন ঘটনা জীবনে ঘটেছে তা বেমালুম ভুলে গেছি। বলে সে সোমার দিকে তাকাল। এ নিয়ে বেশি ভাববেন না।
আমি আদৌ ভাবছি না। যে ভাবছে তাকে বলুন।

মনীষ কেমন হতাশার চোখে দেখল সোমাকে। এই যুবতীকে সে এত ভালোবাসে! ওর এতটুকু কিছু হলে ওর ঘুম আসে না। আর কাল সোমা যা দেখে রাতে ঘুমোল না ভাবলে ভিতরটা আগুন হয়ে যাচ্ছে। সে আধুনিক ছেলে। সে মেয়েদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তবু এমন একজন রূপবান ছেলেকে সে চিনতে পারছে না, সে যে বলতে পারছে না, এই মুহূর্তে তার বিশ্বাস করতে কেন জানি কষ্ট হচ্ছে। সোমা ইচ্ছা করেই সব গোপন রাখছে। সে যখন এমন সুন্দরী, তখন তার কৈশোরে কেউ পাশাপাশি হেঁটে আসেনি, কেবল সে—ই ওকে ধরে নিয়ে এসেছে অথবা জয় করেছে —ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল।

সে বলল, সোমা আমার ঘাট হয়েছে। কিন্তু অসিত তুই জানিস, সকালে বের হয়ে দেখি শীতের বারান্দায় একটা সামান্য র‍্যাপার জড়িয়ে বসে রয়েছে। ডাকছি হুঁশ নেই।

সোমা বলল, ওটা কিছু না। তুমি তো জানো মনীষ, বাবা আমাদের জন্য তেমন কিছু রেখে যাননি। মা খুব অনটনের ভিতর আমাকে সেই টাকাতেই মানুষ করেছেন। আমি সুন্দরী ছিলাম। কী অসিতবাবু এ—ব্যাপারে আপনার কী মত?

আপনি এখনও দেবীর মতো।

তা হলে বুঝতে পারছ মনীষ, দূরের পথ হাঁটতে গেলে কিছু হোঁচট খেতেই হয়। আর রূপবতী হলে তো কথাই নেই।

এখানেই অসিতের একটু গোলমাল ঠেকল। তৃতীয় ব্যক্তির সামনে সোমা কেমন বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে। সে অন্যদিকে কথা টানার জন্য বলল, দেখলে তো মনীষ, বাংলাকে সন্তোষ ট্রফি থেকে কেমন জোর করে হারিয়ে দিল।

মনীষের এ—সব শুনতে ভালো লাগছে না। সে শুধু বলল, অসিত, তুই আয়।

অসিত বলল, তা হলে আসি।

সোমা বলল, কফি হচ্ছে।

আর একদিন হলে হয় না?

যা দিনকাল পড়ছে, আর একদিন যে আসতেই পারবেন ঠিক কি?

মনীষ কিছু বলছে না। নিজের এই আহাম্মুকির জন্য কেমন সে এবার নিজের ওপরই ক্ষেপে গেল। বলল, তোরা বোস, আমি আসছি।

তুমি গেলে চলবে কী করে? তুমি বোস।

মনীষ সোমাকে কেন যে চটাতে ভয় পায়। সে বসে পড়ল।

আজকাল এটা ওর হয়েছে অসিতবাবু। খুব সহজে চটে যায়। ভেঙে পড়ে। কিছুই ধৈর্য ধরে শুনতে চায় না।

অসিত বলল, দেশের যা অবস্থা, খুব ধৈর্য ধরে না শুনলে যে চলবে না।

মনীষ বলল, তাই বলে কি মানুষ দিনদুপুরে হত্যা করবে? বিচার থাকবে না? অসিত বলল, আজকাল বুঝি এসব খুনোখুনির ব্যাপার আপনাদের খুব হন্ট করছে? বলে সে সোমার দিকে তাকাল।

আমাকে করছে না।

কেন করছে না? মনীষ এবার উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রক্তমাংসের শরীর হলে না করে পারে?

কী করব! বল তোমাকে এ—ব্যাপারে অনেক কথা বলতে পারি। তবে বলব না। অসিতবাবু এসেছেন, বলা ঠিক হবে না।

সোমা আর কোনো কথা বলতে চাইল না। সে কফির পট থেকে লিকার ঢেলে অসিতের দিকে তাকাল। বলল, পাতলা না ঘন? দুধ কম বেশি। চিনি দেব, না দেব না?

অনেকগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন এখন অসিত। সে বলল, আমি আজকাল সবরকমের খেতে অভ্যস্ত। যা দেবেন। তারপর সে মনীষের দিকে তাকিয়ে বলল, গিন্নি কি তার লেফট—মাইন্ডেড?

কী জানি ভাই, কী মাইন্ডেড সে—ই জানে। নারী—চরিত্র দেবতারা শুনেছি বুঝতে পারে না। আর শালা আমি তো মনুষ্য—জাতির অযোগ্য। হবু ক্যাপিটালিস্ট।

সোমা বলল, তুমি সব ব্যাপারে নিজেকে টান কেন?

টানব না? তুমি এমন এক—একটা ব্যাপার করবে যে মনে হবে সব বুঝি গেল। আমার ভাবনার অন্ত থাকে না। কী করতে যে শখ করে পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম!

পুরোপুরি হয়ে গেলে তোমার এসব আর থাকবে না।

তার মানে?

মানে তখন দেখবে তোমার সময়ই হবে না বউ কোথায় থাকছে, কী করছে।

তোমাকে আজ জার্মানি, কাল আমেরিকা। বউ এদিকে পার্টি দিচ্ছে, পার্টি করছে। এখনও হওনি। চুনোপুঁটি হলেও না হয় কথা ছিল।

অসিত চাইছে না সোমার এসব উক্তি ওর সামনে হোক। কিন্তু সোমার দিকে তাকিয়ে বুঝল, সোমা আদৌই মাইন্ড করছে না। এ—সব কথা ঘরের সে তা আদৌই ভাবছে না। কোথায় যেন একটা অসীম দুঃখ আছে, সোমা তার বদলা সুদে—আসলে নিতে চায়। সেটা কি নিজের কাছে? সে কী বলছে, তুমি বড় ভুল করেছ সোমা, তুমি কিছু কিছু সৎ ব্যাপার এ—পৃথিবীতে আশা করেছিলে। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখছ আর্থিক অনটন তোমাদের সংসারকে কীভাবে তছনছ করে দিয়েছিল? তুমি বলেছিলে সবাইকে, তোমার বাবা মারা যাবার আগে কিছু ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স রেখে গেছেন। তোমার মা—ও তোমাকে এমন বলেছে। তুমিও সবাইকে এমন সব বলেছ। কিন্তু তুমি বড় হতে গিয়ে জানতে পারলে, এই অর্থ মা তোমার কীভাবে আনছেন। তোমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। মানুষের ওপর বিশ্বাস তোমার হারিয়ে গেল। তখন তুমি একজন মানুষকে মনে মনে খুঁজছিলে। সে থাকলে কিংবা তাকে পেলে তুমি হয়তো আর তোমার বিশ্বাসকে এমনভাবে বিসর্জন দিতে পারতে না। সমাজকে বদলে দেবার শপথ নিয়ে তুমিও হয়তো বের হয়ে পড়তে।

আচ্ছা, সোমা, তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি কি ওকে সত্যি চিনতে পারনি?

না। চিনতে পারিনি। মিথ্যা বলে লাভ নেই।

মনীষের চিৎকার করে বলার ইচ্ছা—তোমার পূর্বপ্রণয়ী। আমি ঠিক জানি। তুমি আমার কাছে সব গোপন করছ।

সোমা মনীষের মুখ—চোখ দেখে বুঝতে পারল, মনীষ এ—ব্যাপারে সেন্টিমেন্টে ভুগছে। সে বলল, অসিতবাবু, মানুষটা কে আমার নিশ্চয়ই মনে পড়বে। আমি আজ তাকে আবিষ্কারের জন্য সারাদিন ভাবব। তবে দোহাই আপনাদের, আমার কোনো অসুখ আছে ভাববেন না। অসুখটা মনীষের। ওর টাকা করার বাতিক। একের পিছনে সে পর পর কেবল শূন্য বসিয়ে যেতে চায়। এটা মানুষের বড় রোগ। এ—রোগে পেলে মানুষ তার মায়া—মমতা হারিয়ে ফেলে। সমাজের যা কিছু সুন্দর সে হরণ করে নিতে চায়। চারপাশে এত কদর্য জীবনযাপন, সে চোখে কিছুতেই তখন তা দেখতে পায় না।

অসিত উঠে গেলে সোমা কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকল। তার কোনো কোলাহল যেন ভালো লাগছে না। এমনকি মনীষকেও তার ভালো লাগছে না। সে চোখ বুজে থাকলে টুকরো টুকরো ঘটনা মনে করতে পারে। একা ব্যালকনিতে পায়চারি করলে বাবার মুখ মনে করতে পারে। কী নিরীহ ছিল তার বাবা। সামান্য তার প্রত্যাশা। সে তার স্ত্রী এবং কন্যাকে সামান্য সুখে রাখার জন্য যৎকিঞ্চিৎ অর্থ এদিক—ওদিক থেকে রোজগারের চেষ্টা করত।

বাবা সামান্য কেরানি। জেলা অফিসে সে টেন্ডার ফাঁস করে কিছু অধিক রোজগার করত।

সোমা বাবার মুখ এ—সময় আর ভাবতে পারল না। কারণ বাবা তার কাছে সব সময়ই নিরীহ মানুষ। বাবার আত্মহত্যার পর এ—সব খবর যেন কানাঘুষা শুনেছে। তার এখনও বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সে জানে, সমাজে যারাই আছে, তারা এটা না করে বাঁচতে পারছে না। বাবাও পারেননি। সে তার বাবাকে এজন্য সব

সময়ই ক্ষমা করে দেয়। তার বাবা মাঝে মাঝে তার জন্য তেলেভাজা কিনে আনত। বাবা এবং সে, মাকে গোপন করে কতদিন তেলেভাজা খেয়েছে। মা দেখলে বড় রাগ করত।

যেন চোখ বুজেই বলল, বাবা তুমি বড় বোকা। যে লোকটার হয়ে এসব করতে, সে কিন্তু বড় মান্য ব্যক্তি সমাজের। সে মাকে এখনও ভালো মাসোহারা দেয়। এটা ওর কী বদান্যতা! মাকে এত বলেও সোমা মাসোহারা নিতে বন্ধ করাতে পারেনি। মা—র এক কথা—এমন দুর্দিনে তিনি আমাদের দেখেছেন।

যত সে বড় হচ্ছে তত মনে হচ্ছে সংসারে তার মা—ও এক পাপে লিপ্ত। সে জানে না, কী যে যথার্থ কারণ। প্রথম যেদিন সে জেনেছিল, বাবার ব্যাঙ্কে কোনো ব্যালেন্সই নেই, বাবা সব তেলেভাজা খেয়ে উড়িয়ে গেছেন, এবং এই টাকা এক মহামান্য ব্যক্তির, তখন সোমার কী যে ঘৃণা হয়েছিল মায়ের ওপর! কিন্তু মা—র চোখমুখ দেখে সে কিছু বলতে পারেনি! মা—র মুখে বড় বিষণ্ণতা ছিল সেদিন। কার জন্য আমি এটা করেছি সোমা? তোর জন্য। আমার আর কী আছে! তোর বাবার বড় ইচ্ছা ছিল তুই বড় হবি। লেখাপড়া শিখবি। তোর বাবা বি.এ. পাস ছিল না। তুই বি.এ. পাস করবি। তোর বাবা থাকলে আজ কী যে তিনি সুখী হতেন।

সোমার ভাবলে অবাক লাগে তার বাবা টিপিক্যাল ছাপোষা মানুষ ছিলেন।

সোমা এখন উঠবে ভাবল। রসুলকে গাড়ি বের করতে বলল। সে অযথা ঘুরবে আজ। সে মনীষকে বলল, আমি একটু বের হচ্ছি মনীষ।

মনীষ তার ঘরে বসে কিছু ফাইলপত্র দেখছিল। আর একটু বেলা বাড়লেই অফিসের বড়বাবু এসে মনীষকে কী বোঝাবে। তখন সোমার সারা বাড়িটার ওপর রাগ হয়। সংসারে একমাত্র মানুষটার টাকা বাদে অন্য চিন্তা নেই। সে সেই বড়বাবুকে দেখলেই বলবে, আপনাদের কী বাজার—টাজার করতে হয় না? সকালে এসে সারাক্ষণ কী যে এত আপনাদের কাজ। বলার পরই মনে হয় সে মনীষের বউ। মনীষ এ—ব্যাপারে রাগ করতে পারে। তার অযথা কথা বলা উচিত হচ্ছে না। সে একেবারে চুপ করে যায়।

এই সকালে কোথায় যাবে?

একটু গঙ্গার ধারে যাব।

মনীষ চাবিটা ছুঁড়ে দিল সোমাকে।—কখন ফিরবে?

তোমার অফিসের আগেই ফিরব।

সোমা গাড়ি নিয়ে বের হয়ে দেখল চারপাশে শীতের রোদ। রাস্তায় এখনও ভিড় বাড়েনি। সে যে কোথায় যাবে বুঝতে পারছে না। একবার ভাবল কাল সে যেখানে ওকে দেখেছিল, সেখানে যাবে। সে যদি আবার আসে।

সোমা খুব দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে। আঁচল পড়ে যাচ্ছিল, সে সেটা গুঁজে দিল। হালকা রোদের ভিতর নীল রঙের গাড়ি, সোমা লাল সিল্ক পরেছে। পায়ে আলতা। সে চোখে আজ কাজল দিয়েছে। এই প্রথম সে কাজল দিয়েছে। সেই কত কাল আগে কাকে যেন জীবন থেকে সে হারিয়ে ফেলেছিল। সে বুঝি আবার ফিরে এসেছে। সে তাকে আজ খুঁজে বের করতে যাচ্ছে।

সোমার মাঝে মাঝে নানা দৃশ্য মনে আসে। মানুষটা কী অনিমাসির ভাশুরপো সমর? সমর কী এত সুন্দর ছিল? সে সমরকে বেশিদিন দেখেনি। মাত্র বিয়ের ক'দিন দেখেছে। সে নানাভাবে তাকে দেখল, সমর সুন্দর ছিল না। ভ্রূ সমরের এত টানা নয়। সে এ—ভাবে তাকাতে জানে না। সুতরাং সে কেন হবে। সে হলে ওর সঙ্গে উঠে দেখা করে যেত। এ—সুসময়ে আমাদের কথা তোমার মনে হয় তো? সে এ—সব জিজ্ঞাসা করত।

অনিমাসির মেয়ের বিয়ের দিনের কথা। জলি ওর বয়সি। অনিমাসি বারবার বলে গেছে, তুই যাবি সোমা। তুই না গেলে জলি খুব দুঃখ পাবে। সোমা তখন অনার্স নিয়ে পড়ছে। কোথাও কেউ যেতে বললে ওর বড় ভালো লাগে। সে যে সোমা দত্ত, তখন অবশ্য দত্ত ছিল না সে, গাঙ্গুলি, সে সুন্দর করে শাড়ি পরতে জানে,

খোঁপা বাঁধতে পারে, চোখে কাজল না দিলেও মনে হয় কাজল দিয়েছে, আর তা ছাড়া প্রথম সে কলেজে ঢুকেছে, আবার তার অনার্স আছে, সে ভালো ছাত্রী, নাম—ডাক, সে যে কত ভালো এবং মেধাবী, কান পাতলে ফিসফিস কথায় সে যেন তা টের পায়।

সোমার মনে হত তখন সে আছে বলেই চারপাশে এত হাসি গান আনন্দ। সে ভালোভাবে তাকাতে পারে না চোখ চুলে। তাকালেই চোখে চোখ পড়ে যায়। সব যুবকেরা তার চারপাশে যেন খেলা করে বেড়াচ্ছে। সে হাত তুলে দিলে সব সারি সারি যুবকের মিছিল, সামান্য তৃষ্ণার জল পান করবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

সে গিয়েছিল সকালে। তখন অনিমাসি ছাদের ঘরে ভাঁড়ার সামলাচ্ছে। বোধহয় সেটা ফাল্গুন মাস ছিল। ফাল্গুন মাসই হবে। কারণ তখন আকাশ বড় পরিষ্কার ছিল। খুবই পরিষ্কার। সে, সমর, এবং আরও চার—পাঁচজন যুবক ছাদে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে নক্ষত্র গুনত। কে ক'টা নক্ষত্র নির্ভুলভাবে গুনতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলত। সবাই পরস্পরের সততায় বিশ্বাস করত। সোমা বারবার গুনতে গিয়ে দেখছে সে ঠিকমতো গুনে যেতে পারে না। আকাশে এত নক্ষত্র, সে গুনবে কী করে! একদিক থেকে একটা দুটো পাঁচটা গুনলেই মনে হয় ভিতরে অজস্র নক্ষত্র রয়ে গেছে তার গোনা হয়নি। সে বলেছিল, না সমর, আমি গুনতে পারছি না।

সমর বলেছিল, যা, গুণতে পারবে না কেন? সবাই সব গুনতে পারে।

তুমি পার সমর?

পারি।

কত নক্ষত্র আকাশে বল?

দু হাজার তিনশো ছত্রিশ।

গুল।

গুল না সোমা। আমার আকাশে দু হাজার তিনশো ছত্রিশই আছে। যারা বাদ গেছে তারা আমার আকাশে নেই।

সোমা বলেছিল, তুমি বড় গুল মারতে পার সমর। আমার গুল মারতে ভালো লাগে না।

তুমি তবু গুল বলছ!

বলব না?

বলা উচিত না সোমা। কারণ—

কী কারণ? ছাদের ওপর সোমা আলগা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে আকাশ দেখছে। সমরের মুখ দেখে মনে হয়েছে সত্যি বুঝি আকাশের নক্ষত্র গোনা যায়। সে বলল, আমি যে পারছি না সমর। ক'টা গুনেই দেখছি তার চারপাশে অজস্র, আবার গুনতে গেলে দেখছি তার ভিতর আরও অজস্র। আমি গুনে শেষ করতে পারছি না, হাঁপিয়ে উঠছি।

বোকা। ও—ভাবে কী কেউ আকাশের তারা গুণে শেষ করতে পারে! বলে সমর ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি গুনছি তোমার হয়ে।

গোনো।

সে গুনতে থাকল। খুব সন্তর্পণে যেন সে গুনছে। একেবারে নিবিষ্ট মনে। আর যারা ছিল, তারা একে একে নেমে গেছে। আকাশে ওদের তারা গোনা বুঝি শেষ। কেবল বাকি সোমার। সোমারটা হয়ে গেলেই সমর নেমে যাবে।

সোমা নিশ্বাস বন্ধ করে প্রায় তাকিয়ে ছিল সমরের দিকে। সে গুনে কত নক্ষত্র বলবে সেই আশায়। নিশ্চয়ই বলবে সেই দু হাজার তিনশো ছত্রিশ। কিন্তু যখন বলল তখন দেখা গেল মাত্র একটা বলছে সমর, মাত্র একটা নক্ষত্র আকাশে!

কী বাজে বকছ?

হ্যাঁ ঠিক বলছি সোমা। তোমার আকাশে একটাই নক্ষত্র।

সোমা হেসে দিয়েছিল, বলেছিল, থাক মশাই, আপনাকে আর নক্ষত্র গুনতে হবে না। নিচে চলুন। বর এসে গেছে। এ—ভাবে দুজনকে ছাদে দেখে ফেললে নির্ঘাত প্রেম করছি ভাববে।

সমর এতবেশি স্মার্ট কথাবার্তা আশা করেনি। সে বলেছিল, তাহলে মেয়েরা প্রেম—ফেম করে আজকাল?

মেয়েরা করে না তো ছেলেরা করে?

কারা যে কী করে সোমা বুঝি না। তবে সত্যি বলতে কি, তোমাকে দেখলে প্রেম না করে পারা যায় না। কেবল তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

আর আমার তখন ইষ্টনাম জপতে ইচ্ছা হয়।

কিছু ইচ্ছা—টিচ্ছা হয় না সোমা?

হবে না কেন? সবই হয়।

আমারও যে কী ইচ্ছা হয়! হলে পরে ভালো লাগে না! একা দাঁড়িয়ে তখন নক্ষত্র গুনি। তবে কী জান, আমার আকাশে সব সময় সেই দু হাজার তিনশো ছত্রিশ। কেউ আমার দিকে তাকায় না। বড় কষ্ট হয় সোমা। সমর সত্যি কেমন বলতে বলতে সিরিয়াস হয়ে গেল।

এই রে খেয়েছে। এবারে আর রক্ষা নেই। ঠিক অরণ্যদেবের পাল্লায় পড়ে যাব। সোমার জন্য ঝড় জল, নদী সমুদ্র এবার সাঁতরে পার হয়ে যাবে মানুষটা।

সমর বলেছিল, তা তুমি ঠাট্টা করতে পার। তুমি কী তেল মাখো সোমা?

আমি তেলই মাখি না।

এমন সুন্দর চুল।

চুলে তেল মাখলে আজকাল চুল উঠে যায়।

কেন? কী কারণ?

তোমাকে আমাদের ফার্মে নিয়ে যেতে পারি। কী করে বাংলাদেশে টাকা তৈরি হচ্ছে দেখাতে পারি। ভেবেই তার মনে হল কী যে ভাবছে! সমরকে সে এখন পাবে কোথায়? তার ফার্ম তখন ছিল কোথায়? সে তো তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের কী একটা তেল মাখত। এখন সে তেলের নাম মনে করতে পারছে না।

সোমা এবার চারপাশে লক্ষ্য রাখল। মাঝে মাঝে সে এ—ভাবে একা বের হয়। কলকাতার ফুটপাথে এবং গাছের নিচে অথবা গাড়ি বারান্দার নিচে অজস্র দুঃখী মানুষের ছবি দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। যেন বাংলাদেশের সব মানুষ চোখ বুজে আছে। এত বড় অসাম্য কারও চোখে পড়ছে না। সে মাঝে মাঝে কোনো যুবতী, হয়তো পাগল কিংবা অভাবে অনটনে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি, ফুটপাথে দেখতে পায়। একা একা হেঁটে যাচ্ছে। গায়ে কোনো জামা—কাপড় নেই। অথবা কোনো কোনো রাতে সে বাড়ি ফেরার সময় দেখে ফুটপাথে উলঙ্গ মানুষ, অথবা এক বৃদ্ধ দীর্ঘদীন না খেতে পেয়ে মরে আছে। সে বাড়ি ফিরেই কেমন চুপচাপ বসে থাকে।

এ—সব দেখলেই সোমার মনে হয়, চুলে যে কোনো তেল মাখে না সেই মানুষটার মুখ উঁকি দেয় মনে! সে কে? সে কেন সহসা এসেছিল সেখানে? সে কেন তাকে এ—ভাবে টানছে? তার তো এখন কোনো অভাব নেই। সে বিরাট প্রাচুর্যের ভিতর দিনযাপন করছে। সময় কাটছে না বলে কোনো মিশনারি কলেজে অধ্যাপনা। গাড়িতে যায়, গাড়ি চালিয়ে নিজে ফিরে আসে। এই যে সে বলে এসেছে অফিসের আগেই সে বাড়ি ফিরবে, ফিরতে সে নাও পারে, তাতে মনীষের কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ অফিসে তার কয়েকটা গাড়ি। নিজের নামে কোনো গাড়ি নেই। সে হাত ফাঁকা করে বসে রয়েছে। বড় চালাক মনীষ। এবং সেই মানুষের মুখ মনে পড়লেই সোমার কেন জানি মাঝে মাঝে মনীষকে বড় ধূর্ত মনে হয়।

কই, তুমি বললে না—তো সোমা, কী তেল মাখো?

কী তেল মাখি আমি জানি না সমর।

সে কী হয়! তুমি তেল মাখো তার নাম জানো না?

তুমি কী আমার মাথায় তেলের গন্ধ পাচ্ছ?

খুব সুন্দর তেলের গন্ধ।

ওটা তেলের গন্ধ নয় সমর। ওটা আমার শরীরের গন্ধ।

সমর বলল, সোমা, তোমার শরীরের এমন সুন্দর গন্ধ ভাবা যায় না।

কী করি বল। থাকলে তাকে তো ফেলে দিতে পারি না।

সমর ছাদে দাঁড়িয়ে আরও গল্প করতে চেয়েছিল। সোমার কেন জানি আর গল্প করতে ভালো লাগছিল না। নিচে মানুষজনের কোলাহল। কেউ কেউ উঠে দেখে গেছে সমর সোমার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কী করছে। একবার সোমার মা সোমাকে ডেকেও গেছে। ও—ভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প করলে চলবে? নিচে কত কাজ!

সমর বলেছিল, যাই মাসিমা।

সোমা বলেছিল, যাচ্ছি। তুমি কি এখন নামবে না সমর?

না। আমার এখানে কেন জানি আজ একা দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে।

সোমা আর দেরি করেনি। সে নিচে নেমে গিয়েছিল। আয়নার ভিতর সে নিজেকে দেখেছিল। খুব সে তেমন সাজেনি। মুখে সামান্য পাউডার! এবং পোশাকে সে সবসময় সাধারণ। অথচ সে বুঝতে পারছে এই পোশাকই ওকে আজ এ—বাড়ির সবচেয়ে দামি এবং নামি মেয়ে করে রেখেছে। সে লক্ষ্য করেছে, সে একবার যেখানেই গেছে, মৃদুগুঞ্জন। মাইরি ভাই, আমি আর থাকতে পারছি না। কী রে, খপ করে ধরে ফেলব? আহা কী যে হেরিনু! সূর্য আজ কোনদিকে উঠেছে! আসলে কী যে অন্ধকার! আমি জানি না, আমার আজ কী হবে! কত রকমের সে কথা শুনতে পায়। আগে সে এ—সব কথায় মনে মনে রাগ করত, কিন্তু কেন জানি তার এ—সব দিনে দিনে গা—সওয়া হয়ে গেছে। এবং সে যত বড় হচ্ছে, মানুষেরা চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকলে তার ভালো লাগে। সে ওদের কথায় রাগ করে না। মুচকি হাসে। এই হাসিটুকু কী যে রহস্যময়ী করে রাখে সোমা বুঝি জানত না। আর এই রহস্যময়তাই সোমাকে এত বেশি দামি করে রেখেছে। মনীষ কিছু বলতে পারে না। কিছু বললেই যেন সোমা তার ঘরে আর থাকবে না। সে সারা শৈশবে এবং সে যখন তরুণী ছিল, যে সব স্বপ্ন দেখত, সেই সব স্বপ্নের ভিতর ডুবে যাবে অথবা হারিয়ে যাবে।

সোমা সারাক্ষণ কাজ করেছিল তারপর। সে সমরের কথা ভুলে গিয়েছিল। সবাই ওকে ডেকে যেন কিছু বলতে চায়। কিছু যেন জিজ্ঞাসা করতে চায়। সে আর চারপাশে তাকাতেই পারে না। চোখ তুলে তাকালেই চোখে চোখ পড়ে যায়। চোখে চোখ পড়ে গেলে তার ভারী লজ্জা লাগে।

সে চারপাশে তাকিয়ে কাজ করেনি বলেই জানে না সমর তখন কোথায়। যখন বরযাত্রীরা খেয়ে চলে গেল তখন ওর হুঁশ হয়েছিল সে অনেকক্ষণ সমরকে দেখছে না। এ—বাড়িতে একমাত্র সমরই সাহস করে ওর সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে। আর যারা ওর মতো তরুণী অথবা যুবক পাশাপাশি, তারা কেউ আসেনি আলাপ করতে। পরিচয় করিয়ে দিলে কেমন নাবালকের মতো ওর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে। ভীতু কাপুরুষ মনে হয়েছিল সবাইকে। বরং সমরই বলেছিল, তোমার হাতে কী কাজ?

কিচ্ছু না।

চল ছাদে দাঁড়িয়ে একটু গল্প করি।

কী গল্প করবে?

যে গল্প করতে তুমি ভালোবাসবে।

এমন কথায় সোমা সাড়া না দিয়ে পারেনি। চল। তারপরই আকাশের নক্ষত্র দেখা! সেই মানুষটাকে সারা বাড়িতে সে কোথাও আর দেখতে পেল না। রাত গভীর হয়ে গেছে। সবাই খেয়ে চলে গেছে। জলিকে নিয়ে

সে কিছুক্ষণ মেতে ছিল। ওর বরকে নানারকম ঠাট্টা—রসিকতা করেছে। জলির বরটা যে কি! সে কথা বলতে পর্যন্ত পারে না যেন। ওর মনে হয়েছিল, মানুষটা দেখাচ্ছে এমন, যেন সে কিছু জানে না। তুমি যে সব জানো মশাই সে আমার জানতে বাকি নেই। আজ রাতে সবুর সইবে তো? এই জলি, আজ রাতে কিছু করেছিস তো খুব খারাপ হবে।

জলির বর এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন সে সোমাকেই খপ করে পাশে বসিয়ে ঠেলে ফেলে কী যে করে ফেলবে! সোমা চোখ দেখলেই মন দেখতে পায়। মানুষটা বড় বজ্জাত। সব জানে, অথচ নাবালকের মতো মুখ করে রেখেছে। এ মশাই, মুখ তুলুন। আপনাকে দেখে কে বর কে কনে বোঝা মুশকিল।

নানারকম সুবাস, এবং বাসর জেগে সোমার ক্লান্তি এসেছিল। ঘুম এসেছিল। সে উঠে বাইরে গেল। সমর গেল কোথায়? সমর ছাদে দাঁড়িয়ে থাকবে বলেছিল ঠাট্টা করে। সে কী সেখানেই আছে? সে কি কিছু খায়ও নি? ওর কেন জানি মনে হল ওকে খুঁজে দেখা উচিত। এ—বাড়িতে একমাত্র সমরই নিজের মানুষের মতো ব্যবহার করেছে। সবাই যখন কোনোরকমে জায়গা করে নিচ্ছে শোবার, যখন মাসিমা—মামিমারা ঘরে গোল হয়ে বসে আছে, জায়গা নেই বলে ঘুমাতে পারছে না, ওদের বিয়ের দিনের গল্প বলে হাসাহাসি করছে, তখন সোমা ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙছিল। সে কোথায়? সমর, সে ধীরে ধীরে ডাকল, সমর তুমি আছ?

ছাদে উঠেই সোমা দেখেছিল সমর সেই একভাবে ছাদের কার্নিসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সোমা যে ডাকছিল, তা পর্যন্ত ওর খেয়াল নেই। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে আকাশ দেখছে। কী সুন্দর আকাশ, কত নক্ষত্র, নিচে দুই তরুণ—তরুণী। কাছাকাছি, অথচ ওরা কতদূরে। সোমা সমরের পাশে দাঁড়াল। কোনো কথা বলল না। নিচে বাসর। সবাই ঘুমিয়ে গেলে হয়তো মানুষটা জলিকে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি আমার দিকে ও—ভাবে তাকালে কেন? জলি বলবে, কীভাবে?

সে বলবে, এই যে যেন আমি একটা চাষা মানুষ, তোমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছি।

জোর করেই তো নিয়ে যাচ্ছ!

জোর করে না নিয়ে গেলে তোমাকে পেতাম কোথায়? বলে হয়তো জলির হাতটা দুহাতের ভিতর রেখে জলির শরীরের উষ্ণতা মাপছে এখন। জলি শিউরে উঠছে। ওর ভিতরটা কাঁপছে। মানুষটার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তুমি আমাকে নাও। আর পারছি না। কতদিন এই এক অপেক্ষাতে ছিলাম।

সোমা ডাকল, সমর।

বল।

এ—ভাবে সারাক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে?

থাকতে ভালো লাগল সোমা।

খেলে না?

খেতে ইচ্ছে হল না।

না খেলে শরীর খারাপ করবে।

একদিন না খেলে কিছু হয় না।

কী দেখছিলে এতক্ষণ?

আকাশ দেখছিলাম।

আকাশে এত কী?

কী যে জানি না। সারা আকাশে সোমা বিশ্বাস কর তোমাকে দেখেছি।

আমাকে তোমার সত্যি ভালো লাগে?

সমর হাসল।

সোমা ওর আরও কাছে গেল। জান কী যে হল, বাসর জেগে আমারও ভালো লাগছিল না। কেবল তোমার কথা মনে হচ্ছিল।

সত্যি?

সত্যি।

আর কিছু লাগে না সোমা। আমার আর কিছু লাগে না। বলে সে কাছে এসেছিল। এবং ওর কপালে চুমু খেয়েছিল।

গালে খাও।

সমর ওর গালে চুমু খেয়েছিল।

ঠোঁটে।

সমর ওর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল।

তারপর সমর সম্মতি পেয়ে আরও দূরে হাত দিতে চেয়েছিল। সোমা বলেছিল আজ আর না। প্রথম রাতে এর চেয়ে বেশি দিতে নেই।

সোমা পরদিন সকাল না হতেই বাড়ি ফিরে এসেছিল। সেই মধুর ঘটনার আর বাড়াবাড়ি সে চায়নি। তাকে কত বড় হতে হবে। তার সামনে কী সুন্দর ভবিষ্যৎ। আর এক জায়গায় আটকে থাকলে চলে না।

সোমা এবার গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল।

ছয়

সোমা গাড়ি থেকে নামল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মনে হল দরজা বন্ধ কফি হাউসের। সে ঘড়ি দেখল। ন'টা বাজেনি। সে উত্তেজনার মাথায় খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। সে এখন কী করবে বুঝতে পারছে না। পুরনো বইয়ের দোকানগুলোর দিকে সে এগিয়ে গেল। সে দুটো একটা বই হাতে নিয়ে দেখছে। পছন্দ হলে কিনে ফেলবে। অনেকদিনের অভ্যাস এটা। সে এখান থেকে বহু দুর্মূল্য বই কিনে নিয়ে গেছে একসময়। তার পড়ার বাতিকের চেয়ে সংগ্রহের বাতিক বেশি।

কিন্তু কী যে মনের ভিতর হচ্ছে। একটা দুটো বই দেখেই তার কেমন হাঁপ ধরে গেল। সে এবার গাড়িতে এসে বসল। মাথাটা ধরেছে মনে হয়। মাথা ধরা আজকাল নানা কারণে ঘটছে। সকালে কোনোদিন মাথা ধরেনি। আজ এই প্রথম। সে কফি হাউস খুললে, প্রথমেই এক গেলাস জল চেয়ে নেবে। এবং একটা অ্যাসপ্রো খেয়ে ফেলবে। সে ব্যাগে অ্যাসপ্রো খুঁজতে থাকল। কেন যে সকালে মাথা ধরা—বিকেলে হলে সে বুঝত যেমন ঘটে তাই ঘটছে। তারপরই মনে হল, সে এখানে কেন এসেছে? সেই মুখ এবং উদাসীনতা লক্ষ্য করবে বলে? মনে হয়! সে কি এখানে এখন আসবে? এলে সে বিকেলে আসতে পারে। নাও আসতে পারে। তাকে সে আবার দেখলে যেন ঠিক চিনে ফেলতে পারত। তাহলে মনের ভিতর যে কষ্টটা, ওকে কোথায় যেন দেখেছি, সে আমার মনের মানুষ যে রে, গানের কলির মতো একটা মুখ বারবার চোখের সামনে ভেসে ভেসে হারিয়ে যাচ্ছে।

যাক, তবে একটা অ্যাসপ্রা পাওয়া গেল। সে অ্যাসপ্রোটা হাতের দু আঙুলে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। নিরাময় হবে সে এবার। সংসারে মাঝে মাঝে এমন ট্যাবলেট খেলে মানুষ ভাবে নিরাময় হয়ে যাচ্ছে, বস্তুত কেউ নিরাময় হয় না। অসুখ তার ভেতরেই থাকে। সে তাকে নিয়ে শুধু বড় হয়।

ঘড়িতে ন'টা বাজল। সোমা ওপরে উঠে গেল। একগেলাস জল চেয়ে নিল। সে ট্যাবলেটটা ঘুমের বড়ির মতো মুখের ভিতরে ফেলে দিল। তারপর চারদিকে তাকাতেই মনে হল কফি হাউস ফাঁকা। কেউ আসেনি। এত বড় হলঘরটায় কেউ নেই। তাদের এবার কাজ আরম্ভ হবে। এক দুই করে এসে সবাই বসবে। ওরা সোমার দিকে তাকিয়ে থাকল। এই সকালে এমন মেয়ে, মুখ—চেনা, একসময় এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মেরে গেছে। সুতরাং ওরা কেউ কাছে এসে দাঁড়াল। কী দেব?

সোমা বলল, আচ্ছা আবদুল, তোমার মনে আছে কাল ঐ কোণের টেবিলে পুল—ওভার গায়ে একজন বসেছিলেন? এই তোমার তখন সাতটা কী সাড়ে সাতটা হবে হয়তো।

আবদুল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। কত মানুষ আসে, সে কী করে জানব।

আচ্ছা ঐ কোণের টেবিলে কাল বিকেলে কে সার্ভ করেছিল বলতে পার?

আবদুল কাউন্টারে গিয়ে কী ফিসফিস করে বলল। ভিতরে তখন একটা কাচের গেলাস ভেঙে পড়ার শব্দ। ঝনঝন। বুকটা কেঁপে উঠল সোমার। সে বুঝি এল। তুমি জান সে লোকটাকে?

সে বলল, না দিদিমণি। আমি ঠিক খেয়াল করতে পারছি না।

কেন মনে নেই তোমার? সে পিছন ফিরে বসেছিল।

সে বলল, না। তারপর সে আর দাঁড়াল না। উত্তরের দিকে দুজন ভদ্রলোক এসে বসেছে। ওরা রোজই এ—সময় এখানে আসে। এক কাপ করে কফি এবং এক প্লেট স্যান্ডউইচ খেয়ে ওরা কোথায় একসঙ্গে কাজে যায়। ওদের কাছ থেকে এখন আর অর্ডার নেবার প্রয়োজন হয় না। এলেই কফি আর স্যান্ডউইচ দিয়ে আসে। ওটা ওর টেবিল বলে, সে চলে গেল।

সোমা এখন একা। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি। সুভাষ বসুর ছবি। কিছুদিন আগে গান্ধী এবং নেহরুর দুটো ছবি ছিল। এখন আর সে ছবি দুটো নেই। নামিয়ে রাখা হয়েছে। অথবা চারপাশে যে সব তরুণেরা সমাজকে বদলে দেবার নেশাতে মেতে উঠেছে, তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য, নিরাপদ জায়গায় বোধহয় সরিয়ে রেখেছে।

ওর যে এখন কী করণীয়! সে বসে বসে এক কাপ কফি খেল। চোখে—মুখে ভীষণ দুশ্চিন্তার ছাপ যেন। এত বড় শহরে একজন অপরিচিত মানুষকে খুঁজছে। সে কোথায় পাবে তাকে। সে কাকে জিজ্ঞাসা করবে, করতে পারলে যদি কোথাও তার ঠিকানা মিলে যায়। ওর পাশাপাশি যেসব মুখ ছিল, সে যে কী বোকা, যদি একটা মুখ ভালো করে দেখে রাখত তবে আর একজন সাক্ষী থাকত তার, আচ্ছা আপনি বলতে পারেন, আপনার টেবিলে পিছন ফিরে যিনি বসেছিলেন তার নাম কী, কোথায় থাকেন?

সোমা কাউকে দেখেনি। একমাত্র চুরি করে টেবিলের সেই মানুষটিকে সে দেখেছে। ওর উচিত ছিল, টেবিলের সব মুখগুলো একবার ভালোভাবে দেখে রাখা। তবে সে অন্তত আজ অথবা কাল কাউকে কফি হাউসে পেয়ে যেত। পেয়ে গেলেই সে তার সন্ধান পেতে পারত। বোকার মতো তাকে এ—ভাবে বসে থাকতে হত না।

সুতরাং সে উঠে পড়ল। এই সকালে এখানে একা বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। বস্তুত সে যে কী চায়, তার কী পাওয়ার কথা ছিল, সে যেন নিজেও জানে না। কেবল সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা হলেই যেন বলে দিতে পারত, তুমি সোমা এই চেয়েছিলে, এখন তুমি সব ভুলে গেছ। আর কী করা। সে ধীরে ধীরে নেমে গেল। তারপর বাড়ি। এবং দীর্ঘ সময় বসে থাকা। শুয়ে থাকা। এই যে দীর্ঘ সময় সে একা বাড়ি থাকবে তখন তার মনে হয় সব প্রাচুর্য অহেতুক মনীষ দুটো মানুষের জন্য আটকে রেখেছে। এত দরকার কী? সেই মানুষটাকে দেখার পর থেকেই এমন মনে হচ্ছে তার।

সোমা ভাবল, সে আবার বিকেলে আসবে ওকে খুঁজতে।

সে বিকেলে এসেছিল। রাতে চুপচাপ কোণের একটা টেবিলে বসেছিল। বিনুর সঙ্গে দেখা। বিনু অবাক। তুমি এখানে?

তোমাদের কাছে এলাম।

ওরে বাপস! কী বলছ!

আচ্ছা বিনু, কাল তুমি লক্ষ্য করেছিলে একজন যুবক হবে হ্যাঁ বেশ লম্বা—চওড়া মানুষ, সাদা পুল—ওভার গায়ে, কালো প্যান্ট পরনে ঐ কোণের টেবিলটায় বসেছিল, এবং আমাকে মাঝে মাঝে চুরি করে দেখছিল!

বিনু পাশে একটা চেয়ার টেনে আনতে আনতে বলল, আমি যেদিকে তাকিয়েছি দেখেছি সব চোখ তোমার দিকে। চুরি করে সবাই তোমাকে দেখছিল, এবং তোমার দেখা মানুষটি যে কে কী করে বলব!

সোমা কথা বলল না আর। বিনু বলল, কফি খেয়েছ?

আমি খাব না, তুমি খাও।

আমি মটন ওমলেট নিচ্ছি সঙ্গে।

নাও।

বিনু বলল, মনীষ এল না?

সোমা তাকাল বিনুর দিকে, সে এখানে আসে না বিনু।

কাল যে এল!

কাল এল, সেই ছবিটা দেখে ওর অতীত দিনের কথা মনে পড়ে গেছিল।

খুব আবেগের বশে এসে গেছে। আর আসবে না।

তুমি এলে?

আমি এসেছিলাম ওর সঙ্গে আমার দরকার ছিল।

কী দরকার?

কী যে দরকার আমি ঠিক জানি না। ওর সঙ্গে দেখা হলেই সে বলে দিতে পারত আমার কী দরকার।

তুমি নিজে তোমার দরকারের কথা জান না, তার সঙ্গে দেখা হলে তোমার কী দরকার সে বলে দিতে পারত—কেমন কথা?

ঠিক কথা বিনু। আমরা যে কী চাই নিজে বুঝে উঠতে পারি না। আর একজন মানুষের দরকার হয়, সে বলে দিতে পারে, তোমার এটা দরকার সোমা, তোমার ওটা দরকার নয়। অনর্থক তুমি ছুটে মরছ।

ওসব তত্ত্বকথায় আমি নেই সোমা। তাহলে আমি খাচ্ছি।

খাও।

বিনু বলল, তুমি এলে মাঝে মাঝে ভালো—মন্দ খাওয়া যায়।

তুমি আরও কিছু খাবে?

না, আর না। খেতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু পেটে সহ্য হয় না। পেটে বোধহয় আলসার হবে। মাঝে মাঝে ব্যথা হয়।

তবে এসব ছাইপাঁশ খাওয়া কেন?

খেতে খুব ভালো লাগে। আজ জান, আমাদের ওখানে আবার গণ্ডগোল। টু উইকেট ডাউন।

সোমার মুখটা ব্যথায় নীল হয়ে গেল।

কী সুন্দর ছেলে দুটো। তাজা। একেবারে ফুলের মতো তাজা। গলগল করে রক্ত পড়ছে। পুলিশ গলায় গুলি চালিয়েছে।

সোমা আর কথা বলতে পারল না।

ওদের কে যে এমনভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে বুঝি না। ওরা দুজন একজন সার্জেন্টের গলা কেটে ফেলেছিল।

সোমা বলল, তুমি খাও। আমার ভালো লাগছে না ওসব শুনতে।

বিনু বলল, আমি তাড়াতাড়ি চলে যাব। তুমিও তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। কখন কোথায় কীভাবে গণ্ডগোল বেধে যাবে বুঝতে পারবে না।

সোমা এবারও কোনো কথা বলল না। সে চারপাশে কাকে খুঁজছে। সোমা উঠছে না বলে সে—ও উঠতে পারছে না। সোমা কথাবার্তা আরম্ভ করল। সুধীর, অশোক এল না?

সবাই তো ভয়ে মরছে। এদিকে আসা সবাই এখন ছেড়ে দেবে। সাতটার পর রাস্তা ফাঁকা। তোমার কী মনে হয় এদেশে সিভিল ওয়ার শুরু হবে?

জানি না। ওর সঙ্গে দেখা হলে তোমাকে সব বলে দিতে পারতাম। সে বলল, অবশ্য মনে মনে। বিনু, আমার স্বামী মনীষ। সে এখন কত বড় ঘুষে কত বড় ইমপোর্ট লাইসেন্স দিল্লির উদ্যোগভবন থেকে বের করতে পারে তার মুসাবিদার জন্য ছুটোছুটি করছে। সে সংসারের এই অমঙ্গলের দিকটা দেখতে পাচ্ছে না।

বিনু বলল, তুমি কিছু ভাবছ সোমা?

কী ভাবব?

এই যে লক্ষ লক্ষ বেকার, আমার ভাইটা আজ চার বছর এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বসে আছে। এখন বাড়ি থাকে না। রাত করে ফেরে। আমরা বাড়ির সবাই ওর জন্য রাত জেগে থাকি।...কেবল মনে হয় আমার ভাইটাকে কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে কে সোমা?

সোমা বলল, তুমি উঠবে বলেছিলে, চল উঠি।

তুমি একা এতদূর যাবে? সঙ্গে যাব তোমার?

না। বরং চল আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাই।

না, সে কী করে হয়।

কী করে হয় দ্যাখো। বলে জোর করে সে বিনুকে গাড়িতে তুলে নিল। বলল, জান বিনু, আমাদের দেশের এই অবস্থা চোখে দেখা যায় না।

তুমি এমন কথা বলছ!

খুব খারাপ লাগে। রাতে একটা ভিখারি মেয়ে আমাদের বাড়ির নিচে রোজ পড়ে আছে দেখতে পাই।

তা খেতে না পেলে কী করবে? আশ্রয় না থাকলে যাবে কোথায়?

সে আজ হোক কাল হোক মরে যাবে।

তা যাবে।

মনীষকে মাঝে মাঝে বলি, এত দিয়ে আমাদের কী হবে?

কী কথায় কী কথা! বিনু বলল, মনীষের সঙ্গে তোমার রাগারাগি হয়েছে সোমা? আমি কাল যাব।

আমি রাগ করি না। কারণ রাগ করে আর লাভ নেই। আমরা দিন দিন একচক্ষু হরিণ হয়ে যাচ্ছি।

তারপর সোমা আর কথা বলল না। মানুষজন পাতলা। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। একটা বস্তির মতো জায়গার কাছে সোমা বিনুকে নামিয়ে দিল। বস্তির ভিতর দিয়ে বিনুকে যেতে হয়। সে যেতে যেতে মানুষের অসন্তোষ চারপাশে ফেটে পড়ছে দেখতে পেল। কারণ একটা কলের গোড়ায় আট—দশ তরুণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটি খুঁড়ছে। বিনুর মনে হল ওর ভাইটা ওদের ভিতর আছে। তাকে ডাকতে পর্যন্ত বিনুর সাহসে কুলাল না।

সোমা একা একা যাচ্ছে। এত বড় কলকাতা নগরী, ট্রাম বাস অজস্র মানুষ, আর তাদের সেই অসন্তোষ, যেন সবাই ফেটে পড়বে—বলবে, আমরা এ চাই না, আমরা অজস্র এই তরুণের মৃত্যু চাই না—তখন সোমা জানে, তার স্বামী, মনীষ, বাজারে তেলের অভাব, সে হোয়াইট অয়েল প্যাক করে কেমিক্যাল ঘ্রাণ মিশিয়ে বাজারে নারকেল তেল বলে চালাচ্ছে। মনীষের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা হাওয়ায় উড়ছে। কেবল কুড়িয়ে নিতে জানা চাই।

মনীষ কিছুতেই কেন জানি সংসারের অমঙ্গলের দিকটা দেখতে পাচ্ছে না। সোমার চোখে জল চলে এল।

সাত

কে যেন হেঁকে যাচ্ছিল তখন, গ্রামে গ্রামে আজ নতুন দিনের ফসল উঠছে, যে যার ফসল ঘরে তুলে নিন।

সোমা গাড়ি চালাতে চালাতে সেই হাঁক শুনতে পেল। কে হাঁকছে। সে গাড়ি চালাতে চালাতে লক্ষ্য করল না, কেউ হাঁকছে না। রাস্তার মানুষের ভিতর তেমন কেউ মানুষ নেই যে এমন হাঁকতে পারে। সবাই বাড়ি যাবার জন্য ছুটছে। কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। চারপাশে কী হচ্ছে দেখছে না। বাড়ি পৌঁছে গেলেই যেন

রক্ষা। তার তাকে কিছুতে পাবে না। সোমা এ—সময় মনে মনে না হেসে পারল না। আটটা না বাজতেই আবার গাড়ি—বারান্দায়, ফুটপাথে, গাছের নিচে সব অসহায় মানুষদের শুয়ে পড়ার দৃশ্য। সোমার মনে হল, সেইসব জায়গায় মানুষটা এখন অদৃশ্য হয়ে আছে, এবং হাঁকছে, যে যার ফসল ঘরে তুলে নাও।

সে একবার কুলু উপত্যকাতে বেড়াতে গিয়েছিল। কলকাতা থেকে সোমা মোটরে যেতে যেতে কত সরাইখানা, নদী, মাঠ, পাহাড় দেখেছে। দেখেছে মাথার ওপর নীল আকাশ আর অজস্র পাখি এবং শীতের রোদ। সেই রোদে কত হাজার লক্ষ অসহায় মানুষের মুখ। দেখলে মনে হবে যেন কতদিন ওরা কিছু খায়নি। সোমার তখন আর উপত্যকার ফুল ফল নজরে আসেনি। বাবার মুখ মনে হয়েছে। বাবার আত্মহত্যার পরের মুখ। অসৎ মানুষের পাল্লায় পড়ে বাবা আত্মহত্যা করেছিলেন। যেন বাবার মুখে সোমা পড়তে পেরেছিল, এমন এক সমাজে আমরা আছি সোমা, যেখানে আমাকে চুরি করে তেলেভাজা খেতেই হয়। তুই আর কী করবি।

সোমা যেতে যেতে চারপাশে লক্ষ্য রাখছে। খুব ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে। কলকাতায় জোরে সে কখনও গাড়ি চালাতে পারে না। পায়ে হেঁটে গেলে বুঝি আগে চলে যাওয়া যায়। ফলে যত মানুষ আছে তাদের মুখ দেখতে দেখতে যাচ্ছে। আবছা তাদের মুখ। আবছা বলেই সে যেন বুঝতে পারে—মানুষেরা কত উদ্বিগ্ন। ওর মায়া হয়।

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত করে ফেলেছিল সোমা। সে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যাচ্ছিল। মনীষ ব্যালকনিতে পায়চারি করছিল—এবং ভীষণ উদ্বিগ্ন সে। সোমা এখনও ফিরছে না। রসুল সোমার সঙ্গে যায়নি। একা বের হয়ে গেছে। তখনই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মনীষ বলল, ওকে সামান্য আঘাত দেবার জন্য যেন বলল, ওকে পেলে?

না।

গাড়িতে চড়ে ওসব মানুষের নাগাল পাওয়া যায় না সোমা।

মনীষ সোমাকে ঠাট্টা করছিল অথবা বিদ্রুপ। সোমা গায়ে মাখল না। মনীষ স্ত্রীর কাছে গেল। বলল, সোমা তুমি কী পাগল হয়ে যাচ্ছ?

সোমা সোজা তাকাল মনীষের দিকে।

আমার তাই মনে হচ্ছে। তোমার কী হয়েছে বল? তুমি এমন করলে আমি বাঁচি কী করে!

আমার তো কিছু হয়নি মনীষ। তুমি অনর্থক চিন্তা করছ।

যদি তুমি তাকে খুঁজে পাও, তবে কী করবে?

কিছুই করব না।

তবে তাকে খোঁজার কী দরকার এত?

সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারছি না।

সোমা! মনীষ চিৎকার করে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, কাল থেকে আর বের হবে না। বলে দিলাম।

সোমা এ—কথা শুনে কী ভাবল মুখ দেখে বোঝা গেল না। সে যেমন অন্যান্য দিন স্নান করে রেকর্ড—প্লেয়ার নিয়ে বসে তেমনি বসেছিল। এবং গত রাতে যে—সব রেকর্ড বাজিয়েছে একা একা, সে সব বাজাল। সে মনীষের সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত পারছে না। মানুষটার মুখ তাকে এত বেশি হন্ট করছে।

খাবার পর অন্তত মনীষ ভেবেছিল সোমা সহজ হবে। সে রাগ করলে খায় না। না খেয়ে শুয়ে থাকে। কিন্তু আজ মনীষ ডাকতেই সে খাবার টেবিলে গিয়ে বসল। বেশ পেট ভরে খেল। পেট ভরে খেলে মনীষের মনে হয় সোমার কোনো রাগ থাকে না। সে একটা দামি চাদর সোমাকে জড়িয়ে দিল। বলল, চল তুমি গান গাইবে, আমি শুনব।

সোমা বস্তুত সেই গানগুলিই ফিরিয়ে ফিরিয়ে গাইল, গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে....।

মনীষ জানে সোমার এই গান সেই এক মানুষকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া। সে যেন এ—সব গান মনীষকে শোনাচ্ছে না, সেই নিবেদিত প্রাণকে শোনাচ্ছে। মনীষ ভিতরে ভিতরে ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। তবু কিছু করতে পারছে না। সোমা যখন নীল চোখে তাকায় তখন মনীষের সব রাগ দুঃখ কেমন গলে যায়। মনীষ ওকে জড়িয়ে ধরল। সোমা কিছু বলছে না। ওকে শুইয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। সোমা কিছু বলছে না। মনীষ বলছে, এ—ভাবে ভালো লাগছে না। আজ তুমি লাল রঙের গাউন পরো। লাল রঙের নাইটি পরে এল সোমা। নিচে কোনো বাস নেই। সেই এক মোমের মতো নরম হাত—পা। সোমা হাত—পা বিস্তার করে দিল। মনীষ কেমন কুকুরের মতো শুঁকে শুঁকে ওর শরীরের দিকে এগুচ্ছে। অন্তস্তলে ডুব দেওয়া মাত্রই সোমা আর্তনাদ করে উঠল, মনীষ, চারপাশে কারা ঘিরে ফেলেছে বাড়িটা দ্যাখো। ওরা আমাদের পুড়িয়ে মারবে। বলেই মনীষকে শরীর থেকে ঠেলে ফেলে দিল সোমা।

মনীষের মুখে এ—শীতের রাতেও ঘাম। সে স্ত্রীকে জোর করে সাপ্টে ধরল ফের। সোমা এলোপাথাড়ি হাত—পা ছুঁড়ছে। না, না। আমি পারব না। আমাদের ওরা আজ হোক কাল হোক পুড়িয়ে মারবে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমাদের ওরা কোনোদিন ক্ষমা করবে না।

কিন্তু মনীষ শুনছে না। কী যেন এক অমানুষিক লোভ ওকে তাড়া করে ফিরছে। আজ তিনদিন সোমা ওকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, নানারকমের অজুহাত সোমা দাঁড় করায়। সে কিছু শুনবে না। জোর করে বাঘ যেমন শিকার নিয়ে পালায় তেমনি সে সোমাকে পাঁজাকোলে করে নিজের খাটের দিকে এগুচ্ছে। আর সোমা, এক অবোধ বালিকার মতো হাত—পা ছুঁড়ে বাধা দিচ্ছে। ওর নাইটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। বলছে, মনীষ, ওরা এসে গেছে। ওরা আমাদের পুড়িয়ে মারতে এসে গেছে।

মনীষ কিছু শুনল না। সে তার স্ত্রীকে উলঙ্গ করে ফেলে রাখল। বলল, তুমি উঠবে না। উঠলে আমি তোমাকে হত্যা করব। মনীষ ওকে এবার যথার্থই ভয় দেখাল। উত্তেজনায় ওর হাত—পা কাঁপছে। কে এমন মানুষ, যে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে! একেবারে উঠবে না। আমি তোমার পাশে শোব। তোমাকে ধর্ষণ করব।

সোমা শক্ত হয়ে থাকল। কিন্তু মনীষের যতটা ইচ্ছা ছিল আজ ওকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার, নীল চোখ দেখে সে আর তা করতে পারল না। শিয়রে বসে থাকল। এবং সহসা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল, বল তোমার কী হয়েছে। খুলে বল। আমি তোমার জন্য সব করব।

সোমা পাশ ফিরে শুল। ঘরে আর কেউ আছে সোমার যেন মনে নেই। মনীষ বলল, তুমি উঠে দেখো কেউ আমাদের বাড়ির চারপাশে নেই। কেউ আমাদের পুড়িয়েও মারতে আসছে না।

সোমা ঘুমিয়ে পড়েছে।

মনীষ একা একা একটা মৃদু আলো জ্বালিয়ে পায়চারি করতে থাকল। তার ঘুম আসছিল না। গত রাতে সোমা যেমন শীতের রাতে ব্যালকনিতে চুপচাপ বসেছিল, আজ সে তেমনি নিজে সেখানে চলে গেছে। তার ভিতর সোমা কী করে যেন এক মৃত্যুভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। সকালের কাগজ পড়ার পর সেই মৃত্যুভয় তাকে অনেকক্ষণ কাজের ভিতর ডুবতে দেয় না, তবু সে সারাক্ষণ কাজ—পাগলা মানুষের মতো অফিসে থাকে। আজ এখন সেই মৃত্যুভয় ওকে এমন জড়িয়ে ধরেছে যে একা একা ব্যালকনিতে পায়চারি করতে সে ভয় পেল। ওর কেন জানি মনে হল সত্যি কারা চারপাশে, মাঠ ঘাট অথবা গ্রাম থেকে মশাল জ্বালিয়ে শহরের দিকে উঠে আসছে। হাতে ওদের মশাল। এবং বর্শার ফলাতে মানুষের মৃত্যু নাচছে। ওর মনে হল ওরা সব অন্নহীন ভূমিহীন মানুষ। সে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেবার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, একা পেয়ে তাকে বর্শায় গেঁথে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ সোমার কেমন ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল শিয়রে কেউ বসে রয়েছে। তাকে ডাকছে। ওর প্রথম মনে হয়েছিল সেই মানুষটা তার শিয়রে বসে রয়েছে। তাকে ডাকছে। বলছে, ওঠ, চল, আমরা নতুন ফসল

তুলতে যাই। এসো দ্যাখো, চারপাশে মানুষের ভিতর কী উল্লাস! স্বাধীন মানুষের কী আনন্দ! কিন্তু চোখ মেলে তাকালে দেখল, মনীষ হাঁটু গেড়ে বসে আছে পাশে। ওকে ভয়ার্ত কণ্ঠে ডাকছে—সোমা ওঠ।

সে উঠে বসল।

দ্যাখো একটা চিঠি। উড়োচিঠি।

কৈ দেখি।

এই দ্যাখো। বলে সে একটা চিঠি দেখালে।

কে দিল তোমাকে?

কে দিল জানি না। রসুল বলল, একটা লোক ওর দরজায় কড়া নেড়ে দিয়ে গেল।

সদর খোলা ছিল?

না। সদর খোলা ছিল না।

সোমা অবাক হয়ে গেল। দেখতে কেমন? রসুল ওর মুখ দেখেছে?

রসুলকে ডাকব?

না না। এখন থাক। চিঠিটা পড়।

মনীষ ভয়ে চিঠি পড়তে পারল না। তুমি পড়। আমার গলা শুকিয়ে উঠছে।

সোমা আলোর নিচে চিঠি রেখে পড়তে গিয়ে কেমন ভীত হয়ে পড়ল। সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা। এমন যার হস্তাক্ষর, সে নিজে না কত সুন্দর। সে পড়ল, পড়তে পড়তে গলা শুকিয়ে গেল তার। সব খুঁটিনাটি তথ্য দেওয়া। এত খবর ওরা কী করে রাখে! শেষে লেখা, গণ—আদালতে আপনার বিচার হওয়া দরকার। আপনিই বলুন, যেভাবে আপনার ব্যবসা হাজার মানুষকে জাহান্নমে ঠেলে দিচ্ছে তার কী শাস্তি?

সোমা বলল, আমি জানি সে আসবে।

সোমা! মনীষ আর্তনাদ করে বলল, তুমি কী বলছ!

কী বলব বল? এমনই তো হবার কথা। আমাদের আইন তোমার এই ভেজাল ব্যবসা রুখতে পারছে?

তার জন্য জুলুম? ভয় দেখাবে?

আর কী করা। সোমা হাসতে থাকল। আমি তোমাকে ভালোবাসি মনীষ। আমার বাবা লোকলজ্জার ভয়ে আত্মহত্যা করল! কী সামান্য ছাপোষা মানুষ ছিলেন তিনি। রসুলকে তাড়াতাড়ি ডাকো। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করার আছে।

রসুল এলে বলল, মানুষটা দেখতে কেমন রে?

রসুল বলল, বড় ভালোমানুষ। সে এসে ডাকল আমাকে, বলল, রসুল ভালো আছ?

তুই কী বললি?

বললাম, ভালো আছি কর্তা।

কর্তা বলছ কেন? আমার নাম অঞ্জন। তুমি আমাকে অঞ্জন বলেই ডাকবে।

নাম অঞ্জন বলল। অঞ্জন নাম তার! বলতে বলতে সোমা কেমন মূর্ছা গেল।

আমাকে তার নাম বলতে বারণ করেছে দিদিমণি। এই, এই, কী হল! দাদাবাবু কী হল?

কিছু না।

ডাক্তার ডাকি?

না। মনীষ, সোমাকে শুইয়ে দিল। আর শোয়ানোর সময়ই মনে হল তার সেই ছিন্ন—ভিন্ন নাইটি ওর গায়ে। রসুল এমন পোশাকে দিদিমণিকে কখনও দেখেনি। কিন্তু মানুষটার কথাবার্তায় কী জাদু আছে! সে একেবারে তার কথায় মুগ্ধ হয়ে গেল! এবং সেটুকু না বলাতেই রসুলকে ডেকে এনেছে ওরা যে ঘরে বসে, সে ঘরে। সে কী করে জানবে, দুজনেরই তখন মূর্ছা যাবার মতো চেহারা। সে বলতে বলতে সব দেখছিল আর অবাক হয়ে যাচ্ছিল। মনীষ তাড়াতাড়ি বলল তুই বাইরে দাঁড়া। ওর চোখে—মুখে জল দিচ্ছি।

মনীষ এখন অঝোরে ঘামছে। এটা যে শীতের রাত মনেই হচ্ছে না। সে পর্দা তুলে বাইরে এসে বলল, রিভলবারটা ঠিক আছে তো?

সব ঠিক আছে দাদাবাবু। কিন্তু ও তো রিভলবারের মানুষ নয়। ওর চোখ—মুখ দেখলে আপনারও মায়া হবে।

রাখ তোর মায়া। বলে সে এক ধমক লাগাল। তারপর ঘরে ঢুকে দ্রুত পালটে ফেলল সোমার পোশাক। ওর চোখে—মুখে জল দিল সামান্য এবং চোখ খুললে বলল, তুমি ওকে চিনতে পারনি।

সোমা বলল, না।

আট

সোমা ডায়াল ঘোরাল। বলল, এটা কী থ্রি ফাইভ ফোর এইট টু ফোর?

ইয়েস। আপনার কাকে চাই?

অসিতবাবু আছেন? ওকে একটু ডেকে দিন না।

অসিতকে? অসিতের বাবার গলা সোমা বুঝতে পারল। আপনি কোত্থেকে বলছেন?

আমি সোমা, মেসোমশাই।

অ সোমা, তোমার কী খবর? কতদিন তোমাকে দেখি না।

আমার খবর ভালো মেসোমশাই! একদিন আপনাকে দেখতে যাব। তাড়াতাড়ি অসিতবাবুকে একটু ডেকে দিন না। ওর শরীরটা ভালো না। একবার এক্ষুনি আসতে হবে।

সোমা বুঝল অসিতবাবুর বাবা এবার ফোন ছেড়ে অসিতবাবুকে ডাকতে গেছে। সোমা এবার পাশের খাটের দিকে তাকাল। দেখল মনীষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। নিশ্বাস ফেলতে ওর কষ্ট হচ্ছে কেন জানি।

আমি সোমা বলছি অসিতবাবু। তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনার বন্ধুর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বুকে ভয়ংকর ব্যথা।

যাচ্ছি।

সোমা রসুলকে বলল, সদর খুলে বসে থাক। অসিতবাবু আসছে।

মনীষ বলল, ওর বলতে কষ্ট হচ্ছে তবু বলল, না সদর খুলবে না। দরজায় এসে গাড়ি থামলে দেখে খুলবি। অন্য যে—কোনো লোক এসে ঢুকতে চাইলে গুলি করবি।

সোমাকে মনীষ অবিশ্বাস করছে। কারণ সোমা অঞ্জন, অঞ্জন এসেছিল বলতে বলতে মূর্ছা গেছে। বস্তুত সে একজনকে হয়তো চিনে ফেলেছে। ওর নাম অঞ্জন কিনা সে জানে না। অঞ্জন এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা মুখ মনে পড়েছিল, সে মুখটার সঙ্গেই যেন বেশি মিল আছে কফি হাউসে সে যাকে দেখেছিল তার। কারণ সোমার নাম ছিল একসময় অঞ্জলি। সোমা ওর পোশাকি নাম। অঞ্জলি এবং অঞ্জু এই নামে কেউ তাকে ডাকত। একজন তাকে ডেকেছিল অঞ্জনা বলে। সেই মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি সুন্দর মুখ ভেসে উঠল। দাড়ি—গোঁফ ওঠেনি তখনও, অথচ কী দুর্ধর্ষ সে, তার ভিতরটা, মনে হল এখনও কেঁপে ওঠে।

সোমা এবার মনীষের পাশে গিয়ে বসল।—একটু জল গরম করে সেঁক দিচ্ছি।

আরে ধুত্তোর তোমার সেঁক। আমি কথা বলতে পারছি না।

এতটুকু কম মনে হচ্ছে না?

মনীষ কথা বলতে পর্যন্ত পারছে না।

হঠাৎ তোমার এমন কেন হল?

মনীষ উপুড় হয়ে আছে। ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কেবল ঘামছে। সোমা যে কী করবে বুঝতে পারছে না। সে চোখ মেলে দেখেছিল মনীষ অপলক ওকে দেখছে। ওর গলার কাছে হাত। যেন সোমার গলা টিপে মেরে ফেলবে। সোমারও ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। মরে যাবে এই ভেবে কষ্ট না। মনীষ তাকে অবিশ্বাস করে

অযথা কষ্ট পাচ্ছে এই ভেবে। সে বলল, মনীষ, আমি তোমাকে কিছু লুকাচ্ছি না। অঞ্জন বলে আমি কাউকে চিনি না।

নয়

অসিত এসে দেখল, মনীষ শুয়ে আছে। সোমা পাশে চিন্তিত মুখে বসে রয়েছে। এবং অসিতকে দেখেই সোমা প্রাণ পেল যেন। বলল, আসুন। কী বিপদ দেখুন।

অসিত কথা না বলে মনীষের শিয়রে গিয়ে বসল। কী, কোথায় কষ্ট হচ্ছে?

মনীষ চিত হয়ে শুয়ে আছে। সে মাথা ঘোরাল না। কেমন চুপচাপ ছাদ দেখছে। হলুদ রঙের ছাদ এবং এটা বেডরুম নয়। এখানে সবাই আসতে পারে। এখানেও দুটো খাট আছে দুজনের। এখানে অসিত কেমন একটা নিরীহ গোছের ছবি দেখতে পাচ্ছে। গোটা বাড়িটা ভয়ে কেমন চুপচাপ।

সে বলল, কোথায়? এখানে? সে বুকে হাত রাখল।

বুকটা কেমন করছে অসিত।

এখানে লাগছে?

না।

সে চিন্তিত মুখে বলল, ওকে কাল একবার ভালো করে দেখতে হবে। এখন ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলাম।

সোমা ভাবল সেই চিঠিটা ওকে দেখাবে কিনা। চিঠিটা পাবার পরই ওর এমন হয়েছে। অসিতবাবু ঘরের লোক। ওর ছেলেবেলার বন্ধু। সুতরাং সে মনীষকে না বলেই চিঠিটা দেখাবে ভাবল। বলল, কী যে করি। ওকে কে একজন থ্রেটনিং চিঠি দিয়ে গেছে। ওটা পাবার পর থেকেই ওর এমন হয়েছে।

অসিত বলল, আপনাদের আপত্তি না থাকলে চিঠিটা দেখাতে পারেন।

আপত্তি থাকলে বলব কেন?

চিঠিটা লকার খুলে আনার সময় অসিত বলল, পুলিশে খবর দিয়েছেন?

পুলিশে খবর দেব কিনা ভাবছি।

কেন? অসুবিধা কী?

ওর ভয়—এতে ঝামেলা আরও বাড়ে। কাজের কাজ কিছু হয় না।

অসিত চিঠিটা পড়ে কেমন নিজেও বিব্রত বোধ করল। যা চিঠি এতে কার যে অপরাধ সে যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। এগুলো যদি সত্যি হয়, তবে মনীষের স্বপক্ষে বলার কিছু নেই।

সে সোমাকে চিঠিটা ফিরিয়ে দেবার সময় একবার মনীষের খাটের দিকে তাকাল। মনীষকে কেমন বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সে সোমাকে বলল, চিঠিটা পড়ে মনে হয় কোনো মধ্যযুগীয় নাইট রাতের আঁধারে পাপ অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

সোমা বলল, কেন যে হচ্ছে এমন!

মনীষ বলল, আর কাজ করা যাবে না। দেশের বেকারি বাড়বে।

ওর দিকে তাকিয়ে অসিত হাসল। তুই এখন ঘুমো।

আর কী ঘুম আসে! বলে সে পাশ ফিরে শুল। সে ভাবছিল সোমার কথা বলবে কিনা। কিন্তু পারিবারিক প্রেস্টিজ, সে কিছু বলল না। সোমা অঞ্জন অঞ্জন বলে মূর্ছা গিয়েছিল, সে কথা বললে যেন মনে হবে সব ব্যাপারটার সঙ্গে সোমা জড়িত।

অসিতই বলল, ওকে খুঁজে পেলেন?

কাকে?

ঐ যে বলেছিলেন খুব পরিচিত কাকে একবার দেখে মনে করতে পারছিলেন না কোথায় তাকে দেখেছেন?

তাঁকে খুঁজে পেয়েছি। সে ঠাট্টার সুরে বলল।
তাহলে আপনার অসুখ সেরে গেল বলতে হবে।
কীসের অসুখ?
এই যে মানুষের মাঝে মাঝে অসুখ হয়। সে চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না কী করছে। তবু করে যায়, খুঁজে যায়।
মনীষ আর পারল না। সে উঠে এল। তুই একটু বুঝিয়ে যা সোমাকে। সোমা বড় ছেলেমানুষ। চারপাশে এত যে দরিদ্র আর অন্নহীন মানুষ আছে তাতে আমরা কী করতে পারি?
কিছু পারি বইকি।
আপনি বলুন—আমরা পারি না? ইচ্ছা করলে পারি না?
অসিত! কী বলছিস আজে—বাজে! তুই যদি টাকা কুড়িয়ে না নিস, তবে অন্য কেউ এসে নিয়ে যাবে। টাকা পড়ে থাকবে না।
অসিত বলল, আমি জানি না, বুঝিও না এসব। তবে এ—ভাবে বেশিদিন চলে না। কলকাতার চারপাশে নজর দিলে যা চোখে পড়ে, সাধারণ মানুষের মাথা ঠিক থাকার কথা না। যদি কেউ এখন মনে করে থাকে, আর যখন কিছু করণীয় নেই, সব হাতের বাইরে, তখন মধ্যযুগীয় নাইট হয়ে যাওয়াই ভালো, যেখানেই পাপ সেখানেই ওদের তরবারি ঝলসে উঠবে।
তুই কী মনে করিস, ভয় দেখিয়ে আমাদের কাজ গুটিয়ে দিতে পারবে?
অসিত আবার হাসল। তুই উঠে এসেছিস কেন? শুয়ে থাক। উত্তেজনা এ—সময় খারাপ।
আমার ঘুম আসবে না অসিত।
সোমা বলল, লক্ষ্মী মনীষ, তুমি যা বলবে শুয়ে শুয়ে বল, আমরা শুনছি।
মনীষ বলল, আমরা যে—ভাবেই টাকা কামাই, ওতে করে তো দশটা লোকও কাজ পাচ্ছে। ওটা না করলে ওরাও কাজ পাবে না, খেতে পাবে না।
ঠিক আছে, তোর সঙ্গে এ—ব্যাপারে পরে আমি আলোচনা করব। এখন আর কোনো কথা নয়।
কথা বললে সে আরও উত্তেজিত হবে। এবং এতে খারাপ হবে। ওর যা মনে হচ্ছে—হার্ট ওর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। চিঠি পাওয়ার পরই হার্ট কারও দুর্বল হয়ে যায়। এবং ভয়ে সে মরে যায়। মনীষ ভয়ে মরে যাবে, স্বভাব ওর যাবে না। এ—সব তর্ক বৃথা। সোমাকে স্বপক্ষে সে টেনে নিতে পারত, কিন্তু কথায় কথা বাড়ে, সে ডাক্তার মানুষ, সে সমাজ—সংস্কারক নয়। সে রুগির যাতে ভালো হয় তাই করবে। এবং সেইমতো উপদেশ দিয়ে গেল সোমাকে।
অসিত যাবার সময় সোমাকে বলল, আপনার সেই ভয়টা গেছে তো?
কোন ভয়? ভয় কোথায় আবার!
এই যে রাস্তায় গরিব দুঃখী মানুষ অথবা ভিখারি মানুষ দেখলে আপনার ভয় হত। মনে হত ওরা হাজার লক্ষ হলেই ছুটে আসবে। যা কিছু সুন্দর, যাকে আপনারা এখন শিল্প বলছেন, একে একে ভেঙে তছনছ করে নতুন সমাজ তৈরি করবে।
এভাবে আমরা চললে, ওরা আজ হোক কাল হোক আসবেই। বলে সে সিঁড়ির দরজার কাছে এল। ওর মুখে অদ্ভুত কমনীয়তা। সে ডাক্তার মানুষ। মনীষ শুয়ে আছে। মনোরমা এখানে নেই। রসুল নিচে জেগে আছে। সে সারারাতই জেগে থাকবে। অসিত বলল, ভয় নেই কোনো। কাল এসে সব চেক করে যাব। আমার যা মনে হচ্ছে চিঠি পেয়ে এটা হয়েছে।
অসিত চলে গেলে সোমার মনে হল, এই এক ভয় নিরন্তর এখন কাজ করবে। তবু ওর কেন জানি মনে হল, সে যা চায় তা পায় না। কে সেই মানুষ? ওর বড় ইচ্ছা হচ্ছিল সেই মানুষটাকে দেখবে। সে ভিতরে ঢুকে দেখল মনীষ ঘুমিয়ে পড়েছে। মনীষ নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। সে আয়নার সামনে দাঁড়াল। দামি

ইটালিয়ান সিল্ক এবং চোখে কাজল দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেল। যেখানে রসুল আছে, সেখানে গেল। সে রসুলকে বলল, চিঠি দিয়ে কোনদিকে গেছে বলতে পারিস?

রসুল সদর খুলে দিল ভালো করে। দিদিমণিকে দেখেই আদাব দিল। বাইরে এসে ঠিক যেখানে অজস্র বোগেনভেলিয়ার গাছ একটা ঝোপের মতো সৃষ্টি করেছে সেখানে দাঁড়াল। ঐ দিকে নেমে গেছে।

ওটা তো মাঠ।

হ্যাঁ, তিনি মাঠের অন্ধকারেই নেমে গেছেন।

ও—মাঠের গাছগুলোর ছায়ায় যারা রাত কাটায় তুই তাদের কাউকে চিনিস?

না দিদিমণি।

আমার সঙ্গে আয়।

এত রাতে!

আয় না।

সদর খোলা থাকবে?

থাকুক।

কিন্তু তিনি যে বলেছেন সারারাত জেগে পাহারা দিতে।

কিচ্ছু হবে না। তুই আয়, আমি বলছি আসতে।

রসুল একটা পাগড়ি বাঁধল মাথায়। সে কোমরে বড় একটা ভোজালি ঝুলিয়ে ওর সঙ্গ নিল।

তিনি যদি রাগ করেন। রসুল কেমন আমতা আমতা করল।

তিনি ঘুমোচ্ছেন।

ওরা সদর খুলে ফের বন্ধ করে দিল। মনীষের অযথা ভয়। যারা আজ চিঠি দিয়ে সাবধান করে যায়, তারা সে রাতে আসে না। শোধরাবার একটা সময় দেয়। সে জানে মনীষ কোনোদিন আর শোধরাবে না। ওর অসুখ করবে। অসুখ নিয়েই সে বড় একটা অসুখের ব্যবসা চালিয়ে যাবে এই দেশে। দেশের মানুষকে সব নেড়ামাথা করে দিয়ে মনীষ নিজে কষ্ট পাবে।

সোমা দেখল গাছের নিচে অন্ধকার, বড় প্রশস্ত পথ। শোরুমে ইতস্তত আলো জ্বলছে। কিছু রাতের পোকা উড়ছিল। দু—একজন মানুষের সাড়া পাচ্ছে সে। সোমা রসুলকে নিয়ে বড় মাঠে ঢুকে গেল। এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে বরং ভয়। মাঠে অজস্র গাছ, এবং গাছের নিচে কারা চুপচাপ শীতের রাতে জেগে আছে মনে হল। কাছে গেলে অবাক, দেখলে সব কাতারে কাতারে মানুষ, ওদের পোশাক ময়লা, ছেঁড়া, শুকনো ঘাসের ওপর ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। ওরা কী গভীর ঘুম যাচ্ছে! দুঃখ বেদনা আছে মুখে। ফাঁক ফোকরে যে সামান্য আলো বড় রাজপথ থেকে ভেসে আসছে তাতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সকাল হলে এরাই এই বড় শহরে, অথবা রেল—ব্রিজের মাথায়, কখনও সূর্য অস্ত গেলে, বড় লাল বাড়িটার দিকে কেন জানি প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। সে রসুলকে বলল, তুই চলে যা। আমি এই মাঠে এক একা ঘুরব। আজ সে আসবে।

রসুল জানে মাথা খারাপ আছে দিদিমণির। সে কাছে থাকলে চিৎকার করতে পারে। বাড়ি গেলে বলতে পারে, রসুল তুমি বিদায় হও। কর্তাসাহেব যতই হামবড়া ভাব দেখান—এই দিদিমণির কাছে একেবারে বাচ্চা শিশুটি। কী যে করে রেখেছে! সে বলল, আচ্ছা যাচ্ছি।

বস্তুত সে গেল না। সে দূরে অস্পষ্ট আলোর ভিতর দাঁড়িয়ে দেখল দিদিমণি একা একা মাঠে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সোমা দেখল বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে। শেষ রাত এখন। এখন রাতে এ ভাবে একটা মাঠে পায়চারি করা ঠিক না। কিন্তু সোমা জানে, রসুল পাশে ঠিক কোনো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাকে পাহারা দিচ্ছে। এবং সে রসুলকে যে—ভাবে জানে, তাতে রসুল সোমার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে পারে যে—কোনো ভাবে। সে

বেশ নিশ্চিন্তে হেঁটে যাচ্ছে। কী যে সে খুঁজছে, মাঝে মাঝে ভুলে যায়। আসলে সে তাকেই খুঁজতে এসেছে। যদি সে এই মাঠে নেমে এসে থাকে, তবে ঠিক কোনো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং সোমার জন্য অপেক্ষা করবে। এটা কেন হয়, সে বোঝে না। সেই চোখ দুটো কী যে মায়াবী। হয়তো ওরা সেদিন বাড়ি ফিরে গেলে, সব খোঁজখবর নিয়েছে গোপনে। এবং সে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেখেছে, সদরে রসুল, হয়তো তাকে টপকে যাবার ক্ষমতা মানুষটার নেই। চিঠি দিয়ে চলে গেছে।

মানুষটার সঙ্গে তার খুব দেখা হওয়া দরকার। যেমন সে দেখা হলে বলতে পারত, এটা একটা মানুষের কঠিন অসুখ। সেই প্রথমদিন থেকে, যেদিন থেকে মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করতে শিখল, সেদিন থেকে মানুষের লোভ এ—ভাবে মানুষকে তাড়না করছে। যেটা হাজার হাজার বছরের অসুখ তাকে তুমি কী করে দু দণ্ডের ভিতর আরোগ্য করবে।

আর তখনই দলে দলে মাঠের ভিতর কারা আগুন জ্বেলে দিয়েছে। শেষ রাতে এ—সব মাঠে যারা গাছের নিচে শুয়ে থাকে, শীতে তাদের ঘুম আসে না। ওরা বিকেলে ঘাসপাতা সংগ্রহ করে রাখে। শেষ রাতে যখন হাত পা বরফ হয়ে যায়, শীত নিদারুণভাবে কষ্ট দেয়, এবং মনে হয় মরে যাবে, তখন এরা আগুন জ্বেলে সকালের রোদের জন্য অপেক্ষা করে। সোমার কিন্তু মনে হল, মানুষটা চিঠি দিয়ে বেশিদূর যেতে পারেনি। কারণ মানুষটা তো জানে, এ—বাড়িতে সোমা দত্ত আছে, সে ছিল সোমা গাঙ্গুলি, উদ্বাস্তু মেয়ে সোমা গাঙ্গুলি কী করে যে সোমা দত্ত হয়ে গেল, এবং কিছু ছবি সে মনে করতে পারে, স্মৃতির মতো খেলা করে বেড়ায়, সেই কবে যেন তাকে তার মা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, বোধহয় এটা বাবার মৃত্যুর পর। সেই লোকটা—কেমন চুপচাপ ভালোমানুষের মুখ করে ওর বড় বৈঠকখানায় বসেছিল, কী সদাশয় মানুষ, বাবার বিনিময়ে লোকটা লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছে, সোমার এটা তখন মনে হয়নি, পরে সে সবটা জেনেছে মার কাছ থেকে, এবং মা যখন লোকটার রক্ষিতা হয়ে গেল, বাবা তখন আত্মহত্যা না করে বোধহয় পারেননি।

সব সে মনে করতে পারে না। এই শীতের রাতেও সে কেমন শীত অনুভব করছে না। মাথার ওপর বড় আকাশ আর অজস্র নক্ষত্র, সব রাস্তার আলো এসে মাঠে পড়েছে। এখানে পাশাপাশি সব বড় বড় গাছ, পাশেই একটা বড় হাসপাতাল। দুটো একটা অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে। যার কিছু দূর হেঁটে গেলে দুর্গের র‍্যামপার্ট। সে সেদিকে গেল না। সে গাছের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে গেল। আগুনের দিকে হেঁটে গেল। ওখানে হয়তো সে আছে। সে কে? সে অঞ্জন! অঞ্জন বলে কে আছে তার! কাল একবার বিনয়ের কাছে যেতে হবে, বিনয় যদি বলতে পারে, কলেজ—জীবনে অঞ্জন বলে কোনো বন্ধু যদি থেকে থাকে। সে এমন একটা নাম শুনে মূর্ছা গেল! ভাবতে পারছে না এমন কেন হল! সহসা কী হল মনের ভিতর অঞ্জন বলে কোনো যুবক অথবা কিশোর অথবা বালকের মুখ আবিষ্কার করে ফেলেছিল, যে ছিল তার কাছে রাজার মতো। ওর মা এবং বাবাকে যা কিছুর বিনিময়ে ছোট হতে হয়েছে, সব কিছুর বদলা নেবার মতো এক মানুষ সে। সে শিশু বয়সে, কিংবা আরও বড় হয়ে বুঝতে পারত, ওর এমন একজন মানুষের দরকার যে মধ্যরাতে নাইটদের মতো পাপ অন্বেষণ করে বেড়াবে, সেই যে লোকটা, দুটো চোখ যার শয়তানের মতো ঘোরাফেরা করত, এবং মাকে দেখলেই চোখ দুটো জ্বলে উঠত, তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের অনিবার্যতা ভাবলে সে স্থির থাকতে পারত না। সোমা ভাবত, একদিন—না—একদিন সে আসবেই।

কিন্তু সোমা সেই আগুনের পাশে গেলে দেখল, মাত্র একজন বুড়ো মতো লোক বসে আছে। শীতে হাত পা চোখ সাদা হয়ে গেছে। পাশে নানারকমের পোঁটলা—পুঁটলি, ভাঙা টিনের বাক্স, মগ, পুরনো টিনের কৌটা, সে বেশ এই নিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে। এমন একজন দেবীর মতো সহসা মানুষের ছবি দেখে, চোখের পলক ফেলতে পারল না। হয়তো বনদেবী—টেবি হবে, অথবা এই মহানগরীর দেবী, যে রাতে বুড়ো মানুষটার কষ্টের কথা ভেবে না—এসে থাকতে পারেনি। সে বলল, মা—জননী!

সোমা বলল, খুব শীত না!

খুব মা—জননী।

কোথায় থাক?

এই ফুটপাতে মা—জননী।

তোমার কষ্ট হয় না?

কষ্ট! ওর মুখ এত ছোট, আর এত রেখা মুখে এবং এত বেশি শীর্ণ যে বোঝাই যায় না, কষ্টের কথা শুনে হাসছে, কী অবাক হচ্ছে, অথবা কষ্টের কথা শুনে কেঁদে ফেলছে। দাঁত না থাকলে বোধহয় মানুষের মুখ শিশুর মতো হয়ে যায়। সোমা পাশে বসে দুটো একটা পাতা আগুনে ফেলে দিতে থাকল।

তোমার নাম কী?

আমার নাম! ভুলে গেছি!

ভুলে গেছ মানে!

বিশ—বছরের ওপর মা জননী, আমার কী নাম কেউ জিজ্ঞেস করে না। কেউ ডাকে না আমার নামে। আমি যে কী এখন জানি না।

সোমা ওর কথা সব বুঝতে পারছে না, কথা বললে থুথু ছড়াচ্ছে।

সোমা সামান্য সরে বসল। আগুন জ্বলছে, এবং এমন একটা নিরিবিলি মাঠে, কেউ শেষ রাতে ঘুমোতে না পেরে আগুন জ্বেলে জ্বেলে বসে থাকবে ভাবা যায় না। এবং এ—ভাবে দূরে দূরে সে দেখল পর পর গাছের নীচে আগুন, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, সব মশালের আগুন, ধীরে ধীরে এত বড় শহরের ধার্মিক নাগরিকদের অজ্ঞাতে এটা জ্বলে উঠছে। সকাল হলে, ট্রাম বাস চললে কেউ টেরই পায় না, গাছের নীচে, অথবা ওদের কিছু নির্দিষ্ট জায়গা আছে, সেখানে ওরা শীত থেকে বাঁচবার জন্য আগুন জ্বালায়।

সোমা বলল, এখানে আগুন পোহাতে কেউ আসে নি?

বুড়ো লোকটা কি দেখল সোমার চোখে। বলল, দুটি ছোড়া আসত। চোখে—মুখে বদজাতি, ওরা আমার পাতাগুলো একসঙ্গে আগুনে ফেলে দিত। দাউদাউ করে জ্বলেই নিভে যেত আগুন। আবার শীত। আমি এখন লাঠি নিয়ে বসে থাকি। ওরা আসতে সাহস পায় না।

সোমা বলল, তাহলে কেউ আসে না আগুন পোহাতে?

আসে। সে আসে।

সে আসে!

সে আসে। কি নাম জানি না। সন্ধ্যার পর সে আমাকে, কিছু খড়কুটো দিয়ে যায়। কখনও খাবার।

কখন আসে?

ঠিক থাকে না। দুদিন তিনদিনের খড়কুটো দেয়। খাবার পাঠিয়ে দেয় কখনও। সে নিজেও আমার সঙ্গে খাবার ভাগ করে খায়।

দেখতে কেমন?

খুব ভাল। চোখ বড় বড়। লম্বা মানুষ, কালো রঙের প্যান্ট পরতে ভালবাসে। সাদা হাফশার্ট।

চোখে কেমন একটা মায়া আছে তার, তাই না?

খুব। সে এলেই আমার আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়!

আজ সে এসেছিল?

এই কিছুক্ষণ আগে সে এসেছিল। সে ডেকে আমাকে উঠতে বলে দিল। শরীরে হাত দিয়ে বুঝেছিল, ঠাণ্ডায় মরে যাব, সে আগুন জ্বেলে বসে থাকতে বলল, শীতে আমার মরে যাবার কথা। আগুন জ্বেলে রাখলে শীতে আমি মরে যাব না। সে এমন বলল।

তুমি ওর নাম জান না?

না।

নাম বলে না?

না।

সোমা কেমন আশ্চর্য হয়ে যায়। পৃথিবীতে এমনও মানুষ আছে। সে এক হাতে গায়ের চাদরটা কাঁধে তুলে নিল। এখন মনে হচ্ছে সত্যি ভীষণ হিম ঠাণ্ডা। সে গলায় চাদর জড়িয়ে দিল। হাত পা ওরও যেন ক্রমে অবশ হয়ে যাবে, শীতে খোলা আকাশের নীচে বসে থাকলে এমন হবারই কথা। সাদা জ্যোৎস্না ক্রমে মরে আসছে। বোধহয় নদীতে একটা জাহাজ নোঙর তুলে তখন সমুদ্রে যাবে বলে সিটি দিচ্ছে। এবং দূরে দূরে, এই যেমন নদীর ওপারে সব চটকলের চিমনি থেকেও সাইরেন বাজছে। চারটা বেজেছে। সে ঘড়ি দেখে বুঝল, ঠিক তাই। রসুল কোথায়? সে পিছন ফিরে দেখল, একটু দূরে মাঠের ভিতর রসুল ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে আর বসবে না ভাবল, যেন কী একটি সূত্র পেয়ে গেছে, তাকে সে ঠিক খুঁজে পাবে না। না পেলে শান্তি পাবে না, এই সেই লোক হবে, যে কফি—হাউসে অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়েছিল। ওর নাম কি অঞ্জন!

সোমা বলল, একটা কথা তুমি আমার হয়ে ওকে বলবে?

কি কথা মা—জননী?

ওর নাম অঞ্জন কিনা জানবে তো!

আমি তো কারো নাম জিজ্ঞাসা করি না মা—জননী।

কেন কর না?

নাম মানুষের একটাই থাকে।

সে আবার কেমন?

নাম মানুষের দুটো হয় না।

সে কেমন?

না মানে সে মানুষ, আর কিছু নয়।

তাকে তুমি নাম জিজ্ঞাসা করেছিলে কোনোদিন?

না।

তবে একবার বলতে আপত্তি কী?

আপনি মা—জননী, ওর নাম বললেই কী চিনবেন?

চিনব না কেন? অঞ্জন বলে কেউ আছে কিনা জানতে চাই।

কেন আপনার এমন জানতে ইচ্ছা হয় মা—জননী?

সে যে আমাকে খুঁজছে।

সে না আপনি?

সে একই কথা।

আচ্ছা এবার দেখা হলে বলব।

বলবে কিন্তু। সোমা উঠে দাঁড়াল।

আপনি আবার কবে আসবেন?

আসব।

আসার সময় কিছু খড়কুটো নিয়ে আসবেন। ওর অনেক কাজ। কিছু কাজ আপনি করে দিলে, সে বেশি আমাদের জন্য সময় পাবে।

বুড়ো লোকটার কথা খুব স্পষ্ট নয়। সোমা সব না বুঝলেও মোটামুটি কথাবার্তা বলে বুঝেছে, এখানে কেউ আসে। বুড়ো লোকটা নিজের সম্পর্কে কিছু বলেনি। সে বুড়োমানুষ এই পর্যন্ত বলেছে। না বললেও কোনো ক্ষতি ছিল না, বুড়ো মানুষের রকমফের আছে, তার যেন তাও নেই। সে একেবারেই বুড়ো। বুড়ো হলে যা

হয়। শীত করে, মানুষের অবহেলা তখন বাড়ে। বুড়ো হলেই নদীর পাড়ে বসে থাকতে হয়। কেউ আসবে কথা থাকে।

বুড়ো মানুষটা তাকে এসব বলতে পারত। কিন্তু সে তা না বলে, কিছু খড়কুটো আনতে বলছে! খড়কুটো আনলে লোকটা আরও বেশি কাজ করার সময় পাবে।

সোমা কেমন ঝোঁকের মাথায় হাঁটছে। এই বড় শহরের মাঠে, রাত শেষ হতে থাকলে একটা আশ্চর্য নিঃসঙ্গতা দেখা দেয়। সোমা দেখতে পাচ্ছে, ঘাসের জলে ওর চটি ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। এবং ওপরের নক্ষত্রেরা একে একে আকাশ থেকে কেমন ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল। ওরা ক্রমে সেই অবলুপ্তির পথে, সোমা বোধহয় টের পাচ্ছে অজস্র শিশিরকণা হয়ে এইসব ঘাসে ঘাসে অথবা কোনো কুটিরের মাথায় ঝরে পড়ছে। কুটিরে কী অঞ্জন থাকে!

এই যে এক কথা, অঞ্জন, অঞ্জন, কে সে? কেন সে মনে করতে পারছে না, কে আসে এই মাঠে, সেই মানুষটা কী আসে, অথবা সে কী জানে, কাছাকাছি জায়গায় সোমা থাকে, সে কী কোনো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সোমাকে দেখতে ভালোবাসে।

আবার মনে হয় অকারণ খোঁজা। এত রাতে ও—ভাবে ওর বের হয়ে আসা উচিত হয়নি। মাথা ঠিকঠাক আছে তো! কেমন সে নিজের কাছেই বোকা হয়ে গেল, সে এটা কী করছে! গোপনে এ—ভাবে চলে আসা ঠিক হয়নি! ছিঃ মনীষ জেগে গেলে কী ভাববে। মাঝে মাঝে এ—জন্য মনে হয় মাথার ভিতরটা কেমন করছে। কেন যে সে কফি—হাউসে মরতে গিয়েছিল।

একটু পা চালিয়ে হেঁটে গেল। সে এখন দেখতে পাচ্ছে, দুটো একটা শেষ রাতের ট্রাম বড় শহরের ওপর দিয়ে কেমন মায়াবী হরিণের মতো চলে যাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে অজস্র ঠান্ডায়, এক শীতকাতুরে বুড়ো তখনও একটু একটু করে আগুন জ্বেলে যাচ্ছে বাঁচবে বলে। আর সেই সব মহামহিম নাইটগণ পাপ অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

ওরা টের পেয়েছে, এরা থাকলে, পৃথিবীতে পাপ বেড়ে যায়। মধ্য রাতে ওরা চলে আসে। অথবা দুপুরে, কোনো শিমুল গাছে ফুল ফুটলে বোঝা যায় সকালে সেই মহামহিম নাইটগণ, গাছের নিচে আগুন জ্বেলেছিল, এবং এ—পথেই তারা পাপ অন্বেষণে চলে গেছে।

এ—সব যে কেন মনে হয় সোমার। সে দেখল, একটু দূরে রসুল। সে পরেছিল খাকি শার্ট। ওর পায়ে বুট জুতো, এবং সে প্রায় সিপাইর মতো মুখে একটা হামবড়া ভাব নিয়ে হাঁটছে। সে আছে, ভয় নেই, কার এমন হিম্মত আছে, কী যে বিশ্বাসী মুখ রসুলের। ওর বয়স খুব বেশি নয়, চল্লিশও বোধ হয় হয়নি, ওর কী মনে হয় না সোমার শরীরে তাপ আছে, ওর কী বিশ্বাস হয় না, সোমার অনেক কিছু ইচ্ছা হয়। এমন একা মাঠে মানুষ এত বিশ্বাসী থাকে কী করে! এবং এসব মনে হলেই সে বুঝতে পারে পৃথিবীতে কিছু—না—কিছু সবাই ভালো কাজ করতে চায়। সবার লোভ একরকমের না। মনীষ কেন যে এমন হয় না, অথবা অঞ্জন কে! সে যে কেন মূর্ছা গেল!

সদরে এসে মনে হল, গাড়ি বারান্দার ওপরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। এখন কাক জ্যোৎস্না। চারপাশের আলো নেভানো। কেবল সদরে আলো জ্বালা থাকে, মনে হল তার মনীষ হয়তো জেগে গেছে। জেগে গিয়ে বিছানায় দেখতে না পেলে ভেবে থাকে, বাথরুমে গেছে। অবশ্য সে খুব কুঁড়ে লোক, বিছানা থেকে উঠে দেখার ইচ্ছা হয় না ভিতর থেকে দরজা বন্ধ আছে কিনা, এটা ওর স্বভাব, শুয়ে শুয়ে সব ভেবে ফেলবে, এবং আবার ঘুমোবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় সে দেখল মনোরমা দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দায় উঠে এলেই মনোরমা আলো জ্বেলে দিল। আলো না জ্বাললেও হয়তো হত। সে ঠিক উঠে যেতে পারত। চারপাশে সকাল হবার আগে যেমন রোজ পাখিরা ডাকে, কীটপতঙ্গের আওয়াজ পাওয়া যায়, এবং যা শুনলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবা যায় সকাল হয়ে যাচ্ছে, তেমনি সব শব্দ, বাগানে, আতাফল গাছটার পাশে এবং মনে হয় সকাল হবে বলেই

মনীষ হয়তো গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আর তারপরই যা মনে হল, এটা শীতকাল, শীতকালের এমন ঠান্ডায় মনীষ কিছুতেই গাড়ি বারান্দায় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, ওর ভিতরটা এমন মনে হতেই কেমন কিঞ্চিৎ কেঁপে উঠল, তারপর আর যা সে ভাবতে পারে, হয়তো সে লক্ষ্য রাখছে, কোথায় যায় সোমা, কখন আসে, এবং অলক্ষ্যে এসব হলেই চেপে যাবার কথা।

সোমা নানাভাবে ভাবছিল, সে কেন গেল, অথবা সেই মাঠে কে আসে, গাড়ি বারান্দায় কে দাঁড়িয়েছিল, যে কেউ আসতে পারে—যা সময়, কোনো নাইট কী আবার অলক্ষ্যে এমন একটা বাড়ির ভিতর পাপ অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। সে এমন ভেবেই নিজের মনে হেসে দিল। কীসব আজেবাজে চিন্তা। আসলে মনীষই দাঁড়িয়েছিল। হয়তো মনোরমার মুখে শুনেছে, রসুলকে নিয়ে দিদিমণি কোথায় বের হয়ে গেল, গাড়ি নেয়নি। পাশাপাশি ওর কোনো বান্ধবীর কাছে, বিপদের কথা জানাতে যেতে পারে, অথবা ওর মায়ের কাছে, সে ঘুমিয়েছিল বলে সোমা ডাকেনি। এবং এ—সব ভাবতে ভাবতে সে একসময় মনোরমাকে বলল, দাদাবাবু কখন জেগেছে রে!

উনি তো জাগেননি। সেই থেকে ঘুমোচ্ছে।

মানে!

ঘুমোচ্ছে। আমার ঘুম এল না। আপনার জন্য ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে থাকলাম।

তুই জানিস না?

কি জানি না?

ও উঠেছে। গাড়ি বারান্দায় ছাদে দাঁড়িয়েছিল!

কখন!

এক্ষুনি। ভিতরে ঢোকাবার সময় দেখলাম।

কী বলছেন দিদিমণি!

সোমা ভিতরে ঢুকে অবাক। মনীষ শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ওষুধ ভীষণ কাজ দিয়েছে। সে, কী দেখল তবে! ওর মনে হল, মনীষই দাঁড়িয়েছিল, ওকে ঢুকতে দেখে ফের এসে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমের ভান করছে। সে এবার পাশে বসল। মাথায় ওর হাত রাখল। ওর চুল ঘন। এবং নুয়ে যখন দেখল, না এটা অভিনয়ের মুখ নয়, সত্যি সত্যি ঘুমোচ্ছে, তখন কেমন সে গুম হয়ে গেল।

মনোরমা বলল, লোকটা কেমন দেখতে?

মনোরমার এত উৎসাহ সোমার ভালো লাগছিল না। সেতো মনোরমাকে জানে। সে বলেই ভুল করেছে। এখন মনোরমা কথায় কথায় এটা কতদূর যে নিয়ে যাবে!

সোমা ধমকের সুরে বলল, চুপ করতো! কিছু ভালো লাগছে না।

তাতো ভালো না লাগবারই কথা দিদিমণি! কী যে হবে! ঐ তো শুনলাম, মাঠের ধারে দুজন ছেলেকে কারা মেরে ফেলে গেছে!

কবে?

কবে আবার, দু তিনদিন আগে।

সোমা বলল, তাতে তোমার কী?

বা আমাদের কিছু নয়। যখন তখন যাকে তাকে মেরে ফেলবে! বিচার নেই!

সোমা আর কথা বাড়াল না। সে ভাবল বলে দেবে, তুমি বাপু আমাদের কথা দু কান করবে না। তোমার যা স্বভাব। তুমি এ—সব কথা দু কান করলেই দাদাবাবুর কানে উঠবে। মানুষটা ভয়ে এমনিতে ঘুমোতে পারছে না, আর এ—সব শুনলে একটা ফ্যাসাদ হয়ে যাবে। সোমা এবার খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, কী দেখতে কী দেখেছি!

তা বলে কী একটা ভালো মানুষ খুন হয়!

হয় না?

কী করে হয়। আঁধারেও যে দিদিমণি বেড়ালকে বেড়ালই মনে হয়।

তুই চালাক বলে মনে হয়। তোর মতো সবাই অত চালাক নাও হতে পারে।

মনে হল না, মনোরমা খুব একটা বিশ্বাস করছে। ওর ধারণা, যা দিনকাল, যেভাবে চিঠি দিয়ে গেছে, ঠিক একটা কিছু হবে। এবং কারও ক্ষমতা নেই দাদাবাবুকে রক্ষা করতে পারে। এই যে চারপাশে এখন এত নিরাপত্তা, দাদাবাবুর বালিশের নিচে কী একটা থাকে, কিন্তু দাদাবাবু জানে না, ওরা এমন লোক যে, কী করে কখন মনোরমাকেই ফুসলে ফাসলে হাত করে ফেলবে, এবং দাদাবাবু তখন দেখবে, ওর সামনে মনোরমা বীরাঙ্গনা হয়ে গেছে। ওরা কীভাবে কী করবে কেউ বলতে পারে না, আর তখন কী না দিদিমণি সব উড়িয়ে দিচ্ছে!

সোমা দেখল, মনোরমা নিচে নেমে গেল। ঠিক নেমে গেল, না, এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে কিছু খুঁজছে বোঝা গেল না।

আর সোমা নিজেও অবাক, কেমন নিশ্চিন্তে, বসে রয়েছে। ঘুরে ফিরে দেখা দরকার। ওটা মানুষ, না তার ছায়া, না কোনো মরীচিকা, অথবা চোখের ভুল, সে যে কী করবে এখন বুঝতে পারছে না। কেবল নিচে নেমে রসুলকে ডেকে পাঠাল। রসুল এলে বলল, কেউ বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে?

নাতো।

খুঁজে দ্যাখ তো। মনে হয় কেউ দাঁড়িয়েছিল। ওর কানে যেন কথাটা না ওঠে।

কখন দেখলেন?

যখন ঢুকলাম।

কোথায়?

গাড়ি বারান্দার ছাদে। রসুল আর সোমা যেতে যেতে কথা বলছিল। সকাল হয়ে গেছে। এখন ঘরের দরজা জানালা খুলে দেওয়া যায়। রোদ আসবে। অথবা শীতের বাতাস বয়ে গেলে ফুল ফুটে থাকার কথা, কিন্তু কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। সব ফাঁকা।

আমি তো কিছু দেখলাম না।

হয়তো লক্ষ্য করনি।

দাদাবাবুর ঘর থেকে আলো এসে পড়ছিল।

তা আলো আর মানুষ কখনও এক হয় রসুল!

তা অবশ্য হয় না।

ওরা এ—ভাবে বাগানের ভিতর ঢুকে গেল। বাগানটা খুব বড় নয়। ছোট। জ্যোৎস্নারাতে বড় ইউকালিপটাস গাছের নিচে মাঝরাতে দুজনে ওরা কত যে চুপচাপ বসে থেকেছে! চারপাশে উঁচু পাঁচিল। মাধবীলতার ছায়া কোথাও ঘন। লালবর্ণের গোলাপ কোথাও ফুটে আছে। শীতে গোলাপের পাপড়ি ভারী হয়। কুয়াশার জলে পাপড়িগুলো কেমন কুমারী মেয়ের মতো পবিত্র থাকে। সে দেখল, না, কোথাও সে নেই। সেই গাড়ি বারান্দার কাছে যে মানুষটা দাঁড়িয়েছিল, কেমন ভোজবাজির মতো বাড়ি থেকে উধাও। সোমার ভীষণ শীত করছে। ভিতরে ওর ভয় আদৌ ছিল না। অথচ সে নিজেই কেমন তখন শীতকাতুরে ভীতু মুখ করে ওপরে উঠে গেল। জানালায় রোদ এলে দাঁড়িয়ে থাকল। একটু পরেই কাগজ আসবে। রেডিয়ো ভয়ে খোলা হয় না। কাগজটাও আজ থেকে লুকিয়ে রাখতে হবে। সে কাগজটা না খুলেই ভাবল, ক উইকেট ডাউন?

সে জবাব দিল, একটাও না। ঈশ্বর, যেন একটিও না হয়।

কিন্তু খুলে দেখল, বহরমপুরে তিন, ডেবরাতে চার, কলকাতা এবং তার চারপাশে চোদ্দ। সে কাগজটা বন্ধ করতে গিয়েও পারল না। একটা ছবি ছাপা হয়েছে। ওকে পুলিশ খুঁজছে। ছবিটায় চোখ দুটো, কফি—

হাউসের চোখ দুটো আরও কী যেন...সে বোধহয় ফের সংজ্ঞা হারাত। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি জানালা ধরে ফেলল।

দশ

বাড়িটা কেমন নিঝুম লাগছে। মনীষ ঘুম ভেঙে গেলে দেখল, জানালায় চুপচাপ সোমা দাঁড়িয়ে আছে। কী দেখছে যেন। অপলক। ঘুম ভাঙলে শরীরে ভীষণ জড়তা থাকে। এবং চিঠি পাবার পর থেকে জড়তা কেমন ভীষণ বেড়ে গেছে, উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সবকিছু ফাঁকা, নিরিবিলি, এ—ভাবে বেঁচে থাকার মানে হয় না, এবং কেমন সবকিছুর ওপর বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা হয়, দেশের মানুষ, পুলিশ, সরকার সবকিছুর ওপর। সাংঘাতিক সাংঘাতিক ঘটনা, এবং সে নিজের গলায় হাত দিল। আর এ—ভাবেই বোধহয় মনে পড়ে যায়, কী কী ঘটেছে, কীভাবে সব হত্যা, অর্থাৎ কীভাবে সব মানুষের গলা কেটে দেওয়া হচ্ছে। কেউ কিছু করতে পারছে না। দিনদুপুরে হাজার মানুষ যাচ্ছে, তার ভিতর তিনজন ওরা অথবা চারজন, সবাইকে বলছে সরে যান, আমরা এর গলা কেটে দেব। আর সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের জানালা দরজা বন্ধ, রাস্তা ফাঁকা। যে যার মতো পড়িমরি ছুটছে। ভাবলেই চোখমুখ ঘোলা ঘোলা হয়ে যায়। চিঠির কথা মনে হয়। কথা আছে ওরা আসবে। ওরা আসবে কথা থাকলে আসেই।

ওর এখন যা যা করণীয়, সে উঠে পড়ে ঠিক করে নিল। অন্য দিন সোমা জানলায় দাঁড়িয়ে থাকলে, তাকে পাশে নিয়ে সেও দাঁড়াত। কথা বলত। বাগানের সব নানাবর্ণের ফুলের সঙ্গে সোমার অঙ্গ—প্রত্যঙ্গের তুলনা দিতে ভালোবাসত। যেমন একটা লাল তাজা গোলাপের মতো ওর সুন্দর সুষম জায়গা, নরম তাজা, এবং লাল গোলাপ চটকালে যে মধুর ইচ্ছা কাজ করে বেড়ায় তেমন ইচ্ছায় কথা বললে, সোমা বলত, তুমি ভারি অসভ্য।

এ—মুহূর্তে সে আর সোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না। বুকের ভিতরে সেই একটা কষ্ট, কেমন থেকে থেকে ধক করে উঠছে। এমন তো ওর কখনও ছিল না। সে, সোমাকে আজও প্রশ্ন করতে পারত, কিন্তু করে লাভ নেই। বরং সে ভেবেছে, এখন যে যে জায়গায় তার পরিচিত ব্যক্তিরা হত্যা হয়েছে, সব জায়গায় সে এক এক করে জিজ্ঞাসা করবে, প্রত্যেকে চিঠি পেয়েছিল না চিঠি পায়নি, চিঠি পাবার পর ওরা কতদিন সাধারণত দেরি করে থাকে, অথবা যারাই চিঠি পেয়েছে, তারাই নিহত হয়েছে, না কেউ কেউ রেহাই পেয়েছে, এবং সেটা শতকরা কী দাঁড়ায়, সেজন্য সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে গেল। কিন্তু বাথরুমে ঢুকেই মনে হল, সোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি, সে আবার দরজা খুলে বের হয়ে এল! কিন্তু সোমা তখনও জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। এটা কেন হবে, সে সোমার পাশে গিয়ে ডাকল। কেমন অহেতুক একটা জড়তা শরীরে সোমার। সর্বনাশ এটা কী! সোমা, সোমা! আশ্চর্য তো, সোমার হুঁশ নেই।—এই সোমা!

সোমা বলল, হুঁ।

তুমি কী দেখছ?

কিছু না।

তুমি এমন শক্ত হয়ে যাচ্ছ কেন?

আমি শক্ত হয়ে যাচ্ছি!

হ্যাঁ। তোমার কী হয়েছে?

কিছু না।

এ—ভাবে কেউ দাঁড়ায়। এসো, বসবে।

সোমাকে ও খাটের দিকে ধরে ধরে নিয়ে গেল।—কী হয়েছে?

কিছু না।

ঠিক করে বল!

কিছু না।

তুমিও শেষে এমন করলে আমি কী করি!

আমি কী করেছি!

তুমি আয়নায় এসো, চোখ দেখবে।

আমার চোখ, কী!

চোখ ঘুরছে না!

কী যে বল!

সত্যি। একেবারে স্থির।

এটা হয়েছে বুঝি!

অ মাই গড। আমি কী করব।—অসিত, অসিত, সে জোরে চিৎকার করে উঠল ফোনে।

এই সকালে! কী হয়েছে?

শিগগির আয় ভাই!

অ্যাকসিডেন্ট!

না, তার চেয়েও বেশি। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ডাকল, মনোরমা, চিৎকার করে উঠল, মনোরমা! মনোরমা এলে দেখল, কেমন স্থির চোখে শুয়ে আছে দিদিমণি। চোখ দেখেই টের পেয়েছে, ভীষণ ভয় পেলে মানুষের এমন হয়ে থাকে। সে তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল এনে, চোখে পরপর ঝাপটা দিতেই কেমন, চোখ ঘুরতে থাকল। সোমা দেখল পাশে দাঁড়িয়ে আছে মনীষ। সে কেমন বোকার মতো বলল, আমার কী হয়েছিল, চোখে জলের ঝাপটা দিলে কেন!

মনীষ বলল, শুয়ে থাক। উঠতে হবে না। কিছু হয়নি।

কিছু হয়নি তো শুয়ে থাকব কেন! জোর করে শুইয়ে রাখতে চাও?

না, জোর করে না। তোমার শরীরটা ভালো না। তোমার বিশ্রামের দরকার।

সে হবে। সারাদিনই তো তার জন্য আছে। রাত্রিটা আছে। আমাকে একবার বের হতে হবে।

সোমা উঠে বসল।

প্লিজ সোমা। আমার কথা রাখো।

আমাকে এক্ষুনি একটু বিনুর কাছে যেতে হবে।

লোক পাঠাচ্ছি বিনুর কাছে। ওকে নিয়ে আসুক।

শুধু বিনুর কাছে গেলেই হবে না। অন্য অনেক জায়গায় যেতে হবে। আমার অনেক কাজ মনীষ।

সোমা!

সত্যি বলছি। তুমি ভাববে না।

তোমার চোখ কোথায় চলে গেছে!

সে তোমারও।

আমার আবার ঠিক হয়ে যাবে।

আমারও।

সোমা, অসিতকে অন্তত আসতে দাও।

কিন্তু ততক্ষণে বিনু যদি বের হয়ে যায়।

বিনুকে বাড়ি থাকতে বলে পাঠাচ্ছি।

সোমা বুঝতে পারল, অসিত না আসা পর্যন্ত সে বের হতে পারছে না। ঘরের দামি আসবাবপত্রের মতো আর সোমাকে মনে হচ্ছে না। কেন যে এক রাতেই শ্রীহীন হয়ে গেছে। সে যে রসুলকে নিয়ে শেষ রাতের

দিকে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে, মনীষ জানে না। জানলে আরও ঘাবড়ে যাবে।

আর মনীষ পাশের একটা ডিভানে বসে কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। রাতের পোশাক এখনও শরীরে। অসিত আসার আগে বাথরুম থেকে বের হয়ে আসতে হবে। অসিত না এলেও কোনো ক্ষতি নেই। যে—ভাবে সোমা এখন স্বাভাবিক, তাতে অসিত হয়তো এসে বলতে পারে, আমাকে তুই কী এপ্রিল ফুল করলি। এখন সে এলে কী যে বলবে! তবু ওর মনে হল সব খুলে বলাই ঠিক। অঞ্জনের কথা সে খুলে বলবে। সারারাত সে কাল ঘুমিয়েছে বলবে, তারপরই মনে হল, না ঘুম ঠিক হয়নি, কেমন তন্দ্রার মতো, যেন অসাড় অবশ, শুধু শুয়ে থাকা চোখ বুজে, চারপাশে কী হচ্ছে সব সে বুঝতে পারে, কেবল কথা বলতে পারে না, চোখ খুলতে পারে না, এবং এক সময় মনে হল শেষ রাতের দিকে সোমা নিচে নেমে গিয়েছিল, কেমন সে অনায়াসে এ—সব মনে করতে পারে, একটু মনের ভিতর ডুবে গেলেই যেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘুমের ভিতর এই বাড়িতে কী হয়েছে, কটা কীটপতঙ্গ ডেকেছে, একটা বেড়াল কখন ম্যাউ ম্যাউ করে গেছে সে সব বলতে পারে এবং এমন ভাবলেই কেমন সোমার জন্য এসব হচ্ছে টের পায়। কী দরকার ছিল, সেই লোকটার দিকে তাকানো, সে লোকটা কে! সোমা কি শেষ পর্যন্ত মনে করতে পারছে, সে কে? কোথায় তাকে দেখেছে!

মনীষ বাথরুম থেকে ফিরে ভাবল, সোমাকে বলবে, সোমা, তুমি চিনতে পারলে তাকে। কিন্তু সোমা এই অবসরে, ভীষণ সেজেছে। ওর নখে সাদা নেল পালিশ। বোধহয় সকালেই সেসব পোশাক পালটে কী পরবে ঠিক করে রেখেছিল। সে মুখ গালে এমন রঙ মেখেছে যে একসময় মনে হল মনীষ নিজেই হেসে দেবে। সোমা এমনিতেই ভারি সুন্দর, তাকালে মনে হয় সে সব দেখে ফেলছে মানুষের। মানুষেরা তাকালে মনে হবে, এক নদী বয়ে যায়। নিরন্তর গাছপালার ভিতরে সেই নদীর নীল জল ভারি গভীর। তবু এমন সাদা কেন। সেই যে মানুষটা, সে কী জেনেছে, সোমার এই ভারি চোখ, অথবা স্পষ্ট বাহু, এবং নাভিমূলে যে আশ্চর্য নীল জলের খেলা সব তার চেনা। নতুন কিছু সোমা তাকে দিতে পারে না। দিতে না পারলেই যা হয়, জ্বালা, ভিতরে জ্বালা কী যে মনে হয় নিজেকে, যেন সংকোচের শেষ নেই, নানাভাবে সেজেও মনে হয় ঠিক সাজা হল না, হয়তো সে দেখে তার দিকে তাকাবেই না। মনীষ বলল, এই সাত সকালে এমনভাবে সানফ্লাওয়ারের মতো ফুটে থাকলে!

সোমা বলল, সত্যি।

মনীষ পাশে গিয়ে বলল, ভীষণ খারাপ লাগছে।

ভীষণ খারাপ লাগছে কেন!

আর একটু হলে হেসে দিতাম। বলেই সে ঠোঁটে চুমু খেল। লক্ষ্মী মেয়ে, অসিত আসছে। মুখের রঙ ধুয়ে ফেল, তোমার নিজের এমন সুন্দর রঙ থাকতে কেন যে ছাইপাঁশ মাখা বুঝি না। ভীষণ ভালো তুমি। তুমি পরিষ্কার হয়ে এসে বোসো।

আর তখনই মনে হল কেউ উঠে আসছে। নিচে কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মনীষ বাইরে বের হয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াল। সিঁড়ির মুখে পার্লারে বসাল অসিতকে এবং তারপর ডেকে যখন সাড়া পেল সোমার, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে, সোমা এল সাধারণ বেশে। সোমাকে মনীষের আবার সুন্দর লাগছিল। আসলে সোমার চারপাশে থাকে বর্ণময় এক গন্ধ। ছুঁয়ে দিতে পারলেই যেন লাভ, কী যে মিহি শরীর, অথচ কী দেখে এমন হয়ে গেল! এবং মনীষ অসিতকে সকালের ঘটনা বলে কী ভাবল, তারপর সোমাকে ছেড়ে দিল। সিঁড়ি ধরে নামার সময় অসিত বলল, হিস্টিরিয়ার মতো কিছু একটা হচ্ছে।

তুই একবার ডাক্তার অমিতাভ চৌধুরীকে দেখাতে পারিস। মন—টনের ব্যাপারটা তিনি ভালো বোঝেন। বলেই বলল, তুই কেমন আছিস?

ভালো।

আর চিঠি এল?

না।

সব বাজে। আজকাল অনেক উড়ো চিঠি আসছে। তবে সময় খারাপ। বড় খারাপ। সে তারপর বলল, যাই হোক, সাবধানে থাকিস। আর নামতে নামতেই যেন মনে পড়ে গেল। বলল, সোমা লোকটাকে চিনতে পারল?

না।

কিছু বলছে না?

কী বলবে। সকালে মূর্ছা যাবার আগে কিছু একটা নিশ্চয় দেখেছিল।

সেটা কী?

আমি জানি না।

তুই জানিস না মানে! তুই তখন কোথায় ছিলি?

ঘরেই।

তবে?

আমি কী করে বুঝব, দাঁড়িয়ে সোমা মূর্ছা যেতে পারে। কী করে বুঝব বাজ—পড়া মানুষের মতো সোমা দাঁড়িয়ে আছে।

দেখে বুঝতে পারিসনি?

সকাল বেলাতে রোদ আসার আগে ওর তো অভ্যাস, জানালায় দাঁড়ানো। আজও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ভাবলাম। ঘুম থেকে উঠেই ভাবলাম, একবার শান্তিবাবুর কাছে যাব। তারপর যাব সমরজিতের কাছে। ফোনে এ—সব কথা হয় না। গরজ আমার, নিজেই যাব ভাবছি।

ওরা গাড়ি বারান্দায় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। পাশে একটু দূরে ড্রাইভার। মনীষ আস্তে আস্তে মুখোমুখি কথা বলছে। অসিত সময় দিয়ে শুনছে। যেন কেউ শুনতে না পায়, শুনলে আবার দুকান হবে, সে সন্তর্পণে বলছে, শান্তিবাবুদের নাকি একটা লিস্ট টানিয়ে দিয়েছে!

কীসের লিস্ট?

কীসের লিস্ট আবার। লাল কালির লিস্ট।

কে কে আছেন?

প্রায় একুশ জনের নাম আছে।

—সবাই অধ্যাপক!

সবাই। কেউ আরও উঁচুতে।

এইসব নিরীহ মানুষদের মেরে কী হবে!

জানি না।

তুই এখন ওখানে যাবি?

না গিয়ে উপায়! এখন কাউকে কিছু বিশ্বাস করে বলাও যায় না। কে যে কার লোক! আর জানিস সবসময় ভয় হয়, কেউ আমাকে ফলো করছে।

অসিত কিছু বলতে পারল না। কারণ সে সঠিক বলতে পারবে না কী ঘটনা। সে শুধু সাবধান করে দিতে পারে। সে আর বলতে পারে না, শুধু মিথ্যা ভয় দেখানো। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থার জন্য হয়তো শান্তিবাবুরা যাবেন। ওদের তিন মাসের সময় দেওয়া হয়েছে।

অসিত একটু ভেবে বলল, তোকে কোনো সময় দেয়নি?

না।

পুলিশে চিঠিটা দিয়ে দে।

কী হবে! ওরা তো তবে আরও ক্ষেপে যাবে। আমি চেষ্টা করছি ভালো হবার। যারাই পুলিশে কেস দিয়েছে কেউ বাঁচেনি। ওদের ভিতরও লোক আছে। তাছাড়া ওরা নিজেরাই তো নিজেদের রক্ষা করতে পারছে না।

চেষ্টা করছিস?

কী করব! ভেবেছি আজই গিয়ে সব চর্বিটর্বি নষ্ট করে দিতে বলব। মিনারেল অয়েল আর ব্যবহার করতে বারণ করব। তারপর কপালে যা হয়। মুশকিল কী জিনিস, ঠিক মাপ দিলে দামে পড়তা আসে না। এত লোক কাজ করে, ওদের পয়সা তবে দেব কোত্থেকে!

অসিত বলল, হ্যাঁ ভাববার কথা।

—ভাববার কথা না! কেউ এখন প্রকৃতিস্থ নেই। কেন যে এমন হল!

অসিত বলতে পারত, আমরা নানাভাবে অধার্মিক হয়ে গেছি। তবে এভাবে কী এর সমাধান! এটাও সে ভাবল। সুতরাং মনীষকে সে কিছু বলতে পারল না। কিছু বলতে না পারলে যা হয়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা, ওরা চুপচাপ কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে যখন বুঝল আর কোনো এখন কথা হতে পারে না, তখন অসিত গাড়িতে বসে বলল, যা ওপরে যা।

অসিত চলে গেলে সে কেমন একা হয়ে গেল। রসুল এখন থাকে না, রাম অবতারের বোধহয় গেটে ডিউটি। কিন্তু সে এত সতর্ক থেকেও কেমন অসহায় বোধ করছে। সে এটা কাউকে বুঝতে দেয় না। সে যেমন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে থাকে তেমনি করার চেষ্টা করছে। এবং এটা যে হচ্ছে, ওর ধারণা, রসুল মনোরমা আর অসিত বাদে পৃথিবীর আর কেউ জানে না। সে ভাবল, কোনোরকমে গাড়ি করে অপরিচিত জায়গায় চলে যেতে পারলে এতটা ভয় থাকবে না। কারণ ওর মনে হচ্ছে, এই বাড়ির যেখানে সে থাকুক না, ওরা ঠিক টের পেয়ে যায়। যেন ওরা চারপাশে ওর সতর্ক নজর রেখেছে, সে কী করছে। সে আর মুহূর্ত দেরি করল না। লাফিয়ে কাঠের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে গিয়ে দেখল, সোমা খুব সাধারণ পোশাকে নেমে যাচ্ছে। মনীষকে বলার পর্যন্ত সময় দিল না, যেন কতকটা সে পালিয়ে চলে যাচ্ছে।

মনীষ এবার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ডাকল, সোমা।

নিচ থেকে সোমা বলল, বিনুর কাছে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হলে ভাববে না।

সোমা গ্যারেজের ভিতর ঢুকে গেল। গাড়ি বের করার শব্দ হচ্ছে। সবচেয়ে ভালো গাড়িটা নিয়ে বের হচ্ছে। বের না হলেই যেন খারাপ হত। সে ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়ে থাকল। সকালের কাগজে কী আছে আজ, বাড়িতে সবাই ওকে কাগজ পড়তে দিচ্ছে না। নিশ্চয়ই সোমা কাগজ লুকিয়ে রেখে গেছে। আজকে কী ঘটেছে, অথবা এ—ভাবে অকারণ হত্যা, অথবা কোথাও কি মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছে না, এমন খবর কি কোথাও নেই—সে কেবল তেমন একটা খবরই দেখতে চায়। চারপাশের জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে না, এ—ভাবে একজন সাধারণ পুলিশ, সাধারণ সুদখোরের জীবন নিয়ে কী যে হচ্ছে, অথবা ওর কথাই ধরা যাক না, সে তো সবই নিজে নিয়ে নিচ্ছে না, সবই তো যারা কাজ করে তাদের জন্য, তা বলে একটা লাভের অঙ্ক থাকবে না, ক্যাপিটেল তৈরি হবে কী করে, ক্যাপিটেল তৈরি না হলে নতুন নতুন কারখানা হবে কী করে, বেশি লোক কাজ পাবে কী করে।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে নিচ্ছে সোমা। ডিমের মতো গাড়ির আকার। সাদা, ডিমের মতো রঙ, রঙ কখনও মলিন হয় না। অনেক চেষ্টার পর সে গাড়িটা পেয়েছে। অথবা দাম অনেক বেশি দিয়েছে, তবু সোমা যখন এ গাড়িটা চড়ে সুখ পায় তখন আর টাকার দুঃখ থাকে না। গাড়িটা অর্ধেক দামে কেনা যেত। এত বেশি মাঝখানে দালাল পড়ে গেল যে সবার মুখ বন্ধ করার জন্য সে টাকার মায়া করেনি। এবং এ—গাড়িটায় চড়ে কোনো রাস্তায় বের হলে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষেরা গাড়িটার ভিতর আছে সহজেই মানুষেরা ভেবে ফেলতে পারে। সে এটা অস্বীকার করে না, সে নানাভাবে রাজার মতো যখন বেঁচে ছিল,

তখন এক অতীব বিষাক্ত কীটের উপদ্রব। একটা জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। ওকে অসুস্থ করে দিচ্ছে। সে এমন শক্ত মানুষ, তাকে কীভাবে যে দুর্বল করে ফেলেছে!

সোমা বের হয়ে গেল। গেট খুলে যাচ্ছে। সোমা, হাত নাড়ল, এটা সোমার স্বভাব। সোমা পথের ওপরে পড়েই সাঁ সাঁ করে বের হয়ে গেল। এবং মনীষ দেখল, এসময় সে ভীষণ একা, এবং ঘরের ভিতর ঢুকতে পর্যন্ত ভয় করছে। ঘর ফাঁকা পেয়ে যদি কেউ পাঁচিল বেয়ে উঠে এসে থাকে। ব্যালকনি থেকে সে নড়তে পারল না। সে এই শীতেও ঘামছে। ভিতরে ঢুকেও যদি দেখে কেউ চাদর গায়ে দাঁড়িয়ে আছে!

সে নিজেকে স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টা করছে। প্রথমে সে মৃত্যু একটি অতি সহজ ঘটনা, সে, যে—কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। সে তারপর ভাবল, ভাগ্য। ভাগ্যে লেখা থাকলে ঘটবে। কেউ রুখতে পারবে না। তারপরই ভাবল, সে কী যা তা ভাবছে। ভাগ্য আবার কী! সে তো এতদিন সোমাকে বুঝিয়েছে, পুরুষকার। সে তার বুদ্ধি এবং কৌশলের দ্বারা এমন এক অপূর্ব মণি—কাঞ্চনের ব্যবস্থা করেছে। সবাই পারে না। সবাই সে—জন্য গাড়িও চড়তে পারে না। সবার গাড়ি চড়া ঠিক না। সবাই গাড়ি চড়লে কাজ করবে কে। পৃথিবীতে কাজের লোক না থাকলে মণি—কাঞ্চন সংগ্রহ হয় না।

তারপরই মনে হল, এসবও ওর ভাবার কথা না। সে সাহসের সঙ্গে সবকিছুর সম্মুখীন হবে ভাবল। সে এক পা এগোচ্ছে আর সাহস কথাটা ভাবছে। সাহস কথাটা ওর কাছে আশ্চর্য একটি শব্দ মনে হচ্ছে। সাহস কথাটার ভিতর খুব বড় একটা ব্যাপার আছে। না হলে এমন সামান্য শব্দ, যা সে ভাবত, এমন কিছু না, এখন তাকে একেবারে গলা শুকিয়ে দিচ্ছে। সে এবার যেন না ডেকে পারল না, মনোরমা! সে ডাকল, রসুল। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। ওরা কি কেউ নেই! সে ডাকল, রাম অবতার। না, কেউ সাড়া দিচ্ছে না। সে করিডোরে ঢুকে গেল। ওর পা এগুচ্ছে না। দুপাশে দেয়ালে সব ছবি। নানাবর্ণের ছবি। সে ছবির এগজিবিশান হলেই ভালো ভালো ছবি কিনে ফেলে। একটা ইঁদুরকে ঈগলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, অথবা কোনো বনের ভিতর র‍্যাটেল সাপের ভয়ংকর মূর্তি, এসব মিলে সে ভাবল, আর ঢোকা যাবে না। ভিতরে কী আছে কে জানে!

তখনই মনীষ অবাক হয়ে গেল ভেবে, সারা বাড়িটা এ—ভাবে কখনও কখনও ভূতুড়ে হয়ে যায়। সে মরে যাবে ভাবতেই কী আশ্চর্য, এ বাড়ির চারপাশে যেন এক অতিকায় নৈঃশব্দ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় মোটরের হর্ন, মানুষজন এত, তবু মনে হচ্ছে, এখানে কিছুক্ষণের ভিতরই এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটবে। সে দ্রুত সিঁড়ি ধরে নেমে বলল, কৈ হায়।

জি হুজুর।

কেউ রয়েছে?

কোথায় হুজুর?

এই দ্যাখো তো বাগানের দিকে।

রাম অবতার বাগানের চারপাশে ঘুরে এসে বলল, কৈ, না।

মনীষ বলল, রসুল কাঁহা?

রসুল! রসুল কাহারে! হুজুর বলাতা হ।

রসুল এলে মনীষ বলল, এসো।

সে রসুলকে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল। রসুল কখনোই এত ভিতরে ঢুকতে পারে না। সে দেখে অবাক, মানুষেরা এ ভাবে বাঁচে! বেহেস্তের শামিল। তিনি ভিতরে খুট খুট করে কী করছেন। এবং কিছুক্ষণের ভিতর বের হয়ে এলে রসুল বুঝতে পারল, হুজুর কোথাও বের হচ্ছে। মনীষ একটা চাবি ওকে ছুড়ে দিল। এবং সে নিচে নেমে যখন গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে গেল, মনে হল মুক্তি। এত বড় মুক্তি সে কখনও পাবে ভাবেনি। তাকে এখন কেউ চেনে না। যেন একটা বড় বাড়ির ভিতরই তাকে চেনা যায়, তার নাম মনীষ দত্ত। হবু ক্যাপিটালিস্ট। হবু ক্যাপিটালিস্টদের ওরা বোধহয় বেশি খুঁজছে। সে প্রায় পালাবার মতো গাড়ি নিয়ে এ—গলি সে—গলি করে যেন তাকে কেউ ফলো করতে না পারে, এবং সে এ—ভাবে কখন কোথায়

কোথায় কীভাবে সে ঘুরে ঘুরে শান্তিবাবুর ফ্ল্যাটে কড়া নাড়ল, নিজেও বলতে পারল না। যখন শান্তিবাবু দরজা খুলে দিলেন, সে দেখতে পেল দেয়াল ঘড়িতে এগোরোটা বাজে। সে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল সাতটায়। শান্তিবাবুর বাড়ি পৌঁছাতে খুব বেশি চল্লিশ মিনিট। বাকি সময় ভয়ে সে কেবল একটা ইঁদুরের মতো এ—গলি সে—গলি করেছে।

এগারো

বিনু, তুই এ—ছবিটা চিনতে পারিস?

বিনু ছবিটার ওপর ঝুঁকে দেখল। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর চোখ বুজে কী ভাবল, বেশ কিছু সময় চোখ বুজে থাকলে সোমা ভাবল, বিনু হয়তো খুঁজে পেয়েছে। ওর মুখে হাসি দেখা দেবে, সে বলবে, ইউরেকা, এবং এ—ভাবে যখন দেখল বিনু চোখ বুজেই আছে খুলছে না, খুলবে কিনা তাও ঠিক নেই, তখন সোমা না বলে পারল না, কিরে চিনতে পেরেছিস?

বিনুর মনে হল, কেউ তাকে ডাকছে। সে চোখ খুলে বলল, কেউ আমাকে ডাকছে?

কে আবার ডাকবে! আমি বললাম, বিনু চিনতে পেরেছিস?

অঃ তুই। আচ্ছা, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

তা হলে দে। বলেই সোমা উঠে দাঁড়াবে ভাবল।

ছবিটার জন্যে এখানে ছুটে এসেছিস!

সে তুই বুঝবি না!

আচ্ছা এ—ছবিটার সঙ্গে কী সেই মানুষটার মিল আছে?

হুবহু এক।

কী যে মিস করলাম!

মিস করলি মানে!

তোকে দেখছিল, আমরা দেখলাম না, তোকে কে এত দেখছিল! মিস করলাম না!

এখন আজে—বাজে কথা রাখ। কী করি বলত!

তোর আবার কী করার আছে! সুন্দরী মেয়েদের অনেকেই দেখে থাকে। তোকেও দেখেছে। অঞ্জনের খোঁজখবর করতে পারলি?

না।

তোর যে কী হয়েছে! অবশ্য এমন হয়েছে আজকাল। সব মানুষই পাগল হয়ে যাচ্ছে। বিভীষিকা! আমাদের বাড়িতেই দেখ না, একটা আতঙ্ক সব সময়। কখন খবর আসবে, রমু হাসপাতালে, অথবা সে কী বলতে গিয়েও থেমে গেল। বলল, না থাক। ও—সব ভাবলে মাথা ঠিক থাকে না। আমার মতে এখন কারও সঙ্গে কথা বলা ঠিক না। চুপচাপ থাকা ভালো। মাও বোধহয় কিছু দেখতে পায়। রমুরা সবুজ মাঠে শুয়ে আছে দেখতে পায়।

সোমা বলল, চিনতে পারলি না?

না।

তবে যাচ্ছি।

বোস। গরিবের বাড়িতে একটু চা খেয়ে যা।

সোমা কী ভেবে বলল, তাড়াতাড়ি। আমি বসব না।

কোথায় যাবি?

দেখি, আর কেউ চিনতে পারে কি না!

কেউ চিনতে পারবে না। অনর্থক ঘুরে মরবি।

কিন্তু আমার কী মনে হয় জানিস, অঞ্জন আর এ লোকটি একই ব্যক্তি। জায়গায় জায়গায় নাম ভাঁড়াচ্ছে।

তা হতে পারে।

সে আবার কবে আসবে লিখেছে?

কবে আসবে কিছু লেখেনি।

বেশ ফাজিল ছোকরা।

মানে!

মানে, আমার যা মনে হয়, বড়লোকের এমন সুন্দরী বউ দেখেই একটু মসকরা করছে। আর এমন সুন্দর মেয়ের স্বামীকে কেউ মেরে ফেলতে পারে না।

তুই কী আজেবাজে বকছিস!

আজেবাজে নারে। আমি তো মানুষ চিনি। সবাই তো তোদের মতো জায়গায় যেতে চায়। যেতে ভালোবাসে। যেতে না পারলে আক্রোশ হয়। তখন সব ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। কিন্তু একবার পৌঁছে গেলে, আর মায়াবী ছবির মতো তোর মুখ দেখে ফেললে কেউ আর নিষ্ঠুরতার কথা ভাবতে পারে না। মনীষের কিছু হবে না। তোরা অনর্থক উদবিগ্ন হচ্ছিস!

সোমার ইচ্ছা হচ্ছিল, ভোর রাতের ঘটনা খুলে বলে। সব খুলে বললে, বিনু বুঝতে পারবে, কেন সে এমন অসহায় বোধ করছে। কিন্তু বিনুকে সে আর কিছু বলতে উৎসাহ পেল না। কারণ বিনু খুব সিরিয়াস না এ—ব্যাপারে। চারপাশে এমন হচ্ছে, বড়লোকের শখের ব্যাপার, একটু ভয় পাওয়া। ওদের গায়ে তো কেউ হাত দিচ্ছে না, এটা পাড়ার কোনো ফাজিল ছোকরার কাজই হবে, কারণ বিনুর কথাবার্তায় মনে হয় ফাজিল ছোকরাটি সোমার জন্য ঘুমোতে পারে না। বড় বড় শ্বাস উঠে আসে। এমন একটা দুঃসময়ে ভয় পাইয়ে দিতে পারলে বেশ মজা। এবং এ—ভাবে এক চিঠি, সুতরাং সোমার এ—সব ভয় বিনু খুব তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভেবে নিচ্ছে।

সোমা বলল, যাই রে।

চা এসেছে। চা না খেয়ে যাবি!

শুধু চা।

শুধু চা—ই দেওয়া হচ্ছে।

সোমা চা খেতে খেতে বলল, সবকিছুই বিনু হালকাভাবে নিলি?

না নিলে ভীষণ দুঃখ পেতে হয়।

তাহলে সবই তুই ভুলে গেছিস?

দুম করে সোমা এমন কথা তুলে ফেলবে সে ভাবতে পারেনি। বিনু বলল, ও—বয়সে এমন হয়। ওটা কিছু না।

চার বছরে তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ ভাবছ।

সত্যি অনেক বড়। চার বছরে কত কিছু জেনে ফেলেছি। তুই কিন্তু আজও চোখে কাজল দিলি না। কাজল দিলে তোকে বড় ভালো লাগত।

সোমা ওকে এখন তুমি তুমি করছে। বিনু সোমাকে এখনও তুই—তুকারি করছে।

সোমা বলল, কে যেন আমাকে বলেছে, সোমা তুমি কাজল পোরো না, কাজল পরলে আমার ভালো লাগে না।

সে কে!

কখনও মনে করতে পারি, কখনও পারি না। একসময় মনে হয়, যাদের ভালো লাগত, তারা সবাই আমাকে এ—কথাটা বলেছে।

তা হলে তুই বলছিস, আমাকে তোর ভালো লাগত না!

কী জানি, বুঝতে পারি না।

আমি তোকে কাজল পরতে বলতাম। কাজল পরলে তোকে খুব মায়াবী দেখাত।

সোমা বলল, কাজল না পরলে আমাকে খুব ইননোসেন্ট দেখায়, কে যেন বলত!

আমরা কেউ ইননোসেন্ট নই সোমা।

এখন মনে হচ্ছে।

অথচ দ্যাখ, কলেজ লনে আমরা কত সব বড় বড় আদর্শের কথা বলতাম!

সবাই না।

সবাইর মনে কিন্তু একটা স্বপ্ন ছিল। যেন, পৃথিবী এক আশ্চর্য জায়গা, যাও, বড় হও, ধর্মপ্রচার করো।

এখনও তো তাই আছে।

ঠিক বলছিস তাই আছে!

মনে তো হয়।

তবে তাকে খুঁজছিস কেন?

তাকে মানে?

এই যে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস। অঞ্জন না কী নাম!

কী যে বাজে বকিস না! আবার সোমা তুই—তুকারিতে ফিরে এল। চিঠি দিয়ে যে ভয় দেখিয়েছে, সে তো সেই লোকটা।

তোর কী মনে হয়, কফি—হাউসের লোকটাই অঞ্জন হবে।

হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

যদি খুঁজে পাস, কী করবি?

সোমা এ—কথার জবাব দিতে পারল না। সত্যি তো খুঁজে পেলে কী করবে! সে তো এটা ভাবেনি। সে তো ভেবেছে, যে লোকটা ওর দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল, যে চোখ দুটো ভীষণ চোখ, এবং ছবির চোখের সঙ্গে হুবহু এক, আর নাম লেখা আছে অনিমেষ, সেই কী অঞ্জন, সে কি সেই, যাদের সে ভাবত, পৃথিবীতে তারা অনেক বড় হবে। সে ভাবত, সে থাকবে, ওদের পাশে। এখন যদি খুঁজে পায়, তবে তার সঙ্গে সে কতদূর যেতে পারবে! সোমা বিনুকে কোনো জবাব দিতে পারল না।

বিনু বলল, একটা কথা বলব সোমা?

কী কথা?

আমি জানতাম, তুই কিছু জবাব দিতে পারবি না। তুই বড় হতে হতে অনেক কিছু চেয়েছিলি—মনে হয় সব পাসনি।

সে তো সবাই চায়, কেউ পায় না।

তোর না পাওয়াটা একটু বেশি।

তা বলে, তুই কী বোঝাতে চাস!

এ—ভাবে আর কাউকে খুঁজিস না। এতে বিড়ম্বনা বাড়বে।

সোমা মনে মনে রাগ করতে পারত। সে রাগ করল না। সে জানে বিনু আন্তরিকভাবেই সব বলে যাচ্ছে। সোমার মতো মেয়ের এ—ভাবে ঘুরে বেড়ানো ঠিক না। সোমা বলল, আমার যে কী হয়েছে।

—কিছুই হয়নি। আসলে তুমি ভয় পেয়ে গেছ। ভিতরে ভিতরে মনীষের কাজকর্ম তুমি অনেকদিন থেকেই অপছন্দ করছ। তুমি দেখতে পাচ্ছ, যা তুমি ঘৃণা করতে, এখন মনীষ তাই করছে। যার বিরুদ্ধে লড়বে বলে তুমি মনে মনে অনেক স্বপ্ন দেখেছ, ঠিক সেই পাপ মনীষ করছে।

না। মনীষ কোনো পাপ করেনি।

এমন কথায় কি তুমি রাগ করছ!

রাগ, নিশ্চয়ই। তুমি কী বলতে চাও এ—সব।

ভুল হলে ক্ষমা করে দেবে! বিনুর চোখ দুটো কেমন ছলছল করতে থাকল। সে কেমন থেমে থেমে বলল, আসলে আমারও মাথা ঠিক নেই, রমুর জন্য আমাদের সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে। কত আশা ওকে নিয়ে। সে এখন বাড়ি আসে না। পুলিশ ওকে খুঁজছে। যেখানে পাবে, শেষ করে দেবে।

সোমা কেন যে বিনুর দিকে সহজভাবে আর তাকাতে পারছে না। বিনুর সেই চঞ্চল চোখ দুটো আর খুঁজে পাচ্ছে না। আসলে বিনুই কী কখনও তাকে বলেছিল, কাজল পরলে তোমাকে ভালো লাগে না, বিনু আর মনে করতে পারছে না কথাটা, উলটো কথা বলছে, এ—ভাবে যা হয়ে থাকে মাথা গণ্ডগোল হয়ে যায়, যার কথা মনে হয়, সেই শয়তান ব্যক্তির কথা মনে হয়, বাবার তেলেভাজা খাবার নিদারুণ ইচ্ছার কথা মনে হয়, এবং সারাক্ষণ যেন বাবা সেই লোকটার ভয়ে হে হে করে হেসে যাচ্ছে। কান্না পেলেও কাঁদতে পারছে না, বিনুই কী তখন বলেছিল, আমাদের এ—সমাজ বদলে দিতে হবে। না অশোক, না সেই নিতাই! কে? কে বলেছিল! এবং সে এখন কিছুই মনে রাখতে পারছে না, এবং সেই চোখ দুটো, অথবা অঞ্জন, অথবা কাগজের ছবি সব মিলে কেমন সত্যি ওর মাথাটা গণ্ডগোল করে দিচ্ছে। ভোর রাতে সে কাকে যে দেখল গাড়ি বারান্দার ছাদে। সে সম্পর্কে বিনুকে আর কেন জানি কিছু বলতে ইচ্ছা হল না। সে উঠে পড়ল। সে বিনুকে বলতে পারল না, মনীষ পাকা কাজ করছে। কোথায় যে তার অহংকারে লাগছে। বলতে পারলে যেন হালকা বোধ করত।

সে গাড়িতে এবার কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরে বেড়াল। যেমন সে বিনুদের বাড়ি থেকে বের হয়ে, সোজা মাণিকতলা, তারপর বড় রাস্তা ধরে কাঁকুড়গাছি, উল্টোডাঙা, লেক—টাউন, দমদম পার্ক পার হয়ে যাচ্ছে এবং জোরে গাড়ি চালাতে ইচ্ছা হচ্ছে। অথচ সে ঠিক বুঝতে পারছে না কিছু। এমন সুন্দর বাড়িটা কেন যে ক্রমে একটা রহস্যময় বাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এখন তো মনীষ বাড়ি নেই। সে ভয়ে হয়তো দু—একদিনের ভিতর বাড়ি ছেড়েও দিতে পারে। যেমন ভয় পেয়ে অনেকে, দিল্লি অথবা এলাহাবাদ, কেউ আবার পুণা, অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের কোনো নিরিবিলি জায়গায়, আত্মগোপন করে থাকছে। এবং যেভাবে মনীষ ত্রাসের ভিতর পড়ে গেল, সেও ঠিক পালাবে শেষ পর্যন্ত। সে গেলে তাকেও যেতে হবে, কিন্তু সেই লোকটাকে তো কলকাতার বাইরে গেলে পাওয়া যাবে না, সে তো কথা আছে, বড় মাঠে আসে। বুড়ো মানুষটাকে আগুন জ্বালাবার জন্য খড়কুটো সংগ্রহ করে দেয়।

ওর চুল উড়ছিল। সে খুব দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে না। ওর পাশ দিয়ে বাসগুলো বেশ জোরে বের হয়ে যাচ্ছে। এমনকি, সব গাড়ি ওকে ফেলে সামনে চলে যাচ্ছে। সে কিছু ভাবছে না। সে দেখছে চারপাশে সব বাড়ি ঘর, এবং বড় বড় ইলেকট্রিক পোস্ট, অথবা কখনও বিজ্ঞাপনের বড় বড় ছবি, সে এ—ভাবে কেন যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আসলে সে বোধহয় ঘুরে বেড়াচ্ছে না, সে নিজের ভিতর ডুবে যেতে চাইছে, এবং অন্যমনস্ক হলে ভীষণ কেলেঙ্কারি, একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সে তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। অঞ্জন বলে সে কাউকে চেনে না, অঞ্জন বলে তার কেউ জানা নেই, সে অহেতুক ঘুরে মরছে। তার চেয়ে বরং সে ভাবল, বিকেলে, ভালো একটা ছবি দেখবে, মিডনাইট কাউ বয়, খুব আশ্চর্য ছবি, এমন ছবিতে বসে থাকলে, অহেতুক সে ভাবে না। ছবিটার নাম সে শুনেছে, বেশিদিন থাকছে না। টাইগারে হচ্ছে। টাইগার হলটা বাজে। সেখানে সে যেতে পারে না। সে যে কী করে। সে বড় বড় সব হাউসে ছবি দেখে থাকে। সাধারণ ছবি—ঘরগুলো সম্পর্কে আজকাল কোনো খবর রাখে না। কিন্তু টাইগার ভীষণ বাজে ব্যাপার। সে একবার লুকিয়ে, কে কে সঙ্গে ছিল, বোধহয় নিতাই, অবনী এবং অন্য অনেকে। বিনু ছিল না, মনীষও ছিল না, এটা সে স্পষ্ট মনে করতে পারছে। দলটা ভারী ছিল। একমাত্র মেয়ে সোমা। ওর প্রতি সবাই মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল এটা মনে আছে। সেখানে কী অঞ্জন নামে কেউ ছিল! যে একবার এসেই চলে গেছে, আর আসেনি। ওর উজ্জ্বল চোখ দুটো কেবল সে মনে করে রেখেছে। মনের ভিতর চোখ দুটো এতদিন আত্মগোপন করেছিল, কফি—হাউসে তাকে দেখার পর আবার সে ভেসে উঠেছে!

কী যে হয় তারপর। কপাল ঘামতে থাকে। সে যাচ্ছে। গাড়ির ভেতরে হাওয়া ঢুকছে। চুল ফুরফুর করে উড়ছিল। সে খুব ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে। সাদা রঙের গাড়ি, আর ভেতরে একমাত্র যুবতী সোমা। চুল এলোমেলো। খোঁপা বাধা নেই। খোলা। উদাসীনতা চোখে মুখে। কী অঞ্জনকে যথার্থই খুঁজে বেড়াচ্ছে, না মনের ভিতর এমন একজন মানুষ থাকে, যে রাজার মতো, যাকে সবসময় ঠিক খুঁজে পাওয়া যায় না—এবং এ—ভাবে কী যে হয়ে যায়, সোমার সুন্দর চোখে এক অপার্থিব করুণা ভেসে ওঠে। চারপাশে এত সব গরিব মানুষেরা রাস্তায় শুয়ে থাকে, ওর মনে হয়, এটা একধরনের পাশবিকতা, এ—ভাবে এদের চোখের ওপর গাড়ি চালিয়ে যাওয়া সত্যিই বড় বেমানান। সে সোজা বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল। চারপাশের এমন সব দৃশ্য ওর কেমন অসহ্য লাগছে।

অথচ বাড়ি ঢুকেও সে কেমন শান্তি পাচ্ছিল না। সে সোজা সিঁড়ি ধরে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল না। গাড়ি সদরে এলেই গেট ধীরে ধীরে খুলে গেল। সে সাধারণত গাড়ি সদরে রেখেই সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যায়। রসুল অথবা রাম অবতার সেলাম দেয়। গাড়ির দরজা খুলে দিলে সে বের হয়ে আসে। আজ একেবারে অন্যরকমের। সে সোজা গাড়ি ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। নিজেই গ্যারেজ করল গাড়ি। চারপাশে কী যেন খুঁজল। বোধহয় সে ও—পাশের গ্যারেজ দেখছে। গ্যারেজ বন্ধ। গাড়ি ভিতরে আছে না বাইরে, সে বুঝতে পারছে না। রসুলকে সে বলল, সাব ফিরেছে?

না দিদিমণি।

এখনও কেন ফিরল না! তারপর আর কিছু বলল না সোমা। সে ঘড়িতে সময় দেখল, বারোটা বেজে গেছে। ওরা একটায় খায়। একসঙ্গে খায়। কলেজ বন্ধ বলে সোমাকে এখন আর আগে খেতে হয় না। মনীষ অপিস থেকে টিফিনে ফিরে এলে একসঙ্গে খায়। সে হয়তো অপিসে আজ যাবে না। হয়তো শরীরটা ভালো নেই বলে ফোনেই সব কাজটা সেরে নেবে। দরকারি সইটই—এর জন্য ফাইল পাঠিয়ে দিতে বলবে।

সোমার ধারণা, মনীষ এক্ষুনি এসে যাবে। বরং এ—ফাঁকে স্নান সেরে ফেললে হয়। কিন্তু সিঁড়ির মুখে ওঠার সময় মনে হল ওদিকে একটা ফুলের টব কাত হয়ে পড়ে আছে। বিশ্রী লাগল। মনটা তিক্ত হয়ে গেল। বাগানের মালিরা কী যে করে। এখানে সদানন্দ কাজ করে, এই সব ফুলের টব সদানন্দের দেখাশোনা করার কথা। এ—ভাবে কিছু অবহেলায় পড়ে থাকলে ওর মাথাটা কেমন গরম হয়ে যায়। কিন্তু মনীষ ফেরেনি, সে না ফেরা পর্যন্ত ওর ভিতরের চিন্তাটা যাচ্ছে না। কাঠের সিঁড়ি বলে শব্দ হয়। সিঁড়ি ধরে কেউ উঠে গেলেই টের পাওয়া যায়। একসময় এই কাঠের সিঁড়িটার জন্য ভীষণ রাগ ছিল সোমার! কেমন পুরোনো সাবেকি ব্যাপার? সে, যা কিছু পুরোনো সাবেকি ব্যাপার সব সেকেলে ভেবে থাকে। কাঠের সিঁড়িটা না থাকলেই যেন ভালো হত।

কিন্তু এখন সে তেমন ভাবে না। এটা না হলেই খারাপ হত। কাঠের সিঁড়িটায় কেউ পা দিলেই বোঝা যায়, কেউ উঠে আসছে। যদি অঞ্জন অথবা অন্য কেউ উঠে আসে তবে ঠিক টের পাওয়া যাবে। শব্দ শুনলেই টের পাবে কেউ উঠে আসছে। আর এ—কাঠের সিঁড়িতে উঠে আসে মনোরমা। মনোরমা উঠে এলে টের পাওয়া যায় মনোরমা উঠে আসছে। রসুল উঠে এলেও টের পাওয়া যায়, রসুল উঠে আসছে, ওদের পায়ের শব্দ এক—এক রকম। আর উঠে আসতে পারে কারখানার বড় বাবু। সে লোকটা মনীষের সব। লোকটা মনীষকে পাতালে নেমে যাবার সোজা রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছে। কাঠের সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ একেবারে আলাদা। কেমন ঘষটে ঘষটে একটা শব্দ। একটানা, উঠছে তো উঠছে। বাতে পঙ্গু হলে মানুষ যেমন হয়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, শব্দটাও তেমন যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সারা বাড়িতে বলে দেয়, খোঁড়া লোকটা এখন কাঠের সিঁড়ি ভাঙছে। আর কারও উঠে আসার নিয়ম নেই। কেউ ওখানে পা দিতে পারে না। আর পারে অসিত। অসিত উঠে এলেও সোমা টের পায় অসিত উঠে আসছে। সুতরাং এ—সব শব্দ বাদে অন্য কোনো শব্দ হলেই মনীষ সাবধান হয়ে যেতে পারবে। সিঁড়িটা না থাকলে মনীষের পক্ষে এটা সম্ভব হত না।

সোমা এখন বাথরুমে। সে নানাবর্ণের সব সুগন্ধ জলে গুলে নিয়েছে। সে মুখে এবং হাতে পায়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে বেশ খোলামেলা আয়নার সামনে বসে রয়েছে। এই কাঠের সিঁড়িটা যা হোক একটা কানের কাজ করছে। মনীষের হয়ে বলে দিচ্ছে কে আসছে, এমন বিশ্বস্ত কাঠের সিঁড়ি। এখন আর তাকে সে সেকেলে অথবা পুরোনো আসবাবপত্রের মতো ভাবতে পারে না। বরং এ—বাড়িতে রসুল, রাম অবতারের মতো, বিশ্বাসী সৎ, ওরা নিদারুণভাবে গেটে থাকছে। যদিও সোমা জানে, যাদের আসার কথা, তারা গেট দিয়ে আসে না। গেট দিয়ে এলেও কেউ তাদের আটকাতে পারে না। সে কাগজে এমন কত খবর পড়েছে। ওর কেমন এই বাথরুমে দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, আসলে সোমার বোধহয় পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রিয় এমন একটি সুন্দর জায়গা। প্রায় চারপাশে লালবর্ণের কাজ করা পাথর বসানো দেয়ালে, আর দেয়াল জুড়ে আয়না। হেঁটে বেড়ালে বেশ লাগে। একটা শোবার ঘর এখানে ঢুকে যেতে পারে। আসলে সোমা এখানে এলেই নিজেকে চিনে ফেলতে পারে। সে তার শরীর চারপাশ থেকে তখন আয়নায় দেখতে পায়। শরীরে কী আছে, এবং সুন্দর স্তন, জঙ্ঘা কী যে পুষ্ট আর মনোরম, সে নিজের ছবিতে নিজেই কেমন তন্ময় হয়ে যায় —সেখানে দুটো মাত্র চোখ, এবং সহসা সে এটা কী দেখে ফেলছে, আয়নায় ওর, মাঝে মাঝে সেই চোখ দুটো, হুবহু, সেই পত্রিকার মুখ, হুবহু এক, এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে। সোমা চিৎকার করে উঠল, মনীষ, সে আসছে, সে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ ঘোলা হয়ে গেল। সে চারপাশে অন্ধকার দেখতে থাকল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

বারো

শান্তিবাবু দরজায় কেউ কড়া নাড়লেই কেমন হয়ে যায়। অবিবাহিত মানুষ। মা আছেন। আর একটা চাকর। তিন তলার ফ্ল্যাট। ইতিহাসের অধ্যাপক। ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসটা বোধহয় খুব ভালো পড়া ছিল না, হলে একটা লিস্ট টানিয়ে দিতেই এত ভয় পাবার কথা না। প্রথমে নামটা দেখে ভেবেছিল, ভুল, ছাত্ররা তাকে ভীষণ ভালোবাসে, কিন্তু চোখ মেলে ফেরতাকালে বুঝেছিল, না ভুল নয়, ওরা ঠিকই ওর নাম লিখেছে, তবে ভালোবাসে বলে, একেবারে শেষে বোধহয় নামটা রেখেছে।

কড়া তখনও নড়ছে। এই এগারোটায় কে আসবে? হুট করে দরজা খোলার নিয়ম নেই। চাকরটাও সেয়ানা হয়ে গেছে। সে যে ভয়ে ভয়ে আছে, চাকরটা বুঝে ফেলেছে। সে দরজায় খট করে কড়া নাড়ার শব্দ পেলেই দৌড়ে আসে। দরজা খোলার আকুলতা। আগে দরজা ভেঙে ফেললেও ওর সাড়া পাওয়া যেত না। যেন জোর করে পাঠাতে হত। এখন আর সে—সব নেই, একেবারে কান খাড়া। এবং দরজা খোলার কথা বলেই বোধহয় বাবুর মুখ শুকিয়ে যায়, আর চাকরটি তাতে বেশ মজা পেয়ে যায়। শান্তিবাবু এখন নানাভাবে চেষ্টা করছে, মুখ স্বাভাবিক রাখার। যেন ওটা কিছু নয়, যেমন আগে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সে অনায়াসে চুরুট টানতে পারত, কপাল ঘামত না, এখনও তেমনি চোখ মুখ করতে গিয়ে বুঝতে পারে সে, বোকা বোকা মুখ। এ—মুখের মানে হয় না।

চাকরটা বলল, খুলব বাবু?

খুলবি!

অনেকক্ষণ থেকে কড়া নাড়ছে।

তা নাড়ুক। দ্যাখ না কে?

একজন বাবু মতো মানুষ।

সঙ্গে আর কেউ নেই তো?

না।

সঙ্গে কিছু নেই তো?

না।

বয়স কেমন?

আপনাদের বয়সি।

তা বল। বলেই শান্তিবাবু দরজায় এসে হোল দিয়ে মানুষটাকে দেখল। মানুষটাকে সে চিনতে পারল আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বলল। হ্যাল্লো। তুমি! কী খবর! হঠাৎ আমার এমন সৌভাগ্য!

মনীষ ঢুকেই বলল, দরজা বন্ধ করে দাও।

মানে!

মানে, তুমি কিছু জানো না!

সে যেন কিছু জানে না, এমন মুখে তাকাল।

মনীষ বলল, শুনলাম তোমার লিস্ট তৈরি!

ও একটা ঝুলিয়েছে। ওটা কিছু না।

তুমি কলেজে বের হচ্ছ?

তা হব না কেন। মা, দ্যাখো কে এসেছে!

মনীষ বুঝতে পারল না, লিস্ট টানিয়ে দিলে মুখ কেউ এমন করে রাখতে পারে।—সে ওর পেছনে পেছনে ভিতরে ঢুকে গেল। শান্তিবাবু দরজা বন্ধ করে দেবে ভাবল, কিন্তু ফিরে দেখল, বাড়ির ছোকরা চাকরটা আগেই দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। সে আর দাঁড়াল না। ভিতরে ঢুকে বসার ঘরটার চারপাশটা দেখল। ভালো করে দেখল সে। এখানে যদি ওরা এসে আগেই লুকিয়ে থাকে। মনীষ ফিসফিস করে বলল, ক'দিন আগে!

তা আজ ন দিন হবে।

ন দিনের ভিতর কোনো এটেমপট হয়নি!

না। সময় লাগবে। সতেরো জনের লিস্ট। যার নাম প্রথমে আছে তার আগে যাবার কথা।

তার কোনো ঠিক নেই। সে তারপর কী ভাবল। শরীরে একটা কী রকমের কষ্ট। এমন কষ্ট, অথচ সে বুঝতে পারছে না, কষ্ট কেন। সে বুঝল, ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। বোধহয় গলা শুকিয়ে গেছে। সে শান্তিকে দেখে কেমন একটু সাহস পাচ্ছে। নিজের কষ্টের কথা বলতে পারছে না। এটা আর কিছু নয়, জলের জন্য কষ্ট। সে এতক্ষণে বুঝতে পারল, ওর ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে। সে বলল, আমি জল খাব।

শান্তি জলের জন্য ছোকরা চাকরটাকে ডাকল। বলল, ক্ষেত্র, বাবুকে শরবত করে দাও।

শরবত খেলে জল তেষ্টা যায় না। আমি জল খাব শান্তি।

এখন জল খাবে কী শরবত, এ—নিয়ে শান্তির মাথা ঘামাবার কথা না। সে বুঝতে পারছে না, মনীষ হঠাৎ এখানে কেন। ওর কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবার কথা না মনীষের। মনীষ এ—জন্য ছুটে আসেনি। সে বলল, তোমার দিকে কোনো গণ্ডগোল নেই। পাড়াটা ভালো।

মনীষ জল খেল। জল না খেলে বোধহয় সে ভালো করে কথাই বলতে পারত না। চোখে মুখে ভীষণ আতঙ্ক। শান্তিবাবু মনীষের জল খাওয়া দেখে এটা বুঝতে পারছে। সে ফের বলল, সোমা কেমন আছে? ওর কিছু হয়নি তো?

ওর কিছু হতে যাবে কেন! মনীষ বুঝতে পারল না সোমার কথা এ—সময় আসে কী করে! পৃথিবীর সবাই যদি সোমার জন্য ভাবে তবে সে ভাববে কখন। সে জল খেয়ে যেন কিছুটা সাহস পেয়েছে। এখন সে সহজভাবে কথা বলতে পারছে। সে বলল, তোমার খবরটা পেয়ে কেমন মন খারাপ লাগছিল। ছুটে এলাম।

তা যদি হয়েই যায়, কী করা!

কিন্তু তোমার অপরাধ কী?

ওরা তো অপরাধের কথা জানায় না।

কেউ কেউ শুনেছি অপরাধের কথা জানিয়ে চিঠি দেয়। সে যে এমন একটা চিঠি পেয়েছে তা বলল না। কেউ পেয়েছে, এমন ভাবে কথা বলল। আসলে ওরা এখন দুজন, দেশের কে কোথায় কখন কীভাবে চিঠি পেয়েছে এবং তার ফলাফল সম্পর্কে কথা বলতে উৎসাহী। যদিও শান্তি খুব একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য দেখাচ্ছে।

এটা একটা রোমান্টিক ব্যাপার। কিছু তো করতে হবে। দেশ উদ্ধারের কাজটা যদি গান্ধী না করে যেতেন, তবে বোধহয় এমনটা হত না। ওদের হাতে আর কোনো কাজ নেই। কিছু লোক খুন করে ওরা শোষণ বন্ধ করবে ভাবছে।

তুমি শোষণের কে? মনীষ পায়ের ওপর পা রেখে কথা বলছে। সে একটা চুরুট ধরাল, চুরুট ধরালে মুখে যে আতঙ্কের ছাপ আছে সেটা মুছে যায়। মনীষের চুরুট মুখে চেহারা অন্য রকমের। বরং ওকে তখন খুব চিন্তাশীল মানুষ দেখায়। সে বলল, কী যে এ—সব হচ্ছে!

এটা চলবে। আজ তো আঠারো উনিশটা গেছে।

পত্রিকা তুমি পড়!

না পড়লে শান্তি পাই না।

সোমা আমাকে পড়তে দেয় না। পত্রিকা এলে লুকিয়ে রাখে।

তুমি না পড়ে থাকতে পারো!

পারি না। লুকিয়ে যে আনাব তার উপায় নেই।

কেন আজকাল অফিসে যাচ্ছ না?

শরীরটা ভালো নেই। বাড়িতেই সব করছি।

দেখবে নাকি পত্রিকাটা?

মনীষ কী বলবে ভেবে পেল না। সে বলল, তুমি কি কাগজ পড়তে পছন্দ কর?

স্টেটসম্যান। এটাতে সঠিক খবর পাওয়া যায়।

একটু দেখলে হত।

এখন শান্তি কাগজটা খুঁজছে। আসলে কাগজটা সেও লুকিয়ে রাখে। একা পড়তে ওরও বোধহয় ভয় হয়। কোনোরকমে কিছুটা পড়েই রেখে দেবার স্বভাব। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে ভালো লাগে না। সে পত্রিকা খুলেই একটা খবর শুধু খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু খবরের শিরোনাম দেখলেই সে কেন সে সবটা পড়তে সাহস পায় না, শিরোনামটা পড়েই সে রেখে দেয়। তারপর সে ভাবে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের ওপর একটা বড় রকমের বক্তৃতা দেওয়া যাক। সে জানালায় দাঁড়িয়ে, কিছু পাহাড়—জঙ্গলের ছবি দেখতে পায়, একটা ব্রিজ উড়িয়ে দিচ্ছে কারা দেখতে পায়, তখন মনে হয়, ব্রিজ উড়িয়ে দিলে দুটো—চারটে লাশ পড়বে, মরে থাকবে জঙ্গলের ভিতর, এবং এ নিয়মেই বিপ্লব সব জায়গায় হয়েছে। সে খানিকক্ষণ পায়চারি করতে থাকে, তারপর মনে হয় মৃত্যু একসময় হবেই, সে এ—জন্য বড় বেশি ভাবছে। এক কাপ চা দিতে বলে, সে আবার পত্রিকাটা খুলে পড়বে ভাবে, না, থাক, চা আসুক, চা খেতে খেতে পড়া যাবে। এবং এভাবে সে সেই একটা শিরোনামার সংবাদ যখন শেষ করে ফেলে তখন ঘড়িতে দশটা বাজে। কাগজ আসে সকাল সাতটায়। একটা শিরোনামা শেষ করতে ওর হয়ে যায় দশটা। সে একটা খবরই তারপর সারাদিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পড়ে। পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে যায়। নানাভাবে সে দেখতে চায় মৃত্যুগুলোর সঙ্গে ওর জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক কতটুকু। যেমন বিজ্ঞান কলেজের একজন অধ্যাপকের গলা কেটে দেওয়া হয়েছে, সবটা কাটাতে পারেনি, ঘাড়ে রেজার চালিয়েছে। ঘাড়ে রেজার চালাতে কতটা গভীর ক্ষত হতে পারে, একটা না দুটো, কবার, এবং সে যদি এমন একটা সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে কীভাবে সে ওদের সঙ্গে যুঝবে, ওর তো ইচ্ছা, সে সময়ই দেবে না। ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেবে, না তার চেয়ে পেছন দিক থেকে লাথি, সে এ—ভাবে বসে থাকবে যাতে করে ওর গলাটা কেউ কাছে না পায়। সব হত্যাই এ ভাবে যখন হচ্ছে তখন একটা পাতলা লোহার চাদরে মোড়া বর্ম জামার নিচে থাকলে কেমন হয়, কোনো বিজ্ঞাপনদাতা এমন একটা বিজ্ঞাপনও কেন যে দিচ্ছে না, মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো সে তবে বর্মের পোশাক পরে থাকত। সে মাঝে মাঝে পত্রিকার ভিতর বোধহয় এমন একটা বিজ্ঞাপনের খবরও পেতে চেষ্টা করে। আর এ—ভাবে এগারোটা বাজলে সে বুঝতে পারে, খবরটি শুধু ওর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়াই হয়নি, সেটা সে মুখস্থও করে ফেলেছে, তারপর সারাটা দিন,

ঐসব নিহত মানুষের ছবি ওর চারপাশে ঘোরাফেরা করলে সে কেমন নিজেই পাগলের মতো জোরে জোরে কাকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দিতে থাকে। এই এগারোটায় তার এক নম্বর বক্তৃতখানা আরম্ভ হবার কথা। মনীষ এসে কিছুটা অসুবিধা ঘটিয়েছে।

মনীষ বলল, কাগজে কী দেখছিস?

কিছু দেখছি না!

তবে এ—ভাবে ঝুঁকে আছিস কেন?

খুঁজছি।

কী খুঁজছিস?

বিজ্ঞাপন।

ধুস! বলে মনীষ কাগজটা জোর করে কেড়ে নিল।

মনীষ প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে দেখল সব হত্যাকাণ্ডের কথা লেখা আছে। বেশ জ্বল—জ্বল করছে লেখাগুলো। ছেলেছোকরা বয়সের হত্যাকাণ্ডে সে বেশ মজা পায়, কোনো মজুতদার অথবা পুলিশের হত্যাকাণ্ডে সে কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। পাঁচ—মেশালি হত্যাকাণ্ড কাগজটা জুড়ে, ছোট বড় সব রকমের। আর তাছাড়া সব হত্যাকাণ্ডের কথা লেখা হয় না, যেমন ওদের বাড়ির সামনে, ঠিক সামনে বলা যায় না, একটু পেছনে, রাস্তার ওপর একজন মানুষের গলাকাটা। কে খুন করল, কখন, কারা, কোনো হদিসই পাওয়া গেল না। খবরটা পর্যন্ত কাগজে বের হয়নি। আর এ—ভাবে, চারপাশে যে হত্যাকাণ্ড চলছে, তার ঠিক হুবহু ছবি কেউ দিতে পারে না। বারাসতে আটটা না আটশো কে বলতে পারবে। কীভাবে যে মাটির নিচে সব চাপা দিয়ে কেমন হাত সাফসোফ করে ভালো মানুষ সেজে যাচ্ছে সবাই।

শান্তি বলল, কী দেখলে?

মনীষ কোনো জবাব দিচ্ছে না।

কী দেখবে! আমার কাছে শোনো। আমি না দেখেও সব তোমাকে হুবহু বলে দিতে পারি।

মনীষ বলল, তোমাদের এক নম্বর যিনি তার খবরাখবর তুমি রাখো?

হ্যাঁ।

তিনি কোথায় আছেন?

তিনি এখন এখানে নেই। ওর শ্যালক থাকে গোণ্ডাতে। সেখানে চলে গেছে।

গোণ্ডা! সে আবার কোথায়?

উত্তরপ্রদেশে বোধহয়।

বেনারসের কাছে একটা খুন হয়েছে।

তাতে তোমার কী মনে হয়?

দ্যাখো এক নম্বর কিনা তোমাদের!

এক নম্বর হতে যাবে কেন?

হতেও তো পারে।

শান্তিবাবুর মনে হচ্ছে, না হওয়াটাই শ্রেয়। হলেই, ওর নম্বর কমে আসবে। বুকটা কেমন করতে থাকল। মুখে ভয় ধরা পড়ুক, সে চাইল না। সে বেশ সোজাসুজি তাকিয়ে থাকল। কিছু বলতে পারল না।

মনীষ বলল, তোমাদের এক নম্বরের ঠিকানা জান না?

তা জানি।

ফোন টোন আছে?

তা আছে।

তোমার কলিগ! ফোন করে খবর নেওয়া উচিত।

শান্তি উঠে দাঁড়াল। ফোন করা ঠিক হবে কিনা, কীভাবে ফোন করবে, কী বলবে এ—সব ভাবল। অধীরবাবুর মা আর বোন আছে। এক ভাই আছে। সে বাড়ি থাকে না। বাড়িতে সে ঢুকতে পারে না। সে ভাবল, ফোন করে বলবে, অধীরবাবুর কোনো চিঠি এসেছে কিনা! অধীরবাবুর স্ত্রী এখন কোথায়! যেন পারিবারিক কুশল নেওয়া। ফোনে যে স্বর ভেসে এল, অচেনা। কোনোদিন এমন স্বরে কেউ কথা বলতে পারে সে ভাবতে পারে না। সে বলল, তাহলে...।

হ্যাঁ।

ওটা ঠিক খবর।

বউদির ভাই টেলিগ্রাম করেছেন।

সত্যি খবর।

ও—পাশের কণ্ঠস্বর ভাঙা কিছু আর বলতে পারছে না, কান্নায় ভেঙে পড়ছে। এবং শান্তি একেবারে কেমন সাদা ফ্যাকাশে, দাঁড়াতে পারছে না, কোনোরকমে এসে সোফাতে হেলান দিয়ে বসে বলল, মনীষ, তুমি ঠিকই বলেছ। আমাদের এক নম্বর গেছে।

তারপর ওরা দুজনই চুপচাপ। চা রেখে গেছে। শান্তিবাবুর মা এ—বাড়িতে আছে টের পাওয়া যাচ্ছে না। নিঝুম, নিরিবিলি, কেবল চাকরটা ভীষণ দর্পের সঙ্গে হাঁটাহাঁটি করছে। কড়াইয়ে সে কিছু ভাজছে, সে এত জোরে জোরে খুন্তি চালাচ্ছিল যে মনে হয়, বাবুদের মজা দেখে সে খুন্তি নেড়ে তামাশা দেখাচ্ছে। আর ওরা দুজন মুখোমুখি। কীভাবে যে সব হয়ে যাচ্ছে! মনীষ বলল, উঠি।

বোসো।

মনীষ এখন উঠি বললেই উঠতে পারছে না। মনে হচ্ছে সে যখন নেমে যাবে সিঁড়ি ধরে, তখন দু—পাশ থেকে ওরা জড়িয়ে ধরবে। গলার শ্বাসনালিটা টুক করে কেটে দেবে। সে টেরও পাবে না। সে, নিজের গলাকাটা, অর্থাৎ শ্বাসনালি কাটা, রক্ত ওগলাচ্ছে, শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে এমন একটা দৃশ্যের কথা ভাবলেই কেমন চোখে ঘোলা ঘোলা দেখতে থাকে। কেমন তখন নিজেকে কবন্ধের মতো মনে হয়। সে একটা হত্যাকাণ্ডের হুবহু বর্ণনা দিয়েছিল। ভোজালি দিয়ে সাঁই করে মাথাটা কেটে দিলেও মানুষটা মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে। হাওয়ায় হাত দুটো যেন খুঁজে বেড়ায় শ্বাস—প্রশ্বাসের কারুকার্য। তারপর ধপাস করে পড়ে যায়। পৃথিবীতে এমন একটা দৃশ্য মনীষ যে—কোনো সময় তৈরি করে ফেলতে পারে। আর তৈরি করতে পারে ভেবে ফেললেই, সে পায়ে আর শক্তি পায় না। সিঁড়ি ধরে কীভাবে নেমে যেতে হবে সে যেন বুঝতে পারে না।

তবু সে উঠে পড়ল। এখানে আর তাকে কে চেনে। কিন্তু সেই সুদূর গোণ্ডাতে শান্তিদের এক নম্বরকে কে চিনত। এক নম্বর গেছে, এখন দুনম্বর যেখানেই পালাক না রক্ষা নেই। শান্তির সতেরো নম্বর। সতেরো না সাতাশ, না সাত। এত কম সময়ে সে সব গুলিয়ে ফেলছে। সে সতেরো হোক, সাতাশ হোক, আসে যায় না, শান্তি তুমি যাবে। আমিও যাব। তবে শালা আমি আর এখানে থাকছি না। ভেবেই সে সটান উঠে দাঁড়াল। শান্তিকে কিছু বলল না। যারা চিঠি পায় তারা বাঁচে না। লিস্টে নাম উঠে গেলে রক্ষা থাকে না। এখন একমাত্র বিদেশে পাড়ি দেওয়া, আর না হলে অগত্যা একটা শান্তির মতো বর্ম তৈরি করে নেওয়া। শান্তি ওকে চুপি চুপি ভিতরে একটা বর্ম পরতে বলেছিল। লোহার অথবা ভালো বিদেশি ইলেকট্রনিক টিনের প্লেট দিয়ে বর্ম। ফুল হাতা গেঞ্জির মতো ভিতরে পরে থাকবে। গলায় চোপ বসাতে পারে, তা গলাটা ঢাকা থাকবে। চারপাশ থেকে ঢাকা গলার নতুন পোশাক, অথবা সে বলবে এটা প্যাটার্ন এখন পোশাকের, পরে থাকলে, তা গুলি বারুদ এবং হাত চালাচালি সব নিরর্থক হয়ে যাবে।

শান্তিবাবু বলল, আমি আর নামছি না। শরীরটা ভালো নেই।

মনীষ জবাব দিল না। শান্তি এক নম্বর গেছে শুনে নিচে নেমে যেতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু দরজার কাছে গেলে ফের শান্তিবাবু ডাকল, মনীষ শুনতে পাচ্ছ?

কী?

কেমন জোরে জোরে খুন্তি নাড়ছে?

তা শুনতে পাচ্ছি।

স্পাই নাতো!

কী করে বলব!

কিছু বলতেও পারি না! যা খুশি করছে!

রাখছ কেন? লাথি মারতে পারছ না?

মারব। সময় আসুক। এমন লাথি মারব না, একেবারে উলটে পড়বে। নাক থেঁতলে যাবে। গল গল করে মুখ দিয়ে রক্ত বের হবে।

আর তখনই চাকরটা এদিকে আসছে দেখে মনীষ চোখে আঙুল রেখে ইশারা করল। তারপর বলল, যাচ্ছি।

যাও।

ছোকরা চাকরটা এদিকে এসেই আবার বাঁই করে ঘুরে গেল। যেন কী আনতে ভুলে গেছে। সেটা নিয়ে সে নিচে নেমে যাবে। এখন মনীষ ভাবতে পারছে না, আসলে ওর মতলব কী! সে দ্রুত দু লাফে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। এবং সেও বাঁই করে ঘুরিয়ে নিল গাড়ি। এলোমেলো চালিয়ে যখন গাড়ি নিয়ে বাড়ি ঢুকল তখন এক কঠিন কাণ্ড। মনোরমা হাই হাই করছে। অসিত নেমে যাচ্ছে। ওর ভিতরটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। সে বোকার মতো অসিতকে দেখল, কিছু বলতে পারল না। অসিত বলল, ভিতরে যাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তেরো

সোমার মনে হল কেউ ডাকছে। অনেক দূর থেকে ডাকছে। সে চোখ খুলে তাকালে দেখল, পাশে মনীষ দাঁড়িয়ে। সে মনীষকে ঠিক চিনতে পারছে না বোধহয়। একটা অসীম শূন্যতার ভিতর সোমা ডুবে যাচ্ছে। ঠিক ডুবে যাচ্ছে কিনা বলা যায় না, কেমন ডুবে যেতে তার ভালো লাগছে। এবং চোখ বুজলেই কেমন সে হালকা, বাতাসে ভর দিয়ে সে যেন অনেকদূর চলে যেতে পারে। তার দুটো হাত এখন পাখির ডানার মতো। অথবা বাতাসে সাঁতার কাটার মতো সে এগিয়ে যায়, আর এখন কেউ ডাকলে মনে হয়, অনেক দূর থেকে, যেন কেমন অনন্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ছোট একটা নক্ষত্রের মতো তাকে বলছে, সোমা, তোমার তো কাজল পরার কথা ছিল না। চোখে কেন যে কাজল পরতে গেলে।

সোমা বলল, আমি কাজল পরি না। কখনও পরি না। সেই যে তুমি বললে, তারপর থেকে পরি না।

মনীষ দেখল সোমা চোখ বুজেই বিড়বিড় করছে। এমন দেখলে কে আর স্থির থাকতে পারে। অসিতের সঙ্গে পরামর্শ দরকার। সে এখন কী করতে পারে। আসলে ভয়ে এমন হয়েছে। ওর চেয়ে সোমা বেশি ভয় পেয়ে গেছে। সে এ—ভাবে এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবে। সে এবার চিৎকার করে ডাকল, মনোরমা মনোরমা!

মনোরমা ছুটে এল। সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

মনীষ বলল, কী হয়েছিল!

কে একজন এসেছিল! বলল সোমা আছে?

সোমা! সোমার কথা বলল!

হ্যাঁ। বলল, ওকে ডেকে দেবে তো।

নাম কী বলল?

নাম বলল না। বলল, এলেই আমাকে চিনতে পারবে।

মনীষ নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে পারলে যেন বেঁচে যেত। সে ব্যালকনিতে ছুটে এসে ডাকল, রসুল! রসুল!

রসুল ছুটে এলে বলল, কে এসেছিল।

কেউ নাতো সাব।

কেউ না!

না।

মনোরমা। সে আকাশ ফাটিয়ে বলল, এসব বাড়িতে কী হচ্ছে! আমি সবাইকে তাড়িয়ে দেব। তোমরা সবাই নেশা করছ।

না দাদাবাবু নেশা করছি না। আমি বললুম, বসুন। কিন্তু ভিতরে ঢুকে দিদিমণিকে দেখতে পেলাম না। বাথরুম বন্ধ। ডাকলাম। কোনো সাড়া পেলাম না। এসে বললাম, বসুন। দেরি হবে।

মনীষ বলল, তুমি বসতে বললে!

মনোরমা দরজার পাশ থেকেই বলল, কিন্তু তিনি বসলেন না। বললেন, ঠিক আছে আমি আবার আসব। হাতে আমার অনেক কাজ। দেরি করলে ক্ষতি হবে।

ইস! কী যে সুযোগ গেল! তারপরই মনে হল সে ছেলেমানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে। রসুল, রাম অবতার এরা কী যে করল, ওরা দেখতে পেল না কেন! না কী রসুল, রাম অবতার সবাই একসঙ্গে ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, যেমন, শান্তির চাকরটা খেতে পেত না, ফুটপাথ থেকে তুলে এনে খেতে দিয়েছিল শান্তি, এখন সেই বেশ বড় বড় পা ফেলে হাঁটে। বাবুরা ভয় পেলে সে মজা পায়। এরা কী শান্তির চাকরের মতো এখন ওর বিপদে তামাশা দেখাচ্ছে। এখন কিছু করা যাবে না। সেই যে সময় এলে এক লাথি, শালা সব তখন উলটে পড়বে। মনীষ খুব নরম গলায় মনোরমাকে বলল, দেখতে কেমন!

রাজপুরুষের মতো দাদাবাবু। খুব লম্বা। চোখ বড়। চুল ঘন। রং একেবারে দুধে আলতায়। চোখে না দেখলে মানুষ এমন সুন্দর হয় কেউ বিশ্বাস করবে না।

মনীষ বলল, ও তারপর চলে গেল!

চলে গেল।

কীভাবে গেল।

কাঠের সিঁড়ি ধরে!

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনেছিলে!

হ্যাঁ।

মানুষের পায়ের শব্দ!

একেবারে মানুষের মতো। মনোরমা দেখল, কেমন বলতে বলতে দাদাবাবু ভেঙে পড়ছে। অথবা অন্ধকার রাতে কোনো নিরিবিলি জায়গায় ভূত দেখলে যেমন মানুষ ভয় পায়, তেমনি ভয় পেয়ে যাচ্ছে। চোখমুখের অবস্থা দেখে মনোরমার ভীষণ কষ্ট হতে থাকল। এত যার দাপট, নিমেষে, কী করুণ চোখ মুখ হয়ে যাচ্ছে। একেবারে গলা নামিয়ে কথা বলছে, যেন কেউ শুনতে না পায়।

মনীষ বলল, তুমি মানুষের পায়ের শব্দ চেনো!

চিনি বাবু।

শব্দটা হালকা ছিল, না দুপদাপ।

হালকা ছিল। খুব চিন্তিত মনে মানুষ সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি।

মনীষ বলল, তখনও বাথরুম থেকে সোমা বের হয়নি!

না।

তুমি তখন কোথায় ছিলে!

রান্নাঘরে।

রান্নাঘর থেকে শোনা যায়!

যায় বাবু।

লোকটা সিঁড়িতে নামতে নামতে তুমি রান্নাঘরে যেতে পার!

পারি দাদাবাবু।

কোথায় বসেছিল!

মনোরমা পার্লারে ঢুকে নীল রঙের একটা সোফা দেখাল।

মনীষ বলল, তুমি এখানে বসো।

মনোরমা ভেবে পেল না, দাদাবাবু এমন বলছেন কেন! ঠাট্টা করছেন না তো! তিনি তো কখনও ওর সঙ্গে ঠাট্টা করেন না, সে কেমন হতভম্ব। সে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল।

কী বললাম!

দাদাবাবু আপনি এ—সব কী বলছেন!

ঠিক বলছি। তুমি বসো!

আমি কবে ওখানে বসেছি।

এখন থেকে তোমরাই ওখানে বসবে।

মনোরমা এখন কী যে করে! সে খুব সংকোচের সঙ্গে এগিয়ে গেল। দাদাবাবু পাগল হয়ে যাচ্ছে, সে ভয়ে ভয়ে মাথা নিচু করে বসল।

মনীষ বলল, লোকটা আগে বের হয়েছিল পার্লার থেকে, না তুমি।

তিনি ভিতরে। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে। আমাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল, আমি গেলাম।

ঠিক আছে। এবারে তুমি আমায় পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটো।

মনোরমা পাগলের পাল্লায় পড়ে গেছে! নতুবা বাড়িটাতে এমনভাবে একটা উপদ্রব দেখা দেবে কেন। এঁরা কী যে হাসিখুশি ছিল, ক'দিনে বাড়ির চেহারা কী হয়ে গেল! যেন চেনা যায় না, কেউ কাউকে চেনে না। সবসময় কী এক ভয়াবহ দৃশ্য ঝুলে থাকে। সবসময় মনে হয় কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। কেবল সময় গুণে যাচ্ছে। যে—কোনো সময় দেখা যাবে, পার্লারে অথবা করিডোর অথবা বাগানে কেউ মরে পড়ে আছে। মনোরমা কথামতো পাশ কাটিয়ে হেঁটে গেল। সে সিঁড়ির দিকে গেলে সে দেখতে পেল, দাদাবাবু রান্নাঘরের দিকে ঠিক একজন মেয়ের যেভাবে হেঁটে যাবার কথা তেমনি হেঁটে যাচ্ছেন। সে এমন দেখে হাসবে কী কাঁদবে ভেবে পেল না। সে শুধু যেমন একজন লোক এসে নেমে যায় সিঁড়ি ধরে তেমনি নেমে গেল।

এটা রান্নাঘর না বলে প্যান্ট্রি বলাই ভালো। প্যান্ট্রিতে ঢুকে মনীষ খুব সন্তর্পণে সেই পায়ের শব্দ শুনতে থাকল। নেমে যাচ্ছে। প্যান্ট্রিতে দাঁড়িয়ে সত্যি তবে শোনা যায়। মনোরমা কোনো মিথ্যা কথা বলেনি। মনোরমা হুবহু ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে, ভাঙা রেকর্ডের মতো ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে, সে দু—কানে হাত রেখে একেবারে সোজা ঘরে ঢুকে চিৎকার করে উঠল, মনোরমা নিচের সব দরজা জানালা বন্ধ করে দাও। বাগানের দিকে রসুলকে পাহারা দিতে বল। রাম অবতার গেটে থাকুক। কেউ যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে!

এবং এমন চেঁচামেচিতে মনে হয় সোমা জেগে গেছে। সে ভেবে পাচ্ছে না, মনীষ এমন করে চিৎকার করছে কেন। সহসা ঝড় উঠলে, যেমন ঘরের দরজা জানালা ছুটে ছুটে বন্ধ করে দিতে হয়, তেমনি মনীষ দরজা জানালা বন্ধ করে দিচ্ছে। সে ভেবে পাচ্ছে না, এটা করছে কেন মনীষ। এখন তো বেশ পরিষ্কার শীতের আকাশ। মনীষ এতক্ষণ কোথায় ছিল, সে কোথায় ছিল! সে তো বাথরুমে ছিল, তারপর, তারপর, হ্যাঁ মনে পড়ছে দুটো চোখ, তারপর তারপর, সে কী ভেবে বলল, তারপর কী মনীষ?

মনীষ দেখল সোমা একেবারে তাজা মেয়ের মতো বিছানায় হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে। কে বলবে সে জ্ঞান হারিয়েছিল। কে বলবে, বাড়িতে এমন তুমুল কাণ্ড ঘটে গেছে। কেউ এসেছিল, সোমার জন্য। সে কে! সোমা কি কাউকে আসতে বলেছিল!

মনীষ বলল, তুমি খাওনি সোমা!

তুমি খেয়েছ?

না।

দরজা জানালা বন্ধ করে রাখছ কেন!

একটা লোক এসেছিল। তুমি তখন বাথরুমে ছিলে।

সে কোথায়!

চলে গেছে।

তাকে চলে যেতে দিলে কেন!

আমি কি বাড়ি ছিলাম! এসে শুনলাম।

দরজা জানালা খুলে দাও। লক্ষ্মী আমার। দরজা জানালা বন্ধ করে রাখলে শ্বাস ফেলতে পারি না, কেমন কষ্ট হয়।

কিন্তু সে যদি আসে!

এলে তাকে বসতে বলবে।

মাই গড। পুলিশে খবর দেব না?

পুলিশে খবর দিতে নেই। শোনো।

মনীষ কাছে এগিয়ে গেলে সোমা বলল, তুমি ভালো হয়ে যাও। ভালো হলে আমাদের কোনো আর ভয় থাকবে না। না হলে তুমি পাগল হয়ে যাবে মনীষ। আমিও।

মনীষ বলল, আমি কি ভালো হব?

মানুষের অনিষ্ট করে টাকা কামিয়ো না।

মনীষ হাসল। মেয়েমানুষের মতো কথা। সে অবশ্য খুলে কিছু বলল না। কেবল বলল, ভাবা যাবে। এখন তো আমরা দরজা জানলা বন্ধ করে থাকি।

সোমা কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মনীষের ভিতর এক পাপ, টাকার পাপ, অথবা লোভ, চারপাশ থেকে এই বাড়ি, ফুল ফল বাগান ঘিরে ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে, মনীষ আর ইচ্ছে করলেও বোধহয় সরে আসতে পারে না। কিন্তু সোমা বুঝতে পারে এ—ভাবে বাঁচা যায় না। সে উঠে দরজা জানালা খুলে দিতে থাকল। বলল, হাওয়া আসতে দাও।

মনীষ বুঝতে পারল না কী করবে। সে খুব একটা জোরজারও করতে পারে না। সেদিন কেন যে মরতে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, আর সেই থেকে এক এক করে উপদ্রব। এবং মনে হয় এ—ভাবে চললে, ভয়ে সে নিজেই আত্মহত্যা করে বসবে। সে বলল, সোমা, আমরা কিন্তু কেউ খাইনি।

এই খাবার নাম শুনলে, অথবা মনীষ খায়নি শুনলে একটু স্বাভাবিক মুখ হয়ে যায় সোমার। সে টেবিলে বসে বলল, এসো।

ওরা দুজনে মুখোমুখি চুপচাপ খেতে থাকল। আজ যত টেলিফোন এসেছে সবার কাছে এক জবাব, মিস্টার দত্ত বাড়ি নেই। মিসেস দত্ত বাড়ি নেই। ওরা বাড়ির ভিতরই ক্যামোফ্লাইজ করে থাকবে ভাবল। কিন্তু বিকেলের দিকে একটা ফোন এল, ফোনে কে একজন কথা বলবেই। যত রসুল বলল, সাহেব বাড়িতে নেই, তত জেদ। বলছে, আমি জানি আছে, তুমি দাও। লাইনটা ওপরে দেবে কী না ভাবছে রসুল। সে যত বলছে, সাহাব নেই, তত সে বলছে, আছে, আমি জানি আছে। আমার সঙ্গে নেই বলে কী হবে!

আর লাইনটা দিয়েই রসুল, সাহাব, বাবুজী বলছে, আপনি আছেন ওকে নেই বলে কিছু হবে না!

মনীষের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। হাত ঠক ঠক করে কাঁপছে। সে কথা বলতে পারছে না দেখে তাড়াতাড়ি ফোন সোমা কেড়ে নিল। বলল, হ্যালো, কে আপনি।

বিনু বলছি।

বিনু! কেমন কিছুক্ষণ ফোনের ওপর সোমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। কিছু বলতে পারল না। বিনুর গলা, যেন অনেক দূর থেকে কেউ অভয় দেবার মতো কথা বলছে। এবং বিনু খুব সহজে বলে গেল, মনীষের শরীর কেমন!

সোমা ভেবে পেল না, এমন সব কথা বিনু বলছে কেন? সে বলল, ভালো। ভালো বলেও নিস্তার নেই, আর ভেবে পেল না বিনু কুশল নিচ্ছে কেন! বিনু তো কতদিন হয়ে গেছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর আর মনীষের কুশল নেয়নি। বিনুর ভাই, কী যেন নাম, এখন সুখী রাজপুত্র, স্বপ্ন দেখছে, পৃথিবী পালটে দেবে, সেই কী খবর দিয়েছে, দাদা তোমার বন্ধুর শরীর ভালো যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে খবর নেবে। সোমা বলল, হঠাৎ এ—কথা বললি কেন?

হঠাৎ নয়তো! মনে হল তোদের কিছু হয়েছে। আমাদের খুলে বলছিস না। তুই চলে যাবার পর এটা আমার মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, তোর কথাবার্তা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনিনি। তারপরই ভাবলাম তোকে একটা ফোন করি, তুই কেমন আছিস, মনীষ কেমন আছে?

সোমা বলল, ও! আমরা ভালোই আছি।

বিনু বলল, আমরা ভালো নেই। ভাইটি আমার ধরা পড়েছে। তবে ভাগ্য আমাদের, গুলি করেনি পুলিশ। তবে যা মেরেছে, ওর আর জীবনে কিছু করে খেতে হবে না।

কবে হল এটা।

তুই যাবার পরই খবর এল। আমরা গেলাম। আসলে সে বেশ ক'দিন আগেই ধরা পড়েছে। আমরা জানতাম না। দেখামাত্রই গুলি—এই নির্দেশ ছিল পুলিশের। যখন জানতে পারলাম, না তা হয়নি, প্রাণে বেঁচে গেছে, তখন সোমা, তোকে কী বলব, কী যে আনন্দ আমাদের। মা এখন আর দুঃখী না। জেলে আছে, আর কিছু হবে না এমন ভেবেছে। জেলেও অবশ্য ঠিক নেই। ওদের মেডিকেল ওয়ার্ডে আছে। দেখে এলাম। পাশ ফিরতে পারছে না। তবে বাঁচবে, মরবে না। ওরা তো এত সহজে মরে না!

কেন মরে না!

মরবে কী, ওরা তো বারবার এ—ভাবে মার খায়।

মার খেয়েও বাঁচে।

তা বাঁচে বোধহয়। না হলে এ—সব হচ্ছে কী করে!

সোমার ভালো লাগছিল না! মনীষ বুঝতে পারছে না এমন অন্তরঙ্গভাবে সোমা কার সঙ্গে কথা বলছে! একবার বলছিল সোমা, বিনু! বিনুর সঙ্গে তবে কথা বলছে! কিন্তু বিনুর সঙ্গে কথা বললে, সোমার তো এ—ভাবে কথা বলার স্বভাব না। কেমন অপরিচিতের মতো কথা বলছে, আসলে কী সেই লোকটা কখনও সোমার কাছে বিনু হয়ে যায় অথবা অশোক, অথবা অঞ্জন। সেই লোকটা কী পৃথিবীর সব ভালো কথা বলে বেড়ায়। সব মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র এবং আবাসের ব্যবস্থা থাকবে। সেটা তো ভালো কথা। সেটা তো সেও চায়। সব মানুষ সুখে থাকুক। কিন্তু সব মানুষ যখন সুখে থাকতে পারে না, তখন সে একা কী করতে পারে। সব মানুষের জন্য যখন সব থাকে না, কিছু কিছু মানুষের জন্য যখন সব থাকে, তখন তাকে বাধ্য হয়ে কিছু মানুষের দলে ভিড়ে যেতে হয়। সে বলল, কার সঙ্গে কথা বলছ?

বিনুর সঙ্গে।

বিনু কথা বলছে!

হ্যাঁ।

কী বলছে?

বলছে, তুমি কেমন আছো?

তবে আমাকে দাও, আমি কথা বলছি।

সোমার হাত থেকে মনীষ ফোন তুলে নিল। বলল, কীরে ব্যাটা বিনু! খুব উৎফুল্ল দেখাতে চাইল। সেদিন দেখা হবার পর যে ওদের বাড়িতে একটা ভয়ংকর কাণ্ড রাতদিন জেঁকে বসেছে, সেটা সে কথাবার্তায় একেবারে বুঝতে দিল না।

বিনু বলল, সোমা সেই লোকটাকে খুঁজে পেয়েছে!

মনীষ কী বলবে বুঝতে পারল না। সে সোমার দিকে তাকাল। সোমা চোখ টিপে বলল, বলে দাও, পাওয়া গেছে।

মনীষ বলল, পাওয়া গেছে!

যাক তবে নিশ্চিন্ত সোমা।

মনীষ তাকাল সোমার দিকে। সোমা বুঝতে পারছে না কী বলবে। ফোনের মুখে হাত রেখে বলল, বলছে, যাক তবে নিশ্চিন্ত!

বলে দাও, নিশ্চিন্ত।

মনীষ বলল, নিশ্চিন্ত।

বিনু এবার বলল, কে লোকটারে?

মনীষ কী বলবে! সে বলল, দাঁড়া জিজ্ঞেস করি! সে সোমার দিকে তাকিয়ে বলল, কে লোকটা জিজ্ঞেস করছে!

সোমা বলল, সে আছে।

মনীষ বলল ফোনে, সে আছে।

বিনু বলল, জিজ্ঞেস কর তো আমরা তাকে চিনি কি না?

মনীষ বলল, বিনু জিজ্ঞেস করছে, আমরা তাকে চিনি কি না!

সোমা বলল, না।

মনীষ বলল, না। আমরা কেউ তাকে চিনি না।

বিনু বলল, ভালো কথা না।

নিশ্চয়ই না।

বিনু বলল, সেই লোকটাই যত নষ্টের গোড়া।

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

সোমা কেন যে এ—ভাবে ঘুরে বেড়ায় বুঝি না!

আমিও না।

তারপর দুজনই চুপচাপ।

বিনু বলল, শুনেছিস!

কী!

বড়বাজারে হুজুরিমল আগরওয়ালের গলা কেটে দিয়েছে। একেবারে দিনের বেলা হাজার লোকের সামনে। তিন চারটি ছেলে এল। বলল, আপনারা যে যার কাজ করে যান। এদিকে তাকাবেন না। লোকটিকে আমরা দোষী সাব্যস্ত করেছি। বলে গোটা চারেক বোমা। ব্যাস ট্রাম বাস বন্ধ। রাস্তা ফাঁকা। দেখা গেল হুজুরিমল রাস্তায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। অত বড় ভুঁড়ি নিয়ে পড়ে আছে যে দেখলে পর্যন্ত কুৎসিত লাগে। পৃথিবীর সবকিছু বেনামিতে লোকটা গিলতে চেয়েছিল। ওরা ঠিক টের পায়। ভালোই হচ্ছে। একদিকে এটা তার কাম্য ছিল। না হলে শালা এই ভারতবর্ষের লোক মানুষ হবে না। এমন অসাম্য পৃথিবীর আর কোথায় আছে

জানি না। কিছু লোক কেবল ক্রমাগত বড় লোক হচ্ছে,...হচ্ছে...হচ্ছে। সেই ভাঙা রেকর্ডের মতো গলা। কিন্তু আশ্চর্য বিনু ফোনে হ্যাঁ হুঁ শুনতে না পেয়ে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। বলল, এই শুনছিস!

হ্যাঁ।

শুনতে পাচ্ছিস। আমি কী বললাম, শুনতে পাচ্ছিস!

হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি।

কিছু বলছিস না কেন?

কী বলব!

তোর কী মত!

আমার মত, এভাবে কি সমস্যা সমাধান হবে!

সমস্যা সমাধান কথাটা যেন ভীষণ লম্বা কথা। ভাগে ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। অনেক লম্বা অঙ্ক। অনেকবার, বারবার কষে কষে দেখতে হবে ব্যাপারটা কী। এবং এ—জন্য বোধহয় ওরা দুজনই চুপচাপ ফোনের দু প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কিছু বলছে না।

সোমা আর থাকতে না পেরে বলল, বিনু এত কী বলছে!

মনীষ বলল, একদিন আসিস।

যাব।

ছাড়ছি।

আচ্ছা।

ওরা দুজনেই ফোন ছেড়ে দিল।

কিছু বলছ না যে?

মনীষ সোফাতে গা এলিয়ে দিল। আসলে ও আর দাঁড়াতে পারছিল না। ওর হাত—পা কাঁপছিল। সে আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে বোধহয় পড়ে যেত। সে বলল, কিছু না।

কিছু না মানে।

কিছু না মানে কিছু না।

সোমা অধৈর্য গলায় বলল, এতক্ষণ কেউ কিছু না বলে থাকে না।

এখন এ—সব কথা ওর বলতে ভালো লাগছে না। সব ব্যাপারটাই ভীষণ গণ্ডগোলের। সে অবিশ্বাসের চোখে সোমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

এমনভাবে কী দেখছ আমার!

আচ্ছা সোমা, সত্যি কি তুমি সেই চোখ দুটোর খবর পেয়েছ!

সোমা হেসে দিল। বলল, বলতে হয় বলা।

মনীষ তবু বিশ্বাস করতে পারল না সোমাকে। সবাই কী তার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই বলল, সোমা, সে ওকে দেখেছে। সে বুঝতে পেরেছে লোকটা কে! অথচ এখন বলছে, বলতে হয় বলা। সেও আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারছে না। হুজুরিমল কি সব জেনে ফেলেছিল। ওর সংসারেও কি এমনভাবে একটা লুকোচুরি খেলা, ঠিক ডেথ ডেথ খেলার মতো ব্যাপার ঘটেছে! সে চিৎকার করে বলল, ঠিক তুমি ওকে খুঁজে পেয়েছ। আমার কাছে এখন তুমি মিথ্যা কথা বলছ!

কীসে কী যে হয়ে যায়! সোমা বলল, সত্যি বলছি, আমি জানি না। বিনুর এত ঔৎসুক্য আমার ভালো লাগছিল না। এ—জন্য বলছি সে আছে।

মনীষ আর পারছে না। সে আবার চিৎকার করে বলে উঠল, এখানে আর থাকছি না। আমি ঠিক পালাব।

এবং সে রাতেই মনীষ কলকাতা ছেড়ে একা পালাল। কাউকে কোনো ঠিকানা দিয়ে গেল না। সোমা সকালে সবাইকে ফোনে জানাল, গতকাল থেকে মনীষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এখন কী যে করি!

চৌদ্দ

সুতরাং সকালের দিকে বাড়িতে একটা থমথমে ভাব। সোমা সবাইকে ফোনে খবরটা দিয়েছে। পুলিশে এখনও খবর দেওয়া হয়নি। মনীষ একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। শুধু লিখেছে, আমি যাচ্ছি। কলকাতায় থাকলে, আমি পাগল হয়ে যাব। কাউকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। সংসারে এ—সব যখন হচ্ছে, তখন তাকে নিবৃত্ত করা যাবে না। পরিচয়হীনভাবে কিছুদিন থাকছি। এ—সময়ে বোধহয় এর চেয়ে আর বড় উপায় আমার জানা নেই। আমার জন্য চিন্তা করবে না। বড়বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে কারখানা চালাবে। আর মনে রেখো, ইচ্ছা করলেই সব একদিনে পালটানো যায় না। তুমি হলেও পারতে না। আমরা সবাই ভীষণ অসহায়। অসহায় হলে প্রত্যেক মানুষই নিজের নিরাপত্তার জন্য যে—ভাবে হোক টাকা রোজগার করে যাবে। এখন তুমি যা ভালো মনে কর করবে। সোমা চিঠিটা বারবার পড়ে অনেক ভেবেছে। এখন কার কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়, বিনুকে ডাকলে হয়, সুধীর অথবা অশোক এবং অসিতবাবু, এরাই তাকে কী করা দরকার পথ বাতলে দিতে পারে।

প্রথম ওর দরকার বিনুর সঙ্গে। প্রথমে সে বিনুকেই ফোন করছিল।

বিনুর পাশের বাড়িতে ফোন আছে। ওর নেই। দরকার—টরকার পড়লে ডেকে দেয়। এমন সকালে কে ফোন করছে সে বুঝতে পারল না। সে ভাবল, বোধহয় পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে। কারণ হাসপাতালে ওর ভাই। ওর ভাই কি তবে মারা গেছে! ফোন যখন কিছু আরজেন্ট ব্যাপার। না হলে এমন সাতসকালে কেউ ফোন করে না। ওর বুকটা ফোনের খবর পেয়েই ধক করে উঠেছিল। মা ছুটে এসেছিল, ফোন, ফোন কেন রে!

এমন সময়ে বাড়ির সবাই খুব সতর্ক থাকে। যেন যে—কোনো সময়ে ফোনে একটা দুর্ঘটনার খবর আসবে। পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, এবং অসুস্থ সে, হাসপাতালে আধমরা হয়ে পড়ে আছে শুনে মা যেন খুব নিশ্চিন্ত ছিল। যা—হোক এখন আর তত ভয় নেই। বাইরে থাকলেই ভয়। কে কখন কোনদিক থেকে আক্রমণ করবে ঠিক কী। এখন তো শোনা যাচ্ছে, দলের ছেলেরাই দলের ছেলেদের খুন করছে। অবিশ্বাস দানা বাঁধলে যা হয়। আর তখনই কিনা সাতসকালে ফোন। মার উদবিগ্ন মুখ দেখে বিনু বলেছিল, যাচ্ছি। এত উতলা হলে চলবে কেন!

বিনু সাহস পাচ্ছিল না ফোনের কাছে যেতে। এটা আজকাল তার নিজেরও হয়েছে। বাবা মারা যাবার পর সেই ছোটভাইদের মানুষ করার ভার নিয়েছিল। সে নিজে আর বেশি পড়াশোনা না করে, সংসারের রোজগার কী করে বাড়বে এবং ভাইয়েরা কী করে মানুষ হবে এই ছিল তার একান্ত দায়িত্ব। আসলে সে ওদের মানুষ করছিল নিজের ছেলের মতো। এদের নিয়েই তার সব কিছু। এদের ছাড়া সে নিজেকে ভাবতে পারে না। এবং কোনো ফোন এলেই কী যেন ভয়াবহ একটা খবর রয়ে গেছে মনে হয় ফোনে।

সে কোনোরকমে ফোন ধরলেই শুনল, সোমা কথা বলছে। সে আর ভয়ের কিছু ভাবছে না। বোধহয় কোনো পিকনিক টিকনিকের খবর দেবে সোমা। ওদের তো কোনো চিন্তাভাবনা নেই তাকে সেটা জানাতে চায়। সে বলল, কিরে কেমন আছিস!

সোমা কেমন কথা বলতে পারছে না। ওর গলা জড়িয়ে আসছে। সে তবু যেন কোনোরকমে বলল, আমার সর্বনাশ হয়েছে! তুই শিগগির চলে আয়।

বিনু বলল, কী বলছিস যা তা।

কী আর বলব, আয়।

কী হয়েছে বলবি তো!

না এলে বলতে পারছি না। তুই আয়। আমি মরে যাব বিনু একা থাকলে আমি মরে যাব।

যাচ্ছি। বিনু বাড়ি ফিরে দরজায় দাঁড়িয়েই বলল, মা সোমা আমাকে ডেকেছে। ফোনে আমাকে যেতে বলেছে। সে সোমার সর্বনাশের কথা বলল না। বলল না এইজন্য যে, বললে, আরও দশটা কথা বলতে হবে। ওর তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। তা ছাড়া যে—কোনো ঘটনাতেই মা এমন করতে থাকেন যে, নিজের হোক পরের হোক, একেবারে কেমন বিষণ্ণ হয়ে যান। মাকে এ—সময়ে আর দুঃখে ভাসিয়ে কাজ নেই।

মা বলল, কিছু খেয়ে যাবি না? এই সাতসকালে বের হচ্ছিস!

ওখানে খাব। তুমি ভেবো না।

সে যখন চলে যাচ্ছিল, রাস্তায় হনহন করে হাঁটছিল, মা তখন জানালায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, কখন ফিরবি!

হয়ে গেলেই ফিরব।

এখন এমন একটা সময় যে, বের হয়ে গেলে কেউ আর ফিরবে কি না ঠিক থাকে না। কেউ ওকে, সোমা ডাকছে বলে, ডেকে নিয়ে গেল না তো! আজকাল তো এ—ভাবেও অনেক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। বিনু চলে গেল। ওকে আর দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে এমন অরাজকতার ভিতর বিনু কেন যে এত সকালে বের হয়ে গেল। জানলায় মার মুখ দেখলে এ—ছাড়া এখন আর কিছু মনে হবে না। সংসারে বিনুই ওদের পারাপারের কড়ি। সে না থাকলে সংসারের কী হতে পারে, ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

বিনু সোমাদের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। সব ঠিকঠাক আছে। রসুল গেটে পাহারা দিচ্ছে। সেই মাধবীলতার গুচ্ছ গুচ্ছ নীলাভ পাতাসকল চারপাশে দেয়ালের, সেই মারবেল বিছানো পথ, সেই ইউক্যালিপটাসের গাছ আর সেই কামিনী ফুলের গাছ, শীতের সময়, এবং শীতকালীন রোদে একটা ভারি মনোরম আমেজ আছে। একটা শীতের কাক পর্যন্ত ডাকছে দেয়ালে। দুটো একটা শালিক পাখিও সে দেখতে পেল। কেবল মনে হচ্ছিল, দু'জনের পক্ষে এটা সত্যি খুব বড় বাড়ি। ও—পাশে গ্যারেজ। সে ভেবেছিল, কোনো একটা খুন—টুনের ব্যাপার হবে। কিন্তু এমন নিরিবিলি এতবড় বাড়িটা দেখে, সে বুঝতে পারছে না, কী হয়েছে! সে ভিতরে ঢুকল, রসুল উঠে সেলাম দিল। বিনু ভাবল একবার রসুলকে জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু এ—বাড়ির আভিজাত্যের খবর সে রাখে। ভিতরে কী হচ্ছে না হচ্ছে, ওরা সহজে জানতে পারে না। জানতে পারলেও না—জানার ভান করে থাকে। খুব নিজের লোক না হলে কিছু প্রকাশ করে না। বিনুকে রসুল দুবার কী তিনবার বেশি হলে দেখেছে। সুতরাং রসুলের কাছেও কোনো খবর সে পেতে পারে না। সে প্রায় ছুটে নুড়ি—বিছানো পথের ওপর দিয়ে বের হয়ে গেল এবং কাঠের সিঁড়ি প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেল। কিন্তু লম্বা করিডোরে কেউ নেই। খাঁ খাঁ করছে যেন। সে দেখেছে এখানে এই করিডোরে এলেই কেউ—না—কেউ দাঁড়িয়ে থাকে ওকে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য। এবং এমন অবস্থায় পড়লে ঘাবড়ে যাবার কথা। সে এখন কী করবে ভেবে পেল না।

আর তখনই দেখল, সোমা শীতের চাদর গায়ে কেমন পীড়িত চোখে মুখে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এতবড় বাড়িতে এভাবে না হাঁটলে বুঝি সৌন্দর্য বাড়ে না। সোমা এই সকালেও সুন্দর করে সেজে বসে আছে, ওর চুলে কোনো অন্যমনস্কতা নেই, পরিপাটি করে চুল বাঁধা। সোমা কী সকালে উঠেই চুল বাঁধতে বসেছিল। সোমা যে গতকাল খুব সুন্দর করে সেজে বসেছিল, মনীষ ফিরলেই অনন্ত জলরাশি আছে পৃথিবীতে, সেই জলরাশিতে অবগাহন কী যে আরামের এবং লম্বা বিছানায়, সাদা চাদরে সোনালি ফুল ফল আঁকা চাদরে কেবল সাঁতার কাটা এবং নরম বিছানার সঙ্গে কেবল মিশে যাওয়ার জন্য এ—মেয়ে যে গতকাল সেজে বসে থেকে সারারাত প্রতীক্ষায় ছিল, মনীষ ঠিক ফিরবে, ফিরছে, অনেক রাতে ওর মনে হল মনীষ ফিরছে না, টেবিলে একটা চিঠি, চিঠিটা আবিষ্কারের পর সে চুপচাপ সারারাত একই জায়গায় বসেছিল। নিথর। টেবিল থেকে এই সকালে মাত্র সে ফোন তুলে এক এক করে সবাইকে ফোন করছে। প্রথমে বিনুর পালা।

বিনুকে দেখে সোমা বলল, আয়।

বিনু পার্লারে ঢুকে গেল সোমার সঙ্গে।
বিনু বলল, কী ব্যাপার বলতো!
বোস।
বিনু বসল। সোমাও ধীরে ধীরে বসল। সোমা বিনুকে অপলক দেখছে। এত বেশি বিনুকে দেখছে, যে বিনুর ভীষণ সংকোচ হচ্ছিল। যেন এই যে সর্বনাশ ঘটেছে, কী সর্বনাশ সে এখনও জানে না, তবু একটা কিছু যখন ঘটেছে, তার জন্য দায়ী বিনয়, এবং বিনয়ের দিকে এমন একটা চোখেই যেন তাকিয়ে আছে সোমা। কিছু বলছে না।
বিনু বলল, মনীষ কোথায়?
সোমা বলল, বোস বলছি।
সোমা, মনে হয় কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না, অথবা কোথা থেকে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না। সে বলল, আমি কীভাবে আরম্ভ করব ঠিক বুঝতে পারছি না।
বিনু বলল, কী হয়েছে বলবি তো!
সোমা ধীরে ধীরে বলল, মনীষ চলে গেছে।
কোথায়!
জানি না।
কিছু বলে যায়নি!
না।
কবে গেল?
কাল!
কাল কখন!
রাতে। আর ফিরে আসেনি। টেবিলে চিঠি। আমি চলে যাচ্ছি। বলে চিঠিটা বিনুকে পড়তে দিল।
বিনু চিঠিটা পড়ল। বিনু পাজামা পাঞ্জাবি পরেছিল। সে সেই পরে চলে এসেছে। দুদিন পরেছে বলে খুব চাকচিক্য নেই জামাকাপড়ে। তবু বিনুর চোখেমুখে কী যেন আছে, যা দেখলে খুব নিজের মানুষ মনে হয়। সব সহজেই বলা যায়। বিনু পড়ে বলল, খুব ছেলেমানুষ তো!
তুই বল বিনু, এটা ছেলেমানুষী না!
আপাত তাই মনে হচ্ছে। ওকে কী কেউ ভয়—টয় দেখিয়ে ছিল?
সোমা ভাবল বলবে কী বলবে না। কিন্তু একজনকে তো বলতেই হবে। বিনু বাদে তার এ—মুহূর্তে নিজের কে আছে! বিনু অথবা অসিতবাবুর পরামর্শমতো চলা দরকার। পুলিশে খবর দিতে হবে কিনা তাও পরামর্শ করে জেনে নিতে হবে। অসিতবাবু মনীষের বন্ধু। মনীষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কম। মানুষটাকে মনীষ যত জানে, সে ঠিক ততটা জানে না। বরং বিনুকে সোমা অসিতের চেয়ে ভালো জানে। বিনু কখনও অপকার করতে পারে না। তাকেই সব খুলে বলা যেতে পারে।
বিনু বলল, সেই লোকটার খবর পেলি!
সোমার যেন খুব শীত করছে। সে চাদরটা আরও ভালো করে জড়িয়ে নিল। কিন্তু তাতেও শীত যাচ্ছে না। সে বলল, বিনু আয় আমরা সামনের করিডোর পার হয়ে পুবের ছাদে গিয়ে বসি। সেখানে বোধহয় এতক্ষণে রোদ এসে গেছে।
সোমা এবং বিনু সোমার শোবার ঘর অতিক্রম করে ছাদে চলে এল। এতবড় শোবার ঘর কেউ ব্যবহার করে পৃথিবীতে! এবং এমন সব ছবি, ছবিগুলো সব অদ্ভুত ধরনের, ছবিগুলো সব ন্যুড এবং ছবিগুলো দেখলে মাথায় রক্ত উঠে আসে অথবা এক লহমায় উত্তেজনা। এ—সব ছবি দেখলে তো মানুষের ভেতর এমনিতেই সবসময় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠার কথা, ওরই তো শরীর কেমন করছে, অথচ সোমা নির্বিকার! যেন

ওতে কিছু নেই। ব্যবহারে ব্যবহারে সোমা কিছুটা ভোঁতা হয়ে গিয়ে থাকবে! তা না হলে, সোমা কিছুতেই এ—ভাবে এখানে নিয়ে আসতে পারত না। অথবা মনীষের জন্য মাথা ঠিক নেই। ওর খেয়ালই নেই, এ—ঘরে পৃথিবীর দুজন মানুষ ঢুকতে পারে, মনীষ দত্ত এবং সোমা দত্ত তাদের নাম। আর ঢুকতে পারে মনোরমা।

সোমা বলল, পেলাম না।

বিনু বলল, আসলে তোর মনের ভুল এটা।

এখন আমারও মনে হয়।

তুই কাউকে ও—ভাবে জানিস না।

কিন্তু চোখ দুটো যে বড় চেনা!

তাই হয়। আসলে কী জানিস! বলে বিনু বেতের চেয়ারে বেশ আরামে হেলান দিল। চাদর ভালো করে জড়িয়ে নিল শরীরে। সামনে একটি টিপয়। সাদা ঝালরে ঢাকা এবং মীনা করা, মনে হয় হাতির দাঁতের কারুকার্য আছে ওতে। সে চায়ে চুমুক দিল।

সোমা চায়ে চুমুক দিল না। হাতে নিয়ে বসে থাকল। আসলে কী জানিস—তারপর বিনু কী বলবে শোনার প্রতীক্ষাতে সে উদগ্রীব। বিনু কিছু না বলা পর্যন্ত সে চা খেতে পারছে না।

বিনু বলল, আসলে কী জানিস, আমরা মনে মনে যা ভাবি তা পাই না।

সোমা বলল, মানে!

মানে এই দ্যাখ না, কত আশা ছিল আমার। পৃথিবী জয় করব আশা ছিল, কিন্তু হল কোথায়! এখনও কিন্তু ভাবি, ঘরে ফিরেই একটা চিঠি পাব। মনে হয় কেউ আমাকে একটা চিঠি দেবে, তা পেয়ে আমি আঁৎকে উঠব, এবং সেখানে আমার রাজ্য জয়ের খবর থাকবে। প্রতিদিন এভাবে কেটে যাচ্ছে, চিঠি আসছে না, তবু রোজ ভাবি চিঠি আজ হোক কাল হোক আসবে।

সোমার এতসব কথা ভালো লাগছিল না। সে সোজা বুঝতে চাইছিল। রহস্যটা কোথায়! কিন্তু বিনু এমনভাবে নিজের কথা বলছে যে, সে যেন তার নিজের কথা শোনাতে এসেছে এখানে। সোমার যে এমন একটা বিপদ তা আমলই দিচ্ছে না। মনীষের এটা ছেলেমানুষী ভাবছে। সেও কথার পিঠে কথায় সায় দিয়ে গেছে, ছেলেমানুষী বলে। কিন্তু পর পর যা ঘটনা একে একে ঘটে গেছে, এবং যেভাবে ওরা ক্রমে অস্থির হয়ে উঠেছিল, তাতে যে—কোনো মানুষের পক্ষে পাগল হয়ে যাওয়া সম্ভব। সে বলল, তোকে সব বলিনি বিনু। শুনলে কিন্তু আর সমাধান খুঁজে পাবি না।

বিনু বলল, সমাধান নেই এমন ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে না। বলে কেমন দার্শনিক চোখে তাকিয়ে থাকল বিনু।

সোমা তারপর সব ঘটনা খুলে বলে একে একে প্রশ্ন করে গেল, চিঠিটার ব্যাপারে কী মনে হয়!

বিনু বলল, চিঠির ব্যাপারে তোকে আগেও বলেছি।

সবই এত সরল তুই ভাবিস! এত সহজে সমাধান! সোমা ভাবল, আসলে বিপাকে পড়েছে সোমা, কাজেই গুরুত্ব দিচ্ছে না। যে—ভাবেই হোক ওকে বোঝানো যত সহজ ভাবছে বিনু, ব্যাপারটা, তত সহজ নয়। সে বলল, জানিস একরাতে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে!

বিনু খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল, কী!

মনে হল, আমার সেই মানুষটি, বড় মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং সোমা সে রসুলকে নিয়ে এক রাতে বের হয়েছিল সে কথাও বলল। তারপর সেই বৃদ্ধ মানুষের খবর, তার আগুন জ্বালিয়ে বসে থাকা, কেউ তার কাছে আসে, খড়কুটো দিয়ে যায় তাও বলল। সোমা বলল, আমার মনে হয়েছিল, সেই লোকটাই অঞ্জন।

বিনু খুব অনায়াসে বলে ফেলল, তা হতে পারে।

কিন্তু তারপরের ব্যাপারটা কী হবে!

সেটা আবার কী?

এসে দেখলাম গাড়ি বারান্দার ছাদে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

তা থাকতে পারে!

কী করে!

অন্য কেউ কি গাড়ি বারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না?

ভোর রাতে কে আসবে।

তোমার বাড়িতে মানুষের তো অভাব নেই।

কেউ তো স্বীকার করল না।

স্বীকার না করলেই দাঁড়াবে না সে কথা কে বলল!

এমন সহজ কথা স্বীকার করতে ক্ষতি কী!

সোমা ভাবল কত অনায়াসে সমাধান বিনুর। আসলে বিনু মানুষটাই এ—স্বভাবের। সহজে সবকিছু ভেবে নেওয়ার স্বভাব। সে বলল, বাড়িতে এতসব ঘটনা একের পর এক ঘটছে, আর কেউ আর একটা নতুন ঘটনা ঘটিয়ে ব্যাপারটাকে আরও ঘোরালো করে তুলবে আমার বিশ্বাস হয় না।

বিশ্বাস সহজে কিছু হয় না। তোমার বাড়িতে মনোরমা আছে, রসুল আছে, রামঅবতার না কে আছে, মালিরা আছে। মনোরমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক যে তোমাদের অগোচরে কেউ ঘটায়নি সে কে বলবে।

বুঝতে পারছি না। বলে সোমা তার চাদর দিয়ে শরীর যেন আরও ঢেকে দিল। পুবের বারান্দার মতো ছাদের এ অংশটা। বেশ শীতের রোদে ওরা দুজনই বেশ উষ্ণতা ভোগ করছে। কারও এখন বিশেষ শীত করছে না। সোমা বলল, অবাক!

অবাক হবার কিছু নেই। তুমি বাড়ি নেই, মনীষ ভয়ে কাতর, রামঅবতার অথবা তোমাদের মালিদের কেউ সে—সময় মনোরমার ঘরে যায়নি এবং তোমার ফিরে আসার খবর পেয়ে বের হয়ে আসেনি, গাড়ি বারান্দায় একপাশে অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে নিজেকে গোপন করেনি কে বলবে।

সোমা কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারেনি। হতে পারে। এমন একটা ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে কেউ স্বীকার করবে না বুঝতে পারে। সে বলল, তবে সেই বাথরুমে....।

বাথরুমে মানে!

বাথরুমের আয়নায় দেখলাম, ঠিক সেই চোখ দুটো, আমি যেমন যেমন ভাবে অঞ্জনকে ভেবেছি, ঠিক হুবহু সেই মানুষটা আয়নায় দাঁড়িয়েছিল।

তা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বইকি!

এবারে সোমা ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। সে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ ঝুঁকে বলল, দাঁড়িয়ে থাকতে পারে মানে! কী বলছিস সব!

তুই ভীষণ উত্তেজিত সোমা। তোর মাথায় সবসময় সেই চোখদুটো, সেই মানুষের হুবহু ছবি চলাফেরা করছে। তোর একটা ইলিউসান দেখা অস্বাভাবিক না।

সোমা বলল, তুমি কি আমাকে গ্রাম্য বালিকা ভেবেছ বিনু! তুমি কী বলতে চাও বুঝি না। ওরা এখন তুমি তুমি করে কথা বলছে। গুরুত্বপূর্ণ কথার সময় এটা বোধহয় হয়।

আসলে সোমা, এবার বিনুও উঠে দাঁড়াল, আমরা সবাই শৈশবে নানাভাবে স্বপ্ন দেখে থাকি। তোমার শৈশবেও স্বপ্ন ছিল। সব মানুষের স্বপ্ন এক রকমের থাকে না। তোমার শৈশবে কী স্বপ্ন ছিল বললে, ব্যাপারটা আরও সহজ করে বোঝানো যেতে পারে।

শৈশবে আমি একটা প্রতিশোধের কথা ভাবতাম কেবল। বাবার আত্মহত্যার কথা মনে হলেই এটা মনে আসত।

বিনু বলল, তোমার বাবা আত্মহত্যা করেছিলেন!

সোমা এমন গোপন পারিবারিক কথা এত অনায়াসে বলে ফেলে অবাক। কেউ জানে না, কেবল শৈশবে সেই দুঃখের দিনে যারা তার চারপাশে ছিল ওরা জানত। সে যে বিনুকে কোনোদিন কথাটা বলেনি, কেবল বিনু কেন, মনীষও জানে না, সেই আত্মহত্যারখবর, তার মা একজন ধনী ব্যক্তির রক্ষিতা, এ—সব খবর সে কাউকে বলেনি, বলেছে বলে অন্তত এই মুহূর্তে মনে করতে পারছে না, সে বলল, বিনু তুমি যখন সব জেনেছ এটা না জানলে বাকিটুকু বুঝতে পারবে না। আসলে বাবা আমার খুব দুঃখী লোক ছিল। মা ছিলেন ভীষণ সুন্দরী এবং বাবার আত্মহত্যার মূল কারণ ছিল সেই ধনী ব্যক্তির লোভ এবং মার নিদারুণ অসহায় মনোভাব। তুমি জানো না হয়তো আমার মাকে পাবার জন্য নানাভাবে একটা সামাজিক চাপ ছিল বাবার প্রতি। সেই অসাম্য চাপের বিরুদ্ধে আমার ভীষণ বিদ্রোহ ছিল। আমি চাইছিলাম কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়াবে, সে আমার সঙ্গে একটা জয়েন্ট কমান্ডো তৈরি করবে। একজন সৎ মানুষের কথা সবসময়ই ভাবতাম। এবং মনে হত, সেই মানুষ আমাকে বারবার বলেছে, তুমি সোমা কাজল পর না। আমি এতদিনে মনে করতে পারছি কে আমার মনের মানুষ। কাজল পরলে সঠিকভাবে পৃথিবীকে চেনা যায় না। বলতে বলতে সোমা কেমন হাঁপিয়ে উঠল। সে আর বোধহয় দাঁড়াতে পারছিল না। সে সোফাতে নিদারুণ দুঃখী যুবতীর মতো বসে থাকল। মাথার ওপর এতবড় আকাশ রয়েছে, শীতের সময় বলে বাগানে কত রক্ত—গোলাপ, আর চারপাশে নিরিবিলি সব গাছপালার ভিতর এক আশ্চর্য মহিমা আছে সে বুঝতে পারছে না।

বিনু বলল, তাহলে তোমার নিজের কথাতেই আসা যাক। তুমি এ—ভাবে একজন মনের মানুষ চেয়েছিলে পাওনি। বরং উলটো এমন একজন তোমার কাছে হাজির যাকে তুমি চাওনি। বলে একটু থামল। কী ভাবল। —আচ্ছা সেদিন যাকে বাথরুমে দেখেছিলে সে দেখতে কেমন।

ভারি সুন্দর।

তুমি সোমা এমন একজন মানুষকেই চেয়েছিলে সঙ্গে। কিন্তু মানুষের দোষ কতভাবে যে থাকে। তাকে তুমি পাওনি, না পেয়ে ভালোই হয়েছে। পেলে তার দাম থাকত না। সারাদিন তুমি তবে আরও একাকী থাকতে। সে একাকিত্ব আরও মারাত্মক।

সোমা কিছুক্ষণ কথা না বলে একটু নিজের ভিতর ফিরে আসতে পেরে বলল, তবে চিঠিটা!

চিঠিটার কথা তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি ভয় পাইয়ে দেওয়া।

তবে তুমি বলছ, এই যে হত্যাকাণ্ড সব ঘটছে এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

আমার মনে হচ্ছে, না।

আর ঠিক সে—সময়ই ফোনে কে যেন সোমাকে চাইছে।

সোমা উঠে গিয়ে ফোনে কী শুনতে শুনতে টেবিলে মূর্ছা গেল। বিনু ছুটে গেল টেবিলের কাছে। সে ফোনটা কেড়ে নিয়ে বলল, কে? সোমা টেবিলের ওপরই পড়ে আছে। সে ফের বলল, হ্যালো, কে বলছেন! এবং সে বুঝতে পারল পুলিশ অফিস থেকে ফোন। কেউ যেন বলছে, মনীশ দত্তের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, আপনি কে!

সে বলল, মনীশ দত্তের স্ত্রী মূর্ছা গেছে।

তবে শুনুন। একটা লাশ পাওয়া গেছে। ব্যান্ডেলের কাছে রেললাইনের ধারে পাওয়া গেছে। ওর ডায়রি থেকে সব খবর জেনে ফোন করছি।

বিনুর হাত কাঁপছিল। সেও বোধহয় মূর্ছা যেত। সে বলল, আপনাদের ঠিকানা!

লালবাজার, স্পেশাল স্কোয়াডে খবর নেবেন।

বিনু এখন কী করবে বুঝতে পারছে না। সে প্রথমে সোমাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে চিৎকার করে ডাকল, রসুল! মনোরমা!

পনেরো

বিনু প্রথমে অশোককে ফোন করে বলল, সুধীরকে নিয়ে শিগগির চলে আয়। সোমাদের বাড়িতে চলে আয়। মনীষ খুন হয়েছে।

ও—পাশ থেকে কথা বলার আগ্রহ ছিল, কিন্তু বিনুর এক ধমক। —যা বলছি কর। এসে সব শুনতে পাবি।

অশোক বের হয়ে সুধীরের খোঁজে গেল। সুধীর সকালে বাড়ি থাকে না। রোববার, বাড়ি না থাকারই কথা। সকালের দিকে ক্লাবে আড্ডা দেবার স্বভাব। ক্লাবে গিয়ে দেখল সেখানেও নেই। ক্লাবের একটা ছেলে বলল, বীরেনবাবুদের বাড়িতে গেছে। ও—পাশের গলিতে ঢুকে একটা নীল রঙের সাইনবোর্ড দেখবেন, তার পাশের বাড়িটা বীরেনবাবুদের। এবং এ—ভাবে, অশোক ঠিকঠাক পেয়ে গেল সুধীরকে। সুধীরকে সে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে পড়ল। কিছু বলছে না, সুধীর সব শুনলে নাও যেতে পারে। ও যা স্বভাবের মানুষ! কিন্তু সোমার এমন বিপদে সে স্থির থাকতে পারছে না। সোমার বিয়ের পর মনে মনে সে সোমা অসুখী হোক চাইছিল, মনীষের কিছু একটা হয়ে যাক, কিছু একটা হয়ে গেলে, সোমা ওর কাছে আবার ঘুর ঘুর করতে পারে অথবা অসম্মান করে সোমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে, কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর সে নিজেই ভারি দুঃখী লোক হয়ে গেছে! আসলে বিপদটা তার নিজের যেন। সে ট্যাক্সিতে উঠে বলল, মনীষ খুন হয়েছে!

সুধীর বলল, কী বলছিস যা তা!

সত্যি বলছি।

কোথায় খুন হয়েছে!

জানি না।

কখন খুন হয়েছে!

জানি না। বিনু সোমাদের বাড়িতে। সে তোকে নিয়ে যেতে বলেছে।

সুধীর বলল, আমি এ—সব খুন—টুনের সঙ্গে জড়াতে চাই না। আমাকে নামিয়ে দে। ও—সব আমার সহ্য হয় না। সহসা খুন—টুন ভালো ব্যাপার নয় এমন বুঝে বলে ফেলল।

অশোক বলল, তুই কী বলছিস!

সুধীর বলল, আগে বলবি তো। দিনকাল যা যাচ্ছে, এখন এ—সবে কেউ মাথা গলায়!

সোমার কথা ভাব!

ধুস সোমা। বড়লোক খুন—টুন হবে বেশি কী! সোমা আবার একটা বিয়ে করে নেবে। আমাকে ছাড়, আমি যাব না।

অশোক বলল ঠিক আছে। তুই নেমে যা। আমাকে যেতেই হবে।

এবং ট্যাক্সি কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে থামলে অশোক বলল, বিনু একা সব দিক সামলাতে পারবে না, বোধহয় এ—জন্য তোকে নিয়ে যেতে বলেছিল।

সুধীর কী ভাবল। এ—ভাবে নেমে যাওয়াও যেন ঠিক হচ্ছে না। অশোকের ওপর রাগ হচ্ছিল খুব। খুন—টুনের ব্যাপারে জড়ালে শেষ পর্যন্ত কী হয় তার জানা আছে। কার দায় কোথায় গড়ায় কে জানে। ওর এ—ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞতা হয়েছে। রাস্তায় কে মেরে গেল, আর কেউ রাস্তা ধরে চলে গেল, পুলিশ তাকেই তুলে নিল, সে একবার এ—ভাবে থানায় চলে গিয়েছিল। তার মা বাবা থেকে চোদ্দ গুষ্টির কথা জেনে ছেড়েছিল। মারধোর করেনি এই যা রক্ষে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ভেবে ফেলে, অশোক এবং বিনু যাচ্ছে, অশোক ঠিক বিনুকে বলবে, বিনু ভাববে, সুধীর কাপুরুষ, সোমা হয়তো কোনোদিন তার কথা আর ভাববে না। সোমার কথা ভেবে বলল, চল।

অশোক বলল, অসুবিধা হলে থাক।

সুধীর বলল, বুঝিস না কেন? আমরা ছা—পোষা লোক। কোর্ট—কাছারি করতে পারি না।

এখানে কোর্ট—কাছারির কী হল!

ট্যাক্সি যাচ্ছে। একটু জোরে চালাতে বলেছে অশোক। এবং সুধীর শেষ পর্যন্ত কিন্তু বরং অশোকের চেয়ে বেশি করিতকর্মা মানুষ হিসেবে প্রায় সোমাদের বিশাল বাড়ির সদর দরজায় নেমে একেবারে লাফিয়ে লাফিয়ে ঢুকে গেল। কোর্ট—কাছারি কথাটা তার মনে থাকল না। এবং নিঝুম এই বাড়িতে পুলিশের এক গাড়ি। কালো রঙের পুলিশের গাড়ি। মৃতদেহ শনাক্ত করার কথা। মনীষের ব্যবহারিক সব, এই যেমন সুটকেস, মানি ব্যাগ ডাইরি সব দেখানো হচ্ছে। সোমা সকাল বেলাটায় বোধহয় সংজ্ঞা হারানো অবস্থায় কাটিয়েছে। এখনও ঠিক হুঁশ নেই তার। তবু দেখে দেখে বুঝে নিচ্ছে সবই মনীষের, তারপর ওদের যেতে হবে গাড়িতে। দুটো গাড়ি বিনু ঠিকঠাক করতে বলেছে। একটা গাড়িতে অশোক, সুধীর এবং অসিতবাবু। একটা গাড়িতে মনোরমা, রসুল, বিনু, সোমা। সামনে পুলিশের গাড়ি। এবং শীতের সকালে রোদ বেশ, ছুটির দিন বলে চৌরঙ্গি পাড়ায় ভিড় নেই। সকালে সব ছেলেমেয়েরা নিত্যদিনের মতো খেলা করছে। এবং গাছে গাছে তেমনি বাতাস, আর সেই বুড়ো লোকটা আগুন জ্বেলে ঠিক বসে রয়েছে। পুলিশের রিপোর্টে তার সব বর্ণনা থাকবে। সোমাকে সবই খুলে বলতে হবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

কখনও মনে হয় ওরা মিছিল করে যাচ্ছে। আগে পুলিশের গাড়ি, পরে সোমাদের গাড়ি, পেছনে অশোকদের গাড়ি। ওদের দুটো গাড়িই দামি। বড়লোক খুন—টুন হলে এমনি হয়ে থাকে। অবশ্য পুলিশ থেকে এটা খুনের ঘটনা বলতে পারছে না। আবার আত্মহত্যার ঘটনাও বলতে পারছে না। ট্রেনে কাটাও বলতে পারছে না। ট্রেনে কাটা পড়েছে। প্রথম শ্রেণীর রিজারভেশান দূরপাল্লার গাড়ি। এবং ব্যান্ডেল ছাড়তে না ছাড়তেই ঠিক মগরার গুমটি ঘরের কাছে লাশ পাওয়া গেছে। তার যেহেতু পকেটে ছোট্ট ডাইরি ছিল, খোঁজখবর নিতে সময় লাগেনি। মনীষ দত্ত যে মর্গে চালান যাবে এবং লাশের পাশে ডোম হোমরাজ সাহনি দাঁড়িয়ে আছে, পুলিশের গাড়িতে কাক, এ—সব বিনু সোমার মুখ দেখতে দেখতে মনে করতে পারল। সোমাকে সে সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে।

ওরা বেশ বড় বাড়িটার সদর গেটে ঢুকে গেল। তারপর আরও ভিতরে। একদল পুলিশ দূরের মাঠে প্যারেড করছে, ঠিক প্যারেড না করলেও প্যারেডের মতো মনে হয়, কারণ ওরা প্যারেড করে বের হয়ে গেছে। এবং গাড়িতে একদল সাদা ইউনিফর্ম পরা পুলিশ বের হয়ে গেল, আর মোটর বাইকের শব্দ, সার্জেন্ট, সাব—ইন্সপেক্টর এবং আরও বড় অফিসারদের ওরা দেখতে পেল করিডোর দিয়ে যাচ্ছে! ওদের গাড়ি এবং সোমাকে দেখেই পুলিশের চোখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ওরা বুঝতে পারছে একজন বড়লোকের বউ এসেছে স্বামীকে শনাক্ত করতে। ওরা যে যার সিটে অথবা গাড়িতে বসে থাকতে পারছিল না। খুন—টুন হওয়া মানুষের বউ এত লম্বা এবং চাকচিক্যময় অথবা সুন্দরী হতে নেই।

এবং এ—সময়ে বিনু দেখল, দুজন অফিসার, সে একজনকে চেনে মনে হল। কিন্তু এইসব পোশাকে সঠিক বোঝা যায় না। সে সাহস পেল না কিছু বলতে। অফিসারটিই বলল, তুই বিনয় না। আমাদের ক্লাসের বিনু। আমি তোদের সবাইকে চিনি।

বিনু বলল, আমিও চিনি। লাশটা তোর....

অজিতেশ বলল, তোরা কার লাশ দেখতে এসেছিস! সে খুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

মনীষের।

মানে মনীষ দত্ত।

মনীষ দত্ত মানে সোমা গাঙ্গুলীর স্বামী।

হ্যাঁ।

লাশ মনীষ দত্তের! দেখতে হয়! আমি তো আর দশটা লাশের মতোই চটের থলে দিয়ে বেঁধে রাখতে বলেছি। খুব আগলি সিন হবে। সোমা কী সহ্য করতে পারবে!

তুই দেখিসনি!

ভোর রাতে এসেছে। এখনও যাইনি। দেখে লাভ নেই! মরা মানুষ দেখতে ভালো লাগে না। তবু দেখতে হয়। কাজকর্ম চালাতে হলে কাজ করতেই হয়। সোমা কোথায়।

পাশের ঘরে আছে।

অজিতেশ ওর জুনিয়র অফিসারকে ডেকে বলল, হোমরাজকে ডেকে পাঠান।

হোমরাজ এলে বলল, রঘুবাবুকে বল একটা সাদা চাদর দিতে। আর তুই দেখবি, লাশের মুখটা শুধু যেন বের করা থাকে। যেন শুয়ে আছে মতো। চাদরটা ভালোভাবে গুঁজে রাখবি। বাতাসে উড়ে—টুড়ে গেলে নাড়ি—ভুঁড়ি দেখে ফেললে আর একটা দুর্ঘটনা হতে পারে। বুঝলি, অজিতেশ বিনুর দিকে তাকিয়ে বলল, পেটের ভিতর যে এতসব নিয়ে আমরা ঘোরাফেরা করি বুঝতে পারি না। ট্রেনে কাটা লাশ—টাস দেখলে এটা হয়। নিয়ম একেবারে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। অথবা মর্গে। তবে বড়লোকের ব্যাপার তো। সোজা এখানেই।

অশোক দেখল, দূরে করিডোরে বিনু কার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ওরা এলে বিনু ওদের পরিচয় করিয়ে দিল। চিনতে পারছিস তো!

খুব। অশোক বলল।

সুধীর বলল, তুই যে আমাদের মনে রেখেছিস!

আরে যা! আয় চা খাবি।

বিনু বলল, সোমার সঙ্গে পরিচয় করবি না?

অজিতেশ বলল, না। সোমা এখন নিজের ভেতর নেই। খুব খারাপ লাগছে সোমার জন্য। বলেই অজিতেশ তিনজনের দিকেই তাকাল, তোদের কী মনে হয়?

বিনু বুঝতে না পেরে বলল, কী ব্যাপারে!

এই যে মনীষ ট্রেনে কাটা পড়ল, আসলে এটা আত্মহত্যা না খুন না অন্য কিছু!

সে তো তোরা বলতে পারবি।

অজিতেশ হাসতে হাসতে বলল, অনেক সময় পুলিশের চেয়ে যারা চারপাশে থাকে তারা ভালো জানে। তারা ভালো বলতে পারে।

সুধীর মনে মনে গজগজ করতে থাকল। এবারে ঠ্যালা সামলাও।

অজিতেশ বলল, আয়। আমার এটা ঘর। এখানে বসি, কোনো অসুবিধা হলে বলবি। একটু চা খা। ওদিকে ঠিকঠাক করুক; তারপর আমরা একসঙ্গে যাব।

ওরা তারপর একসঙ্গে বের হল। সোমাকে নিয়ে যাওয়া হল। সরু মতো গলি। দুদিকে উঁচু বাড়ি, এবং অন্ধকার মতো জায়গায় শ্যাওলা ধরা মতো ঘরের তালা খুলে ফেলা হল। অন্ধকার ঘর। দিনের বেলাতেও আলো আসে না। একটা আলো জ্বেলে দেওয়া হল। হোমরাজ কোর্তা পরে আছে। ছেঁড়া পেন্টালুন। কালো লম্বা দস্যুর মতো মানুষ। ছেঁড়া চটি এবং চুল রুক্ষ, কোঁকড়ানো, মাথাটা ফেট্টি বাঁধা। লম্বা গোঁফ দু গালে ঝুলে পড়েছে। দেখলেই মনে হবে জ্যান্ত যম, যমের মতো পাহারাদার লাশকাটা ঘরে। সে বলল, এই যে বাবু। ওই যে মেমসাব। স্যার দেখুন কী চোখ মুখ। গোটা শরীর চাদরে ঢাকা চটে বাঁধা এখন নেই। খোলামেলা। কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না কেউ। মনোরমা ধরে রেখেছে সোমাকে। সোমা উপুড় হয়ে পড়ে যেতে পারে। চারপাশে ওরা পাহারাদারের মতো। যেন সোমা উপুড় হয়ে পড়লেই কে পড়তে দিচ্ছে। সোমা দেখে হাহাকার করে উঠল।

ব্যাস হয়ে গেছে। এই তবে মনীষ দত্ত। এখন আর কিছু করণীয় নেই। পুলিশের করণীয় কাজ আছে তারপরও। তারপর মর্গে। মর্গ থেকে খালাস পেতে আরও সময়। ওরা এখন ফিরে যাবে।

বিনু বলল, পুলিশ কিনারা করতে পারবে কিছু।

অজিতেশ বলল, পুলিশের পক্ষে আমারই তদন্ত করার ভার। তবে পুলিশ কিছু করতে পারবে না। এখন তো হামেশা এ—সব হচ্ছে।

তার মানে! আমাদের বন্ধু। তুই ওকে চিনতিস। তুই একটা এর কিনারা করতে পারবি না।

হয় না। কিনারা হয় না। তবে চেষ্টা করা হবে।

বিনু, সোমাকে নিয়ে চলে যেতে বলল অশোককে। সুধীর বিনুর সঙ্গে থাকবে। অজিতেশের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে যেতে হবে।

এবং কথাবার্তা হওয়ার পর অজিতেশ বলল, আমাদের একদিন বসতে হবে। তুই যা যা বললি শুনলাম। দুটো চোখ সোমাকে বিভ্রান্ত করছে। দু—একদিন না গেলে সোমাকে কিছু বলা যাবে না। এখন সোমা ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারবে না। সময় দিতে হবে। এমনকী একটা রহস্য আছে বুঝতে পারিনি। আচ্ছা চিঠিটা পাওয়া যাবে তো।

কোন চিঠিটা?

ঐ যে মনীষকে ভয় দেখিয়ে একটা লাল কালিতে চিঠি দিয়েছিল।

অঃ। কিন্তু ওটা তো সাদা চোখেই বোঝা যায় ছেলেছোকরাদের কাজ। দেশ উদ্ধার করবে বলে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের কাজ।

অজিতেশ ওর চেয়ারে বসে একটা চুরুট টানছিল। ওর টেবিলটা ভীষণ বড়। এ—পাশে শুধু বিনু আর সুধীর বসে রয়েছে। করিডোরে পুলিশের বুটের শব্দ। মাঝে মাঝে সৈন্য—সামন্ত নিয়ে ফিরে আসার মতো পুলিশের গাড়ি ফিরে আসছে। অজিতেশ কাগজে কী সব লিখে দিচ্ছে, আর আবার গাড়ি উধাও হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একজন ছোটোখাটো অফিসার ঢুকে নির্দেশ নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তা চালাচ্ছে ওরা। মনীষের মৃতদেহ এখন চটের ভিতর পুরে হোমরাজ একটা ভাঙা হাতল গাড়িতে ঠেলেঠুলে তুলে দিচ্ছে। এর পাকস্থলী বের হয়ে পড়েছে। সেটা ঠেলেঠুলে একপাশে রেখে দিচ্ছে আর তখন সোমা যাচ্ছে গাড়িতে। ওর মুখে রক্তশূন্যতা, বিবর্ণ, চুলে আর বাহার নেই। একদিনেই তাকে অনেক বয়স্ক করে দিয়েছে।

অজিতেশ বলল, সেদিন কফি—হাউসেই প্রথম লোকটাকে দেখে?

সোমা তো তাই বলছে।

আগে কোথায় দেখেছে মনে করতে পারে না!

না। অনেক চেষ্টা করেও পারেনি।

ভারি ইন্টারেস্টিং! সে ফাঁকে ফাঁকে কিছু নোট নিচ্ছিল। সুধীরের ভালো লাগছিল না। যা হবার হয়ে গেছে। এ—সব কেসের কিনারা হয় না। অনর্থক এ—ভাবে বিনু নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে।

অজিতেশ বলল, আমার চিঠিটা দরকার।

দেব। বিনু বলল, সোমা নিশ্চয় ওটা তোকে দেবে।

যদি থাকে। সুধীর কথাটা যোগ করল।

থাকবে না কেন?

মনীষ কোথায় রেখেছে, যদি রাখে, যদি সোমাকে না বলে কোথাও রেখে দেয়, অথবা রাগে ছিঁড়ে ফেলতে পারে...এসব হলে সোমা চিঠি দেবে কী করে!

তা ঠিক। অজিতেশ কিছুক্ষণ কী ভাবল।

সুধীর ভাবল, আহাম্মুকি। সে নিজেও জড়িয়ে যাচ্ছে। এ—সব ব্যাপারে যত চুপচাপ থাকা যায় তত মঙ্গল।

অজিতেশ বলল, সোমা সেদিন কী বই দেখেছিল?

বিনু বলল, বোধহয় এ—সময়ের যুব বিদ্রোহের ওপর কোনো বই। বড় পরিচালকের নাম বলে সে বলল, এমনই যেন বলেছিল।

চিঠিটা সম্পর্কে যাতে কোনো ভয় না থাকে সেজন্য বিনু সোমাকে অন্য কথা বলেছে। প্রেমটেমের ব্যাপার অথবা ফাজিল ছোকরার কাজ এমন বলেছে। এখন সে খুব জোর দিয়ে সহজ মনে যা ভেবেছিল তাই বলল। চিঠিটা যে—ভাবেই হোক দিতে হবে অজিতেশের কাছে।

অজিতেশ বলল, দশ তারিখের সকালে তুই ফ্রি আছিস!

সকাল কটায়?

এই নটা নাগাদ।

ফ্রি।

আমার এখানে চলে আয়। এখানে চা খাবি। তারপর তুই আমি সোমার বাড়িতে যাব। আগে থেকে সোমাকে কিছু বলতে হবে না।

দশ তারিখের সকালে বিনু এবং অজিতেশ একটা ট্যাক্সিতে সোমার বাড়িতে হাজির। তখন দশটা বেজে গেছে। সোমা সারা সকাল শুয়ে আছে। বিছানা থেকে উঠছে না। আচমকা বিনু এবং অজিতেশ আসায় সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সে হেঁটে যাচ্ছে পার্লারের দিকে। রাতে একা ভয়ে ঘুমোতে পারে না অথবা খুব কেঁদেছে, চোখের নিচটা ফুলে গেছে সেজন্য। সে একটা সুন্দর জ্যাকেট গায়ে দিয়েছিল, ওর আসার ভিতরই এমন একটা তন্ময়তা আছে যে অজিতেশ অবাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকে দেখল। তারপর কেমন সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সোমা, তোমাদের শোবার ঘরটা একবার আমার দেখা দরকার।

সোমা বলল, একটু দেরি কর। সে বেল টিপল।

অজিতেশ বলল, এখুনি দেখা দরকার।

সোমা বলল, আমার শোবার ঘরে কিছু বাজে ছবি আছে, ওগুলো মনীষ এনে রেখেছিল, ওগুলো তোমার দেখা ঠিক না।

ওসব অনেক দেখেছি, সয়ে গেছে। ওজন্য ঘাবড়াবার কিছু নেই।

তবু কেমন বে—আব্রু ব্যাপার, এটা বাইরের লোক কেউ দেখুক সে চায় না। শোবার ঘরে এসব ছবি না হলে মনীষের লীলা খেলা জমত না। অজিতেশ ওসব দেখলে টের পাবে মনীষ দত্ত সোমা দত্তকে খুব নিত। সে এটা চায় না বলেই নিজের বোকামির জন্য ভিতরে ভিতরে রেগে যাচ্ছে। এমন একটা শোকের সময় মাথা ঠিক রাখা দায়। মনোরমার উচিত ছিল ছবিগুলো সরিয়ে নেওয়া। পুলিশ যে—কোনো সময় যা কিছু দেখে যেতে পারে। এবং যখন অজিতেশ দেখতে চাইছে, অজিতেশকে খুব ভালো লোক মনে হল না। চালাক ধূর্ত। পুলিশে কাজ করলেই এটা হয়! সে বলল, চল। সে বুঝতে পারল, পৃথিবীতে সে আর কিছু আজ থেকে গোপন রাখতে পারবে না।

শোবার ঘরটা খুবই বড়। বড় হলঘরের মতো ব্যাপার। দুটো বড় খাট। দুটো ছোট মেহগনি কাঠের পুরোনো টেবিল। কাচের বাতিদান। ছাদে ঝুলছে কাচের ঝালর। রকমারি কাঠের কাজ দেয়ালে। এবং মীনা করা দেয়ালের বর্ডার। নীল হলুদ রঙের মেঝে। মনে হয় দামি পাথর বসানো, এবং খুব সন্তর্পণে হাঁটতে হয়। এত মসৃণ মেঝে যে পা সহজেই পিছলে যাবার কথা থাকে। ওরা সন্তর্পণে হাঁটছিল। অজিতেশ নানা কারণে বহু বড়লোকের শোবার ঘর দেখেছে। এতবড় আয়না, মাথা সমান জাপানি ঝালরে ঢাকা আয়না। দুদিকে এমনভাবে স্ক্রীনের মতো বাঁধা যে দড়ি ধরে টান দিলে থিয়েটারের স্ক্রিন উঠে যাবার মতো উঠে যায়। অজিতেশ সেই সিল্কের দড়ি ধরে টান দিল। না এটা স্ক্রিনই। তারপর সে মুখ উঁচু করে দেখল। টেবিলের চকচকে কাঠের উপরে যে সিল্কের ঢাকনা সবই এত দামি যে সে আর দেয়াল দেখার অবকাশ পাচ্ছে না। এবং তারপরই সব ছবি, দেয়ালে অজস্র ছবি। রঙবেরঙের, পৃথিবীর যাবতীয় পুরুষ রমণীর সহবাসের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে ছবি। ছবিগুলো খুব বড় শিল্পীর আঁকা। ন্যুড অথচ কোথায় যে এইসব ছবিতে একটা বিরাট মহত্ব রয়ে গেছে, যার জন্য একসময় অজিতেশ না ভেবে পারল না, মনীষ দত্তের রুচি ছিল।

সে বলল, সোমা তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

সোমা পাশে পাশে হাঁটতে পারছে না, সে ঠিক ঘরের মাঝখানে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়েছিল। ওর আস্তে কথা অজিতেশ শুনতে পায়নি। কাছে এসে বলল, তোমাকে চিঠিটা দিতে হবে।

কীসের চিঠি?

মনীষকে যে চিঠিতে থ্রেটনিঙ করেছিল।

সোমা বলল, দিচ্ছি।

অজিতেশ বলল, আর একটা কাজ করতে হবে!

কী কাজ!

কাল আমরা সবাই আসব।

বিনু বলল, সবাই বলতে কী বোঝাতে চাইছিস!

সোমার সঙ্গে যারা পরিচিত তারা সবাই। কিছু হিল্লে করা যায় কিনা। জটিল ব্যাপার। মনীষ ভয় পেয়ে পাগল হয়ে যেত। পাগল যে হয়ে যায়নি তাই বা কে বলবে! সেজন্য ওর আত্মহত্যা করা স্বাভাবিক। যাই হোক। আমরা সবাই। আমি, বিনু, সুধীর, অশোক, অসিতবাবু এবং তুমি। বড় টেবিলটা থেকে আয়না খুলে নেবে। সাতটা চেয়ার। ঘরে আর কিছু থাকবে না।

ষোলো

সোমা পরদিন ফোন করে বলল, অজিতেশ আছে।

ধরুন দিচ্ছি।

অজিতেশ বলল, হ্যাঁ, আমি অজিতেশ বলছি।

শোন, আমি সোমা।

বুঝতে পারছি।

আমার ঘর ঠিক। কখন আসছ?

রাতে।

রাত কটায়?

এই ধর আটটায়।

সবাইকে তো জানিয়ে দিতে হবে।

তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। বিনু সব করছে।

বিনু না থাকলে কী যে হত!

কেউ কেউ এ—ভাবে থেকে যায়। মানুষ কখনও একেবারে নির্বান্ধব হয় না।

সোমা উত্তরে কিছু বলতে পারল না। কেবল অজিতেশ বলল, সোমা, তোমরা সামান্য স্ফুলিঙ্গ দেখেই ভয় পেয়ে গেলে!

সোমা হঠাৎ অজিতেশ এমন কথা বলছে কেন বুঝতে পারছে না।

সে বলল, স্ফুলিঙ্গ মানে!

আরে এই যে ছেলে—ছোকরারা বিপ্লব করছে না!

তা করছে।

যাক শোনো, আটটা।

আচ্ছা, ফোন ছেড়ে দিল সোমা।

বিকেলে ফোন করল ফের অজিতেশ। আচ্ছা তোমার আত্মীয়স্বজন কে কে তোমাদের বাড়িতে রেগুলার আসত।

রেগুলার কেউ আসে না। আসলে মনীষ এত বেশি ব্যস্ত ছিল নিজেকে নিয়ে, আমি কলেজ নিয়ে, এবং সন্ধ্যায় মনীষ বাড়িতে থাকতেই ভালোবাসত।

তবু কে কে আসত জানতে পারলে ভালো হয়।

সোমা বলল, যে গেছে তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। আমার ইচ্ছে নয় এজন্য অন্য কেউ হ্যারাস হোক।

হ্যারাস হবে কিনা জানি না, তবে এটা আমি যা ভেবেছি, এক আজগুবি ঘটনা। এমন হয়, সুতরাং এমন যখন হয়, তখন ভীষণ হাসি পায়।

সোমা আর কিছু বলল না। ফোন রেখে দেবে ভাবল। তখনই অজিতেশ বলল, আমাদের সিটিং অনিবার্য কারণে আজ বন্ধ। সিটিং হচ্ছে চারদিন পর। বিনুকে ফোন করে দিচ্ছি। সেই খবর দিয়ে দেবে।

সোমা কী বলবে ভেবে পেল না। সে শুধু বলল, আচ্ছা।

এবং রাতে সোমা আর মনোরমা একঘরে। সারারাত সোমার কেমন ভয় ভয় করতে থাকল ফের। সারারাত মনীষের সেই মরা মুখ কেমন বাতাসে ভেসে ভেসে কাছে চলে আসছিল। আর সোমা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। সোমা ভয়ে ঘামছিল। শীতেও সে ঘামছিল। সে একবার ডাকল, মনোরমা। মনোরমা উঠলে বলল, জল। তারপর বলল, তুই কিছু দেখতে পাচ্ছিস।

মনোরমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, না তো!

কোনো শব্দ?

সে বলল, না তো!

আমার কেবল কী যে মনে হয়!

মনোরমা বলল, ও কিছু না! মনের ভুল!

এ—ভাবে রাত কেটে যেত, সোমা রাতে ঘুমোতে পারত না। একটা কী যে রহস্য থেকে গেল। এখন আর কিছু মনে হয় না। এখন এ—বাড়িতে কেউ এসে মনীষকে খুন করতে পারে মনে হয় না। সব কেমন মনীষের মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। এখন বদলে মনীষ বাতাসে ভেসে ভেসে চলে আসে। এবং একটা মমির মতো ঠিক ওর সামনে নাকের ডগায় ভেসে থাকে। সে ছুঁয়ে দিতে পারে না, ছুঁয়ে দিলেই যেন সোমাও মমি হয়ে যাবে। সোমা কিছুতেই মমি হতে চায় না। সে বাঁচতে চায়। সে কখনও রাতে চিৎকার করে ওঠে, আমাকে বাঁচতে দাও তোমরা। আমাকে এ—ভাবে ভয় দেখিও না।

তারপর যেমন কথা ছিল, সেই বড় হলঘরের মতো ঘরে লম্বা টেবিলের চারপাশে চুপচাপ বসে পড়ার, যেমন কথা ছিল যার যার আসার এবং যেভাবে ঠিকঠাক ছিল ঘর রাখার, সেভাবে ঘর রেখে এখন একটা অদ্ভুত নির্জনতা এই ঘরে। নীল রঙের আলো জ্বলছে ঘরে। ঝাড়বাতিগুলোতে ছোট ছোট আলোর চুমকি। সোমা পরেছে খুব সুন্দর সাদা সিল্ক। তার গায়ে জোনাকি পোকার মতো চুমকি বসানো। সে বসেছে টেবিলের ঠিক মাঝখানে। একে মাঝখানে ঠিক বলা যায় না অবশ্য, কারণ বড় টেবিলটা ডিনার টেবিলের মতো, অনেক বড়, খুব বড় এবং ডিমের মতো আকৃতি টেবিলের। সূচলো ডিমের আকৃতি বলে, সোমা সূচলো দিকটায় বসে রয়েছে। তার মুখ দক্ষিণ—মুখো। তার ডান পাশে সরে সরে বসেছে অশোক, সুধীর, অসিত। আর বাঁ পাশে আছে বিনু, অজিতেশ। অজিতেশ পুলিশের ইউনিফরমে এসেছে। অজিতেশের এটা পাগলামি, বিনু এবং অন্যান্যরা এমন ভাবছে। অন্য সময় হলে ওরা এসব নিয়ে হাসিঠাট্টা করত, কিন্তু খুন—টুনের গন্ধ এর সঙ্গে আছে, তার ওপর অজিতেশ পুলিশের একজন মোটামুটি বড়কর্তা, তাকে অবহেলা করা যায় না। অজিতেশের কথাবার্তায় মনে হয়, ওরা কেউ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। সুতরাং এখন এই অজিতেশ ব্যক্তিটি যা যা করবে, তাতে সায় রাখতে হবে, না থাকলেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়, এটা বেশি প্রমাণিত হবে।

আর এ—ছাড়া কী—যে বড় মনে হচ্ছে এখন এই হলঘরটা। নীল আলোতে দেয়ালে মোমের প্লাস্টার বেশি চকচক করছে, দেয়ালে সব ছবি, এবং ছবিগুলো সেই রুপো বাঁধানো ফ্রেমে অবিকল মানুষের মতো

হঠাৎ সহবাসের ছবি পরিত্যাগ করে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা এখন কী বলছে যেন ছবিগুলো শুনতে চায়। আর মাথার ওপরে হলঘরের ছাদটা এত বেশি লম্বা হয়ে গেছে যে মনে হয় দ্রুত বাতাসে লম্বা হয়ে যাবে ছাদটা, এবং ঠিক এই ছাদের শেষ যেন অনেকদূরে এক অন্ধকার নির্জনতায় মিশে গিয়ে নক্ষত্রের দেশে ঢুকে গেছে। ফলে এইসব মানুষগুলোকে টেবিলের পাশে খুব ছোট এবং আকাশের নিচে কোনো সৌরলোক থেকে আসা গ্রহান্তরের মানুষের মতো মনে হচ্ছিল। ওরা টেবিলের চারপাশে বসে রয়েছে। ওদের দেখলে এখন মনে হবে, ওরা কেউ কাউকে চেনে না। ওরা মাথা নিচু করে কিছু ভাবছে। দেখে মনে হচ্ছিল কোনো মহাকাশযানে ওরা নীল অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে।

কেউ কিছু বলছে না। এ—ভাবে তো চুপচাপ বসে থাকার কথা না। বিনু একবার ঘাড় তুলে তাকাল। সবাই কেমন শোকে মুহ্যমান এমন দেখাচ্ছে। বিনু ফিক করে হেসে দেবে ভাবল, এটা যেন প্রহসনের মতো মনে হচ্ছে, অথবা ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে অলৌকিক উপায়ে মনীষের আত্মা এখানে নিয়ে আসা হবে। অজিতেশ কী পুলিশের কাজ করতে করতে পরলোকচর্চা করে থাকে! বিনুর কেমন সন্দেহ হল। আসলে কী অজিতেশের মনে মনে খারাপ মতলব আছে। সে কী দেখাতে চায়, আর একটা যে খালি চেয়ার রাখা হয়েছে, রাত গভীর হলে চেয়ারটা খালি থাকবে না। সেখানে যে বসে থাকবে, সে মনীষ। মনীষের মুখ দেখা যাবে না হয়তো। ওর অস্পষ্ট অবয়ব দেখতে পাবে সবাই। বিনু ভীষণ ঘাবড়ে গেল। বলল, আমরা এ—ভাবে কতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকব অজিতেশ?

অজিতেশ কোনো কথা বলল না। ওর হাতের ব্যাটনটা মাথার ওপর তুলে দিল শুধু। অর্থাৎ বলতে চাইল যেন, চুপ। অজিতেশের মোটা গোঁফ কিছুটা ঝুলে পড়েছে মনে হল। অজিতেশের খাটো চুল, খাড়া চুল আরও খাড়া হয়ে গেছে। বিনু ভাবল, মাথা নিচু করে দেখবে মুখটা।

কিন্তু বিনুর তখন মনে হল, সোমা উঠে দাঁড়িয়েছে। সে কেমন এক অপার্থিব চেহারায় ওদের দেখছে। যেন সোমা ইচ্ছে করলেই বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে এখন। এটা কী অজিতেশ কোনো মন্ত্রতন্ত্র আওড়ে এমন করছে, না কী সে শালা ভয় পেয়ে চোখে গণ্ডগোল দেখছে। সে বলল, সোমা, তুমি এ—ভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোস।

অজিতেশ বলল, চুপ। কথা না। শব্দ!

শব্দ!

হ্যাঁ শব্দ!

কীসের শব্দ!

কেউ কাঠের সিঁড়ি ধরে উঠে আসছে!

হ্যাঁ। তাইতো। কাঠের সিঁড়ি!

তুমি শুনতে পাচ্ছ সোমা?

না তো!

অজিতেশ বলতে বলতে উত্তেজনায় উঠে পড়েছিল। কিন্তু সোমা শুনতে পায়নি ভেবে সে কেমন হতাশ গলায় দুস বলে বসে পড়ল। হল না।

অসিত বলল, অজিতেশবাবু, আর যাই করুন আমাদের ভয় পাইয়ে দেবেন না। ঘরের এমন চেহারা হয়, আর সোমাকে যা দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন কোনো পরলোক—টরোলোকে চলে এসেছি।

অজিতেশ বলল, বুঝলেন অসিতবাবু, পৃথিবী ভারী আশ্চর্য জায়গা। মানুষ আরও আশ্চর্য। বলতে বলতে ওর গোঁফটা এবার সোজা হয়ে গেল।

বিনু বলল, তুই কী বলতে চাস বুঝতে পারছিনে!

বলছি, এই মৃত্যুর জন্য তোমরা সবাই দায়ী।

তার মানে! অশোক লাফিয়ে উঠল। যেন ভিতরে একটা চোট খেয়েছে।

অজিতেশ বলল, রাগ করছিস কেন! যা ঘটনা তাই বললাম।

সুধীর বলল, অ্যাবসার্ড ঘটনা। এর সঙ্গে আমরা যুক্ত নই।

যুক্ত আছিস। এসব নানাভাবে জানতে হয়। সোমাও কিছুটা দায়ী।

বিনু বলল, কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে তোর বুঝি এটা মনে হয়েছে।

অজিতেশ বলল, সোমা, প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করা যাক।

সোমা ফের বসে পড়ল। চারপাশের দরজা বন্ধ। ঘরটাকে সামান্য উষ্ণ রাখার আর দরকার হচ্ছে না। শীতকাল চলে যাচ্ছে। সোমা কিছু বলল না। সে শুনে যাচ্ছে। সে অজিতেশের গোঁফ নড়তে দেখল শুধু।

অজিতেশ বলল, প্রথম দিন থেকে মানে, সেই ছবি দেখার দিন থেকে, ছবিটা ছিল, বলে ছবির নাম এবং পরিচালকের নাম বলল। তোমরা সোমা সেই ছবিটাই তো দেখেছিলে!

সোমা মুখ তুলে তাকাল। ওর শরীর কাঁপছিল যেন। চোখ দুটো মায়াবী, এবং যেন জলছবির মতো নিরুপায় মুখ। সে বলল, হ্যাঁ। আর তখনই মনে হল ওর সাদা সিল্ক থেকে একটা চুমকি সত্যি জোনাকি হয়ে বাতাসে উড়ে গেল।

অজিতেশ বলল, তোমরা বুঝতে পারছ আমার খবরাখবর ঠিক।

বিনু হঠাৎ ক্ষেপে গেল। বলল, ধুস শালা, তুই একটা চারশো বিশ। তোকে তো আমি বলেছিলামরে, সোমা কী বই দেখার পর মনীষকে নিয়ে কফি—হাউসে গিয়েছিল। এর আবার খবরাখবর ঠিক বেঠিক কী।

অজিতেশ বেশ অবিকল নকল করে বলল, পৃথিবীটা ভারি মজার জায়গা হে বাপু। অত সহজে ক্ষেপে গেলেই চলে! বলেই সে বলল, ওটাতে একটা দৃশ্য ছিল, সোমা তুমি মনে করতে পার কিনা দ্যাখো। আমি বলার চেয়ে এখানে দেখ। প্রজেকটার দিয়ে তোমাকে সেই রিলটা দেখিয়ে দিচ্ছি বরং। বলে সে ওর লম্বা ব্যাগ থেকে সব টেনে টেনে বের করতে থাকল। সে বেশ নুয়ে থাকল ব্যাগের ওপর। ক্যানভাসের ব্যাগ, কিছুটা জাদুকরের মতো ওকে এখন দেখাচ্ছে। ক্যানভাসের ব্যাগ থেকে টেনে নামানোর চেয়ে সে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ উপুড় হয়ে থাকল। সাপুড়ে ওঝার মতো সে যেন বের করেই জিনিসটা সবার ওপর ছুঁড়ে দেবে। সাপ—টাপের মতো কিছু একটা ছুঁড়ে দেবে—এমন মনে হচ্ছে ওর আচার—আচরণ দেখে। এবং সবার এতে ভয় পাবার কথা। চারপাশের মানুষ জনের ভিতর একটা এখন বিস্ময়কর সতর্কতা। সাপটা কার ওপরে এসে পড়বে কেউ বলতে পারে না। তবু নিজেদের রক্ষা করার জন্য সবাই সতর্ক থাকছে। যেন ছুঁড়ে দিলেই দুহাতে ঠেলে ফেলে ছুটতে পারে। কেবল সোমা এসব কিছু ভাবছে না। সাত আট দিনের মাথায় অজিতেশ এতদিনের একটা রহস্যকর ঘটনার সমাধান করতে চায়। ওর মনে মনে হাসি পেল।

অজিতেশ হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াল। সবার দিকে চোখ ঘোরাল। কী দেখল চোখ ঘুরিয়ে। তারপর বলল, এই দেখুন। সে টেবিলে স্ট্যান্ড বসিয়ে সামনের সাদা রঙের দেয়ালে আলো ফেলে ছবির রিলটা দেখাবে বলে বোতাম টিপে দিল। এবং তখনই দেয়ালে এক তরুণের ছবি। সে একটা মরুভূমির মতো বালিয়াড়ির ওপরে ছুটছে। চারপাশ থেকে পুলিশের রাইফেল, বেয়নেট চার্জ করার জন্য ওরাও ছুটছে। এবং সেই তরুণ এই বয়স তেইশ—চব্বিশ হবে, মুখে সামান্য দাড়ি, চোখ বড়, সে সব কিছু অন্যায় শোষণ দূর করার জন্য শহরের রাস্তায়, গ্রামের নির্জনতায়, চারপাশের মাঠে, সুন্দর সূর্য উঠলে শারীরিক কৌশলে এবং এক আশ্চর্য দৃঢ়তায় সে যখন পৃথিবীতে সুখী রাজপুত্র, তখনই অজিতেশ অনেক দূরে থেকে বলার মতো বলে চলল, সোমা তুমি ওকে ভালো করে দেখ। শৈশবে অথবা যখন তুমি নানাবর্ণের স্বপ্নের ভিতর বড় হয়ে উঠেছিলে, তখন তোমার বাবার আত্মহত্যা, তোমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তুমি জানতে কেন তোমার বাবার এই আত্মহত্যা, তুমিও স্বপ্ন দেখতে, কোনো সকালে ঠিক এই ধরণিতে আশ্চর্য এক সকাল আসবে। সব মানুষ সুখী, তোমার বাবাকে সেখানে তেলেভাজা চুরি করে খেতে হবে না, তোমার মাকে...বলে সে থামল কিছুক্ষণের জন্য। আজীবন এমন একটা সকাল আসবে ভেবেছিলে। এবং এমন একজন তোমার পাশে কেউ থাকবে যার চোখ বড়, যে সুখী রাজপুত্রের মতো স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে।

রিলে তখন সেই তরুণ অথবা বলা যায় যুবাকে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বর্তমান অসাম্যের জাগ্রত প্রহরী এই পুলিশের গুলি, ওর মাথায় বুকে পেটে, জঙ্ঘায় তুমি দৃশ্যটি দেখে কেঁদে ফেলেছিলে। সে কেমন সারমন দেবার মতো বলতে বলতে শেষে বলে ফেলল, তুমি কেঁদেছিলে কী না!

সোমা ঘাড় নিচু করে সম্মতি জানাল।

অজিতেশ বলল, মুখটা দেখ। চোখ দেখ। ফের সে রিল ঘুরিয়ে দিল।

সবাই ফের ছবিটা দেখল।

অজিতেশ বলল, আমি চাই মুখটা সোমা মুখস্থ করে ফেলুক।

সোমা বলল, আমার মনে থাকবে।

অজিতেশ বলল, মুখটা কিন্তু যুবার আসল মুখ নয়। মেক—আপ নেবার পর।

বিনু বলল, তারপর কী!

এবং সঙ্গে সঙ্গে অজিতেশ রিল বন্ধ করে দিল। তারপর বসে পড়ল। এখন ওরা আগের মতো বসে রয়েছে। টেবিলে স্ট্যান্ড তিনটে পা যেন। জিরাফের মতো গলা উঁচু করে রেখেছে। এবং দেখলে মনে হবে এই নীল অন্ধকারে এ প্রজেকটারও একটা জীবের মতো। যেন ওরা এখন সাত জন। ওর জন্যও আলাদা একটা চেয়ার দরকার।

অজিতেশ বলল, এবারে সোমা তোমাকে বলতে চাই, সেই অভিনেতাকে তুমি কফি—হাউসে দেখেছিলে। তুমি এত সুন্দর, সবাই তোমাকে দেখছে, অথচ তুমি ওকে দেখছ, বারবার ওকে দেখছ, সেও এমন সুন্দরী যুবতী ওকে এত দেখছে ভেবে অবাক হয়নি, কারণ সে প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছে, এবার থেকে অনেকেই ওকে দেখবে তাতে বেশি কী। আসলে ব্যাপারটা সেখানেও নয়। সে তোমার মতো মেয়ের রূপ ভুলতে পারছিল না। ওর চোখে ছিল উদাসীনতা। যেন এসব কিছু না। আরও সে ওপরে উঠবে। বহু সুন্দরীদের সে ক্রমে লোভনীয় বস্তু হয়ে যাবে।

সোমা বলল, অজিতেশ, তুমি আমাকে ঘাবড়ে দিও না।

অজিতেশের গোঁফ আবার লম্বা হয়ে গেল। বলল, সেই অভিনেতার গালে দাড়ি না থাকলে কেমন দেখায়! তুমি ভাবছিলে ওকে যেন কোথায় দেখেছ! কত কালের চেনা, কিন্তু ঠিক কারও সঙ্গে মেলাতে পারছ না। ছবির মতো ওর মুখে দাড়ি গোঁফ ছিল না। কিন্তু চোখ দুটো ছিল একরকমের। তুমি কিছুতেই মেলাতে পারছিলে না।

সোমা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, না না! মিথ্যে কথা।

অজিতেশ বলল, সোমা, তুমি বসো। উত্তেজিত হবে না।

সোমা একেবারে বসে গেল। সে চেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে ছাদে যেন কী দেখছে। আসলে কিছুই দেখছে না। শূন্য দৃষ্টি। সে বলতে পারত, তুমি ঠিক বলেছ অজিতেশ। এতদিনে আমি ওকে চিনতে পেরেছি।

অজিতেশ বলল, চারপাশে যখন দুর্ঘটনা, যখন হত্যাকাণ্ড, সুখী রাজপুত্রেরা পৃথিবীতে সু—সময় আনবে বলে যখন বাজি ধরেছে তখন তোমরা নিশ্চিন্তে ছবি দেখবে, কোনো ভাবনা থাকবে না, এটা তোমার বন্ধুদের কেউ চাইল না। বলেই সে আবার ঘাড় নিচু করে দিল। সেই ক্যানভাসের ব্যাগ থেকে বের করল একটা খাতা। বলল, এখানে সবাই যদি একটা চিঠি লিখে দেন মনীষ দত্তকে। লিখবেন, যে যেভাবে পারবেন লিখবেন। চিঠিটা মনীষ দত্তকে উদ্দেশ্য করে লেখা। ওর নাম ঠিকানা থাকবে। লাল কালিতে লিখবেন।

বিনু আর এখন কিছু বলতে পারছে না। সে দেখল অজিতেশ এখন বাজিকরের মতো ভারি সব সুন্দর সুন্দর খেলা দেখাচ্ছে। সে খাতাটা নিয়ে লিখল, মনীষ দত্ত...।

সুধীর লিখল, আরও কিছু।

অসিত বলল, আমিও কিছু লিখে দিচ্ছি।

অশোক বলল, কী লিখব বুঝতে পারছি না।

তারপর অজিতেশ লেখাগুলো বের করে একটা লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দিল। দ্যাখ তো দুটো লেখাতে মিল আছে কিনা।

একেবারে এক। হাতের লেখা এক।

অজিতেশ এবারে দু হাতের ওপর টেবিলে ঝুঁকে দাঁড়াল। বলল, অশোক তুমি থ্রেটনিঙের চিঠি দিয়েছিলে! ছেলেমানুষী। আসলে তোমার কোনো মতলবই ছিল না খুন—টুন করার। সেদিন কফি—হাউসে এমন একজোড়া পায়রা আকাশের নিচে খুব বকম বকম করে উড়ে বেড়াচ্ছে বলে হিংসে হয়েছিল। কী করে জব্দ করা যায় ভেবেছিলে। কত উড়ো চিঠি আসছে, ভয়ে পুলিশে উড়ো চিঠি জমা দিচ্ছে না এসব ভালো করে জানতে। মনীষকে একটু ঘাবড়ে দিয়ে কাপুরুষের মতো প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে! চিঠিটা তুমি নিজের হাতেই রসুলকে দিয়ে গেছিলে। নাম বলেছিলে অঞ্জন? ঠিক?

অশোক বলল, আমি কিছু বলব না।

সুধীর বলল, কিন্তু ও তো একচুয়েলি খুন করেনি!

অজিতেশ হাসল। খুব প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো হাসল। বলল, না। অশোকের ঐ চিঠি লেখাই সার। ওর আর কিছু করার ক্ষমতা নেই।

অসিত বলল, তাহলে!

সোমা তখন বাধা দিয়ে বলল, হঠাৎ কেউ কেউ আসত দেখা করতে। কিন্তু দেখা হত না।

সুধীর বলল, আমি একদিন এসে দেখা পাইনি তোর! কেবল নাম জানতে চায়। যত বলি, এলেই চিনতে পারবে, নাম বলার দরকার হবে না, ততই তোমার লোকেরা ক্ষেপে যায়। রাগ করে শেষে চলে গেছি। হাতের কাছে ফোন থাকলে একচোট নিতাম। তারপর মনে হয়েছে, যাকগে বড়লোক হয়ে গেলে এমনি হয়ে থাকে। নালিশ করার প্রয়োজন মনে করিনি। আগেই বলেছিলাম, না হলে এ—থেকে তোমরা একটা ক্লু বের করার চেষ্টা করবে।

অজিতেশ বলল, ওটা একদিনই হয়েছে। অথচ এমনভাবে একটা ভয়ের ভিতর তোমরা পড়ে গেলে যে মনে হত বারবার এটা তোমাদের জীবনে ঘটছে। নতুবা বাথরুমে কেউ ঢুকে যাবে না। আয়নায় কারও ছবি ভেসে ওঠে না। কীভাবে এইসব সুখী রাজপুত্রেরা যে তোমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, বুঝতে পারছ না! ভয়ংকর একটা ইলুসানের ভিতর ডুবে গেছিলে।

সোমা বলল, চিঠিটা পাবার পর আমি কেন যে ওকে বললাম, জানি সে আসবে!

মনীষ তখন কী বলেছিল? অজিতেশ প্রশ্ন করল।

মনীষ আর্তনাদ করে উঠেছিল। বলেছিল, কী বলছ সোমা!

বিনু বলল, ওভাবেই তুমি ওকে আরও বেশি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।

অজিতেশ বলল, সোমার সেই যে শৈশবে স্বপ্ন ছিল, সুখী রাজপুত্রেরা এসে ওর বাবার মৃত্যুর শোধ নেবে, এবং সে কোনোদিন যেজন্য কাজল পরল না, অথচ বড় হতে হতে সে সুখী রাজপুত্র ভেবে মনীষকেই বিয়ে করে ফেলল, তারপর দেখা গেল, না মনীষ ঠিক সুখী রাজপুত্র নয়। বরং সে শহরের সেই সেরিফ ভদ্রলোকটির মতো, যার কাণ্ডজ্ঞান একেবারেই নেই—আর আমরা এ—ভাবে সবাই তরুণ বয়সে এমন স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি, বয়স বাড়ে, ক্রমে আমরা কঠিন রাস্তায় হেঁটে হেঁটে স্বপ্নের কথা ভুলে যাই। মনীষও ভুলে গিয়েছিল। সোমার তখন মনে হত, কেউ আসবে। আর এ—পথেই সোমার সংসারে গণ্ডগোল এমনভাবে দানা বেঁধে গেল যা মনীষের মৃত্যুর কারণ।

অসিত বলল, মনীষবাবু তো পালাচ্ছিল। অথচ ট্রেনের নিচে পড়ে গেল পালাতে গিয়ে।

আমরা এর আগে বিনুকে কিছু জিজ্ঞাসা করব। আচ্ছা বিনু, তুমি কি কোনো ভয় দেখিয়েছিলে!

সে বলল, না তো।

মনে করে দ্যাখো।

বিনু বলল, যেদিন সে পালিয়েছিল, সেদিন বিকেলের দিকে ওকে একবার ফোন করেছিলাম।

ফোনে কী বলেছিলে?

ফোনে...ফোনে! সে মনে করার চেষ্টা করল।—অঃ। মনে পড়ে গেল কথাটা। বলেছিলাম, কে এক জহুরিমল না হুজুরীমলের গলা কেটে দিয়েছে। ঘটনাটা চিৎপুরে ঘটেছিল।

একটা লোক ভয়ে মরে যাচ্ছে, তুমি ওকে আরও ভয় পাইয়ে দিলে। ওতো পালাবেই।

আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

কেউ আমরা বুঝতে পারিনি। অসিত বলল।

অজিতেশ বলল, আপনারা এখন বুঝতে পারছেন, ভয় কখনও কী ভয়ংকর হয়ে যায়। এবং অহেতুক মৃত্যুকে টেনে আনে! আমরা মনীষের কাছে কিছু শুনতে চাই। আসুন না আমরা ভাবি ঐ যে খালি চেয়ারটা রাখা হয়েছে সেখানে মনীষ বসে আছে। আপনারা সবাই ভাবুন খালি চেয়ারটাতে মনীষ বসে রয়েছে। ওকে সবাই আপনারা প্রশ্ন করুন। তারপর কী! তুমি কোথায় কীভাবে পড়ে গেলে, না কেউ তোমাকে কামরায় মেরে ট্রেনের চাকার নিচে ফেলে গিয়েছে। আপনারা সবাই কায়মনোবাক্যে প্রশ্ন করে যান। যান। বলুন। নিবিষ্ট হোন। দেখুন নীল অন্ধকারে খালি চেয়ার এবং সোমার সাদা সিল্কে একটাও চুমকি আর নেই, সব জোনাকি হয়ে গেছে। ছাদটাকে ছাদ আর মনে করবেন না, নীল আকাশ ভেবে ফেলুন। দেখুন সেখানে সব জোনাকি পোকারা একে একে সব নক্ষত্র হয়ে গেছে। আপনারা সবাই কোনো মহাকাশযানে চড়ে আত্মার অন্য স্তরে চলে যাচ্ছেন। ভাবুন, এ—ভাবে ভাবুন! দেখুন ঐ তো, ঐ তো মনীষ ঘাড় নিচু করে বসে আছে। চেয়ারটা আর খালি নেই। অন্ধকারের ভিতর থেকে চেয়ারটায় অস্পষ্ট কিছু যে দেখছেন, ঐ মনীষ। সে এবার আপনাদের মানুষের অধম চরিত্রহীনতার কথা বলবে। মানুষ যে কখনও সম্পূর্ণ নয় তার কথা বলবে। তাকে এবার চুপচাপ বলতে দিন।

নারী এবং নদীর পাড়ে বাড়ি

।। এক ।।

অনেকটা পথ, রাস্তায় ঝড় বৃষ্টি এবং কিছুটা রাস্তা জল কাদা ভেঙে বারদীর স্টিমারঘাটে তাকে এনে তুলেছিলেন জগদীশ। পথশ্রম লাঘবের জন্য লোকনাথের আশ্রমেও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন। বাল্যভোগের সময় তখনও পার হয়ে যায়নি। জগদীশকে দেখে সেবাইত কুলদাচরণ খুবই পুলকিত—আরে ভুঁইঞামশায়, এদিকে হঠাৎ। এটি কে?

জগদীশ এসব ক্ষেত্রে সে যে তার বড় পুত্র এমন পরিচয় কখনই দেন না। বাবার সঙ্গে গেলে এটা টের পেতে অসুবিধা হয়নি অরণির। আশ্রমেও আসন পেতে দিলে বাবা বলেছিলেন, ঠাকুরের কৃপা, বাল্যভোগ সেরে যাব ভেবেই আশ্রমে এসে উঠেছি। আপনার সব কুশল তো! যাচ্ছি কর্মস্থলে। সামান্য উঁজিয়ে স্টিমার ধরব বলে চলে এলাম। এবারে অরণি মাইনর পাশ করেছে। কাছাকাছি হাইস্কুল কোথায়! তাই নিয়ে যাচ্ছি।

কুলদাচরণ এবং তার লোকজন জগদীশকে খুবই খাতির করল, একটা লোক বালতি করে জল এনে দিয়েছিল, হাত মুখ ধুয়ে বাল্যভোগ সেরে আবার রওনা হওয়া। আশ্রম থেকে ঘাটের দূরত্ব সামান্য। স্টিমারের আওয়াজ আশ্রমে বসে শোনা যায় এমন সে শুনেছে।

বাবা লোকনাথের বাল্যভোগের স্বাদই আলাদা। গোবিন্দভোগ চালের ভাত, এক গণ্ডূষ ঘি এবং সঙ্গে আলু বেগুন কুমড়ো সেদ্ধ। এই দিয়ে সকালের জলযোগ। খুবই পরিতৃপ্ত তারা এবং দু ক্রোশ দুর্গম রাস্তার পথকষ্ট নিমেষে উবে গেলে সে তার বাবার সঙ্গে রওনা হবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল।

জগদীশ বললেন, তা হলে এবার যাত্রা করা যাক। স্টিমারে ওঠার আগে বাবা লোকনাথের কৃপার বড় দরকার ছিল। তাই উজিয়ে চলে এলাম। স্টিমারে গেলে বেশি সময়ও লাগবে না।

চৌচালা ছোট্ট কুটিরে লোকনাথের অতিকায় ফটোটির সামনে তাঁর প্রণিপাত দেখে সেও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল—দূর দেশে যাচ্ছে, মন তার ভালো ছিল না। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতের পর, অরণির মনে হয়েছিল, বাবা লোকনাথই তাকে রক্ষা করবেন।

কর্মস্থলে অবশ্য হেঁটেও যাওয়া যায়—দশক্রোশের মতো পথ। হেমন্তের শেষাশেষি সময়। মাঠ— ঘাট থেকে বর্ষায় জল নেমে গেছে ঠিক, তবে জায়গায় জায়গায় মাঠ ভাঙতে এত বেশি কাদা ভাঙতে হয় যে তাতে তার পক্ষে সুস্থ শরীরে পৌঁছানো সম্ভব কিনা এমন ভাবতেই পারেন জগদীশ। দু ক্রোশের মতো রাস্তা যে করে হোক পার হয়ে স্টিমারে ওঠার সময় সে বুঝেছিল, বাবার কর্মস্থলে পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে।

সারা রাস্তায় বাবা তাকে এত বেশি বুঝ প্রবোধ দিয়েছেন যে সে মাঝে মাঝে বিরক্ত না হয়ে পারেনি।

যেমন বাড়ি থেকে নেমে সে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে ছিল।

বাবা বললেন, পেছনে তাকাতে নেই। হোঁচট খাবে।

তখন সে দেখেছিল পুকুরপাড়ে মা তোতন নীলু ফুলু ছোটকাকা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। সে জানে যতক্ষণ দেখা যায় সবাই তাকে দেখবে। খেজুর গাছের নিচে তারা শুধু দাঁড়িয়ে নেই, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যে কাঁদবে, কিংবা সবারই অশ্রুপাতের কথা ভেবে সে বিষণ্ণ হয়ে না যায় সেই ছিল আতঙ্ক। জল— কাদায় তাকে হেঁটে যেতে হবে। আর মাস দু এক আগে হলে সোজা নৌকায় সে তার বাবার কর্মস্থলে চলে যেতে পারত। কিন্তু মা মনস্থির করতে পারেননি। মামার বাড়ি রেখে পড়ানো যায় যদি—এবং বেশি দূরও না, ক্রোশ দুই রাস্তা পার হতে হয়। পুষ্পতারা হাইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়ারও কথা হয়েছিল।

তবে বাবার মনঃপূত নয়। পুষ্পতারা স্কুলের রেজাল্ট মোটেই সুবিধের না। সেদিক থেকে ভবনাথ হাইস্কুলের বিশেষ সুনাম আছে। স্থানীয় জমিদারদের আনুকূল্যে স্কুলটি চলে। স্কুলে ফুটবল খেলার মাঠ পর্যন্ত আছে। এসব বিষয়ে বাবার পরামর্শ দেবার লোকের অভাব নাই। তিনি জমিদারদের এক শরিকের কাছারি বাড়িতে থাকেন। আদায়পত্র সব তারই জিম্মায়। বিশ্বস্ত খুব।

হাফপ্যান্ট হাফশার্ট গায় সে বারবার বাবার পেছনে পড়ে যাচ্ছিল। টিনের স্যুটকেসটি বাবার হাতে। ছোটকাকা সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন, বাবা রাজি হননি। কতটুকু রাস্তা, আমরা ঠিক চলে যাব। তোকে সঙ্গে

আর যেতে হবে না।

আসলে বাবার বোধ হয় ধারণা, ছোটকাকা সঙ্গে থাকলে স্টিমারে ফের আর একটা সিন তৈরি হবে। ছোটকাকা ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকলে সে রেলিং থেকে কিছুতেই সরে যাবে না। তার ফের অশ্রুপাত শুরু হয়ে যেতে পারে। এমনিতেই বাবা খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন, এতদূরে সে শেষ পর্যন্ত যেতে রাজি হবে কি না। এক গ্রীষ্মের বন্ধে কিংবা পূজার বন্ধে সে শুধু আসতে পারবে। এতদিন বাড়ি ছাড়া হয়ে থাকার কষ্ট ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে।

কিছুটা হেঁটে এসেই সে দেখেছিল, সে আগে, বাবা তাকে এগিয়ে দিয়ে পেছনে তিনি আসছেন। সে আর পেছন ফিরে তাকাতেও সাহস পায়নি।

রাস্তা যে খুবই দুর্গম—সে বল্লভদির মাঠে নেমেই বুঝতে পেরেছিল। পায়ে তার রবারের জুতো। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে কিছুটা হেঁটে একটা সাঁকোর সামনে দাঁড়ালেন বাবা। তার যে কী হয়েছে, কিছুতেই বাবার সঙ্গে হেঁটে পারছে না। কিছুটা গিয়েই তিনি তার জন্য অপেক্ষা করছেন। গাঁয়ের লোকজন বাবার যে খুবই পরিচিত তাও সে টের পেল। এত সকালে তাকে নিয়ে তিনি কোথায় যাচ্ছেন এমন কথাবার্তা শুনেও বাবার সেই এক কথা, অরুকে নিয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে থাকবে। ওখানকার স্কুলে ভর্তি করে দেব।

সাঁকোর ঠিক নিচে এসে জগদীশ বলেছিলেন, জুতো খুলে নাও অরু। আমরা সোজা সাঁকো পার হয়ে যাচ্ছি না। আমরা যাব দক্ষিণে। সোজা গেলে দনদির বাজার পড়বে। আরও দূরে নদীর পাড়ে প্রভাকরদি। গঞ্জ মতো জায়গা। ওখানে মেলা পাটের আড়ত আছে। একটা বড় সাঁকো আছে। বড় হলে সবই জানতে পারবে। আমরা এবার মাঠে নেমে যাব। কিছুটা রাস্তা জলকাদা ভাঙতে হবে।

অরণি সাঁকোর উঁচু জায়গা থেকে খালের পাড়ে দৌড়ে নেমে গিয়েছিল। ঘাস পাতায় ঢাকা রাস্তা, তারপর আরও নিচে ধানখেতের লম্বা আল পড়েছে দেখতে পেল। এই আলের রাস্তায় নওঁগা পর্যন্ত হেঁটে না গেলে সড়কে ওঠা যাবে না। সকালের দিকে ঠান্ডার আমেজ থাকে। সূর্য উঠে গেছে। ঘাসে শিশির পড়ে আছে। ধানের জমিগুলো হলুদ রঙের—যতদূর চোখ যায় মনে হয়েছিল হেমন্তের মাঠ বড় নিরিবিলি।

অবশ্য আলের রাস্তায় বকের মতো পা ফেলে কিছুটা হেঁটে আসতেই দেখতে পেল— সামনের জমি সব উঁচু। রাস্তায় জলকাদাও নেই—দু—পাশের জমিতে কলাই সর্ষে বুনে দেওয়া হয়েছে। কীটপতঙ্গের আওয়াজও উঠছিল, দূরে একটি নদী আছে টের পেল—এবং এটা যে ছাগলবামনি নদী অরণি জানে। নদীর পাড় ধরে হেঁটে গেলে পায়ের কাদা ধুয়ে আবার জুতো পরে নেওয়া যেত, কিন্তু জগদীশ তাকে নিয়ে সেদিকে গেলেনই না। সোজা সামনে তিনি বেশ দ্রুত পায়েই হেঁটে যাচ্ছেন, এবং দম ফেলতে না ফেলতেই ফের সেই কাদাজল ভাঙা—ধানজমির মাঠ উঁচুনিচু হয়ে আছে—সামনের দিগন্ত প্রসারিত মাঠের শেষ দিকটায় বাবা আঙুল তুলে বললেন, আর ঘণ্টাখানেকের পথ, ওখানে আমাদের শেষ সাঁকোটি পার হতে হবে। নদীর জলে ইচ্ছে করলে পা ধুয়ে নিতে পারবে।

তারপর হাঁটতে হাঁটতেই বলেছিলেন, বারদীর আশ্রমে আমাদের একটু তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়া দরকার। আশ্রমের বাল্যভোগ প্রসাদ পা চালিয়ে না হাঁটলে পাবে না। বাল্যভোগ তুমি খেয়েছ, তবে স্মৃতিতে সে অমৃতস্বাদের কথা মনে নাও থাকতে পারে। একবার তোমাদের সবাইকে নিয়ে জ্যৈষ্ঠমাসে বাবা লোকনাথের উৎসবে এসেছিলাম—তোমার কি মনে পড়ে।

অরণির কিছুই মনে নেই।

সে বলেছিল, কবে?

তখন তুমি খুবই ছোট। তোমার মা মানত করেছিল, আশ্রমে মিসরি বাতাসা ভোগ দেবে। তোমার ঠাকুমা তখন বেঁচে।

অরণি আর কোনও কথাই বলছিল না। কারণ ঠাকুমার কোনও স্মৃতি তার মনে নেই। আর সে ভেবে পাচ্ছিল না, বাবা তার সঙ্গে আজ এত কথা কেন বলছিলেন!

যেমন জমির কথা।
যেমন ঋতুর কথা।
যেমন এই মাঠ এবং গ্রামগুলো সম্পর্কে শোনা কথা।

জগদীশ বলেই চলেছেন, আশেপাশের গ্রামগুলোর নামে অদ্ভুত মিল আছে। যেমন ধরো আমরা বল্লভদি পার হয়ে এলাম—পূর্বে গেলে সুলতানসাদি, দক্ষিণে গেলে বাণেশ্বরদি, বারদি, হামচাদি, দামোদরদি। সব গ্রামের শেষে 'দি' শব্দটি আছে। আসলে ওটা 'দি' হবে না। 'ডিহি' হবে। জলা দেশ, আমাদের পূর্বপুরুষরা এই জলা দেশে মাটি ভরাট করে বাড়িঘর বানিয়েছিলেন। দেখবে সবার বাড়ির সামনেই একটা করে পুকুর আছে। মাটি তুলে নেওয়ার প্রয়োজনেই পুকুর কাটতে হয়েছে। মাটি তুলে ডিহি তৈরি করে বসতবাড়ি গড়া হয়েছে। যত উত্তরে যাবে সব 'দি'। ব্রাহ্মণনদী, মনোহরদি, গোপালদি, নরসিংদি। তোমার পায়ে কি লাগল!

না বাবা!

বসে পড়লে কেন! অরণি দেখেছে বাবা তাকে গুরুত্বপূর্ণ কথায় কখনো সখনো তুমি বলে, আবার কখনো তুইতোকারিও করেন। আজ বাবা একটু বেশি মাত্রায় তুমি তুমি করছেন। অরণি পা থেকে জড়ানো কিছু যেন তুলে নিচ্ছে। বোধ হয় লতাপাতা কিছু জলকাদা ভাঙতে গিয়ে পায়ে জড়িয়ে গেছে।

জলা জায়গায় পোকামাকড়ের উপদ্রব এমনিতেই বেশি মাত্রায়। যদি জোঁকের উপদ্রবে পড়ে যায় অরু—জগদীশ নুয়ে দেখলেন, শ্যাওলা জাতীয় কিছু পায়ে আটকে গেছে। কাদা শুকিয়ে যাওয়ায় পায়ের গোড়ালিতে টান ধরে যেতে পারে। হাঁটতে অস্বস্তি হতে পারে। প্রায় হাঁটুর কাছেও কাদার দাগ। তিনি বললেন, আর বেশি দূর না। এবারে আমরা নওগাঁর সড়কে উঠে যাব। নওগাঁর শচীন ডাক্তারের কথা মনে আছে?

অরণি বলল, আছে। সোম শুক্র সাইকেলে আমাদের বাড়ি যেতেন।

তা হলে মনে করতে পারছ। দীর্ঘদিন কালাজ্বরে ভুগে ভুগে বড়ই রুগণ হয়ে পড়েছিলে। তোমার গায়ের রঙও পুড়ে গিয়েছিল—আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। ভাগ্যিস শচীন যুদ্ধফেরত সোজা দেশে চলে এসেছিল—তা না হলে কী যে হত! খবর পাঠাতেই সোজা এসে দেখে গেল তোমাকে। নওগাঁতেই তার বাড়ি।

আমার সবই মনে আছে বাবা। তিনি আমাকে ব্রহ্মচারী ইনজেকসান দিতেন। সপ্তাহে দু—বার।

ঠাকুরের কৃপায়, আর শচীন ডাক্তারের হাতযশে সেবারে তুমি আরোগ্য লাভ করলে। শচীন কিন্তু পাশ করা ডাক্তার না। আর পাশ করা ডাক্তার পাওয়াই যে কঠিন। দশ পনেরো ক্রোশের মধ্যে একজনও নেই। পাঁচদোনার মল্লিক বাড়ির ছেলে অমিয় শুনেছি কলকাতা থেকে এল এম এফ পাশ করে এসেছে। খুবই বড় ডাক্তার। তবে সে গাঁয়ে বসছে না। শহরেই ডিসপেনসারি খুলেছে। শচীনই আমাদের ব্রহ্মা বলো বিষ্ণু বলো, মহেশ্বরও বলতে পারো—একমাত্র পরিত্রাতা। তোমার এত বড় কঠিন অসুখ সেই নিরাময় করে তুলল। সামনে যে গাছপালা দেখা যাচ্ছে, সেখানেই শচীন থাকে। গ্রামটি খুবই বর্ধিষ্ণু। গাঁয়ে একটি পোস্টাফিসও আছে। তবে পাকা বাড়ি নেই। কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। বারদী গাঁয়ে ঢুকলেই পাকা বাড়ি কেমন হয় বুঝতে পারবে। এই অঞ্চলে একমাত্র বারদী গ্রামেই চৈতন্য নাগের প্রাসাদতুল্য কোঠাবাড়ি আছে—স্টিমারঘাটে যাওয়ার রাস্তায় দেখতে পাবে। আর একটু কষ্ট করে পা চালিয়ে হাঁটো। সড়কে উঠে গেলে আর জলকাদা ভাঙতে হবে না।

অরু অবশ্য বলতে পারত তার মামাবাড়ির দেশে পাকাবাড়ি কেমন হয় সে দেখেছে। তবে সে কিছুই বলল না। দু ক্রোশ রাস্তায় এই সাঁকোটি পার হলেও সড়কে উঠে যাওয়া যাবে। জগদীশ হাতের পুঁটুলি এবং টিনের বাক্সটি নদীর পাড়ে রেখে ঘাটে নেমে গেলেন। অরু তার বাবার পিছু পিছু নামছে। কাঠের গুঁড়ি ফেলে অস্থায়ী ঘাট। গাঁয়ের মানুষজনের ভিড় আছে ঘাটে। জগদীশকে এলাকার লোক সবিশেষ চেনে। ব্রাহ্মণই শুধু নন, তিনি গোস্বামী বংশের সন্তান। তাঁর পিতাঠাকুরকে এলাকার লোক এক ডাকে চেনে। তাঁকে দেখে স্ত্রী—পুরুষ নির্বিশেষে ঘাট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল।

জগদীশ সবার কুশল নিতে নিতে ঘাটে নেমে যাচ্ছিলেন। পুত্রেরও পরিচয় দিয়ে তারা যে স্টিমার ধরার জন্য রওনা হয়েছেন, রাস্তায় বাবা লোকনাথের আশ্রমে বাল্যভোগ গ্রহণের পর আবার রওনা হবেন, নদীর জলে নামার আগে সেই প্রসঙ্গেই নানা কথা বলছিলেন।

নদীর জল খুবই স্বচ্ছ। জলে স্রোত আছে। নিজে এক গণ্ডূষ জল খেলেন। কারণ রাস্তায় যত্রতত্র আহার এবং জলপান নিষিদ্ধ। তা—ছাড়া পুকুর কিংবা নদীর জলই তৃষ্ণা নিবারণের একমাত্র উপায়। যদিও জগদীশের পিতাঠাকুর তাঁর বাড়িতে একটি ইঁদারা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। যে দুটি গ্রামের উপর দিয়ে এলেন, সেখানে একটিমাত্র সরকারি টিউকল—ইউনিয়ন বোর্ড থেকে করা। তবে কলটির হাতল চুরি যাওয়ায় দীর্ঘকাল অব্যবহারে পড়ে থেকে থেকে বাকিটুকুও অদৃশ্য হবার অপেক্ষায় আছে।

জগদীশ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, রাস্তায় আহার এবং জলপানের সমস্যা আছে। পুঁটুলির মধ্যে একটি হলুদ রঙের তরমুজের সাইজ বাঙ্গি আছে। কৌটায় ঝোলা গুড়। স্টিমারে আহারের সুবন্দোবস্ত থাকলেও তাঁর এবং অরুর পক্ষে সেসব স্পর্শ করলে বিধর্মীর কাজ হবে। জাতপাতের বিচার জগদীশের মধ্যে একটু বেশি মাত্রাতেই আছে।

অরণি জগদীশের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার যথেষ্ট জল তেষ্টা, অথচ খাওয়া উচিত অনুচিত প্রশ্নে সে গণ্ডূষ করে জল খেতে পারছিল না।

জগদীশেরও জল তেষ্টা পেয়েছে। তিনি গণ্ডূষ করে জল খাবার আগে বলেছিলেন, নদীর জলে কোনও দোষ থাকে না। পতিত পাবনি গঙ্গারই শাখা—প্রশাখা সব। সবাই সাগরের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। তুমি নির্মল চিত্তে জল পান করতে পারো। নদীর জলে কোনও দোষ থাকে না।

অরু বাবা লোকনাথের আশ্রম থেকে নেমে বলল, চৈতন্যনাগের বাড়ি পার হয়ে গেলেই কি স্টিমারঘাট?

জগদীশ বললেন, না। চৈতন্যনাগ নদীর ধারেই বাড়ি করেছিলেন, কিন্তু কীর্তিনাশা নদীটি বর্ষায় কখন কোন পাড় ভেঙে ধেয়ে চলবে কেউ জানে না। নদীর পাড়ে বাড়ি করে চৈতন্যনাগ এই এক সমস্যায় ভুগছিলেন। বাবা লোকনাথই অভয় দিয়েছিলেন, আমি যদ্দিন আছি, তোর গৃহনাশের ভয় নেই। নদী যতই উত্তাল হোক, তোর বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে সাহস পাবে না।

অরু বাবা লোকনাথের অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনেছে। কেমন আশ্চর্য মুগ্ধতা এই সব অলৌকিক বিস্তারের মধ্যে থেকে যায়। বাবা লোকনাথের ব্রহ্মবাক্যে অভিশপ্ত খ্যাপা নদীটি তার উত্তাল তরঙ্গমালা নিয়ে শেষ পর্যন্ত খাত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। নদীটি দেখার ইচ্ছা যেমন প্রবল হতে থাকে তেমনি যে প্রাসাদটি চার পুরুষ ধরে অক্ষত থেকে গেছে, সেটি দেখার বাসনাও তার কম নয়।

লোকনাথের আশ্রম থেকে নেমেই একটি বড় মাঠ পার হতে হয়। আজ হাটবার নয়। হাটবার মানুষের ভিড়ে হাঁটা যায় না। মাঠে গোরু মোষ চরে বেড়াচ্ছে। অঞ্চলে বারদীর হাট বিখ্যাত। নদীর পাড়ে হাটের দিন দু মাল্লা তিন মাল্লা নৌকার ভিড় হয়। যে দিনের যে সবজি, আনারসের নৌকা, তালের নৌকা, হাড়িপাতিলের নৌকা, করলা ঝিঙেও বাদ যায় না—নদীর পাড়ে অজস্র নৌকার ভিড়—দূরদেশ থেকে মানুষজন সওদা করতে আসে নৌকায়—বর্ষাকালে জায়গাটা একটা গঞ্জের মতো হয়ে যায়, পাটের নৌকাও নিয়ে আসে ব্যাপারীরা—তবে অরণি আশ্চর্য হল, লোকনাথের মন্দির সংলগ্ন যে নদীটি আছে, তার বিস্তার তো নেই—ই বরং কিছুটা যেন আবদ্ধ জলার মতো। কচুরিপানায় ঠাসা—হাঁটু জল ভেঙে এ—পাড় ও—পাড় করা যায়। এটা যে মূলনদী থেকে কোনও শাখা বের হয়ে বাবা লোকনাথের চরণ ছুঁয়ে চলে গেছে বুঝতে কষ্ট হয় না। এই জলাদেশটা এতসব নদীনালার ঘোরপ্যাঁচে পড়ে আছে সে তার বাবার কর্মস্থলে না গেলে যেন জানতে পারত না।

অরু এই প্রথম দূরদেশে যাচ্ছে। পাকাবাড়ি কিংবা প্রাসাদ দেখার অভিজ্ঞতা তার নেই বললেই চলে। তবে মামাবাড়ি গেলে চৌধুরীদের পাকাবাড়ি সে দেখেছে। সামনে দিঘি আছে একটা। দিঘির পাড়ে মন্দিরও আছে। মামাবাড়ির দেশটা এজন্য তার কাছে একটি বিশেষ রহস্যময় দেশ। সাদারঙের পাকাবাড়ি, ঘাট বাঁধানো দিঘি, সবুজ ঘাসের মাঠ বাড়ি—সংলগ্ন, সবই তার কাছে অসীম কৌতূহলের বিষয়। মামাবাড়িতে গেলে দিঘির ঘাটলায় বসে থাকলে কেমন সে অন্য গ্রহের মানুষ হয়ে যেত। কেউ এসে তার হাত ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলে সে কেমন মুহ্যমান হয়ে যেত। ঘরের পর ঘর, ছাদে রঙিন কাচের ঝালর, এবং কিছু তৈলচিত্র, সুন্দর প্রতিমার মতো দেখতে মেয়েরা তাকে আদর করে অন্দরে নিয়ে গেলে সবাই হইচই বাধিয়ে দিত। ও মা দ্যাখো এসে কাকে নিয়ে এসেছি! বাসনাদির ছেলেটা না চুপচাপ আমাদের ঘাটলায় একা বসেছিল!

বাড়িটায় ঢুকলেই মনে হত চারপাশে যেন সাজানো গোছানো সবকিছু। শান বাঁধানো মেঝে চক চক করছে। খালি পায়ে হাঁটলে ঠান্ডায় পা কেমন শির শির করত। বারদী গ্রামটায় ঢুকে বুঝল, শুধু পর পর পাকাবাড়ি, তারপর দু—মাথা সমান উঁচু পাঁচিল কতদূর চলে গেছে! পাঁচিলের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্যাঁতলা ধরা দেয়াল, টিন—কাঠের বাড়িঘরও চোখে পড়ল। রাস্তাটা গ্রামের ভেতর দিয়ে গেছে বলে সে সবই দেখতে পাচ্ছে। তার বাবাকে এই এলাকার মানুষজনও যে চেনে, এতে তার কিছুটা অহঙ্কার হচ্ছিল। বাবার সঙ্গে এত লোকের পরিচয় আছে সে জানতই না। বাবাকে সে এমনিতেই সমীহ করে, বাবার সঙ্গে বের হয়ে দূরদেশে যাবার সময় মনে হল বাবা তার একজন মুসাফির। তিনি এই সব গ্রাম মাঠ ভ্রমণ শেষে নদীর শেষ প্রান্তে গিয়ে শেষে তাঁর কর্মস্থলে উঠেছেন।

জগদীশ বলল, শোনা যায় চৈতন্যনাগের পিতাঠাকুর বিখ্যাত ডাকাত সর্দার ছিলেন। মেঘনা নদীতে তার লোকজন, নৌবহর, ছিপনৌকা, সবই মজুত থাকত। পঞ্চাশটা বৈঠায় নৌকা নদীর উপরে উড়ে যেত। এখন আর সেই ছিপ নৌকাও নেই, ডাকাতিও কেউ করে না। চৈতন্যনাগের বংশধরদেরও পাত্তা নেই। তারা শহরে বাড়িঘর বানিয়ে থাকে। এমন অজ পাড়াগাঁতে কার পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয় বল!

শহরে সব পাকাবাড়ি না বাবা?

সব কেন হবে। সব কি কখনও পাকাবাড়ি হয়? সবার হাতে এত পয়সা কোথায়। গরিব মানুষজনেরও তো অভাব নেই শহরে।

অরণি জানে বাবাকে বাবুদের মামলা মোকদ্দমার তদারকি করতে প্রায়ই শহরে যেতে হয়। বাবা শহরে রাত্রিবাসও করেন। সেই বাবার সঙ্গে সে হেঁটে যাচ্ছে। সোজা কথা!

শহরের পাকা রাস্তায় আপনি কখনও হেঁটে গেছেন।

হ্যাঁ গেছি, কেন?

আমি একবার আপনার সঙ্গে যাব।

যাবে। বড় হও।

আচ্ছা বাবা মদনগঞ্জে পাকা রাস্তা আছে?

আছে। হরিহরবাবুর প্রাসাদের সামনের কিছুটা রাস্তা পাকা। ঠিক পাকা বলা যায় না, আসলে নদী পাড় না ভাঙে, সেজন্য নদীর ধারের কিছুটা এলাকা বাঁধিয়ে দিয়েছেন বাবুরা। গেলে সবই দেখতে পাবে।

মদনগঞ্জে কি সব পাকাবাড়ি।

গেলেই দেখতে পাবে।

বাবুদের বাড়ির প্রাসাদে পরী ওড়ে নাকি?

জগদীশ হেসে ফেলেছিলেন।

ওড়ে। যে যেমন দেখে অরু।

তারপরই মোক্ষম কথাটা বলে ফেলল অরু।

আমি আবার কবে ফিরব? মাকে ছেড়ে থাকতে আমার খুব কষ্ট হয়।

জগদীশ বললেন, ঐ দেখ নদী। স্টিমারঘাটে লোকজন জড়ো হচ্ছে। মানুষতো এক জায়গায় থাকে না, তাকে স্থানান্তরে যেতেই হয়। তাড়াতাড়ি ভর্তি করে না দিতে পারলে একটা বছর নষ্ট হবে। মাসখানেক বাদেই এনুয়েল পরীক্ষা। ক্ষিতিমোহনবাবু তো বললেন, ভর্তি করে দিন ভুঁইঞামশায়। ছেলের একটা বছর নষ্ট করবেন কেন। পড়াশোনায় ভালো যখন ঠিক পাশ করে যাবে।

পরীক্ষা হয়ে গেলে আমি কিন্তু চলে আসব।

জগদীশ অগত্যা বললেন, ঠিক আছে পরীক্ষা দাও। কাউকে না হয় তোমার সঙ্গে পাঠাব। আমার তো সময় হবে না, দেখি কাকে পাঠাতে পারি।

অরু তখনই দেখতে পেল সেই নদী—মেঘনা। পারাপারহীন হয়ে আছে নদী—ও—পাড় দেখা যায় না। অনন্ত জলরাশি ছাড়া সামনে যেন কিছু নেই। এদিকটায় নদীর চড়া পড়ায় স্টিমারঘাট দূরে সরে গেছে। বাবা লোকনাথের অভ্রান্ত নির্দেশে নদী আর এদিকটায় এগোতে সাহস পায়নি। চড়ার জমিতে চাষ—আবাদও হচ্ছে।

তারা আল ধরে দ্রুত হাঁটছিল।

জমিতে লতার মতো গাছ বাড়ছে।

জগদীশ বললেন, এগুলো সব পটলের জমি। এগুলো সব পটলের লতা।

জগদীশ যেতে যেতে পুত্রকে রাস্তায় দু—পাশের মাঠঘাট চেনাচ্ছিলেন। কিছু যাযাবর পাখিও উড়ে এসেছে—চড়ার যেদিকটায় এখনও জোয়ারের সময় জলে ডুবে যায়, সেখানে চাষ—আবাদ নেই। কিন্তু হাজার হাজার পাখির ওড়াউড়ি আছে।

যাযাবর পাখিরা যে হিমালয় পার হয়ে উষ্ণতার জন্য এ—দেশে চলে আসে, এবং শীতের শেষে আবার সাইবেরিয়ায় উড়ে যায় যেতে যেতে জগদীশ পুত্রকে তাও জানালেন।

অরু তার গ্রাম মাঠ চেনে। তাদের গ্রামে কোনও পাকাবাড়ি নেই। তাদের গাঁয়ে কেন, কাছাকাছি কোনও গাঁয়েই পাকাবাড়ি নেই। সেতো ছোট কাকার সঙ্গে বাজার হাট করতে দু—এক ক্রোশ কখনও হেঁটে গেছে, বর্ষাকালে নৌকায় বাজার হাট করতে যাওয়ারও মজা কম না।

কিন্তু সে কোনও গাঁয়েই পাকাবাড়ি দেখেনি। কেবল দনদির বাজার পার হয়ে লাধুর চরের দিকে যাবার রাস্তায় একটি ছোট্ট মিনা করা শান বাঁধানো মসজিদ দেখেছে। কাচ হতে পারে, অথবা অন্য কিছুও হতে পারে। রোদ উঠলে মসজিদের মিনার এমন সোনালি রঙ ধরে যে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। গাঁয়ের সব বাড়িঘরই হয় টিন কাঠের, না হয় মুলিবাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি। মাটির ভিটে। গরিব মানুষেরা খড়ের ঘরে থাকে—ছোট ছোট কুটিরের মতো লাগে দেখতে।

এই গাছপালার মধ্যে, নদীনালার পাড়ে পাড়ে অবিশ্রান্ত এই নিবাস তৈরি করে বসবাসের মধ্যে মানুষের আশ্চর্য এক মোহ তৈরি হয়ে যায়। অরু হাঁটে।

যেদিকে চোখ যায়, এখন শুধু ধু ধু বালি রাশি। সে চড়া পার হয়ে যায় বাবার সঙ্গে। অদূরেই সেই বিশাল অশ্বত্থ গাছ, তার নিচে স্টিমারঘাটের স্টেশনবাবুর আটচালা বাড়ি। চা সিগারেট বিড়ির দোকান, একদিকে একটা কুঁড়েঘরে একজন সাধুবাবা ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। স্টিমারযাত্রীদের ভিড়। সবই অতি দেহাতি মানুষ। মাথায় বোচকা। কাঁধে ঝোলানো কাস্তে এবং মাথলা। পরনে লুঙ্গি, ফতুয়া গায়। তারা উজানে ধান কাটতে বর্ষায় বের হয়ে গেছে, হেমন্তের শেষাশেষি দেশে ফিরছে। কিছু বাবুমতো মানুষ, তাদের পরিবার যাত্রীনিবাসের, বাঁশের মাচানে বসে আছে। কাঠের পাটাতনের উপর দিয়ে কিছুটা হেঁটে যেতে হবে। চিরপরিচিত পৃথিবী তার, এখানটায় এসে যেন একেবারেই হারিয়ে গেছে।

সে বারবারই মুখ তুলে বাবাকে দেখছে।

জগদীশ বললেন, নারাণগঞ্জ থেকে স্টিমারটা ছাড়ে। উদ্ধবগঞ্জ, বৈদ্যেরবাজার হয়ে বারদীর ঘাটে এসে ভিড়বে। বেলা দেখে সময়ের আন্দাজ করতে হয়। তবে জগদীশ জানে, দশটার মধ্যেই স্টিমার ঘাটে ভিড়বে।

এখানটায় নদী খুব চওড়া, এবং বাঁক আছে বলে, ঠিক বেলতলির মুখে না এলে স্টিমার দেখা যায় না। সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে, ঐ বুঝি আসছে, ঐ বুঝি দেখা যায়। জগদীশ বুঝতে পারছেন না—ঠিক কতটা আর দেরি। তার পকেট ঘড়িটা সময় ঠিক দিচ্ছিল না, নারায়ণগঞ্জে সুধাকরের ঘড়ি মেরামতের দোকানে দিয়ে এসেছিল, ফেরত আনা হয়ে ওঠেনি। সেখানে যেতে হলেও যে স্টিমারে যেতে হয়—যেতে আসতে একটা দিন কাবার হয়ে যায়। মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষেই যাওয়া এতদূর, তবে যে হেঁটে যাওয়া যায় না তাও নয়, শীত কিংবা গ্রীষ্মে হেঁটেই যেতে হয়। প্রায় পনেরো ক্রোশের মতো রাস্তা হেঁটে শুধু ঘড়ি মেরামতের খবর নেওয়াও কঠিন।

অগত্যা পাশের ভদ্রলোকটিকে বলতেই হল, বাবুমশায়, কটা বাজে?

লোকটি পকেট থেকে ঘড়ি বের না করেই বলল, দশটা বেজে গেছে। মনে হয় লেট আছে।

ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়তে পারে, চড়ায় আটকে যেতে পারে। কতরকমের দুর্দৈবই যে যাত্রাপথের অপেক্ষায় থাকে। জগদীশ অগত্যা অশ্বত্থ গাছের গুঁড়িতে বসে পড়লেন। পাশে অরু দাঁড়িয়ে আছে। সে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। হাওয়ায় নদীতে বড় বড় ঢেউ—পাখিরা উড়ছে, ফিঙে পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে নদীর উপর দিয়ে। কাক চিলও উড়ছে। ঢেউ—এর মাথায় ভেসে বেড়াচ্ছে বালিহাঁস—বাজপাখিরাও উড়ে উড়ে নদীর জলে শিকারের খোঁজে আছে। পাটাতনটা লম্বা হয়ে চলে গেছে বেশ দূরে—পাটাতনের নিচে বেদেদের নৌকাগুলি বাঁধা। ঢেউএ খুবই দুলছিল।

গাদাবোটও কম নেই। জেলে ডিঙ্গি সব মাছ নদীতে জাল ফেলে বসে আসে। অদূরে নদীর ঘাটে দুটো কেরায়া নৌকা লগি পুঁতে অপেক্ষা করছে। যাত্রী পেলেই বোধ হয় ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে দেবে। আর যতদূর চোখ যায় শুধু জল, আর কাশের জঙ্গল নদীর বুকে জেগে ওঠা চরগুলিতে। আশ্চর্য এক রূপকথার দেশে যেন অরু ঢুকে যাচ্ছে।

তখনই জগদীশ ডাকলেন, অরু আয়। স্টিমার আসছে।

অরু বেলতলির ঘাটের দিকে তাকাল—না কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সে শুনেছে, সাদারঙের স্টিমারটা অনেক দূর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে স্টিমারের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখতে পেল না।

সে বলল, কোথায়?

আসছে। চলো এগিয়ে থাকি।

এগিয়ে থাকি বলতে জগদীশ অরুকে কোথায় যেতে বলছেন বুঝতে পারল না।

সে দেখল বাবা তার আর কোনও কথা না বলে পাটাতনের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন।

সে এবার যেন কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলল, কোথায় স্টিমার?

বাবা বললেন, শব্দ শুনতে পাচ্ছ না। গুমগুম আওয়াজ। কান পাতলেই শোনা যায়। তোমার স্টিমার আসছে।

দুই

বাবার হাতে ফুল—তোলা টিনের স্যুটকেস, বগলে পুঁটুলি—তিনি পাটাতনের শেষ মাথায় প্রায় চলে গেছেন—সেও দৌড়তে পারত, কিন্তু কোথায় স্টিমার, গুমগুম আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে না, সে দাঁড়িয়েই আছে। সারাটা রাস্তা বাবা কিছুতেই স্যুটকেসটা তার হাতে দেননি—এমনকি বোঁচকাটিও নয়, সে কি এতই ছেলেমানুষ! এই সব ভেবেই তার এত রাগ হচ্ছিল যে, স্টিমার না দেখে যেন এক পা—ও নড়বে না সে। আর বাবা কেন যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাও সে বুঝতে পারছে না। স্টিমারটা কি তাদের ফেলে চলে যেতে পারে!

বাবা ডাকছেন, অরু আয়, দাঁড়িয়ে থাকিস না। আগে উঠতে না পারলে বসার ভালো জায়গা পাবি না। কতদূর আমাদের যেতে হবে!

তখনই সাদা রঙের স্টিমার নদীর বাঁকে ঢুকে গেছে। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ক্রমে স্টিমারটা এগিয়ে আসছে। কী বিশাল, যেন নদীর জল তোলপাড় করে সিটি বাজাতে বাজাতে সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছে—নদীর পাড়ে এসে বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। নৌকাগুলি দুলছিল—নদীর দু'পাড় জলময় হয়ে যেতে যেতে কখন যে স্টিমার থেকে সিঁড়ি নেমে গেল, তাও যেন অরুণ খেয়াল নেই। কেমন এক বিস্ময় তার মধ্যে নিয়ত খেলা করে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ সে দেখল বাবা তার কাছে ছুটে এসেছেন।

কী হল! আয়।

অরু বুঝল তাকে যে স্টিমারে উঠে আরও অনেক দূরে চলে যেতে হবে—যেন মনেই নেই। যেন নদীর পাড়ে সে বেড়াতে এসেছিল, কোথাও যাবার কথা ছিল না তার, স্টিমার দেখে সে বাড়ি ফিরে যাবে—বাবা এসে তার হাত ধরে টানতেই তার খেয়াল হল সে পাটাতনের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীরা সব উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি ধরে, সে তাড়াতাড়ি বাবার হাত ছাড়িয়ে দৌড়তে থাকল। আর স্টিমারে উঠে যাত্রীদের ভিড় ঠেলে সিঁড়ি ধরে আপার—ডেকে উঠে গেল। রেলিং—এ ঝোলানো সাদা রঙের গোল গোল লাইফবয়া পরম কৌতূহলে সে দেখছে।

বাবাকে দেখেই প্রশ্ন, এগুলো কী!

পরে সব জানতে পারবে। আগে আমার সঙ্গে এসো। জাহাজের সারেঙসাবের সঙ্গে দেখা করে আসি। তিনি তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। সুলতানসাদির বাজারের কাছে এককালে তাঁর বাড়ি ছিল। তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি শুনেই বললেন, কর্তারে নিয়া আসেন, দেখি। আশরাফ মিঞার নাম নিশ্চয়ই শুনেছ।

আশরাফ মিঞার নাম সে কখনোই শোনেনি। সে জানে বাবার এই স্বভাব, যে—মানুষ এতবড় স্টিমারটা চালিয়ে নিয়ে যায়, তার নাম না জানলে হবে কেন! ঝড়জলে কিংবা প্লাবনে, অথবা জলের ঘূর্ণি যার এত চেনা, সে মানুষটার নাম না জানা খুবই অন্যায়, এমনও মনে হল বাবার মুখ দেখে। তা ছাড়া মানুষটা যখন তাদের এলাকার মানুষ।

সে ডেক—ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। এটা যে স্টিমারের নিষিদ্ধ এলাকা, তার জানা নেই। পাশের ঘরটা হুইল রুম। একটা লোক সেখানে দাঁড়িয়ে চাকার মতো দেখতে জিনিসটাকে ডাইনে—বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে। রঙ—বার্নিশের গন্ধ উঠছে। দু'পাড়ে নদীর চড়া, সামনে নদীর জল, মাথার ওপর আকাশ দিগন্ত প্রসারিত যেন। গাছপালা, নদীর তীর এবং সামনের জলরাশি—সব মিলে তাকে কিছুটা কেন জানি উন্মনা করে দিয়েছে। জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না।

জগদীশ বললেন, কী হল, এসো! দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?

এখন আমার যেতে ইচ্ছে করছে না বাবা।

তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা করা উচিত। তাঁরই স্টিমারে তুমি যাচ্ছ, আমি তো সব সময় তোমার স্কুলের ছুটিছাটায় সঙ্গে আসতে পারব না। আশরাফের স্টিমারে উঠিয়ে দিলে, সে—ই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। আমাদের এলাকার লোক, সবাই তাকে চেনে।

আমার ভালো লাগছে না বাবা।

কেন ভালো লাগছে না! কী হয়েছে? মোয়ামুড়ি আছে, খিদে পেলে খেতে পারো।

ভালো না লাগারই কথা। বাড়ি ছেড়ে এই প্রথম দূরদেশে যাচ্ছে। বাড়ির কাছাকাছি কোনও হাইস্কুল নেই বলেই, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া। মন খারাপ হতেই পারে। বাড়িতে তার জননীও কান্নাকাটি করেছে আসার সময়।

আসলে অরুর মনে হচ্ছিল, সেই নির্বাসিত দেশে সে যাচ্ছে। সেখানে কে আছে জানে না, যতক্ষণ দেখা যায়। এই দু'পাড়ের মানুষজন ছেড়ে গেলেই যেন সেই নির্বাসিত দেশটায় ঢুকে যাবে। যতক্ষণ পারা যায়, দেখা। ঘরবাড়ি, মানুষের পদচিহ্ন এত আগ্রহ সৃষ্টি করে, সে জীবনেও টের পায়নি!

সে রেলিং—এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

স্টিমারটা গতি পেয়ে গেছে—দু'পাশের চাকাদুটো ঘুরছিল—কেমন ঝমঝম শব্দ। তার কাছে সবকিছুই একটা নতুন গ্রহের মতো। পরনে হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট গায়, মাথার চুল উড়ছিল, সে জানেই না বাবা তার পাশে এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে যতদূর চোখ যায় দেখা, এবং যখন টের পেল বাবা তাকে নিয়ে যাবেনই, সে বলল, ওটা কী বাবা?

ওটা নবাব ঈশাখাঁর কেল্লা। এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই কেল্লা থেকেই নবাব, চাঁদ রায় কেদার রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

নবাব ঈশাখাঁর নাম সে জানে। চাঁদ রায় যাত্রাপালায় নবাব ঈশাখাঁ, সোনাই এবং সেই ঝলমলে তরবারিটির কথাও তার কেন জানি এ সময় মনে পড়ল। কেন যে এসব মনে পড়ে তার! তার নিজের বাড়িঘর, পুকুর, গোপাট, পুকুরপাড়ের অতিকায় তেঁতুলগাছটিও তার চোখে ভেসে উঠল। বাড়িতে ভাইবোনেরা, দাদা বাড়ি নেই বলে কিছুটা ছন্নছাড়া, সে বোঝে। ছোটকাকা হয়তো এখন বিগ্রহের সেবায় ঠাকুরঘরে ঢুকে গেছেন। মা বিগ্রহের পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। কাকিমা রান্নাঘরে। হালের বলদ দুটিকে বিধুদা খড় কেটে দিচ্ছে। বৈঠকখানা ফাঁকা। তার পড়ার টেবিল—চেয়ার ফাঁকা। বই, খাতাপত্র কিছুই পড়ে নেই। গৃহশিক্ষক সমতুল সার ছুটিতে দেশে গেছেন। ফিরে এলে তিনি একাই রাতে বৈঠকখানায় শোবেন। মাথার কাছে একটা হারিকেন জ্বলবে। বাড়ি থেকে কেউ চলে গেলে কতটা ফাঁকা লাগে গৃহশিক্ষক ফিরে এলে ঠিক টের পাবেন। সে রাতে বৈঠকখানায় শুত। একটা তক্তপোশে সমতুল সার। পাশের তক্তপোশে সে। সামনের জানলা খুলে দিলে গরমেও ঠান্ডা হাওয়া উঠে আসত গোপাট থেকে।

এখন থেকে সমতুল সার তার ভাই—বোনদের নিয়ে তক্তপোশেই হয়তো গোল হয়ে বসবেন। মাইনর স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক সমতুল সার তাদের বাড়িতেই থাকেন, খান। তাদের পড়াশোনার সব দায়িত্ব তাঁর। সে নেই। সে আর সন্ধ্যায় হারিকেন জ্বেলে বৈঠকখানায় সারের সামনে গিয়ে পড়ার জন্য বসতে পারবে না।

স্টিমারে উঠে এই সব অতি—তুচ্ছ ঘটনাই এত বেশি তাকে পীড়া দিচ্ছে যে সে আশরাফ মিঞার সঙ্গে দেখা করার কোনও উৎসাহই পাচ্ছে না।

আশরাফ মিঞা কখন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সে টের পায়নি। বাবা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই গেলি না, আশরাফ নিজেই উঠে এসেছে।

আপনারা এখানে!

অরু আর কী করে!

সে নদীর দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। বাবার সেই অসামান্য মানুষটি তাদের খোঁজে ডেক—ছাদে চলে এসেছে। সে পেছন ফিরে তাকাতেই আশরাফ বলল, কী—গ কর্তা, মন ব্যাজার কেন এত! মানুষ কি কখনও এক জায়গায় থাকে! পড়ালিখা করতে যাচ্ছেন, কত সুখবর বোঝেন না! ব্যাজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়? বড় হয়েছেন না!

অরু দেখল, লুঙ্গি পরে ফতুয়া—গায়ে লোকটি প্রায় আত্মীয়ের মতো কথা বলছে। তাকে আশ্বস্ত করছে, বাড়ির খবর ইচ্ছে করলে রোজই পেয়ে যাবেন। মা—র জন্য মন খারাপ করবেন না। রোজ না পারি, এক—দু'দিন অন্তর বাড়ির খবর দিয়ে আসব। আসেন আমার সঙ্গে। স্টিমারটা ঘুরে দ্যাখেন—কত মজা আছে ইঞ্জিন—ঘরে ঢুকলে বুঝতে পারবেন।

আশরাফ তাকে নিয়ে আপার ডেক থেকে লোয়ার ডেকে নেমে গেল। জগদীশ সঙ্গে গেলেন না—আশরাফ দেশের লোক, সে নদীতে স্টিমার চালায় বলে কর্মস্থল যেতে আসতে নানা সুবিধাও থাকে। আশরাফের সঙ্গে

তাঁর খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক—একটাই মুশকিল, আশরাফের আদর—আপ্যায়ন একটু বেশি মাত্রায়—যেমন সে আলাদা বন্দোবস্ত করে জগদীশকে খাওয়াতে চায়। লস্করদের একজন জগদীশের স্বজাতি—সেই আসন পেতে চিঁড়ে—মুড়ি অথবা দই দিয়ে ফলারের বন্দোবস্ত করে দেয়। এতে জগদীশ যে খুবই বিব্রত বোধ করেন, আশরাফ কিছুতেই বুঝতে চায় না। স্টিমারে আশরাফের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার এই একটা বিড়ম্বনা আছে। যাত্রীবোঝাই স্টিমারটিতে পা ফেলার জায়গা থাকে না। যে যেখানে পারছে আসন পেতে বসে থাকে। দূরের যাত্রীরা বিছানাপত্রও তুলে আনে। তিনি একা থাকলে আশরাফের কেবিনের দিকে সহজে পা মাড়ান না। যতটা পারেন আশরাফকে এড়িয়ে চলেন।

কিন্তু এবারে কী যে মনে হল তাঁর, অরুকে নিয়ে যাচ্ছেন, আশরাফের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা খুবই জরুরি। এই ভেবেই তিনি লোয়ার ডেক ধরে ইঞ্জিন—রুম পার হয়ে কেবিনে ঢুকে গেছিলেন। অরু তখন দৌড়ে কোথায় যে সিঁড়ি ধরে উঠে গিয়েছিল!

পরে ডেক—ছাদে খুঁজে পেলে তাকে নিয়ে যেতে চাইলেন, অথচ অরু কিছুতেই গা করল না। আশরাফ মনে মনে কী না ভাবল!

তিনি আর ডেক—ছাদ থেকে নামলেন না। আসন পেতে বসে থাকলেন। জায়গাটি নিষিদ্ধ এলাকা হলেও তার এখানে বসে থাকতে অসুবিধা হয় না। হুইল—ঘরের লোকটিও জানে কর্তার সঙ্গে আশরাফ সারেঙের দোস্তি আছে।

পাঁচুডাঙ্গার পাশ দিয়ে স্টিমার যাচ্ছে। এখানকার পাটালি গুড়ের সুখ্যাতি আছে খুব। আশরাফ মাঝে মাঝে তার কাছারিবাড়িতে পাটালি গুড়ও ভালো পেলে দিয়ে আসে। এমনকি স্টিমার ছাড়তে দেরি থাকলে আশরাফ তাঁর সঙ্গে কাছারিবাড়িতে দেখা করেও যায়। সেই আশরাফ এখনও ফিরছে না অরুকে নিয়ে। স্টিমারে বসে থাকলে ঘরবাড়ি, গাছপালা, মানুষজন কেমন আলগা হয়ে যায়, মাঝে মাঝে মনে হয় সম্পর্ক সব শিথিল হয়ে যাচ্ছে, উদাস লাগে। তিনি নিজেও তখন ভালো থাকেন না।

তিনি জানেন, অরুর অজস্র কৌতূহল, একবার যদি আশরাফের আশকারা পেয়ে যায়, তবে তাকেই হয়তো শেষ পর্যন্ত নিচে নেমে যেতে হবে অরুকে খুঁজতে। কাছারিবাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে, আহারের বন্দোবস্ত বলতে চিঁড়াগুড়, কিছু মুড়কি এবং মোয়া জলে ভিজিয়ে খাওয়া। রাতে কখন পাত পড়বে, যদিও বড় শরিকের তরফের বউঠান জানেন, অরু আসছে। শুধু বউঠান কেন, বড় শরিক দেবকুমারবাবুর অনুমতি না পেলে তিনি অরুকে নিয়ে সেখানে তুলতে পারতেন না। তিনিই আশ্বাস দিয়েছেন, দেশে পড়ার বন্দোবস্ত করতে না পারো এখানে নিয়ে চলে এসো। তোমার সঙ্গেই না—হয় থাকবে। থাকা—খাওয়ার যখন কোনও অসুবিধা নেই, তুমি এত সঙ্কোচ করছ কেন, জগদীশ বুঝছি না।

নদী এখানে তার কিছুটা বিস্তার হারিয়েছে।

দু'পাড়ের গ্রাম মাঠ ঘরবাড়ি ফেলে স্টিমার এগিয়ে যাচ্ছে।

গোপালদির ঘাটে কিছু যাত্রী নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে, স্টিমারে ভিড় এখন বেশ হালকা। এরপর আসমানদির চরে যাত্রী নেমে যাবে। নবিনগর পার হলেই আর ঘণ্টাখানেকের পথ। এই নদীনালায় বেষ্টিত দেশটির জন্য জগদীশ খুবই গর্ববোধ করেন। অরুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যাত্রা করেছিলেন, দুশ্চিন্তাও আছে, অরুর শেষ পর্যন্ত মন টিকলে হয়! তবে আশরাফের জিম্মায় চলে যাওয়ায় তিনি যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত। যেমন একবার অরু ডেকে গেল, বাবা, আশরাফ চাচা গোপালদির ঘাট থেকে দই—মিষ্টি আনিয়েছে। অরুর সঙ্গে উদ্ধবও হাজির। কলাপাতায় দই চিঁড়া মুড়ি সযত্নে রেখে বলেছে, আপনি খেতে বসেন কর্তা। বেলা তো পড়ে আসছে। ইস, আশরাফ যে কী করে! মোয়া মুড়ি চিঁড়া সবই অরুর মা পুঁটুলিতে দিয়েছে। কী যে করে না আশরাফ!

কে শোনে কার কথা! আশরাফও ওপরে উঠে এসেছে। তার কাজ—কাম মেলা জাহাজে। ইচ্ছে করলেই সে সব সময় হাজির থাকতে পারে না। জগদীশ কিছু বলতেও পারেন না। ডেক—ছাদে আসন পেতে ফলার

খাওয়ার মজাও কম না। অরু খেয়েছে কি না জানে না। আশরাফ সামনে হাজির। অরুকে জিজ্ঞেসও করতে পারছে না সে খেয়েছে কি না। বললে যেন আশরাফকে ছোট করা হবে।

জগদীশ গণ্ডূষ করে কলাপাতার চারপাশে জল ছিটিয়ে দেওয়ার সময় বললেন, তোমাদের খাওয়া হয়ে গেছে আশরাফ!

কর্তা আহারপর্বটি আপনার সারা না—হলে মুখে দানাপানি দিই কী করে।

জগদীশ বললেন, এই ভয়েই তোমার স্টিমারে উঠি না আশরাফ। উঠলেও গা ঢাকা দিয়ে থাকি। দশ ক্রোশ হেঁটেই ছুটি পেলে দেশে চলে যাই। কাজ—কাম ফেলে আমাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে চলে!

আপনি খান তো!

অরু বলল, ক্ষীরের চমচম দারুণ। পাতক্ষীরও খেয়েছি। হাঁড়িতে কলাপাতায় বেঁধে দিয়েছে বাকিটা।

গোপালদির পাতক্ষীরের খ্যাতি আছে খুব। ক্ষীরের চমচমেরও। আশরাফ অরুকে এমন সুস্বাদু খাবার না খাইয়ে ছাড়ে কী করে! শুধু খাইয়েই তৃপ্তি নেই তার, সঙ্গে ক্ষীরের চমচম, পাতক্ষীর হাঁড়িতে আলাদা কলাপাতায় বেঁধে দিয়েছে। গোপালদির ঘাটে স্টিমার ভিড়ল, অথচ অরুকে তা খাওয়ানো গেল না, আশরাফের মতো মানুষ তা মানতে রাজি না। আশরাফ যে এককালে পিতাঠাকুরের আমলে তাদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছে—অরু সে খবরও রাখে না। অনাথ আশরাফ বৈঠকখানায় থাকত, জগদীশ আর সে একই সঙ্গে বড় হয়েছে, আশরাফ তারপর কিছুদিন নিখোঁজ হয়ে থাকল, পিতাঠাকুর বেঁচে থাকতে নিখোঁজ আশরাফ একবার দেখা করেও গেল, কারণ পিতাঠাকুর, আশরাফ না বলে না কয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় বড়ই আন্তরে পড়ে গিয়েছিলেন, খোঁজাখুঁজিও কম হয়নি। শেষে পিতাঠাকুর হাল ছেড়ে দিয়ে একদিন কেন যে বলে ফেললেন, বেইমান। দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম। ছোবল মেরে পালিয়েছে।

সেই আশরাফ যখন ফিরে এল তখন তাকে চেনাই যায় না। বাবরি চুল, পাজামা পাঞ্জাবি পরনে, পায়ে রাবারের জুতো, বাড়ি ঢুকেই হাঁকডাক, জ্যাঠাবাবা। কোথায়! অরু তখন হয়নি। সবে জগদীশের বিয়ে দিয়েছেন, কল্যাণীকে বালিকাই বলা চলে, একজন অপরিচিত লোকের ভেতর বাড়িতে ঢুকে যাওয়ায়, কিছুটা কল্যাণী বিরক্তও হয়নি বলা যায় না, সেই ডেকে বলেছিল, বাবা একটা লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে কাকে জ্যাঠাবাবা জ্যাঠাবাবা করছে।

পিতাঠাকুর ঠাকুরঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখতেই, কেমন আহ্লাদে পূজা—আর্চার কথা ভুলে বাইরে বের হয়ে বলেছিলেন, তুই, তুই আশরাফ না।

জি!

জি তোমার বের করছি। বেরো বাড়ি থেকে। বেরো—বলছি। বলা নেই কওয়া নেই, চলে গেলি! তুই কিরে।

তারপর যা হয়, পিতাঠাকুর কেঁদে ফেলেছিলেন, ঠাকুর তুমি আমার মুখ রক্ষা করেছ। আশরাফ আবার ফিরে এসেছে।

জগদীশের জননী পুকুরঘাট থেকে ছুটে এসেছিলেন, আশরাফ ফিরে এসেছে। তারপর যা হয়, আশরাফের উপর কড়া হুকুম জারি হয়ে গিয়েছিল, বাড়ি থেকে না বলে কয়ে বের হলে ঠ্যাঙ ভেঙে দেওয়া হবে।

আশরাফ হাসতে হাসতে বলেছিল, জ্যাঠাবাবা আমার কাজ ফেলে থাকি কী করে। বাড়ি থেকে বের হতে না দিলে আমার মনিব মানবে কেন! কিছু একটা করে খেতে হবে বলেই বের হয়ে গেছি। লসকরের কাজ নিয়েছি জানতে পারলে তখনই যে খড়মপেটা করতেন। আমার কী দোষ বলেন!

আশরাফের কাজ হয়েছে শুনে পিতাঠাকুর কিছুক্ষণ গুম মেরে বসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, এলি যখন, দুটো দিন থেকে যা। তুই না থাকায় বাড়িটা আমার কত খালি হয়ে গেছে বুঝবি না আশরাফ!

আশরাফ জ্যাঠাবাবার কথা ফেলে কী করে! সে থেকে গেল। পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরল, পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে গেল, দোয়া ভিক্ষা করল, এবং সে যে একসময় বাড়ির ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িয়ে

গিয়েছিল, বাড়িটা ঘুরে ঘুরে সব ঠিক আছে কিনা দেখতে গিয়ে না বলে পারল না, ঘাটের জামগাছটা নেই কেন?

ঝড়ে পড়ে গেছে।

গোপাটের জমিতে তামাকপাতার চাষ বন্ধ কেন?

কে করবে! কে এত খাটবে।

বাগানের সব বাঁশ দেখছি সাফ হয়ে গেছে।

বিক্রি করে দেওয়া হল। অজন্মার বছরে বাঁশ আর রাখা গেল না। সংসার চলবে কী করে! খাব কী দিয়ে!

পুকুরপাড়ের কয়েতবেল গাছটাও নেই?

সেবার প্লাবন হল, জলে ডুবে গেল পুকুরপাড়। গাছটা মরে গেল।

আশরাফ যে বাড়িরই একজন, হম্বিতম্বি করতে ছাড়ল না। বিধুভূষণকে বলল, বিধু তুই যখন তখন গামছা পেতে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাস, গোরুর খোঁটা পালটাস না, তোকে রেখে হবেটা কী!

জগদীশের সবই মনে পড়ছিল—কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ তিনি। তবু কেন যে তাঁর মুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠল। কোথাকার আশরাফ এককালে তাদের বাড়ি এসে উঠেছিল, সেই আশরাফ স্টিমার চালিয়ে নদী ধরে কতদূরে চলে যায়, বন্দরের কাছে নদীর পাড়ে বাড়িও করেছে, আশরাফের সংসার হয়ে যাওয়ায় সে আর দু ক্রোশ হেঁটে বারদীতে নেমে তাঁর বাড়ির সঙ্গে কোনোই যোগাযোগ রাখতে পারে না—দেখা হলে আপ্যায়নের শেষ থাকে না—বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় অথবা তিনি দু ক্রোশ রাস্তা ধরে অরুকে নিয়ে যে হেঁটে এলেন, একবারও কেন যে আশরাফের কথা মনে হয়নি ভেবেই হেসে দিয়েছেন। ম্রিয়মাণ হাসি—আশরাফ ঠিকই বলেছে, এক জায়গায় কেউ থাকে না।

অরু হয়তো নিজের মতো একদিন তার পৃথিবীটাকে খুঁজে নেবে। বাড়ির সঙ্গে সেও তার নাড়ির সম্পর্ক হারিয়ে ফেলতে পারে। স্টিমারে সে যে তাঁর সঙ্গে দূরদেশে যাচ্ছে কে বলবে? সারাটা দিন স্টিমারের এ—মাথা ও—মাথায় দৌড়াচ্ছে। লাফালাফিরও শেষ নেই। রেলিং—এ ভর দিয়ে সিঁড়ি ধরে আপার—ডেকে উঠে গেছে। আবার লোয়ার—ডেকে নেমে গেছে। তার বাবা স্টিমারে আছে, না তাকে ফেলে নেমে গেছে, নেমে যেতেই পারেন, ভুলভাল তো মানুষেরই হয়, অরুর সে ব্যাপারে কোনোই ভ্রূক্ষেপ নেই। জগদীশ অরুকে নিয়ে যতটা দুশ্চিন্তায় ছিলেন এমনকি, হাঁটাপথে তাকে যতটা ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, এখন দেখলে মনে হয় না সে ক্লান্ত। আশরাফ কিছুতেই অরুকে তার কেবিনে নিয়ে যেতে পারেনি। কেবিনের বাঙ্কে ইচ্ছে করলেই গড়াগড়ি দিতে পারত, অন্তত আর কিছু না হোক, অরুর বিশ্রাম হত কিছুটা, অরু ওর কেবিনে ঢুকেছে, বাঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়ে নিতে বললে, সে আবার লাফিয়ে বের হয়ে এসেছে। কখনও বিশাল চিমনিটার পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছে চুপচাপ, অথবা ইঞ্জিন রুমে যে লোকটা কয়লা মারছিল বয়লারে তার বলিষ্ঠ শরীর এবং আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে লোকটা, সোজা কথা—সে কিছুতেই তার পাশ থেকে সরে আসতে চাইছিল না।

একসময় মদনগঞ্জ ঘাটও চোখে ভেসে উঠল দূর থেকে।

সেখানে একটিমাত্র থামের উপর বড় গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। রাতে সেই গ্যাসবাতির আলোতে স্টিমারটা চিনতে পারে, কাছে এসে গেছে মদনগঞ্জের ঘাট।

নদীর দু—পাড়ে অন্ধকারে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। কোথাও কুপির আলো, কোথাও বা হারিকেনের আলো। মদনগঞ্জের সড়ক ধরে মানুষজন যে হেঁটে যাচ্ছে বোঝা যায়। লোকজন রাস্তায় বের হলে সঙ্গে হয় টর্চবাতি, না হয় হারিকেন হাতে রাখে। অন্ধকারে গাছপালার ছায়ায় রাস্তার কিছুই দেখা যায় না। সড়কের সুরকির রাস্তা বড়ই এবড়োখেবড়ো। বাবুদের প্রাসাদ এখনও চোখে পড়ছে না—স্টিমার তার গতি কমিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণ পুবের দিকে মুখ ছিল স্টিমারের এখন তার মুখ উত্তরদিকে ঘুরে গেছে। শান বাঁধানো নদীর পাড়ে স্টিমারটা এবার ভিড়বে।

আলোগুলো জ্বালিয়ে দিতেই মনে হল জগদীশের একটা জ্যান্ত শহর হয়ে গেছে যেন স্টিমারটা। উজ্জ্বল আলোর নিচে যাত্রীরা তাদের লটবহর গুছিয়ে নিচ্ছে। অরু যে কোথায়! এবার তো নামতে হবে।

তিনি ব্যস্ত হয়ে অরুকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলেন। আশরাফ বোধহয় নোঙরের ঘরে ঢুকে গেছে। তার দায় মেলা। সে যে কেবিনে নেই জগদীশ জানেন। আর তা ছাড়া আশরাফ খুবই ব্যস্ত মানুষ, তাকে অরু সম্পর্কে কোনও কথা বলতেও সঙ্কোচ হচ্ছিল। স্টিমারের এদিকটায় মুরগির মাংসের গন্ধ উঠছে। স্টিমারে উঠলে তার কেন জানি গন্ধটা সহ্য হয় না। লোয়ার ডেকের শেষ দিকটায় তিনি সেজন্য কখনই যান না। ইলিশ মাছের ঝোল ভাত প্লেটে করে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। কোনওরকমে নাকে রুমাল দিয়ে কিচেনের দিকটা পার হয়ে গেলেন। যদি কৌতূহল বশে অরু গেরাফি ফেলার ঘরটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। না সেখানেও নেই। কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন—তারপর না পেরে ফরোয়ার্ড পিকে উঠে গেলেন। যেখানটায় স্টিমারের সার্চলাইট নদীর জল ঘেঁষে দূরে চলে গেছে, অবাক হয়ে দেখলেন, সার্চলাইটের ঠিক নিচে অরু দাঁড়িয়ে আছে। নদীর বুকে আলো পড়ে যে রহস্য তৈরি হয়েছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাই দেখছে অরু।

এই উজ্জ্বল আলোর উৎস অরু জীবনেও প্রত্যক্ষ করেনি। সার্চলাইটের আলোতে নদীর পাড়, গাছপালার সব যেন ভেসে যাচ্ছে। অজস্র পাখি ওড়াউড়ি করছিল এবং কোথাও কোনও গাছের ডাল থেকে একঝাঁক বাদুড় উড়ে গিয়ে ঘুরে ঘুরে গাছটা প্রদক্ষিণ করছে। ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়ায় বাদুড়ের কিচমিচ শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। ঘাটে মানুষের ভিড়। আলোতে সব কিছু এত বেশি উদ্ভাসিত হয়ে আছে যে অরু নড়তে পারছিল না।

এই অরু!

হুঁ।

চল, আমাদের নামতে হবে।

অরু যেন কিছুটা ঘোরে পড়ে গেছে। সে দাঁড়িয়েই আছে।

জগদীশ বোঝেন, জীবনের এই সব নতুন অভিজ্ঞতায় অরু কিছুটা বোধহয় ধন্দে পড়ে গেছে। সে ভাবতে পারে এমন আশ্চর্য এক গ্রহের খোঁজ স্টিমারে না এলে পেত না।

জগদীশ টের পেল গেরাফি নেমে যাচ্ছে। গড় গড় করে অতিকায় গেরাফিটা জলের অতলে নেমে যাচ্ছে। মোটা রশি দিয়ে পাটাতনের থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হচ্ছে স্টিমারটিকে। যাত্রীদের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। অরুর কিছুতেই হুঁশ ফিরে আসছে না যেন!

সবাই নেমে যাচ্ছে। অরু বলল।

আমরা নামব! হ্যাঁ। এতক্ষণ কী বলছি তোমাকে।

অরুর মধ্যে আবার সেই বিষণ্ণতা, সে যেন কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছে না। প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে যাচ্ছেন জগদীশ, আশরাফকে এই সময় খোঁজা অর্থহীন—কোনওরকমে নেমে যাওয়া দরকার। টিনের স্যুটকেস, মিষ্টির হাঁড়ি এক হাতে, অন্য হাতে অরুকে ধরে রেখেছেন। পাড়ে লেগে গেলে স্টিমারটা দুলে উঠল। জগদীশ নিজেকে সামলে, অরুকে সামলে নেমে যাচ্ছেন, তখনই দেখলেন আশরাফ ছুটে আসছে। অরুকে বলল, সাবধানে নামবেন। বাবার কথা শোনবেন। বাড়ি ছেড়ে বিদেশ—বিভুঁইয়ে পড়াশোনা করতে চলে এলেন—তারপর বড় হয়ে দূরদেশে যখন যাবেন, আমারে সঙ্গে নিবেন, মন খারাপ করলে চলে! কেউ তো এক জায়গায় থাকে না।

অরু কিছু না বলে শুধু হাত তুলে দিল।

তিন

নদীর ঘাটে নেমে জগদীশ বললেন, পা চালিয়ে এসো। আর বেশি দূর না। সামনেই আমবাগান, সেখানে আমি থাকি। ঐ যে দেখছ, টিনে কাঠের ঘর। দেখতে পাচ্ছ, অন্ধকার হয়ে আছে বলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আর একটু এগুলেই দেখতে পাবে। বাবুদের সবাইকে মান্য করবে। আমি ওদের কাছারি বাড়িতে থাকি। মেলা দাদা দিদি আছে তোমার। তারা যেন তোমার ব্যবহারে কোনও কারণেই ক্ষুণ্ণ না হয়। কাল দশটায় স্কুলে যাবে। গুরুপদবাবু তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। গুরুপদবাবু স্কুলের হেডমাস্টারই শুধু নন, তিনি একটি আস্ত বিদ্যার জাহাজ।

অরণি বাবার পেছনে পেছনে সেই টিনকাঠের ঘরটার সামনে উঠে যেতেই বুঝল, জায়গাটা যেন কিছুটা পরিত্যক্ত এলাকা। নিশুতি রাতের মতো নিঝুম হয়ে আছে। সিমেন্ট বাঁধানো উঁচু ভিটি, ঘরে ঢোকার সিঁড়িটিও পাকা—বাবা তখন তালা খুলছেন এবং কথা বলেই যাচ্ছেন, স্কুলে ভর্তি হয়ে যাও। এখানেও তোমার মেলা বন্ধুবান্ধব জুটে যাবে। আর বড়বাবু, ছোটবাবুর মতো মানুষ হয় না। দুই শরিকের মধ্যে রেষারেষি আছে ঠিকই তবে তুমি রেষারেষি যতটা পারো এড়িয়ে চলবে। আপাতত বড়বাবুর পালিতে আছি, সেখানেই আমাদের দু—বেলা আহারের ব্যবস্থা। মাসে মাসে পালি বদল হবে। সে থাকতে থাকতে বুঝে যাবে। আপাতত জামাপ্যান্ট ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও। বলে তিনি দরজা ঠেলে দিলেন। অন্ধকারেই হাতড়ে বের করলেন একটা হারিকেন। আলো জ্বেলে একটা থামের তারকাঁটায় ঝুলিয়ে দিলেন।

ঘরটা যে পার্টিশান করা তাও টের পেল অরু। পাশের দরজা ঠেলে দিতেই চোখে পড়ল, মেলা কাঠের র‍্যাক, তাতে পুরনো লাল মলাটের সব খাতাপত্র—কেমন একটা অচেনা গন্ধ বের হয়ে আসছে ঘরটা থেকে। একটা বালতি এবং কাঁসার ঘটি ঘর থেকে বের করে দরজা ফের বন্ধ করে বললেন, দু'মিনিট বিশ্রাম করে হাতমুখ ধুয়ে নাও। পাশেই টিউকল। আমার সঙ্গে এসো, বলে হারিকেন তুলে দূরে টিউকলটি দেখালেন। আমি এখুনি আসছি। ভয়ের কিছু নেই। বউঠানকে খবরটা দিয়ে আসি, আমরা এসে গেছি, রাতে খাব। বড়বাবু হয়তো বৈঠকখানায় অপেক্ষা করছেন, তাঁকেও খবরটা দেওয়া দরকার।

তারপর অরণি দেখল, বাবা অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেলেন।

সে কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে যে পড়েছে—তার মুখচোখ দেখেই বোঝা যায়। কোথায় কতদূরে সেই বৈঠকখানা—সে ঘর থেকে যে বের হয়ে যাবে তাও পারছে না। বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে কতটা কি ক্ষতি হত!

সারাদিনের পথশ্রমে সে যে খুবই কাহিল! দরজা খোলা। বাবা সামনের জানালাও খুলে দিয়ে গেছেন। নদী থেকে ঠান্ডা হাওয়া উঠে আসছে। সে তক্তপোশে বসে আছে। তার আর নড়তে ইচ্ছা করছে না। রাতের বেলা একা থাকতে তার এমনিতেই অস্বস্তি হয়। ভয় ভয় করে। অশুভ আত্মাদের ভয়ও আছে তার। সে বেজায় সাহসীও নয়। চারপাশের গাছপালার মধ্যে একটা মাত্র টিনের ঘর, মানুষের কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া যাচ্ছে না। দূরে, বহুদূরে স্টিমারটা যে দুকূল জলে ভাসিয়ে চলে যাচ্ছে, তার গুমগুম আওয়াজ কান পাতলে এখনও শোনা যায়। তক্তপোশের নিচে কী আছে সে জানে না, সে দু—পা উঠিয়ে বসল। উঠে গিয়ে যে তারকাঁটার আংটা থেকে হারিকেনটা তুলে এনে তক্তপোশের নিচটা দেখবে তারও যেন সাহস নেই। কীটপতঙ্গের আওয়াজ উঠছে। গাছপালা থেকে পাতা পড়ছে টুপটাপ, এবং অন্ধকার ভেদ করে সেই শব্দমালার মধ্যে কোনও ভূতুড়ে আওয়াজের মতো টিনের চালে অনবরত কেউ যেন করাত চালিয়ে যাচ্ছে।

তার গলা শুকিয়ে উঠছে।

বাবা কতদূরে গেল!

তক্তপোশে হামাগুড়ি দিয়ে জানালার কাছে উঠে গেল। উঁকি দিল—না শুধু নিশীথের জোনাকি ছাড়া আর কিছুই গোচরে আসছে না।

সে ভেবেছিল, জমিদার বাড়ির সংলগ্ন কোনও গৃহে বাবা থাকেন। বাবা দেশে গেলে নিজের থাকা—খাওয়া নিয়ে মাকে মাঝে মাঝে যেসব খবর দিতেন, তাতে সে বুঝতেই পারেনি, বাবাকে এমন একটা পরিত্যক্ত আবাসে থাকতে হয়। বাবা একা ঘরটায় থাকেন, তবে দু—একজন পাইক কি লেঠেল

জমিদারদের থাকবে না, হয় কী করে! এ যে একেবারে ন্যাড়া! কাঠের কড়ি বরগার উপর মুলিবাঁশের আচ্ছাদন, এখানে সেখানে ঝুলকালি, কাঠের একটি তাক এবং সেখানে তোষক বালিশ মাদুর—কোনও মৃত মানুষের মুখও তার চোখে যেন ভেসে উঠল। এই বাড়িতে কোনও এক অপমৃত্যুর দিনে বাবা রাতে টের পেয়েছিলেন, টিনের চালের উপর কারা সব নৃত্য করছে। কারণ সে রাতে টিনের চালে ঝম ঝম শব্দ, ঠিক ঝড়বৃষ্টিতে টিনের চালে যেমন শব্দ হয়ে থাকে, বাবা কোনও অশুভ ইঙ্গিত পেয়ে দিশেহারা যে হয়ে গেছিলেন, তাও সে জানে। বাবা আতঙ্কে সে রাতে ঘুমোতে পারেননি।

সকালে উঠেই ছুটে গিয়েছিলেন জমিদার বাড়ির অন্দর মহলে। রাতে যে তাঁর টিনের চালে অশুভ আত্মারা নৃত্য করে গেছে তারও খবর দিলেন। কেমন অমঙ্গলের আভাস পেয়ে দেবকুমারবাবু গুম মেরে গেছিলেন। বিন্দুমাত্র বৃষ্টি না, শিলাবৃষ্টিও না—শকুন উড়ে এসে বসলেই এমন শব্দ হয়ে থাকে—তারপর বাবাকে ইঙ্গিতে বসতে বলেছিলেন।

তুমি ঠিক শুনেছ, টিনের চালে দাপাদাপি হচ্ছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বের হয়ে দেখলে না কেন?

আজ্ঞে....

মনে হয় রাতে চালে শকুনের পাল উড়ে এসে বসেছিল। ঠিক আছে, আর কাউকে বলতে যাবে না। এতে গোটা বাড়িটাই ত্রাসে পড়ে যেতে পারে। শনি সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা করো। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা দরকার। কিছুই ভালো বুঝছি না। বাড়িতে কেউ কেউ এভাবে অমঙ্গলের আভাস দিয়ে যায়।

বাবার মুখেই শোনা, বাবুর বড় কন্যাটির মৃত্যুর খবর এসেছিল তার ঠিক এক সপ্তাহের মাথায়। কেরোসিন ঢেলে শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এই পরিবারের এই সব দুর্ঘটনার খবর আগাম কে যে জানিয়ে যায়। ঘরের চালে শকুন উড়ে এসে বসলে এমনিতেই খারাপ লাগে, ভয়েরও কথা, আতঙ্কও কম থাকে না। দিনের বেলাতেই একবার একপাল শকুন উড়ে এসে তাদের কাঁঠাল গাছের মাথায় বসে পড়েছিল—সারা গাঁয়ে হইচই—লোকজন ছুটে এসে গাছের মাথা থেকে শকুন তাড়ানোর দৃশ্যটির কথা তার মনে পড়ছে। শকুন ওড়ে, গাছের মগডালে বসেও থাকে, তবে সবই পরিত্যক্ত এলাকায়, যেমন সিংগিদের পুকুর পাড়ের জংলায় যে বটগাছটা কত যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তার মগডালে সে শকুন বসে থাকতে দেখেছে। প্রভাকরদির বাজারে যাবার রাস্তায় প্রায় একটি জনশূন্য প্রান্তরের গাছটিতে শকুনের বাসা আছে। তবে রাতে সে রাস্তায় কেউ যায় না। বাজার থেকে কেউ ফেরেও না সেই রাস্তায়।

সে ভেতরে ভেতরে ভয়ে যে গুটিয়ে যাচ্ছে টের পেতেই তার মুখ চুন হয়ে গেল।

দরজা খোলা।

সে কোনোরকমে প্রায় টলতে টলতে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঠিক তখনই তক্তপোশের নিচে সরসর শব্দ।

ঠিক তখনই টিনের চালে কীসের যেন ঘষ্টানোর শব্দ।

তারপর শো শো আওয়াজ।

জানালাটার কাঠ দুটো ঝোড়ো হাওয়ায় ফসকে গিয়ে পাল্লা দুটো দমাস করে বন্ধ হয়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার খুলেও গেল।

হারিকেনের আলো দপ দপ করে জ্বলছে।

সে ঘামছিল।

হারিকেনটা দুলছে।

কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক খণ্ড বিখণ্ড উপদ্রবে সে যে পড়ে যাচ্ছে, সে ঘোলা ঘোলা দেখছে সবকিছু, বাবা তাকে ফেলে এভাবে কোথায় চলে গেলেন—সে যেন মূর্ছা যাবে।

আর তখনই জানালায় এক সুন্দর বালিকার মুখ। বড় বড় ফোঁটায় বোধহয় বৃষ্টি হচ্ছে। বালিকার মুখে বৃষ্টির ফোঁটা লেগে আছে। জানালার গরাদ ধরে কিছুটা উপরে উঠে ডাকছে। এই অরুদা, তোমরা কখন এলে!

সে কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এমন একটি পরিত্যক্ত জায়গায় এতটুকুন একটা মেয়ে একা আসতেই পারে না। ফ্রক গায়, দু বিনুনি চুলে, বোধ হয় বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, একবারও বলছে না, দরজা খুলে দাও। কেবল জানালায় দাঁড়িয়ে বলছে অরুদা, তোমার ভয় করছে না তো। আমি জানি, একা তুমি ভয় পাবে। থাকতে পারলাম না। সারাদিন নদীর ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি, কখন তুমি আসবে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কত কিছু যে মনে হয়। আমিতো জানি, স্টিমার সাঁজবেলায় আসে কিন্তু কী যে হয়, সকাল দুপুর যখনই সময় পেয়েছি ছুটে গেছি নদীর পাড়ে। অরুদা আসবে। কাকা যে বলে গেছে, আজ তোমাকে নিয়ে কাকা ফিরবে। তুমি ভয় পাচ্ছো না তো! নতুন জায়গা, ভালো নাই লাগতে পারে। দরজাটা খোলো না। এই কী কথা বলছ না কেন? চোখ গোল করে আমাকে এত দেখছ কেন! আমি বাঘ না ভালুক। দেখছ না বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি, দরজা খুলে দিতে পারছ না!

মেয়েটা ফের বলল, আমার নাম তিথি। ভুইঞা কাকা আমাকে নটসুন্দরী বলে ডাকে। বাজারে আমার বাবা জিলিপি ভাজে। তুমি দরজাটা খুলে দাও না। কেবল আমাকে হাঁ করে দেখছ!

তখনই দূরে টর্চবাতির আলো জ্বলে উঠল।

আর তিথি লাফিয়ে নেমে গেল অন্ধকারে।

কে রে ছুটে পালাচ্ছিস!

তিথি বলল, আমি ছুটে পালাইনি। তাড়াতাড়ি এসো। অরুদা না, আমাকে দেখতে দেখতে কেমন হিম হয়ে গেছে।

জগদীশ প্রায় দৌড়েই দরজার দিকে ছুটে গেলেন। অরুকে একা রেখে যাওয়া ঠিক হয়নি। ঝড় শিলাবৃষ্টি, আকাশ মেঘলা ছিল ঠিক, তবে এতটা ঝড় এবং শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে বুঝতে পারেননি। দরজায় এসে ডাকলেন, অরু দরজা খোল। আমরা ভিজে যাচ্ছি।

অরুর কেমন কিছুটা বাহ্যজ্ঞান লোপ হয়ে গেছিল। সে আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। দরজা খুলে দিতেই ঠান্ডা হাওয়ায় তার শরীর কিছুটা যেন তাজা হয়ে গেল। তিথিকে দেখে আবার সাহস পেল বোধ হয়। এতটুকুন মেয়ে প্রায় তারই বয়সি, বিন্দুমাত্র ভয়ডর নেই, ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে তাকে দেখবে বলে চলে এসেছে।

সে কিছুটা লজ্জায় পড়ে গেল।

জগদীশ বললেন, তোর কী হয়েছিল?

কিছু না তো।

তবে তিথিকে দরজা খুলে দিসনি কেন। হাতমুখ ধুয়েছিস?

অরু বলল, না।

তিথি বলল, বালতিটা কোথায়?

তিথি বালতি খুঁজতে দরজা ঠেলে পাশের ঘরটায় ঢুকে গেলে জগদীশ বললেন, ওখানে পাবি না, চকির নীচে আছে দ্যাখ।

হেমন্তে যে মাঝে মাঝে এ সময়ে শিলাবৃষ্টি হয় অরু জানে। ঝড়বৃষ্টি দুপদাপ করে এল, দুপদাপ করে আবার চলেও গেল। তিথি বালতি হাতে বের হয়ে গেল, কল থেকে জল টিপে সিঁড়িতে তুলে রাখল। কাঁসারবাটি এগিয়ে দিয়ে বলল, যাও বাইরে। কাকা তুমি আমাকে টর্চটা দাও তো। দরজায় হারিকেন নেওয়া যাবে না, নিভে যাবে। অরুর দিকে তাকিয়ে বলল, বসে থাকলে কেন? হাতমুখ ধুয়ে নাও। খাবে না। সেই কোন সকালে বের হয়েছ!

জগদীশ জানেন, তিথির কথাবার্তায় বেশ পাকামি আছে। তিথি সবাইকে বড় বেশি নিজের ভাবে। কাছারি বাড়ির এক কোণায় মাঠের ঝুপড়িতে থাকে। তিনিই বাবুদের বলে কাঠা দু'এক জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। সেখানে ঝুপড়ি বানিয়ে বছর দশেক হল গৌর ওরফে গোরাচাঁদ উঠে এসেছে। বছরখানেকের বয়স ছিল তখন মেয়েটার। কত তাড়াতাড়ি যে বড় হয়ে গেল।

তিথিকে কিছু বলতে হয় না।

যেমন জগদীশের জামাকাপড় কেচে রাখা, জল তোলা এবং বিছানা করার কাজটিও সে করে দিয়ে যায়। জগদীশ এসব পছন্দ করেন না। তবে তিথি তাকে পাত্তাই দিতে চায় না। সে তার মতো কাজ খুঁজে নেয়— শুধু তারই নয়, বড় তরফের ছোট তরফের সবার হেঁসেলেই তার অবাধ যাতায়াত।

তিথি হামাগুড়ি দিয়ে দড়ি থেকে গামছা তুলে এনে অরণির হাতে দিল।

অরুর ইচ্ছে নয়, মেয়েটা এভাবে তার উপর মাতব্বরি করুক। কেমন বিরক্ত হয়ে বলল, রাখো, আমি নিজেই নিতে পারব।

নিজে নিতে পারবে তো, চুপ করে বসে আছো কেন? কাকাকে জ্বালাতে বুঝি খুব ভালো লাগে! কখন থেকে বলছে, হাতমুখ ধুয়ে নে অরু, জামাপ্যান্ট ছেড়ে ফেল, তোমার কোনও গেরাহ্যি আছে।

অরু বুঝে পেল না, মেয়েটাকে কে এত আশকারা দেয়। সে তাকে চেনেই না, বাবাও তিথির কথা কিছু বলেনি, কিন্তু যেভাবে তার পেছনে লেগেছে, শেষে না জানি কী হয়! তারও রাগ কম না। আর কোথা থেকে উদয়! বাবাকে পর্যন্ত সমীহ করে না। তাঁর সামনেই তাকে হেনস্থা করতে চাইছে।

সে এখানে যতটা জলে পড়ে যাবে ভেবেছিল, তিথিকে দেখে সহসা কেন জানি মনে হল, না তাকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে না। তিথি বড়ই সতর্ক তার ভালো মন্দ নিয়ে। সে কিছুটা নরম হয়ে গেল। বলল, কোথায় থাকিসরে তুই?

কোথায় থাকি, সে দিয়ে কি হবে? দয়া করে তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও। আমি দেখছি বড়গিন্নি কী করছে। তোমাদের খাওয়ার কতদূর। তারপরই বলল, এই নাও পাউটি। খালি পায়ে হাঁটবে না বলে দিলাম।

তিথি দরজা দিয়ে মাঠের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে কোথা থেকে একজোড়া পাউটি বার করে রেখে গেল তার জন্য।

তিথি থাকায় তার জামাপ্যান্ট ছাড়তে লজ্জা হচ্ছিল। কখন আবার উঠে আসবে, কে জানে। সে সিঁড়িতে হাত পা ধুয়ে কাঠের পাউটি পরে ঘরে ঢুকে গেল। ভিজা গামছা দিয়ে গা মুছল, টিনের স্যুটকেস থেকে হাফপ্যান্ট হাফশার্ট বের করে নিল। ছাড়া প্যান্ট সার্ট চকিতে রাখলে জগদীশ বললেন, নিচে ফেলে রাখ। চকিতে রাখলে মেয়েটা চোপা করতে পারে।

বাবা দেখছি মেয়েটার কাছে জব্দ। এমন একটা পুচকে মেয়ের কাছে বাবার এত জব্দ থাকার কী কারণ সে বুঝল না। মনিবের মেয়েও নয়, মনিবের বাড়িতে আশ্রিতই বলা চলে। চকির উপর ছাড়া কাপড় রাখলে মেয়েটা ক্ষুব্ধ হতে পারে। এতটাই জব্দ যে সে জামাপ্যান্ট চকির একপাশে রেখে দিলেও বাবা তা নিয়ে ঘরের এক কোণায় রেখে দিলেন। সে কিছু আর বলতে পারল না। দেয়াল ঘড়িতে আটটা বাজে। তার খিদেও পেয়েছে—সারাদিনে সেই বাবা লোকনাথের আশ্রমে সামান্য বাল্যভোগ ছাড়া পেটে ভাত পড়েনি। ভাত না খেলে সে শরীরে জোর পায় না। তার তিনবেলা ভাত চাই।

সেই অরু বসে আছে, কখন তিথি খবর নিয়ে আসবে। কখন খেতে ডাকবে।

বাবা আয়না চিরুনি তাক থেকে নামিয়ে বললেন, মাথা আঁচড়ে নাও।

এখন দরজাও খোলা।

ঠান্ডা হাওয়ায় অরুর শীত শীত করছে। যেন গায়ে একটা চাদর জড়ালে ভালো লাগত।

সে একসময় না বলে পারল না, চালে ঘসটানো শব্দ হচ্ছিল খুব।

ও হয়। হাওয়া উঠলে হয়। আমগাছের একটা ডাল চালে এসে পড়েছে। হাওয়ায় নড়ে।

টিনের চালের এই দোষ। বৃষ্টি হলে ঝম ঝম শব্দ হয়। আবার শকুন উড়ে এসে বসলেও টের পাওয়া যায়। এমনকি কাক শালিখ চালে এসে উড়ে বসলেও কীরকম মৃদু শব্দ পাওয়া যায়। টালির চাল থাকলে এতটা হয় না। খড়ের চাল থাকলে একদম কিছুই টের পাওয়া যায় না। অরু বাড়ির বৈঠকখানায় থাকে। খড়ের চাল—চৌচালা ঘরটা ঠান্ডা রাখার জন্য খড় দিয়ে ছাওয়া।

নতুন জায়গা, ঘরটার কোনদিকে কী আছে সে কিছুই জানে না। তিথিরা কোনদিকে থাকে তাও না। ঘরে যদি কখনও একা থাকতে হয় তবেই মুশকিল। বাবাকে মাঝে মাঝেই আদায়পত্রে বের হয়ে যেতে হয়। মামলা মোকদ্দমার জন্য শহরে যেতে হয়, তখন এই ঘরটায় কেউ থাকে কিনা সে জানে না। না ঘরটা খালি পড়ে থাকে!

অরণি এসব ভেবে খুব কাতর হয়ে পড়ছিল।

বাবা।

বল।

তুমি না থাকলে রাতে ঘরে কে শোয়?

ঠিক নেই। যার যখন সুবিধা সেই থাকে। রাতে ঘর পাহারা দেবার জন্য মাঝে মাঝে তিথিও এসে শোয়। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না।

না তা বলছি না।

দরকারে ওর বাবাও থাকে। হরমোহনও থাকে।

হরমোহন কে বাবা?

বাবুদের পেয়াদা।

ওকে দেখছি না!

আছে। সকাল হোক। সব বুঝতে পারবে, কখন রান্না বাড়ি থেকে তিথি আসে দ্যাখ। তাড়াতাড়ি তোমার শুয়ে পড়া দরকার।

তিথিও শোয়। সে একা শোয়, না আর কেউ সঙ্গে থাকে। তিথি সম্পর্কে সে কোনও প্রশ্ন করতে চায় না। সে যে বড় হয়ে যাচ্ছে বাবা কি টের পান না! বড় হয়ে গেলে তার তো একাই এ ঘরে শোওয়া উচিত। সে থাকলে, অন্য কেউ শুতে আসবেই বা কেন!

তিথি সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করতেই তার সংকোচ হচ্ছিল।

তখনই তিথি বলল, দেরি হবে। এই নাও, ধরো। জল থাকল। সেজদা শিকারে গেছিলেন। বড় বড় দুটো বালিহাঁস শিকার করে এনেছেন। ছাল—চামড়া ছাড়ানো হচ্ছে।

রেকাবিতে ফুলকো লুচি এবং সন্দেশ। আলাদা রেকাবিতে ভাগ করে তিথি বলল, গিন্নিমা অরুদাকে দেখতে চেয়েছে। খেতে তোমাদের দশটা। এখন এই খেয়ে নিতে বলেছে। তুমি খাও অরুদা। পরে এসে নিয়ে যাব। এত বড় হাঁস। ছাল—চামড়া ছাড়ানো হচ্ছে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে!

জগদীশ জানে, মেয়েটার বড় উৎসাহ, সারাক্ষণ পাখি ছাড়ানো দেখবে। বউঠান বঁটি নিয়ে বসলে সে থালাবাসন এগিয়ে দেবে। রান্না বাড়িতে জল বাটনা দেবার লোক থাকলেও গিন্নিমা রান্না নিজের হাতে করেন। বামুনঠাকুর পোষার মতো ক্ষমতা কখনোই ছিল না, মাত্র এক আনার শরিক তা আবার দু—তরফের মধ্যে ভাগ। জমিদারির আয়ও কমে গেছে। আদায়পত্র আগের মতো নেই। তিথি বড় বিশ্বাসী বউঠানের। যতক্ষণ বাড়ির খাওয়া চলবে, কিংবা বউঠানের রান্নার সময় সে ছুটে ছুটে ফুটফরমাস খাটবে। তারপর বউঠান যখন বলবেন, তিথি তুইও আমাদের সঙ্গে বসে যা। খেয়ে নে। তিথির কী আনন্দ তখন।

তিনি এই আশায় আশায় সারাদিন বুঝি ছুটে বেড়ায়। সারাদিন কাজ করার উৎসাহ পায়।

মেজদার সব কথাই অরু জানে। ভালো শিকারি, তুখোড় ফুটবল খেলোয়াড়, ঢাকা শহরে ওয়ারি টিমে হাফ ব্যাকে খেলে। বাবুদের খবর বাড়িতে বসেই সে জেনেছে। যে ক'দিন বাড়ি থাকবেন বাবা, দেবকুমার

বাবুর পুত্রদের প্রশংসা। সব সোনার টুকরো ছেলে বাবার ভাষায়। ভুইঞা কাকা বলতে অজ্ঞান। বড় দেখতে ইচ্ছে হত মেজদাকে। বড়দির বিয়ে হয়ে গেছে। সেই বড়দি মরেও গেছে। আর আছে ছোড়দি। সে নাকি অরুরই বয়সি। পরীর মতো দেখতে। সারা বাড়িতে সুঘ্রাণ। রোয়াক ধরে হেঁটে গেলে এক এক ঘরের খাট পালঙ্ক দেখলেই নাকি ভিরমি খেতে হয়। বৈঠকখানায় সব বড় বড় মানুষ সমান ছবি। পেল্লাই সব দরজা জানালা। হরিণের শিং, বাঘের ছাল দেয়ালে, সে সবই বাবার মুখে শুনেছে।

তিথি বলল, কী অরুদা যাবে? হাঁসটার পেটে ডিম ছিল জানো!

পাখির মাংস খুব সুস্বাদু। আজ সেই পাখির মাংস হচ্ছে বাড়িতে। তার খুবই খেতে ইচ্ছে করছিল, তবে তিথির সব আগ বাড়িয়ে বলার স্বভাবের জন্যই যেন বলল, তুই যা। আমি পরে যাব।

পরে আর যাবে কখন? ততক্ষণে মাংস রান্না হয়ে যাবে।

আসলে তিথি চায়, অরু তার সঙ্গে সেই রান্নাবাড়িতে যেন যায়।

কারণ, একটা বালিহাঁসের ছালচামড়া ছাড়ানো হয়নি। হাঁসটা বেঁচে আছে। গুলি লেগে হাঁসটার ডানা ভেঙে গেছে। ধরতে গেলে ঠুকরে দিচ্ছে। মেজদাকে ক্লাবের লোক এসে বৈঠকখানায় ডেকে নিয়ে গেছে। কীসব কথাবার্তা হচ্ছে সে জানে না। ওরা চলে না গেলে পড়ে থাকা হাঁসটার ছালচামড়া ছাড়ানো হচ্ছে না। মেজদা বড় নিষ্ঠুর এই সব কাজে। তখন বাড়ির কেউ বড় একটা কাছে ঘেঁষে না।

মেজদারই বড্ড শিকারের নেশা।

মেজদার উৎসাহে মাঝে মাঝে পাখি শিকার করে আনা হয়।

ক্লাবের ছেলেরা চলে গেলেই মেজদা আবার রান্নাবাড়িতে ঢুকে যাবে। জখমি হাঁসটার ছালচামড়া ছাড়িয়ে দেবে। গিন্নিমার কাজ বঁটি নিয়ে বসা। তার কাজ গিন্নিমাকে সাহায্য করা। সে যে এই বাড়ির লোকজনের কাছে কত প্রিয় অরু তার সঙ্গে গেলে টের পেত।

জগদীশই বলল, যা না। বসে থেকে কী করবি। আমি যাচ্ছি। বউঠান তোকে দেখতে চেয়েছে।

অরু যাও যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল, বাবার কথায় তার উৎসাহে যেন জল ঢেলে দিল। বউঠান তাকে দেখতে চেয়েছেন, সেই বউঠানের সামনে সে নিজে গিয়ে একা হাজির হয় কী করে! বাবা না গেলে তার পক্ষে কোনওভাবেই যাওয়া সম্ভব না। তিথির সঙ্গে তো নয়ই।

এই চলো না অরুদা। এক দৌড়ে চলে যাব। বলে তিথি অরুর হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিল।

ইস কী যে করে না!

কী করেছি তোমাকে! গেলে দেখতে পেতে, কত বড় বালিহাঁস! সেজন্যই তো যেতে বলছি।

কেন যে তাকে হাঁসটাকে দেখানোর এত আগ্রহ তিথির, বুঝতে পারছে না। একটা হাঁসের ছালচামড়া ছাড়ানো হয়ে গেছে, আর একটার ছাড়ানো হয়নি, এখনও পড়ে আছে, আহত হাঁসটাকে দেখাতে না পারলে তিথির যেন নিস্তার নেই। বাবা বাইরে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকেছেন খড়ম পায়ে। গামছায় শরীর মুখ মুছে বোধ হয় আহ্নিকে বসবেন। বাবা যে সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে বসে আহ্নিক সারেন, সকালেও বাবার নদীর জলে প্রাতঃস্নান এবং আহ্নিক সেরে কাছারি বাড়িতে ফিরে আসার স্বভাব সে ভালোই জানে। বাবা বাড়ি গেলে, তার নৈমিত্তিক কাজের বহর সম্পর্কে মাকে বিশদ বর্ণনা দিতে ভালোবাসেন, রাত হয়ে গেছে বলে, হয়তো ঘরেই জপতপ সেরে নেবেন, কিংবা যদি মঠে যান, তাও নদীর পাড়ে। বাবা যে কী করবেন সে বুঝতে পারছে না। আবার যদি তাকে একা ফেলে জপতপের অছিলাতে বাবা বের হয়ে যান তবেই মুশকিল। তখন তিথি সহজেই তাকে কবজা করে ফেলতে পারে।

সে বলল, বাবা তুমি যাবে না?

কোথায়?

এই যে আমাকে নিয়ে যেতে বলল।

ও হ্যাঁ। যাব। তোমাকে দেখার আগ্রহ সবার। বউঠান দু—বার খবরও নিয়েছেন। স্টিমার এত লেট করবে কে জানত!

অরু ফের বলল, তুমি কি আহ্নিকে বসবে!

কেন?

দেরি হয়ে যাবে না।

তিথির সঙ্গে যা না। বলবি, আহ্নিক সেরে আমি যাচ্ছি।

তিথি বলল, হল তো! চলো না অরুদা!

তিথি তার হাত কিছুতেই ছাড়ছে না।

চলো বলছি।

আগে তুই আমার হাত ছাড়।

আমার হাতে কী আগুন আছে? ছুঁলে হাতে কি তোমার ফোসকা পড়বে!

এত আস্পর্ধা হয় কি করে! বাবা কেন যে ধমক দিচ্ছেন না। বাবা তো বলতে পারেন, ঠিক আছে যাবে, হাত ধরা যখন পছন্দ করে না। না ধরলেই পারিস।

জগদীশ খড়ম পায়ে কোথায় আবার বের হয়ে যাচ্ছেন।

অরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আহ্নিক সেরে আসছি ঘাট থেকে। বেশি দেরি হবে না।

বাবা আর কোনও কথা না বলেই বের হয়ে গেলেন।

তিথির এখন যেন ভারী মজা।

বাবার উপর অরণির ক্ষোভ বাড়ছে। এই অচেনা জায়গায় তার জন্য বাবার যেন কোনও ভাবনা নেই। তার কোনও বিন্দুমাত্র বিপদের আশঙ্কা আছে বলেও বোধ হয় তিনি মনে করেন না।

তিথি এবার গম্ভীর গলায় বলল, কী যাবে? না বসে থাকবে। আমি অত সাধাসাধি করতে পারব না বাপু। একা বসে থাকলে জানো ভূতে ধরে।

কত সহজে তিথি কথাটা বলে ফেলল। তাকে যে ভূতে ধরেছিল তিথি বোধ হয় টের পেয়ে গেছে। সে ঘামছিল, চোখ গোল গোল করে তিথিকে দেখছিল, সে কোনও সাড়া দিতে পারেনি, তিথি জানলায় উঁকি দিয়ে সব টের পেয়েছে।

বাবার খড়মের শব্দও মিলিয়ে গেল।

সে কী করবে বুঝতে পারছে না। যদি তিথি এখন এক লাফে বের হয়ে চলে যায়, যদি বলে ঠিক আছে, ভুইঞা কাকা এলেই যেয়ো, আমি যাচ্ছি। আমার মেলা কাজ। তা হলেই হয়েছে।

তিথি তাকে নিয়ে এখন যে কতরকমের মজা করতে পারে।

তিথির সঙ্গে চলে যাওয়াই ভালো। সে আর এই ঘরটায় একা বসে থাকতে পারবে না। কিছুতেই না। একা থাকলে সত্যি ভূতে ধরে। ভূতের যত ধান্দা রাতে। বিধুখুড়োর কথা। রাতেই তারা ঘুরে বেড়ায়—যত অন্ধকার তত তাদের মজা। সিঙ্গিদের সেই বটগাছটায় যে জোড়া ভূত থাকে, কিংবা খালের পাড়ে সাঁকোর নিচে ভেতো ভূত থাকে, কেবল ভাত চুরি করে খেতে ভালোবাসে বিধু খুড়ো ছাড়া সে খবর কেউ রাখে না। নানাপ্রকারের ভূতের গল্প বিধুখুড়োর পেটে গোলমাল পাকায়। রাতে গোরু—বাছুর গোয়ালে তুলে, বৈঠকখানায় এসে টুলে চিত হয়ে শুয়ে পড়বে, আর গামছা ঘুরিয়ে মশা তাড়ানোর সঙ্গে রাজ্যের যত ভূত এসে তার কাছে হাজির হয়। অরু আর তার ভাইবোন মিলে জপতপ করার মতো বিধুখুড়োর শিয়রে বসে থাকে—তারপর কী হল খুড়ো।

হয়েছে তোদের মাথা। রান্নাঘরে দেখে আয় পাত পাড়তে কত দেরি! তোদের মা কাকিরা সারাদিন কী করে! কখন খাব, কখন ঘুমাব। কত রাত হল টের পাস না।

অরুর তখন এক কথা, তুমি খাও না খাও—আমি একা যেতে পারব না।

রান্নাঘরটা যে তাদের ভেতরের উঠোন পার হয়ে অন্দরের উঠোনের শেষ দিকটায়। ঠিক বাঁশঝাড়ের পাশে। এতটা রাস্তা রাতে জ্যোৎস্না থাকুক, অন্ধকার থাকুক—হারিকেন হাতে থাকুক, টর্চ থাকলেও সে একা যেতে সাহস পায় না। তবু বাড়িতে একরকম, কিন্তু এই অচেনা জায়গায় সে যে কী করে!

তিথির কথারও গুরুত্ব আছে।

ঘরে একা থাকলে ভূতে ধরে।

সে বলল, তিথি একটু বসবি। বাবা আসুক। তারপর আমরা যাব।

হয়ে গেল। ভূতের ভয়ে এত কাবু। কাকার ফিরতে দেরি আছে।

কেন, দেরি কেন?

বারে মঠে শিবলিঙ্গ আছে জানো?

তা থাকতেই পারে।

থাকতেই পারে না, আছে। খুবই জাগ্রত। কাল সকালে আমার সঙ্গে যাবে। সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব। আটআনা জমিদারবাবুর কত বড় প্রাসাদ দেখতে পাবে। নদীর পাড়ে কাকা ঘাটের স্টেশন মাস্টারের ঘরে বসে খবরের কাগজ না পড়ে ফিরবেন না। আহ্নিক সারা হলেই ফিরে আসবেন, তা হলেই হয়েছে।

মঠে শিবলিঙ্গ আছে জানো না? কেন যে বলল তিথি! জাগ্রত ঠাকুর, সেই না হয় হল। জাগ্রত বলেই বাবার দেরি হবে ফিরতে তাই বা কেমন আবদার। তা হলে কি রাতে তাকে এই ঘরে পাঠ্যবই নিয়ে একাই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে!

বাবা তার আহ্নিকের নামে মঠে যাবেন, জাগ্রত ঠাকুর বলে পরিবারের সবার মঙ্গলের জন্য ধ্যানে বসবেন, তারপর স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকে সেজবাতির আলোয় অর্ধসাপ্তাহিক আনন্দবাজার কাগজখানা পড়বেন। পড়া শেষ না হলে আবার পড়বেন—এই অজুহাতে যে বাবা রাতে ঘরে ফিরতে বেশ দেরি করবেন তাও অরু বুঝে গেল। তিথির সঙ্গে তার বরং ভাব করেই চলা দরকার।

অরু কিছুটা চালাকি করে বলল, তোর বাবা কী করে রে?

বাবা জিলিপি ভাজে। কতবার বলব!

কোথায়?

কেন বাজারে।

তোদের বাড়িটা কোন দিকে।

আঙুল তুলে দেখাল, চলো না আমাদের বাড়ি হয়ে যাবে। জানো আমার মা না কোথায় চলে গেছে?

তোর মা বাড়ি থাকে না?

লোকে যে বলে মা আমার জলে ভেসে গেছে।

এইরে, এ যে আর এক ভূতের দোসর।

কী করে জলে ভেসে গেল?

আমি তার কী জানি? ছোট ছিলাম তো। মা'র কথা আমার মনেই নেই।

তোর মা নেই তবে?

তিথি জিভ কেটে বলল, অমন কথা বলো না অরুদা। আমার মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুণ। মা না থাকলে বাবা নাকি বিবাগি হয়ে যেত। ভুইঞাকাকাই জোরজার করে ফের বাবাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে তুললেন।

তোর ভাইবোন আছে?

হাতের পাঁচ আঙুল তুলে দেখাল।

মানে পাঁচটি ভাইবোন নিয়ে তিথি বিমাতার সংসারে থাকে।

তিথির কথা ভেবে অরুর খারাপই লাগল।

আসলে সে যে চালাকি করে তিথির বাবা—মার কথা বলে আটকে রেখেছে বুঝতেই দিল না। কথা বললে মেয়েটা নড়তেই চায় না। শিকারের সেই মৃত হাঁসটা দেখানোর আগ্রহ যেন আর তিথির মধ্যে নেই। তাঁকে সামান্য ভালোবেসে কথা বললে, এমন চোখে তাকিয়ে থাকে যে কিছুতেই আর অবহেলা করা যাবে না।

তিথি ঠিক অরুর পাশের চকিতে বসে পা দোলাচ্ছে। রোগা এবং কিছুটা লম্বা, অরুর মতোই লম্বা হবে, সংকোচ সংশয় কোনওকিছুই যেন তার মধ্যে নেই। চোখ দুটো বড় তাজা। খুবই ফর্সা, মুখের গড়নটা সরল সুন্দর এবং কিছুটা গম্ভীর। মেয়েটা চুপচাপ থাকলে দেবী বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠে। চুল কোঁকড়ানো, কপাল বেশ চওড়া এবং ঘন চুলে নারকেল তেলের গন্ধ।

অরু দেখল, সামান্য কথাবার্তা বলায় তিথি খুব খুশি। তারপরই কেন যে বলল, তুমি ওঠো তো। বিছানাটা একেবারে করে দিয়ে যাই। খেয়ে এসে শুয়ে পড়বে। বালিশ চাদর ওয়াড় সব কেচে রেখেছি। কাকার মশারিটা ছোট। দু'জনের হয় না। বলে কয়ে কাকাকে দিয়ে তোমার আলাদা মশারি আনিয়েছি। কাকার শুতে শুতে অনেক রাত হবে।

এখন বিছানা করতে হবে না। বাবা আসুক।

তিথি বলল, তা হলে আমি যাই। বলেই সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে নেমে গেলে অরু দৌড়ে দরজার কাছে চলে গেল।

এই যাস না। আমি তোর সঙ্গে যাব।

এসো না। আমি তো দাঁড়িয়েই আছি।

কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস! দেখতে পাচ্ছি না!

নেমে এসো, দেখতে পাবে।

দরজা বন্ধ করে দেব।

শিকল তুলে দাও না!

অরু শিকল তুলে দিতেই তার চারপাশ রাতের অন্ধকার ঘিরে ধরল। কিছুই চেনে না। বড় বড় আমগাছের ছায়ায় জায়গাটা কীভাবে কতটা ছড়িয়ে আছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। জানালা দিয়ে সামান্য আলো এসে বাইরে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়েও কিছু বুঝতে পারল না। একবার ভাবল দরকার নেই তিথির সঙ্গে গিয়ে, কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বুঝতেই পারছে না, সে ঘাবড়ে গেলে তিথি আরও মজা পেয়ে যাবে।

সে সিঁড়িতে উঠে শিকল খুলতে গেলেই, তিথি কোথা থেকে ডাকল, এই তো আমি। তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না!—ঠিক যেখানে জানালার আলো এসে পড়েছে, তিথি সেখানে দু—হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

সে ফের ঘরে শেকল লাগিয়ে জানালার আলোর দিকে এগিয়ে গেল।

না, তিথি নেই।

পাশেই সাড়া পাওয়া গেল, এসো।

অরু অন্ধকারে খুঁজছে তিথিকে। কোনও গাছের আড়াল থেকে যেন কথা বলছে। যতই অন্ধকার হোক, আবছামতো কিছু তো দেখা যাবেই। একটা কুকুর দৌড়ে গেল। ঘেউ ঘেউ করছে।

অরুর মহা মুশকিল। এখন ইচ্ছে করলেই সে যেন আর ঘরে ফিরতে পারবে না। আমবাগানের এলাকাটা যে অনেকটা জায়গা জুড়ে তিথিকে খুঁজতে গিয়ে টের পেল। কোনও আলো পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। শুধু তিথির এক কথা, আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি। এসো না।

তুই আমার সঙ্গে নেই? গাছের আড়াল থেকে কথা বলছিস! কতদূর! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে তুই ভয় দেখাবি না বলে দিচ্ছি।

সামনে একটা সুপারি বাগান পড়বে। বাগানটা নদীর পাড়ে চলে গেছে। রাস্তা হারিয়ো না অরুদা। আমার পিছু পিছু চলে এসো। আমি ভূত নই, আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই।

মেয়েটি ভারী বজ্জাত। তাকে বেকুব বানাবার তালে আছে। জমিদারবাড়ি বিশাল এলাকা নিয়েই হয়ে থাকে সে জানে। যেমন এই আমবাগান কিংবা সুপারিবাগানের ভেতর দিয়ে যেতে যেতেই হয়তো কোনও সাদারঙের বাড়ি আবিষ্কার করে ফেলবে। কারণ স্টিমারের আলোতে সুপারিবাগানের ভেতর দিয়ে সে যেন সত্যি একটা সাদারঙের বাড়ি দেখে ফেলেছিল।

বাবা তাকে কোথায় এনে তুললেন! সে কার পাল্লায় পড়ে গেল! মা নদীর জলে ভেসে গেছে, বাপ বাজারে জিলিপি ভাজে—তিথির ভাইবোনও আছে, কোন দিকটায় তিথি তার বাবার সঙ্গে থাকে তাও সে বুঝতে পারছে না। চারপাশে গাছ, কোথাও জঙ্গল, সুপারির গাছগুলো সোজা দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য ঝড়বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় টুপটাপ পাতাও ঝরছে না, দু—একটা মরা ডাল পায়ে লাগতেই সে উবু হয়ে বসে পড়ল। তিথি তাকে যেন কোনও অশরীরী আত্মার পাল্লায় ফেলে দিচ্ছে।

এই অরুদা, বসে পড়লে কেন।

যেন একেবারে পাশ থেকে বলছে।

বিশাল একটা গাছের কাণ্ড তার সামনে রাস্তা রুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে এগোতে পারছে না।

এত পাঁচিল। ঐ তো দরজা।

অরু বলল, তুই কোথায়?

এই তো আমি।

তিথি একেবারে সামনে এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই ছাড়। কী হচ্ছে।

কিছু হচ্ছে না। তুমি এত ভীতু। নদীর জল কল কল শব্দ—শুনতে পাচ্ছ না। সুপারিগাছের ফাঁক দিয়ে দেখ না, ঘাটে নৌকায় কত লণ্ঠন জ্বলছে।

তুই আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?

নদীর পাড়ে।

কেন?

এমনি এমনি।

আমি যাব না। তোর ইচ্ছে হয় তুই যা। বাবা আসুক, সব না বলছি তো। তুই না আমাকে অন্দরে নিয়ে যাবি বললি। গিন্নি মা আমাকে দেখতে চেয়েছেন, পাখি শিকার, মেজদা, রান্নাবাড়ি কত কিছু না বললি!

আমি তো তোমাকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।

এত দূর!

দূর, কী বলছ! ঐ তো দেখা যাচ্ছে। সাদামতো বাড়ি দেখতে পাচ্ছ না আবছামতো। বৈঠকখানায় সেজবাতি জ্বলছে। রকে হারিকেন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছ না! নদীর পাড় ধরে গেলে তুমি খুব খুশি হতে অরুদা। সেখানে কত বড় আকাশ, কত নক্ষত্র আকাশে, কত সব জেলে ডিঙ্গি নদীর ঢেউ—এ ভাসছে, আমার যে কেবল মনে হয় খুব বর্ষায় কোনও ডিঙ্গিতে নদীর ঢেউয়ে ভেসে যাই। ঝড়বৃষ্টি নদীর ঢেউ ফুলেফেঁপে উঠবে, লম্বা ছিপনৌকায় আমি বসে থাকব। চারপাশে ঘন আঁধার, ঝিরঝির করে কুয়াশার মতো বৃষ্টি ঘিরে থাকবে আমাকে, কেউ দেখতে পাবে না, কেউ না, তুমি ছাড়া।

তিথি এত সুন্দর কথা বলে! কে বলায় তাকে! কেমন এক আশ্চর্য প্রকৃতির মধ্যে তিথি বড় হয়ে উঠতে উঠতে বোধহয় কখনও সে কোনও স্বপ্নের দেশ আবিষ্কার করে ফেলে! সে তো সবে এসেছে, সে এখানেই থাকবে। এও বুঝতে পেরেছে, বাবা আদায়পত্রে বের হলে এই মেয়েটার সাহচর্য তার সম্বল।

পাঁচিলে শ্যাওলার গন্ধ। অরণি ভেতরে ঢোকার সময় গন্ধটা পেল। দরজা দিয়ে ঢোকার সময় তিথি বলল, তুমি আমার হাত ধরো।

কেন? তোর হাত ধরব কেন?

কিছু এখানটায় দেখা যায় না।

কেন দেখা যায় না?

দুটো চালতা গাছ আছে। নালা নর্দমা আছে বাড়িটার। পড়ে যেতে পারো।

বাস্তবিক জায়গাটায় পা বাড়াতেই ভয় করছিল অরুর। প্রায় অন্ধের মতো পার হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা। তিথি তার হাত ধরে রেখেছে। এবং রকে তুলে দিলে বুঝল, তার আর হাঁটতে অসুবিধা হবে না। মেলা মানুষজন বারান্দায়, বৈঠকখানাও সে দেখতে পেল। সেখানে চার—পাঁচজন প্রৌঢ়মতো মানুষ পাশা খেলায় ব্যস্ত।

তিথি বলল, গিন্নিমা, অ গিন্নিমা, তুমি অরুদাকে দেখবে বলেছিলে, এই তো অরুদা দাঁড়িয়ে আছে।

মৌমাছির মতো মানুষজন যেন উড়ে আসছে। গুঞ্জন।

এই ছোড়দি—তিথি কাকে যেন ডাকল।

ছোড়দি ছোড়দি করছিস কেন? ওকে ঘরে নিয়ে বসা।

তিথি কোন ঘরে নিয়ে যাবে! বড় বউদির ঘরে, গিন্নিমার ঘরে, মেজদার ঘরে—সে ঠিক বুঝতে পারছে না বলেই রোয়াকে দাঁড়িয়ে আছে।

অরু বড়ই অসহায় বোধ করছে। বাবার সঙ্গে এলে বোধ হয় এতটা অস্বস্তি হত না।

গিন্নিমা ডাকলেন, তিথি, তুই তো আচ্ছা মেয়ে, কোথায় যাস, কোথায় থাকিস, ডেকে ডেকে সাড়া পাচ্ছি না। কখন থেকে খুঁজছি।

বারে তুমি যে বললে, অরুদাকে দেখবে!

কখন বললাম!

বললে না, জগদীশকে বলবি, অরুকে যেন নিয়ে একবার আসে।

বলেছি বুঝি। কোথায় ছেলেটা! কোথায় দাঁড়িয়ে আছে! আমি যাই কী করে—হাত জোড়া আমার। এখানে নিয়ে আয়। সব ঘরগুলোর সামনেই লম্বা রোয়াক অথবা বারান্দা বলা যায়, বারান্দা পার হয়ে তিথি বলল, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন অরুদা, সবাইকে প্রণাম করতে হয়।

অরু রোয়াকে দাঁড়িয়েই আছে।

পাকাবাড়ি বুঝি এমনই হয়ে থাকে। একতলা বাড়িটা এতবড় ভেতরে না ঢুকলে সে বুঝতে পারত না। বাড়ির মানুষজন সবাই বড় সুপুরুষ। ঘরের ভেতর পালঙ্কে শুয়ে সুন্দরমতো মেয়েটা কে সে জানে না। বালিশে ভর করে তাকে দেখছিল। সাদা ধবধবে বিছানা, পালঙ্কের পায়ায় সিংহের থাবা। চকচকে লাল মেঝে এবং ছাদে ঝাড়বাতি ঝুলছে। হাওয়ায় রিন রিন করে বাজছিল। বয়স্ক এক মহিলা তাকে কাছে টেনে আদর করতে চাইলে সে কেমন জড়ভরত হয়ে গেল। তিথি বলল, ছোটপিসি, ভয় কি অরুদা।

ছোটপিসিকে সে কেন যে বয়স্ক ভাবল বুঝতে পারছে না। সাদা ধবধবে থান পরনে। হারিকেনের আলোতে আবছামতো মুখ। ভালো করে নজর করতেই বুঝল, সাদা থান পরলেই বয়স্ক হয়ে যায় না। তার চেয়ে কিছু বড় হতে পারে। কাকিমার বয়সিই হবে। ছোটকাকার বিয়ের কথা তার মনে আছে। সে বরযাত্রী গিয়েছিল। বালিকা বয়সে ছোট কাকিমা যদি তাদের বাড়িতে আসে, তবে এখন তার কতই বা বয়স হতে পারে।

ছোটপিসি থুতনি ধরে বলল, আয় আমার ঘরে।

অরু কিছুতেই যেতে চাইল না।

আর আশ্চর্য তিথির হাতে সেই হাঁসটা। ছালচামড়া ছাড়ানো হয়নি। হাঁসটা মৃতও নয়। তবে ভালোমতো জখম হয়েছে। তিথি হাঁসটাকে প্রায় বুকে করে ধরে রেখেছে।

পাকা ঝাপটাচ্ছিল হাঁসটা।

কিন্তু উড়তে পারছে না। জোরজার করে তিথি চেপে রেখেছে কোলে।

হাঁসটা যে আদৌ মরে যায়নি, শিকারের পাখি এমনই হয়ে থাকে, খোঁড়া হতে পারে, কিংবা পাখায় ছররার গুলি লাগতে পারে, বোধহয় হাঁসটার ডানা ভেঙে গেছে, বড়ই কাতর চোখে হাঁসটা মাথা তুলে হারিকেনের আলোতে উড়ে যাবার চেষ্টা করছে, পারছে না, বৃথাই চেষ্টা—তখনই ছোটপিসি বলল, তোর কি তিথি ঘেন্নাপেত্তা নেই। বুকে তুলে রেখেছিস। নিয়ে যা। আমি সহ্য করতে পারছি না।

অরুও কেমন দমে গেল।

এই জখমি হাঁসটা যেন না দেখলেই ভালো হত।

অরু বলল, আমি যাই।

তিথি বলল, একা যেতে পারবে, কাছারিবাড়িতে! রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারো।

অরুর মনে হল, সে সত্যি একা যেতে পারবে না। তিথি রাস্তা চিনিয়ে না নিয়ে গেলে, রাতের অন্ধকারে গাছপালার ছায়ায় কাছারিবাড়িটা যেন কখনোই আর খুঁজে পাবে না।

।চার

জগদীশ পাঁচটা না বাজতেই ঘুম থেকে উঠে পড়েন। খড়ম পায়ে বাইরে বের হয়ে সূর্য প্রণাম, তারপর নুয়ে এই বসুন্ধরা এবং যাকে তিনি জগজ্জননী ভাবেন তাঁর উদ্দেশ্যে চোখ বুজে কিছুক্ষণ ধ্যান, ফের ঘরে ঢুকে পেতলের গাড়ুটি হাতে নিয়ে হাঁটা দেন—সামনের সুপারিবাগানে ঢুকে যান, কিছুদূর হেঁটে গেলেই ঝোপের মতো জায়গায় তিনি অদৃশ্য হন। তারপর নদীর জলে অবগাহন, স্তোত্রপাঠ এবং ফেরার পথে মঠের শিবলিঙ্গের মাথায় একটি ধুতুরা ফুল এবং নদীর জল ঢেলে শিবস্তোত্র পাঠ করেন।

এত সকালে তার পুত্র অরণির ওঠার অভ্যাস নেই। দেশের বাড়িতে মাইনর পাশ করে বসেছিল, গতকাল তাকে নিয়ে তিনি তাঁর কর্মস্থলে চলে এসেছেন। স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করে দেবার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। রাতে পথশ্রমে অরণির বোধ হয় ভালো ঘুম হয়নি। সারারাতই ছটফট করেছে। বাড়ি ছেড়ে থাকারও কষ্ট কম না। ভোররাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ায় তিনি তাকে এখনও ডেকে তোলেনি। মনে মনে স্তোত্রপাঠ করছেন, এবং খড়ম পায়ে হাঁটাহাঁটি করলে অরণির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে—যতক্ষণ না হরমোহন নাজিরখানার দরজা খুলে দেবে, তিনি ঘর ছেড়ে যেতেও পারেন না।

অরণিকে তাঁর কিছু বলার আছে। তাকে ঘুম থেকে তোলাও দরকার। ডাকতে কষ্ট হচ্ছিল, অঘোরে ঘুমোচ্ছে, অথচ সব না বলে গেলেও চলবে না। তাকে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে বগলে বই নিয়ে জমিদারবাবুর পুত্রদের ঘরে চলে যাওয়া দরকার। সেখানে মাস্টারমশাই তাদের পড়াতে আসেন। অরণিও তাদের সঙ্গে পড়বে।

একবার, ভাবলেন ডাকেন। বলেন, অরু উঠে পড়ো। কারণ সকাল হয়ে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে নাও। তোমার দেরি দেখলে বিশু চলে আসতে পারে। এ—বাড়িতে কেউ এত দেরি করে ওঠে না।

বাড়ি থেকে খুব সকালে রওনা হয়ে, কিছুটা পথ হেঁটে, বাকি পথ স্টিমারে যখন এই কাছারিবাড়িতে এসে উঠেছিলেন তিনি, তখন রাত হয়ে গেছিল। স্টিমারের আলোতে সুপারিবাগান এবং জমিদারদের খানিকটা প্রাসাদ ছাড়া অরণির চোখে কিছুই দৃশ্যমান ছিল না। আমবাগানের পরিত্যক্ত কাছারিবাড়িতে অরণিকে একা থাকতে হবে ভেবে সে খুবই মনকষ্টে ছিল। কিছুটা আতঙ্কও চোখেমুখে লক্ষ করেছেন তিনি।

এখন ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাবে, সুপারিবাগান পার হয়ে নদীর জল কলকল ছলছল—নদীর পাড়ে গেলে ছবির মতো দেখতে জমিদারবাবুদের গ্রামটিও সে দেখতে পাবে। প্রাসাদগুলির জাঁকজমক অরণিকে অবাক না করে পারে না। নদীটি এত বিশাল আর নদীর চর, পাখির ওড়াউড়ি নিয়ে এত ব্যস্ত যে নদীটিকে দেখলেই ডুব দিতে ইচ্ছে হয়। তিনি এক আনা জমিদার দেবকুমারবাবুর আমলা। প্রাসাদ, দিঘি সহ নদীর পাড়ে তাঁর এলাহি ব্যবস্থা। ফুলের রকমারি বাহারও কম নেই বাড়িটাতে। অরণি ঘুম থেকে উঠে হাই

তুললেই দেখতে পাবে সামনের সুপারিবাগান পার হয়ে পুণ্যতোয়া নদীটির জল, জলে ঢেউ, পালতোলা সব নৌকা।

গ্রামের পাশে নদী থাকলে স্থানমহিমা যে কত বেড়ে যায়, অরণি ঘুম থেকে উঠলেই বুঝতে পারবে।

তখনই তিথি জানালায়—ও বাব্বা, অরুদা তুমি ঘুমোচ্ছ, তুমি কি গো। কত লোক কত দূর দেশে চলে গেল, এখনও তোমার ঘুম ভাঙল না।

জগদীশের মনঃপূত নয়, তিথি তাকে ডেকে জাগিয়ে দিক—কিন্তু, এতই চঞ্চল, আর হতভাগ্য মেয়েটি, যে তাকে তিনি কোনও কড়া কথাই বলতে পারেন না। আর এত কাজের, আসলে সে চলে এসেছে, বিছানা তুলে ঘর ঝাড় দিয়ে চলে যাবে। অরণি আসায় এ—ঘরে তার যেন দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। ওর বাবা গোরাচাঁদকে বাড়িঘর করার মতো কিছুটা জমি পাইয়ে দেওয়ার পর থেকে গোরাচাঁদের বউ যমুনার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। আগে যমুনা করে দিত, তিথি বড় হয়ে যাওয়ায় সে এখন করে দেয়। জিলিপি, তেলেভাজার দোকানের জায়গাটিও তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাজারের ওই একফালি জায়গা নবকুমারবাবুকে বলে ব্যবস্থা না করে দিলে গোরাচাঁদ একপাল ছেলেপিলে নিয়ে অথৈ জলে পড়ে যেত। তবে জগদীশের পছন্দ নয়, তিনি আগে মানাও করতেন, তাতে যমুনা কিংবা গোরাচাঁদের দুজনের মুখই ভারী ব্যাজার হয়ে যেত। ভুঁইঞ্রামশায়ের মর্জিতেই জমিদারি চলে, তিনি এটুকু সেবা না নিলে, তারা কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।

তিনি আর তারপর থেকে, কাজ করে দিলে মানা করেন না, কাজের কথা ভুলে গেলে ডেকে মনেও করিয়ে দেন না। নিজেই করে নেন। কোনওদিন তিথি হয়তো সকালেই নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘাটে পুণ্যস্থান থাকলে, নদীর জলে ডুব দিয়ে হয়তো পয়সা তুলছে। পয়সা সংগ্রহের উত্তেজনায় মনেই নেই, সকালে এক বালতি জল ভুঁইঞ্রাকাকার ঘরে তুলে রাখতে সে ভুলে গেছে।

জগদীশ তখন নিজেই জল তোলেন।

জগদীশ তখন নিজেই ছাড়া জামাকাপড় ধুয়ে তারে মেলে দেন। এসব কাজের জন্য তিথি কিংবা যমুনার উপর নির্ভর না করে নিজে করে নিতে পারলে কিছুটা আত্মতুষ্টিতেও ভোগেন।

তারপরই হয় মুশকিল।

গোরাচাঁদ শুনে খেপে যায়, কোথায় তিথি, কোথায় গেছে। ভুঁইঞ্রামশাই তারে কাপড় মেলছে, সারাদিন ছুক ছুক করে বেড়ানো, তোর এত লোভ! বউকেও বলবে, তুমি খেয়াল রাখতে পারো না, তিথি ছেলেমানুষ, তার দোষ কি! ইস কী যে হবে!

জগদীশের কানেও কথা উঠে আসে।

ইস, মেয়েটাকে গোরা গোরু খোঁজা খুঁজছে।

কেন? ও কী করেছে! অন্দরে থাকতে পারে। গোরাকে ওখানে খোঁজ নিতে বলো।

না, ওখানে নেই।

ওখানে না থাকলে, নদীর চরে শালুক তুলতে যেতে পারে।

না, সেখানেও যায়নি!

তবে গেল কোথায় মেয়েটা! এক দণ্ড চুপ করে বসে থাকতে পারে না। নদীর ঘাটে পুণ্যস্নান, মেলার চরে পালতোলা নৌকার ভিড়। মানুষজনও মেলা। পায়ে হাঁটা পথে, স্টিমারে কেউ কেউ এসে নেমে থাকে। মাঠের চারপাশে ভিড় থাকে, তারপর মানুষজন নদীর ঘাটে পুণ্যস্নান সেরে চলে যাবে বাজারের দিকটায়। সড়ক ধরে, একপাশে বিশাল সব প্রাসাদ ফেলে সোজা হেঁটে গেলেই বাজার—চরের উপর দিয়েও হেঁটে যাওয়া যায়, তারপর বিন্নির খই লালবাতাসা খেয়ে যে যার নৌকায় কিংবা হাঁটাপথে বাড়ির দিকে রওনা হবে। অষ্টমী স্নানেই বেশি ভিড়, ছোটখাটো পুণ্যস্নানও বছরে যে কিছু না থাকে—তাও নয়। তিথির তখন কেমন দিশেহারা অবস্থা। নদীর জলে ডুব দিয়ে পয়সা তুলবে। দুটো পাঁচটা যা পায়, সেই দিয়ে সেও বিন্নির খই

লালবাতাসা কিনে কোঁচড়ে নিয়ে খাবে আর নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়াবে। আর নদীর পালতোলা নৌকা, যেমন কাঁঠালের কিংবা আনারসের, তালের নৌকাও থাকে, এই সব নৌকার দিকে তাকিয়ে আপন মনে নদীর সঙ্গে কথা বলবে। নৌকার ব্যাপারীদের সঙ্গে কথা বলবে।

এই তিথি!

সে অবাক হয়ে তাকাবে।

তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? কী খাচ্ছিস?

কী খুশি তিথি! সে তার কোঁচড় খুলে দেখাবে।

যা বাড়িতে, খাওয়া তোর বের করবে।

তিথির চোখ মুখ শুকিয়ে যায়।

জগদীশ জানেন, গোরাচাঁদের ওই এক দোষ। বড় চণ্ড রাগ তার। মাথা গরম হয়ে গেলে সে ভালোমন্দ বোঝে না, মেয়েটার সজল চোখও তাকে আটকাতে পারে না। বড় নির্মম হয়ে ওঠে।

জগদীশের এই হয়েছে মুশকিল। মেয়েটাকে ধরতে পারলেই গোরাচাঁদ টেনে হিঁচড়ে বাড়ি নিয়ে আসবে।

তুই মার খেয়ে খেয়ে মরবি! ভুইঞামশাইর ঘরে জল তুলে রাখিসনি! ছাড়া কাপড় কেচে তারে মেলে দিসনি। তোর এত নোলা।

জগদীশ এই সব জানেন বলেই, তিথিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনলেই কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলেন, কোথায় গেল! তারপর নিজেই খুঁজতে বের হয়ে যান। গোরাচাঁদের ভয়, মেয়েটার জন্য তার সব না শেষ হয়ে যায়। বাবুদের অনুগ্রহে জমিদারিতে তার আশ্রয়। একখানা নোটিস ঝুলিয়ে দিলেই তার সব গেল। তিথি তার সর্বনাশ না করে ছাড়বে না।

জগদীশ সুপারিবাগানের এক কোণায় গিয়ে ডাকবেন, গোরাচাঁদ, গোরা আছিস?

আজ্ঞে উনি তো তিথিকে খুঁজতে গেছেন।

যমুনা দরজার বাইরে একগলা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে বলবে, তিথির গায়ে যেন হাত না তোলে। হাত তুললে খুব খারাপ হবে। আমার মনে হয় মঠের ঘাটে গেছে। পুণ্যস্নান হচ্ছে, মেলা বসেছে, তালপাতার বাঁশি বাজছে, মেয়েটার মন ঘরে টিকবে কেন!

মেলায় নেই।

তা হলে জলে আছে। আমি যাচ্ছি, দেখছি খুঁজে পাই কি না।

আর তখনই তিনি ঠিক দেখতে পান গোরাচাঁদ নদীর পাড় থেকে মেয়েটাকে হাতে ধরে টেনে আনছে। নদীর জলে সারা সকাল যে ডুবে ডুবে পয়সা খুঁজছে, চোখ দেখেই বোঝা যায়। তারপর পাড়ে উঠে নদীর হাওয়ায় ফ্রক শুকিয়েছে, তাও বোঝা যায় শুকনো ফ্রক দেখে, বিন্নির খই, লালবাতাসা কোঁচড়ে নিয়ে নদীর পাড়ে ঘুরে ঘুরে কিছুটা খেয়েছে, বাকিটা ভাইবোনদের জন্য লুকিয়ে নিয়ে আসার মতলবে ছিল, তাও বোঝা যায় ওর এক হাতে কোঁচড় ধরে রাখার চেষ্টায়। হাত টানাটানিতে না আবার কোঁচড়ের মুঠি ফসকে যায়, যতই গোরাচাঁদ তার মেয়েকে টেনে আনার চেষ্টা করুক না, তিথি তার কোঁচড় ছাড়ছে না।

গোরাচাঁদ জগদীশকে দেখেই থমকে গিয়েছিল। তিথির হাতও ছেড়ে দিয়েছিল।

ভুঁইঞামশায় আমার কী হবে! যমুনা খবর পাঠাল, আপনি তারে কাপড় মেলছেন, তিথি সকালে বেপাত্তা। চরণকে বসিয়ে ছুটে এসেছি। এই দেখুন কী কাণ্ড!

দেখছি। কি রে তিথি কটা পয়সা হল।

তিথির সব ভয়ডর নিমেষে জল।

সে মুচকি হেসে বলল, পাঁচ পয়সা।

এত জল ঘাঁটলে জ্বর হবে যে! বাবার কথা শুনিস না কেন!

তিথি বড় বড় চোখে তাকিয়ে শুধু তাঁকে দেখছিল।

কোঁচড়ে কী আছে?

খুবই আহ্লাদের গলায় বলল, খই বাতাসা। বলে, কোঁচড় মেলে দেখাল।

যা বাড়ি যা। বাড়ি থেকে গেলে বলে যাবি। তুই বড় হয়ে যাচ্ছিস বুঝতে পারিস না।

বড় হয়ে যাওয়ার কথায় তিথির কী লজ্জা! সে প্রায় পড়িমরি করে ছুটতে থাকল। কোঁচড় দু—হাতে সামলে, সেই মুলিবাঁশের বেড়া দেওয়া ঘরটার দিকে ছুটতে থাকলে তার ভাইবোনগুলো বের হয়ে এল প্যাক প্যাক করতে করতে।

গোরাচাঁদ আফসোসের গলায় বলল, বলেন, এই কর্মনাশা মেয়েকে নিয়ে আমি কী করি! কোথায় যাই।

তিথিকে দেখতে দেখতে জগদীশের পলকে মনে পড়ে যায় সব। চোখের সামনে বড় হয়ে উঠছে। ছেঁড়া ফ্রকে তাকে খারাপও দেখায় না। মেয়েটার দস্যিপনায় তার বাবা অস্থির। নতুন ফ্রক কিনে দিলে দু—চার মাসও যায় না। ওর বাবাও পেরে ওঠে না। বউঠান, তুলির পুরনো ফ্রক থাকলে মাঝে মাঝে ওকে ডেকে দেন। কী খুশি তখন। ফ্রকটা ছোড়দি গায়ে দিত, সেই ফ্রক সে গায়ে দিচ্ছে। আর যা হয়, তখনই তার কত আবদার সবার কাছে, গাছপালা, জীবজন্তু, পাখপাখালি সবাই তার বন্ধু হয়ে যায়। সে যেন ফ্রকটা গায়ে দিয়ে ইচ্ছে করলে উড়ে বেড়াতেও পারে।

তখন সর্বত্র তার চোখ।

কে রে? কে সুপারির বাগানে ঢুকেছিস।

সে তেড়ে যায়।

গরিবগুর্বো মানুষেরা এই সব ভূস্বামীদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে যে বেঁচে থাকে জগদীশ ভালোই জানেন। সুপারির খোল বাগানে পড়ে আছে, কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তিথির জ্বালায় তা নিয়ে যাওয়া কঠিন। বাবুদের বাড়ির সবকিছুর উপরই তার যেন হক আছে।

সুপারির খোল নেবে সাধ্য কি!

তার চেঁচামেচির শেষ থাকে না।

অমলদা, দ্যাখো এসে আমাদের সুপারির বাগানে কে এসে ঢুকেছে।

কারও সাড়া না পেলে সে খোল নিয়ে গরিব মানুষটির সঙ্গে টানাটানি শুরু করে দেবে।

এটা আমাদের, তুই মেঘা কোন সাহসে বাগানে ঢুকলি! ভুইঞাকাকাকে দাঁড়া খবর দিচ্ছি।

এই হয়, সুপারির বাগানে হাওয়ায় পাকা সুপারি ঝরে পড়ে। গাছের ডগা থেকে খোল খসে পড়ে। যাওয়া আসার রাস্তায় গরিব মানুষদের চোখ কান শকুনের মতো সজাগ। শব্দ হলেই হল, তাল পড়তে পারে, নারকেল পড়তে পারে, সুপারির খোল পড়তে পারে, এতবড় মহলার মধ্যে কোথায় কী পড়ে থাকে কারও খেয়াল থাকার কথা না, কিন্তু তিথির সব খেয়াল থাকে—বিশাল এলাকায় আম জাম জামরুল গাছেরও অভাব নেই—তিথির মতো কেউ খবর দিতে পারে না, কোন গাছে কী ফল ধরে আছে, কোন গাছে কত আম পেকে আছে। তিথির জ্বালায় গাছের ফল পাকুড় কুড়িয়ে নিয়ে কারও হাওয়া হয়ে যাবার ক্ষমতাই নেই। সে কেড়েকুড়ে সব এনে বউঠানের কাছে জিম্মা দেবে।

আর নালিশ, জানো, নিয়ে পালাচ্ছিল। বাতাবি লেবুটা গাছের নীচে কখন পড়ে আছে, আমিও জানো খেয়াল করিনি। শ্রীশ ধরের ব্যাটা নিয়ে পালাচ্ছিল। আমাকে দেখে ফেলে দৌড়োছে।

তিথি ঘরে ঢুকে গেছে ততক্ষণে। সে তাঁর বিছানা মশারি গুটিয়ে কাঠের তাকে তুলে রাখছে। তিথির ডাকাডাকিতে অরু বিছানায় উঠে বসল। নতুন জায়গা—এটা একটা কাছারিবাড়ি কিছুই বোধহয় তার মনে ছিল না। চোখ কচলে হাত পা ঝাড়া দিতেই বুঝল সে তা বাবার কর্মস্থলে—তিথিকে দেখে তার সব মনে পড়ল—রাতের অন্ধকারে কেমন সব কিছু রহস্যাবৃত ছিল, এই সকালবেলায় সে বিছানা ছেড়ে নামার সময়ই, দেখল সামনে সুপারিবাগান, তার ভেতর দিয়ে নদীর পাড়, চড়া, সাদা কাশফুলের ওড়াউড়ি। বাবার স্নান জপতপ সারা। কারণ বাবা একটি ফতুয়া গায়ে দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছেন আয়নায়। সে কিছুটা যে উৎফুল্ল

হয়ে উঠেছে বোঝা যায়। দরজায় দাঁড়াতেই বুঝল, চারপাশে বড় বড় সব আমগাছ, তার ডালপালায় কাছারিবাড়িটা তপোবনের মতো।

তিথি বলল, দাঁড়াও জল এনে দিচ্ছি।

অরুর ভীষণ হিসি পেয়েছে। সে তিথির কথার তোয়াক্কা করছে না। সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেলে টের পেল মেলা ঝোপজঙ্গলও আছে কাছারিবাড়ির চারপাশে। তারপর বেশ বড় মাঠ, বাঁশের বেড়া, সেখানে ফুলের সব গাছপালা, সাদা রঙের ছোটখাটো প্রাসাদও চোখে পড়ল। সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেন নদীর পাড় ধরে যতদূর চোখ যায়, সবই বড় সুন্দর করে সাজানো গোছানো।

জগদীশ বের হবার সময় বললেন, তুমি গোলঘরে চলে যাবে অরু। হাত মুখ ধুয়ে নাও। বইখাতা নিয়ে যাবে। অমল কমলের ঘরে পড়বে।

রাতে খেতে বসে সবাইকে সে দেখেছে। অমলদা তার চেয়ে বেশ বড়ই হবে। ক্লাশ নাইনে পড়ে। কমল তার বয়সি কমলদা ঠিক বলা যায় না, সমবয়সিকে সে দাদা বলতে রাজি না। সবাই অবশ্য এখানে বাবু হয়ে আছে। অমলবাবু, কমলবাবু, কারণ জমিদারি যতই সামান্য থাক, ঠাটবাট আছে পুরো মাত্রায়।

খেতে বসেই টের পেয়েছে বাড়িটায় আশ্রিতজনেরও অভাব নেই। লম্বা রান্নাঘরে আসন পেতে সারি সারি পাত পড়েছে। ঝি—চাকরেরও অভাব নেই। একটা ধিঙ্গি মেয়েকে কোলে করে তুলে এনেছে—ঘুম থেকে তুলে খাওয়ানোর ফ্যাসাদও সে টের পেয়েছিল। কোল থেকে নামিয়ে দিলে সে বুঝেছিল ইনিই সেই ছোড়দি, গায়ে সাটিনের ফ্রক, ফ্রকের ফাঁক দিয়ে হাতির দাঁতের মতো দুটো লম্বা ঠ্যাং বের হয়ে আছে। মাথায় লাল রিবন বাঁধা, কিছুতেই চোখ খুলছে না—আসনে বসিয়ে দিলেও ঢুলছে। সবাই তাকে খাওয়াবার জন্য যে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এবং সে না খেলে বাড়িতে মহামারি শুরু হয়ে যাবে যেন, আহ্লাদ আবদারের শেষ ছিল না।

এই তুলি, কী হচ্ছে! ইস জলের গেলাসটা দিলি তো ফেলে। এ কি রে বাবা, কিছুতেই মুখে দিচ্ছে না।

পাশে যিনি বসে তুলিকে খাওয়াবার চেষ্টা করছেন, তাকে সে চেনে না। পরে অবশ্য তিথি বলেছে, বড়বাবুর সম্পর্কে মাসি হয়—এই বাড়িতেই থাকেন।

তারা যখন খাচ্ছিল—তিথি রোয়াকে বসেছিল, নুন জল লেবু সে পাতে পাতে দিয়েছে। কাঁচালংকা দিয়েছে। পায়ে আলতা পরা বউটিকে বাবার বউঠান, ভাতের টাগারি এগিয়ে দিচ্ছেন পরিবেশনের জন্য। সারাক্ষণ বউমা বউমা করছেন। এই নাও মাছভাজা। বড় বড় কইমাছ ভাজা পাতে পাতে। ডাল পাতে পাতে। আলু পটলের ডালনা, পাখির মাংস, আর ছোট বাটিতে এক বাটি দুধ সবার। ঘোমটায় ঢাকা মুখ, আর নিষ্প্রভ হারিকেনের আলোতে বউটির মুখ সে দেখতে পায়নি, তবে আলতা পরা পা দু—খানি তার এত সুন্দর, একেবারে দুধে আলতায় যার রঙ সে যে খুবই সুন্দরী তাতে তার কোনও সন্দেহ ছিল না। সে মাথা নিচু করে বাবার পাশে চুপচাপ খাচ্ছিল, আর তুলির আবদারে বিরক্ত হচ্ছিল।

কী দিয়ে খাবি?

খাব না।

পাখির মাংস দিয়ে খা।

না খাব না।

তবে কী দিয়ে খাবি?

কিছুই খাব না।

দুধ মেখে দিচ্ছি।

দাও।

দু—গ্রাস খেয়েই কেমন ওক তুলে দিচ্ছে।

অরুর বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, মারব থাপ্পড়।

তিথির বয়সিই হবে। সারা বাড়ির মানুষজন, একটা পুঁচকে মেয়ের খাওয়া নিয়ে যেন অস্থির হয়ে পড়েছিল। আদরে আদরে যে মাথাটি গেছে অরুর বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

তিথি রাতে খেয়েছে কি না জানে না।

খেতেও পারে, নাও পারে।

তার বাবা জমিদারবাবুর আশ্রিত। বাড়ির কাজে কিংবা গিন্নিমার ফুটফরমাস খেটে না দিলে যে তাদের সবই যেতে পারে।

তিথি কি সেই আতঙ্কেই থাকে!

পাঁচ

তারপর অরণির এইভাবেই দিন যায়, বছর যায়।

একদিন সে স্কুল থেকে ফিরে না বলে পারেনি, এই তিথি শোন।

তিথি তার ঘরে জল তুলে দিয়ে গেছে। তারপর সে ছুটছিল বাড়ির অন্দরের দিকে। কাছারিবাড়ির পরে মাঠ, ঘাসের লন এবং দুটো জবাফুলের গাছ পার হয়ে পাঁচিলের দরজায় হয়তো ঢুকে যেত। তার জলখাবার, এই যেমন কখনও তেলমাখা মুড়ি, অথবা চিড়ে ভাজা, সঙ্গে বাদাম ভাজা কিংবা নাড়ু, কখনও ফুলুরি অথবা ফুলকপির সিঙারা, যা তাকে দেয়, সে নিয়ে আসে।

তিথি জবাফুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বলল, ডাকছ কেন?

শুনে যা।

আমার এখন শোনার সময় নেই।

আছে। শুনে যা বলছি।

অরুদা। কোনও কারণে রেগে যেতে পারে, সে ইতস্তত করছিল, গাছের নীচ থেকে নড়ছিল না।

শুনে যা বলছি।

কী যে করো না। কী হয়েছে? কখন সেই সকালে দুটো মুখে দিয়ে গেছ, না খেলে পিত্তি পড়বে না। আমি আসছি।

না, আসছি না। আগে আয়।

অরু স্কুলের জামাও ছাড়েনি। এত নজর মেয়েটার। কখন সে ফিরবে, সেই আশায় হয়তো নদীর পাড়ে কিংবা সুপারিবাগানে হেঁটে বেড়ায়। না হলে, সে ফিরেই দেখতে পাবে কেন, এক বালতি জল আর কাঁসার ঘটিটি সিঁড়িতে রাখা আছে। না হলে ফিরেই দেখবে কেন, তার জামাপ্যান্ট ভাঁজ করা, চকির এক কোনায় সাজিয়ে রাখা, চাঁপা ফুল তুলেও একটা কাচের গেলাসে জলে ডুবিয়ে রাখে। এই ঘরের সব সৌন্দর্য তৈরি হয় তার হাতে। সে যা কিছু এখানে সেখানে ফেলে রাখে, তিথির কাজ তা গুছিয়ে রাখা।

এ জন্য অরুর নিজের উপরও রাগ হয়।

কিন্তু মুশকিল, কমলদা কিংবা বিশুদা ডাকলে তার ছুটে যাবার অভ্যাস—শীতে ব্যাডমিন্টন, বর্ষায় স্কুলের মাঠে ফুটবল, কিংবা স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসে নাটক, এ—ছাড়া কত যে আকর্ষণ, মেজদা ঢাকা থেকে এলে তার সঙ্গে শিকারে যাওয়া, অথবা নদীর চরে ডাল ফেলে রাখা হয়, জোয়ারের জলে ডুবে যায় ডালপালা, ভাটার মুখে জল নামার আগে সব ডালপালা ঘিরে ফেলা হয় বাঁশের বানা দিয়ে। জল নেমে গেলে, সেই ডালপালা সরিয়ে দিলে জলে কাদায় তাজা মাছের ছড়াছড়ি। গলদা চিংড়ি, কালিবাউশ, ভেটকি থেকে কই পুঁটি ট্যাংরা কিছুই বাদ থাকে না। দাদারা পছন্দমতো মাছ ঝুড়িতে তুলে দিতে বলে, জেলেরা মাছের ঝুড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়, সে আর তিথি তার পেছনে পেছনে ছোটে।

তখন তার মনেই থাকে না, সে তিথির জন্য কাজ বাড়িয়ে রেখে যাচ্ছে। বই খাতা সব চকিতে ছড়ানো ছিটানো। কলম পেনসিল, জিওমেট্রি বক্স যেখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। স্কুল থেকে ছুটে

আসে। যেন সে তাড়াতাড়ি বের হতে না পারলে তার মজা উপভোগ করার সময় পার হয়ে যাবে। তিথি আছে, সে—ই সব করবে।

সে—ই সব তুলে রাখে। সাজিয়ে রাখে। জিওমেট্রি বক্স খোলা, বাক্সের সবকিছু এলোমেলো, তিথির কাজই হল, ঠিকঠাক তুলে রেখে দেওয়া। এত যে মজা উপভোগ করতে পারে তিথি আছে বলেই।

তিথি কেমন ভীরু পায়ে লন পার হয়ে এগিয়ে আসছে।

সে বুঝতে পারছে না তার কী দোষ।

অরু সিঁড়ি থেকে নড়ছে না।

তিথি অত্যন্ত ভীরু মুখেই বলল, আমি কী করেছি?

আগে কাছে আয়।

তিথি ভয়ে কাছে যাচ্ছে না।

বলোই না। আমি তো কাছেই আছি।

ঘরে আয়।

না ঘরে ঢুকব না।

ঢুকবি না?

তুমি কি আমাকে মারবে?

তোকে মারতে পারলে ভালো হত। তুই কখন রাতে বাড়ি যাস? সারাদিন বাবুদের বাড়িতে পড়ে থাকতে ভালো লাগে?

তিথি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

রাতে তুই রোয়াকে বসে থাকিস কেন? তুই কি রাতে বাবুদের বাড়িতে খাস। তোকে কি তারা দু—বেলা খেতে দেয়।

দেবে না কেন? যখন যা বেশি হয় দেয়। সবাই খেলে কিছু তো পড়ে থাকেই। আমি আলাদা থালায় তুলে রাখি। ওতেই পেট ভরে যায়।

সারাদিন ধরে বাবুদের বাড়ির সবার উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে বেড়াস? তোর খারাপ লাগে না।

বারে, খারাপ লাগার কী আছে। তুমি কি এজন্য আমাকে ডেকেছ? আমার কত কাজ জানো? তুমি জানো, ছোড়দির আজ পুতুলের বিয়ে। আমি না গেলে সব কাজ পড়ে থাকবে। পুতুলের জামাকাপড় আমি না গেলে পরাবে কে! দেরি হলে রাগ করবে। আমাকে খামচে দেবে। আমার ফ্রকও ছিঁড়ে ফেলতে পারে। ছোড়দির বেজায় রাগ জানো? আমাকে কি বলেছে জানো?

কী বলেছে!

তুমি নাকি ছোড়দিকে দেখলে পালাও।

মিছে কথা।

ছোড়দি মিছে কথা বলে না। ছোড়দি তো কাউকে ভয় পায় না। মিছে কথা বলতে যাবে কেন?

পালাই! বেশ করেছি। বলবি বেশ করেছি।

ছোড়দির সঙ্গে কথা বলো না কেন? তাই তো খেপে যাচ্ছে। তোমাকে দূর থেকে দেখলেই বলবে, দাঁড়া না অরুকে আমি মজা দেখাচ্ছি। ভুঁইঞাকাকাকে বলে এমন মার খাওয়াব না, জীবনেও ভুলতে পারবে না।

তিথি তার সঙ্গে এতদিন নিজের কথাই বলেছে—সে কারও নিন্দামন্দে থাকে না। তুলির কোনও কথাই এতদিন বলেনি। আজ কি তিথি বুঝতে পেরেছে, সে উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেড়ালে, তার অরুদাকে ছোট করা হয়। অরুদাকে বিশ্বাস করে সে কি তাকে নিজের মানুষ ভেবে ফেলেছে।

তিথি বলল, ঠিক আছে পরে কথা হবে। বলেই ছুট। একদণ্ড আর দাঁড়াল না। বাটিতে মুড়ি আর দুটো সন্দেশ নিয়ে এসে হাজির। ঘরে আলাদা তার কাঁসার গেলাস আছে, কুঁজো থেকে গেলাসে জল ভরে একটা

টিপয়ে রেখে বলল, আমি যাচ্ছি অরুদা। দরজা খোলা রেখে উধাও হবে না। শেকল তুলে দিয়ে যাবে। কুকুর বিড়ালের উৎপাত আছে বোঝ না।

তারপর আর তিথি একদণ্ড দাঁড়াল না। বড় বেশি লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে, লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ায়। তিথি দৌড়ে মাঠ পার হয়ে লনের ভেতর ঢুকে গেল। অরু বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তিথি একসময় পাঁচিলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে বের হয়ে যাওয়া দরকার। দেরি হলে বিশুদা, অমল, কমল সবাই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শহর থেকে মেজদা নতুন র‍্যাকেট নিয়ে এসেছে। কর্ক এনেছে এক ডজন। শীতের শেষাশেষি নদীর পাড়ে নেট টাঙিয়ে আজ থেকে ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু হবে। সে সঙ্গে না থাকলে বাঁশ, খোনতা কে নিয়ে যাবে! সে একজন আমলার পুত্র, এ—কাজটা তারই করা উচিত।

গোলঘরে যাবার সময়ই ভাবল, তিথিকে বড় বড় কথা না বললেই পারত। তিথি খারাপ পেতে পারে। তিথি এভাবে বাবুদের উচ্ছিষ্ট খেয়েই বড় হয়ে উঠেছে। কেন যে মনে হল বাবাও তার উচ্ছিষ্টভোজী এবং সেও। তার মুখে অত বড় বড় কথা শোভা পায় না। তিথি তার কথা শুনে ভাগ্যিস হেসে ফেলেনি।

তারপরেই মনে হয় কাজ করলে মানুষ ছোট হয়ে যায় না। হাতে র‍্যাকেট নিয়ে সেও খেলবে। খেলার নামে তার মধ্যে ঘোর সৃষ্টি হয়। নদীর পাড়ে যখন তারা নেট টাঙিয়ে খেলছিল, তখন আর নিজেকে কিছুতেই খাটো ভাবতে পারেনি। ফেরার সময় মনে হল সে রাজ্য জয় করে ফিরছে।

তবে তুলি বাবাকে মিছে অভিযোগ করে মার খাওয়াবার পরিকল্পনা করছে, ভাবতেই ভারী দমে গেল। তুলির সঙ্গে যাও ইচ্ছে হয়েছিল, দেখা হলে একদিন কথা বলবে, তাও আর বোধহয় হবে না। কি বলতে কি ভেবে নেবে কে জানে। আর তুলিকে সে কী কথা বলবে? তুমি ভালো আছো? তুমি দেখতে খুব সুন্দর। খুব বোকা বোকা কথা! তুলির সঙ্গে কথা বলার মতো ভাষাই তার জানা নেই।

সবাই চলে গেছে, নদীর পাড়ে মানুষজন কমে আসছে, দূরে স্টিমারঘাটে গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘাটে যাত্রীদের ভিড় আছে। রাত আটটায় স্টিমার আসবে, যাত্রী নামবে, যাত্রী উঠবে। আশরাফ সারেঙ জাহাজ ভর্তি করে লোক তুলে নিয়ে যাবে। তার খুবই ইচ্ছে হয়েছিল, আশরাফ সারেঙের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে একদিন দেখা করে। কিন্তু হয়ে ওঠে না। গোলঘরে তখন সবার সঙ্গে তাকেও পড়তে বসতে হয়। মাস্টারমশাই প্রাসাদের বড় বড় জানালা দেখিয়ে বলেন, এই হচ্ছে আয়তক্ষেত্র। ঘরের মেঝে দেখিয়ে বলেন, এই হল বর্গক্ষেত্র—যার চারটি বাহুই সমান।

পড়াশোনার পীড়নও কম নয়। ক্লাশে পড়া না পারলে ঠিক বাবার কানে কথা উঠে যায়।

ভুঁইঞামশায় আছেন?

দ্বিজপদ সার এসে হাজির।

তোমার বাবা কোথায়।

সে বুঝতে পারে দ্বিজপদ সার নালিশ জানাতে এসেছেন। সে দরজা খুলে সামনের বারান্দায় একটা টিনের চেয়ার বের করে দেয়। তারপর বাবাকে খুঁজে বেড়ায়। ইংরেজি গ্রামার ট্রানস্লেশনে সে কাঁচা, তার নাকি মনোযোগেরও অভাব আছে—দ্বিজপদ সার সে—সব কথা বলতেই হয়তো এসেছেন। সে তার বাবাকে খুঁজতে গিয়ে নিজেই হারিয়ে যায়।

এভাবে সে কতদিন কত কারণে নদীর পাড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কাছারিবাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছে হয় না। বাড়ির জন্য মন কেমন করে তখন। পূজার ছুটিতে সে বাড়ি যেতে পারবে, পূজার তো এখনও অনেক দেরি। নতুন উপসর্গ তুলি। তাকে ভয় দেখিয়েছে, তুলি মিছে কথা বলে না। তুলি কাউকে ভয় পায় না। ভয় না পেলে যেন মিছে কথা বলা যায় না।

নদী থেকে হাওয়া উঠে আসছে। জোয়ারে নদীর জল বাড়ছে। দেখতে না দেখতে বর্ষা এসে যাবে। বর্ষায় নদী বিশেষ করে এই কোয়ালা নদীতে কুমির পর্যন্ত ভেসে আসে। তিথিই তাকে একদিন খবর দিয়েছিল,

জমিদার হেমন্ত রায়চৌধুরীর বৈঠকখানার বারান্দায় শ্বেতপাথরের টেবিলে একটা কুমিরের ছাল আছে। তিথি তাকে সেখানে একদিন নিয়ে যাবে, এমনও কথা দিয়েছে।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কত কথা মনে হয়। আর কত পাখির ওড়াউড়ি, কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় সে কিছুই জানে না। বর্ষা এলে দু—পাড়ের চর ডুবে যায়। নদীর ঘাটগুলিতে যত সিঁড়ি আছে সব জলে ডুবে যায়। তিথিই সব খবর দেয় তাকে। কিন্তু তুলির খবরটা না দিলেই পারত। এমন সুন্দর মেয়েটা এত কুবুদ্ধির ডিপো ভাবতেই তার কষ্ট হচ্ছিল।

তবে বাবা তাকে কখনোই গায়ে হাত তোলেনি। বাবাকে বলে মার খাওয়ানো সহজ না। বাবা কি পুতুল! সে সাহস পায়। ঘাটলার সিঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়ায়। আকাশ আর মেঘমালায় ঢেকে আছে চারপাশ। দুটো একটা নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব জলে ভাসছে। ছলাত ছলাত জলের শব্দ। গুন টেনে নিয়ে যাচ্ছে মাঝিরা। কত দূর দেশে চলে যায় কত লোক। সেও চলে এসেছে—তিথির জন্যই হোক কিংবা এই গ্রাম, মাঠ, স্কুল, মজা খাল বিশাল সব প্রাসাদ আর বাবুদের জাঁকজমক, যেমন জমিদার হেমন্ত রায়চৌধুরীর আস্তাবলে বিশাল দুটো আরবি ঘোড়া এবং ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড় ধরে হরিশবাবুর ছোটা, যে না দেখেছে, সে জানেই না, এক আশ্চর্য অশ্বারোহী কদম দিতে দিতে বিন্দু থেকে বিন্দুবৎ হয়ে যেতে পারে। হরিশবাবু দেশে এলে তিথি তাকে নিয়ে নদীর পাড়ে ছুটে যাবেই কারণ হরিশবাবু বিকেলে ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড়ে হাওয়া খেতে বের হন। তিথি তাকে গোপনে একটা চিরকুট ধরিয়ে দেয়। চিরকুটে কী লেখা থাকে সে জানে না। তিথি চিরকুট হোক, চিঠি হোক খুবই গোপনে হরিশবাবুর হাতে দিয়ে দেয়। ঠিক ঘাটলার পাশে কদম দিতে দিতে তিথির সামনে এসে দাঁড়াবেন। তারপর ভারী সতর্ক নজর। ঘোড়ার উপরেই তিনি বসে থাকেন। নুয়ে তিথির চিঠিটা নিয়েই দিঘির পাড় ধরে অদৃশ্য হয়ে যান।

আসলে অরুর মাঝে মাঝে কেন জানি মনে হয় কোনও স্বপ্নের পৃথিবীতে সে এসে উঠেছে। বাড়ির জন্য প্রথম প্রথম খুবই মন খারাপ করত, কিন্তু দিন যত যাচ্ছে, তত তার মনে হয় মন খারাপ আর আগের মতো হয় না। সে তো দেখতে পায় তুলি সাটিনের ফ্রক গায় দিয়ে মাথায় সুন্দর লাল রিবন বেঁধে কখনও সুপারিবাগানে, কখনও নদীর চরে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে কেউ থাকে। সে কাছে থাকে না, ঝোপজঙ্গলের আড়াল থেকেই সে তুলিকে দেখতে বেশি ভালোবাসে। তুলি কাছাকাছি এলেই সে দৌড়ে পালায়—যদি তুলি টের পেয়ে যায়, সে চুরি করে চরের উপর একটা জ্যান্ত পরীর ওড়াউড়ি দেখছিল—ধরা পড়লে কেলেঙ্কারির একশেষ—সে না পালিয়ে থাকে কী করে!

তুলি মিছে কথা বলে না, তিথি ঠিকই বলেছে।

তুলি ঠিক টের পেয়েছে সে তাকে দেখে, তাকে দেখার জন্য নদীর পাড়ে কিংবা কাছারিবাড়ির বড় বড় আমগাছের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনও বাবুদের সঙ্গে স্টিমারঘাটে গেলেও সে যে তুলির পিছু নেয়, তাও টের পেতে পারে। কখনোই তুলির সামনে যেতে সাহস পায়নি। রান্নাবাড়িতেই কখনও রাতে সে কাছ থেকে তুলিকে দেখতে পায়। রোজদিন দেখা হয় না। তুলি আগে খেয়ে নিলে দেখা হওয়ার কথাও নয়, তার যে কি হয়, সে রান্নাবাড়িতে মাথা নিচু করেই খায়। চোখে চোখ পড়ে গেলে কত বড় বেয়াদপি, সেটা সে বোঝে। তুলি অপছন্দও করতে পারে। বাড়ির একজন আমলার পুত্রের এত আস্পর্ধা হয় কী করে! সাটিনের ফ্রকের নিচে তুলি আজকাল টেপ দেওয়া জামাও পরে।

তুলির এত সে জানে, তুলি কেন জানবে না, তুলিকে দেখলেই সে পালায়।

কাছারিবাড়ির দিকে সে হেঁটে যাচ্ছে। বাবার সঙ্গে তার কমই দেখা হয়। বাবার ছুটিছাটা নেই। রবিবার শনিবার নেই। সেই আটটায় গিয়ে নাজিরখানায় বসেন, তক্তাপোশে সাদা ধবধবে ফরাস পাতা—দু—তিনটে তাকিয়া, সামনে কাঠের একটা বড় ক্যাশবাক্স, দেয়ালের দিকে গোটা দুই লম্বা টুল, লোকজন সব সময় বাবার কাছে বসেই থাকে—আদায়পত্র, কিছু সুদেরও কারবার আছে, নদী থেকে বড় রকমের রোজগার আছে বাবুদের—নদীর ডাক হয়—ইলিশমাছের জো পড়লে আদাইয়ের পরিমাণ বাড়ে।

সকালবেলাতেই ভেতর বাড়ি থেকে একটা লম্বা ফর্দ চলে আসে। বাবা ফর্দ মিলিয়ে সব কিছু নিয়ে আসার জন্য হরমোহনকে বাজারে পাঠিয়ে দেন। যার যা দরকার, বাবার কাছে দরকারমতো চিরকুট আসে। লম্বা খেরো খাতায় বাবা সব খরচখরচা এবং আদায় কী হল সব টাকার জমা খরচ তুলে রাখেন। সাঁজবেলায় দেবকুমারবাবু কিংবা নবকুমারবাবুর কাছে সারাদিনের খরচ খরচা এবং আয়ের হিসাব অর্থাৎ খেরো খাতাটি সম্বল করে বাবা তাদের কাছে চলে যান। মামলা মোকদ্দমা অথবা তালুকের প্রজাদের বাদবিসংবাদে বাবাকেই ছুটতে হয়।

যত তার কথা রাতে।

তোমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো অরু?

আজ্ঞে না।

বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে না তো?

আজ্ঞে না।

মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। পড়া বুঝতে না পারলে দ্বিজপদকে বলবে।

তখনই একদিন সে তার বাবাকে কেন যে বলল, আচ্ছা বাবা আমার জামাপ্যান্ট আমি কেচে নিতে পারি না।

পারো।

সকালে তিথির জল তুলে দিয়ে যাওয়ার কিন্তু দরকার হয় না। আমিই তুলে রাখতে পারি।

ইচ্ছে করলে সবই করা যায় অরু। এতে সাবলম্বী হওয়া যায়। সবকিছু নিজে করে নিতে পারার মতো বড় কিছু নেই।

আমি তিথিকে ঘরে ঢুকতে বারণ করে দেব।

কেন? সে কী করেছে।

কিছু করেনি। তিথির কত কাজ ভেতর বাড়িতে। সে সব করে কখন?

অঃ এই কথা। তবে তিথি কি দমবার পাত্র। আমার তো মনে হয় না রাজি করাতে পারবে।

বাবার কথাই ঠিক।

সে তিথিকে নিষেধ করেছিল।

শোন তিথি, এই কাজটুকু তোর না করলেও চলবে।

তিথি বড় বড় চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

জলটল আমিই তুলে রাখব। বিছানা করে নিতে আমার অসুবিধা হবে না। জামাপ্যান্ট গোলা সাবানে কাচতে কতটুকু সময় লাগে বল।

ঠিক আছে করে নেবে। করতে পারলে তো ভালোই। তারপরই তিথি সিঁড়ি ধরে নামার সময় ভেংচি কেটে বলল, কত মুরদ। জানা আছে। তিনি সব করে নেবেন তা হলেই হয়েছে!

কিন্তু তিথি বোধহয় শেষে অবাকই হয়ে গেছিল, সে তো ছেড়ে দেবার জন্য বসে নেই। তিথি যখন দেখল, কোনও কাজেই তার ত্রুটি থাকছে না, কেমন দিন দিন বিমর্ষ হয়ে যেতে থাকল। স্কুলে যাবার সময় দেখতে পায় তিথি সিঁড়িতে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, স্কুল থেকে ফিরেও দেখতে পায় গালে হাত দিয়ে বসে আছে। কাজের কোনও খুঁতই ধরতে পারছে না, ক্ষোভে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। আর একদিন এসে দেখল, সারা ঘর তছনছ করে রেখেছে কে! মেঝেতে বালতির সব জল ঢেলে দিয়েছে কেউ। ঘরে ঢুকেই অরুর মাথা খারাপ। তিথির কাজ। তিথিই শেকল খুলে সব তছনছ করে দিয়ে গেছে। কাজ কেড়ে নেওয়ায় তার বোধ হয় সহ্য হচ্ছে না।

তিথি! তিথি!

সে দরজার বাইরে লাফিয়ে নেমে গেল।

তারপর তিথিদের বাড়ির দিকে ছুটল।

না কোথাও তিথি নেই।

কোথায় গেলে মেয়েটা?

অরণি কাউকে বলতেও পারছে না, আমার ঘর তিথি তছনছ করে দিয়েছে। বইটই পেনসিল খাতা সারা চকিময়। জলে ভাসছে মেঝে। কাঁসার ঘটি গেলাস গড়াগড়ি খাচ্ছে চকির নিচে। এটা যে তিথিরই কাজ বলে কি করে!

শেষে সে তিথিকে খুঁজে পেল সুপারিবাগানের ভেতর। গাছগুলো খুবই পাতলা, দূর থেকেও দেখা যায় ভেতরে কেউ বসে থাকলে। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে নদীতে। নদীর জল তেমনি ছলাত ছলাত। পাড় ভাঙারও শব্দ পেল। হরিশবাবুর ঘোড়াও ছায়ার মতো দূরে ভেসে উঠল।

অরু ছুটে যাচ্ছে।

সুপারিবাগানের ভেতর দিয়ে সোজা ছোটা যায় না। সে এ—গাছ ও—গাছ ডাইনে বাঁয়ে ফেলে বাগানে ঢুকে যাচ্ছে।

আর ডাকছে, এই তিথি, এখানে লুকিয়ে থেকে রক্ষা পাবি ভাবছিস! তোর বাবাকে ডেকে সব না দেখাচ্ছি তো আমার নাম অরণি না। তোর এত জেদ!

এই কি, কাছে গিয়ে কী দেখছে!

তিথি গাছের গুঁড়িতে বসে আছে মাথা নিচু করে। ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না।

অরু জোর করে মুখ দেখার জন্য তিথিকে চিৎ করে দিল। তিথি বিন্দুমাত্র জোরাজুরি করল না। কারণ তিথি বোকার মতো ভেউ ভেউ করে কাঁদছে—আমি কী করব বলে দাও। আমি কী নিয়ে থাকব বলে দাও।

অরণি হতভম্ব। বুঝতে পারছে না, সে হাসবে না রাগ দেখাবে। আমি কী করব, কী নিয়ে থাকব—এত পাকা পাকা কথা মেয়েটার, এটুকুন মেয়ে কেমন সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারে। তিথির পক্ষেই সম্ভব?

নে ওঠ। ঘরে চল। যে হাতে সব তছনছ করেছিস সেই হাতে সব সাজিয়ে রাখ। স্টিমারঘাট থেকে বাবা ফিরে এলে মুশকিলে পড়ে যাবি।

তিথি হি হি করে হাসতে হাসতে উঠে বসল, তারপর ছুটতে থাকল, যেন সে জয়লাভ করে খুবই খুশি—ছোটার মধ্যে তিথির এত সজীবতা থাকে যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এক বিনুনি বাঁধা, মার্কিন কাপড়ের ঢোলা সেমিজ গায়ে, উসখোখুসকো চুলে মেয়েটার লাবণ্য যেন আরও বেড়ে যায় তখন। আর তখনই মনে হয়েছিল, তিথি চিৎ হয়ে পড়ে থেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ঠিক, আবার সঙ্গে সঙ্গে এমন চোখে ওকে দেখছিল যেন কিছু একটা হয়ে যাক। আর কিছু না হোক, অরুদা তাকে আদর করলে সে আপত্তি করবে না।

এই সব মনে হলেই তিথির জন্য তার কষ্ট হয়। সে ধীরে ধীরে হাঁটে। তার কিছু ভালো লাগে না। অমলদা যাবার সময় তাকে ডেকে গেছে, এই অরু ঘাটলায় গিয়ে আবার বসলি কেন? পড়াশোনা নেই।

সে সাড়া দেয়নি। কিন্তু গোলঘরে সবাই পড়তে চলে যাবে। তাকেও হাতমুখ ধুয়ে মাস্টারমশাইর সামনে গিয়ে পড়তে বসতে হবে, সে না গেলে দাদারাই খুঁজতে বের হবে। কাছারিবাড়িতে এসে খুঁজবে তাকে।

সে পা চালিয়ে হাঁটছে। সুপারিবাগান পার হয়ে কাছারিবাড়ির মাঠে ঢুকতেই মনে হল কারা যেন মাঠে তার জন্য অপেক্ষা করছে। কাছে গেলে দেখল তিথি আর তুলি। তুলিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে তুলির ভাব না হলে তিথি বোধহয় স্বস্তি পাচ্ছিল না।

তিথি বলল, কোথায় একা একা ঘুরছিলে। জানো সাঁজবেলায় তেঁতুলতলা দিয়ে কেউ আসে না। জায়গাটা ভালো না। একা একা তেঁতুলতলা দিয়ে চলে এলে!

আসলে রাস্তা সংক্ষিপ্ত করার জন্যই সে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তেঁতুলতলার নিচ দিয়ে উঠে এসেছে। জায়গাটা যে ভালো না সেও শুনেছে। ছোটপিসিকে এখানে একবার ভূতে ধরেছিল—সাঁজ লাগলে রাস্তাটা দিয়ে কেউ বড় আসে না। তুলির আক্রোশের কথা ভাবতে গিয়ে এতই দমে গিয়েছিল, তার কোনও কিছুই প্রায় খেয়াল ছিল না। সেই তুলি অরুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক, তবে তাকে দেখছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রিয় কোনও নক্ষত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে যেন।

তিথি না পেরে বলল, এই ছোড়দি, অরুদাকে কী বলবে বলেছিলে?

কী বলব?

কেন, বললে না, চল তো, অরুর সঙ্গে আমার কথা আছে।

কখন বললাম?

জানি না বাপু, তা হলে আসার কী দরকার ছিল। অরুদা তুমি যাও। হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসোগে।

অরু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে পা বাড়াতেই তুলি বলল, সেদিন মাঠের আড়ালে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলে?

কবে?

মনে নেই তোমার। আমি চরের বালিতে বাণীপিসির সঙ্গে হাওয়া খাচ্ছিলাম।

অরু সোজাসুজি বলল, না। মনে নেই।

না, আচ্ছা নাই মানলাম। তারপরই বলল, আমি বাঘও নয় ভালুকও না। আমার সঙ্গে কথা বললে জাত যাবে না। কি মনে থাকবে?

কী কথা বলব?

কথার কি শেষ আছে। আমাকে চুরি করে দেখলে খুব রাগ হয় আমার জানো?

ঠিক আছে আর দেখব না।

তিথি বলল, তুমি ছোড়দিকে তবে সত্যি চুরি করে দ্যাখো!

কী বলব, ও যখন বলছে—

ও বললেই তুমি মেনে নেবে। এ কেমন কথা। চুরি করে দেখার কী আছে!

অরু কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এই চুরি করে দেখার মধ্যে কি কোনও অন্য অনুভূতি কাজ করে। সে বড় হয়ে যাচ্ছে। সে নিজেকে যতই আড়াল করে রাখুক তার ভেতর একজন নারী যে স্বপ্নে বড় হয়ে উঠছে বুঝতে পারে। এই সব গোপন কথা যদি সত্যি ফাঁস হয়ে যায়, তবে সে মুখ দেখাবে কী করে! বাবা যে তবে খুবই জলে পড়ে যাবেন। সেদিনের ছেলে, ক্লাশ এইটে সে পড়ে, তার মধ্যে একজন নারী স্বপ্নে বড় হয়ে উঠলে যে রোগব্যাধির পর্যায়ে পড়ে। কলঙ্কও কম না।

তখনই তুলি বলল, আমি কাউকে কিছু বলতে যাচ্ছি না। আমার পুতুলের বিয়ে আজ। তুমি খাবে। তিথি এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। না গেলে রাগ করব।

পুতুলের বিয়ে নিয়ে অরুর এক ধন্দ। সে খাবে। কী খাবে? সে যাই হোক অরু বুঝল, সে তুলিকে দেখে যা ভাবে, তুলিও তাকে দেখলে তেমনই কিছু একটা ভাবে। তুলি তার বিরুদ্ধে খুব বেশি কিছু রটাতে সাহস পাবে না। তুলি নিজেও ভেতরে ভেতরে বড় হয়ে যাচ্ছে। তুলিও তার শরীর নিয়ে ঠিক কিছু ভাবে।

এভাবে সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে অরুর মুখ রক্তাভ হয়ে গেল। ভেতরে এক অতীব স্পৃহা শরীরের কোষে কোষে ঢেউ তুলে দিচ্ছে। সে কোনওরকমে কাছারিবাড়িতে ঢুকে তক্তাপোষে বসে পড়ল।

হাতমুখ ধোয়ার কথা মনে থাকল না।

কেমন ভ্যাবলু বনে গেছে যেন।

মনে হয় তার জীবনে এই প্রথম এক পালতোলা নৌকা এসে হাজির। নৌকায় উঠে গেলেই এক রহস্যময় দেশ, শরীরে সুঘ্রাণ—হাতে পায়ে জংঘায় পদ্মফুলের ছড়াছড়ি। নরম পাপড়ি, কোমল ত্বকের ভিতর ফুটে

থাকা নরম স্পর্শে তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। সে হাত পা টান করে একটা বালিশ টেনে শুয়ে পড়ল। কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে তার শরীর।

তখনই দ্বিজপদ সারকে অরুর নামে নালিশ।

সার দিন দিন অরু ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছে। এখনও তার আসার নামগন্ধ নেই। কখন পড়তে বসবে!

দ্বিজপদ বুঝতে পারেন, যতক্ষণ তিনি পড়ান, ততক্ষণ বাবুদের ছেলেরা হাজতখানায় বসে থাকে। অরু না আসায়, তাদের ক্ষোভ বাড়ছে। হাজতখানার আর এক কয়েদির পাত্তাই নেই। সার শুধু একবার বলেছিলেন, অরুর শরীর খারাপ।

কমল বলল, ডাহা ফাঁকিবাজ সার। পড়ার নামে মাথায় বাজ পড়ে। কী করছে, কাছারিবাড়িতে! দেখে আসব সার?

দ্বিজপদ হাসলেন। আসলে পড়া থেকে ফাঁকি দেবার সুযোগ খুঁজছে। ভুঁইঞামশায়ের পুত্রটি পড়াশোনায় বেশ ভালো। পড়াশোনায় অরুর যথেষ্ট আগ্রহও আছে। যথাসময়েই সে চলে আসে। দ্বিজপদ ঘরে ঢুকে আর কাউকে দেখতে না পেলেও, অরুকে দেখতে পান। দ্বিজপদ ঘরে ঢুকলে সে উঠে দাঁড়ায়। নম্র স্বভাবের ছেলেটির পড়াশোনার ভার ভুঁইঞামশায় তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, সে যদি না আসে, চিন্তারই কারণ। আমবাগানের এক কোনায় কাছারিবাড়িতে একাই তাকে থাকতে হয়। দ্বিজপদ কী ভেবে বললেন, ঠিক আছে। আমিই দেখে আসছি।

এতে সবাই একবাক্যে সায় দিল, সেই ভালো সার।

অর্থাৎ তিনি যতক্ষণ না থাকবেন, ততক্ষণই তাদের রেহাই।

বিশু বলল, আমি যাব সঙ্গে।

কী দরকার!

কমল বলল, টর্চ নিলেন না?

তা সাপখোপের উপদ্রব আছে। নদীর পাড়ে বাড়ি। ঝোপজঙ্গল, কোথাও কোথাও প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপও আছে। বিষধর ভুজঙ্গের উৎপাতও কম না। তিনি কী ভেবে টর্চ বাতিটা সঙ্গেই নিলেন।

ঘর থেকে বের হলেই দুটো করবীফুলের গাছ, তারপর একটা হাসনুহানার গাছ। গাছটায় দু—একটাই ফুল ফোটে। ফুলের তীব্র গন্ধ ছড়ালেই বোঝেন, গাছে কোথাও ফুল ফুটেছে। গাছটা মাথায় আনারসের ডিগের মতো লম্বা ঘন পাতায় ঝোপ সৃষ্টি করে রেখেছে। গাছটার নিচ দিয়ে যাবার সময় তিনি খুব সতর্ক থাকেন। কেন যে মনে হয় যে—কোনও মুহূর্তে পাতার ঝোপ থেকে পোকামাকড় লাফিয়ে পড়বে। খুবই দুর্লভ ফুলের গাছ। দিনের বেলাতেও ফুল খুঁজে বের করা কঠিন—অথচ ফুল যে ফুটেছে, গন্ধেই টের পাওয়া যায়। বিষধর সাপেদের বড় প্রিয় এই ফুলের ঘ্রাণ। একেবারে রাস্তার উপর গাছটা জমিদারবাবুরা না লাগালেই পারতেন। তিনি কী ভেবে গাছটার নিচে ঢুকে যাবার আগে টর্চ মেরেও দেখলেন। প্রায় বিশাল ছত্রাকার হয়ে আছে গাছের মাথাটি। ঘন সবুজের সমারোহ।

গাছটা পার হলেই সবুজ লন। শীত বসন্তে নীল রঙের বেতের চেয়ার টেবিল পাতা থাকে। বাবুরা বিকালে হাওয়া খান এখানটায় বসে। নদীর জলে নৌকা ভাসে। রাতে স্টিমারের সার্চলাইটে কেমন নীলাভ দেখায় এলাকাটা। বাবুদের আত্মীয়স্বজনও কম না। এখানে বসে তাস পাশার আড্ডাও জমিয়ে তোলার ব্যবস্থা থাকে।

দ্বিজপদ যাচ্ছিলেন, তার ছাত্রটি কাছারিবাড়িতে একা একা কী করছে, শরীর যদি খারাপ হয়, এই সব ভেবেই আমবাগানে ঢুকে গেলেন। এক ইটের দেয়াল, মাথায় টিনের চাল, আটচালার উপরে গাছের ডালপাতায় জায়গাটা খুবই অন্ধকার হয়ে আছে। মূল বাড়ি থেকে বড়ই আলগা কাছারিবাড়িটা। অরু ছেলেমানুষ সে এমন একটি পরিত্যক্ত জায়গায় একা বসে থাকতেও ভয় পাবে।

সে কি ঘরে নেই?

দরজা খোলা?

টর্চ মেরে দূর থেকেই সব টের পাচ্ছেন।

কেউ হারিকেনও জ্বালিয়ে দিয়ে যায়নি।

দ্বিজপদ কিছুটা দ্রুতই হেঁটে যেতে থাকলেন।

ঘরে ঢোকার আগে ডাকলেন, অরু আছিস! অরু।

কোনও সাড়া নেই।

তাজ্জব। ছেলেটা গেল কোথায়?

ভেতরে টর্চ মারতেই দেখলেন, অরু শুয়ে আছে একটা লম্বা সাদা চাদরে মুখ মাথা ঢেকে। সে কি ঘুমোচ্ছে!

এই অসময়ে!

এই অরু, অরু।

অরু ধড়ফড় করে উঠে বসল।

ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছিস, কী ব্যাপার, শরীর খারাপ!

টর্চের আলো চোখে পড়ায়, অরু তাকাতে পারছিল না। সে হাতে চোখ আড়াল করে বোঝার চেষ্টা করল, কে তাকে ডাকছে!

তার যে কী হয়েছিল! সে কী বলবে। লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে থাকা ছাড়া তার যেন আর অন্য কোনও উপায় নেই। সার নিজে চলে এসেছেন। এতে সে আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল। সে ঘরে কখন ঢুকে গেছে, কখন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল—শরীরে তার যেন কীসের ঘোর উপস্থিত। চোখ মুখ জ্বালা করছিল, এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আশ্চর্য এক ঝড়ের আভাস। ঝড়ে তাকে বড়ই বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে—সে কিছুটা যেন চৈতন্যও হারিয়েছিল—এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবীতে সে স্বপ্নের বালিহাঁস হয়ে গেছিল। কোনও শিকারের দৃশ্য, সে মজবুত হাতে হাঁসটার ডানা, কিংবা পালক ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে।

লজ্জায় সে কথা বলতে পারছিল না।

কী হয়েছে? শরীর খারাপ অরু?

আজ্ঞে। সে কথা বলতে পারছে না।

ভয় পেয়েছিস?

আজ্ঞে... সে কথা বলতে পারছে না।

ঘরে হারিকেনও জ্বালিসনি!

আজ্ঞে আমি যাচ্ছি সার।

আয়। তোর একা থাকতে ভয় করলে, কারও এ—ঘরে থাকা দরকার। সত্যি তো, তুই থাকিস কী করে। ঠিক আছে, ভুঁইঞ্রামশায়কে বলছি।

আজ্ঞে না সার বলবেন না। আমার একা থাকতে ভয় করে না। আপনি বাবাকে কিছু বলবেন না।

হারিকেন ধরা।

সে চকি থেকে নেমে হারিকেন ধরাল।

এখন তার ধীরে ধীরে সবই মনে পড়ছে। তিথি হারিকেনের চিমনি মুছে তেল ভরে রেখে গেছে। দরকারে সে জ্বালিয়ে নেয়। নিবিয়ে দেয়। আজ ঘরে ঢুকে কিছুই মনে ছিল না। শরীরে ঘোর উপস্থিত হলে এমনই বুঝি হয়—সে তার দ্বিতীয় সত্তা আবিষ্কার করে কেমন নির্বোধ হয়ে গেছে আজ।

সে খুবই ধীর পায়ে বই খাতা নিয়ে ঘর থেকে বের হবার আগে আলো কমিয়ে দিল হারিকেনের। তারপর দ্বিজপদ সারের পিছনে প্রায় চোরের মতো হেঁটে যেতে থাকল। তার মনেই থাকল না, তুলি তার পুতুলের বিয়েতে খেতে বলেছে। বড়লোকের মেয়ে তুলি, তার পুতুলের বিয়ে—সেখানে একমাত্র নিমন্ত্রিত অতিথি বোধহয় সেই ছিল। কারণ সকালে তিথির গালিগালাজে প্রায় ভূত ভেগে যাওয়ার মতো অবস্থা। তুমি কী

অরুদা! ছোড়দি কত আশা নিয়ে বসেছিল, তোমাকে সে সামনে বসিয়ে লুচি পায়েস খাওয়াবে। তুমি পাত্তাই দিলে না। ভুঁইঞাকাকার সঙ্গে রান্নাবাড়িতে খেতে ঢুকে গেলে! তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

অরু খেপে গিয়ে বলল, আমার কপালে না তোর কপালে!

বারে, আমার কী দোষ!

হরিশবাবুকে ছোটপিসির চিরকুট গোপনে পাচার করিস, ওটা বুঝি দোষ না।

তুমি অরুদা নিষ্ঠুর। জানো, ছোটপিসি বালবিধবা?

জানব না কেন? তাই বলে তোকে দিয়ে চিঠি পাচার করাবে! জানতে পারলে তোর কী হবে জানিস?

কী হবে?

অন্দর থেকে তোকে বাবুরা তাড়াবে।

জানবেই না, জানতে দেবই না। তুমি ছাড়া আর কেউ যে জানে না।

চিঠিতে কী লেখা থাকে জানিস?

হ্যাঁ, জানি।

বড় অকপটে তিথি স্বীকার করে ফেলল।

কী লেখা থাকে বল তো!

স্বপ্নের কথা লেখা থাকে। জানো স্বপ্নের কথা পড়তে নেই, পড়লে অভিশাপে পাথর হয়ে যেতে হয়। আমি পাথর হয়ে যাই, তুমি কি চাও?

তারপর তিথি আর দাঁড়াল না। সুপারিবাগান পার হয়ে নদীর চড়ায় কাশবনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কেন যে গেল! তিথি কী চায়! সে কিছুটা দৌড়ে গিয়েও ফিরে এল। তার সাহস নেই। তিথির সঙ্গে নদীর চরে কাশের জঙ্গলে হারিয়ে গেলে বড় পাপ কাজ হবে। সে ধীরে ধীরে কাছারিবাড়িতে উঠে গেল।

ছয়

তারপর এ—দেশে ঋতু পরিবর্তনের পালা শুরু হল। চৈত্রমাসে নদীর চর যতদূর দেখা যায় ধুধু করছে। ফুটি তরমুজের চাষ সর্বত্র। হাওয়ায় ধূলিকণা ওড়াওড়ি করছে। গাছপালা সব গৈরিক রঙ ধারণ করছে। স্টিমার আসে না নদীতে। জল শুকিয়ে গেলে যা হয়। শীর্ণ জলধারা নদীর। পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি। তারপরই মেঘ গুরু গুরু—আকাশ মেঘমালায় ভরে যায়। কালবৈশাখীর ঝড়ে গাছের ডালপালা সব তোলপাড় হয়। আমবাগানে তিথি প্রায় সব সময় পড়ে থাকে। ঝোড়ো হাওয়ায় আম পড়লে মেয়েটা ত্বরিতে ছুটে আসে। আম কুড়িয়ে নেওয়ার এই মোহ থেকে অরণি বাদ যায় না। গাছ থেকে ঝুড়ি ভর্তি আম পেড়ে হরমোহন ভেতরে বাড়িতে দিয়ে আসে।

আজকাল অরণি যতটা পারে তুলিকে এড়িয়ে চলে। আমবাগানে তুলিও আসে। তার সঙ্গে বীণা পিসি। তুলি এসেই আর আগের মতো লাফায় না। কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির হয়ে গেছে। অরণির তেজ তার সহ্য হয় না। অরণি তার পুতুলের বিয়েতে না খাওয়ায় ক্ষোভও কম না তার। সে সুযোগ খুঁজতে পারে।

—ধিঙ্গি হচ্ছিস দিন দিন—তোর কি না পুতুলের বিয়ে! এজন্য তুলি আমবাগানে কিংবা কাছারিবাড়ির আশপাশে বের হয়ে এলেই সে এক দৌড়ে বিশুদার ঘরে ঢুকে যায়। যেহেতু বিকেলবেলায় স্কুল থেকে ফিরে, কোনও খেলাধুলোর ব্যবস্থা থাকে না, ইচ্ছে করলে স্কুলের মাঠেও যাওয়া যায় না—ফুটবল খেলা আপাতত বন্ধ, বিশুদার ঘরে গেলে ক্যারাম পেটাতে পারে। তুলি সেখানে বড় যায় না। ছুটির দিনেই হয় মুশকিল, সারাটা দিন একা একা সে যে কী করে! তিথি তাকে গোপনে পাহারা দেয়, কারণ সে কাছারিবাড়ি থেকে বের হলেই টের পায় তিথি কোথাও না কোথাও দাঁড়িয়ে আছে।

এক সকালে জগদীশ নদীর ঘাট থেকে প্রাতঃস্নান সেরে ফিরে এসে দেখলেন, অরণি খুবই মনোযোগ সহকারে অঙ্ক করে যাচ্ছে। অরণিকে বলা দরকার। চার—পাঁচদিনের জন্য তাঁকে শহরে যেতে হবে। ত্রিশ ক্রোশ রাস্তা, কিছুটা নৌকায়, কিছুটা হাঁটাপথে যেতে হবে। যেতে আসতেই প্রায় দুদিন কাবার। অরণিকে

একা থাকতে হবে রাতে। তবে তিনি গোরাচাঁদকে বলে ব্যবস্থা করে গেছেন, গোরাচাঁদের মেয়ে তিথি রাতে তার ঘরে শোবে। অরণি কিছুই জানে না। মামলা—মোকদ্দমার ব্যাপার, উকিল—মুক্তার তাঁকে ছুটি না দিলে তিনি ফিরতে পারবেন না। বলি বলি করেও বলা হয়নি। এই মুহূর্তে না বললেও চলে না। কারণ আজই পুঁটুলিতে চিড়াগুড় বেঁধে তাঁকে রওনা হতে হবে।

তিনি তাঁর ভিজা গামছা দড়িতে মেলে দেওয়ার সময় বললেন, আমি আজ থাকছি না। বুলতা, কালীগঞ্জ হয়ে রাতে রাতে ধামগড় পৌঁছাব। সেখানে আমার রাত্রিবাস। সকালে উঠে আবার রওনা হতে হবে। কবে ফিরতে পারব জানি না, তবে চার—পাঁচদিনের আগে কাজ উদ্ধার হবে বলে মনে হয় না। তুমি সাবধানে থেকো। রাতে তিথি এ ঘরে শোবে। চিন্তা করবে না।

অরণি আগেই জানে, বাবা না থাকলে তিথি তার ঘরে রাতে শোবে। বাবাই তাকে কবে যেন বলেছিলেন। তখন অবশ্য তিথির থাকা নিয়ে তার কোনও সঙ্কোচ ছিল না। তবে ঋতুর রঙ বদলে গেলে বয়স যে এক জায়গায় থাকে না, শরীর এবং মন দুই—ই বিদ্রোহ করে। তিথি থাকবে শুনে, তিথিকে অবশ্য পরে বুঝিয়ে বললে হয়—দ্যাখ তিথি আমার ঘরে তোর থাকার কোনও দরকার নেই। বাবা সেকেলে মানুষ, সব সময় আমার কিছু বিপদ না হয়, এমন ভাবে। আমি একাই শুতে পারব। বিছানা করে দিয়ে তুই চলে যা, এইসব যখন ভাবছিল তখনই বাবা বললেন, সাঁজ লাগলে একা এই ঘরে তোমার না থাকাই ভালো। সেদিন কী হয়েছিল জানি না, দ্বিজপদও বললেন, ছেলেমানুষ, এমন পরিত্যক্ত আবাসে একা থাকলে ভয় পেতেই পারে। ভয়ে সে মূর্ছা গিয়েছে, দ্বিজপদ সার নিজের চোখে দেখেছেন, এভাবেই সব চাউর হয়ে যায়। সে যতই সেদিন স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করুক, দ্বিজপদ সারের অমোঘ কথা বাবা বিশ্বাস না করে পারেন না। নিজেকে গোপন করার জন্য সেদিন সে চাদরে শরীর ঢেকেও নিয়েছিল। কেউ গায়ে চাদর জড়িয়ে কি মূর্ছা যায়! দ্বিজপদ সার কেন যে বলতে গেলেন! শুধু বাবাকেই না, মনে হয় বাবুদের বাড়ির সবার কাছেই প্রচার হয়ে গেছে, অরণি অন্ধকারে তক্তপোশে পড়েছিল, কোনও হুঁশ ছিল না!

কী যে বিপদ—সে বলল, হরমোহনদাদু থাকলে হয় না!

সেও তো আমার সঙ্গে যাচ্ছে। তিথি শুলে কি তোমার আপত্তির কিছু আছে!

আপত্তির কথা বলার অর্থই সে সব বুঝতে শিখে গেছে। এই বুঝতে পারাটা এই বয়সে কত বড় অপরাধ গুরুজনদের কাছে সে বোঝে।

সে বলল, না না আপত্তির কী আছে? তবে কেউ না শুলেও আমার অসুবিধা হবে না। আমার জন্য আবার তিথিকে বিরক্ত করা...

সে বিরক্ত হয় না। তার এই সুন্দর স্বভাবের জন্যই সে জীবনে সুখী হবে। একবার তার কাজকাম বন্ধ করে দিয়ে তো বুঝেছিলে, কী অনর্থ ঘটতে পারে!

বাবা সকাল সকাল রওনা হয়ে গেলেন। হরমোহনদাদু মাথায় ফেট্টি বেঁধে পেছনে রওনা হল। কাঁধে লম্বা বেতের লাঠি। মাথায় একটা পুঁটুলি। বাবা ক্যাম্বিসের জুতো পরে হাঁটুর সামান্য নিচে কোঁচা লুটিয়ে দুগগা দুগগা বলতে বলতে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। সিঁড়ি ধরে নামার সময় বলেছিলেন রোদে ঘুরে বেড়াবে না, নদীতে চান করতে গেলে দু ডুব দিয়ে উঠে আসবে। জলে পড়ে থাকবে না। এ সময়টা দেবী ওলাওঠার আবির্ভাব হয়, নদীর জল না খাওয়াই ভালো। গুটি বসন্তের কাল, রোদের তেজ প্রখর, ঝোড়ো হাওয়ায় বেশি ঘুরে বেড়াবে না। হাওয়ার সঙ্গে গুটি বসন্তের জীবাণু উড়ে বেড়ায়।

তারপর বাবা বলেছিলেন, ঋতুটির রঙ বড়ই অগ্নিবর্ণ। ওলাওঠায় চরের মানুষজন সাফ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিষেধকের কোনও ব্যবস্থা নেই। চৌকির নিচে নিমের ডাল রেখে দেবে রোজ। এতে কিছুটা প্রতিষেধকের কাজ করবে।

এটা ঠিক, এই ঋতুটির আবির্ভাবের সঙ্গে বাবা রোজ কিছু নিমপাতা বালিশের নিচে রেখে দেন। কখনও নিমের ডাল এনে চকির নিচে ঢুকিয়ে রাখেন। রান্নাবাড়িতে কচি নিমবেগুনের ব্যবস্থা হয়। টিউকল কিংবা

ইঁদারার জল ছাড়া পানীয় জলের ব্যবহার থাকে না। নদীর জল কিংবা পুকুরের জল যে খাওয়া হয় না তাও নয়। তবে ফুটিয়ে। তার জন্য বাবার দুশ্চিন্তার যে শেষ থাকে না, এইসব বাধা নিষেধে সে ভালোই টের পায়। চরে কিংবা নদীর পাড়ে ছুটতে ছুটতে তেষ্টা পেলে নদী থেকে গণ্ডূষ করে সে কেন, সবাই জল তুলে খায়। বর্ষায় কিংবা শীতে খাওয়া গেলেও এ—সময়টায় খাওয়া একেবারেই অনুচিত, বের হওয়ার আগে পই পই করে মনে করিয়ে দিয়ে গেছেন।

বাবা বের হয়ে গেলে সেও কিছুটা হেঁটে গেল। নদীর পাড় পর্যন্ত সে গেল। নদীতে নৌকা লেগে আছে। চরের ওপর দিয়ে অনেকটা রাস্তা হেঁটে গিয়ে বাবা নৌকায় উঠে পড়লেন। কালীগঞ্জ পর্যন্ত যাওয়া যাবে। তারপর আর নৌকা যাবে না। বর্ষা না নামলে নদী নাব্য হয়ে উঠবে না।

যতক্ষণ বাবার ছই দেওয়া নৌকাটি দেখা যাচ্ছিল, অরণি পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এত নিরিবিলি এই ঘাট যে কাকপক্ষী উড়ে গেলেও ডানার শব্দ পাওয়া যায়। আজ ছুটির দিন বলেই সে বেশি একা। স্কুলে গেলে সময় কোথা দিয়ে কেটে যায় এবং বিকেলে তারা সবাই মিলে হইহই করতে করতে স্কুল থেকে একসঙ্গে ফেরে। গাছে ফলপাকুড়েরও অভাব থাকে না। লটকন ফলের গুচ্ছ সহজেই লাফিয়ে গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া যায় কিংবা মজাখালের পাড় ধরে ফিরলে কার্তিক অঘ্রাণে সহজেই বেতঝোপে বেথুনফলের খোঁজে ঢুকে যাওয়া যায়। ছুটির দিনটি এমনিতেই তার কাটতে চায় না, আজ বাবা না থাকায় কেমন বিমর্ষ লাগছে —কিছুটা নিরুপায় যেন সে! আর তখনই কোনও জঙ্গলে বসে তিথি 'কু' দিচ্ছে।

তিথি না অন্য কেউ! তবে কেন যে মনে হল তিথি ছাড়া তার সঙ্গে মজা করার সাহস কারও নেই। ডানদিকের সড়ক পার হয়ে গেলে জেলে পাড়া, তার বয়সি ছেলেছোকরার অভাব নেই। তার বয়সি মেয়েও অনেক। তবে ভুঁইঞামশায়ের পুত্র বলেই তাকে যথেষ্ট সমীহ করে। কেউ কেউ তার সঙ্গে আপনি—আজ্ঞে করে— সুতরাং চরের কাশবন থেকে যেই তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করুক, সে পাত্তা দেবে না। তার মন ভালো নেই। কাছারিবাড়িতে ফিরে যেতেও ভালো লাগছে না। গরমও পড়েছে। বেলাও বিশেষ হয়নি, অথচ মনে হচ্ছে হাওয়ায় আগুনের ভাপ ছড়াচ্ছে। নদীর জলে ডুবে থাকলে এ সময় বেশ আরাম পাওয়া যায়।

সে নদীর চর ধরে দৌড়ে যেতে থাকল।

তখনই মনে হল ঝুপ করে কেউ জঙ্গলে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে ফিরেও তাকাল না। কারণ তিথি যদি সত্যি হয়, তবে এই পেছনে লেগে থাকা তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে।

সে জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নদীর জলে সকাল সকাল মানুষের ভিড় থাকলেও বেলা বাড়লে ভিড় কমে যায়। প্রায় লু বইবার মতো অবস্থা। নদীর ওপারের ঘাটে কেউ কাঠ কাটছে, নদীতে এদিক—ওদিক নৌকা পড়ে আছে ঠিক, তবে মাঝিমাল্লাদের দেখা যাচ্ছে না। কাঠ কাটার শব্দ নদীর পাড়ে বড় বেশি আওয়াজ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। জলে ডুব দিয়েও সেই আওয়াজ শোনার সময় মনে হল তার পা কিছুতে জড়িয়ে ধরেছে।

জল এদিকটায় এখন গভীর। সে ভোঁস করে ভেসে উঠল। তীর থেকে বেশ দূরেই সে চলে এসেছে। ঘাট থেকে মানুষজন ডুব দিয়ে উঠে যাচ্ছে, তার পায়ে কে যে জড়াজড়ি করে সরে গেল, সে ভোঁস করে ভেসে উঠেও কিছু দেখতে পেল না। তারপরই মনে হল পাশেই কেউ আছে—তার দিকে জল ছিটাচ্ছে। তিথি ছাড়া আর কারও যে সাহস হবে না তাও সে জানে।

সে দেখবে না। তিথি যাকে সে এড়িয়ে চলতে চায়, সেই তাকে নিষ্কৃতি দিচ্ছে না।

সে যে কত অসহায়, বাবা যেন তিথিকে রাতে তার ঘরে শুতে বলে আরও বেশি করে বুঝিয়ে দিয়ে গেল। মেয়েটার উপদ্রবে শেষে সে কি অস্থির হয়ে উঠবে!

সে তিথিকে অনায়াসে তেড়ে যেতে পারত। তিথি যতই ভালো সাঁতার জানুক, সে ইচ্ছা করলে তিথিকে গিয়ে অনায়াসে ধরে ফেলতে পারে। ডুবসাঁতারে চিতসাঁতারে সেও কম দক্ষ নয়, কিন্তু তার ইচ্ছেই করছে না

তিথির দিকে তাকাতে। বাবা তিথিকে রাতে তার ঘরে শুতে না বললেই পারতেন। তারা যে বড় হয়ে গেছে বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

সে যে তিথির ওপর খুবই ক্ষুব্ধ।

তিথি অন্তত বুঝুক কাছারিবাড়িতে তার রাতে থাকা সে পছন্দ করছে না। তিথিটা বোকা না পাগল তাও সে বোঝে না। তাছাড়া সেও কম অসহায় নয়, তিথিকে সে বারণ করে দিতে পারে, বেরও করে দিতে পারে ঘর থেকে, কিন্তু নিঝুম রাতে পাখিরা কলরব করলে, কিংবা কীটপতঙ্গের আওয়াজও উঠতে পারে, হাওয়ায় টিনের চালে ডালপালার ঘর্ষণের বিদঘুটে আওয়াজ, একা ঘরে শুয়ে খুবই উপদ্রবের শামিল সে বোঝে। আর রাতে ঝড়বৃষ্টি হলে সে যে খুবই ফাঁপরে পড়ে যাবে। শুয়ে থাকলে, কড়িবরগায় ফেলে রাখা মুলিবাঁশের ছাদে ধস্তাধস্তি যদি শুরু হয়, রাতে অশুভ আত্মারাও তাকে একা পেয়ে নানা তামাশায় মত্ত হতে পারে—এইসব চিন্তাতেই তিথিকে সে ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছে না। তিথি ইচ্ছে করলে রাজি নাও হতে পারত, বাবা তবে আর কারওকে বলে যেতেন। কিন্তু তিথি যে এক পায়ে খাড়া। বাবাও বোঝেন না, তিথিও তুলির মতো বড় হয়ে গেছে। এবং তার ভেতর নিজের শরীর নিয়ে এক গোপন অভিমান গড়ে উঠছে—তার মূর্ছা যাওয়ার কথাও একরকম যেন জোর করেই চাপানো—এতে আর কারও সুবিধা না হোক, তিথির খুবই সুবিধা হয়েছে। যেন সে নিজের অধিকারেই তাকে পাহারা দেওয়ার অধিকার পেয়ে গেছে।

সে তিথিকে কিছু বলছে না।

তার দিকে জলের ঢেউ তুলে দিচ্ছে তিথি।

তাকে ডাকছে, অরুদা চলো সামনে যাই। তুমি কতটা দূরে যেতে পারো দেখি। চলো নদী পার হয়ে ওপাড়ে উঠি।

সে তীরের দিকে উঠে যাচ্ছে। তিথির কথায় সাড়া দিচ্ছে না।

তিথি তার পিছু নিয়েছে।

এই অরুদা উঠে যাচ্ছ কেন? আমি তোমাকে কিছু বলেছি?

অরণি ভ্রূক্ষেপ করছে না। তার মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে আছে।

এই অরুদা ঠিক আছে, আর জল ছিটাব না। তুমি ডুবে মাটি তুলতে পারবে? আমি পারি,দেখবে?

অরণি ঘাটের কাছে, যেখানে কাদামাটি এবং খুবই পিছল, পা টিপে টিপে এগোচ্ছে।

তিথি মানবে কেন?

সে লাফিয়ে জল থেকে উঠে অরণির কাছে গিয়ে হাত চেপে ধরল। তিথি তাকে জলে নিয়ে নামবেই। তিথি তাকে জল থেকে উঠতে দেবে না। সে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। জোরাজুরি করলে তিথি জলে কাদায় আছাড় খেয়ে পড়ে যেতে পারে। না করেও উপায় নেই, সে এক ধাক্কায় তিথিকে সরিয়ে এগিয়ে যেতেই দেখল তিথি পড়ে গেছে চিত হয়ে। পড়ে গিয়ে সড়াৎ করে নদীর ঢালুতে পিছলে গেছে।

তিথির ফ্রক কোমরের উপরে উঠে যাওয়ায় সে পুরোদস্তুর বেকুব। তিথি ইজের পরেনি। শুধু ফ্রক গায়ে জলে নেমে এসেছে। সে লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ছি! সে এটা কী করল! খুবই অপরাধ তার। তিথির কাছে ক্ষমা চাওয়ারও সে অযোগ্য। সে জানবে কী করে তিথি ইজের না পরেই জলে নেমে এসেছে। তার শরীর রোমাঞ্চিত, আবার অপরাধবোধও আছে, সে তিথির দিকে আর তাকাতে পারছে না। ভাগ্যিস ঘাটে কিংবা নদীর পাড়ে কাছাকাছি কেউ নেই!

তিথির দিকে সে ফিরে তাকাতেও পারছে না।

তিথি এখন কী করছে তাও সে জানে না।

তিথি যদি দেবী দুর্গার মতো জলের কিনারে একইভাবে পড়ে থাকে, তবে আর যাই হোক, তাকানো যায় না। সে নিদারুণ সঙ্কটে পড়ে গেল। কাছে যেতেও পারছে না। হাত ধরে তুলে দিয়ে বলতে পারছে না, ওঠ তিথি। তোর লাগেনি তো!

তিথি কোনওরকমে ততক্ষণে উঠে বসেছে। ফ্রক দিয়ে হাঁটু, শরীর সব দ্রুত ঢেকে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে!

সে খুবই কাতর গলায় বলল, ওঠ। আর ফেলব না। আমি কি জানি তুই পড়ে যাবি! ধাক্কা দেব কেন!

তিথি ছাড়ার পাত্র নয়। সে বলল, আমার সব তুমি দেখে ফেললে কেন? বলো কেন দেখে ফেললে!

না, আমি তোর কিছু দেখিনি বলতে পারত। কিন্তু বড় মিছে কথা হবে। সে সবই দেখেছে, এমনকি সবুজ নিথর প্রান্তরটিও। এত কুহক, এই শরীরে, সে চোখ ফেরাতে পারছে না, নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। যেন প্রকৃতি আর শরীরের এক অসীম অনন্ত লীলারহস্যের যুগপৎ খেলায় সে অস্থির হয়ে উঠছে। প্রকৃতি তার বাহু মেলে দিয়েছে তিথির শরীরে।

তিথির কাছে এখন যাওয়া যায়। তিথি সব ঢেকে হাঁটুর কাছে ফ্রক টেনে কাদার মধ্যেই লেপটে বসে আছে। সে উঠছে না।

অরণি হাত ধরে না ওঠালে, সে যেন উঠবে না।

সে কাছে গিয়ে বলল, ওঠ। বাড়ি যাব।

তিথির চোখে জল। তিথি কোনও জবাব দিচ্ছে না।

অরণি কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

তিথির সবকিছু সে দেখে ফেলে কেমন কিছুটা মুহ্যমান। সে কাছেও যেতে সাহস পাচ্ছে না। তিথির রোষ শেষ পর্যন্ত কীভাবে ফুটে বের হবে, সেই আতঙ্কেই সে অস্থির।

তিথি ওঠ। আমি কী জানি তুই পড়ে যাবি। আমার কী দোষ বল? তুই কাঁদছিস কেন তাও বুঝছি না। আমি ইচ্ছে করেও তোকে ফেলে দিইনি!

তিথি সহসা লাফিয়ে তার জামা খামচে ধরল। আঁচড়ে খামচে দিচ্ছে।

কেন তুমি আমার সব দেখে ফেললে! আমার আর কী থাকল!

অরণি হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

এই আমার লাগছে তিথি। তুই কী করছিস বল তো।

লাগুক। একশোবার লাগবে। তুমি আমার সঙ্গে কখনও আর কথা বলবে না।

ঠিক আছে, বলব না। চল এবার।

আমি তোমাকে মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়াও।

এবারে সত্যি ভয় পেয়ে গেল অরণি। তিথি কি তুলিকে সব বলে দেবে! মেয়েদের কত গোপন কথা থাকে। তুলির সঙ্গে যে এত ভাব, সেই গোপন কথার সুবাদে। সে বাবুদের বাড়িতে থাকে। বাবা তার বাবুদের আমলা। বাবুদের মেয়ে তুলির হাতে এভাবে অস্ত্র তুলে দিলে সে যে খুবই বিপদে পড়ে যাবে। এখন তিথিকে বশে না আনতে পারলে সত্যি কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। সেই সবুজ নিঃসঙ্গ প্রান্তরটি কিছুতেই চোখ থেকে তার সরছে না। তিথির সব মাহাত্ম্য সবুজ প্রান্তরে সে গোপন করে রেখেছিল। তাই যদি কেউ দেখে ফেলে তবে আর তিথির ইজ্জত থাকে কী করে!

সে ভারী বিষণ্ণ হয়ে গেল।

গরমের তাপে তার জামাপ্যান্ট শুকিয়ে যাচ্ছে। তার হাফপ্যান্টের নিচে কাদা লেগে আছে। হাতে—পায়ে কাদা। তিথি তাকে কাদায় মাখামাখি করে দিয়েছে আঁচড়ে খামচে দেওয়ার সময়।

সে সোজা জলে নেমে আবার ডুব দিল—নদীর জল এত ঠান্ডা হয়ে আছে নিচে যে উঠতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তিথির সামনে তার দাঁড়াবার আর সাহস নেই। সে জল থেকে উঠে সোজা দৌড়াতে থাকল। যা হয় হবে। কিন্তু তিথি রাতে আসবে। তখন যদি সে কিছু করে বসে। তার তো আর ইজ্জত ধর্ম কিছু নেই। বাবুদের বাড়ির এঁটোকাঁটা খেয়ে বড় হয়ে উঠেছে যে তিথি, তারও যে এত ইজ্জতবোধ জানবে কী করে!

সে কিছু করেই বসতে পারে।

কিছুটা এসেই মনে হল এভাবে তিথিকে একা ফেলে চলে যাওয়া বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। নদীর চর এখন সামনে পেছনে। নদীর পাড় ধরে ইতস্তত দু—একজন চাষী কিংবা ব্যাপারী মানুষ বাজারের দিকে যাচ্ছে। কোথাও আজ হয়তো হাটবার আছে, চরের পাশে কিছু নৌকায় আনাজ তরকারি উঠছে। কেউ নেমে যাওয়ার সময় বলল, অরুবাবু যে! এত রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! গরমে কাহিল হয়ে পড়েছেন দেখছি। মুখ রোদে পুড়ে গেছে। ভুঁইঞামশায় কবে ফিরবেন!

সে বলল, জানি না।

সে মরছে তার আতান্তরে।

কারণ আরও দূরে সেই মেয়েটি কী করছে, দেখারই বেশি বাসনা তার।

তিথি জলে নেমে গেল, ডুবও দিল, তারপর পাড়ে উঠে দৌড়াতে থাকল তার পিছু পিছু।

যাক, মাথা ঠান্ডা হয়েছে।

সে দাঁড়িয়ে গেল।

তিথিও দাঁড়িয়ে গেল।

বোধহয় তিথি তার সঙ্গে ফিরতে চায় না।

সে আবার দাঁড়াল। তিথিও দাঁড়িয়ে গেল।

তিথি কি তাকে মুখ দেখাতে লজ্জা পায়! এতবড় অঘটনের পরে তিথিরও দোষ দেওয়া যায় না। মাথা ঠান্ডা হওয়ায় তার লজ্জায় পড়ে গেছে।

সে আবার হাঁটতে থাকল।

তিথিকে সঙ্গে না নিয়ে ফিরলে, আবার কোথায় কী করে বসবে, তিথিও তাকে যথেষ্ট নির্যাতন করেছে, তিথির মধ্যে প্রবল ক্ষোভ ছিল, এখন মাথা ঠান্ডা হওয়ায় সে নানা ফন্দিও আঁটতে পারে। সে তো তাকে ডাকেনি। ওই যে দোষ তিথির, সব সময় নজর রাখা, কখন সে ঠিক দেখেছে অরুদা নদীর পাড়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। বড় বড় সব কড়ুই গাছের নিচ দিয়ে অরুদা তার বাবার পিছু পিছু ঘাটের দিকে যাচ্ছে। তিথি এইসব ভেবেই সুপারিবাগান থেকে বের হয়ে পড়েছিল বোধহয়। তারপর তাকে জলে নেমে যেতে দেখে লোভ আর সামলাতে পারেনি।

কিন্তু তিথির পরনে ইজের ছিল না। তিথির বাবা খুবই গরিব। দস্যি মেয়ের প্যান্ট কিনে দিলেও দু—এক মাসে সেলাই খুলে যায় বোধহয়, ফেঁসেও যেতে পারে। তিথি সেমিজের মতো মার্কিন কাপড়ের ঢোলা জামা গায়ে দিয়ে থাকে—ঝুল আছে অনেকটা, হাঁটুর অনেক নিচে সেমিজ ঝুলে থাকে—তার কি ইজের পরার অভ্যাস নেই! কারণ তার শরীর ঢাকাই থাকে। ইজের না পরলেও চলে যায়, গরিব হওয়ার জন্য তিথি এমন ভাবতেই পারে। বাপের কাছে বারবার ইজের চাইতেও তার সম্ভবত লজ্জাবোধ হয়। সে তো কিছু চাইতেই জানে না। দয়া করে যে যা দেয় তাতেই খুশি মেয়েটা।

তাহলে তিথি তার ঘরে আসে ইজের না পরেই। সে জল তুলে রাখে, ঘরদোর ঝাঁট দেয় ইজের না পরেই। তার কাছে এটা বোধহয় বেআব্রু মনেই হয় না। এত গরিব হলে চলে!

এবং এসব মনে হতেই তিথির জন্য কেমন এক কান্না ভেতরে গোল গোল দলা পাকিয়ে গলার কাছে থমকে গেল।

সে আবার দাঁড়াল। এখান থেকে দূরের প্রাসাদ সব দেখা যায়। কার্নিসের মাথায় পরী উড়ছে। উঁচু লোহার রেলিং দিয়ে বাগান মাঠ এবং পুকুর সব ঘেরা। বৈভব এত চারপাশে, আর তিথি একটা ইজেরের কার্পণ্য করে গরিব বাপের টাকা বাঁচায়।

অরণি আবার পেছন ফিরে তাকাল।

তার কেন যে মনে হল এই অভাগা মেয়েটাকে ফেলে চলে যাওয়া কোনও কারণেই উচিত হবে না।

কিন্তু যা হয়।

তিথিও দাঁড়িয়ে গেছে।

সে আর পারল না। তিথিকে ধরার জন্য এবার সে নিজেই দৌড়াতে লাগল।

বৈশাখের খরতপ্ত বালিরাশিতে দু'জনেই নেমে গেল। কিন্তু তিথির নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। তিথি যে কত বন্য হয়ে উঠতে পারে চরের এই বালিরাশি মাড়িয়ে না গেলে টের পেত না। তার পায়ে ছ্যাঁকা লাগছে। কিছুটা গিয়েই সে আর এগোতে সাহস পেল না। তরমুজের জমিতে উঠে তরমুজের লতাপাতার ওপর দাঁড়িয়ে গেল।

তিথি কিন্তু দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

সে খুবই অসহায় বোধ করতে থাকল।

তিথি কোথায় যাচ্ছে! কাকে ডাকবে! কাছারিবাড়ি উঠে গিয়ে কমলদা কিংবা বিশুদাকে খবর দিতে পারে। সে আর তাদের নাম ধরে ডাকে না। কমল অমল বিশুরা তার কাছে সোনাদা, সেজদা, ছোড়দা হয়ে গেছে। সোনাদাকে তিথি ভয় পায়। একদিন কী কারণে সোনাদা তিথির কানও মলে দিয়েছিল। তিথি মাথা নিচু করে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে, কিন্তু সোনাদা কানও মলে দিয়েছে বলে কাউকে নালিশ করেনি। তিথিও তার কাজের জন্য বাবুর বাড়ির সবার কাছে প্রিয়। শুধু প্রিয় না, বিশ্বস্তও। ছোটপিসির চিরকুট সে হরিশবাবুকে গোপনে পৌঁছে দেয়। শুধু সেই খবরটা রাখে। তিথি কখনও চিরকুটটি তার হাতে দেয়নি, পড়তেও দেয়নি। ছোটপিসি বালবিধবা। তার যে কত কষ্ট তিথিই বোধহয় একমাত্র টের পেয়েছে। তবু একদিন তিথিকে না বলে পারেনি, চিরকুটে কী লেখা থাকে জানিস?

তিথি সরল বিশ্বাসে বলেছিল, স্বপ্নের কথা লেখা থাকে। ও চিঠি পড়তে হয় না। পড়লে পাথর হয়ে যেতে হয়।

তিথিও কি কোনও স্বপ্নের চিঠি নিয়ে ছুটছে! সে কাছে থাকলে জোরজার করে পড়ে ফেলতে পারে ভয়েই কি ছুটছে! পড়লে সে পাথর হয়ে যেতে পারে—সে পাথর না হয়ে যায়, কারণ সে যে তার সবকিছু দেখে ফেলেছে। অরুদা পাথর হয়ে গেলে সে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে!

অরণি বুঝতে পারে নদীর চরায় তিথি ক্রমে বিন্দু থেকে বিন্দুবৎ হয়ে যাচ্ছে। সব আজগুবি চিন্তায় সে মাথা ঠিক রাখতে পারছে না।

তিথি শেষে কিছু করে বসবে না তো!

এখুনি বাড়িতে গিয়ে খবর না দিলেই নয়।

কারণ নদীর পাড়ে তিথি অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেখানে কি কোনও অরণ্য আছে, অথবা কোনও স্পৃহা থেকে, এমনকি তাকে লোভে ফেলে দেওয়ার জন্যও যে ছুটছিল না তারই বা ঠিক কি!

কিছুক্ষণ সে তরমুজের জমিতে দাঁড়িয়ে থাকল।

চাষি মানুষটি পাতার আড়াল থেকে উঠে বলল, আপনি বাড়ি যান বাবু। তিথির জন্য ভাববেন না। ও এরকমেরই। চাষি মানুষটি তো জানে না, আজ নদীর পাড়ে বড় অঘটন ঘটে গেছে তাদের। তিথি তার মুখ কাউকে আর বোধহয় দেখাতে চায় না।

সে বড়ই অস্থির হয়ে উঠছে।

তার পা চলছে না। একবার একটা গাছের গুঁড়িতে ধপাস করে বসেও পড়ল।

তিথি নেই, উত্তপ্ত বালির চড়া ডিঙিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তিথি।

কেন গেল?

কী হয়েছিল!

তখন সে কী বলবে?

তাকে মিছে কথা বলতে হবে।

এই করে সে যখন কাছারিবাড়ি পৌঁছাল—সবাই ছুটে এসেছে।

এই তুই কোথায় গেছিলি! কত বেলা হয়েছে, খাবি না! রান্নাবাড়িতে মা বারবার খোঁজ নিচ্ছে, তুই কোথায়! সে তো খেতে এল না!

তার খাওয়ার ইচ্ছা নেই। রোদে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত। চুল উসকোখুসকো। চোখ জবাফুলের মতো লাল। তিথি যে কোথায় চলে গেল, প্রায় কেঁদেই ফেলত—আর তখনই তিথি সুন্দর একটি ফ্রক গায়ে তুলির সঙ্গে হাজির। তুলির কাছ থেকে পাউডার চেয়ে নিয়ে মুখে পর্যন্ত মেখেছে।

তার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল যেন।

তিথির সঙ্গে একটা কথাও বলল না। তুলি তাকে দেখে মুচকি হাসছে। এতে তার রাগ আরও বেড়ে গেল। দৌড়ে সে কাছারিবাড়ির ঘরে ঢুকে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ করে জামাপ্যান্ট ছেড়ে রাখল। তারপর কাচা হাফপ্যান্ট হাফশার্ট গায়ে দিয়ে রান্নাবাড়ির দিকে হাঁটা দিল। সে খায়নি বলে বাবার বউঠান এখনও না খেয়ে আছে।

এই বাড়ির আলাদা যে রুচিবোধ আছে, ভেতরবাড়ি গিয়েই সে টের পেল। সে শুধু খায়নি, আর সবাই খেয়ে নিয়েছে এ বাড়িতে বোধহয় তা হয় না। আসন পাতা আছে পর পর। জলের গেলাস থালা দিয়ে ঢাকা। কাগজিলেবু, নুন, কাচালংকা সাজানো—সে ভেতরবাড়ি ঢুকতেই সোনাদা চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে, বাবু এয়েছেন মা। রোদে কোথায় টো—টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ভুঁইঞাকাকা নেই, তিনিও স্বাধীন। আসুক ভুঁইঞাকাকা, কোথায় যাস!

বাবার বউঠানকে সে জেঠিমা ডাকে। সামান্য স্থূলকায় এবং ফর্সা দেখতে, হাতে চকচক করছে সোনার বালা, পায়ে আলতা, তাঁর বউমাটিও হেঁশেলে অপেক্ষা করছেন, তার জন্য সবারই পাতে বসতে দেরি হয়ে গেল, তিথি কতভাবে যে ভোগাচ্ছে!

জেঠিমা বললেন, কীরে তোর চোখমুখ এত শুকনো কেন! তোর বাবা কাজে বাইরে গেছেন বলে, যেখানে—সেখানে ঘুরে বেড়াবি! কী চিন্তা হচ্ছিল!

তারপর বললেন, বলে যাবি তো! কেউ কিছু বলতে পারল না। তিথিও না।

পা থেকে মাথায় রক্ত উঠে গেল। তিথি এত বেইমান! সারাটা সকাল—দুপুর তাকে ঘুরিয়ে হয়রান করেছেন, সে বলেছে, কিছু জানে না!

তিথির কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে সেই আগের মতো পা ছড়িয়ে বসে আছে রোয়াকে। সেই যে আসন পেতে দিয়েছে, গেলাসে গেলাসে জল ঢেলেছে, এবং থালায় কাগজিলেবু, কাঁচালংকা সাজিয়ে রেখেছে, বসে পড়লেই সবার পাতে পাতে সব সে দেবে—অথচ ঘুণাক্ষরেও জানাল না, সে চরে তরমুজের জমিতে তার জন্য কতক্ষণ যে অপেক্ষা করেছে! নিজে কোথা থেকে কীভাবে যে ঠিক উঠে এসেছে, সে কি একবারও দেখতে পায়নি, কেউ তার জন্য নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে! এত শয়তান মেয়েটা! সে তো রাস্তাঘাট ভালো জানে না। বাবা তাঁর কর্মস্থলে নিয়ে এসেছেন। স্কুলে সেই কবে ভর্তি করে দিয়েছেন। সে একা নদীর পাড় ধরে বেশিদূর হেঁটেও যায় না। ভয়, সে না কোথাও হারিয়ে যায়। নদীর ওদিকটায় সে কখনও যায়ওনি। সে জানবে কী করে, আসলে তিথি দৌড়ে একা উঠে আসার জন্যই তাকে নদীর চরে ফেলে রেখে এসেছে।

গরমে চরাচর যেন হাঁসফাঁস করছে। খাওয়া হয়ে গেলে সে কোনওরকমে মাঠ পার হয়ে শেকল খুলে ঘরে ঢুকে গেল। চকির কাঠ পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে আছে। রোদে এত তেজ যে বাইরে তাকানো যাচ্ছে না। কাকগুলির কর্কশ চিৎকারে কেমন তার মাথা ধরে যাচ্ছে। জানালা খুলে দিয়ে ভেবেছিল, নদী থেকে ঠান্ডা হাওয়া উঠে আসবে। তাও এল না। গরম বাতাসে মুখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। এই ঘরে শুয়ে থাকার অর্থ ভাপে সেদ্ধ হওয়া। কোনও গাছতলায় গিয়ে বসে থাকলেও বোধহয় আরাম পাওয়া যেত। কিন্তু শরীর আর দিচ্ছে না। জামা খুলে বালিশ টেনে শুয়ে পড়তে গিয়ে টের পেল, বালিশ চাদর তোশক সবই তেতে আছে। তার যেন আর নড়ারও ক্ষমতা নেই। সে শুয়ে পড়তেই ঘুমে তলিয়ে গেল।

টিনের ঘর বড় সহজেই গরম হয়ে যায়, আবার ঠান্ডাও হয়ে যায়। ঘুমের মধ্যেই সে টের পেল, তিরতির করে চোরা ঠান্ডা স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মেঘ গর্জনও শুনতে পেল। বাইরে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে কখন, জানালা দিয়ে ছাঁট আসছে, সে ধড়ফড় করে উঠে বসল। জানালা দিয়ে দেখল, গাছের শাখা—প্রশাখা দুলছে। বেশ জারে হাওয়া দিচ্ছে। টিনের চালে বৃষ্টির জলতরঙ্গ আওয়াজ। কখনও ঝমঝম, কখনও রিনরিন। প্রকৃতির চেহারাই পালটে গেছে। তার শীত শীত করছিল। বিছানার চাদর গায়ে জানালার ধারে অঝোরে বৃষ্টির দাপাদাপি দেখার জন্য সে কেমন পাগল হয়ে উঠল। দুরন্ত তিথি তাকে কিছুতেই ছাড়ছে না—কিংবা তুলি। বারবার তাদের চোখ মুখ শরীরের তাজা গন্ধ বৃষ্টির ছাটে মিলেমিশে গোলমাল পাকিয়ে দিচ্ছে।

আর তিথি তখনই একটা ছেঁড়া ছাতা মাথায় পা টিপে টিপে এসে হাজির। তার জল তোলা আছে, হারিকেনে তেল ভরা আছে, চিমনি মুছে তার সাফসোফ করার কাজও আছে। সে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না। কখন থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাও জানে না। মাঠে জল জমে গেছে। জলে কীটপতঙ্গ ভেসে বেড়াচ্ছে, আর বিচিত্র শব্দতরঙ্গ উঠে আসছে—কোথাও জল নেমে যাচ্ছে, কোথাও মাটি পাগলের মতো জল শুষে নিচ্ছে— অজস্র বুড়বুড়ি জলে ভেসে মিলিয়ে যাচ্ছে। পাখপাখালির ওড়াওড়ি বন্ধ—ডালে বসে বৃষ্টির জলে ভিজছে, কখনও পাখা ঝাপটাচ্ছে। তিথি ঘরে কাজ করছে তার, সে তিথির দিকে তাকাচ্ছে না, সেই পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটাই তাকে বারবার তাড়া করছে।

তিথিকে এখন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলে যেন সারা সকাল—দুপুরের প্রতিশোধ নেওয়া যেত—কিংবা তিথিকে বললে হয়, রাতে আমার ঘরে তোকে শুতে হবে না, রাতে তুই আসবি না। এইসব ভাবতে ভাবতেই তিথি কখন যে চলে গেল, কোনও কথা বলল না, সন্ধ্যাও হয়ে গেল।

তিথির পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা কেমন তার মাথার মধ্যে গেঁথে আছে। তাকে তাড়াও করছে। সে কখনও বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছে, কখনও সেই শরীর এক আশ্চর্য সুবাতাস বহন করে আনছে। সে তিথির এই পড়ে যাওয়ার ঘোর থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। কত রাত হয়েছে তাও জানে না। গোলঘরে গিয়েও বসেছিল কিছুক্ষণ। ছুটির দিন বলে দ্বিজপদ সার তাদের পড়াতে আসেননি। সে একটা ছাতা মাথায় বাবার টর্চটি নিয়ে পড়ার ঘরে চলে গিয়েছিল, ঘোর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ ক্যারাম পিটিয়েছে, তারপর রাতের খাওয়া সেরে আবার ঘরে ঢুকে গেছে। তিথি আসেনি।

তিথি এলে কী হবে?

সে দরজা বন্ধ করে দিল।

দূরে শেয়ালেরা ডাকছে। এই বিভীষিকাকে সে গ্রাহ্য করতে চায় না।

তিথি একফাঁকে তার বিছানা করে রেখে গেছে। মশারিও টাঙানো। চকির অন্যপাশে বাবার বিছানা গোটানো। তিথি এসে শোবে কোথায়!

তিথি তার আলাদা বিছানাও পেতে রাখেনি। তিথির সঙ্গে তার একটাও কথা হয়নি আর। সে এই ঘরে শুতে নাও আসতে পারে।

কিছুটা হালকা হয়ে গেল। জানালা খোলা আছে—ঝিরঝিরে বৃষ্টির ক্লান্তি নেই—বর্ষা শুরু হয়ে গেল বোধহয়। জোনাকি জ্বলছে ঝোপে জঙ্গলে—কেমন নিথর হয়ে আছে চরাচর। সে শুয়ে পড়ল।

তিথির কথা ভাবতে ভাবতেই সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। তখনই দরজায় টোকা। খুবই সন্তর্পণে।

সে সাড়া দিল না।

তারপর কড়া নাড়ার শব্দ।

সে পাশ ফিরে শুল।

এই অরুদা দরজা খোল। কী হল রে বাবা! কুম্ভকর্ণের নিদ্রা!

সে নাক ডাকাতে থাকল।

দ্যাখ অরুদা সারাটা দিন, অনেক জ্বালিয়েছ, কিছু বলিনি। মটকা মেরে পড়ে আছো, তুমি মনে করো আমি কিছু বুঝি না। কাকা বারবার বলে গেছে, না হলে তোমার ঘরে শুতে আমার ভারী বয়ে গেছে।

সে যেন সাহস পেয়ে গেল এবার। সে বলল, একা শুতে আমার অসুবিধা হবে না। তুই যা। এত রাতে আর জ্বালাবি না।

জ্বালাব না! কে জ্বালায়? আমি না তুমি! দরজা খোলো বলছি। খোলো বলছি।

তিথি দরজা ধাক্কাতে থাকল।

তিথি চেঁচামেচিও শুরু করে দিতে পারে। এত রাত্রে চিৎকার—চেঁচামেচি কেউ শুনতে পেলে কী ভাববে! অবশ্য ঘরটা মাঠের মধ্যে—জমিদারবাবুদের প্রাসাদও কাছে নয়, যে শোনা যাবেই, তবু যদি কেউ শুনেই ফেলে—সে তাড়াতাড়ি মশারি তুলে চকি থেকে নেমে গেল—হারিকেন উসকে দিল। দরজা খুলে অবাক, কোনওরকমে তালিমারা ছাতায় তিথি তার মাদুর বালিশ বৃষ্টির ছাট থেকে বাঁচিয়ে সিঁড়িতে উঠে এসেছে।

নাও ধরো। বলে বগলের মাদুর বালিশ তাকে দিয়ে ছাতাটা বন্ধ করার আগে বলল, এক ঘটি জল দাও। পায়ে কাদা লেগে আছে।

তিথি যা বলছে, অরু বাধ্য ছেলের মতো সব করে যাচ্ছে। তিথির ফ্রকের নিচে যদি ইজের না থাকে—তার মাথাটা ফের কেমন গোলমালে পড়ে গেল।

সেই এলি!

আসব না কেন?

সে আর কিছু বলল না।

তিথি মেঝেতে মাদুর পেতে তারপর বালিশ ঠেলে দিল ওপরের দিকে। সে আলগা হয়ে মাদুরে বসেছে। গামছা দিয়ে পা মুছল।

তিথি আজ আলতা পরেছে পায়ে।

তিথি তার বোধহয় পুজোর ফ্রক গায়ে দিয়েছে। সুন্দর লতাপাতা আঁকা ফ্রকে তিথির স্তন কিছুটা ভেসে উঠেছে। এই প্রথম তিথিকে সে চুরি করে দেখছে। তিথির দিকে তার এতদিন যেন কোনও নজরই ছিল না। এমনকি নদীর জলে তিথিকে সামান্য তিথি বলেই এত ঝগড়া করতে পেরেছে। তিথি যেন সহসা হাওয়ায় বড় হয়ে গেল তার কাছে—ফ্রকটা যে কিছুটা টাইট তাও বুঝতে পারল। সে যে ঢোলা সেমিজের মতো মার্কিন কাপড়ের ফ্রক পরে থাকে—তার কোনও অন্তর্বাস থাকে না, সে চিত হয়ে পড়ে না গেলে কিছুই টের পেত না। পড়ে গিয়েই তাকে এতটা বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, এই মুহূর্তে তিথিকে দেখে তাও বোঝা গেল।

তিথি মুখে প্রসাধনও করেছে। তুলির কাছ থেকে ইচ্ছে করলে সবই চেয়ে নিতে পারে। চুল দু'বিনুনি করে মাথায় টেনে বেঁধেছে। হাতে পিতলের চুড়ি পরেছে। নাকে নথও ঝিলমিল করে উঠল। কিন্তু তিথির ফ্রকের নিচে যদি ইজের না থাকে!

তিথি এবার তাকাল। কী হল, বসে থাকলে কেন, শুয়ে পড়ো।

তোর মশারি আনলি না? মশারি টাঙিয়ে না শুলে মশা কামড়াবে।

অতীব এক তির্যক চোখে তার দিকে তাকিয়ে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, মশা আমাকে কামড়ায় না।

মশা তোকে কামড়ায় না?

না। কামড়ায় না। বললাম তো।

মশারি না টাঙালে শুতে দেব না।

তুমি শুতে দেওয়ার কে? অযথা ঝগড়া করবে না। মশারি টাঙালে কতটা আর আব্রু থাকবে বলো! যা দেখার দেখে ফেলেছ।

কত সহজে কথাটা বলে ফেলল তিথি! এতবড় নির্লজ্জ কথা বলতে বিন্দুমাত্র আটকাল না তিথির।

সেও তেরিয়া হয়ে উঠল, কী দেখে ফেলেছি! আমি কিছু দেখিনি!

দেখেছ! মিছে কথা বলবে না। মিছেকথা বললে আমার মাথা ঠিক থাকে না। রাত হয়েছে শুয়ে পড়ো। হারিকেন নিভিয়ে দিচ্ছি।

না, নেভাবি না।

আলো থাকলে আমার ঘুম হয় না।

তাহলে জেগে শুয়ে থাক।

সেই ভালো। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নিভিয়ে দেব। বলে সে বালিশ টেনে চিত হয়ে শোওয়ার আগে বলল, দুগগা দুগগা। তিথির হাই উঠছে। সে বালিশে থাবড়া মেরে কীসব ঠিক করে নিল। পাকা বুড়ির মতো আচরণ। নিশুতি রাতে কতরকমের আতঙ্ক থাকে, ঠাকুরের নাম করে সেই আতঙ্ক থেকে যেন রক্ষা করতে চাইছে অরণিকে।

অরণি কিছুতেই মশারির নিচে ঢুকছে না।

কী হল, বসে থাকলে কেন!

অরণি গুম মেরে বসে আছে?

ইস আলোটা চোখে কী লাগছে! বলেই উঠে পড়ল তিথি। হারিকেনটা থামের আংটা থেকে তুলে এক কোনায় নিয়ে রেখে দিল।

ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে তিথি বলল, আলোটা একটু কমিয়ে দিলে তোমার অসুবিধা হবে?

হ্যাঁ হবে।

আচ্ছা, ঠিক আছে। এবারে শুয়ে পড়ো।

অরণি এবার তক্তপোশে উঠে সে তার বাবার মশারিটা তিথির দিকে ছুঁড়ে দিল।

নে, এটা টাঙিয়ে নে।

তুমি খেপেছ। কাকার মশারি আমি টাঙাতে পারি। কাকা জানতে পারলে কী ভাববে বলো! মেঝেতে চুপচাপ শুয়ে থাকব, তাও তোমার সহ্য হচ্ছে না! তোমার মনে এত পাপ অরুদা।

পাপ কথাটা এত অশ্লীল লাগে শুনতে অরণি জীবনেও টের পায়নি। পাপ আছে তার মনে। আছে, সত্যি আছে, পাপ না থাকলে, সারাদিন সে তিথির ঘোরে পড়ে থাকবে কেন! তিথি সহজভাবেই যদি সব মেনে নেয়, নিতেই পারে, সে পড়ে গেছে কাদায় পিছলে এবং যা কিছু দেখার দেখা হয়ে গেছে, এখন আর ভেবে কী হবে! তিথি তাকে বোধহয় মনে মনে ক্ষমাই করে দিয়েছে।

সে তাড়াতাড়ি চোরের মতো মশারির ভিতর ঢুকে গেল। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। ঠান্ডা হাওয়ায় শীত শীত করছে তার। তিথি গায়ে দেওয়ার কিছু আনেনি। তিথিকে মশায় কামড়ায় না, তিথির শীতও করে না বুঝি! মশারি কিছুতেই টাঙাল না। ভাঁজ করে বাবার বিছানার নিচে রেখে দিয়েছে। চাদর দিলেও হয়তো গায়ে দেবে না—বলবে, কী যে করছ না, কাকার চাদর আমি গায়ে দিতে পারি! কত বড় গুরুজন তিনি।

অরণি বিছানায় শুয়ে স্বস্তি পাচ্ছিল না।

অনেকদূর থেকে যেন বলল অরণি, তোর শীত করছে না তিথি।

করছে। হঠাৎ কীরকম ঠান্ডা হয়ে গেল সব কিছু।

চাদর গায়ে দিবি?

তিথি পাশ ফিরে হাঁটু ভাঁজ করে শুল।

অরণি মশারির ভেতর থেকেই তার চাদরটা বের করে বলল, ধর। এটা গায়ে দে।

তুমি কী গায়ে দেবে?

বাবার চাদরটা বের করে নিচ্ছি।

তাহলে দাও। তিথি উঠে বসল। তার ফ্রক হাঁটুর নিচে নেমে গেছে। জঙ্ঘা, ঊরু দেখা যাচ্ছে—সব যেন ফুলের উষ্ণতা নিয়ে ফুটে আছে। তিথির শরীর এত পুষ্ট, এত সাবলীল, এত সুষমা হাতে পায়ে, সে

কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছে না। তবে রক্ষা নিচে আজ অন্তর্বাস আছে। ফ্রকের নিচে শরীর যে উদোম করে রাখেনি। তার সব অস্বস্তি শরীর থেকে সহজেই মুছে গেল।

তিথি চাদরটা দিয়ে শরীর ঢেকে শুয়ে পড়ল।

অস্বস্তি থেকে রেহাই পেয়ে হালকা বোধ করল। তিথি চাদরে সারা শরীর ঢেকে নিয়েছে। এমনকি মুখও। মশার কামড় থেকে আত্মরক্ষার এটাই বোধহয় একমাত্র উপায় তিথির।

অরণি যেন কিছুটা নিশ্চিন্তে এবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। কেউ আর কথা বলছে না। তিথি ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

তখনই তিথি বলল, আলোটা নিভিয়ে দিই, চোখে বড় লাগছে।

চোখ কনুইতে ঢেকে শুয়ে আছে অরণি। তিথি যা খুশি করুক, সে কিছু বলবে না। হারিকেন নিভিয়ে দিতে হয় দিক, আলো থাকলে তার ঘুমের যখন ব্যাঘাত হয়—

কি নিভিয়ে দেব?

দে না! আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে, এত কথা আর ভালো লাগছে না।

তিথি হারিকেন নেভালো না। সে শুয়েই আছে। ঘরের কোনায় হারিকেন। বিছানা থেকে উঠে গেলে, মাদুরের ঘস ঘস শব্দ পাওয়া যেত, কারণ সে বুঝেছে তিথি এপাশ—ওপাশ করলেও টের পাওয়া যায়। বৃষ্টি ধরে গেছে। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ ফোঁটা পড়ছে টিনের চালে। এত নিঝুম হয়ে আছে যে হাই উঠলে, কিংবা জোরে শ্বাস ফেললেও টের পাওয়া যায়।

একটা কথা বলব অরুদা?

বললাম তো, আলো নিভিয়ে দে। আবার কী কথা!

তুমি রাতে ওঠো?

ঠিক নেই।

আমি কিন্তু উঠি।

ভয় পেলে ডাকবি। দরজায় দাঁড়াব।

টর্চটা বালিশের পাশে আছে। দেখে নাও।

কথাই বলছে, আলো নেভাচ্ছে না।

সে চিত হয়ে শুয়ে আছে বলে তিথিকে দেখতে পাচ্ছে না। শিয়রের পাশেই মেঝেতে তিথির বিছানা, হাত বাড়ালে নাগাল পাওয়া যায়, তিথি কী করছে দেখতে হলে তাকে উঠে বসতে হয়। তার মনে পাপ আছে, তিথি যে এত সুন্দর এবং এবার থেকে সে রহস্যময়ী নারী হয়ে যাবে—তার ভেতর পাপ আছে বলেই জেনে ফেলেছে। সেও বড় হয়ে যাবে, তিথির সঙ্গে ঠিক আগের মতো কোনও অকপট কথাবার্তায় জমে যেতে পারবে না। নদীর পাড়ে গেলে, কিংবা চরে নেমে গেলে সে তিথিকে কতদিন সঙ্গে নিয়ে গেছে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকারও নেশা তার কম না। নৌকায় উঠে এক নৌকা থেকে আর এক নৌকায় লাফিয়ে পড়েছে, তিথি সঙ্গে আছে।

নৌকায় বাদাম তুলে দিয়েছে মাঝিরা, তিথি সাঁতরে নৌকায় উঠে গেছে। সেও। কিছুটা দূরে গিয়ে নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়েছে, দু'জনেই। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে পাড়ে উঠে এসেছে। কখনোই মনে হয়নি সে এত সুন্দর।

তিথি ফের বলল, একটা কথা বলব?

তিথির কথা কি শেষ হবে না! তাকে কি কথার ভূতে পেয়েছে!

সে সাড়া দিল না।

তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে!

সে কিছুতেই সাড়া দেবে না। কারণ সে ভেতরে ভালো নেই বুঝতে পারছে। আশ্চর্য এক কৌতূহল তিথির শরীর নিয়ে—কেমন সে ভেতরে ভেতরে পাগল হয়ে উঠছে। সে জোর করে নিজেকে ঠিক রাখার চেষ্টা করছে। যেন নেমে গেলেই দু'জনের মধ্যে উষ্ণতার ছড়াছড়ি শুরু হয়ে যাবে।

তিথি নিজের মতোই কথা বলছে—তুমি তো আমাকে ভালোবাস। ভালোবাসলে জানো কাচের চুড়ি কিনে দিতে হয়। অষ্টমী স্নানের মেলায় গোবর্ধন দাসের দোকানে তোমাকে নিয়ে যাব। কত রকমের চুড়ি, কী রঙ, কী বাহার! কাচের চুড়ি পরতে আমার খুব ভালো লাগে।

না, সে আর পারছে না। সে উঠে বসল। চোখ জ্বলছে। মুখে ঘাড়ে জল দিতে পারলে ভালো হত।

আর তখনই তিথি উঠে হারিকেনের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। মশারির নিচে সে বসে আছে, তিথি জানে না। তার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়েছে। আর এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যায় না। টর্চ জ্বেলে দেখতে পারে। জানালা খোলা—প্রকৃতির আশ্চর্য বাহার—জ্যোৎস্না উঠেছে। এবং আকাশও দেখা যায়। সে কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় গাছপালা দেখার চেষ্টা করল। তিথির শরীর তাকে পাগল করে দিচ্ছে। সে কিছুতেই অন্যমনস্ক হতে পারছে না। আকাশে তারা ফুটে আছে বোধহয়। জানালায় বসে আকাশে তারা খুঁজে বেড়ালেও শান্তি পেত বোধহয়। কারণ সে আর যাই করুক, তিথির কাছে খাটো হতে পারবে না। প্রকৃতির মতোই তিথির কোনও স্থিরতা নেই। এই চঞ্চল, এই শান্ত, এই বৃষ্টি, এই রোদ। কখন দু'পাড় ভেঙে দ্রুত সব তরঙ্গের মধ্যে নদীর জলে ভেসে যাবে, কখনও জ্যোৎস্নায় চরের কাশফুলে হাওয়ায় দুলে উঠবে, তার কিছুই জানে না অরণি।

সে ধীরে ধীরে নেমে গেল। তারপর টর্চ জ্বালতেই দেখল, তিথি ঘুমোচ্ছে। সত্যি ঘুমোচ্ছে। পাশ ফিরে, দু'হাঁটুর মধ্যে প্রায় মাথা গুঁজে তিথি অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। সে তিথিকে ছুঁতে সাহস পেল না।

সে অনভিজ্ঞ। সে কিছুই জানে না, যেটুকু করেছে ভেতরের তাড়না থেকে। শরীর স্পর্শ করার এক অমোঘ তাড়নাতেই সে চকি থেকে নেমে এসেছিল—তার কেন জানি ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল, তিথির শরীর ছুঁয়ে দিলেই এক আশ্চর্য পৃথিবীতে ঢুকে যাবে এমন মনে হয়েছিল তার। তিথিকে ছুঁয়ে দেখার মতো সাহস নেই তার। ছুঁয়ে দিলেই সে অপবিত্র করে দেবে তিথিকে।

সাত

দু'কূল ছাপিয়ে এবারে নদী জলে ভেসে গেল। জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি সেই যে দুর্যোগ শুরু হয়েছিল, দিনরাত ঘনবর্ষণ, ঝোড়ো হাওয়া, আকাশে মেঘের দাপাদাপি, ঘর থেকে বের হওয়াই দায়। ছাতা মাথায় দিলেও রক্ষা নেই, ঝোড়ো হাওয়ায় ছাতা উড়িয়ে নিচ্ছে। ভেতরবাড়িতে অরণি যাচ্ছিল ছাতা মাথায় দিয়ে, তখনই দেখল তিথি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। তিথিও ভিতরবাড়িতে যাবে। কিন্তু ছাতা নেই বলে কারও অপেক্ষায় আছে। তাকে দেখেই সে দৌড়ে এসে ছাতার তলায় ঢুকে গেল।

ওর ইচ্ছে হয়েছিল নিজেই ডেকে বলবে, এই তুই ভিজছিস কেন! চলে আয়।

কিন্তু আজকাল সে আগের মতো তিথিকে কাছে ডাকতে সাহস পায় না।

এই যে দুর্যোগ যাচ্ছে, সে কোনওদিন স্কুলে যেতে পারে, কোনওদিন পারে না। রেনি ডেরও ছুটি থাকে, তবে স্কুল কামাই করার পাত্র সে নয়। বাতাস এতই প্রবল যে ছাতা মাথায় যাওয়া যায় না। বর্ষাকাল আসার মুখে ঋতুর এই খেপা স্বভাবের কথা তার জানা আছে। কিন্তু তিথির কী ইচ্ছে হবে বোঝা ভার।

সে ছাতার ভেতর ঢুকেই বলল, ও ভিজে গেলাম! বলে প্রায় শরীর ঘেঁষে লেপটে যেতে চাইছে।

তিথির শরীরে এত আগুন আছে, কাছে এলেই যেন পুড়ে যেতে পারে, সে যতটা পারে আলগা হয়ে হাঁটে, কিন্তু হাঁটতে দিলে তো! তিথি নিজেই ছাতা কেড়ে নিয়ে বলল, এসো। কাছে এসো। জলে ভিজে যাচ্ছ।

ছপ ছপ পায়ের শব্দ উঠছে জলে।

ভেতরবাড়িতে পাত পড়েছে এমন খবর পাওয়ার পরই সে বের হয়ে পড়েছে। বাবা নাজিরখানা থেকে সোজা চলে যাবেন। আবার খেয়েদেয়ে সোজা নাজিরখানায় যাবেন। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে দিবানিদ্রা তিনি সেখানেই সেরে নেন। তিথি আগে হলে তার ঘরে ঢুকে যেত, তাকে ডেকে নিয়ে যেত, সেই যে ভেতরবাড়ির সঙ্গে কাছারিবাড়ির দুতিয়ালি করে থাকে, কিন্তু ইদানীং তিথি একা আর তার ঘরে আসে না, সঙ্গে ওর কোনও ভাই না হয় বোন থাকে। সেই কোলে করে নিয়ে আসে, বড়দের হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে আসে।

অরণি তখন ভেতরে ভেতরে বড় অপমান বোধ করে। সে যে রাতের অন্ধকারে তিথির পাশে গিয়ে বসেছিল, আনাড়ি বলেই কী করতে হয় জানে না, তবুও বসেছিল, বোধহয় তিথি তা জানে। বোকার মতো কিছু একটা করে বসলে তিথিরও যে মান থাকে না। সে ছোট হয়ে গেলে তিথিও বোধহয় ছোট হয়ে যাবে।

হাসনুহানার গাছের নিচ দিয়ে পাঁচিলের পাশ ধরে হাঁটছে। তিথির দেরি হয়ে গেছে, সে অনেক আগেই রান্নাবাড়িতে গিয়ে বসে থাকে! তবে ঘর থেকে বের হতে পারছিল না। ছাতা না থাকলে কী করা! ভাঙা ছাতাটি তার বাবা নিয়ে যেতে পারে। ঘরে বসে বোধহয় তিথি লক্ষ্য রাখছিল, তার অরুদা কখন মাঠ পার হয়ে ভেতরবাড়িতে যায়, এবং তাকে দেখেই বড় চালতা গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল। অরুদার ছাতার নিচে ঢুকে গেলে তার রান্নাবাড়িতে যেতে অসুবিধা হবে না।

তিথি ঠিক করবী গাছটার নিচেই ফিসফিস করে বলল, এই একটা কথা বলব?

একটা কথা বোধ হয় আর শেষ হবে না।

কী বলবি?

বলো রাগ করবে না।

রাগ করার কথা হলে মানুষ রাগ না করে পারে?

তা হলে তো বলা যাবে না। তুলিদি যদি জানতে পারে আমাকে খেয়ে ফেলবে।

বাবুদের বাড়ির মেয়ে। এখন সে আরও লম্বা ফ্রক পরে। তাকে দেখলে আড়ালে চলে যায়—তুলির খুব আজকাল লজ্জা। তিথি বলল, আগে তুমি তুলিদিকে চুরি করে দেখতে, এখন তুলিদি তোমাকে দেখে।

তুলি বলল তোকে!

আমাকে বলবে কেন। তুলিদির চাওনি দেখলেই সব বোঝা যায়।

এই কথা!

আজ্ঞে না। এই কথা না। আরও কথা আছে।

কী কথা, শোনার কোনও আগ্রহ বোধ করল না সে। বাবুদের মেয়ে, কত রকমের শখই থাকে। মেজদা শহর থেকে একটা সাদা রঙের বাচ্চা কুকুর এনে দিয়েছে। খরগোশের চেয়ে সামান্য বড়। কুকুরটা আর বড় হবে না। তুলি বিকাল হলেই পরীর মতো সেজে গুজে কুকুরটা বুকে নিয়ে কাছারিবাড়ির বাগান, না হয় নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়াবে। তার জানালা থেকে যতটা দেখা যায় ততটা রাস্তাতেই তুলি হাঁটাহাঁটি করে। বেশি দূরে যায় না। কখনও বীণা পিসি থাকে, কখনও থাকে না।

পাঁচিলের দরজা দিয়ে ঠিক ভেতরে ঢোকার মুখেই তিথি ছিটকে ছাতার তলা থেকে সরে যাওয়ার সময় বলল, তুমি তো শুনতে চাইলে না পরে বলব।

এক ছাতার তলায় তিথিকে এত ঘনিষ্ঠ দেখলে তুলি কি খেপে যাবে! তিথির ছিটকে যাওয়া দেখে এমনই মনে হল তার। এবং আজকাল তার যা হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে। তিথি জলে কাদায় চিত হয়ে পড়ে আছে। তিথিকে না দেখে কেন যে তুলিকে দেখতে পেল—ঠিক একইভাবে জলে কাদায় তুলি চিত হয়ে পড়ে আছে।

এসব কেন যে সে দেখে!

রোয়াকে উঠে এক কোনায় সবার সঙ্গে সেও ছাতা রেখে হেঁটে গেল। লম্বা কার্নিসের নিচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রান্নাবাড়ির এলাকাটা বাড়ির ভেতর মহল পার হয়ে। সবাই এসে গেছে—সে এদিক—ওদিক চোখ তুলে তাকায় না। মাথা নিচু করে হাঁটার স্বভাব। চোখ তুললেই যেন, জানালার পাশে কিংবা খাটের বাজুতে দেখতে পাবে তুলি থুতনি রেখে তাকে দেখছে।

অবশ্য তুলি বের হবেই। সে না দেখলেও বের হবেই।

কারণ তার কুকুরটা কী শুঁকতে শুঁকতে রোয়াকে বের হলেই তুলি ছুটে আসবে। একবার পলকে তাকে দেখে কুকুরটাকে বুকে করে তুলে নিয়ে যাবে। তাকে দেখার জন্য তুলির এই ছলনায় সে ভেতরে ভেতরে মজা পায়। তুলি মনে করে সে কিছু বোঝে না।

দুর্যোগের দিনে আজ রান্নাবাড়িতে খিচুড়ি লাবড়া বেগুনভাজা চাটনি দিয়ে সবাই বেশ হুঁসহাস করে খেল। ছোড়দার থালায় খিচুড়ি থেকে গেছে। চাটনি দিতে এলে, ছোড়দা খিচুড়ি পাত থেকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইলে জেঠিমা হা হা করে উঠলেন।

ফেলিস না। তিথি খেয়ে নেবে। খেতে পেলে খুশি হবে।

এসব দেখার অভ্যাস তার আছে। পাতে তার কিছুই বেশি হয় না। বেশি হলেও খেয়ে নেয়। না খেলে তিথির জন্য তুলে রাখা হবে। ভেতরে তখন তার বড় কষ্ট হয়। তিথিকে এ নিয়ে শাসনও করা যায় না। তার বাপের যা অবস্থা, বর্ষাকাল বলে অবশ্য তার বাবা ফুলুরি, জিলিপি ভাজার দোকানটায় বসে না। নদীনালার দেশ, বর্ষায় তিথির বাবা একটা ভাঙা কোষা নৌকায় গাওয়াল করতে বের হয়ে যায়। পান, সুপারি, ছোলা, মটর, বিস্কুট, ময়দার কড়ি ভাজা নিয়ে বের হয়। ঘাটে ঘাটে পাটের বদলে গ্রাহকদের ছোলা মটর বিস্কুট দেয়। বাড়ির বউ—ঝিরা চুরি করে পাট দিয়ে জিলিপিও কেনে। এতে তিথির বাবার পড়তা অনেক বেশি পড়ে। এসময় তিথির মা বাবা ভাইবোনগুলি পেট ভরে হয়তো খেতেও পায়। কিন্তু তিথির যখন এক জায়গায় ব্যবস্থা আছে, তখন তার জন্য যেন ভাবার দরকার নেই। তিথির মা যে তার বাবার দ্বিতীয়পক্ষের, তা বোধহয় সে ভুলেই গেছে। সে তার মাকে সবসময় বড় লক্ষ্মীমতী ভাবে। মার জন্যই বাবা বিবাগী হয়ে যায়নি, সোজা কথা!

নদীনালার দেশ। পোকামাকড়ের উপদ্রব আছে। বর্ষায় তিথির বাবার ভাঙা নৌকাই সম্বল। তাপ্পি মারা। গাবের কষ খেতে খেতে পোড়াকাঠের মতো হয়ে গেছে।

ওর বাবার রাতে ফিরতে দেরি হলে নদীর পাড়ে চালতে গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তিথি উসখুস করলেই সে টের পায়—কিছু একটা হয়েছে।

তিথি বলবে, বাবা ফেরেনি। একা সে চালতে গাছটার নিচে গিয়ে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় পায়। ভয় পায়, না, সঙ্গে যাওয়ার জন্য ভয়ের ছলনা, সে ঠিক বুঝতে পারে না। সে সঙ্গে থাকলে কথায় কথায় তিথি হেসে গড়িয়ে পড়ে। আবার তার বাপের ফিরতে দেরি দেখলে, চোখ জলে ভেসে যায়। বাবা না থাকলে যে কেউ থাকে না।

অরণি খেয়েদেয়ে বের হয়ে দেখল, বৃষ্টি আরও ঝেঁপে নেমেছে।

জগদীশও বৈঠকখানা ঘরে বসেছেন। সেও একটা বড় টুলে বসে আছে। বাবুরা কিংবা বাবুদের ছেলেরা বাড়ির করিডর ধরে যে যার ঘরে ঢুকে গেছেন। বৃষ্টির তোড় না কমলে বের হওয়া যাবে না।

জগদীশই বললেন, একটু বসে যাও। বৃষ্টি ধরে আসুক। তারপর যাবে।

বাবা তার সঙ্গে যাবেন না, সুপারিবাগানের ভেতর দিয়ে বাবা নাজিরখানায় চলে যাবেন। আসলে একসময় কাছারিবাড়িটায় যে নায়েব—গোমস্তাদের ভিড় ছিল, বোঝা যায়। বাবুদের অবস্থা পড়ে যাওয়ায় কাছারিবাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কবে অরণি জানে না। কাছারিবাড়িতে শুধু তার বাবা থাকেন। পাশের ঘরটায় দলিল—দস্তাবেজে ভর্তি। পরের ঘরটায়, লাঠি সড়কি বল্লম এবং তরবারিও সে ঝুলতে দেখেছে। ঘরটায় সবসময়

তালা দেওয়া থাকে। পরের ছোট ঘরটায় থাকে হরমোহনদাদু—পাইক পেয়াদা এবং বাজার সরকার যখন যা দরকার সেই কাজই করেন!

এত বড় ঘরটায় তার ফিরে যেতেও ভালো লাগছে না। অবশ্য খুবই ঠান্ডা লাগছে। কাঁথা গায়ে দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তেও পারে। বই খাতা নিয়ে বসতে পারে। চলিত নিয়মের কিছু অঙ্ক করা বাকি। কিন্তু যা দুর্যোগের ঘোর চলছে, তাতে হারিকেন জ্বেলে না দিলে কিছুই দেখা যাবে না। বৃষ্টি ধরে আসতেই সে বের হয়ে পাঁচিলের দিকে যাওয়ার সময় দেখল তিথি পা টিপে টিপে তার ছাতার তলায় ঢুকে যাচ্ছে। তিথি কিছু বলতে চায়।

মানুষ সমান পাঁচিলের এপাশে সে ছাতা মাথায় বৃষ্টিতে হেঁটে যাচ্ছে। পাশে তিথি তেমনি তার গা ঘেঁষে হাঁটছে। তার কনুইয়ে তিথির নরম স্তনের সামান্য আভাস ছুঁয়ে যাচ্ছে। তার ভালো লাগছিল। তিথি কী যে চায়, তার ছাতার নিচে ঢুকে তার সঙ্গে কাছারিবাড়িতে উঠে যেতে পারে, কিন্তু তিথি আজকাল তার ঘরে একা ঢোকে না—যেন তিথি খুবই সতর্ক হয়ে গেছে। তার মনে পাপ আছে, সে কিছু যদি করে বসে, এসবও ভাবতে পারে। নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করার চেষ্টাতেই যেন বলল, যা বাড়ি যা।

বাড়ি যাব কি! তুমি তো আমার কথাই শুনলে না।

আবার কী কথা!

বারে বললাম না, আরও কথা আছে।

আবার বোধহয় ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে! সে ছুটতে চাইলে ছাতার ডগা ধরে ফেলল তিথি।

কী যে লাফাচ্ছ না! জলে সব ভিজে যাচ্ছে।

চারপাশে জল জমে যাওয়ায় ইচ্ছে করলেই ছুটে যাওয়া যায় না।

বকের মতো পা ফেলে হাঁটতে হয়। তিথির আরও কথা আছে, কিছুতেই এই বৃষ্টির মধ্যে না শুনিয়ে ছাড়বে না। অথচ দু'জনেই ভিজে যাচ্ছে।

তুমি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বলবে না।

কী বলব না।

এই যে তুলিদি তোমাকে চুরি করে দেখে। তুলিদি সব লক্ষ্য রাখে জানো। কী বলল জানো, দেখিস অরুর আর কদিন বাদেই গোঁফ উঠবে।

সে বলল, তাই বুঝি।

আমাকে বকল। তুই একা ঘরে যাস লজ্জা করে না। দামড়া হয়ে উঠছে জানিস না!

এসব কথা শুনতে তার ভালো লাগছে না।

আর যাবি না একা। খবরদার। একা গেলে ছোটপিসিকে বলে দেব। হুমকি।

এসব শুনতে ভালো লাগছিল না তার।

ঠিক আছে। চল তোকে বাড়ি দিয়ে আসি। না হলে সব তোর ভিজে যাবে।

যাক, গোঁফ উঠলে দামড়া হয়ে যায় একথা কি ঠিক?

জানি না।

তুমি তো কিছুই জানো না। আর ক'দিন বাদে তোমার গোঁফ উঠবে, তুলিদি জানে, অথচ তুমি জানো না। যার গোঁফ সেই ঘুমিয়ে থাকে। আয়নায় দেখে তো বুঝতে পারো, না তাও বোঝ না। তুমি কী বোঝ বলো তো!

তিথির কথা এমন যে মায়া না জন্মে পারে না। তিথি না থাকলে সে কত একা তাও বোঝে। বড় হওয়ার মুখে তিথির সাহচর্য তার চারপাশ ভরে রেখেছে। সে না থাকলে তার যে সবই অর্থহীন হয়ে যেত, সে অতিষ্ঠ হয়ে হয়তো চলেই যেত। একা এমন দূর দেশে মাকে ছেড়ে এভাবে কারও পক্ষে থাকাই সম্ভব হত

না। মাঝে মাঝে মনে হয় বাবাকে বলে সে তিথির জন্য ভালো ফ্রক প্যান্ট আনিয়ে দেবে। কিন্তু সে বলে কী করে! তিথির প্রতি তার আকর্ষণ যদি বাবা টের পেয়ে যান!

সে এত নিরুপায় যে তিথিকে কোনও কারণেই সামান্য ভর্ৎসনা পর্যন্ত করতে পারে না। তিথির পক্ষে তার ঘরে একা আসা উচিত নয় সেও এটা বোঝে। তুলির চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন।

তারপরই তিথি বলল, মনে আছে তো! এভাবে তাকিয়ে আছো কেন? তুমি আমাকে কাচের চুড়ি কিনে দেবে, মনে নেই!

দেব।

তারপরই তিথি কেন যে সহসা বলল, আমি যাই। নদীতে বান এসে গেছে, কী মজা হবে না! তুমি যাবে?

কোথায়?

নদীতে।

কেন?

বারে নৌকায় ভেসে যাব আমরা। তারপর নৌকা যেখানে যায় যাবে। আমরা বসে থাকব। হাটবারে বাবা গাওয়ালে যায় না। নৌকাটা নদীর পাড়ে পড়ে থাকে। যাবে আমার সঙ্গে?

না।

কেন যাবে না? আমি কী করেছি! আমার সঙ্গে গেলে তাজা ইলিশ দেখাব। ঝকঝকে রুপোর ইলিশ। লাফাচ্ছে, পাটাতনে লাফাচ্ছে।

তিথির পক্ষে সবই সম্ভব। গেছো মেয়ে, ভালো বৈঠা চালাতে পারে, আর বর্ষায় নদীর জলে স্রোতের মুখে সাঁতরাবার সময় কখন যে শুশুক মাছ হয়ে যায়, কখন যে জলের নিচে ডিগবাজি খায়, দূর থেকে কখনোই মনে হয় না তিথি জলে সাঁতার কাটছে, জলে ডিগবাজি খাচ্ছে, যেন নদীর জলে নেমে মৎস্যগন্ধা হয়ে গিয়ে কোনও সুপ্রাচীন কাব্যগাথা তিথি। সে পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখত। ভরা কোটালে মাঝনদীতে যাওয়ার সাহসই নেই তার। ঘোর বর্ষায় নদীর জলে ঘূর্ণি দেখলেই তার মাথা ঘোরায়। তিথি কিছুই গ্রাহ্য করে না। তাকে তাজা ইলিশমাছের প্রলোভনে ফেলে দিচ্ছে। সে যেন এবার তাকে নিয়ে নদীতে ভেসে যাবেই। তাজা ইলিশ তাকে জেলেদের নৌকায় দেখাবেই।

মানবাজারের ওদিকে মেলা মন্দির আছে। বিশ্বনাথের মন্দির, কালভৈরবের মন্দির, রুদ্রদেবের, অন্নপূর্ণার মন্দির। ওদিকটায় তখন ঘন জঙ্গল। অষ্টমী স্নানের মেলায় জমিদারবাবুরা লোক লাগিয়ে জঙ্গল সাফ করে দেয়। ওখানেই তো মেলা বসে। কাচের চুড়ি ওখানেই কিনতে পাওয়া যায়।

তিথির সঙ্গে থাকার এই মুশকিল। কিছুতেই তার কথা শেষ হয় না। তাকে রাজি না করিয়ে যেন তিথি কিছুতেই যাবে না।

সে কেমন প্রলোভনে পড়ে গিয়ে বলল, ঠিক আছে যাব। হাটবার আসুক।

ঠিক যাবে?

হ্যাঁ, ঠিক যাব।

তিন সত্যি।

তিন সত্যি।

আমার গা ছুঁয়ে বলছ!

এই গা ছুঁয়ে বলছি।

তিথি এতই আপ্লুত তার কথায়, প্রায় বুকের কাছে মাথা ঠেকিয়ে দিয়েছে।

ঘনবর্ষণে দু'জনেই ভিজে যাচ্ছিল। তিথি কি এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে চায়! তিথির শরীরে কি উত্তাপ জমা হচ্ছে! বুকে মাথা ঠেকিয়ে দিলে কেন যে মনে হয়েছিল, তিথির গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

খুবই বিব্রত হয়ে পড়ল সে।

তিথি তোর গা গরম! জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিস!

যা ভাগ! আমার কিছু হয়নি।

এতই ঘনবর্ষণ যে দু—দশ হাতের কাছাকাছি কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যেন এক আচ্ছাদন চারপাশে তাদের ঘিরে রেখেছে। এমন মুহূর্তে তার ইচ্ছেই করছে না তিথিকে ফেলে যেতে। কাছারিবাড়িতে গিয়ে উঠতে পারে—কিন্তু তিথি তার বুক থেকে কিছুতেই মাথা তুলছে না।

জানো, তোমাকে আমার ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয় না। তুমি আমাকে স্বপ্নে দ্যাখ?

এমন প্রশ্নের সে কী জবাব দেবে! সে কখনোই তিথিকে স্বপ্নে দেখেনি।

সে বলল, না।

বা তা হয় নাকি! ভালোবাসলে স্বপ্ন দেখতে হয় জানো!

তুই দেখিস?

হ্যাঁ, দেখি। কত রাতে স্বপ্নে দেখেছি, আমি নদীর জলে ডুবে যাচ্ছি, পাড় থেকে লাফিয়ে পড়েছ তুমি—দু হাতে চুলের ডগা ধরে তুলে আনছ। তারপর পাঁজাকোলে করে...

পাঁজাকোলে করে... কী?

কী আবার, ধ্যাত, আমার লজ্জা লাগে। শুনতে খুব ভালো লাগে... পাঁজাকোলে করে কী... এখন বলব না। পরে বলব।

তারপর বৃষ্টির মধ্যেই সে দৌড়ে সুপারিবাগানের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়েটার মাঝে মাঝে কী যে হয়!

মাঝে মাঝে তারও কী যে হয়!

মাথা কান গরম হয়ে যায়। চোখ মুখ ঝাঁঝাঁ করে।

পরের বর্ষায় তিথি সত্যি একদিন হাত ধরে টানতে টানতে নদীর পাড়ে গেছিল। সেদিনও অবিশ্রান্ত বর্ষণে পৃথিবী যেন কুহেলিকাময়। ঝাপসা কুয়াশার মতো বৃষ্টির আড়ালে তারা যে নৌকায় উঠে বসেছে কেউ দেখতেই পায়নি। বাবা সেদিনও কাজে বাইরে গেছেন। ফিরবেন দুদিন বাদে। রাতে তিথি এখন তার ঘরে পাহারায় আর থাকে না। তিথির মামা চরণ রাতে তার ঘরে শোয়।

বাবাই কেন যে সেবারে বললেন, তিথির এখন সমন্দ আসছে। গোরাচাঁদ যাকে দেখছে, বলছে, কন্যে উদ্ধার করে দিন। তিথির মামা চরণ তোমার ঘরে শোবে। তিথির আর তোমার ঘরে শোওয়া ঠিক হবে না। আমিই তিথিকে বারণ করে দিয়েছি।

তিথির বিয়ে! যা হয় নাকি! কতটুকুন মেয়ে—বড় না হলে মেয়েদের বিয়ে হওয়া মানায় না।

সে তিথিকে ডেকে বলেছিল, কী রে তোর বাবা নাকি পাত্র খুঁজছে?

ধুস, তুমি যে কি না। আমি বড় হয়ে গেছি না! তাই তোমার ঘরে শুলে কেউ খারাপ কিছু ভাবুক কাকা চায় না। আমার পাত্র দেখা হচ্ছে, আমি জানব না!

এও হতে পারে, মেয়ে বড় হতে থাকলে বাপের চিন্তা বাড়ে। হয়তো বাবাকেই ধরতে পারে, কোনও সুপাত্র যদি জোগাড় হয়। সুন্দরী মেয়ের পাত্রের অভাব হয় না। কিন্তু যা হয়, এসব ভাবলেই খুব মুষড়ে পড়ে অরণি।

তিথি হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলে সে না গিয়ে পারে! তিথি যে কী সুঘ্রাণ ছড়িয়ে রেখেছে—তিথির কাছে থাকলে তার শরীরে যে সুবাতাস বয়—তার সাধ্য কি তিথিকে ফেরায়!

চালতে গাছের নিচে তাপ্পিমারা কোষা নৌকাটা দড়িতে বাঁধা ছিল। পাটাতনের নিচে বৈঠা। একটা লগিও আছে। বৃষ্টিতে পাটাতনের নিচে জল জমে গেছে—তিথি উবু হয়ে বসল। জল সেঁচে ফেলছে—তিথির দুই উরুর দিকে কিছুতেই তাকাচ্ছে না অরণি, যদি কিছু দেখে ফেলে।

সহসা কেন যে অরণির মনে পড়ে গেল তিথি তাকে ফের হয়রানি করতে পারে। নদীতে তাজা ইলিশ দেখাবার নাম করে তাকে নিয়ে গিয়ে শেষে কোথায় ফেলবে জানে না। তিথির যদি কোনও দুষ্টবুদ্ধি কাজ করে, সারা সকাল—দুপুর রোদের সেই হয়রানির কথাও মনে পড়ল।

মুশকিল তিথি কোথায়, কী করছে, দেখার প্রায় কেউ নেই বললেই চলে। তিথি বাড়ি না থাকলে ধরেই নেয় সে বাবুদের রান্নাবাড়িতে আছে, নয়তো তুলির ঘরে, ছোটপিসির ঘরেও থাকতে পারে। কিন্তু তার ওপর বাবুদের বাড়ির সবারই কমবেশি নজর আছে। সেজদা কিংবা সোনাদা কাছারিবাড়িতে এসে উঁকি দিতে পারে, তাছাড়া দুপুরেও তাকে রান্নাবাড়িতে হাজির থাকতে হয়। সে না গেলেই কার নির্দেশে যে ভেতরবাড়িতে তোলপাড় পড়ে যায়—সে তিথির সঙ্গে এই দুর্যোগে কিছুতেই নদীতে নৌকা ভাসিয়ে দিতে পারে না।

নৌকা থেকে লাফ দিয়ে পাড়ে উঠে এল অরণি।

তার খালি গা। প্যান্টের ওপর কোমরে গামছা জড়ানো। সে নদীতে ডুব দিয়ে বলল, এই তিথি বাড়ি চল। যেতে হবে না।

কেন, গেলে কী হবে?

ফিরতে দেরি হয়ে গেল সবাই ভাববে।

ফিরতে দেরি হবে কেন? জাল থেকে পাটাতনে যখন ফেলে, ইলিশ মাছ কী লাফায়! তারপর মরে যায়। মাছের মরে যাওয়া দেখবে না!

আচ্ছা তিথি মাঝে মাঝে তোর এত বাই চাপে কেন বল তো! মাছের মরে যাওয়া দেখার মধ্যে কোনও আনন্দ আছে?

তিথি আর কথা বলল না। সে পাড় থেকে নৌকা ঠেলে পাটাতনে লাফিয়ে উঠে গেল। কী যে করে তিথি! নদীর দু'কূল দেখা যায় না।

ভরা কোটাল। প্রবল স্রোতে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, চরের কাশবন সব ডুবে গেছে। সামনে নদীর এত বড় চড়া অদৃশ্য—মনে হয় নদী ফুলে ফেঁপে দু'পাড় ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে গেছে। মাঝগাঙে মেলা জেলে নৌকা পর পর, খড়ের নৌকাও মেলা। গয়না নৌকার মাঝি গুণ টেনে স্রোতের বিপরীতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি যেন বড় বেশি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছে। সারা আকাশে মেঘ আর বজ্রবিদ্যুতের ছড়াছড়ি।

এই কি, তিথি সত্যি বৈঠা মেরে মাঝগাঙে চলে যাচ্ছে!

সে চিৎকার করে ডাকল তিথি যাস না। গেলে ভালো হবে না। আকাশ তোর মাথায় ভেঙে পড়বে।

তিথি পাটাতনে দাঁড়িয়ে বলল, আমার ভালো দিয়ে তোমার কী হবে?

হবে। তুই ফিরে আয়। তুই ফিরে এলেই হবে।

তুমি কথা রাখো না। আমার গা ছুঁয়ে বলেছ, আমার সঙ্গে নদীতে যাবে। ফিরে গেলে আমার আর কতটা ভালো হবে?

কতটা ভালো হবে জানি না। তবে তুই এলে পরামর্শ করা যাবে। তুই না থাকলে তুলি আমাকে নিয়ে যা খুশি ইচ্ছে করবে। তোর ভালো লাগবে?

এতেই যেন জব্দ। তিথি পাটাতনে বসে পড়ল। পাড়ের দিকে আসার চেষ্টা করছে।

সে কোমর জলে নেমে গেল। তারপর সাঁতার কাটতে থাকল। নৌকার কাছে গিয়ে ঝুঁকি মেরে পাটাতনে উঠল। এবং বৈঠা আর তিথির হাতে রাখল না। সে প্রায় জোর করেই কেড়ে নিল।

তিথি তুই আমাকে নিয়ে কোথায় যেতে চাস বল। আমরা কতদূর যেতে পারি। মাথা খারাপ করে লাভ আছে!

আমি কী করব অরুদা, তিথি কেমন পাগলের মতো হা—হুতাশ করছে।

অরণি ঠিক বুঝতে পারছে না, তিথি এত ভেঙে পড়েছে কেন! তিথির কি কোনও দুঃসংবাদ আছে—অথবা কোনও এক অতিকায় হাঙরের পাল্লায় পড়ে গেছে তিথি! তার বিয়ের কথা কি পাকা হয়ে গেছে!

তবু তার কেন জানি হাঙরের কথাই মনে পড়ল। তিথিকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে।

সেজদা কিংবা জমিদারবাড়ির আর কেউ। তিথির শরীরে লাবণ্য এত বেশি, যে—কেউ যেন তিথিকে দেখলে মোহিত হয়ে যাবে।

সে ডাকল, তিথি।

বলো।

তোর কিছু হয়েছে?

কী হবে?

আচ্ছা আমাকে নিয়ে তুই কোথায় পালিয়ে যেতে চাস?—

তা তো জানি না।

আজকে কী মতলব ছিল তোর?

কী যে ছিল, বলতে পারব না। তুমি আমাকে স্বপ্নে দ্যাখো না, আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখি—ভাবলে যে মন খারাপ হয়ে যায়।

স্বপ্নে যদি তোকে দেখি খুশি হবি?

তিথি মাথা নিচু করে বসে থাকল।

বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। সঙ্গে দামাল হাওয়া। হালকা কোষা নৌকাটি সহজেই উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। সে জলের নিচে বৈঠা ঢুকিয়ে হাল ধরেছে। ইচ্ছে করলেই হাওয়ার উপায় নেই নৌকা উড়িয়ে নেয়। বরং হাওয়ার গতির জন্য নৌকা পাড়ের দিকে ভেসে যাচ্ছে। এত ঘন বৃষ্টির ছাট যে এখন পাড়ও ভালো করে দেখা যায় না। তবে সামনের বাঁশের জঙ্গল বিশেষ করে স্টিমারঘাটের বয়ার আলো দুলছিল বলে সে জানে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে নদীর অন্য কোনও মোহনায় হারিয়ে যাচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর তীর পেয়ে যাবে।

কী চুপ করে থাকলি কেন, স্বপ্নে যদি তোকে দেখি খুশি হবি?

তিথি বলল, তুমি তুলিদিকে কখনও স্বপ্নে দ্যাখো না?

না।

কাউকে দ্যাখো না।

কাউকে দেখব না কেন। আর স্বপ্নের কথা কি মনে থাকে। কত কিছুই দেখি, ঘুম থেকে উঠে আর মনে করতে পারি না। আমার কী দোষ বল।

আমাকে স্বপ্নে দেখলে তুমি ভুলে যেতেই পারো না। ঠিক তোমার মনে থাকত।

তা অবশ্য বোধহয় থাকত।

বোধহয় না। থাকত।

ঠিক আছে, আয় আমরা এসে গেছি। নাম।

তুমি তো বললে না, কবে তুমি স্বপ্নে আমাকে দেখবে!

তিথির কাছে এই মুহূর্তে কোনও মিছে কথাও বলতে পারছে না। সে বলতে পারত, নারে, আমি তোকে স্বপ্নে দেখি, তবে বলতে লজ্জা হয়। তুই না আবার কী ভাবিস! মিছে কথা বললে, তিথি সহজেই তাকে বিশ্বাস করবে। নিছক একটা স্বপ্ন নিয়ে তিথির কাতর মুখ সহজেই উচ্ছল হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তিথির কাছে কিছুতেই মিছে কথা বলতে মন সায় দিল না।

শোন অরুদা। স্বপ্ন কখন দ্যাখে জানো?

না, জানি না।
সারাদিন যাকে ভাববে, রাতে সেই স্বপ্নে হাজির হয়, জানো?
অরণি বলল, হতে পারে।
হতে পারে না। হয়। আমি তো প্রায়ই তোমাকে দেখি। সেই এক দৃশ্য, আমি ডুবে যাচ্ছি, তুমি আমাকে জল থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছ। ভাবতে গেলেই আমার শরীর কেমন শিউরে ওঠে। এই দ্যাখো, দ্যাখো না, আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেছে! স্বপ্নটা ভাবতে গেলেই শরীর অবশ হয়ে যায়।
শিগগির নাম।
নৌকাটা খুবই দুলছিল। নৌকাটাকে আয়ত্তে রাখাই কঠিন। যেন পাড়ে এসে ডুবে যাবে। সে লাফিয়ে কোমর জলে নেমে গেল। নৌকাটা একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে ফেলল।
এই নাম। ঠান্ডায় হাত—পা অবশ হয়ে আসছে।
নামব না।
তুই কি আমাকে মেরে ফেলতে চাস?
তখনই পাড়ের দুটো গাছ অদূরে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে জলে পড়ে গেল। স্রোতে গাছ দুটো ভেসে যাচ্ছে। কোথা থেকে উড়ে এল দুটো বক। ভাসমান গাছের ডালে বসে পড়ল। এক সময় মনে হল এই দুর্যোগ থেকে তিথিকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। সেও ভেসে যেতে পারে। নদীর এমন ভয়ঙ্কর রুদ্ররূপ সে যেন জীবনেও দেখেনি। সে ইচ্ছা করলে আত্মরক্ষার্থে তিথিকে ফেলে চলে যেতে পারে—তিথি যা খুশি করুক। কিন্তু তিথিকে ফেলে যাওয়ার যে তার ক্ষমতাই নেই। মরে গেলেও তিথিকে নিয়েই মরে যেতে হবে।
সে না বলে পারল না, কী হল বসে থাকলি কেন? দ্যাখ কী অবস্থা। বুঝতে পারছিস না। দুর্যোগ সব গাছপালা উড়িয়ে নিতে চাইছে। তুই কী মরতে চাস!
তিথি পাটাতনে উঠতে গিয়ে নৌকার দুলুনিতে টাল সামলাতে পারল না। জলে পড়ে গেল। নৌকার কিনার ধরে ফেলায় স্রোতের মুখে ভেসে গেল না ঠিক, তবে কেমন অসহায় চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। নৌকার কিনার ধরে সে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালে তিথি জলের মধ্যে সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল।
তিথি! তিথি!
কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে পাগলের মতো শুধু চিৎকার করছে, তিথি! তিথি!
মুহূর্তে মনে হল তিথি অদূরে ভেসে উঠেছে জলের ওপরে। জন্ম থেকে সে এই নদীকে চেনে। নদীর ক্ষমতাই নেই তাকে ডুবিয়ে দিতে পারে। সে ভুস করে জলে মুখ দেখিয়ে আবার ডুবে গেল! আবার কিছুটা দূরে চলে যাচ্ছে, আবার ভুস করে ভেসে ওঠে তার মুখ দেখাচ্ছে। সে পাড়ে পাড়ে ছুটে যাচ্ছে। সে চিৎকারও করতে পারছে না, তিথি জলে ডুবে যাচ্ছে। জলে ডুবে যাচ্ছে না, তাকে নিয়ে নদীর পাড়ে মজায় মেতেছে, তখনই তিথি পাড়ের জঙ্গল আঁকড়ে তাকে ডাকছে—অরুদা, আমি এখানে। সে দৌড়ে কাছে গেলে বলল, একটা কথা বলব?
জীবনমৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তিথির এ কী খেলা! জঙ্গল থেকে তার হাত ফসকে গেলেই তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। জলের ঘূর্ণি এখানটায় প্রবল। দুর্যোগের মুখে স্টিমার পর্যন্ত জায়গাটা এড়িয়ে চলে। যতই সে নদীকে চিনুক, এই প্রবল ঘূর্ণিতে সে হাত ছেড়ে দিলেই জলের নিচে খড়কুটোর মতো তলিয়ে যাবে।
তিথি কি তার শেষ কথা তাকে বলার জন্য অপেক্ষা করছে? তা হলে ফেললেই আর তার মরার ভয় থাকবে না?
সে দাঁড়িয়েই আছে।
তিথি স্রোতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সে লাফিয়ে জলে নেমে যেতে পারছে না। নামার সময় মাটি ধসে যেতে পারে। মাটি ধসে গেলেই ঝোপজঙ্গলসহ তিথি আবার তলিয়ে যাবে।

সে চিৎকার করে বলল, আমি আর পারছি না। তোর আর কী কথা আছে বল! আমাকে আর কত আতঙ্কে রাখবি?

অরুদা তুমি তুলিদিকে কিন্তু কখনও স্বপ্নে দেখবে না। কথা দাও।

অরণি হাসবে না কাঁদবে না ভয়ঙ্কর বিরক্তিতে চুল ধরে জল থেকে তুলে আনবে বুঝতে পারছে না। সে মুখ খিঁচিয়ে বলতে গিয়ে ভাবল, তা হলে আর এক বিড়ম্বনা শুরু হবে। হয়তো সত্যি হাত ছেড়ে দিয়ে তিথি নদীর অতলে মৎস্যকন্যা হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

আর আশ্চর্য, তার কথারই প্রতিধ্বনি যেন করছে তিথি। বলছে অরুদা আমি তো অন্য জন্মে নদীতে মৎস্যগন্ধা হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। এ—জন্মে তিথি হয়ে জন্মেছি। তুমি তো কিছুই জানো না।

কত নিশ্চিন্তে এমন কথা বলছে, তার মাথা ধরে যাচ্ছিল। মৃত্যুর মুখে পড়ে গিয়ে, ঠিক পড়ে গিয়ে নয়, যেন কোনও আত্মবিনাশের প্রবণতা থেকে মেয়েটা তার সঙ্গে এভাবে কথা বলছে।

সে আর পারছে না। বলল, ঠিক আছে, সাবধানে উঠে আয়। নে, বলে সে গামছার প্রান্তভাগ ছুঁড়ে দিল তিথির দিকে। তিথি ইচ্ছে করেই যেন ধরল না। এমনকি চেষ্টাও করেও দেখল না, গামছাটা ধরা যায় কিনা।

শুধু বলল, কী দেখবে না তো?

না, দেখব না।

তুমি আমাকে স্বপ্নে না দেখলে তুলিদিকেও স্বপ্নে দেখবে না।

দেখব না, দেখব না।

তিন সত্যি।

তিন সত্যি।

তারপরই তিথি জলের ঘূর্ণিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আট

শেষে অবশ্য তিথিকে খুঁজে পাওয়া গেল ইলিশ মাছের নৌকায়। জেলেরা টের পেয়েই জলে লাফিয়ে পড়েছিল।

তারপর সেই দুর্যোগের মধ্যে তিথিকে নিয়ে বাড়ি আসতে পেরেছিল ঠিক, তবে সেদিনই জ্বরে পড়ে গেল অরণি। জ্বর বাড়ল। বাবা বাড়ি নেই—তিনদিনের মাথায় বুকে কফ জমে গেল—কবিরাজ অমূল্যধন, এলাকার ধন্বন্তরি, তিনি বলে গেলেন, সান্নিপাতিক জ্বর—ভোগাবে।

অরণি প্রায় মাসখানেক বিছানায় পড়ে থাকল। এত দুর্বল হয়ে গেল যে প্রায় উঠতে পারে না। বিছানায় লেগে আছে। বাবা ফিরে এসে খুব প্রমাদ গুণলেন। তিথি বলতে গেলে সারাদিন তার ঘরেই পড়ে থাকে। সেবা—শুশ্রূষারও শেষ ছিল না। বাবাই তিথিকে অনুপান—সহ কখন বড়ি মেড়ে খাওয়াতে হবে বলে দিয়েছেন। যেমন বাসকপাতা, তুলসিপাতা, মধু এবং পুনর্ণবার পাতা তিথিও ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করত। একেবারে একজন শিশুকে যেভাবে পরিচর্যা করা দরকার, তিথি তাকে সেভাবেই অতি যত্নে বিছানা থেকে তুলেছে, কপালে জলপট্টি দিয়েছে, এবং তিথি যে কত দায়িত্বশীল তার এই পরিচর্যার বহর না দেখলে বিশ্বাসই করা যেত না। তার আরোগ্য কামনায়, সে সেই জঙ্গলের মন্দিরগুলিতে মাথা ঠুকে এসেছে, মানত করেছে, অরুদা ভালো হয়ে উঠলে তাকে নিয়ে যাবে। বাতাসা মিসরিভোগ দেবে।

বিকেলের দিকে বাবুরা আসতেন। বাবা ক'দিন ঘর থেকে বেরই হলেন না। জেঠিমা, তুলিও তাকে দেখে যায়। ছোট পিসি ঘরে ঢোকেন না। বাইরে থেকেই, মুখ বাড়িয়ে বলবেন, মুখে তোর রুচি কীরকমের?

তার খাওয়ায় রুচি ফিরে এলে বলেছিলেন, আর ভয় নেই। এবার ভালো হয়ে উঠবি। আর ভয় নেই। তিথির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, মেয়েটা তোর জন্য যা করেছে!

তিথি এসব কথায় খুবই লজ্জায় পড়ে যেত। টিপয়ের গেলাসে জল রেখে দিত ঢাকনা দিয়ে। বেদানার খোলা ছাড়িয়ে প্লেটে সাজিয়ে দিত। প্রথম পথ্যের দিনে হেলানচার ডগা সেই তুলে এনেছে। জঙ্গল থেকে গন্ধপাঁদাল। মৌরলা মাছ দিয়ে গন্ধপাঁদালের ঝোল পথ্য। তিথিই তাকে ধীরে ধীরে বাইরে নিয়ে এল একদিন। কাছারিবাড়ির বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার পেতে বলেছিল, আমার জন্য এই ভোগান্তি। কিছু হলে আমার যে কী হত! আমি আর কাউকে মুখ দেখাতে পারতাম না। বলেই ফুঁপিয়ে তার কি কান্না।

কাঁদছিস কেন? আমি তো ভালো হয়ে গেছি। অরণি বলত।

তিথি তখন তার কথায় জবাব না দিয়ে পালাত। সে দেখতে পেত তিথি সুপারিবাগানে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যেন এক দিশেহারা কিশোরী—সে শুধু দেখত। জোরে আর ডাকতে পারত না।

তিথি বড় সুন্দর দেখতে।

অরণি সুপারিবাগানের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবছিল। চুল কোঁকড়ানো। চোখ টানা টানা—গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে। নাকে নথ ঝুলিয়ে দিলে দুগ্গা ঠাকুর।

সে জানে ভেতর বাড়িতে তিথি ফুটফরমাস খাটতে ভালোবাসে—তিথি গামছাটা নিয়ে আয়, তিথি দ্যাখ বৃন্দাবনদা এল। ভাঁড়ার থেকে চাল, ডাল বের করে দে। ভেতর বাড়িতে দাদাদের সঙ্গে গেলে এমন কত কথা শুনতে পেত অরণি। বাজার থেকে ঝুড়ি ভর্তি সওদা এলে ফ্রক গুটিয়ে ছোট পিসির সঙ্গে বাজার গোছাত। কোথায় কী রাখতে হবে তিথি ঠিক জানে। কখনও বীণাপিসির সঙ্গে মাছ কুটতে বসে যায়—ঘাট থেকে কাটা মাছ ধুয়ে আনে। কোচরে থাকে থোকা থোকা লটকন ফল। ফাঁক পেলেই খোসা ছাড়িয়ে খায়। তার ঘরে এসে তাকেও দেয়।

যখনকার যে ফল, কোঁচড়ে নিয়ে ঘোরার স্বভাব। কামরাঙ্গা, লটকন, আঁশ—ফল—কোথায় যেসব পায়! জমিদারবাবুদের বাড়িগুলি পার হয়ে গেলেই মজা খাল, মজা খালের পাড়ে পাড়ে অজস্র গাছপালা, ঝোপজঙ্গল। তিথি জানে কোথায় কোন গাছ কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোন গাছে কী ফল পেকেছে—জমিদারিতে এলাহি গাছপালা। জঙ্গলেরও যেন ব্যবস্থা আছে। দিঘির পাড়ে বিলাতি গাব গাছের ছায়া বিকালে লম্বা হতে হতে দিঘিটাকে অন্ধকার করে দেয়। কালো জল, থামের মতো বড় বড় সব গজার মাছ ভেসে উঠলে তিথিই তাকে নিয়ে গেছে সেখানে—তিথিই খবর দিত, গাছে বিলাতি গাব পেকেছে। যেমনি গাছ, তেমনি তার বিশাল কাণ্ড। আর গাছে বড় বড় তেল চুকচুকে পাতা। গভীর ঘন ছায়ার মধ্যে লাল রঙের পাকা বিলাতি গাব তিথির চোখ এড়ানো কঠিন। জমিদারবাবুদের দেশটা সে যেন চিনেছে তিথির চোখ দিয়ে।

তিথি একটা বালিশ দিয়ে গেছে মাথার কাছে। ইজিচেয়ারে মাথায় বালিশ দিয়ে সে তিথির কথাই ভাবছিল।

মেয়েটার মাঝে মাঝে কী যে হয়?

এভাবে জীবন নিয়ে খেলা তিথির পক্ষেই সম্ভব। কারণ তিথি অনাথ। বাবুদের বাড়ির এঁটোকাটা খেয়ে সে বড় হয়ে উঠছে।

অরণি ভাবল অষ্টমী স্নানে এবারে তিথিকে নিয়ে যেতেই হবে। কাচের চুড়ি কিনে দিতে হবে। মেয়েটাও বেশি কিছু চায় না। ভালোবাসলে কাচের চুড়ি কিনে দিতে হয়—ভালোবাসার দাম সামান্য কটা কাচের চুড়ি—ভাবলেই কেন জানি মন খারাপ হয়ে যায় তার।

একমাত্র পূজার ছুটিতে অরণি বাড়ি যেতে পারে। স্টিমারে পাঁচ সাত ঘণ্টা লেগে যায় বারদি যেতে। সেখান থেকে গয়না নৌকায় সে বাড়ি যায়। বাবা সঙ্গে থাকেন। গেল পূজায় সে একাই গেছে। গাঁয়ের লোকজন বারদির ঘাটে কেউ না কেউ থাকে। ছোটকাকাও চলে আসেন তাকে নিতে।

বাড়ি গেলেই এক কথা কাকিমার, ও সেজদি দ্যাখ এসে, অরু আমাদের কত বড় হয়ে গেছে! সেদিনকার ছেলে, দেখলে চেনাই যায় না। এক একটা বছর যায় আর সে লম্বা পা ফেলে যেন দৌড়ায়। তিথিরও হয়েছে

তাই।

পূজার ছুটিতে বাড়ি যাবার সময় তিথিই তার সব গোছগাছ করে দেয়। জামা—প্যান্ট কেচে সব ধোপা বাড়ি দিয়ে আসে। তার বইপত্র গুছিয়ে দেয়। এবং স্টিমারঘাটেও যাওয়া চাই তার। হাতে টিনের স্যুটকেসটি তিথি কিছুতেই কাউকে দেয় না। স্টিমারে উঠে আসে বাবার সঙ্গে। তারপর স্টিমার ঘাট থেকে ছেড়ে দিলে মঠের চাতালে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ স্টিমার দেখা যায়—দাঁড়িয়ে থাকে।

অকারণে ঝগড়ারও শেষ নেই।

ব্যাটবল খেলার জন্য স্টাম্প বানাচ্ছে সে। মেজদা শহর থেকে ব্যাট কিনে এনেছে। একটি টেনিস বলও। তার উপর স্টাম্প বানাবার দায়িত্ব পড়েছে। সে জঙ্গলে ঢুকে জারুলগাছে উঠে গেছে ডাল কাটছে। তিথির তখন নিচ থেকে হাজার রকমের প্রশ্ন।

গাছে উঠেছ কেন? নামো। পড়ে হাত—পা ভাঙলে কে দেখবে।

শোন তিথি সবতাতে মাতব্বরি করবি না। ভাগ এখান থেকে।

ডাল কাটছ কেন বলবে তো!

আমার ইচ্ছে, কাটব।

না কাটতে পারবে না।

তোর গাছ?

হ্যাঁ আমার গাছ। নামো বলছি। উনি অবেলায় বাবুদের কথায় গাছে উঠে গেছেন!

ডালে কোপ দিতেই তিথির চেঁচামেচি শুরু।

অ হরমোহনদাদু, দ্যাখো এসে অরুদা গাছের ডাল কাটছে।

আর তখনই হরমোহনদাদুর তড়পানি শুরু হয়ে যায়। গাছের নীচে এসে তাড়া—নামেন গাছ থেকে। কে অবলায় আপনাকে গাছে তুলে দিয়েছে। পড়ে—টরে হাত—পা ভাঙলে কী হবে?

গ্রীষ্মের ছুটি, পুজোর ছুটি, বড়দিনের বন্ধে তিথির শুধু অপেক্ষা বাবুদের আত্মীয়স্বজনরা কে কবে আসবে। কেউ আসার কথা থাকলেই সে দৌড়ে সবার সঙ্গে স্টিমারঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মালপত্র নামানো হয়। তিথি দেখেশুনে সব মালপত্র নামায়। ছোট তরফের বউদিমণি এলে ত কথাই নেই। সে বউদিমণির ব্যাগ—এটাচি হাতে নিয়ে বাড়ি চলে আসে।

বউদিমণি এলে সে কিছু পায়।

যেমন সেবারে তাকে একটা গন্ধ সাবান দিতেই কি খুশি! নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকছে। তার ঘরে ছুটে এসে বলেছে, ছোট তরফের বউদিমণি দিল। একবার মেলা থেকে পেতলের মাকড়ি কিনে দিয়েছিল বাবার বউঠান—কী খুশি তিথি। বাড়ি বাড়ি সে কানে মাকড়ি পরে ঘুরেছে।

কে দিল রে?

গিন্নিমা দিয়েছে। গিন্নিমা বলল, তিথি, মেয়েদের কান খালি থাকলে ভালো দেখায় না। পেতলের মাকড়ি জোড়া দিলাম। সব সময় পরে থাকবি। কান খালি রাখলে বাড়ির অমঙ্গল হয়।

তিথি ভালো ফ্রক গায়ে দিলে, স্নো পাউডার মাখলে সবার এক প্রশ্ন—কে দিল?

অকপটে তিথি সব বলে দিত, কে কখন ডেকে তাকে কী কী দিয়েছে।

তিথির সঙ্গে তার যে দু—একবার হাতাহাতি হয়েছে, তাও আজ কেন যে মনে পড়ল!

সেই যে বছর সে এখানে চলে আসে, বোধ হয়, সেবারেই হবে। তখনও সবার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়নি। তিথির মামা, তার সমবয়সিই হবে, চরণের সঙ্গে ডাংগুলি খেলার জন্য গাছের ডাল খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পেয়ারা গাছের সোজা ডাল হলে ভালো হয়। পেয়ারা গাছের ডাল ওজনেও ভারী। উৎকৃষ্ট ডাং পেয়ারা গাছের ডাল থেকেই তৈরি করা যায়। ডাল কাটার দা নিয়ে বাগানে ঘোরাঘুরি করতেই সহসা তিথি উদয় গাছতলায়। চেঁচাচ্ছে—ও বৃন্দাবনদা, পেয়ারা গাছের ডাল কাটবে অরুদা। গাছের নীচে ঘুর ঘুর করছে।

মারব এক থাপ্পড়। আমি ডাল কাটব, তোকে কে বলেছে?

ডাল না কাটলে দা নিয়ে পেয়ারাতলায় কেন?

তোদের গাছ?

হা আমাদের গাছ।

বৃন্দাবনদা চেঁচাচ্ছে, অরুদাদা ও গাছের ডাল কাটবে না। কানে উঠলে বড়কর্তা রাগ হজম করতে পারবেন না।

অবশ্য গাছটা যে খুব দামি সে জানত। কাশীর পেয়ারা—এক একটা পেয়ারা পোয়াটেক ওজনের। বড়কর্তা গাছটা কাশী থেকে আনিয়েছিলেন কি না সে জানে না, তবে গাছটার প্রতি বড়কর্তার তীক্ষ্ন নজর থাকে সে জানে। সে গোপনে ডাল কাটবে ভেবে গাছের নিচে ঘুর ঘুর করছিল। মেয়েটার স্বভাব এত মন্দ, ঠিক খেয়াল রেখেছে। নিজের হলেও কথা ছিল।

সে বলেছিল, অমলদা বলেছে কাটতে।

কে অমলদা?

যেন তিথি বাড়ির ছোটবাবুকে চেনেই না।

ডাকব, অমলদাকে। তুই বাড়ির ছোটবাবুকে চিনিস না। তাদের এঁটো খেয়ে তুই মানুষ।

আমি কাউকে চিনি না। সোজা কথা বলে দিলাম, ডাল কাটবে না। কাটলে বিপত্তি হবে।

অমলদাও ছুটে এসেছিল।

কি হয়েছে রে অরু?

ডাল কাটতে দেবে না।

সহসা তেড়ে গেল তিথিকে, তুই কে রে? যা ভাগ।

তিথি কি সে মেয়ে! সে ছুটে এসে তার হাত থেকে প্রায় জোরাজুরি করেই দাটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল। এবং এতেই লেগে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। সে কিছুতেই ডাল কাটতে দেবে না। সে হাতের দা ছাড়বে না। সহসা তিথি তাকে জাপটে ধরে দা কেড়ে দৌড়। সে কিংবা অমল কেউ তার নাগালই পেল না।

পরে দেখা হলে বলেছিল, এমন সুন্দর গাছটায় ডাল কেউ কাটে! মায়া হয় না!

কত কথাই যে মনে হচ্ছিল অরণির।

অরু তারপর ক্রমশ আরোগ্যলাভ করতে থাকলে একদিন তিথিই তাকে ধরে ধরে নদীর পাড়ে নিয়ে গেল। স্কুলেও সে ক্রমে যেতে পারছে। এবং এভাবে নদীর ঘাটে এক সময় অষ্টমী স্নানের পরবও শুরু হয়ে গেল।

বর্ষায় নদীর দু—পাড় এমনিতেই দেখা যায় না। কত সব একমাল্লা, দোমাল্লা নৌকায় পুণ্যার্থীরা চলে আসছে। পানসি নাও দেখা গেল। নদীর উত্তরের চরের দিকটায় ললিত সাধুর আশ্রম, সেখানেও হাজার হাজার পুণ্যার্থীর ভিড়। সড়ক ধরে ক্রোশখানেক হেঁটে গেলে সেই মঠ মন্দির—সেখানেও পুণ্যার্থীরা জড়ো হয়েছে। সারা নদী জুড়ে বজরা, পানসি। আনারস, তালের নৌকারও বিশাল বিশাল বহর। নদীর পাড়ে বাবুদের সব প্রাসাদের পর প্রাসাদ, সেই সব প্রাসাদেও দূর দেশ থেকে এসেছে আত্মীয়স্বজনরা। নদীতে ডুব দিয়ে কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা বলবে বলে এসেছে।

তিথিও বসে নেই। সকাল থেকে সে ছোটপিসির সঙ্গে ফুল দুর্বা তুলেছে। তিল তুলসী কাঠের বারকোশে সাজিয়ে রেখেছে, সঙ্গে হরীতকী। বাবুদের মেয়ে বউরা ঘাটে ডুব দিতে যাবে। হরমোহনদাদুও বসে নেই। মাথায় ফেট্টি বেঁধে কাঁধে বাঁশের লাঠি ফেলে সবার আগে আগে যাচ্ছে।

তিথি অরণির দরজায় এসে ডাকল, কী হল? বসে থাকলে কেন! ঘাটে ডুব দিতে যাবে না। সবাই যাচ্ছে। এ—দিনে নদীর জলে ডুব দিলে কাশীবাসের পুণ্য হয় জানো!

অরণি চারপাশে খাতা বই মেলে বসে আছে। ওর এসবে খুব একটা বিশ্বাস নেই। তাছাড়া একগাদা টাস্ক বাকি। দ্বিজপদ সার টাস্ক দিয়ে গেছেন রাতে। সে বই—এর ভেতর ডুবে থেকেই বলল, তোরা যা, আমি পরে ডুব দিয়ে আসব।

পরে ডুব দিলে হবে! সময় পার হয়ে যাবে না। তুমি কিছুই জানো না। পড়া তো তোমার সারাজীবনই থাকবে—কিন্তু এই পুণ্যস্নান, এত গ্রহ সমাবেশ আবার কবে হবে কেউ জানে! সব বছর অষ্টমী স্নান হয়। মহাঅষ্টমী স্নান কালে ভদ্রে হয়।

আসলে তিথি ভেতর বাড়িতে যা শোনে তাই এসে উগলে দেয়।

অগত্যা, তাকে যেতেই হল। ডুবও দিতে হল। কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গাও বলতে হল।

তিথি আজ শাড়ি পরেছে। তিথিকে এত লম্বা লাগছিল দেখতে যে সে অবাক না হয়ে পারেনি। ফেরার পথে এক ফাঁকে সে তার কাছে এসে অতি সতর্কভাবে বলছিল, মন্দিরে যাব। আমাকে তুলিদি সঙ্গে নেবে বলেছে। তুলিদির সঙ্গে যাব না। বলেছি, ছোট তরফের বউদিমণির সঙ্গে যাব। বউদিমণি খবর পাঠিয়েছে। তুমি কিন্তু রেডি থেকো।

তারপরই আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেছিল, মনে আছে?

কী মনে আছে, কী জানতে চাইছে, অরণি বুঝতে পারছে না।

তিথি মনে করিয়ে দিল, তোমার অসুখের সময় মন্দিরে মানত করেছি। বাতাসা মিসরি কিনতে হবে। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কালভৈরবীর মন্দিরে যাব।

তিথি ঠিক দুপুরেই চুপি চুপি তার ঘরে হাজির। তাড়াতাড়ি রওনা না হলে মন্দির দর্শন করে বাড়ি ফেরা যাবে না। তিথির জন্য বাতাসা মিসরি কিনতে হবে, অরু সেজন্য বাবার কাছ থেকে টাকা নেবার সময় বলল, তিথি যে কি না, আমার জন্য মন্দিরে মানত করেছে। ও পয়সা পাবে কোথায়। থলে থেকে তোমার টাকা নিয়েছি।

জগদীশ আজ নাজিরখানায় যাননি। সকাল থেকেই তাঁর কাজের শেষ ছিল না। বাবুরা সবাই ঘাটে ডুব দিতে যাবেন। নতুন কাপড় গামছা সে ঘরে ঘরে হরমোহনকে দিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। বউঠানের জন্য লালপেড়ে, নলিনীর জন্য সাদা থান, তুলির জন্য লম্বা নতুন ফ্রক, বউমাদের জন্য তাঁদের শাড়ি—ডুব দিয়ে বাড়ি ফিরে সবাই আজ নতুন জামা—কাপড় পরবে। ধর্মাচরণের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে সেই নিয়েও তাঁর ভাবনা কম ছিল না। অরণিকে নিয়ে তিথি মন্দিরে যাবে, মানত থাকলে না গিয়েও উপায় নেই, অরণি টাকা নেবার সময় এজন্য তিনি না বলে পারলেন না—বেশি করে নাও। মেলায় গেলে কেনাকাটা করতে হয়। তিথি কিছু নিতে চাইলে কিনে দিয়ো। ওর তো দেখার কেউ নেই।

তিথিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে অরণির আর কোনও সংকোচ থাকল না।

নদীর পাড়ে গিজ গিজ করছে লোক। চাদর টাঙিয়ে অস্থায়ী তাঁবু তৈরি হয়েছে। স্টিমারঘাটের বিশ্রামাগারে মানুষজন গিজ গিজ করছে। রাস্তার দু—দিকেই জিলিপির দোকান, বিন্নি খই বস্তা খুলে বিক্রি হচ্ছে। লাল বাতাসা, আর কোথাও রসগোল্লা, বুঁদে, যে যা পারছে নদীতে ডুব দিয়ে এসে শালপাতায় খাচ্ছে।

তিথির কোনও দিকেই যেন খেয়াল নেই।

সে হেঁটে যাচ্ছে। ভিড় দেখলেই সরে দাঁড়াচ্ছে। হেমন্তবাবুর প্রাসাদ পার হয়ে, সেই বড় মাঠ, মাঠেও তাঁবু পড়েছে। কোথাও আয়না, চিরুনি, তাবিজের মালা, মণিহারি দোকানে সুগন্ধ তেল, সাবান, কী নেই! যেন সারা দেশ থেকে যে যা পেরেছে, সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

তিথির কোনও দিকেই খেয়াল নেই।

ক্রোশখানেক পথ হাঁটতে হবে। এদিকটায় বেশ ফাঁকা। তারপর বাজার। তার বাবা গোরাচাঁদ মেলায় জিলিপির দোকান দিয়েছে, সে ওদিকটায় কিছুতেই গেল না। যেন সে তার বাবাকে এড়িয়ে কোনওরকমে

এখন মন্দিরে পৌঁছতে চায়। হাতে কাঁসার ঘটি, তাতে নদীর জল—মন্দির সংলগ্ন মাঠে মিসরি, বাতাসার দোকান—অরু বলল, মিসরি বাতাসা কিনতে হবে তো!

তিথির গায়ে ভারী সুঘ্রাণ। শাড়ির আঁচল বিছিয়ে বলল, কী সুন্দর না, কত কারুকাজ করা রেশমি সুতোয়। বাতাসা মিসরির ঠোঙা শাড়ির আঁচল মেলে তুলে নিল। এক হাতে কাঁসার ঘটি আর আঁচলে বাতাসা মিসরির ঠোঙা। সে ভিড় ঠেলে অরণির হাত ধরে মন্দিরে ঢুকে গেল। তারপর সোজা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। অরণি কিছুই বলতে পারছে না। জায়গাটা মানুষজনের যাওয়া—আসায় জল—কাদায় মাখামাখি।

তিথি সবই করছে, যেমন ফুল বেলপাতা তার হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে, শিবের মাথায় জল ঢালতে বলছে। এক মন্দির থেকে আর এক মন্দিরে লাফিয়ে লাফিয়ে ঢুকছে, ভোগের মিসরি বাতাসা কলাপাতায় রেখে দিচ্ছে। তিথি প্রণাম করে উঠে তার দিকে তাকিয়ে আছে, অরণি আর কী করে, সেও হাঁটু গেড়ে প্রণাম করছে।

ফেরার সময়ই অরণি না বলে পারল না, কিরে, তোর সেই দোকান দেখছি না! দু—হাত ভরে কাচের চুড়ি পরবি বললি, তুই কেমন হয়ে যাচ্ছিস। গোবর্ধন দাসের দোকান কোথায়?

তিথি হাসল। তুমি আমাকে কিনে দেবে?

কোথায় দোকান।

তিথি বলল, থাক।

না থাকবে না। কোথায় দোকান বল!

অরণি মেলায় সেই দোকান কোথায় খুঁজে বেড়াতে থাকল। তিথির লজ্জা হয়েছে। তিথির এই আচরণে সে কিছুটা বেকুফ। চারপাশে এত জিলিপির দোকান মিষ্টির দোকান, সে কিছুই যেন দেখছে না।

অরণি এবার নিজেই বলল, আয়। জিলিপি খাই। গরম গরম জিলিপি আমার খেতে বেশ লাগে।

তুমি খাও, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

তোকে কেউ কিছু বলেছে?

কী বলবে!

আমার সঙ্গে আসায়?

না। কেউ কিছু বলেনি। বললেই শুনব কেন! তুলিদি ডেকে পাঠিয়েছিল, মেলায় আমার সঙ্গে যাবে। আমি তো সব বুঝি অরুদা। তোমার সঙ্গে মেলায় ঘুরি তুলিদির পছন্দ না। আমিও বলে দিয়েছি, না, যেতে পারব না। ছোট তরফের বউদিমণি ডেকে পাঠিয়েছে।

তারপরই মেলায় মন্দিরের সামনে টেনে নিয়ে গেল তাকে।

একটা কথা বলব!

বল।

তুমি মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলবে, তুলিদিকে কখনও স্বপ্নে দেখনি!

অরু বলল, কেন তুলি তোকে কিছু বলেছে?

তুলিদি যে বলল, তুমি তাকে প্রায়ই স্বপ্নে দ্যাখো।

মিছে কথা।

মন্দিরে ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে বলো, মিথ্যে কথা।

সে ভেতরে ঢুকে দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, মিথ্যে কথা। তুলিকে আমি কখনোই স্বপ্নে দেখিনি।

তিথি কী খুশি!

সে তার নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে। অরুর হাত ধরে হাঁটছে। এতক্ষণ চারপাশে কী ছিল, কারা ছিল সে কিছুই খেয়াল করেনি। কাচের চুড়ির কথাও মনে ছিল না। অরুদা, তুলিদিকে স্বপ্নে দেখে এই তাড়নাতেই সে কাহিল ছিল। দেবতার সামনে কেউ মিছে কথা বলে না। অরুদা দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে,

তুলিদিকে কখনোই স্বপ্নে দেখেনি। স্বপ্নে না দেখলে ভালোবাসাও হয় না। সে কিছুতেই এতক্ষণ নিজের কথাটা বলতে পারছিল না—তাকে অরুদা স্বপ্নে দ্যাখে কি না।

অরণি বানিয়ে বলল, জানিস সেদিন রাতে তোকে স্বপ্নে দেখলাম। তুমি আমি মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। গরম জিলিপি ভাজা খাচ্ছি। তারপর নদীর চরে নেমে গেলি, জলে মাটির প্রদীপ ভাসালি।

আর তিথিকে পায় কে? মন্দিরে না নিয়ে এলে সে কিছুই জানতে পারত না। তার যে কত কাজ এখন। পুণ্যার্থীরা নদীর পাড়ে জড়ো হয়ে ডুব দিয়েছে। যে যার মতো ব্রত উদযাপন করছে। কেউ অঘোর চতুর্দশী ব্রতের জন্য ধুতুরা ফুলের মালা গলায় পরে পুরোহিতের সামনে বসে গেছে। কেউ মৌনি স্নান করছে—ভূত চতুর্দশী ব্রত, সাবিত্রী চতুর্দশী—যার যেমন মানত। নদীর বুকে যতদূর চোখ যায় শুধু নৌকা আর নৌকা, কোনওটায় ছই দেওয়া, গয়না নৌকাও আছে। পানসি বজরা—যেদিকে চোখ যায়, শুধু মানুষের সমারোহ। জলে প্রদীপ ভাসাচ্ছে কেউ। তিথি তার অরুদার কল্যাণ কামনায় জলে প্রদীপ ভাসিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে থাকল। স্রোতের মুখে প্রদীপ ঘুরে ঘুরে কতদূর নিমেষে চলে যাচ্ছে।

মন্দিরতলায় সাধু সন্নেসিদের ভিড়। মাঠের দিকটায় নাগরদোলা, হাড়ি পাতিলের দোকান, জাদুকরের তাঁবু, কোথাও আবার হরিসংকীর্তন, খোল করতালের সঙ্গে জায়গাটায় যেন মাটি ফুঁড়ে ধ্বনি উঠছে। অরু হাত ধরে তিথির কেন জানি মনে হচ্ছিল আশ্চর্য এক করুণাধারায় সে ভেসে যাচ্ছে। সে মোহিত হয়ে গেছে সব দেখে। কিছুতেই তার নড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না।

এই তিথি! দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? গোবর্ধন দাসের দোকানে যাবি না!

যে সম্বিত ফিরে পেল সে। তার তো আর কিছুই দরকার নেই। সে তো সবই পেয়ে গেছে। চুড়ি পরে আর কী হবে! তবু অরুদার কথা সে ফেলতে পারল না। গোবর্ধন দাসের দোকান আস্তাবলের কাছে। সে সেখানে ছুটে যেতে চাইলেই সহসা কে যেন বলল, এই তুই তিথি না!

সে থমকে দাঁড়াল। লোকটাকে সে কোথায় যেন দেখেছে! আবার মনে হল লোকটাকে সে যেন চেনে। গলায় কণ্ঠি, মাথায় ছাঁটা চুল, ধুতি পরনে, ফতুয়া গায়। কপালে তিলক কাটা—লোকটা রাস্তা আগলে আছে। সামনে তাকে কিছুতেই এগোতে দিচ্ছে না।

কী রে জবাব নেই কেন। তুই তিথি না! গোরাচাঁদের আগের পক্ষের মেয়ে না তুই!

তিথি বলল, হ্যাঁ, কেন!

তোকে কত ছোট দেখেছি। তুই কবে এতবড় হয়ে গেছি—তোর বাপের দোকানে গেলাম। বলল, দেখুনগে হয় বাড়িতে আছে, নয় মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বললাম, তোর তো এঁটো খাওয়ার অভ্যাস! অভ্যাসটা আছে, না গেছে।

অরুর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। একজন আগন্তুক যদি গায়ে পড়ে তিথিকে অপমান করতে চায়, সে ছাড়বে কেন।

অরণি বলল, কে বলেছে ও এঁটো খায়! আপনি কে!

আরে আমি জানি না ভাবছ। বাবুদের আমি তোলা আদায় করতাম। তোমার বাবা আমাকে চেনে। তিথির বাবাকে পালমশাই খবর পাঠিয়েছেন। ঐ যে দেখছ, দূরে, ঠিক বরাবর দেখ, দেখছ না, নদীর বুকে বজরা নৌকা একখানা, ওখানে কর্তামশাই তার পরিবার নিয়ে আছেন। মহাঅষ্টমী স্নান বলে কথা। আমাকেই পাঠাল, আমি তো খুঁজে বেড়াচ্ছি, পাই কোথা। এখানে এসে গোরাচাঁদের কথা মনে পড়ে গেল। আয় মা, তুই যে অন্নপূর্ণা, কে না জানে! চল আমার কর্তামশাইকে দর্শন দিয়ে আসবি।

লোকটা কি পাগল! অরণির এমনই মনে হল। কিন্তু লোকটা যে বলল, সে তার বাবাকে চেনে! তিথির বাবাকেও চেনে। লোকটাকে চটাতেও পারে না! সে কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে জানতে পারলে বাবা খুবই দুঃখ পান।

কী করে আর অরু! শুধু বলল, রাস্তা ছাড়ুন আমরা যাব।

কোথায় যাবে? তুমিও সঙ্গে চল না। কর্তামশাই তোমাকে দেখলে খুশিই হবেন। তোমার বাবা বন্দরে গেলে, মহাজনের সঙ্গে একবার দেখা না করে আসেন না। বাবুরাও চেনে। কত বড় মানুষ, বড় মনকষ্টে ভুগছেন।

অরণি ফিক করে হেসে দিল। লোকটার কাতর অনুনয় তাকে ভারী কৌতূহলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কে মহাজন, সে নামই শোনেনি। অথচ লোকটা যেভাবে কথা বলছে, তাতে কর্তামশাইটি যে খুবই ধনাঢ্য ব্যক্তি বুঝতে অসুবিধা হয় না। বজরায় চেপে পুণ্যস্নানে এসেছেন। তার দাসী বাঁদি চাকর—বাকরের মধ্যে বোধ হয় এই লোকটিও পড়ে। বজরার পাশে আলাদা নৌকায় তারা আছে। অরু খুব গম্ভীর গলায় বলল, ঠিক আছে পরে যাবে। ওর বাবাকে না বলে যায় কী করে?

তখনই তিথি কেমন লোকটার শরীরে দুর্গন্ধ পেল। লোকটার হাবভাব একদম ভালো না। মেলায় দুষ্টু লোকের অভাব থাকে না। সে অরুর দিকে তাকিয়ে বলল, শিগগির চলে এসো অরুদা। বলেই ছুটতে থাকল। দ্রুত এবং যত সত্বর সম্ভব লোকটার নাগাল থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যেন ছুটছে।

অরণিও ছুটতে থাকল। তিথি কি ভয় পেয়ে গেছে! ঝাউতলার কাছে গিয়ে দেখল তিথি দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাঁপাচ্ছে। চোখ মুখে ভীষণ উত্তেজনা। এত হাঁপাচ্ছে যে কথা বলতে পারছিল না। প্রচণ্ড ঘামাচ্ছে।

অরণিও দম নিতে পারছিল না। মন্দিরতলা থেকে এই ঝাউতলার দূরত্ব কম না। তিথি কখনও নৌকায় লাফিয়ে পড়েছে—এক নৌকা থেকে আর এক নৌকায়। সোজা রাস্তায় ভিড়ের জন্য হাঁটা যাচ্ছে না। তিথি পালাবার জন্য নৌকাগুলির উপর দিয়ে ছুটছিল। কোনও নৌকা কাত হয়ে যাচ্ছে, কোনও নৌকা টলে উঠছে, নৌকার আরোহীরাও তাকে তেড়ে গেছে—কি দস্যি মেয়েরে বাবা! কার মেয়ে? মেলায় এসে সাপের পাঁচ পা দেখেছে।

কিন্তু তাকে কিছু বলার আগেই তিথি আর এক নৌকায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে, চরের কাছে রাস্তায় এত ভিড় নেই। সে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে যখন উঠছিল, সব নৌকা থেকেই মানুষজন চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

কার মেয়ে?

কোথায় থাকে?

পরীর মতো জলে উড়ে বেড়ায়। মা—বাবাই বা কেমন।

কেউ বলল, কচি খুকিটিও নও। লজ্জাশরম খেয়ে বসে আছো। পায়ের শাড়ি তুলে নৌকা থেকে নৌকায় লাফিয়ে ছুটে যাচ্ছ!

তিথি কিছুই গ্রাহ্য করছিল না। সে ঘাটের সিঁড়ি ধরে আবার জনারণ্যে মিশে গেছে। লোকটা তাকে খুঁজে পেলেই যেন তার মরণ।

অরুকেও সবাই দেখেছে, মেয়েটার পিছু পিছু নৌকা থেকে আর এক নৌকায় লাফিয়ে পড়ছে।

এই তিথি, কী হল তোর?

শিগগির চলে এসো।

কেন!

বলছি, চলে এসো! কেন, পরে বলব।

এখন তারা দুজনেই মজা খালের সাঁকোর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর বিশাল বিলাতি গাবের গাছ। তার ঘন ছায়ায় ঠান্ডা হয়ে আছে জায়গাটা। মানুষজনের চলাচল কম।

দুজনই এতক্ষণ হাঁপাচ্ছিল। দুজনেই এবারে যেন কিছুটা ধাতস্থ। তিথি বলল, লোকটা ভালো না অরুদা। মহেশ পাল বাজারে তোলা আদায় করত। এতক্ষণ সব মনে পড়ছে। লোকটা ছ্যাঁচড়া স্বভাবের। বাবুরা তাড়িয়ে দিয়েছিল। আবার কেন এখানে উদয় কিছুই বুঝছি না।

অরু বলল, তোর বাবাকে সত্যি চেনে?

চিনবে না কেন? বাবাকে বাজারে কিছুতেই বসতে দেবে না। আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আসত। বাবার তো জানো তখন মাথা খারাপ। ঠাঁই নেই কোথাও। বাজারের ফাঁকা জায়গায় ফুলুরি ভেজে পয়সা হত, লোকটার হম্বিতম্বিতে বাবা খুবই ঘাবড়ে গেল। পরে দেখেছি, আমাদের বাড়িতেও আসত। বাবা না থাকলে...

তিথি চুপ করে গেল। যেন বোবা হয়ে গেছে।

ঠিক আছে চল। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না।

যেন কোনও গত জন্মের পাপের বোঝা বয়ে তিথি হাঁটছে। তার বোধহয় পা চলছিল না। লোকটা তার শরীর কচলাত। বাবা বুঝত কি বুঝত না সে জানে না, সেও কিছু বলত না, লোকটা বাড়ি উদয় হলেই আতঙ্কে সে পালাবার চেষ্টা করত।

তারপর তার আর কিছু মনে পড়ছে না। তার বয়সই বা কত তখন। মহেশ পাল যে ছ্যাঁচড়া স্বভাবের বাবুদের কানেও কথাটা উঠে গেল। ভুঁইঞা কাকা না থাকলে কি যে হত! লোকটাকে ডেকে বললেন, 'মহেশ অনেক হয়েছে। তোমার অনাচারে বাবুদের ইজ্জত যেতে বসেছে। কাল থেকে যেন সকালে উঠে আর তোমার মুখ দেখি না। তিথি তোমার হাত কামড়ে দিয়েছে কেন—তুমি এত বড় অমানুষ!'

তারপর থেকেই লোকটা হাওয়া।

তিথির সবই মনে পড়ল। লোকটা যে তার আবার পেছনে লেগেছে, সেও টের পেল। ভাবতে গিয়ে চোখমুখ এত কাতর হয়ে পড়ছে যে সে আর একটা কথা বলতে পারছে না। ভয়ে বুক থেকে কান্না উঠে আসছে।

তখন সাঁজ লেগে গেছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে নদীর পাড়ে। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে গ্রামগুলি—শুধু মঠের দিকটায় কিংবা নদীতে লণ্ঠন জ্বলছে—দোকানে দোকানে হ্যাজাক, ডেলাইট। এবং দূরে সেই বজরায় বোধ হয় হ্যাজাকের আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। ওটা গোপীবল্লভ মহাজনের বজরা—চাউর হয়ে গেছে সারা মেলায়। কারণ যারা পুণ্যস্নান করে নদীর পাড়ে খড়কুটো জ্বেলে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করছে, তারাই বলাবলি করছিল—তীর্থ মাহাত্ম্যের কথা। মহাজনের মতো জাঁদরেল মানুষও বিধাতার কোপের শিকার হতে চায় না। অষ্টমী স্নানে নদীতে ডুব দিতে এসেছে।

তিথি হাঁটছিল ঠিক, তবে তার মধ্যে কোনও বিসর্জনের বাজনা বাজছে বুঝতে কষ্ট হয় না। কাছারিবাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যাবারও তার ক্ষমতা নেই। অন্ধকার গাছপালার ছায়ায় তিথি কেমন নিস্তেজ গলায় ডাকল, অরুদা।

কী হল, এত পেছনে পড়ে থাকলি কেন?

তিথি নড়ছে না।

অরু কাছে গিয়ে বলল, শরীর খারাপ?

তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরো।

অরুর খুবই সংকোচ হচ্ছিল, রাস্তার উপর যে জড়িয়ে ধরা যায় না কিছুতেই তিথি বুঝছে না। কে কখন দেখে ফেলবে, বাড়ি ফেরার এই রাস্তাটা যতই নির্জন হোক, বাবা নাজিরখানা থেকে এখন ফিরে আসতে পারেন। বৃন্দাবনদা, হরমোহনদা, কিংবা অন্য কেউ, কত লোকই এই রাস্তায় হেঁটে যায়, সে কিছুতেই তিথি বললেও তাকে জড়িয়ে ধরতে পারে না।

সুপারিবাগানের ভেতর ঢুকে গেলে কিছুটা আড়াল মিলতে পারে। বাগানের শেষ দিকটায় মুলিবাঁশের ঘর তিথিদের। দাওয়ায় কুপি জ্বলছে দূর থেকেও বোঝা যায়। তিথির ভাইবোনদের কোলাহলও টের পাওয়া যাবে কিছুটা ভেতরে ঢুকে গেল। বোধ হয় এভাবে পাগলের মতো ছোটা তিথির উচিত হয়নি। খুবই কাহিল হয়ে পড়তে পারে।

সে বলল, চল তোকে বাড়ি দিয়ে আসি। তুই এভাবে না ছুটলেই পারতিস।

তিথি সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

কেন আমি ছুটেছি, তুমি জানো?

লোকটাকে তোর এত ভয় কেন বুঝি না।

বুঝবে না। আমি মরে গেলেও বুঝবে না কিছু, কেন তিথি মরে গেল।

আবার পাগলামি শুরু করলি।

লোকটা বাবাকে টোপ দিচ্ছে। লোকটার কাছে, বাবার কাছে আমি এখন টোপ ছাড়া কিছু না। নিজেকেই ঘেন্না হচ্ছে। আচ্ছা অরুদা আমার শরীরে কী আছে বলো তো, আমি কেন টোপ হয়ে ঝুলব। শরীর জ্বালিয়ে দিলে তোমাদের সবার শিক্ষা হবে।

তিথির মধ্যে আবার আগেকার সেই তিথি হাজির। তাকে জড়িয়ে না ধরায় সে অপমানিত বোধ করছে। সমবয়সি এই মেয়েটিকে সে ঠিক যেন বুঝতে পারছে না। তিথিকে কেন টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হবে! কীসের টোপ। কে সেই শিকারি, যে টোপ নাকের ডগায় ঝুলিয়ে ফেলে দেবে। কবে থেকেই যেন তিথি এটা অনুমান করতে পেরে তাকে নিয়ে বারবার উধাও হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না, অরুর এতে বিন্দুমাত্র সায় নেই বলে। তিথির যা সাজে, তার তা সাজে না।

অরু তো ইচ্ছে করলেই তিথিকে নিয়ে দেশান্তরী হতে পারে না। সে এখানে পড়তে এসেছে। স্কুলের মাস্টারমশাইরা তার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল এমনও ভাবে। বাবুদের বাড়ির সবাই তাকে খুব ভালো এবং বিনয়ী বলে জানে। বাবার সে খুবই অনুগত। সে ইচ্ছে করলেই তিথির মতো পাগল হয়ে যেতে পারে না।

সে নিজেকে সামলে নিচ্ছিল।

তিথি তাকে জড়িয়ে ধরেছে। তিথি কিছু চায়। কী চায় সে—যে বোঝে না তাও না। কিন্তু সে তো মনে করে এতে তিথি খাটো হয়ে যাবে। সেও খাটো হয়ে যাবে। এই সব আশঙ্কাতেই সে তিথিকে জড়িয়ে ধরতে সাহস পাচ্ছে না।

সুপারির বাগান বলে যথেষ্ট আড়াল রয়েছে। জ্যোৎস্না রাতেও কিছুটা ম্রিয়মাণ অন্ধকার এবং নদী থেকে হাওয়া উঠে আসছে। সুপারি গাছগুলো হেলছে দুলছে। নীচে সবুজ ঘাস। তাকে জড়িয়ে তিথি ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছিল।

আর এ—সময়ে তিথি বড়ই বিহ্বল গলায় বলছে, অরুদা আমি আর পারছি না। কেমন নিস্তেজ গলার স্বর, এবং কিছুটা গোঙানির মতো শোনাচ্ছে। তুমি আমার সব দেখেছ। আমার আর কিছু গোপন করার নেই। আমার সব ভেসে যাচ্ছে অরুদা।

আবার সেই স্খলিত গলার স্বর—আমি ডুবে যাচ্ছি। তুমি আমাকে জড়িয়ে না ধরলে বাঁচব না।

আর অরু কেমন এক আশ্চর্য গন্ধ পেল তিথির শরীরে। ভেসে গেলে কিংবা ডুবে গেলে মেয়েদের শরীরে এসময় এক আশ্চর্য গন্ধে ভরে যায় বোধ হয়।

প্রথমে মনে হল, পদ্মপাতার গন্ধ।

তারপর মনে হল নদীর জলের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা শ্যাওলার গন্ধ এবং শেষে কেন যে মনে হল নদীর জলে মাছের ঝাঁক ভেসে গেলে যে গন্ধ ওঠে, কেমন এক আঁশটে গন্ধ তিথির শরীরে।

নারী রহস্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে মেয়েদের শরীরে এমনই বুঝি ঘ্রাণ পাওয়া যায়। এবার তিথিকে আলিঙ্গনে অবারিত মুগ্ধতায় নিয়ে যেতে চাইল অরু। তিথির হুঁশ নেই। তারও না। স্বপ্নের মতো এক অস্পষ্ট ইচ্ছার জগতে তারা ভ্রাম্যমাণ। কেন যে মনে হচ্ছিল অরুর, যে—কোনও সময় তাঁর হাত থেকে পিছলে যেতে পারে তিথি। নদীর জলে পড়ে গেলে তিথি সত্যি কোনওদিন মীন হয়ে তার অপেক্ষায় নদীতে ঘুরে বেড়াতে পারে।

নদীর জলে ডুবে গেলে তাকে আর সে কিছুতেই খুঁজে পাবে না।

যখন উভয়ের হুঁশ ফিরে এল, অরণি কেমন লজ্জায় পড়ে গেল। তিথিকে অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখাচ্ছিল। সে তার শাড়ি সায়া ব্লাউজ বুকে জড়িয়ে রেখেছে। এবং বারবার বলছে, তুমি যাও অরুদা, তুমি কিচ্ছু জানো

না। তুমি বোকা আছো।

অরু কিছুটা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়েছিল। সত্যি সে কিছু জানে না।

তুমি যাও না অরুদা! কে আবার দেখে ফেলবে। এবং এও বুঝতে পারছে, তিথি খুব দ্রুত সায়া গলিয়ে দিচ্ছে। তারপর শাড়ি পেচিয়ে এক দৌড়। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। সুপারিবাগানের ভেতর দিয়ে তিথিদের বারান্দায় যে কুপিটা জ্বলছিল, দপ দপ করে তাও নিভে গেল।

অরণি বুঝে পেল না, স্বপ্নের জগতে তিথিকে সে মীন হয়ে জলে ভেসে যেতে কেন যে দেখল!

জলের গভীরে তিথি ডুব দিচ্ছে, ভেসে উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে। ঠিক ভরা গাঙে যেন একটা শুশুক মাছ। স্তন্যপায়ী মাছের ডুবে যাওয়া ভেসে ওঠা সে কতদিন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে তিথির সঙ্গে সে দেখেছে। তিথির যে কী হত, শুশুক মাছ দেখলেই জলে লাফিয়ে পড়তে চাইত। মাঝ নদীতে কিংবা কিনারে সে শুশুক মাছ ভেসে যেতে দেখলেই কেন যে বলত, অরুদা তোমার ইচ্ছে হয় না, পাখির মতো আমরা কোথাও উড়ে যাই, মাছের মতো আমরা কোথাও ভেসে যাই।

তারপরই কেন যে মনে হল, সে তিথির শরীরে আবিষ্ট হয়ে ডুবে যেতে পারেনি। আসলে জড়িয়ে ধরার উষ্ণতাই তাকে এত কাবু করে দিয়েছিল যে, সে বেশিদূর এগোতে পারেনি, কিংবা সাহস পায়নি, কিংবা স্তন অথবা শরীরের সঙ্গে তার শরীর মিশেই যায়নি, তার আগেই সে বুঝি হেরে গেছে, অথচ ভ্রাম্যমাণ কোনও শুশুক মাছের মতো জলের তলায় কেন যে মনে হয়েছিল তার, দীর্ঘক্ষণ সে বিচরণ করেছে। তার করুণ অবস্থা দেখে তিথি বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ক্ষেপেই গিয়েছিল—তুমি যাও অরুদা, তুমি যাও না। সে কাপুরুষের মতো কাজটা করে ফেলে বড় অসহায় বোধ করছে।

অথবা কোনও ঘোর থেকে সে যদি এসব দেখে ফেলে। দেখতেই পারে।

তিথিকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে তিথির শরীর তার মধ্যে নানা মোহ তৈরি করে দেয়। তিথি আজ শাড়ি পরায় সেই মোহ অতীব অনন্ত হয়ে বিরাজ করেছে তার মধ্যে। সারা দুপুর বিকেল অষ্টমীর মেলায় তিথির চঞ্চল স্বভাব তাকে যে তাড়া করেছে, সে তাও বোঝে। তিথিকে নিয়ে সে ফিরছিল, এবং এই নির্জন জায়গায় তিথিকে নিয়ে ঢুকে গেছে। ঢুকে গেছে না, ঘোরে পড়ে গিয়ে তিথির সর্বস্ব লুটে নেবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, কী যে হয়েছিল, সে কিছুই আর ঠিকঠাক মনে করতে পারছে না।

সে যখন কিছুই করতে পারছিল না, কারণ সে তো জানে না, কীভাবে শরীরে শরীর বিভোর হয়ে থাকে—তার অপটুত্ব নিশ্চয়ই তিথিকে পীড়া দিচ্ছিল। তিথি তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে হা হা করে বুঝি হেসেও উঠেছিল। তারপর দৌড়াতে পারে। কিংবা তিথি দাঁড়িয়ে আছে, সায়া শাড়ি বুকে জাপ্টে তাকে যে দেখছিল, সেটাও যে কোনও ঘোর থেকে দেখে ফেলেনি তার নিশ্চয়তা কি!

তারপরই মনে হল সে তার জামাপ্যান্টে হাত দিয়ে দেখতে পারে। রাতে স্বপ্নে কতবার প্যান্ট নোংরা করে ফেলেছে, চুপি চুপি উঠে গিয়ে প্যান্ট পালটেছে, দু—একবার বাবার কাছে সে ধরাও পড়েছে, বাবার এক কথা, বাইরে যাবি? যা। আমি জেগে আছি, ভয়ের কিছু নেই।

বাবা কি জানেন, এ—বয়সেই সবার এটা হয়। এবং সেই ভেবেই বাবা তাকে অভয় দিয়ে গেছেন। রাতে ওঠার অভ্যাস সবারই কমবেশি থাকে, বাবা কি ভেবে অভয় দিতেন তার কোনও স্পষ্ট ধারণা তার নেই। বাইরে বের হলে অন্ধকার মাঠ কিংবা বনজঙ্গলের এক ভূতুড়ে অবয়বের মধ্যে পড়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে—সেই ভেবে যদি বাবা অভয় দেন। সে টর্চ জ্বেলে বের হয় ঠিক, এবং ধোওয়া প্যান্ট হাতে আলগা করে তুলে নেয়। তারপর বাইরে বের হয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া প্যান্ট খুলে খুব সতর্কভাবে জংঘা এবং আশ্চর্য সব নীলাভ বনরাজিনীলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জল ঢেলে সব সাফ করে নিলে পবিত্রতা সৃষ্টি হয়। তারপর ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লে সহজেই ঘুমিয়ে যেতে পারে। আর যদি তা না হয়, সারা রাত তার অস্বস্তিতে ঘুম হয় না।

ঘোর যদি হয়।

সে তার প্যান্টের উপর প্রথমে হাত রাখল। না কিছুই ভিজে যায়নি। কিংবা পিচ্ছিল হয়ে নেই তার জংঘাদেশও। তবে তার এটা কী হল! কী দেখল! কিছুই হয়নি তার! অথচ কেন যে দেখল তিথিকে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ শুশুক মাছ হয়ে গেছে জলের নিচে। কেন যে দেখল, তিথি সায়া শাড়ি বুকে জাপ্টে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যোৎস্না রাত, নদীর ঢেউ, জলে অজস্র নৌকায় লম্ফের আলো, বাঁশবনে পাখির কলরব এবং স্টিমারঘাটের গ্যাসের বাতি তাকে কেমন কুহকে ফেলে দিয়েছে। অথবা তিথিও তাকে কুহকে ফেলে দিতে পারে। সে কিছুটা অন্যমনস্কভাবে তিথির খোঁজে বাড়িটায় গিয়ে দেখলে হয় সে বাড়িতে আছে, না মেলায় এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারাটা দিন সে যে তিথিকে নিয়ে মেলায় ঘুরেছে, তার কেন যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কিংবা সুপারিবাগানে ঢুকে সে তিথিকে নিয়ে মজে গিয়েছিল, তাও ভাবতে তার কষ্ট হচ্ছে। খুবই একা এবং নিঃসঙ্গ সে। মনে মনে সে তিথিকে নিয়ে কত কিছু ভাবে—তিথির জন্য এই আকুলতাই তার এই ঘোরে পড়ে যাওয়ার মূলে। তিথিকে টোপ হিসাবে কে ব্যবহার করতে চায়—যদি চায়ই, তিথি ইচ্ছে করেই তাকে আজ টোপ দিল কেন, কিংবা তিথির অন্তরালে কোনও দৈব যদি তাকে তাড়া করে থাকে। কোনও দৈব যে ছলনা করেনি কে বলবে! তিথি সেজে যদি হাজির হয়, সাধ্য কি সে তাকে অবহেলা করে।

নানারকমের সংশয়ে সে ভুগছিল এবং কখন কাছারিবাড়ি ফিরে ঘরের জানালায় চুপচাপ বসে আছে, টেরই পায়নি।

জানালায় কেউ যেন তখনই উঁকি দিয়ে গেল।

কে?

সে ঠিক দেখতে পাচ্ছে না। ফ্রক গায় মেয়েটা তিথি না তুলি তাও বুঝতে পারছে না। সে কিছুটা বোকার মতো দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে গেল। না কেউ না। তারপর ফের কাছারিঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে জানালায় বসলে সে দেখল এবারে শাড়ি পরা কোনও নারী তার দিকে এগিয়ে আসছে।

সে আর পারল না।

সে চিৎকার করে ডাকল, কে ওখানটায়। কদম গাছের নিচে কে দাঁড়িয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই নারী অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

অরণি ভালো করে চোখ কচলে দেখল, না কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। অরণির ভয় ভয় করছে। একবার ছুটে পড়ার ঘরে চলে গেলে হত। বাবার ফিরতে রাত হবে। অষ্টমী স্নানে বাবার একদণ্ড ফুরসত থাকে না। জমিদারবাবুদের সঙ্গে মেলায় ভলান্টিয়ার থেকে জলছত্রের সব ব্যবস্থাই তাকে দেখতে হয়। চিঁড়ে গুড় বাতাসার ব্যবস্থা করতে হয়। বেশি রাত হয়নি। স্টেশন মাস্টারের ঘরে বসে বাবা যদি পাশাখেলায় মত্ত হয়ে পড়েন—তবে ফিরতে অনেক রাত হবে। বাবা কোথায়, সে তাও জানে না। তবে বাবা আজ নাজিরখানায় যাননি, সারাদিন তাঁবুতে বসে ছিলেন—তারপর কোথায় সে জানে না। পাইক—বরকন্দাজদের কারও পাত্তা নেই। বাবুদের ছেলেরা হয় যাত্রা দেখতে গেছে। আজ যে 'তরণী বধ' পালা হবে তাও সে জানে। আট আনা অংশের জমিদার অম্বিকাবাবুর নাটমন্দিরে যাত্রাপালা দেখার জন্য বাড়ির ভেতরও কেউ থাকবে বলে মনে হয় না। স্কুল ছুটি, পড়া থেকে ছুটি, সামনে তার টেস্ট পরীক্ষা, অথচ সারাটা দিন তিথিকে নিয়ে ঘুরছে, কেবল মনে হচ্ছে, তিথি না, অন্য কেউ। কোনও দৈব তার সঙ্গে সারাদিন ছলনা করে গেছে। তিথি হয়তো তার সঙ্গে যায়ইনি।

সে বড়ই বিভ্রমে পড়ে যাচ্ছে।

কদম গাছের ছায়া কিংবা কলাতলায় কেউ যদি ফের আসে। আর আশ্চর্য তখনই মনে হল, ঘরে কে তবে হারিকেন জ্বালিয়ে রাখল! তিথি মেলায়, তার সঙ্গেই তো তিথি ফিরছে। তিথিই ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে রাখে—কখন তার ঘরে ঢুকে গেল মেয়েটা।

এতসব বিভ্রমে পড়েই সে দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এল। এদিকটায় এত নিরিবিলি যে একদণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভয় করছে। কে কখন তার সামনে ফ্রক কিংবা শাড়ি পরে হাজির হবে ঠিক কি। আসলে মাথাটাই কেমন গণ্ডগোল শুরু করে দিল।

আসলে সে সকাল থেকেই নিজের মধ্যে নেই। সে কুহকে পড়ে গেছে সকাল থেকেই।

তবু নিজের উপর চরম আস্থা বজায় রেখে সে কোনওরকমে কেয়াফুল গাছের নিচে ছুটে গেল। পড়ার ঘরে অন্ধকার। কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ভেতর বাড়ির দিকের রাস্তায় ঢুকে বুঝল গোটা এলাকাটাই রহস্যময় হয়ে গেছে। কেবল বৈঠকখানায় একটি অতি মৃদু সেজবাতি জ্বলছে। সেখানে বাবার হুজুর নবকুমারবাবু বদরি হুঁকোয় চোখ বুজে তামাক সেবন করছেন। পাশে আরও একজন।

তিনি কে?

তাঁকে সে কখনও দেখেনি।

বয়স্ক মানুষ। গোঁফ আছে। পাকা গোঁফ। গলায় কণ্ঠি। ঘরে মৃদু সৌরভ তামাকের। লোকটার মুখ ধোঁয়ায় কিছুটা আচ্ছন্ন। তবে খুবই ধনাঢ্য ব্যক্তি বোঝাই যায়। পায়ে পাম্প সু। মোজা। সিল্কের পাঞ্জাবি গায়। হাতের আঙুলে হীরের আংটি—কারণ এই নিষ্প্রভ সেজবাতির আলোতে আঙুলের আংটি থেকে হীরের দ্যুতি উঠছে। কোনও কূট গভীর পরামর্শে তাঁরা দুজনেই যে মগ্ন ছিল, অরুর বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

তখনই স্তিমিত গম্ভীর গলা—কে দরজায় দাঁড়িয়ে।

অরু অর্থাৎ অরণি সঙ্গে সঙ্গে সরে দাঁড়াল। সে কোনও জবাব দিল না।

এ—সময় এদিকটায় বোধহয় তার আসা উচিত হয়নি। কারণ এতবড় প্রাসাদতুল্য বাড়িতে কোথায় কে আছে বোঝাও দায়। তুলির ঘর বন্ধ। রোয়াক থেকে সে উঠোনে নেমে যাবার সময়ই মনে হল বীণাপিসির দরজা হাট করে খোলা। ঘরের ভেতর হ্যাজাক বাতি জ্বলছে।

আর অবাক, সে দেখল, জেঠিমা—বীণাপিসি এবং আরও দু—একজন অপরিচিত মহিলা ফরাসের ওপর বসে আছেন। পানের বাটা থেকে পান তুলে মুখে দিচ্ছেন কেউ। বেশ হাসিমশকরা যে চলছে তাও বোঝা যায়। রান্নাবাড়ির দিকে সরে যাওয়ায়, তাকে কেউ দেখছে না।

তুলি কোথায়?

তা যাত্রাপালা দেখতে যেতে পারে।

প্রাসাদের সুন্দর বউমাটিও নেই। কিংবা থাকতে পারে, ভেতরের দিকে থাকতে পারে। সে তো ঘরের সবটা দেখতে পাচ্ছে না। বিশাল জানালাগুলি প্রায় দরজা সমান। খড়খড়ির পাল্লা। জানালা বন্ধ। খড়খড়ি তোলা আছে বলে, বাইরে আলো এসে পড়ছে।

কিছুটা যেন এই বাড়িতে গোপন গম্ভীর অবস্থা, যে—কেউ ইচ্ছে করলেই এদিকটায় ঢুকতে পারে না। বৃন্দাবনদাকেও দেখা যাচ্ছে না। রান্নাবাড়িতেও কেউ নেই। আজ রাতের খাওয়া কি হবে তাও সে বুঝতে পারছে না। শুধু দাওয়ায় হারিকেন জ্বলছে একটা।

সে পাঁচিলের দিকে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কেন যে আছে, কীসের এক রহস্য যেন তাকে তাড়া করছে। 'টোপ' কথাটা তার ভালো লাগেনি। কার টোপ, কীসের টোপ, পাঁচিল সংলগ্ন অন্দরের দরজায়, তার আড়ালে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকা যায়, এমন ভাববার সময়ই সে দেখল, সুপারিবাগানের ভেতর থেকে একটা আলো এসে তার পায়ের কাছে পড়ছে। সে চোখ তুলতেই টের পেল, বাগানের ভেতর দিয়ে কেউ হারিকেন হাতে এগিয়ে আসছে।

এ—জায়গাটাও নিরাপদ নয়। আসলে কি সে তিথিকে খুঁজতে এদিকটায় চলে এসেছে!

তিথি রান্নাবাড়িতেই পড়ে থাকে। যদি তিথির দেখা পাওয়া যায়। দেখা হলে সে তার মনের সংশয় খুলে বলতে পারত।

তিথি তুই কি দৈব তাড়িত?

তিথি তুই সত্যি সারাদিন আমার সঙ্গে মেলায় ছিলি?

তিথি তুই নৌকা থেকে আর এক নৌকায় লাফিয়ে পড়লি, মিসরি বাতাসা মন্দিরে দিলি, কিন্তু আমার যে কী হয়েছে, কেন যে মনে হচ্ছে সবই অলীক ঘটনা। কোনও ঘোরে পড়ে গেছি। তুই সত্যি করে বল তো...

কী বলব?

সত্যি করে বল তোর সঙ্গে আমার কিছু হয়েছে কি না!

কী হবে?

বারে তুই যে বললি, তুমি কী অরুদা, আমার কিছুই খুঁজে পাচ্ছ না।

তুমি আমার কী খুঁজছিলে?

আমি মুখ ফুটে বলতে পারব না। আমি কী খুঁজছিলাম, তুই জানিস না?

কী করে জানব, না বললে!

তারপরই অরণি ঘাবড়ে গেল।

কার সঙ্গে কথা বলছে! এ তো বাগানের ভেতর দিয়ে হারিকেন হাতে বৃন্দাবনদা পাঁচিলের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। কেমন একটা গোপন শলাপরামর্শ চলছে। কে কথা বলল, কার গলার স্বর? তিথির মতো অবিকল নকল করে কে কথা বলল!

সে দরজায় আড়াল থেকে পা টিপে টিপে কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখল, বৃন্দাবনদা হারিকেন রোয়াকে রেখে করজোড়ে প্রণিপাত সারছে। তারপর যা বলল, তাতে অরণির হৃৎকম্প উপস্থিত হবার জোগাড়।

ধরে এনেছে হুজুর। সাজানো হচ্ছে। কোথায় যে থাকে। একটু চঞ্চল স্বভাবের। সাজিয়ে দিচ্ছে বউমা। গোরাচাঁদ আমাকে পাঠাল। দোষ নেবেন না। ছেলেমানুষ, বুদ্ধিসুদ্ধি পরিপক্ব নয়।

অরণি আড়াল থেকেই টের পেল এই যে আর্জি পেশ সবই ধনাঢ্য ব্যক্তিটিকে উদ্দেশ্য করে।

নবকুমারবাবু বললেন, তা ঠিক, ঐ সেদিন হল মেয়েটা। থাকার জায়গা নেই, বাগানের এক কোণায় ঘর তুলে নিতে বললাম। এখন পালমশাই আপনার দয়ার শরীর। কন্যেটিকে উদ্ধার করে নিলে, গোরাচাঁদের বড়ই কল্যাণ হয়।

বৃন্দাবনদাই বললেন, যা হোক শেষ পর্যন্ত হুজুর রাজি করানো গেছে। গোরাচাঁদ তো হুজুর কেঁদেই ফেলল। এতবড় সুযোগ হাতের কাছে, তুই অবহেলায় নষ্ট করবি। আমাদের পাকাবাড়ি হবে, বাজারে মুদির দোকান করে দেবে, সংসারে এতবড় সুখের খবর, তুই রাজি হয়ে যা।

নবকুমারবাবু গড়গড়া থেকে মুখ তুলে বললেন, মেয়েটি বড়ই শান্ত প্রকৃতির। বয়সকালে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী হবার সম্ভাবনা আছে। গোরাচাঁদের মেয়েটিকে আপনার যখন দেখার সাধ হয়েছে তখন দেখে যাওয়াই ভালো। মেয়েটি সাক্ষাৎ দেবী দুর্গা।

অরণি দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছে, শুনতেও পাচ্ছে সব। নদীর পাড়ে বাড়ি বলে নির্জনতা সামান্য বেশিমাত্রায়, সে কান খাড়া করে শুনছে।

অস্পষ্ট আলোতে লোকটার মুখ মাঝে মাঝে কেন যে বাঘের মতো হয়ে যাচ্ছে। অথবা শিকার ধরার লোভে চোখ চক চক করছে। হাই তুলছে, কথাও বলছে, আজ্ঞে বাবুমশাই, মহেশই বছরখানেক আগে খবরটা দিয়েছে, বাড়ছে, দেবী দুর্গার শরীর পুষ্ট হচ্ছে। সেই খবর রাখত, কখনও নদীর জলে সাঁতার কাটছে, কখনও ছুটছে নদীর চর পার হয়ে, চুল উড়ছে। সে যা দেখত, বন্দরের ঘাটে নেমে গদিতে হুবহু বর্ণনা দিত। শুনতে শুনতে কেমন আমার আবেগ সৃষ্টি হয়ে গেল। দুই পত্নীর পরামর্শ নিতে হয়। পুত্রসন্তান না থাকলে মরেও যে শান্তি পাবে না তারা। তারা রাজি হয়ে গেল। বাড়িঘরের সৌন্দর্য রক্ষার্থেই মহাঅষ্টমী স্নানে আসা—একবার দেখেও যাওয়া। এমনকি পাখনাওয়ালা কন্যা যে ফুরুত করে হাত থেকে উড়ে যাবে।

অরণি বুঝল, আসলে লোকটা টাকার গরমে সেদ্ধ হচ্ছে। তিথির মতো অনাথ বালিকার পক্ষে উড়ে যাওয়া যে কিছুতেই সম্ভব না, 'ফুরুত করে উড়ে যাবে' কথাটাতে সে আরও বেশি টের পেল।

অরণি এখন যে কী করে!

তার অবশ্য করবারও কিছু নেই।

সে রেগেমেগে নদীর পাড়ে গিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। অথবা দৌড়ে গিয়ে সে তার বাবাকে খবর দিতে পারে। মহেশ তিথিকে কচলাত, বাবা খবরটা শোনার পরই ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং দেশ ছাড়া করেছিলেন।

বাবা খবর পেলে ছুটে চলে আসতে পারেন, গোরাকাকাকে ধমকও দিতে পারেন, তুই কি পাগল হয়ে গেছিস! এতটুকুন মেয়েটাকে টাকার লোভে একটা পিচাশের হাতে তুলে দিচ্ছিস! টাকার পিচাশ! টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। বয়সের গাছ পাথর নেই, তুই কী রে! দু—দিন বাদে যমের দুয়ারে দৌড়বে, তোর এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই গোরা!

আর তখনই কেন যে নদীর পাড়ে চিৎ হয়ে তিথির পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা অরণির চোখে ভেসে উঠল। মেয়েটার সেই অসহায় মুখ এবং ক্ষোভ দুই—ই তাকে যেন তাড়া করছে।—কেন আমার সব দেখে ফেললে, কেন! সব দেখে ফেলার পরও উষ্ণতায় জড়িয়ে ধরার সময় কিছুই খুঁজে পাও না কেন? বলো! বলো!

তিথি তুই কোথায়! আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি না। তোর কথা শুনতে পাচ্ছি। সে তার চারপাশে তিথিকে খুঁজছে। কেউ নেই। চারপাশে শুধু ম্রিয়মাণ জ্যোৎস্না।

এখন তার একটাই কাজ, বাবাকে দৌড়ে গিয়ে খবরটা দেওয়া।

অরণির মনে হল বাবাকে গিয়ে খবরটা দিতে পারলে তিনি ছুটে আসতে পারেন।—আবার মহেশের কবজায় পড়ে গেল মেয়েটা! তুই কী রে, ধম্ম অধম্ম নেই! কচি মেয়েটার পেছনে সেই থেকে লেগে আছিস। অনাথ বলে কি ফ্যালনা! যার যা খুশি তাকে নিয়ে যেভাবে খুশি ফুর্তি করবে। বের করছি ফুর্তি করা। বাবা এলেই মহেশের জারিজুরি যেন ভেস্তে যাবে।

সে এই ভেবে প্রাসাদের অন্দরমহল পাড় হয়ে দিঘির পার ধরে ছুটবে ভাবল। সেই সব পেয়ারা গাছ, লিচু গাছের বাগান পার হয়ে নদীর পাড়ে চলে যাবে ভাবল—এক্ষুনি খবরটা না দিতে পারলে তিথির সমূহ সর্বনাশ।

সে তখনই দেখল তিথিদের বাড়ি থেকে কারা বের হয়ে আসছে। জঙ্গলের মধ্যে সে ঝুপ করে বসে পড়ল। শুধু জঙ্গলের ফাঁকে মাথাটা বের করে রেখেছে।

আগে গোরাকাকা—হাতে প্যাট্রোম্যাক্স।

আলোয় আলোয় ভরে গেছে তিথিদের বাড়িঘর—সুপারিবাগান।

এই কী দেখছে!

ঐ তো বাবা।

বাবা তিথিকে যেন জোর করে ধরে নিয়ে আসছেন। প্যাট্রোম্যাক্সের আলোয় দেবীর মুখ ঝলমল করছে। বেনারসি শাড়ি পরনে, তিথির হাতে বালা, কঙ্কন, কোমরে সোনার বিছেহার, তিথির শাড়ির কুঁচিতে সোনার ঝলমলে লেসের কারুকাজ, মাথায় টায়রা, চোখ বিস্ফারিত, তিথি যেন হাঁটতে পারছে না, শাড়ি আর অলঙ্কারের ভারে জবুথবু হয়ে গেছে। যেন যে—কোনও মুহূর্তে শাড়ির প্যাঁচে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে।

আর তার পাশেই তুলি। বোধহয় পড়ে গেলে তুলে ধরবে। তুলির শরীরে ভর করে তিথি যেন কোনওরকমে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই বুড়ো লোকটার কাছে যাবে, কিংবা নদীতে বজরা ভেসে আছে, সেখানে তুলে নিয়ে যেতে পারে—কী যে হবে, সে কিছুই জানে না।

তিথি জমিদারবাবুদের এঁটো খেয়ে বড় হয়েছে, তার পক্ষে বেশি আশাও করা বোধ হয় ঠিক না, তাকে যেভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে তিথির বলারও কিছু থাকতে পারে না। তাকে একবার দেখবেন সেই গোপীবল্লভ না কি যেন, শীর্ষ পালও হতে পারে—তার মাথা ঠিক নেই, সে ঠিক মনে করতে পারে না।

মহেশ নৌকায় তুলে নিতে চেয়েছিল তিথিকে, বড়ই মহাজন ব্যক্তি মানুষটি বজরায় শুয়ে আছেন, আরাম করছেন, তিথিকে নিয়ে যেতে পারলে তিনি দেখে খুবই খুশি হবেন—এমন সব কথাবার্তা মেলাতে তিথিকে বোধ হয় বলেইছিল—তিথি লোকটাকে একদম পাত্তা দেয়নি। নৌকার পর নৌকা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেছে। সে তো দেখতেই পাচ্ছে, তিথিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বাবুদের বৈঠকখানায়। অনাথ মেয়েটির এত হেনস্থা। কেউ টের পাচ্ছে না। বাবাও না। মহেশ কচলাত বলে, তাকে দেশান্তরী করতে চেয়েছিলেন, এখন এই কালভৈরবের হাত থেকে কে উদ্ধার করবে তাকে?

কেন তুমি?

কে?

বারে দেখতে পাচ্ছ না আমি তিথি। আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, আমার দাসদাসীর অভাব থাকবে না জানো, সোনার অলঙ্কারে আমাকে মুড়ে দেওয়া হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না—পছন্দ হলেই বজরায় নিয়ে তোলা হবে।

তিথি তুই কোথা থেকে কথা বলছিস?

কেন এই যে দূরে, আমি যাচ্ছি, গাছপালা ভেদ করে আমাকে নিয়ে তোলা হচ্ছে বাবুদের বৈঠকখানায়, নদীর পাড়, কাশবন, জলের ঢেউ, চড়ায় পাখিদের ওড়াউড়ি থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অন্ধকার প্রেতপুরীতে, তুমি অরুদা কিছুই বুঝতে পারছ না।

হঠাৎ কেউ ইচ্ছে করলেই তুলে নিয়ে যেতে পারে?

বারে আমার কর্তাটির যে ইচ্ছে হয়েছে, আমাকে চিবোবে।

তিথি আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

আর বুঝতে হবেও না।

আমি তোকে নিয়ে কোথাও চলে যাব।

কোথায়?

যেখানে বলবি।

তবে গেলে না কেন? ঘোর উজানে তোমাকে নিয়ে সাঁতার কাটব বলে বের হলাম, নদীর জলে টেনে নামাতে চাইলাম, তুমি তো কিছুতেই রাজি হলে না। আমাকে ফেলে কতবার নদী থেকে উঠে এসেছ, মনে নেই। এখন যত কষ্টের কথা তোমার মনে পড়ছে। আমি মরে গেলে রক্ষা পাও তোমরা, আমি বুঝি না।

তিথি তুই চুপ করবি!

চুপ করব কেন? আমি তোমার খাই না পরি।

প্যাট্রোম্যাক্সের আলো, লোকজন, তিথি, বাবুদের অন্দরমহলে কখন ঢুকে গেছে! সে একাই দাঁড়িয়ে আছে ঝোপের আড়ালে। এতক্ষণ তিথির সঙ্গে কথাও বলেছে। সে আর তিথি, তিথি এত কাছ থেকে কথা বলে, অথচ সে তাকে দেখতে পায় না কেন? তিথি বলে, না সে নিজেই তিথির হয়ে কথা বলে।

এই প্রবাসে তিথি ছাড়া সেও যে বড় অনাথ।

ঝোপজঙ্গলে জোনাকি উড়ছে। ভাদ্রমাসের আকাশ—সব নক্ষত্র আকাশে যেন ফুটে আছে। নীল এবং সবুজের সমারোহে সে ডুবে যাচ্ছিল। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। কাছারিবাড়িতে ফিরে যাওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। খুব গোপনে কাজটা হচ্ছে, তিথিকে দেখানো হচ্ছে, তিথির বাবা অকুল পাথারে পড়ে আছে—তিথিকে পালমশাই—এর হাতে তুলে দিতে পারলেই পাকাবাড়ি, বাজারে পাকা বন্দোবস্ত এমন সব সুযোগ কে হাতছাড়া করে!

সবার উপরই সে ক্ষুব্ধ।

বাবার উপরও।

কেউ মানুষ না।

তিথির দুঃখ কেউ বুঝল না।

ভাবতে ভাবতে কখন সে স্টিমারঘাটে চলে এসেছে। একা দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভয়ও করছে। নদীতে সারি সারি নৌকা। লণ্ঠন জ্বলছে। কোনও নৌকায় রান্না হচ্ছে। তিথি পাশে থাকলে তার কোনও ভয় থাকত না। সে ঠিক নৌকায় উঠে পড়তে পারত। এবং টালমাটাল নৌকায় তিথিকে নিয়ে ছোটাছুটি করতে পারত।

তার কিছুই ভালো লাগছে না।

আজ দিনটাই তার খারাপ।

সে কিছু করতেও পারে না। তবে তিথি এত সহজে ধরা দেবে, কেন যে তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

এই ভেবেই মনে সাহস সঞ্চয় করে ফেলল অরণি। শরীরও আর দিচ্ছে না। সাহস সঞ্চয় হতেই টের পেল, সে খুবই ক্লান্ত। খিদেও পেয়েছে। রান্নাবাড়িতে খাওয়ার আজ কোনও বন্দোবস্ত হয়নি। কোথায় খাবে, কী খাবে, তাও সে জানে না। অষ্টমী স্নান উপলক্ষে উপবাসের নিয়ম যদি থাকে—তাই বা কী করে হবে, তা হলে সারাদিন না খেয়ে থাকা যে বড় কষ্টের।

এইসব সাত—পাঁচ ভাবতে ভাবতে, নদীর পাড় থেকে চালতে গাছের জঙ্গল পার হয়ে কাছারিবাড়ির মাঠে ঢুকে গেল। মাঠে কেউ নেই—দূরে বাবুদের প্রাসাদে ঢোকার মুখে হাসনুহানার জঙ্গলে কেউ হারিকেন নিয়ে ভেতর বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে।

সে কোনওরকমে শরীর টানতে টানতে কাছারিবাড়ির দরজায় উঠে গেল। ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। আর অবাক মেঝেতে আসন পেতে কেউ তার ভাত ডাল তরকারি মাছ ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে একটা বগি থালায়।

থালা তুলে তো সে আরও অবাক। দই মাছ মিষ্টি সহ কিছুটা পলান্ন এবং সাদা ভাত। পলান্নের সুবাসে তার জিভে জল এসে গেল।

ক্লান্ত অবসন্ন, তার কেমন চোখ বুজে আসছে। তার হাত মুখ ধোওয়া দরকার। বালতি ভর্তি জল রেখে গেছে কেউ। সে চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে কেমন এক ঘোরের মধ্যে খেতে বসে গেল। এবং লণ্ঠন জ্বলছে সামনে। টিনের চালে গাছের ডাল নড়ানড়ি করছে বাতাসে।

খস খস শব্দ, এবং এই শব্দমালায় সে আগে বড়ই ভয় পেত, এখনও এইসব শব্দমালা উচ্ছল না হয়ে উঠলেই তার কেমন সব মৃতবৎ মনে হয়। কেমন স্থবির মনে হয় চরাচর। সে একা এই কাছারিবাড়িতে থাকতে থাকতে খুবই অভ্যস্ত হয়ে ওঠায়, সে সহজেই দরজার বাইরে গিয়ে কীটপতঙ্গের আওয়াজ শুনতে ভালোবাসে। পাখির কলরব, নদীর জলে ছলাত ছলাত শব্দে তার কখনও মনেই হয় না সে কাছারিবাড়িতে একা আছে। আম জাম গাছের ছায়াও তার বড় অবলম্বন। রাতের অন্ধকারে দূরের মাঠে শেয়ালেরা ডেকে গেলেও সে ভাবে, সে আর একা নয়। সবাই আছে তার আশেপাশে। মানুষই শুধু মানুষের নির্ভর এটা তার তখন আর মনে হয় না।

সে খাচ্ছিল।

আর কেমন সুস্বাদু খাবার তার জিভে স্বাদের রহস্য সৃষ্টি করতে করতে, টিনে ডালপালার শব্দ শুনতে শুনতে আবার কেন যে মনে হচ্ছে তিথি কথা বলছে।

শুনছ?

কী শুনব?

বারে আগের জন্মে জানো আমি নদীতে ডুবে থাকতাম। ভেসে উঠতাম।

কেন ডুবে থাকতিস?

বারে আগের জন্মে আমি শুশুক মাছ ছিলাম। ভেসে উঠতাম।

যা, বাজে কথা।

তুমি কিছুই জানো না? ভরা কোটালে নদীর পাড়ে এলেই তারা আমায় ডাকে।

কে ডাকে?

বারে নদীর গর্ভে তারা যে উঠে আসে।

বাজে কথা।

তুমি আমার কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না। কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না। কিছুই তুমি আর আমার শরীরে খুঁজে পাও না। তুমি জানোই না কেন তুমি আমার শরীরে আঁশটে গন্ধ পাচ্ছিলে!

আঁশটে গন্ধ কোথায়? বাজে কথা? পদ্মপাতার গন্ধ পাচ্ছিলাম।

তুমি তো নিজের মধ্যে নেই অরুদা। কিছুই তুমি মনে করতে পারছ না। শরীরে আমার শ্যাওলার গন্ধ, তারপর পদ্মপাতার গন্ধ—শেষে আঁশটে গন্ধ। আমি তো ভেসে উঠেছিলাম, শ্যাওলার জঙ্গল ফুঁড়ে, পদ্মপাতার নিচে ডুব দিলাম। শরীরে পদ্মপাতার গন্ধ পেলে। আরও ভেসে উঠলে আঁশটে গন্ধ। তুমি কেমন ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে—অথচ শরীরে কিছুই খুঁজে পেলে না। মাছের শরীরে মানুষ কী করে খুঁজে পাবে সব।

তা ঠিক। তুই মাছ হয়ে গেছিলি।

শুশুক মাছ। নদীর জলে ভেসে যেতে চাইলাম, নড়লে না, দাঁড়িয়ে থাকলে। আমি যে তোমাকে নদীর জলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। নদীতে ডুবে ডুবে আমরা শুশুক মাছ হয়ে গেলে কেউ আর আমাদের খুঁজেই পেত না। আমার সঙ্গে চলো না?

কোথায়?

কেন নদীতে?

কী হবে গিয়ে?

দুজনে মাছ হয়ে থাকব।

যা, তুই একটা পাগল।

আমি পাগল, না তুমি পাগল! জলের নীচে শুশুক মাছ হয়ে থাকলে কত সুবিধে বলো তো!

কীসের সুবিধে!

তুমি যাবে কি না বলো। কেউ টের পাবে না। বলেই তিথি তার শরীর থেকে সব সায়া শাড়ি সেমিজ খুলে ফেলতে থাকল, তারপর নদীর চরে ছুটতে থাকল।

সেও নেমে গেছে তিথির পিছু পিছু।

সব চরাচর একেবারে স্তব্ধ হয়ে আছে। নীল জল এবং জলরাশি খেলা করে বেড়াচ্ছে চারপাশে। ঢেউ উঠছে। তারা দুজনেই হেঁটে হেঁটে পার হয়ে গেল নদী।

তারপরই এক বিশাল বালির চর সামনে। কেমন এক অন্য গ্রহে তাকে নিয়ে তিথি উঠে এসেছে।

ঐ যে দেখছ?

তিথি তুই আমাকে কী দেখাচ্ছিস?

ঐ যে দেখছ, নদীর চড়ায় একটা স্টিমার আটকে আছে। ওটাই আশরাফ সারেঙের স্টিমার। কবে কোন কালে নদীর গর্ভে ডুবে গিয়ে বালির চড়ায় ভেসে উঠেছে।

তিথি তাকে কোথায় নিয়ে এল! কিছুই সে চিনতে পারছে না। কেমন তেপান্তরের মাঠে নেমে আসার মতো এবং সে যেদিকে তাকাচ্ছে, সর্বত্রই সে অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। একটা বজরা দেখতে পেল। বজরটা বালির চড়ায় প্রায় সবটাই ডুবে আছে। জেগে আছে শুধু তার মাস্তুল আর গলুইর দিকটার একটা ঘর। এভাবে ভাঙা—জাহাজের কবরখানায় সে কী করে যে এসে হাজির হল বুঝতে পারছে না।

তিথিও পাশে নেই।

কোথায় গেল।

এক অতি অবধারিত লীলা দেখতে পেল তিথির। অথচ তিথি নেই।

তিথি তখনই উড়ে উড়ে হাজির।

অরুদা।

কোথায় থাকিস।

আমার সঙ্গে এসো। আশরাফ সারেঙের ঘরটা খুঁজে পেয়েছি। ঐ যে স্টিমারটা দেখছ, বালিতে ডুবে আছে, ঐ যে ডেক ছাদের ঘরটা দেখছ, ওখানটায় আশরাফ সারেঙ থাকতেন। ওর লুঙ্গি, ফতুয়া, দড়িতে ঝুলছে। একটা জানালাও আছে। চলো না, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?

ওরা দু'জনই এখন উড়ে যেতে পারছে। শরীর এত হালকা হয় বাতাসে উড়ে গিয়ে এই প্রথম টের পেল অরণি। তিথি পাশে থাকায় এটা হয়েছে। তিথির শরীরে তো কিছুই নেই। সে হালকা হয়ে যেতেই পারে। কিন্তু তার শরীরে জামা এবং প্যান্ট—জামাপ্যান্টে হাওয়া এসে ঢুকলেই বিপদ। জামাপ্যান্ট হাওয়ায় পত পত করে ওড়ে অথবা জামার মধ্যে হাওয়া আটকে গিয়ে নৌকার পালের মতো ফুলে ওঠে—তখন সে অবশ্য অনায়াসে হালকা হয়ে গিয়ে দূরের নক্ষত্রও ছুঁয়ে আসতে পারে, তার শরীরে জামাপ্যান্ট থাকায় কোনও অসুবিধাই হচ্ছিল না।

তখনই বালির চরে জেগে থাকা একটা ডেক ছাদের ঘরে তিথি ঝুপ করে নেমে পড়ল।

এই অরুদা কোথায় যাচ্ছ আমাকে ফেলে—

সে যেন কত শত কোটি বছর আগেকার এক ছোট্ট গ্রহাণু—তার নিজস্ব কোনও বেগ আর গতি নেই—সে এক মহাশূন্যে অখণ্ড হয়ে আছে, তিথি ডেক ছাদে দাঁড়িয়ে। আশরাফ সারেঙের একটা ভাঙা সানকি হাতে সে অপেক্ষা করছে তার অরুদা যেখানেই যাক, তার কাছে আবার ফিরে আসবে।

তখনই তাকে কে যেন ঝাঁকাচ্ছে। ডাকছে, এই অরু ওঠ। খাবি না। কত রাত হয়ে গেছে। ঘুমিয়ে পড়লি!

আমি খাইনি!

না খাওনি।

বাবা তিথি কোথায়?

ওকে মহাজন বজরায় তুলে নিয়ে গেছে।

আমি খাব না।

খাবি না কেন?

আমার একদম খেতে ইচ্ছে করছে না। এই তো কিছুক্ষণ আগে খেলাম। তারপর...

তারপর কী!

আমি আর কিছু জানি না।

মেলায় খেয়েছিস।

অরণি চুপ করে থাকল।

অরণি এই প্রথম তিথিকে স্বপ্নে দেখেছে। সত্যি দেখেছে। কিন্তু তিথিকে তার স্বপ্নের কথা আর কখনোই বলা হবে না। তিথিকে বজরায় তুলে নিয়ে গিয়েছে গোপীবল্লভ পাল। তিথি আর কখনোই নদীর গভীর জলায় শুশুক মাছ হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে না।

নয়

জগদীশ কিছুতেই অরণিকে ঘুম থেকে তুলতে পারলেন না।

হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন, হাত ছেড়ে দিলেই শুয়ে পড়ছে। ঘুম জড়ানো চোখে। তার এক কথা।

আমি খেয়েছি, এই তো খেয়ে শুলাম। আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

অগত্যা জগদীশ আর কী করেন!

রান্নাবাড়িতে ঢুকে গেলেন। রাত কম হয়নি। অরণির জন্য সবাই বসে আছে। মহাজন গোপীবল্লভ তার বামুন ঠাকুর দিয়ে জমিদারবাবুর বাড়িতে পেল্লাই ভোজের ব্যবস্থা করেছেন। পাত পেতে কেউ কেউ খেয়ে

গেছে। অরণি না খেলে বউঠান কিংবা বাবুরা খেতে পারছেন না, অগত্যা কী করা যায়, জগদীশ বউঠানকে বললেন, অরু খাবে না। ওর খিদে নেই বলছে।

নবকুমারবাবু বারান্দায় বের হয়ে আসছেন। বাড়ির আরও সবাই, লম্বা বারান্দায় কিংবা বিশাল রান্নাঘরে আসন পাতা। জলের গেলাস থালা দিয়ে ঢাকা। সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়ার রেয়াজ এই রান্নাবাড়িতে।

তুলিকেও তুলে আনা হয়েছে। সেও খাবে। কিছুটা বনভোজনের মতো ব্যবস্থা করেছিলেন গোপীবল্লভ পাল। তার লোকজন জঙ্গল সাফ করে নদীর পাড়ে রান্নার বন্দোবস্ত করেছিল। তার বামুন ঠাকুর অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠা বজায় রেখে রান্না করেছে। বাবুরা নদীর পাড়ে যাবেন না, বাড়িতে সব পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা সুচারুভাবেই করা হয়েছে। কিন্তু অরণির জন্য সবাই অপেক্ষা করছিল, সে এসে গেলেই খেতে বসা হবে, সেই অরুকেই কাছারিবাড়ি থেকে নিয়ে আসা গেল না।

বৃন্দাবন বলল, আমি একবার যাই।

জগদীশ বললেন, গিয়ে লাভ হবে না। ওতো বলছে, সে খেয়েছে।

তুলি বলল, কখন খেয়েছ?

তাতো জানি না।

বউঠান বললেন, ঘুমের ঘোরে বলছে, তুমি আর একবার যাও!

না বউঠান। ও ঘুমিয়ে পড়লে, তুলে খাওয়ানো খুবই ঝামেলা। একটা তো রাত। না খেলেও কিছু হবে না।

বউঠান সহজে ছাড়বার পাত্র নন।

ও কী খেল! রান্নাবাড়িতে ওকে কে খেতে দিল!

বড়দা বলল, আসলে, বাহানা। আমি গিয়ে দেখছি।

বড়দা মেজদা সবাই আসনে বসে গেছেন। তুলি, নবকুমারবাবু, বাড়ির কেউ বাদ নেই। জগদীশও বসে গেছেন—অরণি সারাদিন কোথায় ঘুরেছে মেলায় তিনি কিছুই জানেন না, মেলায় জলছত্র থেকে ভলান্টিয়ারদের দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল তাঁর—সারাদিনে একবার অরণির সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়নি, অবশ্য তাঁর টাকার থলে থেকে অরণি কিছু টাকা চেয়ে নিয়েছে, তিথিকে নিয়ে মেলায় যাবে, এমনও ভাবতে পারে অরণি, কাজেই মেলায় তারা যদিও মিঠাই মণ্ডা পেট ভরে খেয়ে থাকে, এমন সাত— পাঁচ ভাবনাই অরণিকে জোরজার করে তুলে খাওয়াবার বিষয়ে জগদীশকে কিছুটা নিস্পৃহ করে রাখতে পারে। তিনি মেজদার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে যেতে হবে না। খেয়ে নাও। কতক্ষণ তোমরা আর বসে থাকবে!

জগদীশ রান্নাবাড়ি থেকে ফেরার সময় টের পেলেন, আকাশ ভেঙে বজ্রপাত নেমে আসছে। সারা আকাশ জুড়ে বিদ্যুতের ঝলকায় ভেসে গেল চরাচর। ঝড় উঠবে। বৃষ্টিও নামতে পারে জোরে। সারাদিন যা গরম গেছে, ভ্যাপসা গরমে শরীরের সব রক্ত যেন ঘাম হয়ে বের হয়ে আসছিল—তিনি খুবই ক্লান্ত, নদী থেকে ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় তার শরীর জুড়িয়ে গেল।

তিনি টের পেলেন আকাশ বড় গুরুগম্ভীর।

তিনি কিছুটা পা চালিয়ে হাঁটছেন আবার কিছুটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। আকাশ যেন খুবই নিচে নেমে এসেছে। এলোমেলো হাওয়ায় গাছের ডালপালা দুলছে। শীতল হাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে আরাম বোধ করছিলেন।

নদীর দিকে তাকালেন তিনি। সুপারিবাগান পার হয়ে নদী দেখাও কঠিন। মিশকালো অন্ধকারে সব ঢেকে গেছে। মনে হল হঠাৎ হাওয়া পড়ে গেল। চরাচর কেমন থম মেরে গেছে। নদীর পাড়ে তার কাছারিবাড়ি বলে ঝোড়ো হাওয়া উঠলে বেশ জোরেই এসে কাছারিবাড়িতে আছড়ে পড়ে। ঘরের দরজা জানালা সব ঠাস ঠাস করে বন্ধ হয়, খুলেও যায়। দরজা খোলা রেখে অবশ্য আসেননি। শেকল তুলে দিয়ে এসেছেন—কিন্তু জানালাগুলি সব খোলা। জোর বৃষ্টি হলে বিছানা সব ভিজে যায়।

তিথিও নেই যে সব নজর রাখবে। গোপীবল্লভ নদীতে রাত কাটিয়ে সকালে পাল তুলে দেবেন বজরার। মানুষজন তাঁর মেলা। বজরার সঙ্গে নৌকার বহর। কোনওটায় বামুনঠাকুর, কোনওটায় গদির সরকারমশাই—সবাই সপরিবারে হাজির কর্তার সঙ্গে। এমন পুণ্যস্নানের সুযোগ কেউ ছাড়তে রাজি হয়নি। ঝি—চাকরদের আলাদা নৌকা। বজরায় শুধু তার দুই স্ত্রী, তিথি উঠে যাওয়ায় অবশ্য তিনজন। তার দুই স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে তিথিকে। শুভদিনে বিবাহ। দেশে রেখে যেতে কেউ রাজি হয়নি। মহাজনের ইচ্ছের উপর কারও কথা নেই। নবকুমারবাবু অবশ্য বলেছিলেন, কিছুদিন এখানে থেকে গেলেও অসুবিধা হবে না। আপনার যখন পছন্দ হয়েছে। দিনক্ষণও ঠিক—গোরাচাঁদের ভাঙা ঘরে না রাখেন, আমাদের বাড়িতেও তিথি থাকতে পারবে।

গোপীবল্লভ রাজি হননি।

অত্যন্ত সদাশয় মানুষটি কেবল বলেছিলেন, থাকতে পারে, তবে এটোকাঁটা খেয়ে না আবার আমার ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করে। যা স্বভাব!

তখন সবাই একবাক্যে বিষয়টি নিয়ে মনস্থির করে ফেলে। গোঁরাচাদও রাজি। তার তো বাড়িতে পাকা দালানকোঠা হবার কথা। বাজারে মুদিখানাও খুলে দিতে পারেন। মহাজন মানুষটি কম কথা বলেন। তার পাকা গোঁফ এবং নাদুসনুদুস শরীরটি তেল মাখনে যে ডুবে আছে দেখলেই বোঝা যায়। তিথি তার সেবাযত্ন করতে পারবে, আসলে এখানে রেখে যেতে মন তাঁর সায় দেয়নি। বাবুরাও ও মহাজন ব্যক্তিটিকে খুশি রাখতে পারলে অসময়ে ধার কর্জ পেতে অসুবিধা হয় না। জমিদারির খাজনা সরকারের ঘরে জমা দেবার সময় বাবুদের মহাজনের গদিতে ছুটতেই হয়। শুধু যে গোপীবল্লভের পাটের ব্যবসা, তেজারতির কারবার নিয়ে এমন রমরমা অবস্থা তাও নয়। ইস্টিমার কোম্পানির তিনি একজন বড় অংশীদার। তিথির সৌভাগ্য এমন হবে জগদীশ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তিনি অন্ধকারে দাঁড়িয়েই মেয়েটার ভালো হোক বলে কপালে হাত ঠেকালেন।

তিথি না থাকায় কাছারিবাড়িটাই শুধু খালি হয়ে গেল না, জমিদারবাবুর প্রাসাদ, সুপারির বাগান, নদীর চর, দিঘির পাড়ের ঝোপজঙ্গল সবই খালি হয়ে গেল। নদীর জলে আর যখন তখন কেউ ঝাঁপিয়ে পড়বে না। কিংবা কোঁচড়ে খই—বাতাসা নিয়েও ইস্টিমার ঘাটে কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। তিথির কথা ভাবতে গিয়ে জগদীশ কেমন কাতর হয়ে পড়লেন।

তখনই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

জগদীশ দৌড়ে ঘরের সিঁড়িতে উঠেই টের পেলেন, তীরবেগে ঝড় ছুটে আসছে। হাওয়ায় যেন তাকে উড়িয়ে নেবে।

তিনি দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা—জানালা বন্ধ করে দিতে থাকলেন। অরণি ঘুমুচ্ছে। মশারি না টাঙিয়েই শুয়ে পড়েছে। মশার কামড়ে ছেলেটা জেরবার, কোনোই হুঁশ নেই। চালে আমের বড় ডালের ঘসটানিতে ঘরটা কাঁপছে। তিনি হারিকেনের আলো উসকে দিলেন। বৃষ্টির ছাট এত তীব্র যে টিনের চালে বড় রকমের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। তারপরই মনে হল ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ। আমগাছের অতিকায় ডালটি কেটে ফেলা উচিত ছিল, ঝড়বৃষ্টির সময়ই এ—কথাটা তিনি ভাবেন, কিন্তু কাটা আর হয় না। সেই ডালটি ভেঙে পড়ল কি না কে জানে! সামনের দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দেখতে পারেন, কিন্তু দরজা খুলতে সাহস পাচ্ছেন না—বাড়িতেই এই অবস্থা, নদীতে না জানি কী হচ্ছে—ভাদ্র—আশ্বিনের এই সময়টায় নদী মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে—অসময়ে ভরা কোটালেরও আবির্ভাব হয়। দুর্যোগ শুরু হয়ে যায়। নদীর দু—পাড় জলে প্লাবিত হয়। নদীতে কেউ নৌকা রাখতে সাহস পায় না। ইস্টিমার মাঝনদীতে থাকলে কিনারে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়। গেরাফি ফেলে, মোটা কাছিতে বেড় দিয়ে দেওয়া হয়।

মহাজনের বজরায় কী অবস্থা, কে জানে! তবে বজরার মাঝিরা হাওয়ায় গন্ধ শুঁকে টের পায় সব। তারা যথেষ্ট সাবধানী। মহাজনের বজরা আসিনুল মাঝির হেপাজতে থাকে। সে বড় দড়িয়ার মাঝি ছিল একসময়, তার ঝড়বৃষ্টির অভিজ্ঞতা যথেষ্ট—ঘূর্ণিঝড়েও তার নাও কাত করতে পারে না। সে ঠিকই টের পেয়ে গেছে,

নদীর কুহেলিকার কথা। বড় শরিকের অতিথিনিবাসের কাছে বজরা নিয়ে তুলতে পারে। ঝড়ের দাপটে কোনও অঘটন ঘটে গেলে যাতে নৌকাডুবির আশঙ্কা না থাকে, তার ব্যবস্থাও তার জানা।

জগদীশ বারান্দায় নেমে যাবার জন্য দরজা খুলতে কিছুতেই সাহস পাচ্ছেন না। ঝড়ে ডাল ভেঙে পড়ল, না বিশাল আমগাছটির গোড়া উপড়ে গেল! কী যে করেন তিনি। তখনই চারপাশে আর্ত চিৎকার, কোথাও শাঁখ বাজছে, কাঁসি—ঘণ্টার শব্দও কানে আসছে—বাবুদের প্রাসাদেও তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। চারপাশে শুধু শঙ্খধ্বনি। উলুধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। আসলে দুর্যোগ যে অতিমাত্রায় আতঙ্কে ফেলে দিচ্ছে মানুষজনকে বোঝাই যায়। তিনি কী করবেন বুঝতে পারছেন না। এই দুর্যোগের রাতে ঝড়ের ছোলায় কাছারিবাড়ির টিনের চাল উড়ে গেলে অরুণিকে নিয়ে বিপদে পড়ে যাবেন। হুড়মুড় করে মাথার উপরের মুলিবাঁশের পাটাতনও ভেঙে পড়তে পারে। হরমোহন থাকলে তাঁর এত আতঙ্ক হত না। অরুণির কথা ভেবেই তিনি কাতর হয়ে পড়ছেন। ডেকে তুললে হয়—এ যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, কোনও হুঁশ নেই।

এই অরণি, অরণি!

সাড়া নেই। দরজা খুললে বৃষ্টির ছাটে সব ভিজে যাবে। হাওয়ায় হারিকেনও নিভে যেতে পারে। তিনি তাড়াতাড়ি মাথার উপরের পাটাতন থেকে টর্চটা নামিয়ে হাতের কাছে রেখে দিলেন। একবার মাঠ পার হয়ে প্রাসাদের দিকে যেতে পারলে ভালো হত। নিরাপদ জায়গা। কিন্তু অরণিকে যে ঘুম থেকে তোলাই যাচ্ছে না।

এই, কিরে তুই! কী ঝড় শুরু হয়েছে। ওঠ। শিগগির ওঠ।

তিনি অরণির হাত টেনে বসিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু এ কি, সে তো বসে থাকছে না। হয়েছেটা কী! কেমন নেশাখোর মানুষের মতো সে বেহুঁশ।

অরু! তোর কী হয়েছে!

অরণি সাড়া দিচ্ছে না।

সারাদিন কোথায় ছিলি! মেলায় কী খেয়েছিস?

জগদীশ ভয় পেয়ে গেছেন। তাকে ডাকছেন, তাকে ঠেলে পাশ ফিরিয়ে দিচ্ছেন, অথচ অরণি চোখ খুলে তাকাচ্ছে না। বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে, অরণি স্বাভাবিক থাকলে, কখনোই এভাবে বিছানায় পড়ে থাকতে পারত না। তিথিকে বজরায় তুলে নিয়ে গেছে শোনার পর থেকে সে যেন আরও বেহুঁশ।

এখন জগদীশ যে কী করে! ঝড়ে, নদীর প্লাবনে সবকিছু তছনছ হয়ে গেল।

একটা গাছ ভেঙে পড়ল, অরণি কিছুই টের পাচ্ছে না। লম্বা হয়ে পড়ে আছে।

অরণি বাবুদের প্রাসাদে যাবি? এখানে থাকা আমাদের উচিত হবে না। অরণি তুই ওঠ, ঘরের নিচে আমরা চাপা পড়ে থাকব। অরণি, তিথিকে বজরায় তুলে নিয়ে গেছে, এই দুর্যোগে, বজরার অবস্থা কীরকম বুঝতে পারছি না। আসিনুল যদি বাতাসের গন্ধ শুঁকে ঝড়ের আভাস টের না পায়, বজরা ডুবে যেতে কতক্ষণ!

অরণি এবার তাকাল।

তাকাল ঠিক। তবে ওর চাওনি স্বাভাবিক নয়। কোনও অতি দ্রুত ধাবমান জলরাশি পার হয়ে সে যেন নদীর পাড়ে উঠে এসেছে। চোখে কিছুটা দুঃস্বপ্ন, কিছুটা দুশ্চিন্তা এবং ক্ষোভ জ্বালাও হতে পারে—তিথির জন্য অরণির কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, নানা ধন্দ দেখা দিতেই জগদীশ বললেন, এখন ঘুমাতে নেই, অবস্থা বিশেষ ভালো ঠেকছে না। দেখি ভেতর বাড়িতে যাওয়ার কোনও অবস্থা করা যায় কি না।

ছাতায় যে কাজ হবে না তিনি জানেন।

বৃষ্টি মাথায় ছুটে যেতে পারেন, তবে, যা ঝড়, গাছটাছ মাথার উপর উপড়ে পড়া বিচিত্র নয়। এবং অরণি যাবে কি না, সে তো উঠেও বসল না। তার যেন জীবন নিয়ে কোনও চিন্তাই নেই। সে যেন সব সুখ দুঃখ এবং অনুভূতির বাইরে।

অরণি তোর কী হয়েছে?

অরণি এবার উঠে বসল ঠিক, তবে মাথা দু হাঁটুর ফাঁকে গোঁজ করে রাখল।

আর একটা ছোলা এত জোড়ে এসে ঘরে ধাক্কা মারল যে, মনে হয় সব এবার সত্যি উড়িয়ে নেবে। কবে থেকে তাঁর এই নদীর পাড়ে বাস, কখনও এমন ভয়ঙ্কর ঝড়ের সোঁ সোঁ আওয়াজ টের পাননি। কোথাও যেন বড় রকমের ধ্বংসকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল অরণি!

শুনতে পাচ্ছেন, আপনি শুনতে পাচ্ছেন বাবা!

তিনি অনেক কিছুই শুনতে পাচ্ছেন, মহাপ্রলয়ের মতো অবস্থা, মনে হয় নদীর জল ফুলেফেঁপে পাড় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের ঘাসের জমি জলে ডুবে গেছে দেখতে পেলেন। বাতাসের শব্দে নানাপ্রকার কুহক তৈরি হচ্ছে। নদীর জলে বাতাসের প্রচণ্ড চাপ, জল উথাল—পাতাল হচ্ছে নদীতে, তার শব্দও কান পাতলে শোনা যাচ্ছে—কিছু ঝড়ের পাখি বাঁশঝাড়ের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে, বাঁশের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে যাওয়ায় কোথাও দূরে কোঁ কোঁ আওয়াজ উঠছে। আর তার ভেতর সেই সব অসহায় পাখিরা আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু অরণি কী বলতে চাইছে! তিনি তার কিছুই বুঝতে পারছেন না।

কোনও শব্দ কিংবা নদীর পাড়ে কোনও তরঙ্গমালার আঘাত যদি ভাসমান কিম্ভূতকিমাকার হাহাকার হয়ে ভেসে আসে, সেই সব শব্দমালার কথা কি অরণি বলতে চাইছে! সে কি কোনও হাহাকারের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

অরণিকে না বলে পারলেন না, তুই কী শুনতে পাচ্ছিস?

তিথি আমাকে ডাকছে?

তিথি ডাকছে! তোকে কেন ডাকবে?

ডাকছে। শুনতে পাচ্ছেন না, অরুদা, তুমি যাবে না!

তুই কোথায় যাবি তিথির সঙ্গে।

সে তো আমাকে নিয়ে যেতে চায়।

স্বভাব লাজুক অরণির এমন কথায় তিনি ঘাবড়ে গেলেন। সামনে টেস্ট পরীক্ষা, অরণি সতেরো বছরে পড়েছে। মেয়েদের সম্পর্কে সে খুবই লাজুক, কখনোই সে তুলির সঙ্গে কথা বলতে পারে না। জমিদারবাবুর মেয়েটা একটু চঞ্চল স্বভাবের, কিন্তু অরণি কখনোই তার সামনে পড়তে চায় না, তুলি এক দরজা দিয়ে ঢুকলে সে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়, সেই অরণিকে তুলির বয়সি তিথি এই ঘোর দুর্যোগে কোথায় নিয়ে যাবে!

তিনি কিছুটা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ছেলেটার মাথা বিগড়ে যায়নি তো! ধমকও দিতে পারেন না, ছেলেটা এমনিতেই তার ভারী কোমল স্বভাবের, তাকে বড় হতে হবে, পড়াশোনা করে মানুষ হতে হবে, তার মায়ের এমন ইচ্ছের কথা ভালোই জানে, সে কেন দুর্যোগের রাতে তিথির কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে!

কী আজেবাজে বকছিস? তিথি কেন মরতে আসবে, সে তো বজরায় আছে, বজরা না থাকলেও, বড় শরিকের অতিথিনিবাসে গিয়ে উঠেছে। নদী যদি সত্যি খেপে যায় তবে আসিনুল আগেই তা টের পাবে। সে বজরা পাড়ে ভিড়িয়ে দিয়েছে ঠিক, সে খুব হুঁশিয়ার মাঝি, বহু ঝড়ঝঞ্ঝার সে সাক্ষী। জলে জলে তার জীবন কেটেছে, সেটা বুঝতে শেখো।

তবু যে ডাকছে তিথি! ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে সে ছুটে আসছে!

অরণি, তুই স্বপ্ন দেখছিস। তাই স্বপ্নে বকছিস। তোর স্বপ্ন দেখা কী শেষ হয়নি! শুয়ে শুয়ে বিড় বিড় করে সেই কখন থেকে—

স্বপ্ন কেন হবে বাবা! আমি তো দেখতে পাচ্ছি, ওর বগলে একটা পুঁটুলি, সে পাগলের মতো নদীর পাড় ধরে ছুটে আসছে। বজরাখানা নদীর পাড়ে ডিমের খোলার মতো তুফানে এসে আছড়ে পড়েছে। খান খান

হয়ে গেছে বজরা। আশরাফ চাচার স্টিমার ডুবে যাচ্ছে।

মহাজন খুবই সদাশয় মানুষ—তিথিকে ফেলে তিনি কিছুতেই অতিথিনিবাসে গিয়ে উঠতে পারেন না। বজরা ডিমের খোলার মতো তছনছ হয়ে পড়ে আছে পাড়ে, জানলি কী করে!

আর তখনই কড়াৎ করে বজ্রপাতের শব্দ। চরচর কেঁপে উঠল, কোনও বৃক্ষের উপর পড়তে পারে—বজ্রপাতের সাদা গন্ধও নাকে এসে লাগল জগদীশের।

তিনি তাড়াতাড়ি দোহাই জয়মুনি বলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন। জয়মুনির দোহাই দিলে বজ্রের ধার কমে আসে—মুনিঋষিদের বাক্য কখনও বিফল হয় না। জয়মুনি সহজেই বজ্রের ব্যাপকতা নষ্ট করে দিতে পারেন। নিজের এবং পুত্রের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তিনি জয়মুনির দোহাই না দিয়ে পারেননি।

কিন্তু অরণির কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে হাঁটুর মধ্যে মাথা গোঁজ করে বসেই আছে চারপাশের ব্যাপ্ত তাণ্ডবলীলা তাকে বিন্দুমাত্র সচকিত করছে না।

সহসাই ফের অরণি বলল, আমি যাব বাবা।

কোথায় যাবি!

তিথি নদীর পাড়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আর পারা যায়! কেন সে অপেক্ষা করবে। সে মহাজনের এখন আশ্রিত জন, তার জন্য ভাবতে হবে না। মহাজনের লোকজনের অভাব নেই—তাদের কাছ থেকে তিথি কখনোই ছাড়া পেতে পারে না। সব মনের ভুল। হাতমুখ ধুয়ে, মাথায় মুখে ভালো করে জল দে। বায়ুচরা হয়ে গেলে লোকে ভুলভাল কথা শুনতে পায়। ভুলভাল বকে। ওঠো। মাথায় জল ঢেলে দিচ্ছি। ওঠো, বালতিতে জল আছে, হাতমুখ ধুয়ে নাও।

অরণির এক কথা, আমি যাব বাবা। নদীর জল তালগাছ সমান উঁচু হয়ে ভেসে যাচ্ছে। হাজার হাজার শুশুক মাছ সাঁতার কাটছে। ওরা তিথিকে নিতে এসেছে, আমি জানি।

তুই সব জানিস। যতসব আজগুবি চিন্তা!

আজগুবি নয়। সত্যি কথা। তিথি আর জন্মে শুশুক মাছ ছিল। সে আমাকে বলেছে।

আর কী বলেছে? জগদীশ বিরক্ত হয়ে গালে চড়ই কষাতে যাচ্ছিলেন।

ও যে বলেছে, তুমি আমাকে স্বপ্নে দ্যাখোনা অরুদা?

স্বপ্ন দেখলে কী হয়?

বারে ওর তো বিশ্বাস, স্বপ্ন দেখলে ভালোবাসা হয়। ভালোবাসলে স্বপ্ন দেখতে হয়। আমি ওকে মিছে কথা বলেছি বাবা। ওকে আমি স্বপ্নে আগে কখনও দেখিনি। তবু বলেছি, স্বপ্নে দেখেছি। ও যদি খুশি হয় তাই বলেছি।

ওতে কিছু হয় না। উঠে আয়। তুই নিজের মধ্যে নেই।

ও যে বলেছে, তুমি অরুদা তুলিকে কখনও স্বপ্ন দ্যাখো না তো?

আসলে জগদীশ জানেন গোরার মেয়েটা বড় হতে হতে কিছুটা ইঁচড়ে পক্ক হয়ে গেছে। মেয়েটা এমন সব কথা বলেই অরণির মাথা বিগড়ে দিয়েছে।

তা না হলে তার স্বভাবলাজুক ছেলের এই পরিণতি হয় না। বেজায় নির্লজ্জ না হয়ে গেলে বাবাকে কেউ ভালোবাসার কথাও বলতে পারে না। এমনও হতে পারে অরণি তার অস্তিত্বের কথাই ভুলে গেছে। সে যে তার বাবার সঙ্গে কথা বলছে, তেমনও হুঁশ না থাকতে পারে। জগদীশ খুবই বিচলিত হয়ে পড়ছেন। কাউকে যে ডাকবেন, ডেকে কথা বলবেন, অরণি ধীরে ধীরে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। আপনারা আসুন, কিছু তার উপর নিশ্চয়ই ভর করেছে। নদীর জলে মেয়েটা ভেসে গেল না তো! মরে গেল না তো! ভূত হয়ে অরণির মাথায় ঢুকে গেল না তো! ভূত প্রেতে জগদীশের প্রবল বিশ্বাসও আছে—তিনি ভাবলেন সকাল হলে অনাদি ওঝাকে ডেকে দেখাবেন, এখন রাতটা কাটলে হয়।

তখনই অরণি দাঁড়িয়ে গেল। চোখমুখ কেমন তার থমথম করছে।

অরণি চিৎকার করে উঠল, ডুবে গেল—স্টিমারটা ডুবে গেল। আশরাফ চাচা ডেকে ছোটাছুটি করছে। লাইফ জ্যাকেট, বয়া সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সবাই নেমে না গেলে তিনি নামতে পারছেন না।

অরণি, বাবা তুই কী হয়ে যাচ্ছিস? কোথায় স্টিমার?

ঐ দ্যাখো বাবা, ডেক ছাদে তিথি চাচার ভাঙা সানকি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি সব। তিথিকে স্বপ্নটার কথা না বললে পাপ হবে। আজ সত্যি তিথিকে স্বপ্নে দেখেছি।

এবারে তিনি তিরস্কার না করে পারলেন না—বের করছি তোমার পাগলামি। টানতে টানতে বালতির কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, মাথাটা ধুয়ে দিলে আরাম পেতে পারে। ওর ঘুমানো দরকার। আসলে কোনও ঘোর থেকেও এসব দেখতে পারে। মাথাটা ধুয়ে দিলে শরীর ঠান্ডা হবে। কিন্তু অরণি কিছুতেই যেতে চাইছে না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অরণি যে তার পুত্র এখন কিছুতেই মনে হচ্ছে না জগদীশের। যেন এক নতুন জগৎ আবিষ্কারে অরণি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে।

তারপরই অরণি কাণ্ডখানা ঘটিয়ে ফেলল। হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল দরজার দিকে, আমি আসছি তিথি, তুই দাঁড়া বলে দরজা খুলে দুর্যোগের মধ্যে ছুটতে থাকল।

জগদীশ হতভম্ব। মাথায় কিছু দিচ্ছে না তাঁর। তিনি কিছুটা উদভ্রান্ত। তারপর কী ভেবে যে টর্চটা হাতে নিয়ে বের হয়ে ডাকতে থাকলেন—তুই যাস না অরণি। তিনি প্রাসাদের দিকে ছুটে যেতে পারতেন, প্রবল বর্ষণে তার শরীর ভিজে যাচ্ছে, ঝোড়ো হাওয়ায় এগোতে পারছেন না। সবকিছু ঝাপসা। টর্চ জ্বেলে দেখলেন, অরণি সুপারিবাগানের মধ্যে ঢুকে গেছে। তিনিও সুপারিবাগানের মধ্যে যাবার জন্য ছুটছেন, বৃষ্টি কিংবা বন্যার জলে থইথই করছে মাঠ, তারও যেন হুঁশ নেই। টর্চ জ্বেলে কাউকেই দেখতে পেলেন না, একা অরণি নদীর পাড়ের দিকে ছুটছে। এক অতিকায় অজগরের মতো নদী ফুঁসছে, গাছপালা তছনছ করে ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সব, একবার কী ভেবে চিৎকার করেও ডাকলেন, কে কোথায় আছেন আপনারা, শিগগির আসুন, অরণি উন্মাদ হয়ে গেছে।

তারপর তিনি যা দেখলেন! হতবাক। পাড়ে বগলে পুঁটুলি নিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ঝাপসামতো অস্বচ্ছ টর্চের আলোয় কিছুই স্পষ্ট নয়। কে দাঁড়িয়ে আছে তাও বোঝা যায় না, তবু কেউ দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে যেন এক জলাভূমি হয়ে গেছে নদীর পাড়, গাছ সব উপড়ে পড়েছে, সুপারিগাছগুলিও আস্ত নেই—তিনি ছুটতে ছুটতে কেবল অসহায় আর্তনাদে ভেঙে পড়ছেন, অরণি, বাবা যাস না। সামনে দ্যাখ কত বড় ঢেউ এগিয়ে আসছে। সাবধান।

আর সাবধান!

কড়াৎ করে আবার বাজ পড়ল।

সারা আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি—মেঘ ডাকছে গুরু গুরু। অজস্র বর্ষণে নদী ভরা কোটালের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আর দেখলেন, কারণ টর্চটাও তার হাতে নেই। কোথায় ছিটকে পড়েছে—এক কঠিন লণ্ডভণ্ড অবস্থা তার। চোখ স্থির। তিনি তারপর চোখ বুজে ফেললেন আতঙ্কে। অরণি আবছামতো এক নারীর হাত ধরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। নদীর ঢেউ তাকে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আর সকালেই খবর, তিথিও হারিয়ে গেছে। ঝড় ওঠার পর সবাই দেখেছে, তিথি বজরা থেকে লাফিয়ে ছুটে গেছে নদীর পাড়ে পাড়ে। কেউ আটকাতে পারেনি—বাঁচাও বাঁচাও, এই ছিল তার মুখে একমাত্র কথা। একবার শুধু বলেছে, আমাকে বাঁচাও অরুদা। অরুদা তুমি কোথায়।

তারপর যা খবর, নদীর বুকে কোনও চড়ায় আশরাফের স্টিমার ডুবি হয়েছে। ঝড়ে ক্ষতির শেষ নেই। মানুষজনও ডুবে মরেছে নদীতে। তবে মরার লাশ পাওয়া গেলেও অরণি কিংবা তিথির লাশ আবিষ্কার করা যায়নি,—এবং এভাবেই তিথি এবং অরণির এই কাহিনী বছর পার না হতেই কিংবদন্তির রূপ পায়।

কেউ বলে, তিথি শুশুক মাছ হয়ে গেছে। অরণিকে সঙ্গে নিয়ে নদীর জলে হারিয়ে গেছে। কেউ পূর্ণিমা রাতে ভরা কোটালে গভীর রাতে দু'জনকেই ঢেউ—এর মাথায় সাঁতার কাটতেও দেখেছে।

কেউ বলে, মোহনার কাছে চড়া জেগে উঠেছে, খুঁজলে তাদের সেখানে পাওয়া যেতে পারে।

আবার কারও সোজা কথা, ওসব বাজে কথা। আসলে অরণি উন্মাদ হয়ে গেছিল। তিথিকে ভালোবেসে সে উন্মাদ হয়ে গেছে। এটা বয়সেরই দোষ। তিথি সেই সুযোগে ওকে নিয়ে নদী পার হয়ে কোথাও চলে গেছে। মেয়েটা জলের পোকা, তাকে আটকায় কে!

—